শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন

১ম খণ্ড

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন

পুস্তক / ২৩৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন

মুদ্রণ
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

মূল্য : দুই খণ্ড একসঙ্গে ৩,০০০.০০ টাকা

WHITE PAPER
2000 Days of Fundamentalist and Communal Violence in Bangladesh
Volume-1

Published by
People's Inquiry Commission on
Fundamentalist & Communal Violence in Bangladesh
Printed by
Ekattorer Ghatak Dalal Nirmul Commitee
(Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971)
Ga-16 Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 0088-02-9842985, Fax : 0088-02-9842985
e-mail : <nirmul.committee@gmail.com>
Facebook : https://www.facebook.com/groups/nirmulcommittee/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCMV74eJqqKfpCo9XHS7fHew

প্রাপ্তিস্থান
অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা ♦ প্যাপিরাস, আজিজ সুপার মার্কেট

First Published : February 2022

Price : Two vol.: Tk. 3,000.00 (Bangladesh) US $ 50.00 (outside Bangladesh)

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশনের সদস্যবৃন্দ

চেয়ারপার্সন

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

যুগ্ম চেয়ারপার্সন

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

সদস্য

লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী
বিচারপতি শামসুল হুদা, জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি
জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি, সাংবাদিক মুহম্মদ শফিকুর রহমান এমপি
মানবাধিকার নেত্রী আরমা দত্ত এমপি, অধ্যাপক অনুপম সেন
সমাজকর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস, শিল্পী হাশেম খান, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী
অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ
প্রাক্তন বিচারক মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান
সমাজকর্মী কাজল দেবনাথ, স্বামী তপনানন্দগিরি মহারাজ
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম,
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বীর প্রতীক
কলামিস্ট মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আমজাদ হোসেন
অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, মানবাধিকার নেতা নির্মল রোজারিও
নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার (প্রাক্তন আইজিপি)
নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মো. আবদুর রশীদ (অবসরপ্রাপ্ত)
নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এ কে মোহম্মাদ আলী শিকদার (অবসরপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক ডা. উত্তম বড়ুয়া

সদস্য সচিব

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ

বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাসের যৌথ উদ্যোগে গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশন-এর সচিবালয়

কাজী মুকুল (সমন্বয়কারী), লেখক আলী আকবর টাবী
মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী (সিলেট), এডভোকেট রুহুল তুহীন (সুনামগঞ্জ)
অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী শম্পা, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়
শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, শহীদসন্তান তৌহীদ রেজা নূর
ডা. মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি
আদিবাসী নেতা সঞ্জিব দ্রং, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়
সাংবাদিক সমরেশ বৈদ্য (চট্টগ্রাম), সাংবাদিক মুস্তাফিজুর রহমান (সংবাদ)
সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, ব্লগার লেখক মারুফ রসুল
সাংবাদিক আবু সালেহ রনি (সমকাল), সাংবাদিক খায়রুল আলম (বিটিভি)
ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার ডাল্টন তালুকদার
ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কাওছার, এডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবু
সাংবাদিক খলিল রহমান (প্রথম আলো, সুনামগঞ্জ), সৈয়দ নূর-ই-আলম
সাংবাদিক এডভোকেট মাহবুল হাসান শাহীন (সুনামগঞ্জ খবর)
এডভোকেট মোঃ নাসির মিয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), এডভোকেট এনাম আহমদ (সুনামগঞ্জ)
এডভোকেট হাসান মাহমুদ সাদি (সুনামগঞ্জ), অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট সোলারিন আলেকজান্ডার
সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ, সমাজকর্মী মোঃ সাইফউদ্দিন রুবেল
সমাজকর্মী তপন দাস, লেখক মিথুশিলাক মুরমু, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে
সমাজকর্মী সাইফ রায়হান, সমাজকর্মী সুশীল মালাকার
সাংবাদিক আজিজুল পারভেজ, সাংবাদিক মোরসালিন মিজান (জনকণ্ঠ)
সাংবাদিক রাজন ভট্টাচার্য (জনকণ্ঠ), সাংবাদিক ঝর্ণা মনি (ভোরের কাগজ)
সাংবাদিক সুবর্ণ আদিত্য, মওলানা হাসান রফিক

সূচিপত্র

ক্র.নং বিবরণ

১ ভূমিকা/৭

২ সারাংশ ও সুপারিশ/২৫

৩ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ : একটি পর্যালোচনা/৪৭

ক) হেফাজতে ইসলামের নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয়/৭৬

খ) বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা/২০৫

গ) কওমি শিক্ষা, কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন সম্পর্কে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ২৫টি সংগঠনের বক্তব্য/২৬৯

৪ ক) বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : ২৭টি আলোচিত জঙ্গি সংগঠনের পরিচিতি/৩৩৫

খ) গুলশান হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর্যালোচনা/৪১৯

৫ রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড/৪৪৩

ক) রোহিঙ্গা ৪০টি জঙ্গি সংগঠনের ইতিবৃত্ত/৪৫৯

খ) রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে এনজিও ও জামায়াত-হেফাজতের কর্মকাণ্ড/৫১৫

গ) ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রকাশিত নির্বাচিত কলাম ও অভিমত/৫৫৫

১. রোহিঙ্গা ইস্যু নিরাপত্তার জন্য বিষফোঁড়া –মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.)/৫৫৫

২. রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান কোন পথে –অমিত গোস্বামী/৫৫৮

৩. অ্যাডভেঞ্চারিজমের সুযোগ নেই –ইশফাক ইলাহী চৌধুরী/৫৬২

৪. রোহিঙ্গাদের সর্বনাশ জামায়াত বিএনপির পৌষ মাস –জাফর ওয়াজেদ/৫৬৫

৫. রোহিঙ্গা ॥ কী বলছে আনান কমিশন! –মনজুরুল আহসান বুলবুল/৫৬৮

৬. রোহিঙ্গাদের একনদী দুঃখ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ –মুনতাসীর মামুন/৫৭৫

৭. সঙ্কট সমাধানে প্রতিবেশীসুলভ পদক্ষেপ কাম্য –মুহম্মদ শফিকুর রহমান/৫৮৩

৮. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দায় মেটাতে এগিয়ে বাংলাদেশ –মেজর জেনারেল মো. আব্দুর রশীদ (অব.)/৫৮৭

৯. রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান –শাহরিয়ার কবির/৫৯৪

১০. বার্মায় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ : আন্তর্জাতিক আদালতে অপরাধীদের বিচারের বাস্তবতা –তুরিন আফরোজ/৬০১

১১. বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন-এর উদ্দেশ্য ও বিবেচ্য বিষয় –এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক/৬০৭

১২. দৈনিক সমকালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার : 'বাংলাদেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধি দলের মিয়ানমার যাওয়া উচিত' –সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের/৬১০

১৩. রোহিঙ্গা গণহত্যা : বাংলাদেশে মানবতা বনাম সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত –শাহরিয়ার কবির/৬১৪

১৪. রোহিঙ্গাদের টেকসই সমাধান না দিতে পারলে আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টের দায় বর্তাবে এশিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রের উপর –মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুর রশীদ (অব.)/৬১৯

১৫. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ষড়যন্ত্রের লক্ষণ –মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.)/৬২৫

১৬. রোহিঙ্গা সংকট ॥ জাতিসংঘ প্রতিবেদন ও গণহত্যার দায় –হাসান আজিজুল হক/৬২৮

১৭. নিরাপত্তা ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে –এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার/৬৩১

১৮. রোহিঙ্গা-বাঙালি দাঙ্গার পাঁয়তারা –সাঈদ ইফতেখার আহমেদ/৬৩৫

১৯. রোহিঙ্গা গণহত্যা : বাংলাদেশে মানবতা বনাম জাতীয় নিরাপত্তা –শাহরিয়ার কবির/৬৪০

২০. রোহিঙ্গা সংকট ও চীনা কূটনীতি বাংলাদেশ-মিয়ানমার –তুরিন আফরোজ/৬৪৫

২১. রোহিঙ্গাদের পক্ষে রায় : অতঃপর? –এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক/৬৪৮

২২. রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ হত্যা এবং সন্ত্রাসবাদের অশনিসংকেত –অজয় দাশগুপ্ত/৬৫২

ঘ) ১০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জবানবন্দি/৬৫৫

৬ ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা : অনলাইন, অফলাইনে জঙ্গিদের বিভিন্ন বইপুস্তক, ম্যাগাজিন ও মুখপত্র পর্যালোচনা/৭০৭

খ) ওয়াজের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিস্তার এবং ৪০ জন বক্তার পরিচিতি/৭৫২

৭ বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশনের নিজস্ব ১০টি সরেজমিন প্রতিবেদন/৮১১

৮ ক) পরিশিষ্ট-১/৮৮৯

খ) র‍্যাব প্রতিবেদন ও পুলিশ প্রতিবেদন/৯৮৩

গ) হেফাজত নিয়ন্ত্রিত ১০০০ মাদ্রাসার তালিকা/৯৮৬

ঘ) তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থের তালিকা/১০২১

ভূমিকা

১৯৯২ সালের ১৯ জানুযারি শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয়েছিল প্রধানত দুটি দাবিতে– ১) '৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর প্রধান নেতা গোলাম আযম সহ অন্যান্য গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবির চক্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্তর্গত। শহীদজননীর জীবদ্দশায়ই আমাদের অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রায় চল্লিশ বছর '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম আরম্ভ করেছে, যা আমাদের আন্দোলনের আংশিক বিজয় হিসেবে স্বীকৃত।

নির্মূল কমিটির আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত বাংলাদেশের মূল সংবিধান অনুযায়ী ধর্মের নামে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ এখনও সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি এর বহু কারণ রয়েছে, যা আমরা গত ৩০ বছরে প্রকাশিত তিন শতাধিক পুস্তক, পুস্তিকা, তদন্ত প্রতিবেদনের পাশাপাশি শ্বেতপত্র আকারেও প্রকাশ করেছি।

গত ৩০ বছরে নির্মূল কমিটি বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধান, ঘটনার কুশিলবদের চিহ্নিতকরণ এবং ভুক্তভোগীদের বিবরণ সহ সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয় নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে ৭টি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে; যার ভেতর রয়েছে– ১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলার শ্বেতপত্র (বাংলা ও ইংরেজি; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬), ২) 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬: সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র' (বাংলা ও ইংরেজি; আগস্ট, ১৯৯৬), ৩) 'শ্বেতপত্র: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' (৩ খণ্ড, বাংলা, অক্টোবর ২০০৫), ৪) শ্বেতপত্র: হেফাজত জামায়াতের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ৪০০ দিন (২ খন্ড, বাংলা, নবেম্বর, ২০১৩), ৫) বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ৮০০ দিন (৩ খণ্ড, বাংলা, জুলাই ২০১৬) এবং ৬) 'পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশন-এর প্রতিবেদন (১ খণ্ড, বাংলা; মার্চ, ২০১৭)।

এই ৬টি প্রকাশনার ভেতর সবচেয়ে ক্ষীণ কলেবরের ছিল প্রথমোক্ত দুটি যা ঘটনার এক/দুই মাসের ভেতর প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় ও পঞ্চম প্রকাশনার পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ২৭৬০ ও ২৫০৬ এবং চতুর্থ ও ষষ্ঠ প্রকাশনার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫৬ ও ৩৩৬। প্রথম দুটি প্রকাশনা বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল, পরের তিনটির সারসংক্ষেপ ইংরেজি ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৬ সালের পর সরকারের সঙ্গে সমঝোতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে হেফাজতকে মাঠে দেখা যায়নি। তাদের নেতারা ওয়াজ মাহফিলের নামে সমাবেশ করে জিহাদী এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের ভেতর নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছিলেন। ২০২০ সালের নবেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকালে হঠাৎ মাঠে নেমে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছিল। এরপর ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকালে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতার নামে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে আমরা তা দেখেছি।

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হেফাজতের এই জিহাদের প্রেক্ষাপটে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জাতীয় সংসদের 'আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাসে'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২০২১-এর ২২ মার্চ 'বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন' গঠন করেছে। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে চেয়ারম্যান, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক রাজনীতিবিদ ফজলে হোসেন বাদশাকে কো-চেয়ারম্যান এবং ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে সদস্য সচিব করে গঠিত ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এই গণকমিশনের ৪২ সদস্যবিশিষ্ট একটি সচিবালয়ও তখন গঠন করা হয়েছিল, যার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল।

দীর্ঘ নয় মাস গণকমিশন এবং এর সচিবালয়ের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জঙ্গি মৌলবাদীদের বিভিন্ন প্রকাশনা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত পর্যালোচনার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন তা শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করা হল।

২ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন'-এর এই শ্বেতপত্রে ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান ক্যাফের নৃশংস হামলা ও হত্যাকাণ্ড থেকে আরম্ভ করে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনাবলীর সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমাদের প্রথম ৩টি শ্বেতপত্র নির্মূল কমিটির বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বে গঠিত এক দল তরুণ সাংবাদিক লেখক ও মানবাধিকার কর্মীর সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থিত ও প্রকাশিত হলেও ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের উত্থানের প্রেক্ষাপটে জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তের জন্য স্বতন্ত্র নাগরিক কমিশন গঠন করা হয়। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ছাত্র-জনতার গণজাগরণ মঞ্চ প্রতিহতকরণের উদ্দেশ্যে হেফাজতে ইসলামের সহিংস আত্মপ্রকাশ এবং ৫ ও ৬ মে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে বিএনপি-জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় হেফাজতের নৃশংস তাণ্ডব ও হত্যাকাণ্ডের পর দেশে ও বিদেশে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক হাজার হাজার আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্র হত্যার হেফাজতি

প্রচারণার প্রেক্ষাপটে আমরা সরকারের নিকট ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছিলাম, যা পূরণ হয়নি। ঘটনার ভয়াবহতা এবং এর সুদূরপ্রসারী অভিঘাত আশঙ্কা করে নির্মূল কমিটি ২০১৩ সালের আগস্টে বিচারপতি সৈয়দ আমীরুল ইসলামকে চেয়ারম্যান এবং শাহরিয়ার কবিরকে সদস্য সচিব করে 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন' গঠন করে। এই কমিশনকে সহযোগিতার জন্য তরুণ সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে একটি সচিবালয়ও গঠন করা হয়, যার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে প্রকাশিত তিন খণ্ডের শ্বেতপত্রে এবং বর্তমান শ্বেতপত্রে হেফাজতে ইসলামের রাজনীতি এবং জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের তদন্তকালে আমরা জেনেছি হেফাজতে ইসলামীর কতগুলো দাবি শুধু ভিত্তিহীন নয়, সর্বৈব মিথ্যা। যেমন– ১) হেফাজতের নেতারা দাবি করেন তাদের সংগঠন কোনও রাজনৈতিক দল নয়, ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা কাউকে ক্ষমতায় বসানো বা ক্ষমতা থেকে নামানো নাকি তাদের অভিলাষ নয়। অথচ আমাদের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে হেফাজতের মহা তাণ্ডবের প্রধান মদদদাতা জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপি। মহাতাণ্ডবের পর গ্রেফতারকৃত হেফাজতের তৎকালীন দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, কীভাবে তারা ৫ মে সরকার পতনের জন্য নজিরবিহীন সশস্ত্র সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, পরদিন সচিবালয় দখল করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর পর নতুন অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাবুনগরীকে করা হবে– এই মর্মে তাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট। ২) হেফাজত দাবি করে তারা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী সংগঠন এবং তাদের সঙ্গে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই। সরকারের অনেক নীতি নির্ধারকও তা মনে করেন। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে– ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেফাজতে ইসলাম তাদের দলের যে ১৩ দফা দাবি ঘোষণা করেছে এর সবগুলো জামায়াতের পুরনো দাবিরই পুনরাবৃত্তি। হেফাজতের শীর্ষ নেতা আহমদ শফী তার লেখা প্রবন্ধে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কৌশলগত ঐক্যের কথাও বলেছেন যা আমাদের তদন্তে জানা গিয়েছে। ৩) হেফাজত দাবি করেছে ২০১৩ সালে ৫ মে রাতে হেফাজতের মহাসমাবেশে পুলিশ ও র‍্যাব নির্বিচারে গুলি করে হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করেছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। নির্মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত কমিশনের তদন্তকর্মীরা সরেজমিনে তদন্ত করে জেনেছেন ৫ ও ৬ মে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে হেফাজতের সশস্ত্র সংঘাতে নিহতের সংখ্যা মোট ৪৫ জন, যাদের ভেতর পুলিশ আছে, জামায়াত-হেফাজতের কর্মী আছে, কোনও দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এরকম মাদ্রাসার শিশু আছে, এমনকি আওয়ামী লীগের একজন কর্মীও নারায়ণগঞ্জে হেফাজত-পুলিশের বন্দুক যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে নিহত হয়েছেন। আমাদের এই তালিকা হেফাজত বা সরকার কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। এসবের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমাদের পূর্ববর্তী শ্বেতপত্রে রয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র বিশ্লেষণ, এর বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং নির্মূলনের ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করতে হলে এর জন্মবৃত্তান্ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসের অন্তর্গত। এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা বুঝি হিন্দু মুসলমান– এই প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতর বিরোধ, যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হচ্ছে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, উপাসনাস্থল ধ্বংস ইত্যাদি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যখন থেকে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তখন থেকে ধর্মের নামে হানাহানি, হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও রাজ্য দখলের ঘটনাও ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের আগে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম ছিল। তখনও ঘটেছে আন্তধর্মীয় হানাহানি এবং রাজার ধর্ম কর্তৃক প্রজার ধর্ম অথবা বিশ্বাসের উপর উৎপীড়নের বহু ঘটনা।

আরব সমরনায়ক মুহাম্মদ বিন কাশিম তলোয়ারের জোরে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রর্বতন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন আফগান সমরনায়করাও। আরব ও মধ্য এশিয়ার সুফীরা যখন এ দেশে ইসলাম প্রচার করতে এসে শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বললেন তখন তারা সফল হলেন। ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল শাসন করেছেন মুঘল শাসকরা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মুঘল শাসকরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে তাদের শাসন নিরঙ্কুশ করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সনাতন ধর্মের সঙ্গে কোনও বিরোধে যাওয়া চলবে না।

বহিরাগত হলেও মুঘলরা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বিবেচনা করে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিল। মুঘলদের পর ইংরেজরা এসেছিল ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ লুণ্ঠনের দ্বারা নিজ দেশকে সমৃদ্ধ করা। ইংরেজরা ভারতবর্ষে সার্থকভাবে ধর্ম বিভাজন নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছেন তা আজ বিশাল মহিরূহে পরিণত হয়েছে। ইংরেজদের বিভাজন নীতি ভারতবর্ষ ভেঙে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ। একই উদ্দেশ্যে তারা সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও প্রসারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমসহ যে কোনও প্রচারমাধ্যমের গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে উনিশ শতকে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে বৃটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্রের চেয়ে দেশীয়দের মালিকানাধীন সংবাদপত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ও বিপক্ষে গণমাধ্যমের এই ভূমিকা এখন আরও বিস্তৃত হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী ভাইরাসের মতো।

সংবাদপত্রের প্রচলনের আগে বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষ ছিল না– এ কথা বলা ঠিক হবে না। মধ্যযুগের সাহিত্যে ও ইতিহাসে

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণভাবে স্থানিক ও কালিক। ঘটনার বা গুজবের বাহক হিসেবে সংবাদপত্র না থাকার কারণে এর বিস্তার ঘটেনি। ইংরেজ আমলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ যেভাবে ঘটেছে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ তারই অন্তর্গত। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের মাধ্যমে দৃশ্যমান হলেও এর বিকাশের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৪৮-১৯৫২র ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত। ভাষা আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা মুক্তিযুদ্ধের পর মূর্ত হয়েছে ১৯৭২ সালের ৪ নবেম্বর গৃহীত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র নির্মাণের প্রধান উপকরণ হচ্ছে– সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ও বিপক্ষের সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, নিবন্ধ এবং সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংগঠনের ইশতেহার, সমাবেশ, গুজব প্রভৃতি। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণ পাওয়া যাবে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র' গ্রন্থমালায়।

অতীতে বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক সমাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভেতর বাঙালি লোকায়ত সংস্কৃতির সুদৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে বড় ধরনের কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটার সুযোগ ছিল না। সামাজিক আচরণ উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক ছিল। এমনকি ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রেও এক ধরনের যোগসূত্র বা সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়েছে। বাঙালি হিন্দুর সত্যনারায়ণের পূজা হয়ে গেছে বাঙালি মুসলমানের সত্যপীরের সিন্নি। ঝড়বৃষ্টির সময় নৌকার মাঝি ধর্ম নির্বিশেষে এখনও বদর পীরের শরণাপন্ন হয়। ওলাইচণ্ডী অনায়াসে রূপান্তরিত হন ওলাই বিবিতে, যে দেবী দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই ভীতির কারণ। মধ্যযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসমন্বয় ও সম্প্রীতির বহু উদাহরণ আছে।

গ্রাম বাংলার সুফী ও বাউল সম্প্রদায়ের রচনা ও আচরণবিধির ভেতর এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা এবং সমন্বয়ের সংস্কৃতির অভিব্যক্তি আমাদের অজানা নয়। হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রধান কারণ ছিল দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা। মুসলমান রাজার আক্রমণে হিন্দু প্রজা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিংবা হিন্দু জমিদারের দ্বারা মুসলমান কৃষক উৎপীড়িত হয় তার কারণ রাজা-প্রজার ধর্ম নয়, শ্রেণী– এই সত্যটি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমনকি অনেক জাতীয়তাবাদীও স্বীকার করতে চান না।

এই শ্রেণী বিরোধকে ধর্মীয় বিরোধের পর্যায়ে টেনে আনার জন্য দায়ী প্রধানতঃ বহিরাগত ইংরেজ শাসকরা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ উপনিবেশটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অর্থনৈতিক শোষণ নির্বিঘ্ন রাখার প্রয়োজনে ইংরেজ শাসকরা প্রথম থেকেই এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতর বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে তাদের ভেদনীতির দ্বারা। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য বৃটিশ রাজের জন্য প্রচণ্ড শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সচেতনভাবে এই বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ভারতের ইতিহাসে পর্ব ভাগ করেছিলেন– হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও আধুনিক যুগ হিসেবে। আধুনিকতায় দীক্ষিত এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী পশ্চিমের সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ইংরেজদের সকল নীতিকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করলেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাজয় বরণের দায়িত্ব একে অপরের ঘাড়ে চাপাতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির দেয়ালে ফাটল ধরেছিল। এর পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ তাদের শাসকশ্রেণীর নিকটতর হতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে মুসলমানরা ইংরেজের কাছে সদ্য রাজ্য হারানোর শোকে পশ্চিমা শিক্ষা থেকে নিজেদের বহুকাল দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

বাংলাদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক জনতার অবশ্য এসবের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজ কুঠিয়ালদের নির্যাতন, জমিদারদের পীড়ন, মহাজনদের শোষণে তারা এমনিতেই জর্জরিত ছিল। শেষে মরিয়া হয়েই বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ এবং হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, ময়মনসিংহ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। এই ক্ষোভ যাতে পুঞ্জিভূত হতে না পারে তার জন্য ইংরেজ শাসকরা ভেদনীতি আরও শক্তিশালীভাবে প্রয়োগ করেছিল। একই সঙ্গে তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণে ইন্ধন জুগিয়েছে মহা উৎসাহের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলমানের লোকাচার ও ধর্মাচারণের অতি তুচ্ছ বিষয় এতদঞ্চলে যা উপেক্ষিত ছিল সেগুলো অতি বড় সমস্যা হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দুই সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলেন তারা একে অপরের চেয়ে আলাদা। তাদের ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সামাজিক আচরণ, রীতিনীতি সবই আলাদা। ধর্মের নামে নিজেরা আলাদা হলেও ব্যক্তিগত তাদের জীবনে ধর্ম এক্ষেত্রে কতখানি অপ্রয়োজনীয় ছিল দুটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরোধের বিষয় ছিল মুসলমানদের মসজিদের সামনে হিন্দুদের পুজোর বাদ্য বাজানো এবং মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের দেবতা 'গোমাতা'কে খাদ্য হিসেবে গণ্য করা। বলা যেতে পারে এই উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে এই দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে বিকশিত হয়েছে।

খাদ্য ও বাদ্যের বিষয় ছাড়াও সাম্প্রদায়িক বিরোধের আরো বহু হাস্যকর প্রসঙ্গ এ পর্যায়ে লক্ষণীয়। হাস্যকর এই কারণে যে ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যা বলেন বা করেন তার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। ভাষার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিতর্কটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রদায়িক মুসলমানরা এক সময় মনে করতেন বাংলা ভাষা হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা এবং এই ভাষা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও অনুপযুক্ত। এই চেতনার ভেতর ধর্মের প্রতি আনুগত্য নয় হিন্দু-বিরোধিতাই ক্রিয়াশীল ছিল। কারণ এই

বক্তব্যধারীরা যদি প্রকৃত অর্থে ধর্মের প্রতি অনুগত হতেন তাহলে হিন্দু এবং খৃস্টানরা যেভাবে বাংলা ভাষাকে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, মুসলমানরাও তাই করতেন। অবশ্য বিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ধর্মীয় কারণে এবং বাস্তব কারণেও ভাষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন। বাংলার প্রতি মুসলমানদের এই বিরোধের কারণ ছিল অন্যত্র। মুসলমান সমাজের তৎকালীন কর্ণধাররা– যাঁরা ছিলেন নবাব ও জমিদার পরিবার থেকে আগত, তারা লক্ষ্য করেছিলেন ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে চালু করার জন্য তাদের সম শ্রেণীর হিন্দুরা 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি পত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন, সুতরাং এর বিরোধিতা করা দরকার। নিতান্ত সাম্প্রদায়িক কারণে নবাব আদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ ও আমীর আলীর নেতৃত্বে উর্দু ও ফারসী প্রচলনের দাবী উত্থাপিত হয়েছিল, যে ভাষা বিতর্ক ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৪৭-এ ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকরা বিদায় নেয়ার সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তানের জন্ম দেয়। '৪৭-এর আগে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করলেও দেশভাগের পর পরই তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্তসারশূন্যতা ও ভ্রান্তি উপলব্ধি করে এবং বাঙালির স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার জন্য বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে। ১৯৭১ সালে এই ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে গঠিত হয় বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত কৃত্রিম পাকিস্তানের দর্শন নাকচ করে দিয়ে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং যে বাঙালি মানস গঠিত হয়েছিল তার পেছনে ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশে যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রাম বেগবান হয়েছে, যখনই স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্ন উঠেছে তখনই শাসক শ্রেণী জনগণকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সরকারের মালিকানাধীন গণমাধ্যম এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে মহানবীর এক গাছি চুল অপহরণের সংবাদে গোটা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছিল। বাংলাদেশের হিন্দুরাও তখন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়েছিল। সেই সময়ে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ গণবিক্ষোভে রূপ নিচ্ছিল। তবে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাংবাদিক সমাজ তখন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, ধারণা করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা এতদঞ্চল থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। '৭৫ সালে স্বাধীন

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে সংবিধান থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র খারিজ করে মুখবন্ধের উপরে 'বিসমিল্লাহ .....' সংযোজন করে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থানের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তার উত্তরসূরী জেনারেল এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণা করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছেন।

জেনারেল জিয়ার সময় সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলি 'বাঙালি না বাংলাদেশী' এই অর্থহীন বিতর্ক চালু করে গোটা জাতিকে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। পাকিস্তান আমলের মতো অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ইসলামের প্রতিপক্ষ বানানো হয়েছে। যা কিছু বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্গত সব হিন্দুয়ানি ও ইসলামবিরোধী বলা হয়েছে। মোল্লাদের বিচিত্র সব ওয়াজ এবং মাদ্রাসায় এখনও তাই শেখানো হয়।

১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যখন গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে তখন এরশাদ ও জিয়ার মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য, একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী যুদ্ধাপরাধী মওলানা মান্নানের মালিকাধীন দৈনিক 'ইনকিলাব' ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মিথ্যা সংবাদ ছেপে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টি করেছিল তার জের চলেছিল বেশ কয়েক দিন। অবশ্য দৈনিক 'ইনকিলাব' একদিন পরই এই মিথ্যা সংবাদ ছাপার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু ততদিনে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মন্দির ভাঙা হয়েছে, বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠিত হয়েছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে এবং 'ইনকিলাব'-এর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

সেই সময়ে ভারতেও কিছু পত্রিকা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার জন্য কিছু মিথ্যা সংবাদ ছেপেছিল। উত্তর প্রদেশের 'দৈনিক জাগরণ,' 'স্বতন্ত্র ভারত,' 'স্বতন্ত্র চেতনা' ও 'আজ'-এ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মিথ্যা সংবাদ ছাপা হলে প্রেস কাউন্সিল তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করে এবং কোন কোন পত্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছেপে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির অপরাধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এর ফলে 'ইনকিলাব' ও সমচরিত্রের কিছু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী পত্রিকা সুযোগ পেলেই ভারতে মুসলমান নির্যাতনের বিষয় ফলাও করে ছাপে এবং বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়ে কোন কথা বলে না। ২০০১ সলের নির্বাচনের সময় আমার মতো যেসব সাংবাদিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে লিখেছেন, 'ইনকিলাব' তাদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে ফাঁসি দাবি করেছে।

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও হামলা হয়েছে দেশের প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোতে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় স্তম্ভে এই নির্যাতন বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে, সাম্প্রদায়িক

দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নির্যাতিতদের সামাজিক ও আর্থিক পুনর্বাসনের দাবিও জানানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার এসবের প্রতি কোন কর্ণপাত করেনি। বরং নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যরা প্রথম থেকে বলছেন বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলো মিথ্যা, বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত সংবাদ ছাপছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে লেখার জন্য এবং সরকারের মিথ্যাচার চ্যালেঞ্জ করার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তব্যরত সাংবাদিকদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপণের মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার হরণের ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে– '৯২-এ যেমন হামলা হয়েছে রাজধানী ও প্রধান প্রধান শহরের হিন্দুদের উপর ২০০১-এ হয়েছে তার উল্টোটি। ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত বড় বড় শহরগুলোতে হিন্দুদের অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, ঘটনা ঘটেছে গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। যেহেতু ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রচুর বিদেশী পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে এসেছিলেন, সেহেতু প্রশাসন শহরগুলোর পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে চেয়েছে। নির্বাচনের দিন দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকরা, এমনকি সাংবাদিকরাও মাইলের পর মাইল কাঁচা রাস্তায় কাদা পানির ভেতর হেঁটে বা নৌকায় দুর্গম এলাকায় যান নি, তাই সেই সব এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর নেমে এসেছিল অকল্পনীয় নির্যাতন। তারপরও খবরের কাগজে নির্যাতনের যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা বিবেকসম্পন্ন মানুষদের বিচলিত, বেদনার্ত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছে হতভাগ্য পিতার কথা যিনি নিজের চোখের সামনে দেখেছেন তাঁর স্ত্রী, ভগ্নি ও কিশোরী কন্যাকে ধর্ষিতা হতে, চোদ্দ বছরের বালিকা শিকার হয়েছে গণধর্ষণের, কন্যাকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন পিতা, বৃদ্ধ জ্ঞানতাপসকে মাথায় গুলি করে হত্যার খবর, কিংবা সেই অসহায় মায়ের কথা যিনি দুষ্কৃতকারীদের মিনতি করে বলছেন তার কন্যার বয়স মাত্র বার, তারা যেন একজন একজন করে আসে। এ ধরনের শত শত সংবাদ ২০০১-এর মধ্য জুলাই থেকে ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। হামলার উপলক্ষ হিসেবে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে হিন্দু মাত্রেই আওয়ামী লীগের সমর্থক, নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়, অতএব তারা বিনাশযোগ্য। অথচ তুলনামূলকভাবে নৌকায় ভোট বেশি দিলেও বহু হিন্দু ভোটার বাম দলগুলোর সমর্থক, এমনকি তারা বিএনপিকেও ভোট দেয়। সিরাজগঞ্জের ধর্ষিতা কিশোরী পূর্ণিমার মা ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন তারা ধানের শীষে ভোট দেয়ার কথা বলেও নির্যাতনের কবল থেকে রেহাই পাননি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, যারা সেই সময় উপদ্রুত অঞ্চল সফর করেছে, ঢাকায় ফিরে এসে বলেছে– প্রকৃত ঘটনা যা ঘটেছে খবরের কাগজে তার অর্ধেকও ছাপা হয়নি। আক্রান্ত বিপন্ন ও অসহায় হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। যে কারণে তারা আক্রান্ত হলেও প্রাণভয়ে প্রকাশ করতে চায় না। থানায় কদাচিৎ অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। থানায় বা পত্রিকার সাংবাদিকদের নির্যাতনের কথা জানালে হামলাকারীরা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। অনেকে পুলিশ বা সাংবাদিকদের নির্যাতনের কথা জানাতে গিয়ে নিজেদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। আবার অনেকে নির্যাতনের কথা জানাতে না পেরে অপমানের গ্লানি ও যন্ত্রণায় আত্মহত্যাও করেছে।

২০০১-এর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা সরকার প্রথম থেকেই আড়াল করতে চেয়েছিল। সরকারের ভ্রুকুটি ও হুমকি উপেক্ষা করে যারা এসব ঘটনা ছেপেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতের চার দলীয় জোট সরকারের এ ধরনের ফ্যাসিস্ট আচরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে এখানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে চায়। চার দলীয় জোটের মৌলবাদী শরিকরা বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মতো মৌলবাদী ও তালেবানি রাষ্ট্র বানাবার অঙ্গীকার প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছে। সংবাদপত্র সরকারের এই সব কার্যকলাপ সাধারণের কাছে উন্মোচিত করেছে বলেই এই সরকার গণমাধ্যমের উপর এতটা রুষ্ট ছিল। বর্তমানে বিএনপি-জামায়াত বিরোধী দলে অবস্থান করলেও তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডা নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। যে কারণে বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও হামলা সম্পর্কে দায়সারা বিবৃতি দিয়ে সরকারের সমালোচনা ছাড়া ভুক্তভোগীদের পক্ষে কার্যকর অবস্থান গ্রহণের কোনও উদ্যোগ বিএনপি-জামায়াত চক্র কখনও নেয়নি, কারণ তাদের মূল এজেণ্ডা হচ্ছে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা, যাতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

বিএনপি-জামায়াত জোটের জমানায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সময় দেখা গেছে সংবাদপত্র ও সিভিল সমাজ এর বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার ছিল রাজনৈতিক দলগুলো সেভাবে সোচ্চার হতে পারেনি। এখনও এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। '৬৪ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারীরা পরাস্ত হয়েছিল। এমনকি '৯২ সালেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলো একজোট হয়ে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি' গঠন করে উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছিল, নির্যাতিত মানুষদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়েছিল; কিন্তু ২০০১-এ এবং এর পর কখনও তা হয়নি। রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা শুধু নির্যাতিতদের নয়, সর্বস্তরের মানুষকে হতাশ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান না হওয়ার কারণ– ১) ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা ও নির্যাতনকে ধর্মের নামে বৈধতা দেয়া, ২) সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ যা সাম্প্রদায়িক শোষণ-পীড়নকে এক ধরনের বৈধতা দিয়েছে এবং ৩) উপযুক্ত আইনের অভাবে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য

দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ না হলে শুধু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

তিন

আমাদের অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ দুটি ভিন্ন বিষয়। তাদের সরল যুক্তি হচ্ছে– সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণের লক্ষ্য ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন জাতি। পক্ষান্তরে মৌলবাদীরা ধর্মের কট্টর অনুসারী এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত স্বধর্মীরা, যারা তাদের ভাষায় ধর্ম থেকে বিচ্যুত। জামায়াতে ইসলামীর মতো দলকে তারা মনে করেন মৌলবাদী, যদিও অনেক মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামবিরোধী হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী বা হেফাজতে ইসলামের মতো সংগঠনের রাজনীতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে ভিন্ন বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও সুযোগ নেই। জামায়াতের মওদুদীবাদ এই উপমহাদেশে সৌদি ওহাবিবাদেরই নবসংস্করণ, যার আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে ভিন্নমত, ভিন্নধর্ম ও ভিন্ন জীবনধারার অনুসারীরা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইংরেজদের ভাষায় সিপাহী বিদ্রোহের পর উপমহাদেশের রক্ষণশীল ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসী মুসলমান নেতারা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত না করলে মুসলমানদের স্বার্থ বা ইসলাম রক্ষা করা যাবে না এবং ক্ষমতায় যেতে হলে হিন্দুদের মোকাবেলার পাশাপাশি প্রবল ক্ষমতাশালী ইংরেজদের বিরোধিতার পথ ছেড়ে সহযোগিতার পথ অনুসরণ করতে হবে। এর আগে ওহাবিরা কট্টর ইংরেজবিরোধী ছিলেন। ওহাবিদের এই উপলব্ধির কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু নেতা বললেন, হিন্দুত্ব রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের প্রতি বৈরিতার পাশপাশি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম, ভাষা, জাতিসত্তা নির্বিশেষে ভারতীয়দের প্রথম ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের এক যুগের ভেতরই উপমহাদেশে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও বিভেদের রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইংরেজরা উগ্র হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের এ হেন মনোভাব লক্ষ্য করে ভারতবর্ষে মুসলমানিত্ব ও হিন্দুত্বকে উস্কে দিয়ে বিভাজন নীতি অনুসরণ করে যেভাবে মৌলবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করেছে– তার পরিণামে দেশভাগ হয়েছে, ধর্মের নামে হানাহানি বেড়েছে, সম্প্রীতি ও মানবতা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল উপমহাদেশের ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ। এই মুক্তিযুদ্ধের ফসল হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বকে কবর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিজয় চার বছরও ধরে রাখা যায়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারীরা প্রথম সুযোগেই স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ১৯৭৫-এর

পর থেকে বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতির মৌলবাদীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ তথা ও 'ইসলামিকরণে'র যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির ক্ষমতায় থাকাকালেও তা অব্যাহত রয়েছে, যা কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়।

১৫ মে (২০১৪) জনকণ্ঠের প্রথম পাতার একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল– 'অবশেষে হেফাজতের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে সরকারের সমঝোতা!' সংবাদের শুরুতে বলা হয়েছে– 'শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে হেফাজতে ইসলাম! অলিখিত ও অঘোষিত কিছু শর্তসাপেক্ষে বিপরীতমুখী অবস্থান থেকে সরে আসার বিষয়ে একমত এখন উভয়পক্ষই। সরকারের বিরুদ্ধে থাকা আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন হেফাজতের আমির শাহ আহমদ শফী। সরকারের সঙ্গে সমঝোতার অংশ হিসেবে আমিরের অফিস ও হেফাজতের সদর দফতর হাটহাজারী মাদ্রাসা লিজ পেয়েছে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের জমি। পাশাপাশি হেফাজত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দায়ের করা মামলাগুলোর বিষয়ে নমনীয় অবস্থান আদায়ের বিষয়েও সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছেন হেফাজতের আমির।'

এরপর সংবাদে বিস্তারিত বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের সঙ্গে হেফাজত প্রধান আহমদ শফীর আলোচনা ও সমঝোতার ইতিবৃত্ত।

২০১৩-এর ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদন্ডের দাবিতে ঢাকার শাহবাগে তরুণদের মহা অভ্যুত্থান মোকাবেলার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী এককালের জামায়াতবিরোধী সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'কে মাঠে নামিয়েছিল। জামায়াতের অর্থের প্রলোভনে হেফাজত নেতারা জামায়াতবিরোধী অবস্থান থেকে সরে এসে জামায়াত-বিএনপির সহযোগিতায় লংমার্চ ও ঢাকা অবরোধের নামে ৬ এপ্রিল ও ৫ মে (২০১৩) যে মহাতাণ্ডব করেছে গোটা জাতি তা প্রত্যক্ষ করেছে। ৫ মে শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশ থেকে হেফাজত বর্তমান সরকারকে নাস্তিকদের সরকার আখ্যা দিয়ে উৎখাতের হুমকি শুধু নয়, সরকার পতনের আয়োজনও করেছিল; যা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ঝটিকা অভিযানের কারণে সম্ভব হয়নি। ৬ মে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, হেফাজত-জামায়াতকে আর ছাড় দেয়া হবে না।

হেফাজত-জামায়াত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর মনোভাবের কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হেফাজতের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী সহ শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সারা দেশে জামায়াত হেফাজতের নাম-নিশানা দেখা যায়নি। হঠাৎ সরকারের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ উপলব্ধি করলেন হেফাজত-জামায়াত-বিএনপিকে, মুনতাসীর মামুনের ভাষায় 'হে-জা-বি'দের ব্র্যাকেটভুক্ত না করে জামায়াতকে বিএনপির খপ্পর থেকে এবং হেফাজতকে জামায়াতের কবল থেকে বের করে আনতে হবে। তখন থেকেই আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মন্থরতা এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগকে বন্ধু ঘোষণা করে হেফাজতপ্রধানের একাধিক ভাষণ, সর্বোপরি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভেতর জামায়াত-হেফাজতের অনুপ্রবেশ।

২০১৩ সালের নবেম্বরে জামায়াত হেফাজতের দেশ ও জাতিবিরোধী কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা জাতীয় গণকমিশন গঠন করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম যার শিরোনাম ছিল 'হেফাজত-জামায়াতের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ৪০০ দিন।' এতে হেফাজতের ১৩ দফার বিশ্লেষণ, হেফাজত নেতাদের জামায়াত ও আলকায়দা কানেকশন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিনাশী কার্যক্রম সবই বিস্তারিত বলা হয়েছে। শ্বেতপত্রে হেফাজত তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ সহ ১৯ দফা সুপারিশ করা হয়েছিল। শ্বেতপত্রের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভেতর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে–

ক. গণকমিশন কর্তৃক এক হাজার কওমি মাদ্রাসায় অনুসন্ধান, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষকদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসী রিক্রুটের প্রধান কেন্দ্র এবং এটি বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে এসব মাদ্রাসার উপর সরকারের কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ, তদারকি বা নজরদারি না থাকার কারণে। গণকমিশনকে কওমি মাদ্রাসার ৮৮% ছাত্র এবং ৭৫% শিক্ষক কওমি মাদ্রাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি এবং শিক্ষকদের বেতনভাতা আলিয়া মাদ্রাসার সমপর্যায়ে আনার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

হেফাজতপ্রধান আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন 'বেফাক' দীর্ঘকাল ধরে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দাবি করছিল। সরকার যখন স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হয়েছে তখন আহমদ শফী বলছেন স্বীকৃতির নামে সরকার কওমি মাদ্রাসায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, যা তারা হতে দেবেন না। এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তারা গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। বেফাকের এই দ্বৈত ভূমিকা সরকারকে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিকট তুলে ধরতে হবে।

খ. সকল কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত সহ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস না জানলে মাদ্রাসার ছাত্রদের কখনও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না।

গ. কওমি মাদ্রাসায় ছেলেদের পড়তে পাঠিয়ে কোনও বাবা-মা আশা করেন না– তাদের ছেলে একদিন লাশ হয়ে ফিরে আসবে। মাদ্রাসায় সবরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ এবং ছাত্রদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

ঘ. মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কোনও বিশেষ ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র বা বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভ্রান্ত অথবা বৈষম্যমূলক কিছু যেন না থাকে সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েকে সতর্ক থাকতে হবে। সংবিধানের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে সর্বস্তরের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা কার্যক্রম।

ঙ. সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদার পরিপন্থী সকল প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তকে বা প্রচারমাধ্যমে এ ধরনের কিছু থাকলে তা সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেবে।

চ. নারীর প্রতি অবমাননাকর যে কোন বক্তব্য নারী নির্যাতন এবং নারীর মৌলিক অধিকারহরণের ক্ষেত্র তৈরি করে। গণমাধ্যমে এ ধরনের বক্তব্য প্রচারের বিরুদ্ধে সংবিধান ও প্রচলিত আইন থেকে উৎসারিত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের সুপারিশ ও পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্তে সরকার হেফাজতের পরামর্শে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতিতে ক্লাস এইট পর্যন্ত মাদ্রাসায় পৃথক পাঠ্যসূচির পরিবর্তে সাধারণ পাঠ্যসূচি অনুসরণ এবং মাদ্রাসায় বাঙালি জাতি এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো বাধ্যতামূলক করবার কথা বলা হয়েছে। জামায়াত-হেফাজতের হুমকির কারণে এই শিক্ষানীতি হিমঘরে পড়ে আছে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পরিবর্তে মহাজোট সরকার কীভাবে হেফাজত-জামায়াতের শিক্ষানীতি অনুসরণ করছে এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিকে বিস্তর লেখা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৫ মে-র দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত 'সরকারি পাঠ্য বইতে জামায়াতি আদর্শ' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–

'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অধিকাংশ বইতে স্থান পেয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর নীতি ও আদর্শ। ইসলামের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে জামায়াত-শিবির যেসব কৌশল অনুসরণ করছে, সেগুলোই সরকারি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবর্তন করা হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা।

মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) থেকে শুরু করে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত সব স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও নোট-গাইডে সুকৌশলে জামায়াতের দর্শন-মওদুদীবাদ ও তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এমনকি এসব বই প্রকাশ করেছে জামায়াত-শিবিরের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা ১০টি প্রতিষ্ঠান। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদন থেকে পাওয়া গেছে এসব তথ্য। আলিয়া মাদ্রাসার অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক ও গাইড বই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রণয়ন করা হয়েছে এ প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞ আলেম, মুফতি মুফাসসির ও মুহাদ্দিস সমন্বয়ে গঠিত ২১ সদস্যের কমিটি ব্যাপক পর্যালোচনার পর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। জামায়াতি ও মওদুদী দর্শনযুক্ত বই অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহারসহ সাত দফা সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

এছাড়া মাদ্রাসার বইতে দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে উপেক্ষা করা, 'জাতির পিতা' শব্দ ব্যবহার না করা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বদলে

জামায়াতি দর্শন শেখানো হচ্ছে বলে কমিটির পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়। ২১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি সোমবার সরকারের 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কমিটি'র কাছে হস্তান্তর করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।' (যুগান্তর, ১৫ মে, ২০১৪)

এরপর ২০১৭ সালে আমরা দেখেছি হেফাজতের দাবির কারণে কীভাবে সাধারণ শিক্ষা পাঠক্রমের সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে।

প্রায় কোটি ছাত্রের কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসায় জামায়াতে ইসলামী তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে ১৯৮০-এর দশকে, জেনারেল এরশাদের আমল থেকে। প্রাক্তন মুসলিম লীগ নেতা এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম প্রধান সহযোগী দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল মান্নান জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'জমিয়তুল মুদাররেসিন' গঠন করেন। আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে তিনি তার নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ করেন।

জামায়াতে ইসলামী '৮০-এর দশক থেকে সচেষ্ট মাদ্রাসায় সেভাবে ঢুকতে পারে নি। কওমি মাদ্রাসাগুলো যেহেতু ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষানীতি অনুসরণ করে এবং দেওবন্দিরা যেহেতু জামায়াতবিরোধী সেজন্য সেখানে অনুপ্রবেশের কোনও সুযোগ জামায়াতের তখন ছিল না। জামায়াতকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। জামায়াতের অর্থ, মেধা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে হেফাজতের নেতারা তাদের সংগঠনের দরজা জামায়াতের জন্য খুলে দিয়েছেন, যার ভয়ঙ্কর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল ও ৫ মে' হেফাজতের কর্মসূচীতে জামায়াতের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতায়।

২০১৩ সালের আগে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণকারী হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন 'ইসলামী ঐক্য জোট', 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামী' 'খেলাফত আন্দোলন', খেলাফত মজলিশ', 'ইসলামী আন্দোলন' ও 'নেজামে ইসলামে'রও শীর্ষ নেতা এবং একই সঙ্গে জামায়াতবিরোধী। অপরদিকে মওলানা মান্নানের কারণে ২০০১ সালের আগে আলিয়া মাদ্রাসায়ও জামায়াতের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জামায়াত ও জামায়াতবিরোধী সকল মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধাপরাধীদের দলকে তাদের জোটভুক্ত করেছে এবং জোটের ঐক্য ধরে রাখার জন্য জামায়াত ও জামায়াতবিরোধীদের আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ভারতের আধিপত্য, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইত্যাদি জুজুর ভয় দেখিয়ে এক মঞ্চে একত্রিত রেখেছে।

২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে 'হরকতুল জিহাদ' এবং অপরাপর জঙ্গী সংগঠনের পাশাপাশি জোটের অন্যান্য শরিকের সঙ্গে জামায়াতের দ্বন্দ্ব ও দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছে বিএনপি। যেহেতু এরশাদের দল ও মওলানা মান্নান এক সময় বিএনপিবিরোধী ছিলেন সেহেতু জামায়াত ক্ষমতায় এসে প্রথম সুযোগই আলিয়া মাদ্রাসায় কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয় এবং অল্প সময়ের ভেতর মওলানা মান্নানের জামিয়তে মুদাররেসিনকে তারা কোনঠাসা করে ফেলে। সেই সময় জামায়াত মাদ্রাসা ও

মসজিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

জামায়াত-হেফাজত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বিরুদ্ধে তাদের অনড় অবস্থান কখনও গোপন করে নি। হেফাজতপ্রধান আওয়ামী লীগকে বন্ধু বললেও কখনও তিনি বলেন নি ২০১৩ সালে তাদের ১৩ দফাকে কেন্দ্র করে ৫ মের মহাতাণ্ডবের জন্য, ৪৫ জনের হত্যা এবং জনগণের শত শত কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংসের জন্য তিনি অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থী। হেফাজত নেতারা কখনও বলেননি হেফাজত ১৩ দফা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তারা বাংলাদেশের সংবিধান মেনে নিয়েছেন। কোনও কওমি মাদ্রাসাকে বৈধভাবে সরকারি জমি লীজ দেয়ার ভেতর আপত্তির কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না। সরকারের নেতারা এরকম বহু জমি আত্মসাৎ করছেন বা অন্যদের আত্মসাতে সহযোগিতা করছেন– যেগুলো নিঃসন্দেহে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু হেফাজতের মাদ্রাসাকে জমি দিয়ে জঙ্গীবাদকে যদি মদদ দেয়া হয় সেটি গুরুতর অপরাধ। পুরনো বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে দুধকলা দিয়ে কখনও কাল সাপকে পোষ মানানো যায় না। হেফাজত যে পোষ না মানা কাল সাপ এটা সর্বশেষ প্রমাণ করেছে– ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করার হুমকি দিয়ে। ২০২১ সালে তারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতার অজুহাতে বহু জায়গায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভেঙেছে। এসবের বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান শ্বেতপত্রে রয়েছে।

হেফাজত-জামায়াতের সঙ্গে সরকারের সমঝোতার যে অভিযোগ উঠেছে, এ বিষয়ে সরকারকে নিজেদের অবস্থান স্বচ্ছ করতে হবে। প্রতি বছর জানুয়ারি ও মে মাসে সরকারের সহযোগিতায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বরেণ্য কথাশিল্পী শওকত ওসমানের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। বিভিন্ন আলোচনা সভায় তাঁর আদর্শ সমুন্নত রাখার কথা বলেন সরকারের মন্ত্রীরা। শওকত ওসমানের একটি বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে 'মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা'। সরকারের মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকদের অনুরোধ করব– হেফাজত-জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা করবার আগে শওকত ওসমানের এই বইটি অত্যন্ত পড়ুন। তিনি বামপন্থী ছিলেন না, সব সময় আওয়ামী লীগ সমর্থন করেছেন। শওকত ওসমান লিখেছেন, মৌলবাদের আগুন নিয়ে যারাই খেলতে গিয়েছে তারা ধ্বংস হয়েছে।

মাঠপর্যায়ে জঙ্গিবাদ দমনে শেখ হাসিনার সরকার দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করে জঙ্গিদের আদর্শিক গুরু হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে কেন সমঝোতার সম্পর্ক রাখে এ বিষয়ে দলের অবস্থান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের স্পষ্ট করতে হবে। আমাদের আগের শ্বেতপত্রে এবং বর্তমান শ্বেতপত্রেও হেফাজত নেতাদের জঙ্গি সম্পৃক্ততা, আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা ও তালেবানের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং আদর্শগত অভিন্নতার বহু তথ্য রয়েছে।

জঙ্গিদমনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হলেও বিএনপি-জামায়াত এর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার অব্যাহত রেখেছে। নিজেরা মুক্তচিন্তার লেখক, প্রকাশকদের

হত্যা করে বাইরে প্রচার করছে বাংলাদেশে ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা ও গুম করছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি-জামায়াত সাম্প্রদায়িক হামলা করে দায় চাপাচ্ছে সরকারের ঘাড়ে। এর বিরুদ্ধে সরকারের কোনও জোরালো প্রতিবাদ নেই।

জামায়াত-বিএনপি তাদের পক্ষে কাজ করবার জন্য বিদেশে বহু লবিস্ট নিয়োগ করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাইবার যুদ্ধে তারা আওয়ামী লীগের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে যুক্ত করার কোনও উদ্যোগ সরকারের নেই। বিদেশে লবিস্ট নিয়োগের পাশাপাশি প্রবাসী বাঙালিদের মেধা ও দেশপ্রেম সরকার কাজে লাগাতে পারে। দেশের বাইরে দেখেছি অনেকে কাজ করতে আগ্রহী কিন্তু তাদের কাজে লাগানোর কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারের। যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন জামায়াত-বিএনপির প্রধান দুর্গে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যারা বিদেশে থাকেন, যারা দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে চান বহু জায়গায় তারা আওয়ামী লীগের দলীয় কোন্দলের কারণে হতাশ হয়ে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন।

বর্তমান শ্বেতপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে জঙ্গিবাদের আশঙ্কাজনক বিস্তার এবং এর সঙ্গে জামায়াত-হেফাজতের সম্পৃক্ততা। প্রতিবেশি মিয়ানমারে গণহত্যা ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছেন, পশ্চিমা গণমাধ্যম তাকে 'মানবতার জননী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। হেফাজত-জামায়াতের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক গোদের ওপর জঙ্গি রোহিঙ্গাদের বিষফোঁড়া বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটানোর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কক্সবাজার, বান্দরবান ও আরাকানের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন রোহিঙ্গা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের এজেণ্ডা নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাদের এদেশীয় এজেন্ট জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে দীর্ঘকাল কাজ করছে। ২০১৭ সালে নতুনভাবে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার আগমন তাদের এই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে দেশে ও বিদেশে আমরা বহুবার বলেছি রোহিঙ্গাদের দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলে তাদের তৃতীয় দেশে স্থানান্তর করতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ শুধু নয়, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিপন্ন হবে এবং পশ্চিমা বিশ্বও নিরাপদ থাকবে না। বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে গণ্য করে এই অপশক্তিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে মোকাবেলার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় পুঁজি হচ্ছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং '৭২-এর সংবিধান। এই পুঁজি ব্যবহারে আওয়ামী লীগের কার্পণ্য কিংবা অনীহা জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থানকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে। মাঠ পর্যায়ে সরকারের জঙ্গীদমন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হলেও নাগরিক সমাজ কর্তৃক তাবৎ জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের গডফাদার জামায়াতের রাজনীতি

নিষিদ্ধকরণের দাবি এখনও পূরণ হয়নি। আমাদের দাবি এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের কারণে আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিল ক্ষমতায় গেলে তারা 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন এবং 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠন করবে। গত তিন বছরে এই নির্বাচনী অঙ্গিকার বাস্তবায়িত হয়নি। এটা ঠিক যে, গত কয়েক বছর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে কোথাও বড় ধরনের জঙ্গী হামলা হয়নি, তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না— রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে মৌলবাদীকরণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুকে মান্য করব, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন যা প্রতিফলিত হয়ছিল '৭২-এর সংবিধানে, তা অমান্য করব– এমন ধারা চলতে থাকলে আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে, কিন্তু সভ্য জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যাবে না, যেখানে বঙ্গবন্ধু দেশ ও জাতিকে নিতে চেয়েছিলেন। সৌদি আরবের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের ২০ গুণেরও বেশি। শুধু জিডিপি বাড়িয়ে সৌদি আরবের মতো অসভ্য দেশ নিশ্চয়ই আমরা হতে চাইব না। আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের আগামী নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশকে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চান। আমরা দেখতে চাই মহাজোট আবার ক্ষমতায় এলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীতে প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবাধিকারের সূচকে বাংলাদেশের মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি পাবে। মর্যাদা বৃদ্ধির এই ব্যবস্থাপত্র নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করলেই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে।

আমাদের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাগরিক আন্দোলনের সামাজিক মাত্রা রয়েছে, সাংস্কৃতিক মাত্রাও রয়েছে, কিন্তু এই আন্দোলনের চরিত্র মূলত রাজনৈতিক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে '৭১ আর '৯২-এর মতো একজোট হয়ে এক মঞ্চে না দাঁড়ালে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা যাবে না। আশা করি আমাদের বর্তমান শ্বেতপত্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটনের ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করবে।

শাহরিয়ার কবির
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

সারাংশ ও সুপারিশ

সারাংশ ও সুপারিশ

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতিকে এক অনন্যসাধারণ সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী তাঁর অপরাপর সহযোগীরা। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বকে কবর দিয়ে এই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য। সমাজে সমতা সৃষ্টির জন্য একমুখী শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে ধর্মের নামে হত্যা সন্ত্রাসের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বৈধতা দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির যে 'পাকিস্তানিকরণ' প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন সেই অভিশাপ থেকে আমরা আজও মুক্ত হতে পারিনি।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নির্মূল কমিটি গণকমিশন গঠন করে জঙ্গি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সার্বিক চরিত্র উন্মোচন করেছে এবং একে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয় সুপারিশ শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করেছে।

২০২১ সালের ২২ মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন গঠন করেছে। দীর্ঘ নয় মাস তদন্ত করে 'বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন' শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করছে।

এই শ্বেতপত্রে ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাজধানীর হলি আর্টিজান ক্যাফের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা থেকে আরম্ভ করে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জঙ্গি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে যা বিভিন্ন যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সন্ত্রাসের কারণে ও কুশীলবদের সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে জঙ্গিবাদের অন্যতম প্রধান উৎস হেফাজত ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন, রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম, ওয়াজের মাধ্যমে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো সহ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি শ্বেতপত্রে অন্তভূক্ত করা হয়েছে। শ্বেতপত্রে আলোচিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ-

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার এক বছর পর ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম। এই সংগঠনের শীর্ষনেতারা মুক্তিযুদ্ধকালে নেজামে ইসলামীর সাথে ছিলেন। এই সংগঠনটি (নেজামে ইসলাম) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটাতে মদদ দিয়েছে। পরবর্তীকালে হেফাজত ইসলামের নেতারা হরকাতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তথাকথিত আফগান জিহাদে অংশ নিয়েছেন। ২০১১ সালে সরকার 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' ঘোষণা করলে হেফাজতে ইসলাম প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা শুরু করে।

২০১৩ সালে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন শুরু হলে হেফাজতে ইসলাম এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মঞ্চের সংগঠকদের নাস্তিক-ব্লগার আখ্যা দিয়ে এবং যুদ্ধাপরাধীদের নামে আলেম-ওলামাদের বিচার করা হচ্ছে বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন সংগঠনটির নেতারা।

২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলাম ঘোষিত ১৩ দফা কর্মসূচি বিভিন্ন সময়ে সমালোচিত হয়েছে। এসব দাবির মধ্যে ছিল ইসলাম ধর্ম অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে আইন করা, নারীদের পোশাকে হিজাব যুক্ত করা, বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত নারী নীতি ও শিক্ষা নীতির তথাকথিত ইসলামবিরোধী ধারাগুলো বাদ দেওয়া, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ভাস্কর্য বা মঙ্গল প্রদীপের মতো সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলোর বিরোধিতা, নাটক-সিনেমায় ধর্মীয় লেবাসের লোকজনের নেতিবাচক চরিত্র বন্ধ কিংবা কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার মতো বিষয়গুলো।

দেশে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের দাবি তুলে ২০১৩ সালের ৫ মে সারাদেশ থেকে লংমার্চ নিয়ে ঢাকার শাপলা চত্বরে যায় হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার নেতাকর্মী, যার মধ্যে অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। শাপলা চত্বরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতারা মামলা আর হুলিয়া নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান, কেউ কেউ আবার সরকারের সাথে সমঝোতা করে সময় পার করেছেন।

হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দাবি করেছে তারা অরাজনৈতিক সংগঠন। যদিও ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আহমদ শফীর খোলা চিঠি এবং এপ্রিলে ঘোষিত ১৩ দফা দাবির মাধ্যমে হেফাজত জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশে তারা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নেমেছে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক ২০১৩ সালের জুন মাসে গঠিত 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন' কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে (নভেম্বর, ২০১৩) হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তাদের ১৩ দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর সহ সারাদেশে হেফাজতে ইসলামের সহিংস সমাবেশ ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে দেশে-বিদেশে বহুল

আলোচিত এই ঘটনায় দায়ের হওয়া ৪৪টি মামলার একটিরও অভিযোগপত্র (চার্জশিট) এখন পর্যন্ত পুলিশ দাখিল করেনি পুলিশ।

২০১৬ সালের শেষ দিকে ন্যায়বিচারের প্রতীক গ্রিক দেবীর একটি ভাস্কর্যটি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। এরপর প্রায় দুই মাস এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মত প্রকাশ করা না হলেও ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুখ খোলেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক আমির শাহ আহমদ শফী। এক বিবৃতিতে তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্যটি অপসারণের দাবি জানান। এরপর থেকে হেফাজত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন ভাস্কর্যটি সরানোর দাবিতে আন্দোলন করেছে। এটি সরানো না হলে আবারও শাপলা চত্বর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেবেন বলে জানিয়েছিলেন হেফাজতের নেতারা। হেফাজতে ইসলামীর অব্যাহত দাবির মুখে সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ভাস্কর্যটি সরানো হয়। ২০১৩ সালের পর এভাবে হেফাজত আবার প্রকাশ্যে এসেছে।

২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত হেফাজত জঙ্গি কর্মসূচি থেকে বিরত ছিল। নেতাদের কর্মকাণ্ড ওয়াজের মাধ্যমে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমত এবং বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

২০২০ সালের ১৩ নভেম্বর ঢাকার গেণ্ডারিয়ার ধূপখোলার মাঠে হেফাজতে ইসলাম 'তৌহিদী জনতা ঐক্যপরিষদের' ব্যানারে আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করে নতুন উদ্যমে মাঠে নামে। সরকার বা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তেমন কোনো জোরালো প্রতিবাদ দেখা না যাওয়ায় জোটসঙ্গীরা এবং নাগরিক সমাজ সমালোচনা করেন।

২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর জুনায়েদ বাবুনগরীকে আমির করে হেফাজতের ১৫১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নামের তালিকা, আদি সংগঠন ও রাজনৈতিক পরিচয় বর্তমান শ্বেতপত্রে প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে তাঁর সফরের বিরোধিতা করে মাঠে নেমেছিল হেফাজতে ইসলাম। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এলাকায় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় হেফাজতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এর ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠে নামে হেফাজত। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ১৯ জন নিহত ও পুলিশসহ ৫০০ জন আহত হয়।

২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে হেফাজতের ডাকা প্রতিরোধ সভা এবং হরতালের সময় বিএনপি জামায়াত শিবির, হেফাজতে ইসলাম এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তাণ্ডবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং মারধর ও হতাহতের ঘটনাসহ নজিরবিহীন নারকীয় যজ্ঞ চালিয়েছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরসহ পুরো জেলাতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে জ্বলন্ত নরক বানিয়ে দিয়েছিল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। গণকমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে যে, ভারতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করা ১৫৪ মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।

২০২১ সালের এপ্রিলে শীর্ষ নেতা মামুনুল হক নারী কেলেঙ্কারীতে গ্রেপ্তার হলে হেফাজতে ইসলাম ২৫ এপ্রিল ইতিপূর্বে (২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর) গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপরে সাবেক আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীকে আহ্বায়ক ও সাবেক মহাসচিব আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদি সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি সদস্য করা হয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২১- এর মার্চের তাণ্ডবের নেপথ্যে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হকের প্রধান লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বর্তমান সরকারের পতনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মামুনুলের। বিশেষত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার।

বর্তমান শ্বেতপত্রে হেফাজতে ইসলামের মোট ৭৬ জন কমিটি নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, তাদের অনেকেই নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী'র সঙ্গে যুক্ত। বেশির ভাগ হেফাজতে ইসলামের নেতাই নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। অনেকেই আবার তালেবান ও আল কায়দার সঙ্গে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী জঙ্গিদের আস্থাভাজন ও মুরব্বী ছিলেন। বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই হেফাজতেরও কেন্দ্রীয় নেতা ও উপদেষ্টা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এছাড়া হেফাজতে ইসলামের বেশির ভাগ নেতাই মুক্তিযুদ্ধকালে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠনে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেরাও এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমান শ্বেতপত্রে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কার্যক্রম, হেফাজতের মামলার হালচাল, হাটহাজারী মাদ্রাসায় ছাত্র বিক্ষোভ, হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন (২০২০), হেফাজতের শীর্ষ নেতাদের মৃত্যু, বিভিন্ন সময়ে হেফাজতের তাণ্ডব, হেফাজত নেতাদের রাজনৈতিক পরিচিতি তুলে করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কারের উদ্যোগ

'মাদ্রাসা' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো অধ্যয়নের স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ। বাংলা একাডেমির অভিধান মতে, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রকে মাদ্রাসা বলা হয়। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৯৭৫, 'মাদ্রাসা')। কওমি মাদ্রাসা মানে জনগণ বা সর্বসাধারণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেহেতু কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকারি অনুদানের পরিবর্তে জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়, তাই এই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কওমি মাদ্রাসা বলা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার অন্যতম সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, এমপিও ভুক্তি, অনুদান, বেতন-ভাতাসহ সনদের স্বীকৃতি হচ্ছে এ শিক্ষা ধারার বৈশিষ্ট্য। সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন কওমি মাদ্রাসাগুলো প্রধানত হেফাজতে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নুরানি মক্তব, ফোরকানিয়া, কারিয়ানা, হাফেজি আর স্বতন্ত্র মাদ্রাসা, যেগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই।

ঢাকা সহ সারাদেশে কওমি মাদ্রাসা ও ছাত্র সংখ্যা কত এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছে। এ কারণে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া মুশকিল। কারণ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান বা গণমাধ্যমের কাছ থেকে সঠিক তথ্য নেই। যেমন বেফাকুল মাদারিসিলি আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক), এর অফিস সহকারী মাওলানা আব্দুল ওয়াহাবের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, দেশে ছোট বড় কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৪০ হাজার ও ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। অন্যদিকে বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুসের তথ্যমতে, বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৩ হাজার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস'র)তথ্য মতে সারা দেশে কওমি মাদ্রাসা সংখ্যা ১৪ হাজার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা ও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের হিসাব মতে কওমি মাদ্রাসা সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। কওমি বিষয়ে উইকিলিকসের তথ্য মতে, ২০০৯ সালের ৩ মার্চ ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি ছোট বড় কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩ থেকে ৫৭ হাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।

কওমির মাদ্রাসায় শিক্ষক সংখ্যা কত এ বিষয়ে কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত কোনো তথ্য না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শিক্ষক সংখ্যা জানিয়েছে। বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্য ২ লক্ষ।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতির লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের ফলে একই বছর 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর মহাপরিচালক হেফাজতে ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফিকে উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ১৭ সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়।

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সর্ব সম্মতিক্রমে 'আল হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কমিয়া বাংলাদেশ'-এর অধীন কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওয়ায়ে হাদিসের (তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি সমমানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এরপরও কওমি মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কওমি মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা প্রদানের নামে নানা রকম অনৈতিক ও জিহাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। সুনাগরিক তৈরি না করে তারা তৈরি করছে জঙ্গিবাদের আবাদ। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতি যুগোপযোগী না করে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় বিভ্রান্ত করে তুলছে শিশুদের মন-মানসিকতা। শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকারও হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

তদন্তে উঠে এসেছে যে, দেশের কওমি মাদ্রাসায় পাঠ্যসূচিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতির কোনো স্থান নেই। নেই মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ

শহীদের আত্মত্যাগের বর্ণনা। শেখানো হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের অশুদ্ধ ও বিকৃত ইতিহাস, যেখানে বলা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক। বইয়ে বিএনপি-জামায়াত শাসনামলের মতই বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বদলে পাকিস্তানপ্রীতি বিদ্যমান রয়েছে।

এসব মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিষিদ্ধ। বড় বড় মাদ্রাসায় ছাত্ররা বাংলায় কোনো দরখাস্ত লিখতে পারে না। শিক্ষার্থীদের যে কোনো দরখাস্ত লিখতে হয় আরবি অথবা উর্দুতে।

হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ১০০০ মাদ্রাসায় জরিপ করতে গিয়ে গণ কমিশনের প্রতিনিধিরা প্রায় ৪ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ও ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন। হেফাজত প্রভাবিত হলেও কওমি মাদ্রাসার ৮০ ভাগ ছাত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। শিক্ষকদের অধিকাংশ এ বিষয়ে মন্তব্য প্রদানে বিরত ছিলেন। জরিপ করা মাদ্রসার শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্র-শিক্ষক কওমি পাঠ্যসূচির সংস্কার চান বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তার

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর পরবর্তী ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা তথা প্রগতিশীল চিন্তাধারা রীতিমতো কনডেম সেলে বন্দি ছিল। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রথমে সেনাপ্রধান হিসেবে পরে বিএনপি গঠন করে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দুই মেয়াদের দেশ শাসনের সময় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা বিরোধীদের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করেছেন। তার পরবর্তী সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যুক্ত ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম- কথাগুলো যুক্ত করে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেন। এই সময়টাতে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও মৌলবাদী দল ধর্মভীরু মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীগুলো এদেশে তাদের শেকড় বিস্তারে মনোনিবেশ করে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত শতাব্দীর আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করে মুসলিম মিল্লাত বাহিনী ও হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশকে (হুজি-বি) নামের দুটি জঙ্গি সংগঠন। মুসলিম মিল্লাতের নাশকতার ঘটনার কোনও তথ্য পাওয়া না গেলেও হুজি-বি গত ৬ বছরে অন্তত পক্ষে ১৩টি নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে।

২০০১ সালে বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিরা হেফাজতে ইসলামের নামে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটের ছত্রছায়ায় জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদুল ইসলামী ও হিজবুত তওহিদ নামের জঙ্গি সংগঠনগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সংগঠনগুলো সারাদেশে বিভিন্ন সময়ে তাণ্ডবলীলা

চালিয়েছে। এছাড়া আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আনসার আল ইসলাম নামে আরও জঙ্গি সংগঠনের জন্ম নেয় যেটি ব্লগার হত্যার ঘটনায় জড়িত। বর্তমানে সক্রিয় এই সংগঠনটি আল কায়েদার অনুসারী।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সারা দেশে কমপক্ষে ৪০টি হামলা পরিচালনা করে এই জঙ্গি সংগঠনগুলো। এর মধ্যে ৬৪ জেলায় একযোগে বোমা হামলা ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে সিরিয়াল গ্রেনেড হামলার ঘটনা ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচিত।

২০১৬ সালের ১ জুলাই হলি আর্টিজানে বড় ধরনের নাশকতার ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা আবারো শক্ত অবস্থান জানান দেয়। এসময় জঙ্গিরা হত্যা করেছিল দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২২ দেশি-বিদেশি নাগরিককে; যাদের মধ্যে ৯ ইতালীয়, ৭ জাপানি, ১ ভারতীয় ও ৩ জন বাংলাদেশি।

২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে পুলিশ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে বহু জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ২০১৯ সালে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে মোট ৬টি। ২০২০ সালে ৩টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে।

২০১৯-২০২০ পর্যন্ত এর পর থেকে করোনাকালীন সময়ে জঙ্গি কার্যক্রম দৃশ্যমান ছিল না বললেই চলে। এ সময়টায় তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিবাদ বিস্তারে নিয়োজিত ছিল। যার প্রমাণ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টরা পেয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতার নামে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর মদদদাতা বিএনপি-জামায়াত-হেফাজত সারাদেশে তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠে। জঙ্গি কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন সময়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে।

বর্তমান শ্বেতপত্রে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ে একটি বিশদ পর্যালোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে ২৫টি আলোচিত জঙ্গি সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

গুলশান হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সফলতা

২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে ভয়াবহ হলি আর্টিজান হামলার ঘটনা স্তম্ভিত করেছিল পুরো বাংলাদেশকে। হত্যা করা হয়েছিল পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২২ জন দেশি-বিদেশি নাগরিককে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে পার হওয়া সেই রাত শেষে ভোরে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ইউনিটের নেতৃত্বে পুলিশ ও র‍্যাব যৌথভাবে 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' নামে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে নিহত হয় হামলাকারী সংগঠন নব্য জেএমবি'র পাঁচ জঙ্গি। উদ্ধার করা হয় হলি আর্টিজান বেকারিতে জিম্মি অবস্থায় থাকা দেশি-বিদেশি অতিথি ও বেকারির স্টাফসহ প্রায় ৩৫ জনকে।

গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ এই হামলার দুই বছরের মাথায় ২১ জনের সম্পৃক্ততা থাকার প্রমাণ পেয়ে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় মামলার তদন্ত সংস্থা-কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। তবে ২১ জনের মধ্যে ১৩ জন অপারেশন থান্ডারবোল্টসহ আইন-শৃঙ্খলা

বাহিনীর অন্যান্য অভিযানে মারা যাওয়ায় জীবিত ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল এই মামলার যুক্তিতর্ক শেষে রায়ে ৭ আসামির মৃত্যুদণ্ড দেন ও একজনকে খালাস দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা আদালতে আপিল করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষও খালাস পাওয়া আসামির মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল করেছেন। বর্তমানে এই মামলাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট জঙ্গিবাদবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। এর মধ্যে ঢাকার জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গঠিত বিশেষ ইউনিট কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট ২০টি অভিযান চালায়। এসব অভিযানে ৬৩ জন জঙ্গি নিহত হয়। হলি আর্টিজান বেকারিতে নব্য জেএমবি নামে যে জঙ্গি সংগঠনটি হামলা চালিয়েছিল, তাদের প্রায় কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছে।

যেসব কারণে কারণে হলি আটিজানে হামলা করেছিল তা নিম্নরূপ-

১) কূটনৈতিক এলাকায় হামলা করে নিজেদের সামর্থ্যের জানান দেওয়া।
২) বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করে নৃশংসতার প্রকাশ ঘটানো।
৩) দেশে বিদেশে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পাওয়া এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা।

রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

১৯৭৮ সালে তৎকালীন সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা দুই থেকে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা তখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর ১৯৯১-৯২ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের আধা-সামরিক বাহিনী নাসাকা এবং অন্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত আক্রমণের পর নতুন করে আবার প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

পরবর্তীকালে মাত্র এক থেকে দেড় লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমারে ফেরত যায়। আবার প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গারাও ফের অনুপ্রবেশ করে এ দেশে। বাংলাদেশে থেকে যাওয়া রোহিঙ্গাদের স্বল্পসংখ্যক জাতিসংঘের নির্ধারিত শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করলেও বেশিরভাগই কক্সবাজার, টেকনাফ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকে। ফলে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৭ সালে ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হত্যা, নির্যাতন, ভূমি দখল, নারী ও শিশু নির্যাতনের মত নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। একারণে ২০১৭ সাল থেকে কয়েক দফা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার সীমান্তের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এবং ভাসানচরের আশ্রয়ণ প্রকল্পে বর্তমানে অবস্থান করছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ২০১৯ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে ১৯ দফা সংবলিত একটা সমঝোতা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। তার আলোকে ২০১৯ সালের ২২

অগাস্ট বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার প্রাথমিকভাবে সাত ভাগে বিভক্ত করে ৩ হাজার ৪৫০ জন রোহিঙ্গাদের নিজেদের দেশে ফেরত নেওয়ার কথা বললেও, বাস্তবে তা আলোর মুখ দেখেনি।

গণকমিশনের তদন্তে জানা গেছে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের একটি গোষ্ঠী সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। এরা মিয়ানমার ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। এর নেপথ্যে কাজ করছে একশ্রেণির এনজিও ও জঙ্গি-গোষ্ঠী, যারা আন্তর্জাতিক জঙ্গি জিহাদী বলয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার মিয়ানমার সরকারের মদদে গড়ে উঠা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার পথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে।

গণকমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে- কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফে ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্প এখন অপরাধের অভয়ারণ্য। আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বড় একটি অংশ খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, অস্ত্র ও মাদক কারবার, মানব পাচার, ডাকাতিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় পাওয়ার পর রোহিঙ্গাদের ভেতর অপরাধ কর্মকাণ্ড প্রতিবছর আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ বছরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে হত্যার শিকার হয়েছেন ৭১ জন। মামলা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩০০টি। এতে আসামি হয়েছে ২ হাজার ৮৫০ রোহিঙ্গা।

তদন্তে আরও জানা যায়, আন্তর্জাতিক মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। এসব সংগঠনগুলোর জঙ্গি কর্মীদের একটা বড় উৎস হলো রোহিঙ্গা। বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে থাকা রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের জঙ্গি কর্মী হিসেবে রিক্রুট করছে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় গঠিত ১২৫টি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা প্রস্তুত করে, যার ভেতর ১৭টি ছিল রোহিঙ্গাদের। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৭ সালের পর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নতুনভাবে গড়ে উঠেছে আরো ২৩টি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন।

বর্তমান শ্বেতপত্রে রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি-সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে তুলে ধরা হয়েছে ৪০টি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের ইতিবৃত্ত। পর্যালোচনা করা হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে এনজিও ও জামায়াত এবং হেফাজতের জঙ্গি কর্মকান্ড। সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৭ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রকাশিত নির্বাচিত কলাম ও অভিমত। এ ছাড়া ১০০ রোহিঙ্গার জবানবন্দিও উপস্থাপন করা হয়েছে, যাদের অনেকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা

জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তাদের জিহাদী কাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বেশি সক্রিয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করা সহজ এবং দ্রুত ঘটে। এটি তেমন সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল নয় এবং এতে শারীরিক উপস্থিতির দরকার নেই। তাই যে কোনো জায়গা থেকে নিঃশব্দে তারা পৌঁছে যাচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে। এরা ধর্মীয় খোলসে প্রচার

চালায়। ফলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে। ইতোমধ্যে তাদের নানারকম বিষয়বস্তুর মাধ্যমে, বিশেষত ওয়াজের মাধ্যমে দেশবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, নারী-বিদ্বেষী এবং শিল্প সংস্কৃতিবিরোধী প্রচারণা নিয়ে দেশের শহরগুলোর নিম্নবিত্ত ও গ্রামাঞ্চলে এরা আশঙ্কাজনকভাবে পৌঁছে গেছে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশান হলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান ও তীক্ষ্ণ নজরদারির কারণে বাংলাদেশের জঙ্গিরা এখন কৌশল বদলে 'সাইবার জিহাদ' সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো যতোটা না সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার চেয়ে বেশি তাদের এই বিষয়ে জনমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে বা কোনো একটি সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনার পটভূমি তৈরির চেষ্টা করে। তারা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সাইবার জগতকে তারা ব্যবহার করছে। কখনো কখনো দুটো কাজ একই সঙ্গে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের উদ্দেশ্য মূলত দুটি- মুখ্য উদ্দেশ্য: জনমনস্তত্ত্ব তৈরি এবং গৌণ উদ্দেশ্য: সাংগঠনিক বিস্তার। প্রকাশ্যে বা প্রচলিত অনলাইন প্লাটফর্মে সাইবার জিহাদের যে প্রক্রিয়াটি আমরা দেখতে পাই, তা নিম্নরূপঃ

১. ধর্মীয় সংবেদনশীলতার রাজনীতিকরণ; ২. রাজনৈতিক প্রপঞ্চের ধর্মীয় লেবাস; ৩. ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চরিত্রহনন।

সাইবার জিহাদের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি বর্তমানে ফেসবুকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের পেজ এবং তাদের শেয়ার করা সংবাদের লিংক। এছাড়া গণমাধ্যমের ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট সেকশনে কাজ করা জঙ্গিদের পক্ষে অনেক নিরাপদ। কারণ, ফেসবুকে আইডি খুলতে হলে মোবাইল নম্বর ছাড়া আর কিছুই লাগে না। এই কাজটি তারা করে ভুয়া একাউন্টের মাধ্যমে। এই ভুয়া একাউন্টগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হলে একদিকে সরকারকে আইনি পদক্ষেপ চালাতে হবে অর্থাৎ আইডির পেছনের লোকগুলো খুঁজে বের করতে হবে অন্যদিকে ফেসবুকের সঙ্গে দেন-দরবার করতে হবে। ভিপিএন ব্যবহার করে ফেক আইডি পরিচালনা করায় তাদের কার্যক্রমের স্থান শনাক্ত করা অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। দেশে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়া তরুণদের ৮২ শতাংশই ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তারা এই মাধ্যম ব্যবহার করছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো প্রচারণার জন্য বেছে নিচ্ছে জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো। তারা আনসার আল ইসলামের ১০০টি প্রচারপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার ৩০ ভাগ পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানবিরোধী। ২৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরোধী। এছাড়া দুর্নীতি, আইনের প্রয়োগহীনতা বা অপপ্রয়োগ নিয়ে ২৫ ভাগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন সংক্রান্ত আর জিহাদ ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনা আছে মাত্র ২০ ভাগ প্রচারপত্রে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে জঙ্গিদের ৬০টি মিডিয়া ও অনলাইন পত্রিকা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হোলঃ লোন উলফ, তিতুমীর

মিডিয়া, মুওয়াহহিদ মিডিয়া, ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, আনসার আল ইসলাম মিডিয়া, আন নাসর মিডিয়া, দাওয়াহ ইলাল্লাহ, আল ফিরদাউস মিডিয়া, দারুল ইলম এবং ইসলামী হিন্দ। এই শ্বেতপত্রে জঙ্গিদের কয়েকটি মিডিয়া ও অনলাইন পত্রিকার তালিকা ও পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশ কিছু জঙ্গিবাদী পত্রিকা রয়েছে যেগুলোতে নিয়মিত জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- দাবিক, দ্বিমাসিক শরিয়ত, মাসিক রহমত, মাসিক দা'ওয়াত, মাসিক দেশজগত, মাসিক দাওয়াতুল হক, আলোর মিনার, মাসিক নতুন ডাক, মাসিক রহমানী পয়গাম, মাসিক আল আমানাহ, মাসিক আল কাউছার, মাসিক মঈনুল ইসলাম, মাসিক আত তাওহীদ, সাপ্তাহিক লিখনী, মাসিক আল হক, মাসিক নেয়ামত, আল জামিয়া, মাসিক হেফাজতে ইসলাম ও কাফেলা। এসবের পরিচিতি বর্তমান শ্বেতপত্রে রয়েছে।

সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৌলবাদী কার্যকলাপের বিশাল সংখ্যার ওপর সহজে নজর রাখতে পারে না বা সম্ভবও হয় না এবং তাদের সংখ্যাও কমাতে পারছে না। এমনকি, কোনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে মৌলবাদী প্লাটফর্ম বা তাদের উগ্রবাদী ও জিহাদি কার্যকলাপ মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ঠ রসদও নেই। শ্বেতপত্রের এই অংশে তরুণ অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টরা এ বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ওয়াজের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিস্তার

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক কালে ওয়াজের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের মাধ্যমে তৃণমূলে জঙ্গি মৌলবাদের যে বিস্তার ঘটছে তা একদিকে যেমন বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী, অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ওয়াজগুলো ধর্মের নামে উন্মাদনা ছড়াচ্ছে।

ওয়াজের নামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে। জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হচ্ছে, নারীদের অবমাননা করা হচ্ছে, অবমাননা করা হচ্ছে সুফি সাধক, বাউল, গায়ক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বকে। ওয়াজের নামে উগ্র রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বিষোদগারের বার্তা সরাসরি তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বক্তারা ওয়াজের নামে কথিত জিহাদের ডাক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করে আসছেন। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা কোমলমতি কিশোর-তরুণদের মগজ ধোলাই করে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

২০১০ সাল থেকে নতুনভাবে ওয়াজ মাহফিলের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠেছে ভিডিও কনটেন্ট। এগুলো ইউটিউবে আপলোড করা হয়। ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে সারাদেশে পাঁচ শতাধিক ভিডিও কনটেন্ট প্রতিষ্ঠান চলছে। এগুলো ওয়াজের ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার কন্ট্রাক্ট নেওয়ার মধ্য নিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করে। বক্তাদের নিজস্ব চ্যানেল তো বটেই, শুধু ওয়াজ প্রচার করে এমন চ্যানেলগুলোর দর্শক সংখ্যাও অবিশ্বাস্য।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারাদেশে ইসলামী জলসায়, ওয়াজ মাহফিলে, ফেসবুক, ইউটিউবে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেওয়া এমন ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করে ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ তালিকা তৈরি করে বাংলাদেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। এরা সহ গণকমিশন সারাদেশে কওমিপন্থী প্রায় ১০০ জন ওয়াজকারী খুঁজে পেয়েছে, যারা ওয়াজ মাহফিলের বক্তা হিসেবে পরিচিত। এর বাইরে জামায়াতপন্থী ১০০ জন, মাজারপন্থী ৫০ জন, আলিয়া মাদ্রাসাভিত্তিক ৫০ জন এবং আহলে হাদিসের ৫০ জন বক্তা হিসেবে পরিচিত। বর্তমান গণকমিশন ১১৬ জন উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক ইসলামী বক্তার তালিকা তৈরি করেছে। তারা ইউটিউবে ওয়াজের নামে সাম্প্রদায়িকতা উগ্রবাদ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদের ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমান শ্বেতপত্রে ৪০ জন ধর্মীয় উগ্রপন্থী ওয়াজকারীর পরিচিতি ও তাদের আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশনের সরেজমিন প্রতিবেদন

পচাত্তর পরবর্তী সময়ে সেনাশাসক শাসক জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে রাজনীতি করার অধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেন। এরপর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কিংবা ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন তাদের মদদে দেশে একের পর এক নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো। তাদের এ কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে পূর্বে প্রকাশিত শ্বেতপত্রগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান শ্বেতপত্রে গত কয়েক বছর বিশেষ করে ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিবরণ এবং ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি তুলে ধরা হয়েছে।

গণকমিশনের তদন্তে জানা গেছে, ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে সাম্প্রদায়িক নাশকতা কার্যক্রম তুলনামূলক কম হলেও ২০২১ সালে তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতা করে দেশব্যাপি বিক্ষোভ ও তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজত ইসলাম রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালায়। হিন্দুদের ঘর-বাড়ি-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন চালায়। একই বছর অক্টোবর কুমিল্লা শহরের নানুয়া দীঘির উত্তর পাড়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে করা একটি পূজামণ্ডপে কোরাণ অবমাননার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে কুমিল্লা শহরে চারটি মন্দির ও সাতটি পূজামণ্ডপে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। শুধু তাই নয়, সুনামগঞ্জের শাল্লায় ঝুমন দাস নামের এক হিন্দু যুবকের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সেখানকার হিন্দুদের ৮৮টি বাড়ি-ঘরে লুটপাট, আগুন ও ৭টি মন্দিরে হামলা করা হয়।

একই বছর নোয়াখালীর চৌমুহনী, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, ফেনী, রংপুরের পীরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসব কর্মকাণ্ডে হেফাজতের পাশাপাশি বিএনপি-জামায়াত-শিবির সহ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীও অংশ নেয়। এসব তাণ্ডবের ঘটনায় ২০২১ সালে আক্রান্ত জেলাগুলোতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাস বিষয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাসের যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'-এর বেশ কয়েকটি তদন্ত ও গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গণকমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক-এর নেতৃত্বে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর আহ্বায়ক জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, প্রাক্তন আইজিপি নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোট-এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান। অংশগ্রহণ করেন গণকমিশন-এর সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, গণকমিশন-এর সচিবালয়ের সমন্বয়কারী কাজী মুকুল, নির্মূল কমিটি চট্টগ্রামের সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আলাউদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা শাখা নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতি দিপঙ্কর চৌধুরী কাজল, চট্টগ্রাম জেলা শাখা নির্মূল কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক আবু সাদাত মোঃ সায়েম, চট্টগ্রাম জেলা শাখা নির্মূল কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সুচিত্রা গুহ টুম্পা, সচিবালয়ের সদস্য শহীদ সন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, সচিবালয়ের সদস্য সাংবাদিক শওকত বাঙালি, নির্মূল কমিটির সিলেট জেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী, নির্মূল কমিটির সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রুহুল তুহিন সচিবালয়ের সদস্য মওলানা হাসান রফিক, সমাজকর্মী এসএম শহীদুল্লাহ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন, সমাজকর্মী সাইফ রায়হান প্রমূখ।

বিভিন্ন জেলাতে নাশকতার ঘটনায় গণকমিশনের গণশুনানিতে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা হেফাজতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের নারকীয় সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের লিখিত ও মৌখিক বিবরণ প্রদান দেন।

ভুক্তবোগীদের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে নামে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করেছে। যাদের উপর হামলা হয়েছে খোদ সেই ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরাই বলেছেন যে, পুলিশ আসল হামলাকারীদের বাদ দিয়ে পরবর্তীকালে যাদের ধরেছে তাদের অনেককেই তারা চিনেন যারা হামলার সঙ্গে জড়িত নয়। বিভিন্ন স্থানে ভুক্তভোগীরা হামলার সময় পুলিশ ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন।

গণতদন্ত কমিশনের তদন্তে পাওয়া গেছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা মনে করে যে দেশের নানা স্থানে অতীতের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার বিচার না হওয়ায় প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ জন্য সরকারকে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে হবে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

গণকমিশনের সুপারিশ

উপরযুক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে গণকমিশন আশু, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু প্রস্তাব সুপারিশ আকারে উত্থাপন করছে-

ক. আশু করণীয়

১. দেশে জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দমনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

২. হেফাজতে ইসলামী এবং অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

৩. হেফাজতের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সকল মাদ্রাসায় তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে।

৪. ধর্মের নামে হেফাজতে ইসলাম যে বিভ্রান্ত করছে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।

৫. কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৬. কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, বলাৎকার সহ অনেক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. 'গাজওয়ায়ে হিন্দ'-এর নামে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী অপপ্রচার ও অপতৎপরতা চালাচ্ছে অনলাইন ও অফলাইনে। এর বিরুদ্ধে অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. ইসলাম ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যায় প্ররোচনা যারা দেয় তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. অতীতে ঘটে যাওয়া যেসব জঙ্গি তাণ্ডবের তদন্ত ও বিচার হয়নি সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সাইবার জগতে জঙ্গিবাদ ব্যপক বিস্তার লাভ করেছে। সাইবারে জঙ্গিবাদ ঠেকাতে ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাইবার সেলকে শক্তিশালী করতে হবে।

১১. সাইবার জিহাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেশে ও বিদেশে অবস্থানকারী তরুণ সাইবার যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং মুক্তচিন্তকদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৩. ফেসবুক এবং ইউটিউবসহ গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্মগুলোয় যাতে উগ্রবাদ ছড়াতে না পারে সেজন্য সরকারের সাইবার সেলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

১৪. বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ঘৃণাবাদ ছড়ানো হয় গণমাধ্যমগুলোর ফেসবুক পেজের কমেন্ট সেকশনে। তাই সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্দেশ দিতে হবে, যেন তারা কমেন্ট সেকশন ঠিকমতো সম্পাদনা করে। উস্কানিমূলক মন্তব্য নিয়মিত সরানো হলে প্রকাশ্যে ঘৃণা ছড়ানো ব্যক্তিরা নিরুৎসাহী হবে।

১৫. গণমাধ্যমের সাংবাদিকতা যার মাধ্যমে অধিক ভিউ হয় অর্থ্যাৎ জনগণের ক্ষোভকে উস্কে দেওয়া সংবাদ শিরোনামের ওপরেও সেন্সরশিপ আরোপ করতে হবে

১৬. জঙ্গি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যাতে না ঘটে তার জন্য রোহিঙ্গা শিবিরে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়াতে হবে।

১৭. রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে উৎপত্তি হওয়া জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সকলকে জরুরী ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করতে হবে।

১৮. নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন নতুন নামে রোহিঙ্গা শিবিরে তৎপরতা চালাচ্ছে। তাদেরও নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৯. রোহিঙ্গা শিবিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পর্যাপ্ত পরিমাণ নিয়োজিত করতে হবে

২০. অভিযোগ আছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু দূর্নীতিপরায়ণ সদস্য জঙ্গিদের কার্যক্রমে সহযোগিতা করে। এটি যাতে না হয় সেজন্য বাহিনীর অভ্যন্তরে নজরদারি করতে হবে।

২১. কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও সংস্থার আড়ালে জঙ্গি সংগঠনগুলো কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এসব এনজিওগুলো চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করতে হবে। এগুলোর সঙ্গে যুক্তদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২২. কক্সবাজারের স্থানীয় রাজনীতিতে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩. উগ্র সাম্প্রদায়িকতার লেবাসে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রসার ঠেকানো আজ সময়ের দাবি। আর এটা করতে হলে অবশ্যই ওয়াজ ও অনলাইন প্লাটফর্মগুলোয় নজরদারি বাড়াতে হবে।

২৪. ওয়াজ মাহফিলে নারী, অমুসলিম ও ভিন্ন মতের লোকদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানকারীর বিচার ও শাস্তির জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২৫. ওয়াজ মাহফিল, মসজিদের বয়ান এবং সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানোকে অপরাধ হিসাবে আইনের আওতাধীন করতে হবে।

২৬. ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যার জন্য যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে উৎসাহ দেয় এবং যারা এইসব মানবতাবিরোধী কাজে যে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া জরুরি।

২৭. ২০১২ সালে রামু থেকে শুরু করে ২০২১ সালের দুর্গা পূজার সময় সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী ঘটনার সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

খ. মধ্যমেয়াদী সুপারিশ

বাংলাদেশে জঙ্গি, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে এমন কিছু উদ্যোগ নিতে হবে যা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব না হলেও একটি সময় পর তার ফলাফল পাওয়া যাবে। আর এজন্য নিতে হবে সুচিন্তিত উদ্যোগ। গণকমিশন মনে করে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস নির্মূলে নিম্নলিখিত মধ্যমেয়াদী সুপারিশ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১. কওমি পাঠ্যসূচিতে জঙ্গিবাদ কিভাবে শিক্ষার্থীদের সুকুমার প্রবৃত্তি ধ্বংস করছে এ বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে হবে।

২. কওমি পাঠসূচিতে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম সম্পর্কে একাধিক অধ্যায় যুক্ত করে পাঠদান করাতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে যুক্ত না দেশপ্রেমিক নাগরিক হতে পারে।

৩. বিশ্বের সব মুসলিমপ্রধান দেশেই প্রকাশ্য স্থানে ভাস্কর্য আছে। এ বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা সহ পরবর্তী প্রজন্ম ভাস্কর্য নিয়ে বিরূপ মানসিকতা পোষণ না করতে পারে।

৪. কওমি মাদ্রাসাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বিষয়ে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি জরুরি।

৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের একাধিক রায়ে জামায়াতে ইসলামীকে '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী বলা হয়েছে। '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বিচার করতে হবে।

৬. হেফাজতপ্রধান আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন 'বেফাক' দীর্ঘকাল ধরে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দাবি করছিল। সরকার যখন স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হয়েছে তখন আহমদ শফী বলছেন স্বীকৃতির নামে সরকার কওমি মাদ্রাসায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, যা তারা হতে দেবেন না। এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তারা গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন। বেফাকের এই দ্বৈত ভূমিকা সরকারকে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিকট তুলে ধরতে হবে।

৭. ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করলে তার জন্য ফৌজদারী দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির বিধান আছে। তাই পাকিস্তানের মতো যারা তথাকথিত ব্লাশফেমি আইন প্রণয়নের কথা বলছে তাদের সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৮. জঙ্গি মোকাবেলায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জঙ্গি দমন ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদের উন্নয়নকে একই গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য জাতীয় বাজেটে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জঙ্গিদের সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে যাতে তারাও জঙ্গিদের ছলচাতুরী ধরতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তাদের পরিবারের কাছে বার্তা পাঠাতে পারে।

১০. ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে 'হরকাতুল জিহাদ' প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা থেকে ৫ হাজারের বেশি ছাত্রকে রিক্রুট করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পাঠানো হয়েছে উচ্চতর সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য। এসব তরুণ জিহাদীরা দেশে ফেরার পর জঙ্গি তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও বর্তমানে অধিকাংশই বেকার। এদের অনেকে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত এবং সমাজের মূলধারায় তারা ফিরে আসতে আগ্রহী। তাদের অনেকের কোনও পারিবারিক বা সামাজিক জীবন নেই। আত্মগোপন অবস্থায় অত্যন্ত বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছে তারা। গণকমিশন প্রস্তাব করছে— যাদের বিরুদ্ধে হত্যা বা অনুরূপ অপরাধের অভিযোগ নেই সেসব জঙ্গিদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো প্রয়োজন।

১১. নারীদের শিক্ষা গ্রহণ ও ক্ষমতায়নে লিঙ্গভিত্তিক কোনো বৈষম্যের বিধান বাংলাদেশের সংবিধানে নেই। যারা সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ বিরোধিতা করে তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

১২. ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারীনীতি এবং ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে দ্রুত এই সব নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. ওয়াজ-মাহফিল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৪. ২০১২ সালে রামু থেকে শুরু করে সর্বশেষ বিগত দুর্গা পূজার সময় সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী ঘটনার সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাস দমনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট সাফল্য প্রদর্শন করলেও জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। গণকমিশন মনে করে বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীতে আরও এক লক্ষ সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন এবং এই বাহিনীতে অন্ততপক্ষে ২০% ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয় রসদ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬. সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদার পরিপন্থী সকল প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। বিশেষভাবে ওয়াজ মাহফিল, মসজিদের খুৎবা, পাঠ্যপুস্তক বা প্রচারমাধ্যমে এ ধরনের কিছু থাকলে তা জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেবে।

১৭. আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' এবং 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের কথা বললেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। গণকমিশন মনে করে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীর হাত থেকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় এই আইন প্রণয়ন ও কমিশন গঠনের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে গণকমিশন সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করছে।

১৮. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবের ভিডিও লিঙ্ক ও কমেন্ট সেকশন ব্যবহার করে জঙ্গিরা তাদের জঙ্গি নিজেদের মধ্যে নির্দেশনা আদান-প্রদান সহ ধর্মভীরু মানুষকে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করছে। জঙ্গিদের এই জঙ্গি কার্যক্রম ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাইবার সেলকে আরও সক্রিয় করতে হবে। ডেডিকেটেড হটলাইন নাম্বার, ইমেইল, ফেসবুক পেজ, অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ করলে তা যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়। অভিযোগ গুরুতর না হলেও অভিযুক্তের পরিচয় বা আইডি মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা জরুরি। যেন পরবর্তীতে আবারও অভিযোগ পেলে পূর্ববর্তী অভিযোগও খতিয়ে দেখা যায়। এছাড়া ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা ইউটিউবের ক্ষতিকর লিংকগুলো দিয়ে এই সেলে অভিযোগ করলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি সংক্রান্ত অভিযোগ বা মামলাগুলো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় আনতে হবে।

১৯. বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশান হলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান ও তীক্ষ নজরদারির কারণে বাংলাদেশের জঙ্গিরা এখন কৌশল বদলে 'সাইবার জিহাদ' সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। গণকমিশন মনে করে সর্বসাধারণের বিচরণের এই ক্ষেত্র থেকে জঙ্গিদের বিতারিত করার সময় এসেছে। এজন্য সরকারের সাইবার সেল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের নিয়ে একটা সেল খুলতে হবে। যাদের কাজ হবে এই মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। যেহেতু এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া তাই সেল এর কার্যক্রমও যাতে নিয়মিত থাকে সেজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ রেখে নিয়মিত তদারকী করতে হবে।

২০. ফেসবুক বাংলাদেশে থেকে কোটি কোটি ডলার ব্যবসা করছে অথচ এদের উপর আমাদের সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যেসব অনলাইন যোদ্ধারা আছে তাদেরকে নানা সময়ে নানা অযুহাতে ফেসবুক নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের নামে তাদের আইডি ব্যান থেকে কার্যক্রমকে লিমিটেড করে রাখে। অথচ যারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে তাদের আইডি রিপোর্ট করলেও ফেসবুকের কোনো নিয়ন্ত্রণ পড়ে না। এটি একটি বৈষম্যমূলক কার্যক্রম। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উদ্যোগী হয়ে ফেসবুক কতৃপক্ষের সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

২১. গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারাদেশে ইসলামী জলসায়, ওয়াজ মাহফিলে, ফেসবুক, ইউটিউবে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেওয়া এমন ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করে ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ তালিকা তৈরি করে বাংলাদেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। গণকমিশন মনে করে, এই তালিকা অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক চিহ্নিত অন্য ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার এবং বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

২২. সকল ক্যাডারের জন্য বিসিএস পরিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আলাদা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

২৩. সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধে প্রশাসন বহু ক্ষেত্রে যথাসময়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তদন্ত করে প্রশাসনের ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করতে হবেঃ

* সব পর্যায়ের ও সব ডিপার্টমেন্টের কর্মকতা যারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে।
* সব জেনে যারা নিষ্ক্রিয় থেকেছেন তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
* যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করেছেন তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
* উপরোক্ত চিহ্নিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তার বিষয়ে যাথাযথ আইনী ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

১. জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ...', 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' প্রভৃতি সংযোজন করে বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। এসব সংযোজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭২-এর মূল সংবিধান কতিপয় সংশোধনী সহ পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করে 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'।

২. মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে '৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ধর্মব্যবসায়ীদের দল নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. আইন করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. জঙ্গি সংগঠনগুলোর বেশিরভাগ জঙ্গি রিক্রুট করে কওমি মাদ্রাসা থেকে। ছাত্রদের জঙ্গি কার্যক্রম থেকে ফেরাতে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাঠ্যসূচি সংস্কারের উদ্যোগ নিলেন মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকের বিরোধীতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে বিরোধীতাকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

৫. কওমি মাদ্রাসায় ছেলেদের পড়তে পাঠিয়ে কোনও বাবা-মা আশা করেন না, তাদের ছেলে একদিন লাশ হয়ে ফিরে আসবে। মাদ্রাসায় সবরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ এবং ছাত্রদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

৬. গণকমিশন মনে করে, রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিস্তার বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রোহিঙ্গাদের দ্রুত স্বতেশ প্রত্যাবর্তনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে রোহিঙ্গাদের

তৃতীয় কোনো দেশে স্থানান্তরের বিষয়ে ব্যপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ এবং প্রবাসী বাঙালিদের বিশ্ব জনমত সংগঠনে সহায়তা করতে হবে।

৭. মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় ফতোয়া জারি করে প্রগতিশীল ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করে। এটি সংবিধানবিরোধী কাজ। ফৌজদারী আইনে ধর্মীয় নাশকতার কঠোর সাজার কথা বলা হলেও ফতোয়া বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাই আইন করে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর এই ফতোয়া জারি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৮. ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ দমনের জন্য আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। বিশ্বব্যাপি জঙ্গিসন্ত্রাসের আশঙ্কাজনক উত্থানের প্রেক্ষাপটে গণকমিশন মনে করে বাংলাদেশের উচিৎ হবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক টাস্ক ফোর্স' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জঙ্গি মৌলবাদের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজকে এবং প্রবাসী বাঙালিদেরও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে গণকমিশন।

৯. তরুণ প্রজন্মের মনোজগতকে পরমতসহিষ্ণু ও বন্ধুবৎসল করা আবশ্যক, তার জন্যে যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে সেগুলো হলোঃ

ক. প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যে কোনো একটি দলগত খেলা বাধ্যতামুলক করা প্রয়োজন। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অন্তত একটিতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

খ. স্কুল, কলেজ, সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছর ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালু রাখার আবশ্যকতা থাকা দরকার।

মাঠপর্যায়ে জঙ্গিদমনে সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও জঙ্গি মৌলবাদকে আদর্শিক ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার জন্য যে ব্যাপক ও সমন্বিত কার্যক্রম প্রয়োজন তা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। বিশেষভাবে অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাঙালি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের উদ্যোগ নিতে হবে। গ্রামবাংলার বিলুপ্তপ্রায় মেলা, যাত্রা, পালা ইত্যাদি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী যে কোনও উদ্যোগ নিরুৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
একটি পর্যালোচনা

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ : একটি পর্যালোচনা

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক ২০১৩ সালের জুন মাসে গঠিত 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন' এর প্রকাশিত শ্বেতপত্রে (নবেম্বর, ২০১৩) হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তাদের ১৩ দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গণকমিশন কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র ৮০০ দিন (২০১৬)-এ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কার্যক্রম, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী কমিটি), কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা (সাধারণ কমিটি), কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বৈঠকে গৃহিত কর্মসূচি (২০১৪-২০১৫), মজলিশে শূরার বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উত্থাপিত দাবিসমূহ, কার্যক্রম, বিবৃতি, বর্তমান অবস্থা, হেফাজত নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয়, আদি ও বর্তমান সংগঠন পরিচিতি-পদবীসহ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান শ্বেতপত্রে ২০১৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কার্যক্রম, দলটির মামলার হালচাল, হাটহাজারী মাদ্রাসায় ছাত্র বিক্ষোভ, হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন (২০২০), দলের শীর্ষ চার নেতার মৃত্যু, বিভিন্ন সময়ে হেফাজতের তাণ্ডব, দলের নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কার্যক্রম

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচনায় আসে মূলত ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে। সেই সময় সংগঠনটির ঘোষণা করা ১৩ দফা কর্মসূচি বিভিন্ন সময়ে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। এসব দাবির মধ্যে ছিল ইসলাম ধর্ম অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে আইন করা, নারীদের পোশাকে বিশেষ করে হিজাবে উদ্বুদ্ধ করা, বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত নারী নীতি ও শিক্ষা নীতির তথাকথিত ইসলামবিরোধী ধারাগুলো বাদ দেওয়া, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ভাস্কর্য বা মঙ্গল প্রদীপের মতো সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলোর বিরোধিতা, নাটক-সিনেমায় ধর্মীয় লেবাসের লোকজনের নেতিবাচক চরিত্র বন্ধ কিংবা কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার মতো বিষয়।

হেফাজতে ইসলামের আগে ১৯৯৪ সালে লেখক তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনগুলো ব্যাপক শক্তি প্রদর্শন করলেও তা স্থায়ী হয়নি। এর

আগে লেখক সালমান রুশদীর লেখায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে এবং পরে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় দেশজুড়ে সক্রিয় হয়েছিল কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনগুলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার এক বছর পর ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম। এর প্রতিষ্ঠাতা আমির ছিলেন শাহ আহমদ শফী এবং মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী। ২০১১ সালে সরকার 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' ঘোষণা করলে হেফাজতে ইসলাম প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা শুরু করে। তবে ২০১৩ সালে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন শুরু হলে দলটি এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মঞ্চের সংগঠকদের নাস্তিক-ব্লগার আখ্যা দিয়ে এবং যুদ্ধাপরাধীদের নামে আলেম-ওলামাদের বিচার করা হচ্ছে বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকেন সংগঠনটির নেতারা। আকস্মিকভাবে দেশে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের দাবি তুলে ২০১৩ সালের ৫ মে সারাদেশ থেকে লংমার্চ নিয়ে ঢাকার শাপলা চত্বরে মিলিত হয় সংগঠনটির হাজার হাজার নেতাকর্মী, যার অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

শাপলা চত্বরে সরকার উৎখাতের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হেফাজতপ্রধান শাহ আহমদ শফীর সঙ্গে একাধিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী। লংমার্চ কর্মসূচির বছরখানেক পর থেকেই হেফাজতে ইসলামের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয় ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে। ততদিনে দৃশ্যপটে চলে আসেন শফীর ছেলে হাটহাজারী মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষা সচিব আনাস মাদানি। তার নেতৃত্বে হেফাজতের একটি অংশ সরকারের প্রতি 'কিছুটা নমনীয়' এবং বাবুনগরীর নেতৃত্বে আরেকটি অংশ 'তীব্র সরকারবিরোধী' অবস্থান নেয়। এর মধ্যে কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রির সরকারি স্বীকৃতিও আসে। এভাবে শফীর নেতৃত্বে হেফাজতের একটি অংশ সরকারের বিরোধিতা থেকে সরে আসে। মূলত তখনই হেফাজতে ইসলাম শফীপন্থী ও বাবুনগরীপন্থী- এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

হেফাজতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০১৩ সালে রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম আর কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজপথে দেখা যায়নি। মামলার ভয়ে সংগঠিত হতেও পারেনি তাদের নেতাকর্মীরা। তবে মাঝেমধ্যে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিত সংগঠনটি। ৫ মে ২০১৩ রাজধানীর শাপলা চত্বরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে তাদের শীর্ষ নেতারাও মামলা আর হুলিয়ার ভয়ে আত্মগোপনে চলে যান, কেউ কেউ আবার সরকারের সাথে সমঝোতা করে সময় পার করেছেন। এরপর ২০২০-২১ সালে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে হেফাজতে ইসলামের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে রাজপথে আলোড়ন ও ত্রাস সৃষ্টি করে। ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে হেফাজতের জঙ্গি তৎপরতা ও তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে।

হেফাজতের মামলার হালচাল

রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় দায়ের হওয়া ৪৪টি মামলার একটিরও অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেনি পুলিশ। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, সরকারি কাজে বাধাদান, ভাঙচুর ও লুটতরাজের কারণে দায়ের হওয়া এসব মামলার তদন্ত রীতিমত 'হিমঘরে' চলে গেছে।

২০১৩ সালের ৫ মে 'নাস্তিক' ব্লগারদের ফাঁসি, রাসুল (সা.) ও ইসলামের অবমাননা বন্ধে আইন পাসসহ ১৩ দফা দাবিতে রাজধানীর শাপলা চত্বরে সমাবেশের ডাক দিয়ে তাণ্ডব শুরু করে হেফাজতে ইসলাম। হাজার হাজার হেফাজত অনুসারী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, কোরাণ শরিফ পোড়ানো, আওয়ামী লীগ অফিস পোড়ানো, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। এসব সহিংসতার পর ১৬ জুন পর্যন্ত রাজধানীর মতিঝিল, পল্টন ও রমনা থানায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪০টি মামলা দায়ের হয়। এছাড়া ২০১৩ সালের ৬ মে সকালের সহিংসতার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সদর থানায় আরো তিনটি মামলা হয়। সমাবেশের দিন একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক নাদিয়া শারমিনসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় ৬ মে শাহবাগ থানায় আরেকটি মামলা হয়। মামলায় হেফাজতে ইসলামের ৪০ হাজার ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি হত্যা মামলাও রয়েছে। সব ক'টির মামলার বাদী পুলিশ। হেফাজতের শীর্ষ পর্যায়ের ৩৩ নেতাসহ জেলা পর্যায়ের ২০০ ব্যক্তি বেশিরভাগ মামলায় আসামি। ১৮ দলীয় জোটের কয়েকজন নেতাকেও মামলায় আসামি করা হয়েছে।

মতিঝিল থানার তিনটি এবং পল্টন থানার ১০টি মামলার তদন্তের দায়িত্ব ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। মামলাগুলো হলো- ৬ মে মতিঝিল থানায় হামলা ও বিস্ফোরক উপাদান-সংক্রান্ত ১৩ নম্বর মামলা, পল্টন থানায় পুলিশ বক্সে হামলার ঘটনায় ১৮ নম্বর মামলা; হামলা ও পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহজাহান হত্যার অভিযোগে দায়ের হওয়া ৪২ নম্বর মামলা এবং হামলা, বিস্ফোরক ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে করা ১১ ও ১২ নম্বর মামলা। মতিঝিল থানায় তিনটি মামলা, পল্টন থানায় ২০টি এবং রমনা থানার তিনটি মামলা তদন্ত করছে থানা পুলিশ।

২০১৩ সালে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য মোট ৮৩টি মামলা হয়। এর মধ্যে ৫৩টি মামলা হয় রাজধানীতে। এসব মামলায় হেফাজতে ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিশ, খেলাফত আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীদের আসামি করা হয়। এছাড়া মোট ৮৩ মামলায় ৩ হাজার ৪১৬ জনের নামসহ ৮৪ হাজার ৯৭৬ জনকে আসামি করা হয় ।

হেফাজতের বিভিন্ন মামলার তদন্ত কর্মকর্তার অভিযোগপত্র, আদালত প্রতিবেদন ও গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ৮৩টি মামলার মধ্যে রাজধানী ঢাকার

কলাবাগান থানায় দুটি, রমনায় একটি, শেরেবাংলা নগর থানায় একটি, বাগেরহাটে ছয়টি, নারায়ণগঞ্জে পাঁচটিসহ মোট ১৫টি মামলায় ২০১৪ সালে হেফাজতে ইসলাম, জামায়াত ও বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।

এরপর হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মুফতি ওয়াক্কাস, বিএনপি-জামায়াতসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ ৮৮ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। পরে তারা জামিনে মুক্তি পান।

রাজধানীতে দায়ের হওয়া ৫৩টি মামলার মধ্যে চারটি মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি ৪৯টি মামলার তদন্ত চলছে। এসব মামলায় প্রায় আড়াই'শ নেতার নামসহ অন্তত ৪০ হাজার ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। আসামিদের অনেকেরই নাম ঘুরেফিরে প্রায় সব মামলায় রয়েছে।

২০১৩ সারের ৫ মে ঢাকার ঘটনার পরদিন হেফাজতে ইসলামের ডাকা সড়ক অবরোধে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়। এ ঘটনায় হাটহাজারী থানার পুলিশ হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করে। ওই মামলায় ৫৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ হাজার ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। আসামিরা সবাই স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মী এবং হেফাজতের সমর্থক। ঢাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন এবং পরদিন বাগেরহাটে হেফাজতের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে হেফাজতের দু'জন কর্মী নিহত হন। এ ঘটনায় ফকিরহাটে চারটি ও বাগেরহাট সদর থানায় দুটি মামলা করে পুলিশ। এতে হেফাজত, জামায়াত ও স্থানীয় বিএনপির ৮৮ জন নেতা-কর্মীসহ ১০-১২ হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। হেফাজত, জামায়াত ও বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের আসামি করে ছয়টি মামলায় ইতিপূর্বে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। ফকিরহাট থানায় করা একটি মামলার রায়ে প্রায় ৪০০ আসামি সাক্ষীর অভাবে খালাস পেয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর-শিমরাইল এলাকায় হেফাজতের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ-বিজিবির সংঘর্ষ ও নিহতের ঘটনায় সোনারগাঁ ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় সাতটি মামলা হয়। এসব ঘটনায় পুলিশ সোনারগাঁ ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ছয়টি মামলা করে। সহিংস ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এক বাস মালিকও আরেকটি মামলা করেন। ২০১৭ সালের ৪ মে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মঈনুল হক প্রথম আলোকে বলেন, 'ইতিমধ্যে পাঁচ মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি দুই মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।'

১৫৪ মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি ১১মাসেও : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে তাঁর সফরের বিরোধিতা করে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে সক্রিয় হয় হেফাজতে ইসলাম। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এলাকায় বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় হেফাজতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা

শুরু করে হেফাজত। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ১৯ জন নিহত ও পুলিশসহ ৫০০ জন আহত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৫৪ মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি ।

প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্য ও গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে সহিংসতার মামলায় ছয় জেলায় ১১০ মামলায় ১ হাজার ৩০৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের ৪৯০ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এছাড়া আসামিদের মধ্যে ৯০ জন উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন। বর্তমানে কারাগারে আছেন ৮১৩ জন।

রাজধানীতে ১৪ মামলায় কারাগারে ১৪০ : রাজধানীতে ২৬ মার্চ সংঘর্ষের ঘটনায় মতিঝিল, পল্টন ও যাত্রাবাড়ী থানায় ১৪টি মামলা হয়। ১৪ মামলায় হেফাজতের ১৬৮ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখসহ মোট ১০ হাজার ১১৮ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে হেফাজতের সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হককে আসামি করা হয় চারটিতে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার ২০৬ জনের মধ্যে ৬৬ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

চট্টগ্রামে ১১ মামলা : ঢাকার সংঘর্ষের প্রতিবাদে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে হেফাজতের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভে নামলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে পুলিশ গুলি চালালে চারজন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। এর জেরে মাদ্রাসাছাত্ররা হাটহাজারী ও পটিয়া থানা ভবন, হাটহাজারী ডাকবাংলো, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সদর ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে হামলা চালায়। এই ঘটনায় হাটহাজারী থানায় ১০টি ও পটিয়া থানায় ১টি মামলা হয়। এসব মামলায় আসামি করা হয় হেফাজতের তৎকালীন আমির জুনায়েদ বাবুনগরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর হেলাল উদ্দিনসহ অজ্ঞাতপরিচয় ৫ হাজার ৩০০ জনকে। মামলায় ১৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে ৪৩ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মামলাগুলো: ২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সহিংসতায় ১৫ জন নিহত ও অন্তত ৫০০ আহত হন। ওই তিন দিনের হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে ১২টি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৩৭টি, সরাইল থানায় পুলিশ বাদী হয়ে ২টি, আশুগঞ্জ থানায় পুলিশ বাদী হয়ে ১টি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৩টি এবং আখাউড়া রেলওয়ে থানায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার ১টি মামলা করেন। এসব মামলায় হেফাজত ও বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ৪১৪ জনের নাম উল্লেখ সহ ৩৮ হাজারের বেশি জনকে আসামি করা হয়। তাদের মধ্যে ৬৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ৬০৮ জন হেফাজতের, ৫৪ জন বিএনপির ও ৩ জন জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী। তাদের মধ্যে ৩০০ ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জে জামিনে মুক্ত ৩২ জন : হেফাজতের ডাকা হরতালকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৮ মার্চ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে

পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা ১৮টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। ওই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে চারটি, সাধারণ মানুষ বাদী হয়ে তিনটি ও র‍্যাব বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মামলা করে। ৩০ থেকে ৩৫ জনের নাম উল্লেখ ছাড়াও প্রতিটি মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও দেড় থেকে দুই হাজার ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। এসব মামলায় পুলিশ হেফাজতের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বশীর উল্লাহ্সহ বিএনপি-জামায়াতের ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে হেফাজতের ৫৫ জন। গ্রেপ্তার ৩২ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

মুন্সিগঞ্জে ১০ মামলা: ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হেফাজতের হরতালে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে সহিংসতার ঘটনায় থানায় ১০টি মামলা হয়। এসব মামলায় অজ্ঞাতনামা ৪০০-৫০০ জন হেফাজত নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়। এদের মধ্যে ৩২ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে ৮ জন জামিন পেয়েছেন। আর উচ্চ আদালত থেকে ৫৫ জন আগাম জামিন পেয়েছেন।

কিশোরগঞ্জের ৪ মামলা, জামিন ৪১ জনের : ২০২১ সালের ২৮ মার্চ কিশোরগঞ্জে সদর উপজেলার গৌরী বাজারে হেফাজতের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সদর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে চারটি মামলা করা হয়। পুলিশের করা মামলায় হেফাজতের ৭৯ জনের নাম উল্লেখ ছাড়াও ৪ হাজার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। পুলিশ এসব মামলায় ৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে ৪১ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

২০১৩–২০২১ সাল পর্যন্ত হেফাজতের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ও জামিন

২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডবের ঘটনায় ঢাকাসহ পাঁচ জেলায় মোট ৮৩টি মামলা হয়। এসব মামলায় ৩ হাজার ৪১৬ জনের নামসহ ৮৪ হাজার ৯৭৬ জনকে আসামি করা হয়। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, ৮৩টি মামলার মধ্যে রাজধানী ঢাকার কলাবাগান থানায় দুটি, রমনায় একটি, শেরেবাংলা নগর থানায় একটি, বাগেরহাটে ছয়টি, নারায়ণগঞ্জে পাঁচটিসহ মোট ১৫টি মামলায় ২০১৪ সালে হেফাজতে ইসলাম, জামায়াত ও বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। এরপর হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন মহাসচিব প্রয়াত জুনায়েদ বাবুনগরী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎকালীন মহাসচিব প্রয়াত মুফতি ওয়াক্কাস, বিএনপি-জামায়াতসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ ৮৮ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তারা জামিনে মুক্তি পান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬-২৮ মার্চ সহিংসতার ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সারা দেশে মামলা হয় ১৫৪টি। সর্বোচ্চ ৫৬টি মামলা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এছাড়া ঢাকায় ১৪, চট্টগ্রামে ১১, নারায়ণগঞ্জে ৮, মুন্সিগঞ্জে হয় দশটি মামলা করা হয়। এসব মামলায় আসামি করা হয় এক লক্ষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক হাজার ৩০০ আসামি। যাদের মধ্যে জামিনে আছেন পাঁচ'শ।

হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা আমির শফীর মৃত্যু ও বিক্ষোভ

১৯৮৬ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক পদে যোগ দেন আহমদ শফী। এরপর থেকে টানা ৩৪ বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। শফীর বয়স হওয়ায় হাটহাজারী মাদ্রাসায় তার উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে ২০২০ সালে সেপ্টেম্বরে বিরোধ দেখা দেয়। মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম বা সহকারী পরিচালকের পদে থাকা হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাবেক মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী ছিলেন শীর্ষ পদের অন্যতম দাবিদার কিন্তু শফী সমর্থকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে ২০২০ সালের ১৮ জুন তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

শফী সমর্থকরা সেই দফা টিকে গেলেও তার রেশ থেকে গিয়েছিল। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকার পর মাদ্রাসা খোলা হলে আকস্মিকভাবে কয়েক'শ শিক্ষার্থী বিক্ষোভ শুরু করে। তারা শফীর অব্যাহতি এবং তার ছেলে মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক আনাস মাদানির বহিষ্কার দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর চালায়।

ছাত্রদের দাবি ছিল– হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শফীর ছেলে মাওলানা আনাস মাদানীকে অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার, ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বাস্তবায়নে সকল প্রকার হয়রানি বন্ধ, বয়ো:বৃদ্ধ আল্লামা শফী শারীরিকভাবে অসুস্থ ও চলতে অক্ষম হওয়ায় তাকে মহাপরিচালকের পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে উপদেষ্টা বানানো, মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ কিংবা অপসারণের ক্ষমতা মজলিসে শুরাকে প্রদান, বিগত শুরার হক্কানি আলেমদের পুনরায় নিয়োগ এবং শুরা থেকে কথিত বিতর্কিত ও চিহ্নিতদের বহিষ্কার।

বিক্ষোভ চলাকালীন ছাত্ররা মাদ্রাসার মাইক থেকে এসব দাবির কথা জানান দিতে থাকে। এ সময় বিভিন্ন রকমের স্লোগানে উত্তাল হয়ে উঠে পুরো মাদ্রাসা অঙ্গন। বিক্ষোভের সময় মাদ্রাসার গেট বন্ধ রাখা হয়। আল্লামা শাহ শফী বিক্ষোভের সময় মাদ্রাসায় নিজ কক্ষেই অবস্থান করছিলেন। তবে হাটহাজারী মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষা পরিচালক মাওলানা আনাস মাদানী মাদ্রাসায় ছিলেন না, বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তার রুমের আসবাব ভাঙচুর করেছে।

মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ নানা বিষয় নিয়ে হাটহাজারী মাদ্রাসায় অনেকদিন থেকেই অসন্তোষ ও পারস্পরিক মতপার্থক্য চলে আসছিল। এর সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্ব ও বেফাকের দুর্নীতিজনিত অস্থিরতা নিয়ে উদ্ভুত ঝামেলা না মেটানোয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, মাদ্রাসার সব গেট বন্ধ করে রাখার পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ-প্রশাসন যাতে মাদ্রাসার ভেতরে ঢুকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে সেজন্য ছাত্ররা মসজিদের মাইকে বারবার মাইকিং করেছে।

২০২০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জোহরের নামাজের পর চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। দাবি না মানা পর্যন্ত ক্লাস বর্জন ও অন্যান্য কাজ বন্ধের ঘোষণা দেয় তারা। ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর

হেফাজতের প্রতিষ্ঠা আমির মাওলানা আহম্মদ শফী মারা যান। আহমদ শফী যখন মারা যান তখন হাটহাজারী মাদ্রাসায় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভের মুখে মাদ্রাসার পরিচালকের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তখন তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় আনার কিছুক্ষণ পরই মারা যান তিনি। আহমদ শফীর মৃত্যুর পর পরিবার অভিযোগ তোলে, পদ ছাড়ার দিন হট্টগোলের সময় শাহ আহমদ শফীকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। এ কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। পরে ১৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের আদালতে হত্যার অভিযোগে নালিশি মামলা করেন তার শ্যালক মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদ্রাসায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যে ইন্ধন জোগায় স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। হাটহাজারী মাদ্রাসার নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামায়াতের নেপথ্য ভূমিকা ক্রমেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ইতোমধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়েছে। আহমেদ শফীর জানাজা এবং দাফন কার্যক্রমে অংশ নেন জামায়াত ইসলামের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম, জামায়াতের সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরীসহ জামায়াত-শিবিরের বেশকজন প্রভাবশালী শীর্ষ নেতা ও সাবেক এমপি। এমনকি আহমেদ শফীর মরদেহবাহী খাটিয়া কাঁধে নিতেও দেখা যায় জামায়াতের সেক্রেটারিকে। জানাজার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে, জামায়াত-শিবিরের একাধিক নেতাকর্মীকে।

হেফাজতের নেতৃত্ব নিয়ে আমির আহমেদ শফীর সঙ্গে মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীর দ্বন্দ্বের জেরেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এতে আদতে লাভ হয়েছে বাবুনগরীর। মাদ্রাসার সহকারী পরিচালকের পদ থেকে ইতিপূর্বে বাদ পড়া বাবুনগরী এরপর পরিচালক পদে নিযুক্ত হন।

হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীর ইন্ধনে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে শূরা কমিটির বৈঠকে শফী গ্রুপের পরাজয় হয়। তার ছেলে আনাস মাদানীকেও হাটহাজারীর ওই মাদ্রাসা থেকে বরখাস্ত করা হয়।

২০২১ সালে হেফাজত : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬-২৮ মার্চ থেকে তিন দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, চট্টগ্রামের হাটহাজারী এবং ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ এলাকায় হেফাজতের কর্মসূচি চলাকালে ব্যাপক সহিংসতা হয়। হাটহাজারী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের থানা আক্রমণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগসহ নাশকতার নানা ঘটনা ঘটে। ২০২১ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চ প্রাণহানি হয়েছে ১৯ জনের।

এ সহিংসতার পর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একটি রিসোর্টে হেফাজত নেতা মামুনুল হকের তথাকথিত দ্বিতীয় স্ত্রীসহ অবস্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই 'স্ত্রী'র করা মামলায় মামুনুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়ে।

নানা ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল হেফাজতের কমিটি ভেঙে দেন দলটির তৎকালীন আমির জুনায়েদ বাবুনগরী। তিনি অনেককে দল থেকে বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেন। এর কিছুদিন পর তার মৃত্যু হয়। এরপর দলটির ভারপ্রাপ্ত আমির হন মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী।

২০১৩ সালে রাজধানীর শাপলা চত্বরে জনস্রোত দেখিয়ে দেশে-বিদেশে আলোড়ন তোলা হেফাজত এমন চাপে আগে পড়েনি। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ এত নেতা অতীতে কারাবন্দি হননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের বিরোধিতা করে সংগঠনটি ২০২১ সালে আন্দোলনে নামে। পরে তাদেরই হরতাল ঘিরে ব্যাপক নাশকতার জেরে নেতাকর্মীর ওপর নেমে আসে শতাধিক মামলার খড়্গ। এর পরই ঘটে যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের রিসোর্টকাণ্ড।

প্রতিষ্ঠাতা আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় অভিযুক্ত হন বাবুনগরীসহ ৪৩ কেন্দ্রীয় নেতা। এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ও বিতর্কের কারণে বিভক্তি এবং পাঁচ কেন্দ্রীয় শতাধিক নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের ঘটনায় হেফাজতে বিরাজ করছিল অস্থিরতা। আবার গ্রেপ্তার এড়াতে অনেক নেতা লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। এই প্রেক্ষাপটেও কেন্দ্রীয় বিতর্কের জেরে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগ করেন সংগঠনের নায়েবে আমির ও বাংলাদেশ ফরায়েজী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান।

হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার পর তা পুলিশের প্রতিবেদনে প্রমাণও হয়। হাটহাজারি মাদ্রাসাকে গ্রাস করতেই পরিকল্পনায় করে তাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ ব্যুরো ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) তদন্ত প্রতিবেদনে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে হেফাজতের বর্তমান আমির জুনায়েদ বাবুনগরী, যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দীন মুনিরসহ ৪৩ জনের নাম উল্লেখ করে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২০২১ সালের ১২ এপ্রিল চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল তৃতীয় জজ আদালতে এ প্রতিবেদন দাখিল করে পিবিআই। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকাপোস্টের এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, 'অভিযুক্তরা আল্লামা শফীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়নি ও উন্নত চিকিৎসা দিতে কালক্ষেপণ করেছে। তারপর মাদ্রাসা থেকে আল্লামা আহমদ শফীকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলে গেট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলার আসামি জুনায়েদ বাবুনগরীর পিএস এনামুল হাসান ফারুকীর নেতৃত্বে আহমদ শফীকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেওয়া হয়। ১ ঘণ্টা আটকে রেখে আহমদ শফির মৃত্যু হয়েছে মনে করে ছেড়ে দেয়। এরপর তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হলে সেখান থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়। পরে ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়।'

আদালত প্রতিবেদন থেকে অনুসন্ধানে জানা গেছে, ৪৩ জনের মধ্যে ৩১ জন এজাহারভুক্ত। তারা হলেন মাওলানা নাছির উদ্দিন মুনির, মাওলানা মীর ইদ্রিস, হাবিব উল্লাহ আজাদী, আহসান উল্লাহ, আজিজুল হক ইসলামাবাদী, জাকারিয়া নোমান ফয়েজী, আব্দুল মতিন, মো. শহীদুল্লাহ, মো. রিজুয়ান আরমান, হাসানুজ্জামান, মো.

এনামুল হাসান ফারুকী, মীর সাজেদ, জাফর আহমদ, মীর জিয়াউদ্দিন, মাওলানা আহম্মদ, মাওলানা মাহমুদ, আসাদুল্লাহ, জুবাইর মাহমুদ, হাফেজ জুনায়েদ আহমেদ, আনোয়ার শাহ, ছাদেক জামিল কামাল, কামরুল ইসলাম কাসেমি, মো. হাসান, ওবায়েদুল্লা ওবায়েদ, জুবাইর, মাওলানা মোহাম্মদ, আমিনুল হক, সোহেল চৌধুরী, মবিনুল হক, নাইমুল ইসলাম খান ও হাফেজ সায়েম উল্লাহ।

তদন্তে নতুন করে যে ১২ জনের নাম যুক্ত হয়, তারা হলেন- জুনায়েদ বাবুনগরী, মাওলানা শফিউল আলম, শিব্বির আহমেদ, আবু সাঈদ, হোসাইন আহমদ, তাওহীদ, এরফান, মামুন, আমিনুল, মাসুদুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম ও নুর মোহাম্মদ।

২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হেফাজতের আমিরের মৃত্যুর পর ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির নির্বাচিত হন হেফাজতের মহাসচিব ও হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। সংগঠনটির মহাসচিব হন ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও হেফাজতের ঢাকা মহানগর শাখার আমির নূর হোসাইন কাসেমী। ২০২০ সালের ১৩ ডিসেম্বর নূর হোসাইন কাসেমী মারা যাবার পর হেফাজতের প্রয়াত মহাসচিবের দায়িত্ব পান মাওলানা নূরুল ইসলাম জিহাদী। হেফাজতের দায়িত্ব নেওয়ার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় আন্দোলনের নামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রাজপথে নামেন তিনি।

এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হাটহাজারীতে ২০ জন মারা যান। এসব হত্যাকাণ্ড ও হামলার বিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি করেন কাসেমী। অন্যদিকে এই ঘটনার কারণে দলের মধ্যেই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে হেফাজতের তৎকালীন আমির জুনাইদ বাবুনগরী ও মহাসচিব নূরুল ইসলাম জিহাদীসহ ৩৩ সদস্য কমিটিকে।

২০২১ সালের ১৯ আগস্ট দুপুরে জুনায়েদ বাবুনগরীর মৃত্যুর পর একই দিন বৈঠক করে রাত পৌনে ১১টার দিকে হেফাজতের মহাসচিব নুরুল ইসলাম জিহাদী মাদ্রাসার মাইকে জুনাইদ বাবুনগরীর মামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরীকে ভারপ্রাপ্ত আমির করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর মহাসচিব নুরুল ইসলাম জিহাদীর মৃত্যুর পর মাওলানা সাজিদুর রহমনাকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর এক বৈঠকে তাকে পূর্ণাঙ্গ মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এভাবে ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২১-এর নবেম্বর পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক 'অরাজনৈতিক' সংগঠন বলে দাবিদার হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের চার শীর্ষ নেতা।

শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর হেফাজতের স্মারকলিপি:

২০১৬ সালের ১৬ মে এটিএন নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইনকে ইসলামবিদ্বেষী আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবিতে ২০১৬ সালের ১৬ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে হেফাজতে ইসলাম ঢাকা

মহানগরীর যুগ্ম-সদস্য সচিব মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমীর নেতৃত্বে মহানগর নেতারা ঢাকা, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক আল্লামা নূর হোছাইন কাসেমী স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন ডেপুটি কমিশনার মো. আল মামুন। স্মারকলিপি প্রদানকালে প্রতিনিধি দলের প্রধান মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী বলেন, ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষানীতি, ধর্মহীন শিক্ষা আইন বাতিল করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, মাওলনা আহমদ আলী কাসেমী, মাওলানা ফখরুল ইসলাম, মাওলানা শরীফুল্লাহ, মাওলানা রবিউল ইসলাম, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা ফয়সাল আহমদ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ ও মাওলানা রবিউল ইসলাম প্রমুখ। স্মারকলিপিতে বলা হয়, আজ অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে আপনার কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হচ্ছে। কারণ বিতর্কিত ইসলামবিরোধী সেকুলার শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ক্রমান্বয়ে ইসলাম ভাবাপন্ন পাঠসমূহ বাতিল করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দুত্ববাদ ও নাস্তিক্যবাদমূলক টেক্সট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী ভাবধারার লেখা বাদ দিয়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁঠাবলীর নিয়ম, গরুকে মায়ের সম্মান, হিন্দুদের তীর্থস্থানে ভ্রমণ কাহিনী এবং হিন্দু রীতিনীতি ও দেব-দেবীর নামে প্রার্থনা করার বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে চলতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস এবং দাড়ি-টুপি ও পীর-মাশায়েখবিরোধী কাল্পনিক কাহিনীর প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে লাখ লাখ মুসলিম ছাত্রছাত্রীকে ইসলামবিরোধী ও হিন্দুত্ববাদের মহানুভবতা প্রকাশ পায় এমন উত্তর লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

'আমরা মনে করি, স্কুল-কলেজের বর্তমান ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আইনি ভিত্তিদান এবং কওমি মাদ্রাসাসমূহকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন-২০১৬ নামে একটি বিতর্কিত খসড়া আইন প্রকাশ করে তড়িঘড়ি পাস করার উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব কর্মকাণ্ডকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শের বিরোধী বলে আমরা মনে করি। দেশ ও জাতি গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আপনার সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ধর্মীয় শিক্ষাকে শুধু সংকোচনই করেনি, বরং ইসলামধর্ম বিষয়ক এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি উদ্দীপনামূলক গল্প-রচনা ও কবিতাসমূহ বাদ দিয়ে তদস্থলে নাস্তিক্যবাদ ও হিন্দুত্ববাদের প্রতি উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন রচনা, গল্প ও কবিতা একতরফা প্রতিস্থাপিত করেছে।

'স্মারকলিপিতে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের সিলেবাস পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। স্মারকলিপিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং তদালোকে প্রণীত শিক্ষাআইন ২০১৬-এর খসড়া অবিলম্বে বাতিল, নূরানী-মক্তব, হাফেজিয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসার স্থাপন ও পরিচালনাকে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতার

আওতামুক্ত রাখা, প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে চক্রান্তমূলকভাবে বাদ দেয়া ইসলামী ভাবধারার গল্প, রচনা ও কবিতাসমূহ পুনঃঅন্তর্ভূক্ত করা এবং পরিকল্পিতভাবে যুক্ত করে দেয়া হিন্দুত্ববাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী কবিতা, গল্প ও রচনাবলী শিক্ষা সিলেবাস থেকে বাদ দেয়াসহ ১০ দফা দাবি করা হয়।'

পাঠ্যপুস্তক থেকে 'হিন্দুত্ব ও নাস্তিক্যবাদ' ছেঁটে ফেলায় হেফাজত আমিরের প্রশংসা: ২০১৭ সালের ১৫ জানুয়ারি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৭ সালের ১৫ জানুয়ারি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে হেফাজতের আমির আহমদ শফী বলেন, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরা বিষয়টির গুরুত্ব ও নাজুকতা বুঝতে পেরে সিলেবাসে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে হেফাজতের দাবি শতভাগ পূরণ হয়েছে বলে যারা বিতর্ক তুলে ইসলামী ভাবধারার গল্প-কবিতার প্রতি আঙুল তুলেছেন তারা ইমানী চেতনাবোধ মুছে বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ ও নাস্তিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ২০১৬ সালের ৮ই এপ্রিল হেফাজতে ইসলাম স্কুল পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে মুসলমানদের সন্তানদের নাস্তিক্যবাদ ও হিন্দু তত্ত্বের বিষয়ে পড়ানোর অভিযোগ তোলে।

'২০১২ সাল পর্যন্ত প্রচলিত সিলেবাস পাল্টে ২০১৩ সাল থেকে স্কুল পাঠ্যবইয়ে এমন ১৭টি রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো নৈতিকতা ও আদর্শিকভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে কয়েক যুগ ধরে। তার পরিবর্তে এমন ১২টি নতুন রচনা সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো তাত্ত্বিকভাবে সরাসরি হিন্দুত্ব ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত।' হেফাজত আমীরের প্রেস সচিব মাওলানা মুনির আহমদ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, 'পাঠ্যবইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামবিদ্বেষী এই চক্রের বক্তব্য গ্রহণের সুযোগ নেই। এদের কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। স্কুল পাঠ্যবই নিয়ে সমালোচনার মুখে গণতান্ত্রিক শাসনের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থেকে সরকারের 'এই ইতিবাচক উদ্যোগ প্রশংসনীয়' বলে মন্তব্য করে এতে বলা হয়, স্কুল পাঠ্যবইয়ে কি পরিবর্তন হয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সামাজিক নেতাদের ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাচাই করে দেখা হোক। স্কুল পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন নিয়ে যারা বিতর্ক তুলতে চাইছে তাদের 'ক্ষুদ্র অংশ' আখ্যা দিয়ে আহমদ শফী বলেন, তাদের কাজই হচ্ছে নৈতিক আদর্শ ও ইসলামী চেতনাবোধের বিপক্ষে এবং নাস্তিক্যবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে কথা বলা। তারা 'ও' দিয়ে 'ওড়না' লেখায় সাম্প্রাদয়িকতা ও অসামঞ্জস্য খুঁজে পায়, কিন্তু 'র' দিয়ে 'রথ টানি', 'ত' দিয়ে 'তবলা বাজাই', 'ঢ' দিয়ে 'ঢাক বাজাই', 'ঋ' দিয়ে 'ঋষি'র মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অসামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। হেফাজত আমীর বিবৃতিতে পাঠ্যবইয়ে হেফাজতের দাবি শতভাগ পূরণ হয়েছে বলে কয়েকটি পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলের উস্কানিমূলক সংবাদ প্রতিবেদন ও চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের সমালোচনা করে তাদের ইসলামবিদ্বেষীদের মুখপত্রের ভূমিকা বাদ দিয়ে দেশের গণমানুষের পক্ষে ভূমিকা পালনের আহবান জানান।'

'গ্রিক দেবী মূর্তি' অপসারণের হুমকি : ২০১৬ সালের শেষ দিকে গ্রিক দেবীর ভাস্কর্যটি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। এরপর প্রায় দুই মাস এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কোনও মত প্রকাশ না হলেও ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুখ খোলেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক আমির শাহ আহমদ শফী। এক বিবৃতিতে তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্যটি অপসারণের দাবি জানান।

এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সবগুলো ধর্মভিত্তিক সংগঠন ভাস্কর্যটি সরানোর দাবিতে আন্দোলন করছিল। এটি সরানো না হলে আবারও শাপলা চত্বর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেবেন বলে জানান সংগঠনটির নেতারা। রোজা শুরুর আগে ভাস্কর্য অপসারণের দাবি জানান তারা।

২০১৭ সালের ১১ মার্চ ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে গ্রিক দেবী মূর্তিকে ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে স্থাপন ধর্মহীনতার ইঙ্গিত বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী। ফেনী জেলা হেফাজতের উদ্যোগে শানে রিসালাত সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

২০১৭ সালের ১০ মার্চ অনলাইন নিউজ পাঠক.নিউজ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নগরীর আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের উত্তর গেট চত্বরে একটি সমাবেশে হেফাজতের তৎকালীন আমির প্রয়াত আহমদ শফী বলেছিলেন, অবিলম্বে গ্রিক মুর্তি অপসারণ করা না হলে সরকারে পতন অনিবার্য। প্রয়োজনে আবারো শাপলা চত্তরে অবস্থান কর্মসূচী দেওয়া হবে। ইসলামী বিরোধী কার্যকলাপ যদি সরকার কঠোর হাতে দমন না করে এবং অবিলম্বে গ্রিক মুর্তি অপসারণ করা না হয় তাহলে আবারো শাপলা চত্তরে অবস্থান কর্মসূচী দেওয়া হবে। এবার আর শাপলা চত্তর থেকে তৌহিদী জনতা ফিরে আসবে না যতক্ষণ সরকারের পতন না হবে।

'সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সামনে গ্রিক দেবির মূর্তি স্থাপন বাংলাদেশের গণমানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আদর্শিক চেতনার বিপরীত। কোন মুসলমান মূর্তিকে ন্যায় বিচারের প্রতীক বিশ্বাস করলে তার ঈমান থাকবে না। বাংলাদেশে মূর্তি স্থাপনের চাহিদা ও সুযোগ কোনটাই নেই। অবিলম্বে এই মূর্তি অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় ঈমান, আক্বীদা ও ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যে মূর্তি অপসারণের দাবীতে প্রয়োজনে লাখ লাখ মানুষ নিয়ে ঢাকা ঘেরাওসহ শাপলা চত্তরে আবারো অবস্থান কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। নেতৃবৃন্দরা বলেন, অবিলম্বে গ্রিক মুর্তি অপসারণ করা না হলে সরকারের পতন অনিবার্য।'

হেফাজতে ইসলামের অব্যাহত দাবির মুখে সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ভাস্কর্যটি সরানো হয়।

২০২০ সালের ২৮ নবেম্বর দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্টের ভাস্কর্য সরানোর তিন বছর পর– যে কোনো ভাস্কর্য বসালে তা 'টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেয়ার' হুমকি দিয়েছিলেন হেফাজতে ইসলামের আমির জুনায়েদ বাবুনগরী। ২০২০ সালের ১৫ নবেম্বর হাটহাজারীর পার্বতী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আল আমিন সংস্থা আয়োজিত তিনদিনের তাফসিরুল কোরাণ মাহফিলের

সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তার এমন বক্তব্য প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বছর জাতির পিতার ভাস্কর্যের বিরোধিতাকারী হেফাজত ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হক উত্তেজনাকর বক্তব্য রাখেন।

'২০২০ সালের ১৫ নবেম্বর হাটহাজারীর মাহফিল থেকে সরকারের কাছে চার দফা দাবি তুলে ধরেন হেফাজত আমির জুনায়েদ বাবুনগরী। বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম বন্ধ করা, কাদিয়ানীদের সরকারিভাবে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা, দূতাবাস বন্ধ করে ফ্রান্সের দূতকে বহিষ্কার করা এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংসদে নিন্দা প্রস্তাব পাস করার দাবিও ছিল সেখানে। সমাবেশে বাবুনগরী বলেন, দেশ চলবে মদিনার সনদে। এই কথায় আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ মদিনার সনদে চলবে। রাশিয়া, আমেরিকা, ভারত, চীনের সনদে চলতে পারবে না। ওই মাহফিল থেকেই ভাস্কর্যবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন হেফাজতের তৎকালীন আমির জুনায়েদ বাবুনগরী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মদিনার সনদে দেশ চলবে। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। মদিনার সনদে যদি দেশ চলে, ইসলামবিরোধী কোন কাজ হতে পারবে না। ইনশা আল্লাহ প্রধানমন্ত্রী (ভাস্কর্য বসাতে) দেবে না, দেবে না। মদিনার সনদে যদি দেশ চলে, কোন ভাস্কর্য থাকতে পারে না। মদিনায় কি কোন ভাস্কর্য আছে?

'২০২০ সালের ১৫ নবেম্বর হাটহাজারীর পার্বতী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাফসীর মাহফিলে বাবুনগরী বক্তব্য প্রদান করেন, 'ভাস্কর্য- এটা শরিয়তসম্মত নয়। কোন পার্টি বা নেতার নাম বলছি না, যার ভাস্কর্য হোক না কেন। আল্লাহর কসম, কেউ যদি আমার আব্বার ভাস্কর্য বসায়, আমি সর্বপ্রথম সেই ভাস্কর্য টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেব। যে কোন দল ভাস্কর্য বসাবে, আমার আব্বার ভাস্কর্যও যদি স্থাপন করা হয়, সেটা শরিয়ত সম্মত হবে না। টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেব।'

২০২০ সালের ১৩ নবেম্বর ঢাকার গেণ্ডারিয়ার ধূপখোলার মাঠে 'তৌহিদী জনতা ঐক্যপরিষদের' ব্যানারে এক সমাবেশ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। একই দিনে রাজধানীর বিএমএ অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে শানে রিসালাত কনফারেন্সে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মামুনুল হকও প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করেন। ওই বক্তব্যের পর সরকার বা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তেমন কোন জোরালো প্রতিবাদ দেখা না যাওয়ায় জোটসঙ্গীরা এবং নাগরিক সমাজ সমালোচনা করেন।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ করে হেফাজতে ইসলাম। মোদির বিরোধিতায় প্রথমে ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে বিক্ষোভে সহিংসতা হয়, তার জেরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাণঘাতী সংঘাত হয়। যার জেরে ২৮ মার্চ হরতাল ডাকে হেফাজত, ওই হরতালকে ঘিরে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় সারাদেশে।

২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে হেফাজতের ডাকা প্রতিরোধ সভা এবং হরতালের সময় বিএনপি জামায়াত শিবির, হেফাজতে ইসলাম এবং সামপ্রদায়িক গোষ্ঠীর তাণ্ডবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং মারধর, খুনাখুনি, গাড়ী পোড়ানোসহ নজিরবিহীন নারকীয় যজ্ঞ চালিয়েছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরসহ পুরো জেলাতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে জ্বলন্ত নরক বানিয়ে দিয়েছিল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হকের প্রধান লক্ষ্য ছিল বর্তমান সরকার পতনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকার বিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো মামুনুলের। বিশেষত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার।

২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল জাগোনিউজ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) হারুন-অর-রশিদ জানিয়েছেন, মামুনুল ভারতবিরোধী মতাদর্শীর লোকজন এবং সরকারবিরোধী দলের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে করে নাশকতার পরিকল্পনা করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভারতে মুসলমানদের নির্যাতনে মোদি জড়িত বলে ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসেন। এই ইস্যুতে সারা দেশে তিনি বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতায় 'বড় মুভমেন্ট' করার পরিকল্পনা করেন। ২০১৩ সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সরকারের পতন ঘটিয়ে অন্য দল ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে ধারণা ছিল তাদের। ওই সময় হেফাজতের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে মামুনুল হক নিজেকে ছাড়া কোনো কিছু হবে না বলে বিশ্বাস ছিল তার। এ কারণে কৌশলে তিনি উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে থাকেন। প্রথমে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে মূর্তি বলে বিরোধিতা শুরু করেন। পরে মোদিবিরোধী স্লোগান তোলেন।'

হেফাজতের কমিটি ও নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দাবি করে তারা অরাজনৈতিক সংগঠন। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আহমদ শফীর খোলা চিঠি এবং এপ্রিলে ঘোষিত ১৩ দফা দাবির মাধ্যমে হেফাজত জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশে তারা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নেমেছে।

হেফাজতের ইসলাম বাংলাদেশে সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফী চট্টগ্রামে নেজামে ইসলাম পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠনে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেও এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত সাবেক আমির মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী চট্টগ্রামে 'হরকাতুল জিহাদ'-এর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন, তালেবান ও আল কায়দার

সঙ্গে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী জঙ্গিদের প্রধান আস্থাভাজন ও মুরব্বী ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ফজলুল হক আমিনীর 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি'র গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী ছিলেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম নেতা। চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা কাপ্তাইয়ের গহীন অরণ্যে ছিল তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

জুনায়েদ বাবুনগরী ছাত্রজীবনে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগ দিয়ে সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করেন, তিনি প্রকাশ্যে রাজনীতির কথা না বললেও গোপনে নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

হেফাজতের বর্তমান আমির মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি 'নেজামে ইসলাম পার্টিতে' যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 'নেজামে ইসলাম পার্টির' কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারক। 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির' কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির। ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতী আমিনী গ্রুপ)-এর নায়েবে আমির। জামায়াত-বিএনপি জোট-এর কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ বৃহত্তর ফটিকছড়ির সিনিয়র উপদেষ্টা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর' উপদেষ্টা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজাহিদ বাহিনীর সিনিয়র নেতা ছিলেন।

মাওলানা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। সেই বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্য কাপ্তাইয়ের গহীন অরণ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন এবং হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন।

বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই হেফাজতেরও কেন্দ্রীয় নেতা ও উপদেষ্টা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য; যাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা জিয়াউদ্দীন, খেলাফতে মজলিসের আমির মাওলানা ইসহাক, খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী কামরাঙ্গীরচর, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, ইসলামী ঐক্যজোট কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী, আমির খেলাফত মজলিস মাওলানা ইসমাঈল নুরপুরী প্রমুখ।

হেফাজতের ২০২০ সালের ১৫ নবেম্বর জুনায়েদ বাবুনগরীর নেতৃত্বাধীন বিলুপ্ত কমিটিতে ২০ দলীয় জোটভুক্ত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (কাসেমী অংশ) ৩৪ জন কেন্দ্রীয় নেতা স্থান পান। দলের মহাসচিব মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী হেফাজতের নতুন কমিটির মহাসচিব হিসেবে মনোনীত হন। হেফাজতের উপদেষ্টামণ্ডলীতে জায়গা পেয়েছিলেন জমিয়ত নেতা মাওলানা জিয়াউদ্দীন ও মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, জমিয়তের নায়েবে আমির পদে ছিলেন, মাওলানা আব্দুল হামিদ (পীর সাহেব মধুপুর), মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ সাদী, মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী, মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, মাওলানা আনোয়ারুল করিম (যশোর) ও মাওলানা নুরুল ইসলাম খান (সুনামগঞ্জ)।

চারজন যুগ্ম-মহাসচিবের দুজন ছিলেন জমিয়তের। তারা হলেন, মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব ও মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির। সহকারী মহাসচিবের তালিকায় জায়গা পান জমিয়ত নেতা মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী ও মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী। দলটির সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান মাওলানা মাসউদুল করীম, টঙ্গী, মাওলানা শামসুল ইসলাম জিলানী ও মাওলানা তাফহিমুল হক, হবিগঞ্জ। এছাড়া হেফাজতের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিলেন, মুফতি মুনির হোসাইন কাসেমী (অর্থ সম্পাদক), মাওলানা লোকমান মাজহারী (সহকারী অর্থ সম্পাদক), মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানী, মুফতি শরীফুল্লাহ ও মাওলানা ফেরদাউসুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ (সহকারী প্রচার সম্পাদক), মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী (আইন বিষয়ক সম্পাদক), মাওলানা নাজমুল হাসান (দাওয়াহ সম্পাদক), মাওলানা শুয়াইব আহমদ, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, লন্ডন (সহকারী আন্তর্জাতিক সম্পাদক), মাওলানা সিদ্দিকুল ইসলাম তোফায়েল (সহকারী দফতর সম্পাদক)।

হেফাজতে ইসলামের সাবেক কমিটিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও খেলাফত মজলিসের (২০ দলীয় জোটভুক্ত) অন্তত ৩০ জন কেন্দ্রীয় নেতা স্থান পান। সংগঠনের বিভিন্ন পদে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা ইসমাঈল নূরপুরী (উপদেষ্টা), সাবেক মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক (নায়েবে আমির), ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক (যুগ্ম-মহাসচিব), মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী ও মাওলানা জালালুদ্দিন (সহকারী মহাসচিব), যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন (সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক), মাওলানা ফয়সাল আহমদ (সহ-প্রচার সম্পাদক) ছিলেন।

হেফাজতের বিলুপ্ত কমিটিতে বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক খেলাফত মজলিসের ছয় জন নেতা স্থান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে উপদেষ্টামণ্ডলীতে দলের আমির মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, নায়েবে আমির পদে মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের, তিনি শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ২০ দলীয় জোটের শরিক খেলাফত মজলিসের মহাসচিব। ১৯৮২ সালে শিবিরকে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলে জামায়াতের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন আহমদ আবদুল কাদের। এরপর শিবির থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তিনি। ১৯৮৩ সালে তিনি ইসলামী যুবশিবিরের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি ২০ দলীয় জোটের শরিক খেলাফত মজলিসের মহাসচিব।

মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে হজরত মাওলানা আবদুল কাদের সালেহ ও আহমদ আলী কাসেমী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, নায়েবে আমির পদে মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী (নেজামে ইসলাম), মাওলানা জাফরুল্লাহ খান (খেলাফত আন্দোলন) রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী সহ ২০ খেলাফত নেতা (নায়েবে আমির) উল্লেখযোগ্য।

১৫ নভেম্বর ২০২০ সালে গঠিত ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নামের তালিকা, আদি সংগঠন ও রাজনৈতিক পরিচয়

উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা ঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী
(ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)।

অন্যান্য উপদেষ্টা ঃ

(১) আল্লামা সুলতান যওক নদভী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন, হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা ও নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা)।
(২) মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী (মৃত) (হরকাতুল জিহাদ ফতোয়া বোর্ডের উপদেষ্টা ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন নেতা)।
(৩) আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী (হরকাতুল জিহাদ উপদেষ্টা, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৪) আল্লামা আবদুর রহমান হাফেজ্জী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(৬) মুফতি আবদুল মালেক হালিম (ইসলামী আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট)
(৭) মাওলানা হাফেজ কাসিম (তালিমুদ্দিন মাদ্রাসা) জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা
(৮) মাওলানা নূরুল ইসলাম আদীব (খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা।
(৯) মাওলানা জিয়াউদ্দীন (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১০) মুফতি ওয়াক্কাস (মৃত) জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১১) মাওলানা আবুল হাসান রংপুরী (ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(১২) অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী, দেওনা, গাজীপুর, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি)
(১৩) মাওলানা নোমান ফয়েজী (মৃত) (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১৪) মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা)
(১৫) মাওলানা ইসহাক (আমির খেলাফতে মজলিস)
(১৬) মাওলানা আবদুর রকীব (কেন্দ্রীয় নেতা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম)
(১৭) মাওলানা রশিদুর রহমান ফারুক (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১৮) আল্লামা নূরুল হক, কুমিল্লা, (ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(১৯) মাওলানা আবুল কালাম (খেলাফত মজলিস নেতা)
(২০) মাওলানা ইসমাঈল নুরপুরী (আমির খেলাফত মজলিস)
(২১) মাওলানা জালাল আহমদ (নেতা খেলাফত মজলিস)
(২২) মাওলানা আশেকে এলাহী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(২৩) মাওলানা ফজলুর রহমান, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)

(২৪) মাওলানা ফজলুল্লাহ, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও খেলাফত মজলিসের নেতা)
(২৫) মাওলানা আশেকে এলাহী পীর সাহেব উজানী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়ত নেতা)

আমির ঃ আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (মৃত) (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন, হরকাতুল জিহাদ ও নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা)
নায়েবে আমির ঃ
(১) মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী কামরাঙ্গীরচর (আমির খেলাফত আন্দোলন)
(২) মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৩) মাওলানা সালাহ্উদ্দিন নানুপুরী, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৪) মাওলানা শেখ আহমদ হাটহাজারী, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৫) মুফতী আহমদুল্লাহ পটিয়া মাদ্রাসা, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৬) মাওলানা আব্দুল হামিদ, পীর মধুপুর, (ইসলামী ঐক্যজোট ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৭) মুফতী আরশাদ রহমানী, বসুন্ধরা, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৮) মাওলানা মাহফুজুল হক, বেফাক, (সিনিয়র নায়েবে আমির, খেলাফত মজলিস)
(৯) মাওলানা মুহিব্বুল হক, গাছবাড়ী, সিলেট, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১০) মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী, মোমেনশাহী, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১১) ড. আহমদ আব্দুল কাদের (খেলাফত মজলিস একাংশের মহাসচিব)
(১২) মাওলানা সাজিদুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(১৩) মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(১৪) মাওলানা ইয়াহিয়া, হাটহাজারী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও হরকাতুল জিহাদ উপদেষ্টা)
(১৫) মাওলানা আব্দুল আওয়াল, নারায়ণগঞ্জ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(১৬) মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, আরজাবাদ মাদ্রাসা, (ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের একাংশ)
(১৭) ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন, চট্টগ্রাম (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা)

(১৮) মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী (নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি)
(১৯) মাওলানা হাবিবুর রহমান কাসেমী, নাজিরহাট, (হরকাতুল জিহাদ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২০) মুফতী জসিম উদ্দিন হাটহাজারী, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(২১) মাওলানা তাজুল ইসলাম, ফিরোজশাহ কলোনী, চট্টগ্রাম, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(২২) মাওলানা আনোয়ারুল করিম, যশোর, (খেলাফত মজলিসের নেতা)
(২৩) মাওলানা মুশতাক আহমদ, খুলনা, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২৪) মাওলানা রশিদ আহমদ, জামিয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২৫) মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, ঢাকা, (খেলাফত আন্দোলনের একাংশের আমির)
(২৬) মাওলানা নুরুল ইসলাম খান, সুনামগঞ্জ, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা)
(২৭) মাওলানা হাবিবুর রহমান, লালবাগ মাদ্রাসা, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(২৮) মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলিল দারুল মা'রিফ, (হরকাতুল জিহাদ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নেতা)
(২৯) মাওলানা নেজাম উদ্দিন, নোয়াখালী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৩০) মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব, বরিশাল, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৩১) মাওলানা ইউনুস আহমদ, রংপুর, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৩২) মাওলানা জাহিদুল ইসলাম বিন ইউনুস, (খেলাফত আন্দোলনের নেতা)

বাবুনগরীর কমিটির মহাসচিব ঃ আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী (মৃত) (তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় মহাসচিব ছিলেন)
মহাসচিবঃ মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী (তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের আমির)
যুগ্ম মহাসচিব ঃ
(১) মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, (কেন্দ্রীয় নেতা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম)
(২) মাওলানা মামুনুল হক, (মহাসচিব খেলাফতে মজলিস বাংলাদেশ)
(৩) মাওলানা লোকমান হাকিম (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৪) মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা)

সহকারী মহাসচিব ঃ

(১) মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২) মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, খুলনা, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৩) মাওলানা খুরশিদ আলম কাসেমী, (খেলাফত মজলিসের নেতা)
(৪) মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব একাংশ)
(৫) মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, রাবেতাতুল ওয়ায়েজিন কেন্দ্রীয় নেতা)
(৬) মাওলানা আব্দুল বাসেত খান, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৭) মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী, (হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ নেতা, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নেতা)
(৮) মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফাতেহপুরী, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(৯) মাওলানা মুফতি আজহারুল ইসলাম, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(১০) মুফতি রহিমুল্লাহ কাসেমী (খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(১১) মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজি, (খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব)
(১২) মাওলানা মূসা বিন ইজহার, (হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ নেতা ও ইসলামী ঐক্যজোট মুফতি ইজহার এর কেন্দ্রীয় নেতা)
(১৩) মাওলানা জাফর আহমদ, ভাটুয়া, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট)
(১৪) মাওলানা হাবিবুল্লাহ আজাদী, (হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি নেতা)
(১৫) মাওলানা শফিক উদ্দিন, (ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)
(১৬) মাওলানা জসিমুদ্দিন, লালবাগ, ইসলামী খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(১৭) মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমাদ (ইসলামী ঐক্যজোট ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি নেতা)
(১৮) মাওলানা হাসান জামিল, (রাবেতাতুল ওয়ায়েজিন নেতা)

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী (হরকাতুল জিহাদ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)

সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(১) মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, (খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির)
(২) মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, (ইসলামী ঐক্যজোট কেন্দ্রীয় নেতা)
(৩) মাওলানা মাসউদুল করীম, টঙ্গী, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৪) মাওলানা মীর মুহাম্মদ ইদ্রিস, (হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ ও ইসলামী বাস্তবায়ন কমিটি এবং খেলাফত আন্দোলনের নেতা)

(৫) মাওলানা শামসুল ইসলাম জিলানী, (খেলাফত আন্দোলনের নেতা)
(৬) মুফতি ওমর ফারুক, (খেলাফত মজলিসের নেতা)
(৭) মাওলানা আতাউল্লাহ আমেনী, ঢাকা, (খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক)
(৮) মাওলানা আফিমুল হক, হবিগঞ্জ, (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৯) মাহমুদুল আলম, রংপুর (খেলাফত মজলিসের নেতা)

অর্থ সম্পাদক ঃ মুফতি মুনির হোসাইন কাসেমী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা)

সহকারী অর্থ সম্পাদক ঃ

(১) মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ফয়সাল, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২) মাওলানা লোকমান মাজহারী, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৩) মাওলানা মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, (খেলাফতে মজলিসের নেতা)
(৪) মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস হামেদী (খেলাফত মজলিসের নেতা)

প্রচার সম্পাদক ঃ মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়জী (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটিও হরকাতুল জিহাদের নেতা)

সহকারী প্রচার সম্পাদক ঃ

(১) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(২) মাওলানা ফয়সাল আহমদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৩) মুফতি শরীফুল্লাহ (খেলাফত মজলিসের নেতা)
(৪) মাওলানা ফেরদাউসুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)
(৫) হাফেজ সায়েম উল্লাহ (খেলাফত আন্দোলনের নেতা)

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ মুফতি হারুন ইজহার (হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ এর নেতা ও মুফতি ইজাহারুল ইসলামের ইসলামী ঐক্যজোট-এর কেন্দ্রীয় নেতা)

সহকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ মাওলানা জুনায়েদ বিন জালাল (হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)

সাহিত্য ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঃ মাওলানা হারুন আজিজী নদভী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান হামিদ

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুফতি কুতুবুদ্দিন নানুপুরী (হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নেতা)

সহকারী সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মাওলানা হাফেজ সালামত উল্লাহ (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও ইসলামী ঐক্যজোট কক্সবাজার জেলা সভাপতি)

আইন বিষয়ক সম্পাদক ঃ অ্যাডভোকেট মাওলানা শাহিনুর পাশা চৌধুরী, সাবেক এমপি, (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব)

সহকারী আইন বিষয়ক সম্পাদক ঃ অ্যাডভোকেট নিজামুদ্দিন

দাওয়াহ সম্পাদক ঃ মাওলানা নাজমুল হাসান (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা)

সহকারী দাওয়াহ সম্পাদক ঃ মাওলানা মুশতাকুন্নবী, আহমদ আলী কাসেমী

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ঃ মাওলানা ওবায়দুর রহামান খান নদভী (দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক এবং হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা)

ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক ঃ মুফতি মুহাম্মদ আলী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)

সহকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক ঃ মাওলানা জাকারিয়া মাদানী, মাওলানা গাজী ইয়াকুব (ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা)

ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ঃ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ খুবায়েব (হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)

সহকারী ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ঃ মাওলানা জিয়াউল হোসাইন

আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ হেলাল উদ্দিন নানুপুরী (হরকাতুল জিহাদ ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতা)

সহকারী আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ

আনোয়ার শাহ আজহারী, আব্দুল কাদের সালেহ (লন্ডন), মাওলানা আব্দুস সালাম পাটওয়ারী, মাওলানা শুয়াইব আহমদ, মাওলানা রফিক আহমদ (নিউ ইয়র্ক), মাওলানা গোলাম কিবরিয়া (লন্ডন)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ঃ মাওলানা ড. নুরুল আবছার আজহারী

সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ঃ মুফতি হুমায়ুন কবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দফতর সম্পাদক ঃ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ তৈয়ব

সহকারী দফতর সম্পাদক ঃ আবু তাহের ওসমানী ও মাওলানা সিদ্দিকুল ইসলাম তোফায়েল

সদস্য ঃ

মাওলানা আবু তাহের নদভী (পটিয়া), মুফতি কেফায়েত উল্লাহ (হাটহাজারী), মাওলানা আজিজুল হক (আল মাদানী), মাওলানা আলী ওসমান, মুফতি বশিরুল্লাহ, মুহাম্মদ শফি বাতুয়া, আবুল হোসাইন (সাতকানিয়া), হাফেজ ইলিয়াস হামেদী, আনওয়ারুল আলম, চিরিঙ্গা, শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুর রহিম কাসেমী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ক্বারি জহিরুল ইসলাম, জামিল আহমদ চৌধুরী (মৌলভীবাজার), বশির আহমদ (মুন্সিগঞ্জ), তাফাজ্জুল হক আজিজ (সুনামগঞ্জ), আলী আকবর (সাভার), আবু আব্দুর রহিম (নরসিংদী), আব্দুল কুদ্দুস (মানিকনগর), মুফতি আবু সাঈদ (ফরিদাবাদ মাদ্রাসা), এনামুল হক আল মাদানী, আব্দুল মুবিন, মুহাম্মদ উল্লাহ জামি, রফিকুল ইসলাম মাদানী, হাফেজ শুয়াইব মাক্কি, নূর হুসাইন নুরানী, মাওলানা আব্দুল মান্নান আম্বরশাহ, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মাহমুদ কাসেমী, মাওলানা রাশেদ বিন নূর, মাওলানা সাঈদ নূর।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

৩০ জানুয়ারি ২০২১ সালে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে মাখজানুল উলুম মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন হেফাজতের কেন্দ্রীয় তৎকালীন প্রয়াত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদী। এতে মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীবকে সভাপতি ও মাওলানা মামুনুল হককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনিত করা হয়েছে।

কমিটিতে সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন- মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মানিকনগর, মাওলানা নাজমুল হাসান, মাওলানা শফিক উদ্দিন, মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মাওলানা খুরশিদ আলম কাসেমী, মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী, মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, মাওলানা কুরবান আলী কাসেমী, মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস আরজাবাদ, মুফতি এনামুল হক বসুন্ধরা, মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মাওলানা রশিদ আহমদ মেরাজনগর, মাওলানা জসীমউদ্দীন লালবাগ, মাওলানা জুবায়ের আহমদ লালবাগ, মাওলানা মুসা বিন ইজহার, মাওলানা ইলিয়াস হামিদী, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সুবহানী, মাওলানা শিব্বির আহমদ খিলগাঁও ও মুফতি মহিউদ্দিন মাসুম ধৌর।

কমিটিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছেন- মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী, মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ আজহারী উত্তরা, মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমদ, মাওলানা লোকমান মাজহারী, মুফতি জাবের কাসেমী, মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজি, মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা আব্দুর রহমান খান, মাওলানা ফিরোজ আশরাফী, মাওলানা আবু তাহের খান ও মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী।

সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি আজহারুল ইসলাম। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পেয়েছেন- মাওলানা মতিউর রহমান গাজীপুরী, মাওলানা সুলতান মহিউদ্দিন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ কাসেমী, মাওলানা মুফতি শরিফুল্লাহ যাত্রাবাড়ী, মাওলানা জুবায়ের মোহাম্মদপুর, মাওলানা কামাল উদ্দিন সালেহ, মাওলানা আজিজুর রহমান হেলাল, সাইফুদ্দিন আহমেদ খন্দকার ও মুফতি রুহুল আমিন।

প্রচার সম্পাদক: মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, সহ-প্রচার সম্পাদক: মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ আরমান, মাওলানা এহসানুল হক, মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমী বাউনিয়াবাধ, মাওলানা আকরাম হোসাইন, মাওলানা ফরহাদ আলম ও তাওহীদুল ইসলাম তুহিন। অর্থ সম্পাদক: মাওলানা মুফতি জাকির হোসাইন কাসেমী। সহ-অর্থ সম্পাদক: মাওলানা মুফতি কামাল উদ্দিন উত্তরা, মাওলানা ইউনুছ আলী খিলগাঁও, মাওলানা আনোয়ারুল করীম, মাওলানা নাসির উদ্দিন লালবাগ ও মাওলানা উযায়ের আমিন।

স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক সম্পাদক: মাওলানা ফয়সাল আহমদ। স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক সহ-সম্পাদক: হাফেজ নুরুল আমিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ, মাওলানা নুরুজ্জামান রাহমানিয়া, মাওলানা সানাউল্লাহ, মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আমিন উত্তরা, মাওলানা মাহবুবুল আলম খিলগাঁও, মাওলানা রাশেদ বিন নূর খিলগাঁও, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা রিজওয়ান আরজাবাদ ও মাওলানা আতিকুর রহমান সিদ্দিকী।

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: মাওলানা গাজী ইয়াকুব। সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: মাওলানা আব্দুল লতিফ ফারুকী ভাষানটেক, রিফাত মালিক, মাওলানা সাইফুল্লাহ হাবিবী লালবাগ, মাওলানা দ্বীনে আলম হারুনী, মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ মিরপুর, মুফতী আতাউর রহমান খান, মাওলানা ইলিয়াস হাসান কাসেমী মিরপুর, মাওলানা কামাল আহমদ, মাওলানা সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী ও মুফতি আবু বকর সিদ্দিক ফরিদী।

আইন বিষয়ক সম্পাদক: অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান। সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক:মাওলানা বশিরুল হাসান খাদিমানী, মাওলানা আনিসুর রহমান বিমানবন্দর, মাওলানা শরীফ হোসাইন, মাওলানা রবিউল ইসলাম, অ্যাডভোকেট যুবায়ের আহমাদ ফরীদ, অ্যাডভোকেট লিটন চৌধুরী ও মুফতি শামসুল আলম।

দফতর সম্পাদক: মাওলানা রবিউল ইসলাম মিরপুর, সহ-দফতর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মুমিন, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক: ড. মুস্তাফিজুর রহমান, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ-সম্পাদক: মাওলানা জাকির হোসাইন খান, অধ্যাপক আব্দুল জলিল, মাওলানা রিজওয়ান জমীরাবাদী ও মাওলানা আশরাফুজ্জামান পাহাড়পুরী। এছাড়াও হেফাজতের ঢাকা মহানগরের সদস্যরা হলেন- মাওলানা হামেদ জহিরী, মাওলানা বশির উল্লাহ মাহমুদ পল্লবী, মাওলানা মাহমুদুর রহমান আদাবর, মাওলানা লুৎফুর রহমান ফার্মগেট, মাওলানা মুফতি কামাল উদ্দিন শিহাব যাত্রাবাড়ী, মাওলানা ওয়াজেদ আলী কড়াইল, মাওলানা হেদায়েতুল ইসলাম, মাওলানা মুজিবুর রহমান গেন্ডারিয়া, মাওলানা ঈসা কাসেমী কল্যাণপুর, মাওলানা মুফতি আব্দুস সাত্তার পল্টন, মাওলানা ইমরান হোসাইন কাসেমী, শাহাবুদ্দিন খন্দকার, মাওলানা সানাউল্লাহ লালবাগ, মাওলানা এমদাদুল হক সাকি ও মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রাজী।

হেফাজতের কমিটি বিলুপ্ত ঃ জুনায়েদ বাবুনগরী

২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর সম্মেলনে জুনায়েদ বাবুনগরীকে আমির করে হেফাজতের ১৫১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছিল। নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন এর আমির জুনায়েদ বাবুনগরী। ২৫ এপ্রিল ২০২১ রোববার রাতে এক বিবৃতিতে বাবুনগরী বলেন, "দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল।"

নতুন একটি আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছিলেন বাবুনগরী। হেফাজতে ইসলামের ফেসবুক পাতায় এক মিনিট ২৪ সেকেন্ডের এক ভিডিও বার্তায় বিবৃতিটি পড়েন তিনি।

নতুন কমিটি গঠনের ছয় মাস পার হওয়ার আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকেন্দ্রিক বিক্ষোভ থেকে সহিংসতার ঘটনার পর পুলিশি অভিযানে চাপে থাকার মধ্যে বাবুনগরীর এই ঘোষণা এসেছিল।

৫ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে হেফাজত : চলমান অস্থির ও নাজুক পরিস্থিতি বিবেচনায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও মহানগর কমিটি

বিলুপ্তি ঘোষণা পরবর্তী উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শক্রমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল রবিবার রাতে হেফাজতের মহাসচিব নুরুল ইসলাম জিহাদী এই কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটির সদস্যরা হলেন, প্রধান উপদেষ্টা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, আহ্বায়ক জুনায়েদ বাবুনগরী, মহাসচিব নুরুল ইসলাম, সদস্য সালাহউদ্দীন নানুপুরী ও দেওনার পীর অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী।

৭ জুন ২০২১ ঘোষিত ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির নামের তালিকা

নানা সমীকরণের পর আলোচিত সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের' নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৭ জুন সকাল ১১ টায় খিলগাঁও মাখজানুল উলুম মাদ্রাসায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ৩৩ সদস্যের নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেন বর্তমান মহাসচিব আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদী। বিভিন্ন অভিযোগে জেলে থাকা ও রাজনৈতিক পরিচয়ধারী নেতাদের বাদ দিয়ে এই সংগঠনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নব গঠিত কমিটিতে রাখা হয়নি খেলাফত মজলিশের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক ও তার অনুসারীদের। কমিটিতে জুনায়েদ বাবুনগরীকে আমির এবং নুরুল ইসলাম জিহাদীকে মহাসচিব হিসেবে রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রয়াত আমির শাহ আহমদ শফীর বড় ছেলে মো. ইউসুফকেও রাখা হয়।

নতুন কমিটিতে নায়েবে আমির হিসেবে রাখা হয়েছে নয়জনকে। তারা হলেন- মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী, মাওলানা সালাউদ্দিন নানুপুরী, অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা মুহিব্বুল হক (সিলেট) ও মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুবসহ (বরিশাল), মাওলানা আবদুল হক (ময়মনসিংহ), মাওলানা ইয়াহইয়া (হাটহাজারী মাদ্রাসা), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (ফরিদাবাদ মাদ্রাসা), মাওলানা তাজুল ইসলাম ও মাওলানা মুফতি জসিমুদ্দীন (হাটহাজারী মাদ্রাসা)।

যুগ্ম-মহাসচিব পাঁচ জন

মাওলানা সাজিদুর রহমান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মাওলানা আবদুল আউয়াল (নারায়নগঞ্জ), মাওলানা লোকমান হাকীম (চট্টগ্রাম), মাওলানা আনোয়ারুল করীম (যশোর) ও মাওলানা আইয়ুব বাবুনগরী।

সহকারী মহাসচিব: মাওলানা জহুরুল ইসলাম ও মাওলানা ইউসুফ মাদানী। সাংগঠনিক সম্পাদক: মাওলানা মীর ইদ্রিস (চট্টগ্রাম), অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী (মেখল) ও সহ-অর্থ সম্পাদক: মাওলানা মুফতী হাবিবুর রহমান কাসেমী

(নাজিরহাট)। প্রচার সম্পাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন রব্বানীকে (সাভার) এবং সহ-প্রচার সম্পাদক করা হয়েছে মাওলানা জামাল উদ্দীনকে (কুড়িগ্রাম)। দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক: মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সোবহানী (সেগুনবাগিচা) এবং সহকারী দাওয়াহ: মাওলানা ওমর ফারুক (নোয়াখালী)।

এছাড়া সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে নয়জনকে। তারা হলেন- মাওলানা মোবারাকুল্লাহ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মাওলানা ফয়জুল্লাহ (মাদানীনগর), মাওলানা ফোরকানুল্লাহ খলিল (চট্টগ্রাম), মাওলানা মোশতাক আহমদ (খুলনা), মাওলানা রশিদ আহমদ (কিশোরগঞ্জ), মাওলানা আনাস (ভোলা), মাওলানা মাহমুদুল হাসান (ফতেহপুরী) এবং মাওলানা মাহমুদুল আলম (পঞ্চগড়)।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় হেফাজতের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট। ৩৩ সদস্যর এ নতুন কমিটি অন্যান্যদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে পারবেন। এছাড়া ভবিষ্যতে প্রত্যেক জেলা কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং জেলা কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী অরাজনৈতিক ব্যক্তি হতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীকে প্রধান করে ১৬ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়। জুনায়েদ বাবুনগরী এবং মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী অসুস্থ থাকার কারণে এ সময় উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানান মাওলানা নুরুল ইসলাম।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর কেন্দ্র করে ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের হাটহাজারীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত সহিংসতার মামলায় সারাদেশে টানা গ্রেপ্তার অভিযানসহ নানামুখী চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে রয়্যাল রিসোর্টে নারীসহ জনতার হাতে ধরা পড়েন। এতে নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়ে হেফাজত।

২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল রাতে হঠাৎ এক ভিডিও বার্তায় হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্তির কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাবেক আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীকে আহ্বায়ক ও সাবেক মহাসচিব আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদী সচিব করে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন আরও ৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি সদস্য করা হয়।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয়

১. আহমদ শফী

সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান ঘাঁটি চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা। দেশের এই বৃহত্তম কওমি মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম (মহাপরিচালক) প্রয়াত শাহ আহমদ শফী। তিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানাধীন পাখিয়ার টিলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বরকত আলী এবং মাতার নাম মেহেরুন্নেছা বেগম। তিনি সরফভাটা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ভর্তি হন চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি মাদ্রাসায়। সেখান থেকে ১৯৪২ সালে দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ ও কাজী মুবারাক (স্নাতক) পর্যন্ত পড়ার পর তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস, দাওরায়ে তাফসীর এর কোর্স অধ্যায়ন সমাপ্ত করেন।[১] দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষকরা অত্যন্ত রক্ষণশীল হলেও তারা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর কট্টর সমালোচক।

হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাওলানা আহমদ শফীর কর্মকাণ্ডে নজর রেখেছিলেন গণকমিশনের অনুসন্ধানী প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য। কমিশনের সদস্যের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারী এলাকায় তিনি নেজামে ইসলাম-এর প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান ও নেজামে ইসলাম এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে ছিলেন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতাপূর্ব কালে নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠন করেন। পাকিস্তানীদের সব ধরণের সহযোগিতায় ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, লুঠ, অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল এই 'মুজাহিদ বাহিনী'। আহমদ শফী ১৯৮৬ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পান। পরবর্তী সময়ে শায়খুল হাদিসের দায়িত্বও পালন করেন আহমদ শফী। ২০০৮ সালে তিনি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-বেফাকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চ আন্দোলন শুরু করলে আহমদ শফীর মুখোশ উন্মোচিত হয় এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতায়

হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে মাঠে নামেন এবং তথাকথিত ১৩ দফা দাবি প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশের সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী।

২০০৯ সালের দিকে সরকার ঘোষিত নারীনীতিকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে অভিহিত করে হেফাজতে ইসলামের জন্ম হয়। যদিও বা সরকার ঘোষিত নারী নীতির মধ্যে ইসলামবিরোধী কিছুই ছিল না, বরং নারীনীতি ছিল এ দেশের পশ্চাদপদ, অবহেলিত নারী সমাজের অধিকার নিশ্চিত করার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মাত্র। শুরুতে হেফাজতে ইসলাম নিজেদেরকে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও সময় গড়ানোর সাথে সাথে 'অরাজনৈতিক সংগঠন' নামের আড়ালে তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ দিনের পর দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে।

২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি দারুল উলুম হাটহাজারী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ গঠন করা হয়। আহমদ শফী এর প্রতিষ্ঠাতা আমির মনোনীত হন। বিবাহের ন্যূনতম বয়স, নারী শিক্ষার বিরোধীতা, ব্লগারদের নাস্তিক আখ্যায়িত করে নানা বক্তব্য, নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য, নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কেও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির নানা অনুসঙ্গ ও প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বারবার সমালোচিত হন হেফাজতের প্রয়াত আমির ও হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন মহাপরিচালক শাহ আহমদ শফী।

২০১৩ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আহমদ শফীর দেওয়া একটি বক্তৃতাকে বলে অভিহিত করে সরকার। বক্তৃতায় তিনি নারীদের চতুর্থ শ্রেণির বেশি পড়াতে নিষেধ করেন, সমালোচনা করেন সহশিক্ষার। নারীদের চাকরি না করে বাড়িতে রাখার পরামর্শ দেন তিনি। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আপনি কেন আপনার মেয়েকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পাঠাচ্ছেন? সে ফজরের পর ৭/৮টায় কাজে যায় আর রাত ৮/১০/১২টায়ও ফিরে আসে না। আপনি তো জানেন না সে কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা করছে। আপনি তো জানেন না সে কী পরিমাণ যিনায় লিপ্ত হচ্ছে।' হেফাজতের আমিরের বক্তব্যটি নারী অধিকার কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তারা তাঁকে জেলে পাঠানোর দাবি তোলে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এই বক্তব্যকে 'নোংরা' এবং 'জঘন্য' বলে উল্লেখ করেন।

২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ঢাকায় একটা সমাবেশের ডাক দেয় এবং সমাবেশ শেষে শাপলা চত্বরে গিয়ে একটি শোকরানা মোনাজাতের মাধ্যমে সমাবেশের সমাপ্তির কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল। কিন্তু সেদিন হেফাজত নেতারা শাপলা চত্বরে নিজেদের লোক জমায়েত দেখে ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় ভেবে মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে যান। সমাবেশে তারা সরকার পতনের ডাক দেন।

আহমদ শফীর নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে সরকার কওমি মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান প্রদান করলে আইন অনুসারে কওমি মাদ্রাসার ৬টি বোর্ডের সমন্বয়ে 'আল

হাইআতুল উলয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' গঠন করা হয়। এ সংস্থার নেতৃত্বও আহমদ শফীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

২০২০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আহমদ শফীর পদত্যাগ এবং তার ছেলে আনাস মাদানীকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কারসহ ৫ দফা দাবি নিয়ে দারুল উলুম হাটহাজারীর ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। দুপুর থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়, রাতে আনাস মাদানীকে বহিষ্কার করা হয় এবং পরদিন আহমদ শফী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের কারণ দেখিয়ে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য হাটহাজারী মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্ররা সরকারের এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যায়, আহমদ শফী পদত্যাগ করলে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

দেওবন্দের পাঠ শেষ করে আহমদ শফী বাংলাদেশে এসে ১৯৮১ সালে 'ইজহারে হকিকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এতে তিনি মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। মওদুদী সম্পর্কে আহমদ শফী লিখেছেন, 'তিনি নিজ ইচ্ছামত পবিত্র কোরাণের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এবং সর্বাদিসম্মত গ্রহণযোগ্য হাদিস, যা শ্রেষ্ঠতম ইমামে হাদিস হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) এর নিকটও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তিনি সেগুলিকেও প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ জন্য সকল শ্রেণির ও সকল সম্প্রদায়ের ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মওদুদী নিজেও বিপথগামী এবং অন্যকেও বিপথগামী করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।'[২]

হেফাজতের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফী এককালে জামায়াতে ইসলামীর এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের স্বার্থে নিজের মত পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি 'রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কোন সমস্যার খাতিরে সাময়িকভাবে হলেও কোন হানাফী, সুন্নী ব্যক্তির জন্য জামায়াতের সাথে মিলে কাজ করা বা তার সহযোগিতা জায়েয নয়'। আহমদ শফী তার পুস্তিকার 'আল জওয়াব' অধ্যায়ে এমন কথাও লিখেছেন, 'রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের (জামায়াতের) সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা যদি ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কামুক্ত হয় তা প্রথম জায়েয হতে পারে'।

আহমদ শফীর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে– 'আল-বয়ানুল ফাসিল বাইনাল হক্কে ওয়াল বাতিল', 'আল-হুজাজুল ক্বাতিয়া, আল খায়রুন কাসীর ফী উসুলীততাফসীর', 'ইসলাম ওয়া ছিয়াছত', 'ইজহারে হাক্বীকত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাংলায় রয়েছে– হক্ব ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা, ইসলাম ও রাজনীতি, ইজহারে হাক্বীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ, মুসলমানকে কাফির বলার পরিণাম, সত্যের দিকে করুণ আহ্বান, ধূমপান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ, একটি সন্দেহের অবসান, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া, তাবলীগ একটি অন্যতম জিহাদ, ইছমতে আম্বিয়া ও মিয়ারে হক্ব এবং বায়আতের হাক্বীকত ইত্যাদি।

নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর আদর্শিক গুরু হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন আহমদ শফী। তিনি হুজির পরিচিতি পুস্তিকায়

সংগঠনটির কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, 'হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ পরিচিতি ও কার্যক্রম', পুস্তিকার ভূমিকায় বলা হয়েছে– 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বিগত আট বৎসর যাবত উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার উপর অর্পিত জিহাদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি এই সংস্থাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। বাইতুল মুকাদ্দাস, কাশ্মীর, বার্মা ও ফিলিপাইনসহ বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি ও নির্যাতিত মুসলমানদেরকে জালিমের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর পতাকাতলে সমবেত হওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। আমি সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে এই সংগঠনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন এই সংগঠনের উপর তার গায়েবী মদদের হাত সর্বদা সম্প্রসারিত রাখেন।'[৩]

হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত আমির আহমদ শফী স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়। ২০১৩ সালের ২৫ জুলাই দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক মাওলানারা ছাড়া দেশের অধিকাংশ আলেম একজোট হয়ে তার বিচার দাবি করেছেন। চট্টগ্রামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসমাবেশে সুন্নি ওলামায়ে কেরামরা সরাসরি আহমদ শফীকে যুদ্ধাপরাধী বলে দাবি করে তার বিচার চান।'[৪]

আহমদ শফী সাত সন্তানের জনক। এর মধ্যে চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র। নেজামে ইসলাম পার্টি দিয়ে আহমদ শফীর রাজনীতি শুরু। ছাত্র অবস্থায় চট্টগ্রাম জেলার নেজামে ইসলাম পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নেজামে ইসলাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় নেতা ছিলেন। হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার পর রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

২. জুনায়েদ বাবুনগরী

সাবেক আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলাম-এর প্রয়াত সাবেক আমির জুনায়েদ বাবুনগরী উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি বাবুনগর গ্রামে ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা আবুল হাসান। বাবুনগরী হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য পাকিস্তানের জামিয়া বিন্নুরী টাউন, করাচিতে যান।

পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ মেয়ে ও ১ ছেলের জনক। আরবি, উর্দু ও বাংলায় তার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি।

২০১৩ সালের ২২ জুলাই জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী ছিলেন মুজাহিদ

বাহিনীর অন্যতম নেতা। চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা কাপ্তাইয়ের গহীন অরণ্যে ছিল তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। জুনাইদ বাবুনগরী মুক্তিযুদ্ধকালে পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য গঠিত মুজাহিদ বাহিনীর নেতা ছিলেন। ফটিকছড়ি এলাকায় বাবুনগরী ও ফটিকছড়ি বাবুনগর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ হারুন বাবুনগরী এবং হেফাজতে ইসলামের সিনিয়র নায়েবে আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক সদস্য নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য কাপ্তাইয়ের গহীন অরণ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধের সময় আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ফটিকছড়ি-মিরসরাই নির্বাচনী এলাকা থেকে নেজামে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে হারুন বাবুনগরী তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফজলুল হক বিএসসির বিরুদ্ধে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। হেফাজতের নায়েবে আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও হেফাজতের মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অন্যতম সহযোগী সংগঠন নেজামে ইসলামে যোগ দিয়ে সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করেন।'[৫]

১৯৯২ সালে ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রধান জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' (হুজি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী এই সংগঠনের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হুজি'র মুখপত্র মাসিক 'জাগো মুজাহিদ' 'মাসিক রহমত' পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ লিখে তিনি এ দেশের যুব সমাজকে উগ্রবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে তিনি দেশে এসে আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর ২০০৩ সালে তিনি দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসায় যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। ২০২০ সালের ১৭ জুন মাদ্রাসা কমিটি এই দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়।

২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হাটহাজারী মাদ্রাসায় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন বড় হতে থাকলে ওই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক শাহ আহমদ শফী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে মাদ্রাসার দায়িত্ব মজলিসে শুরাকে হস্তান্তর করেন। পরে বাবুনগরীসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। তিনি মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস ও শিক্ষা সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

২০১০ সালে বাবুনগরীকে মহাসচিব করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির আমির শাহ আহমদ শফী মৃত্যুর পর ১৫ নভেম্বর সংগঠনের একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি আমির নির্বাচিত হন। বাবুনগরীকে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির, দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব ও শায়খুল হাদিস, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম নূরারি তালিমুল কোরাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাসিক মুঈনুল ইসলামের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী, মাসিক দাওয়াতুল হকের পৃষ্ঠপোষক, ইনসাফ২৪.কম ও

কওমিভিশন.কমের প্রধান উপদেষ্টাসহ কয়েকটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঈমান-আকিদা সংরক্ষণ ও বিশ্বনবীর সম্মান রক্ষার ঘোষণা দিয়ে গঠিত অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামকে 'রাজনৈতিক চরিত্র প্রদান' দেওয়া, কখনও আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নেওয়া, আবার কখনও নিজ সংগঠনের ভেতর কিংবা আলোচিত হাটহাজারী মাদ্রাসায় অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি– নানা ইস্যুতে একের পর এক বিতর্ক তৈরি করেছিলেন তিনি। হেফাজতের মধ্যেই একাংশের কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য, আবার আরেক অংশের কাছে অগ্রহণযোগ্য– বিতর্কিত। এভাবে নানা বিতর্কে বারবার আলোচনায় এসেছেন জুনায়েদ বাবুনগরী।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতায় বাবুনগরীর নেতৃত্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় হেফাজতের কর্মীরা। ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ তিনদিনে ১৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

আফগান ফেরত জঙ্গি কমান্ডার মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ হচ্ছেন বাংলাদেশের জঙ্গি মুজাহিদ ও জিহাদী উগ্র তারুণ্যের একজন প্রিয় লেখক তার জিহাদ বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে জিহাদের নামে উগ্র জঙ্গিবাদী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হতো। এই জঙ্গি নেতার বিতর্কিত গ্রন্থ 'কেন জিহাদ করবো', 'জিহাদ কি ও কেন'? 'জিহাদের ডাক', সহ কয়েকটি গ্রন্থ এক মলাটে বিশাল আকারে 'ফাযায়েলে জিহাদ' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। জঙ্গি মৌলবাদ বিষয়ক এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী। ভূমিকায় তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'কমান্ডার সগীর বিন ইমদাদ আমার খুবই স্নেহভাজন একজন। তার লেখা পড়ে এ দেশের যুব সমাজ যেভাবে জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তা দেখে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। তার এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।'[৬]

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার উদ্দেশ্যে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে সগীর বিন ইমদাদ বা বাবুনগরী কর্তৃক প্রশংসিত বই 'কেন জিহাদ করবো' বইয়ে লিখেছেন, 'নামাজ, রোজার চেয়েও সশস্ত্র জিহাদ অধিক জরুরি'।'

উক্ত বইতে তিনি যুব সমাজকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রতি আহ্বান করতে গিয়ে লিখেছেন, 'সশস্ত্র জিহাদই হচ্ছে জান্নাত (স্বর্গ) লাভের একমাত্র পথ।'

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরো লিখেছেন, 'অমুসলিম ও স্বৈরাচারী শাসকদের যে কোন মুহূর্তে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'[৭]

বাবুনগরীর জামায়াত কানেকশন: ২০২০ সালের ১৬ মে একুশে পত্রিকা নামে অনলাইন পোর্টাল 'সাঈদীপুত্রের সাথে বাবুনগরীর বৈঠক, হেফাজতকে কবজায় নিতে চায় জামায়াত' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হেফাজত মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীর সাথে জামায়াতের সম্পর্ক তুলে ধরতে গিয়ে তার মামা হেফাজতের আরেক শীর্ষ নেতা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর প্রসঙ্গও নিয়ে আসে অনলাইন পোর্টালটি। প্রতিবেদনে ফটিকছড়ির নাজিরহাটে অবস্থিত

ঐতিহ্যবাহী বাবুনগর মাদ্রাসায় দুই বাবুনগরীর সাথে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা হামিদুর রহমান আজাদের গোপন বৈঠক হয়েছে বলেও দাবি করা হয়।'[৮]

২০২১ সালের ১৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় বাবুনগরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর তাকে চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড় এলাকায় সিএসসিআর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওই হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর ১২টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবুনগরীকে মৃত ঘোষণা করেন।

৩. মুহাম্মদ মামুনুল হক

কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাবেক মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

মাওলানা মামুনুল হক ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা আজিজুল হক ছিলেন বোখারী শরিফের বাংলা অনুবাদক। তিনি "শাইখুল হাদিস" নামে পরিচিত। মামুনুল হকরা ১৩ ভাই-বোন।

মামুনুল হক তার প্রাথমিক শিক্ষা তার বাবা শাইখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক এর কাছ থেকে শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি লালবাগ চানতারা মসজিদ মাদ্রাসা থেকে কোরাণে হাফেজ হন। তারপর ১৯৮৬ সালে মামুনুল হক জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকায় ভর্তি হন। এরপর তিনি ১৯৯৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৯৫ সালে স্নাতক এবং ১৯৯৬ সালে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স সমাপ্ত করেন।[৯]

মামুনুল হক সিরাজগঞ্জ জামিয়া নিজামিয়া বেথুয়া মাদ্রাসা ও মিরপুর জামিউল উলুম মাদ্রাসায় যথাক্রমে পাঁচ বছর এবং দুই বছর শিক্ষকতা করেন। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকায় শায়খুল হাদিস হিসেবে তিনি ২০০০ সাল থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। মাহাদুত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়া নামে একটি ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন ২০১৫ সালে।

২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলাদেশের কথিত ইসলামী বক্তাদের সংগঠন 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজিন বাংলাদেশে'র উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে তিনি ঢাকা কেরানীগঞ্জে বাবরি মসজিদ বাংলাদেশের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হেফাজতের আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য ১২ই মে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কারাগারে থাকাবস্থায় মামুনুল হক একটি বই রচনা করেন, যার নাম "কারাগার থেকে বলছি", যা ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ২দিন আগে তাকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২০ সালের ১০ অক্টোবরে তিনি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও ১৫ নভেম্বর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব নির্বাচিত হন। ২৬ ডিসেম্বর হেফাজতের এক সভায় তাকে ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, মামুনুল হক আলোচনায় আসেন মূলত হেফাজতে ইসলামকে কেন্দ্র করেই। ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের ঘটনার পর তিনি গ্রেপ্তার হন। বেশ কয়েক মাস কারাভোগের পর বেরিয়ে এসে তিনি সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেন। এরপর থেকে দেশব্যাপী বিভিন্ন মাহফিলে তার চাহিদা বেড়ে যায়। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে নবেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ইস্যুতে তার মাঠ গরম করা কিছু বক্তৃতায় তিনি সরকারবিরোধী মৌলবাদী বলয়ে জনপ্রিয়তা পান।

২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মারা যাওয়ার আগে মামুনুল হক তৎকালীন আমির প্রয়াত জুনায়েদ বাবুনগরী বলয়ের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। বাবুনগরীর নেতৃত্বাধীন ২০২০ সালের ১৫ নবেম্বর হেফাজতের নতুন কমিটিতে তিনি কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিবের পদ পান। এছাড়া তাকে ঢাকা মহানগরীর কমিটির সেক্রেটারি করা হয়। নতুন কমিটিতে মামুনুল হক প্রভাব খাটিয়ে নিজের পদ ছাড়াও তার ঘনিষ্ঠ অনেককে জায়গা করে দেন বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

হেফাজত নেতা মামুনুল হক রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকার একটি ভবনের মালিক। বিগত ১০ বছর ধরে পাঁচ ভাই মিলে সেখানে থাকছেন। এর আগে রাজধানীর আজিমপুরে পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িটি এখন বোনদের দখলে রয়েছে। মোহাম্মদপুরের বসিলায় মামুনুল হকের ব্যক্তিগত ফ্ল্যাট আছে বলে জানা গেছে। হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হক বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় সব সময় নীতি-নৈতিকতার বক্তব্য দিয়ে নিজেকে আলোচনায় রাখতেন।

২০২১ সালে নারায়ণগঞ্জে তার স্ত্রী ছাড়া অন্য একজন নারীর সঙ্গে রিসোর্টে সময় কাটাতে গেলে স্থানীয় জনরোষের মুখে পড়েন। পরবর্তীকালে দেখা যায় তিনি তার প্রকৃত স্ত্রীর নাম দিয়ে এবং নিজের পরিচয় একজন প্রফেসর দিয়ে বুকিং করে ওই নারীর সঙ্গে সেখানে যান। তিনি উত্তেজিত জনগণের কাছে এ নারীকে নিজের স্ত্রী দাবি করলেও পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া তার প্রকৃত স্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে এ নারীকে অন্য ব্যক্তির স্ত্রী দাবি করেন। ২০২১ সালের ৩ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের এ নেতা বন্ধুর স্ত্রী সহ বিলাসবহুল রিসোর্টে আটক হন। তাৎক্ষণিকভাবে তার সমর্থকেরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং সোনারগাঁও এ ব্যাপক ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। দেশব্যাপী তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠে।

জনকণ্ঠে প্রকাশিত মামুনুলনামা ও গণকমিশনের নিজস্ব অনুসন্ধানে হেফাজত নেতা মামুনুল হকের দীর্ঘদিনের ওয়াজের নামে উস্কানিমূলক বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ধর্মের নামে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কথায় কথায় মনগড়া ফতোয়া প্রদান, মানুষ খুন, রক্তারক্তি,সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছিল তার মূল টার্গেট। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালিত্বের বোধ, উদারনৈতিক সংস্কৃতিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন প্রতিটি ওয়াজে। অন্যের অনুভূতি, অন্যের ধর্ম, দেশ ও জাতিকে ছোট করা তার নিত্যদিনের কাজ ছিল।

মামুনুল হকের ওয়াজে শান্তির ধর্ম ইসলামের মর্মবাণী কিংবা সৌহার্দ্য সম্প্রীতির কথা কখনই বলেননি। জঙ্গি-উগ্র মতবাদ তুলে ধরতেই বেশি আগ্রহী তিনি। ধর্মের

অপব্যাখ্যা করে আইন হাতে তুলে নেওয়া এমনকি মানুষ খুন করতে অনুসারীদের সরাসরি উস্কানি দিয়ে মাঠ গরম করে রাখতেন সবসময়। যাকে তাকে 'ইসলামের দুশমন', 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' ও 'কাফের' বলে তাদের হত্যায় প্ররোচনা দেন তিনি। এমন অসংখ্য ওয়াজের মধ্যে ২০১৯ সালের ১২ মার্চ Jadid Media নামের ইউটিউবে প্রচারিত এক ওয়াজে তিনি বলেন, 'কটূক্তি করে কোনো দুশমন কল্লা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না।' তার এ ঘোষণা এমন উত্তেজনা ছড়ায় যে, তরুণরা উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকে। শ্লোগানে শ্লোগানে কটূক্তিকারী খুঁজে বের করা ও নিজ হাতে শাস্তি প্রদানের যেন প্রতিজ্ঞা করে তারা। ওই বক্তব্যে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'অপারগ' হয়ে কেউ খুন করে ফেললে সেটা দোষের হবে না। যাকে তাকে অপবাদ দিয়ে 'জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে' ফেলারও ঘোষণা দেন তিনি।

মামুনুল হকের বক্তব্যে চরম সাম্প্রদায়িক উস্কানি লক্ষ্য করা যায়। ওয়াজে অপরের ধর্মকে 'অন্তঃসারশূন্য', 'ভেলকিবাজির ভাওতাবাজির ধর্ম' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন হাজার হাজার খ্রীস্টান ভাওতাবাজির মিথ্যা ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলামের কালেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে।' এমন মিথ্যা তথ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অনুসারীরা। একইভাবে মামুনুল হক অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনুসারী ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতেন। তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাই তার নিত্য কাজ।

হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে জন্মলগ্ন থেকে নারী বিদ্বেষের অভিযোগ আছে। একই ইস্যুতে ওয়াজে চরম নোংরা ভাষায় নারীদের আক্রমণ করেন মামুনুল হক। সহশিক্ষার বিরোধিতা করতে গিয়ে ছাত্রীদের চরিত্র হনন করেন তিনি।

মামুনুল হকের অসংখ্য ওয়াজের ভিডিও রয়েছে যেসব ভিডিও দেখা কিংবা শোনার অযোগ্য। এসব ওয়াজের ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী মামুনুল। ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করেন তিনি। কথায় কথায় ইসলাম ধর্মই একমাত্র ধর্ম বলে অন্য ধর্মকে ছোট করে বক্তব্য রাখেন। যারা গান করেন, নাচেন কবিতা আবৃত্তি করেন তাদের 'বাতিল' বলে ফতোয়া দেন তিনি। মামুনুল বলেন, 'বাতিলরা যদি একদিন গানের আয়োজন করে আপনারা ওয়াজ মাহফিল করবেন তিনটা।' ওয়াজে পহেলা বৈশাখ উদযাপনেরও তীব্র সমালোচনা করতে দেখা যায় মামুনুলকে। বাঙালির বর্ষবরণ উৎসবকে 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে অশ্লীলতা বেহায়াপনা আমদানি' বলে মন্তব্য করেন। একইভাবে সঙ্গীত, নৃত্যসহ সবধরনের শিল্পচর্চাকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেন। ২০২০ সালের নবেম্বর মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেবার হুমকি দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিলেন। তার ভাস্কর্যবিরোধী উস্কানিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়।

মামুনুলের হকের সহপাঠী রবরব প্রকাশনার স্বত্ত্বাধিকারী মাওলানা আব্দুল আজিজ গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে বলেন, 'মামুনুল হকের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও কামুক স্পৃহা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নতুন নয়। ১৯৯৪ সালে মোহাম্মদপুর জামিয়া রহমানিয়া

মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন সময়ে এক শিশুর সাথে বলাৎকারের অভিযোগে তাকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে শিশু বলাৎকারের বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা পাওয়ায় উক্ত মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিন্সিপাল) মুফতি মনসুরুল হক মামুনুলকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি শিক্ষকতার পেশায় মনোনিবেশ করেন কিন্তু তখনও তিনি নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। মামুনুল হক সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার জামিয়া নিজামিয়া বেতুয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার সময় নূরুল আলম নামে এক শিশুকে সমকামিতায় বাধ্য করেন। শিশুটি অন্যান্যদেরকে বিষয়টি অবহিত করলে মাদ্রাসা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত মাদ্রাসার মুহতামীম (অধ্যক্ষ) মাওলানা মাহমুদুল আলমের স্বাক্ষরে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।'

ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম-মহাসচিব, হেফাজতের প্রতিষ্ঠাকালীন সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব এবং হেফাজতের ১৩ দফার লেখক মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী গণকমিশনের অনুসন্ধানী দলের প্রতিনিধিকে ২০২১ সালের ২৬ নবেম্বর একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'হেফাজতের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছে। ঝর্ণা ছাড়াও মামুনুল হকের আরও কয়েক স্ত্রীর সন্ধান আমাদের কাছে রয়েছে। তারমধ্যে তার বাবা শাইখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের ছোট স্ত্রী অর্থাৎ তার সৎ মাকে জোরপূর্বক বিয়ে করে বর্তমানে লণ্ডনে রেখেছেন। এটা সামাজিক এবং ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জঘন্য ও ধিক্কারজনক।'

২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে মামুনুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ করে হেফাজতে ইসলাম। মোদির বিরোধিতায় প্রথমে ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে বিক্ষোভে সহিংসতা হয়, তার জেরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাণঘাতী সংঘাত হয়। এর প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হরতাল ডাকে হেফাজত, ওই হরতালকে ঘিরে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় সারাদেশে। এরপর ২০২১ সালের ৩ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার রয়েল রিসোর্টে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হককে 'ঘেরাও' করার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, মামুনুল এক নারীসহ আটক হয়েছেন। যদিও ওই নারীকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করেছেন মামুনুল হক। ওইদিন সন্ধ্যায় রিসোর্ট থেকে তাকে ছাড়িয়ে স্থানীয় একটি মসজিদে নিয়ে যান হেফাজত নেতাকর্মীরা।

ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে হেফাজতের নেতাকর্মীরা রিসোর্ট, স্থানীয় আওয়ামী লীগের কার্যালয়, বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। এছাড়া তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে। ওইদিন পুলিশের ওপর হামলা ও রিসোর্টে ভাঙচুরের অভিযোগে মামুনুল হকসহ ৮৩ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়। এছাড়া মামলায় ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামিও করা হয়।

২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হকের প্রধান লক্ষ্য ছিল বর্তমান সরকার পতনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মামুনুলের। বিশেষত জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। বর্তমান সরকারের পতনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখেছিলেন মামুনুল হক। এজন্য তিনি হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তার মতে, অন্য নেতাদের দিয়ে এই বিপ্লব সম্ভব নয়, তাই তিনি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনের নামে সহিংসতায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। মামুনুল মনে করতেন, বর্তমান সরকারের পতন হলে, কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে হলে হেফাজতের সমর্থন লাগবে। আর এই সরকার পতনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ হতো। শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর বাতিলের চেষ্টা নয়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারিভাবে আয়োজিত 'মুজিব চিরন্তন' অনুষ্ঠানও বানচালের পরিকল্পনা করেছিলেন মামুনুল হক। হেফাজতের সদ্যবিলুপ্ত এই যুগ্ম-মহাসচিব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে কথিত আন্দোলনের নামে নাশকতার পরিকল্পনা করেন।

'মামুনুল ভারতবিরোধী মতাদর্শীর লোকজন এবং সরকারবিরোধী দলের লোকজনকে একসঙ্গে করে নাশকতার পরিকল্পনা করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভারতে মুসলমানদের নির্যাতনে মোদি জড়িত বলে ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসেন। এই ইস্যুতে সারা দেশে তিনি বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতায় 'বড় মুভমেন্ট' করার পরিকল্পনা করেন। ২০১৩ সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সরকারের পতন ঘটিয়ে অন্য দল ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে ধারণা ছিল তাদের। ওই সময় হেফাজতের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে মামুনুল হক নিজেকে ছাড়া কোনো কিছু হবে না বলে বিশ্বাস ছিল তার। এ কারণে কৌশলে তিনি উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে থাকেন। প্রথমে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে মূর্তি বলে বিরোধিতা শুরু করেন। পরে মোদিবিরোধী শ্লোগান তোলেন।'[১০]

২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের সম্পৃক্ততা ছিল। ২০০৫ সালে তিনি পাকিস্তানে যান। সেখান থেকে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটান। এছাড়া সরকার উৎখাতে মামুনুল হক সব ধরনের পরিকল্পনাও করেন। ২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. হারুন অর রশীদ রিমান্ডে থাকা মামুনুল হকের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানে ৪০ দিন অবস্থান করেন মামুনুল হক। সেখান থেকে জঙ্গি ও উগ্রবাদী মতাদর্শ নিয়ে দেশে ফেরেন তিনি। মামুনুল হক হেফাজতকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছিলেন বলে

জানান হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফয়দা নেয়ার পায়তারা করছিলেন মামুনুল।'[১১]

৪. সুলতান যওক নদভী

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
উপদেষ্টা, নেজামে ইসলাম পার্টি

সুলতান যওক নদভী ১৯৩৯ সালে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানার অন্তর্গত বড় মহেশখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ আবুল খায়ের। তিনি স্থানীয় আশরাফুল উলুম ঝাপুয়া কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে চট্টগ্রাম জেলাধীন পটিয়া থানার অন্তর্গত আল-জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ ১৯৫৭ সালে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন।[১২]

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে সুলতান উপমহাদেশের বিভিন্ন মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হয়ে হাদিস শাস্ত্র ও জিহাদের উপর শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত থেকে 'নদভী' উপাধি লাভ করেন। আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (পাকিস্তান), আল্লামা ক্বারী তৈয়ব (ভারত), আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (সিরিয়া), প্রমুখ শিক্ষকদের কাছ থেকে হাদিসের সনদ লাভ করেন। হাদিস, উচ্চতর ইসলামী গবেষণা ও আরবী সাহিত্যের উপর শিক্ষকতা করেছেন বশরতনগর রশিদিয়া মাদ্রাসা (চন্দনাইশ), জামেয়া এমদাদিয়া মাদ্রাসা (কিশোরগঞ্জ), জামেয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা (বাবুনগর), আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া (চট্টগ্রাম) ও নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ (ভারত)-এ।

সুলতান যওক নদভী ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কারের ডাক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রামের জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তিনি। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দায়িত্ব পালন করেছেন ইন্টারন্যাশনাল স্কলার ইউনিয়ন, ইউ.কে, সৌদি আরবের গ্রাণ্ড মুফতি এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দাওয়াতী মিশন, আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা।

নদভী আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা বাংলাদেশ ব্যুরো চিফ, কওমি শিক্ষা বোর্ড 'ইত্তেহাদুল মাদারিস' বাংলাদেশে সভাপতি, মানারুশ-শরক (আরবী ম্যাগাজিন) ও মাসিক 'আল হক' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহ-সভাপতি, সম্মিলিত মাদ্রাসা সংগ্রাম পরিষদ, খতমে নবুয়ত পরিষদ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি তানজীমে আহলে হক ও মুসলিম উম্মাহ সংহতি পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামসহ ডজনখানেক কওমি মাদ্রাসার ট্রাস্ট সদস্য এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা।

মাওলানা সুলতান যওককে বাংলাদেশের জঙ্গি মৌলবাদী জিহাদী সাহিত্যের জনক বলা হয়। লেখালেখিতে তার দক্ষতা অন্যান্য জঙ্গি মৌলবাদী লেখক ও নেতাদের চেয়ে বেশি। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় প্রায় ত্রিশটির মতো বই লিখেছেন। এসবের ভেতর তাজকারায়ে আজিজ, মাদ্রাসা সংস্কারের ডাক, সহজ হজ্জ ও ওমরা, আমার জীবন কথা, দেখে এলাম জিহাদ ভূমি, আত তারিক ইলাল ইনশা, কাসাসুন নবীয়্যীন (৩ খণ্ডে) কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা, পাঠ্যসূচির একটি গ্রন্থ 'যা-দুত তালেবীন', নুখবাতুল হাদিস, তাযকারায়ে বোয়ালভী গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম।

সুলতান যওক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে জিহাদপন্থীদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম এবং সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একাধিকবার সফর করেছেন– মিয়ানমার, সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান, ওমান, ভারত, কাতার, লিবিয়া, মরক্কো, মালয়েশিয়া, মিসর, থাইল্যান্ড, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় আন্তর্জাতিক জিহাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার অনেক জিহাদী প্রবন্ধ। বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন করেছেন জিহাদের উপর বিশেষ রচনা। ১৯৮২ সালে লিবিয়া কর্তৃক আয়োজিত তিনি আন্তর্জাতিক আরবী সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে আন্তর্জাতিক জঙ্গি মৌলবাদীদের নজর কাড়তে সক্ষম হন। সে সুবাদে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করেন।

হেফাজতের উপদেষ্টা মাওলানা সুলতান যওক নদভী হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের কার্যকরী পরিষদের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পদে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তালেবানী আফগান সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন 'রিহলাতি ইলা আরদিল জিহাদ' নামে একটি বই, যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'দেখে এলাম জিহাদ ভূমি'।

যওক উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কওমি মাদ্রাসার দশজনের একটি প্রতিনিধি দল ১৯৮৮ সালের ২ মার্চ পাকিস্তান হয়ে আফগান সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেন ছাড়াও আফগানের হরকাতুল জিহাদের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক হরকাত নেতার সঙ্গেও সাক্ষাত করেন।' তিনি আফগান রণাঙ্গন সফরের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন— '১৯৮৮ সালের ২রা মার্চ বুধবার সকাল ৯টায় আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, করাচী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন আমাদের বিমানটি ল্যান্ড করলো, তখন দুপুর ১টা। আর পাকিস্তানে তখন ১২টা বেজেছে, বিমানের বাইরে আসতেই দেখতে পেলাম চারদিক আলো করা হাস্যোজ্জল অনেকগুলো চেনা মুখ। পাকিস্তান প্রবাসী বাংলাদেশি আলেম-উলামা, ছাত্র-যুবক, ঐ দেশি পরিচিতজন ছাড়াও আমাদের আমন্ত্রণকারী হরকাতুল জিহাদের সদস্যরা এসেছেন প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানাতে। প্রায় শ'দুয়েক অভ্যর্থনাকারীর মাঝে রাশেদ, হারুন, সুলায়মান, আমার ছোট ভাই তাহের কাওসার ছাড়াও আমার বহুসংখ্যক ছাত্রও ছিল। প্রীতি-সৌহার্দ্য আর উষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে পরিচিতিপর্ব শেষ করলাম।'

আফগানিস্তানে জিহাদে অংশগ্রহণের সময় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুলতান যওক তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'সন্ধ্যার সময় আমাদের শিবিরের পার্শ্ববর্তী বিরাট মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল। মসজিদটিতে ছিল আরব মুজাহিদে ভরা। মনে হয় যেন এটা আরব অঞ্চলের কোনো মসজিদ। এদের অনেকের সঙ্গেই অস্ত্র (কালাশনিকভ) লাইনের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো রেখেছেন তারা। প্রতিনিধি দলটি মসজিদে প্রবেশ করতেই ছোট মাইক্রোফোন হাতে এক যুবক এগিয়ে এল আমার দিকে। পরে জানতে পারলাম, তিনি আরব নেতা আবু আব্দুল্লাহ ওসামা বিন লাদেন। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলতে লাগলেন, আসুন মাওলানা। হাতে ইশারা করলেন মিহরাবের দিকে। তাদের সঙ্গে গিয়ে মাগরিব পড়লাম। নামাযের পর ঐ যুবনেতা প্রতিনিধিদলের আগমনের ঘোষণা দিয়ে দলের তরফ থেকে আমাকে কিছু বলার প্রস্তাব করলেন। আমি বাংলাদেশি মুসলিম জনগণের পক্ষ হতে সালাম ও শুভেচ্ছা জানালাম। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রেরণার উপর কিছু কথা বলে দায়িত্বশীল নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে কথা শেষ করলাম। কমান্ডার আবু আব্দুল্লাহ উসামা আমার বক্তব্যের উপর একটি পর্যালোচনা করলেন।

আলোচনায় ওসামা বিন লাদেন বললেন, 'বাংলাদেশি মাওলানা, আপনার জিহাদী বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার বিশ্বাস আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশেও একদিন সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন হবে। যে জিহাদে আল কায়েদার পক্ষ থেকে অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে। আপনাদের দায়িত্ব হল নিজ দেশে গিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া। আপনার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম বাংলাদেশ একটি জিহাদের দাওয়াত প্রচারের উর্বর ভূমি, আপনাদের মাধ্যমেই আল-কায়েদার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালনা করার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।'[১৩]

বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ড ও সশস্ত্র জঙ্গি প্রশিক্ষণ এবং রোহিঙ্গা জঙ্গি গোষ্ঠিদের তৎপরতা বিষয়ে তার আত্মজীবনীমূলক 'আমার জীবন কথা' গ্রন্থে লিখেছেন, '২৬ মার্চ ১৯৮৯ সাল সকালে মাওলানা সায়্যিদ সালমান নদভী (ভারতীয় মুজাহিদ নেতা) সাহেব কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সঙ্গে আমি ছিলাম। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফোর্স (ARIF) এর প্রধান জনাব নূরুল ইসলামের দাওয়াতে রোহিঙ্গা শরণার্থী মুজাহিদদের ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনের প্রোগ্রাম ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ আমীন নদভীর (ভারতের মুজাহিদ) পথনির্দেশে আমরা চললাম। ক্যাম্পের গেইটে উপস্থিত সশস্ত্র মুজাহিদরা সামরিক সালাম দিয়ে আমাদের কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানালো। তারা তাদের ছাউনির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। মাওলানা সালমান নদভী বক্তৃতা করলেন। দায়িত্বশীলদের পীড়াপীড়িতে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য শেষে কক্সবাজার ইসলামী সম্মেলন ও মুজাহিদ ভাইদের বৈঠকে রওয়ানা দিলাম। রাতে আমরা হোটেল কক্সবাজারের প্যানোয়াতে অবস্থান করলাম। ঐ এলাকার বিভিন্ন ছাত্র-শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব ও মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে পরবর্তী

জিহাদী প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের রূপরেখা জেনে নেন। এইভাবে মহেশখালী, ফটিকছড়ি, বাবুনগরী, হাটহাজারী ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জিহাদী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলাম।'[১৪]

৫. সাজিদুর রহমান

বর্তমান মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
কো-চেয়ারম্যান, আল হাইআতুল উলয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া

মাওলানা সাজিদুর রহমান ১৯৬৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার বেড়তলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ আলী ও মাতার নাম আয়েশা বেগম। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বর্তমান মহাসচিব ও কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সংস্থা আল হাইআতুল উলয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশের সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সিনিয়র সহ-সভাপতি, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শায়খুল হাদিস ও জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

সাজিদুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নাটাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৭৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার জামাতে ইয়াজদহমে ভর্তি হন। ৩ বছর পর তিনি জেলার সদর থানার অন্তর্গত বিরাসার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসা থেকে আঞ্চলিক শিক্ষাবোর্ড এদারায়ে তালিমিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কেন্দ্রিয় পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর তিনি দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৮৪ সালে উক্ত মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন।

মাওলানা সাজিদুর শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন নাজিরহাট বড় মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা করেন। এ মাদ্রাসায় ৩ বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসায় যোগ দেন। এখানে ৩ বছর শিক্ষকতা করে তিনি কাতার গমন করেন। সেখানে ৩ বছর একটি মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। একই বছর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পশ্চিম মেড্ডায় জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

২০২১ সালের ২ নভেম্বর তিনি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও আল হাইআতুল উলয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৯ নভেম্বর তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নির্বাচিত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর-এর সংসদ সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি র আ ম ওবায়দুল মুকতাদির লিখিত

'হেফাজতি তাণ্ডব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া' নামক পুস্তিকায় হেফাজতের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা সাজেদুর রহমান এর নেতৃত্বে ২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ যে নারকীয় তাণ্ডব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন– '২৬ মার্চ ছিল শুক্রবার। মসজিদগুলোর (বিশেষত বায়তুল মোকাররম মসজিদ) জুমার নামাজের সমাবেশের সুযোগ নিয়ে, বিভিন্ন মিথ্যাচার ও ভন্ডামির আশ্রয় নিয়ে তারা এক তাণ্ডব চালায়। এই তাণ্ডবের সাথে মিলে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে তার অনুবৃত্তি ঘটায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও এক ব্যাপক তাণ্ডব কর্ম পরিচালনা করে। বস্তুত: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ছিল ওদের টার্গেট। ওরা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় (কখনও স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে এমন উদাহরণ কেউ খুঁজে পাবে না)। তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ওরা সহ্য করতে পারেনি। তাই যেখানে যেখানে সম্ভব ওরা 'হাইয়া আলাল জিহাদ' শ্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হচ্ছে তাদের প্রধানতম কেন্দ্র।'

৬. আতাউল্লাহ হাফেজ্জী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
আমির, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন-এর আমির জামিয়া নুরিয়া কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসার মুহতামিম ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বর্তমান নায়েবে আমির মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী-এর জন্ম ১৯৪৮ সালের ১০ জানুয়ারি লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে। আতাউল্লাহ হাফেজ্জী-এর পরিচিতির মধ্যে মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে, খেলাফত আন্দোলনের আমির ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদ-এর উপদেষ্টা। অতীতের এইসব পরিচয়কে অতিক্রম করে বর্তমানে তিনি হেফাজতে ইসলামের অন্যতম নায়েবে আমির হিসেবে পরিচিত।

আতাউল্লাহ হাফেজ্জীর পরিচিতি বর্ণনা করতে গেলে তার বাবা হাফেজ্জী হুজুরের নাম চলে আসে। জঙ্গিবাদীদের প্রিয়ভাজন হিসাবেও প্রথমেই চলে আসে তার নাম। তিনি হরকাতুল জিহাদের আফগান ফেরতদের (মুজাহিদ) নিজের মাদ্রাসার ভিতরে আস্তানা গড়ার জন্য বিশাল স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। মুজাহিদদের মুখপত্র 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' পত্রিকা ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বন্ধ করে দেওয়ার পর আতাউল্লাহ হাফেজ্জীর বাবার "মাসিক পত্রিকা রহমত"কে মুজাহিদদের জন্য ২০০০ সালে দান করে দেন, যার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন আফগান ফেরত মুজাহিদ জঙ্গি মনযুর আহমদ।

দীর্ঘ এক দশক থেকেই হরকাতুল জিহাদের প্রচার-প্রকাশনাসহ যাবতীয় কার্যকলাপ আতাউল্লাহ হাফেজ্জী-এর জামিয়া নূরীয়া মাদ্রাসা থেকেই চালিয়ে আসছেন। এখনও মাসিক রহমত ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল রহমত ২৪ ডটকম পত্রিকার কর্মকাণ্ডের কার্যালয় তার মাদ্রাসায়। আফগান ফেরত মুজাহিদরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন

নামে রাজনীতির ময়দানে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। সর্বশেষ খেলাফত আন্দোলনকেই তাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে বেছে নিয়েছে। মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী খেলাফত আন্দোলনের জন্য রাজনীতি করলেও ক্ষমতার স্বার্থে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে জোট করতে কোনো সমস্যা হয়নি। যদিও তিনি সব সময় নারী নেত্রী এবং জামায়াত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে আসছেন।

রাজনৈতিক জীবন শুরু তার পিতা হাফেজ্জী হুজুরের হাতে গড়া সংগঠন খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তার পিতার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হওয়ায় তিনি খেলাফত আন্দোলনের সব কর্মকাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয়। তখন তিনি উক্ত জোটের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি মুফতি আমিনীর গঠিত জঙ্গি সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নেতা হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন। ঢাকা শহরে যত মৌলবাদী জনসভা হয় সকল জনসভায় মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। ২০১৩ সালের ৫ মে সরকার উৎখাতের জন্য হেফাজতে ইসলাম মতিঝিলের শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশ করে, তখন কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসা ছিল হেফাজতের নেতাদের প্রধান দুর্গ। তিনি বর্তমানে হেফাজতের নায়েবে আমিরের দায়িত্ব পালন করছেন।

তার পিতা মোহাম্মদুল্লাহ মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর এর মৃত্যুর পর তার ভাই মাওলানা ক্বারী আহমাদুল্লাহ আশরাফ জামিয়া নুরিয়া ইসলামিয়ার (মাদ্রাসা-ই নূরিয়া') মুহতামিম পদে নিযুক্ত হন। অসুস্থতা ও কর্ম অক্ষমতার কারণে ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধি সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলনের আমিরে শরীয়তের দায়িত্ব এবং ২০১৫ সালের ৬ আগষ্ট জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া (মাদ্রাসায়ে নূরিয়া) এর মুহতামিমের দায়িত্ব তার ছোট ভাই হেফাজতের বর্তমান নায়েবে আমির মাওলানা আতাউল্লাহ-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে, ১৯৯৪ সালে নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন ও ২০০১ সালের ফতোয়া বিরোধী আন্দোলনে তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দেন।

২০০৭ সালে দৈনিক প্রথম আলো কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা'র প্রতিবাদে সবধরনের মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ থাকার পরেও খেলাফত আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে সর্বপ্রথম তিনি ও তার বড় ভাইয়ের নেতৃত্বে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন এবং পরবর্তীকালে এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৭ সালে নারী নীতিমালা বাতিলের দাবীতে কোরাণ বিরোধী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন।

২০১৩ সালে তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদ-ব্লগারদের বিরুদ্ধে খেলাফত আন্দোলনের ব্যানারে তিনিই প্রথম আন্দোলনের ডাক দেন। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন 'হেফাজতে ইসলামে'র নেতৃত্বে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লে

হেফাজতের ব্যানারেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষায় পীর দেওয়ানবাগী, মাইজভান্ডারী, আটরশি, সুরেশ্বরীসহ বিভিন্ন পীরদের বিরুদ্ধে কওমিদেরকে উস্কানি দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেন।

৭. শহীদুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় নেতা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আল মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলামের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে মুফতি শহীদুল ইসলাম অন্যতম। ১৯৬০ সালের ১৫ মার্চ ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। হেফজ এবং লেখাপড়া জামেয়া আরাবিয়া গওহরডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ মাদ্রাসায়।

মুফতি শহীদুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী (দাওরায়ে হাদিস) পাশ করেন। এরপর ইফতা (ইসলামী আইন) বিষয়ে পাকিস্তানের করাচি জামেয়া বিন্নুরী টাউন মাদ্রাসায় পড়ার সময় আফগান, পাকিস্তান ও কাশ্মীর এবং বাংলাদেশি মুজাহিদদের সঙ্গে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী পাকিস্তান শাখার সদস্য হিসেবে সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন। আফগান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হয়ে সেখানে গিয়ে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আফগান জিহাদে সশস্ত্র বাংলাদেশি ৫ হাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুফতি শহীদুল ইসলাম অন্যতম নেতা ছিলেন। জিহাদ শেষে ১৯৯২ সালে ৩০ এপ্রিল হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ শাখা আত্মপ্রকাশ করে মুফতি শহীদুল ইসলাম সহ অন্যান্য জিহাদীর নেতৃত্বে। এই শিবিরে বহুল আলোচিত জঙ্গি আব্দুর রহমান ফারুকী, জঙ্গি আব্দুল হাই, জঙ্গি মনযুর হাসান সহ কয়েকজন আলোচিত আফগান ফেরত মুজাহিদ মুফতি শহীদুল ইসলামের সহযোদ্ধা ছিলেন।

শহীদুল ইসলাম ছাত্রজীবনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করেন। এ সংগঠন ছাড়াও তিনি সে সময়ে নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিস ও খেলাফত আন্দোলনের রাজনীতি করেছেন মুফতি শহীদুল ইসলাম। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসার পরিচালক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা। মুফতি আমিনীর মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির তিনি সহ-সভাপতিও নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন বহু বছর। ১৯৮৮ সালে প্রথম আল মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ নামে এনজি ও প্রতিষ্ঠা করেন মুফতি শহীদুল ইসলাম। এই সংস্থাটি প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এনজিও কার্যক্রমের আড়ালে তিনি হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন।

নব্বই দশকের শুরুতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মারকাজের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বাবর রোড ও শ্যামলীতে সংস্থাটির নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ওই সময়ে দেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অর্থ-সহযোগিতায় দিনে-দিনে পরিসর বাড়ে সংস্থাটির।

এই অর্থায়নে সৌদি আরব, কাতার, দুবাই, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ছিল। মারকাজের অর্থায়নে দুর্গম অঞ্চলে মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের কাজও করা হয়েছে এই এনজিওর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এসবের আড়ালেই হরকাতুল জিহাদসহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে।

২০০১ সালে নড়াইল-২ আসন থেকে উপ-নির্বাচনে তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের (অবিভক্ত) সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মুফতি শহীদুল ইসলাম। উপ-নির্বাচনের আগে মূল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন চার হাজার ভোটের ব্যবধানে। ওই নির্বাচনের পরই আলোচনায় আসেন মুফতি শহীদুল। নির্বাচনের পর তিনি প্রয়াত শায়খুল হাদিস আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মনোনীত হন।

মুফতি শহীদুল ২০০১ সালের নির্বাচনের ১ মাস আগে খেলাফত মজলিসে যোগ দিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান মুফতি শহীদ। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা করতে চাইলে নির্বাচন কমিশন তা বাতিল করে। ২০১১ সালের ২১ জুলাই দলটির নায়েবে আমিরের পদ থেকে পদত্যাগ করে ওই দলের অন্তত ১৫ জন নেতাকে নিয়ে তিনি গণসেবা আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন এই রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান হলেন খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি শহীদুল ইসলাম।

৮. নুর হোসাইন নুরানী

কেন্দ্রীয় নেতা, হেফাজতে ইসলাম
আমির, খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশ

মাওলানা নুর হোসাইন নুরানী ১৯৭১ সালে মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার মুন্সিরহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা ও খতমে নবুয়ত আন্দোলন বাংলাদেশের আমির। খতমে নবুয়ত-এর ব্যানারে কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তার রাজনীতি শুরু। তিনি পটিয়া মাদ্রাসা থেকে হেফজ কালামুল্লাহ শেষ করে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকেই দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। জঙ্গিবাদী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করে খুব অল্প সময়ে বিতর্কিত হওয়া কয়েকজন মাওলানার মধ্যে নুর হোসাইন নুরানী অন্যতম।

বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানীবিরোধী জঙ্গি মিছিল, কাদিয়ানী মসজিদে হামলা, কাদিয়ানীদের মসজিদের সাইনবোর্ড উপড়ে ফেলে, তার দলের পক্ষ থেকে নিজেদের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়াসহ নানাবিধ অসাংবিধানিক জঙ্গি কর্মসূচীর মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন নুর হোসাইন নুরানী। ২০০৩ সালে 'আন্দোলন সমন্বয়

কমিটি' নামে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেও প্রথমে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। পরে নতুন পরিকল্পনা করে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের উগ্রবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এক সময় 'খতমে নবুয়ত'-এর ইন্টারন্যাশনাল কমিটির আমির সৌদি নাগরিক আব্দুল হাফিজ আল মক্কীর সাক্ষাৎ পান। নূরানীর দাওয়াতে আল মক্কী ২০০৪ সালে ১০ মার্চ সরাসরি বাংলাদেশে এসে তার সমন্বয় কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'খতমে নবুয়ত আন্দোলন বাংলাদেশ' হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমোদন দিয়ে যান। সেই সুযোগ এবং দেশের সাধারণ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে কিছু জঙ্গি মিছিল মিটিং করে দেশ বিদেশ থেকে অর্থ এনে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন– এমন অভিযোগ করেন তাদের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা সোলাইমান। পরবর্তীকালে সংগঠনের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দলের একাধিক নেতা দল থেকে বের হয়ে নতুন দল গঠন করেছেন।

হেফাজত নেতা মুফতি নূর হোসেন নূরানী ওয়াজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ান বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ২০২০ সালের ১৩ই নভেম্বর 'হাতপাখা মিডিয়া' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'আমি আজকে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি বঙ্গবন্ধুর সুসন্তান নাকি কুসন্তান? যদি কুসন্তান হন তবে আমাদের কোনো পরামর্শ আপনার শোনার দরকার নাই। যা মন চায় করেন। মূর্তি বানান আমরা তা ভেঙে ফেলে দেব। আর যদি সুসন্তান হন তবে আমাদের পরামর্শ হলো মূর্তি না বানিয়ে ওলামায়ে একরামগণ কিভাবে প্রস্তাব করেছেন সেইভাবে মিনার বানান। আপনার সবচেয়ে প্রিয় রাষ্ট্র ভারতে তাজমহল আছে। পর্যটক যায়। আপনি একটা মুজিব মিনার তৈরী করেন। সেই মিনার ৩৬০ ফুট উঁচু করেন। মক্কা শরীফের ঘড়ি টাওয়ারের মত ঘড়ি দেন। যেন ওইদিকে মাওয়াঘাট, এইদিকের টঙ্গীবাসী এই ঘড়ি দেখতে পায়। আর ডিজিটাল মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সেই মিনার থেকে চালু করেন। আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর সুসন্তান হন তবে শোনেন, পাঁচ ওয়াক্ত আজান শোনার পর আপনার বাবা সওয়াব পাবে কবর থেকে।

'আর মূর্তি যদি বানান, পারবেন না চ্যালেঞ্জ করে বলছি। এয়ারপোর্ট গোলচত্তর মোস্ট ইন্টারন্যাশনাল পয়েন্ট– সেখানে পারে নাই মূর্তি বানাইয়া রাখতে, ভেঙে দিয়েছি। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি বাহাদুরি দেখান তবে আপনাকে দেখে নেয়া হবে ইনশাল্লাহ। মূর্তি বানালে সে মূর্তি থাকবে না। বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেব।'...

'২০২১ সালের ২ এপ্রিল হেফাজতের হরতালের দিন মুন্সিরহাটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে নিমকহারাম ও মীরজাফর বলে মন্তব্য করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি যে ১৮ জনের রক্ত ঝরালেন সে রক্তের কি ক্ষমতা আপনি ৬ মাসের মধ্যেই তা টের পাবেন।' তিনি বলেন, 'মোদীকে এনে যারা দেশকে কসাইখানা বানিয়েছে তাদের এদেশে ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।'[১৫]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে ৬ মাসের মধ্যে সরকার পতনের হুমকি দেওয়া হেফাজত নেতা ও খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের প্রধান মুফতি

নূর হোসাইন নূরানীকে ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার মুন্সিরহাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

৯. নুরুল ইসলাম খান সুনামগঞ্জী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম, বাংলাদেশ ও
সহসভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং সুনামগঞ্জ জেলার দারুল উলুম দরগাহপুর মাদ্রাসার মহাপরিচালক মাওলানা নুরুল ইসলাম খাঁন ১৯৪২ সালে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার ১১নং পাথারিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গাজীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান সহ-সভাপতি। সুনামগঞ্জের দরগাহপুর মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদিস তিনি। জেলার জমিয়তের দীর্ঘ দিনের সভাপতি ছিলেন তিনি।

নুরুল ইসলাম প্রাথমিক লেখাপড়া শেষে সুনামগঞ্জের জামেয়া ইসলামিয়া আরবিয়া রামনগর মাদ্রাসায় উচ্চমাধ্যমিক ১ম বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে সিলেটের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম দরগাহে ভর্তি হন। সেখানে উচ্চমাধ্যমিক ২য় বর্ষ থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত সমাপ্ত করেন।

তৎকালীন সময়ে নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সমাজের একজন কর্মী হিসাবে মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু তার। নেজামে ইসলাম পার্টি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন করেছিল নুরুল ইসলাম। সেই নির্বাচনে পার্টির ৩২ জন এমপি হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর যখন হাফেজ্জী হুজুর নতুন করে তথাকথিত ইসলামী রাজনীতির দ্বার খুললেন, খেলাফত আন্দোলনের নামে তাওবার ডাক দিলেন, তখন মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর এর সঙ্গে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে জড়ান। কিছুদিন খেলাফত আন্দোলন সুনামগঞ্জ জেলার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নির্বাচনী কাজেও ছিল নুরুল ইসলাম খানের উপস্থিতি। ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠন করলে শুরু থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত হন তিনি এবং সুনামগঞ্জ জেলার দায়িত্ব পালন করেন। পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

QAWMI TV নামে ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মাওলানা নুরুল ইসলাম সুনামগঞ্জী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নামে ভাস্কর্য না বানিয়ে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করুন। মানুষ বা অন্য যেকোনো প্রাণীর ভাস্কর্য আর মূর্তি দুটোই শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ (হারাম)। এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। পূজার উদ্দেশ্যে না হলেও তা সন্দেহাতীতভাবে নাজায়েজ ও স্পষ্ট হারাম এবং কঠোরতর শাস্তিযোগ্য গুনাহ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য মূর্তি নয়, স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ

করুন। মসজিদ আল্লাহর ঘর। স্মৃতি ধরে রাখতে ভাস্কর্য বা মূর্তি নির্মাণ করা ইসলামে হারাম। ভাস্কর্য এবং মূর্তি এক ও অভিন্ন, এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ এটার পূজা করুক, আর না করুক ইসলামের দৃষ্টিতে কোন প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম। বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত হিতাকাঙ্খীরা কখনো ভাস্কর্য- মূর্তিকে সমর্থন করতে পারে না।'

১০. মুফতি মুবারকুল্লাহ

কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মুহতামিম (মহাপরিচালক) মুফতি মুবারকুল্লাহ ১৩৬০ বাংলা ২৪ অগ্রহায়ণ হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী ক্বারী মুলফতুল্লাহ, দাদা নিয়াজ মোহাম্মদ। তারা ভাই-বোন ছয় জন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ।

মুবারকুল্লাহ সর্বপ্রথম দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মালিহাতা তাজুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে জামাতে পানজাম (১০ম শ্রেণি) পর্যন্ত অধ্যায়ন করার পর ১৯৭৩ সালে জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামাতে চাহারম (একাদশ শ্রেণী) ভর্তি হয়ে উক্ত জামিয়া থেকে ১৯৭৭ সালে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন।

জামিয়া ইউনুছিয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস শেষ করার পর তৎকালীন একমাত্র ইফতা বিভাগ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে ইফতা ও পুনঃ দাওরায়ে হাদিসের ডিগ্রি অর্জন করেন। জামিয়া আরজাবাদ ঢাকার মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমীর নিকট উচ্চতর তাফসীরের বিশেষ কোর্স সমাপ্ত করেন ও ইসলামী রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা (ঢাকা) থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া থানাধীন শ্রীপুর আলীয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর কুমিল্লা জেলাধীন ধামতী আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৯১ সালে কামিল পাস করেন।

১৯৭৮ সালে জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের পাশাপাশি সহকারী মুফতি ও এদারায়ে তালিমিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সহকারী নাজেমের দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর ২০১০ থেকে উক্ত জামিয়ার মহাপরিচালক ও প্রধান মুফতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ বেফাক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও এদারায়ে তালিমিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সিনিয়র সহ-সভাপতি। ।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা ২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়। এসব

ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন থানায় মোট ৫৬টি মামলা করা হয়। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় ৪৯টি, আশুগঞ্জ থানায় ৪টি, সরাইল থানায় ২টি এবং আখাউড়া রেলওয়ে থানায় ১টি মামলা করা হয়। এসব মামলায় ৪১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরো ৩০-৩৫ হাজার লোককে আসামি করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সাজিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি মুবারকুল্লাহ সহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরো এক থেকে দেড়শ জনকে আসামী করে মামলা: ২০২১ সালের ১ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি জমা করেন। সাংসদ মোকতাদির চৌধুরীর পক্ষে তার আইনজীবি ও শহর আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল জব্বার মামুন মামলাটি সদর মডেল থানায় দাখিল করেন।

২০২১ সালের ৩০ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নারকীয় তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলামের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার নেতাকর্মীরা। তারা তাণ্ডব চালিয়ে বৈধ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে। এরই অংশ হিসেবে আগ্নেয়াস্ত্র, গানপাউডার সহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করেন। এর আগে হেফাজতে ইসলামের জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সাজিদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুবারক উল্লাহ সহ অন্যান্য আসামীদের নির্দেশে বিভিন্ন ফেইসবুক পেজ, আইডি ও নিউজপোর্টালে সাইবার সন্ত্রাস সংগঠিত করে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক, বিদ্বেষ ও ঘৃণামূলক স্ট্যাটাস প্রদান করে জনসাধারণের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটে।'

১১. শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী

বর্তমান আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট

মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন দৌলতপুর ইউনিয়নের বাবুনগর গ্রামে ১৯৩৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা হারুন বাবুনগরী। তিনি আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসা ফটিকছড়ি, চট্টগ্রামের মহাপরিচালক এবং চারদলীয় জোট সরকারের আমল থেকে দীর্ঘদিন ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র নায়েবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পর বর্তমান উপদেষ্টা পদে রয়েছেন।

মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন তার পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আজিজুল উলুম বাবুনগরে। ১৯৪৯ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে আসেন হেফাজতের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী

মাদ্রাসায়। সেখানে তিনি দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান ভারতের দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসায়। এখান থেকে লেখাপড়া শেষ করে মাওলানা বাবুনগরী দেশে এসে তার পিতার মাদ্রাসা আজিজুল উলুম বাবুনগরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তার পিতা মাওলানা হারুনের মারা যাওয়ার পর তিনি সেই মাদ্রাসার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্বে আছেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– আহমদ শফী, নুরুল ইসলাম জদীদ, মুফতি আহমদ উল্লাহ প্রমুখ।

যুদ্ধাপরাধী সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীর আস্থাভাজন মুহিবুল্লাহ ছাত্রজীবন থেকে উগ্র ছিলেন। তার উগ্রতার কারণে হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফীও তাকে ভয় পেতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। সর্বপ্রথম তিনি 'নেজামে ইসলাম পার্টিতে' যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি 'নেজামে ইসলাম পার্টির' কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারক। ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতি আমিনী গ্রুপ)-এর উপদেষ্টা। তিনি জামায়াত-বিএনপি জোট-এর কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ বৃহত্তর ফটিকছড়ির সিনিয়র উপদেষ্টা।

মাওলানা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী, তার পিতা হারুন বাবুনগরী এবং তার ভাগ্নে হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত সাবেক আমির জুনায়েদ বাবুনগরী ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করেন। সেই বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ের গহীন অরণ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন এবং হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন।

লেখক মিজান সিরাজ ফেনবী 'ধর্মের নামে ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচন' বইতে লিখেছেন, '১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ফটিকছড়ি-মিরসরাই নির্বাচন এলাকা থেকে মুহিবুল্লাহ বাবুনগরীর পিতা হারুন বাবুনগরী যখন নেজামে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফজলুল হক বিএসসির বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছিলেন তখন নির্বাচনী জনসভায় (মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ) মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী বলেছিলেন, যদি আপনারা আমার পিতা হারুন বাবুনগরীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা নির্বাচনের পরে বুলডোজার দিয়ে এই দরবার শরীফের (মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ) সমস্ত মাজার-বিল্ডিং ভেঙে ফেলব।'[১৬]

তৎকালীন নির্বাচনে হারুন বাবুনগরী পরাজিত হয়ে জামানত হারান। হেফাজতের মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী ২০০০-২০০১ সালের দিকে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ব্যানারে (মুফতি আমিনীর মৌলবাদী সংগঠন) তৎকালীন আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন প্রকাশ্যে লালদীঘি এবং জমিয়াতুল ফালাহ ময়দানে। তিনি সব সময় সব জায়গায় আওয়ামী লীগ, প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে নাস্তিক-মুরতাদ এবং কাফের ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

হেফাজতের এই আমির শুধু আওয়ামী লীগ, প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের নাস্তিক-মুরতাদ ফতোয়া দেন না— তার মতের অমিল হলেই তারা নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যান। বর্তমানে তিনি বাবুনগর মাদ্রাসা ছাড়াও আরো অনেক কওমি মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

কওমি ঘরানাদের নিকট তিনি বাংলাদেশের প্রথম সারির মুরুব্বীদের মাঝে অন্যতম এবং জামিয়া ইসলামিয়া বাবুনগরের মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইসলামবিদ্বেষী শক্তি ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলার নামে তিনি ইসলামী রাজনীতিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি চরমোনাইর পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করিম জীবদ্দশায় ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। মুফতি আমিনীর জীবদ্দশায় তিনি ইসলামী ঐক্যজোট এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১২. আহমদ আবদুল কাদের

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
মহাসচিব, খেলাফত মজলিস

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির আহমদ আবদুল কাদের ১৯৫৫ সালের ৩১ জুলাই হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার ভাঙ্গার পাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আহমদ আব্দুল কাদের জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। এক পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে বিরোধে জড়িয়ে তিনি ছাত্র শিবির থেকে পদত্যাগ করে ইসলামী যুব শিবির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর তিনি মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী, মাওলানা আজিজুল হক, সৈয়দ ফজলুল করিম ও মুহিউদ্দীন খান সহ প্রমুখ দেওবন্দি আলেমদের সান্নিধ্যে আসেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী ঐক্যজোট সহ প্রভৃতি দলের পর বর্তমানে তিনি খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নায়েবে আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নুসরা নামক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সত্তরের দশকের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ছিলেন আবদুল কাদের। তিনি ১৯৭০ সালে সরাইল অন্নদা হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি ও ১৯৭২ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস.সি পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) ও ১৯৮০ সালে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্স্যুরেন্স এন্ড তাকাফুল এর উপর গবেষণা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি দুইবার ডাকসু নির্বাচনে জি.এস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ভোটে হেরে যান। ড. আহমদ আব্দুল কাদের ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ৮০'র দশকের শুরুতে তিনি ইসলামী যুব শিবির নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবগঠিত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮৯ সালে বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠনকে একত্রিত করে খেলাফত মজলিস গঠন করেন। তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-মহাসচিব ও পরে নায়েবে আমির

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি খেলাফত মজলিশের মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০০ সালে চারদলীয় জোট গঠনেও রয়েছে তার বিশেষ ভূমিকা। ২০ দলীয় জোটেরও অন্যতম শীর্ষনেতা আহমদ আবদুল কাদের।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর বলয় থেকে বের হয়ে একটি বিকল্প ইসলামী ফ্রন্ট গঠনে নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছেন। এরই অংশ হিসেবে গঠিত হয় বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট। তিনি উক্ত জোটের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন এবং শায়খুল হাদিস ও মুফতি আমীনি কারাগারে থাকাবস্থায় ইসলামী ঐক্যজোটের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৯০ দশকের শুরুতে ভারতের বাবরী মসজিদ অভিমুখে লংমার্চের নেতৃত্বে ছিলেন আহমদ আবদুল কাদের। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসাবে চুনারুঘাট-মাধবপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৮৩ সালে ঢাকার আইডিয়াল কলেজে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০০০ সালে পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র একাধিকবার সফর করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখেন। দেশ-বিদেশে সফরের সময় বিভিন্ন উগ্রবাদী ইসলামী নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

জুনায়েদ বাবুনগরীর নেতৃত্বাধীন হেফাজতের বিলুপ্ত কমিটিতে বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক খেলাফত মজলিসের ছয়জন নেতা স্থান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন নায়েবে আমির পদে মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের। ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মেয়ের বাসা থেকে হেফাজতে নায়েবে আমির আহমদ আবদুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ২৫ এপ্রিল ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসমিন আরা তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রাজধানীর পল্টন থানায় নাশকতার মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে নাশকতার মামলারও অন্যতম আসামি। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর আট মাস পর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান হেফাজতের নায়েবে আমির আহমদ আবদুল কাদের।

১৩. মাহফুজুল হক

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' (বেফাক)-এর মহাসচিব, ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মাহফুজুল হক ১৯৬৯ সালের ১৫ নবেম্বর ঢাকার আজিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ ভাইবোনের সংসারে তিনি অষ্টম। বাবা

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক-এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এর পর আজিমপুর চাঁনতারা মসজিদ সংলগ্ন হিফজ মাদ্রাসায় হাফেজ আবদুল মতিন- এর কাছে কোরাণ হেফজ করেন।

১৯৮৬ সালে লালবাগ মাদ্রাসায় বিভক্তির ফলে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ভর্তি হন বড়কাটারা মাদ্রাসায়। লালবাগ জামিয়া আরাবিয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসা একাংশ ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে মোহাদী হাউজিং মোহাম্মদপুরে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক প্রতিষ্ঠা করেন জামিয়া মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা। ফলে মুফতি মাহফুজুল হক বড়কাটারা আর না গিয়ে চলে যান জামিয়া মোহাম্মাদীয়ায়। এখানে ২ বছর মাদ্রাসা চলার পর শায়খুল হাদিস জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া নামে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ সংলগ্নে মাদ্রাসা স্থানান্তর করেন। মুফতি মাহফুজুল হকও চলে আসেন জামিয়া রাহমানিয়ায়। অতপর এই জামিয়া রাহমানিয়া থেকেই ১৯৯১ সালে দাওরায়ে হাদিস শেষ করে 'মাওলানা' সনদ লাভ করেন। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয়বার দাওরায়ে হাদিস পড়ার উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দুদের হাতে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়। এর প্রতিবাদে তার বাবা শায়খুল হাদিস ভারত অভিমুখে লংমার্চের ডাক দেন। তার এ কর্মসূচি বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ কারণে শায়খুল হাদিস- এর সন্তান হিসেবে মুফতি মাহফুজুল হকের নিরাপত্তা নিয়ে দেওবন্দের উস্তাদগণ বিশেষ করে ওয়াকফ দেওবন্দের মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মিরী উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আগলে রাখেন। ১৯৯২ সালে দেওবন্দ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো দাওরায়ে হাদিস শেষ করে ' কাসেমী ' সনদ লাভ করেন।

২০০০ সালে শায়খুল হাদিস জামিয়া রাহমানিয়া থেকে চলে আসেন। রাজনৈতিক কারণে সরকারের প্রচ্ছন্ন সহায়তা ও প্রশাসনের মদদে সৃষ্ট পরিবেশের কারণে তিনি রাহমানিয়া ছেড়ে মোহাম্মদপুরের কুবা মসজিদকে কেন্দ্র করে হাদিসের দল অব্যাহত রাখেন এবং জামিয়া রাহমানিয়া হাকিকিয়া নামে মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। জামিয়া হাকিকিয়ার মুহতামিম হিসেবে নিযুক্ত হন মুফতি মাহফুজুল হক।

২০০১ সালের শেষের দিকে শায়খুল হাদিস পুনরায় জামিয়া রাহমানিয়ায় ফিরে আসেন। তখন মুফতি মাহফুজুল হক প্রথমে ভাইস প্রিন্সিপাল ও ২০০২ সাল থেকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পান।

তিনি কওমি মাদ্রাসাগুলোর নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার যুগ্ম-মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন ২০০৫ সালের কাউন্সিলে। যুগ-মহাসচিব হিসেবে চৌদ্দ বছরের বেশি সময় বেফাকে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। কওমি মাদ্রাসার বোর্ড নিয়ন্ত্রক সংস্থা আল হাইআতুল উলয়ার তিনি একজন কেন্দ্রীয় সদস্য।

হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষকতা হেফাজত নেতা মাওলানা মাহফুজুল হকের প্রধান পেশা হলেও তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তার পিতা মাওলানা আজিজুল হক যেমন নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস

বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোট এর নামে বিভিন্ন ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ছিলেন, তেমনিভাবে তিনিও কয়েকটি ইসলামী মৌলবাদী দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন, সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশে খেলাফত মজলিসে সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৯১ সালে কয়েকটি সমমনা ইসলামী দল নিয়ে যখন ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করা হয় তখন তার পিতা ঐক্যজোটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবার পর মাওলানা মাহফুজুল হকের দাপট বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাহফুজুলের ছত্রছায়ায় জামেয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা হয়ে উঠে জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা। ঢাকা বিভাগের মধ্যে তিনি প্রভাবশালী নেতাদের অন্যতম। হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিচালনা করার শুরুর দিকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা পেয়েছে শায়খুল হাদিস ও তার ছেলে হেফাজত নেতা মাওলানা মাহফুজুল হক এর কাছ থেকে।

তিনি জঙ্গি সংগঠন হরকাত নেতাদের সঙ্গে আফগান-কাশ্মির, পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করেছেন। আফগান ফেরত জঙ্গিরা যখন মোহাম্মদপুর মাদ্রাসায় নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এই হেফাজত নেতার নাম সবার আগে উচ্চারিত হত। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হুজি নেতা মুফতি হান্নান, মুফতি আবদুল হাই, মুফতি আবদুস সালাম, মাওলানা শেখ ফরিদ, মাওলানা ইয়াহইয়া, পলাতক আসামী মাওলানা তাজউদ্দীন ও আব্দুর রউফসহ উচ্চ পর্যায়ের হরকাতুল জিহাদের নেতারা তার ঘনিষ্ঠবন্ধু ছিলেন।

২০১৭ সালের ১২ জানুয়ারি দৈনিক সংগ্রামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হেফাজতের ইসলামের নায়েবে আমির ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক বলেছেন, পাঠ্যসূচিতে ইসলাম বিরোধী বিষয় বাদ দিতে হবে মূর্তি স্থাপন মানা হবে না। ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন হবে। সে ক্ষেত্রে পূর্বের পাঠ্যসূচির আংশিক পরিবর্তন করলেও এখনো শিরকী বিষয় রয়েই গেছে। নতুন পাঠ্যসূচিতে আগের কিছু বিষয় অর্ন্তভুক্ত হওয়াতে বামপন্থিদের গাত্রজ্বালা শুরু হয়েছে। বামপন্থিরা ইসলামের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই বলবে ও করবে তা কখনো মেনে নেয়া হবে না। সিলেবাস নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পরিণতি ভালো হবে না। বামপন্থিদের মোকাবেলা করা হবে এবং তাদের কর্মসূচির বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচি নিয়ে ইসলামপ্রিয় তাওহিদী জনতা মাঠে নামবে।

'তিনি আরো বলেন, মহানবী সা. বলেছেন তিনি পৃথিবীতে এসেছেন মূর্তি ও বাদ্যযন্ত্রকে ধ্বংস করতে। অথচ দেশের সুপ্রিম কোর্টের সামনে গ্রীকনারীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটা ইসলাম ও মুসলমানরা সহ্য করতে পারে না। অবিলম্বে মূর্তি সরাতে হবে। অন্যথায় এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তিনি উল্লেখ করেন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান ফটকে হযরত মুহাম্মদ সা. সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা' লেখা রয়েছে। জাপানের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে পবিত্র কোরাণের আয়াত

(বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত) উল্লেখ রয়েছে। তাহলে ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সামনে কেন মূর্তি থাকবে। কোনোভাবেই এটা মানা হবে না।

'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ, মাওলানা আতাউল্লাহ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা কুরবান আলী, মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ, অফিস ও সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান হেলাল, সহকারী প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা হারুনুর রশীদ ভূইয়া, নির্বাহী সদস্য মাওলানা মুখলিসুর রহমান কাসেমী প্রমুখ।'

১৪. উবায়দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

হেফাজতে ইসলামের উপদেষ্টা মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক ১৯৪৭ সালের ৯ আগস্ট সিলেট জেলার কানাইঘাট থানাধীন আকুনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আল্লামা শফিকুল হক আকুনি। দাদার নাম মাওলানা ইবরাহীম আলী। নয় ভাইবোনের মাঝে তিনি সবার বড়।

পিতা আল্লামা শফিকুল হক প্রতিষ্ঠিত নিজ গ্রামের মাজাহিরুল উলুম আকুনি মাদ্রাসায় মকতব থেকে মেশকাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর দারুল উলুম চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৯ সালে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগে সময় দেন। বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার নামে সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতা প্রচার করতেন উবায়দুল্লাহ ফারুক।

এরপর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ফাতেহপুর মাদ্রাসায় এবং ১৯৭৩ সালে ভারতের আসাম প্রদেশের নোয়াগাং মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। কর্মজীবনের বিরতি দিয়ে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত দুই বছরে উচ্চতর পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। ১৯৭৬ সালে মাওলানা ফারুক দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৭ সালে হজ্জে গমন করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪-৮৭ সাল পর্যন্ত মালিবাগ জামিয়ায়, ১৯৮৭-৯৪ সাল পর্যন্ত তার পিতার প্রতিষ্ঠিত নিজ গ্রামের মাজাহিরুল উলুম আকুনি মাদ্রাসায়, ১৯৯৫ থেকে বারিধারা জামিয়ায় এবং মাঝে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত জামিয়া সুবহানিয়ায় থেকে পুনরায় বারিধারা জামিয়ায় ফিরে আসেন এবং অদ্যাবধি জামিয়ার শাইখুল হাদিসের দায়িত্বে আছেন।

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার সাবেক ও বর্তমান ভারতে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মাওলানা জিএফএম সাইদুল আলম গণকমিশনের তদন্ত কমিটিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, '১৯৬৬ সাল থেকে প্রায় পাঁচ দশক অবধি তিনি

এদেশের ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত। মূলত বাবার হাত ধরে ছাত্রকাল থেকেই তিনি জমিয়তের সক্রিয় কর্মী। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় দুই যুগ ধরে তিনি জমিয়তের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর সেচ্ছায় পদ ছেড়ে দেন। বর্তমানে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জামিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের শতবর্ষী সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাওলানা ফারুক তিনবার সৌদি আরব সফর করেন, একাধিকবার পাকিস্তানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সফর করেন এবং শিক্ষামূলক, সাংগঠনিক ও তাবলীগ সংকটকে সামনে রেখে তিনি বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের মুখপাত্র হয়ে অসংখ্যবার ভারত সফর করেন।

১৫. শায়খ জিয়া উদ্দীন

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

হেফাজতে ইসলামের উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন ১৯৪১ সালের ৪ এপ্রিল সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কাকরদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুকাদ্দাস, মাতার নাম খায়রুন্নেছা বেগম। তিন ভাই, দু'বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি ১ ছেলে এবং ৬ মেয়ের পিতা। ছেলে সাইফুল আলম ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা। তার একজন জামাতা মাওলানা ফয়যুল হক আব্দুল আজিজ বৃটেনের একজন উগ্রবাদী ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

শায়খ জিয়া উদ্দীন অক্ষরজ্ঞান এবং বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ নিজগৃহে মা-বাবার কাছেই অর্জন করেন। এরপর গ্রামের মসজিদে মক্তবশিক্ষার মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৫৩ সালে ভর্তি হন গ্রামের পাঠশালায়। তিন বছর এখানে লেখাপড়া করে ১৯৫৫ সালে প্রাইমারি শিক্ষার সমাপ্তি টানেন।

১৯৫৬ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ঈদগাহ বাজার মাদ্রাসায় সাফেলা দুওম (৫ম শ্রেণি) পড়েন। পরের বছর দারুল উলুম দেউলগ্রাম মাদ্রাসায় সাফেলা সুওম জামাতে ভর্তি হন। দেউলগ্রাম মাদ্রাসায় সানবী দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত লেখাপড়া করে ১৯৬০ সালে গাছবাড়ি জামিউল উলুম মাদ্রাসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে দু'বছর লেখাপড়া করে ১৯৬২ সালে হাটহাজারী চলে যান। ভর্তি হন হেদায়া আউয়ালাইন জামাতে। ১৯৬৫ সালে দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। পরের বছর হাটহাজারীতেই ইলমে তাফসীরে তাখাসসুস করে শিক্ষাজীবনের ইতি টানেন।

কর্মজীবনে মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। হাটহাজারী থেকে হাদিস শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৬৭ সালে

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুরে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৬৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১০ সালে শিক্ষা সচিবের পাশাপাশি তিনি জামিয়ার মুহতামিম পদেও অধিষ্ঠিত হন।

২০২০ সালের ২০ অক্টোবর অনলাইন নিউজ পোর্টাল উম্মাহ২৪ ডটকমের -এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'শিক্ষকতার পাশাপাশি মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক কাজেও জড়িত। হাটহাজারীতে থাকাকালীন আইয়ুব আমলে মুসলিম পার্সোনাল ল' এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। পরের বছর ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামে মাইজভান্ডারীদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন মারাত্মকভাবে আহত হন।

'নব্বই'র দশকে তিনি বিয়ানীবাজারে ইসমতে আম্বিয়া ও খতমে নবুওত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এসময় তার তত্ত্বাবধানে ইযহারে হকের ব্যানারে বিয়ানীবাজারে খতমে নবুওত ও ইসমতে আম্বিয়া-আদালতে সাহাবা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তসলিমা বিরোধী আন্দোলন, শাবিপ্রবির নামকরণের আন্দোলন, ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি সিলেটে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। ২০০৫ সালে ভারতীয় নদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে জাতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আহুত ঐতিহাসিক টিপাইমুখ লংমার্চে তিনি সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালের ৮ডিসেম্বর জমিয়তের ডাকা টিপাইবাঁধ অভিমুখে ঐতিহাসিক রোডমার্চের আহবায়ক ছিলেন তিনি।

'২০০৮ সালে কোরাণ বিরোধী নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিরুদ্ধে সিলেটে 'কোরাণী আইন সংরক্ষণ কমিটির' আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। ২০১৩ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি নির্মাণের বিরুদ্ধে শাহজালাল ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটির ব্যানারে আন্দোলন করেন।'[১৭]

২০১৩ সালে হেফাজতের আন্দোলনে মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রেখেছেন। সিলেট জেলা হেফাজতের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বে সিলেটে হেফাজত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল ঢাকায় হেফাজতের লংমার্চে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। আগের দিন লালবাগ মাদ্রাসায় হেফাজতের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জুনায়েদ বাবুনগরীর পাশেই বসা ছিলেন। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৫ মের রাতে তিনি সশরীরে শাপলা চত্বরে উপস্থিত হয়ে সরকারবিরোধী বক্তব্য দেন। ৫ মের ঘটনার পর মাওলানা জিয়া উদ্দীনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়। তার বিরুদ্ধে মোট ৬টি মামলা রয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে মাওলানা শায়খ জিয়া উদ্দীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে জড়িত। আশির দশকে তিনি জমিয়তের অঙ্গসংগঠন 'জমিয়তে তুলাবায়ে আরাবিয়ায়' সক্রিয় ছিলেন। এসময় তিনি তুলাবায়ে আরাবিয়ার বৃহত্তর সিলেট শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বিয়ানীবাজার উপজেলার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে শায়খ জিয়া উদ্দীনের অভিষেক

হয়। ১৯৯৪ সালে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। পরপর তিন মেয়াদে তিনি জেলা জমিয়তের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে তিনি কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হন।

২০১১ সালে সিলেট জেলা জমিয়তের সভাপতির দায়িত্ব পান। এ বছরই কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় জেলা জমিয়তের সভাপতি হন। ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তাকে পুণরায় সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ২০১৮ সালে তাঁকে তৃতীয়বারের মতো সিলেট জেলা জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তাকে কেন্দ্রীয় জমিয়তের অন্যতম নীতিনির্ধারক এবং সিলেট জেলা জমিয়তের প্রধান নির্বাহী মনে করা হয়। রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছাড়াও মাওলানা জিয়া উদ্দীন বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন। কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ বোর্ড আল হাইআতুল উলিয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্য তিনি। ২০২১ সালের ৪ মার্চ দেশের প্রাচীনতম শিক্ষাবোর্ড আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশের সভাপতি নির্বাচিত হন আল্লামা শায়খ জিয়া উদ্দীন। এছাড়াও তিনি মাদানিয়া কোরাণ শিক্ষাবোর্ড, নুরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ডসহ বেশ কয়েকটি কওমি শিক্ষাবোর্ডের উপদেষ্টার দায়িত্বে আছেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন ইমামবাড়ির মারা যাওয়ায় ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনীত হয়েছেন আল্লামা শায়খ জিয়া উদ্দিন। জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর ছাড়াও তিনি জামিয়া কাসিমুল উলুম মেওয়া, জামিয়া হাতিমিয়া শিবগঞ্জ, বাহাদুরপুর জালালিয়া মাদ্রাসা, আকাখাজানা মহিলা টাইটেল মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার মুহতামিম।

তিনি মৌলবাদী উগ্র সংগঠন আশ-শিহাব পরিষদ, ইকরা ফাউন্ডেশন ইউকে, আল-হিলাল ছাত্র সংসদ, আল-কলম গবেষণা পরিষদ, চেতনা সাহিত্য পরিষদ, জাগরণ ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ ও হিজবে এলাহী বিয়ানীবাজারসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২১-২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর তিনি জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৬. মুহিব্বুর রহমান খান

কেন্দ্রীয় নেতা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল মুভমেন্ট বাংলাদেশ

১৯৭৯ সনের অক্টোবরে কিশোরগঞ্জ শহরের নূর মনযিলে জন্মগ্রহণ করেন মুহিব্বুর রহমান। মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম নেতা তার পিতা মাওলানা আতাউর রহমান খান। কওমি মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদিস শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক করেন মুহিব্বুর রহমান খান। তিনি ন্যাশনাল মুভমেন্ট বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান। ইসলামী সঙ্গীত চর্চা ও ওয়াজের নামে যুব সমাজকে উগ্রতার দিকে নিয়ে

যাচ্ছেন তিনি। গানে গানে তৈরি করেছেন অগণিত উগ্রবাদী ভক্ত। বর্তমানে তিনি 'জাগ্রত কবি মুহিব খান' নামে অধিক পরিচিত। তিনি কওমি-মৌলবাদী মুখপত্র হিসেবে পরিচিত 'সাপ্তাহিক লিখনী'র সাবেক নির্বাহী সম্পাদক। তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন। ২০০১ সালে প্রকাশিত 'লাল সাগরের ঢেউ' নামের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এটি তার রচিত প্রথম কবিতার বই। এছাড়া 'প্রাণের আওয়াজ', 'অচিনকাব্য', 'বারোটি সুন্দর গল্প' প্রভৃতি তার রচনা। হেফাজত নেতা মুহিব খান জিহাদী সংগীত, লেখালেখি, কবিতা ও অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে যুব সমাজকে উগ্র জঙ্গিবাদের দিকে সর্বদা আহ্বান জানান ।

তিনি হেফাজতের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করা প্রসঙ্গে 'সাপ্তাহিক লিখনী' পত্রিকায় লিখেছেন, 'হেফাজতের আগে আমি আর কোনো সংগঠনের কর্মসূচীতে কখনও জড়াই নাই। হেফাজত অরাজনৈতিক ঈমানী আন্দোলন। আমার রক্তের স্পন্দন। তোমরা জানোই তো আমি এর পক্ষে দিন রাত খাটছি, দুই হাতে কলম চালায়েছি। চেতনার শিহরণ থাইকা একেকটা কবিতা লিইখা জাতির সামনে ছড়াইয়া দিছি। আমি হেফাজতের মঞ্চে গেছি। বাংলাদেশের অসংখ্য আলেম-ওলামা, ইমাম-মুয়াজ্জিন ও কওমি মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকের অবস্থা আমার চেয়ে অনেক বেশি করুণ। অথচ ২০১৩ সালের ৫ মে'র পরে হেফাজতে ইসলাম সরকারের সঙ্গে আঁতাত-সমঝোতা করে আমার ভাইদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করছে। এটা কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে পারি না। জনগণ একবার যদি ক্ষেপে উঠে তাহলে হেফাজত আমির আহমদ শফীর পিঠের চামড়া উঠিয়ে নিবে।'

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাজধানীর ফটো জার্নালিস্ট ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে মুহিব্বুর রহমান খান তার দল ন্যাশনাল মুভমেন্টের ১৬ দফা ঘোষণা করেছেন। এ ১৬ দফায় রয়েছে ৬৪টি প্রস্তাবনা। ১৬ দফা হলো–

দফা-১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা ও অগ্রণী পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-২ জনগণের ধর্মীয়-বিশ্বাস, জাতীয়-চেতনা ও সামাজিক-মূল্যবোধের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান, আইন ও বিচার ব্যবস্থা পুনমূল্যায়ণ করতে হবে।

দফা-৩ জনগণের জীবন, সম্পদ, সম্মানের পূর্ণ-নিরাপত্তা ও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-৪ জনগণের ধর্ম-বিধান ও কাঙ্খিত জীবনমান উপযোগী অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যিক খাতকে সমগুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে।

দফা-৫ জনগণের ধর্মীয়-বিশ্বাস জাতীয়-চেতনা ও সামাজিক-মূল্যবোধের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বমানের কল্যাণমুখি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিনোদন ও জাতীয় চরিত্র বিনির্মাণ করতে হবে।

দফা-৬ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের তুলনামূলক সুবিধা, আজীবন নিরাপত্তা, মৌলিক স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-৭ প্রবাসী কল্যাণ, যুব উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন, বেকারত্ব নিরসন, নিঃস্ব ও ভবঘুরে পুনর্বাসন, দারিদ্র দূরীকরণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দফা-৮ জাতীয় মেধার যথাযথ মূল্যায়ন এবং জাতীয় সম্পদের নিরাপদ উন্নয়ন আহরণ সংরক্ষণ ও সর্বাধিক জাতীয় স্বার্থানুকূল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-৯ দুর্নীতি সন্ত্রাস ও গুরুতর অপরাধ নির্মূলে সর্বাধিক কঠোরতর আইন এবং দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-১০ সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় যথাযথ আইনী ব্যবস্থা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-১১ জনগণের মৌলিক অধিকার সহজীকরণ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ ও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

দফা-১২ জনগণের মানবাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং নিয়মতান্ত্রিক মত-প্রকাশের নিরাপদ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-১৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থ, মর্যাদা ও ভাবমূর্তি সংরক্ষণমূলক সুদৃঢ় ও সুকৌশলী নীতি গ্রহণ করতে হবে।

দফা-১৪ ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণসহ সুদূরপ্রসারী অধুনিক রাজধানী ও নগর-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানসম্মত সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক দিবারাত্রি কর্মঘণ্টা বিন্যাস এবং আর্থ-সামাজিক-অবকাঠামোগত উন্নয়নে গ্রাম ও শহরের সুসমন্বয় ও যৌক্তিক সামঞ্জস্যবিধান নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-১৫ সকল প্রকার অযৌক্তিক ও অনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য দূর করতে হবে এবং কৃষক শ্রমিক চাকুরিজীবি ও পেশাজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও যৌক্তিক চাহিদা পূরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

দফা-১৬ নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার কাঠামো, শাসন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক আন্দোলনবিধি সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে হবে।

১৭. সরওয়ার কামাল আজিজী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সভাপতি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

সরওয়ার কামাল আজিজী ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন পদুয়া গ্রামের নয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমী চট্টগ্রাম-এর পরিচালক, জামিয়াতুল আনওয়ার হেমায়তুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসা পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম-এর মহাপরিচালক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির এবং হেফাজতে ইসলাম চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি। লেখক নুরুল ইসলাম রচিত 'খতিবে আজম ও তার চিন্তাধারা'

বইতে উল্লেখ করেছেন, 'মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী স্থানীয় ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সেখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেন।'[১৮]

তৎকালীন সময়ে জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়া মুসলিম ছাত্র পরিষদের অন্যতম দায়িত্বশীল ছিলেন এই হেফাজত নেতা। পরে তিনি লোহাগাড়া থানা নেজামে ইসলামের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শেষে চট্টগ্রাম জেলা শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাহার আলী ও মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মাওলানা সিদ্দিক আহমদের সঙ্গে হেফাজত নেতা মাওলানা সরওয়ার কামালের সুসম্পর্ক থাকার কারণে অতি সহজেই নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ অর্জনে সক্ষম হন। তিনি দীর্ঘদিন নেজামে ইসলাম পার্টি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতির দায়িত্ব এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৫২ সালে কিশোরগঞ্জে মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভীর নেতৃত্ব আলোচিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই আত্মপ্রকাশ ঘটে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র।

১৯৮১ সালে মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খতীবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদের সভাপতিত্বে গঠিত নেজামে ইসলামের বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন আল্লামা সরওয়ার কামাল আজিজী। ১৯৮৪ সালে তিনি নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে তিনি নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী নেজামে ইসলাম পার্টির তৎকালীন মহাসচিব মাওলানা সিদ্দিক আহমদ-এর মতাবলম্বী ও তার সহযোগী কওমি আলেম হিসেবে পরিচিত। ১৯৭০ সালে খতিবে আজম সিদ্দিক আহমদ ন্যাশনাল এসেম্বলীর (এম,এন,এ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তার পক্ষে তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থকড়ি ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন।

২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মজলিসে শুরার সভায় তিন বছর মেয়াদের জন্য পার্টির আমির হিসেবে মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী এবং মহাসচিব হিসেবে আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের শিষ্য মুফতি ইজাহারের ছেলের মাওলানা মুসা বিন ইজহারের নাম ঘোষণা করা হয়।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় অনেক নেতা উক্ত দলের বিভিন্ন পদে সম্পৃক্ত। ঢাকায় দলের মজলিসে শুরার সভায় নবনির্বাচিত আমিরের মারফত পার্টির উপদেষ্টা পরিষদ, পরবর্তী সেশনের জন্য মজলিসে শুরা এবং কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী পরিষদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। পরিষদ সমূহের সদস্যরা হচ্ছেন, প্রধান উপদেষ্টা

হেফাজতের বর্তমান আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। উপদেষ্টা মুফতি ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল মালেক হালীম, ফযলুর রহমান, সুলতান যওক্ব নদভী, আবদুল হালীম বোখারী, শায়খ আহমদ হাটহাজারী, নূরুল ইসলাম জিহাদী।

১৮. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
উপদেষ্টা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

আ ফ ম খালিদ হোসেন ১৯৫৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলার মাদ্রাসা ইউনিয়নের মক্কার বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নায়েবে আমির, চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা ও আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরির মুহাদ্দিস।

তার পূর্ণ নাম আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ খালিদ হোসেন, পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। প্রাথমিক জীবনে তিনি বাবুনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালে সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম মাদ্রাসা থেকে আলিম ও ১৯৭৩ সালে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম চন্দনপুরা দারুল উলুমে হাদিস অধ্যয়ন করেন।১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

খালিদ হোসেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভীর মুরিদ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনের কাছে সহীহ বুখারী, যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের সাবেক আমির প্রয়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর কাছে সহীহ মুসলিম, মাওলানা ইসমাইল আরাকানী কাসেমীর কাছে সুনান আত-তিরমিজী, মাওলান নাওয়াব হাসান কাসেমীর কাছে সুনানে আবু দাউদ পড়েছেন। ১৯৮২ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও ১৯৮৩ সালে একই বিষয়ে এমএ পাশ করেন। আ ফ ম খালিদ হোসেন ১৯৮৭ সালে সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা হয়।

১৯৯২ সাল থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রাম ওমরগণি এমইএস কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন খালিদ হোসেন। ২০০৭ সাল থেকে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র মাসিক আত তাওহীদের সম্পাদক ও হালিশহর এ-ব্লক হজরত উসমান জামে মসজিদের খতিব এবং আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরির মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার গবেষণা বিভাগে ৪ বছর, সুলতান যওক নদভীর আহ্বানে জামেয়া দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় 'ওসিলাতুল ইলাম' বিষয়ে এক বছর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ছাত্রজীবনে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সমাজ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

ছাত্রজীবনে (১৯৭৩–১৯৮৪) খালিদ হোসেন দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলার বাণী ও The Bangladesh Times এর পটিয়া মহকুমা সংবাদদাতা এবং The New Nation এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নায়েবে আমির নির্বাচিত হন তিনি। চট্টগ্রামের নানুপুর মাদ্রাসার প্রাক্তন মহাপরিচালক মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরীর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত লাভ করেন তিনি। নানুপুরীর মৃত্যুর পর তিনি হেফাজতের সাবেক আমির প্রয়াত আল্লামা শাহ আহমদ শফীর হাতে বায়আত হন ও খেলাফত লাভ করেন।

খালিদ হোসেন জুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর কাছেও বায়আত হয়েছেন। ১৯৭০ সালে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র মাসিক আত-তাওহীদে 'হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক তার প্রথম লেখা ছাপানো হয়। বর্তমানে তিনি জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম এর নয়া দিগন্তে ও রাজাকার বাহিনীর অন্যতম সদস্য এম এ মান্নানের ইনকিলাবে জাতীয় পত্রিকার নিয়মিত লেখক, মাসিক আত তাওহীদের সম্পাদক ও আরবি পত্রিকা বালাগুশ শরকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্ব মুসলীগ লীগের মুখপাত্র দ্যা ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ জার্নাল সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে তার দুই শতাধিক জঙ্গি মৌলবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯. মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
আমির, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (একাংশ)

হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা জাফরুল্লাহ খান ১৯৫১ সালে নেত্রকোণা পৌরসভার অন্তর্গত মালনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সনে নেত্রকোনার জামিয়া মিফতাহুল উলুম কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হন এবং একটানা ১২ বৎসর সেখানে লেখাপড়া করেন। ১৯৬৭ সনে ময়মনসিংহের কওমি মাদ্রাসা জামিয়া ইসলামিয়ায় হাদিসের প্রথম বর্ষে ভর্তি হন, ১৯৬৮ সনে ঢাকার জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ায় হাদিসের শেষবর্ষ সমাপ্ত করেন।

মাওলানা জাফরউল্লাহ খান ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের কওমি মাদ্রাসা এবং হেফাজতের প্রধান ঘাঁটি দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম হাটহাজারীতে পুনরায় তাফসীর বিভাগে ভর্তি হন এবং ইলমে তাফসীরও চর্চা করেন। হেফাজত নেতা মাওলানা জাফরুল্লাহ খান যাদের নিকট থেকে ইলমে হাদিস ও তাফসীর অধ্যয়ন করে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন মৌলবাদী শিক্ষক হলেন– ভারতের জাফর

আহমদ উসমানী, হেফাজতের সাবেক আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরীর বাবা মাওলানা আবুল হাসান।

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান কর্মজীবনের শুরু হয় চট্টগ্রামের দামপাড়া ব্যাটারি গলি মসজিদ বায়তুল আজিজের ইমাম হিসেবে। একই সময়ে সেই এলাকার দামপাড়াস্থ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৫ সালে ঢাকার কামরাঙ্গির চর জামিয়া নুরীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দীর্ঘদিন উক্ত মাদ্রাসায় হাদিসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে কোরাণ প্রচার সংস্থা নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। সংস্থার নামটিতে কোরাণ প্রচার করার কথা বলা হলেও কাজের বেলায় ঠিক তার বিপরীত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় গ্রামে গ্রামে ওয়াজ মাহফিল ও দাওয়াতের নামে মৌলবাদী-উগ্রবাদী ধ্যান-ধারণা মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার কাজ করেছেন আদতে। তিনি জিহাদের কথা বলে, ইসলামী আইন ও কোরাণ-হাদিসের শাসনের কথা বলে জনসাধারণকে মগজ ধোলাই করে উগ্রবাদী দলে টেনেছেন।

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান হেফাজতী ও মৌলবাদী রাজনীতিবিদদের নিকট উক্ত কোরাণ প্রচার সংস্থার কারণে বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে তিনি আর্থিকভাবে অনেক দুর্বল ছিলেন কিন্তু সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দেশ-বিদেশ থেকে কোরাণ প্রচারের নামে জিহাদের প্রচার-প্রসারসহ আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদদের অর্থ, বাসস্থানসহ সার্বিক সহযোগিতা করেন। মাসিক 'জাগো মুজাহিদ' নামের পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করা হলে তার সুপারিশে হাফেজ্জী হুজুরের 'মাসিক রহমত' পত্রিকাটি জঙ্গিদেরকে দেয়া হয় জঙ্গি মৌলবাদী মুখপত্র হিসেবে। এখনও নুরীয়া মাদ্রাসাকে 'মাসিক রহমত'-এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করে জাফরুল্লাহ খানদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে যুব সমাজকে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কাজের দিকে ধাবিত করছেন।

ছাত্রজীবনে মাওলানা জাফরুল্লাহ খান নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তোলাবায়ে কওমিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এই সময় উগ্রবাদী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি।

একটানা ২০ বছর তিনি খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের শিষ্য ছিলেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও হাফেজ্জীর মতাদর্শী। তিনি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন একাংশের আমির। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মারা যাবার পর দীর্ঘদিন রাজনীতি হারাম বলে ফতোয়াদানকারী মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর তওবার ডাক দিয়ে ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আলেমদের নিয়ে খেলাফত আন্দোলন নামে রাজনীতি শুরু করেছিলেন। মাওলানা জাফরুল্লাহ খান মৌলবাদী সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও ঢাকা মহানগরীর যুগ্ম-আহ্বায়ক, কোরাণ প্রচার সংস্থা বাংলাদেশের সভাপতি, জামিয়া নুরিয়া

ইসলামিয়ার সাবেক মুহাদ্দিস, সমমনা ইসলামী ১২ দলের মহাসচিব ও 'মাসিক হেদায়েত' পত্রিকার সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম ও জিহাদী আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য সৌদি আরব, আমেরিকা, কুয়েত, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, লিবিয়া, আরব আমিরাত ও থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। রিয়াদ, জেদ্দা, তায়েফ, আল খোবার, করাচী, লাহোর, দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, ত্রিপোলী, বেনগাজী ও ব্যাংককে অবস্থিত বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন।

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে হরকাতুল জিহাদ ও খেলাফত আন্দোলনের মুখপত্র 'মাসিক রহমত'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যুদ্ধাপরাধের বিচার সুষ্ঠুভাবে হোক অন্যদের মতো আমিও তা চাই। কিন্তু বিচারের নামে প্রহসন করা হবে, রাজনৈতিক হীনস্বার্থে নাটক সাজানো হবে– তাতো সমর্থন করতে পারি না।' এই জিহাদী পত্রিকার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'যারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আইন জমিনে প্রতিষ্ঠা করে না, তারা কাফের। যারা তাদের সমর্থন করে, তারা জালেমের সমতুল্য। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য সকল মতবাদ হোক তা সেক্যুলারিজম বা জাতীয়তাবাদ তা সমর্থন করা কোনো মুসলমানের পক্ষে বৈধ হতে পারে না।' বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত ও সশস্ত্র জিহাদ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে না পারি তাহলে অবশ্যই সশস্ত্র জিহাদের পথ অবলম্বন করতে হবে।

'এই দেশে ইসলামী হুকুমতের আমি উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। বাতিল শক্তি যেভাবে হোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলমান যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে– এই পরিস্থিতি আমাদের ইসলামী হুকুমতের পথে আসছে। আমরা একটা গণঅভ্যুত্থানের অপেক্ষা করছি। আরব বসন্তের মতো এ দেশেও বাংলা বসন্তের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্ষমতা চর্চায় বড় দলগুলোর ব্যর্থতাও এর একটা কারণ হতে পারে। অবশেষে মানুষ ইসলামের নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। সত্য কথা হচ্ছে– ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ।'[১৯]

২০. আব্দুল হালিম বোখারী

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
উপদেষ্টা, নেজামে ইসলাম পার্টি

মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার আমিরাবাদ গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার বৃহত্তম কওমি মাদ্রাসা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম (মহাপরিচালক) এবং হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা। তিনি পটিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। দাওরায় হাদিস ও ইফতা কোর্স আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সমাপ্ত করেন। কওমি শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষাও অর্জন

করেন। কাগমারী সরকারি কলেজ টাঙ্গাইল থেকে বি.এ পাশ করেন। তিনি আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি জঙ্গি মৌলবাদীদের মুখপত্র মাসিক আত-তাওহীদ পত্রিকার সম্পাদক। চট্টগ্রাম বিভাগ কেন্দ্রিক আঞ্চলিক কওমি শিক্ষা বোর্ড আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মাদারিস নামে যে শিক্ষা বোর্ড রয়েছে সেই বোর্ডের দীর্ঘদিন মহাসচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শত শত কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হয়।

শাকের হোসাইন শিবলি লিখিত 'প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার' বইতে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আব্দুল হালিম বোখারী স্বাধীনতা দিবস বিশ্বাস করেন না। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সম্পর্কে তার বক্তব্য হচ্ছে– 'ইসলাম দিবস সর্বস্ব কোনো কিছু সমর্থন করে না। এমনকি রাসূল-এর জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, এটারও কোনো বিধান ইসলামে নেই বরং রাসূলকে সব সময় অনুসরণ করতে হবে, আমল করতে হবে। কারণ দিবস হলে সেটা আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যায়। বছরে একবার দু'বার স্মরণ করা হয় আর বাকি সময় কোনো খোঁজ খবর নেই। একটা দিনকে ঠিক করে সেদিনই সবকিছু করলাম, পরে আর করলাম না এতে আমরা বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতা দিবস সরকার যেহেতু একটা রেখেছে, তাই এ ব্যাপারে আমরা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ করি না বা কারও সঙ্গে বিরোধেও জড়াই না। সরকার যা করে, আমরা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না। নাস্তিক, মুরতাদ, ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দু বিধর্মীদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে আল্লাহপাক যেন আমাদের এই দেশকে, এদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন, তার জন্য সব ছাত্র শিক্ষককে নিয়ে দোয়া করি।' বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ উদযাপন সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী বলেন, 'পয়লা বৈশাখ আমরা মোটেই সমর্থন করি না। আমরা আরবি মাস অনুসরণ করি। সেখানেও আমরা পয়লা মহররম দিবস পালন করি না।'[২০]

হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সহযোগিতা করেছিলেন। হরকাতের জঙ্গিদের নিকট তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং উক্ত সংগঠনের উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৭১ সালে পটিয়া মাদ্রাসা শিক্ষক থাকাকালে মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে একটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী নেজামে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে আবদুল হালিম বোখারীর রাজনীতি শুরু। ছাত্র অবস্থায় চট্টগ্রাম জেলার নেজামে ইসলাম পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৭১-এ নেজামে ইসলাম পার্টির নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত মুজাহিদ বাহিনীর চট্টগ্রাম জেলা শাখার অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নেজামে ইসলাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অন্যতম কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৯৬-এ জাতীয়

নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া আমিরাবাদ নির্বাচনী এলাকায় তিনি নেজামে ইসলামের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামানত হারান।

নেজামে ইসলাম পার্টি ছাড়া আবদুল হালিম বোখারী ইসলামী ঐক্যজোটের চট্টগ্রামের একজন সিনিয়র নেতা। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে মাওলানা আবদুল হালিম চার দলীয় ঐক্যজোটের সিনিয়র নেতা ছিলেন। মুফতি ফজলুল হক আমিনীর গড়া মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে তিনি ২০০০-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ, প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের নাস্তিক ফতোয়া দিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। তিনি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির একজন সিনিয়র নেতা এবং মুফতি আমিনীর আস্থাভাজন লোক ছিলেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাওলানা বোখারী চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ ময়দানে ১৯৯৪ সালে থেকে ধরে 'আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থার' নামে এনজিওর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চাঁদা তুলে মাহফিলের আয়োজন করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। ওয়াজ মাহফিলের জন্য সংগৃহিত চাঁদার টাকা থেকে কিছু টাকা খরচ করেন জঙ্গি কর্মকাণ্ডে এবং বাকি টাকা দিয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটান মাওলানা বোখারী। তিনি উক্ত সংস্থার মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ১৯৯৪ সাল থেকে।

মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

১. আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) ঃ এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে প্রায় পাঁচশত মাদ্রাসা। প্রতি বছর এই বোর্ডের অধীনে ৬ টি শ্রেণিতে মারকাজি (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

২. আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থা ঃ বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থা প্রতিবছর যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে এই সংস্থার নামে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করেন। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৬ সাল।

৩. ইসলামী রিলিফ কমিটি ঃ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সব ধরনের বিপদের সময় দুর্গত মানবতার সেবা-সাহায্য ও পুনর্বাসনের নামে গঠিত হয়েছে ইসলামী রিলিফ কমিটি। এটি বর্তমানে এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একটি সংস্থা। ইসলামী রিলিফ কমিটির নামে দেশ বিদেশ থেকে দান অনুদান সংগ্রহ করে বিভিন্ন আন্দোলনে ব্যয় এই এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে অর্থায়নের অভিযোগে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ২০২১ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

৪. নও মুসলিম ফাউন্ডেশন ঃ নও মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং আর্থিক সহায়তা দানের নামে ১৯৯৯ ইংরেজিতে নও মুসলিম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নও মুসলিমদের পুনর্বাসনের নামে বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ করে আব্দুল হালিম নিজেই খরচ করেন।

২১. সলিম উল্লাহ

সাবেক যুগ্ম মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সহ-সভাপতি, ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রাম উত্তর জেলা

মাওলানা সলিম উল্লাহ হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব আল জামিয়া ইসলামিয়া নছিরুল ইসলাম (নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার) সাবেক শিক্ষা পরিচালক, আল জামিয়াতুল ফারুকিয়া মাদ্রাসার বর্তমান মহাপরিচালক। এছাড়া তিনি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ফটিকছড়ি থানার সেক্রেটারী ও ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সহ-সভাপতি। উপরে উল্লেখিত সব পরিচিতি ছাড়িয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রথম জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ-এর একজন নীতি নির্ধারক ও হরকাতুল জিহাদের চট্টগ্রাম জেলা শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে বেশি পরিচিত।

হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা সলিম উল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন দৌলতপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে নাজিরহাট (বড় মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বে) কুতুবশাহ বাড়িতে ১৯৬১ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ মুসা। তিনি প্রাইমারী স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত জামেয়া নাজিরহাট বড় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় জামাতে হাস্তম (অষ্টম শ্রেণি) ভর্তি হয়ে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। শিক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই জামেয়া ইসলামিয়া ভোলা মাদ্রাসায় শায়খুল হাদিস পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

সেখানে এক বছর পাঠদান করার পর জামিয়া নছিরুল ইসলাম (নাজিরহাট বড় মাদ্রাসা) তৎকালীন মহাপরিচালক শাহ শামসুদ্দীনের আহ্বানে জামিয়া নাজিরহাট বড় মাদ্রাসায় যোগদান করেন।

হরকাতুল জিহাদের আহ্বানে আফগান যুদ্ধে এ দেশের পাঁচ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেন। সেই সব জঙ্গিদের মধ্যে আবদুর রহমান ফারুকী ছাড়াও নেতৃত্ব দেন মৌলবাদী সেলিম উল্লাহ। মাওলানা সলিম উল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি দুর্গম পাহাড়ে স্থাপিত মুজাহিদদের জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ফটিকছড়ি ধর্মপুর, কাঞ্চননগর, রাঙ্গামাটির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাজিরহাট ভুজপুর, দাঁতমারা, মানিকছড়ির প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও বিভিন্ন মাদ্রাসার জিহাদী ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহ সরাসরি পরিচালনা করতেন। এছাড়াও হাটহাজারী থানার মিরেরখীল বাজারের পশ্চিমে পাহাড়িস্থানে মীর আনিসের সঙ্গে মাওলানা হাবীবুর রহমানকে নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো যৌথভাবে পরিচালনা করতেন মাওলানা সলিম উল্লাহ।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্থ যোগান ও বণ্টন করতেন তিনি। নাজিরহাট নছিরুল ইসলাম বড় মাদ্রাসার নামে জঙ্গিদের অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য তিনি আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত ও লন্ডনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করতেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রচুর অর্থ এনে তিনি জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও জঙ্গিদের সহযোগিতা করতেন।

২২. নুরুল ইসলাম ওলিপুরী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ নুরে মদীনা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী। তিনি একজন উগ্র মৌলবাদী বাগ্মী। তার বয়ানে এক সময় জামায়াত-শিবির ও মওদুদীবাদ বিরোধিতা স্থান পেত কিন্তু জামায়াত-হেফাজত সমঝোতার পর তিনি আর জামায়াত বিরোধিতা করেননি। ১৯৫৫ সালে হবিগঞ্জ জেলার নুরপুর থানার ওলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হেফাজতের এ নেতা। তার পিতা মাওলানা আবদুর রহিম। মাওলানা ওলীপুরী ৫ ভাই এবং ২ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। মাওলানা ওলীপুরী যখন পাঁচ বছরের শিশু তখনই মাতা-পিতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়েন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তার পিতা-মাতা, বড় ভাই মাওলানা আব্দুস সামাদ ও বড় বোন গুলেনূর মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে মারা গেলে তার পরিবার ও তিনি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

গ্রামের একটি প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নের পর নেজামে ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাহার আলী প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ জেলার কওমি মাদ্রাসা বর্তমান হেফাজতীদের নিরাপদ ঘাঁটি জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন নুরুল ইসলাম। মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের জন্য তিনি হবিগঞ্জ জেলার রায়ধর জামিয়া ছাদিয়ায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে মুজাহিদ মাওলানা মোখলিসুর রহমানের নিকট তথাকথিত বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালে ঢাকার লালবাগ মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানাধীন শাহপুর আল-জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু তার। সদর থানার রায়ধর জামিয়া ছাদিয়ায় আরবী, নাহু, ছরফ, মানতিক, ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় আট বছর অধ্যাপনা করেন। এরপর সদর জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সুবহানিয়া মাদ্রাসায় এক বছর শিক্ষকতার পর হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানাধীন মনতলা দারুস সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসায় এক যুগেরও অধিককাল প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে তিনি শায়েস্তাগঞ্জে নুরে মদীনা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি আল-ফারুক ইসলামী গবেষণা পরিষদ শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। হবিগঞ্জ জেলা শাখার একজন অন্যতম নেতা হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগের সহ-সভাপতির পদে নিয়োজিত আছেন।

মাওলানা নুরুল ইসলাম তার প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে যুব সমাজকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। জঙ্গি মুজাহিদদের বিভিন্ন ক্যাসেট, বই, ম্যাগাজিন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন নিষিদ্ধ করে দেয়, তারপর থেকে ওলিপুরীর ওয়াজ জঙ্গিরা অনুপ্রেরণার মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কেবল ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে নয় বিভিন্ন বই লিখেও তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তার লিখিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই-এর তালিকা-(১) কাদিয়ানী মতবাদ ও ইসলাম ধর্ম, (২) বিভ্রান্তির অবসান, (৩) ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান, (৪) বিশ্ব মুসলিম নিরাপত্তা ব্যবস্থা, (৫) সুন্নী নামের অন্তরালে, (৬) কার ফতোয়ায় কে কাফের? (৭) নুরে মদীনা, (৮) পরিপূর্ণ দ্বীন, (৯) শিক্ষানীতি ও নারী নীতি, (১০) কওমি শিক্ষার ইতিহাস।

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী ২০২১ সালে হবিঞ্জের এক মাহফিলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জানাযায় অংশ নেওয়া নাজায়েজ বলে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। নূরুল ইসলাম ওলীপুরী কওমি ঘরোনার একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী। ওই মাহফিলে নূরুল ইসলাম ওলীপুরী বলেন, 'আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠন গুলো রাসুলের খাটি উম্মতদের হত্যা করার কারণে তারা ইসলাম বিদ্বেষী দল এবং মুসলমানিত্ব থেকে চিরতরে বহিষ্কার হয়ে গেল।

'ক্ষমা অযোগ্য সীমাহীন এসব অপরাধের কারণে তারা মারা গেলে তাদের জনাজায় কোন আলেম বা সমাজের জ্ঞানী কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহন করা একেবারে নাজায়েজ। নিরস্ত্র মুসলমানদের জন্য এটাই হবে দ্বিতীয় স্তরের জিহাদ।'

মাহফিলে নুরুল ইসলাম বলেন, 'খতমে নবুওয়ত আমাদের ঈমানের অঙ্গ। একজন কাদিয়ানী মুসলিম পরিচয়ে বাংলাদেশ থাকা অবস্থায়ও আমাদেরকে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। নিজের জীবন উজাড় করে হলেও চূড়ান্ত বিজয় নিয়ে আমরা ক্ষান্ত হবো।'

এ পর্যায়ে নূরুল ইসলাম কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত দাবি সমূহ প্রমাণসহ উপস্থিত ইমাম-খতিবদের সামনে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কাদিয়ানীরা ইজতেমা করার সাহস দেখালে ঢাকার বকশীবাজারে তাদের আস্তানার প্রতিটি ইট খুলে নেওয়া হবে বলে হুমকি দেন।

২৩. আব্দুল মালেক হালিম

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

বাংলাদেশে যে কয়জন কওমি আলেম দীর্ঘদিন ইসলামী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের মধ্যে হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র সহ-সভাপতি, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড উপদেষ্টা ও চট্টগ্রাম

আনোয়ারা থানার হাইলধর আল-জামেয়া আরাবিয়া মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম অন্যতম প্রধান। তিনি চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত পুকুরিয়া নামক গ্রামে ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আব্দুল হক।

তার প্রথমিক শিক্ষার সূচনা ঘটে নিজ পিতা আল্লামা আব্দুল হক এর হাতে, এটাই তার পারিবারিক শিক্ষার প্রথম ধাপ। মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম বাল্যকালে স্থানীয় জামিয়া পুকুরিয়া কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কয়েক জামাত শ্রেণি পড়ার পর আল-জামেয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পটিয়া মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জামাতে উলা (স্নাতক) ও দাওরায়ে হাদিস (স্নাতকোত্তর) সহ ফিকাহের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টানেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি জামেয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। তারপর পটিয়া মাদ্রাসা ও জামেয়া দারুল মা'আরিফ মাদ্রাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতার পর নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন মহিলাদের জন্য বৃহৎ বেসরকারি মহিলা মাদ্রাসা।

মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা থেকে নারীশিক্ষা বিরোধী ফতোয়া পাঠানো হয় এই হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মালেক হালিমের মহিলা মাদ্রাসায়। পরবর্তীকালে তার পরিচালনাধীন জামিয়া আরাবিয়া হাইলধর মহিলা মাদ্রাসাটি দেশের বেসরকারি কওমি নারী শিক্ষার একটা কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এটাই ছিল বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের দরসে নেজামির আলোকে প্রথম কওমি মহিলা মাদ্রাসা। তিনি বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় সফর করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তার হাতে স্থাপিত হয়েছে অগণিত মহিলা মাদ্রাসা এইসব কওমি মহিলা মাদ্রাসায় হিজাবের নামে ছোট ছোট শিশুদেরকে বোরকার ঘেরাটুপে বন্দি করে রাখার পদ্ধতি প্রচলন শুরু হয়। তিনি বিভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পাকিস্তান, ভারত, আরব বিশ্বের সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইয়ামান, ওমান সহ আরো অনেক দেশ সফর করেছেন। সেইসব দেশ থেকে হিজাবনীতি এনে বাংলাদেশে প্রচলন ঘটান।

আব্দুল মালেক হালিম বাংলাদেশে কথিত ইসলামী রাজনীতির পরিচিত মুখ। ১৯৮৬ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারতের হোসাইন আহমদ মাদানীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার একজন সমর্থক। বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক জীবনের প্রধান দিকনির্দেশক ও পথদ্রষ্টা ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর আল্লামা সিদ্দিক আহমদ। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির বাঁশখালী থানার দায়িত্ব শেষে চট্টগ্রাম জেলা শাখার সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৮৪ সালে পার্টির আহ্বায়ক, ২০০৮ সালে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে সকল সংগঠনের প্রথম সারির একজন নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই. ডি. এল) ও ইসলামী ঐক্যজোট।

জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আমির মাওলানা আবদুর রহিম এর হাতে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' এর প্রাথমিক যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মধ্যে আব্দুল মালেক হালিম। যদিও পরবর্তীকালে আই.ডি.এল ভেঙে যাওয়ায় তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির পুনরোদ্ধার কার্যক্রমকে গতিশীল করতে দেশ-বিদেশে বিশেষ করে আরবের বিভিন্ন দেশে তৎপরতা জারি রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে ইসলামী ছাত্র সমাজের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ফ ম খালিদ হোসেন লিখেছেন, 'আই. ডি. এল ভেঙ্গে যাবার পর নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়। দলের গতিধারা এখানে এসে যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম ও মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজি পবিত্র মক্কা মোকাররমের খিদুয়াতের বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিক ও প্রাক্তন নেজামে ইসলামের নেতাদের এক কনভেনশন আহ্বান করেন। ১১৫ জন আলেম ও কনভেনশনে বাংলাদেশের নেজামে ইসলাম পার্টির সফলতা ব্যর্থতার উপর দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নেন– খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ, পীর মোহসেনুদ্দীন দুধু মিঞা, মাওলনা সাইয়েদ মোসলেহু উদ্দীন, আলহাজ্ব শাহ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ, হযরত মাওলানা আব্দুল করীম শেখে কৌড়িয়া, মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আমিনুল ইসলাম।'

২০১০ সালে ১৯শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত 'হেফাজতে ইসলাম' বাংলাদেশের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আব্দুল মালেক হালিম। তিনি ছিলেন হেফাজতের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী মহাসচিব এবং আফগান ফেরত জঙ্গি নেতা সুলতান যওক নদভীর পর তিনি ছিলেন হেফাজতের দ্বিতীয় মহাসচিব।

পরবর্তীকালে ২০১৩ সালের হেফাজতের তথাকথিত নাস্তিক বিরোধী আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে তৎকালীন মহাসচিব আব্দুল মালেক হালিম নিজের বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতার কারণে হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর কাছে তার পরিবর্তে অন্য একজন মহাসচিব নিয়োগের অনুরোধ করেন। এরপর হেফাজতের প্রয়াত আমির জুনাইদ বাবুনগরীকে হেফাজতে ইসলামের তৃতীয় মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং আব্দুল মালেক হালিমকে কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র নায়েবে আমিরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হেফাজতের পক্ষ থেকে তাকে শাহবাগের গণজাগরণ বিরোধী আন্দোলনের সময় সমগ্র সিলেট বিভাগের প্রধান দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে ৬ই এপ্রিলের হেফাজতে ইসলামের লংমার্চ এবং ৫ মে'র অবরোধকালে তিনি শাপলাচত্বরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেফাজত নেতাকর্মীদের জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেইদিন।

২৪. হাবীবুর রহমান কাসেমী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হাবীবুর রহমান কাসেমী আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নছিরুল ইসলাম চট্টগ্রামের নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার বর্তমান মহাপরিচালক– প্রধান মুফতি ও জঙ্গিদের মুখপত্র 'মাসিক দাওয়াতুল হক'-এর সম্পাদক এবং বর্তমান হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির।

হাবীবুর রহমান কাসেমী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ঈসাপুর এলাকায় ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার মাওলানা কাজী ওবায়দুর রহমান। তিনি নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেখল হামিউসসুন্নাহ মাদ্রাসায় পড়লেখা করেন এবং মাধ্যমিক স্তরের জামাতে শরহে বেকায়া পর্যন্ত দারুল উলুম হাটহাজারীতে অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ যান। সেখানে তিনি ফুনুনাতের বিশেষ বিশেষ কিতাবাদীসহ দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। ১৯৮৩ সালে আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নছিরুল ইসলাম নাজিরহাটে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ঐ বছর থেকেই জামেয়ার সিহাসিত্তার কিতাব নাসায়ী শরীফের দরস দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসার মুহতামিম (মহাপরিচালক)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

হাবীবুর রহমান কাসেমী হরকাতুল জিহাদের সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য। আফগান জিহাদের অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি জঙ্গিদের একজন।

নব্বই দশকে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির দুর্গম পাহাড়ে স্থাপিত জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফটিকছড়ি ধর্মপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাঞ্চননগর পাহাড়ি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও বিভিন্ন মাদ্রাসার জিহাদী ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহ সরাসরি তার তত্ত্বাবধানে পরিচালনা হতো। হাটহাজারী থানার মিরেরখীল বাজারে পশ্চিমে পাহাড়ি স্থানে মীর আনিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও যৌথভাবে পরিচালনা করতেন হাবীবুর রহমান। তাছাড়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্থ যোগান ও বণ্টন করতেন তিনি। যদিও পরবর্তীকালে হরকাতুল জিহাদ অর্থ আত্মসাতের কারণে তাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দীর্ঘদিন বিরত রাখে। এরপরও তিনি দীর্ঘ এক যুগ সংগঠনটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী ১৯৮৩ সালে 'নেজামে ইসলাম পার্টির' সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রাজনীতির মাঠে নামেন, পরবর্তীকালে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের দায়িত্ব নেওয়ার পর ইসলামী দল সমূহের জঙ্গি মিছিল-মিটিং এবং গোপনীয় বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ২০০০ সালের পর যখন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়, তিনি মুফতি হওয়ার কারণে সে কমিটির সিনিয়র নেতা এবং ফটিকছড়ি উপজেলার ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির নায়েবে আমির এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বিএনপি-জামায়াত এর চার দলীয় জোটের সঙ্গে মুফতি আমিনী জড়িত থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুফতি হাবীবুর রহমান কাসেমী মৌলবাদী জঙ্গি কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে জড়িয়েছিলেন।

'ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ বৃহত্তর ফটিকছড়ি'-র ব্যানারে তাফসীরুল কোরাণ মাহফিলসহ দেশের বিভিন্ন জনসভায় তিনি বক্তব্য দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নাস্তিক-মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে উগ্র মৌলবাদীদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী আন্দোলন (চরমোনাই), ইসলামী ঐক্যজোট, 'নেজামে ইসলাম পার্টিসহ কওমি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের জঙ্গি ছাত্রদের কাছে একজন সম্মানীত নেতা হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি হেফাজতের প্রয়াত আমির জুনায়েদ বাবুনগরীর বলয়ের লোক হিসেবে পরিচিত।

২৫. শাহীনুর পাশা চৌধুরী

আইন বিষয়ক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

এডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার পাটলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত. আব্দুল ছাত্তার। জামিয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহঃ) সিলেট থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ (বাংলা) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ করেন। রাবেয়া ডিগ্রি কলেজ সিলেট-এ বাংলা প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। প্রতিষ্ঠিত করেন, হযরত শাহজালাল (রহঃ) ইসলামী একাডেমী, সিলেট। বর্তমানে সিলেটের সুনামগঞ্জ জর্জ কোর্টের আইনজীবী, মাসিক 'তৌহিদী পরিক্রমা' পত্রিকার সম্পাদক এবং জগন্নাথপুর দক্ষিণ সুনামগঞ্জ কল্যাণ ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, শাহীনুর পাশা চৌধুরীকে হেফাজতে ইসলামের সিলেট বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়ার পিছনে একমাত্র কারণ কওমিপন্থী উগ্রবাদী জঙ্গি-মুজাহিদ এবং যুবসমাজ তাকে সমর্থন করেন। তিনি জঙ্গি শফীকুর রহমান (সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমির, হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ), আবদুল হাই, মঞ্জুর আহমেদ, মঞ্জুর হাসান, সোলেয়মান শহীদুল ইসলামসহ বহু আফগান ফেরত মুজাহিদদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ সিলেট বিভাগে বহু জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সময় দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে কিংবা প্রতিরোধ করতে সর্বদা শাহীনুর পাশা তাদের সহায়তা করেছেন। সিলেটের বিভিন্ন চা বাগান ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন টিলাসহ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গিদের যেসব ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল সেই সব ক্যাম্পের ট্রেনিং প্রশিক্ষণসহ তাদের সকল সুবিধা দেওয়ার পিছনে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। চট্টগ্রাম বিভাগের পর সিলেট বিভাগকে জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করার মূলে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

৯০-এর দশকের শুরুতে নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিন বিরোধী জঙ্গিবাদী কর্মসূচি দিয়ে মাওলানা হাবীবুর রহমানের সঙ্গে হেফাজতের এই নেতা মাদ্রাসার ছাত্রদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেট রেজিস্টারি মাঠে কয়েক হাজার উগ্র মৌলবাদী সমর্থক গোষ্ঠির সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে তিনি সিলেট থেকে সারা দেশে এ আন্দোলনকে প্রচার-প্রসার করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। লেখক তসলিমা নাসরিনকে গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সকল লেখা বাজেয়াপ্ত করা ও মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড আইন প্রণয়নের জোর দাবি জানান। প্রকাশ্য জনসভায় তসলিমা নাসরিনকে হত্যার ঘোষণা দেন তিনি। তসলিমা নাসরিনকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে ১৯৯৩ সালের ৯ অক্টোবর সিলেট জেলায় হরতালের ডাক দিয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করেছিলেন। একই বছর ১৯ অক্টোবর কওমিপন্থী আলেম ও জঙ্গি-মুজাহিদদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকার বৈঠকে তিনি যুব সমাজের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২৮ নবেম্বর কয়েক হাজার জঙ্গি মুজাহিদ বাহিনী জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রা করলে সেখানেও সামনের কাতারে থেকে তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। মিছিলের এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হন তিনি।

তথাকথিত ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড আইন পাশ করার জন্য তৎকালীন সরকারকে কড়াভাষায় আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে মৌলবাদীদের মহাসমাবেশে তসলিমা নাসরিনবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে তরুণ যুব মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আফগান ফেরত মুজাহিদ জঙ্গি নেতাদের আস্থাভাজনদের একজন। সিলেট ঐক্যপরিষদ ও সাহাবা সৈনিক পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল আফগান ফেরত মুজাহিদ নেতা মাওলানা হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের সিলেট সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রতিরোধের কর্মসূচির ডাক দিলে সেখানেও শাহীনুর পাশা অর্থ-লোকবল দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

২০০০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হলের' নামকরণ বিরোধী আন্দোলনের নামে শাহীনুর পাশা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে হরতাল পালন ও হামলা লুটপাটের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। সেদিন হরতাল পালনকালে প্রগতিশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি চরম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'সিলেট ইসলামপন্থীদের নিরাপদ ভূমি। এখানে ভিন্ন কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।' শুধু কবি শামসুর রাহমান নয়, একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবিতে প্রতিষ্ঠিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শহীদ জননী জাহানারা ইমামকেও শাহীনুর পাশা গং সিলেটের পুণ্যভূমিতে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন।

শাহীনুর পাশা চৌধুরী ১৭ বছর বয়সে জামিয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর ছাত্রাবস্থায় ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে

রাজনীতিতে পদার্পণ করেছিলেন। তারপর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, সিলেট শাখার দায়িত্ব শেষে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরীর অনলাইন সাময়িকী জাগরণ জুন সংখ্যা ২০২১-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– 'শাহিনুর পাশা চৌধুরী সিলেট খাদিমনগর এলাকায় একটি মাদ্রাসার নামে লন্ডন থেকে এটিএন বাংলা টিভিতে একটি ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন প্রায় তিন কোটি টাকা। এসব অর্থ তিনি লন্ডন থেকে অবৈধ পথে বাংলাদেশে নিয়ে যান। এসব অর্থের বেশীর ভাগই খরচ করা হয় বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার পেছনে।

'ঠিক এই সময় তিনি লন্ডনে প্রবাসীদের নিয়ে সিলেটে একটি হোটেল ও মার্কেট করার নামে লন্ডন থেকে সংগ্রহ করেন নয় কোটি টাকা। লন্ডনে বসবাসরত ১৮ জন প্রবাসী প্রত্যেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে তার প্রস্তাবিত মার্কেটের মালিক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা জানান, তারা এর থেকে কোনো লভ্যাংশ পাচ্ছেন না। একাই নিয়ে নিচ্ছেন শাহিনুর পাশা চৌধুরী। প্রবাসী ১৮ জন বিনিয়োগকারীর মধ্যে অন্যতম হলেন উইল শায়ার কাউন্সিলের কাউন্সিলার আতিকুল হক, জয়নাল কোরেশী, আলফু মিয়া প্রমুখ।

'এর ভেতর শাহিনুর পাশা চৌধুরী আরো কয়েকবার লন্ডন সফর করেন। তার প্রত্যেকবার লন্ডন সফরকালীন সময় তিনি বিনিয়োগকারী আলফু মিয়াকে সাথে নিয়ে কয়েকবারই যান লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশনে। এসময় তার সাথে ছিলেন হেফাজত নেতা মৌলানা শোয়াইব আহমদ ও মুফতি আব্দুল মোস্তাকিম এবং ব্রিটিশ ভারতীয় নাগরিক আলখাইর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইমাম রশিদ আহমদ কাছিম। এই সময় তারা লন্ডনে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর সাথে একাধিক বৈঠক করেন।'[২১]

২০২১ সালের ৬ মে দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ঢাকা থেকে আসা একটি দল অ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরীকে সিলেট নগরীর বনকলাপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভূমি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় হওয়া মামলায় সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরীকে ৭ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে পাঠানো হয়। হেফাজত নেতা মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী ২০২১ সালের ২৬ আগস্ট জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পান।

২৬. তাফাজ্জল হক হবিগঞ্জী

সাবেক নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

তাফাজ্জল হক হবিগঞ্জী হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নায়েবে আমির। তার মূল পেশা ছিল শিক্ষকতা। প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৩৮ সালের ২০ জুন হবিগঞ্জের পশ্চিম কাঁটাখালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাফাজ্জল হক হবিগঞ্জী। তার নানা আসাদুল্লাহ একজন মৌলবাদী মুজাহিদ ছিলেন। তার মামারাও ছিলেন মৌলবাদী মুজাহিদ।

স্থানীয় কাঁটাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কোরাণ-হাদিসের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে হবিগঞ্জ জেলার রায়ধর জামিয়া ছাদিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘ ৬ বছর মাওলানা মোখলিসুর রহমানের নিকট নাহু, সরফ, ফিক্বাহ, উসুলে ফিকাহ, বালাগাত মানতিক ও ইলমে আদবসহ বিভিন্ন বিষয়াদি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আলিয়া ৩য় বর্ষ সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি আল-জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা তথা হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৪ বছর পড়াশোনা করে ১৯৬০ সালে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। পরবর্তীকালে হাদিসের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন ও জঙ্গিবাদী শিক্ষায় দীক্ষা নেয়ার জন্য পাকিস্তানের বিখ্যাত জঙ্গি পদচারণার কেন্দ্র জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা ইদ্রীস ও মাওলানা রাসূল খানসহ তৎকালীন বিভিন্ন মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদিসের উচ্চতর সনদ লাভ করার পর মুজাহিদ মাওলানা আবদুল্লার নিকট জিহাদের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে আরও বেশি পারদর্শিতা লাভের জন্য পাকিস্তানের জামিয়া ইসলামিয়া নিউ টাউন করাচিতে মুজাহিদ আল্লামা ইউছুফ বিন নুরীর কাছ থেকে জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করেন। পাকিস্তানের জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর ও জামিয়া ইসলামিয়া করাচী মাদ্রাসাতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও জিহাদী প্রশিক্ষণ শেষে মাওলানা তাফাজ্জল হক এর উপর সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৯৬২ সালে কওমি শিক্ষা গোড়াপত্তনকারী দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় সফর করতেন। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাতে মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমদ মুরাদাবাদী ও মাওলানা ইব্রাহিম-এর নিকট জিহাদের উপর বিশেষ সনদ লাভ করেছিলেন।

হেফাজতে ইসলামের সাবেক নায়েবে আমির মাওলানা তাফাজ্জল হক ১৯৬৩ সালে কর্মজীবনের শুরুতে জামিয়া ছাদিয়া রায়ধরে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে জামিয়া দারুল উলুম বরুড়া কুমিল্লায় ৩ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন।

১৯৬৫ সালের শেষ দিকে উত্তর ময়মনসিংহের ফুলপুর থানায় অবস্থিত কওমি পন্থী ও হেফাজতিদের প্রাণকেন্দ্র জামিয়া আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। উক্ত মাদ্রাসায় ৩ বছর হাদিস, তাফসীর, ফিকাহসহ কওমিদের বিভিন্ন কিতাবাদী শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকার যুবসমাজকে জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জঙ্গি-মৌলবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে। দিনে দিনে সেখানে তার ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েছে। তিনি তারাকান্দা বাজারে একটি জামে মসজিদ ও মদিনাতুল উলুম কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে ময়মনসিংহ চড়পাড়ায় আল জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শায়খুল হাদিস পদে নতুন চাকরি শুরু করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেট থেকে ময়মনসিংহে আসা-যাওয়ার সমস্যা হওয়াতে নিজ এলাকায় অবস্থিত জামিয়াতুল ইসলামিয়া আরাবিয়া উমেদনগর হবিগঞ্জ মাদ্রাসায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন। এখানে প্রায় ৪০ বছর শায়খুল হাদিস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হবিগঞ্জের ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা মোখলিসুর রহমানের মারা যাওয়ার পর উবায়দুর রহমান খান নদভী পরিষদের দায়িত্বভার মাওলানা তাফাজ্জল হকের উপর ন্যস্ত হয়। উক্ত জেলায় কথিত অনৈসলামিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ এবং তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ, প্রতিহতের নামে তার নেতৃত্বে তখন সন্ত্রাসের খড়্গ নেমে আসে জনসাধারণের উপর। 'উবায়াদুর রহমান খান নদভী পরিষদ' হবিগঞ্জ একটি জঙ্গি-মৌলবাদী সংগঠন। এই উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রম এখনো সক্রিয়। ২০০৩ সালে তিনি তার বাসার সংলগ্ন নুরুল হেরা মসজিদ কমপ্লেক্স নামক একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদটি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা আমির মাওলানা আহমদ শফীর দোয়ার মাধ্যমে ২৩ জানুয়ারি ২০০৩ সালে উদ্বোধন ঘোষণা করেছিলেন। তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ছাড়াও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

২০০৪ সালে বৃটেনের বার্মিংহামে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করে কাদিয়ানীবিরোধী ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তাদের নামে খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে জঙ্গি-মৌলবাদী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতেন।

একজন বক্তা হিসেবে দেশ বিদেশে তার সফর করার সুযোগে তিনি জঙ্গি মুজাহিদদের পক্ষে জিহাদী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশ হরকাতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে প্রকাশ্যে এই সংগঠনের জঙ্গি মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দিতেন। এদেশের এমন কোনো জেলা নেই, যেখানে তিনি সফর করেননি। তার ওয়াজে জিহাদ সম্পর্কে কোরাণ-হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে চলেছিলেন। হরকাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় শাখায় একজন প্রচারকারী নেতা ছাড়াও সিলেট বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে এই সংগঠনকে সবরকম সহযোগিতা প্রদান করতেন। যার কারণে তিনি জঙ্গি মুজাহিদদের একজন আদর্শ অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জমিয়তের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ও হেফাজতে ইসলামের সাবেক নায়েবে মাওলানা তাফাজ্জুল হক ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টায় মারা গেছেন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৫ বছর। তিনি ৫ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে গেছেন।

২৭. মুহাম্মদ তৈয়্যব

সাবেক নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রাচীন কওমি মাদ্রাসা 'আল জামেয়াতুল আরাবিয়া ইসলামিয়া' জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম। এই প্রতিষ্ঠানের সাবেক মুহতামিম ও হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা নায়েবে আমির মাওলানা শাহ মোহাম্মদ তৈয়্যব। তিনি ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম জেলার

পটিয়া থানার জিরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'আল জামেয়াতুল আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি' মাদ্রাসার মাধ্যমে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসা থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস (মাওলানা) টাইটেল অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি ভারতের নদওয়াতুল ওলামা মাদ্রাসা থেকে সম্মাননা ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি কওমি মাদ্রাসার জন্য চাঁদা তুলতে নিয়মিত আমেরিকা ভ্রমণ করতেন। এক সময় হেফাজতের এই নেতা নিজের জিরি মাদ্রাসা পরিচালনা করতে আর্থিক কষ্টে ভুগতেন। অথচ নিয়মিত আমেরিকা সফরের পর থেকে তার টাকার অভাব ছিল না। তিনি প্রতি বৎসর আমেরিকার বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যে টাকা সংগ্রহ করতেন, সেই টাকাকে কয়েকভাগে বণ্টন করতেন। একভাগ মাদ্রাসায় ব্যয় করতেন, আরেকভাগ নিজের জন্য রেখে দিতেন, তৃতীয় অংশটি 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম শাখার জন্য অনুদান হিসেবে দিতেন। এক অংশ হরকাতুল জিহাদে দেয়ার কারণ হল, তার বড় ছেলে মোহাম্মদ শোয়েব যিনি জঙ্গি ও আফগানিস্তান থেকে ফিরে হরকাতুল জিহাদ চট্টগ্রাম শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব এর 'আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদ্রাসা' চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে জঙ্গি মুজাহিদ নেতাদের একটি সুপ্রসিদ্ধ নিরাপদ আস্তানা। আন্তর্জাতিক হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর জঙ্গি নেতা সাইফুল্লাহ আখতার বহুবার বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি যখনই এদেশে আসতেন, তার সব ধরণের দায়িত্বে থাকতেন মুহাম্মদ তৈয়্যব। কওমিপন্থী উগ্রবাদী এবং মুজাহিদদের একত্রীকরণ, অর্থদান সহ সকল ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। হরকাত নেতা সাইফুল্লাহ আখতার যখন ১৯৮৮ সালে জানুয়ারিতে বাংলাদেশে সফরে এসেছিলেন, তখন তার সঙ্গে মিশরের আল-ইখওয়ান (মুসলিম ব্রাদারহুড) নেতা শায়খ আব্দুল মুইজ আবদুস সাত্তার মিশরীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল সারা পৃথিবী থেকে হরকাতের জন্য টাকা সংগ্রহ করে অর্থনৈতিকভাবে জঙ্গিদের শক্তিশালী করা।

মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব 'নেজামে ইসলামের' মাধ্যমে মুজাহিদ বাহিনীর নেতা মাওলানা সিদ্দিক আহমদ-এর হাত ধরে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না থাকলেও তিনি মৌলবাদী ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন সব সময়। যখন চট্টগ্রামে হেফাজত নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজীর নেতৃত্বে 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়্যত মুভমেন্ট' আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ হামলা করে তাদের সাইনবোর্ড উপড়ে ফেলে মমতাজীর সাইন বোর্ডটা লাগিয়েছেন তখন এই জঙ্গি সংগঠনকে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন মাওলানা তৈয়্যব। মাওলানা তৈয়্যব 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়্যত মুভেমন্ট'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ছিলেন।

২০১৩ সালে হেফাজতের উত্থানের কিছুদিন আগে 'আমার দেশ' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান আলেম ওলামাদের সঙ্গে সাক্ষাতের নামে সর্বপ্রথম মাওলানা তৈয়্যব-এর জিরি মাদ্রাসা গিয়েছিলেন। সেখানেই মাওলানা তৈয়্যব-এর সভাপতিত্বে মাহমুদুর রহমান উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক নায়েবে আমির ও জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরি'র মহাপরিচালক মাওলানা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব ২৪ মে ২০২০ মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে, নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

২৮. আশরাফ আলী নিজামপুরী

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলামের সহকারী মহাসচিব আশরাফ আলী নিজামপুরী ২০১২ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের রাজনৈতিক কারণে দেশে তার নতুন পরিচয় ঘটে হেফাজতের মুখপাত্র হিসেবে। যদিও কয়েক বছর আগে থেকে নিজামপুরীর জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর একজন প্রচার সম্পাদক হিসেবে কওমি মহলে ব্যাপক পরিচিতি ছিল তার। দেশের প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চরিত্র হননেও তার দূর্নাম রয়েছে। তার রচিত 'বুদ্ধিজীবী মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজী' গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে এমন কোনো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নেই, যাদের প্রতি তিনি বিষোদগার করেননি। নিজামপুরী উক্ত গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মিথ্যাচার করে গেছেন দেশের সূর্যসন্তানদের বিরুদ্ধে। চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই থানার অন্তর্গত জোরারগঞ্জের তেমুহনী নিজামপুর গ্রামে ১৯৬৯ সালে ২৫ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা বেলায়েত হোসাইন ও মাতার নাম ফাতেমা বেগম।

তেমুহনী তাজবিদুল কোরাণ মাদ্রাসায় কোরাণ শরীফ হেফজ শেষ করে আবুরহাট মুনিরুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জঙ্গি ও উগ্রপন্থী তৈরির কওমি কারখানা জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটাহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে বাকি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। ১৯৯০ সালে হাটহাজারী তথা হেফাজত ইসলামের বর্তমান ঘাঁটি থেকে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষার জন্য পড়তে গিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুজাহিদ, বিশেষ করে পাকিস্তান, কাশ্মির ও আফগান এবং ভারতীয় জঙ্গিদের সঙ্গে দেখা করেন।

ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষক এক সময়ের কাশ্মিরের তথাকথিত আজাদী আন্দোলনের মুখপাত্র মাহমুদ শাহ কাশ্মিরীর সঙ্গে তার সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে। সেই সুবাদে কাশ্মিরের মুজাহিদ গ্রুপের সঙ্গে পাকিস্তান হয়ে যুদ্ধ চলাকালীন আফগানে ভ্রমণ করেছিলেন। অন্যান্য বাংলাদেশি ছাত্রদের ন্যায় নিজামপুরী 'হরকাতুল জিহাদের' সদস্য হিসেবে আফগান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। কমান্ডার আশরাফ নামেও তার পরিচিত আছে।

১৯৯২ সালে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে এসেছিলেন। ভারতের দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে জিহাদ, হাদিস ও আরবি সাহিত্য কোর্স সমাপ্ত করে দেশে ফিরে ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম শহরের হরকাতুল জিহাদের কেন্দ্র হিসেবে

পরিচিত মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া লালখান বাজার মাদ্রাসায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি হরকাতুল জিহাদের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৯৩-২০০১ সাল পর্যন্ত লালখান বাজার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার পর তার কয়েকজন সহকর্মী মুজাহিদ বিশেষ করে জঙ্গি মুনির আহমদের মাধ্যমে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে হাটহাজারী মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। উগ্রপন্থি-জঙ্গিবাদীদের মুখপত্র 'মাসিক আল-হেলাল' পত্রিকার মধ্য দিয়ে সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আল-হেলাল ইসলামী সমাজসেবা পরিষদ নামে একটি বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিদেশ থেকে চাঁদাবাজি আরম্ভ করেছিলেন।

আশরাফ আলী নিজামপুরী হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফীর যেমনি খুবই আস্থাভাজন ছিলেন, তেমনি জুনায়েদ বাবুনগরীরও হওয়ার নেপথ্য কারণ হল নিজামপুরী। তিনি এদেশের সকল প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে নাস্তিক মুরতাদ ঘোষণার দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা নিজামপুরী তার রচিত 'বুদ্ধিজীবী মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজী' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আমাদের দেশ আজ বহুমুখী ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত, দেশের স্বাধীনতা হুমকির পথে। এ মুহূর্তে আমাদের নীরবে বসে থাকার সুযোগ নেই। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে ধর্মদ্রোহী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। তাছাড়া নাস্তিক, মুরতাদ ঐসব বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।'[২২]

মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু 'ইসলামী ছাত্র সমাজ' (নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন)-এর মাধ্যমে। পরে তিনি ছাত্র রাজনীতি ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে দক্ষ হওয়ায় মূল সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি কথিত নাস্তিক-মুরতাদের নামে, প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে 'নেজামে ইসলাম পার্টির' সভাপতি হেফাজতের সাবেক নায়েবে আমির আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদ মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী এবং হেফাজতের প্রয়াত সাবেক আমির জুনায়েদ বাবুনগরীর আস্থাভাজনে পরিণত হয়েছিলেন। নেজামে ইসলাম পার্টি ছাড়াও অন্যান্য মৌলবাদী ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের জনসভায় যোগদান করে থাকেন। পেশা হিসেবে গত ৩০ বছর তিনি শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা একই সঙ্গে করছেন।

২৯. উবায়দুর রহমান খান নদভী

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
উপদেষ্টা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী ১৯৬৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আতাউর রহমান খান নদভী, (মুজাহিদ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা) মাতার নাম মুরশিদা-ই-আমিনা। বর্তমানে তিনি বসবাস

করেছেন ২/১ আর কে মিশন রোড, ঢাকায়। শিক্ষকতা এবং সাংবাদিতকায় ৩০ বছর যাবৎ নিজেকে জড়িত রেখেছেন মাওলানা নদভী। পাশাপাশি গত ২৫ বছর জুম্মার নামাজের খতিব হিসেবে ঢাকার মিরপুরস্থ মদিনা নগর মসজিদে দ্বায়িত্ব পারন করছেন।

১৯৭৮ সালে দৈনিক আল-আজাদে মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। লেখার নাম ছিলো সাহিত্য সাধনা। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি রচিত 'আমার দেখা প্রাচ্য' নামের একটি গ্রন্থের অনুবাদ তার রচিত ও প্রকাশিত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত গ্রন্থ এবং নিজস্ব প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সা.)'। এছাড়া আরো বেশ কিছু বিতর্কিত গ্রন্থের জনক তিনি। মাওলানা নদভী রচিত আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী, ইতিহাসের কান্না, হৃদয় থেকে, নবীজী (সা.) কেমন ছিলেন, রক্তভেজা গুজরাট, ছেঁড়া পাতা, মুজাহিদের জীবনকথা এবং আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি বইগুলোর প্রত্যেকটিই যুব সমাজকে উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ করে। দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করার পাশাপাশি দেশের প্রায় সব বড় বড় কওমি মাদ্রাসাতে অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতেন মাওলানা উবায়দুর রহমান খান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উপমহাদেশের ভাষায় আরবির প্রভাব' বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন তিনি। তিনি ভ্রমণ করেছেন ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কুয়েত, কাতার, আবুধাবি, দুবাই, তুরস্ক ও সৌদি আরবসহ আরো কয়েকটি দেশ।

তিনি কিশোরগঞ্জ জামিয়া এমদাদিয়া কওমি মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স শেষ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের লক্ষ্মৌ শহরের 'নদওয়াতুল উলামা' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদিসের উপর বিশেষ কোর্স অর্জন শেষে 'নদভী' খেতাব প্রাপ্ত হন। সেখান থেকে দেশে ফেরার পর চট্টগ্রাম চাঁদগাও থানায় অবস্থিত 'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী'-এর ব্যুরো চীফ, হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব মাওলানা সুলতান যওক নদভী প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষকতা শেষে সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছায় ঢাকায় ফিরে আসেন। 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান' পত্রিকার মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিকতার জীবন শুরু।

১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক দশক মাওলানা মহিউদ্দিন খান-এর মৌলবাদী মুখপত্র 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান'-এর নির্বাহী সম্পাদক পদে নিয়োজিত ছিলেন। উবায়দুর রহমান খান নদভী নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এদেশের সাহিত্যিক, কবি, লেখক, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী ও অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের বারবার নাস্তিক-মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে তাদের হত্যার জন্য জঙ্গিদের প্ররোচিত করেছেন। ২০০০ সালে যুদ্ধাপরাধী মাওলানা মান্নানের 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি আরো বেশি উগ্র হয়ে উঠেন। ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিষোদগার করে চলেছেন।

তার লিখিত 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' বইটি বাংলাদেশি জঙ্গিদের খুবই প্রিয় একটি বই। উক্ত বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'সেই ঈমান, আবেগ ও নিপীড়িত বনী আদমের প্রতি অগাধ ভালোবাসার দাবিতেই এই গ্রন্থটি। এতে যদি বিশ্ব-মুসলিম, বিশেষ করে বাংলাদেশের কোটি কোটি তাওহীদি জনতার একজনের বুকেও ঈমান-আকীদা-ইজ্জত ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য লড়াই করার জযবা, খোদার পথে সবকিছু কুরবানী দেয়ার অদম্য উদ্দীপনার জন্ম এবং সশস্ত্র জিহাদের অনুপ্রেরণা জাগে, তবেই আমার শ্রম সার্থক'।

এই গ্রন্থে তিনি আরও লিখেছেন– 'বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার কাছে আরজ আপনারা ভেবে দেখুন, খোদাদ্রোহী শাসন ও বিশ্ব জুড়ে তাগুতী শক্তির বিস্তৃত জালে আটকা পড়ে আমরা যে ধরনের লাঞ্ছিত জীবনযাপন করছি, এখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার হতে হলে সশস্ত্র জিহাদের পথ বেছে নিতে হবে। আমার তো মনে হয়, আফগান জিহাদের পদাংক অনুসরণ করে খোদাভীতি, ঈমান, আমল-ইখলাস ও সশস্ত্র সংগ্রামের খুনরাঙ্গা পথই বেছে নিতে হবে। শুধু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলমানেরই নয়, বরং বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উম্মতে মুহাম্মদীর ১২৫ কোটি সদস্যকেই বেছে নিতে হবে সশস্ত্র এই খুনরাঙ্গা পথ। আফগান মুজাহিদীনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে, বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহর সার্বিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন ও পূর্ব-ইউরোপসহ সারা বিশ্বের সকল মজলুম মুসলমানের বিজয় ও সাফল্যের জন্যে, বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্যে সশস্ত্র জিহাদ ও সংগ্রাম করতে হবে। নিজের বুকের তপ্ত-তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের বাগিচাকে সিঞ্চিত করার জন্যে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়।'[২৩]

৩০. সালাহউদ্দীন নানুপুরী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা সালাহউদ্দীন নানুপুরী ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন নানুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা জমিরউদ্দীন নানুপুরী। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয় আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া উবাইদিয়া নানুপুর মাদ্রাসা থেকে। উক্ত মাদ্রাসা থেকে প্রাইমারী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ দাওরায়ে হাদিস স্তরের পড়াশোনা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার্জনের জন্যে দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাদিসের উপর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই তার বাবা মাওলানা জমিরউদ্দীন পরিচালনাধীন মাদ্রাসা চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার জামিয়াতুল ইসলামিয়া উবাইদিয়া নানুপুর-এ সাধারণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তার পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি উক্ত মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্বে আসীন হন। বর্তমানে মাওলানা

সালাহউদ্দীন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির। তার সাত ভাই ও এক বোন। তিনি ভাইদের মধ্যে সবার বড়।

আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি জঙ্গি মুজাহিদদের একটি প্লাটফর্মের নাম 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ'। ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল হরকাতুল জিহাদের আহ্বানে আফগান ফেরত মুজাহিদ আর কওমি উগ্রপন্থিদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল জঙ্গিবাদী একটি আন্দোলন 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ'। মাওলানা সালাহউদ্দিন সেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় একজন নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিনি বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ওয়াজের মাধ্যমে উগ্রবাদ প্রচার করার জন্য সফর করে থাকেন। যার কারণে হেফাজতপন্থী কওমিদের নিকট তার পরিচিতি জঙ্গি কমান্ডার সালাহউদ্দীন নামে। 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী' এই মন্ত্রে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত করে নিজেদের ফায়দা হাসিল করে সালাহউদ্দীন হয়ে যান অনেক বিত্তের মালিক।

হেফাজত নেতা মাওলানা সলিম উল্লাহ ও হাবীবুর রহমান-এর সঙ্গে হেফাজত নেতা মাওলানা সালাহউদ্দীন-এর তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার নানুপুর, খিরাম, কাঞ্চননগর, রাঙ্গামাটিসহ কয়েকটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ৯০ দশকের পর থেকে মুজাহিদদের জিহাদী ক্যাম্প ও সশস্ত্র ট্রেনিং কেন্দ্র খুলে হরকাতুল জিহাদের পক্ষ থেকে তিনি পরিচালনা করতেন। সেইসব ট্রেনিং কেন্দ্রের অর্থের যোগান আসতো তার পিতার মুরীদানদের নিকট হতে। উল্লেখ্য, তার পিতা মাওলানা শাহ জমিরউদ্দীন একজন কওমিপন্থী পীর। তিনি পীরগিরির কেরামতির নামে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরও কাবু করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এই পীরের পদে মাওলানা সালাহউদ্দীন আসীন আছেন। তিনি দেশ-বিদেশ থেকে মাদ্রাসা-মসজিদ ও এতিমদের জন্য টাকা সংগ্রহের নামে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত এবং জিহাদী সংগঠনের কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতেন।

এই হেফাজত নেতার পিতা শাহ জমিরউদ্দিন রাজনীতিতে প্রবেশ না করলেও তিনি বার বার দল পরিবর্তন করে সুবিধাবাদী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার শিক্ষা জীবনেই স্বাধীনতাবিরোধী নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সমাজ-এর রাজনীতিতে নাম লেখান। হেফাজতের বর্তমান আমির মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী লাদেন শিষ্য মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গেও দীর্ঘদিন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পরে মুফতি ফজলুল হক আমিনীর দলে নাম লেখান। একে একে ইসলামী মোর্চা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি এবং খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের একজন কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আফগান ফেরত মুজাহিদদের দল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই ডি এল) এর সঙ্গেও কিছুদিন নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

৩১. আহমদ উল্লাহ আশরাফ

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সাবেক আমির, খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ

মাওলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফ লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাবেক আমির জামিয়া নুরিয়া কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক উপদেষ্টা।

আহমদ উল্লাহ আশরাফের পরিচিতি বর্ণনা করতে গেলে তার বাবা হাফেজ্জী হুজুরের নাম চলে আসে। জঙ্গিবাদীদের প্রিয়ভাজন হিসাবেও প্রথমেই চলে আসে তার নাম। তিনি হরকাতুল জিহাদের আফগান ফেরতদের (মুজাহিদ) নিজের মাদ্রাসার ভিতরে আস্তানা গড়ার জন্য বিশাল স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুজাহিদদের মুখপত্র 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' পত্রিকা ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বন্ধ করে দেয়ার পর আহমদ উল্লাহ আশরাফের বাবার 'মাসিক পত্রিকা রহমত'কে মুজাহিদদের জন্য ২০০০ সালে দান করে দিয়েছিলেন, যার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন ছিলেন আফগান ফেরত মুজাহিদ জঙ্গি মনযুর আহমদ। আহমদ উল্লাহ আশরাফ আফগান ফেরত মুজাহিদদের নিজের মাদ্রাসায় নিরাপদ আস্তানা ও পত্রিকা দেয়া ছাড়াও নিজের দলের ২০ দলীয় জোটের শরীক দল খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিবের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আফগান ফেরত সেই মুজিবুর রহমান হামিদীকে যিনি বর্তমানে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম-মহাসচিব।

দীর্ঘ এক দশক হরকাতুল জিহাদের প্রচার-প্রকাশনাসহ যাবতীয় কার্যকলাপ আহমদ উল্লাহ আশরাফ-এর জামিয়া নূরীয়া মাদ্রাসায় বসেই চালিয়ে এসেছিলেন। বর্তমান রহমত২৪ ডটকম পত্রিকার অফিস তার মাদ্রাসায়। আফগান ফেরত মুজাহিদরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে রাজনীতির ময়দানে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। সর্বশেষ খেলাফত আন্দোলনকেই তাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। মাওলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফ ইসলামী খেলাফত আন্দোলনের জন্য রাজনীতি করলেও ক্ষমতার স্বার্থে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে জোট করতে কোনো সমস্যা হয়নি কখনো। যদিও তিনি সবসময় নারীনেত্রী এবং জামায়াত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেন।

একাত্তরের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'মাসিক রহমতকে' এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের গেইটে তিনি জাতীয় পতাকা এবং মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ বিক্রি করেছেন।'[২৪]

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে এই বিষয়ে তার অভিমত কী জানতে চাইলে তিনি 'মাসিক রহমতকে' বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচারকাজ পরিচালিত হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি বলতে চাই, এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিঃসন্দেহে খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমের দু'টি ধারা তখন দু'দিকে প্রবাহিত ছিল। সুতরাং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উচিত মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতাবিরোধী এবং

যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদেরকে একত্রিত করে একযোগে কাজ করা। তাহলে দেশ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। বিচারের নামে বিভাজনের প্রয়োজন নেই। আমরা স্বাধীনতার সময়ের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখিত, তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।'[২৫]

মাওলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফের রাজনৈতিক জীবন শুরু তার পিতা হাফেজ্জী হুজুরের হাতে গড়া সংগঠন 'খেলাফত আন্দোলন' বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তার পিতার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হওয়ায় তিনি খেলাফত আন্দোলনের সব কর্মকাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুজুর) মৃত্যুর পর তিনি উক্ত সংগঠনের আমিরে শরীয়তের দায়িত্ব পান। পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয়– তখন তিনি উক্ত জোটের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি মুফতি আমিনীর গঠিত জঙ্গি সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির সিনিয়র নেতা হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০১৩ সালের ৫ মে সরকার উৎখাতের জন্য হেফাজত মতিঝিলে মহাসমাবেশ করে, তখন তার কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসা ছিল হেফাজতের নেতাদের প্রধান দুর্গ। তিনি ২০১৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন।

৩২. মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (সাবেক এমপি)

সাবেক নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস যশোর জেলার মনিরামপুর গ্রামে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাহাদুরপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা ভারত থেকে দাওরায়ে হাদিস ও মুফতি (ইফতা) অর্জন করেন। লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন শায়খুল হাদিস হিসেবে খুলনা দারুল উলুম, যশোর রেল স্টেশন মাদ্রাসা, জামিয়া শরইয়্যা মালিবাগ, ঢাকা ও জামিয়া এমদাদিয়া মাদানীনগর মাদ্রাসা, মনিরামপুর, যশোর। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সভাপতির পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

মুফতি ওয়াক্কাস ১৯৮৬ সালে নিজ এলাকা যশোরে মনিরামপুর থেকে সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন। ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং এরশাদ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও হুইপের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০০১-এর অক্টোবরের নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে বিএনপির ধানের শীষ মার্কায় তৃতীয়বারের মত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হেফাজতে ইসলামের রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গি মৌলবাদী আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন মুফতি ওয়াক্কাস। সংগঠনটির ১৩ দফার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আহমদ শফীর আহ্বানে ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল ওলামা মাশায়েখ

সম্মেলনে তিনি তার বক্তব্যে সরাসরি চারদলীয় জোটের পক্ষ নিয়ে যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, হঠাৎ শ্রোতারা প্রতিবাদ করেছিলেন। শুরু হয় বৃষ্টির মত জুতার আক্রমণ এবং সেই বৈঠকে চরমোনাইর পীরের সাথে তার বিবাদ সৃষ্টি হয়। সরকারবিরোধী আন্দোলনে হেফাজতকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ রয়েছে, হেফাজতে ইসলামের আমির আহমদ শফীর ছেলে মাওলানা আনাসকে চার দলীয় জোট থেকে মোটা অংকের টাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন তিনি।

হেফাজতে ইসলামের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, '১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে যেদিন হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ শাখা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, সেদিনের বিশেষ অতিথি হিসেবে মুফতি ওয়াক্কাস নিজেকে জিহাদীদের একজন সহযোগিতাকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, এই দেশ হবে আফগানিস্তানের মত একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দেশ। এদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য যদি জীবন দিতে হয়, তাহলে আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের এখন থেকে এদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ করে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে জিহাদের বাণী সবার নিকট পৌঁছে দিতে হবে। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে মুজাহিদ তৈরি করতে হবে। জাতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সর্বত্র জিহাদ ছড়িয়ে দিতে হবে।'[২৬]

২০০১ সালে মুফতি ওয়াক্কাস যখন ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, তখন থেকেই সারা দেশে আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদরা দেশজুড়ে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মুফতি ওয়াক্কাসের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে। তিনি দীর্ঘদিন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বে যখন ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয় তখন তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম-মহাসচিব ছিলেন। পরে যখন আমিনী ও শায়খুল হাদিস দুই ভাগ হয়ে যায় তখন তিনি মুফতি আমিনী গ্রুপে চলে আসেন এবং এই অংশের গ্রুপের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০০০ সালে যখন মুফতি আমিনীর নেতৃত্বে মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় তখন মুফতি ওয়াক্কাস সেই কমিটির মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মুফতি ওয়াক্কাস ২০০০ সালে ইসলামী আইন এবং কুরআনি শাসনের নামে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং চার দলীয় বিএনপি-জামায়ত জোটের নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ছিলেন। মূলত হেফাজতে ইসলামকে সহযোগিতা করার জন্য বিএনপি-জামায়াতের ২০ দলীয় জোটের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতের তাণ্ডবের দিন মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মুফতি ওয়াক্কাস সেদিন দীর্ঘ সময় বক্তব্য দিয়েছিলেন।

'হেফাজতের আমির আসছেন, আসবেন ইত্যাদি বলে হেফাজতের জঙ্গি নেতা-কর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন। সে দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং তিনি কারাগারে যান। পরবর্তীকালে তিনি জামিনে মুক্ত হন। তিনি একাধিক মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পাকিস্তান আমলে তিনি তার মুর্শিদ তাজাম্মুল আলীর তত্ত্বাবধানে জমিয়তের কাজে জড়িত হন। তাজাম্মুল আলী গরুর গাড়িতে করে জমিয়তের নানা প্রোগ্রামে হাজির হতেন এবং সফরসাথি হিসেবে তিনি জমিয়তের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

মুফতি ওয়াক্কাস বাহাদুরপুর কামিল মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া বাহাদুরপুর শাখার ভিপি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে শাহ আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়া ও শায়খুল হাদিস আজিজুল হক জমিয়তের সভাপতি থাকাকালীন তিনি খুলনা বিভাগ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সেক্রেটারি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জমিয়তের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর আন্দোলনে যোগদান করলে তিনিও জমিয়াতের সিদ্ধান্তক্রমে খেলাফত আন্দোলনের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে যান। খেলাফত থেকে জমিয়ত বের হয়ে এলে জমিয়তের কর্মী হিসেবে তিনিও খেলাফত থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে শামসুদ্দীন কাসেমীর সরাসরি নির্দেশে মুফতি সাহেব দামাত জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অতঃপর সংসদে হুইপের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে মাওলানা শামসুদ্দিন সহ অন্যান্য নেতারা জমিয়াতের পক্ষ থেকে মুফতি ওয়াক্কাস সাহেবকে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে বিশাল গণসংবর্ধনা প্রদান করেছিলেন। নব্বইয়ের দশকে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিনি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন জমিয়াতের রাজনীতিতে। ১৯৯১ সালে ঢাকার মিরপুর আরজাবাদ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের জাতীয় কাউন্সিলে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে জমিয়তের মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জমিয়তের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০১৮ সালের ১১ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে তাকে জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সাবেক উপদেষ্টা মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস ২০২১ সালের ৩১ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

৩৩. প্রিন্সিপাল হাবীবুর রহমান

সাবেক নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাবেক আমির, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

সিলেট কাজীরবাজার জামে মসজিদের সাবেক খতীব, জামিয়া মাদানীয়া কাজীর বাজার মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল ও তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের জঙ্গিবাদী নেতা হাবীবুর রহমান ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের প্রভাবশালী কেন্দ্রীয়

নায়েবে আমির হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তার জন্ম ১৯৫৩ সালের ৮ জুলাই সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হাজীপুর (ঘনশ্যাম) গ্রামে। তার পিতার নাম মাওলানা মাহমুদ আলী এবং মাতার নাম আছিয়া খাতুন। তিনি ফুলবাড়ি ইউনিয়নের বাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রুস্তমপুর কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে ফুলবাড়ি আল-জামিয়া আজিজিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসা থেকে দাখিল (এসএসসি), আলিম (এইচএসসি) ও ফাজিল (স্নাতক) পাশ করেন ১৯৭০ সালে। ১৯৭৩ সালে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদিস বিভাগে কামিল (মাষ্টার্স) পাশ করে শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন।

লেখাপড়ার শেষে কর্মজীবনের শুরুতেই কাজীরবাজার জামে মসজিদের ইমামতিকে প্রথম পেশা হিসেবে বেছে নেন ১৯৭৩ সালে। ঐ এলাকায় ১৯৭৪ সালে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তার উদ্যোগে নির্মিত হয় জামিয়া মাদানিয়া কাজিরবাজার কওমি মাদ্রাসা।

মাওলানা প্রিন্সিপাল হাবীবুর রহমান তার ডায়েরী 'কাফেলা'তে লিখেছিলেন, 'শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর পথে জিহাদ অর্থাৎ সিলেটে প্রকাশ্যে কোনো নাচ, গান, জুয়া, যাত্রা এবং নাস্তিক মুরতাদদের আগমন ঠেকানো, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা।...যে উদ্দেশ্যে এ কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা আজ শতভাগ পূর্ণ হয়েছে। আমাদের দুইশত ছাত্র বর্তমানে লন্ডনে রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭০ জন নিজস্ব মসজিদ তৈরি করে ফেলেছে। ৮/১০ জন কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। আরব আমিরাতে আছে ৫৫ জন, সৌদি আরবে আছে ৫০ জনের বেশি। আমেরিকা ও ইতালিতে পাঁচজন, সাতজন করে আমার এ মাদ্রাসার ছাত্র আছে। মোটকথা বিশ্বের অনেক দেশেই আমরা আমাদের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানী দলকে সিলেট জাতীয় শ্রমিক সমাজ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা ইউসুফ বলেন, 'বিশেষ করে লন্ডনে তার ছাত্রদের থেকে টাকা এনে জঙ্গিবাদকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর থেকেই মাওলানা হাবীবুর রহমান বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। মসজিদ-মাদ্রাসা, তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলন ও ইসলামী রাজনীতির অজুহাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর মিশন বাস্তবায়ন করতেন।'

'ইসলামী বিপ্লব' বুলেটিন-এর একটি প্রতিবেদনের তথ্যমতে, '১৯৮১ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকায় এম.সি কলেজের অধ্যাপক সরদার আলাউদ্দিনের একটি প্রবন্ধ ছাপা হলে কোরাণ অবমাননার দোহাই দিয়ে মাওলানা হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বে সমগ্র সিলেটে তথাকথিত মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা হয়। তখনকার এ প্রতিরোধ আন্দোলন চলাকালে ৪ জন মারা গেলে তাকে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরে তাকে মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। শুধু

মামলা থেকে অব্যহতি নয়, এমনকি তৎকালীন সরকার তাদের তিন দফা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

'১৯৯০ সালের ২৪ জুন, স্থানীয় কাজিরবাজার এলাকায় রমজান মাসে প্রকাশ্যে পানাহার বন্ধের দাবিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে তার নেতৃত্বে দোকানে হামলা চালিয়েছিলেন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে শতাধিক আহত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। এরপর সারাদেশের জঙ্গি-মৌলবাদী গোষ্ঠি ফুঁসে উঠেছিল। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর মাওলানা হাবীবুর রহমান আরো উগ্র, আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৭৯ সালে সৌদি আরবের হারাম শরীফে অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদ বিক্ষোভের নামে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অজুহাতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সিলেটে হরতাল ডাকা হয়েছিল তার নেতৃত্বে। হরতালের নামে তখন স্থানীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও তাদের ঘরবাড়ি, মন্দিরে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়েছিল। হাবীবুর রহমানের উগ্র-জঙ্গি বাহিনীর হামলার শিকার হয়ে তখন অনেক হিন্দুপরিবার দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৯৫ সালের ১৩ অক্টোবর বসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত তৎকালীন মুজাহিদ স্বেচ্ছাসেবক মহাসমাবেশে সিলেট অঞ্চলের পক্ষ থেকে হাবীবুর রহমান জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে জঙ্গিদেরকে উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে সিলেটের আঘালিয়া গ্রামে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিআর-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তার জঙ্গি বাহিনী। এ আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত সর্বদলীয় গণসংগ্রাম কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম শীর্ষ নেতা।

১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আদালতে সাহাবা বা ইসমতে আম্বিয়াসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বায়েদ সংরক্ষণের ও তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিহতের লক্ষ্য নিয়ে মাওলানা হাবীবুর রহমান দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উগ্রবাদী আলেম-ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক এবং আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ'। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে সিলেটসহ সমগ্র বংলাদেশে জঙ্গি-মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলনের নামে আহমদিয়া জামাতের নিরীহ জনগোষ্ঠির উপর বর্বর হামলা চালানো হয়েছিল তার নেতৃত্বে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাদিয়ানী বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে হাবীবুর রহমান-এর চরম উস্কানিমূলক বক্তৃতার পর দেশজুড়ে আহমদীয়া জামাতের উপর হামলা ও আক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন মসজিদের সাইনবোর্ড নামিয়ে লাগানো হয়েছিল আহমদিয়া জামাত উপাসনালয় নামের ব্যানার।

১৯৭৭ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে একটি মেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, এ মেলাকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী গোষ্ঠী তার নেতৃত্বে মেলা বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তারা তৎকালীন জেলা প্রশাসককে মেলা বন্ধ করার দাবি জানালে জেলা প্রশাসক সাথে সাথে তা প্রত্যাখান করেছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি উক্ত প্রদর্শনী বন্ধের দাবিতে জঙ্গি-মৌলবাদীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল তার নেতৃত্বে।

মিছিলের এক পর্যায়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'শাহজালালের মাটিতে কোনো মেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে দেওয়া হবে না। মেলাকে অবশ্যই প্রতিরোধ করা হবে, নয়তো আমরা শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছি।' পুলিশের উপর হামলা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে থানা হাজতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ দিন মধ্যরাতেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে প্রশাসন তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। একই সাথে মেলা প্রদর্শনীও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

৯০-এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশের আলোচিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে প্রতিরোধের নামে জঙ্গিবাদী কর্মসূচী দিয়ে হাবীবুর রহমান দেশ-বিদেশে আলোচনায় চলে আসেন। ১৯৯৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেট রেজিষ্ট্রারী মাঠে উগ্র সমর্থক গোষ্ঠির বিশাল সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে তিনি সিলেট থেকে সারা দেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম লেখক তসলিমাকে গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, তার সকল লেখা বাজেয়াপ্ত ও মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড আইন প্রণয়নের জোর দাবি জানিয়েছিলেন। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম পাঁচ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিলেন।

সেই সময়কার সরকার হাবীবুর রহমান কর্তৃক দাবি না মানার কারণে ১৯৯৩ সালের ৯ অক্টোবর হরতালের ডাক দিয়েছিল। তার নির্দেশে সিলেট জুড়ে হরতাল পালিত হয়েছিল। একই বছর ১৯ অক্টোবর তার উদ্যোগে ঢাকায় কওমিপন্থী আলেম ও জঙ্গি-মুজাহিদদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২১ অক্টোবর এ প্রেক্ষাপটে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ২৮ নভেম্বর তার নেতৃত্বে কয়েক হাজার জঙ্গি ও মৌলবাদীদের মিছিল জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রা করেছিল। পুলিশ গতিরোধ করলে তৎকালীন সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কাছে তার নেতৃত্বে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে তথাকথিত ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড আইন পাশের জোর দাবি জানিয়েছিল। ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। কর্মসূচী চলাকালে 'আরমান' নামক এক কিশোর মারা গিয়েছিল। ১ জুলাই তার নেতৃত্বে একজন মন্ত্রীর গাড়ীবহরে বিনা উস্কানিতে হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় ৩ জুলাই হাবীবুর রহমান-এর প্রতিষ্ঠিত সিলেটের আল-জামিয়া মাদানীয়া কাজির বাজার মাদ্রাসায় পুলিশ অভিযান চালালে অনেক জিহাদী বই, সিডি-ভিসিডি, দেশীয় অস্ত্র এবং বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করেছিলেন। তখন অর্ধশতাধিক জঙ্গি ঐ মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ১২ জুলাই রেজিষ্ট্রারী মাঠে সমাবেশের

ডাক দিয়েছিল। তার উদ্যোগে ১৯৯৪ সালের ২৭ জুলাই এনজিওদের সকল কার্যক্রম, তথাকথিত নাস্তিক-মুরতাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড আইন প্রণয়ন, গ্রেপ্তার করা জঙ্গিদের মুক্তির দাবিতে নজীরবিহীন লুটপাট ও হামলা চলেছিল সিলেট শহর জুড়ে। জঙ্গিদের ভয়ে শহরের অলিগলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছিল এনজিও এবং সংখ্যালঘুদের উপর।

১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল মাওলানা হাবীবুর রহমানের নেতৃত্বে 'কবি শামসুর রাহমানের সিলেটে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান' প্রতিরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে ১৭ এপ্রিল সিলেট পৌর পয়েন্টে জঙ্গি সংগঠন সাহাবা সৈনিক পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মৌলবাদীদের সমাবেশ। উক্ত সমাবেশে তিনি বাংলাদেশের প্রগতিশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি চরম হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'সিলেটে কাউকে কোনো সংবর্ধনা কিংবা আসতে দেয়া হবে না।' ঘটনার দিন সমস্ত সিলেট শহর জুড়ে মৌলবাদীদের মিছিল চলে। ফলে পূর্ব নির্ধারিত কবি শামসুর রাহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা নেতা লাদেনের এই শিষ্য দেশে ফিরে আফগান জিহাদের উপর লিখেছিলেন 'আফগান রণাঙ্গনে কয়েকদিন' নামক একটি বই। উক্ত বইয়ের তথ্যমতে, '২০০০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণ বিরোধী আন্দোলনের নামে তিনি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বাহানা দিয়ে টানা ৭ মাস সিলেট শহর কার্যত জঙ্গি-মৌলবাদীদের তাণ্ডব চলে। হেফাজতে ইসলামের সাবেক কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির, ওসামা বিন লাদেনের শিষ্য, এদেশের উগ্র মৌলবাদীদের অন্যতম নেতা মাওলানা হাবীবুর রহমান আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর দাওয়াতের মাধ্যমে পাকিস্তান হয়ে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতসহ তার সফরের বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন 'ইসলামী বিপ্লব' নামে একটি বিশেষ বুলেটিনে।

মাওলানা হাবীবুর রহমান ছিলেন শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিসের সঙ্গে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তৎকালীন সময়ে জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়া মুসলিম ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিলেট জেলা শাখার সেক্রেটারী এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের সফরসঙ্গী হিসাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেছিলেন এবং তিনি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে শায়খুল হাদিস খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠা করলে তিনি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন।

চারদলীয় জোট সরকারের শরিক দল খেলাফত মজলিস (শায়খুল হাদিস) গ্রুপের নায়েবে আমির থাকার সুবাদে জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের পাঁচ বছরেই

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আর্শীবাদ পেয়েছিলেন ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত। প্রকাশ্যে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী দিতে দ্বিধা করেননি যার কারণে দেশজুড়ে জঙ্গিদের আস্ফালন বেড়ে যায়। বিশেষ করে সিলেট হয়ে ওঠে জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হেফাজতের নায়েবে আমিরের পাশাপাশি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের চেয়ারম্যান এবং জঙ্গি সংগঠন 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ'-এর আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালের ১৯ অক্টোবর রাত ১২টায় সিলেটের নিজ বাসায় প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৩ মেয়ে রেখে গেছেন।

৩৪. মুহাম্মদ ইদ্রীস

সাবেক নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আল-জামেয়াতুল আরাবিয়া নাছিরুল ইসলাম নাজিরহাট, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামী ঐক্যজোট-এর সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম পূর্ব নাসিরাবাদ জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার সুন্দরপুর ইউনিয়নের ছোট সিলনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়েদ আমিনুল হক। তিনি ভুজপুর কাজিরহাট এমদাদুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা শেষে হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৭৬ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে হাদিসের সনদ অর্জন করেন। পরের বছর তিনি হাদিসের বিশেষ কোর্স সমাপ্ত করে শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি যশোর জেলার শাহবাদ আলিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আল-জামেয়া আরাবিয়া নছিরুল ইসলাম নাজিরহাট মাদ্রাসায় শায়খুল হাদিস ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব শেষে মাদ্রাসার মজলিশে শুরার সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে ২০০৪ সালে তাকে মহাপরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

হেফাজতের এই নেতা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সফর করে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে যুবসমাজকে জিহাদের প্রতি আহ্বান করার পাশাপাশি গণতন্ত্র, আওয়ামী লীগ সরকারসহ প্রগতিশীল লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিষোদগার করতেন। তিনি ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে অন্যান্য দলের নেতানেত্রীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করতেন। তার সম্পাদিত জঙ্গিদের মুখপত্র 'দাওয়াতুল হক' ৯০ দশকের পর থেকে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকসহ সাধারণ শিক্ষিতদেরও উগ্রতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। জামায়াত-বিএনপির ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় থাকাকালীন তার মাদ্রাসায় জঙ্গিদের আনাগোনা ও জিহাদী সশস্ত্র ট্রেনিং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সময় উত্তর চট্টগ্রাম বিশেষ করে হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি থানার পাহাড়ী এলাকায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদসহ দেশিয় জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে তার পরিচালনাধীন মাদ্রাসাকে ব্যবহার করা হতো।

তিনি মাদ্রাসা পরিচালনার নাম করে দেশে জঙ্গিবাদী আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও কাতারসহ বহুদেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি বছর বিদেশ সফর করতেন। ২০২০ সালের ২৮ মে মাওলানা ইদ্রিস মারা গেছেন।

৩৫. মুফতি আহমদ উল্লাহ

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সহ-সভাপতি, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির আহমদ উল্লাহ ১৯৪১ সালের ১২ মে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত নাইখানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা ঈসা।

পিতার কাছে ৭ বছর বয়সে তিনি কোরাণের নাজেরা শেষ করেন। অতঃপর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে ১০ বছর বয়সে কোরাণের হেফজ (মুখস্থ) সমাপ্ত করে কিতাব বিভাগে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি জিরি মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তান গমন করে জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোরে ভর্তি হন। সেখানে দাওরায়ে হাদিসের কিতাবাদি আবারও অধ্যায়ন করেন। দারুল উলুম করাচীতে মুফতি শফী উসমানীর তত্ত্বাবধানে ফতোয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এখানে মুহাম্মদ তাকি উসমানী তার সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

১৯৬৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ২৩ বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৯ সালের শেষ দিকে তিনি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তিনি সংগঠনটির নায়েবে আমির বা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি ইসলামী ফিকহ একাডেমি বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষক এবং সালসাবিল সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি ১৯৬৭ সালে ভারত থেকে দেশে এসে আল জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন জিরি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শেষে শায়খুল হাদিস পদে উন্নীত হন। ১৯৯০ সালে জামিয়া পটিয়ায় মুহাদ্দিস ও মুফতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

তার প্রকাশিত গ্রন্থাবলি- ১. দাফউল ইলতিবাছ, ২. মাশয়ায়েখ চাটগাঁ, ৩. তাজকেরাতুন নূর, ৪. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ডেসটিনি (এম.এল.এম) ব্যবসা, ৫. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ব্যবসা, ৬. দোয়া ও মুনাজাত ইত্যাদি।

তিনি জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ-এ তিনি দীর্ঘদিন উপদেষ্টা এবং ফতোয়া বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পটিয়া আল জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতি পদে নিয়োজিত থাকাকালীন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী তার নামে ফতোয়া জারি করতেন। তিনি হরকাত জঙ্গিদের একজন পরামর্শক হিসেবে খুবই সম্মান পেতেন। জঙ্গিদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলে, তিনি সব সময় মধ্যস্থতা করে দিতেন। কাউকে পছন্দ না হলে হরকাত সদস্যরা তার ফতোয়া জারির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কথিত কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করতেন। হরকাতের সকল অর্থ কোথায় কিভাবে বণ্টন, ব্যয় করবেন সে বিষয় তিনি তার সুবিধা মোতাবেক ফতোয়া দিতেন।

মুফতি আহমদ উল্লাহর রাজনীতির শুরু স্বাধীনতাবিরোধী নেজামে ইসলাম পার্টি দিয়ে। আল জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদ্রাসায় ছাত্রাবস্থায় নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৬৮ সালে ফিরে এসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম হিন্দ থেকে বাংলাদেশ জমিয়ত হয়ে নেজামে ইসলামের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-এর দায়িত্ব পালন করেন।

নেজামে ইসলাম সংগঠনকে '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সহযোগিতা করার কারণে '৭২-এর সংবিধানে জামায়াতে ইসলামীর মতো নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মেজর জিয়াউর রহমান আবার ধর্মের নামে রাজনীতি চালু করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও হেফাজতের নায়েবে আমির এবং জমিরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিছ হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

৩৬. হেলাল উদ্দীন নানুপুরী বিন জমির

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান, আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

হেফাজতে ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পাদক এবং জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা হেলাল উদ্দীন ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন নানুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসার সাবেক পরিচালক, কথিত পীর মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী। মাওলানা হেলাল উদ্দীন ছাত্রজীবন শুরু করেন তার পিতা মাওলানা শাহ জমির উদ্দীনের হাত ধরেই। জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। তার পিতা মাদ্রাসার পরিচালক হওয়ার সুযোগে তিনি অল্প দিনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক এবং

পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পেয়ে যান। ধীরে ধীরে তিনি মাদ্রাসার নীতি নির্ধারণী কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

তিনি ছাত্রজীবনে হরকাতুল জিহাদ এবং 'নেজামে ইসলাম পার্টি', 'ইসলামী ঐক্যজোটের' রাজনীতির পাশাপাশি জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসা থেকে যে সব জঙ্গি-মৌলবাদী হরকাতের সদস্য বা জঙ্গি ট্রেনিং নিতেন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করেছেন। তার নেতৃত্বে ফটিকছড়ি নানুপুরের খিরাম পাহাড়-জঙ্গলে জঙ্গি ট্রেনিং হতো। হেলাল প্রভাব কাটিয়ে 'নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসার' প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সুলতান আহমদ নানুপুরীর ছেলের কাছ থেকে পরিচালকের আসন কেড়ে নিয়ে নিজের বড় ভাইকে দিয়ে দেন।

মাওলানা হেলাল উদ্দীন 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির' সদস্য হওয়ার প্রভাব খাটিয়েও অনেক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড করেছেন। ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গি-মৌলবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। মাওলানা হেলাল উদ্দীন যে সব মৌলবাদী-জঙ্গিবাদী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রাজনীতি করেন সেগুলো হচ্ছে– ইসলামী ঐক্যজোট, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী আন্দোলন (চরমোনাই), ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি।

১৯৯৮ সালে জনসেবার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুর জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার তৎকালীন প্রধান পরিচালক মাওলানা জমির উদ্দিন আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামের একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বাবার স্মৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তার মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন তারই সাত সন্তান।

এই সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যানসহ ৩ জন পরিচালক জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার মধ্যে ৩ জন পরিচালকই সহোদর। সবাই হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা। সংগঠনের বর্তমান চেয়ারম্যান মাওলানা হেলাল উদ্দীন হচ্ছেন হেফাজতের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। মাওলানা সালাহ উদ্দীন হচ্ছেন হেফাজতের নায়েবে আমির। আরেকজন হচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতা।

আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সরকারের এনজিও ব্যুরো ও সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত একটি অরাজনৈতিক, সম্পূর্ণ অলাভজনক বেসরকারি দাতব্য সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। আল্লামা জমির উদ্দিন নানুপরী ২০১১ সালে মারা যান। এরপর তার তিন সন্তান মাওলানা হেলাল উদ্দিন বিন জমির, মাওলানা শিহাব উদ্দিন বিন জমির ও মাওলানা ফরিদ উদ্দিন বিন জমির ফাউন্ডেশনটি পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান মাওলানা হেলাল উদ্দিন জমিরউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এস এন কিবরিয়া ও মাওলানা শিহাবউদ্দিন জমিরউদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন জমিরউদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী ও আবুল কালাম আজাদ এবং জেনারেল ম্যানেজার ইসমাইল চৌধুরী।

৩৭. নূর হোসাইন কাসেমী

সাবেক মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সাবেক মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

নূর হোসাইন কাসেমী বারিধারা জামিয়া মাদানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাবেক মহাসচিব, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (বেফাক)-এর সিনিয়র সহসভাপতি ও হাইয়্যাতুল উলইয়ার কো-চেয়ারম্যান ছিলেন।

নূর হোসাইন কাসেমী ১৯৪৫ সালের ১০ জানুয়ারি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ থানার চড্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তিনি নিজ গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর ভর্তি হন পাশের গ্রামের কাশিমপুর মাদ্রাসায়। এখানে পড়েন মুতাওয়াস-সিতাহ পর্যন্ত। তারপর বরুড়ার জামিয়া দারুল উলুমে ভর্তি হন। সেখানে হেদায়া পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে পাড়ি জমান। সেখানে প্রথমে সাহারানপুর জেলার বেরিতাজপুর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে জালালাইন জামাত পড়া শেষ করেন। তারপর ভর্তি হন দারুল উলুম দেওবন্দে।

কাসেম নানুতুবীর প্রতিষ্ঠিত ভারতের মুজাফফার নগরের মুরাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসেন নূর হোসাইন কাসেমী। শরীয়তপুর জেলার মুহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসায় শাইখুল হাদিস ও মুহতামিম পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে চলে আসেন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে। মালিবাগে ছয় বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি ১৯৮৮ সালে রাজধানী ঢাকায় জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯৮ সালে তুরাগ থানায় জামিয়া সুবহানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, শামসুল উলুম কাওলা মাদ্রাসা, টিকরপুর জামেয়া, জামেয়া ইসহাকিয়া মানিক নগরসহ দেশের কয়েকটি মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস ও মুরুব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৩ সালে শাইখুল হাদিস যাকারিয়ার কাছে প্রথমে বায়াত নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। তার মৃত্যুর পর মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহীর কাছে বায়াত নেন। ১৯৯৫ সালে মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী বাংলাদেশে এলে সে সময় তার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি খানকায়ে মাহমুদিয়ার আমির ছিলেন।

নূর হোসাইন কাসেমী হেফাজতে ইসলামের নেতা হিসাবে যত না পরিচিত তার চেয়ে অধিক কাদিয়ানী বিরোধী খতমে নবুওয়াত নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি একসময় জামায়াত শিবির ও মওদুদীবাদের বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশব্যাপী বিতর্কিত হয়েছিলেন। জামায়াত ও মওদুদীবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন,

মওদুদী দর্শন হল একটি ভ্রান্ত ও আত্মঘাতি দর্শন এবং তার সৃষ্ট জামায়াতে ইসলামী হলো ধর্মের নামে একটি ভাওতাবাজি, বিপথগামী দল। জামায়াত কিংবা মওদুদী দর্শন সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। আমরা কখনও জামাতকে সমর্থন করি না, ভবিষ্যতেও করব না। কারণ, জামায়াতে ইসলামী মোনাফেকের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, আমরা তা করি না। তাছাড়া মওদুদীর দর্শনটাই হল ভুল।

অথচ নূর হোসাইন কাসেমী জামায়াতে ইসলামীর যুদ্ধাপরাধী নেতাদের বাঁচানোর জন্য হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে ১৩ দফার নামে আন্দোলন শুরু করেছিলেন আহমদ শফীর নেতৃত্বে।

নূর হোসাইন কাসেমী হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ও পরামর্শকদের মধ্যে অন্যতম। হরকাত জঙ্গিদের নিকট তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত অভিভাবক। ঢাকাকেন্দ্রিক হরকাতুল জিহাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তার ছিল অগাধ সমর্থন। তাছাড়া নূর হোসেন কাসেমী তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত ও খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯৩ সালে মানিক মিয়া এভিনিউতে খতমে নবুয়তের মহাসমাবেশ করে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই নূর হোসাইন কাসেমী সবার কাছে কাদিয়ানী বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে তিনি তার অতীতের সব পরিচিতি পিছনে ফেলে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নূর হোসাইন ১৯৭৫ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে যোগ দেন। তারপর ১৯৯০ সালে জমিয়তের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসেন। ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিবের দায়িত্ব পান। এরপর থেকে তিনি এ দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দলের নেতা হিসেবেও তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এছাড়া হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সময় থেকেই কেন্দ্রীয় নায়েবে আমিরের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা আন্দোলনের সময় সংগঠনের কার্যক্রম বিস্তৃত হলে ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আসেন। বিশেষ করে ২০১৩ সালের ২ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অভিমুখী লংমার্চ এবং ৫ মে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া খতমে নবুওয়াত আন্দোলন, লেখক তাসলিমা নাসরিনের মতবাদবিরোধী আন্দোলন, কথিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার আন্দোলন, বাবরি মসজিদ রক্ষা আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে ইসলাম শিক্ষা বাদ দেয়ার প্রতিবাদী আন্দোলন, স্কুল পাঠ্যপুস্তক সংশোধনী আন্দোলন, রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন, সুপ্রিমকোর্ট চত্বর থেকে থেমিস দেবির মূর্তি অপসারণ আন্দোলন, কাশ্মির-ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের দেশে দেশে মুসলিম নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন এবং ফ্রান্সে রাসূলের অবমাননার প্রতিবাদে আন্দোলনের নামে ঢাকায় অরাজকতা সৃষ্টি করেছিলেন।

জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত জামিয়া সুবহানিয়ার শায়খুল হাদিস ও মুহতামীম দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২০ সালের ১২ ডিসেম্বর হেফাজতের সাবেক মহাসচিব মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী মারা গেছেন।

৩৮. মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
সেক্রেটারি জেনারেল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিষদ বাংলাদেশ

মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ ফেনী জেলার ফুলগাজী থানায় ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য, মুফতি ও মোফাসসিরে কোরাণ হিসেবে অধিক পরিচিত। তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রধান মুফতি কুড়িল শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিষদ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল।

মিজানুর রহমান সাঈদ জামিয়া আশরাফিয়া ফুলগাজী (ফেনী) থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (পটিয়া) এবং আল-জামায়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মইনুল ইসলামে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মিজানুর রহমান উচ্চশিক্ষার জন্য দারুল উলুম (করাচি) যান। সেখানে তিনি দাওরা-য়ে-হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং ইসলামী আইন ও ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষত্ব লাভ করেন। আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ থেকে আরবি সাহিত্যে ডিপ্লোমাও অর্জন করেন।

মিজানুর রহমান সাঈদ ফেনীর ফারুকী ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তিনি কয়েক বছর বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ এর শিক্ষা সচিব হিসেবে কাজ করেন। ২০১২ সালের ২৬ জানুয়ারি মুফতি মিজান শেখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, তিনি আল-মাদ্রাসাতুল আরবীয়া বাইতুসসালাম, উত্তরা, ঢাকা এর শাইখুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ভাস্কর্য ও মূর্তির পার্থক্য নিয়ে মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ ২০২০ সালের ২১ নবেম্বর আওয়ার ইসলাম ২৪ ডট.কম অনলাইন পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘চলমান ভাস্কর্য ইস্যু নিয়ে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ বলেন, এদেশের আলেমরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী। কেননা আমরা আলেমরা চাই না যে, ‘যিনি আমাদেরকে এ দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন, তার কবরে এ ভাস্কর্যকে উসিলা করে আজাব হোক।

‘তিনি বলেন, ‘কিছু অজ্ঞ লোক আছে তারা বলছে, হুজুরেরা কেন ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে! এটাতো মূর্তি না। এটাতো ভাস্কর্য। ভাস্কর্য ও মূর্তি তো এক না। মূর্তি তো তাকে বলে যার পূজা মানুষ করে। আমাদের এটার পূজা তো কেউ

করবে না। আমরা শুধু এটা স্মৃতি ধরে রাখার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখব। আমরা এটার কোনো পূজা করবো না। মূর্তি তো বলা হয় হিন্দুরা যেটার পূজা করে। যেটাকে বানানোই হয় প্রতিমা হিসেবে।

'আমি মিজানুর রহমান সাঈদ বলছি, ভাস্কর্য ও মূর্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, এ দুটি এক ও অভিন্ন। যেকোনোভাবে কোনো মানুষের আকৃতিকে কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি এমনভাবে দাঁড় করানো হয়, যেটার ছায়া পড়ে। সেটাকে ইসলামে মূর্তি বলে। চাই মানুষ এর পূজা করুক আর নাই করুক। সেটা মানুষ স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বানাক কিংবা পূজা করার জন্য।'

মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ আরও বলেন, 'আমরা উলামায়ে কেরামগণ এই ভাস্কর্য বা মূর্তির বিরোধিতা করছি কোনো বিদ্বেষের কারণে নয় কিংবা কারো পক্ষ নিয়ে নয়। আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমরা এই কারণে এ ভাস্কর্যের বিরোধিতা করছি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এটি তৈরি করেন, তাহলে তার শ্রদ্ধেয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবরে এর জন্য আল্লাহ আজাব দিবেন। যিনি আমাদের এই দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার কবরকে আজাবে ফেলতে চাই না। আমরা শুধু তার কবরকে আজাব থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। মূর্তি থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে চাচ্ছি। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ আরও বলেন, 'দেখুন বর্তমান সময়ে মানুষ যেমন ভাস্কর্য কিংবা মূর্তি বানায় এর চেয়েও সুন্দর ভাস্কর্য কিংবা মূর্তি বানাতে পারত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সময়ের মানুষজন। প্রায় প্রত্যেক ঘরে মূর্তি ছিল। তারা মূর্তি বানাতে ছিল বেশ দক্ষ। যদি ভাস্কর্য বানালে কোনো সমস্যা না থাকতো, যদি ভাস্কর্য মূর্তির মাঝে পার্থক্য থাকতো, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলতেন যে, তোমরা কোরাণ-হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি ভাস্কর্য বানিয়ে রেখে দাও যেটা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ দেখে দেখে মন জুড়াতে পারে। আমার স্মৃতি যেন অব্যাহত থাকে। অটুট থাকে যেন আমার স্মৃতিচিহ্ন।'[২৭]

মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ ওয়াজের নামে তরুণ যুবক সমাজকে উগ্রবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

৩৯. মুফতি মাহমুদুল হাসান

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

ফটিকছড়ি 'জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর' মাদ্রাসার প্রধান মুফতি এবং হেফাজতে ইসলামের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান চট্টগ্রাম জেলা ফটিকছড়ি উপজেলাধীন ভুজপুর থানার পশ্চিম ভুজপুর গ্রামে ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছাত্রজীবন শুরু করেন কাজির হাট ভুজপুর থানাধীন এমদাদুল উলুম ভুজপুর মাদ্রাসায়। মাওলানা মাহমুদুল হাসান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফটিকছড়ি আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় চলে আসেন। সেখানে তিনি কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে যান। সেখানে করাচি নিউটাউন মাদ্রাসায় ইফতা বিভাগে (ফতোয়া) ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি দেশে ফিরে আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার পর তিনি ২০০২ সালে চলে যান জামিয়া নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসায়। বছর দুয়েক পর তিনি পুনরায় আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রসায় চলে আসেন এবং বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাসার প্রধান মুফতির দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি এই মাদ্রাসার প্রধান মুফতি ছাড়াও তার জন্মস্থান ফটিকছড়ি ভুজপুরে একটা মাহাদুল ইসলাম বালক-বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি সে মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান একজন উগ্র জিহাদী ওয়াজ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত।

মুফতি মাহমুদুলের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় 'নেজামে ইসলাম পার্টির' মাধ্যমে। তিনি হরকাতুল জিহাদের একজন উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী ঐক্যজোট এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হয়ে তিনি জঙ্গি-মৌলবাদীদের সমস্ত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির' ফটিকছড়ি থানার নায়েবে আমির ছিলেন। জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ যখন নিষিদ্ধ হয় তখন ২০০৭ সালে হরকাতুল জিহাদের নেতারা সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেছিলেন। এর ব্যানারে হাটহাজারীতে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। হাটহাজারীর সেই জঙ্গি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুফতি মাহমুদুল হাসান। কওমিপন্থী যত মৌলবাদী জঙ্গি রাজনৈতিক দল আছে তাদের অনুষ্ঠানে মাওলানা মাহমুদুল হাসান উপস্থিত থাকতেন। তিনি জঙ্গিবাদী উগ্র বক্তব্য দিয়ে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দেন। ভুজপুর থানার পশ্চিম ভুজপুর বড়বিল এলাকার এক পীরের মাজার তার নেতৃত্বে ভেঙ্গে ফেলা হয়। সেখানে তিনি তলোয়ার হাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার এলাকায় (ভুজপুর থানা) কোনো দরবার মাজার পীর আউলিয়া থাকতে পারবেন না। তার জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে যুব সমাজ সহজে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়।

ফটিকছড়ি, ভুজপুর থানাসহ উত্তর চট্টগ্রামের যত মৌলবাদী জঙ্গি তাণ্ডব হয়েছে বা হয়; সব কিছুতেই এই হেফাজত নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসানের অংশগ্রহণ দেখা যায়। কারণ তিনি হলেন মৌলবাদীদের কাছে একজন বড় মাপের মুফতি (ফতোয়াবাজ)। হেফাজতের বর্তমান আমির মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী এবং সাবেক প্রয়াত আমির জুনায়েদ বাবুনগরীর খুব কাছের মানুষ তিনি। তিনি মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ বৃহত্তর ফটিকছড়ির একজন উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও উত্তর জেলার সহ-সভাপতি। তাছাড়াও তিনি ইসলামী ঐক্যজোট,

নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী আন্দোলন চরমোনাই– এসব মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের একজন সিনিয়র নেতা হিসেবে পরিচিত।

৪০. আজিজুল হক ইসলামাবাদী

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
যুগ্ম-মহাসচিব, নেজামে ইসলাম পার্টি

আজিজুল হক ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হরিণখাইন এলাকার মাওলানা সৈয়দ আহমেদের বাড়ির হাফেজ আহমদ উল্লাহর ছেলে। তিনি ৬ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব।

আজিজুল হক ইসলামাবাদী ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা ওবাইদুল হকের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৯৬ সালে নেজাম ইসলাম পার্টির সাথে যুক্ত হন। ২০১০ সালে হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব নেন। পরে ২০১৩ সালে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ঢাকার শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের যে আন্দোলন হয়েছিল সেই সময় তিনি হেফাজতের সারাদেশের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। শাপলা চত্বরের আন্দোলনে যেতে তিনটি বাসে ১৫০ লোক নিয়ে রওনা হলে তাকে চট্টগ্রামের ওয়াসা মোড়ে পুলিশ আটকে দিলে সেখানেই তিনি সমাবেশ করেন। তিনি প্রয়াত হেফাজত আমির শাহ আহমদ শফীর ছাত্র। আহমদ শফীর প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। কিন্তু আহমদ শফীর ছেলে আনাস মাদানীর কর্মকান্ডে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

২০২১ সালের ১২ জুন দৈনিক পূর্বকোণের এক প্রতিবেদনে আজিজুল হক ইসলামাবাদীর একটি জবানবন্দির রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে তিনি বলেন– 'হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পর রূপ পাল্টে যায় হেফাজতের। জামায়াত-বিএনপির সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে জুনায়েদ বাবুনগরীর অনুসারীরা। বিএনপি-জামায়াতসহ ২০ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমান খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের ও জমিয়েতে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুল রব ইউসুফী হেফাজতের সাথে সমন্বয় ও তথ্য আদান প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। দু'জনে আবার হেফাজতের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির নায়েবে আমিরের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাবু নগরীর অনুসারী বিভিন্ন জেলার হেফাজত নেতা-কর্মীদেরকে সরকারবিরোধী ইসলামী দল এবং বিএনপি-জামায়াতের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে নির্দেশনাও দিয়েছে হেফাজত। ২০২১ সালের ১৬ জুন হেফাজতে ইসলামের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদীর আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে এসব

তথ্য উঠে এসেছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৌশিক আহমেদ খোন্দকারের আদালতে তিনি এ জবানবন্দি দিয়েছেন।

'আহমদ শফীর মৃত্যুর পর তারা হাফেজ জুনাইদ বাবুনগরীকে আমির হিসাবে স্বীকৃতি দেন। হেফাজতের বিভিন্ন দাবির বিষয়ে সরকারের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তিনি বিভিন্ন জেলার হেফাজত কর্মীদের চাঙা করার উদ্যোগ নেন। এ সময় তিনি ফরিদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও ঢাকা সফর করেন। জবানবন্দিতে আজিজূল হক ইসলামবাদী বলেন, 'সরকার যেহেতু তাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না, তখন হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটি সরকার বিরোধী ইসলামী দল এবং বিএনপি-জামায়াতের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। হেফাজতের বিলুপ্ত কমিটির নায়েবে আমির ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির হেফাজতের দাওয়া সম্পাদক মাওলানা আহমদ আলি কাসেমী, জমিয়তে উলামায়ের যুগ্ম-মহাসচিব ও হেফাজতের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সহকারী মহাসচিব গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম হেফাজতের পক্ষ থেকে জামায়াত ও বিএনপির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখেন।

'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীর বাংলাদেশে আগমন ঠেকাতে জুনায়েদ বাবুনগরীর নির্দেশে ২০ দলের সাথে আমরা ঢাকায় বৈঠকও করেছি। বৈঠকে মাওলানা মামুনুল হক, মুফতি মনির কাসেমী, সুনামগঞ্জের সাবেক এমপি হেফাজতের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট শাহীনুর পাশা, হাবিবুল্লাহ আজাদী, হেফাজত নেতা নাসির উদ্দিন মুনির, মীর ইদ্রিস, মুফতি হারুন ইজহার, খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, হেফাজতের বর্তমান মহাসচিব নুরুল ইসলাম জিহাদী, মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী ও জুনাইদ আল হাবীব উপস্থিত ছিলেন।'[২৮]

২০২১ সালের ১১ এপ্রিল মধ্যরাতে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে র‍্যাবের সঙ্গে যৌথ অভিযানে আজিজুল হককে গ্রেপ্তার করে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। কয়েক দফা রিমান্ড শেষে বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

৪১. মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর সভাপতি। তিনি পুরনো ঢাকার ইসলামবাগ বড় মসজিদের খতিব, জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামবাগ মাদ্রাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী ১৯৬৮ সালের ১৫ নভেম্বর নীলফামারী জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত সোনারায় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ্ব রশিদুল হাসান,

মাতা সাহিদা বেগম। দাদার নাম মাওলানা এহসানুল হক আফেন্দী রহ.। জন্মের পর নাম রাখা হয় মঞ্জুরুল ইসলাম।

মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী শৈশব থেকেই একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। চিন্তা, দর্শনও পেয়েছেন দেওবন্দী আদর্শের। মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্র জমিয়তের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। তিনি আত্মশুদ্ধী বা তাসাউফের দীক্ষা নিয়েছেন হেফাজতের সাবেক আমির আল্লামা আহমদ শফী এর কাছ থেকে। বায়াত এবং খেলাফতও গ্রহণ করেছেন। দেওবন্দী চিন্তা, দর্শন ও মাদানীর আদর্শ লালনকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে থাকেন। শিশু মঞ্জুরুল ইসলাম আক্ষরিক জ্ঞান-অর্জনের উপযুক্ত হলে তার পিতা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য স্কুলে না পাঠিয়ে হাফেজ ছফিউল্লাহ সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। তখন তার বয়স মাত্র ছয় বছর। পরে ১৯৮০ সালে তাকে ফেনীর ওলামা বাজার মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন।

তিনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যথারীতি পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ৬ বছর পড়াশুনা করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালে মাওলানা আব্দুল হালীম এর সম্মতিক্রমে মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী-এর তত্ত্বাবধানে মিরপুর জামেয়া হোসাইনিয়া আরাজাবাদ মাদ্রাসায় শরহেজামী জামাতে ভর্তি হয়ে যান। তিনি জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসায় শরহে জামি জামাত থেকে জামাতে মেশকাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯৯৩ সালে উচ্চ শিক্ষা জন্য ভারতের দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়তে যান।

দেওবন্দে পড়াশুনা শেষ করে তিনি দেশে ফিরে আসলে অল্প কিছুদিন পরেই সৌদি আরবে চলে যান। সেখানেই তার কর্মজীবনের যাত্রা শুরু। সৌদিতে চার বছর সপরিবারে বসবাস করেন। ১৯৯৯ সালে ছুটিতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তার উস্তাদ মাওলানা ইমরান মাজহারী সৌদি আরব যেতে না দিয়ে তাকে ইসলামবাগ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

২০০১ সালের জুনে মাওলানা ইমরান মাজহারী সাহেব যখন তার হাতে মাদ্রাসার দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। ২০০৪ সালে দাওরায়ে হাদিস তাকমীল ক্লাসটি চালু হলে দীর্ঘ ১৪ বছর শাইখুল হাদিসের পদটিও তিনি ধরে বসে আছেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমীর মৃত্যুর পর এ দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করছেন তিনি।

২০২১ সালের ১৪ এপ্রিল রাত ১০টায় হাতিরপুলের নিজ বাসা থেকে মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

শাপলা চত্বরের সমাবেশকে কেন্দ্র হেফাজতের তাণ্ডবের ঘটনায় পল্টন থানায় করা মামলায় হেফাজত নেতা মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। ২০২১ সালের ২৮ জুন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোর্শেদ আল মামুন ভূঁইয়া রিমাণ্ডের এ আদেশ দেন।

রাজধানী মতিঝিল ও পল্টন থানায় করা নাশকতার পৃথক ছয় মামলায় হেফাজত নেতা মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীর জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। ২০২১

সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোর্শেদ আল মামুন ভূঁইয়া জামিনের এ আদেশ দেন। ২০২১ সালের ২০ আগস্ট কারামুক্ত হন হেফাজতের এই নেতা। জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামবাগ মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদিস, ইসলামবাগ বড় মসজিদের খতিব এর দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি জাতীয় ইমাম সমাজের সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং জামেয়া ইসলামিয়া রিয়াজিয়া মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বও পালন করছেন।

৪২. হারুন ইজহার চৌধুরী

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
পরিচালক, মানহাজি গ্রুপ অব বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুফতি হারুন ইজহার। তিনি বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সাবেক সভাপতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর বড় ছেলে এবং চট্টগ্রামের লালখান বাজারের জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক। তার বাবা মুফতি ইজহার চট্টগ্রামের ওই মাদ্রাসার মহাপরিচালক। তার বাবা এক সময় হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির ছিলেন।

২০২১ সালের ৩০ এপ্রিল দৈনিক আজাদীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০২১ সালের ২৯ এপ্রিল মুফতি ইজাহারকে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে আটক করা হয়। র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল মশিউর রহমান জুয়েল জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর ঘিরে দেশের বিভিন্নস্থানে যে নাশকতা হয়েছে, তাতে প্রত্যক্ষভাবে মদদ দেওয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'২০১৩ সালের ৭ জুলাই চট্টগ্রাম মহানগরীর আলোচিত লালখান বাজার মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মাদ্রাসার পরিচালক ও হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মুফতি ইজহারুল ইসলামের ছেলে হারুন ইজহারসহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ইজহারুলের ছেলে মুফতি হারুন ইজহার ও তার দেহরক্ষী হিসেবে পরিচিত জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

'হাটহাজারী উপজেলার ইছাপুর গ্রামের জালাল ই চৌধুরীর বাড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বাড়িতে তারা আত্মগোপনে ছিলেন বলে জানিয়েছেন অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া নগরীর কোতয়ালী থানার তৎকালীন ওসি এ কে এম মহিউদ্দিন সেলিম। ২০১৩ সালে বোমা বানাতে গিয়ে মাদ্রাসার যে কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটে তার পাশের কক্ষেই ছিল মুফতি হারুন ইজহারের কার্যালয়। বিস্ফোরণের পরপর তিনি পালিয়ে যান। এছাড়া মুফতি ইজহারুল ইসলামও ওইদিন সন্ধ্যায় আত্মগোপনে চলে যান। পিতা-পুত্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় চাপে পড়ে পুলিশ। এরপর মুফতি হারুনকে গ্রেপ্তারের জন্য কোতয়ালী থানার ওসি এ কে এম মহিউদ্দিন সেলিমকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ বিভিন্ন কৌশলে হারুন ইজহারের অবস্থান নিশ্চিত

করে গভীর রাতে ইছাপুরের জালাল ই চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তিনি পায়জামা ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। ভোরে তাকে পাঁচলাইশ থানায় আনার পর নগর পুলিশের পাঁচলাইশ জোনের সহকারী কমিশনার শাহ মো.আব্দুর রউফ প্রায় এক ঘণ্টা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।'

২০১৩ সালের ৮ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৩ সালের ৭ জুলাই চট্টগ্রাম নগরীর লালখান বাজারে হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মুফতি ইজহারুল ইসলাম পরিচালিত জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে পাঁচজন ছাত্র আহত হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'ছাত্র মারা যায়।

'মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ল্যাপটপ চার্জার থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করে। তবে পুলিশ ওই কক্ষ তল্লাশি করে চারটি তাজা গ্রেনেড এবং বিপুল পরিমাণ গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেন। রাতে মুফতি ইজহারের বাসায় তল্লাশি করে ১৮ বোতল এসিড পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে নগরীর খুলশী থানায় বিস্ফোরক ও এসিড আইনে পৃথক দু'টি মামলা করেন। দু'টি মামলাতেই মুফতি ইজহার ও ছেলে হারুনকে আসামী করা হয়।'

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর ই তৈয়বার সঙ্গে কানেকশনের অভিযোগে ২০১০ সালেও একবার মুফতি হারুন ইজহার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের ডাউকি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া লস্কর-ই তৈয়বার দু'জন জঙ্গি নাজের ওরফে নাজের পারবন এবং শফিক ওরফে সাহাফাজ শামসুদ্দিন সেদেশের পুলিশকে জানায়, তাদের সঙ্গে ২০০৯ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে মুফতি হারুনের কয়েক দফা বৈঠক হয়। এমনকি তারা মার্কিন ও ভারত দূতাবাসে হামলারও পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরপর মুফতি হারুন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

তার পিতা মুফতি ইজহারুল ইসলামও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুফতি ইজহারের মাদ্রাসায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের জন্ম হয়েছিল। জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের আস্তানা হিসেবে পরিচিত ছিল এটি। দুই দশক আগে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াত কবি শামসুর রাহমানের প্রাণনাশ চেষ্টার অভিযোগে আটক হওয়া কয়েকজন জঙ্গি জানায়, তারা মুফতি ইজহারুল ইসলামের লালখান বাজার মাদ্রাসাতেই ট্রেনিং নিয়েছিল।

হেফাজতে উগ্রপন্থীদের নেতৃত্ব দিতেন মুফতি হারুন ইজহার। অরাজনৈতিক দাবি করা হেফাজতে ইসলামের উগ্রপন্থীদের নেতৃত্ব দিতেন সংগঠনটির সদ্য বিলুপ্ত কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক শায়খ মুফতি হারুন ইজহার। সংগঠনে তাকে সবাই 'মানহাজি'দের দলনেতা হিসেবেই চিনতেন। বক্তব্য-বিবৃতিতে জিহাদের ডাক দেওয়া হারুন ইজহারকে এর আগেও গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জামিনে বেরিয়ে আগের মতোই উগ্রপন্থা মতবাদ ছড়িয়ে কথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন তিনি। হেফাজতকে তিনিই উগ্রবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তার সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও অন্যান্য জঙ্গিবাদী সংগঠনের সদস্যদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল।

২০২১ সালের ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের লালখান বাজারের জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে এক সহযোগীসহ হারুন ইজহারকে গ্রেপ্তার করে এলিট ফোর্স র‍্যাব। হাটহাজারী থানা পুলিশ হারুন ইজহারকে তিনটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে ২১ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে। আদালত রিমান্ড শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠান।

হেফাজতে ইসলামে 'মানহাজি' নামে বড় একটি গ্রুপ রয়েছে। এরাই হেফাজতকে নানারকম আগ্রাসী কর্মসূচি দিতে বাধ্য করতো। হেফাজতের এই গ্রুপের প্রভাব অনেক বেশি। এই গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন হারুন ইজহার। এছাড়া তার নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি 'গাজওয়াতুল হিন্দ' এর সময় এসে গেছে বলে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করতেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

২০২১ সালের ১৪ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মাহমুদুল হাসান গুনবী 'মানহাজি' নামক একটি উগ্রবাদী গ্রুপের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবেও কাজ করছেন। তিনিসহ তিনজন এই গ্রুপের অন্যতম দায়িত্বশীল। বাকি দুজন হলেন মাওলানা হারুন ইজহার ও আলী হাসান ওসামা। এই দুজন গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। এই মানহাজি গ্রুপও হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গোপনে তৎপর রয়েছে। মানহাজি গ্রুপও আল-কায়েদার মতাদর্শ অনুসরণ করে এবং হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সংগঠিত হয়েছে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৯ সালে হারুন ইজহারের পরিচালনাধীন লালখান বাজারে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসা ঘিরে আন্তঃদেশীয় জঙ্গিরা একটি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ওই বছরের শেষ দিকে তারা ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ও ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার ছক কষেছিল। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ছিল ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়্যবা। হারুন ইজহার পুরো এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসময় ওই মাদ্রাসায় অভিযান চালিয়ে হারুন ইজহার এবং লস্কর-ই-তৈয়্যবার কয়েকজন সদস্য ও ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০১৩ সালেও একবার হারুন ইজহারকে গ্রেপ্তার করেছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ওই বছরের ১০ জুলাই হারুন ইজহারের জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসায় গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিন জন নিহত হন। পুলিশ তখন ঘটনাস্থল থেকে চারটি তাজা গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণ গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছিলেন।

৪৩. ইসমাঈল নূরপুরী

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
আমির, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

মাওলানা ইসমাঈল নূরপুরী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির, নরসিংদী শহরস্থ বৌয়াকুড় জামেয়া কুরআনিয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিস। তিনি তা'লিম তরবিয়তের পাশাপাশি তথাকথিত ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছেন। ছাত্রজীবনেই

তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি অসংখ্য কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত আছেন। মাওলানা ইসমাইল নূরপুরী নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত নূরপুর গ্রামে ১৯৫৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সি জাফর আলী।

প্রাথমিক পড়ালেখার হাতেখড়ি নূরপুর গ্রামের ফুরকানিয়া মকতবে। নুরপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শুরু করে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন তিনি। সাহেবনগর মাদ্রাসায় তিন বছর পড়ালেখা করেন। সাহেবনগর মাদ্রাসায় সফফে আউয়াল থেকে মিজান জামাত সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভর্তি হন ঢাকার জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসায়। মুফতি আব্দুল মুঈজ এর কাছে বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড, তিরমিজী ২য় খণ্ড ও হেদায়া ৪র্থ খণ্ড, ইমামুন্নাহু নামে খ্যাত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবের কাছে মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, মাওলানা আব্দুল আউয়াল ঢাকুবী এর কাছে আবু দাউদ, হাফেজ্জী হুজুর এর কাছে নাসায়ী শরীফ, তাহাবী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, মুয়াত্তাহ ইমাম মালেক ও হেদায়তুল্লাহ.এর কাছে মেশকাত শরীফ পড়েন। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম সালেম সাহেবের কাছে মিযান পড়েন।

১৯৭৬ সালে লালবাগ জামেয়া থেকে 'তাকমীল ফিল হাদিস' শেষ করার পর বালুয়াকান্দি শামসুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮০ সালে নরসিংদী জামেয়া কুরআনিয়া মেরাজুল উলুম বৌয়াকুড়ে চলে আসেন। ১৯৯১ সালে জামেয়ার পরিচালনার দায়িত্ব তার পান তিনি। তখন থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ২০০৪ সাল থেকে তিনি জামেয়ার প্রধান শায়খুল হাদিসের পদে রয়েছেন। এটি ছাড়াও বালুয়াকান্দি শামসুল উলুম মাদ্রাসা, রায়পুরা সিরাজনগর, আবাবিল মহিলা মাদ্রাসা, বড় মির্জাপুর মনোহরদী ও রিয়াজুল জান্নাত মহিলা মাদ্রাসায় বর্তমানে বোখারী শরীফের নিয়মিত ক্লাস করান।

মাওলানা ইসমাইল নূরপুরী ছাত্রজীবন থেকেই কথিত আন্দোলন সংগ্রামের সাথে জড়িত। তিনি বিভিন্ন সময় কুফর শিরক নাস্তিক মুরতাদ ও তাগুত প্রতিরোধের নামে দেশজুড়ে অরাজকতা এবং হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। কাদিয়ানী বিরোধী মানববন্ধন ও আন্দোলনের নামে বিভিন্ন সময় কর্মসূচি দিয়ে উগ্রতা ছড়িয়ে দিয়েছেন তরুণদের মধ্যে। ১৯৯২-৯৩ এর বাবরী মসজিদ আন্দোলন ও অযোধ্যা অভিমুখে লংমার্চে শায়খুল হাদিস আজিজুল হকের পাশে ছিলেন তিনি সবসময়। নরসিংদী থেকে বিশাল গাড়ির বহর নিয়ে লংমার্চের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তারপর পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চেও শায়খুল হাদিসের সাথেই ছিলেন। ২০০০ সালে ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলনেও নরসিংদীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৩ সালে হেফাজতের আন্দোলনে নরসিংদী জেলার নেতৃত্বের মূল দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সমাজের একজন কর্মী হিসাবে মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক জীবন শুরু। পরবর্তীকালে খেলাফত

আন্দোলন নরসিংদী জেলার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নির্বাচনী কাজেও ছিলেন নুরপুরীর উপস্থিতি। ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠন করলে শুরু থেকেই এর সাথে সম্পৃক্ত হন তিনি এবং নরসিংদী জেলার দায়িত্ব পালন করেন। পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় দায়িত্বও পালন করেন তিনি। সাবেক আমিরে মজলিস প্রিন্সিপাল হাবীবুর রহমান এর ইন্তেকালের পর ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় শূরায় তাকে সংগঠনের আমিরের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। অদ্যাবধি এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তিনি। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক ও মাওলানা মামুনুল হক এর বিভিন্ন দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি এবং অপকর্মের সুযোগ করে দিচ্ছেন সংগঠনের আমির ইসমাইল নূরপুরী। ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির আমির পদে মাওলানা ইসমাইল নূরপুরী এবং মহাসচিব পদে মাওলানা মাহফুজুল হক পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন।

৪৪. সুলাইমান নোমানী

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

সুলাইমান নোমানী ১৯৩৯ সালে কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার আড়ুই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাবা-মায়ের কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার বাবা প্রথমে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তারপর বরুড়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে হেদায়া পর্যন্ত পড়েন। তারপর তিনি উম্মুল মাদারিস জামিয়াতুল আহলিয়া মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় জালালাইন জামাতে ভর্তি হন। এখানে মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম চাটগামী এর কাছে বুখারী শরীফ পড়েন। তাকমীল জামাত পড়ার পর আরো তিন বছর জিহাদ বিষয়ের দরস, বালাগাত ও দর্শন বিদ্যা শিখেন।

ফেনী জেলার শশর্দী মাদ্রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। শশর্দী মাদ্রাসায় ৪ বছর শিক্ষকতা করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ফরিদাবাদে দীর্ঘদিন সিনিয়র মোহাদ্দিস ও শাইখুত তাফসীর এর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৮২ সালে চলে আসেন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে। এখানে হাদিস, তাফসীর ও দর্শন বিদ্যা দরস দান করেন। এখানে ৫ বছর শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি ১৯৮৪ সালে উনার নিজের পীর ও মুর্শিদ আমিরে শরীয়ত হাফেজ্জী হুজুরের নির্দেশে জামিয়া দ্বীনিয়া শামসুল উলুম পীর জঙ্গি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন মোহাম্মদপুর জামেয়া মোহাম্মদীয়ায় শাইখুল হাদিস ও সদরে মুফতি ছিলেন। তিনি জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গিরচর, জামিয়া ইসলামিয়া মুসলিমবাগ, মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, জামেউল উলুম মিরপুর, জামেয়া সাভার ব্যাংক কলোনী মাদ্রাসা সহ প্রায় ১৫টি মাদ্রাসায় ৪০ বছর সর্বোচ্চ হাদিস গ্রন্থ সহীহ বুখারীর দরসদান দিয়ে আসছেন। বর্তমানে তিনি প্রায় ১৫টি মাদ্রাসায় শাইখুল হাদিসের পদে আসীন রয়েছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি হাফেজ্জী হুজুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাথে ১৯৮১ সাল থেকেই জড়িত। তিনি সংগঠনটির সহ-সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি এই সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা তথা শরিয়াহ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। খতিব ওবাইদুল হক থাকাকালীন দেশের বিতর্কিত সংগঠন আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে উস্কানী দিয়ে ছিলেন।

৪৫. রশিদুর রহমান ফারুক

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
আমির, আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভৈরবগঞ্জ বাজারে অবস্থিত জামেয়া মাদানিয়া শেখবাড়ি মাদ্রাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস, বরুণার পীর মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক বর্ণভী হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা। তিনি ১৯৪৫ সালে বরুণালয় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি হেফাজতে ইসলামের উপদেষ্টা ছাড়াও অরাজনৈতিক সংগঠন আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমির।

২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর শ্রীমঙ্গল উপজেলার হামিদনগরের ঐতিহ্যবাহী বরুণা টাইটেল মাদ্রাসার মসজিদে কদিমে (পুরাতন মসজিদে) আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা শায়খ সাইদুর রহমান হামিদী বর্ণভীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুস সবুরের সঞ্চালনায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমির নির্বাচিত হয়েছেন আল্লামা মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক বর্ণভী।

'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' একটি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন। ১৯৪৪ সালে লুৎফুর রহমান বর্ণভী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা আরম্ভ হয় ১৯৫৪ সালে। শুরু থেকে সংগঠনটির বিস্তারে শামসুল হক ফরিদপুরী, মুশাহিদ আহমদ, তাজুল ইসলাম সহ প্রমুখ আলেম অবদান রেখেছেন। সংগঠনটির বর্তমান আমির রশীদুর রহমান ফারুক বর্ণভী। সংগঠনের মূল কেন্দ্র জামিয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলুম হামিদনগর বরুণায় অবস্থিত।

দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় অরাজনৈতিক সংগঠন 'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম' যেটি ১৯৪৪ সাল থেকে দেশে-বিদেশে 'হেফাজতে ইসলাম' নামেই পরিচিত। যুক্তরাজ্যেও রয়েছে সংগঠনটির শাখা। সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে 'হেফাজতে ইসলাম' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও ৪৮ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। উক্ত অরাজনৈতিক সংগঠনটির সুনাম পুঁজি করে ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামে আত্মপ্রকাশ করে 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' নামের সংগঠনটি।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১০ সালে সরকারের নারী নীতিমালার বিরোধিতা করে একটি গোষ্ঠী মাঠে নামে। সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে

তারা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বেছে নেয় 'হেফাজতে ইসলাম' নাম। 'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম' নামের সংগঠনটির নাম ব্যবহার করে মাঠে নামে এই গোষ্ঠী। মূল সংগঠনটি সে সময় তাদের নাম ব্যবহার না করার জন্য একাধিকবার চিঠি এবং সশরীরে যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। 'হেফাজতে ইসলাম' নাম ব্যবহার না করার আশ্বাস দিলেও সে কথা রাখেননি চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা– এমন অভিযোগ হেফাজতে ইসলাম নামের মূল সংগঠনটির নেতাদের।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মূল সংগঠন 'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলামের' প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শায়খ লুৎফুর রহমান বর্ণভী। তিনি রাজনৈতিক দলাদলি পছন্দ করতেন না। ১৯৭১ সালে বৃহত্তর সিলেটের কওমি মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে তিনিই একমাত্র আলেম যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলামের গঠনতন্ত্র ঘেঁটে জানা যায়, ১৯৫৪ সালে সিলেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনটির জন্ম। যদিও এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৪ সালে। তখন স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন শায়খ বর্ণভী। কমিটির নাম ছিল 'হেফাজতে ইসলাম কমিটি'। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫-৪৬ সালে মৌলভীবাজারের বালিকান্দি গ্রামে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে শায়খ বর্ণভীকে আমির নিযুক্ত করে আঞ্চলিকভাবে 'হেফাজতে ইসলাম' সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে সিলেটের বন্দরবাজার জামে মসজিদে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখদের এক সভায় 'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম পাকিস্তান' নামে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সংগঠনটির আমিরের দায়িত্ব পান শায়খ লুৎফুর রহমান বর্ণভী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংগঠনের নাম থেকে পাকিস্তান বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশ' যুক্ত করা হয়। সংগঠনটির নামের সঙ্গে আঞ্জুমান যুক্ত করা হলেও শুরু থেকেই এটি 'হেফাজতে ইসলাম' নামে দেশে-বিদেশে পরিচিত।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যে গঠিত হয় 'হেফাজতে ইসলাম ইউকে'। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১১১৫৭০৯। এছাড়া ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে চালু করা হয় 'হেফাজতে ইসলাম অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিস', ২০০৮ সালে চালু করা হয় হেফাজতে ইসলাম মেডিক্যাল সেন্টার' ও 'হেফাজতে ইসলাম সমাজসেবা সংস্থা'। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যে স্থাপিত হয়, 'হেফাজতে ইসলাম সেন্টার লন্ডন'।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে আবারও হেফাজতে ইসলামের নামে সম্মেলনের ডাক দেন চট্টগ্রামের আলেমরা। এ অবস্থায় ২০১১ সালের ৫ জানুয়ারি মূল সংগঠনের পক্ষ থেকে আবারও আল্লামা শফীর কাছে একটি চিঠি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। এরপর দীর্ঘদিন হেফাজতে ইসলামের নামে কোনো কর্মসূচি পালিত না হলেও ২০১৩ সালে আবার 'হেফাজতে ইসলাম' নাম ব্যবহার করে আবারও মাঠে নামেন চট্টগ্রামের আলেমরা। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে ঘটে স্মরণকালের নারকীয় ঘটনা। এরপর ২০১৫ সালের শেষ দিকে আবারও আলোচনায় আসতে শুরু করে সংগঠনটি। পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন, সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্থাপন করা থেমিসের ভাস্কর্য সরানোর দাবিতে মাঠে নামে সংগঠনটি। এসব ঘটনায় মূল সংগঠন 'আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলামে'র নেতারা চরম ক্ষুব্ধ হন।

তারপরও মাওলানা রশিদুর রহমান ফারুক হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪৬. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সভাপতি, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির আল্লামা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে কাজি সালেহ আহমদ এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কাজি আব্দুল আজিজ। তিনি ১০ বছর বয়সে হাটহাজারী মাদ্রাসার নূরানী বিভাগের শিক্ষক কারী নুরুল হক এর কাছে পড়ালেখা শুরু করেন এবং হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৩ সালে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন।

১৯৭৩ সালে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে হাটহাজারীর অন্তর্গত গড়দুয়ারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। গড়দুয়ারা মাদ্রাসায় ১০ বছর শিক্ষকতার পরে হাজী ইউনুস সাহেব প্রতিষ্ঠিত ইছাপুর ফয়জিয়া তাজবিদুল কোরাণ মাদ্রাসায় ৬ বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে শূরার ডাকে ১৯৯১ সালে উম্মুল মাদারিস খ্যাত হাটহাজারী মাদ্রাসায় যোগদান করেন। সর্বশেষ ২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে হাটহাজারী মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার (কার্যকরী পরিষদ) বৈঠক আল্লামা ইয়াহিয়া-কে মসলিসে এদারি (মাদ্রাসা পরিচালনা বোর্ড) এর সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

মাওলানা ইয়াহিয়া হেফাজতের সাবেক আমির শাহ আহমদ শফী এর আস্থাভাজন ও স্নেহের পাত্রে পরিণত হন। শাহ আহমদ শফী তাকে চার তরিকার খেলাফত দান করে বাইয়াত ও মুরিদ করার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে টানা ৩৪ বছর হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ছিলেন প্রয়াত আল্লামা আহমদ শফী। শুধু এই মাদ্রাসা নয়, দীর্ঘদিন পুরো কওমি অঙ্গনেই ছিল তার একচ্ছত্র প্রভাব। আহমদ শফী যখন মাদ্রাসার মহাপরিচালক ছিলেন তখন এর সহকারী মহাপরিচালক ছিলেন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। এরই মধ্যে ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। সংগঠনটির আমির ছিলেন আহমদ শফী এবং মহাসচিব ছিলেন জুনায়েদ বাবুনগরী।

২০২০ সালের ১৭ জুন বাবুনগরীকে মাদ্রাসার সহযোগী পরিচালকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্থলে নিয়োগ দেওয়া হয় মাওলানা শেখ আহমদকে। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসার মহাপরিচালক পদ থেকে অব্যহতি নেন আল্লামা শফী। পরদিনই রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শফীর মৃত্যুর পর হাটহাজারী মাদ্রাসার দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করে। তখন শুরা কমিটির এক বৈঠকে জুনায়েদ বাবুনগরীকে শিক্ষা পরিচালক ও প্রধান শায়খুল হাদিস হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য তিন

সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে রাখা হয়– মাওলানা আবদুস সালাম চাটগামী, আল্লামা শেখ আহমেদ ও মাওলানা ইয়াহিয়াকে। তবে অদৃশ্যভাবে বাবুনগরীই মাদ্রাসার পরিচালনাসহ সার্বিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন বলে জানা যায়। যে কারণে মহাপরিচালক পদে কেউ না থাকলেও শূন্যতা অনুভব করেনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

২০২১ সালের ১৯ আগস্ট জুনায়েদ বাবুনগরী মারা গেলে মাদ্রাসা পরিচালনায় আবার নতুন করে সংকট দেখা দেয়। ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর শুরা কমিটির বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়াকে হাটহাজারী মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় এক বছর পর মহাপরিচালক পেল ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী মাদ্রাসা।

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া বলেন, 'খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানীরা সুস্পষ্টভাবে অমুসলিম তথা কাফের। ইসলামবিদ্বেষী আন্তর্জাতিক অপশক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা মুসলিম নাম ও পরিভাষা ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করার মিশন চালাচ্ছে। তাদের প্রতারণাপূর্ণ কার্যক্রমের কারণে দেশের কোটি কোটি তাওহিদী জনতা চরম বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর। কাদিয়ানীরা শুধু ইসলামের দুশমন নয়, তারা বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্যও চরম হুমকি তৈরি করছে। বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের সকল কার্যক্রম বন্ধ এবং জাতীয় সংসদে আইন পাস করে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি।'

৪৭. আবুল হাসনাত আমিনী

সাবেক সেক্রেটারি, হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগর ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট

ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুফতি ফজলুল হক আমিনীর ছেলে ও বর্তমান দলের চেয়ারম্যান এবং হেফাজতের ঢাকা মহানগরী সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসনাত আমিনী ১৯৮০ সালে ১০ ডিসেম্বর বি-বাড়িয়ার সরাইল থানার কাজী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী, দাদা মরহুম ওয়েজ উদ্দিন, নানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর।

কোরাণে হাফেজ হয়ে ২০০৮ সালে জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ হতে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন আবুল হাসনাত আমিনী।

হাফেজ মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনী বর্তমানে জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার মজলিশে শু'রা (পরিচালনা কমিটি)-র অন্যতম সদস্য ও জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড়কাটরা মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী ও ভাইস প্রিন্সিপাল

এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কাজীপাড়ায় পিতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী প্রতিষ্ঠিত জামিয়া কোরআনিয়া সৈয়দা সৈয়দুন্নেছা ও কারিগরি শিক্ষালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পালন করে আসছেন।

রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ার সুবাদে ইসলামী ছাত্র মোর্চা বাংলাদেশ এর মাধ্যমেই মূলত রাজনীতিতে আসা হাফেজ মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনীর। বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামী রাজনীতির চরিত্র বিতর্কিত মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সন্তান হওয়ার সুবাদে পিতার ইন্তেকালের পর তারই প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে ইসলামী বাংলাদেশ এর মজলিশে শুরা সদস্য, প্রত্যেক জেলা কমিটির দায়িত্বশীল ও দেশের শীর্ষ উলামা মাশায়েখদের অনুরোধে রাজনৈতিক ময়দানে পিতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী এর রাজনৈতিক ধারাকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খেলাফতে ইসলামী বাংলাদেশ এর আমির নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ইসলামী রাজনৈতিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের মজলিশে শুরা সদস্য হন। পরে হাফেজ মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনী ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

মুফতি ফজলুল হক আমিনীর হাতে গড়া বাংলাদেশের আলোচিত ইসলামী রাজনৈতিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান পদ ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভারপ্রাপ্ত থেকে ভারমুক্ত হলেন মুফতি আমিনী এর সন্তান মাওলানা আবুল হাসনাত আমিনী। তিনি এখন থেকে ইসলামী ঐক্যজোটের পূর্ণাঙ্গ চেয়ারম্যান। লালবাগস্থ ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এসব সিদ্ধান্ত হয় বলে জানা গেছে।

২০২০ সালের ১১ মে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামীর মৃত্যুর পরদিন ১২ মে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন দলটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আবুল হাসনাত আমিনী। তথাকথিত নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনে সাড়া জাগানো সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা আমির শাহ আহমদ শফী মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীসহ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর শীর্ষ নেতারা ও উলামায়ে কেরাম হাফেজ মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনীকে হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। পাশাপাশি দেশের সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড আল হাইয়াতুল উলিয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সদস্যও নির্বাচিত হন তিনি।

৪৮. মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
আমির, খেলাফত মজলিস

হেফাজত নেতা মোহাম্মদ ইসহাক ১৯৩৫ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ হাজী আহমদ আলী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন, এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স শেষ করে এগ্রিকালচার এবং সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করেন।

খেলাফত মজলিসের বর্তমান আমির তিনি। জামায়াতে ইসলামীর আমির যুদ্ধাপরাধী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন তার প্রথম দিককার ছাত্র। তিনি পাবনা কামিল আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজনীতি শুরু করেন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম দিয়ে। ছাত্রাবস্থায় বৃহত্তর পাবনা জেলার নেজামে ইসলাম পার্টির প্রচার সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, হাফেজ্জি হুজুরের খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আজিজুল হকের খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও নায়েবে আমির ছিলেন। পূর্ব বাংলার শেষ গভর্নর মোনেম খাঁর মন্ত্রীসভায় বেসিক ডেমোক্রেটিক লোকাল গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বর্তমান (এলজিআরডি মন্ত্রণালয়)-এর মন্ত্রী ছিলেন।

জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী সম্পর্কে তিনি বলেন, সে আমার কাছে ফাযিল পর্যন্ত পড়েছে, তখনও কোনো রাজনীতি করেনি। আমি অতীতে জামায়াতে ইসলামী করিনি এখনও করি না এবং আগামীতেও কখনো করব না। কারণ আমার উস্তাদরা জামায়াতে ইসলামী পছন্দ করতেন না। শিক্ষকদের এই প্রভাবটা আমার মধ্যে কাজ করেছে। আমি তাদের বইপুস্তক পড়িনি। মওদুদী সম্পর্কে আমার তেমন একটা জানাশোনা নেই। তাই তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি হয়ত বলতে পারব না। তবে বুজুর্গানেদ্বীন এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম জামায়াত সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ করেন, আমিও সে ধরণেরই অভিমত পোষণ করি। জামায়াতের সঙ্গে প্রকাশ্যে হোক আর গোপনে হোক, কোন ধরনের আপোসের প্রশ্নই আসে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে মাওলানা ইসহাক সরাসরি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং পাবনার শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন। জামায়াত নেতা নিজামীর সমালোচনা করলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা একজোট হয়ে বাঙালি নিধনে ভূমিকা রেখেছেন। ২০১০ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার মাসিক রহমতকে এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭১-এর ভূমিকা বলতে গিয়ে মাওলানা ইসহাক বলেন, 'আমি যেহেতু তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী ছিলাম, তাহলে বুঝতে হবে আমি পাকিস্তানের পক্ষেই ছিলাম। তবে ১৯৭০ সালে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব যখন নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন তখন আমরা বলেছি, ওনাকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হোক। এজন্য আমরা আন্দোলনও করেছি এবং অতীতে আমরা আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল দল মিলে জোট গঠন করেছি। আমরা সব দল মিলেই আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছি। সব আন্দোলনেই আমরা ছিলাম। এরপর সামরিক শাসনের কারণে এদেশে যখন খুব করুণ অবস্থার সৃষ্টি হল, তখন মানুষ আমাদের কাছে এসে আশ্রয় চাইলেন– আপনারা একটা কিছু করুন। এক কোটি লোক হয়ত দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ছয় কোটি লোক তো আর যায়নি। ৭১-এর ভূমিকার জন্য আত্মস্বীকৃত যুদ্ধাপরাধী মাওলানা ইসহাক বলেন, ৭১-এ আমরা পাকিস্তানের পক্ষে থাকার কারণে দুঃখিত ও অনুশোচিত। যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করেছিল এই ভূমিকায় যেতে। তারপরও এই ভূমিকার জন্য আমি দুঃখিত।'[২৯]

৪৯. বেলাল উদ্দীন নানুপুরী

কেন্দ্রীয় শুরাসদস্য, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলাম-এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য এবং চট্টগ্রাম ফটিকছড়ির 'জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর' মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা বেলাল নানুপুরী ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানা অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা জমিরুদ্দিন নানুপুরী ছিলেন পীর এবং নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসার মহাপরিচালক। তার পিতার পরিচালিত মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। তিনি হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা সালাউদ্দিন নানুপুরীর ছোট ভাই।

মাওলানা বেলাল উদ্দীন নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পিতা পরিচালক হওয়ায় (বর্তমান পরিচালক তার বড় ভাই সালাহউদ্দীন নানুপুরী) তিনি উক্ত মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির মেম্বারের দায়িত্ব পালন করছেন। তার পিতা শাহ জমির উদ্দীন যদিও রাজনীতি ভালোবাসতেন না কিন্তু মাওলানা বেলাল ছাত্রজীবনে সর্বপ্রথম নেজামে ইসলাম পার্টি এবং পরে হরকাতুল জিহাদে যোগদান করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে এক সময় মাওলানা বেলাল সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন।

নানুপুর উবায়দিয়ায় তার সার্বিক সহযোগিতায় 'হরকাতুল জিহাদের' কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। পরে যখন হরকাতুল জিহাদ নিষিদ্ধ হয় তখন তিনি গোপনে তাদের সহযোগিতা করতেন। জঙ্গি-মৌলবাদীদের যত কর্মকাণ্ড উত্তর চট্টগ্রামে পরিচালিত হতো 'ইসলামী ঐক্যজোটের' ব্যানারে সব জায়গায় তার অবস্থান সবার আগে ছিল। মাওলানা বেলাল উদ্দিন নানুপুরীর সঙ্গে ইসলামী ঐক্যজোট, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, (চরমোনাই), খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ, হরকাতুল জিহাদ সহ বাংলাদেশের প্রায় সব জঙ্গি-মৌলবাদী দলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বর্তমান হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির শুরা সদস্য এবং হেফাজতের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত 'জামিয়া ইসলামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর' মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

মাওলানা বেলাল উদ্দিন তার একটি ওয়াজ মাহফিলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন, 'আরাকানে মুসলমানদের গণহত্যার প্রতিশোধ ও প্রতিরোধে আল্লাহর সিংহরা প্রস্তুত হচ্ছে! মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনাদের কাছে আবেদন এবং অনুরোধ আপনারা সকলে এই উদ্বুদ্ধকর ভিডিওটি দেখুন। অবশ্যই দেখবেন ইনশা'আল্লাহ। ঈমান আরও দৃঢ় করুন। প্রত্যেকের মধ্যে জিহাদের আলোড়ন ছড়িয়ে দিন। অন্যান্য মুসলিম ভাই ও বোনদের মাঝে প্রচার করে দিন। বেশি বেশি করে শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। এই বার্তাটি পৌঁছিয়ে দিন।

'আরাকানে বহু প্রতিক্ষার পর জিহাদের ডাক এসেছে। আল্লাহু আকবার! মুজাহিদীন ভাইরা ট্রেনিং এবং সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। মুরতাদ কুফফরদের

প্রতিরোধে তারা প্রস্তুত। আল্লাহ্ তাদেরকে কবুল করুন। বিজয় দান করুন, আমীন!ইয়া উম্মাতে মহম্মাদ সিংহের মত এগিয়ে চলো। ইনশাআল্লাহ্ প্রকৃত বিজয় তো আল্লাহ্, তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং মোমিন বান্দাদেরই। হে আল্লাহ্ আমাদের আপনি ক্ষমা করুন, পবিত্র করুন এবং বিজয় দান করুন বিশ্বের সমস্ত কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে।'

৫০. মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী

অর্থ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
যুগ্ম-মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

মুফতি মনির হোসেন কাসেমী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব ও জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম (অধ্যক্ষ) এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক। সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০ দলীয় জোটের মনোনয়ন পেয়ে নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ফতুল্লায় ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

মুফতি মুনীর হোসাইন কাসেমী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের আগের কমিটির অর্থ-সম্পাদক এবং বর্তমান কমিটির যুগ্ম-মহাসচিব। তিনি ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের জমিয়ত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে শামিম ওসমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

২০২১ সালের ৪ এপ্রিল আওয়ার ইসলাম ২৪ ডট.কম-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজধানী ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার মুহতামিম হয়েছেন মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী। নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছেন মাওলানা মাসউদ আহমদ।

'৪ এপ্রিল ২০২১ রোববার বিকাল ৫টায় জামিয়ার শূরা কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন মাদানি সোসাইটি বাংলাদেশের সভাপতি ও শূরার অন্যতম সদস্য বদিউর রহমান।

'মজলিসে শূরার বৈঠকে জামিয়ার পরিচালনার জন্য এর আগে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা কমিটি বিলুপ্ত করে মুফতি মনির হোসাইন কাসেমীকে মুহতামিম এবং মাওলানা মাসউদ আহমদকে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া মজলিসে শূরার বৈঠকে বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা এবং কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শূরা কমিটি নবনিযুক্ত মুহতামিম মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী ও নায়েবে মুহতামিম মাওলানা মাসউদ আহমদকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষার গুণগত মান আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।'

এর আগে ২০২০ সালের ১৩ ডিসেম্বর মারা যান মাদ্রাসাটির মুহতামিম হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব নূর হোসাইন কাসেমী। তার মৃত্যুর পর

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে চলছিল মাদ্রাসা। ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল মজলিসে শূরার বৈঠকে জামিয়ার পরিচালনার জন্য এর আগে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালনা কমিটি বিলুপ্ত করে মুফতি মনির হোসাইন কাসেমীকে মুহতামিম এবং মাওলানা মাসউদ আহমদকে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুফতি মনির হোসেন কাসেমীকে ২০২১ সালের ২১ মে রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাসেমী এজাহারভুক্ত আসামি। তার বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে ৫ মে শাপলা চত্বরে নাশকতা, ২০২০ সালের মামলা, নারায়ণগঞ্জে মামলা ও ২০২১ সালের নাশকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বর, ২০২০ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২১ সালের বিভিন্ন ঘটনায় তিনি জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। হেফাজতের এই নেতা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। ২০২১ সালের ৯ জুন মনির হোসেন কাসেমীকে বারিধারা মাদানিয়া মাদ্রাসা থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়।

৫১. আবদুর রব ইউসুফী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

বাংলাদেশের যে ক'জন কওমি ঘরানার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক রয়েছেন আবদুর রব ইউসুফী তাদের অন্যতম। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাধ্যমেই রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেন। হাফেজ্জী হুজুর রাজনৈতিক দল গঠনের সময় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের 'সাংগঠনিক সম্পাদক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। হাফেজ্জী হুজুরের নির্বাচনী আন্দোলন ও পরবর্তীকালে শাইখুল হাদিস আজীজুল হকের নেতৃত্বে কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এদেশে মৌলবাদী ধারাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আবদুর রব ইউসুফী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। শামসুদ্দীন কাসেমী পরিচালিত রাজধানী ঢাকার জামেয়া হুসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদের মুহাদ্দিস ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় একটি দ্বীনি দারসগাহের মহাপরিচালক ও শাইখুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২১ সালের ১২ জুন দৈনিক পূর্বকোণের এক প্রতিবেদনে হেফাজতের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদীর একটি জবানবন্দির রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে তিনি বলেন– 'হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পর রূপ পাল্টে যায় হেফাজতের। জামায়াত-বিএনপির সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে জুনায়েদ বাবুনগরীর অনুসারীরা। বিএনপি-জামায়াতসহ ২০ দলীয়

জোটের পক্ষ থেকে জমিয়েতে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুল রব ইউসুফী হেফাজতের সাথে সমন্বয় ও তথ্য আদান প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। দু'জনে আবার হেফাজতের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির নায়েবে আমিরের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাবু নগরীর অনুসারী বিভিন্ন জেলার হেফাজত নেতা-কর্মীদেরকে সরকারবিরোধী ইসলামী দল এবং বিএনপি-জামায়াতের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে নির্দেশনাও দিয়েছে হেফাজত।'

৫২. আব্দুস সালাম চাটগামী

উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাবেক প্রধান মুফতি, জামেয়াতুল উলুম আল্লামা বানূরী মাদ্রাসা, পাকিস্তান

আব্দুস সালাম চাটগামী পাকিস্তানের জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বানূরী টাউন করাচির সাবেক প্রধান মুফতি। সর্বশেষ ছিলেন দারুল উলুম হাটহাজারীর মুফতি ও মুহাদ্দিস। তিনি ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার নলদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে ১৯৫৮ সালে বাবুনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের জিরি মাদ্রাসায় চার বছর পড়াশুনা শেষে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন।

১৯৬৭ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাকিস্তানের জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বানূরী টাউন করাচিতে ভর্তি হন। সেখানে উচ্চতর হাদিস ও ফিকাহ নিয়ে পড়াশুনা করেন। ফিকাহ পড়াকালিন প্রচলিত ব্যবসায় স্বত্ব বিক্রি ও একটি তাত্ত্বিক আলোচনা শিরোনামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করেন। পড়াশুনা শেষেই উক্ত জামেয়াতেই কার্যকরি মুফতি হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। মুফতি আযম ওলি হাসান টুংকির অসুস্থার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান মুফতির দায়িত্ব পান। মুফতি ওলি হাসান টুংকির মৃত্যুর পর জামেয়ার প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী পাকিস্তানের বানূরী টাউন করাচিতে দীর্ঘ ৩০বছর অবস্থানকালে প্রায় ৩ লক্ষ লিখিত ফতোয়া দিয়েছেন। যা জামেয়া বানূরী টাউন করাচির ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক। বানূরী টাউনের দারুল ইফতায় ৬০ খণ্ড সম্বলিত রেজিস্ট্রি বইতে এসব সংরক্ষিত আছে। ফলে দেশের মাটি পেরিয়ে বিদেশেও মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী একজন বিখ্যাত ফতোয়াবাজ হিসেবে বেশ পরিচিত। মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজদের নিকট সবচেয়ে দামী ফতোয়া গ্রন্থের জগতে সাড়া জাগানো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'জাওয়াহিরুল ফাতওয়া'। ৪ খণ্ডের জাওয়াহিরুল ফাতওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের করাচির শীর্ষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে চাটগামীর একাধিক গ্রন্থ ছাপানো হয়েছে।

চাটগামীর বইসমূহ: ১. জাওয়াহিরুল ফাতওয়া ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিতব্য! (উর্দু), ২. আপকা সুওয়াল আওর উনকা জওয়াব আহাদীছ কি রৌশনি মেঁ (উর্দু), ৩. ইসলামী মায়িশাত কে বুনয়াদী উসূল (উর্দু), ৪. ইসলাম ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়। (বাংলায় অনূদিত), ৫. রহমতে আলম সা. এর মকবুল দোয়া (উর্দু-বাংলা), ৬. মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী (উর্দু), ৭. হায়াতে শায়খুল কুল, ৮. তাজকেরায়ে মুখলিছ, ৯. মাকালাতে চাটগামী।

২০০০ সালে স্বদেশের ভালবাসা এবং হেফাজতের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আমির দারুল উলুম হাটহাজারীর মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফীর আহ্বানে মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ২০০৩ সালে দারুল উলুম হাটহাজারীতে খেদমত শুরু করেন। মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দারুল উলুম হাটহাজারীতে নিয়োগের পর ২ বছর মেয়াদি উচ্চতর উলূমুল হাদীছ বিভাগ চালু করা হয়। বিভাগটি ইতোমধ্যে হাদিস গবেষণায় নতুন নতুন ফতোয়া অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

দেশে ফিরে হাটহাজারী মাদ্রাসায় নিয়োগের সময় বাংলাদেশের গ্রান্ড মুফতি ছিলেন আল্লামা আহমদুল হক। তার মৃত্যুর পর ২০০৯ সালে আল্লামা চাটগামীকে বাংলাদেশের 'মুফতি আযম' হিসেবে মনোনীত করা হয়। মাওলানা চাটগামী ২০০১ সালে চট্টগ্রাম শহরের চাক্তাই-এ প্রতিষ্ঠা করেছেন, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআস ওয়াস সুন্নাহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ, উচ্চতর কেরাত ও হেফজ বিভাগের পাশাপাশি জিহাদের উপর বিশেষ কোর্স রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ফতোয়াবাজদের একজন।

২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে শুরা বৈঠক চলছিল। তাকে হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দিতে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। এর পরপরই সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। অ্যাম্বুলেন্স করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ২০২১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় হাটহাজারী মাদ্রাসা মাঠে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাদ্রাসার 'মাকাবারায়ে জামিয়া'তে দাফন করা হয়।

৫৩. আব্দুল হামীদ মধুপুর

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
নায়েবে আমির, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট

মাওলানা আব্দুল হামীদ (পীর সাহেব মধুপুর) ১৯৫৪ সালে বিক্রমপুরের (মুন্সিগঞ্জ জেলার) সিরাজদিখান থানাধীন রাজানগর সৈয়দপুর ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মনিরুদ্দীন।

মাওলানা হামীদের প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের দক্ষিণ মধুপুর শরীয়তুল্লাহ বেপারী মসজিদের মক্তব থেকে আরম্ভ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য নোয়াখালীতে অন্তর্গত চাটখিল থানাধীন কেশুরবাগ গ্রামের আশরাফিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে চার বছর পড়াশুনার পর সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে দারুল উলুম আল

হুসাইনিয়া ওলামা বাজার গমন করেন। সেখানে দীর্ঘ ছয় বছর পর দাওরায়ে হাদিস সমার্পন করেন।

মধুপুরের পীর ১৯৭০ সালে লেখা পড়া শেষ করে এক টানা দেড় বছর সময় লাগানোর পর ছয় মাস কাকরাইলে মুকীম হিসাবে থাকেন। পরে এলাকায় ফিরে দক্ষিণ মধুপুর মসজিদ সংলগ্ন মক্তব যেখানে তিনি নিজেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন, সেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ চার বছর মাদ্রাসা সেখানেই ছিল।

২০২১ সালের ২৮ মার্চ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ আহুত হরতালের সমর্থনে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মিছিল বের করা হলে পুলিশের বাধা ও উপর্যুপরি গুলিবর্ষণে মাওলানা আব্দুল হামিদ গুলিবিদ্ধ হন। জুনায়েদ বাবুনগরী ও নুরুল ইসলাম জিহাদীর নেতৃত্বাধীন হেফাজতে ইসলামের ২০২১ সালে বিলুপ্ত কমিটি ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে হেফাজতের নায়েবে আমির ও মধুপুরের পীর মাওলানা আব্দুল হামিদ। ২০২১ সালের ২৮ মে লেখা ওই ঘোষণাপত্রে হেফাজতের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা আমির মাওলানা আহমদ শফীর আদর্শে অবিচল থাকার ঘোষণা দেন তিনি। তিনি হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। আহমদ শফীপন্থী হওয়াতে পরবর্তীকালে হেফাজতের নতুন কমিটিতে কোনো পদ দেওয়া হয়নি। তিনি দীর্ঘদিন জমিয়তের উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। বর্তমান তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের নায়েবে আমির পদে রয়েছেন।

৫৪. শেখ আহমদ

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
উপদেষ্টা, নেজামে ইসলাম পার্টি

মাওলানা শেখ আহমদ ১৯৫০ সালের ১৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার মিরেরখীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করেন শেখ আহমদ। পড়াশোনা শেষে টানা ৩৫ বছর পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা করেন তিনি। এরপর চট্টগ্রামের উবাইদিয়া ফটিকছড়ি নানুপুর মাদ্রাসায় কয়েক বছর শাইখুল হাদিস হিসেবে অধ্যাপনার পর ২০১৮ সালে তাকে আবার হাটহাজারীতে নিয়ে আসা হয়। হাটহাজারী মাদ্রাসার মুঈনে মুহতামিম (সহযোগী পরিচালক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন শেখ আহমদ।

২০০৪ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসায় কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা বাধ্য হয়েই থাকে হাটহাজারী ছাড়তে হয়েছিল। ২০০৪ সালে জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরে শায়খুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেফাজতের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আমির প্রয়াত আহমদ শফীর খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন শেখ আহমদ। মাদ্রাসা ও ব্যক্তিগত প্রায় সব কাজেই তিনি আহমদ শফীর সহযোগী ছিলেন। শেখ আহমদ দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য অনেক কওমি মাদ্রাসার শূরা সদস্য (পরিচালনা কমিটির সদস্য)। এমনকি তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার বর্তমান চাকরিরত দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষকদের শিক্ষক।

শেখ আহমদ হাটহাজারীর মুফতি ফয়জুল্লাহ এর হাতে প্রথম বায়াত গ্রহণ করেন। মুফতি ফয়জুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর মাওলানা হাফিজুর রহমান (প্রকাশ পীর সাহেব) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। সর্বশেষ আহমদ শফীর বিশেষ খলিফা হিসেবে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নব্বইয়ের দশক ও শূন্য দশকের শুরুর দিকে হাটহাজারী মাদ্রাসার দরসে হাদিসের শিক্ষক ছিলেন। তার কাছে হাদিস পড়া ছিল তখনকার ছাত্রদের অন্যতম স্বপ্ন। কারণ জিহাদ ও সাম্প্রদায়িক বিষয়ক হাদিসগুলো তিনি মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ছাত্রদের মাঝে উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতেন। তার হাদিসের দরস থেকে তৎকালীন হরকাতুল জিহাদের জঙ্গি সদস্যরা অনুপ্রেণিত হয়ে জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তেন। তিনি হুজির একজন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও পরামর্শক। হুজির পরিচিতি ও মুখপত্র মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম ও ফতোয়া বিষয়ক লিখতেন। তার সেইসব জিহাদ বিষয়ক লেখা জঙ্গিরা আগ্রহ সহকারে পড়ে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হতেন। বাংলাদেশে জিহাদী তৈরিতে তার ভূমিকা রয়েছে।

২০২০ সালের ১৬ জুন চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় মজলিসে শূরার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির মজলিশে শুরার বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতে আল্লামা বাবুনগরীকে সহযোগী পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হাটহাজারী মাদ্রাসার শূরা সদস্যের কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে একজন শয্যাশায়ী হওয়ায় তিনি ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মজলিসে শূরার উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন– ঢাকার জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা পরিচালক ও হাইয়াতুল উলয়া কো-চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, ফরিদাবাদ মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম ও বেফাক যুগ্ম-মহাসচিব মুফতি নুরুল আমিন, ঢাকার খিলগাঁও মাখজানুল উলুম মাদ্রাসার মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী, হাটহাজারীর আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া হামিউচ্ছুন্নাহ মেখল মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা নোমান ফয়জী, ফটিকছড়ির জামিয়া উবাইদিয়া নানুপুর মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা সালাহউদ্দিন নানুপুরী ও হাটহাজারীর ফতেপুর মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফতেপুরী।

৫৫. মুহিব্বুল হক গাছবাড়ি

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
কেন্দ্রীয় নেতা, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম

মাওলানা মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ি ১৯৪৫ সালের ৬ ডিসেম্বর সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের ফখরোচটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা ইসহাক। ডাকনাইল দক্ষিণ সরকারি বিদ্যালয়ে ৫ বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ছাফেলা ১ম বর্ষ থেকে আলিয়া ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন নিজ এলাকার গাছবাড়ি মাযাহিরুল উলুম কওমি মাদ্রাসায়।

অতঃপর ১৯৬৩-৬৪ সালে তদানীন্তন সিলেটের দারুল উলুম কানাইঘাটে ভর্তি হয়ে আলিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ ২ বছরকাল মুখতাছারুল মাআনি, সুল্লামুল উলুম, মুসল্লামুস সুবুত, তাফসিরে মাদারিক প্রভৃতি কিতাব পড়ালেখা করেন। এরপর ১৯৬৫ সালে ছয়মাস ঢাকা উত্তর রানাপিং আরবিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৪ বছর অবধি উলুমে আরাবিয়ার বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পরই তার কর্মজীবনের সূচনা হয় প্রথমেই ১৯৬৯ সালে সুনামগঞ্জ দরগাহপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে। সেখানে তিনি ৪ বছর হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবাদীর অধ্যাপনা করেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগার শিক্ষক মনোনীত হন। মাওলানা আবুল কালাম জাকারিয়া মৃত্যুর পর ২০১৯ সাল থেকে সিলেটের জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগার মুহতামিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন তিনি একাধারে জামেয়ার শাইখুল হাদিস, প্রধান মুফতি ও মুহতামিম হিসাবে তিনটি পদে সমাসীন।

বর্তমানে তিনি সিলেটের কওমি শিক্ষাবোর্ড আযাদ দ্বীনি এদারার সিনিয়র সহ-সভাপতি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কওমি মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড আল হাইআতুল উলয়ার মূল কমিটির সদস্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য, আল-হাইআতুল উলিয়ার অধীনে গঠিত ইফতা বোর্ডের সদস্য, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ সিলেট জেলার সভাপতি, খাদিমুল কোরাণ পরিষদের সভাপতি, সিলেট জেলা উলামা কমিটির চেয়ারম্যান ও সিলেট জেলা ফতোয়াবোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এছাড়াও বর্তমানে দরগাহ মাদ্রাসা ছাড়াও তিনি বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। তন্মধ্যে গাছবাড়ি মাযাহিরুল উলুম কৌমি মাদ্রাসা আকুনি, জামেয়া আয়েশা সিদ্দিকা (রা) দারুল হাদিস জাহানপুর বালিকা মাদ্রাসা ও খাইরুল উলুম খাদিমনগর মাদ্রাসা।

৫৬. মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী

সাবেক মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাবেক সভাপতি, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত

মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধুরুং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুর রশীদ। বাল্যকালেই নাজিরহাট নাসিরুল ইসলাম বড় মাদ্রাসায় কোরাণ শরীফ হিফজ সম্পন্ন করে একাধারে কিতাবখানার অধ্যায় শেষ করে আল জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করার পর পটিয়া থানাধীন কৈয়গ্রাম মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। উক্ত মাদ্রাসায় এক বৎসর শিক্ষকতার পর বাবুনগর জামিয়া ইসলামিয়া আজীজুল উলুম মাদ্রাসায় নিয়োজিত হন।

বাবুনগর জামিয়ায় কয়েক বৎসর অধ্যাপনার পর ঢাকার আশরাফুল উলুম বড় কাটারায় ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ঘটনাক্রমে তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি ধুরুংগ্রামে চলে যান ও পুনরায় বাবুনগর মাদ্রাসায় যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালের ১০ই জুলাই ঢাকা জেলার অন্তর্গত খিলগাঁও-এ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা ও আমেলার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৭৮ সালে "ইসলামী আন্দোলন পরিষদ" নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কথিত ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মূলোৎপাটনের নামে নিজেকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের নেতা হিসেবে জাহির করতে সক্ষম হন। তার জীবনের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে নেজামে ইসলাম পার্টির সাবেক সভাপতি সিদ্দীক আহমদ এর সাহচর্যে। সমকালীন কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের নামে দেশজুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেন। কাদিয়ানী ফিৎনাসহ যাবতীয় নবুওয়তের দাবীদার ও তাদের অনুসারীদের সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে গঠিত তথাকথিত "আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ" এর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ১৯৯০ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ তারই মূল ভূমিকা ছিল। বক্তা হিসেবেও তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। তার কয়েকটি বই: আখলাকে রাসূল সাঃ, উল্কা নক্ষত্র, কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিলাতের অবস্থান, কুরবানীর আহকাম, গুলশানে নুর, আসমানে ইলম কি চাঁন্দ দরখসান্দে সিতারে, তাজকেরায়ে খতীবে আজম, শেখ সাদীর রহ. এর উপদেশ ভান্ডার, কাদিয়ানের বহুরূপী ভন্ড নবী, নুকুশে জিন্দেগী ও পান্দে নামায়ে নছীর, কওমি মাদ্রাসা উদ্দেশ্য পদ্ধতি ফলাফল ইত্যাদি।

মাওলানা নুরুল ইসলাম বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে বেশ কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য; যেমন– যুক্তরাজ্যের জামিয়া খাতামুন্নাবিয়্যীন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া নূরুল উলুম কুমিল্লা, তাজবীদুল কোরাণ মাদ্রাসা শাহনগর চট্টগ্রাম, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম নূরনগর মশিউর নগর, অষ্টধার কোতোয়ালী মোমেনশাহী, দারুল উলুম নূরবাগ গোপালপুর টাঙ্গাইল, নূরুল কোরাণ একাডেমী, রহমতবাগ মাদানীনগরসহ আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী ২০২১ সালের ২৯ নবেম্বর দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

৫৭. আয়ুব বাবুনগরী

কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাজতে ইসলামের সাবেক অর্থ সম্পাদক, বর্তমান কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা ও আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আয়ুব বাবুনগরী চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি থানাধীন দৌলতপুর ইউনিয়নের বাবুনগর গ্রামে ১৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হেফাজতের বর্তমান আমির মাওলানা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী। তার দাদা নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা হারুন বাবুনগরী। হেফাজতের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় মহাসচিব (জুনায়েদ বাবুনগরী) হলেন তার আপন ফুফাতো ভাই।

মাওলানা আয়ুব বাবুনগরীর লেখাপড়ার হাতেখড়ি 'আজিজুল উলুম বাবুনগরী' মাদ্রাসায়। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি শেষ করেন তার দাদার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা জামিয়া আজিজুল উলুমে। তিনি উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। আয়ুব বাবুনগরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় 'নেজামে ইসলাম পার্টির' মাধ্যমে। তিনি 'ইসলামী ঐক্যজোটের' রাজনীতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। মুফতি আমিনীর প্রতিষ্ঠিত জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ফটিকছড়ির সিনিয়র নেতা, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ এর উপদেষ্টা এবং হরকাতুল জিহাদের নেতা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন মাওলানা আয়ুব বাবুনগরী।

১৯৯৯ সালে যখন 'ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়; (সিপাহে সাহাবা) তখন মাওলানা আয়ুব বাবুনগরী এই সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গি-মৌলবাদী ছাত্রদের মাধ্যমে হরকাতুল জিহাদকে সহযোগিতা করা। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মুফতি শাজাহান ইসলামাবাদী ছিলেন একজন হরকাতুল জিহাদের কমান্ডার ও নেতা। বর্তমানে তিনি কুয়েত প্রবাসী এবং জঙ্গি-মৌলবাদী এনজিও 'ইয়াহইয়াসুন্নাহর' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আয়ুব বাবুনগরী ছাত্রজীবন থেকেই মৌলবাদী-জঙ্গিদের সহযোগিতা করে আসছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, একসময় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হওয়ার সুবাদে মাওলানা আয়ুব বাবুনগরী অঢেল সম্পত্তির মালিক। হেফাজতের অর্থ সম্পাদক ছাড়াও তিনি তার পিতা হেফাজতের বর্তমান আমির মুহিববুল্লাহ বাবুনগরীর পরিচালনাধীন মাদ্রাসা 'আজিজুল উলুম বাবুনগর'-এর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন।

৫৮. খালেদ সাইফুল্লাহ

যুগ্ম-মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
উপদেষ্টা, রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ

রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা, উত্তরা গাউসুল আজম জামে মসজিদের খতীব হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ

আইয়ুবী নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার অদূরে সাভারের সুগন্ধা হাউজিংয়ে তার মারকাজুত তাকওয়াহ মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। হেফাজতে ইসলামের নাশকতা ও সহিংসতার ঘটনায় খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবীর বিরুদ্ধে পল্টন থানায় মামলা ছিল। তাকে ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সিংগাইর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিতর্কিত হেফাজত নেতা মামুনুল হকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী। হেফাজতের নতুন কমিটি গঠন ও বক্তাদের নিয়ে রাবেতাতুল ওয়ায়েজিন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছনে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।

ওয়ায়েজীনদের বৃহৎ প্লাটফর্ম ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংগঠনটির পুরোনো কমিটি ভেঙে মাওলানা আব্দুল বাসেত খান সিরাজীকে সভাপতি ও মাওলানা হাসান জামিলকে মহাসচিব করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২০২০ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর প্রেস ক্লাব সংলগ্ন বিএমএ মিলনায়তনে দিনব্যাপী 'ওয়ায়েজ, খতীব ও দায়ী ওলামায়ে কেরামের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনটির উপদেষ্টা মাওলানা মামুনুল হক ও মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ূবীর যৌথ সঞ্চালনায় অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (পীর সাহেব দেওনা) কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

দেশের সকল ওয়ায়েজদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে আনার জন্যে ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ নামে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে মুফতি উমর ফারুক যুক্তিবাদী ও নির্বাহী সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কেন্দ্রীয় মহাসচিব হিসেবে মাওলানা ইউসুফ বিন এনাম শিবপুরী দায়িত্ব পালন করছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'-এর কমিটির সাথে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের তৎকালীন আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী একাত্মতা পোষণ করেছিলেন এবং মুঠোফোনে বক্তাদেরকে শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের চেতনার পক্ষে ওয়াজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। সেই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। ওই সংঘাতে প্রাণ হারান অন্তত ১৮ জন। সেসব ঘটনায় একাধিক মামলা হয়। মামলার আসামীদের ধরতে অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ পর্যন্ত হেফাজতের অন্তত এক ডজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন মাওলানা আইয়ুবী।

'গাজওয়ায়ে হিন্দ' বিষয়ে তার একটি ওয়াজে তিনি বলেন, 'এই উম্মাহর মধ্যে একটি দল সিন্ধ ও হিন্দের দিকে অগ্রসর হবে অবশ্যই, তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের(মুজাহিদ) বরকত দান করবেন, আর তারা সিন্ধের রাজাদের শিকল পরিয়ে আনবে, আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের

ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তারা যখন ফিরে আসবে তখন তারা ঈসা ইবন-ই-মারিয়ামকে সিরিয়ায় পাবে।

'আমার উম্মাহর কিছু লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা ইন্ডিয়ান রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) সেখানে পাবে।

'জেরুসালেমের (বাই'ত-উল-মুক্বাদ্দাস) একজন রাজা তার একটি সৈন্যদল হিন্দুস্তানের দিকে পাঠাবেন, যোদ্ধারা হিন্দের ভূমি ধ্বংস করে দিবে, এর অর্থ-ভান্ডার ভোগদখল করবে, তারপর রাজা এসব ধনদৌলত দিয়ে জেরুসালেম সজ্জিত করবে, দলটি হিন্দের রাজাদের জেরুসালেমের রাজার দরবারে উপস্থিত করবে, তার সৈন্য-সামন্ত তার নির্দেশে পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল এলাকা বিজয় করবে, এবং হিন্দুস্তানে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণ না দাজ্জালের ঘটনাটি ঘটে ।'

৫৯. জাকারিয়া নোমান ফয়েজী

প্রচার সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা জাকারিয়া নোমান হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ও চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া হামিয়ুচ্ছুন্নাহ মেখল মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক। ফয়েজী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী সদর উপজেলার পূর্বাংশে মেখল ইউনিয়নে ১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা নোমান ফয়েজী। জাকারিয়া নোমান ফয়েজীর বাবা মাওলানা নোমান ফয়েজীও ছিলেন হেফাজতের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। ছিলেন আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার শূরা সদস্য ও হাটহাজারী উপজেলার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া হামিয়ুচ্ছুন্নাহ মেখল মাদ্রাসার পরিচালক।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ মাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামসহ দেশজুড়ে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডবের ঘটনার কমপক্ষে ১০ জন 'মাস্টারমাইন্ড' ছিল বলে জানিয়েছিল পুলিশ। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক জাকারিয়া নোমান ফয়েজী একজন। ২০২১ সালের ৫ মে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের গোয়েন্দা ইউনিটের একটি দল কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে জাকারিয়া নোমান ফয়েজীকে গ্রেপ্তার করে।

২০২১ সালের ৬ মে সারাবাংলা ডটনেট-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গ্রেপ্তারের পর জাকারিয়া নোমান ফয়েজীর কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে জাকারিয়া নোমান ফয়েজী হাটহাজারীতে যেসকল নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে, বিশেষ করে পুলিশ সদস্যদের ওপর আক্রমণ, থানা ভাঙচুর, ডাকবাংলো ভাঙচুর, ভূমি অফিসে আগুন

দেওয়াসহ যেসব ফৌজদারি অপরাধ হয়েছে– প্রত্যেকটিতেই তার সম্পৃক্ততার কথা আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে।

'হেফাজতের তান্ডবের ঘটনায় যারা মাস্টারমাইন্ড ছিল, তাদের মধ্যে একজন জাকারিয়া নোমান ফয়েজী। তাদের ইন্ধনে, তাদের নির্দেশে, তাদের অর্থের যোগানে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে, প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তিনি (জাকারিয়া) নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। যেহেতু তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক, হাটহাজারীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় হেফাজত কর্তৃক যেসব ফৌজদারি অপরাধ সম্পৃক্ত হয়েছে, কমবেশি প্রত্যেকটি ঘটনায় কোথাও কোথাও তার সম্পৃক্ততা ছিল, কোথাও কোথাও তার নির্দেশ ছিল, কোথাও কোথাও তার ইন্ধন ছিল।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিন ২০২১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় ভাঙচুর, স্থানীয় ভূমি অফিসে অগ্নিসংযোগসহ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয় হেফাজতের নেতাকর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ গুলি ছুড়লে হেফাজতে ইসলামের চার কর্মী নিহত হয। এর জেরে তিনদিন ধরে হাটহাজারী থানার অদূরে হেফাজতের মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার সামনে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে ইটের দেওয়াল তুলে অবরোধ তৈরি করে রাখে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। একই ঘটনার জেরে চট্টগ্রামের পটিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্নস্থানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় প্রথমে সাতটি মামলা করা হয়েছে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণের অভিযোগে এনে হেফাজত নেতা মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়েজীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেছেন এক নারী।

২০২১ সালের ৬ মে ঢাকা পোস্ট টুয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০২১ সালের ৬ মে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মডেল থানায় মামলাটি করা হয়। মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ফেসবুকের মাধ্যমে ওই নারীর সঙ্গে হেফাজত নেতা ফয়েজীর পরিচয় হয়। মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে তাকে ফুসলাতে থাকেন। পরে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে ওই নারীকে হাটহাজারীতে আসতে বলেন। সে অনুযায়ী ওই নারী হাটহাজারী এলে ওই বছরের নভেম্বরে পৌরসভার ফটিকা গ্রামে কনক বিল্ডিংয়ের নিচ তলায় বাসা ভাড়া করে দেন হেফাজত নেতা ফয়েজী।

'প্রায় এক বছর ধরে ভাড়া বাসায় অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় তিনি ওই নারীকে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী হাটহাজারী থেকে চট্টগ্রাম শহরে তার খালার বাসায় চলে আসেন। এরপরও বিয়ের প্রলোভন দিয়ে সুকৌশলে বিভিন্ন বাসা ও হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফয়েজী তাকে ধর্ষণ করেন। অবশেষে তার প্রতারণা বুঝতে পেরে ওই নারী নিজে বাদী হয়ে হাটহাজারী মডেল থানায় তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেন।

'হেফাজত নেতা ফয়েজী হাটহাজারীতে সহিংসতার মামলার এজহারভুক্ত আসামি। একাধিক নারীর সঙ্গে ফয়েজীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক: হেফাজতে ইসলাম

বাংলাদেশের বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক হেফাজতে নেতা নোমান ফয়েজীর একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রমাণ পায় পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি একাধিক নারীর সঙ্গে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন। এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'মানুষ মাত্রই ভুল করে।' এছাড়া জাকারিয়া নোমান দেশজুড়ে হেফাজতের তাণ্ডবের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড ছিলেন বলেও দাবি পুলিশের। ২০২১ সালের ৭ মে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার এস এম রশিদুল হক বলেন, তিনি (জাকারিয়া নোমান) বিবাহিত কিন্তু তার কাছ থেকে পাওয়া মোবাইল সেটের সূত্র ধরে আমরা জানতে পারি, তার একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক ছিল। এছাড়া জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে, একাধিক নারীর সঙ্গে তার বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক ছাড়াও বিবাহবর্হিভূত শারীরিক সম্পর্কও ছিল।

'মোবাইলে ম্যাসেঞ্জারে একাধিক নারীর সঙ্গে 'অনৈতিক' কথোপকথনের তথ্য আছে জানিয়ে পুলিশ সুপার আরও বলেন, বেশকিছু চ্যাটিং পেয়েছি, যাদের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। আমাদের হাতে সেগুলো আছে। তদন্তের স্বার্থে আমরা সেগুলো এখন প্রকাশ করব না। ওই নারীদের সঙ্গে যে তার যোগাযোগ ছিল এবং অনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেগুলো এই চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।'

৬০. সাখাওয়াত হোসাইন রাজী

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট

হেফাজতে ইসলামের সাবেক সহকারী মহাসচিব ও বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজীর বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'বিডি ইসলামিক সেন্টার' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ওয়াজে মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, 'নামাজের জামাতে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক করা নাকি অসাংবিধানিক? এই দেশে অনেক কিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ছবি টানানো বাধ্যতামূলক করা হয়, মঙ্গল শোভাযাত্রা বাধ্যতামূলক করা হয়। নামাজ আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। প্রয়োজনে বাংলাদেশের সংবিধান একশ বার কাঁটাছেড়া করো। দল মত ভিন্ন হতে পারে, তবুও যদি তোমরা এই ধরনের নোংরা কথাবার্তা বলো তবে দেশের মানুষ কাগজ জমাইয়া তোমার গদিতে আগুন ধরাইয়া দেবে।

'আমরা কর্মসূচি পালন করেই যাব। যদি কেউ মনে করে আমরা কর্মসূচি পালন করে ক্লান্ত হয়ে যাব তবে আপনারা ভুল করবেন। আমরা শাপলা চত্বরে রক্ত দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই নাই। দরকার হলে বঙ্গোপসাগর পরিমান রক্ত দেব। এই রক্তের স্রোতে কাদিয়ানী আর তাদের দোসররা বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাবে। হে মুসলমানরা শোনো,

লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি লাগে। আমরা প্রস্তুত আছি। জুনায়েদ বাবুনগরী, ওলামায়ে একরাম যখনই আমাদের ডাকবে তখনই আমরা রাজপথে নেমে আসব ইনশাল্লাহ।'

২০২১ সালের ৭ই মার্চ 'Jadid Media' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ওয়াজে দেখা যায় মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজী বলছেন, 'কেন আমরা আল্লাহর নবীর দুশমনদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই, তোমরা জানতে চাও? আমার কাছে এক কোটি যুক্তি আছে। যদি রসুলের কটূক্তিকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা না হয় তবে এর উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। যদি মুসলমান হিসেবে মরতে চাও, মুনাফেক হিসেবে মরতে না চাও, তবে দেশের জন্যে, ঈমানের জন্যে, শান্তির জন্যে এমন একটি আইন চাই যেখানে কটূক্তিকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে। না হলে আল্লাহর কসম বলছি, আমাদের গায়ে আগুন লাগলে আমরা সারা বাংলাদেশে আগুন ছড়িয়ে দেব। তোমাদেরকে ইজ্জত পুনরুদ্ধারের তরিকা বলে দেই। যদি বাংলার জমিনে হেফাজত থাকে তবে আল্লাহ তোমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দেবে। আর যদি বাংলাদেশে হেফাজত না থাকে তবে তোমাদের ইজ্জত কতটা যাবে তা আল্লাহই জানেন। আমরা যদি বাংলাদেশে কোরান বাধ্যতামূলক করতে চাই তবে নাস্তিক মুরতাদদের গায়ে আগুন ধরে যায়। পাকিস্তানেও স্কুল কলেজে কোরান শেখা বাধ্যতামূলক।

'হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করেছিলাম, এদেশে মুসলমানদের জন্য কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিন্তু স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলোতে আমরা তা দেখতে পাই না। তোমরা কাকে পরোয়া করো? আজকে প্রাইমারি স্কুলে, হাইস্কুলে কোটি কোটি শিক্ষার্থী কোরান পড়তে পারে না। তাই কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভালভাবে বলছি। যদি না শোনো তবে আঙুল ত্যাড়া করতেও আমরা জানি।'

২০২০ সালে 'Islamic Jihad TV' ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত– কুষ্টিয়া শাহ মিরপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার একটি ওয়াজ মাহফিলে মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বলেন, ''আমার সোনার বাংলা' গানটি লেখা হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তখন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে রবি ঠাকুর এটা লিখেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গ হলে সেদিন আমাদের এই পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়তো। রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাওয়ার বেশ সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের নির্যাতিত মুসলিম ও দলিত শ্রেণির প্রজাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হতো।

'এছাড়া তখন বঙ্গভঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শোষক জমিদারশ্রেণির জমিদারিত্ব হুমকির মুখে পড়তো। তাই নিজের জমিদারিত্ব, পূর্ববাংলার মুসলমান ও দলিত শ্রেণির প্রজাদের শোষণ এবং অভিজাত বর্ণহিন্দুর আধিপত্য নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে রবিঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এই গানটি লিখেছিলেন।

'গানটি এমনকি পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাংলার একত্রীকরণের কিংবা অখণ্ড বাংলার ঐতিহাসিক প্রেরণাও জোগায়। ফলে এটি কোনোভাবেই বাঙালি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের চেতনার প্রতি সর্মথন দেয় না। অথচ আজকের বাংলাদেশ

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অধীন একটি পরজীবী অঙ্গরাজ্য মাত্র! 'আমার সোনার বাংলা' গানটি আগাগোড়াই পৌত্তলিক ভাবপুষ্ট। হিন্দু সম্প্রদায় যেভাবে গরুকে 'মা' বলে পূজা করে, ঠিক সেভাবে দেশকেও 'মা' কল্পনা করে পূজা করার মতো একটা শেরেকি ভাব এই গানটির মধ্যে নিহিত আছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মজাত মাতৃভক্তিবাদ ফুটে ওঠে গানটিতে।

'মুসলমানরা দেশের মাটি, বাতাস, আলো, বায়ু ইত্যাদিকে আল্লাহ'র দান ও তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে তার প্রশংসায় শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক সিজদাবনত হয়। অথচ গানটিতে তথাকথিত 'মা'-এর বন্দনা করা হয়েছে, যেন দেশ নিজেই একটা মাতৃদেবী! আর ইসলামের বিশ্বাসব্যবস্থায় কেবল আল্লাহ'র প্রতি ব্যতীত আর কোনো বিশেষ ভক্তিবাদের স্থান নেই, কারণ তা শিরক বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক কয়েকটি লাইন গানটি থেকে তুলে না ধরলেই নয়। তা হলো:

'ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে / দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে / ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিবো চরণতলে / মরি হায়, হায় রে। এখানে বিশেষত 'তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে' এবং 'গরিবের ধন যা আছে তাই দিবো চরণতলে'– এ দুটি লাইনে যেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে দেবীর পাদদেশে পূজার অর্ঘ্য নিবেদনের গভীর আর্তি জেগে ওঠে! তাছাড়া দেশকে 'মা' হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা একসময় ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ছিল না; হিন্দুদের স্বভাবজাত ধর্মীয় মাতৃভক্তিবাদপ্রসূত 'দেশমাতা' ভাবনার জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিকভাবে সেটা ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। গরুকেও হিন্দুরা ধর্মীয় 'মা' হিসেবে পূজা করে। সুতরাং মাতৃভক্তিবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ধর্মাচার মাত্র। তাই, পৌত্তলিক ভাবপুষ্ট হওয়ায় 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নিয়ে বিশেষত ওলামায়ে কেরামের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। আমি এই সংগীতের পরিবর্তন চাই।'

৬১. মুফতি ইলিয়াস হামিদী

সহ-অর্থ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মারকাজুল কুরআন ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক, ঢাকা বায়তুল আকসা জামে মসজিদের খতিব, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সভাপতি মুফতি ইলিয়াস হামিদী ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার ঘাটারচর তারবিয়াতুল উম্মাহ মাদ্রাসার বর্তমান পরিচালক তিনি। ২০২১ সালের ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে ফেরার পথে মুফতি ইলিয়াস হামিদিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

হেফাজত নেতাদের জরুরি বৈঠক শেষে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ঢাকা ফেরার পথে রাত ১০টার দিকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে র‍্যাবের একটি দল সাদা পোশাকে

হামিদীর ভাড়া করা গাড়ির গতিরোধ করে। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর সহ-সভাপতি মুফতি ইলিয়াস হামিদীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব হাসান রিমান্ডের এই আদেশ দেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানায় দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় তার ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ।

নাশকতার পরিকল্পনা, ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, মুফতি ইলিয়াসসহ মোট নয় জনের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের (সংশোধন-২০১৩) ১০/১১/১২/১৩ ধারায় মামলা হয়েছে। র‍্যাব-২ এর ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে এই মামলা করেন।

২০২০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'মাদানী HD মিডিয়া' চ্যানেলে প্রকাশিত নেত্রকোণার একটি ওয়াজ মাহফিলে মুফতি ইলিয়াস হামিদী বলেন, 'হে যুবক ভাইয়েরা, এখন সমগ্র বাংলাদেশে চলছে দাওয়াতের কাজ। আমাদের কাজ এখন দাওয়াত দেওয়া। যখন সময় আসবে জিহাদের তখন সবাইকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সামনে সেই দিন আসতেছে। যখন জিহাদের ডাক আসবে তখন আর ঘরে বসে থাকা যাবে না।

'হে মুসলীম ভাইয়েরা, আর দেরি নয় এখনই নেমে পড়ুন, ইসলাম রক্ষার জন্য, ঘরে বসে থাকলে চলবেনা, ওরা আল্লাহর কোরান ফুরিয়েছে, ওরা আমাদের ভাইদের কে মেরেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর বদলা নিতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসবো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন। ওহে নাস্তিকদের দল হুঁশিয়ার হও এখনি। নইলে বাংলার মুসলমান রা ছাড়বে না তোমাদের কোন দিন দরকার হলে যশোরেরে মাটি থেকেই তোমাদের বিতাড়িত করার তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে ইনশা আল্লাহ।'

৬২. শরিফউল্লাহ

সহ-প্রচার সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা শরিফউল্লাহ ১৯৮০ সালে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার মীর হাজিরবাগ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাত্রাবাড়ী জামিয়া মাদানিয়া কওমি মাদ্রাসা থেকে পঞ্চম-দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক মুফতি শরিফউল্লাহ। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধ করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। পুলিশের মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, '২০১৩ সালের ৬ মে ভোর ৫টা ৫ মিনিটের দিকে হেফাজত নেতাকর্মীরা যাত্রাবাড়ী থানার ডব্লিউ জেট ফিলিং স্টেশনের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপর কদমতলী থানার কাজে ব্যবহৃত ঢাকা মেট্রো-ঠ- ১৪-১৭০৫ পুলিশ পিকাপে অগ্নিসংযোগ করে পুলিশের ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। পরে ওই দিন সকাল ৯ টার দিকে

যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগস্থ ইউনাইটেড পেট্রোল পাম্পের সামনে পৌঁছা মাত্রই আসামি শরীফ উল্লাহসহ অন্য আরও ৪০০/৫০০ জন দুষ্কৃতকারী হঠাৎ করে ট্রাকটির ওপর বেআইনিভাবে মারমুখী হয়ে গাড়ির ওপর হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে এবং গাড়িতে অবস্থানকারী ফোর্সদের হত্যার উদ্দেশ্যে ইট-পাথর, লোহার রড, পাইপ ইত্যাদি দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।'

হেফাজত নেতা শরিফ উল্লাহ ছাত্র জীবনে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ(হুজির) সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ঢাকার কামরাঙ্গিরচর জামিয়া নুরিয়া মাদ্রাসায় অবস্থিত তৎকালীন হুজির কার্যালয়ে তিনি যাতায়াত করতেন। কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন স্পটে হুজির পরিচালনাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। হুজির একজন সদস্য হিসেবে বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা মাদ্রাসার ছাত্রদের মাঝে জিহাদী দাওয়াত দিতে সফর করতেন। ঢাকার বাইরে হুজির বৃহত্তর ঘাঁটি চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার মুফতি ইজাহার ইসলামের জমিয়াতুল উলুম মাদ্রাসায়ও তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। হুজির সাবেক আমির ২১ আগস্ট মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রয়াত হাফেজ মাওলানা কমান্ডার ইয়াহিয়া ছিলেন হেফাজত নেতা শরিফউল্লাহর প্রশিক্ষক। হুজির সাবেক কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এখনো। হেফাজতে ইসলামের ভেতরে মানহাজি গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পেছনেও তার ভূমিকা রয়েছে। হেফাজতের সাবেক আমির প্রয়াত আহমদ শফীর মৃত্যুর পর মানহাজি গ্রুপের মাধ্যমে হুজির সাবেক সদস্যরা হেফাজতের মূল কমিটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীর হাজিরবাগ এলাকা থেকে শরিফ উল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে। মুফতি শরিফ উল্লাহ ২০১৩ সালের ৬ মে যাত্রাবাড়ী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামী।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মুফতি শরিফউল্লাহ হেফাজতের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ২০১৩ সালের ৫ মের তাণ্ডব ছাড়াও ২০২১ সালের ২৬ মার্চ হেফাজতের সহিংসতার সঙ্গে তার যোগসূত্র রয়েছে। তাকে ২০২১ সালের ১৪ এপ্রিল আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে ডিবি সূত্র জানায়।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশে আসা নিয়ে রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলাম। হেফাজতের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের রিসোর্টকাণ্ডের পর একে একে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। রাজধানী যাত্রাবাড়ী থানার বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলায় গ্রেপ্তার হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক মুফতি শরিফ উল্লাহকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

৬৩. জুবায়ের আহমেদ

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, ইসলামী ঐক্যজোট

জুবায়ের আহমেদ ১৯৬৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা থেকে জামাতে দাহুম (পঞ্চম শ্রেণি) থেকে পঞ্জুম (দশম শ্রেণি) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে লালবাগ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় পরিচালকদের বিভক্তির ফলে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি ভর্তি হন বড়কাটারা মাদ্রাসায়। কিন্তু সেখানে আর আনুষ্ঠানিক দরসে অংশ নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে লালবাগ জামিয়া কোরআনিয়ার একাংশ ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে মোহাম্মদী হাউজিং ঢাকার মোহাম্মদপুরে শায়খুল হাদিস আজিজুল হক প্রতিষ্ঠা করেন জামিয়া মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা। ফলে মুফতি মাওলানা জুবায়ের আহম্মদ বড়কাটারা আর না গিয়ে চলে যান জামিয়া মোহাম্মাদিয়ায়। এখানে ২ বছর মাদ্রাসা চলার পর শায়খুল হাদিস জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া নামে সাতমসজিদ সংলগ্নে মাদ্রাসা স্থানান্তর করেন। মাওলানা জুবায়ের আহম্মদও চলে আসেন জামিয়া রাহমানিয়ায়। অতপর এই জামিয়া রাহমানিয়া থেকেই ১৯৯১ সালে দাওরায়ে হাদিস শেষ করে 'মাওলানা' সনদ লাভ করেন।

মাওলানা জুবায়ের আহমদ হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষকতা হেফাজত নেতা মাওলানা জুবায়ের আহমদের প্রধান পেশা হলেও তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তার শ্বশুর মাওলানা ফজলুল হক আমিনী যেমন নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোট এর নামে বিভিন্ন ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ছিলেন, তেমনিভাবে তিনিও কয়েকটি ইসলামী মৌলবাদী দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন, সর্বশেষ ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে আছেন। জুবায়ের আহমেদ হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগরের নায়েবে আমির। হেফাজত নেতা জুবায়ের আহমদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ২০১৩ সালের ৫ মের মামলাগুলোর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমন উপলক্ষে নতুন করে তার বিরুদ্ধে নাশকতার মামলাও দায়ের হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া মাওলানা জুবায়ের আহমদ হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগরীর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান মুফতি আমিনীর জামাতা। মাওলানা জুবায়ের আহমদ মুফতি আমিনীর একান্ত খাদেম থাকাকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সফর করতেন। সফরকালীন বিভিন্ন উগ্রবাদীদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সাবেক আমির মুফতি আব্দুস সালাম ও হুজির ভারপ্রাপ্ত আমির মুফতি শফিকুর রহমান হচ্ছেন তার কাছের বন্ধু। এসব জঙ্গিদের সাথে মুফতি আমিনীর

পরিচয় এবং লালবাগ মাদ্রাসায় যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়েছিলেন মাওলানা জুবায়ের আহমদ।পরবর্তীকালে তার সাথে জঙ্গি নেতাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্কের কারণে লালবাগ জামিয়া কোরানিয়া মাদ্রাসা হয়ে উঠে জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি। বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে সর্বশেষ সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

সরকার বিরোধী বিভিন্ন সভাসমাবেশ করতে সবসময় দৌঁড়ঝাপ করতেন হেফাজতের এই নেতা। লালবাগ ও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে হেফাজতের পক্ষে যেসব সভাসমাবেশ এবং ওয়াজের আয়োজন করা হত সবখানেই তিনি নিজেই উপস্থিত থাকতেন। কওমি মাদ্রাসা কেন্দ্রিক তার একটি উগ্র বাহিনী রয়েছে। উক্ত বাহিনীর কাজ হচ্ছে ঢাকায় মিছিল মিটিংয়ের সময় ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতের ঢাকা অবরোধকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনায় মতিঝিল থানায় হওয়া মামলা এবং ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের বিরোধিতা করে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় একই থানার একাধিক মামলার আসামী তিনি।

৬৪. জালাল উদ্দিন আহমেদ

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
যুগ্ম মহাসচিব, খেলাফতে মজলিস

মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমেদ ১৯৭০ সালে ঢাকার লালবাগ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খেলাফতে মজলিশের যুগ্ম-মহাসচিব এবং সংগঠনটির ঢাকা মহানগরের সহ-সাধারণ সম্পাদক। হেফাজতের সহকারী মহাসচিব মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমদ হেফাজত ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুনায়েদ বাবুনগরীর বলয়ের লোক হিসেবে পরিচিত। হেফাজতের বিতর্কিত নেতা মামুনুল হকের খুবই কাছের বন্ধু হিসেবে তার রয়েছে আরেকটি পরিচয়। মামুনুল হকের সহকর্মী হিসেবে হেফাজতের তান্ডব ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে তিনি সবসময় সঙ্গ দিতেন। তিনি মামুনুল হকের বাবার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব হওয়ার বদৌলতে সাম্প্রদায়িক ইসলামী রাজনীতির আড়ালে তরুণ যুবকদেরকে উগ্রতার দিকে নিয়ে যেতেন। খেলাফত মজলিসের হয়ে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নামে মৌলাবাদী দাওয়াতী প্রচার করতেন। ঢাকায় হেফাজতের যেকোনো নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কওমি ছাত্র- শিক্ষকদেরকে ব্যবহার করে নিজেই বনে গেলেন নেতা। হেফাজতের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগৃহীত অর্থ নিজের ব্যক্তি স্বার্থে খরচ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুর জামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে মাঠে নামাতেন। যারা মাঠে ময়দানে নামতেন না তাদের উপর নির্যাতন ও ভয়ভীতির খড়্গ নেমে আসতো। হেফাজত নেতা মামুনুল হককে গ্রেপ্তারের পর জালাল উদ্দিন আহমদের ক্ষমতা ও শক্তি কমে যায়।

নাশকতার দুই মামলায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহকারী ২০২১ সালের ১৯ এপ্রিল মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমেদের ছয়দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। এদিন আসামী জালাল উদ্দিনকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। এরপর ২০১৩ সালে রাজধানীর শাপলা চত্বরে হেফাজতের তাণ্ডবের ঘটনায় মতিঝিল থানার মামলা ও চলতি বছরের মার্চে বায়তুল মোকারমে হেফাজতের তাণ্ডবের ঘটনায় দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোসহ ১০ দিন করে মোট ২০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। এরপর শুনানি শেষে আদালত পল্টন ও মতিঝিল থানার দুই মামলায় তিন দিন করে মোট ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

২০২১ সালের ২৬ মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৫৪ মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। এসব মামলায় এক লাখেরও বেশি আসামীর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১ হাজার ৩'শ জনকে। জামিনে আছেন পাঁচশ'র বেশি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলাম। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ায় সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। রাজধানীর বাইরে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে দেশের আরও কয়েকটি জেলায়। সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। হামলা-ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করা হয় সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায়। সারা দেশে নিহত হয় ১৯ জন। পুলিশসহ আহত হয় পাঁচশ'র বেশি মানুষ। ওই সময়ের ঘটনায় সারাদেশে মামলা হয় ১৫৪টি। সর্বোচ্চ ৫৬টি মামলা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ঢাকায় ১৪, চট্টগ্রামে ১১, নারায়ণগঞ্জে ৮, মুন্সিগঞ্জে হয় ১০টি মামলা। এসব মামলায় আসামী করা হয় এক লাখেরও বেশি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক হাজার ৩শ' আসামি। যাদের মধ্যে জামিনে আছেন পাঁচশ'র বেশি। উক্ত ঘটনার মামলায় ২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধ করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এ অবরোধ কর্মসূচির নামে লাঠিসোটা, ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাজধানীর মতিঝিল, পল্টন ও আরামবাগসহ আশপাশের এলাকায় যানবাহন ও সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে হেফাজতের কর্মীরা। এ ঘটনায় পল্টন থানায় মামলা করা হয়।

৬৫. আতাউল্লাহ আমীন

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম ও
যুগ্ম-মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

আতাউল্লাহ আমীন ১৯৮০ সালে শরিয়তপুর জেলার নড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। খেলাফত মজলিস ছাড়াও তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক।

হেফাজতের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন তরুণ বয়স থেকে একজন উগ্রবাদী বক্তা হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সবসময় জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে তরুণ যুবকদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতেন। খেলাফত মজলিসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র খেলাফতের মাধ্যমে মূলত তার রাজনৈতিক হাতেখড়ি। হেফাজত নেতা মামুনুল হকের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ার পর থেকে তার দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে অন্যান্য নেতারা। মামুনুল হকের আস্থাভাজন হিসেবে নিজের ক্ষমতার দাপট দেখাতেন দলের অভ্যন্তরে। খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিবৃতিগুলো তিনিই লিখে দিতেন। ২০১০ সালের ১৫ নবেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে– 'বর্তমান সরকার দেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের কোন উদ্যোগ নিলে দেশের জনগণ তা কোনভাবেই মেনে নিবে না। কারণ ৯০ ভাগ মুসলমানদের এ দেশে মুসলমানদের বিশ্বাস ও অনুভূতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আশাকরি সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবর্তে '৭২-এর সংবিধানে ফিরে গিয়ে এনালগ বাংলাদেশে ফিরে যাবে না।

'১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় উল্লেখ নেই। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ইন্দিরা-মুজিব স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ভারতীয় এই চার মূলনীতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এই চুক্তির পর ১৯৭২ সালের ৪ নবেম্বর গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানে ভারতীয় চার মূলনীতিকে বাংলাদেশে গ্রহণ করিয়ে নেয়া হয়। ৯০% মুসলমানের বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় বা ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে, তারা সরকারের কল্যাণ চায় না। ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করতে হলে পবিত্র কোরাণের রাজনীতি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ নিষিদ্ধ করতে হবে। এ অধিকার কোন সরকার ও পার্লামেন্ট এবং আদালতের নেই। সরকার আল্লাহকে ভয় করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

২০১৩ সালের ২৯ মার্চ রাজধানীর পল্টন থানার আতাউল্লাহ আমীনের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। মামলা নং-৬০। সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২০২১ সালের ২৮ এপ্রিল শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বাকী বিল্লাহ এ আদেশ দেন। পাঁচদিনের রিমান্ড শেষে আসামিকে আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ। এরপর মতিঝিল থানার করা মামলায় দশ এবং পল্টন থানায় সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন এ তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক মতিঝিল থানার মামলায় ৩ দিন এবং পল্টন থানায় তিনদিন করে মোট ৬ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

২০২১ সালের ২২ এপ্রিল আসামির ৫ দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দিয়েছিলেন ঢাকার সিএমএম আদালত। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধ করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। সেদিন রাজধানীর মতিঝিল, পল্টন ও আরামবাগসহ আশপাশের এলাকায় যানবাহন ও সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে তারা। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পল্টন ও মতিঝিল থানাসহ বিভিন্ন থানায় মামলা করা হয়।

৬৬. আব্দুর রহিম কাসেমী

সহকারী সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও
কেন্দ্রীয় নেতা, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

আব্দুর রহিম কাসেমী ১৯৬৯ সালে সদর থানার কাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মাওলানা আব্দুর রহিম কাসেমীকে মাদ্রাসা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরুষ সহকর্মীকে নারী সাজিয়ে 'মুরব্বিদের ব্ল্যাকমেইল' করার অভিযোগে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাঠানো মাদ্রাসার মোহতামিম (অধ্যক্ষ) মুফতি মাওলানা মুবারকুল্লাহ স্বাক্ষরিত মাদ্রাসার সভার কার্যবিবরণীতে মাওলানা আব্দুর রহিম কাসেমীকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানান। মাদ্রাসার কার্যবিবরণীতে ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর মাদ্রাসার সভায় ওই শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয় বলে জানানো হয়। মাদ্রাসার সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা গেছে, মাওলানা আব্দুর রহিম কাসেমীর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে নারী সাজিয়ে মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষকদেরকে ব্ল্যাকমেইলিং করাসহ বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি ওই শিক্ষক যেন মাদ্রাসার নাম ব্যবহার করতে না পারেন সেদিকে সকলকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম (অধ্যক্ষ) মুবারকুল্লাহ স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণীতে বলা হয়, মাওলানা আব্দুর রহিম ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভুল বুঝিয়ে বিক্ষোভ করান। জামিয়ার সিনিয়রদেরকে তিনি তোয়াক্কা করেন না। নিজের সহযোগী আব্দুল কুদ্দুসকে নারী সাজিয়ে মাদ্রাসার মুরুব্বিদের ব্ল্যাকমেইলিং করার চেষ্টা করেন।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ থেকে পদত্যাগ করেন হেফাজতের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়ার সাবেক মুহাদ্দিস মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমী।

২০২১ সালের ২২ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবে লিখিত বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'সম্মানিত ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী সাংবাদিক ভাইয়েরা, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম, আমি মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমী। ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশব্যাপী চলমান অস্থিতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমি দীর্ঘদিন যাবত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইউনুছিয়া ইসলামিয়ায় খেদমতে ছিলাম। কিছু মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাকে বিগত ০১/১২/২০২০ তারিখে জামিয়ার সকল দায় দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। আপনারা অবগত আছেন অত্র প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে আমাকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানানো হয় এবং জামিয়ার সকল কার্যক্রম ও দায়িত্বের সাথে আমি কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নই এ ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করা হয়। এমনকি জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

'পূর্ব হতে যদিও আমি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে ও রাজবাড়িয়া জেলা কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলাম কিন্তু ০১/১২/২০১০ তারিখের পর হতে আমাকে সকল দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর হতে এ পর্যন্ত জামিয়া বা হেফাজতে ইসলামের আভ্যন্তরীণ বা সার্বজনীন কোনো সভা, সমাবেশ, মিছিল বা মাহফিল কোথাও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, এমনকি জামিয়ার ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহের মাহফিলেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাই আমি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রদের তালিম তরবিয়্যত নিয়ে একান্তভাবে ব্যস্ত আছি। কোনোভাবেই জামিয়া বা হেফাজতে ইসলামের কোনোরকম কার্যক্রমের সাথে জড়িত নই।

'২৬ শে মার্চ ২০২১, স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে ভারতের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগমনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী হেফাজতে ইসলামের ডাকে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তা নজিরবিহীন, অমানবিক এবং দেশ ও জনগণের জান মালের যে ক্ষতি হয় তা কোনভাবেই ইসলামসম্মত হতে পারেনা। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এসমস্ত কার্যক্রম হতে নিষ্ক্রিয় থাকি এবং আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সমস্ত মাদ্রাসা সমূহের সকল শিক্ষক ও ছাত্রদের এসমস্ত দেশ ও ইসলাম বিরোধী কাজে যোগদান না করতে বাধ্য করি।

'এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬/০৩/২০১১ তারিখে রেল ষ্টেশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আক্রমণ ও ক্ষয়ক্ষতি করা এবং ২৭, ২৮ মার্চ ২০১১ মধ্যে হরতাল চলাকালে যে সমস্ত ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় তাতে আমি বা আমার মাদ্রাসা কোন ছাত্র কোনভাবেই অংশগ্রহণ করে নাই। এমতাবস্থায় কে বা কাহারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমার নাম যুক্ত করে অপপ্রচার চালাচ্ছে যা প্রতিহিংসামূলক মিথ্যাচার এবং সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই।'

মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমী ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল হেফাজত থেকে পদত্যাগ করে সাংবাদিকদের কাছে প্রেরিত লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী হেফাজতে ইসলামের ডাকে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা নজিরবিহীন ও অমানবিক। দেশ ও জনগণের জানমালের ক্ষতি কোনোভাবেই ইসলামসম্মত হতে পারে না। যাদের প্ররোচনায় দেশ ও জনগণের জানমালের এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান কাসেমী।'

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের বিরোধিতা করতে গিয়ে হেফাজতের নেতাকর্মীরা ২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগসহ ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এসব ঘটনায় বিভিন্ন থানায় ৫৬টি মামলা হয়। এসব মামলায় ৪শ' ১৪ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করে অজ্ঞাত আরো ৩৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪শ' ১৫ জন। এ ঘটনায় হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমীকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

২০২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়ার সাবেক সিনিয়র মুহাদ্দিস, বি-বাড়িয়ার মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ যোগদান করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (একাংশ) এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা আমেলার বৈঠকে তিনি এ যোগদান সম্পন্ন করেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অংশের সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সিলেটের শায়খ জিয়াউদ্দিন। অন্যভাগের সভাপতি সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস। বি-বাড়ীয়ার মুফতি আব্দুর রহিম কাসেমি মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস অংশের জমিয়তে যোগদান করেন।

২০২১ সালের ৪ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে হেফাজতের সহিংসতায় জড়িতদের বিচার দাবি করে পদত্যাগ করেছিলেন কাসেমী। তবে পুলিশ বলছে– হেফাজতের সহিংস ঘটনার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে চালানো হেফাজতের সহিংসতার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল।

৬৭. মুজিবুর রহমান হামিদী

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
নায়েবে আমির, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

মাওলানা মজিবুর রহমান হামিদী ১৯৫৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর বিজয়নগর উপজেলার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফেজ্জী হুজুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও দলের ঢাকা মহানগরীর আমির। তিনি বিগত ৩০ বছর তথাকথিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীরও সাবেক সহ-সভাপতি।

১৯৯৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে ১১টি ইসলামী ছাত্র ও যুব সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'খতমে নবুওয়াত যুব-ছাত্র সমন্বয় কমিটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী তথাকথিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা, তাহজিব-তামাদ্দুন সংরক্ষণ, গণমানুষের অধিকার আদায় এবং কথিত নাস্তিক-মুরতাদদের কর্মকান্ড বন্ধের নামে দীর্ঘদিন যাবত দেশে অরাজকতা ও উগ্রতা সৃষ্টি করেছেন।

ছাত্রজীবনে মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তোলাবায়ে কওমিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় উগ্রবাদী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পরে তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন।

একটানা ২০ বছর তিনি খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের শিষ্য হিসেবে থাকার পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও হাফেজ্জীর মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মারা যাবার পর দীর্ঘদিন রাজনীতি হারাম বলে ফতোয়াদানকারী মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর তওবার ডাক দিয়ে ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আলেমদের নিয়ে খেলাফত আন্দোলন নামে রাজনীতি শুরু করেন। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সকালে রাজধানীর লালবাগ কেল্লার মোড়স্থ খেলাফত মিলনায়তনে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ঢাকা মহানগর-এর মজলিসে আমেলার এক জরুরি মিটিংয়ে সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে মসজিদ নির্মাণ করুন, ভাস্কর্য-মূর্তি নির্মাণ ইসলামে হারাম। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীতে আগমন হয়েছিল মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) কাবাঘরের পাশে থাকা সব মূর্তি ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। ভাস্কর্য এবং মূর্তি এক ও অভিন্ন, এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ এটার পূজা করুক, আর না করুক ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম।

'বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য মূর্তি নয়, স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করুন। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মানুষ সেখানে ইবাদত বন্দেগী জিকির তেলাওয়াত দোয়া করবেন। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর ইবাদত করার কারণে বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে, ছাওয়াব পাবে। আর ভাস্কর্যের নামে মূর্তি হলে বঙ্গবন্ধুর কবরে আজাব হবে। বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত হিতাকাঙ্খীরা কখনো ভাস্কর্য-মূর্তিকে সমর্থন করতে পারে না। এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা কাফির-মুশরিকদের মূর্তি সংস্কৃতি বরদাশ্ত করবে না।

'হেফাজতের সহকারী মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির এবং ঢাকা মহানগর আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী বলেছেন, বিশ্বে খেলাফত ব্যবস্থা চালু না থাকায় পৃথিবীর সর্বত্র চলছে অরাজকতা, মারামারি-কাটাকাটি। অন্যদিকে সূদের রাজ্যে পুরো পৃথিবী সয়লাব। মানুষ দিশেহারা। বাঁচার জন্য কখনোবা গ্রহণ করছে সমাজতন্ত্র মতবাদ, কখনোবা গণতন্ত্র। কিন্তু কোনো তন্ত্রই

মানুষকে মুক্তি ও শান্তি দিতে পারেনি। একমাত্র খেলাফত প্রতিষ্ঠাই মানব জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে।'

২০২০ সালের ২৬ নবেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০২০ সালের ২৫ নবেম্বর এক বিবৃতিতে মাওলানা হামিদী কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরাণে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামান্নাবিয়্যীন (অর্থ সর্বশেষ নবী)। তার পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত মুহাম্মদ সা. কে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোরাণকে অস্বীকার করেছে। হযরত মুহাম্মাদ সা. কে সর্বশেষ নবী বিশ্বাস না করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। তাই বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের অমুসলিম বা কাফের হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন।

'ওআইসির ফিকাহ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। সৌদি আরব কাদিয়ানীদের জন্য পবিত্র হজ্জ নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশেও কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হবে। যাতে মুসলমান পরিচয় দিয়ে কাদিয়ানীরা জাতিকে বিভ্রান্ত করে ঈমান হরণ করতে না পারে। কাদিয়ানীরা পৃথক ধর্ম হিসেবে স্পষ্ট হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত কাদিয়ানীরাও এদেশে বসবাস এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবে। কোনো মুসলমান বাধা দিবে না।'

৬৮. হাফেজ মুহাম্মদ কাসেম

সাবেক উপদেষ্টা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা হাফেজ কাসেম চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধুরং গ্রামে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আল্লামা শাহ নূর আহমদ। তার মাতার নাম মরহুমা আয়েশা খাতুন। ফটিকছড়ির জামেয়া কোরআনিয়া তা'লিমুদ্দীন তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মজলিসে শুরার একজন কর্মতৎপর ও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন এবং প্রায়ই শুরার সভাগুলোতে তিনিই সভাপতিত্ব করতেন।

হাফেজ কাসেম জামেয়া কোরআনিয়া তা'লিমুদ্দীনে কায়েদায়ে বোগদাদী থেকে নিয়ে নাযেরা এবং হিফজ পর্যন্ত শেষ করেন। এখানে হিফজের সবক শেষ করার পর তার পিতার পরিচালনাধীন অন্য আরেকটি মাদ্রাসা– জামেয়া আরাবিয়া নাজিরহাটে চলে যান এবং সেখানে ১৯৬১ সালে ভর্তি হয়ে হিফজের দাওর করেন। বাংলা, ইংরেজী, গণিত এগুলো জনাব মরহুম মাষ্টার মীর আহমদ-এর কাছে পড়েন। উর্দু, ফার্সী, দ্বীনীয়াত থেকে নিয়ে জামাতে পাঞ্জুম তথা শরহে জামি কানযুদ্দাকায়েক পর্যন্ত নাজিরহাট মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আপন পিতা মরহুম মাওলানা নূর আহমদ-এর কাছে বিশেষভাবে পড়েন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

তিনি সেখানে শারহে বিকায়া থেকে দাওরায়ে হাদিস ও দাওরায়ে তাফসির পর্যন্ত পড়েন এবং ১৯৭১ সালে দাওয়ায়ে হাদিস ও ৭২ সালে দাওয়ারে তাফসির পড়ে মাওলানা সনদ লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মাওলানা কাসেমকে দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন।

দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে হাটহাজারী মাদ্রাসার যাবতীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি দারুল উলুমের একজন মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির এবং প্রভাবশালী সহযোগী মুহতামিম ছিলেন। ২০০৩-তে তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসরের কর্মক্ষেত্র দারুল উলুম হাটহাজারী থেকে পৃথক হয়ে নিজ পিতার প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আরাবিয়া নাছিরুল ইসলাম নাজিরহাটে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তে নির্বাহী পরিচালক ও শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৪ সাল থেকে জামেয়া কোরআনিয়া তা'লিমুদ্দীনের মুতাওয়াল্লীর পদে দায়িত্ব পালন করেন।

নব্বই দশকের শুরুতে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার দুর্গম পাহাড়ে স্থাপিত জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ধর্মপুর ও কাঞ্চননগর পাহাড়ি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং ফটিকছড়ির বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা কেন্দ্রিক পরিচালিত জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ মাওলানা কাসেমের অধীনে চলতো। হাটহাজারী উপজেলা থানার মীরেরখীলের পশ্চিমে হুজির পরিচালনাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও তার অধীনে চলতো। মাওলানা কাসেম হুজির উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য ও পরামর্শক ছিলেন। জিহাদের নামে কওমি তরুণ যুবকদেরকে জঙ্গিবাদের দিকে ধাবিত করতেন তিনি। তার জিহাদী বক্তব্য ও লেখালেখি জঙ্গি সংগঠন হুজির সদস্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতো। উত্তর চট্টগ্রামের জিহাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি সরাসরি উপস্থিত থেকেই জঙ্গিদের উৎসাহ প্রদান করতেন। জঙ্গিদের নিকট তিনি একজন আদর্শ নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির একজন কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে তার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি থানায় বিভিন্ন মিছিল মিটিং অনুষ্ঠিত হতো।

৬৯. বাহাউদ্দীন যাকারিয়া

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
যুগ্ম-মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানাধীন নিয়ামস্তির গ্রামে ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী আর দাদার নাম মুহাম্মদ মুদ্দাসসির। তার পিতা ছিলেন খতমে নবুওত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব, জামিয়া হুছাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মিরপুর ঢাকার মহাপরিচালক, মাসিক পয়গামে হক ও সাপ্তাহিক জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বাহাউদ্দীন যাকারিয়া গ্রামের মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর স্থানীয় রিয়াজুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। নাহু-সরফের শিক্ষা সমাপন করে সন্দ্বীপ হরিশপুর বশিরিয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলীম ও ফাজিল পাস করেন। পরবর্তীকালে হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে দুই বছর পড়াশোনা করে ঢাকার মিরপুর আরজাবাদ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

বাহাউদ্দীনের পিতা মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমী বাতিল তাগুতি শক্তির মোকাবেলার নামে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে তৎকালীন সময় সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতো। খ্রিষ্টান মিশনারীর উৎপাতের অজুহাতে তার পিতা কাসেমী তখন "দেশ ও ঈমান বাঁচাও" আন্দোলনের ডাক দেন। পাক আমলে রচিত পুস্তক "পাকিস্তানে মিশনারীর উৎপাত" প্রমাণ করে তিনি অনেক আগে থেকেই খ্রিষ্টানদের তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঠিক তেমনি শিয়া মতবাদ যখন মাথা চাড়া দেয় কাসেমী তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সামনে প্রকাশ করেন- "শিয়া কাফির" নামক বই। "ইসলাম বনাম কমিউনিজম" নামক একটি বইও তিনি রচনা করেন। আফগানিস্তানে যখন সোভিয়েত আক্রমণ চালিয়েছিল কাসেমী তখন জিহাদের আন্দোলনের ডাক দেন। মির্জা কাদিয়ানীর অনুসারীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ঘোরবিরোধী। খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদ গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে আন্দোলনের দামামা বাজিয়ে তুলেন। কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ষোঘণার দাবিতে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর, দাওয়াতি অভিযান, সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আহ্বান করে দেশের যুব সমাজকে উগ্রপথে ধাবিত করেছেন।

তার পিতা মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী মৃত্যুর পর মোস্তফা আজাদ ১৯৯৬ সাল থেকে জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদের মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যু হলে মুহতামিমের পদটি শূন্য হয়। প্রতিষ্ঠানের মজলিসে মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী এর বড় ছেলে মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়াকে মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এর আগে মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া প্রতিষ্ঠানটির নায়েবে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করছেন দীর্ঘদিন ।

হেফাজত নেতা মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর নিজ ফেসবুক পেজে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'মুসলমানদের ঈমানশূন্য করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি যে সব গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ভয়ঙ্কর হল কাদিয়ানী সম্প্রদায়। এরা মুসলমানদের ঈমানশূণ্য করার পাশাপাশি কুফরী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন করে আসছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান আর্মির কাদিয়ানী সদস্যরা আমাদের মা বোনদের ধর্ষণ, লুটতরাজ, বাড়ি-ঘর অগ্নিসংযোগসহ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেশি চালিয়েছিল। এ দেশিয় কাদিয়ানীরাও পাক আর্মিকে

নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় কাদিয়ানী সম্প্রদায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ছিল।

এ দেশের উলামায়ে কেরামসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান দীর্ঘ দিন ধরে কাদিয়ানীদের অমুসলিম দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো, কোনো সরকারই এ দাবির প্রতি সামান্যতম কর্ণপাত করেনি। যার ফলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে ধর্মীয় শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের অপচেষ্টা অনবরত করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে পঞ্চগড়ে এবারো কাদিয়ানীরা ইজতেমার আয়োজন করে। বাংলাদেশ সরকারের নিকট মুসলিম জনতার দাবি, পঞ্চগড়ে আহুত কাদিয়ানীদের ইজতিমা অবিলম্বে নিষিদ্ধ করুন। কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায় ঘোষণা করুন। কাদিয়ানীদের জন্য ইসলামী পরি ভাষার ব্যবহার আইনত দন্ডনীয় বলে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করুন। কাদিয়ানী সম্প্রদায় কর্তৃক ঈমান বিধ্বংসী সকল বই-পুস্তক বায়জাপ্ত করুন।'

মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া 'ধর্মীয় চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধ চেতনা কি একটি অপরটির বিপরীত'? শিরোনামে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন– 'সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, বোধের উপর আঘাত হানে এমন কোন অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতেই একটি চিহ্নিত মহল থেকে রবরব উঠে, এসব কর্মকাণ্ড নাকি মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী। প্রশ্ন হল মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বলতে কি বুঝায়? আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ কি ধর্মীয় চেতনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল, না জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের আজাদীর লড়াই ছিল? না অপশাসনের বিরুদ্ধে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল? না স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামীদের লড়াই ছিল? এ যুদ্ধ তো কোনো ধর্মীয় চেতনা, বোধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল না। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তো ইসলামের শ্বাশত আদর্শের বিরুদ্ধে ছিল না। বাংলাদেশ থেকে ইসলামী বোধ-বিশ্বাস তাড়িয়ে রামবাবুদের পৌরানিক ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল না। ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ধ্বংস করে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার জন্য ছিল না। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবও এমন বক্তব্য, বিবৃতি দিয়েছেনে বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।'

৭০. শাহ মমশাদ আহমদ

কেন্দ্রীয় নেতা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সদস্য সচিব, সাহাবা সৈনিক পরিষদ

মাওলানা শাহ মমশাদ আহমদ ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানাধীন (বর্তমান ওসমানীনগর) তাজপুর গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম। তার মাতার নাম আয়শা বেগম।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে তিনি স্থানীয় আওরঙ্গপুর মাদ্রাসায় ইবতেদায়ী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর সিলেটের জামেয়া মাদানিয়া ইসলামীয়া কাজির বাজার মাদ্রাসায় ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে তাকমীল ফিল হাদিসে উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির সাথে সাথে একজন আলেম হিসেবে জামেয়া মাদানীয়া কাজির বাজার মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে সাহাব সৈনিক পরিষদের ডাকে লেখক তাসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হাবিবুর রহমানের সাথে সিলেট জুড়ে তাণ্ডব চালায়।

তিনি কথিত নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনে ফুলতলির পীর, শায়েখে কৌড়িয়া ও প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় ইসলামী ঐক্য পরিষদের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কথিত ইসলামী রাজনীতির নামে খেলাফত প্রতিষ্ঠার যুবকদেরকে মগজ ধোলাই করে জঙ্গিবাদে দীক্ষা দেন। ছাত্র রাজনীতিতে একজন সংগঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

তার মৌলবাদী কর্মকাণ্ডে দক্ষতার কারণে তরুণ বয়সেই তিনি সাহাবা সৈনিক পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব নির্বাচিত হন। ৯০-এর দশকের শুরুতে লেখক তসলিমা নাসরিন বিরোধী জঙ্গিবাদী কর্মসূচি দিয়ে মাওলানা হাবীবুর রহমানের সঙ্গে হেফাজতের এই নেতা মাদ্রাসার ছাত্রদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেট রেজিস্ট্রারি মাঠে কয়েক হাজার উগ্র মৌলবাদী সমর্থক গোষ্ঠির সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে তিনি এই জায়গা থেকে সারাদেশে এ আন্দোলনকে প্রচার-প্রসার করতে ভূমিকা পালন করেন। লেখক তসলিমা নাসরিনকে গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সকল লেখা বাজেয়াপ্ত করা ও কথিত মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড আইন প্রণয়নের নামে ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি করেন। প্রকাশ্য জনসভায় তসলিমা নাসরিনকে হত্যার ঘোষণা দেন তিনি। তসলিমা নাসরিনকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে ১৯৯৩ সালের ৯ অক্টোবর সিলেট জেলায় হরতালের ডাক দিয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। একই বছর ১৯ অক্টোবর কওমিপন্থী আলেম ও জঙ্গি-মুজাহিদদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকার বৈঠকে তিনি যুব সমাজের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৯৩ সালের ২৮ নবেম্বর কয়েক হাজার জঙ্গি মুজাহিদ বাহিনী জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রা করলে সেখানেও সামনের কাতারে থেকে তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মিছিলের এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হন তিনি।

তথাকথিত ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড আইন পাশ করার জন্য তৎকালীন সরকারকে কড়াভাষায় আল্টিমেটাম দেন। ১৯৯৪ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে মৌলবাদীদের মহাসমাবেশে তসলিমা নাসরিনবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে তরুণ যুব মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন জঙ্গিদের আস্থাভাজনদের একজন। সিলেট ঐক্যপরিষদ, সাহাবা সৈনিক পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রাজনীতির সাথেও জড়িত রয়েছেন।

৭১. জুনায়েদ আল হাবিব

যুগ্ম-মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-মহাসচিব ছিলেন। এছাড়া তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি ও ঢাকার জামিয়া কাসেমিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ইত্তেহাদ মিডিয়ার সাথে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জুনাইদ আল হাবিব বলেন– 'সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত গ্রিকদেবীর মূর্তি সরানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা দেখছি এখনো সেটি বাস্তবায়ন হয়নি, আবার শোনা যাচ্ছে বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে, বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন?

'জুনায়েদ আল হাবীব : গ্রিকদেবীর মূর্তি বহাল রেখে বিকল্প যে কোনো চিন্তা করলে ধর্মপ্রাণ জনতা কোনভাবেই মেনে নিবে না। সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রিকদেবীর মূর্তি অবিলম্বে অপসারণ করতেই হবে। গণভবনে দেশের শীর্ষ আলেমদের সামনে ওয়াদা অনুযায়ী অবিলম্বে গ্রিকদেবীর মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা পূরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাই। আপনি জানেন গ্রিকদেবীর মূর্তি মুসলমানদের সংস্কৃতির অংশ নয়। এটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক। ৯২ ভাগ মুসলমানের এদেশে সাম্প্রদায়িক মূর্তি স্থাপন করে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের খুঁজে বের করার আহবান জানান।'

'একজন আলেমের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন' এমন বক্তব্য দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেন জুনায়েদ আল হাবিব। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের বিরোধিতায় মাঠে নামে হেফাজত। ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতার দিনে হেফাজতের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন মারা যান। এ নিয়ে হেফাজতের সাতজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ সারাদেশে প্রায় শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব বলেন– 'পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, বেফাক, হাইয়াতুল উলইয়া, হেফাজতে ইসলামে, খতমে নবুওয়াতের বিষয়ে আজকের মঞ্চে যেই সিদ্ধান্ত হবে, সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে। এর বাহিরে কেউ বাঁকা পথে হাটতে যাবেন, আপনাদেরও দালালগুষ্টির কাতারে নাম লেখানো হবে।'

হেফাজত নেতা জুনায়েদ আল হাবিবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে জঙ্গিবাদ এবং ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। ২০২১ সালের ১৫ এপ্রিল 'NH Media' নামক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট থেকে দুজন বিচারপতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। লতিফ সিদ্দিকী হজ আর তাবলীগের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। মনে রাখবা বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল

হকের নেতৃত্বে আমরা পাহারাদার। তসলিমা নাসরিন কোরাণ পরিবর্তনের কথা বলে, শাহবাগে নাস্তিক মুরতাদরা আল্লাহর ইজ্জতের উপরে আক্রমণ করেছে। আমরা পাহারাদার। শিখা চিরন্তন জ্বালাইছেন, আমরা পাহারাদার। আমরা শাইখুল হাদিসের নেতৃত্বে আবার শাপলা চত্বর রক্তে রঞ্জিত করে আমরা পাহারাদার হব।

তোমরা যারা স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি তারা স্বাধীনতার কথা বলো। তোমরা ৫২ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছো, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছো। মনে রাখবা আমাদের শাহ আব্দুল আজিজকে ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চার ভাগের একভাগও হবে না। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করতে তাদেরকে আনতে হবে। শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রথম সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। তাদের শাহদাতের ইতিহাস বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা হবে না। তোমরা ৯ মাস যুদ্ধ করেছো আর আমরা পৌনে দুইশ' বছর লড়াই করেছি স্বাধীনতার জন্য। এই দেশ মুসলমান এবং আলেম ওলামাদের রক্তে অর্জিত। আমরা দেশ রক্ষা করব ইসলামকে রক্ষা করার জন্য।

'ভাইয়েরা, আমরা দ্বীন ইসলামের পাহারাদার। আমরা পাহারাদারি করেই যাব। যদি আজকে আমাদের মাহফিলে বক্তৃতা দিতে বাধা দেয়া হয় মামলা করা হয় এতে আমাদের একটা পশমেরও কিছু হবে না। এসবে আমাদের কিছুই যায় আসে না। তোমাদের যদি আলেম ওলামাদের পছন্দ না হয়। তবে তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাও। এই দেশ তোমাদের জন্য না। এই দেশে থাকতে হলে আলেম ওলামাদের ফতোয়া মেনেই থাকতে হবে।'

হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব জুনায়েদ আল হাবিব বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।

৭২. মুফতি সাইফুল্লাহ সাদী

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

ইত্তেফাকুল ওলামা সংঠনের কার্যকরী কমিটির সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি ও হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী ১৯৫১ সালে ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার মাইজদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী সদর উপজেলার মাইজবাড়ি এলাকার মাওলানা আরিফ রব্বানীর ছেলে। তিনি ঢাকা মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক নুর মসজিদ ও টঙ্গী বাজার বায়তুল মামুর জামে মসজিদে বেশ কিছুদিন খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদীকে ২০২১ সালের ২ মে ময়মনসিংহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ময়মনসিংহ সদরের মাইজবাড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হরতালের নামে নাশকতা, নগরীর চরপাড়া মোড়ে পুলিশবক্স ভাঙচুর, বাসে আগুন দেওয়া ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বিলুপ্ত কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী গ্রেপ্তারের ৭৮ দিন পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। ২০২১ সালের ১৮ জুলাই বিকাল ২ টায় ময়মনসিংহ আদালতে খালেদ সাইফুল্লাহ সাদীর জামিন শুনানি শেষ হয়। এরপর সন্ধ্যা সাতটায় ময়মনসিংহ কারাগার থেকে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। এর আগে গত ২ মে ২০২১ সালেও ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদীকে।

মাওলানা সাদীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাবা মাওলানা আরিফ রব্বানীর কাছে। আর দারুস সুন্নাহ কাকনী মাদ্রাসায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে অল্প কিছুদিন নিমতলা গোয়ালগাতি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষে ভগ্নিপতি মাওলানা তাফাজ্জল হক হবিগঞ্জী এর উমেদনগর মাদ্রাসায় (হবিগঞ্জ) ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে জামিয়া ইউনুছিয়ায় ৪ বছর পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনি বি.বাড়িয়া জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্বও পালন করেন। জামিয়া ইউনুছিয়া থেকে মুরুব্বিদের পরামর্শে শায়খুল হাদিস কাজী মুতাসিম বিল্লাহ-এর তত্ত্বাবধানে আরজাবাদ মাদ্রাসায় চলে আসেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে কিছুদিন ময়মনসিংহের জামিয়া আশরাফিয়ায় ভর্তি হন। পরে নতুন বছরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে মেশকাত, জালালাইন ও দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন।

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ সাদী হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ১৪০০-১৪০১ হিজরি শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদিসের সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'মাওলানা' সনদ লাভ করেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সাওতুল হেরার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই মাদ্রাসার মুরুব্বি ও শায়খুল হাদিস। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কওমি আলেমদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম 'ইত্তেফাকুল উলামা মোমেনশাহী' প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা রয়েছে। ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক হিসেবে, পরবর্তীকালে সম্পাদক এবং বর্তমানে মজলিসে আমেলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সঙ্গে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৫-১৮ শেসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে নির্বাসিত লেখক তাসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন, ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের আন্দোলনসহ ধর্মবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সংগঠিত নানা আন্দোলনে মাওলানা সাদীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ময়মনসিংহ বিভাগে জঙ্গি কর্মকাণ্ড প্রসারতা লাভ করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে তিনি ওয়াজ মাহফিলের জন্য সফর করেন। প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে তিনি উগ্রবাদ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন।

আহবাব মিডিয়া নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে খালিদ সাইফুল্লাহ সাদী বলেন, 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় চোর ডাকাতে ভরে গেছে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা আজকাল চোর ও দুর্নীতিবাজদের দখলে চলে গেছে। আজকাল চোরকে চোর

আর ডাকাতকে ডাকাত বলা যায় না। বড় বড় চোর ডাকাত যারা তারা হচ্ছে ঋণ খেলাপী কিন্তু তাদেরকে কিছু বলা যাবেনা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করে এসব লুটেরাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। জিহাদই একমাত্র পথ এদেরকে হটানোর জন্য। আমাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকে। এই রাষ্ট্র আমাদের কোনো কল্যাণে আসবে না। ইসলামী হুকুমত ছাড়া শান্তি আসবে না। ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। এই হুকুত কায়েম করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিতে হবে। আপনারা কে কে রাজী আছেন হাত তুলেন? সবাই জীবন দিতে তৈরি থাকুন।'

৭৩. মুফতি আব্দুল কুদ্দুস

নায়েবে আমির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
কো-চেয়ারম্যান, আল হাইআতুল উলয়া

বেফাকুল মাদারিসিলি আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) -এর নায়েবে আমির, আল হাইআতুল উলয়ার কো-চেয়ারম্যান, জামিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদের মুহতামিম ও হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নানা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস এর বেফাক থেকে পদত্যাগের দাবি উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। তখন তিনি আল্লামা শাহ আহমদ শফীর দোহাই দিয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে পদ আকড়ে ধরে রাখার ব্যাপারে অনড় অবস্থানে ছিলেন।

২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের কেন্দ্রীয় অফিসে খাস কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহাসচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুস জানান তিনি পদত্যাগ করবেন। উপস্থিত সদস্যদের কেউ কেউ সেখানেই তাকে পদত্যাগ করতে বললে তিনি জানান আগামী ২০২০ সালের ৩ অক্টোবর বেফাকের আমেলা বৈঠকে তিনি পদত্যাগ করবেন। খাস কমিটির বৈঠকে তার দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত নিয়েও কথা হয়। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

২০১৯ সালের ফাঁস হওয়া বেফাকের বহিষ্কৃত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাওলানা আবু ইউসুফের সঙ্গে তার ফোনালাপে কিছু অনিয়মের বিষয় প্রকাশ পায়। তখন থেকেই তার পদত্যাগের দাবি জোরালো হতে থাকে। তবে হাটহাজারী হুজুরকে দিয়ে তিনি নিজের নামে 'সাফাইপত্র' আনান। পরবর্তী সময়ে হাটহাজারীতে বেফাকের খাস কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন অনিয়ম তদন্তে একটি কমিটিও হয়। যদিও সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও আলোর মুখ দেখেনি।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে বেফাকে তার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিতরা কিছুটা বেকায়দায় আছেন। তাদের ব্যাপারে নানা মহলের ক্ষোভ রয়েছে। এজন্য তারা এখন কিছুটা ব্যাকফুটে থাকতে চান। ২০১৬ সালের বেফাকের দীর্ঘ সময়ের তৎকালিন মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার জাহানাবাদীর ইন্তেকালের পর প্রথমে ভারপ্রাপ্ত পরে কাউন্সিলে মহাসচিব নির্বাচিত হন

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস। তার সময়ের মৌলিক অর্জন বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি। স্বীকৃতি ঘিরেই ঘটিত হয় কওমি শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ অথরিটি আল হাইয়াতুল উলইয়া। কওমি শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি ঘোষণা করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে আয়োজন করা হয় শুকরানা মাহফিলের। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এই সভায় বেফাক মহাসচিব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুসের বক্তৃতার কিছু অংশ নিয়ে প্রচণ্ড আপত্তি আছে আলেম ও শিক্ষার্থীদের। সেই বক্তৃতায় তিনি দায়িত্বশীল ও নেতাসুলভ আচরণ করতে পারেননি বলে মনে করেন অনেকে। তখনই সমালোচনার দানা বাঁধে তার বিরুদ্ধে।

হাটহাজারীর ন্যায় ফরিদাবাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র বিক্ষোভ হতে পারে এমন পরিস্থিতি উপলব্ধি করেই তিনি সব কিছু থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পানি ঘোলা করে অবশেষে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) সকল পদ ছাড়তে সম্মত হয়েছেন সংস্থাটির সাবেক মহাসচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুস।

১৯৫৬ সালে শামসুল হক ফরিদপুরী মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। নামকরণ করেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নামে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রথম মুরুব্বী ও মুতাওয়াল্লী ছিলেন নিজেই এবং মুহতামিম ছিলেন সহপাঠী মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করে এ মাদ্রাসায় এবং প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় একযুগ বেফাকের প্রধান কার্যালয়ও ছিল এ মাদ্রাসাতে। বাংলাদেশের ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকায় মাদ্রাসার অবস্থান। মাদ্রাসার সর্বমোট আয়তন ৪.৬ একর। চারপাশে রয়েছে চারটি ভবন, পশ্চিম পাশে বেলাল মসজিদ। আটটি বহুতল ছাত্রাবাস ও শিক্ষাভবন। দুটি উন্মুক্ত পাঠাগার ছাড়াও ফতোয়া বিভাগ ও মাসিক নেয়ামতের জন্য রয়েছে পৃথক পাঠাগার।

৭৫. আবদুল কাইয়ূম ফারুকী

সাধারণ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম নবীনগর কমিটি

মাওলানা আবদুল কাইয়ূম ফারুকী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের প্রতিবাদে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদে বিক্ষোভ ঘিরে হামলা-সংঘর্ষের ঘটনার জেরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওইদিন বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওইদিন চট্টগ্রামে ৪ জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজনের মৃত্যু হয় গুলিতে। এরপর সহিংসতা বাড়তে থাকে। তিন দিনের তাণ্ডবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোট প্রাণ গেছে ১২ জনের।

২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক সহিংস তাণ্ডব চলে। হেফাজতে ইসলামির কর্মসূচি চলাকালীন এই সহিংস কর্মকাণ্ড চলে। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ হেফাজতের নেতাকর্মীরাই মাঠে ছিলেন। তার পরের দুই দিন হেফাজতের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষ ঢুকে পড়ে। হেফাজতকে রসদ জোগাতে অর্থায়ন করে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও- এমন তথ্যও উঠে এসেছে ইতোমধ্যে। ২০১৬ সালে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো শহরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনো শহরের অন্যান্য স্থাপনার

সঙ্গে সুরসম্রাট আলাউদ্দিন সংগীতাঙ্গন আক্রান্ত হয়। বরাবরই হামলাকারীদের টার্গেট থাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম পীঠস্থান এই কেন্দ্র। এছাড়া ২০০০ সালে প্রশিকার মেলার বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে তাণ্ডবে প্রাণ হারান ছয়জন। এসব ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি।

২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকরা। শহরজুড়েই নেমে আসে বিভীষিকা। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় বঙ্গবন্ধু স্কয়ার, স্কয়ারসংলগ্ন আব্দুল কুদ্দুস মাখন মুক্তমঞ্চ, মঞ্চের পাশের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, পৌর মার্কেট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, প্রেসক্লাব, ডাকবাংলো, থানা, ফাঁড়ি, রেলস্টেশন, ভূমি অফিসসহ ৪০টির বেশি সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায়।

২০২১ সালের ১২ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৩ জুন দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে সদর মডেল থানায় ৪৯টি, আশুগঞ্জ থানায় ৪টি, সরাইল থানায় ২টি এবং আখাউড়া রেলওয়ে থানায় ১টি মামলা করা হয়। এসব মামলায় ৪১৪ জন এজাহারনামীয় আসামিসহ অজ্ঞাতনামা ৩০-৩৫ হাজার মানুষকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ এ পর্যন্ত মামলার পাঁচ শতাধিক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

৭৭. হাসান জামিল

সহকারী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
সেক্রেটারি, রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ

দেশের সকল ওয়ায়েজদের ঐক্যবদ্ধ করে এক প্লাটফর্মে আনার জন্যে ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল গঠন করা হয় 'ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন। দেশের পরিচিত অনেক ওয়াজ ব্যবসায়ী যুক্ত ছিলেন এ সংগঠনের সাথে। সংগঠনের পরিসর বাড়িয়ে কাজকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে নাম বদল করে রাখা হয় 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'। এছাড়াও সংগঠনটির পুরোনো কমিটি ভেঙে মাওলানা আব্দুল বাসেত খান সিরাজীকে সভাপতি ও মাওলানা হাসান জামিলকে সেক্রেটারি করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে দিনব্যাপী 'ওয়ায়েজ, খতীব ও দায়ী ওলামায়ে কেরামের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনটির উপদেষ্টা মাওলানা মামুনুল হক ও মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ূবীর যৌথ সঞ্চালনায় অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (দেওনা পীর) কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'-এর কমিটির সাথে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের তৎকালীন আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী একাত্মতা পোষণ করেছেন।

২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নিজেদের নেতাকর্মীদের নিয়ে সারাদেশে 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এমনকি সেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সংগঠনটি

সারাদেশে ওয়াজ মাহফিল নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও দাবি করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের যুগ্ম-কমিশনার মো. মাহবুব আলম তার কার্যালয়ে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় এ কথা জানান। যুগ্ম কমিশনার মো. মাহবুব আলম বলেন, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আয়োজকদের বাধ্য করা হচ্ছে হেফাজত নেতাদের বিভিন্ন ওয়াজে নেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে তারা উগ্রবাদী বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারছেন। এছাড়া মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের ব্যবহার করে হেফাজত নেতারা বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন। মাদ্রাসা দখলের মতো অপকর্ম ও অনেকের নারী বিলাসের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

'নিজেদের নেতাকর্মীদের নিয়ে সারাদেশে 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এমনকি সেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সংগঠনটি সারাদেশে ওয়াজ মাহফিল নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও দাবি করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মো. মাহবুব আলম তার কার্যালয়ে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় এ কথা জানান।

'যুগ্ম কমিশনার মো. মাহবুব আলম বলেন, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আয়োজকদের বাধ্য করা হচ্ছে হেফাজত নেতাদের বিভিন্ন ওয়াজে নেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে তারা উগ্রবাদী বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারছেন। এছাড়া মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের ব্যবহার করে হেফাজত নেতারা বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন। মাদ্রাসা দখলের মতো অপকর্ম ও অনেকের নারী বিলাসের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা। সম্প্রতি নাশকতার বিরুদ্ধে হওয়া ১২টি মামলা এবং ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের ঘটনায় হওয়া ৫৩টিসহ মোট ৬৫টি মামলার তদন্ত করছে ডিবি।'

মাওলানা হাসান জামিল এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর Khatib Media নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে হাসান জামিল বলেন, 'মুসলমানদের এই জমিনে মুসলমানরাই থাকবে। আল্লাহ নবীর দুশমনেরা থাকতে পারবে না। আহমদ শফীর এই জমিনে জয় শ্রীরাম শ্লোগান যে কুলাঙ্গার দেবে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। তোমার এই পরমাণু অস্ত্রের উপর কোনো মুসলমান ভরসা রাখে না। মুসলমানের ভরসা আল্লাহর উপর। হে যুবক, হুমকি ধামকি আসবে, তুমি ভেবো না আমাদের কাছে অস্ত্র নাই। যেই অস্ত্র আছে এইটা যার কাছে ছিল ইতিহাস বলে সে জয়ী হয়েছে। বুকে হিম্মত রাখো। শুনে রাখ কুলাঙ্গাররা, আমি এই স্বপ্ন দেখি যেদিন দিল্লীর লাল কেল্লায় আবারো কলেমার পতাকা পতপত করে উড়বে। দালালে ভরে গেছে দেশ; পালাতে পারবে না শেষমেশ। তোমার জমিনে জয় শ্রীরামের শ্লোগান চলে আর তুমি সাবিলুনা সাবিলুনা আল জিহাদের শ্লোগান দিতে ভয় পাও? তোমার মইরা যাওয়া দরকার। এই জমিনকে ভালবাসি; এই মানচিত্রকে ভালবাসি। ফসল ভাল হয় এই জন্য? আরে না, এই জমিনকে ভালবাসি কারণ এই জমিন আহমদ শফীর সেজদার সাক্ষী। এই জমিনকে ভালবাসি এই জন্য এই জমিন আল্লামা আমিনীর হুঙ্কারের সাক্ষী।'

৭৬. লোকমান হাকিম

যুগ্ম-মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও
কেন্দ্রীয় নেতা, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট

মাওলানা লোকমান হাকিম ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়ার মিয়াখান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা ইসমাইল। হেফাজতের এই নেতা চট্টগ্রাম শহরের হেফাজতের বিখ্যাত ঘাঁটি মিয়াখান নগরে অবস্থিত আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল-আরবিয়া মোজাহেরুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক।

ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমি বোর্ড নিয়ন্ত্রিত এই হেফাজত নেতার পরিচালনাধীন অন্য প্রতিষ্ঠান রাজাখালী নেয়ামত নূর জামে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। হেফাজতের এই ঘাঁটি ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা ইসমাঈল চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়া-মিয়াখান নগর এলাকায় আলহাজ্ব বেলাওয়ার খান জামে মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সহায়তায় মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯৫১ সনে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ও স্বনামধন্য দানবীর ও সমাজেসেবক মরহুম জনাব খান বাহাদুর আলহাজ্ব মিয়া খান সওদাগরের ওয়াকফকৃত বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে আরও জায়গা নিয়ে এই মাদ্রাসা সম্প্রসারিত হয়। দীর্ঘদিন থেকে এই মাদ্রাসা থেকে বিভিন্ন তাণ্ডব ও নাশকতামূলক কাজ পরিচালনা করা হয়। হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই মাদ্রাসা হয়ে উঠে একটি উস্কানি ও গুজবের কারখানা। এখান থেকে নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো চট্টগ্রামজুড়ে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যেতো।

২০১৩ সাল থেকে হেফাজতে ইসলাম চট্টগ্রাম নগরীর মধ্যে যেসব সমাবেশ ও অনুষ্ঠানের নামে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে সেগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাওলানা লোকমান হাকিম। হরতালের নামে পিকেটিং ও ভাঙচুর করার জন্য আগেভাগে লাঠিসোঁটা সংগ্রহ করে তার মাদ্রাসায় মজুদ করে রাখা হত। চট্টগ্রাম শহরের বাইরে বিভিন্ন উপজেলা থেকে হেফাজত নেতাকর্মী জড়ো হয়ে আশ্রয় নিতেন হেফাজত নেতার মোজাহেরুল উলুম মাদ্রাসায়। কোথায় কীভাবে এবং কখন জঙ্গি মিছিল ও হামলা হবে তার নির্দেশ দিতেন লোকমান হাকিম। প্রতিটি মিছিল মিটিংয়ে সবার সামনে থাকতেন তিনি। চট্টগ্রাম ভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে লিঁয়াজো করতেন তিনি। ২০১৩ সালের ৬ মে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে হেফাজতের একটি জনসমাবেশ থেকে সরকার পতনের হুংকার দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার যদি হেফাজতের তের দফা মেনে নিতে কালক্ষেপ করে তাহলে গদি থেকে টেনেহিঁচড়ে কীভাবে নামাতে হয় তা আমাদের ভালো করে জানা আছে।'

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ব্যাপক সহিংসতা, তাণ্ডব-নাশকতা চালায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মী-সমর্থকরা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় এবং হাটহাজারী থানায় হামলা, ভূমি কার্যালয়, ডাকবাংলোতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে তারা। এসব হামলা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে চট্টগ্রাম শহর কেন্দ্রিক কমিটির নেতা মাওলানা লোকমান হাকিম গ্রুপের প্ররোচনার অভিযোগ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. মাওলানা মুনির আহমদের রচিত 'জীবন ও কর্ম, আল্লামা আহমদ শফী', প্রকাশকালঃ ৯ মার্চ, ২০১৩
২. ইজাহারে হকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ, লেখক ঃ আল্লামা আহমদ শফী, প্রকাশক ঃ আনাস মাদানী, মাকতাবাতুল মাদানী হাটহাজারী চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল ঃ ২০০৪
৩. হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ পরিচিতি ও কার্যক্রম, প্রকাশনা ঃ জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, তালতলা, খিলগাঁও, প্রকাশক ঃ চেয়ারম্যান, মুফতি আব্দুল হাই, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৯
৪. সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০১৩
৫. জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০১৩
৬. ফাযায়েলে জিহাদ, লেখক ঃ মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ, প্রকাশনা ঃ মাকতাবাতুল কোরাণ, প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ১০
৭. কেন জিহাদ করবো, লেখক ঃ মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ, প্রকাশক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক খান, প্রকাশনা ঃ খান প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ঃ ১৮
৮. দৈনিক একুশে পত্রিকা ১৬ মে ২০২০
৯. মাসিক রহমানী পয়গাম, ১০ জানুয়ারি ২০২১
১০. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ২০২১
১১. দৈনিক সমকাল, ২৫ এপ্রিল ২০২১
১২. আমার জীবন কথা, লেখক ঃ সুলতান যওক নদভী, প্রকাশক ঃ এদারায়ে দারুল মা'আরিফ, প্রকাশকাল ঃ ২০১৪
১৩. রিহলাতী ইলা আরদিল জিহাদ, লেখক ঃ মাওলানা সুলতান যওক নদভী, আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি, লেখক উবায়াদুর রহমান খান নদভী, প্রকাশকাল ঃ ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ২৯
১৪. আমার জীবন কথা, লেখক ঃ সুলতান যওক নদভী, প্রকাশক ঃ এদারায়ে দারুল মা'আরিফ, প্রকাশকাল ঃ ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৬
১৫. 'হাতপাখা মিডিয়া', ইউটিউব চ্যানেল, প্রকাশকাল: ১৩ নভেম্বর ২০২০
১৬. ধর্মের নামে ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচন, লেখক ও প্রকাশক ঃ মিজান সিরাজ ফেনবী, প্রকাশকাল ঃ ২০১২, পৃষ্ঠা ঃ ৭০
১৭. উম্মাহ ২৪ ডটকম, ২০ অক্টোবর ২০২০
১৮. খতিবে আজম ও তার চিন্তাধারা, লেখক ঃ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রকাশনা ঃ জিয়া ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল ঃ ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৩১-১৩২
১৯. মাসিক রহমত, সম্পাদক ঃ মঞ্জুর আহমদ, প্রকাশক ঃ মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০১৩
২০. প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার, লেখক ঃ শাকের হোসাইন শিবলি, প্রকাশনা ঃ বাড কম্প্রিট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৩-১৮৩
২১. অনলাইন সাময়িকী জাগরণ জুন সংখ্যা ২০২১
২২. 'বুদ্ধিজীবী মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজী', লেখক ঃ আশরাফ আলী নিজামপুরী, প্রকাশক ঃ পরিবেশনায়-বোখারী একাডেমী, চট্টগ্রাম/জানুয়ারি ২০০৫
২৩. আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি, লেখক উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রকাশনা ঃ কিতাব কেন্দ্র, প্রকাশকাল ঃ ২০০৮, অধ্যায় ঃ জিহাদ পর্ব, জিহাদ বর্জনে অনিহা, পৃষ্ঠা ঃ ১৪২
২৪. মাসিক রহমত, সম্পাদক ঃ মঞ্জুর আহমদ, প্রকাশক ঃ মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১২
২৫. প্রাগুপ্ত
২৬. আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি, লেখক ঃ উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রকাশকাল ঃ ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ৭২ ও ৯৩
২৭. আওয়ার ইসলাম ২৪ ডট.কম, ২১ নবেম্বর ২০২০
২৮. দৈনিক পূর্বকোণ, ১১ এপ্রিল ২০২১
২৯. মাসিক রহমত ডিসেম্বর, ২০১০

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা : কওমি মাদ্রাসা

'কওম' আরবি শব্দ। এর অর্থ গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, সম্প্রদায়, জনগণ বা সর্বসাধারণ। 'কওমি' অর্থ জাতীয়। (বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ২০৫, 'কওম')।

'মাদ্রাসা' শব্দটিও আরবি। এর অর্থ হলো অধ্যয়নের স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ। বাংলা একাডেমির অভিধান মতে, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রকে মাদ্রাসা বলা হয়। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৯৭৫, 'মাদ্রাসা')। সুতরাং কওমি মাদ্রাসা মানে জনগণ বা সর্বসাধারণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেহেতু কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকারি অনুদানের পরিবর্তে জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়, তাই এই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কওমি মাদ্রাসা বলা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার অন্যতম সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, এমপিও ভুক্তি, অনুদান, বেতন-ভাতাসহ সনদের স্বীকৃতি হচ্ছে এ শিক্ষা ধারার বৈশিষ্ট্য। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে কওমি মাদ্রাসা। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নুরানি মক্তব, ফোরকানিয়া, কারিয়ানা, হাফেজি আর স্বতন্ত্র মাদ্রাসা।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, 'দেশে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে ৬,৮৬৯টি। দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৯,৩২২টি। আলিম মাদ্রাসা ২,৭৯৯টি। ফাযিল মাদ্রাসা ১,২৫৬টি। আর কামিল মাদ্রাসা ২০০টি। এগুলো এমপিওভুক্ত এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২০,৪৪৬টি। শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্য ২ লক্ষ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫২ লক্ষ।'

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর তথ্যমতে, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প'-এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৫০৫টি উপজেলা, থানা ও জোনে ৩২ হাজার প্রাক-প্রাথমিক, ৪১ হাজার কোরাণ শিক্ষা এবং ৭৬৮টি বয়স্ক কেন্দ্রেসহ মোট ৭৩ হাজার ৭৬৮টি শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এর বাইরে ইফার দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে ১ হাজার ১০ টি। এসব মাদ্রাসার শিক্ষক সংখ্যা দুই হাজার ২০ জন।'

স্বতন্ত্র মাদ্রাসা: বাংলাদেশে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত এবং স্বতন্ত্র শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসে পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে পাঁচটি শিক্ষা ধারা রয়েছে । সেগুলি হচ্ছে: (১) কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা ও ক্যাডেট মাদ্রাসা, (২) শর্ট কোর্স মাদ্রাসা, (৩) স্বতন্ত্র ও বিশেষ নেসাবের মাদ্রাসা, (৪) উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও বিশেষ কোর্সের (তাখাচ্ছুস) মাদ্রাসা, (৫) আহলে হাদিস মাদ্রাসা।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ধারাটি সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। যার কারণে বর্তমান শ্বেতপত্রে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

কওমি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। ফলে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা অথবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত, স্তর ভিত্তিক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ইত্যাদির কোন নিয়মনীতি এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না। কওমি মাদ্রাসা সব ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। এখানে সরকারি কোন অর্থ বরাদ্দের নিয়ম নেই। ব্যক্তি এবং ইসলামী এনজিও'র অনুদানে এসব মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে হেফাজতে ইসলাম।

১৮৬৬ সালের ৩০ মে তদানীন্তন অখণ্ড ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে হজরত কাসেম নানতুভি-এর নেতৃত্বে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপমহাদেশে এটিই সর্বপ্রথম কওমি মাদ্রাসা। এর ছয় মাস পর দারুল উলুমের আদর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাহারানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুজাহেরুল উলুম মাদ্রাসা'। তারপর দেওবন্দের কারিকুলামে বিভিন্ন দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০১ সালে বাংলাদেশের প্রথম কওমি মাদ্রাসা 'দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৭ সালে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩টি কওমি মাদ্রাসা ছিল। এর মধ্যে প্রায় ৫১টি ছিল দাওরায়ে হাদিস মাদ্রাসা।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছাড়াও কওমি কারিকুলামে মসজিদ, মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাকেন্দ্রিক আরো লাখো প্রতিষ্ঠানে কওমি ধারার শিক্ষা দেওয়া হয়।

এ দেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক স্তর শুরু হয় শিশুর চার পাঁচ বছর বয়স থেকে। সর্বোচ্চ স্তর হলো, দাওরায়ে-ই-হাদিস। এটিকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান বলে মনে করে।

কওমি মাদ্রাসার প্রকৃত সংখ্যা : বর্তমানে কওমি মাদ্রাসার প্রকৃত সংখ্যা কত এটা সারাদেশ দূরে থাক শুধু রাজধানী ঢাকাতে বা সমগ্র ঢাকা জেলায় কওমি, নূরানী ও মক্তবের সঠিক সংখ্যাই সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থার জানা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসার আলাদা বিভাগ রয়েছে। সেখানে আছেন একজন সচিবসহ অনেক কর্মকর্তা। তাদের কাছেও কওমি মাদ্রাসার সর্বশেষ ও সঠিক সংখ্যা নেই। দেশের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন অসংখ্য এনজিও আছে কিন্তু তাদের হাতে এতদসংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস'র) কাছেও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। সর্বশেষ ২০১৫ সালে ব্যানবেইসের সংগ্রহ করা তথ্যে প্রচুর ভুল ও অসংগতি রয়েছে। প্রতিবছর সব স্তরের ও ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করাই ব্যানবেইসের অন্যতম প্রধান কাজ। প্রতিবছর শিক্ষার উপরে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ হয় কিন্তু কওমি মাদ্রাসার কিছু থাকে না সেইসব প্রতিবেদনে।

বেফাকুল মাদারিসিলি আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক)-এর পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিস সহকারী মাওলানা আব্দুল ওয়াহাবের তথ্য উদ্ধৃত করে– হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সাবেক প্রচার সম্পাদক ও ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রাম জেলার সহকারী সম্পাদক শিক্ষা গবেষক মাওলানা আ.ন.ম আহম্মদ উল্লাহ গণকমিশনের অনুসন্ধানী টিমের প্রতিনিধিকে বলেন, দেশে ছোট বড় কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৪০ হাজার ও ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ।

অন্যদিকে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া-বেফাক) সাবেক মহাসচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুসের তথ্যমতে, বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৩ হাজার। সারাদেশে বেফাকে অধিভুক্ত আছে ১৩ হাজার ২০০টি প্রতিষ্ঠান। এর বাইরে অন্যান্য আঞ্চলিক ও বিভাগীয় পর্যায়ের বোর্ডের অধীনে আরও ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে।

২০২০ সালের ১৪ জানুয়ারি বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বেফাকের ২০১৯ সালের একটি হিসাবে দেখা গেছে, সারাদেশে মোট কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১১ হাজার ৭৫৮টি। বিভাগওয়ারি ঢাকায় ৪৫১৬টি, ময়মনসিংহে ২০৫৪, সিলেটে ১০৬১, চট্টগ্রামে ১৯১৭, খুলনায় ৯০৬, রাজশাহীতে ৪৭৮, বরিশালে ৪৮৬, রংপুরে ৩৪০টি।'

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা ও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের হিসাব মতে কওমি মাদ্রাসা সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি।

'বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)' তথ্য মতে 'সারা দেশে কওমি মাদ্রাসা সংখ্যা ১৪ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা, ৪ হাজার ৫৯৯টি। সবচেয়ে কম বরিশালে, ১ হাজার ৪০টি। বেশির ভাগ মাদ্রাসাই মফস্বল এলাকায় অবস্থিত।

'ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী, মোট কওমি মাদ্রাসার মধ্যে ১২ হাজার ৬৯৩টি পুরুষ ও ১ হাজার ২০৯টি মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৩৬ জন ছাত্র ও তিন লাখ ৩৯ হাজার ৬১৬ জন ছাত্রী পড়াশোনা করছে। সারা দেশে শিক্ষক আছেন ৭৩ হাজার ৭৩১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬৬ হাজার ৯০২ জন এবং মহিলা ৬ হাজার ৮২৯ জন।

'ব্যানবেইসের মতে, সংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকার পরেই চট্টগ্রামে মাদ্রাসা বেশি, ২ হাজার ৯৮৪টি। এর পরে রাজশাহীতে ১ হাজার ৭০২টি, সিলেটে ১ হাজার ২৪৬টি, রংপুরে ১ হাজার ১৭৬টি, খুলনায় ১ হাজার ১৫৫টি।

'২০০৮ সালে একবার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একটি গবেষণা সমীক্ষা চালায় ব্যানবেইস। ওই গবেষণায় কওমি শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার মতো সরকারের আওতায় আনতে ছোট-বড় ১৯টি কওমি শিক্ষা বোর্ড স্বাধীনভাবে পরিচালিত না হয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে একই ধারার মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছিল। এরপর ২০১০ সালে আরেকটি গবেষণায় একই ধরনের কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল।'[১]

২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর বরাত দিয়ে লিখেছে, 'দেশে ২৬ থেকে ২৮ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে।'[২]

অধ্যাপক আবুল বারকাতের মতে, 'দেশে মোট ৫৩ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক আবুল বারকাত দীর্ঘ দুই দশক গবেষণা করছেন। ২০০৮ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার

রাজনৈতিক অর্থনীতি ঃ উৎস, বিকাশ ও প্রভাব' গবেষণা গ্রন্থে তিনি কওমির মাদ্রাসার সংখ্যা সম্পর্কে লিখেছেন– বিভিন্ন উৎসের তথ্য অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬৬,৩০০ এবং সর্বনিম্ন ৫,২৩০।

'আমাদের গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের পূর্বে আমরা কওমি সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে বৈঠক করি। কওমি মাদ্রাসার নেতাদের কাছে এত বেশি সংখ্যক (২০০৮ সালে ৩৯,৬১২টি) মাদ্রাসার সংখ্যার কারণ জানতে চাইলে তারা একে অতিরঞ্জিত সংখ্যা বলে মানতে নারাজ। যখন আমরা বলি যে, প্রাথমিক পর্যায়ের (হাফেজিয়া, মক্তব, ফোরকানিয়া, নূরানি) ১২,৩৯৯ মাদ্রাসার সংখ্যা কওমি মাদ্রাসার সীমার বাইরে, তখন তারা এটা মেনে নেন।'[৩]

জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মুফতি উসামা ইসলামের তথ্য মোতাবেক, 'দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০ হাজার আর কওমি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ।

২০১৭ সালের ১৭ এপ্রিল দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনে কওমি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ২৫ হাজার এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি উল্লেখ করেছে।'[৪]

শিক্ষা গবেষক ও লেখক সিদ্দিকুর রহমান খান লিখিত 'কওমি মাদ্রাসা : একটি অসমাপ্ত প্রকাশনা' বইয়ে লিখেছেন, '২০১২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার নেতৃবৃন্দের বৈঠক শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কওমি মাদ্রাসার অবস্থানপত্র হস্তান্তর করা হয়। অবস্থানপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত জেলা ভিত্তিক তালিকায় ৬৩ জেলার মাদ্রাসার সংখ্যা দেখানো হয় ২৪ হাজার ৯৩১টি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে হস্তান্তরিত অবস্থানপত্রের ভূমিকায় মোট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ২৫ হাজার ৯০৬টি।'[৫]

কওমি বিষয়ে উইকিলিকসের তথ্য মতে, ২০০৯ সালের ৩ মার্চ ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি ছোট বড় কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩ থেকে ৫৭ হাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিগত সরকারের শেষ দিকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১২ সালে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য আইনের খসড়া অর্থ, জনপ্রশাসন ও প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদন শেষে মন্ত্রিসভার বৈঠকেও উত্থাপন করা হয়। কিন্তু খসড়াটি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ফেরত পাঠানো হয়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতির লক্ষ্যে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর মহাপরিচালক হেফাজতে ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা আমির আহমদ শফিকে উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ১৭ সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন কওমি মাদ্রাসার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট 'নেসাব ও নেযামে তালীম' প্রণয়ন সাব-কমিটি গঠন করে।

বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে প্রথমে ২৫ সদস্য এবং পরে ৬২ সদস্যের আলেমদের প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাৎ করে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতির দাবি জানায়। প্রতিনিধিদলে শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ও আল্লামা শাহ আহমদ শফীও ছিলেন।'[৬]

এই কারণে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী একটি কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেন। '২০১২ সালের ৮ এপ্রিল বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সাথে বৈঠক করে শাহ আহমদ শফী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ২১ জন আলেমের নাম প্রস্তাব করেন। ৯ এপ্রিল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সরকার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আলেমের বৈঠকের পর ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে আহমদ শফীর প্রস্তাবিত নামের মধ্য থেকে ১০ জন এবং এর বাইরে আরও ৫ জন রাখা হয়। তখনই আহমদ শফী এই কমিশনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।'[৭]

পরে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল আরও ২ জন সদস্য বৃদ্ধি করে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতিতে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিশনে শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদকে কো-চেয়ারম্যান এবং রুহুল আমিনকে সদস্য সচিব করা হয়। কমিশনকে ৬ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।

এই কমিশনকে যেসব বিষয় নিয়ে সুপারিশ দিতে বলা হয় তা হল– 'কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদানের বিষয় সহ কওমি মাদ্রাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন সহ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার স্তর-বিন্যাস, শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা-কারিকুলাম ও সংস্কার, সমন্বয়করণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক যাবতীয় বিষয়ের রূপরেখা, বিধি প্রণয়ন, পদ্ধতি, ধরন ও প্রক্রিয়া।'[৮]

২০২১ সালের ১৬ এপ্রিল কমিশনের জন্য আশকোনা হাজী ক্যাম্পে একটি অফিস প্রস্তুত করা হয়। প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান, সহায়ক জনবল ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ সহ সাচিবিক দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে। কমিশনের চেয়ারম্যান, কো-চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ও সদস্যদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। কমিশনকে প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপট করা ও উপ-কমিটি গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই কমিশন গঠনে আহমদ শফীর প্রস্তাবিত নাম বাদ দেওয়া, সুপারিশ মেনে না নেওয়া ও সরকারদলীয় লোক অন্তর্ভুক্ত করায় তিনি ১৬ এপ্রিল কমিশন প্রত্যাখ্যান করে একটি বিবৃতি দেন। 'আহমদ শফী কমিশন গঠন প্রক্রিয়াকে বিভ্রান্তিকর ও ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যায়িত করেন। ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ ও রুহুল আমিনকে সরকার সমর্থক বলে অভিযোগ করে তাদের স্থলে কো-চেয়ারম্যান-১ পদে আশরাফ আলী ও সদস্য সচিব পদে

আবদুল জাব্বার জাহানাবাদীর নাম দিয়ে কমিশন পুনর্গঠন করার দাবি জানান তিনি। তিনি একই সঙ্গে বেফাকের নামে কওমি সনদের স্বীকৃতি দেয়া, বেফাককে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করা, সরকারি অনুদান গ্রহণ না করা ও কওমি মাদ্রাসার পাঠপদ্ধতি পরিবর্তন না করা সহ আটটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। ৩ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলন করে তিনি নতুন কমিশন গঠনের দাবি করেন।'[৯]

বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ : 'আহমদ শফীর উত্থাপিত দাবি পূরণ না হওয়ায় দুটি বৈঠকের পর আহমদ শফী সহ বেফাক নেতারা কমিশন থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। তাকে ছাড়াই ফরীদ উদ্দীন মাসঊদের নেতৃত্বে ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশন একটি প্রতিবেদন জমা দেয়।'[১০]

প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪ সেপ্টেম্বর কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩' করার উদ্যোগ নেয় সরকার।

এজন্য চূড়ান্ত করা খসড়ায় ২০টি ধারা ও বেশ কিছু উপধারা রয়েছে। খসড়ায় বলা হয়– '১৬ সদস্য বিশিষ্ট কওমি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হবেন কওমি শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ একজন শীর্ষ পর্যায়ের আলেম। এতে কওমি শিক্ষার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় সাতজন আলেম, যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন সরকারের প্রতিনিধি, মহিলা কওমি মাদ্রাসার একজন প্রতিনিধি ও পাঁচটি কওমি মাদ্রাসার প্রধান বা সচিব পদাধিকারবলে কর্তৃপক্ষের সদস্য হবেন এবং একজন সচিব থাকবেন। খসড়াটি অর্থ, জনপ্রশাসন ও প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়।'[১১]

খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার পর কওমি ধারার শীর্ষস্থানীয় আলেমরা সরকারি এই উদ্যোগের বিরোধিতা শুরু করেন। এ উদ্যোগ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে তারা 'কওমি মাদ্রাসা সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করেন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ সহ কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। তারা অভিযোগ করেন– 'কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে দেশে কওমি শিক্ষার অস্তিত্ব ও স্বাধীন ধর্মীয় চর্চার অপমৃত্যু ঘটবে। ক্ষমতাসীন মহাজোটের অন্যতম শরিক সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদও 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। খসড়া আইনের সব দিক পর্যালোচনা করে শীর্ষস্থানীয় আলেমদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়। তাতে কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযোগ তুলে এই আইন প্রত্যাখ্যান করা হয়। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির ও বেফাকের চেয়ারম্যান শাহ আহমদ শফী বলেন, কওমি মাদ্রাসা আইন পাস হলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। তিনি আইনটি পাস করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।'[১২]

এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালের ২৮ অক্টোবর 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩'-এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিবেচিত বিষয়ের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

পরবর্তী উদ্যোগ: 'রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিরোধিতার মুখে স্থগিত হওয়ার পর ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবারও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের

সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে কমিশনের সদস্য ফরীদ উদ্দীন মাসউদকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা অনুবিভাগ কমিটিকে সাচিবিক দায়িত্ব দিয়ে নতুন কমিটিকে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে শিক্ষাসচিবের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।'[১৩] ৩০ সেপ্টেম্বর আহমদ শফীর নেতৃত্বে বেফাক এই কমিটি প্রত্যাখ্যান করে।

'২০১৬ সালের ৩ অক্টোবর আহমদ শফী ৫ শর্তে কওমি সনদের স্বীকৃতি নিতে আগ্রহী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন। যেখানে তিনি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষানীতি এবং ২০১২-এর আলোকে তৈরি 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩' বাতিল করার আহ্বান জানান।'[১৪]

'২০১৬ সালের ৪ অক্টোবর ফরীদ উদ্দীন মাসউদের নেতৃত্বে নবগঠিত কমিটি প্রথম সভা করে কওমি মাদ্রাসার ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র এবং স্বকীয়তা বজায় রেখে সুপারিশমালা প্রণয়নের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ৯ অক্টোবর আহমদ শফীর নেতৃত্বাধীন কমিশনকে সক্রিয় করে কমিশনের মেয়াদ ২০১৭ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।'[১৫]

স্বীকৃতি প্রদান: 'কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল 'কওমি মাদ্রাসার আলেমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'[১৬]

এরপর এই স্বীকৃতির আইনি বৈধতা দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। '২০১৮ সালের ১৩ আগস্ট এই আইনের খসড়ার অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। ১০ সেপ্টেম্বর প্রথমবার তা সংসদে তোলা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে 'আল হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'-এর অধীন 'কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিসের (তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান বিল, ২০১৮' পাশ হয়।'[১৭]

১৭ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা হলেন– ১. শাহ আহমদ শফি, চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক ঃ দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। ২. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, কো-চেয়ারম্যান, পরিচালক ঃ ইকরা বাংলাদেশ, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা। ৩. মুফতি রুহুল আমিন, সদস্য সচিব, মুহতামিম ঃ গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। ৪. মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, সদস্য, পরিচালক ঃ জামেয়া দারুল মা 'আরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম। ৫. মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী, সদস্য, মহাপরিচালক ঃ আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম। ৬. মাওলানা আশরাফ আলী, সদস্য, শাইখুল হাদীসঃ জামিয়া কাসেমুল উলুম, কুমিল্লা। ৭. মাওলানা আনোয়ার শাহ, সদস্য, মুহতামিম ঃ আল-জামিয়াতুর ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ। ৮. মাওলানা আব্দুল জব্বার, সদস্য, মহাসচিব ঃ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। ৯. মাওলানা আব্দুল বাসেত বরকতপুরি, সদস্য, শাইখুল হাদীস ঃ দক্ষিণকাছ হোসাইনিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, খাদিমনগর, সিলেট। ১০. মুফতী আব্দুল মালেক, সদস্য, শিক্ষা সচিব ঃ

মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা। ১১. মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, সদস্য, মুহতামিম, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর। ১২. মুফতি মাহফুজুল হক, সদস্য, মুহতামিম ঃ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর। ১৩. মুফতি এনামুল হক, সদস্য, সিনিয়র মুহাদ্দিস ঃ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা। ১৪. মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী, সদস্য, মুহতামিমঃ মাদ্রাসা নূরে মাদিনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ১৫. মাওলানা হিফজুর রহমান, সদস্য, মুহতামিম ঃ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী নূর রিয়েল এষ্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ১৬. মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী, সদস্য, নায়েবে মুহতামিম ঃ জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া। ১৭. হাফেজ মাওলানা মোশতাক আহমাদ, সদস্য, মুহতামিম ঃ জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম, খুলনা।

'নেসাব ও নেযামে তা'লীম' প্রণয়ন সাব-কমিটি– ১. মুফতি রুহুল আমিন, আহ্বায়ক; ২. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সদস্য; ৩ মাওলানা সুলতান যওক নদভী, সদস্য; ৪. মাওলানা আশরাফ আলী, সদস্য; ৫. মাওলানা আব্দুল বাসেত বরকতপুরী, সদস্য; ৬. মুফতি মাহফুজুল হক, সদস্য।

উক্ত কমিটি কওমি মাদ্রাসার নেসাব ও নেযামে তা'লীমের (পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী) খসড়া প্রস্তাবনা আকারে পেশ করে কিন্তু প্রণীত এ খসড়া প্রস্তাবনা আলোর মুখ দেখেনি।

ইতিহাসের আলোকে কওমি মাদ্রাসা

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম (মহাপরিচালক) ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব 'তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ' বইতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা নামে যে শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলিত আছে তা ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা সমূহ ইসলামিক শিক্ষা ও আকিদাগতভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে থাকে। ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক এক পল্লীতে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (১৮৩২)।'[১৮]

কওমি মাদ্রাসার ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ে মাওলানা যাকারিয়া 'তারিখে মাজাহারুল উলুম' বইতে লিখেছেন, 'একই বছর ৯ নভেম্বর একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সাহারানপুর জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় কওমি মাদ্রাসা জামিয়া-ই-মাজাহারুল উলুম। এটি প্রতিষ্ঠা করেন মাওলানা সা'দাত আলী। শাহ আব্দুর রহীম তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় নিজামিয়া পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেছিলেন। উক্ত পাঠ্যসূচির উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ ছিল– কাফিয়া, শরহে জামী, শরহে বেকায়া, হেদায়া, জা'মী, তাওজীহ ও তালবীহ, শরহে শামছিয়া, শরহে মাতালি, শরহে আকাইদে নফছী, মোখতাছারুল মা'আনী, মুতাওয়াল, কাযী বায়যাবী, তাফসীর মা'রেফ, আওয়ারেফুল মা'আরেফ, রাসায়েলে নকশবন্দিয়া, শরহে রুবাইআতে মোল্লাজামী, লাওআয়েহ, মোকাদ্দমায়ে লামআত, মোকাদ্দমায়ে নকাদুল আনছুছ, মাওয়ায়িজুল কানুন, শরহে হেদায়াতুল হিকমাহ, মেশকাত শরীফ, সহীহুল বোখারী, সামায়েলিত তিরমিযী।'[১৯]

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষক ড. আল্লামা মুসতাক আহমদ তার 'তাহরিখে দারুল উলুম' বইতে লিখেছেন, 'মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবীর অনুপ্রেরণায় দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লার ছাতা মসজিদের ইমাম হাজী আবিদ হোসাইন এলাকার বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু অনুদান গ্রহণ করেন। মাওলানা মোল্লা মাহমুদকে ১৫ টাকা বেতনে প্রথম শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্রাসা শুরু করা হয়। ১৮৬৬ সালের ৩০ মে আরবি মাদ্রাসার নামে দেওবন্দ মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়। এর প্রথম ছাত্র ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান যিনি পরবর্তীকালে শায়খুল হিন্দ উপাধি পান। শুরুতে ওই মাদ্রাসায় ২১ জন ছাত্র ভর্তি হলেও বছরের শেষে ৭৮ জনে উন্নীত হয়। মাত্র এক যুগ পরে ১৮৮৯ সালে দেওবন্দ আরবি মাদ্রাসা 'দারুল উলুম দেওবন্দ' মাদ্রাসায় রূপান্তরিত ও উন্নীত হয়।'[২০]

দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি বা নেসাবে তা'লীম

বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহকারী মহাসচিব, লেখক-গবেষক আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহাইয়া তার 'দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান' বইতে লিখেছেন, 'দারুল উলূম দেওবন্দ যেহেতু একটি সংস্কারমূলক সার্বজনীন শিক্ষাধারা প্রবর্তনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ কারণে তার পাঠ্যসূচিতে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল। তদানীন্তন ভারতে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার যে কয়টি খণ্ডধারা প্রচলিত ছিল, সেগুলোর সমন্বয় সাধন করতঃ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে একটি নতুন ধাঁচের শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছিল এ প্রতিষ্ঠানের জন্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাঃ)- এর প্রবর্তিত সিলেবাসকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থাৎ কোরাণ ও হাদীসের শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং মাওলানা নিযাম উদ্দীন সাহলাভী কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসকে এর সাথে সমন্বিত করে; মা'কুলাত (ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র) এবং প্রয়োজনীয় আধুনিক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন একটি যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, যা দ্বারা দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই সমানভাবে উপকৃত হতে পারে।

'বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ দেওবন্দ এবং সাহারানপুর থেকে ইলম হাসিল করে দেশে ফিরে এসে বেসরকারিভাবে এক একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রভাবে এরূপ অসংখ্য মাদ্রাসা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই গড়ে উঠেছিল। কিছু মাদ্রাসা আজও টিকে আছে। অনেক মাদ্রাসা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।'[২১]

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী

বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার প্রথম ইতিহাস লেখক মাওলানা শাহ আহমদ হাসান তার 'মাশায়েখ চাটগাম' বইতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার গোড়া পত্তন ১৯০১ সালে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম শহরের ১২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী উপজেলায় দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার প্রথম মুহতামিম ছিলেন মাওলানা হাবিবুল্লাহ এবং সহকারি ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ, মাওলানা ছুফী আজিজুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল হামিদ। তারা সবাই মিলে হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।'[২২]

মাসিক মঈনুল ইসলাম পত্রিকায় ড. আলী আহমদ লিখেছেন, '১৯০৩ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে এ মাদ্রাসার নিয়মতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ মাদ্রাসার নিয়মিত শিক্ষকতার সঙ্গে স্ব স্ব দাওয়াতি কাজও অব্যাহত রাখেন। তারা প্রতিদিন এক বা একাধিক মজলিসে ওয়াজ করতেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ মাদ্রাসার অভ্যন্তর এবং ছাত্রদের তালিম দানের কাজে বেশি সময় দিতেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ, মাওলানা আজিজুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল হামিদ স্থানীয় সমাজে বেশি সময় দিতেন। তারা দাওয়াতী কাজের সুবিধার্থে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে আঞ্জুমান বা সমিতি গড়ে তোলেন।

'বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সে সময়ের বহু সংখ্যক মাদ্রাসা আজও টিকে আছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে কৈয় গ্রামের হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালে। জিরির আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া ১৯১০ সালে। একই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফটিকছড়ির কাজিরহাট এমদাদুল ইসলাম মাদ্রাসা। নাজিরহাটে আল-জামেয়া নছিরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে। পটিয়ার আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া ১৯৩৭ সালে। চারিয়ার কাছে মূল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে।'[২৩]

মাসিক মঈনুল ইসলাম পত্রিকায় মাওলানা মহিউদ্দিন খান লিখেছেন, 'ইতিমধ্যেই দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার শতবর্ষ পালিত হয়েছে। এক'শ বছর পূর্বে যেখানে এক কাঠা জায়গা পাওয়া কঠিন ছিল এবং একটি কুঁড়েঘরে ৫০ জন ছাত্র নিয়ে পাঠদান শুরু হয়েছিল, সেখানে এখন ১৭৫৯ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এক সঙ্গে ১০ হাজার ছাত্রের থাকা এবং পড়া-লেখার বন্দোবস্ত হয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারি রয়েছেন ১২০ জনেরও বেশি। বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। শুধু দাওরায়ে হাদীসে ৩ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেছে। ৮ হাজার জন ছাত্র বিনামূল্যে বোডিং থেকে ভাতা লাভ করছে।'[২৪]

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশে একক কোনো কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড নেই। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি কোন সংস্থা, সংগঠন, বোর্ড বা কার্যক্রম নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে এই ধরণের কওমি মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় কমপক্ষে ১৯টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'শিক্ষা বোর্ডে'র মাধ্যমে। এর মধ্যে কোনো কোনো 'বোর্ড' জোটভুক্ত, আবার কোনটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়।

আবুল কালামের লেখা 'কওমি মাদ্রাসার ইতিহাস ও পরিচিতি' বইতে বলা হয়েছে, 'বর্তমানে সারাদেশে গড়ে ওঠা কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা বোর্ডগুলো হচ্ছে যথাক্রমে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, এদারায়ে তালিমিয়া দীনি বোর্ড, তালীমী বোর্ড মাদারিসে কওমিয়া আরাবিয়া বাংলাদেশ, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম সিলেট বিভাগ, তানযীমুল মাদারিসিল কওমিয়া, কুমিল্লা তানযীমুল মাদারিস, দক্ষিণ ঢাকা এদারা, কওমি মাদ্রাসা ঐক্য পরিষদ, তানযীমুল মাদারিস, বেফাকুল মাদারিস কওমিয়া, আজাদ দ্বীনী এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, দ্বীনী শিক্ষা বোর্ড, আঞ্জুমানে ইত্তিহাদিল মাদারিস, তানজিমুল মাদারিস, ইলহাকুল মাদারিস, ভোলা জেলা তানযীমুল মাদারিস, উলামা বাজার মাদ্রাসা ফেনী, রাজশাহী বিভাগ তানজিমুল মাদারিস।

সমগ্র দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে একটি অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলন, পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং মাদ্রাসার পরীক্ষাসমূহকে একটি জাতীয় শিক্ষার মানে উন্নীত করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই ১৯৭৮ সালে এ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের মাধ্যমেই দেশের সর্বাধিক কওমি মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।'[২৫]

লেখক মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফার লেখা 'জামেয়া একটি যুগান্তকারী ইতিহাস। আল-জামেয়া স্মরণিকা-১২'তে বলা হয়েছে, '১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ দেশে প্রায় ৪৪৩টি কওমি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তার মধ্যে ৫১টি দাওরায়ে হাদীস বা টাইটেল স্তর পর্যন্ত ছিল।

'১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার একটি মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ নামে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত।

'প্রথম পর্যায় ঃ আল মারাহিলাতুল ইবতিদায়ীয়্যাহ বা প্রাথমিক স্তর। ৫ম শ্রেণির মানে এখানে আরবি, ইসলামিয়াত বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ পাঠ ইত্যাদি পড়ানো হয়।

'দ্বিতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে ৫টি স্তরে বিভক্ত– ১. আল মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতা (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর), এর মেয়াদ ৩ বছর অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। ২. মারহালা সানুবিয়া আম্মাহ ঃ (মাধ্যমিক স্তর), এর মেয়াদ ২ বছর। অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণি। ৩. মারহালা সানুবিয়া উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) এর মেয়াদ ২ বছর। ৪. মারহালাতুল ফাযিলাত (ডিগ্রী স্তর) এর মেয়াদ ২ বছর। ৫. মারহালাতুল তাকমীল (মাস্টার ডিগ্রী) এর দুই মেয়াদ বছর।

'তৃতীয় পর্যায় ঃ গবেষণামূলক শিক্ষা-হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবি-সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ইলমুল কালাম, ইসলামী দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের পরিচালনার ১৩৯টি মজলিশ বা কমিটি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ১. মজলিশ উমুমী- বেফাকভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের মুহতামিমরা পদাধিকার বলে এর সদস্য। ২. মজলিশ শু'রা- মজলিশে উমুমীর সদস্যরা কর্তৃক নির্বাচিত ১০০ জন এবং সভাপতি

কর্তৃক মনোনীত ১১জন সহ মোট ১১১ জন সদস্য নিয়ে এ মজলিশ গঠিত হয়। ৩. মজলিশে আ'মেলা- একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট এ মজলিশ।

'প্রতি তিন বছর পর পর শুরা কমিটি ও আমেলা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের কতগুলো বিভাগীয় কমিটি রয়েছে– ১. মজলিশে ইলমী (শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কমিটি)। ২. শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি। ৩. অর্থনৈতিক কমিটি। ৪. ইকুইভ্যালেন্ট কমিটি। ৫. মারকাযী দারুল ইফতা কমিটি। ৬. পাবলিকেশন্স কমিটি। বিভাগীয় কমিটির অধীনে অনেকগুলো সাব কমিটিও রয়েছে।

'১৯৯৭ সালের হিসেব অনুযায়ী ১১৪৬টি মাদ্রাসা বেফাকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০টি প্রাথমিক মানের, ৫০৭টি মাধ্যমিক উচ্চস্তর মানের, ৯৭টি মাধ্যমিক স্তর মানের ও ৯৭টি হিফজ এবং ৮টি বালিকা মাদ্রাসাও রয়েছে।'[২৬]

কওমি মাদ্রাসার রুটিন বোর্ড-এ তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি–

৭টি স্তরের বালক, পুরুষের এবং ৪টি স্তরের বালিকা, মহিলাদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বোর্ড এদের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে।

সনদ বিতরণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ প্রতিটি স্তরে উত্তীর্ণদের সনদ দেওয়া হয়। এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতে চারটি স্তরে বৃত্তি ও ৩টি স্তরে পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রকাশনা ঃ বোর্ড বেফাক পাবলিকেশন্স নামে একটি প্রকাশনা বিভাগ চালু করেছে। মাসিক আল বেফাক নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেফাকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এর আওতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী ও শর্তাবলী—

১. অন্তর্ভুক্তির আবেদনের তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাসার বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে।
২. মাদ্রাসার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের সহিত এবং বেফাক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কার্যাবলীর সহিত একমত পোষণ করতে হবে।
৩. মাদ্রাসা পরিচালনার নিমিত্তে কমিটি থাকতে হবে। নিম্নস্তরের মাদ্রাসার জন্য একটি (নির্বাহী কমিটি) থাকতে হবে। আর উচ্চস্তরের মাদ্রাসার জন্য দু'টি (নির্বাহী ও শুরা) থাকতে হবে।
৪. বেফাক এর অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাহী শুরার সিদ্ধান্ত থাকতে হবে।
৫. বেফাক এর নেছাব, তরীকায়ে তা'লীম, পরীক্ষা পদ্ধতি, তারবিয়াত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং বেফাক এর পাঠ্য বই কিতাব পাঠ্য করতে হবে।
৬. দরখাস্ত দিয়ে ইলহাক বা ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কাগজপত্র বাবদ পঞ্চাশ টাকা ফি জমা দিতে হবে। অফিস থেকে দু'ধরনের কাগজপত্র প্রদান করা হয়। যথা–

এক ঃ যে সমুদয় কাগজপত্র মাদ্রাসার অবগতির জন্য দেয়া হবে এবং মাদ্রাসার দফতরে একটি স্বতন্ত্র ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে। এগুলো হচ্ছে– '১. অন্তর্ভুক্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী। ২. ইলহাকী ও অন্যান্য চাঁদার বিবরণ। ৩. জরুরি ইশতিহার (প্রতি শিক্ষা বছরের জন্য আলাদা)। ৪. কেন্দ্রীয় পরীক্ষার নেছাব (প্রতি বছরের জন্য পৃথক) ৫. দস্তরুল

মাদারিস। ৬. বেফাক এর গঠনতন্ত্র। ৭. বেফাক এর পরিচিতি। ৮. নিসাব নামাসমূহ। ৯. মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ১০. বিবিধ কাগজপত্র/সার্কুলার ও পত্র।'[২৭]

পাঠ্য তালিকা, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড, হবিগঞ্জ এর তথ্য মতে– 'দুই ঃ যা পূরণ করে জমা দিতে হবে– ১. ইলহাকী ফরম। ২. তথ্য ফরম। ৩. শিক্ষকদের বিবরণী ফরম। ৪. মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি বিবরণী ফরম। ৫. কুতুবখানার বিবরণী ফরম। ৬. মাদ্রাসার ভূসম্পত্তির বিবরণী ফরম (মূল ভূমির পরিমাণ, অন্যান্য ভূমির পরিমাণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিবরণী)। ৭. অঙ্গীকারপত্র। ৮. প্রদানযোগ্য ফরমসমূহ পূরণ করে জমা দিতে হবে। ৯. এ ফরম সমূহের সঙ্গে আরো যা যা একত্রে জমা দিতে হবে। ক) ধার্যকৃত চাঁদা। চলতি শিক্ষা বছরের বার্ষিক চাঁদা। খ) বেফাক এর অন্তর্ভুক্ত হবার ব্যাপারে মাদ্রাসা কমিটির রেজুলেশনপত্র সভাপতি ও মুহতামিম এর দস্তখত ও সীলসহ। গ) সরকার অনুমোদিত অডিট কোম্পানি দ্বারা মাদ্রাসার হিসাব অডিট আওতায় বর্ণিত আট প্রকার কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে। কমিটির রেজুলেশন ও হিসাব অডিট রিপোর্টসহ ১০ প্রকার কাগজপত্র বোর্ডের দপ্তরে মাদ্রাসা কর্তৃক জমা দিতে হবে।

১. বেফাক এর অফিসে এর সমুদয় কাগজপত্র জমা হবার পর অনুর্ধ্ব এক মাসের মধ্যে মাদ্রাসার পরিদর্শন করা হলে পরিদর্শনের রিপোর্টের ভিত্তিতে মাদ্রাসা ইলহাক বা ভর্তি করা হবে। পরিদর্শন ব্যয় মাদ্রাসাকে বহন করতে হবে।
২. দস্তুরুল মাদারিস- এর বিধান মতে মাদ্রাসা কমিটি কর্তৃক তা গৃহীত হয়ে বেফাক এর অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হবে (অনুর্ধ্ব ৬ মাসের মধ্যে)।
৩. যে সব মাদ্রাসা বেফাক এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে– ক) আদর্শ ফুরকানিয়া মাদ্রাসা। খ) প্রাইমারি মাদ্রাসা। গ) তাহফিজুল কোরআন (হাফেজিয়া) মাদ্রাসা। ঘ) দরসে নেজামী মাদ্রাসা (যে কোন স্তরের)। ঙ) ইলমুত তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত এর মাদ্রাসা। চ) বালিকা ও মহিলা মাদ্রাসা। ছ) শর্ট কোর্সের মাদ্রাসা। জ) ইসলামী কিন্ডার গার্টেন স্কুল।
৪. বেফাক এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একবার মাদ্রাসা পরিদর্শন করা হবে। প্রতি বছর একবার সরকার অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টে কোম্পানী দ্বারা মাদ্রাসার যাবতীয় সম্পত্তি ও হিসাব অডিট করিয়ে নিতে হবে এবং তার রিপোর্ট বেফাককে প্রদান করতে হবে।
৫. উপরোক্ত ১২ দফা নিয়মাবলী এবং নিম্নোক্ত ১৫ দফা পূরণ হলে মাদ্রাসা পরিদর্শন করে মঞ্জুরীপত্র দেওয়া হবে।'[২৮]

মঞ্জুরী দানের শর্তাবলী ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হাফেজ্জী কাফেলা ডায়রীতে উল্লেখ করা হয়েছে– '১. দূরত্ব ঃ এক মাদ্রাসার কাছে অন্য মাদ্রাসার মাঝে এতটুকু দূরত্ব থাকতে হবে, যাতে একটি মাদ্রাসার কারণে অন্য মাদ্রাসার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় বা সুনাম নষ্ট না হয়।

২. মাদ্রাসার ভূমির পরিমাণ ঃ প্রতিটি মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনমত নিজস্ব জায়গা থাকতে হবে। অর্থাৎ মাদ্রাসার অফিস, কুতুবখানা ও দারুল মুতালায়া, দরগাহ, আবাসিক ব্যবস্থাপনা, পাকা ঘর, খাওয়ার ব্যবস্থাপনা, ওযু, গোছল, ইস্তিঞ্জা ও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থাপনা , শিশুদের খেলাধুলার মাঠ ও গুদামঘর ইত্যাদি প্রয়োজনমত জায়গা থাকতে হবে।

৩. ভৌত কাঠামো ঃ ২নং ক্রমিকের বর্ণিত বিষয়গুলোর নিমিত্ত যেমন জায়গার দরকার, তেমনিভাবে গৃহেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ প্রতিটি শ্রেণিতে নিম্নরূপ ছাত্র-ছাত্রী থাকা আবশ্যকীয় ঃ

শ্রেণি	গ্রামে	শহরে
১ম শ্রেণি	৩০ জন	৪০ জন
২য় শ্রেণি	২৫ জন	৩৫ জন
৩য় শ্রেণি	২০ জন	৩০ জন
৪র্থ শ্রেণি	১৫ জন	২৫ জন
৫ম শ্রেণি	১০ জন	২০ জন
৬ষ্ঠ শ্রেণি	২৫ জন	৩০ জন
৭ম শ্রেণি	২০ জন	২৫ জন
৮ম শ্রেণি	১৫ জন	২০ জন
৯ম শ্রেণি	১০ জন	১৫ জন
১০ম শ্রেণি	১০ জন	১৫ জন
১১শ শ্রেণি	১০ জন	১৫ জন
১২শ শ্রেণি	১০ জন	১৫ জন
১৩শ শ্রেণি	১০ জন	২০ জন
১৪শ শ্রেণি	১০ জন	২০ জন
১৫শ শ্রেণি	১৫ জন	৩০ জন
১৬শ শ্রেণি	১৫ জন	৩০ জন

৫. শিক্ষক কর্মচারী সংখ্যা ঃ পনের জন হিফজের ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকতে হবে। ক) ইলমুত তাজবীদ ও কিরাতের প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকতে হবে। খ) অনাবাসিক প্রাইমারীর (৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) ক্ষেত্রে শিক্ষক ৬ জন ও কর্মচারী ১ জন। আর আবাসিক প্রাইমারীর জন্য ৮ জন শিক্ষক থাকতে হবে। গ) অনাবাসিক মুতাওয়াসসিতার জন্য ১১ জন ও আবাসিকের জন্য ১৪ জন শিক্ষক থাকতে হবে। ঘ) সানুবিয়া আম্মাহ অনাবাসিকের জন্য ১৪ জন ও আবাসিকের জন্য ১৭ জন শিক্ষক থাকতে হবে। ঙ) সানুবিয়া উলইয়া অনাবাসিকের জন্য ১৫ জন ও আবাসিকের জন্য ১৯ জন শিক্ষক থাকতে হবে। চ) ফযীলত স্তরের অনাবাসিকের জন্য

১৯ জন ও আবাসিকের জন্য ২৩ জন শিক্ষক থাকতে হবে। ছ) তাকমীল স্তরের অনাবাসিক এর জন্য ২২ জন ও আবাসিকের জন্য ২৭ জন শিক্ষক প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী থাকতে হবে।

৬. আসবাবপত্র ঃ মাদ্রাসার অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, আলমারী ও র‍্যাক, দরসগাহের জন্য তেপায়া, ব্লাকবোর্ড, আবাসিকের জন্য চৌকি, কিতাব রাখার জন্য র‍্যাক, বিছানাপত্র রাখার র‍্যাক ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘণ্টা বাজাবার জন্য ১টা বেল থাকতে হবে।

৭. গ্রন্থাগার ঃ প্রতিটি মাদ্রাসায় দরসের জন্য, মুতাল'আর জন্য, গবেষণার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত বই কিতাব, পত্র-পত্রিকা, সম্বলিত গ্রন্থাগার থাকতে হবে। এ কাজে সার্বক্ষণিক একজন নাজেমে কুতুবখানা থাকতে হবে। বই কিতাব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারী , র‍্যাক ও খাতাপত্র থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় রেজিস্টার থাকতে হবে।

৮. স্বাস্থ্যচর্চা ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য চর্চার জন্য বৈধ খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. স্যানিটারি ব্যবস্থাপনা ঃ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-স্টাফ ও মেহমানদের জন্য পর্যাপ্ত সেনিটারী ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতি কুড়ি জনের জন্য একটি করে সেনিটারী টয়লেট থাকতে হবে। এছাড়া ওযু, গোসল, কাপড়-চোপড় ধৌত করার ও পানীয় পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. নামাজের ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতিটি মাদ্রাসায় নিজস্ব মসজিদ থাকতে হবে। মাদ্রাসার অধীনে এ মসজিদ পরিচালিত হবে। নামাজের সময় বাইরের লোকদের নামাজ আদায়ের সুযোগ উন্মুক্ত থাকতে হবে।

১১. আবাসিক ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতিটি মাদ্রাসায় আবাসিক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। ছাত্রদের থাকার ও খাওয়ার সুব্যবস্থা, ওজু, গোসল, কাপড় ধোওয়া, পানীয় পানি ও ঢিলা-কুলুপ ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব থাকতে হবে। নিকটবর্তী এলাকার ছাত্রদের জন্য খাওয়ার সময় ব্যতীত সারাদিন মাদ্রাসায় থাকার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। আবাসিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদ্রাসার উচ্চস্তরের একজন শিক্ষককে দায়িত্বশীল বানাতে হবে। তিনি সার্বক্ষণিক হবেন। রাত্রি বেলায় মাদ্রাসায় অবস্থান করবেন। এ ছাড়া মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম, নাজেমে তা'লীম ও তারবিয়াতগণকেও সার্বক্ষণিক হতে হবে। ছাত্রদের দেখাশোনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের জন্য মাদ্রাসায় আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাস, তরীকায়ে, তা'লীম ও তারবিয়াত, তাযকিয়াহ (চরিত্র গঠন ও লালন), পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির অনুসরণ করতে হবে। নির্ধারিত বই কিতাব পাঠ্য করতে হবে। তাকরার, মুনাযারা ও সাপ্তাহিক সভার কার্যক্রম দিতে হবে।

১৩. বার্ষিক নবায়ন ঃ প্রতি বছরের শুরুতে নবায়ন ফিস (বার্ষিক ফি) দিয়ে মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে।

১৪. মারহালা পরিবর্তন বা উচ্চতর স্তরে উন্নীতকরণ ঃ মারহালা পরিবর্তন করতে হলে বছরের শুরুতে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে অফিসে জমা দিতে হবে। উপরের দিকে উন্নত করতে হলে নির্ধারিত ফিস প্রদান করে উন্নত করতে হবে। পরিবর্তন সংক্রান্ত মাদ্রাসা কমিটির রেজুলেশন থাকতে হবে এবং ফরমের সঙ্গে তা জুড়ে দিতে হবে।

১৫. মাদ্রাসার বার্ষিক রিপোর্ট ঃ প্রতি বছর মাদ্রাসার বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রচার করতে হবে। রিপোর্টে থাকবে– ১. মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ ও চিন্তাধারা এবং মাদ্রাসা নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ২. শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের খিদমাত সমূহ। ৩. স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট। ৪. ভবিষ্যত পরিকল্পনা।'[২৯]

কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস

ইয়াজ দাহুম থেকে (পঞ্চম শ্রেণি) থেকে দাওরায়ে হাদীস
(সমাপনী/কামিল/ স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে বিদ্যমান তেমনি তাদের শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও শ্রেণি বিন্যাসও এক নয়। কোনো কোনো মাদ্রাসায় ১৫ শ্রেণিতে আবার কোনটাতে ১২ শ্রেণিতে যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করা হয়। সাধারণত বাংলা, আরবি ও উর্দু পড়ার প্রান্তিক যোগ্যতা থাকলে মক্তব আউয়াল (শিশু শ্রেণি)-তে ভর্তি করা হয়। মক্তব শিক্ষায় শিশু শ্রেণিতে থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৪ বছরে ৪টি শ্রেণির পড়া সমাপ্ত করা হয়। যার কারণে কওমি মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরের শ্রেণিসমূহ এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

জামাতে ইয়াজদাহুম (পঞ্চম শ্রেণি) ঃ ১. ফার্সী কী পহেলী কিতাব– এই কিতাবে (গ্রন্থে) ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক স্তর শেখানো হয়, এই বই পড়ে ফার্সী ভাষার প্রতি কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বেড়ে যায় আর মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ঘৃণা জন্মায়। ২. উর্দু কী পহেলী কিতাব– এই কিতাব উর্দু ভাষা শেখার প্রথম ধাপ। উক্ত কিতাবটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। পঞ্চম শ্রেণিতে (পঞ্চম খণ্ড)-এর মাধ্যমে উর্দু ভাষার উচ্চ পর্যায়ের কিতাবগুলোর নিয়ম-নীতি আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়, ৩. উর্দু কা নয়া কায়েদা- এটিও উর্দু ভাষা শিক্ষার কিতাব। যার মাধ্যমে উর্দু ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার কৌশল শেখানো হয়। ৪. রাহে নাজাত– এই কিতাবটি হলো ফার্সী ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের মাসায়ালা/মাসায়েল (পাক/নাপাক) ইত্যাদি শেখানো হয়। ৫. তালিমুল ইসলাম (১ম ও ২য় খন্ড)। এটি ইসলামের ইতিহাসের পাঠদান দেওয়া হয়, যেখানে সাহাবী যুগ হতে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। ৬. কারিমা– এটি ফার্সী ভাষায় শেখ সাদীর কবিতার বই, যেখানে মুনাজাত এবং কিছু উপদেশমূলক কথা রয়েছে। এখানে শুধু রিডিং পড়ানো হয়। ৭. গোলজারে সুন্নাত– এই কিতাবে নবীর (স) জীবন চরিত পাঠদান দেয়া হয়। ৮. বাংলা, ৯. ইংরেজি, ১০. গণিত।

জামাতে দাহুম (ষষ্ঠ শ্রেণি) ঃ ১. তাইসিরুল মুবতাদি– এটি ফার্সী ভাষা বিশুদ্ধকরণের প্রাথমিক নিয়ম-নীতি সমূহ পড়ানো হয়। ২. চেহেল ছবক– ফার্সী ভাষার মাধ্যমে নীতি কথার (উপদেশ বাণী) ৪০টি পাঠ শেখানো হয়। ৩. আল কেরাতুল রাউজাহ, আরবি বিশুদ্ধপঠন ও উচ্চারণ শেখানো হয়। ৪. কারিমা– এই কিতাবটি অর্থসহ পড়ানো হয় যেখানে রয়েছে ফার্সির মাধ্যমে শেখ সাদীর উপদেশমূলক কথা। ৫. বেহেস্ত জেওর-(১ম ও ২য় খন্ড) এটি মাওলানা আশরাফ আল থানভীর লিখিত কিতাব, যেখানে রয়েছে– মাসায়ালা/মাসায়েল, জায়েজ-নাজায়েজ, বৈধ-অবৈধ, হারাম-হালাল এবং ছেলেমেয়েদের পাকপবিত্র বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ৬. বাংলা, ৭. ইংরেজি, ৮. গণিত, ৯. সমাজ, ১০. বিজ্ঞান ও ১১. ভূগোল।

জামাতে নাহুম (সপ্তম শ্রেণি) ঃ ১. মিজানুস ছরফ মুনশায়ের– আরবি ভাষার প্রাথমিক শব্দ ও তার রূপান্তরশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। ২. মাজদার ফয়েজ– এই কিতাবে ফার্সী ভাষার শব্দ ও তার রূপান্তর শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। ৩. পন্দে নামা– ফার্সি কবিতা, ফরিদউদ্দীন আত্তার-এর লেখা কিতাব, উপদেশসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক কথা রয়েছে। ৪. বেহেস্তি জেওর (৩য়, ৪র্থ খন্ড) এখানেও জায়েজ-নাজায়েজ, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ বিষয়ে মাসায়ালা/মাসায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৫. এসো আরবি শিখি, ৬. বাংলা, ৭. ইংরেজি, ৮. গণিত, ৯. সমাজ, ১০. বিজ্ঞান, ১১. ভূগোল।

জামাতে হাস্তম (অষ্টম শ্রেণি) ঃ ১. নাহবে মীর-ব্যাকরণ যেখানে শিক্ষা দেয়া হয় আরবি ব্যাকরণ প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ। ২. পাঞ্জগঞ্জ-শব্দ ও তার রূপান্তর বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ৩. মালাবুদ্ধা মিনহু-ফার্সী ভাষার মাধ্যমে ইলমে ফিকাহ তথা ইসলামী আইন বিষয়ক প্রাথমিক নিয়ম কানুন পড়ানো হয়। ৪. মফিদুড়ালিবীন- আরবি ভাষার মাধ্যমে উপদেশমূলক বিভিন্ন প্রবাদ বাক্য শিখানো হয়। ৫. গুলিস্তা-ফার্সী ভাষায় কবিতা, পদ্য ও গদ্যে এবং ছোট্ট ছোট্ট গল্পের মিশ্রণে শিক্ষণীয় বিষয় পড়ানো হয়। ৬. বাংলা, ৭. ইংরেজি, ৮. গণিত, ৯. সমাজ, ১০. বিজ্ঞান, ১১. ভূগোল।

জামাতে হাপ্তুম (নবম শ্রেণি) ঃ ১. হেফায়েতুন্নাহু– (ব্যাকরণ) আরবি ভাষার মাধ্যমিক ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া হয়। ২. ইলমুচ্ছিগা– ফার্সী ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শব্দ ও তার রূপান্তর শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়। ৩. নুরুল ইজা- আরবি ভাষার মাধ্যমে ইসলামী আইন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-সাদী বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ৪. বুঁস্তা– এটিও ফার্সী কবিতার বই যেটার মাধ্যমে বিভিন্ন উপদেশমূলক পাঠদান হয়। ৫. তাইসিরুল মানতেক, তর্কশাস্ত্র বা যুক্তি বিদ্যার প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ । ৬. জা-দুত্তালিবীন– আরবি ভাষার মাধ্যমে ছোট্ট ছোট্ট গল্পে ইতিহাস ও আদি ইসলামিক প্রবাদ বাক্য পাঠদান শিক্ষা দেওয়া হয়। ৬. আততরিকুল ইলাল ইন্‌শা। আরবি শব্দ, বাক্য ও আরবিতে কথোপকথন শিক্ষা অর্জন সহ আধুনিক আরবি ভাষার শেখার গ্রন্থ এটি। ৭. কাসাসুন্নবিয়িন-নবীগণের বিভিন্ন ইতিহাস, কাহিনী ও জীবনীর উপর রচিত একটি গ্রন্থ। ৮. বাংলা, ৯. ইংরেজি, ১০. গণিত, ১১. সমাজ, ১২. বিজ্ঞান, ১৩. ভূগোল।

জামাতে শশুম (দশম শ্রেণি/দাখিল/ এস এস সি) ঃ ১. কাফিয়া-(ব্যাকরণ) উচ্চ মাধ্যমিক আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার গ্রন্থ। এটি আরবিতে দক্ষতার জন্য এই গ্রন্থটি

আবশ্যকীয়। ২. কুদরী-আরবি ভাষার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। যে গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী আইন বিষয়ক বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। ৩. মেরকাত-তর্কশাস্ত্র যুক্তি বিদ্যার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থ এটি। এই গ্রন্থে যুক্তি বিদ্যার উপর আরবি ভাষায় বিভিন্ন কলাকৌশল এবং উদাহরণসহ পাঠদান দেয়া হয়। ৪. নফহাতুল ইয়ামন-আরবি ভাষার মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত আমলের বিভিন্ন রাজা-রানীদের প্রেম-ভালবাসা, পরকীয়া ও অবৈধ মিলনসহ বিভিন্ন অনৈতিক বিষয়বস্তু রয়েছে এই গ্রন্থে। ৫. তাছহিলুল উসুল– আরবি ভাষায় ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গ্রন্থ এটি। ৬. তালীমুল মোতা আল্লিম-আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য উপদেশমূলক বিভিন্ন গল্প রয়েছে এই গন্থে যার মাধ্যমে আরবি শব্দ বাক্য লিখন, পঠন এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৭. খেলাফতে বনী উমাইয়া– ইসলামের সূচনাপর্বের চার খলীফার শাসন আমল হতে খেলাফতে আব্বাসীয়ার পতনের ইতিহাস রয়েছে। ৮. শরহে জামী– আরবি ব্যাকরণের উচ্চ মাধ্যমিক গ্রন্থ। যেটা 'ফেল' নামে একটা অধ্যায়ের উপর রচিত। ৯. আসানে কাওয়ায়েদ– উর্দু ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল, আইন-কানুন সহজ ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ।

জামাতে পাঞ্জুম (আলিম ১ম বর্ষ) ঃ ১. শরহে জামী ইছিম, আরবী ব্যাকরণের উচ্চ মাধ্যমিক গ্রন্থ, যেটা 'ইছিম' নামে একটা অধ্যায়ের উপর রচিত। ২. শরহে তাহযীব-আরবি ভাষায় তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থ এটি। ৩. উসুলে শাসী– আরবি ভাষায় ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতির নিয়ম-কানুন শিক্ষার উপর একটি রচিত গ্রন্থ। ৪. কানযুদদাকায়েখ– আরবি ভাষায় উচ্চ মাধ্যমিক অলংকার শাস্ত্রের উপর রচিত একটি গ্রন্থ। ৫. লামিয়াতুল মুজেজা– নবী-রাসুল আউলিয়া কেরামের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনীর উপর রচিত। ৬. কাসিদায়ে বুর্দা– আরবি ভাষায় রচিত একটি কাব্য গ্রন্থ।

জামাতে ছাহারুম (আলিম/এইচ এস সি) ঃ ১. মুখতাসারুল মায়ানী– আরবি ভাষায় রচিত উচ্চতর অলংকার শাস্ত্রের আরবি সাহিত্যগ্রন্থ। ২. কুতবী– আরবি ভাষায় রচিত উচ্চতর তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ। ৩. দেওয়ানে আলী– আরবি ভাষায় রচিত উচ্চতর আরবি সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ। ৪. নুরুল আনোয়ার– আরবি ভাষায় রচিত উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্রের কিতাব। ৫. ফয়জুল কালাম– এটা একটি উচ্চতর হাদিস সংকলন গ্রন্থ। ৬. নফহাতুল আরব– এটি আরবি ভাষায় রচিত উচ্চতর আরবি সাহিত্য। যেটা খেলাফত যুগের প্রেম-ভালবাসা, অবৈধ প্রণয় ও রাজা-রাণীদের কিচ্ছা-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। ৭. সিরাজী– উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতির গ্রন্থ। ৮. শরহে বেকায়া– (১ম, ২য় খন্ড) উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্রের গ্রন্থ।

জামাতে ছুয়াম (ফাজিল ১বর্ষ) ঃ ১. সুল্লুমুলল উলুম– উচ্চতর তর্কশাস্ত্র যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ। ২. হোসামী– উচ্চর ইসলামী ফিকাহগ্রন্থ। ৩. মায় বুজী– ইলমে দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থ। ৪. হেদায়া আউয়াল– উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্র গ্রন্থ (১ম খন্ড)। ৫. হেদায়া ছানী– উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্র গ্রন্থ (২য় খন্ড)। ৬. মাকামাতে হারিরী– উচ্চতর আরবি সাহিত্যে অলংকার শাস্ত্র গ্রন্থ।

জামাতে মিশকাত (ফাজিল/স্নাতক) ঃ ১. মেশকাত আউয়াল– উচ্চতর হাদিস সংকলন গ্রন্থ। (১ম খন্ড) ২. মেশকাত ছানী– উচ্চতর হাদিস সংকলন গ্রন্থ (২য় খন্ড) ৩. জালালাইন আউয়াল– কোরাণ শরীফের তাফসীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রন্থ। (১ম খন্ড) ৪. জালালাইন ছানী– কোরাণ শরীফের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রন্থ (২য় খন্ড) ৫. শরহে আকায়েদ– উচ্চতর ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি গ্রন্থ। ৬. হেদায়া (৩য় খণ্ড)- উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্র গ্রন্থ। ৭. হেদায়া ৪র্থ খন্ড- উচ্চতর ইসলামী আইন শাস্ত্র গ্রন্থ।

দাওরায়ে হাদীস (কামিল/স্নাতকোত্তর) ঃ বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, আবু দাউদ শরীফ, তীরমিজী শরীফ, নেসায়ী শরীফ, ইবনে মা'জা, মুয়াত্তায়ে মালিক, মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ, ত্বা'হাবি শরীফ।

ইফতা (মুফতি) বিভাগ ঃ ফিক্বাহের বিভিন্ন কিতাবাদী থেকে বাছাই পূর্বক মাদ্রাসা ভিত্তিক নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করা হয়। দুই বৎসরের কোর্স শেষে এ বিভাগের ছাত্রদের মুফতির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

উচ্চতর হাদীস (মুহাদ্দিস) বিভাগ ঃ হাদীস বিষয়ের বিভিন্ন কিতাবাদী থেকে বাছাই করে নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করা হয়। এই বিভাগ দুই বৎসর থেকে তিন বৎসরের হয়ে থাকে। কোর্স শেষে এই বিভাগের ছাত্রদেরকে মুহাদ্দিসের (হাদিস ব্যাখ্যাকারী) সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

তাজবিদ (ক্বেরাত) বিভাগ ঃ বিশুদ্ধ এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কোরাণ তেলোওয়াত শিক্ষা দেওয়া হয় এই বিভাগে। এক বৎসর কোর্স শেষে এ বিভাগের ছাত্রদের ক্বারীর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের জন্ম, সে রাষ্ট্রের জন্ম-ইতিহাস কিংবা বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) পাঠ্যসূচিতে। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তি নিয়ে রচনা স্থান পেলেও বাঙালি জাতির ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সব অর্জন কওমির পাঠ্যসূচিতে উপেক্ষিত। 'মদীনায় কখন লোকজন জাগে' শেখানো হলেও (তৃতীয় শ্রেণির আদর্শ বাংলা পাঠ, পৃষ্ঠা ৫৬) বাংলাদেশে কখন ফজরের আজান হয়, সেই প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষাটুকুও দেওয়া হয় না। কওমির পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করে জানা গেছে, কোথাও নেই বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি– এমন কি জাতীয় সংগীতও।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নেই। নেই মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বর্ণনা। সাধারণ ও সরকারি মাদ্রাসায় বাংলা-ইংরেজি বইয়ে বাধ্যতামূলক জাতীয় সংগীত থাকলেও বেফাকের প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি, উচ্চ মাধ্যমিক ও দাওরা হাদিস পর্যন্ত কোনো বইয়েই তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কওমি মাদ্রাসার বইয়ে এখনও বলা হচ্ছে– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। বইয়ে আগের মতোই বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বদলে পাকিস্তান প্রীতি বিদ্যমান রয়েছে।

ওয়াহাবি ও মওদুদীবাদী রাজনীতির ভাবধারায় রচিত ভুলে ভরা এসব বইয়ে নেই আধুনিকতার ছোঁয়া এবং প্রযুক্তি নিয়ে কোনো তথ্য। বরং বিভিন্ন স্তরের বইয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে উস্কানি দেওয়া তথ্য রয়েছে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার ব্যর্থ। ইতিহাস বইয়ে বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকলেও তা হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের বয়ান।

এসব বই রচনা এবং সম্পাদনা যারা করেছেন তাদের নাম নেই কোনো বইতেই। সেখানে 'বেফাক নিয়োজিত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত' লেখা রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যবই ঘেঁটে দেখা গেছে, কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের 'সাহিত্য সওগাত' (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ) ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির বইতে লেখকের গদ্য, প্রবন্ধ থাকলেও কোনো বইতে নেই লেখক পরিচিতি।

ফলে শিক্ষার্থীরা লেখক সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারছেন না। চতুর্থ শ্রেণির 'ইতিহাস পাঠ' বইয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে শুরু করে মোগল আমল, ইংরেজ শাসনকাল থেকে শুরু করে উপমহাদেশ ও ভারত-পাকিস্তানি শাসনকালের নানা ইতিহাস সূচিবদ্ধ হলেও মুক্তিযুদ্ধ-প্রাসঙ্গিক একটি শব্দও নেই। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বাঙালি ও বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ধারণা না-দিয়ে ৫২ পৃষ্ঠার পাঠ্যবইটি ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের বর্ণনার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে ৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধ। যদিও প্রথম প্রকাশের সময় প্রবন্ধ ছিল না। ২০১৪ সালে প্রকাশকালে এই 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উল্লেখ থাকলেও নেই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের তথ্য। ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এমন তথ্য রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে ক্ষুদ্র আকারে বাংলাদেশের জন্মকথা থাকলেও অন্যান্য শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে তা নেই। তৃতীয় শ্রেণির 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি' বইয়ের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় 'বাংলাদেশের প্রথম, দীর্ঘতম, বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ' শিরোনামে লেখায় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে রয়েছে আব্দুল আলিম, শ্রেষ্ঠ কারী মাওলানা ইবরাহীম উজানী, শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, শ্রেষ্ঠ খতীব মুফতি আমীমুল ইহসান, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপের নাম রয়েছে। তবে কিসের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব তা উল্লেখ নেই। পঞ্চম শ্রেণির 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি বইয়ে ৪৭ থেকে ৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'বাংলাদেশের জনসংখ্যাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' প্রবন্ধে জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে উল্লেখ নেই। বরং সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে নানাভাবে। সরকারের অব্যবস্থাপনার জন্য মানুষ খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বিকৃতির এখানেই শেষ নয়। সাধারণ ও আলিয়া মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে জাতীয় পতাকার ছবি ও জাতীয় সংগীত থাকলেও কওমিতে তা অনুসরণের বালাই নেই।

বেফাক নেতারা আবার নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলছেন, সাধারণ শিক্ষার ধারায় এখনও ব্রিটিশদের ছাপ রয়ে গেছে, অন্তত তা থেকে তারা ব্যতিক্রম। অবশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাদ্রাসার বইয়ের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার বইগুলোর কোনো তুলনা চলে না বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এনসিটিবির প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বই ঘেঁটে দেখা যায়, এগুলো শুরু হয়েছে জাতীয় পতাকার ছবির সঙ্গে এর বিস্তারিত বিবরণ ও জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। যা পাওয়া যায়নি কওমির কোনো বইয়েই। বরং একই স্থানে দেয়া হয়েছে কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার জাহানবাদীর বক্তব্য। এ মহাসচিব হেফাজতের রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় বেফাক। তাদের পাঠ্যপুস্তকে তাই জিয়াউর রহমানই ঘোষক। পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যা শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনি এক সময়ে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার ঘোষণা শুনে বাংলার জনগণ অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' প্রবন্ধে জিয়াকে স্বাধীনতার 'ঘোষক' বলা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক বা বঙ্গবন্ধু হিসেবেও উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে কতজন শহীদ হয়েছেন সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

যাদের লেখা বই পড়ানো হয় কওমিতে– স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারী হিসেবে অভিযুক্ত লেখক-সাহিত্যিক, ভারত-পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশের মৌলবাদীরাই কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ও লেখক হিসেবে রয়েছেন। লেখকদের অধিকাংশই বিতর্কিত। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে অধিকাংশেরই চেহারা পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী হিসাবে। যারা এই সব বই লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক আখতার ফারুক, ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখ ও ড. আশরাফ সিদ্দিকী। বিষয়টির উল্লেখ আছে 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' শীর্ষক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা গ্রন্থে। প্রয়াত অধ্যাপক আখতার ফারুক, ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, আশকার ইবনে শাইখ ও ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রণীত 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গবেষণাগ্রন্থে এসব অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে।

১। বইয়ের নামঃ 'ইসলাম ও বিশ্ব ইতিহাস পাঠ' (পঞ্চম শ্রেণি)

এই বইয়ের সম্পাদক, আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী (হেফাজত ইসলামের নায়েবে আমীর ও একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান)। প্রকাশনায় মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ। ঐ বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় 'পাকিস্তান আমলে বৈষম্য এবং

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে– "শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়ার পর জাতির ক্লান্তিলগ্নে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ২৫ মার্চের কাল রাত থেকেই শুরু হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিকট পাক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এভাবে রক্তের নদী সাতার দিয়ে বাঙ্গালি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়। জন্ম হয় স্বাধীন মানুষের সার্বভৌম বাংলাদেশের। ২৬ মার্চকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়"।

স্বাধীনতার ঘোষকের নাম উল্লেখ না করে শুধু ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম, কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যা শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনি এক সময়ে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার ঘোষণা শুনে বাংলার জনগণ অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' বহু লেখালেখি এবং সমালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশের পর ২০১৫ সালে স্বাধীনতার ঘোষক অংশটি বাদ দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে পুনরায় সংশোধন করা হয় বইটি। সেখানে সংযুক্ত করা হয়েছে– "এমনই এক নাজুক সময়ে ২৭ শে মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণ দেন।"

২। 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' (পঞ্চম শ্রেণি)

এই বইয়ের সম্পাদক, আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী (হেফাজত ইসলামের নায়েবে আমীর ও একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান)। ঐ বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠায় 'খেলাফতের আদর্শ ' নামক প্রবন্ধে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাফত তথা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। উক্ত বইয়ে বলা হয়েছে– 'মানুষের শান্তির জন্যই প্রয়োজন সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা। মুসলমানদের জন্য এরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র কয়েম করা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই দেওয়া আইন-কানুন অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার নাম খেলাফত। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইসলামী চরিত্রে যারা সবচেয়ে বেশি চরিত্রবান, খেলাফতের দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে হয়। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই বলে খলিফারা হবেন শাসক। জনগণ তাদের আনুগত্যের শপথ নেবে এবং হক আদায় করে চলবে।' এ ধরনের কোন উক্তি মৃত্যুর আগে রসুল (দঃ) করেছেন বলে জানা নেই। আসলে খেলাফতের ধারণা পরবর্তীকালে। এখানে খেলাফতের ব্যাখ্যাও সঠিক নয়।

৩। 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' (ষষ্ঠ শ্রেণি)

এই বইয়ের সম্পাদক আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী (হেফাজত ইসলামের নায়েবে আমীর ও একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান)। ঐ বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় 'আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে– 'শহীদ-গাজী, পীর-আউলিয়া, দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক, আর শত বীরের লালনভূমি আমাদের এই জন্মস্থান। হযরত শাহ জালাল, শাহ মাখদুম, শাহ পরান, শাহ আমানত, খান জাহান আলী, হাফেজ্জী হুজুর, ফকরে বাঙাল তাজুল ইসলাম (র), শামসুল হক ফরিদপুরী (র) আর মীর তিতুমীরের দেশ বাংলাদেশ।" এখানে যুদ্ধাপরাধী মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার বড় হুজুর মাওলানা তাজুল ইসলামের বাংলাদেশের 'সূর্য সন্তান' বলা হলেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাঙালি জাতির প্রকৃত সূর্য সন্তানদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৪। খেলাফতে রাশেদা-(উর্দু ও বাংলা) (ষষ্ঠ শ্রেণি)

কাজী জয়নুল আবেদিন মিরাঠী লিখিত ঐ বইয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র কায়েম তথা জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় একমাত্র পথ হিসেবে খেলাফত রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে– 'ইসলামী উম্মাহর বৃহত্তর অংশ এ মর্মে একমত যে, খলীফা নিযুক্ত করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যকীয়)। কিন্তু এ আবশ্যিকতা কি ধরনের সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। একটি মহলের মতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই আবশ্যিক। দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

১) রাসূলে আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার স্কন্ধে (সময়ের খলীফার) বায়আত ছিল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। ২) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নিযুক্ত করা জরুরি মনে করেছেন এবং এ বিষয়টিকে তারা এতই গুরুত্ব দান করলেন যে, মহানবীর (সঃ) দাফনের চেয়ে এটিকে অগ্রাধিকার দিলেন। ৩) ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের উপর যে সকল বিষয় ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) করেছে, যেমন শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ প্রয়োগ করা ইত্যাদি।'

কওমি পাঠ্যপুস্তক রচনায় যাদের নাম রয়েছে তারা অনেকেই লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত নন। এমন কি অনেকেই কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করলেও তাদের কোন শিক্ষা সনদ নেই। কিভাবে এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লেখকের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি।

পরবর্তীকালে কওমি পাঠ্যপুস্তক হতে বিতর্কিত লেখকদের নাম সরানো হলেও লেখা আগেরগুলোই রয়ে গেছে এখনও। কওমি পাঠ্যপুস্তক অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বিতর্কিত সেই লেখকদের নাম সরিয়ে নেওয়া হলেও পাঠ্যবইগুলো সরানো হয়নি।

একই সঙ্গে সাধারণ ও মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে জাতীয় পতাকার ছবি ও জাতীয় সংগীত থাকলেও 'বেফাকের' কওমিতে এসব রাখা হয়নি। বেফাক পরিচালিত কওমি মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ের সাম্প্রতিক অবস্থা ঘেঁটে এমন বিকৃত ইতিহাসের চিত্রই পাওয়া গেছে। দেশের কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে ১৯ জাতীয় ও আঞ্চলিক বোর্ড। তবে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)। এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তাদের অধিকাংশই এখন হেফাজতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এই নেতারাই আবার বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক দলের নেতা। পাঠ্যবই 'সংস্কার' করা হলেও ভুলে ভরা এসব বইয়ে নেই আধুনিকতার ছোঁয়া এবং প্রযুক্তি নিয়ে কোনো তথ্য নেই বরং বিভিন্ন স্তরের বইয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক দেওয়া তথ্য রয়েছে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার ব্যর্থ। ইতিহাস বইয়ে বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকলেও তা অসত্য ও অসম্পূর্ণ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ, বা অনুমোদন না থাকায় কওমিতে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠ করছে ভুল তথ্য, বিকৃত ইতিহাস।

কথিত সংস্কারের পর বই ঘেঁটে দেখা গেছে, এসব বই রচনা এবং সম্পাদনা যারা করেছেন তাদের নাম নেই কোনো বইতেই। সেখানে 'বেফাক নিয়োজিত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত' লেখা রয়েছে। যদিও ভেতরের সবই রয়েছে আগের মতোই। কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের 'সাহিত্য সওগাত' (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ) ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির বইতে লেখকের গদ্য, প্রবন্ধ থাকলেও কোনো বইতে নেই লেখক পরিচিতি। ফলে শিক্ষার্থীরা লেখক সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারছে না।

কওমি মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণি থেকে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত গ্রন্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসসহ সরকারী কোনো দিবস পালন করা হয় না।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাসে পড়ানো বইয়ের লেখকের নামসমূহ

কওমি শিক্ষা বিষয়ক গবেষক মাওলানা মাহবুবে এলাহী লেখা 'হায়াতুল মুছান্নিফীন' বইতে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাসে পড়ানো বইয়ের লেখকের নামসমূহ লিখেছেন, 'কবি শেখ সাদী, শায়েখ ওয়াজহুদ্দান ইবনে উসমান ইবনে হুসাইন, আবদুল, সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দী, শায়খ ফরীদউদ্দীন আত্তার, আবদুল্লাহ গাঙ্গহী, কেফায়াতুল্লাহ, ইব্রাহীম, আলী আক্কাশ আবুল হাসান/আবুল হোসোইন, শাইখ আবদুল কাহের জুরজানী, মাওলানা আবদুর রহমান জামী, মুহাম্মদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে হাসান, কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী, মুফতী শফি দেওবন্দী, আব্দুল কাহের জয়জারিন, শরফুদ্দীন, শায়খ সিরাজ্জুদ্দীন উসমান চিশতী নোমানী, মুফতি এনায়াত আহমদ, শিহাবুদ্দীন, আলী আকবর, শায়খ বুরহামুল ইসলাম সারনূজী, আবদুল্লাহ গাঙ্গুহী, হাসান, মুহাম্মদ আহসান, আবু আমর,

আবদুল্লাহ, আবুল হুসাইন, আল্লামা নিজামূদ্দীন ইসহাক, এজাজ আলী, আল্লামা হাফনী নাসেফ, আবদুল্লাহ আবুল বারাকাত, মনযূর নোমানী, কাজ্বী যয়নুল আবেদীন, ফজলে ইমাম, হাবীবুর রহমান, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মুহাম্মদ ইমাম সিরাজউদ্দীন, মাসউদ, মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ, আবু মোহাম্মদ, আহমদ ইবনে আবু সাঈদ, আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ, ওবাইদুল্লাহ, মীর হুসাইন, মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ, মুহিবুল্লাহ, আহমদ আবু তৈয়্যব, আবুল হাসান, আবদুর রহমান, মুহম্মদ জালালুদ্দীন, আহমদ আবুল ফজল, মাসউদ সাদুদ্দীন, আবদুল্লাহ, মাহসূদ, হুসাইন, মুহাম্মদ, আবু আবদুল্লাহ, আহমদ, আবু জাফর, আবু আবদুল্লাহ ইমাম ইবনে মাজহাব, আবু আব্দুর রহমান, সুলায়মান, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা, মুসলিম ইবনে আল- হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ফরদনী আল- কুশায়াবী আন-নিসাপুরী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, আবুল হাসন আলী নদভী, আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, সুলতান যওক নদভী, রফিক আহমদ, জসিম উদ্দিন, আব্দুল হান্নান, আব্দুল মান্নান, আবুল হাসান, আহমদ হাসান।[৩০]

সংস্কারের পর কওমি মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবইসমূহ

কওমি মাদ্রাসার কিতাব ও বই সমূহের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য (সিলেবাস) পুস্তিকা থেকে নিম্নে দেওয়া হলো[৩১]—

শিশু শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত ও তাহযীব	কালেমায়ে তিইয়্যিবাহ, কালেমায়ে শাহাদা, ইমানে মুজমাল, নামাযের দু'আসমূহ, নামাযের তা'লীম ঃ ইসলামী তাহযীব (শিশু অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
২.	আরবি	আরবি অক্ষর পরিচয় ও বর্ণমালা শিক্ষা	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	বাংলা	আদর্শ শিশু শিক্ষা	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	গণিত	আদর্শ ধারাপাত	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	ইংরেজি	ইংরেজি বর্ণমালা শিক্ষা	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত	আম্মাপারা নাযেরা ও সূরা ফীল পর্যন্ত মুখস্থ এবং উযু, তাইয়াম্মুম ও নামাযের তা'লীম	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
২.	ইসলামী তাহযীব	ইসলাম তাহযীব (প্রথম অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	বাংলা	আদর্শ বাংলা পাঠ (১ম শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	গণিত	প্রাথমিক গণিত (১ম খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	ধারাপাত	আদর্শ ধারাপাত	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	আরবি	মৌখিকভাবে শব্দাবলী	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	ইংরেজি	My English Book (Part One)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

দ্বিতীয় শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত ও তাজবীদ	কোরাণ শরীফ নাজেরা- ১ম পাঁচ পারা সূরা ওয়াদুদ্হা পর্যন্ত মুখস্থ এবং তাজবীদের কায়দাসমূহের মৌখিক তা'লীম	
২.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	তা'লীমুল ইসলাম-১ম খণ্ড	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	ইসলামী তাহযীব ঃ (দ্বিতীয অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	বাংলা	আদর্শ বাংলা পাঠ (২য় শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	গণিত	প্রাথমিক গণিত (২য় খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	ভূগোল ও সমাজ	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (২য় শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	উর্দূ	উর্দূ কা কায়েদা লেখাসহ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর	
৮.	আরবি	ওয়ার্ড বুক	
৯.	ইংরেজি	My English Book (Part Two)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত ও তাজবীদ	কোরাণ শরীফ নাজরো- দশ পারা (৬ষ্ঠ পারা- ১৫ পারা) সূরা ওয়াল্ লাইল্ থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত মুখস্ত	
২.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	তা' লমিুল ইসলাম ২য় খণ্ড	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	ইসলামী তাহযীব ঃ (৩য় অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	বাংলা	আদর্শ বাংলা পাঠ (৩য় শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	গণিত	প্রাথমিক গণিত (৩য় খন্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	ইতিহাস	ইতিহাস পাঠ (৩য় খন্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	ভূগোল ও সমাজ	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (৩য় শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৯.	উর্দূ	উর্দূ কী পহেলী কিতাব	
১০.	আরবি	আরবি ওয়ার্ড বুক	
১১.	ইংরেজি	My English Book (Part Three)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১২.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal primary English Grammar For Class Three to Five	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

চতুর্থ শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত ও তাজবীদ	কোরাণ শরীফ নাজেরা- শেষ- ১৫ পারা, বাকী আম্মাপারা মুখস্থ ও মশ্ক। যুবানীভাবে তাজবীদের কাওয়ায়েদ শেখান	

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
২.	ফিকহ্ ও তাহযীব	তা' লমুিল ইসলাম ৩য় খণ্ড	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	ইসলামী তাহযীব ঃ (৪র্থ অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	বাংলা	আদর্শ বাংলা পাঠ (৪র্থ শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	গণিত	প্রাথমিক গণিত (৪র্থ খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	ইতিহাস	ইতিহাস পাঠ (৪র্থ খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	ভূগোল ও সমাজ	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (৪র্থ শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৯.	উর্দূ ও কাওয়ায়েদ্	উর্দূ কী দোছারী কিতাব কাওয়ায়েদসহ	আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর
১০.	আরবি	আরবি বোলচাল (মৌখিক)	
১১.	ইংরেজি	My English Book (Part Four)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১২.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal Primary English Grammar For Class Three to Five	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

পঞ্চম শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	দ্বীনিয়াত ও তাজবীদ	পূর্ণ কোরাণ শরীফ দাওর ও মশ্ক। সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুয্যাম্মিল মুখস্থ।	নুজহাতুল ক্বারী।
২.	ইসলামী ফিক্হ ও তাহযীব	তালিমুল ইসলাম ঃ (৪র্থ খণ্ড) ইসলামী তাহজীব ঃ (৫ম অধ্যায়)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	বাংলা	আদর্শ বাংলা পাঠ (৫ম শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৪.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	গণিত	প্রাথমিক গণিত (৫ম খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	ইতিহাস	ইতিহাস পাঠ (৫ম খণ্ড)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	ভূগোল ও সমাজ	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (৫ম শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	উর্দূ ও কাওয়ায়েদ	উর্দূ কী তিসরী কিতাব	ইমদাদিয়া লাইব্রেরী
৯.	আরবি	আরবি বোলচাল (মৌখিক)	
১০.	ফারসী	ফারসী কী পহেলী কিতাব	ইমদাদিয়া লাইব্রেরি কাওয়ায়েদ ও তাইসীরুল মুবতাদী আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর
১১.	ইংরেজি	My English Book (Part Five)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১২.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal Primary English Grammar For Class Three to Five	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

আল্ মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর)

ষষ্ঠ শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	আরবি ভাষা ও ইনশা	বাকুরাতুল আদব ও ছফওয়াতুল মাছাদির	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
২.	আরবি ব্যাকরণ	ছরফ মীযান, মুনশায়িব অথবা ইলমুছ ছরফ	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	ফিক্হ	বেহেশতী গাওহার	
৪.	বাংলা	সাহিত্য সওগাত -১ম ভাগ	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৫.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	গণিত	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	তাজবীদ	গুনিয়াতুল ক্বারী (সপ্তাহে দু'দিন)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	মশক ও মুখস্থ	সূরা হুজুরাত থেকে ২৯ পারা শেষ, সূরা মূলক মুখস্থ।	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৯.	সমাজ ঃ ইতিহাস	তারিখুল ইসলাম	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১০.	ফারসী	কারীমা ও পান্দেনামা	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১১.	কাওয়ায়েদ	মিফতাহুল কাওয়ায়েদ (সপ্তাহে তিন দিন)	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১২.	উর্দূ সাহিত্য ব্যাকরণ		বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১৩.	ইংরেজি	My English Book (Part Six)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১৪.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal Junior English Grammar & Composition For Class Six to Eight	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

৭ম শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	আরবি ভাষা ও ইনশা	বাকুরাতুল আদব ১ম থেকে ছয় অধ্যায়।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
২.	আরবি ব্যাকরণ	নাহবে মীর ও শরহু মিয়াতি আমিল	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	আরবি ব্যাকরণ (ছরফ)	পাঞ্জেগঞ্জ খাছছিয়্যাত পর্যন্ত/ ইলমুছ ছরফ (৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
৪.	ফিক্হ	মা-লা বুদ্দা মিনহু/ আল ফিকহুল মুয়াস্সার	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
৫.	বাংলা	সাহিত্য সওগাত -২য় ভাগ	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৭ম ও ৮ম শ্রেণির জন্য)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	গণিত	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (৭ম শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	তাজবীদ	জামালুল কোরাণ- অর্ধেক।	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

৯.	মশক ও মুখস্থ	১ম পারা হতে ১০ম পারা শেষ পর্যন্ত, সূরা আর রাহমান মুখস্থ।	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১০.	ইতিহাস ও ভূগোল	সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১১.	ফারসী সাহিত্য	গুলিস্তাঁ-১ম ও ৮ম বাব।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১২.	উর্দূ সাহিত্য ব্যাকরণ	গ্রন্থ উল্লেখ নেই।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১৩.	ইংরেজি	My English Book (Part Seven)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১৪.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal Junior English Grammar & Composition For Class Six to Eight	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

৮ম শ্রেণি

ক্রঃ নং	বিষয়	বইয়ের নাম	প্রকাশক
১.	আরবি ভাষা ও ইনশা	কাছাছুন নাবিয়্যীন ১-৩ খন্ড ও আল মুনতাখাবঃ (১০টি সূরা ও ৪০টি হাদীস মুখস্থসহ।)	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
২.	আরবি ব্যাকরণ	নাহব হিদায়াতুন নাহবে পূর্ণ ও কাফিয়া (বাহসুল ফিল ওয়াল হরফ)।	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৩.	আরবি ব্যাকরণ (ছরফ)	ইলমুছ ছীগাহ ও ফুছুলে আকবরী- খাছছিয়্যাত থেকে শেষ পর্যন্ত।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
৪.	ফিক্‌হ	নূরুল ঈযাহ পূর্ণ।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
৫.	বাংলা	বাংলা ও সাহিত্য সওগাতঃ ৩য় ভাগ	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৬.	ব্যাকরণ	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৭ম ও ৮ম শ্রেণির জন্য)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৭.	গণিত	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (৮ম শ্রেণি)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৮.	তাজবীদ	জামালুল কোরাণ- (দ্বিতীয়ার্ধ)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
৯.	মশক ও মুখস্থ	সূরা ওয়াকিয়াহ ও দুটি খুতবা মুখস্থ।	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১০.	ইতিহাস ও ভূগোল	তারিখুল মিল্লাহ ১ম খন্ড	খিলাফতে রাশেদাহ
১১.	ফারসী সাহিত্য	বুস্তাঁ- ১ম বার	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১২.	উর্দূ সাহিত্য ব্যাকরণ	গ্রন্থ উল্লেখ নেই।	বেফাক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই
১৩.	ইংরেজি	My English Book (Part Eight)	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত
১৪.	ইংরেজি গ্রামার	Ideal Junior English Grammar & Composition For Class Six to Eight	বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ ও জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ এবং মাদ্রাসার পাঠক্রম

২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের এক সংবাদ সম্মেলনে কওমি মাদ্রাসার পাঠ্য সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষাকে আরও ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি বোর্ডগুলোর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও অনার্স লেভেল চালু করে কওমি সনদকে সত্যিকারের মাস্টার্সের মান দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নিজেদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তকরণ ও জাতীয় এবং কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে কওমি সিলেবাস প্রণয়ন উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নতুন এ কওমি শিক্ষাবোর্ডের মহাসচিব মুফতি উসামা ইসলাম লিখিত বক্তব্যে বলেন, '৫০ বছর পরে দেশের কওমি মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আমরা পাঠ্য করেছি বেসরকারি উদ্যেগে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে লক্ষাধিক কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ পাঠ্যবই তুলে দেব। জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের জন্য আমাদের দীর্ঘ ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হলো। এমন একটি মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।'

এ সময় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন– জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক কাসেমী, মুফতী ইয়াহইয়া মাহমুদ কাসেমী, শিক্ষা সিলেবাস ও গবেষণা পরিচালক লেখক মাওলানা সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ, তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মাওলানা মুআজ বিন নূর, জাতীয় ফিকহী বোর্ড বাংলাদেশের মহাপরিচালক মুফতি আজীমুদ্দীন, বোর্ডের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি মাওলানা জিয়াউর রহমান, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক সৈয়দ মাসুম আহমদ প্রমুখ।

জাতীয় ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বিত কওমি সিলেবাস চালু করার কথা জানিয়ে বোর্ডের মহাসচিব মুফতি উসামা ইসলাম বলেন, কোনো একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বাস্তবমুখী কর্মবান্ধব যুগোপযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে একটি দেশের টেকসই ও লাগসই ফলপ্রসূ উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। তারা দাবি করেন, এদেশে আমরাই প্রথম কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালকরণের আওতায় এনেছি। আমরা চাচ্ছি, দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোও তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল সমৃদ্ধ হোক। আগামী দিনে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতির মানকে আরো উন্নতি করতে পারবে।

বোর্ডের মহাসচিব মুফতি উসামা ইসলাম আরও বলেন, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কওমি সনদের পড়ালেখার ধারাবাহিক মান ও সার্টিফিকেটে উন্নিত করা সময়ের দাবি।

দেশের ৩০ হাজার কওমি মাদ্রাসা ও ৩০ লক্ষ কওমি শিক্ষার্থীদের মনের ভাষা ও চাহিদা এটি। বোর্ডটি এসব দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তাদের বৈঠকের কথাও জানায়।

জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ-এর সিলেবাস ও কারিকুলাম–

১. দরসে নেযামীর পাশাপাশি মক্তব থেকে দাওরা পর্যন্ত তাবলীগী নেসাব। যেমন– নবী-সাহাবাদের ঘটনা, দাওয়াতের মূলনীতি, দাওয়াতের অপরিহার্যতা, হায়াতুস সাহাবাহ, মুন্তাখাব হাদীস নেসাবভুক্তকরণ।
২. প্রত্যেক জামাতে ইলমুল আক্বায়েদ শেখানো। যেমন, এসো ঈমান শিখি থেকে শারহুল আক্বায়েদ পর্যন্ত পাঠদান।
৩. কোরাণ পাকের তাফসীর। ধারাবাহিক তাফসীর অধ্যয়ন শ্রেণিভুক্তকরণ।
৪. আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য প্রথমে ভাষা ও পরবর্তীতে ব্যকরণ শিক্ষাদান। যেমন– মক্তব থেকে ছোট ছোট আরবী বাক্য শিক্ষাদান করা এবং পর্যায়ক্রমে আরবী কথোপকথন ও লিখন (মুহাওয়ারা ও তাহরীর)।
৫. আরবী অলঙ্করনশাস্ত্র সহজ ও যুগোপযোগী করে পেশ করা।
৬. ফিকাহশাস্ত্রে ক্লাসভিন্নতায় বিষয়বস্তুর তাক্বরীর ও তাশরীহ নেসাবভুক্ত করা। আরবী মতনের সাথে আরবী শরাহ মুতালা'আর অনুশীলন।
৭. বিষয়ভিত্তিক আয়াতসহ হিফযুল হাদীস চালু করা।
৮. প্রত্যেক জামাতে সীরাত ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্তিকরণ।
৯. তা'লীম ও দাওয়াতের সমন্বয়ে শিক্ষাদান। যেমন, ফাযায়েলে ইলমকে রোজানা দরসের অন্তর্ভূক্তকরণ ও পাঠদানের অন্তর্বর্ত্তিকালীন উস্তাদের নেগরানে খুরুজ, ছুটিতে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে খুরুজ।
১০. অবশাসনমুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা। যেমন, কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জেলা ও থানাভিত্তিক ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।
১১. এসএসসি সমমান সাধারণ শিক্ষা চালু করা।
১২. গণহারে সবাইকে আলেমের সার্টিফিকেট না দিয়ে তূলনামূলক দুর্বল ছাত্রদেরকে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সম্মানজনক উপাধি দিয়ে কর্ম ও দাওয়াতমুখী করে দেওয়া।

শিক্ষাকাল সর্বমোট আঠারো বছর। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

(১) ৫ বছর ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক)
(২) ৩ বছর মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক)
(৩) ২ বছর মুতাওয়াসসিতাহ আম্মাহ (মাধ্যমিক)
(৪) ২ বছর মুতাওয়াসসিতাহ খাসসাহ (উচ্চ মাধ্যমিক)
(৫) ২ বছর আলিয়া (স্নাতক)
(৬) ২ বছর আলিমিয়া (স্নাতকোত্তর)

দরসে নেজামির এ আঠার বছর শিক্ষাকাল শেষ করার পর তাখাসসুস (বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর পড়াশোনা) -এর জন্য তিনটি শাখা চালু রয়েছে।

ক- ৩ বছরমেয়াদি তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা।
খ- ২ বছরমেয়াদি তাখাসসুস ফিদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ।
গ- ২ বছরমেয়াদি তাখাসসুস ফিল কিরাত।
ঘ- ২ বছর মেয়াদী তাখাসসুস ফিল ইক্বতিসাদ (ইসলামী অর্থনীতি ও শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা)

১. মুসলমানদের সমস্ত কার্যক্রম ইলমে ওহি মুতাবিক পরিচালনার লক্ষ্যে রোজানা ১ ঘন্টা মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা কায়েম করা।
২. যুগোপযোগী সিলেবাসের মাধ্যমে ফরজে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা দিয়ে হালাল-হারামের তারতম্য মেনে জীবন যাপন ও প্রয়োজনে ইমামতির যোগ্য করে গড়ে তোলা।
৩. প্রথমিক পর্যায়ের উর্দু ও আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান করা। যাতে দাওয়াতের ময়দানে যেকোন তাকাযা ও জামাত নিয়ে চলার উপযুক্ত করে দেওয়া।

১. মুসলমানের শতভাগ সন্তানকে এই সিলেবাসের মাধ্যমে ফরজে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীন শেখানো।
২. প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের জন্য ১০ বছর মেয়াদী ১ ঘন্টার মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা তরতীব করা ও তাদের জন্য উপযুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন করা।
৩. আমাদের সমমনা শিক্ষকগণ কেন্দ্র থেকে ট্রেনিং নিয়ে দৈনিক ১ঘন্টার জন্য এসকল সুবহী মক্তবের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য যুগোপযুগি দ্বীনি সিলেবাস প্রদান করা। যাতে করে একজন নারী দ্বীনের যাবতীয় ফরজ ইলম শিক্ষালাভ করতে পারে এবং নিজ ঘরে প্রয়োজনীয় তালীম-তরবিয়তের পরিবেশ কায়েম করতে পারে।

জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সকল মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথে জড়িত থাকবেন। তা'লীম ও তারবিয়তের পাশাপাশি মাদ্রাসা-মসজিদ ও আশপাশ মহল্লায় মসজিদ আবাদীর মেহনত করে দ্বীনী পরিবেশ তৈরি করবেন। বিশেষ করে প্রতিমাসে দরস বন্ধ রেখে ৩ দিনের জন্য সকল প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র ও শিক্ষক আল্লাহর রাস্তায় বের হবেন। প্রয়োজনীয় তা'লীম উস্তাদগণ মসজিদের পরিবেশেই সংক্ষিপ্তভাবে পাঠদান করবেন। যাতে করে মসজিদভিত্তিক তা'লীমের সাহাবাওয়ালা পরিবেশ তৈরি হয় এবং তাকাযার ভিত্তিতে মাশোয়ারার সাথে মুনাসিব শিক্ষকগণ বহির্বিশ্বেও সফর করবেন। এছাড়াও রোজানা ইমানি মজলিস কায়েম এবং দাওয়াতের ব্যাপারে উস্তাদগণ ছাত্রদেরকে আমলীভাবে মশক করাবেন।

স্বল্পমেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। বিজ্ঞান শাখা ও গবেষণাগার থাকবে। থাকবে বিশ্ব মানের লাইব্রেরি ও ফতোয়া বোর্ড এবং বাংলা ভাষা

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। আরবী ভাষা সাহিত্যের উপর ১বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা। এছাড়া দক্ষ কারিগরি অনুষদ। কওমির আলেমগণ যাতে দ্বীনি খেদমতের বিনিময় না নিয়ে বিকল্প করসংস্থানে জীবিকার জন্য কাজ করবেন জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হওয়া আলেমগণ। দাওয়াত তালিম ও তিজারা (ব্যাবসা)-কে সাথে নিয়ে চলবেন। হালাল রিজিক তালাশে জাতীয় কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ করে তুলবে আলেমদের। প্রতিটি মাদ্রাসায় ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স থাকবে। কোর্স শেষে কারিগরি বিষয়ে ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ১ বছর মেয়াদী কোর্সসমূহ (পার্ট টাইম দিনে ১ঘন্টা)। যেসব বিষয়ে একজন মাদ্রাসার ছাত্র আলেম হওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

বেসিক কম্পিউটার, জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স, ট্রাভেল টুরিজম এন্ড টিকেটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া ডাটাবেজ সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, অডিও ভিডিও সিস্টেম, আমিন প্রশিক্ষণ, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিভ, সেলস এন্ড কাস্টমার সার্ভিস, রড বাইন্ডার শাটারিং কারপেন্টার মেশন, হাউজ ওয়ারিং ইলেক্ট্রিশিয়ান বিল্ডিং পেইন্টার, ওয়েল্ডার অ্যান্ড গ্রিল মেকার, ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, বিল্ডিং স্কাফোল্ডিং, বিল্ডিং ডাক্ট, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং কাম অটোমেকানিক্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন, ওয়াল্ডিং, বিল্ডিং মেইন্টেনেন্স, সিভিল কন্সট্রাকশন, ফার্ম মেশিনারি, টেইলারিং, মোবাইল সার্ভিসিং, বাশ বেত ও পাটি শিল্প, এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর, হর্টিকালচার, ইউনানী চিকিৎসা, এলএমএফ, এল্যোপাথিক পল্লী চিকিৎসা কোর্স, হিজামা বা কেপিং থেরাপি, বেকারি এন্ড কনফেকশনারী, ফাষ্টফুড, পোশাক তৈরি শিল্প, চমড়া শিল্প ও ট্যানারী, ব্লক, বাটিকা, প্রেস এন্ড প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, কমিউনিকেশন স্কিলস, পাটজাত দ্রব্য সমগ্রী তৈরি, কম্পোস্ট সার তৈরি, নকশিকাঁথা সেলাই, ফুল চাষ, মাশরুম চাষ, নার্সারি, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও কর্মমুখর করে গড়ে তেলা হবে।

জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ এর পরিচিতি

জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমূহের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা নতুন। ২০১৬ সালের ৭ অক্টোবর ফরীদ উদ্দীন মাসউদের নেতৃত্বে এই বোর্ডটি গঠিত হয় এবং ১৫ অক্টোবর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বোর্ডের অধীনে ১ সহস্রাধিক মাদ্রাসা রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা : বোর্ডের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে রয়েছে ২টি স্তর।

প্রথম স্তরঃ প্রাথমিক শিক্ষা। কোরাণ তেলাওয়াত ও ইসলামিয়াতসহ গণিত, বাংলা, ইংরেজি ও সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি ৫ম শ্রেণির মান পর্যন্ত। একে বলা হয় আল মারহালাতুল ইবতিদাইয়্যাহ বা কওমি প্রাথমিক মাদ্রাসা।

দ্বিতীয় স্তরঃ এতে রয়েছে সাধারণ শিক্ষা সহ ইসলামিক শিক্ষা। অর্থাৎ আরবি ভাষা, আরবি ব্যকরণ ও ফিকাহশাস্ত্র, গণিত, বাংলা, ইংরেজি ও সমাজ বিজ্ঞান। একে বলা হয় আল মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ। এর মেয়াদ ৩ বছর। (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম)

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ এপর্যায়ে রয়েছে ৪টি স্তর।

১ম স্তরঃ আল মারহালাতুস সানাবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর), যার মেয়াদ ২ বছর (৯ম-১০ম)।

২য় স্তরঃ আল মারহালাতুস সানাবিয়্যাতুল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর), যার মেয়াদ ২ বছর (১১শ-১২শ)।

৩য় স্তরঃ আল মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক ডিগ্রি)। এর মেয়াদ ২ বছর (১৩শ-১৪শ)।

৪র্থ স্তরঃ আল মারহালাতুল তাকমিল (মাস্টার্স ডিগ্রি)। এর মেয়াদ ২ বছর। এ স্তরকে দাওরায়ে হাদিস বলা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ঃ এতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা ও গবেষণামূলক শিক্ষা কোর্স। যথাঃ হাদিস, তাফসির, ফিকহ, ফতওয়া, তাজবিদ, আরবি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি, উর্দু ও ফারসি ভাষা, ইসলামের ইতিহাস, সীরাত, ইলমুল কালাম, ইসলামী দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণামূলক শিক্ষা।

কেন্দ্রীয় পরীক্ষা :

বর্তমানে বোর্ডের অধীনে নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় : হিফজ ও নাযেরা, ইলমুল কিরাত ও তাজবীদ, ইবতিদাইয়্যাহ, মুতাওয়াসসিতা, সানাবিয়া উলইয়া, ফযীলত, ইফতা।

কওমি মাদ্রাসা প্রাথমিক পাঠক্রম

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কওমি মাদ্রাসার অবস্থান দ্বিতীয়, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরেই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে এখানে। বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, কওমি মাদ্রাসার সব স্তর মিলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। আড়াইশ' বছর আগে ভারতের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশজুড়ে কওমি মাদ্রাসার বিস্তার ঘটেছিল। সে ধারা এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে। অনুসৃত হচ্ছে সুদূর অতীতের মোল্লা নিজামউদ্দিন সাহালভী প্রবর্তিত কারিকুলাম 'দরসে নিজামিয়া নেসাব'। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতে কেবল আরবি ও ফার্সি কেতাব পড়ানো হতো, এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলোর উর্দু তরজমা পড়ানো হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার মতোই বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, গণিতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বিজ্ঞান শিক্ষা এখনও উপেক্ষিত।

কিছুসংখ্যক মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে স্কুল টেক্সট বোর্ডের কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। বেশির ভাগ কওমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় তাদের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী

প্রণীত পুস্তকাদি। সর্ববৃহৎ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক), যার চেয়ারম্যান ছিলেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা শাহ আহমদ শফী। এই বোর্ডের অধীনে প্রায় ৩ হাজার ৩০০ মাদ্রাসা আছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনা 'আল বেফাক পাবলিকেশনের' বই পড়ানো হয়। এই বইগুলোর সঙ্গে অন্যান্য কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে তেমন পার্থক্য নেই।

প্রথম শ্রেণির বই 'আদর্শ বাংলা পাঠে'র রচয়িতা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার জাহানাবাদী। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বই 'আদর্শ বাংলা পাঠ' ও 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি' এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির 'ইতিহাস পাঠের' লেখক হচ্ছেন শাহ সইফ উল আলম ও মুসলিম উদ্দিন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বারসহ কয়েকজনকে নিয়ে এসব বইয়ের সম্পাদনা পরিষদ। বর্তমান প্রতিবেদনে এসব বইয়ের ভুল বানান, দুর্বল রচনা ও সম্পাদনার মান নিয়ে আলোচনা করা হবে না, কেবল বইগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে বলা হবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বইগুলো বেশকিছু রচনা, বিশেষ করে কবিতা চয়নে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেনি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদ্দীনের লেখা কবিতা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলায় আছে– রবীন্দ্রনাথের ছুটি, নজরুলের 'ভোর হল' এবং জসীম উদ্দীনের 'মামার বাড়ি'। বিভিন্ন শ্রেণিতে ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিয়া, আহসান হাবীব প্রমুখের কবিতা আছে। সেই সঙ্গে আছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'আমার পণ' (দ্বিতীয় শ্রেণি), রজনীকান্ত সেনের 'স্বাধীনতার সুখ' (দ্বিতীয় শ্রেণি), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কাজের লোক' (দ্বিতীয় শ্রেণি), কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' (তৃতীয় শ্রেণি), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'রাসুলের বাণী' (তৃতীয় শ্রেণি), কালীদাসের 'মাতৃভক্তি' (চতুর্থ শ্রেণি), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দূরের পাল্লা' (চতুর্থ শ্রেণি), সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র' (পঞ্চম শ্রেণি) এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ 'উত্তম ও মধ্যম' (মূল- শেখ সাদী)। এসব কালজয়ী কবিতার পাশাপাশি জগদীশচন্দ্র বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কামরুল হাসানের প্রবন্ধও স্থান লাভ করেছে। সব প্রথম সারির লেখকদের কবিতা-প্রবন্ধ থাকলেও কোনো শ্রেণিতেই স্থান পায়নি নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার রচনা, স্থান পায়নি নারী অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোনো নিবন্ধ। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংশ্লিষ্টরা নারী অধিকারের প্রতি অসংবেদনশীল। এ বইগুলো পড়ে বোঝা যাবে না, বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী বাস করে। এই বই কেবল মুসলমানদের গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলা বইগুলোতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব বই পড়ে কেউ বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ধারণা পাবে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদের অবদানের কথা শিক্ষার্থীরা জানবে না। ইতিহাস পর্বে ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ে কেবল মুসলমানদের অবদানকে বড় করে দেখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির ইতিহাস বইতে পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল নবীদের কথা বলা হয়েছে। এসব

কিছুই খণ্ডিত ইতিহাস, যা মূল ইতিহাসে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির ইতিহাসে বাংলায় 'মুসলমানদের আগমন' ও 'মুসলিম শাসনের' কথা বলা হয়েছে। শেষ করা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থান এবং ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘটনা বর্ণনা করে। পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাসে ভারতের তুর্কি-পাঠান-মোগল শাসনের কথা বর্ণিত হয়েছে। মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। যেমন আকবর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর মন জয়ের নেশায় আকবর বিভ্রান্ত হন।' (পৃষ্ঠা ২৭, ইতিহাস পাঠ, পঞ্চম শ্রেণি) অথচ আকবর তার অসাম্প্রদায়িক নীতির জন্য মহিমান্বিত। মহান সম্রাট আকবরকে ছোট করা আর আওরঙ্গজেবকে মহান করার পাকিস্তানি ধারা এই বইয়ে প্রতিফলিত।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জানানো হয়নি– বাংলা তথা উপমহাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস। দ্রাবিড়, আর্য-অনার্যদের ইতিহাসের অলিন্দে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাল-মৌর্য-সেন শাসন, মহেঞ্জোদাড়ো থেকে মহাস্থানগড়– উয়ারি বটেশ্বর সভ্যতার কথা শিক্ষার্থীদের একেবারে অজানাই রয়ে গেল। পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস পাঠে 'বাংলার জাগরণ' অধ্যায়ের কেবল ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহর কথা রয়েছে। এ ছাড়াও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কথা, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে যেসব সংগ্রামগাথা, রাজা রামমোহন রায়-ঈশ্বরচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল-রোকেয়ার হাত ধরে হিন্দু-মুসলমানদের যে জাগরণ– সবকিছুই শিক্ষার্থীদের আড়ালে রয়ে যায়। পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস পাঠের পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম অধ্যায় পড়লে মনে হবে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ভূমিকাই মুখ্য। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের ভূমিকাও গৌণ করা হয়েছে, যা ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। ওই অধ্যায়ের শেষ দুটি লাইন, '১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং সেই পথ ধরেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামরত হক্কানি উলামায়ে কিরামেরই অবদান।' প্রথমত, পাকিস্তানের পথ ধরে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়নি। সবারই জানা, পাকিস্তান দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে অসার প্রমাণ করে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ভিত্তিতে। উপেক্ষা করা হয়েছে এই জাজ্বল্যমান সত্য। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম-পর্বে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের কথা নেই। আছে শুধু '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না প্রদানে অস্বীকৃতির কথা। এ আংশিক সত্য বলার মধ্য দিয়ে মনে হতে পারে, সামরিক শাসক ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে সরকার গঠন না করতে দেওয়ায় পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে। এটি কৌশলে 'বাংলাদেশ খণ্ডিত পাকিস্তান'– এমন ধারণা দেওয়ার অপচেষ্টা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা প্রদানে অস্বীকার করা ঘটনার এক দিক, যা মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু সংগ্রামের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে– সুদীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এগিয়েছে। একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে নিরস্ত্র সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নিয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে

দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল বাংলাদেশ, যা চেতনাগতভাবে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ থেকে পৃথক। কোনো বিবেচনায়ই বাংলাদেশ খণ্ডিত পাকিস্তান নয়। এই অধ্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শব্দটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এক লাইনেই অত্যাচার শব্দ বলা হয়েছে। নেই অত্যাচারের বর্ণনা।

একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, আলবদর রাজাকার, শান্তি কমিটির অপরাধ চেপে যাওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তুলে ধরা হয়নি সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস ও বীর নায়কদের অবদান। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি' আছে। এ বইয়ে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মের পরিচিতি আছে। তবে জানা যাবে না অন্য ধর্মাবলম্বীদের কথা। পঞ্চম শ্রেণির 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি'তে 'উপজাতি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারা' অধ্যায় আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণির ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি বইয়ে 'বাংলাদেশের কথা জানো' অধ্যায়ে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারির কথা আছে। জাতীয় পতাকা ও স্মৃতিসৌধের ছবিও আছে। নেই শহীদ মিনারের কথা। জাতীয় অনুষ্ঠান অধ্যায়ে একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে পতাকা উত্তোলন করা বা অর্ধনমিত রাখার কথা আছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতের কথা কোথাও নেই। বলা হয়নি যে, সর্বস্তরের নর-নারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রভাতফেরি করে শহীদ মিনারে ফুল দেয়। এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে– স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের কথা। আরও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গও। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ভূগোল ও সমাজ পরিচিতিতে পরিবেশ, দর্শনীয় স্থান, জেলার বিবরণ আছে।

পঞ্চম শ্রেণিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আছে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য। সেখানে সঙ্গতভাবে মানবাধিকার ও নারী অধিকারের প্রসঙ্গ সংযোজনের দাবি রাখে। এসব বইয়ের রচয়িতা ও সম্পাদকদের মধ্যে কূপমণ্ডূকতা ও পুরুষতান্ত্রিকতা যে কাজ করেছে তা নিয়ে দ্বিমতের সুযোগ নেই। কওমি মাদ্রাসার পাঠক্রমের সংস্কার আজ সময়ের দাবি বলে মনে করেন কওমি মাদ্রাসার সংস্কারমনা ছাত্র, শিক্ষক এবং সচেতন নাগরিক সমাজ।

কওমি মাদ্রাসার সামগ্রিক পর্যালোচনা

সনদের স্বীকৃতি নেই, তাই কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষে অন্য কোথাও চাকরি করতে না পেরে শিক্ষার্থীরা মূলত মসজিদে ইমামতি, ব্যবসা বা কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে থাকেন। কিন্তু এতে আয় হয় খুব কম। তাই এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়েন শিক্ষার্থীদের একাংশ। এই হতাশা থেকে জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে বলে মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল উলামার সভাপতি ও শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ বলেন, জিহাদ সম্পর্কে শিশুপর্যায়ের বইগুলোতে যেভাবে বলা

হয়েছে, তা কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয়। শিশুর মানসিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে।

রাজধানীর মিরপুরের একটি কওমি মাদ্রাসার এক ছাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ১৬ বছরের পড়া শেষে দেখি কোনো দাম নেই, তাই আদর্শিক বিরোধ থাকলেও ভর্তি হয়েছি আলিয়া মাদ্রাসায়। কারণ সেখান থেকে বের হলে অন্তত চাকরি পাব। নইলে লেপ তোষকের ব্যবসা করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

কওমি মাদ্রাসার দাবি, তারা ভারতবর্ষের দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করেন। দেওবন্দের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরিচালিত দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো মূলত আরবি, ফারসি এবং উর্দু ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেয়। এছাড়া সীমিত পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিক্ষাও দেওয়া হয় কওমি মাদ্রাসায়ে।

মিরপুরের জামিউল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) মুফতি মাওলানা আবুল বাশার নোমানী বলেন, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের (বেফাক) সিলেবাস অনুযায়ী এই সব তৈরি করা হয়েছে। তবে কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ কোন একক শিক্ষাবোর্ডের হাতে নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলো চলে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের অধীনে। আবার একই এলাকায় একেকটি মাদ্রাসা একেকটি বোর্ডের অধীনে চলার মতো ঘটনাও ঘটেছে। কোন একটি বিশেষ আদর্শের অনুসারীরা এক ধরনের মাদ্রাসা চালান তো অন্য একটি বিশ্বাসের অনুসারীরা চালান অন্য ধরনের মাদ্রাসা।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না কওমি মাদ্রাসায়। সে প্রশ্ন করা হলে আল-জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী বলেন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং উত্তোলন করতে হবে। কোন মাদ্রাসায় যদি বাংলাদেশের প্রতীক জাতীয় পতাকা না তোলা হয় তাহলে সরকারের পক্ষে হতে বাধ্য করতে হবে যেন অবশ্যই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে আমাদের কিছু অভিযোগ রয়েছে।

আল জামিয়াতুল ইসলামীয়া নছিরুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা দৌলত আলী খান বলেন, জাতীয় পতাকা অবশ্যই তুলতে হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা মানে হচ্ছে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে কওমি আলেম-ওলামারা দ্বিমত পোষণ করেন। আমার নিজের মত হলো, জাতীয় সংগীত গাইলে কোনো সমস্যা দেখছি না। আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে।

ঢাকার কামরাঙ্গীচর মাদ্রাসায়ে নূরে মদিনা-এর পরিচালক মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী বলেন, জাতীয় পতাকা মাঝে মাঝে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু আমি চাই প্রত্যেক দিবসে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে যেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত গাইলে তেমন বেশি অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয় সংগীত নিয়ে আমাদের কওমি আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

কওমি মাদ্রাসার পাঠসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা এবং পাঠদান বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক

ইতিহাস এর ব্যবস্থা করে কওমি সিলেবাসে সংযুক্তি করে সরকারকে পাঠদানের বাধ্য করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের খুব বেশি জানা প্রয়োজন এবং জানতে হবে। এদেশের নাগরিক হলে এদেশ সম্পর্কে জানা থাকা অবশ্যই একজন ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের অধিকার।

বরিশাল জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা হলেন এদেশের কৃতি সন্তান। নবী-সাহাবাদের যুগে যারা বদরের যুদ্ধ করেছেন তারা যেমন মুক্তিযোদ্ধা; তেমনিভাবে এদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন তারাও একই যোদ্ধা। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা হলো ওহুদ এবং বদরের যুদ্ধের সাহাবাদের মত। কিন্তু আমাদের একটা দাবি থাকবে মুক্তিযোদ্ধারা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা না বলেন। পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন চাই।'

খুলনা জামিয়া ইসলামিয়া মারকাযুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আমার মত– এটা সংযোজন করা হোক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। বাধ্য করতে হবে যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয়।'

আল জামিয়া নছিরুল ইসলাম নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার (জামাতে কামেলাইন) এর ছাত্র মুহাম্মদ সেলিম কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমান কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন মনে করি। এ শিক্ষা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি। যত দ্রুত সম্ভব সরকারের নিকট দাবি– এ শিক্ষাকে পরিবর্তন করে আধুনিকায়ন করা হোক। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও শিক্ষা শেষে সেই শিক্ষার কোন মূল্যায়ন করা হয় না স্বীকৃতি না থাকার কারণে। কওমি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস না থাকা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যে দেশের নাগরিক বলে দাবি করি, সেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে দেশপ্রেম আমাদের কার্যক্রমে প্রকাশ পায় না। আমি মনে করি, পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।'

মুহম্মদ সেলিম জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের শিক্ষকগণ জাতীয় সংগীত গাওয়া হারাম মনে করেন তাই আমি জাতীয় সংগীত গাওয়ার পক্ষে নই।'

তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'জাতীয় পতাকা হচ্ছে এই দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন মানে স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা। পতাকা একটি দেশের পরিচিতি বহন করে। সুতরাং আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে শতভাগ মত পোষণ করি।'

আল-জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া মাদ্রাসার ২০১২ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল) এর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল মুবিন, পিতাঃ মুহাম্মদ ইউছুফ, গ্রামঃ কোদালা ধোপাঘাট, থানাঃ রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে বলেন, 'কওমি শিক্ষা সংস্কার পরিবর্তন অপরিহার্য।

কিছুটা সংস্কার আমাদের পটিয়া মাদ্রাসায় হয়েছে। তা কিন্তু খুব বেশি না। আরো ব্যাপক হারে পরিবর্তন এনে যুগোপযোগী করতে হবে। কওমি মাদ্রাসার সার্বিক বিষয়ে বলেন– আমি এখানে দু'একটা বিষয় খুব সমস্যা বলে মনে করি, তা হলো আমাদের থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ছাত্রদের ফ্লোরে ঘুমানো এবং ছাত্রদের ডাল ভাত আর শিক্ষকদের মাছ-মাংস এসব আমার ভালো মনে হয় না।'

মোহাম্মদ আব্দুল মুবিন কওমি মাদ্রাসার পাঠসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা যে দেশের নাগরিক সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের সাঠিক ইতিহাস অবশ্যই থাকতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি বলে মনে করি। জাতীয় সংগীত গাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের একটি জনপ্রিয় গানকে সরকারিভাবে জাতীয় সংগীত ঘোষণা করেছে বিধায় আমাদের উচিত জাতীয় সংগীত গাওয়া। জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর পতাকা হচ্ছে তার একটি অনন্য প্রতীক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে।'

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কওমি মাদ্রাসার বেশির ভাগ শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক হলেও মাদ্রাসায় দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের থাকা-খাওয়া-শিক্ষা কোনটিরই ব্যয় লাগে না। মূলত এ কারণেই শিশুদের শিক্ষিত করার আশায় মাদ্রাসায় দেন অভিভাবকরা। কিন্তু মাদ্রাসায় থাকা-খাওয়া বা শিশুদের বিকাশে ন্যূনতম ব্যয় করার সামর্থ্য নেই বেশির ভাগের। কারণ, মানুষের দান-দক্ষিণায় চলা মাদ্রাসাগুলো জানে না আগামী মাসে তাদের কত আয় হবে।

এছাড়াও আছে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের এক বছর মেয়াদি মসজিদ বা মক্তবভিত্তিক মাদ্রাসা। কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা পেশাগত জীবনে সাধারণত মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক হচ্ছেন। এদের কেউ কেউ মুফতি (ফতোয়া বা ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ), ক্বারি (শুদ্ধভাবে কোরআন তেলওয়াত), মাওলানা (দাওরায়ে হাদিস উত্তীর্ণ এবং সামগ্রিক ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন), হাফেজ (কোরআন শরিফ মুখস্থ থাকা) ডিগ্রি অর্জন করেন।

এছাড়াও ইসলামের প্রচার করতে গিয়ে কেউ কেউ হন মুফাসসির (কোরআনের ব্যাখ্যা), মুহাদ্দেছ (হাদিসে পান্ডিত্য) ইত্যাদি হিসেবে স্বীকৃত হন। তবে সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় তাদের সনদের গ্রহণযোগ্যতা চাকরি, উচ্চশিক্ষা, বিদেশে কর্মসংস্থান কোথাও তেমন একটা নেই। অন্যদিকে কওমি শিক্ষার্থীদের যেসব অনুশাসন ও আদব-কায়দা শেখানো হয় তা রোজকার জীবনে, চাকরির বাজারের আদব-কায়দার সঙ্গে খাপ খায় না। যেমন, প্যান্ট পরা যাবে না, চেয়ারে বসে খাওয়া যাবে না, সালাম দেওয়ার সময় হাত ওঠানো যাবে না ইত্যাদি। সাধারণ বা আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষায় দাখিল পাস করে কলেজ এবং আলিম পাস করে ডিগ্রি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকলেও কওমি-নূরানী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জীবন ও কর্মক্ষেত্র ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকছে।

কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা মাস্টার্স সমমান দাবি করা 'দাওরায়ে হাদিস' ডিগ্রি অর্জনের পরও সরকারি কর্মকমিশনের (বিসিএস) পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাদের জন্য যে কোনো চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। দেশে একমাত্র আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক নিয়োগের ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দেয়। এই শিক্ষা প্রতিযোগিতা এবং পেশার উপযুক্ত দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলতে পারছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেকের মনে। কওমি মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর চাকরির অনিশ্চয়তা সম্পর্কে জামিয়া রহিমিয়া মাদ্রাসার একজন হাফেজ বলেন, 'আল্লাহকে রাজি খুশি করতে দ্বীনের শিক্ষা নিচ্ছি।

টাকার উৎসঃ জামেয়া রাশিদিয়া কওমি মাদ্রাসা লালবাগ জামেয়া আরাবিয়া, বড় কাটরা মাদ্রাসাসহ বাংলাদেশের সব কওমি মাদ্রাসায়ই দুঃস্থ এতিম অসহায় শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের পেছনে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয়। এ টাকা কোথা থেকে আসে? কীভাবে বেতন দেয়া হয়? এ সম্পর্কে জামেয়া রাশিদিয়া কওমি মাদ্রাসার নায়েব মোহতামিম মাওলানা আব্দুল কাদের বলেন, মানুষের দান-খয়রাতের টাকা দিয়েই সব চলে। ঈদ, কোরবানী, রমজান মাসের বিভিন্ন ছদকা, ফেৎরা ও মাহফিলের মাধ্যমে এ টাকা উত্তোলন করা হয়। সরকারি কোনো আর্থিক অনুদান আমরা নিই না। বিদেশ থেকে কোনো অনুদান আসে কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'কোন প্রবাসী বা বিদেশি কোনো লোক যদি আল্লাহর ওয়াস্তে অনুদান দেয় তবে তা নেয়া হয়।'

তাদের এই টাকার উৎস সম্পর্কে বোর্ড মহাসচিব জানান, 'সাধারণ মানুষ যে মুক্তহস্তে টাকা দান করে তাতেই আমাদের চলে যায়। বিদেশি কোনো এনজিও'র সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।'

২০১০ সালে সরকারি সনদের স্বীকৃতির আবেদনের জন্য কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বার্ষিক খরচের যে হিসাব দেয় তাতে সাড়ে তিনশ কোটি টাকারও বেশি খরচ দেখানো হয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে এ সব মাদ্রাসার জন্য অর্থ আসে।

কওমির তার জন্মলগ্ন থেকেই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় পাঠ্যদান করে আসছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সাল থেকে কিছু কিছু মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, অংক পড়ানো হলেও তা ছিল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমানে এই বিষয়গুলো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

বাংলা, ইংরেজি ও অংকের প্রতি তাদের অবহেলার কারণ সম্পর্কে লালবাগ জামেয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি ফয়জুল্লাহ জানান, কোরআন, হাদীস, ফেকাহের মাসলা, মাসায়েল সবই আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায়, কাজেই ঐদিকেই আমাদের নজর বেশি থাকে।

এ কারণেই কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপেক্ষিত। তাদের বেশিরভাগ পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন গল্প, কবিতা রয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, ধর্মীয় ভিন্নতা ও জিহাদ প্রভৃতি সম্পর্কে সুকৌশলী সব বর্ণনা রয়েছে। এদেশের

ইতিহাস ঐতিহ্যকে সাম্প্রদায়িকভাবে তুলে ধরা হয়েছে কওমি মাদ্রাসা, বিভিন্ন মসজিদ ও মুসলিম কীর্তিগুলোর মাধ্যমে।

এছাড়া এ মাদ্রাসাগুলোর বেশিরভাগ বইয়ে রয়েছে নিম্নমানের বর্ণনা এবং অসংখ্য ভুলভ্রান্তি। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ, প্রায় বইতে দেখা গেছে ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, জ, য, ঝ, ও, ঔ ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইসলামী তাহজীব' নামের বইটির বানান 'তাহজীব' আর ভেতরের পাতায় বানান 'তাহযীব'।

বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইতে রয়েছে জিহাদী কবিতা, ধর্মযুদ্ধ, মুসলিম-অমুসলিম সংঘাত, জেহাদের বিভিন্ন হাতিয়ার এবং কিভাবে মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে হত্যা করে বিজয় নিশ্চিত করে তার বর্ণনা। নিচের শ্রেণিতে এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যসূচি প্রণয়ন সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব বলেন, 'মানুষের ছোটবেলার শিক্ষাই মনে দাগ কাটে। কাজেই শিশুদেরকে শুরু থেকে ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার জন্যই এ জাতীয় গল্প-কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। যাতে তারা উক্ত ভাবধারায় জীবন-বিধান মেনে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কওমি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যায়ের সিলেবাস লক্ষ্য করলেই এ ব্যাপারে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল-মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ আল-আম্মাহ (মাধ্যমিক) স্তরের সিলেবাস–
১. আরবি সাহিত্য ও ইনশা (রচনা কাছাছুন নাবিয়্যান ৪র্থ খণ্ড ও নফহাতুল আরব অথবা মুফিদুত তালেবীন আল ক্বিকাআতুল ওয়াজিহাহ। (১-৩), ২. নাহব (ব্যাকরণ)ঃ কাফিয়া ও সরহে জামী-ফিল ও হরফ, ৩. ফিকাহ (আইনশাস্ত্র) ঃ কিতাবুল বুবু থেকে শেষ পর্যন্ত ৪. উর্দুলল ফেকাহঃ উছুলুশ শাশি, ৫. ইতিহাস ঃ খেলাফতে বনী উমাইয়া ও আব্বাসিয়া, ৬. মানতিক (তর্কশাস্ত্র)ঃ মিরকাত, ৭. আখলাক (নৈতিক চরিত্র)ঃ তা'লীমুল মুতাআল্লিম, ৮. বাংলাঃ বাংলা সংকলন, ৯. বাংলা ব্যাকরণ ঃ নির্দিষ্ট নেই, ১০. পৌর বিতান ঃ ইসলামী পৌর বিতান-১ম ভাগ, ১১. আসাল মারহালাতুস সানুরিয়্যা আল উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)।

দুই বছরের এই কোর্সে যা পড়ানো হয়– ১. আরবি সাহিত্য ও ইনশা ঃ আরবের প্রাচীন ও আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য, ২. বালাগাত ও আরুয ঃ ফন্নে মায়ানী ও আরাজুল মিফতাহ, ৩. ফিকাহ ঃ ইসলামী আইননীতি ও নীতিশাস্ত্র, ৪. তাফসীর ঃ কোরাণ তরজমা আরবি ও উর্দুতে (১ম থেকে ১৫ পারা), ৫. ইতিহাস ঃ উপমহাদেশ, ৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ঃ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক ডিগ্রি)

দুই বছরের কোর্সে যা পড়ানো হয়—১. তাফসীর ও উছুলুত তাফসির ঃ তাফসীরু জালালাইন ও আল-ফওযুল কাবীর, ২. ফিকাহ ও উছুলুল পিকাহ ঃ হিদায়া, ৩. আরবি সাহিত্য ঃ দিওয়ানে হামাসাহ, ৪. অর্থনীতি ঃ ইসলামের অর্থনীতি।

মারহালাতুত তাফসীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রি) এখানে পড়ানো হয় সিহাহ সিত্তাহ মানে ছয় খানা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। এগুলো হল– ১. ছহীহুল বুখারী ঃ ১ম ও ২য়, ২. ছহীহুল মুসলিম ঃ ১ম ও ২য়, ৩. জামেউত তিরমিজী ঃ ১ম ও ২য়, ৪. আবু দাউদ শরীফ, ৫. ইবনে মাজাহ শরীফ, ৬. নাসায়ী শরীফ এবং এগুলোর সংকলকদের জীবনী।

কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস পুরোপুরিই ধর্মভিত্তিক। যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, বাংলা ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্র, তারা জানে না তাদের দেশ, দেশের ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর।

সিলেবাসে যে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি রয়েছে তাতে একতরফাভাবে শুধু ইসলামের বিষয়গুলোই রয়েছে। রয়েছে খেলাফত শাসনের সুফল, এবং এই বিষয়গুলো পড়ানোর কারণে ছাত্রদের মাঝে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও আধুনিক মূল্যবোধবিরোধী মনোভাব কাজ করে। তারা চায় খেলাফত শাসন। এজন্য তারা জীবন দিয়ে হলেও আধুনিক গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষকতা ও আধুনিক মূল্যবোধকে প্রতিহত করতে সর্বদা প্রস্তুত।

কওমি পাঠ্যপুস্তকে আধুনিকতাকে ত্যাগ করা সম্পর্কে ২০১৩ সালে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তৎকালীন কওমি বোর্ডের মহাসচিব প্রয়াত আব্দুল জব্বারকে তিনি বলেছিলেন, 'ধর্মীয় শিক্ষা থেকে সামান্যতম দূরে সরে না গিয়ে আমরা সাধারণ শিক্ষার মানে বই প্রকাশের চেষ্টা করছি। এরই অংশ হিসেবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভুগোল, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ সাধারণ বিষয়গুলো চালু করা হচ্ছে।'

কওমি মাদ্রাসা ও ফতোয়া ঃ কওমি মাদ্রাসার অন্যতম একটি বিষয় হলো ফতোয়া। যাকে তারা ইসলামী শরীয়াহ আইন মনে করেন। এই ফতোয়ার সঙ্গে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধ রয়েছে। এ দিয়ে নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছেন গ্রামের অবলা নারীরা। যার জন্য অনেকে গ্রামছাড়া হয়েছেন, অনেকে আবার করেছেন আত্মহত্যা। ২০০১ সালে উচ্চতর আদালতে বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরার বেঞ্চ ফতোয়াকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন। তারপরও ফতোয়া বন্ধ হয়নি।

এই ফতোয়া সম্পর্কে জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি ফয়জুল্লাহ জানান, 'ফতোয়া হল ইসলামী আইন, দেশে ইসলামী সরকার কায়েম হলে এই আইনের মাধ্যমেই দেশ ও সমাজের বিচারকার্য চালানো হবে। যা খোলাফায়ে রাশেদীনরা করে গেছেন। এই ফতোয়ার তথা ইসলামী শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশে শান্তির সুবাতাস বয়ে আনা সম্ভব। অন্যথায় নয়।'

বহুমুখী নিয়ন্ত্রণে কওমি মাদ্রাসা ঃ কওমি মাদ্রাসা যেহেতু সরকারের অর্থায়নে চলে না, তাই এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণও নেই। এসব মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন ইসলামী দল ও বিভিন্ন পীর-মাশায়েখের মধ্যে রয়েছে চরম মতবিরোধ। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) ছাড়া প্রায় ১৩টি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে বেশিরভাগ কওমি মাদ্রাসাই বর্তমানে এই

বোর্ডের আওতায় চলে আসছে। এই বোর্ড-ই পরীক্ষা নেয়া ও সার্টিফিকেট দেয়াসহ মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকে।

এই শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে সুন্নত, খাতনা, মিলাদ, মাহফিল, ওয়াজ নসিহত, পানিপড়া, ফতোয়া, তাবিজ দেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তাছাড়া পরকাল সম্পর্কিত বিষয়, জেহাদও পাঠ্য বিষয়ে রয়েছে। বেশির ভাগ পাঠ্যপুস্তকই উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষার। এ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি শিক্ষকের কোনো সুষ্ঠু বন্দোবস্ত নেই। তাছাড়া কওমি মাদ্রাসার অনেকটিতে একেক ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। একই সময়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষার মাদ্রাসা। এতে কোরআন এবং আরবি, বাংলা, উর্দু ও গণিতের প্রাথমিক বিষয় পড়ানো হয়। হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সাধারণত যারা কোরআনে হাফেজ হন তারাই কওমি মাদ্রাসাগুলোতে ৮টি স্তরভেদে প্রাথমিক স্নাতকোত্তর পর্যন্ত মোট ১৬ বছরের কোর্স করেন।

এসব মাদ্রাসার অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করা। স্বাধীনতার আগে এসব মাদ্রাসায় কোনো পর্যায়ে বাংলা পড়ানো হত না। স্বাধীনতার পর কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাঠ্যক্রমের এই দুর্বলতার কারণেই কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়া অনেকেরই আরবি, ফার্সি, উর্দুর উপরে ভালো দখল থাকলেও মাতৃভাষা বাংলায় তারা পড়তে লিখতে পারে না বললেই চলে।

কওমি মাদ্রাসায় এই বহুমুখী নিয়ন্ত্রণের অন্তরালে রয়েছে কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের কোন্দল, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবসা। এই অবস্থার সুযোগ আঞ্চলিক ধর্মীয় নেতারা তাদের নিয়ন্ত্রণের কিছু মাদ্রাসা একত্র করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শ্রেণি কক্ষ ও আবাসিক রুম ঃ সব কওমি মাদ্রাসায় একই রকম আবাসন ব্যবস্থা, যেখানেই ক্লাস নেয়া হয় সেখানেই খাওয়া-দাওয়া ও শোয়া-থাকার ব্যবস্থা থাকে। তাই কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেও বিশ্রাম নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাদেরকে চিত্তবিনোদন থেকে সব সময়ই বিরত রাখা হয়। এছাড়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় ছাত্রদের। এমনকি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, যা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানায়।

কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী নির্যাতন: ইসলাম শিক্ষার নামে কওমি মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাথায় মগজে যেমন ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, উগ্রতা ও তথাকথিত জিহাদী কার্যক্রমকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে এই শিশুদের উপর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও বলাৎকার প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আরও নির্যাতনের ভয়ে ভুক্তভোগী শিশুরা এবং তাদের দরিদ্র অভিভাবকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করে না। গণমাধ্যমে কখনও যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয় তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়। একেকটি মাদ্রাসা যেন শিশু নির্যাতনের অভয়াশ্রম, একেকটি ধর্ষণ ক্যাম্প। ধর্ষণ শেষে ভয়ে কিংবা আতঙ্কে অনেকে ধর্ষিত শিশুটিকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে। নানা কারণে বেড়ে চলেছে এই ধর্ষণ। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাব, ধর্ষণের শিকার শিশুটির ধর্ষক হয়ে ওঠা।

এই সকল ধর্ষণের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত যতগুলো শিশুর ধর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ সামনে এসেছে অধিকাংশ শিশুরই বাবা মা রয়েছে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসায় মা-বাবাহীন এতিম শিশুর পরিমান অনেক বেশি। তারা যতটা না আসে হাফেজ হতে, তারচেয়ে বেশি আসে দু'মুঠো ভাতের অভাবে। এই সকল শিশু তাদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলতে পারে না। কারণ তাদের বলার কেউ থাকে না। আর যে সকল নির্যাতিত মা-বাবাকে বলে তার অধিকাংশ মাদ্রাসার অন্য শিক্ষক, কমিটির লোকেরা বা স্থানীয় ক্ষমতাবানরা মিটিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এবং গ্রামের ছেলে-মেয়েরা বেশি পড়াশোনা করে। সাধারণ স্কুল-কলেজগুলোতে পড়াশোনার ব্যয় মাদ্রাসা থেকে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে মাদ্রাসাগুলোতে যৌন হয়রানির ঘটনা আড়ালেই রয়ে যায়। কারণ, প্রায় দশ হাজার মাদ্রাসার প্রতি ধর্মপ্রাণ মানুষের শ্রদ্ধা রয়েছে। এ কারণে কেউ মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে ভয় পায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আশঙ্কা করে, যৌন হয়রানির ঘটনা প্রকাশ হলে মাদ্রাসার প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। এছাড়া মাদ্রাসায় শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষক বা ওস্তাদের সমালোচনা করা গুণাহর কাজ। একজন মুসলমান হয়ে অন্য মুসলমানের অপরাধ প্রকাশ করা উচিৎ নয় ইত্যাদি।

ধর্ষণের বাইরেও নানা রকম অমানবিক মধ্যযুগীয় নির্যাতন করা হয় শিশুদের উপর। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে জোড়া বেত দিয়ে পিটানো, তুলে আছাড় মারা, উদোম শরীরে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখাসহ নানা রকম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই শিশুরা। কোমলমতি মাদ্রাসা শিশুদের উপর প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বলৎকারের ঘটনা। শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণের এক দূর্গে পরিণত হয়েছে অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসা। এমনকি মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মসজিদের হুজুরদের দ্বারাও শিশু ধর্ষণের বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও মাদ্রাসায় শতকরা ৯০ ভাগ যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পায় না তারপরও জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত মাদ্রাসায় সংঘটিত ছাত্রী ধর্ষণ, ছাত্র বলৎকার ও শিশু নির্যাতনের সংবাদ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ২০২০ সালের নভেম্বরে ২৬ মাদ্রাসা ছাত্রী ধর্ষণ, ৪ জন নির্যাতিত, ১ জন পঙ্গু হয়ে যায়। ২০২০ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা, মক্তব এবং মসজিদে শিক্ষকদের দ্বারা কমপক্ষে ২৬ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২৪ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে। চার শিশু নির্মম নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং একজন আজীবন পঙ্গু হয়ে যায়। ২০২০ সালের অক্টোবরে মাদ্রাসায় ৩৩টি শিশু ধর্ষণ ও ৬৬টি শিশুর ওপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

জাতীয় ও অনলাইন পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে জানা গেছে, 'কওমি মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদে শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণ চেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতনের মোট ৩৩টি ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালের ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর এই পুরো এক মাসে ৩৩টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২৪টি ছেলেশিশু আর ৯টি

মেয়েশিশু। একটি শিশুকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণ চেষ্টা ও যৌন নিপীড়ন চালানো হয়েছে ৭টি শিশুর উপর। অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে ৬৬ টি শিশুর উপর। সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম আর সিলেট অঞ্চলে।

'২০২০ সালের ২০ অক্টোবর ঘটেছে একটি নির্মম ঘটনা। কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় চানাচুর চুরির অভিযোগে মাদ্রাসার সভাপতি ও শিক্ষকরা মিলে ৬০ শিশু শিক্ষার্থীকে মাথা নিচে, পা ওপরে করে আধাঘণ্টা শাস্তি দেন। এতে ২৫ শিক্ষার্থী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারও শুরু হয় বমি, কারও নাক-মুখ দিয়ে বের হতে শুরু করে রক্ত। এ সময় নির্যাতনের শিকার শিশুদের চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মাদ্রাসাটি ঘেরাও করে।'

২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট ঢাকা টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট মাদ্রাসাছাত্রের যৌন নির্যাতন নিয়ে এএফপির সঙ্গে কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হোজাফিয়া আল মামুদ। সামাজিক মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। বাংলাদেশের সমাজ রক্ষণশীল হওয়ায় মাদ্রাসায় যৌন হয়রানির ঘটনা প্রকাশ অনেকটাই ট্যাবু হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এই ট্যাবুকে উপেক্ষা করেই ঘটনার শিকার শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

'বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী হোজাফিয়া আল মামুদ। তিনি তিনটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন। এএফপিকে তিনি বলেন,'মাদ্রাসায় যৌন হয়রানির ঘটনা অনেক বেশি। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা প্রত্যেক শিক্ষার্থী যৌন হয়রানির ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অনেক শিক্ষক নারীদের সঙ্গে ব্যাভিচারের পরিবর্তে শিশুদের সঙ্গে যৌনতাকে অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ মনে করে। মাদ্রাসায় সবাই একই ছাত্রাবাসে বসবাস করে। ফলে, কেউ অপকর্ম করলে সহজেই নিজেদের গোপন করতে পারে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীকে ঘটনা প্রকাশ না করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। ঢাকার তিনটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন হুজাইফা আল মামদুহ। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে ফেসবুকে নিজেসহ অন্য মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রকাশ করে দেন তিনি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মামদুহ বলেন, মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করেছে তাদের সবাই এই যৌন নির্যাতন সম্পর্কে জানে।

'আমি জানি অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে যৌন মিলনকে বিবাহবহির্ভূত নারীদের সঙ্গে যৌন মিলনের থেকে কম অপরাধ বলে বিবেচনা করেন। যেহেতু তারা মাদ্রাসায় একই ছাত্রাবাসে থাকেন তাই তারা সহজেই তাদের অপরাধ আড়াল করতে পারেন এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলো চেপে রাখতে চাপ দেন। জুলাই মাসে হোজাফিয়া আল মামুদ ফেসবুকে নিজের যৌন হয়রানির শিকারের অভিজ্ঞতা লিখেন।

'মোস্তাবিক বিল্লাহ মাসুম নামে একজন নারীবাদী একটি ওয়েবসাইটে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। মাদ্রাসায় পড়াকালীন সিনিয়র এক শিক্ষার্থী কর্তৃক তিনি যৌন

হয়রানির শিকার হয়েছেন। মাদ্রাসার এক শিক্ষক অজ্ঞান করার পর তাকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় তিনি স্থায়ীভাবে মানসিক বিপর্যস্ত হয়। মাসুম এএফপিকে বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মাদ্রাসার অনেককে চিনি, যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন অথবা তাদের সহপাঠীদের ধর্ষণের ঘটনার সাক্ষী। প্রায় সব মাদ্রাসায় যৌন হয়রানির ঘটনা অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

২০২১ সালের ১৫ এপ্রিল ঢাকা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মাদ্রাসায় তিন মাসে ২০ শিক্ষার্থী ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির শিকার হয়। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসায় সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় তিন মাসে আরও ২১ জন শিশু বিভিন্ন মাদ্রাসা এবং আবাসন কেন্দ্রগুলোতে শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।'

২০২১ সালের ১৫ এপ্রিল ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটি ওয়েবিনার-এর আয়োজন করে। সেখানে উপস্থিত বক্তারা এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বন্ধ করুন" শিরোনামের ওয়েবিনারটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে এ বিষয়টি উঠে আসে যে, কওমি মাদ্রাসায় ঠিক কী ঘটছে এবং সেখানে হয়রানি বন্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। মূলত এ বিষয়গুলো পরিষ্কার নয়, কারণ কওমি মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে নেই।'

২০২০ সালের ১৪ মার্চ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের তথ্যমতে, 'চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আনাস (৭) নামের এক ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগে কামরুল ইসলাম (২৫) নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ আদালতের মাধ্যমে ওই শিক্ষককে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।'

২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের তথ্যমতে, 'নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় ছাত্রকে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যার পর আত্মহত্যা বলে পরিবারের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তিন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ২০১৯ সালের ১২ মার্চ নিহত ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে সিদ্ধারগঞ্জ থানায় মামলা করলে রসুলবাগ মাঝিপাড়ার রওজাতুল উলুম মাদ্রাসা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।'

২০২০ সালের ১৩ মার্চ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের তথ্যমতে, 'দিনাজপুরের কাশিমপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার এক ছাত্রকে বলাৎকার করার অভিযোগে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক রবিউস সানী (২৫) কে ২০১৯ সালের ১৩ মার্চ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভুক্তভোগী ওই ছাত্রের বাবা ১২ মার্চ রাতে মামলা করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের তথ্যমতে, 'যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ছাত্রকে (১৩) বলাৎকারের অভিযোগে ২০১৯ সালের ৫ জানুয়ারি কুমড়ি হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ইয়াকুব আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, তার ছেলে কাউকে কিছু না বলে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি চলে যায়। পরে তাকে মাদ্রাসায় পাঠালে সে না গিয়ে আবারও বাড়ি ফিরে আসে। মাদ্রাসায় না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, হুজুর তার সঙ্গে 'খারাপ কাজ' করেন এবং ঘটনা কাউকে না বলার জন্য ওই শিশুকে ভয়ভীতি দেখান।'

২০২১ সালের ২১ মার্চ দৈনিক আমাদের অর্থনীতির এক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, 'আখিরাতের ভয়, মিথ্যা হাদিস আর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ৩ বছর ধরে ১১ জন ছাত্রীকে ধর্ষণ করলো নারায়ণগঞ্জের দারুল হুদা কওমি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি মোস্তাফিজুর রহমান। ৮ থেকে ১১ বছর বয়সী আবাসিক ছাত্রীদের ধর্ষণের পর সেকথা গোপন রাখার জন্য কোরআন শরীফ ছুঁইয়ে শপথ করালো নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মা হাওয়া (আ.) কওমি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক (মুহতামিম) মওলানা খায়ের বেলালী। বগুড়ার সোনাতলা ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় উপবৃত্তির খবর নিতে এলে আলিম দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করলো অধ্যক্ষ ফজলুল করিম (৬২)।'

২০২১ সালের ৯ এপ্রিল দৈনিক অপরাজিত বাংলার এক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, 'শুধু মাদ্রাসা ছাত্রীরাই ধর্ষণের শিকার হয় না, এখানে ছাত্ররাও বলাৎকারের শিকার হয়। ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারিতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে জামিয়া ইসলামীয়া যাইনুল আবেদীন মাদ্রাসায় পাঁচ শিশু ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠল দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে সোনাগাজী (ফেনী) উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের মাদ্রাসাতু ওসমান (রা.) মাদ্রাসায় আবার ছাত্র বলাৎকারের ঘটনা ঘটে গেল। ধর্ষক মাদ্রাসার খাদেম নুর ইসলাম দরবেশ (৫৫)। আবাসিক ছাত্ররা জানালো, বলাৎকার এখানে নিয়মিত ঘটনা হলেও লজ্জায় অনেকে মুখ খোলে না। ডিসেম্বরে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক মোবারক হোসেনকে একাধিক ছাত্রকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো।'

২০২০ সালের ২১ অক্টোবর বিডিনিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০২০ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা এবং জেলার রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া ও বাঁশখালী উপজেলায় কয়েকজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর এমনই তথ্য মিলেছে। অতীতে চট্টগ্রামসহ সারা দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকদের শিশু ধর্ষণসহ বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণ মিললেও তা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সে কারণে এ ধরনের ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর রাঙ্গুনিয়া স্বনির্ভর এলাকায় চার শিশু ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় আহমদিয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক নাছির উদ্দিনকে (৩৫)। তিনি ওই কওমি মাদ্রাসাটির হোস্টেল সুপার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।

'মধ্যপ্রাচ্যফেরত নাছির দুই বছর আগে রাঙ্গুনিয়ার ওই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেখানকার শিশু ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেক রাতে যৌন নিপীড়নে বাধ্য করতেন বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে বিভিন্ন সময়ে শিশু ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন নাছির। এছাড়া শিশু শিক্ষার্থীদের পরিবারের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে এ ধরনের অপকর্মে বাধ্য করার বিষয়টিও বলেছেন।'

গণমাধ্যমে প্রকাশিত কয়েক'শ ঘটনার মধ্যে, এখানে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র কয়েকটির কথা। এ থেকে ধারণা করা যায় নিয়ন্ত্রণহীন, নজরদারিহীন কওমি মাদ্রাসাগুলো কীভাবে অপরাধের দূর্গে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি : গবেষক অধ্যাপক আবুল বারাকাত লিখিত 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতিঃ উৎস, বিকাশ এবং প্রভাব' এই বইটি থেকে কওমি মাদ্রাসায় আর্থিক কাঠামো নিম্নে তুলে ধরা হলো—

'বিদেশি উৎসের মধ্যে আছে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের অর্থাৎ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের ধনী মুসলিমদের কাছ থেকে অনুদান। রমজান মাস এবং হজের সময় বেশ কিছু উলামা যারা হজের সময় মাদ্রাসার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তারা মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশ বিশেষত যুক্তরাজ্য সফর করেন। তারা নির্বাসিত বাংলাদেশি এবং ধনী মুসলিমদের সাথে সাক্ষাত করে মাদ্রাসা এবং মসজিদে অর্থায়নের জন্য আবেদন জানান। যদিও এসব বিদেশ ভ্রমণের কথা প্রায় সবাই জানে (ওপেন সিক্রেট)। অধিকাংশ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে মুখ খুলতে নারাজ। মাদ্রাসায় পাঁচ ধরনের তহবিল আছে। সাধারণ তহবিল, লিল্লাহ (দরিদ্র) তহবিল, বই বা পুস্তক তহবিল, ভবন ও মসজিদ নির্মাণ বা মেরামত তহবিল (যদি কোনো মাদ্রাসা মসজিদ সংলগ্ন হয়)। সাধারণ তহবিলের অর্থ সমাজের বিভিন্ন উৎস থেকে আসে, বিভিন্ন ব্যক্তির নিয়মিত অর্থায়ন, শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তি, টিউশন, অন্যান্য ফি হতে আয়, ওয়াকফ সম্পত্তি (যেমনঃ জমি, দোকান এবং ঘরবাড়ী) হতে আয়। এ তহবিলের অর্থ সাধারণত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় যেমন, শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ব্যবহার বিল, শিক্ষণ সামগ্রী এবং স্টেশনারি ক্রয়, মহার্ঘ ভাতা, যোগাযোগ ও যানবাহন খরচ, এবং অন্যান্য খরচ।

'লিল্লাহ তহবিলের অন্য নাম 'গরিবা তহবিল' এবং এ তহবিলের অর্থ শুধুমাত্র দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করা হয়। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় না। লিল্লাহ তহবিলের অর্থ প্রধানত যাকাত, ফিতরা, মানত, এবং বিশেষভাবে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য অন্নদানের মাধ্যমে আসে। মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদ খুব সাধারণ ব্যাপার এবং অনেক স্থানে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এসব মসজিদ নির্মিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ তহবিলের

একটি অংশ বরাদ্দ রাখে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি আসে এলাকাবাসী থেকে। মাদ্রাসা বা মসজিদের প্রয়োজনে বিশেষ সময়েও ব্যক্তি এবং সমাজের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকার থেকে সরাসরি কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে না। কিন্তু বেশ কিছু মাদ্রাসা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং ঐ এলাকার সংসদ সদস্যের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেটের অর্থ গ্রহণ করে থাকে। জাতীয় বাজেটের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ADP) থেকে বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে, যা স্থানীয় সরকার এবং সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ব্যয় হয়। জানা যায়, সংসদ সদস্যরা এসব মাদ্রাসায় অবকাঠামোগত উন্নয়নে তহবিল বরাদ্দ করেন।

'পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যক্তিগত অনুদানের উৎস হল যাকাত, ফিতরা, সাদকা, এবং মানত। এটি কেবল দরিদ্র, এতিম এবং অভাবগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করা হয়। ধর্মীয়ভাবেও এটি স্পষ্ট। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– বাস্তবে যখন মাদ্রাসাগুলোর অন্য কোনো জরুরি উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন তারা একটি সুনিপুন উপায় বের করে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ তহবিল হতে কিছু দরিদ্র ছাত্রকে শর্তের ভিত্তিতে প্রদান করে। শর্ত হলো শিক্ষার্থীকে এ অর্থ দ্রুত ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ হাদিয়া (উপহার) রূপে অনুদান ফেরত দিতে হবে। এরপর মাদ্রাসা এ অর্থ খরচ করতে পারে।'[৩২]

কওমি শিক্ষা সংস্কার, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা সম্পর্কে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের বক্তব্য

হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ১ হাজার মাদ্রাসায় তদন্ত করতে গিয়ে গণকমিশনের প্রতিনিধিরা ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছেন। হেফাজত প্রভাবিত হলেও কওমি মাদ্রাসার ৮০ ভাগ ছাত্র-শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় সংগীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মাদ্রাসার শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্র-শিক্ষক কওমি পাঠ্যসূচির সংস্কার চান। নিম্নোক্ত যে দশজন শিক্ষকের বক্তব্য প্রকাশ করা হল তারা হলেন–

১. মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী, সাবেক শিক্ষক, আল-জামিয়া আজিজুল উলুম বাবু নগর মাদ্রাসা, বর্তমান শিক্ষক, জামিয়া ইসলামীয়া জামিরিয়া কাশেমুল উলুম পটিয়া, চট্টগ্রাম। খতীব ঃ ফটিকছড়ি উপজেলা থানা গায়েবী জামে মসজিদ।
২. মাওলানা কবীর আহমদ, পরিচালক, জামিয়া ইসলামীয়া আশরাফুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, ফরিদপুর, কেন্দ্রীয় সদস্য, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, সাবেক শিক্ষা পরিচালক, চট্টগ্রাম রেলওয়ে, (পাহাড়তলী) কওমি মাদ্রাসা, লেখক, প্রবন্ধকার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

৪. মাওলানা আবদুস ছাত্তার, কেন্দ্রীয় সদস্য হেফাজতে ইসলাম, পরিচালক, বরকল মাদ্রাসা আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
৫. মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী, পরিচালক জামিয়া হেমায়াতুল ইসলাম পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম, সভাপতি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা হেফাজত।
৬. মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব, পরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল, কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।
৭. মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী, পরিচালক, জামিয়া রহমানিয়া, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।
৮. মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান, পরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া মারকাযুল উলুম মাদ্রাসা, খুলনা, কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক, হেফাজতে ইসলাম।
৯. মাওলানা দৌলত আলী খান, লেখক, কলামিষ্ট ও শিক্ষক, আল জামিয়াতুল ইসলামীয়া নছিরুল ইসলাম, (নাজির হাট বড়) মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।
১০. মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী, পরিচালক, মাদ্রাসায়ে নূরে মদিনা, বড় গ্রাম কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
১১. মুফতি মোহাম্মদ ইকবাল, শিক্ষক, বাবুনগর আজিজুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১২. মাওলানা জাহেদ আহমদ, শিক্ষক, মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, গোল্টা বাজার বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
১৩. মাওলানা ইলিয়াছ আহমদ, পরিচালক, তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
১৪. মাওলানা হাসান ফারুকী, শিক্ষক, সুড়িকান্দী জামেউল উলুম মাদ্রাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ কওমি পাঠসূচীর (সিলেবাস) পরিবর্তন চাই। কিন্তু আমূল পরিবর্তন নয়। পুরাতন এমন কিছু বিষয় রয়েছে কওমি পাঠসূচীতে যা আমাদের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। সে সব বিষয় বাদ দিয়ে বাংলা-ইংরেজীর সমন্বয়ে আধুনিক কিছু বিষয় সংযোজন করে নতুন ভাবে সিলেবাস প্রণয়ন করার মত রয়েছে আমার।

মাওলানা কবীর আহমদ ঃ এই সিলেবাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মুরব্বিদের (প্রবীণ) পরামর্শক্রমে এই সিলেবাস শত বছর ধরে বহাল রয়েছে। তবুও কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি পরিবর্তন হয়েছে এবং আরো কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ঃ কিছু সংস্কারের দরকার রয়েছে। বাংলা-ইংরেজীর আরও সংযোজন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় উর্দু-ফার্সি বাদ দিতে হবে। স্বীকৃতির বিষয়ে আমরা অনেক দিন হতে বলে আসছি। এখন কথা হলো কোনো

ধরনের শিক্ষা সিলেবাসের ভিত্তিতে সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে সেটা দেখার বিষয়। আমার মত হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে।

মাওলানা আবদুস ছাত্তার ঃ সিলেবাস পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না। এই সিলেবাস শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রঃ) সিলেবাস। এই সিলেবাস দেওবন্দি সিলেবাস। এটা হাটহাজারীর সিলেবাস। সুতরাং এটার পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখছি না।

মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী ঃ কওমি শিক্ষার সংস্কার চাই আমি। আমি খতীবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং সুলতান যওক নদভীর অনুসারী। শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে খতীবে আজমের লিখিত উর্দু গ্রন্থ এবং সুলতান যওক নদভীর 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ডাক' শিরোনামে গ্রন্থগুলো আমি প্রকাশ করেছি।

এই গ্রন্থগুলোতে তারা (২০/৫০ বছর পূর্বে) বলেছিলেন বর্তমান কওমিতে যে শিক্ষা সিলেবাস রয়েছে তার মধ্য থেকে উর্দু-ফার্সি কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে বাংলা-ইংরেজি বাধ্যতামূলক করতে হবে। বর্তমান কওমি মাদ্রাসায় যে শিক্ষা সিলেবাস রয়েছে তা জাতির কোন কাজে আসবে না। এমনকি নিজেরও কোন কাজে আসবে না। আমরা অনেক বছর ধরে সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে আসছি। কিন্তু আমাদের পুরাতন মডেলের আলেমরা তা বুঝতেছেন না। জমিরিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া মাদ্রাসা, দারুল মা'আরিফ মাদ্রাসা এবং আমার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসহ আরো হাজার মাদ্রাসা রয়েছে যারা আমাদের মত কওমি শিক্ষা সিলেবাস সংস্কার চায়। আমি নিজেই আমার মাদ্রাসায় প্রচলিত হাটহাজারীর সিলেবাস গ্রহণ করিনি। আমার মাদ্রাসায় বর্তমান নতুন আধুনিক সিলেবাসে পাঠদান করে চলেছি।

মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব ঃ কওমি শিক্ষা সিলেবাস সংস্কারের পক্ষে একমত আমার। কিন্তু সেটা আমাদের নিয়মে হতে হবে।

মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী ঃ কওমি পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই কিছু আধুনিক বিষয়ঃ যেমন বাংলা-ইংরেজী সংযোজন করা যেতে পারে কিন্তু বিয়োজন করা যাবে না।

মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান ঃ কওমি মাদ্রাসার যুগোপযোগী সংস্কার আমরা চাই। কিন্তু যেন আমাদের কওমি মাদ্রাসার মূল ভিত্তি দারুল উলুম দেওবন্দের মূল সিলেবাস ধ্বংস না হয়ে যায়।

মাওলানা দৌলত আলী খান ঃ কওমি সিলেবাস সংস্কার করতে হবে। এমন অনেক কিতাব (বই) রয়েছে কওমি পুরানো এই সিলেবাসে, যার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যেমন– উর্দু, ফার্সির কিতাবগুলো প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ক্লাসে আরো অনেক কিতাব আছে যা ছাত্ররা বোঝে না। এই সিলেবাসে বাংলা-ইংরেজির সমন্বয় করে, অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়ে কওমি সিলেবাস সংস্কার করে সনদের স্বীকৃতি নিতে হবে।

মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী ঃ কিছুটা সংস্কার চাই কওমি শিক্ষা সিলেবাসের। যেখানে থাকবে বাংলা-ইংরেজি এবং যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা যেমন কম্পিউটার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না কওমি মাদ্রাসায়। সে বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং উত্তোলন করতে হবে। কোনো মাদ্রাসায় যদি বাংলাদেশের প্রতীক জাতীয় পতাকা না তোলা হয় তাহলে সরকারের পক্ষে হতে বাধ্য করতে হবে যেন অবশ্যই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে আমাদের কিছু অভিযোগ রয়েছে।

মাওলানা কবীর আহমদ ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে কি না করলেও কি! এখানে লাভ ক্ষতির কিছু দেখছি না। সরকার যদি বাধ্য করে তাহলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। জাতীয় সংগীত তো গাওয়াই যাবে না। কারণ সংগীত গাওয়া নাজায়েজ।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা নেই। কিন্তু জাতীয় সংগীত গাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে।

মাওলানা আবদুস ছাত্তার ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে আকাবিরে দ্বীন যদি বলেন (হাটহাজারীর মুরব্বিরা) তাহলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। তবে মাঝে মধ্যে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। জাতীয় সংগীত গাওয়া হারাম। এই সংগীত হিন্দুদের সংগীত। দ্বীনি মাদ্রাসায় এই জাতীয় সংগীত গাওয়া জায়েজ নয়।

মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী ঃ জাতীয় পতাকা তুলতেই হবে। আর যদি না তুলে সেটা অপরাধ। যদি কোন মাদ্রাসা সেই অপরাধ করে থাকে সেটা সরকারের দায়িত্ব অবহেলার কারণে হয়েছে বলে আমি মনে করি। সরকারকে বাধ্য করতে হবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে। না হয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জাতীয় সংগীত গাওয়ার পক্ষে না।

মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব ঃ জাতীয় পতাকা হলো এই দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। তাই আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে এবং পতাকা তোলা মানে হলো স্বাধীনতার পক্ষে মত দেয়া। স্বাধীন দেশের স্বীকৃতির জন্য জাতীয় পতাকা তুলতেই হবে। জাতীয় সংগীত এর বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে যা আজ আমি বলতে পারছি না সময়ের অভাবের কারণে।

মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা কোথায়? অবশ্যই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কিন্তু জাতীয় সংগীত গাওয়া যাবে না। কারণ ইসলাম ধর্ম গান-বাদ্যকে বৈধতা দেয়নি।

মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে আমার মনে হয় না কোন অসুবিধা আছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে কারণ এই পতাকাটা আমার স্বাধীন দেশের প্রতীক। জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের অভিযোগ রয়েছে। তাই জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে আমিও দ্বিমত পোষণ করছি।

মাওলানা দৌলত আলী খান ঃ জাতীয় পতাকা অবশ্যই তুলতে হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা মানে হচ্ছে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে কওমি

আলেম-ওলামারা দ্বিমত পোষণ করেন। আমার নিজের মত হলো, জাতীয় সংগীত গাইলে কোনো সমস্যা দেখছি না। আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে।

মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী ঃ জাতীয় পতাকা মাঝে মাঝে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু আমি চাই প্রত্যেক দিবসে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে যেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত গাইলে তেমন বেশি অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয় সংগীত নিয়ে আমাদের কওমি আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পাঠসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা এবং পাঠদান বিষয়ে আপনার মতামত?

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এর ব্যবস্থা করে কওমি সিলেবাসে সংযুক্তি করে সরকারকে পাঠদানের বাধ্য করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের খুব বেশি জানা প্রয়োজন এবং জানতে হবে। এদেশের নাগরিক হলে এদেশ সম্পর্কে জানা থাকা অবশ্যই একজন ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের অধিকার। জাতীয় সংগীত গাওয়ার বিপক্ষে।

মাওলানা কবীর আহমদ ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো দোষের কিছু না। আমাদের মুরব্বিরা যদি বলেন এবং সরকার যদি বাধ্য করেন তাহলে পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা হবে।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ঃ পাঠ্যসূচীতে সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করে অবশ্যই পাঠদান করানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মাওলানা আবদুস ছাত্তার ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের মাদ্রাসায় রয়েছে। আমাদের মাদ্রাসায় ইসলামের (যুদ্ধের) ইতিহাস পড়ানো হয় বেশি। এটা তো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে ইসলামের ইতিহাস বেশি থাকা দরকার।

মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস না থাকাটা সরকারের অপরাধ। আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কোনটা রাখবো কোনটা সঠিক মনে করবো? সরকার যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেন এবং বাধ্য করেন আমার মনে হয় কওমিরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তাদের পাঠ্যসূচীতে সংযোজন করবেন এবং পাঠদান করাবেন।

মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা হলেন এদেশের কৃতি সন্তান। নবী-সাহাবাদের যুগে যারা বদরের যুদ্ধ করেছেন তারা যেমন মুক্তিযোদ্ধা; তেমনি ভাবে এদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন তারাও একই যোদ্ধা। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা হলো ওহুদ এবং বদরের যুদ্ধের সাহাবাদের মত। কিন্তু আমাদের একটা দাবি থাকবে মুক্তিযোদ্ধারা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা না বলেন। পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন চাই।

মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী ঃ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করা দরকার।

মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আমার মত এটা সংযোজন করা হোক।

মাওলানা দৌলত আলী খান ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। বাধ্য করতে হবে যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয়।

মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী ঃ পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা চাই এবং করতেই হবে।

প্রশ্ন ঃ কওমি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান পায় না, আপনি কী বলবেন?

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ ছাত্রদের শিক্ষা শেষে কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ এবং মকতব ছাড়া আর কোনো কর্মসংস্থান নেই, এটা সঠিক না।

মাওলানা কবীর আহমদ ঃ ওলামায়ে দেওবন্দের ছাত্ররা শিক্ষার্জন করেন চাকরির জন্য নয়। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। তাই সরকারি চাকরি পেলেও কি না পেলেও কি? আমাদের চাকরির দরকার নেই আমরা চাই ইসলামের খেদমত করতে।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ঃ ছাত্রদের শিক্ষা শেষে কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ এবং মকতব ছাড়া আর কোন কর্মসংস্থান নেই। তাই কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দিলে সে সমস্যাটা দূর হবে বলে আমি মনে করি।

মাওলানা আবদুস ছাত্তার ঃ মাদ্রাসার ছাত্ররা শিক্ষাজীবন শেষে সরকারি চাকরি করবে কেন? তারা ধর্মীয় শিক্ষার্জন করে– মাদ্রাসা, মসজিদে দ্বীনের খেদমত করবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমার জানা মতে কওমি মাদ্রাসার কোনো ছাত্র বেকার নেই ।

মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী ঃ কর্মসংস্থানের জন্যই তো আমরা কওমি সনদের স্বীকৃতি চাই। কওমি ছাত্ররা অনেক মেধাবী। তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পেলে সব জায়গাতেই সফল হবে। আমি চাই সরকার কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিক এবং ছাত্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক।

মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব ঃ ছাত্রদের চাকরির ব্যবস্থা রয়েছে মোটামুটি। নুরানী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় ছাত্ররা চাকরি করেন। কওমিতে যারা লেখাপড়া করেন তারা তো চাকরির জন্য লেখাপড়া করেন না। তবুও চাকরির দরকার পড়ে।

মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী ঃ মসজিদ মাদ্রাসায় চাকুরী এটাও একটা কর্মসংস্থান।

মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান ঃ কওমি ছাত্ররা শিক্ষা শেষে বেকার থাকে না। সনদের স্বীকৃতি হলে তো অবশ্যই সরকারি চাকরি করা যায়।

মাওলানা দৌলত আলী খান ঃ আসলে চাকরি পাই, কিন্তু সেটা মসজিদ-মাদ্রাসার চাকরি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন সরকারি চাকরি করার সুযোগ থাকে না। কারণ তাদের কোন সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত সনদ নেই। একসময় আমার মত কিছু কিছু ছাত্ররা কওমি মাদ্রাসায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আলিয়া মাদ্রাসার ফরম পূরণ করে পরীক্ষা দিত। আমিও দিয়েছি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছি। আমরা চাইলে চাকরি করতে পারবো।

মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী ঃ হাজার হাজার কওমি শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করে বেকার রয়েছে। টিউশনি, ইমামতি, মুয়াজ্জিন এবং কওমি নুরানী মাদ্রাসা ছাড়া আর কোন চাকরির ব্যবস্থা নেই এই ছাত্রদের।

প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরির কারখানা হিসেবে অনেকের অভিযোগ রয়েছে আপনি কী বলবেন?

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ কথাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কওমি মাদ্রাসা আগেও জঙ্গির কারখানা ছিল না এখনো নেই ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ এটি একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। ইসলাম শান্তির ধর্ম এখানে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়। মারামারি খুনো-খুনির শিক্ষা ইসলাম কখনো দেয়নি।

মাওলানা কবীর আহমদ ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না।

মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না। এসব মাদ্রাসায় ইসলামের জন্য মুজাহিদ তৈরি হয়। যারা ইসলাম রক্ষার আন্দোলনে সব সময় কাজ করে চলেছেন। যেসব জঙ্গি ইসলামের নামে মানুষ হত্যাসহ জঘন্য কাজ করে চলেছে তারা ইসলামের শত্রু। তাদের কারণে কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক নয়।

মাওলানা আবদুস ছাত্তার ঃ কওমি মাদ্রাসায় কোন জঙ্গিবাদী আস্তানা নেই। এখানে জঙ্গি তৈরি হয় না, এখানে ইসলামের সৈনিক (মুজাহিদ) তৈরি হয়। জঙ্গি তৈরির কথা বলে অপবাদ দেওয়াটা ঠিক না।

মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী ঃ জঙ্গি আস্তানা বলাটা অন্যায় কাজ। এখানে কোন জঙ্গিবাদী কার্যক্রম হয় না। এখানে দ্বীনি শিক্ষা পাঠদান করা হয়।

মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না, এখানে দ্বীনের জন্য মুজাহিদ তৈরি হয়। কিছু কিছু কওমি পড়ুয়া যেমন, হাফেজ ইয়াহইয়া, শেখ ফরিদ মুফতি হান্নানসহ যারা জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন তারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকজন এরকম হতেই পারে। স্কুল-কলেজে কি সন্ত্রাসী-জঙ্গি নেই?

মাওলানা আবদুল জাব্বার জিহাদী ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না। আমরাও বলি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরির কারখানা নয়। বরং স্কুল, কলেজে গিয়ে দেখুন সেখানে জঙ্গি সন্ত্রাসী তৈরি হয় কিনা।

মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান ঃ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আস্তানা নয়। এই মাদ্রাসা কোরআন হাদিস এর শিক্ষা দেয়। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামে মারামারি নেই। যদিও যে সব কওমি শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছেন/হচ্ছেন তারা পথভ্রষ্ট। যেমন মুফতি হান্নান, শেখ ফরিদ, হাফেজ ইয়াহিয়াসহ আরো অনেকে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

মাওলানা দৌলত আলী খান ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি আস্তানা অভিযোগটা একটা অপবাদ। এখানে জঙ্গি তৈরি হয় না। ইসলাম রক্ষার মুজাহিদ তৈরি হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম,

ইসলামে হানাহানি নেই। কিন্তু যখন কাফের বেদীনরা ইসলাম ধ্বংস করবার জন্য মাদ্রাসা-মসজিদে হামলা করবে তখন ইসলামের মুজাহিদরা বসে থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

মাওলানা আব্দুর রহমান বেতাগী ঃ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গিদের আস্তানা নয়। এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

ছাত্রদের বক্তব্য

হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ১ হাজার মাদ্রাসায় তদন্ত করতে গিয়ে গণকমিশনের প্রতিনিধিরা ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছেন। হেফাজত প্রভাবিত হলেও কওমি মাদ্রাসার ৮০ ভাগ ছাত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় সংগীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মাদ্রাসার শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্র পাঠ্যসূচির সংস্কার চায়। নিম্নে কয়েকজন ছাত্রের বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

আল জামিয়া নছিরুল ইসলাম নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার (জামাতে কামেলাইন) এর ছাত্র মুহাম্মদ সেলিম, পিতাঃ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, গ্রামঃ দাঁতমারা, থানাঃ ভূজপুর, জেলাঃ চট্টগ্রাম।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে নছিরুল বলেন– 'বর্তমান কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন মনে করি। এ শিক্ষা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি। যত দ্রুত সম্ভব সরকারের নিকট দাবি– এ শিক্ষাকে পরিবর্তন করে আধুনিকায়ন করা হোক।'

কওমি সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে জানতে চাইলে আল জামিয়া নছিরুল ইসলাম নাজিরহাট বড় মাদ্রাসার (জামাতে কামেলাইন) এর ছাত্র মুহাম্মদ সেলিম বলেন, 'আমাদের কওমি শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় আমরা আজকে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও শিক্ষা শেষে সেই শিক্ষার কোন মূল্যায়ন করা হয় না স্বীকৃতি না থাকার কারণে। কওমি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস না থাকা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যে দেশের নাগরিক বলে দাবি করি, সেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে দেশপ্রেম আমাদের কার্যক্রমে প্রকাশ পায় না। আমি মনে করি, পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।'

মুহম্মদ সেলিম জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের শিক্ষকগণ জাতীয় সংগীত গাওয়া হারাম মনে করেন তাই আমি জাতীয় সংগীত গাওয়ার পক্ষে নই।'

তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'জাতীয় পতাকা হচ্ছে এই দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন মানে স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা। পতাকা একটি দেশের পরিচিতি বহন করে। সুতরাং আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে শতভাগ মত পোষণ করি।'

আল-জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়া মাদ্রাসার ২০১২ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল) এর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল মুবিন, পিতাঃ

মুহাম্মদ ইউছুফ, গ্রামঃ কোদালা ধোপাঘাট, থানাঃ রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে বলেন, 'কওমি শিক্ষা সংস্কার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিছুটা সংস্কার আমাদের পটিয়া মাদ্রাসায় হয়েছে। তা কিন্তু খুব বেশি না। আরো ব্যাপক হারে পরিবর্তন এনে যুগোপযোগী করতে হবে। কওমি মাদ্রাসার সার্বিক বিষয়ে বলেন– আমি এখানে দু'একটা বিষয় খুব সমস্যা বলে মনে করি, তা হলো আমাদের থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ছাত্রদের ফ্লোরে ঘুমানো এবং ছাত্রদের ডাল ভাত আর শিক্ষকদের মাছ-মাংস এসব আমার ভালো মনে হয় না।'

মোহাম্মদ আব্দুল মুবিন কওমি মাদ্রাসার পাঠসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা যে দেশের নাগরিক সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের সাঠিক ইতিহাস অবশ্যই থাকতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি বলে মনে করি। জাতীয় সংগীত গাওয়ার বিষয়ে বলেন, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের একটি জনপ্রিয় গানকে সরকারিভাবে জাতীয় সংগীত ঘোষণা করেছে বিধায় আমাদের উচিত জাতীয় সংগীত গাওয়া। জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর পতাকা হচ্ছে তার একটি অনন্য প্রতীক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে।'

আল-জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমূল উলূম চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন চারিয়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস আলী বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক পুরনো। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় করা সময়ের চাহিদা। শত বছর আগের এই শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করা অনেক আগেই দরকার ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সংস্কারতো দূরে থাক; সংস্কারের কথা বললেই অনেকের গায়ে জ্বালা শুরু হয়।

'কওমি পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার কোন রকম সুযোগ নেই। আমি সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, এ-বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এটা ভাবতেও অবাক লাগে যে, একটি স্বাধীন দেশে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা বিদ্যমান। সুতরাং আমি মনে করি, কওমি শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা ঠিক নয়। এখনি এ-শিক্ষা সংস্কার করে যুগোপযোগী ও আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমি জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে।'

আল-জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসা ফটিকছড়ির ছাত্র হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলেন, 'যুগ যুগ ধরে যেভাবে কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে আধুনিক সমাজে মানানসই নয়। কেননা কওমি মাদ্রাসার হাল হকিকত অত্যন্ত নাজুক। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া এবং শিক্ষার কোন মানসম্মত পরিবেশ বলতে কিছু নেই। শিক্ষা সংস্কারের বিষয়ে বলেন– কওমি শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। উর্দু, ফার্সি ও আরবি ছাড়াও মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা পাঠদানের ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা

মাতৃভাষায় অনেক দুর্বল। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করে দেশ ও সমাজের কোনো উপকার হচ্ছে না। মাদ্রাসা-মসজিদ ছাড়া কোথাও চাকরির কোন বন্দোবস্ত নেই।

'এক কথায় বলতে গেলে, কওমি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সংযোজন করা খুবই প্রয়োজন।' জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বলেন, 'আসলে আমি নিজেও জানি না কেন আমাদের কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। আমি মনে করি না জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা রয়েছে। আমি অবশ্যই এ অবস্থার পরিবর্তন চাই।'

আল-জামিয়া ইসলামিয়া জামিরিয়া কাসেমূল উলূম, পটিয়া, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ২০১২ শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল) এর ছাত্র হাফেজ আজগর হোসাইন (রাজী) বলেন, 'কওমি এ শিক্ষা শত বছর পুরনো। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সময়ের দাবি। এটা শুধু আমার দাবি নয়, এই শিক্ষা সংস্কার করা কওমির ৮৫% ছাত্রের দাবি। এ দাবি হযরত খতিবে আজম সিদ্দিক আহমদ সাহেব অনেক বছর আগে রেখে গেছেন। আমাদের এ পটিয়া মাদ্রাসার সাবেক মহাপরিচালক মরহুম হারুণ ইসলামাবাদী এ শিক্ষা সংস্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি শুরু করলেও পরিপূর্ণতা দিয়ে যেতে পারেননি। এটা দুঃখের বিষয়। এই পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সিলেবাস গঠন করা খুব দরকার বলে মনে করি।'

কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আসলে আমাদের এখানে বিশেষ দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় কিন্তু প্রত্যেকদিন উঠানো হয় না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলতে কিছুই আমাদের সিলেবাসে নেই। অথচ আমরা অনেকবার শুনেছি। আমাদের শিক্ষকরা গর্ব করে বলেন, পটিয়া মাদ্রাসায় নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান এসেছিলেন। এটা যদি গর্ববোধের হয়, তাহলে আমার অভিযোগ কেন কওমি সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকবে না? শুধু সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়, এই কওমি সিলেবাসে বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, ইংরেজি, অংক সহ সব বিষয়ে আমাদের জানা থাকা দরকার। আমরা এদেশের নাগরিক হয়েও অনেক পিছিয়ে পড়েছি। দেশ ও দশের কোন কাজে আসতে পারছি না। সুতরাং আমি চাই, হুসাইন আহমদ মাদানী, খতিবে আজম সিদ্দিক আহমদ, সামশুল হক ফরিদপুরী সহ যারা কওমি সংস্কার এবং সিলেবাসের পরিবর্তন চেয়েছেন, তাদের অসম্পূর্ণ কাজকে বর্তমানে আমাদের মুরুব্বি যারা আছেন, দলাদলি না করে সংস্কার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।'

জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কাজির বাজার, সিলেট, জামাতে উলা (ফাজিল)-এর ছাত্র সুহেল আহমদ, পিতা: আব্দুস সুবহান, গ্রাম: লামাশ্যামপুর, থানা: জৈন্তাপুর, জেলা: সিলেট। সুহেল আহমদ বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন আগের। কওমি শিক্ষা সিলেবাসে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোজন করা দরকার। কওমি সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কওমি মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় না। কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয় না, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। আমি জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে।'

আল-জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, দাওরায়ে হাদিস-এর ছাত্র মোশাররফ হুসাইন, পিতা: আব্দুল খালেক মুন্সী, গ্রাম: সাতবাড়ীয়া মুন্সী বাড়ি, থানা: চান্দিনা, জেলা: কুমিল্লা। মোশাররফ হুসাইন বলেন, 'শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে, আমি কওমি শিক্ষার সংস্কার চাই। যে উদ্দেশ্যে এ-কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত তা যেন হারিয়ে না যায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কওমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় না। পড়ানো উচিৎ বলে মনে করি আমি। জাতীয় কোন দিবসে কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।'

আল-জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দাওরায়ে হাদিস-এর ছাত্র মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, পিতা হানিফ সরদার, গ্রাম সিতারখীল পাহাড়িয়া পাড়া, থানা চকরিয়া, জেলা কক্সবাজার। মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল বলেন, 'আমি আমার ছাত্রজীবনে অনেক কিতাব বুঝিনি। সুতরাং আমি চাই কিছু কিতাব পরিবর্তন অপরিহার্য। আমি বুঝিনি তা না, আমার মত অনেক ছাত্র আছে তারা আদৌ ঐ কিতাবের প্রয়োজন আছে মনে করেন না। শিক্ষা সিলেবাস সংস্কার করা বাধ্যতামূলক, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের জানা থাকা ভালো, না হয় আমরা এ দেশের নাগরিক হলাম কিভাবে। জাতীয় সংগীত আমি সমর্থন করি না, কিন্তু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা প্রয়োজন– এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কওমি মাদ্রাসায় সরকারি অনেক নিয়মনীতি পালন করা হয় না।'

জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহ জালাল, সদর সিলেট, দাওরায়ে হাদিস-এর ছাত্র মো. জহিরুল ইসলাম, পিতা: মস্তাজ আলী, গ্রাম: বাঁশতলা, থানা: দোয়ারা বাজার, জেলা: সুনামগঞ্জ। মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সম্পূর্ণ সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। কওমি সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। আরবী, উর্দুর পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠ দানে গুরুত্ব দিতে হবে। ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান সিলেবাসে সংযোজন করতে হবে। কওমি মাদ্রাসা থেকে রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে ভাল হয়।'

আল-জামিয়া এমদাদুল ইসলাম কাজির হাট মাদ্রাসা ভুজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, জামাতে কামেলাইন (ফাজিল ১ম বর্ষ)- এর ছাত্র মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন বলেন, 'আমার মতে কিছুটা সংস্কার প্রয়োজন। যদি আমাদের নেতারা ভালো মনে করেন তাহলে তারা সংস্কার করবেন। সংস্কারের কথা বলেই বা কি লাভ? মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তো আমাদের জানা দরকার। কওমি সিলেবাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি। জাতীয় সংগীত কেন গাইবো? এটা তো একটা গান মাত্র। আমরা কোরাণ হাদিস শিক্ষা করি, গান বাদ্য নয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদানিয়া শোলকবহর মাদ্রাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম জামাতে উলা (দাখিল ১ম বর্ষ)-এর ছাত্র মাহমুদুল হাসান বলেন, 'সিলেবাসে মায়ের ভাষা বাংলা নাই, আন্তজার্তিক ভাষা ইংরেজি নেই। হিসাব নিকাশের বেলায় যে জিনিসটা খুব বেশি দরকার সে অংক। যা আছে অল্প, তা দিয়ে কি হয়? অভিযোগ করতে গেলে অনেক। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানি না। এটা খুর লজ্জার বিষয়। জাতীয় পতাকা বিশেষ দিবস ছাড়া উঠানোই হয় না।'

জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল মাআরিফ চাঁদগাও, চট্টগ্রাম দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল/টাইটেল)-এর ছাত্র মুহাম্মদ নেজামউদ্দীন বলেন, 'কওমি শিক্ষা সংস্কার এটা শুধু আমার দাবি নয়। এ সংস্কার বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্রের প্রাণের দাবি। এ দাবির জন্য আমাদের অত্র মাদ্রাসার মহাপরিচালক সুলতান যওক নদভী সাহেব শিক্ষা সংস্কারের ডাক দিয়েছিলেন, তখন আমার জানামতে উনাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। তিনি তথাকথিত কওমি শিক্ষা সংস্কার করার লক্ষে উজ্জ দারুল মাআরিদ প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের এ-মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষা দান পদ্ধতি চালু আছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সহ আরো কিছু পরিবর্তন করলে আমার মতে ভালো হয়। আমি চাই দারুল মাআরিফের মত প্রত্যেক কওমি মাদ্রাসায় বর্তমান শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন করা হোক।

'শুধু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে মসজিদে ইমামতি করলে কি ইসলামের দায়িত্ব শেষ? রাষ্ট্র পরিচালনা হতে সমাজের প্রত্যেকটি কাজে কওমি আলেম ওলোমা ছাত্র-সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আগের আলেমরা কি করেছিলেন সেটা উদাহরণ দিলে চলবে না। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। অতীব দুঃখের বিষয় আমাদের নেতারা সেটা কানেও নিচ্ছে না। কওমি ওলামাদের দলাদলির কারণে যদি কওমি শিক্ষা সংস্কার এবং সনদের স্বীকৃতি আমরা কওমি ছাত্ররা না পাই; তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আমরা এদেশের নাগরিক বলে দাবি করি তাহলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে আমাদের অসুবিধা কোথায়।'

মজাহেরুল উলুম মাদ্রাসা বাকলিয়া, চট্টগ্রাম জামাতে কামেলাইন-এর ছাত্রঃ (ফাজিল ১ম বর্ষ) মুহাম্মদ আতাউল্লা কুতুবী বলেন, 'সংস্কার বলতে তেমন বেশি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না, কারণ আমাদের কওমি শিক্ষাটা হলো প্রকৃত কোরাণ হাদিসের শিক্ষা এটা যদি বেশি পরিবর্তন হয় তাহলে আমার মনে হয় কওমি স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে নেতারা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে অন্য কথা। আমাদের সনদের স্বীকৃতি তো খুব প্রয়োজন, কারণ সরকারি স্বীকৃতি না থাকলে আমাদের লেখা পড়ার মূল্যায়ন হবে কিভাবে? কওমি সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় সংগীত নয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মধ্যে আমি কোনো অসুবিধা দেখি না।'

আল-জামেয়াতুল ইসলামীয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা, চারিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম- এর ছাত্র মুহাম্মদ শাহাবউদ্দীন বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার বর্তমান সময়ের জন্য কেবল প্রয়োজন নয়, আমি মনে করি ফরজে আইন। বর্তমান প্রচলিত কওমি শিক্ষা

কার্যক্রম পাঠ্যসূচি অতি পুরনো, যুগের সাথে কিছুতেই মিলছে না। যার কারণে আমরা কওমি শিক্ষিতরা খুব পিছিয়ে পড়ছি। শুধু মসজিদ-মাদ্রাসায় চাকরি করা ছাড়া আমাদের কোন সুযোগ নেই। সমাজে আমরা সবার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছি। আমি মনে করি বর্তমানে কওমি পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নতুন নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে।

'কওমি পাঠ্যসূচিতে ইসলামের ইতিহাস যেমন স্থান পাবে ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেও স্থান দিতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মধ্যে আমি মনে করি দেশপ্রেম জড়িত। আশা করি এ ব্যাপারে সরকার ও আমাদের কওমি ওলামায়ে কোরামগণ সজাগ হবেন।'

আল-জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর ছাত্র মুহাম্মদ জাফর আলম, পিতাঃ আবুল মুনছুর, গ্রামঃ মালিয়া পাড়া, জিরি, চট্টগ্রাম। জাফর বলেন, 'কেবল কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার নয়, পুরো কওমি মাদ্রাসার সকল দিক পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। কওমি শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিতাব সমূহের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। যেমন উর্দু, ফার্সি ভাষার বহু কিতাব রয়েছে যেগুলো পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিয়ে আধুনিক বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ তালিকাভুক্ত করা দরকার এসে গেছে মনে করি। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে পড়ার ব্যবস্থা রাখলে আরো ভাল হবে।'

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাহ) মাদ্রাসা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার-এর ছাত্র মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'শিক্ষা সংস্কার ও পরিবেশের পরিবর্তন এমুহূর্তে প্রধান কাজ মনে করি। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার বাবা ও বড় ভাইয়েরা সমাজের কোথাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এটা দেখে আমি খুবই মর্মাহত, যার কারণে আমি চাইবো, এ শিক্ষা শেষে আমার অবস্থা যেন তাদের মত না হয়। সরকার যদি কওমি সনদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করে তাহলে আমরা যারা বর্তমানে লেখা পড়ায় নিয়োজিত রয়েছি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে মনে করি। বিশেষ করে আমার চাওয়া-পাওয়া হলো, বর্তমান কওমি শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেওয়া। আরো একটি বিষয় দেখে খুবই মর্মাহত হই সেটা হল, এখনো আমাদের কওমি মাদ্রাসায় উর্দুর মাধ্যমে পাঠদান দেওয়া হয়। বাংলা হোক আমাদের পাঠদানের প্রধান ও একমাত্র ভাষা।'

আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নছিরুল ইসলাম (নাজিরহাট বড় মাদ্রাসা), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম দাওরায়ে হাদিস (মাষ্টার্স) এর ছাত্র মুহাম্মদ মাহফুজুল করিম (মাসুম) বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে, আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছি, এ-শিক্ষা শত শত বছর পুরনো। আমার জানতে ইচ্ছা হয় দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল। যদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী তখন শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন করা যায়, তাহলে এখন কেন নয়?

'এ দাবির সাথে আমি একমত। আজ আমরা বাঙালী হিসেবে নিজেকে দাবি করি; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা থাকবে না এটা কেমন করে হয়! জাতীয় পতাকা,

জাতীয় সংগীত দুটোই কওমি মাদ্রাসায় থাকা দরকার। কারণ আমরা যেহেতু এ দেশের নাগরিক। যদিও জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে আলেম ওলামাদের দ্বিমত আছে।'

আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া জামিরিয়া কাসেমুল উলুম, পটিয়ার দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল) এর ছাত্র মুহাম্মদ হানিফ বলেন, 'আমি চাই আমাদের বর্তমান সিলেবাস থেকে উর্দু, ফার্সী বাদ দিয়ে তার জায়গায় যেন বাংলা, ইংরেজিকে স্থান দেয়া হয়। এ ছাড়া অনেক বিষয় পরিবর্তন করা যেতে পারে। অবশ্যই প্রশংসনীয় বিষয় হলো পটিয়া মাদ্রাসাসহ কিছু কিছু মাদ্রাসায় কিছুটা সংস্কার করা হয়েছে। আরো সংস্কার ও পরিবর্তনের দরকার, তবেই আমরা উপকৃত হবো। এখন আমরা শিক্ষায় এবং ভাষাগতভাবে সাধারণ শিক্ষা থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। জাতীয় পতাকা উত্তোলনে কেনো সমস্যা আমি দেখি না। আমরা এ দেশের নাগরিক– কওমি বলেন আর যাই বলেন সবাই এ দেশের নাগরিক, সুতরাং কওমিদের উচিৎ হবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তো সবার জানা থাকা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হলে তো, ইতিহাসের বই পড়তে হয়। আমাদের কওমি মাদ্রাসায় সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় না। কওমি সিলেবাস সংস্কারের করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযুক্ত করা অপরিহার্য।'

আল-জামিয়াতুল কুরআনিয়া তালিমুদ্দীন মাদ্রাসা বিবিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম– এর ছাত্র ক্বারী নিজামুদ্দীন বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকা-খাওয়া খুব বেশি সমস্যা, যেমন ফ্লোরে থাকতে হয়। খেতে হয় শুধু ডাল ভাত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন যাপন করতে হয়। এখানে প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ থাকে না। আমি মনে করি, কওমি সিলেবাস সংস্কার প্রয়োজন। যেখানে থাকবে যুগোপযোগী শিক্ষা, থাকবে বাংলা, ইংরেজি, থাকবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। উত্তোলন করতে হবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে অবশ্য আলেমদের দ্বিমত আছে। তবে আমরা অবশ্যই চাইতে পারি আমাদের সনদের সরকারি স্বীকৃতি, যাতে কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা দেশের কাজে আসতে পারে। অন্যথায় স্বীকৃতির কোনো কাজে আসবে বলে আমার মনে হয় না।'

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ২১ মে ২০১৫
২. অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতে, দেশে ২৬ থেকে ২৮ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। (দৈনিক কালের কণ্ঠ : ৮-৪-১৫)
৩. অধ্যাপক আবুল বারকাত, 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি ঃ উৎস, বিকাশ ও প্রভাব', প্রকাশকাল ২০০৮
৪. ২০১৭ সালের ১৭ এপ্রিল দৈনিক সমকাল
৫. শিক্ষা গবেষক ও লেখক সিদ্দিকুর রহমান খান লিখিত 'কওমি মাদ্রাসা : একটি অসমাপ্ত প্রকাশনা
৬. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৫ নভেম্বর ২০১৬
৭. বাংলানিউজ২৪.কম, ৪ মে ২০১২
৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ এপ্রিল ২০১২
৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩ অক্টোবর ২০১৯
১০. বিডিনিউজ২৪ ডটকম, ৩০ জুলাই, ২০১৫
১১. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
১২. প্রাগুক্ত
১৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
১৪. বাংলা ট্রিবিউন, ৩ অক্টোবর, ২০১৬
১৫. বাংলা নিউজ২৪ ডটকম, ৯ অক্টোবর, ২০১৬
১৬. বাংলা নিউজ২৪ ডটকম, ১১ এপ্রিল, ২০১৬
১৭. দৈনিক প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
১৮. তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ, লেখক ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব, প্রকাশনা ঃ এদারায়ে এহতেমানি দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত,পৃষ্ঠা ১৫
১৯. তারিখে মাজাহারুল উলুম, লেখক ঃ মাওলানা যাকারিয়া, প্রকাশনা ঃ এশাতুল খুলক সাহারাণপুর, ভারত, পৃষ্ঠা- ৫, ৪২, ৪৩
২০. তাহরিখে দারুল উলুম, লেখক ঃ ড. আল্লামা মুসতাক আহমদ, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ, প্রকাশকাল ঃ ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ ১০১
২১. দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, লেখক ঃ আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, প্রকাশনা ঃ আল আমিন রির্সাচ একাডেমী বাংলাদেশ, প্রকাশকাল - মার্চ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ৫৭-৬০
২২. মাশায়েখে চাঁটগাম, লেখক ঃ মাওলানা শাহ আহমদ হাসান, প্রকাশক ঃ মুফতি নূরুল্লহা, পৃষ্ঠা - ২০
২৩. মাসিক মঈনুল ইসলাম, লেখক ঃ ড. আলী আহমদ (দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম), প্রকাশকাল ঃ মে-জুন ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৬
২৪. মাসিক মঈনুল ইসলাম, লেখক ঃ মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন (আলোর মশাল), দারুল উলুম হাট হাজারী, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮৪
২৫. মাসিক মঈনুল ইসলাম, প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ৫৫
২৬. জামেয়া একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, আল-জামেয়া স্মরণিকা-১২, লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, লালবাগ, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১২
২৭. প্রকাশক: আব্দুল জাব্বার, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান: বেফাক, কওমি মাদ্রাসার রুটিন বোর্ড
২৮. পাঠ্য তালিকা, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড, হবিগঞ্জ
২৯. হাফেজ্জী কাফেলা, প্রকাশনা ঃ জামিয়া নুরিয়া আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, প্রকাশকাল ঃ ২০১২
৩০. হায়াতুল মুছান্নিফীন, লেখক ঃ মাহবুবে এলাহী, প্রকাশনা ঃ আনোয়ার লাইব্রেরি, প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১২
৩১. কওমি মাদ্রাসার কিতাব ও বই সমূহের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য (সিলেবাস), প্রকাশনা ঃ আল-ফাতাহ পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল ঃ ২০১৪
৩২. বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতিঃ উৎস, বিকাশ এবং প্রভাব, লেখক ঃ অধ্যাপক আবুল বারকাত, প্রকাশকাল ঃ ২০০৮

কওমি মাদ্রাসায় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ এবং অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য

১. মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশ
২. হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান, সভাপতি, সম্মিলিত ইসলামী ঐক্যজোট
৩. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৪. মাওলানা এম এ মতিন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট
৫. মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী, যুগ্ম-মহাসচিব, ইসলামী ঐক্যজোট
৬. মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল, গণতান্ত্রিক ইসলামী ঐক্যজোট
৭. মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী, সভাপতি, সর্বদলীয় ওলামা ঐক্য পরিষদ
৮. মাওলানা মসিহোদ্দৌলা, মহাসচিব, ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন কমিটি বাংলাদেশ
৯. মাওলানা এয়াকুব বাদশা, সভাপতি, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলাদেশ
১০. মাওলানা ফোরকান রেজা, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট
১১. মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী, আল্লামা ইকবাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম
১২. মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী, আমির, ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ
১৩. মাওলানা ফোরকান আহমদ, মহাসচিব, মুনিরিয়া যুব তবলীগ কমিটি বাংলাদেশ

১. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? কওমি শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনাদের মতামত জানতে চাই।

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ কওমি সিলেবাস সংস্কার করতে হবে। বিভিন্ন ক্লাসে অনেক কিতাব আছে যা ছাত্ররা বোঝে না। এই সিলেবাসে বাংলা-ইংরেজির সমন্বয় করে অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়ে কওমি সিলেবাস সংস্কার করতে হবে। এর বাইরে এমন অনেক কিতাব (বই) রয়েছে পুরানো এই সিলেবাসে, যার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যেমন: উর্দু, ফার্সির কিতাবগুলোর প্রয়োজন নেই।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ অবশ্যই সংস্কার করতে হবে। পবিত্র কোরাণের সূরা ইব্রাহীমের চার নং আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী মাতৃভাষা কেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত আলিয়া মাদ্রাসার ন্যায় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ কওমি পাঠসূচীর (সিলেবাস) পরিবর্তন আবশ্যক। কওমি শিক্ষা যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি বলে মনে করি। কওমি শিক্ষা একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা। এই শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিতে হলে সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ কওমিতে যে শিক্ষা সিলেবাস রয়েছে তার মধ্য থেকে উর্দু-ফার্সি কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে বাংলা-ইংরেজি বাধ্যতামূলক করতে হবে। বর্তমান

কওমি মাদ্রাসায় যে শিক্ষা সিলেবাস রয়েছে তা জাতির কোনো কাজে আসবে না যদি পরিবর্তন না করে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ কওমি শিক্ষা সিলেবাসের কিছুটা সংস্কার চাই । যেখানে থাকবে বাংলা-ইংরেজি এবং যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা। যেমন- কম্পিউটার ইত্যাদি।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই কিছু আধুনিক বিষয়, যেমন বাংলা-ইংরেজী সংযোজন করা যেতে পারে কিন্তু বিয়োজন করা যাবে না।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ কিছু সংস্কারের দরকার রয়েছে। বাংলা-ইংরেজীর আরও সংযোজন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় উর্দু-ফার্সি বাদ দিতে হবে।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ কওমি শিক্ষা সিলেবাস সংস্কারের পক্ষে একমত আমি। এর দ্রুত বাস্তবায়ন হোক।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ কওমি শিক্ষা সংস্কার জরুরি না শুধু অতীব জরুরি। এই বিষয়টা নিয়ে গত ২০ বছর বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ ও জনসচেতনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এতো বছর পর কিছুটা হলেও কওমি মাদ্রাসার মধ্যে সেই বোধদয় হতে শুরু করেছে, কিছুদিন আগে কওমির শীর্ষ এক মুরুব্বিও সেই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষককে ব্যবসা ও সামাজিক কাজে জড়িত হতে হবে ওতপ্রোতভাবে।'

ব্যবসা হোক আলেমদের কর্মক্ষেত্র, মসজিদ-মাদ্রাসা হোক খেদমতের স্থান। ইমাম আবু হানিফা একজন বিজ্ঞ আলেম ও মাযহাবের ফকীহ ইমাম ছিলেন পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। রাসুল (সা.) এর বহু সাহাবী ব্যবসায়ী, দ্বীনি বড় বড় খেদমতের করার সাথে সাথে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বয়ং রাসুল (সা.) ও ব্যবসা করতেন।

ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য পেশায় না যাওয়ার জন্য দায়ী উলামায়ে কেরামের এককেন্দ্রীক মানসিকতা। আমরা ইচ্ছা করে কিংবা মনের অজান্তে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছি যে, একজন মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র শুধু মাদ্রাসা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিনি করতে হবে। অন্য কোনো কর্মব্যস্ততায় লিপ্ত হওয়া আমাদের জন্য বেমানান কিংবা এক প্রকার নাজায়েয!

দারুল উলূম দেওবন্দের অধিকাংশ উস্তাযের মাদ্রাসার খেদমতের পাশাপাশি হালাল উপার্জনের জন্য আলাদা ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। মাদ্রাসা তাদের খেদমতের স্থান কিন্তু মূল উপার্জনের মাধ্যম ও কর্মক্ষেত্র হলো ব্যবসায়িক কার্যক্রম। সমস্যা হচ্ছে, আমরা এটা থেকে দূরে, বহু দূরে। হীনমন্যতা, সামাজিকতা, লজ্জা ও এককেন্দ্রিকতা আমাদেরকে এমন কঠিনভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে, আমরা এখন চাইলেও নিজেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে নিতে পারি না।

এখন আমার কথা হলো ব্যবসা করতে হলে সেই বিষয়ের উপর জ্ঞান থাকা লাগবে এবং সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পড়ানো লাগবে এবং বাস্তবে তা করে দেখানো লাগবে কিন্তু মাদ্রাসার সিলেবাসে ব্যবসা সংক্রান্ত যে আয়াত রয়েছে "ব্যবসা হালাল, সুদ হারাম"। এখন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সুদের বিষয়টি কিন্তু ব্যবসার বিষয়টি

এড়িয়ে যাচ্ছে। তাই মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে বর্তমান সমাজের মূলধারার সাথে মিলে ব্যবসা করতে পারে না আলেম-ওলামারা। যদিও এখন কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে, তাও নিজ ইচ্ছায়। এককথায় সমাজের মূলধারার সাথে আসতে হলে বা আনতে হলে বর্তমান সিলেবাস পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

মূলতঃ বেশকিছু বিষয়ে সংস্কার করতে হবে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা। কোরাণে ১১৪টি সাবজেক্ট রয়েছে, সেই সাবজেক্টের আলোকে যদি আপনি মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন করেন তাহলে বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিষয়, ব্যবসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংবাদিকতা, ড্রাইভিংসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ানো দরকার হবে। তাছাড়া যেসব মাদ্রাসা জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) লেখা হয় সে সব প্রতিষ্ঠানে সবধরনের সাবজেক্ট সম্পৃক্ত করতে হবে এবং সব ধরনের মাদ্রাসা থেকে জামিয়া লিখা বাদ দিতে হবে। শুধুমাত্র যেসব প্রতিষ্ঠানে সবধরনের বিষয় নিয়ে বিভাগ থাকবে সেসব প্রতিষ্ঠান জামিয়া লিখতে হবে। মাদ্রাসা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি মসজিদ-মাদ্রাসা ইমামতি-শিক্ষকতা ছাড়া আর কোনো কার্যকরী শিক্ষা না থাকায় তারা সমাজের মূলধারার কোনো কাজে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। যদিও আগের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তারপরও অপ্রয়োজনীয় আরো বেশ কিছু সাবজেক্ট বিলুপ্ত করতে হবে। কোরাণ হাদিসের মূল শিক্ষা এবং পাঠদানে আরবি এবং বাংলার সমন্বয় আনতে হবে। তাছাড়া পাঠদানে বাংলার গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কওমী সিলেবাস দেওবন্দি সিলেবাস। এটা হাটহাজারীর সিলেবাস। সুতরাং এটার পরিবর্তনের অবশ্যই দরকার আছে। আধুনিক শিক্ষা সিলেবাসের প্রয়োজন।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ কওমি পাঠসূচীর (সিলেবাস) পরিবর্তন চাই কিন্তু আমূল পরিবর্তন নয়। পুরাতন এমন কিছু বিষয় রয়েছে কওমি পাঠসূচীতে যা আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। সে সব বিষয়কে বাদ দিয়ে বাংলা-ইংরেজীর সমন্বয়ে আধুনিক কিছু বিষয় সংযোজন করে নতুনভাবে সিলেবাস প্রণয়ন করার মত রয়েছে আমার।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ এই সিলেবাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মুরব্বিদের (প্রবীণ) পরামর্শক্রমে এই সিলেবাস শত বছর ধরে বহাল রয়েছে। তবুও কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি পরিবর্তন হয়েছে এবং আরো কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ কওমি মাদ্রাসার যুগোপযোগী সংস্কার আমরা চাই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন কওমি মাদ্রাসার মূল ভিত্তি দারুল উলুম দেওবন্দের মূল সিলেবাস ধ্বংস না হয়ে যায়।

২. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। সে বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ জাতীয় পতাকা তুলতেই হবে। যদি না তুলে সেটা অপরাধ। যদি কোনো মাদ্রাসা সেই অপরাধ করে থাকে সেটা সরকারের দায়িত্ব অবহেলার কারণে হয়েছে বলে আমি মনে করি। সরকার তাদেরকে বাধ্য করবে জাতীয়

পতাকা উত্তোলন করতে। না হয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সংগীত গাইলে তেমন বেশি অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। এর চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ আমরা কওমিরা করে থাকি।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি কওমি মাদ্রাসায় জেলা, উপজেলা, থানা শিক্ষা অফিসারের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করে ইউনিয়ন পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। নোটিশ/সার্কুলেশন জারি করে জেলা, উপজেলা, থানা, শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

যে সকল মাদ্রাসা সরকারের এই নির্দেশনা মানবে না তাদের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে মাদ্রাসাগুলোতে তালা লাগিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশনা যে মাদ্রাসাগুলো মানবে না তাতে পরিস্কার বোঝা যাবে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। ৩০ লক্ষ শহীদদের রক্তে অর্জিত বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য নেই এবং বাংলাদেশকে এখনও তারা মেনে নিতে পারেনি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো আলেম বা নায়েবে রাসূল তৈরি করা। যেমন- মেডিকেল কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন ডাক্তার তৈরি করা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা। মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যমে হাক্কানী আলেম বা প্রকৃত নায়েবে রাসূল তৈরি করা সম্ভবপর হলে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদী দর্শন বিকশিত হবে। এতে সমাজ থেকে উগ্রবাদী চিন্তা চেতনা লোপ পাবে। ফলস্বরূপ সমাজ থেকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী চিন্তা চেতনা বন্ধ হবে। মাদ্রাসাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নজরদারির মধ্যে আনা প্রয়োজন বলে মনে করি। জাতীয় পতাকা এখন উত্তোলন হয় আগের চেয়ে বেশিতবে জাতীয় সংগীতকে তারা যেখানে এখনো মেনে নেয়নি।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা আছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে কারণ এই পতাকাটা আমার স্বাধীন দেশের প্রতীক। জাতীয় সংগীতের ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের অভিযোগ রয়েছে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন বিষয়ে আকাবিরে দ্বীন যদি বলেন (হাটহাজারীর মুরব্বিরা) তাহলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। তবে মাঝে মধ্যে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। জাতীয় সংগীত গাওয়া হারাম বলে গাওয়া হয় না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ জাতীয় পতাকা হলো এই দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। তাই আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে এবং পতাকা তোলা মানে হলো স্বাধীনতার পক্ষে মত দেওয়া। স্বাধীন দেশের স্বীকৃতির জন্য জাতীয় পতাকা তুলতেই হবে। জাতীয় সংগীত এর বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে যা আজ আমি বলতে পারছি না সময়ের অভাবের কারণে। কওমিতে ধীরে ধীরে সবকিছু পাল্টাতে শুরু করছে, এটাও হবে একদিন।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ জাতীয় পতাকা মাঝে মাঝে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু আমি চাই প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক দিবসে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে যেন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত গাইলে তেমন বেশি অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয় সংগীত নিয়ে কওমি আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা নেই কিন্তু জাতীয় সংগীত গাওয়ার ব্যাপারে কওমিতে বাধা রয়েছে। এটা পরিবর্তন করতে হবে।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা কোথায়? অবশ্যই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। জাতীয় সংগীত গাইতেও বাধ্যতা করতে হবে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ জাতীয় পতাকা এখন উত্তোলন হয় আগের চেয়ে বেশি, তবে জাতীয় সংগীতকে তারা যেখানে এখনো মেনে নেয়নি সেখানে পড়বে কিভাবে বলুন? তবে আমার মতামত খালি গলায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে আমি কোনো অসুবিধে দেখছি না। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবার জন্য বাধ্য করা দরকার।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ জাতীয় পতাকা অবশ্যই তুলতে হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা মানে হচ্ছে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে কওমি আলেম-ওলামারা দ্বিমত পোষণ করেন। আমার নিজের মত হলো, জাতীয় সংগীত গাইলে কোনো সমস্যা দেখছি না। আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং উত্তোলন করতে হবে। কোনো মাদ্রাসায় যদি বাংলাদেশের প্রতীক জাতীয় পতাকা না তোলা হয় তাহলে সরকারের পক্ষ হতে বাধ্য করতে হবে যেন অবশ্যই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। জাতীয় সংগীতের বিষয়ে কওমিতে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। তারপরও জাতীয় সংগীত গাইলে তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে লাভ ক্ষতির কিছু দেখছি না। সরকার যদি বাধ্য করে তাহলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না কওমি মাদ্রাসায়।

৩. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা এবং পাঠদান বিষয়ে আপনাদের মতামত কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ পাঠ্যসূচীতে সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করে অবশ্যই পাঠদান করানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ বিজ্ঞান ভিত্তিক, কারিগরি এবং নৈতিক শিক্ষা দান সহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা হলেন এদেশের কৃতি সন্তান। নবী-সাহাবাদের যুগে যারা বদরের যুদ্ধ করেছেন তারা যেমন মুক্তিযোদ্ধা তেমনিভাবে এদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন তারাও একই যোদ্ধা। পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা চাই এবং করতেই হবে।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হলে দেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজনের ব্যবস্থা করা হোক।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো দোষের কিছু না। আমাদের মুরব্বিরা যদি বলেন এবং সরকার যদি বাধ্য করেন তাহলে পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা হবে। এটার বিকল্প নেই।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কওমি মাদ্রাসায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। মাদ্রাসায় ইসলামের (যুদ্ধের) ইতিহাস পড়ানো হয় বেশি। এটা তো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে ইসলামের ইতিহাস বেশি থাকা দরকার।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আমার মতামত হচ্ছে, এটা বাধ্যতামূলক করা হোক।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস না থাকাটা সরকারের অপরাধ। আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কোনটা রাখবো কোনটা সঠিক মনে করবো? সরকার যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেন এবং বাধ্য করেন আমার মনে হয় কওমি মাদ্রাসাগুলো তাদের পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করবেন এবং পাঠদান করাবেন।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ কওমি পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। সে জন্য মাওলানা মাঈন উদ্দিন রুহি সাহেবকে চেয়ারম্যান করে একটি কওমি কমিশন গঠন করেছিলাম। আমি ও হাসান রফিক মিলে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ আলেমের ভাবনা' শিরোনামের ১০০ মিনিটের একটা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছি। তাছাড়া আমি এই বিষয় নিয়ে কয়েকটি দাবিও উপস্থাপন করেছি–

ক. প্রত্যেক কওমি মাদ্রাসার পাশে একটি করে বঙ্গবন্ধু আর্কাইভ নির্মাণ, যেখানে বিকালে ছুটির পরে ছাত্র-ছাত্রীরা উন্মুক্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করবে।

খ. প্রশ্ন-উত্তরে মুক্তিযুদ্ধ নামের পুস্তিকা প্রকাশ করে তা মাদ্রাসায় ফ্রি বিতরণ করা।

গ. বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী ফ্রি বিতরণ

ঘ. যেহেতু গান-বাজনা তারা হারাম হিসেবে জানে তাই তাদের দেখতে অসুবিধা না হয় এমন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে তাদের দেখার সুযোগ তৈরি করা। বিভিন্ন লোকশনে আলেমদের দাওয়াত দিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি মাদ্রাসা সিলেবাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

এসব বিষয় নিয়ে আমি অনেক আলেম-ওলামাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের সহযোগিতা পেয়েছি কিন্তু সরকার-রাষ্ট্র এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাই না বা পাচ্ছি না। যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা চাই এবং করতেই হবে। একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এর ব্যবস্থা করে কওমি সিলেবাসে সংযুক্তি করে সরকারকে পাঠদানের বাধ্য করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের খুব বেশি জানা প্রয়োজন এবং জানতে হবে। এদেশের নাগরিক হলে এদেশ সম্পর্কে জানা থাকা অবশ্যই একজন ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের অধিকার।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসুচীতে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। বাধ্য করতে হবে যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয়।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অবশ্যই সংযোজন করা দরকার।

৪. প্রশ্ন ঃ কওমি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। এর কারণ কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ ছাত্রদের শিক্ষা শেষে কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ এবং মকতব ছাড়া আর কোনো কর্মসংস্থান নেই। কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দিয়েও সে সমস্যাটা দুর হয়নি।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কারিগরি, জাগতিক, মানবিক এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা না থাকার কারণে তাদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জীবন ও কর্মমূখী শিক্ষানীতি গ্রহণ করে মূলধারার কর্মজীবী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ কওমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করে অনেকেই চাকরি পায় কিন্তু সেটা মসজিদ-মাদ্রাসা ভিত্তিক। দাওরায়ে হাদিসের সরকারিভাবে মাস্টার্সের মান দিলেও কওমি শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ ছাত্রদের চাকরির ব্যবস্থা রয়েছে মোটামুটি। নুরানী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় ছাত্ররা চাকরি করেন। কওমিতে যারা লেখাপড়া করেন তারা তো চাকরির জন্য লেখাপড়া করেন না। তবুও চাকরির দরকার পড়ে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলে জাতির জন্য কল্যাণকর হত।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ ওলামায়ে দেওবন্দের ছাত্ররা শিক্ষার্জন করেন চাকরির জন্য নয়, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। তাই সরকারি চাকরি পেলেই কি না পেলেই কি? আমাদের চাকরির দরকার নেই, আমরা চাই ইসলামের খেদমত করতে। সনদের মান দিয়েও কোনো কাজে আসছে না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ মাদ্রাসার ছাত্ররা শিক্ষাজীবন শেষে সরকারি চাকরি করবে কেন? তারা ধর্মীয় শিক্ষার্জন করে— মাদ্রাসা, মসজিদে দ্বীনের খেদমত করবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমার জানা মতে, কওমি মাদ্রাসার কোনো ছাত্র বেকার নেই। তারপরও কর্মমুখী বাস্তব শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ কওমি ছাত্ররা শিক্ষা শেষে বেকার থাকে না। মসজিদ মাদ্রাসায় চাকরি করে। সরকারি চাকরি হয় না।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ ছাত্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ যাদের সিলেবাস কর্মমুখী না, সেই শিক্ষায় কর্মসংস্থান হবে আমি বিশ্বাস করি না। যে সিলেবাসে ১৫ বছর শিক্ষার্জন করে নুরানি মাদ্রাসায় (প্রাইমারি) পড়ানোর জন্য ৪০ দিন প্রশিক্ষণ নিতে হয় সেই শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থান

হবে অন্তত আমি তা বিশ্বাস করি না। আগে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, তারপর কর্মসংস্থান হবে। কর্মমুখী শিক্ষা যেমন, মাদ্রাসা ছাত্রদের সেলাই ও কম্পিউটার, বিজ্ঞানসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা মানুষের অনুদানে চলে এবং সেই অনুদান এবং চাঁদা কালেকশন করার জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। এটা একজন শিক্ষকের জন্য অপমানজনক। তাছাড়া মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া শেষ চাকরির অভাবে তারা অল্প টাকায় কোরাণ খতম, টিউশনি, মসজিদের ইমামতি এবং নুরানি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ছাড়া আর কোথাও কাজে আসে না। তাই আমার পরামর্শ থাকবে; মাদ্রাসার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে নিজেরা গার্মেন্টস কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। যেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লেখাপড়া শেষ করে তাদের কর্মসংস্থান হয়ে যা। গার্মেন্টস করার মতো ফান্ড হাটহাজারী এবং পটিয়া মাদ্রাসার মতো বড় বড় সব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ হাজার হাজার কওমি শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করে বেকার রয়েছে। টিউশনি, ইমামতি, মুয়াজ্জিন এবং কওমি নুরানী মাদ্রাসা ছাড়া আর কোনো চাকরির ব্যবস্থা নেই এই ছাত্রদের। কওমি ছাত্রদের অনেক যোগ্যতা রয়েছে তারপরও সরকারি কর্মসংস্থান হয় না।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ আসলে চাকরি পায়, কিন্তু সেটা মসজিদ-মাদ্রাসার চাকরি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন সরকারি চাকরি করার সুযোগ থাকে না। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ ছাত্রদের শিক্ষা শেষে কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ এবং মকতব ছাড়া আর কোনো কর্মসংস্থান নেই, এটা পরিবর্তনের সময় এসেছে বলে মনে করি।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ মসজিদ মাদ্রাসায় চাকুরি-এটাও একটা কর্মসংস্থান।

৫. প্রশ্ন ঃ কওমি শিক্ষা সিলেবাস যুগোপযোগী করতে কী করা উচিত বলে মনে করেন?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ নজর দেওয়া কেন? সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেয়া উচিত। এটা শুধু জঙ্গিবাদ প্রতিকার করার জন্য নয়— দেশের শিক্ষাকে আরো বেগবান করা, আরো উন্নত করার জন্য প্রয়োজন। সরকারের উচিৎ হলো সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা। যে স্কুলের সরকারি নজরদারী থাকবে নিয়ন্ত্রণ থাকবে ওখানে আপনার টাকা-পয়সা থাকবে আর কওমি মাদ্রাসায় সেভাবে নজর দেওয়া হয় না। সে ব্যাপারে সরকার কিছু জানে না। ওখানে কি পড়ানো হয়, কতজন ছাত্র আছে, তাদের ব্যাপারে একাউন্টবিলিটি নেই। এজন্য আমরা বারবার দাবি করছি– এটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিৎ। কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস– এটা একটা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাদের সিলেবাস আধুনিক এবং যুগোপযোগী করতে হবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র– এরা দেশের নাগরিক, এরা দেশের সম্পদ। এরা লেখাপড়া করবে। তাদের সরকারি চাকরি পেতে হবে। যদি লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক তৈরি করা হয় বছরের পর বছর, এটাতো ইসলামের বিধান হতে পারে না। ইসলাম চায় একটা গণমুখী শিক্ষা— যে

শিক্ষায় দুনিয়া এবং আখেরাত কল্যাণমুখী হবে। শুধু ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালাবে আর ধর্মান্ধবাদ প্রচার করবে এটাতো ইসলাম চায় না।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষা কমিশন গঠন করে মাতৃভাষা কেন্দ্রিক শিক্ষানীতি চালুকরে নতুন প্রজন্ম কে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো আলেম বা নায়েবে রাসূল তৈরি করা। যেমন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন ডাক্তার তৈরি করা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা। মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যমে হাক্কানী আলেম বা প্রকৃত নায়েবে রাসূল তৈরি করা সম্ভবপর হলে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদী দর্শন বিকশিত হবে। এতে সমাজ থেকে উগ্রবাদী চিন্তা চেতনা লোপ পাবে। ফলস্বরূপ সমাজ থেকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী চিন্তা চেতনা বন্ধ হবে। মাদ্রাসাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নজরদারির মধ্যে আনা প্রয়োজন বলে মনে করি।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ শিক্ষা সংস্কারের পরিবর্তন করতে হবে বিশেষ করে কওমি-ওয়াহাবীদের মাদ্রাসার শিক্ষাতে জঙ্গিদের উৎসাহ দেয়ার মত অনেক গ্রন্থ রয়েছে তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সরকারের গোয়েন্দা নজর আরো বৃদ্ধি করে এসব কওমি মাদ্রাসাকে সরকারিকরণ করে পরিচালনা করতে হবে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি পরিবর্তনে শুধু জঙ্গি-মৌলবাদ সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত করা নয়, সেই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। কওমি শিক্ষায় যুগোপোযোগী কিছু নেই। যার কারণে কোন সরকারি-বেসরকারি চাকুরিতে কাজে আসে না। যার দরুণ তাদের শিক্ষা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। অতএব সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করে যুগপোযোগী করতে হবে।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ হ্যাঁ, ইসলামের নামে জঙ্গি-মৌলবাদী সন্ত্রাসকে নিরুসাহিত বা বন্ধ করতে হলে অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসা পাঠ্যাসূচি তথা শিক্ষার আমূল সংস্কার করে এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের গোয়েন্দা নজরদারি আরও বৃদ্ধি করলে, তবে শেষ হবে এসব জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ সরকারের দেশ পরিচালনায় যত কাজ আছে তার মধ্যে প্রথম কাজ হওয়া উচিৎ এটা। সরকারের ফরজ কাজ হলো– পাঠ্যসূচিকে পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসা তথা সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাধ্যতামূলক করা।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ আলিয়া-কওমি উভয় মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করতে হবে এবং বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করতে হবে এবং এটা খুব বেশি প্রয়োজন।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ আমাদের বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার এই ধারাকে আরও কার্যকরী করতে এর নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর বেশকিছু পদক্ষেপ

নেওয়া উচিত। যুগ চাহিদা অনুধাবন করে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে এর শিক্ষার্থীদের দ্বারা জাতি আরো বেশি উপকৃত হতে পারবে।

প্রথমেই আসি সিলেবাসের কথায়। আমি মনে করি, অনেক বিষয় পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। সংযোজন ও বিয়োজন দরকার অনেক ক্ষেত্রে। যদিও আমাদের মুরব্বিগণ এই ছোট্ট বাস্তবতা মেনে নিতেও অনিচ্ছুক।

ক. যখন ফার্সী ভাষার প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের আকাবির খুব গুরুত্ব দিয়ে এই ভাষা শিখিয়েছেন। যদিও তা আমাদের কোরাণ-সুন্নাহর ভাষা না। অথচ এখন ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও এটাকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে শিখানো হয় না। এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

খ. সংক্ষেপণ এবং সহজিকরণ এর নামে অযথাই যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, আরবি ভাষার অলংকার শাস্ত্রকে সীমিত করা হয়েছে। অথচ এ শাস্ত্রগুলো মেধাকে তীক্ষ্ণ করে। বুদ্ধির জোর বাড়ায়। দর্শন ছাড়া কোনো শিক্ষার গভীরে পৌঁছানো যায় না। এক্ষেত্রে করণীয় হল, পুরাতন ও আধুনিক যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে সমন্বয় করে আরো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া।

গ. শর্ট কোর্স নামীয় নতুন এক শিক্ষা পদ্ধতির আবির্ভাব। আমরা কেন কোরাণ সুন্নাহর এই বহুমাত্রিক, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে এতো সস্তা বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করে আল্লাহই ভালো জানেন। এই অর্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে কি লাভ হচ্ছে। এর দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে পঙ্গুত্ব আসে। যারা কোরাণ ও হাদিস সম্পর্কে অল্প কিছু জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদেরকে দ্বীনিয়াত সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিলেই হয়। দাওরায়ে হাদিস ফারেগ হতে হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা শরিয়তে নেই। শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ আসামের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন তা ছিলো ১৬ বছর মেয়াদি। এই বিষয়টি ভাবনায় নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

ঘ. "ইতিহাস" শিক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। অথচ ইতিহাসের বড় একটা অংশের কোনো ধারণাই মাদ্রাসা শিক্ষাথী'দের নেই। হযরত মাদানি রহ. এর প্রণীত সিলেবাসে উল্লেখ ছিলো কোরাণ, সুন্নাহ এবং ফিকহের পর সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে ইতিহাস।

ঙ. ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে ঈমান এবং ইবাদতের শিক্ষা যে গুরুত্বের সঙ্গে দেওয়া হয়। ঠিক ততটুকু অবহেলা করা হয় বাকি তিন বিষয়ের ক্ষেত্রে। অথচ বাকি তিনটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

চ. নারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, কারণ একজন নারী শিক্ষিত না হলে পরিবার বা রাষ্ট্র শিক্ষিত হবে না, তাছাড়া নারী যদি ডাক্তার না হয়, হুজুরের বউয়ের ডেলিভারিতে চিকিৎসা কাকে দিয়ে করাবেন, ঘরের মহিলারা অসুস্থ হলে চিকিৎসা কাকে দিয়ে করাবেন। সেই প্রশ্ন রাখলাম কওমি শিক্ষা বোর্ডের কাছে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ জ্বী হ্যাঁ, আমরা মনে করি জঙ্গিবাদ রুখতে হলে আদর্শিক লড়াইয়ের পাশাপাশি অর্থাৎ এরা যে ধর্মের দোহাই দিয়ে সরলমনা ধার্মিক

বাঙালিদের বিভ্রান্ত করছে সেই ধর্মের উৎসমূল থেকে এদের অসারতা প্রমাণ করার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানো উচিৎ এবং জঙ্গি তৎপরতা রোধকল্পে নজরদারী আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল-কাদেরী আল-চিশতি ঃ বাংলাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গি-মৌলবাদী সন্ত্রাস নিরুৎসাহিত করতে আলিয়া-কওমি বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি আমূল পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করতে হবে। অবশ্যই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা-স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ জঙ্গিবাদকে নিরুৎসাহিত করতে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। আর সব প্রতিষ্ঠানে সরকারি নজরদারী বৃদ্ধি করা দরকার।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ জঙ্গি-মৌলবাদী সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত করতে হলে অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে কওমি-ওয়াহাবী মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাসকে সংস্কার করে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন এবং গোয়েন্দা নজরদারী শুধু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে, এই বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না। এসব মাদ্রাসায় ইসলামের জন্য মুজাহিদ তৈরি হয়। যারা ইসলাম রক্ষার আন্দোলনে সব সময় কাজ করে চলেছে। যেসব জঙ্গি ইসলামের নামে মানুষ হত্যাসহ জঘন্য কাজ করে চলেছে তারা ইসলামের শত্রু। তাদের কারণে কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ঠিক নয়।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ মুফতি শহীদুল ইসলাম, মুফতি হান্নান, মুফতি জসিম উদ্দিন, মুফতি ইজহার, মুফতি ফজলুল হক আমীনী, জোনায়েদ বাবু নগরী, জেনা ব্যভিচারে লিপ্ত কুখ্যাত মামুনুল হক গংরা কওমি মাদ্রাসাই লালিত-পালিত হয়ে পাকিস্তানি ভাবধারায় জঙ্গিবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়িয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের জঙ্গিবাদে উস্কে দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ একসময় ইসলামের নামে জিহাদের প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে জঙ্গিবাদি কার্যক্রমে ঝুঁকে পড়েছিলো কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক। কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা পরবর্তীতে জঙ্গিবাদি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করে।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ যারা জঙ্গিবাদি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বা আছেন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকজন এরকম হতেই পারে। স্কুল-কলেজে কি সন্ত্রাসী-জঙ্গি নেই? কওমি মাদ্রাসায় এক সময় জঙ্গিবাদী কার্যক্রম ছিল বর্তমানে কমে গেছে মনে হচ্ছে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ কওমি মাদ্রাসায় কোন জঙ্গিবাদী আস্তানা নেই। এখানে জঙ্গি তৈরি হয় না, এখানে ইসলামের সৈনিক (মুজাহিদ) তৈরি হয়। জঙ্গি তৈরির কথা বলে অপবাদ দেওয়াটা ঠিক না।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আস্তানা নয়। এই মাদ্রাসা কোরাণ হাদিস এর শিক্ষা দেয়। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামে মারামারি নেই। যদিও যে সব কওমি শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন/হচ্ছেন তারা পথভ্রষ্ট।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ কওমি মাদ্রাসায় এক সময় জঙ্গিবাদী কার্যক্রম হতো, বর্তমানে কমছে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা বিশেষ করে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে ঝুঁকে পড়েছিল আফগানিস্তানের তালেবান যখন প্রথম রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীকালে হরকাতুল জিহাদ তা বাস্তবায়ন করে এবং জঙ্গিবাদের বীজ বপন করে, এখন অনেকটা কমে এসেছে। এখন স্কুল কলেজে তা বিস্তৃত হয়েছে, যদিও এর পিছনেও মানহাজি আলেমরা দায়ী। যাদের আমরা জঙ্গি বলি, তাদের কিন্তু কওমি মাদ্রাসার একটি অংশও (যারা সমাজের মূলধারায় আসতে চায় বা ফিরতে চায়) জঙ্গি নামে অভিহিত করে তবে তারা জঙ্গি শব্দ ব্যবহার না করে 'মানহাজি' নামে ডাকে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গিদের আস্তানা নয়। একসময় কিছুটা ছিল। বর্তমানে কওমি মাদ্রাসায় সচেতনতা বাড়ছে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ কথাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কওমি মাদ্রাসা আগেও জঙ্গির কারখানা ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ এটি একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। ইসলাম শান্তির ধর্ম এখানে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়। মারামারি, হত্যার শিক্ষা ইসলাম কখনো দেয়নি।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি আস্তানার অভিযোগটা একটা অপবাদ। এখানে জঙ্গি তৈরি হয় না।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ মাদ্রাসায় নজরদারি বাড়াতে হবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

৭. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে সংগঠন বিশেষের বিরুদ্ধে, এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য জানতে চাই।

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ এক সময় কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে শুধু পড়াশোনার জন্য চাপ দেওয়া হতো কিন্তু ইদানিং দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ জনগণের দান খয়রাতের সাহায্যে পরিচালিত মাদ্রাসার ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করতে হলে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রনিধিদের সমন্বয়ে কওমি মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ কওমি মাদ্রাসায় সব সময় ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। তার বড় প্রমাণ ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরে হেফাজতের তাণ্ডব লীলা।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ আমি এটার সম্পূর্ণ বিরোধী। ছাত্রদেরকে পড়াশোনার বাইরে রাজনীতিতে জড়ানো নিষিদ্ধ করা হোক। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হারাম কাজ, এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ সঠিক না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ আমি এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার উচিত বলে মনে করি না।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ কওমি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেটা সম্পূর্ণ বেআইনী।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করছে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ আমি একজন কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষিত (২০০৬ সালে আমি হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেছি)। আমরা যখন পড়েছি, আমার মনে পড়ে, তখন আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিল-মিটিংয়ে যেতে পারতাম না, গেলেও চুরি করে গোপনে যেতে হতো। রাজনীতি একদম নিষিদ্ধ ছিল। কোনো মিছিল-মিটিংয়ে যেতে হলে বড়রা যেত। বাসে আগুন দেওয়া, মন্দিরে হামলা করা, মানুষের জানমালের ক্ষতি হয় এমন কোনো ধরণের কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। পরবর্তীতে বিশেষ করে আফগান ফেরত কিছু জঙ্গি আলেম এবং জামায়াত-শিবিরের ছত্রছায়ায় এখন ছোট ছোট বাচ্চাদেরও ব্যবহার করা শুরু করেছে। বর্তমানে তা মহামারি আকার ধারণ করেছে, তা মোটেও উচিত না। ছাত্রদের এমনভাবে মোটিভেট করছে এখন, একজন এতিম শিশু পড়তে এসে মিছিলে বুক পেতে দেয় জিহাদ করবে বলে। তাই আমার আবেদন এটা হতে দেওয়া যাবে না।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কওমি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত না। যেটা কওমি মাদ্রাসায় আমরা দেখে আসছি।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ কওমি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই কথা সত্য না।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ কওমি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৮. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, বলাৎকারসহ এমন অনেক অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। এইসব ঘটনা সমাজ ভাল চোখে দেখে না।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক ও সামাজিক কমিটি, মানবাধিকার এবং নারী সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের কাউন্সিলিং এর পাশাপাশি সর্ব-সাধারণের উপস্থিতিতে সামাজিক ও প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ ধর্ষণের অভিযোগ কওমি মাদ্রাসায় নিত্য নতুন ঘটনা। বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটছে যা মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের জন্য লজ্জাজনক।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রদের সচেতন করতে হবে এবং অভিভাবকদেরকেও সচেতন হতে হবে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ কিছু কিছু মাদ্রাসায় এসব ঘটনা ঘটে থাকে এটা অস্বীকার করব না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ বলাৎকারের অভিযোগ কওমি মাদ্রাসায় সব সময় দেখা যায়। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকতে হবে।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ এটা একটি অসভ্য কাজ। মাদ্রাসার মতো জায়গায় এসব বেমানান।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ কওমি মাদ্রাসায় বলাৎকার হচ্ছে এটা সত্য।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ বলাৎকার অভিযোগ না, এটা কওমি মাদ্রাসায় রুটিনের মতো হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে হাসান রফিকের লেখা 'একজন জঙ্গির আত্মকথা' গ্রন্থে বিস্তারিত বলা আছে। ধর্ষণের বিষয়টি স্কুল-কলেজেও অভিযোগ আছে কিন্তু মাদ্রাসার বিষয়টা মেনে নেওয়া যায় না এই জন্য যে- কোরাণে স্পষ্ট কওমে লুতের বর্ণনা দেওয়া আছে এবং এটা তারা ছাত্রদের পাঠদানে বলে কিন্তু তারা তার বিপরীত চলে। মাদ্রাসার বেশিরভাগ হোস্টেলে এই ঘটনা দৈনন্দিন চলে। অথচ হযরত লুত নবীর ঘটনা তারা সবাই জানে কিন্তু মানে না।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রদের বলাৎকার করা হয় তা সত্য। এসবের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ বলাৎকারের অভিযোগ কওমি মাদ্রাসায় পুরোনো অভিযোগ।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ কিছু ঘটনা ঘটেছে এটা সত্য কিন্তু মিডিয়া যেভাবে প্রচার করে তা ঠিক না।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ এটা বাস্তব। বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় ছাত্র নির্যাতন ও ছাত্রী ধর্ষণ দিন দিন বাড়ছে।

৯. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে উষ্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপন সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে দোষের কিছু দেখছি না।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ ভিডিও ফুটেজ দেখে এবং থানায় রুজুকৃত মামলাগুলো দ্রুত তদন্ত শেষ করে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাস্কর্যের বিষয়ে বিগত ২২-১১-২০২০ইং তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে "বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোটের" (ছবি এবং পেপার কাটিং সংযুক্ত) পক্ষ থেকে কোরাণ এবং হাদীসের আলোকে আমরা বলেছি ভাস্কর্য ও মূর্তি এক জিনিষ নয়। কোরাণের সূরা সাবার ১৩নং আয়াতে ভাস্কর্য নির্মাণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য হাওয়সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে দাউদ-পরিবার)। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করিতে থাক। এদেশের মানুষ আপনাদেরকে '৭১' সালেও চিনতে ভুল করে নাই এখনো করবে না। ভাস্কর্যের বিরোধিতা মূলত রাজনৈতিক কারণেই। ধর্মীয় কারণে যদি ভাস্কর্য নিষিদ্ধের দাবি উঠত তাহলে অনেক আগেই নির্মিত খাগড়াছড়িতে জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্য হেফাজতিরা ভেঙ্গে ফেলত। এই বিষয়ে কোরাণ হাদিসের প্রকৃত ব্যাখ্যাসহ 'ভাস্কর্য রাজনীতি' নামে একটি বইও আমরা প্রকাশ করেছি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ কওমি তথা হেফাজতীদের উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে দোষের কিছু দেখছি না।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে যেটা আসল হেফাজতে ইসলামের কাজ নয়। ওটা হচ্ছে নকল হেফাজত। নিজেদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করার পক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত নই।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে পক্ষে আমার মতামত।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে কোনো সমস্যা নেই।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে দোষের কিছু দেখছি না।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বলেন, জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য বলেন কওমিরা তার বিরোধিতা করছে জায়েজ নয় ফতোয়া দিয়ে। তারা এক সময় ছবি উঠানো জায়েজ নয় বলে ফতোয়া দিতো। এমনকি ছবি উঠানোর অপরাধে ২০ বছর আগে আমাকে (নাম উল্লেখ করছি না) একজন শিক্ষক পশুর মতো

পিটিয়েছিলেন। আমিতো ঐ ঘটনা এখনো ভুলতে পারি না। অথচ যিনি আমাকে পিটিয়েছিলেন এখন তিনি বৃদ্ধ বয়সে এসে সেলফি তোলেন। যেই হাদিস বা ফতোয়াধারা ছবি তোলা নিষিদ্ধ করেছিলেন তারা; সেই হাদিস ও ফতোয়া দিয়ে ভাস্কর্য নিষিদ্ধের দাবি তুলে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়। আপনারা ফেসবুকে দেখে থাকবেন তাদের সেলফি এবং ফটোসেশান এর কি হিড়িক বর্তমান ওলামা সমাজে। ছবি তোলা এবং ভিডিও করা এখন জায়েজ বা বৈধতায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্যকে নাজায়েজ ফতোয়া দিয়ে অরাজকতায় লিপ্ত হচ্ছে। আমি তাদের কার্যক্রমের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে হেফাজতে ইসলামের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে কোনো সমস্যা দেখছি না।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে দোষের কিছু দেখছি না।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের পক্ষে আমি মতামত দিতে অপারগ।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনে দোষের কিছু দেখছি না।

১০. প্রশ্ন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা গাজওয়ায়ে হিন্দের নামে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথা বলছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ গাজওয়ায়ে হিন্দদের নামে উপমহাদেশে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড এখন থেকে প্রতিরোধ করতে হবে। তরুণ সমাজকে এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ ১৯৭১ সালে মওদুদীবাদী জামাত ইসলামের নামে বর্বরোচিত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠণ, অগ্নিসংযোগ সহ যেভাবে ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা ও ২ লক্ষ ৭৯ হাজার মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠণ করেছিল ঠিক সেইভাবে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা গাজওয়ায়ে হিন্দের নামে উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অস্ত্র এবং পেশি শক্তির জোরে ইসলামের নামে তথাকথিত জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়, যা কোরাণ এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা:)-এর শিক্ষা, আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, বিকশিত, প্রচারিত, প্রসারিত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসা এবং পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। দেশ এবং ক্ষমতা দখল করে বিশ্ব কে পরিবর্তন করা যাবে না। কখনো জঙ্গিবাদীদের তথাকথিত

ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হবে না। হৃদয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে। জোর যবর দস্তি করে নয়। আল-কোরাণ ,সূরা-ইউনুস,আয়াত নং-৯৯-১০০।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ ইসলামের নামে মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ হারাম। এসব কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। গাজওয়ায়ে হিন্দদের নামে তরুণদেরকে উগ্রতার দিকে ডাকছে যেটা খুবই ভয়ঙ্কর।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ এসব শিক্ষা থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে। এটা কখনো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ গাজওয়ায়ে হিন্দদের নামে বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠী অপপ্রচার ও অপতৎপরতা চালাচ্ছে অনলাইন, অফলাইনে। এটার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ গাজওয়ায়ে হিন্দদের নামে বিভিন্ন অনলাইনে উগ্রতাদের দিকে তরুণ সমাজকে ধাবিত করছে কিছু কিছু বিপথগামী ব্যক্তি। এটার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন আছে।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ এটা বাস্তবায়ন করা কখনো সম্ভব না। তথাকথিত জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করতে পারে। নাশকতা সৃষ্টি করে জনগণকে ভয়ভীতি দেখানো ছাড়া আর কিছু না।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ এটা বাস্তবায়ন করা কখনো সম্ভব না। তথাকথিত জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করতে পারে। নাশকতা সৃষ্টি করে জনগণকে ভয়ভীতি দেখানো ছাড়া আর কিছু না। এসব জিহাদীদের বিরুদ্ধে এখন থেকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ গাজওয়ায়ে হিন্দ এটি একটি জয়িপ বা দুর্বল হাদিস। এই হাদিস দিয়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ নামের যেই যুদ্ধের কথা তারা বলেন, মূলতঃ এটি হিন্দুস্তান তথা ভারত বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র, পাকিস্তান তথা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের পরিকল্পনা। এটা বাস্তবায়ন করা কখনো সম্ভব না। তথাকথিত জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করতে পারে। নাশকতা সৃষ্টি করে জনগণকে ভয়ভীতি দেখানো ছাড়া আর কিছু না। এসব জিহাদীদের বিরুদ্ধে এখন থেকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ কল্পনা ছাড়া এটা বাস্তবায়ন অসম্ভব। জঙ্গিবাদীদেরকে সত্য পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ এটা সম্পূর্ণ দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। উপমহাদেশে জঙ্গিরা কখনও দখলদার হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ কওমি মাদ্রাসায় নজরদারি বাড়াতে হবে। ছাত্র শিক্ষকদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ এটা একটা তাদের অলীক কল্পনা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। জঙ্গিবাদীরা সব সময় অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশকে অশান্তির দিকে নিয়ে যেতে চায়। এটা ইসলাম সমর্থন করেন।

১১. প্রশ্ন ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ এটা সম্পূর্ণ হারাম।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ আইএস, আল-কায়দা, তালেবান, হরকাতুল জিহাদ, জামাত-শিবির, হিজবুত তাহরির, জেএমবি, হেফাজত সহ যারাই ভিন্ন মতের, ভিন্ন ধর্মের মানুষদের পবিত্র ইসলামের নামে হত্যা করছে, তারা সকলেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি, দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, ইসলাম ও মানবতাবিরোধী।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কোনো ধর্ম নেই। নরহত্যা জঙ্গিদের বড় মহাপাপ।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ শান্তির ধর্ম ইসলাম। মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ ইসলামে নরহত্যা, গুপ্তহত্যা, অপহরণ, গুম প্রভৃতি চরমপন্থা অবলম্বনকে নিষিদ্ধ করে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সাময়িক উত্তেজনা বা সস্তা আবেগের বশবর্তীতে মানুষকে অপহরণ, গুম, খুন, গুপ্তহত্যা, যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগ, জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারার মতো চরমপন্থা গ্রহণ বা বাড়াবাড়ির অবকাশ ইসলামে নেই। কাউকে প্রাণনাশ বা হত্যা করা সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিশোধ গ্রহণের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা নিরপরাধ মানুষ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তারা মানবতাবর্জিত ও সভ্য জগতের শত্রু।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা এবং হত্যার প্ররোচনা দেওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

১২. প্রশ্ন ঃ ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করলে তার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির বিধান আছে। এরপরও বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য 'ব্লাসফেমি আইন' প্রচলন করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করার কথা অনেক আলেম বলেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ ব্লাসফেমি একটা ধারণা। জামায়াত-হেফাজত কি বলে সেটা বড় কথা নয়। ব্লাসফেমি আইন পৃথিবীর অনেক দেশে ছিল, এখনো আছে। সেটা হলো যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, বাইবেলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে— তাদের বিরুদ্ধে একটা কঠিন আইন প্রণয়ন করা। আমাদের দেশেও আমি এটা বলতে চাই মুক্তমনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা যায়। এটা কোনো বাধা নয়। কেউ যদি নাস্তিক হতে চায়, আমাদের দেশে কাউকে নাস্তিক হতে বাধা দেয়া হয় না। নাস্তিক হলেই শাস্তির বিধান আমাদের ধর্মে নেই।

আমাদের দেশে যে ফৌজদারি বিধানটা আছে— যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত করলে যে শাস্তি আমাদের দেশে আছে। কিন্তু এটার শাস্তিটা খুব কম দিনের। এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজী আছেন, আমরাও এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য দাবি করেছি। কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য ব্লাসফেমি আইনের কথা বলে– গোপনে মানুষ হত্যা করা এটা ইসলামও যেমন বিরোধিতা করে আমরাও এটার বিরোধিতা করি। আমরা আইনকে কেউ হাতে তুলে নিতে পারি না। আইনকে কেউ খাটো করতে পারি না। যা ব্যবস্থা নেবার রাষ্ট্রই নেবে এবং শাস্তিও রাষ্ট্রই দেবে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা থাকার পরেও শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে, ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে গেলে তাকে ব্লাসফেমি আইন প্রচলন করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান কোরাণ ও মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন বলে আমরা মনে করি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ কোরাণ ও সুন্নাহ বিরোধী কী কী কাজ করলে ধর্মের অবমাননা হবে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। ফলে পাকিস্তানের মত ব্লাসফেমি আইন করা হলে বাংলাদেশে এর অপব্যবহার হতে পারে। যেহেতু এ বিষয়ে পেনাল কোডে দণ্ডের বিধান রয়েছে তাই এ ধরনের আইন বাংলাদেশে প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ বাংলাদেশের আইনে ফৌজদারি দন্ডবিধিতে শাস্তির যে বিধান রয়েছে তা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়, আমার মনে হয় না ব্লাসফেমি আইনের প্রয়োজন হবে। জামায়াত-হেফাজতের দাবির (পাকিস্তানের মত ব্লাসফেমি আইন) উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তান-আফগানিস্তানের তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করা।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ বাংলাদেশের ফৌজদারি দন্ডবিধিতে যে আইন বিদ্যমান আছে, সে আইন প্রয়োগ হচ্ছে না। ব্লাসফেমি আইন যদি হয়, তাহলে কেউ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তি করতে সাহস পাবে না। আসলে ব্লাসফেমি আইনটি হওয়া উচিৎ।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ 'ব্লাসফেমি' এবং ধর্ম অবমাননা এসব বিষয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আসলে ব্লাসফেমি আইনটি কোরাণ বিরোধী, হাদিস বিরোধী, ইসলাম বিরোধী। কেউ যদি যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে বলে দেশে বিশৃঙ্খলা করতে চায়, তার বিরুদ্ধে সরকারকে অবশ্যই প্রকাশ্যে জানাতে হবে, যে ফৌজদারি শাস্তির বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ ধর্মের অবমাননাকারীদের যে শাস্তি ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে রয়েছে সেই শাস্তিটা যদি মৃত্যুদণ্ড হতো তাহলে কেউ ইসলাম ধর্ম বা অন্য কোনো ধর্মের বিরোধিতা করতে সাহস পেত না। আপনি ধর্ম মানবেন না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু অন্য কারো ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ ধর্ম অবমাননা বা ধর্মনিন্দা বা ব্লাসফেমি হল পরমেশ্বর, পবিত্র জিনিস কিংবা পবিত্র বা অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত এমন কোনো কিছুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ঠাট্টা করা বা অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশেই ব্লাসফেমি, ধর্মীয় অবমাননা এবং ধর্মত্যাগ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ধর্মীয় স্থান বা সেখানকার কেনা বস্তু ধ্বংস করা, ক্ষতি করা বা অসম্মান করাকে ধর্মীয় অবমাননা হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে একটি সংশোধনীতে ২৯৫(ক) ধারায় যোগ করা হয়েছে, ইচ্ছা করে দেশের কোন নাগরিককে মৌখিক, লিখিতভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হলে তা ধর্মীয় অবমাননা বলে গণ্য হবে।

এরকম অপরাধের ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই আইনের ২৯৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইনসঙ্গতভাবে আয়োজিত ধর্মীয় কোন সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে কেউ বাধা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। তাহলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

বর্তমানে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়াতে ব্লাসফেমি আইন চালু রয়েছে। আমাদের দেশেও ধর্ম অবমাননার জন্য যে আইন রয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে 'ব্লাসফেমি আইন' করতে হবে বলে আমি মনে করি না।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ ফৌজদারি দন্ডবিধিতে যে আইনের কথা বলা হয়েছে বা রয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে বা যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে আমার মনে হয় জামায়াত-হেফাজতীরা পাকিস্তানের মত ব্লাসফেমি আইনের জন্য আর দাবি করবে না।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল-কাদেরী আল-চিশতি ঃ ফৌজদারি দন্ডবিধিতে যে কোন ধর্মের প্রতি অবমাননাকর উক্তি বা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দন্ডনীয় অপরাধ থাকলেও তার সঠিক প্রয়োগ আমরা দেখি না, যার কারণে ধর্মের অবমাননা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ আমি চাই এই ফৌজদারি আইনটি আরো কঠোর করতে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে যে দন্ডনীয় অপরাধের কথা রয়েছে তা দিয়ে ধর্মের প্রতি অবমাননাকারীদের শাস্তি পুরোপুরি হবে না এবং হচ্ছে না। যার

কারণে সবাই সাহস পাচ্ছে— ধর্মের অবমাননা করতে আইনটা আরো কঠোর হলে কেউ কোন ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ ফৌজদারি দন্ডবিধিতে যে আইন রয়েছে তা কি কার্যকর হচ্ছে? হচ্ছে না। আমার দাবি হলো ব্লাসফেমি আইন না হলেও যে ফৌজদারি আইনটা আছে, সেটা আরো কঠোর করে ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারকে সে ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।

১৩. প্রশ্ন ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী যেটা এখনও বহাল রয়েছে। তালেবানকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের দরকার আছে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ নারীদের শিক্ষা গ্রহণ এবং ক্ষমতায়নে জেন্ডার বা লিঙ্গ ভিত্তিক কোন বৈষম্যের বিধান কোরাণে নেই। নারী-পুরুষ সকলের সমমর্যাদা ও অধিকারের কথা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী সেটা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল শাসনামলে তারা পরিচয় দিয়েছে।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চাইলে এখন থেকে নিজেদেরকে নারীবাদী হিসেবে প্রমাণ দিতে হবে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী যেটা ঠিক না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী এটা সত্য। এখান থেকে তালেবানকে বেরিয়ে আসতে হবে।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী এটা সত্য। এখান থেকে তালেবানকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করে দেখাতে হবে।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ ইসলামে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব রয়েছে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ আফগানিস্তানের তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা শুধু না একসময় নারীদের স্কুলে যাওয়াই বারণ ছিল, যার প্রমাণ মালালা ইউসুফজাইয়ের ওপর ২০১২ সালে তালেবান হামলার ঘটনাটি। তালেবানরা এখন সুর একটু পাল্টিয়েছে ঠিক, কিন্তু তারা কখনো মেয়েদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে না। তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশও নারীদের শিক্ষা, ব্যবসা, ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্লাস, ওয়াজের মাঠে প্রচার করে চলেছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং আমি চাই, নারীরা সমাজের মূলধারার সাথে এগিয়ে যাবে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী এটা সত্য। নিজেদের নতুন পথে হাঁটতে হবে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী যেটা সারা বিশ্ব অবগত।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী এটা সত্য। এটার বিকল্প কিছু করা উচিৎ।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী এটা সত্য। এখান থেকে তালেবানকে শিক্ষা নিতে হবে।

১৪. প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ ইসলামী খেলাফত- এর যে কানুন সেটা সম্পর্কে তাদের কাছে ধারণাও নাই। তারা আধুনিক চিন্তা, গণতান্ত্রিক চিন্তা এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা সমর্থন করতো এবং এটাই বলতো। তারা একদিকে বলে খেলাফত। খেলাফতটা কি? যখন বিশ্বে রাজতন্ত্র ছিল, তখন রাসূল (সাঃ) এরা মৃত্যুর সময় উনি কাউকে ঘোষণা দিয়ে দিলেন না যে আমার পরে অমুক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মনোনীত হবে। তিনি তো এটা বলেননি? তিনি মুসলমানদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। নবীর (সাঃ) পর তাদের শাসক তারা নির্বাচিত করলো। এখন আমরা ইসলামে কি দেখতে পাই! আবুবকর হলেন একজন নির্বাচিত শাসক। ওমর ছিলেন নির্বাচিত শাসক। ওখানকার জনগোষ্ঠী তাদেরকে শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

এদেশে যে ভূখণ্ডে আমরা বসবাস করছি সে ভূখণ্ডের নাগরিকরাই তাদের শাসক নির্বাচিত করবেন। এটা ইসলামেরই একটি দিক নির্দেশনা। ইসলাম স্বঘোষিত কোনো শাসককে, কোনো স্বাভাবিক শাসককে ধর্মের নামে কোনো খলিফাকে সমর্থন করে না যদি না সে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এটা ইসলামেরই মূল দিকনির্দেশনা যা হলো 'জনগণের দ্বারা শাসক নির্বাচিত হওয়া'। সে স্বঘোষিত হতে পারবে না। আপনার মন চাইলো আপনি খানকার হুজুর– আপনি একটা হিজবুত তাহরীর তৈরি করলেন, নিষিদ্ধ ইসলামী দলের নামকরণ করলেন এবং নিজেকে আমির ঘোষণা করলেন। আমিরে শরিয়ত ঘোষণা করলেন, আমিরুল মুমিনীন ঘোষণা করলেন- এটা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম চায় তার শাসক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হোক।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ ১৯৭১ সালে সকল ধর্মের মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৭২-এর সংবিধান তৈরি হয়েছে সত্যিকার অর্থে তার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী হুকুমত-সামাজিক ন্যায় বিচার- সাম্য-সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য, সকলের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ তাদের এ সকল দাবি ধর্মীয়ভাবে একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন নির্দিষ্ট জাতি, রাষ্ট্র বা এলাকার জন্য এ দুনিয়াতে আসেন নি। মহান আল্লাহ তাকে সারা দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এ ধারণা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি, রাষ্ট্র বা এলাকার জন্য নয় বরং এটি সারা বিশ্বের জন্য। তাই তাদের এলাকা বা নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক খেলাফত বা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এ ধারণা ইসলামের সার্বজনীন খেলাফতের ধারণার পরিপন্থী। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা সনদের নীতি ও

আদর্শের সাথেও তাদের এ ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওহাবী, সালাফী, জামায়াতী তথা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ইয়াজিদী দর্শন থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নামের সাথে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' কথাটি ছিল না। ১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান, ইরান ও চাদ রাষ্ট্রের নামের শুরুতে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' কথাটি ব্যবহার শুরু হয়। রাষ্ট্রের নামের সাথে ইসলাম থাকলেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় না বরং কোরাণ ও হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও মর্মবাণীর প্রতিফলন ঘটে।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ এসব সংগঠন কিভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে? তারা তো নিজেরাই ভন্ড। এসব জঙ্গি সংগঠন গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকার কীভাবে মানবে? তারা তো এদেশের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ এসব সংগঠন যদি ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মদিনার সনদের অনুসরণ করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের ভোটের মাধ্যমে করতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র বাদ দিয়ে জঙ্গিবাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলো ভ্রান্ত আকিদা। যে সব সংগঠন আমাদের দেশের সংবিধান অস্বীকার করে, সাংবিধানিক সংসদ উৎখাত করতে চায় তারা তো কোরাণ মানে না।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ এ ধরনের সংগঠন গণতন্ত্র মানে না, এমনকি তারা বাংলাদেশের অস্তিত্বও বিশ্বাস করে না। খিলাফত বা ইসলামী হুকুমতের নামে আসলে তারা এদেশকে চায় তালেবানি জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করতে।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ জামায়াত-হেফাজতসহ এসব জঙ্গি সংগঠন তো গণতন্ত্র মানে না। তাদের উদ্দেশ্য হলো ইসলামী হুকুমতের নামে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদেশকে পাকিস্তান বানানো, কারণ তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ তাদের এসব কর্মকাণ্ড কোরাণ-সুন্নার আলোকে সম্পূর্ণ অবৈধ।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত দরকার নেই, এখন মানুষ যেভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে চলাফেরা করছে বা রাষ্ট্র যেভাবে সমান অধিকার দিয়ে দেশ পরিচালনা করছে সেটাই ইসলামী হুকুমত। ইসলামী হুকুমতের নামে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এসে ইসলামের কি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছেন আমরা তা দেখেছি, বরং ইসলামী হুকুমতের নামে মানুষ হত্যার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ইসলামী হুকুমত আমাদের নবীও প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি চাইলে পারতেন। যার প্রমাণ মদিনার সনদ।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ যদি খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমাদের মত জানতে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে বলব, আল-কোরাণ সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছে, ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মুসলমানদের মাঝে আল্লাহ্ নিজে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। কোন জাগতিক শক্তি, রাজনৈতিক কূটচাল বা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অলঙ্ঘনীয়। তর্কচ্ছলে যদি ধরেও নেই এদের মতবাদ সত্য, তাহলে এখন এদেরকে বলব, এদের স্বপ্নের সেই স্বর্গরাজ্য উত্তর সিরিয়া ও উত্তর ইরাকে বাহ্যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আইসিসের জল্লাদরা সেখানে তাদের 'খিলাফত' ও তাদের 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের এদেশীয় 'খিলাফত ও ইসলামী হুকুমতপন্থীদের' কথায় যদি সামান্যতম সততা ও

খোদাভীরুতা থেকে থাকে, এরা সবাই যেন সবাই সেখানে গিয়ে 'স্বর্গে' জীবন কাটায়। সেখানে পৌঁছে এরা যেন এদের সমমনাদের সেখানে ডেকে নিয়ে যায়। একথাও বলে রাখছি, এদের কেউ কস্মিনকালেও সেখানে যাবে না আর তাদের সাথে একাত্মতাও ঘোষণা করবে না। কেননা এদের মুখের কথা আর মূল লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের কাজই হল, সমাজে বিভক্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করে রাখা।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল-কাদেরী আল-চিশতি ঃ এসব জঙ্গি সংগঠনের কাজ হলো ইসলামের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, তারা আসলে গণতন্ত্রও বিশ্বাস করে না এবং বাংলাদেশের সংবিধানও বিশ্বাস করে না, অথচ খিলাফত বা ইসলামী হুকুমতের মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র। বাংলাদেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্রে রয়েছে খিলাফত। এসব জঙ্গিদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে মওদুদি জামায়াত এবং ওয়াহাবীদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে খিলাফত বা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার যে লক্ষ্যে উদ্দেশ্যে এসব সংগঠন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তা আমি সমর্থন করি না। আসলে তারা গণতন্ত্র কীভাবে মানবে তারাতো বাংলাদেশের অস্তিত্বই মানে না।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করে যারা খিলাফত বা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে তাদের এই কথায় আমি একমত নই। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্বাচিত হয়ে করতে হবে। আমরা ইসলামী আন্দোলন-এর মাধ্যমে (চরমোনাই নেতৃত্বে) আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করে থাকি।

১৫. প্রশ্ন ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হয়– এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত জানতে আগ্রহী।

মাওলানা মিছবাহুর রহমান চৌধুরী ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে আমি এটার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান ঃ ওয়াজ মাহ্ফিলের আয়োজকদের স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের অনুমতি সাপেক্ষে অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক আলেমদের পাশাপাশী বিভিন্ন ধর্মের পুরোহিত, যাজকদের সমন্বয়ে বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লেভেল ফিল্ড তৈরি হয়।

আব্দুল্লাহ আল মামুন ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে যেসব বক্তব্য দেয়া হচ্ছে সেগুলো সমর্থন করি না।

মাওলানা এম এ মতিন ঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেছে। যেমন বদলে গেছে ওয়াজ মাহফিল। একসময় ওয়াজ মাহফিলে কোরাণ হাদিস ভিত্তিক আলোচনা হত। বর্তমানে সম্পূর্ণ তার বিপরীত।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে এসব সরকারিভাবে নজরদারি বৃদ্ধি করা জরুরি বলে মনে করি।

মাওলানা শেখ মাসুদুর রহমান ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে ওয়াজ মাহফিলের নামে যেসব আলোচনা হচ্ছে সেগুলো তদারকি করতে হবে। আমি এসব নারী বিদ্বেষী বক্তব্য সমর্থন করি না।

মাওলানা মোঃ ইউসুফ আল-কাদেরী ঃ আমি মনে করি ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে এখন সব থেকে বেশি খারাপ সময় যাচ্ছে। ওয়াজের নামে যার যা ইচ্ছা তাই বলছে, করছে। কোরাণ-হাদিসের বয়ান নেই, রাসূলের সিরাত নেই। শুধু চিৎকার চেঁচামেচি আর একে অন্যের দোষ ধরা এবং নারী বিদ্বেষী বক্তব্য সমাজে বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

মাওলানা মসিহোদ্দৌলা ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ওয়াজ-নসিহত আমাদের দারুণভাবে আহত করে। অধিকাংশ তরুণ-যুবক বক্তার ওয়াজ-নসিহতকে এখন আর ওয়াজ বলে মনে হয় না। এর বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মাওলানা এয়াকুব বাদশা ঃ ওয়াজ মাহফিলে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার বিষয়টি শুধু বর্তমানে না, এটা ৩০ বছর আগেও এই বক্তব্য দিয়েছেন, এবং তার আগেও। ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দিয়ে আসছে অনেক বছর আগে থেকেই কিন্তু হয়তো তখন মিডিয়া ছিলো না বলে মিডিয়াতে আসে নাই, মিডিয়া ছিলো না বলে অথবা তারা তখন ভিডিও করতে দিতো না বলে আমরা জানতে পারি নাই। বর্তমান মিডিয়ার যুগ তাই আপনাদের নজরে এখন এসেছে, ওয়াজের মাঠে তারা মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তারা নারী বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে মানুষের অন্তরে উগ্রতা সৃষ্টি করে দেয়, যেন মানুষের মনে অমুসলিম, নারী এবং ভিন্নমতের মানুষগুলো মানুষ না। এদের এই লাগাম টেনে ধরা লাগবে।

মাওলানা ফোরকান রেজা ঃ ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি দূর করতে হবে। ওয়াজের নামে ভিন্ন মতের লোকদের এবং নারীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল কাদেরী ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে যেসব বক্তব্য বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে সেগুলো দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাওলানা ছালাউদ্দীন দৌলতপুরী ঃ বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ সত্য আমি এটা সমর্থন করি না। আমি মনে করি ওয়াজের নামে বর্তমান সময়ের তরুণ যুবক আলেমরা খুব কুৎসিত পথে ধাবিত হচ্ছে। নোংরা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে। এই ধারা থেকে এখন বেরিয়ে আসা দরকার, পরিবর্তন দরকার এবং প্রশাসনিকভাবে ওয়াজ মাহফিলকে নজরদারির আওতায় আনা জরুরি বলে মনে করি।

মাওলানা ফোরকান আহমদ ঃ বর্তমানে ওয়াজ মাহফিল মানেই চিৎকার-চেচামেচি, হাসাহাসি, ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ আর পরচর্চা। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। নারী বিদ্বেষী বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে মানবাধিকার, ধর্মীয়, নিরাপত্তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বক্তব্য

কওমি মাদ্রাসায় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষানীতিতে উগ্রবাদ এবং অন্যান্য অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতাদের যে প্রশ্ন করা হয়েছিল একই প্রশ্ন করা হযেছে বিভিন্ন মানবাধিকার, ধর্মীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে। এই সব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে– ১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ২) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৩) আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ৪) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, ৫) বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ৬) বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ৭) সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, ৮) প্রজন্ম '৭১, ৯) রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি), ১০) ইন্সটিটিউট অব কনফ্লিক্ট ল এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১১) আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ, ১২) ব্লগার ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক, ১৩) বাংলাদেশ অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) এবং ১৪) সম্প্রীতি বাংলাদেশ। আলোচ্য বিষয়ে উক্ত সংগঠনসমূহের বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? কওমি শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনাদের মতামত জানতে চাই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ সংস্কারের প্রয়োজন আছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ অনুসারে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষানীতি এবং তার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তোলা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। কওমি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পারি, সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা হয় না। আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো- এখন পর্যন্ত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কাছে সঠিক কোনো তথ্য নেই। ২০০৮ সালে ব্যানবেইস-এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালাতে চেয়েছিল কিন্তু মাদ্রসাগুলো তথ্য প্রদানে অপরাগতা জানায় এবং বিভিন্ন বাধার মুখে এই সমীক্ষাটি করা সম্ভব হয়নি। কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হয় একাধিক শিক্ষাবোর্ড দ্বারা যার কোনোটাই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভূক্ত নয়। কাজেই মহিলা পরিষদ কওমি মাদ্রসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং তার ভিত্তিতে দ্রুত এবং জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন মনে করে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর পাঠ্যসূচি প্রকৃত অর্থে স্পষ্ট নয়। তবে যুগ যুগ ধরে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে

বিদ্যমান। এ ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ধর্ম চর্চা এবং ধর্মীয় অনুশাসনমূলক শিক্ষার প্রসার হচ্ছে বলে এ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্তরা দাবি করে থাকেন। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি ধারা– মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মিল না থাকলে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করলে বর্তমান প্রজন্ম বিশ্ব ব্যবস্থা এবং দেশীয় ধারা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে থাকবে। অবশ্যই এই ব্যবস্থার সংস্কার হওয়া উচিত।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার করার প্রয়োজন আছে। কওমি মাদ্রাসার বর্তমান ধারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে। এ থেকে উত্তরণের জন্য অর্থাৎ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যাতে সাম্প্রদায়িক, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা জরুরি।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই যুগের সাথে তালমিলিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে সংস্কার করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যদি বর্তমান বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয় তা হলে সংস্কার করা প্রয়োজন এবং সাধারণ ও চলমান শিক্ষাবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যুক্তিসঙ্গত।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ অবশ্যই কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে। প্রথমত: বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে সবাই সমনাগরিক ও সকলে সম অধিকার ভোগ করবার অধিকারী। সেখানে একটি ধর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকা অন্যদের অধিকারকে খর্ব করে। একারণে আমরা সার্বজনীন একমুখী সাধারণ শিক্ষা চালু করার কথা বলে আসছি, যেখানে শিক্ষার মাধ্যম (ইংরেজী, বাংলা, ইত্যাদি) আলাদা হলেও পাঠ্যক্রম একই রকম থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা একই রকম মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। আমরা মনে করি, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন একমুখী সাধারণ শিক্ষার আওতায় আসা উচিত। এছাড়া কোরাণের বঙ্গানুবাদ পড়ানো উচিত। বিজ্ঞান, অংকসহ ইসলামের ইতিহাসসহ কৃষক শ্রমিক-নারী আন্দোলনসহ বিশ্ব ইতিহাস তাদের পাঠ্য হওয়া উচিত।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা মনে করি, শিক্ষা মানবজীবনকে করে আলোকিত আর সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। তবে সে শিক্ষা হতে হবে বাস্তবমুখী। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানদক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলো অনুপস্থিত। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে কোরান সুন্নাহ, হাদিস অর্থাৎ দীন ইসলাম এর বাইরে কিছু শিক্ষা দেয়া হয় না। এই সব মাদ্রাসার শিক্ষায় সাহিত্য সংস্কৃতি, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনভিহিত থেকে যায়। ফলে শিক্ষা জীবন শেষে তারা উৎপাদনমুখী বা প্রশাসনিক কাজে কর্মসংস্থান তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এসব শিক্ষার্থী অনেকের মেধা থাকা সত্ত্বেও তা বিকাশের সুযোগ পায় না।

প্রজন্ম '৭১ ঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? কওমি শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনাদের মতামত জানতে চাই। একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ে আসা উচিৎ, যেখানে ইসলামসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ধর্মের মূল বক্তব্য সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই চার ধর্মের সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ অবশ্য পাঠ্য হতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা আসলে প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় কমিটি করা উচিত এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জনগণের কাছে উপস্থাপন করা উচিত। কারণ কওমি মাদ্রাসায় চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম এবং বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি কর্মসংস্থানমুখী নয়। ফলে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থীরা সমাজে কর্মসংস্থান করতে পারেনা ফলে তারা ধর্ম নিয়ে জীবিকা অর্জনের পথে হাঁটতে থাকে এবং উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভূগতে থাকে এবং মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সহজেই উগ্রবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং জঙ্গিবাদে জনবলের যোগান দেয়। সেজন্য মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীকে পরিমার্জন করে কর্মমুখী করে তোলা উচিৎ যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত শিক্ষাকে জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যবহার করে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমানভাবে তাল মেলাতে পারে। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন অপরিহার্য।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসা ভারতের দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলামের অনুসরণে বাংলাদেশেও নিজস্ব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে কেবলমাত্র ইসলামের মৌলিক বিষয়, কোরাণ, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদিই প্রধাণতঃ এর শিক্ষা কারিকুলামের বিষয়বস্তু। প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত, বাংলা ইত্যাদি একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রে এসব অচল। এদের জ্ঞানের পরিধিও থাকে অত্যন্ত সীমিত ও সংকীর্ণ। এর ফলে কওমি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্রে তারা মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। মসজিদ-মাদ্রাসা সহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেবল তারা নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে। এর ফলে সমাজে একটি অসুস্থ ও বৈষম্যমূলক অবস্থানের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় কওমি মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা কারিকুলামের সংস্কার সাধন করে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। সেই সাথে কেবল ইসলাম নয় বরং অপরাপর ধর্মের বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে বিকশিত করা। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে গতিশীল জীবন তৈরি করার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করা, প্রত্যক্ষভাবে নিজের ও পরিবারের এবং পরোক্ষে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণ সাধন করা। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা যার মূল হল ধর্মীয় শিক্ষা। এই শিক্ষায় সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি বা ইতিহাস, সব কিছুই ধর্মের সাথে যুক্ত। প্রযুক্তি, কুটনীতি ও

ব্যবস্থাপনার এই যুগে প্রতিযোগিতায় দেশকে টিকে থাকতে হলে দক্ষ মানব সম্পদ দরকার। দক্ষ মানবসম্পদের জন্য বিজ্ঞান, অংক, অর্থনীতি, ব্যবসাপ্রশাসন, লোকপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাসহ নানা বিষয়ে বিশদ লেখাপড়ার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতি উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়েই করা হয় যার কোনো প্রতিফলন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। ফলে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহন করেও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা চাকরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতাই অর্জন করে না। বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এরা মূলধারার পেশায় ঢুকতে পারে না।

সেকারণেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার করে শিক্ষার্থীদের আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার মূলধারায় পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা পদ্ধতি, মাণ নিয়ন্ত্রণ/উন্নয়ন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণয়ন ও তদারকি করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য নানা কার্যক্রম গৃহীত হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের আচরণও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। কিন্তু কওমি মাদ্রাসায় সরকারের কোনো ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণ শিক্ষার তুলনায় তাদের পাঠদান ও পরীক্ষার মান বোঝারও উপায় নেই। ফলে একই দেশে শিক্ষার্থীদের একটি বিপুল অংশ মূলস্রোতে আসতে পারছে না। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য শুভ নয়।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ আমরা মনে করি, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রতিটা শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করেই নিজের কর্মসংস্থান জোগাড় করতে পারে অথবা নিজে কারিগরি শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সহ জাতীয় ব্যক্তিত্বদের গৌরব গাঁথা ইতিহাস জেনে প্রতিটা কওমি শিক্ষার্থী যাতে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়-এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, মূলনীতি ও মতপথের অনুসরণে মুসলিম জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় উলামাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইলমে ওহীর শিক্ষাকেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত। অনেকেই এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদানও প্রদান করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকেন। অথচ বাস্তবতা এই যে এই শিক্ষা পদ্ধতি জীবন ও বাস্তবতার পরিপন্থী। এই শিক্ষা জীবনে কোনো কাজে আসে না। কাজেই অবিলম্বে এর সংস্কার দরকার।

২. কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা ও জাতীয় সংগীত না গাওয়ার বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া সমীচীন মনে করে কমিশন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ বিষয়টিকে আমরা রাষ্ট্র বিরোধী, রাষ্ট্রীয় নীতি বিরোধী ও অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে করি যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।। আমরা ইতোপূর্বেও এই বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা ১৯৭২-এ জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে যার প্রতিফলন বাধ্যতামূলক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৪(১) এবং Bangladesh National Anthem Flag and Emblem Order, 1972 এর অনুচ্ছেদ-২ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ The National Anthem Rules, 1978-এ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ রয়েছে। কাজেই কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা এবং জাতীয় সংগীত না গাওয়ার বিষয়টি সরকারি নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন না হওয়া ও জাতীয় সংগীত না গাওয়া দেশদ্রোহিতার সামিল। আইনসঙ্গতভাবে বিচার হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রয়োজন। এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে করতে হবে। শিশুর মনে দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা একটি উত্তম এবং অদ্বিতীয় পদক্ষেপ। কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরও এর আওতায় অবশ্যই আনা প্রয়োজন। একই দেশে দু'ধরনের প্রথা বা বিধান চালু থাকা মোটেও কাঙ্খিত নয়।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এধরণের আচরণ বা চর্চা রাষ্ট্রবিরোধী, সংবিধান লঙ্ঘনকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যকলাপেরই আওতায় পড়ে। এক্ষেত্রে মনিটরিং জোরদার করা ও শাস্তির আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক। কওমি মাদ্রাসা এবং আরও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ আইন দীর্ঘদিন ধরে অমান্য করে চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখেও না দেখার ভান করছে। আইন সবার জন্য সমান যা প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রজন্ম '৭১ ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা। এই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপের জন্য কঠোর নির্দেশনা, পালন না করলে সেই মাদ্রাসাকে শাস্তি ও জরিমানা এবং সরকারিভাবে কঠোর নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ। শিক্ষা মন্ত্রণায়ের উচিৎ এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম সবার জন্য সমান হতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা ও জাতীয় সংগীত দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং চর্চা দেশের প্রতি আনুগতের প্রকাশ। আগামী প্রজন্মের দেশের প্রতি দায়িত্ববান করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার অংশ। বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখে জাতীয় সংগীত গাওয়া কারোর ইচ্ছা নির্ভর হতে পারে না। মাদ্রাসায় বাংলাদেশকে অবমাননা ও অস্বীকার করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধর্মের নামে অস্বীকার নিঃসন্দেহে একটি উদ্ধৃতপূর্ণ আচরণ যা মেনে নেওয়া উচিৎ নয় এবং নতুন প্রজন্মকে ধর্মান্ধ করার কৌশল। তাই জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখে জাতীয় সংগীত গাওয়া অবশ্যই বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ মহানবী (সাঃ) বলেছেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। মহানবী (সাঃ) এবং খলিফাগণের সময়েও জাতীয় পতাকা বা গোত্রীয় পতাকাকে সন্মান দেখানোর রীতি দেখতে পাওয়া যায়। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত বিভিন্ন "রাজায" যা আধুনিক জাতীয় সঙ্গীতের পূর্বরূপ-এর প্রচলন ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মদিনায় প্রবেশ করেন তখন স্থানীয় শিশুরা তাঁকে কাসিদা বা সংগীত পরিবেশন করে স্বাগত জানায়। যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন রকমের রণসঙ্গীত, শত্রুপক্ষের বিপক্ষে "হাজাভ" (তিরষ্কার মূলক) বিভিন্ন পঙতি ও বাদ্য বাজানো হতো। মহানবী (সাঃ) ও তাঁর খলিফাগণ ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী নয় এধরণের দেশীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে সন্মান দেখিয়েছেন। বর্তমান যুগে জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত দেশপ্রেমের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে অবজ্ঞা করা দেশদ্রোহী মানসিকতার নামান্তর।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ এটি আইনের স্পষ্ট লংঘন। বাংলাদেশে জাতীয় পতাকা আইন অনুযায়ী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল কর্মদিবসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সংগীত এ সংক্রান্ত বিধিমালায় নির্দেশ আছে বিদ্যালয়ের দিনের কার্যক্রম জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু করতে হবে। বিদ্যালয়ের শুধু চার লাইন গাইলে হবে না, গাইতে হবে পুরো জাতীয় সংগীত। উল্লেখ্য যে, সব অনুষ্ঠানে পুরো জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার নিয়ম নেই। কেবল কিছু জাতীয় দিবসে পুরোটা বাজানো হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি কর্মদিবসে পুরোটা গাওয়া বাধ্যতামূলক।

একটি দেশ ও জাতি মূর্ত হয়ে উঠে সংবিধানের মাধ্যমে এবং এর প্রতীকী রূপটি প্রতিফলিত হয় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত একটি জাতির মৌলিক রূপ যা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, দেশের প্রতি আনুগত্য ও দেশপ্রেমকে মনে জাগিয়ে তোলে এবং বিশ্বের বুকে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেকারণেই বিদ্যালয়ে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাইবার নিয়ম করা হয়েছে যাতে শিশুকাল থেকে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের জন্ম নেয়। শিক্ষা হল প্রবহমান অনুশীলন যা একজন শিক্ষার্থীর মনে

গেঁথে যায় এবং পরবর্তীতে এর সুফল অর্জিত হয়। এর বাত্যয় হলে পরিণত বয়সে মানুষের মনে দেশ ও জাতি কোনো আবেগ তৈরি করবেনা ফলে মানুষ বিচ্ছিন্নতা বোধে আক্রান্ত হবে। ফলে যেকোনো মাধ্যমের বিদ্যালয় হোক, সাধারণ শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম বা মাদ্রাসা, প্রতিদিন সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেই হবে এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইতেই হবে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করার পেছনে মধ্যযুগয়ী ধ্যান-ধারণ আর ধর্মান্ধতা! যুগ-যুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কার লালন ও ধারণ করা কতিপয় কওমি শিক্ষকরাই মূলত এর জন্য দায়ী। আর রাষ্ট্র বা সরকারের সুনির্দিষ্ট মনিটরিং-ও এর দায় এড়াতে পারে না। আমরা মনেকরি, ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হলে কওমি মাদ্রাসাও দেশের প্রচলিত আইনের মাঝে পরিচালিত হবে, আইন মানতে বাধ্য। পতাকা উত্তোলন সহ জাতীয় সংগীতের প্রতিও কওমির শিক্ষক-শিক্ষার্থী শ্রদ্ধাশীল হবেন।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ দেশে প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের শিক্ষার্থীদের বৃহৎ অংশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। যেহেতু তারা এদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকেই স্বীকার করে না, তাই তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলনকে শিরক মনে করে এটাই স্বাভাবিক। শহর কিংবা মফস্বলের মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের বাইরে খুব একটা অন্য বই পড়ে না। একটি শ্রেণি অন্যান্য বই পড়তে আগ্রহী হলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়। দেশে কওমি মাদ্রাসায় চৌদ্দ লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। সুতরাং অবজ্ঞা না করে এদের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর অবদান, স্বাধীনতার চেতনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও তাদের মেধার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপর জোর দিতে হবে।

৩. কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা এবং পাঠদান বিষয়ে আপনাদের মতামত কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কওমি মাদ্রসাসহ সকল মাদ্রাসায় প্রতিবন্ধি, নারী, শিশুসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা মানবাধিকার সম্পর্কে পাঠদান করা এবং ফার্সি, উর্দুর পরিবর্তে আরবি, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা এবং অংক ও কারিগরী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ সকল ধরনের পাঠ্যসূচিতেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। তবে সেটি কিভাবে পাঠদান করা হচ্ছে সে বিষয়ে মনিটরিং থাকতে হবে। আমাদের দাবি- বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে মাদ্রসা শিক্ষার পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করতে হবে ও সেখানে সঠিকভাবে পাঠদান করা হচ্ছে সেই বিষয়ে সরকারকে মনিটরিং করতে হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ শুধু কওমি মাদ্রাসা নয় সকল শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন এবং পাঠদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। যারা এটি জানে না বা জানতে চায় না তারা বাংলাদেশের শত্রু।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা এদেশের সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য তাদেরও জানতে হবে; ধারণ করতে হবে। একই দেশে দু'ধরনের শিশু মানসিকতা তৈরি করা ঠিক নয়। আমরা মনে করি কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা একান্তই প্রয়োজন।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানলেই রাষ্ট্রবিরোধী, সংবিধান লঙ্ঘণকারী আচরণ পরিবর্তন হবে না, কওমী মাদ্রাসাকে একীভূত সাধারণ শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। একইসাথে ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষকদের মানবাধিকার, সংবিধান, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, ইহজাগতিকতা, অন্তভর্ভুক্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজনের দাবিতে সোচ্চার। প্রতিটি নাগরিকের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা উচিত। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। এরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এটা দু:খজনক। সকল মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ স্তর ভেদে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতাকারে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

প্রজন্ম '৭১ ঃ সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র সহ সরকার অনুমোদিত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন ও পাঠদান করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টিতে যে বাংলার মানুষের কোন উপকার হয়নি, বরং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের শোষণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে নৃশংসতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল– সেই তথ্য সন্নিবেশিত হতে হবে। জামাত এবং রাজাকার-আল বদরদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে উল্লেকফ থাকতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেরোরিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ দেশ প্রেম ঈমানের অংশ। এ বিষয়ে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাংলাদেশের সব নাগরিক এই সম্পদে সমৃদ্ধ হবেন সেটাই প্রত্যাশিত।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের একটি গৌরবময় অধ্যায়। নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধকে জানা অতীব জরুরি কারণ জাতির বীরত্ব গাঁথা ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা এবং পঠন মাদ্রাসা সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারা দেশের মূল ধারার শিক্ষার্থীদের মতোই এদেশের সন্তান। নিজেকে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা অবশ্য জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের দেশের প্রধান ভিত্তি, আমাদের মহান রাষ্ট্রীয়

দর্শন। অতএব, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল কওমি মাদ্রাসায়ই নয় বরং দেশের সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এবিষয়ে পাঠদান অত্যন্ত জরুরি।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে নিজ পরিচয়, অধিকার, সার্বভৌমত্ব পেয়েছে। এই ইতিহাস শিশুদের জানতে হবে। জেনে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে। দেশের জন্য যারা নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন, তাদের কথা জেনে মনের ভিতর আবেগ ও কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি করতে হবে। নিজের জন্ম পরিচয় যেমন জানা ও মানা গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের জন্ম, যুদ্ধের কারণ, বিসর্জন ও অর্জন তা জানা ও ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এই দেশেরই নাগরিক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে তাদেরকেও এই ইতিহাস পড়তেই হবে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও কওমির শিক্ষার্থীদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে। জাতির পিতা কি, হাজার বছরের বাঙালি কিভাবে নির্ণয় করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু উপাধী কবে এবং কিভাবে দেওয়া হয়েছে, বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সহ বঙ্গবন্ধুর ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরব গাথা ইতিহাস কওমি শিক্ষার্থীদের জানা সম্ভব হবে। কওমি শিক্ষার্থীদের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হলেই এদেশে স্বাধীনতার জন্য শহীদ হওয়া ত্রিশ লাশ তাজা প্রাণ ও দুই লক্ষেরও বেশি সম্ভ্রম বিনাশে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে, দেশাত্মবোধ তারাও বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হতে পারবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ খুব দেরি হয়ে গেলেও আমরা মনে করি যে, এখনো সময় আছে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার এখনই প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদেরকে স্বাধীনতার চেতনা ও শিক্ষায় পারদর্শি করতে হবে। প্রথম দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তাদেরকে সন্নিবিষ্ট করাতে প্রয়োজনে নানা ধরণের প্রনোদনা দেওয়া যেতে পারে।

৪. কওমি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষে তেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। এর কারণ কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ কওমি শিক্ষার্থীদের ফার্সি, উর্দু এবং আরবি হেফজ করার পাশাপাশি কারিগরী ও বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ তৈরি করা হলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ বেকারত্ব নিরসনের জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক, সৃজনশীল, বৈশ্বিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষার্থীরা সেইরকম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এর ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা যা বোঝায় কওমি মাদ্রাসায় সে অর্থে সে ধরনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় পেশাগত জীবনে বহুবিধ চ্যালেঞ্জে পড়ে যাচ্ছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। নিঃসন্দেহে এ ধরনের শিক্ষার্থীরা

কর্মজীবনে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে বা হচ্ছে। এতে করে একটি জনগোষ্ঠী বিশেষ শ্রেণিবদ্ধ হয়ে পড়ছে। যেটা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য বহুবিধ সংকট তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ পর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষায় শিক্ষিত কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উপযোগী 'কর্মক্ষেত্র' শুধু বাংলাদেশে কেন বিশ্বের কোন দেশেই না থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা একটি এককেন্দিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মূলতঃ ধর্মীয় শিক্ষাই এখানে দেয়া হয়। সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব না থাকায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে বাস্তবতার সাথে তাল সে মিলাতে পারে না। ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত থাকে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা/পদ্ধতি শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক এককেন্দ্রীক পশ্চাদমুখী শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের দক্ষতাস স্পন্ন যুগোপযোগী করে তুলতে ব্যর্থ হয় বিধায় কওমি শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ ১নং প্রশ্নের উত্তরেই এর জবাব আছে। কারণ হলো- কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কোরাণ-হাদিসের বাইরে প্রয়োগিক শিক্ষা নেই। উৎপাদনমুখী বা প্রশাসনিক যে শিক্ষা কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন তা এদের নেই। এ বিষয়ে কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

প্রজন্ম '৭১ ঃ বাস্তব জীবন নির্ভর ও কারিগরী কোনো শিক্ষা থাকলে তাদের কর্মসংস্থান হতে পারে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব কর্ম জগতের কোনো মিল নেই।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ কর্মসংস্থান উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয় সেই হেতু কর্মসংস্থানের সুযোগ শুধু সীমিত নয় একেবারে নেই বললে চলে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ কওমি শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ কারিকুলাম-এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের বাংলা, ইংরেজী এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। সে কারণে কওমি শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা, মসজিদ এবং এতদ সংশ্লিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও কাজ পাওয়ার বা করার সুযোগ পায় না যোগ্যতা রাখে না।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ কওমি বোর্ড কর্তৃপক্ষ দাবি করে 'সেখানে ইঞ্জিনিয়ার বানানো হয় না, বৈজ্ঞানিক বানানো হয় না, ডাক্তার হয় না, দার্শনিক হয় না। ইসলামী শিক্ষার মধ্যে গভীর জ্ঞানী হয়। এটা একটা বিভাগ যেখানে ইসলামী শিক্ষায় গভীর জ্ঞানী করে তোলা হয়'। বাস্তবে এই শিক্ষার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে দেশের প্রশাসন, আর্থিক খাত, শিক্ষা ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও শিল্পখাত, অবকাঠামোসহ সকল উন্নয়ন খাত চালাতে জনবলের যে যোগ্যতা থাকা দরকার, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সেই যোগ্যতা তৈরি হয় না। প্রাইভেট সেক্টরের বিশাল কর্মযজ্ঞে তারা

ঢুকতেই পাওে না। ফলে একটা বিপুল জনগোষ্ঠী শুধুই ধর্মীয় লেখাপড়ায় আটকে যায়, নিজের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারে না। কওমি মাদ্রাসা বোর্ড সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও আরবী বিভাগের সিলেবাসের সাথে তাদের উচ্চশিক্ষার সিলেবাসের মিল আছে। তা যদি থাকেও বাংলাদেশের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দু'টি বিভাগ আছে তার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার সাথে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী যোগ হলে যে সংখ্যা হয় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ বা চাকুরির সংখ্যা তার ধারে কাছেও নেই। ফলে এই বিপুল সংখ্যক তরুণের বেকার থাকা ছাড়া গতি নেই।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ আমরা মনে করি, একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতির কারণে যা রাষ্ট্রের কোনো দাপ্তরিক কাজে মূল্যহীন। আর এখানেই রাষ্ট্রকে রীতিমত গবেষণা করে সময় উপযোগি ও বাস্তবমুখী শিক্ষা পদ্ধতি ও কওমি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবন-মান নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসার অন্ত:সারশূণ্য কারিকুলাম বাতিল করে সময়োপযোগী শিক্ষা সম্প্রসারণ করা দরকার। কওমির শিক্ষা দিনের পর দিন শুধু অন্ধকারের সন্ধানই দিয়েছে। ২০২২ সালে এসে এটির কোনো প্রয়োজনই নেই। কাজেই এর সংস্কার ও সংকোচন এবং পাশাপাশি অধিকহারে কারিগরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। কারণ এ মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানির একটি সুযোগ এসেছে। এই বাজার ধরতে হলে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

৫. কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে, এই বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ কেবল কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয়, বিষয়টি সঠিক নয়। হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আমরা দেখেছি হামলাকারী জঙ্গিরা কেবল মাদ্রাসা পড়ুয়া গরিব ঘরের নয়, নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া ধণী পরিবারের সন্তানরাও জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে। তাই, জঙ্গিবাদ নিরুৎসাহিত করার জন্য কওমি মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিষয় সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তোলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। আর স্বাধীনতা, জাতীয় বিকাশ ও মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস জানার মাধ্যমে দেশপ্রেম গড়ে উঠে কিন্তু কওমি মাদ্রাসার পাঠক্রমে এই সকল বিষয় অনুপস্থিত। সেখানে অসাম্প্রদায়িকতার কোনো পাঠ দান করা হয় না। বরং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে তারা জাতীয় সঙ্গীত গায় না বা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে না। উপরোন্ত সাম্প্রদায়িক চর্চার ফলে উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে উঠে। কাজেই এরকম পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ভাবে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ কওমি মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী জঙ্গি হয়ে উঠবে এমন ধারণা করাটা সমীচিন নয়। ধর্মীয় আগ্রাসনের যে চিত্র পৃথিবী জুড়ে,

সেখানে ধর্মভিত্তিক পড়াশোনায় যুক্ত তাকা শিক্ষার্থীরা অনেক সময় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে কিংবা হচ্ছে। তাদের ব্যবহার রকা সহজ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে বিগত দুই দশক ধরে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের নজির আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করার কাজটা অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাস জঙ্গি তৈরির কারখানা।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। আমরা মনে করি বিষয়টিকে নিয়ে কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে; যাতে সাধারণের মনোভাব তাদের প্রতি ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হয়। আমরা চাই আমাদের সকল শিশুরাই যেন মৌলিক এবং সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ ধর্মকেন্দ্রীক, সাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, ভুল শিক্ষার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে জঙ্গি, মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক এবং কওমি মাদ্রাসাগুলো জঙ্গি তৈরি করার কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ এ অভিযোগ কোনো কোনো কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে গণমাধ্যমেও এসেছে অতীতে। তবে সব মাদ্রাসা সম্পর্কে ঢালাও ভাবে বলা ঠিক হবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানে গোপনে একাজটি করে থাকতে পারে, বিশেষ করে যেসব শিক্ষক মধ্যপ্রাচ্য বা আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা এ কাজে সম্পৃক্ত থাকতে পারে।

প্রজন্ম '৭১ ঃ ঢালাও ভাবে হয় বা হয় না– এ কথা বলা যাবে না। তবে অনেক বছর ধরে এরকম আমরা শুনে আসছি এবং মাঝে মাঝে এর প্রমাণ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে জরিপ ও গবেষণা দরকার। সেই জরিপ ও গবেষণার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেরোরিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মান্ধতার প্রতীক। রাজনৈতিক ইসলামের ছদ্মবেশী ধার্মিকরা সহজেই অন্ধ বিশ্বাসী কোমল মনের ছেলে মেয়েদের জঙ্গিবাদের দিকে নিতে পারছে।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক এখানে ধর্মের নামে উগ্রবাদের মতাদর্শকে নতুন প্রজন্মের কোমল মতি শিশুদের অন্তরে স্থাপন করে তাদের ধর্মান্ধ করা হয়। সেখান থেকে কৌশলে জিহাদের নামে উগ্রবাদ ছড়িয়ে দেয়। কোনো কোনো মাদ্রাসা সক্রিয়ভাবে জঙ্গি তৈরিতে সরাসরি আংশ নেয় এবং অন্যান্যরা জঙ্গিবাদ বিস্তারে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ উল্লেখিত অভিযোগটি ঢালাওভাবে সব কওমি মাদ্রাসার জন্য প্রযোজ্য না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পেছনেও রয়েছে সংকীর্ণ এবং উগ্র তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা যেখানে ইসলামের উদার এবং পরমত সহিষ্ণু বিষয়গুলো শেখানো হয় না। বরং গোড়ামী এবং উগ্রতা শেখানো হয় এবং ছোটবেলা থেকেই তাদের মনমানসিকতা সেভাবে গড়ে তোলা

হয়। ভালোবাসা ও উদারতার পরিবর্তে শেখানো হয় সংকীর্ণতা, হিংসা। বিশেষ করে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিষয়ে তাদের মাঝে ঘৃণা ছড়ানো হয়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ শিক্ষক, যাদেরকে তারা ওস্তাদ বলে ডাকে তাদের কাছ থেকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসদাচরণ এবং দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে, ফলে তাদের মনের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে যা খুব সহজেই জঙ্গি ও উগ্র মানসিকতার দিকে মোড় নেয়। এছাড়া দারিদ্রের জাঁতাকলে পিষ্ট এক শ্রেণির ছাত্রদের মাঝে পরকালের জান্নাত ও 'হুর' লাভের লোভ দেখিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সফল মগজধোলাই প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। পাকিস্তানে এধরণের জঙ্গিবাদের উত্থান লক্ষ্য করা গেছে, যার প্রভাবে বাংলাদেশ সহ কয়েকটি দেশেও এধরণের কার্যকলাপের চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ কম। খেলাধুলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তাদের নেই বললেই চলে। বদ্ধ জগতে কঠিন শৃঙ্খল ও শারীরীক মানসিক নিপীড়নে বেড়ে উঠার ফলে তাদের মানসিক বিকাশ কম হয়। মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মন, মুক্ত পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ দক্ষতা, আবেগ ও মানবিক আচরণ তাদের মধ্যে গড়ে উঠে না। এছাড়া অর্থনৈতিক টানপোড়েন, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদায় বৈষম্য এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের মনের দিক থেকে প্রায় পঙ্গু করে রাখে। মুসলিম সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো সহজেই তাই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কাজে লাগাতে পারে। তাদের মিষ্টি কথায় ফাঁদে পা দেয় শিক্ষার্থীরা। ওদের বেড়ে উঠার ক্ষত দিতে প্রবেশ করে জঙ্গি হওয়ার মত ধ্বংসাত্বক ব্যাধি।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ বোয়াফ গবেষণা টীম দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে গড়ে উঠা বেশ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে, বেশ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসায় শারীরিক ব্যায়াম বা আত্মরক্ষার নামে গোপনে বাছাইকৃত কওমি শিক্ষার্থীদের জঙ্গির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যদিও স্থান, কাল ও ব্যক্তির ওপর পুরো বিষয়টি নির্ভর করে এবং অতি গোপনীয়তার সাথে করা হয় বলেই বেশ কিছু কওমি শিক্ষার্থী আমাদের জানিয়েছেন। আমরা মনেকরি, এখানে রাষ্ট্রের উদাসহীনতা বিদ্যমান। যদিও সিরিজ বোমা আর হলি আর্টিজান হামলার পরে দেশীয় জঙ্গিগোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সুযোগ পেলে ছোট-ছোট গ্রুপগুলোও একদিন মহা শক্তিতে রূপান্তর হতে দেরি করবে না।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরি করে এটি আংশিক সত্য। তবে একথা শতভাগ সত্য যে, কওমি শিক্ষা জঙ্গি তৈরির সিড়ি তৈরি দেয়। বই বিক্রির সাইট 'রকমারি'তে খোজ নিয়ে জানা যায়, গেল এক বছরে যে ৩০টি বই বিক্রির শীর্ষে ছিল, এর মধ্যে ১২টি ছিল ধর্মীয় ভাবধারার। এই বইগুলো পড়লে কি হয় তা সহজেই অনুমেয়। এসব পড়লে আর যাই হোক চাঁদে যাওয়া যাবে না, চাকরির বাজারেও এগুলো কোনো সুফল আনবে না।

৬. কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে সংগঠন বিশেষের বিরুদ্ধে, এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য জানতে চাই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করবে এটাই প্রত্যাশিত। তাদেরকে যারা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসায় ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার শুধু অভিযোগ নয়, ২০১৩ সালের হেফাজতের সমাবেশে দেশের সকল জনগণ এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ বাংলাদেশে অনেক সময়ে ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এ দেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা শিক্ষা সংস্কৃতিকসহ মূল ধারার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যা একটি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অপতৎপরতা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে করছি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত শিবিরের Recruiting Source হচ্ছে কওমি মাদ্রাসা।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে; মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে। শিশু বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা সমাজ, দেশ এবং রাজনীতির জন্যও সুখকর নয়।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনতা বিরোধী, ৭১'র ঘাতক ও দালালেরা, ধর্মের লেবাস নিয়ে কওমি মাদ্রাসার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকে পড়েছে এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ শুধু কওমি মাদ্রাসা নয় অন্যান্য যে সকল মাদ্রাসার প্রধানরা সরাসরি রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সক্রিয় তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গণজমায়েত বা দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করেন। নামকরা সকল কওমি মাদ্রাসার প্রধানগণ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন যা স্বীকৃত। শাপলা চত্বরের সমাবেশে তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়াও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে প্রায়শই অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়।

প্রজন্ম '৭১ ঃ আমরাও এরকম শুনেছি। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের উদ্যোগ নিতে পারে। সরকারি উদ্যোগেও নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দখল করতে হবে। এইসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় এ কাজ করেছে। ২০১৩ সালে ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরের

সমাবেশ থেকে হেফাজত, জামায়াত, বিএনপি উগ্রবাদী ইসলামীক দলগুলো একত্রিত হয়ে বৈধ সরকারকে অবৈধভাবে উৎখাতের হুমকি ছিল কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বড় এক উদহারণ।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও বলাৎকার নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের ধোয়ায় দিয়ে সহজেই দায়মুক্তি পাওয়ার নজির অনেক পাওয়া যাবে। নির্যাতন করে শিশু কিশোরদের মনে ভয়ের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রবণতাকে হত্যা করে তাদের মানসিকভাবে কৃতদাস বানিয়ে রাখতে চায়। শিশু কিশোরদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার দায় রাষ্ট্র ও সমাজের।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসা এবং এর সংগঠন নিজেদের "অরাজনৈতিক" দাবি করলেও বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মের আবরণে বিভিন্ন সময়ে তারা রাজনৈতিক ইস্যুতে বক্তব্য প্রদান এমনকি সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছে। ২০১৩ সালের ৫ এপ্রিল এবং একই সালের ৫ ও ৬ মে শাপলা চত্বরে হেফাজতের কর্মকান্ড এবং ৫ মে সারাদিনব্যাপি রাজধানী ঢাকায় তাদের তাণ্ডব এবং সমাবেশে তাদের বক্তব্যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের এমনকি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের অভিলাস পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া কওমি মাদ্রাসার নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের সাথেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। অতএব মুখে ধর্মের কথা আর অরাজনৈতিকতার কথা বলা হলেও তাদের কাজের কাজকর্মের পেছনে একটা রাজনৈতিক অভিলাস কাজ করে আর এক্ষেত্রে তারা কোমলমতি ছাত্রদের ব্যবহার করে থাকে। কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের তাদের শিক্ষকের কথা বা নির্দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আদেশ অমান্য করলে তাদেরর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কওমি মাদ্রাসার সব কর্মসূচিতেই শিশু-কিশোর বয়সী ছাত্রদের বেশি দেখা যায়।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। এতিম শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রচুর। এখানে শিক্ষার্থীদের মূল অভিভাবক বনে যায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। ভিক্ষার মত করে চাঁদা আদায়সহ রাজনৈতিক কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারে কর্তৃপক্ষ কোনো বাধার সম্মুখীন হয়না। নিজেদের রাজনৈতিক অভিলাষ পূর্ণ করতে যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগসহ সন্ত্রাসী কর্মে তাদের নিয়োজিত করে।

২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বর থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে তান্ডব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা চালিয়েছে তা সম্ভব হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অবরুদ্ধ জীবন ও অসহায় অভিভাকদের আত্মসমর্পণের কারণে। সরকারকে অবশ্যই এই শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারও হাতিয়ার হিসেবে যেন তারা ব্যবহৃত না হয়, সে সুরক্ষা সরকারকেই দিতে হবে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের কর্মকাণ্ড দ্বারা এটাই প্রতীয়মান, কওমি শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, করা হচ্ছে যা এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। আর বাংলাদেশের ইতিহাসে ৫ মে একটি কালো অধ্যায়। সাম্প্রদায়িক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম কতটা ভয়ঙ্করভাবে রাজধানীকে কিভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে, কিভাবে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, পবিত্র কোরাণ শরীফ পোড়ানো হয়েছে, কিভাবে রাস্তার মাঝখানের গাছগুলো কাটা হয়েছে-সভ্য জাতি এরকম বর্বরতা আগে কখনো দেখেছে বলে আমাদে মনে হয় না। সেসময়ের গণমাধ্যম বিশেষ করে, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যালেনগুলো সম্প্রচারিত তথ্য-প্রমাণে এটাই প্রতীয়মান, কওমি শিক্ষার্থীদের অপরাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সুযোগ পেলে করবেও!

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ 'আমাদের টার্গেট দক্ষ আলেম তৈরি, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার নয়' - এটি হুজুরদের কমন ফেনোমেনা। সুতরাং তারা ইসলামীক রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। আলিয়া এবং কওমি ছাড়াও হাফেজিয়া, ফোরকানিয়া ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে। মাওলানা আহমেদ শফীর নেতৃত্বে কওমি শিক্ষাবোর্ড সর্ববৃহৎ হলেও, এর বাইরে আরো পাচটি কওমি শিক্ষাবোর্ড আছে, যারা স্বাধীনভাবে মাদ্রাসা এবং কওমি শিক্ষা পরিচালনা করে। বাংলাদেশের প্রধানত মসজিদকে কেন্দ্র করেই কওমি মাদ্রাসাগুলো গড়ে উঠেছে। এই মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রধানত আবাসিক। লিল্লাহ বোডিং-এর আওতায় তাদের থাকা, খাওয়া এবং পড়ার খরচ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষই বহন করে। জাকাত, ফিতরা, কোরাবানির চামড়া, অনুদানের টাকায়ই মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয়। যেহেতু গণমানুষের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত নয় তাই মানুষ সম্পর্কে তাদের প্রথম থেকেই একটি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে বড় হতে থাকে। এদের জঙ্গি বানানো যেমন সহজ, তেমনি একরোখা হওয়ায় তাদের মাধ্যমে জিহাদ ঘটানোও সম্ভব।

৭. কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ মাদ্রাসার শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন ধর্ষণ ও বলাৎকারের ঘটনা গণমাধ্যম সূত্রে আমরা জানতে পারি। ইসলাম ধর্মে ধর্ষণ ও বলাৎকার একটি কবিরা গুনাহ। সভ্য সমাজে এ ধরণের ঘৃণ্যতম ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকসহ যারা জড়িত রয়েছে তাদের সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি এ ধরণের অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইতোমধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও মসজিদের ইমামদের সাথেও মতবিনিময় করেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু কওমি মাদ্রাসার

শিক্ষক নয়, আমাদের দেশের যে কোনো নারী, কন্যা ও শিশুর উপর যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণসহ নারীর প্রতি যে কোনো সহিংসতার প্রতিরোধে সোচ্চার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ । এ বিষয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল প্রতিষ্ঠানে যে অভিযোগ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে মহিলা পরিষদ সেই রায়ের বাস্তবায়নের দাবি জানায়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই অভিযোগ কমিটি থাকতে হবে। এই রায়ের আলোকে যৌন হয়রানী প্রতিরোধে একটি পৃথক আইন তৈরিরও দাবি জানায়। মহিলা পরিষদের আহবান পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল প্রকার লিঙ্গীয় বৈষম্য নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নির্যাতনমুক্ত মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে তরুণ সমাজকে যুক্ত হতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অভিযোগ করতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের অভিযোগ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়। কওমি মাদ্রাসা সাধারণত আবাসিক এবং শিক্ষার্থীদের বয়স কম হওয়ায় নির্যাতনের অভিযোগগুলো স্পর্শকাতর। বিশেষত বলাৎকারের ঘটনাগুলো শিশুর মনোঃবিকাশে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এ ধরনের নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষার্থীরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষায় রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্য দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বলাৎকার হিসেবে বিষয়টি চিহ্নিত না হয়ে ধর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আইন সংস্কার হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের অভিযোগের ব্যাপারে আইনগতভাবে কড়া পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ এ ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত এবং অনভিপ্রেত। কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে; এ ধরনের বির্তকের উর্ধ্বে থাকার সকল ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের। বিষয়গুলো সরকারকেও তলিয়ে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের যে অভিযোগগুলো রয়েছে তা সত্যি এবং এধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে থাকেন যা কখনোও কখনোও সামনে আসে, এখনও ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের ঘটনা বিচারাধীন রয়েছে। এখানেও তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মকে ক্যবহার করে। একারণেই কওমি মাদ্রাসাগুলোতে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন, একইসাথে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতন, ধর্ষণ, বলৎকার ইত্যাদি নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ হিসেবে সর্বত্র বিবেচিত। শুধু কওমি মাদ্রাসা নয় সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু শিক্ষক সম্পর্কে এ অভিযোগ প্রমাণিত। ধরা না

পড়া পর্যন্ত সবাই আদর্শ শিক্ষক। এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রচার জোরদার করা এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রজন্ম '৭১ ঃ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য যৌন হয়রানি ও নির্যাতন কি ও সেই সংক্রান্ত আইন কি বলে, সেই সম্পর্কে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সরকারি হেল্পলাইন (যেমন ১০৯, ৯৯৯ ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেরোরিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ মানুষের ভেতর সহজাতভাবে যে পশু শক্তি বা রিপু রয়েছে তা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানবিকতা ও নৈতিকতার শিক্ষায় কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষকরা শিক্ষিত নয়। পোশাকধারী নামকাওয়াস্তে আলেম ওলামা নামের ছদ্মবেশকে তারা অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে এমন ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাসে তারা এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা উল্লেখিত অপরাধগুলোর সংবাদ আমরা জানতে পারি। ইতিমধ্যে এসবের হোতাদের অনেকেরই আদালতে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি হয়েছে এবং অনেকের বিচার চলছে। এ ধরণের ঘটনা কেবল সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং পবিত্র ধর্ম ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও জঘন্য অপরাধ। সে কারণে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারী বাড়ানো এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মনে করি।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ আগেই বলেছি মাদ্রাসা একটি অবরুদ্ধ জায়গা যেখানে স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ অনুপস্থিত। প্রবহমান পানিকে ডোবা বা গর্তে আটকে দিলে তা পঁচে যায়। মাদ্রাসায়ও তাই হয়েছে। এছাড়া এদের শিক্ষণ পদ্ধতি মধ্যযুগীয়। শারীরীক কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তারা শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করে ও বশ মানায় এবং ধর্মের নামে ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রতিবাদ করা ও প্রকাশ করা থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিবৃত্ত রাখে। দিনের পর দিন ধর্ষণ ও বলাৎকারের মত কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে এরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এরা শিক্ষার্থীদের মনোবল ও জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। শারীরীক আঘাত, ধর্ষণ ও বলাৎকার শিক্ষার্থীদের মনেও সুপ্ত বীজ হয়ে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সরকার ও সমাজের প্রত্যক্ষ দেখভালের সুযোগ না থাকায় এই অপরাধ ঘটে চলেছে যা একটি সুষ্ঠু সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবিলম্বে এই বর্বরতা বন্ধ হওয়া উচিত। চিহ্নিত নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তির আওতায় আনা উচিত। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এধরণের অপরাধ সংগঠিত হবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ বোয়াফ গবেষণা টীম দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে গড়ে উঠা বেশ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিলাসী জীবন-যাপন করলেও কওমি শিক্ষার্থীদের জীবনে নেমে আসে অত্যাচার, নির্যাতন আর ধর্ষণ,

বলৎকারের মতন জঘন্য বর্বরতা। দিনের বেলায় মুষ্ঠিবদ্ধ চাউল বা ভিক্ষা, যাকাত, ফিতরা ও অনুদানের অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাতের বেলায় বেশ কিছু বর্বর কওমি শিক্ষক দ্বারা বলৎকারের শিকার হয়- এমনটাই স্বীকার করেছেন বেশ কয়েকজন কওমি শিক্ষার্থী।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ 'মা গো তোমার একটি ছেলে মাদ্রাসাতে দিও, এই পৃথিবীর বুকে তুমি জান্নাত কিনে নিও'-এ ধরণের গান গেয়ে শিক্ষকেরা ছাত্র সংগ্রহ করে। তাই কওমি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পেটানো এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগ বারবার উঠে এলেও এসব নির্যাতন বন্ধে কার্যত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ দেখা যায়নি। আবার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও জোড়ালো কোনো দাবি জানানো হয় না। তারা মনে করে এটি নিয়মিত জীবনযাপনের একটি অংশ এবং ছাত্রদের প্রাপ্য।

৮. কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মিতই উষ্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের কঠোর অবস্থান। জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপন সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদসহ সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দা প্রস্তাব ৯১তম কমিশন সভায় গৃহীত হয়। সভায় জাতির পিতার নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনসহ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সকলেই বক্তব্য রাখেন। ভাস্কর্য ভাঙচুর করে তাঁর প্রতি যে অসম্মান করা হয়েছে তা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জেনেছি যে, কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্মাণাধীন ভাস্কর্যটির বিভিন্ন অংশ দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলেছে। এ বিষয়ে তারা কঠোর অবস্থানের ঘোষণাও দিয়েছে।

দেশে ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে বিতর্ক এটাই প্রথম নয়। একটি কুচক্র গোষ্ঠী হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে সমাজে এক ধরণের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এধরনের ঘটনা কোনো গণতন্ত্রকামী দেশ বা নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই ঘটনার সাথে জড়িদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানায়। একই সাথে যে উগ্রবাদী গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙার যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদেরও চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে দেশের প্রগতিশীল চেতনায় আঘাত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে অপরাধ। সম্প্রতি জাতির জনকের ভাস্কর্যসহ নানা ইস্যুতে কওমি শিক্ষার্থীদের দিয়ে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টায় একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তৎপর রয়েছে। তাদেরকে প্রতিরোধ বা এক কথায় তাদেরকে নিবৃত করার জন্য প্রচলিত আইনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করছি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসার সরকার বিরোধী তথা রাষ্ট্রবিরোধী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে নেওয়া কঠোর পদক্ষেপকে নির্মূল করা এখন সময়ের প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা রাজপথে নেমে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং মারমুখি আচরণ করেছেন তা জাতি প্রত্যাশা করে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছেন তা মোটেও সঠিক ছিল না। আমরা মনে করি জাতির জনক যিনি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি, মহানায়ক তাঁর ভাস্কর্য বিরোধিতা করে প্রকারান্তরে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন এবং পাকিস্তানি চিন্তাভাবনায় যে তারা এখনো তাড়িত তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা মনে করি, জাতির জনকের ভাস্কর্য যথা স্থানে যথাযথ মর্যাদায় স্থাপন করতে হবে। আগামী প্রজন্মের কাছে এই মহানায়ককে তুলে ধরতে হবে। দেশের স্বার্থেই তা করতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা এবং শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় নামিয়ে আনে এবং বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী এবং সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এবং একইসাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে যা অত্যন্ত ন্যক্করজনক ঘটনা। জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপন এটি ইতিহাসকে সমুন্নত রাখারই অংশ, ধর্মের নাম দিয়ে এ ইতিহাসকেই ভুলুণ্ঠিত করতে চায়। দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসী জঙ্গি হিসেবে যারা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ছে তাদের বয়স ২২ থেকে ৩০-এর মধ্যে। মানবতার দুশমনেরা খুব সচেতনভাবে তরুণদের বিভ্রান্ত করছে, বিভ্রান্ত করছে নারীদেরও। সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদি অপতৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ আমাদের উদ্বেগকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন বাসায়, মেয়েদের হলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালিমের নামে এরা বিভ্রান্ত করছে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান এটা তাদের রাজনীতির কৌশল। সরকার কেন মৌলবাদী রাজনীতি এখনও নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে না এটা আমাদের বোধগম্য নয়। ভাস্কর্য এবং মূর্তির মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য মানে না। একদিকে ভাস্কর্য সম্পর্কে জনমনেও ভ্রান্তি আছে। তারা সেই সুযোগ নিচ্ছে। এজন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার ঐক্যবদ্ধ ভাবে। সরকার এব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করে আসছে।

প্রজন্ম '৭১ ঃ এই ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এই ধরণের ধ্বংসাত্মক কাজে যারা লিপ্ত হয় বা হতে পারে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপনা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং এইভাবে নতুন প্রজন্ম ও বিদেশীরা বাংলাদেশের জাতীয় নায়কদের সম্পর্কে অবহিত থাকবে। এ সকল স্থাপনা ও ভাস্কর্যের নিরাপত্তা বিধান সরকারের দায়িত্ব।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ অন্ধ ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এটা করছে। বাংলাদেশে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি যারা করছে তারা একাত্তরের পাকিস্তানি দোসর ও সহযোগী। তারা একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এটা করছে। তরুণ প্রজন্মকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্য স্থাপন জরুরি।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ মাদ্রাসাগুলোর নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক মোল্লাদের হাতে। সরকারের সাথে দরকষাকষি ও দেন দরবার করে অনেক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করে দেশীয় রাজনীতিতে একটি অবস্থান নিশ্চিত করে চলেছে। যদিও তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে দেখা যায়না। ধর্মের ঝোলা নিয়ে চলা এইসব রাজনৈতিক মোল্লাদের কীভাবে মোকাবেলা করা হবে, তার কোনো রাজনৈতিক কৌশল বা নির্দেশনার অনুপস্থিতি ধর্মের মত স্পর্শকাতর বিষয়কে কৌশলে এড়িয়ে যাবার বিষয়টি দৃশ্যমান।

মাদ্রাসা শিক্ষকগণ মূলতঃ ধর্মান্ধ শিক্ষার উপজাত। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশবিরোধী। তারা ধর্ম দিয়ে রাজনীতি প্রভাবিত করার লক্ষ্যে প্রায়শ সক্রিয় হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে অবমূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে জোটবদ্ধ হয়। ধর্ম নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ এইসম রাজনৈতিক মোল্লারা কখনও হাতছাড়া করেনি এবং এক্ষেত্রেও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতি জোট বেঁধে এদেরকে শক্তি যোগাতে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষক বা এদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সংগঠনের যে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, এবিষয়টি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের উপরের বক্তব্যগুলোতে উল্লেখ করেছি। এরা ধর্মের খোলস পড়ে তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত। বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় নেতাদের ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা মূলত তাদের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিরই পরিচয় বহন করে। তারা একটা ইস্যু তৈরি করে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল। তাছাড়া পাকিস্তানি কায়দায় ধর্মকে ব্যবহার করে তারা সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। তাদের বিভিন্ন বক্তব্য, বিবৃতি এবং কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো উপাসনা করা নিষিদ্ধ। উপাসনার উদ্দেশ্যে যেসব প্রতিমা বানানো হয়, সেগুলোকে ইসলাম সমর্থন করে না। তাই বলে ভিন ধর্মীর উপাসনার বস্তুকে ভেঙ্গে ফেলা, গালমন্দ করা বা উপাসনালয়ে আক্রমণ করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একইসাথে উপাসনা বা পূজার উদ্দেশ্যে নয় এমন ধরণের ভাস্কর্যকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। বরং আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের সূচনা লগ্নে এবং প্রাথমিক যুগে বিজিত দেশসমূহে পূর্ব থেকে স্থাপিত ভাস্কর্যগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার পরিবর্তে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আধুনিক যুগেও সৌদি আরব, তুরস্কসহ বিভিন্ন মুসলিম

অধ্যুষিত দেশে এধরণের ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। অতএব, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নায়কদের ভাস্কর্যের বিরোধিতা মূলত দুরভিসন্ধিমূলক, হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়েছে। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি তারা ভুলতে পারেনি। বারবার চেষ্টা করেছে কোনো না কোনোভাবে এই দেশের ক্ষতি করতে। স্বাধীনতার পর প্রথম রাজনৈতিক মেরুকরণ হয় ধর্মের নামে দল তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড শুরু করার মধ্য দিয়ে। একাত্তুরের পরাজিত শত্রুদের এইদেশীয় অংশ গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে ধর্মভিত্তিক দলে যোগ দেয় এবং দেশব্যাপী হামলা আক্রমণ লুট করে দেশকে একটি অস্থিতিশীল বিপদজনক অবস্থার দিকে ঠেলতে থাকে। অথচ দেশে তখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ধর্মের নামে আবার মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি শুরু হয় যার জের আজও এই দেশকে টানতে হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষকরা এখন সেই রাজনীতির গুটিতে পরিণত হয়েছে। সুদীর্ঘ ২১ বছর এইদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যায়নি। এখনও মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দেয়ার জন্য। চেষ্টা করছে যাতে আগামী প্রজন্মের সামনে বঙ্গবন্ধুর কোনো চিহ্ন না থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা করার এটাই মূল কারণ।

দেশের উল্লেখযোগ্য জায়গায় বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় বীরদের ভাস্কর্য নির্মাণ করা প্রয়োজন। এইসকল ভাস্কর্য তাঁদের দর্শন, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম, চ্যালেঞ্জ, ত্যাগ, সাফল্যের জোর বার্তা তুলে ধরবে জাতির সামনে। অনুপ্রাণিত উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাদের অর্জনকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়চিত্তে কাজ করে যাবে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ কওমি শিক্ষার্থী ধর্মীয় বিষয়টি গুরুত্ব দিলেও কওমি শিক্ষকরা কিন্তু ভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে রাজনৈতিক মাঠ গরম করার চেষ্টা করে থাকে। হেফাজতের রাজনীতি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জেনেছি, দেশীয় রাজনৈতিক দলের সাথে বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়নই তাদের মূল লক্ষ্য। সাম্প্রতিক হেফাজতের বিতর্কিত নেতা মামুনুল হক তার উদাহরণ। মামুনুল হকের বাবা জোট সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। আর এই মামুনুল হকের বাবার সময়কালেই ঠান্ডা মাথার খুনি জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। তখন শুধু মামুনুল হক ও তার বাবা বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা কোনো রকমের প্রতিবাদ করেনি, মিছিল-মিটিং করতে দেখা যায়নি। শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে তাদের তথাকথিত প্রতিবাদ এটাই প্রতীয়মান হয়, এটা ধর্মীয় ইস্যু নয় বরং রাজনৈতিক ইস্যু! আমরা মনে করি, বাহাত্তরের সংবিধান পুর্ণস্থাপন বা ফিরে যাওয়া সম্ভব হলে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে এবং এ লক্ষ্যেই আমাদের জনমত তৈরি করা উচিত।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসায় নজরদারি না থাকার কারণে সেখানে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ সামগ্রিক

নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানে কী পড়ানো হচ্ছে, জাতীয় সংগীত বাজানো হচ্ছে কিনা, সরকারি দিবসগুলো পালিত হচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি এখানে পড়াশোনা করে ছাত্রছাত্রীরা কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে তেমন কোনো আলোচনাও নেই। তাই তারা তাদের শিক্ষকদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতেই বেশি মরিয়া। যেহেতু শিক্ষকদের অধিকাংশই পাকিস্তানি ভাবধারার, সেহেতু তারা মনে করে এটি তাদের মতবাদের সঙ্গে যুক্ত। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকারের টাকায় খেয়ে পড়ে সরকারের বিরুদ্ধেই সব ধরণের ষড়যন্ত্র করছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে তারা জাতির পিতার ভাস্কর্য ভাঙছে, জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে, মূর্তি ভাঙছে। এমনকি তাদের দাবিগুলো সরকারও মাঝে মধ্যে শুনছে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরেও যেহেতু এই ভাবধারার লোকজন আছে সেহেতু এটি সহসা রোধ করা সম্ভবও হবে না।

৯. কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা গাজওয়ায়ে হিন্দের নামে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথা বলছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সংবিধানের ২ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে। কাজেই, একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পবিত্র ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ সাম্প্রদায়িক শক্তির যে কোনো অপতৎপরতা প্রতিরোধে সরকার ও সকল জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে তৎপর থাকতে হবে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এসব ঘটনায় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহীতা ও দায়বদ্ধতার আওতায় আনার দাবি জানায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ এ ধরনের তৎপরতা নিঃসন্দেহে অবাঞ্ছনীয়। এটা প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের গাজওয়ায়ে হিন্দের নামে যে অপতৎপরতা শুরু করেছে তা নির্মূল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সব অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা যে ধরনের চিন্তা ভাবনা করছেন তা মোটেও সঠিক নয়। এতে করে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান সময়ে এ ধরনের পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনা কোনো রাষ্ট্র বা দেশের জন্য কাঙ্খিত নয়। এর বিপরীতে অবশ্যই সরকার ও জনগণকে সর্তক ও সচেতন থাকতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ এধরণের বক্তব্য বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী। এধরণের বক্তব্য আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করাটা জরুরি।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ এ ব্যাপারে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের বক্তব্য সুস্পষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে আমরা জনসচেতনতা তৈরির জন্য সকল গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দল/সংগঠনের কাছে আহ্বান জানিয়ে আসছি। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির দৈন্যদশা তাদের সাহস যোগাচ্ছে।

প্রজন্ম '৭১ ঃ এই ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থার নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদী মনোভাব ও তৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে উপমহাদেশের সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা ও সীমান্ত সংস্থার সাথেও সমন্বয় করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ এটা তাদের দিবা স্বপ্ন। এ স্বপ্ন কোনো দিন পূরণ হবে না। তবে তথাকথিত জিহাদের নামে রক্তপাত ঘটতে পারে। এর ফলে উপমহাদেশের সব দেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ গাজওয়ায়ে হিন্দের মৌলবাদীদের প্রচারণার চমকদার আওয়াজ যার কোনো বাস্তবতা নেই।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ এদের উদ্দেশ্য যে ক্ষমতা দখল এটাতো তাদের বক্তব্যেই পরিষ্কার। **গাজওয়ায়ে** হিন্দ বলতে ঐসব মৌলবী-ধর্মব্যবসায়ীরা মহানবীর (সাঃ) একটি হাদিসের বরাত দিয়ে বলে থাকে যে, ভারতে একটি ধর্মযুদ্ধ হবে মুসলমান ও "কাফিরদের" মধ্যে। যদিও গাজওয়ায়ে শব্দের অর্থ কেবল যুদ্ধ নয়। বরং এর অর্থ হলো, কোসো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো মিশন পরিচালনা করা। সে মিশন বা প্রচেষ্টা যে বলপূর্বক বা অস্ত্রের মাধ্যমে হবে, এমনটি কোথাও বলা হয়নি। বরং আলোচ্য হাদিসেই বলা হয়েছে, এই গাজওয়ায়ে অংশগ্রহণকারীদের আল্লাহ আগুন থেকে রক্ষা করবেন। পবিত্র কুরআনে সশস্ত্র যুদ্ধকে আগুনের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই অভিযাত্রীরা সশস্ত্র যুদ্ধের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। গাওস-কুতুব এবং ওলী-আউলিয়াদের মাধ্যমে এই ইসলাম প্রচার অভিযান ভারতবর্ষে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

পবিত্র কুরআন ধর্মের নামে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (লা ইকরাহা ফিদ দীন)। এক্ষেত্রেও ঐসব ধর্মব্যবসায়ী এবং উগ্রবাদী মৌলবীগণ "জিহাদ"-এর মতই অপব্যখ্যা করছে। জিহাদের আভিধানিক অর্থও হলো চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। ইসলামে আত্মশুদ্ধির জিহাদকে সবচাইতে বড় জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর অস্ত্রের জিহাদকে সবচাইতে ছোট জিহাদ যা হলো আত্মরক্ষা মূলক সশস্ত্র যুদ্ধ। তাই, কওমি মাদ্রাসাওয়ালারা নিজেদের হীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য "গাজওয়ায়ে হিন্দ"– এর অপব্যখ্যা করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করতে চায়।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ বোয়াফ গবেষণা টীম দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে গড়ে উঠা বেশ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে, শারীরিক ব্যায়ম বা আত্মরক্ষার নামে মূলত জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে অতি গোপনে যা গাজওয়ায়ে হিন্দের জিহাদের প্রস্তুতির

নামান্তর। আবার সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া সহ ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিলের ধর্মীয় বক্তাদের বক্তব্যগুলো নিয়ে স্টাডি করলে এটাই প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অনেকে রীতিম প্রকাশ্যেই দেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করেছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নিয়ে জনসচেতনায় কাজ করতে গিয়ে জানা গেছে, এদেশের একশ্রেণির প্রজন্ম ওইসব বিতর্কিত ইসলামী বক্তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ! তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার যে ষড়যন্ত্র করছে, তা আজও বিদ্যমান যা কোমলমতি ও সহজ-সরল নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে তুলছে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ 'হে হিন্দুস্তানের নওজোয়ানেরা, গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য প্রস্তুত হও'- এই শ্রোগানে জিহাদীরা এগুচ্ছে । পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার যুদ্ধের মাধ্যমে তারা জিহাদকে জানান দিতে চায়। শুধু তাই নয় মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটানকেও তারা এই মানচিত্রে রেখেছে। সেই নিরীখে তাদের কাজও বেশ পরিকল্পিত। শুধু যে মাদ্রাসা তাই নয়, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালগুলোতেও এখন বিশাল ঘাঁটি রয়েছে এদের।

১০. ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে এবং হত্যার প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এই ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথা যারা বলছে তারা ইসলামকে অপমান করছে। ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানবাধিকার চর্চা করাই প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র হওয়া উচিত বলে মনে করে কমিশন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসীসহ সকল নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি গণতান্ত্রিক, সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার লক্ষ্যে। আমাদের সংবিধানে দেশের সকল মানুষের সমঅধিকারের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, গত কয়েক দশক ধরেই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটেই চলেছে, যা আমাদের অনেক বড় বড় অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে এবং সকল বৈচিত্র্যকে ধারণ করে পরমত সহিষ্ণুতা ও সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের মিলেমিশে বসবাসের নীতির ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে– মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ম্লান করছে দেশের সংবিধানকে অবমাননা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এসব অপরাধী ও তাদের ইন্ধনদাতাদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার ও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ এ ধরনের কার্যক্রম বা প্ররোচনা অগ্রহণযোগ্য। সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের কার্যক্রমকে কেউ সমর্থন করতে পারে না, এ ধরনের

কার্যক্রমে যুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের নিকট প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যার জন্য যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে উৎসাহ দেয় এবং যারা এইসব মানবতাবিরোধী কাজে যে কোনভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনাকাংখিত, মানবতা ও সভ্যতা বিরোধী। শান্তির ধর্ম ইসলামকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে। বহির্বিশ্বে নেতিবাচক বার্তা প্রদান করে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ শান্তির ধর্ম ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে এবং হত্যার প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে, এটা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন, গণত্রান্ত্রিক, ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়ীর দেশের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহণের কৌশল হিসেবে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই দিনে দিনে সাম্প্রদায়িক শক্তির ভিত মজবুত হচ্ছে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নানাভাবে হামলা, নির্যাতন পরিচালিত হওয়া যার বেদনাদায়ক লক্ষণ।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ বিষয়টি উদ্বেগজনক বলে মনে করি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং আইনশৃঙ্খলা কাজে নিয়োজিত বাহিনীর আরও তৎপরতা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

প্রজন্ম '৭১ ঃ ইসলামের শান্তির বাণী ও সুফী মতবাদের প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশে একই ধরণের প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের সমন্বয় করতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ ওয়াহাবীবাদের উগ্রবাদি মন্ত্রে বিশ্বাসী জঙ্গি সন্ত্রাসীরা এটা করছে। তাতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপ আমেরিকায় ভুল ধারণার জন্ম হচ্ছে এবং সেসব দেশে বসবাসরত মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্যান্য ধর্মের মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়ছে। ইউরোপ আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান ঘটছে, যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি স্বরুপ।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে উগ্রবাদ বিস্তারের বিসয়টির সাথে ভূ-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি মূল উদ্দেশ্য। সহিংসতাকে পূঁজি করে বিশ্ববায়িত প্রক্রিয়ার সাথে দেশীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং দেশি ও বিদেশি দোসররা ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করে চলেছে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম। কোরাণ বলে, ধর্মের বিষয়ে কোনো বল প্রয়োগ নেই (সূরা বাকারা ২৫৬)। তোমার ধর্ম তোমার জন্য আমার

ধর্ম আমার (সূরা আল-কাফিরুন)। প্রভুর পক্ষ থেকে আসা এই বিধান (কোরাণ) যার ইচ্ছা গ্রহণ করুক যার ইচ্ছা বর্জন করুক (সূরা আল-কাহাফ)। যে ব্যাক্তি কোনো নিরপরাধ লোককে হত্যা করলো, সে যেন পুরো মানবাজাতিকেই হত্যা করলো। আর যে কারো জীবন বাঁচালো, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই বাঁচালো (সূরা আল-মায়েদা)। ইসলাম অন্য ধর্মাবালম্বীর উপাসনালয় ধ্বংস না করতে এবং ধর্মীয় পুরোহিতদের হত্যা না করার নির্দেশ দিয়েছে। এতোসব সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরও যারা মানুষ হত্যা করে, বিশেষ করে অন্য ধর্ম এবং তাদের ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা করে তারা মূলত ইসলাম ধর্ম বিরোধী। ইসলামকে তারা স্বীয় হীন ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ যে ধর্ম শান্তির সে ধর্মের অনুসারীরা হত্যা করবে না বা হত্যার প্ররোচনা দিবে না, এটাই সত্য। তাই ধর্মের নামে হলেও যারা হত্যা করে ও হত্যার প্ররোচনা দেয় তারা ধার্মিক নয়, ধর্মসন্ত্রাসী। এই সন্ত্রাসীরা কখনও নিজের ক্ষমতার জন্য সন্ত্রাস করে, কখনও ভাড়াটে হয়ে কাজ করে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাদ্রাসা পর্যন্ত এই ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের ফাঁদ পাতা। নানা কারণে মানসিকভাবে দুর্বল কিছু উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য কখনও এই ধর্মীয়সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তরাই সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর হাতিয়ার। এরা মাদ্রাসায় শক্তি তৈরি করে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিস্তার ঘটাতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এদেরকে প্রতিহত করতে সরকারের সাথে সাথে সমাজের সকল শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ ধর্মীয় সভা-সমাবেশে যেভাবে দেশের বরণ্য বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে নাস্তিক, কাফের, মুরতাদ বলা সহ হত্যার ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে, এটি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবী হত্যার অব্যাহত ষড়যন্ত্র বলেই প্রতীয়মান। শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা সৃষ্টি করে যেভাবে ওয়াজ-মাহফিলগুলোতে বিষবাষ্প ছাড়ানো হচ্ছে, নারী বিদ্বেষ সমাজ-রাষ্ট্র করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে- এ ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে জনসচেতনার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বিতর্কিত বক্তাদের তালিকা প্রণয়ন করে ওয়াজ-মাহফিলে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের সাধারণ জনগণকে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞান, ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি জেলা ও মহানগর শহর সহ উপজেলাগুলোতেও সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। অন্যদিকে শতভাগ মানব সন্তানকে স্কুলে ভর্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ চট্টগ্রামের পাহাড়, বিভিন্ন জেলার দুর্গম এলাকা ও রাজধানীর নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত মাদ্রাসায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে। কিছু মাদ্রাসা আছে যেগুলো জঙ্গি তৈরির কারখানা। জিহাদ এখন সারা বিশ্বেই জঙ্গিদের কাছে অনুকরণীয়। এই উপমহাদেশে এটি ভেতরে ভেতরে চাঙা হয়েছে গেল ক'বছরে। সুতরাং ভিন্ন ধর্মের মানুষ হত্যাকে তারা পূণ্যের কাজ মনে করছে। মাদ্রাসা শিশুরা

ভাবছে মানুষ হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বেহেস্তে যাবে। তাদেরকে বোমা বানাতে অভ্যস্ত করা হচ্ছে, আন-আর্মড কমব্যাট শেখানো হচ্ছে। এদেরকে জঙ্গি মনোভাব থেকে বের করতে হলে এদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। নতুন পরিবেশে তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ দেয়া গেলে তারা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অন্য ধর্মের মানুষকে ভালোবাসবে।

১১. যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষমূলক কথা বললে কিংবা কারও ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করলে তার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির বিধান আছে। এরপরও কি বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য 'ব্লাসফেমি আইন' প্রচলন করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করার কথা অনেক আলেম বলেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অধিকার কারও নেই। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রচলিত আইনের বাইরে এবিষয়ে অন্য কোনো আইনের প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ ব্লাসফেমি আইন মৌলিক মানবাধিকারের সাথে, মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক। ব্লাসফেমি আইন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, উগ্রবাদ ও সহিংসতাকেই উস্কে দেয়। এই আইন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথেও সাংঘর্ষিক। কাজেই এই আইনের প্রচলনের দাবি আমলেই আসে না।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ 'ব্লাসফেমি' আইন কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত নয় বরং অনাকাঙ্ক্ষিত ইস্যু। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এ ধরনের দাবি সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, যেটা কখনও গ্রহণযোগ্য হবার নয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ 'ব্লাসফেমি আইন' আলাদাভাবে করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই আইন পাস করার অর্থ হচ্ছে মৌলবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ ব্লাসফেমি আইন একটি অগ্রহণযোগ্য ও মানবতা বিরোধী আইন যা সভ্য সমাজে অচল। এ আইন কোনভাবেই বাংলাদেশে প্রচলন হতে পারে না। আমাদের সংবিধানের সাথেও তা যায় না। ধর্মান্ধ-মুর্খরা এ ধরনের চিন্তা করতে পারে; তবে তা কোনো দিনই সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য 'ব্লাসফেমি আইন' প্রচলন করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করা, এধরণের বক্তব্য সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী। এসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ স্বার্থন্বেষী মহল যারা দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় তারাই এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল

করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে আমরা মনে করি। এদের ব্যাপারে দেশের আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন। যারা এধরনের কথা বলেন তারা মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি। এরা নানান কৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শিবিরে দুর্বলতা তাদের শক্তি যোগাচ্ছে।

প্রজন্ম '৭১ ঃ ফৌজদারি দণ্ডবিধি কার্যকর করা গেলে ব্লাসফেমি আইনের দরকার নেই। অতীতে ও বিভিন্ন দেশে ব্লাসফেমি আইনের নামে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটেছিল।

রিজিওনাল এন্টি টেরোরিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ অতিরিক্ত ব্লাসফেমি আইন প্রচলনের কোনো প্রয়োজন নেই।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ ধর্মানুভূতিতে আঘাতের বিরুদ্ধে আইনটিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেককে এই আইনের ভিকটিম হতে দেখা গেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্লাসফেমি আইনের সাথে দ্বান্দিকতা রয়েছে। হিংসা বিস্তার রোধে আইন না থাকাও পরিস্থিতিকে জটিল করেছে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ ইসলামে ধর্ম অবমাননার কোনো জাগতিক শাস্তির বিধান নেই। কোরাণ আল্লাহ ও রসুলের অবমাননাকারীদের প্রসঙ্গে বলে, নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব।' (সূরা আল আহযাবঃ ৫৭)। এখানে আল্লাহপাক জাগতিক কোনো শাস্তির কথা বলেননি বা কোনো মানুষ বা সম্প্রদায়কে এর শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব বা অধিকার দেননি। এধরণের আরও নির্দেশনা কোরাণে রয়েছে যার কোথাও ইসলাম বা এর রসুলের (সাঃ) বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কোনো জাগতিক শাস্তির শিক্ষা দেওয়া হয়নি। মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায়ও আমরা এর কোনো নজির পাই না যেখানে কেবল মাত্র ইসলামের বা রসুলের (সাঃ) বিরুদ্ধে কথা বলা বা অবমাননার জন্য কোনো জাগতিক শাস্তির বিধান রয়েছে। ব্লাসফেমি আইন মূলতঃ ইসলাম বিরোধী আইন।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ সংবিধানের আলোকে প্রতিটি অপরাধের বিচারের জন্য আইন আছে। দেশ চলে সংবিধান মোতাবেক। ফলে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এমনসব কর্মসূচী যোগ করা উচিত যাতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও রাষ্ট্রের চার মূলনীতি এবং সংবিধানের আলোকেই যে রাষ্ট্রের চলা উচিত তা সহজ করেই জানতে ও বুঝতে পারে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ বাংলাদেশ কোরাণের আইনে চলে না। প্রচলিত আইন বা সাংবিধানিক রীতিনীতির উপর রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। আর মহান মুক্তিযুদ্ধটাই হয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পদ্ধতির লক্ষ্য স্থির করে। আর 'ব্লাসফেমি আইন'টাই মানবতাবিরোধী আইন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের আইন। কওমি

শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, মূলত ধর্মীয় ব্যবসাকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা, নিরাপদ করার জন্যই ব্লাসফেমি আইন করার কথা বলে থাকেন। প্রতিটা ধর্মীয় শিক্ষক জানে, তাদের জীবন-যাপনের অর্থনৈতিক উৎস একমাত্র ধর্মের কথা বলা বা ধর্মের নামে ব্যবসা করা। তাই এই ব্যবসার বিরুদ্ধের মতামতকে চিরতরের জন্য হত্যার মধ্য স্তব্ধ করার জন্যই ব্লাসফেমি আইন করার কথা বলেন।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ ইসলামীক দেশগুলোতে ব্লাসফেমি আইনের অনুশীলন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি। আমরা মনে করি দেশের বিদ্যমান আইনে এসব বিচার হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে শুধু ধর্মীয় জিহাদের প্রণোদনা দিতেই। এটি মুক্তবুদ্ধিরই শুধু পরিপন্থী নয়, বিজ্ঞানচর্চার জন্যও একটি বড় বাধা।

১২. আফগানিস্তানে তালেবানরা নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিরোধী। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ ইসলাম ধর্মে নারীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর সময়কালে নারীরা যুদ্ধ করেছেন। নবীজীর স্ত্রী খাদিজা ব্যবসা করতেন। ফলে নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন বিরোধী চিন্তা-চেতনা ইসলাম ধর্ম কখনোই সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে শিক্ষা অর্জনের জন্য সুদূর চীন পর্যন্ত যেতে। এখানে কিন্তু শুধু পুরুষকে ইঙ্গিত করা হয়নি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের বিষয়ে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ সম্প্রতি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে আফগানিস্তানে অর্ন্তবর্তীকালীন তালেবান সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার নারীদের অধিকার খর্ব করে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে তালেবান সরকার নারীদের ক্রিকেট খেলা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে, নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় কোনো নারীকে নেয়া হয়নি, এমনকি তাদের পুরুষ স্বজন ছাড়া বাইরে যেতে এবং কাজে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে। নানাভাবে আফগান নারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। যার বিরুদ্ধে আফগান নারীদের সংগঠিত প্রতিবাদ বেত্রাঘাত সহ নানাভাবে বন্ধ করার অপচেষ্টা করছে তালেবান সরকার। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আফগানিস্তানের নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করছে। একই সাথে আফগানিস্তানের নারী ও কন্যা শিশুদের অধিকার নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে এবং নিরাপদে নিশ্চিত করার বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদসহ সকল আন্তর্জাতিক নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ তালেবান একটি ধর্মীয় উগ্রগোষ্ঠী, যাদের নীতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার প্রবলভাবে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ আফগানিস্তানের নারীদের বিরুদ্ধে তৎপর তালেবান শক্তির ন্যায় বাংলাদেশে ও নারীকে অধঃস্তন তথা ভোগের সামগ্রী

(তেতুলের সাথে তুলনা) হিসেবে গণ্য করার মত শক্তি আছে এদেরকে কঠোর হাতে দমন করা দরকার।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ আফগানিস্থানে তালেবানরা নারীদের বিষয়ে যে চিন্তাভাবনা করছে তা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মানবাধিকারের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ধরনের চিন্তাভাবনা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা এর বিরোধীতা করি।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ তালেবানরা নারী বিরোধী, শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, সব ধরণের নারী শিক্ষার বিরোধী ও নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধী। তারা ধর্মের নামে নারীকে অবদমিত করে রাখতে চায়।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু এতে সন্দেহ নেই। সাথে সাথে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিলে মিশে থাকতে চায় সবাই। আমাদের বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সহজ হবে না। তবে এজন্য প্রয়োজন রাজনীতির সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করা।

প্রজন্ম '৭১ ঃ নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে তালেবানদের বিরোধী অবস্থান নিন্দনীয়। বাংলাদেশে বেশ কিছু আফগান নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। আমরা আশা করবো তারা নিজ দেশ ও জাতির জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে দেশে ফিরে বা বাইরে থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন।

রিজিওনাল এন্টি টেরোরিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ আফগানিস্তানের তালেবানরা ওয়াহাবী তন্ত্রে বিশ্বাসী। নারী শিক্ষা ও নারীর সমঅধিকারের বিরোধীতা মানে মানবতা বিরোধী অপরাধ। ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলে তারা চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ আফগানিস্থান এখন তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তালেবানের আদর্শিক ভিত্তি হল ইসলামী মৌলবাদ ও উগ্রবাদ। নারী শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন মৌলিকভাবে তালেবানি আদর্শের বিপরীতে অবস্থান করে। তালেবান সরকার স্বভাবতই নারী শিক্ষা তারা কখনই উৎসাহিত করবে না। উদার সমাজ ধর্মান্ধতা সমর্থন করে না। মৌলবাদকে ভিত্তি করে তাদের ক্ষমতায়ন। তাকে টেকসই করতে আফগান জনগণকে আদর্শিক ভাবে প্রভাবিত করতে শরিয়ার নামে তারা নারী স্বাধীনতা রুখে দিতে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় নীতি দিয়ে সমাজ রুপান্তরের চেস্টা করছে। সেই সাথে আসে পাশের দেশে জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে দিতে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ ইসলাম জ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষা সকল মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ ঘোষণা করেছে। একইভাবে ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমঅধিকার প্রদান করেছে। অতএব যারা এর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের মূল শিক্ষার বিরোধী।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ তালেবানদের রাজনীতি ধর্ম ভিত্তিক এবং পুরুষতান্ত্রিক। শিক্ষিত মানুষ অধিকার সচেতন হয়। ভালোমন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতা অর্জন করা থেকে বিরত রাখতে পারলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চ্যালেঞ্জ অনেক কম হয়। নারীদের উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতায়নকে তারা নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। তাই ধর্মের বাতাবরণে নারীদেরকে চার দেয়ালে আটকে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ পুরাতন তালেবানরা নতুন মোড়কে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। আমেরিকার নিজস্ব চিন্তার ফসল আজকের তালেবান। আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভবিষ্যত যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যই মূলত তালেবানদের আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রীতিমত উপহার দেওয়া হয়েছে। আর নারীর উচ্চ শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে তালেবান নেতাদের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হলেও তৃণমূল তালেবান নেতা-কর্মী আর ফলোগারগণ সেই বর্বর যুগের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। তাদের ধর্মান্ধতাই মূলত তাদের নারী বিদ্বেষ চিন্তা-চেতনার জন্য দায়ী। বাংলাদেশের তালেবান মতাদর্শের মানুষগুলোর ভেতরেও একই দৃষ্টিভঙ্গি। আফগানিস্তান বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির চরণ ভূমি। এখানে বিশ্ব নেতারাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ আফগানিস্থানে যেহেতু ইসলামী জঙ্গিদের আকাঙ্খা পূরণ হয়েছে, সেহেতু তারা সেখানে শরীয়াহ আইন চালু করবে এটাই স্বাভাবিক। দেশটির নারী রাজনীতিবিদদের অনেকে দেশ ছেড়েছেন। নারী ক্রীড়াবিদ, অভিনয়শিল্পী, সাংবাদিক, অধিকারকর্মীদের অনেকেই আত্মগোপনে। এক কথায় ভয়াবহ অবস্থা। ২০২২ সালের ডিজিটাল যুগে এসে আমরা আবার আইয়ামে জাহেলিয়াৎ দেখছি। মানুষের মানুষ হওয়া একেবারে থামিয়ে দিয়েছে আফগান সরকার। সমস্ত পৃথিবীর একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।

১৩. বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষই সহ অবস্থানে থাকবে। বাংলাদেশের সংবিধান আলোকেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। আর রাষ্ট্র চলবে দেশের সংবিধানের আলোকে। কাজেই দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই আসে না।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা এ ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তার করতে পারি না। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে কখনও সম্ভব হবে না; কেননা বাঙালির শিল্প, কৃষ্টি, সৃষ্টি সাংস্কৃতিক চর্চা কোনোদিন এ ধরনের ব্যবস্থাকে সুযোগ দিতে পারবে না বলে আমাদের ধারণা। তবে সচেতনভাবে এই

আগ্রাসনকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যেমন প্রতিটি উপজেলায়, জেলায় যথেষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের বিষয়ে সরকারের অবিলম্বে চিন্তা করা উচিত।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ শুধুমাত্র একটি ধর্মের হুকুমত কায়েমের চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণের ষড়যন্ত্রের অংশ। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এই শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় হতে হবে।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি। ১৯৫২ থেকে শুরু করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনেরা তাদের সম্ভ্রম হারায়নি। জাতির জনকের এই অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় জনগণ কখনো সায় দিবে না।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসীসহ সকল নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি গণতান্ত্রিক, সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার লক্ষ্যে। কোনো ইসলামীক রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এখানে ইসলামিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই নেই।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ প্রথমত: আগেই বলেছি কওমি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাজন রয়েছে। সব কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সিলেবাস আছে বলে আমাদের জানা নেই। সব ধারাকে একত্রিত করা প্রথম কাজ। এজন্য সরকারের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ এবং কওমি শিক্ষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন করে সময় বেঁধে দেওয়া। কওমি শিক্ষকদের বুঝতে হবে যে তাদের শিক্ষার্থীরাও বাংলাদেশের সম্পদ। এ ব্যাপারে জনগোষ্ঠীর মেধাবীদের তাদের অধিকার বঞ্চিত করে রাখা অমানবিক। তারা না বুঝলে আইন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রজন্ম '৭১ ঃ সাংবিধানিকভাবে এই ধরণের উদ্যোগ আইনত দণ্ডনীয় করা, দমন করা ও নিষিদ্ধ করা উচিৎ। এই ধরণের উদ্যোগ সংবিধানের মূল নীতির পরিপন্থী।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ ইসলামী হুকুমত বলে ইসলাম ধর্মে কিছু নেই। এ সব কথাবার্তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ধর্মাদ্রোহিতার সমান।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় কিছু ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং তাদের অনুসারি কিছু রাজনৈতিক মোল্লা। যারা মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধী ছিল। ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের দালালিই শুধু করেনি তারা বাঙালি নিধনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের সাথে আঁতাত করে ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঘুরাতে ব্যস্ত হয়েছে এবং বিচার এড়াতে ইসলামী হুকুমাতের নামে ক্ষমতা দখলের ছক কষে চলেছে। জনগণকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে মৌলবাদের দিকে ধাবিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া থেকে উত্তরণের জন্য অনেক ছক বানিয়ে আবার

নতুন করে রাজনীতিতে অবস্থান করে নিয়েছে। জনগণের সমর্থন ব্যতিরেকে ক্ষমতা দখল সম্ভব না অনুধাবন করে সমাজ রুপান্তর সহ রাজনৈতিকভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যদিও সেটা কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন না করতে পারলেও ঝুঁকি তৈরি করেছে। ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার জন্য বহুমাত্রিক রাজনৈতিক কৌশল বিনির্মাণ অতীব জরুরি।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ বারবার একটা বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ীদের প্রধান উদ্দেশ্য শাসন ক্ষমতা। এর জন্য তারা নানা কূট কৌশল এবং ইসলামের নামে উগ্র-ধর্মান্ধ চক্র ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিচয়, চরিত্র, গন্তব্য, কাঠামো এবং কার্যাবলীর পরিধি নির্ণয় হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের চার মূলনীতির একটি, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা ধর্মীয় শাসনের ব্যাপারেও ফয়সালা হয়ে গেছে। ফলে নতুন করে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চালানোর প্রশ্নই উঠে না।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' ও 'গণতন্ত্র' পদ্ধতির লক্ষ্য স্থির করে। আর ওই স্বপ্নে আমাদের ত্রিশ লাখ তাজা প্রাণ শহীদ হয়েছেন। দুই লাখেরও বেশি নারী মুক্তিযোদ্ধা তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা-মুক্তিযুদ্ধটাই চ্যালেঞ্জ করা, বিতর্কিত করার অপকৌশল।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ মনে করেন, শবে বরাতের রাতে কত রাকাত নামাজ পড়বেন-এই ভেবে আপনি এলাকার হুজুর আর মাদ্রাসার আলেমদের সাথে একটু কথা বলতে গেলেন। দেখা গেল ৬ জনের দুজন আপনাকে মারতে তেড়ে আসলো এই বলে যে, শবে বরাত পালন বেদায়াত। অন্যজন বললো তাদের মাদ্রাসাতে কোরাণ খতম হবে সারারাত। ১০০ টাকা হাদিয়া দিয়ে ঢুকতে হবে। ৪ জন বলল নফল রাকাত ১০, ২৫, ১০০ রাকাত পড়তে। বাকিদের একজন বলল আল্লাহর সব দিনই সমান। যেকোনো এবাদতই সোয়াবের। কিছুক্ষণ পর আপনার মাথা ঘুরা শুরু করল। আপনি বিভ্রান্ত হলেন। এবং এদের যে সিদ্ধান্তটি নিলেন তাতেই তাদের লাভ হল। মানে, আইএস, বোকো হারাম, আল কায়দা এমনকি ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালীদের নৃশংস গণহত্যা ও ধর্ষণকাণ্ডের সহযোগীদের পক্ষেই গেল। এভাবেই তারা ভিন্ন ভিন্ন নাটকের মাধ্যমে সুচারুভাবে মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছে। সবশেষে বাংলাদেশে যে সেক্টরগুলো খালি ছিল তাতেও এখন হুজুরদের সরব উপস্থিতি। যেমন নাটক, সিনেমা, থিয়েটার ও গণমাধ্যম।

১৪. কওমি শিক্ষা সিলেবাস যুগোপযোগী করতে কী করা উচিত বলে মনে করেন?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঃ অবশ্যই যুগোপযোগী করে কওমি শিক্ষার্থীদেরও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ করে দিতে হবে। ইসলাম ধর্মে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চর্চায় কোনো বাঁধা নেই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবি- কওমি মাদ্রসার পাঠ্যসূচি বিষয়ে সরকারকে আরও সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ করতে হবে। একই সাথে প্রগতিশীল চিন্তার মানুষদের এই শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে তাদের বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার আওতায় আনতে হবে, যাতে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিদ্যমান কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার যোগসূত্র করে একটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ কওমি শিক্ষা সিলেবাস/কারিকুলাম যুগোপযোগী করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ অবশ্যই কওমি মাদ্রসা শিক্ষার সিলেবাস যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় চেতনাবোধ ও দেশপ্রেমে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ কওমি মাদ্রাসায় প্রচলিত পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি পুরোপুরি ধর্মকেন্দ্রীক যা অনেকাংশে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে উপরন্তু ধর্মের নামে নানা ধরণের অপশিক্ষার চর্চা হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি, নারীদের প্রতি ঘৃণা করার মানসিকতা তৈরি হয়, একইসাথে বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী একটি জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবে বেড়ে ওঠে। একারণে আমরা মনে করি, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন একমুখী সাধারণ শিক্ষার আওতায় আসা উচিত। এছাড়া কোরানের বঙ্গানুবাদ পড়ানো উচিত। বিজ্ঞান, অংকসহ ইসলামের ইতিহাসসহ কৃষক শ্রমিক-নারী আন্দোলনসহ বিশ্ব ইতিহাস তাদের পাঠ্য হওয়া উচিত। একইসাথে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনদক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞানমুখী মানবিক শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঃ বিষয়টি নৈতিকতা বোধের। এখন শুধু ওয়াজ-মাহফিল না স্বার্থান্বেষী মহল প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক অগ্রগামী, তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মিডিয়া বা যোগাযোগ মাধ্যম যথা ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে সবারই ভাবা উচিত। সংবিধান বিরোধী ও দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে কিভাবে এহেন নৈতিকতা ও মানবাত বিরোধী অপপ্রচার চলতে পারে তার দায়-দায়িত্ব সরকার আইনসভা, বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন ও প্রশাসনের উপর বর্তায়। মুক্তিযুদ্ধের ধর্ম নিরপেক্ষ-অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক নেতনা রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সংগঠন রাজনৈতিক-সামাজিক-ছাত্র-যুব-নারী ও নাগরিক সংগঠন সমূহকে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে এক্ষেত্রে। আবারও বলছি ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকল্প নেই।

প্রজন্ম '৭১ ঃ ১নং প্রশ্নের উত্তর প্রযোজ্য।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ জাতীয় কমিটি করতে হবে এবং কমিটির সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ সিলেবাস পুনঃনিরীক্ষণ করে কর্মমুখী শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ এবিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসার বর্তমান কারিকুলামের আমূল সংস্কার করে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করা জরুরি। এবিষয়ে সরকারের শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি মোটিভেশনাল পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী তারা শিক্ষার্থীদেরকে গভীর ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছে। কিন্তু এই শিক্ষা দিয়ে কওমি শিক্ষার্থীরা ইহজাগতিক জীবনে টিকে থাকার জন্য সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। যদিও কওমি কর্তৃপক্ষ নানা উৎস থেকে অর্থ ও ইহজাগতিক সুযোগসুবিধা আদায় করছে কিন্তু পাশ করে যাওয়া শিক্ষার্থীরা ইহজাগতিক কর্মজীবনে প্রবেশের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। কিছু মানুষের কর্তৃত্বের খেয়ালে দেশের লক্ষ লক্ষ কওমি শিক্ষার্থীকে একপাশে ফেলে রাখার সুযোগ নেই। তাদের যোগ্য করে তুলতেই হবে।

মূলধারার শিক্ষার আলোকে সিলেবাস তৈরি করতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে কর্মমুখী করে তুলতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি মূলধারার সাথে মিল থাকতে হবে। তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করতে। ধর্মের সাথে সাথে ইহজাগতিক জীবনের মূল্যবোধও গড়ে তুলতে হবে। সিলেবাসে ভাষা আন্দোলন, আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের উল্লেখযোগ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ কওমি শিক্ষা পদ্ধতি যুগোপযোগী করতে হলে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক, গবেষক, সাংবাদিকের সমন্বয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ কওমি ও আলিয়া- বাংলাদেশের প্রধান এই দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের ইসলাম ধর্ম, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা। দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। এসব মাদ্রাসায় পাঠ্যক্রমে মূল মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ধর্ম বিষয়ে। ফলে, এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণমূলক চিন্তার দক্ষতা গড়ে ওঠে না। তদের চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের মতো বিশেষায়িত বিষয়গুলোতে পড়ার মতো যোগ্যতাও তৈরি করতে পারে না। কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষার স্তর রয়েছে ছয়টি। এর প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে বলা হয় মক্তব হিফজুল কোরান। এই স্তরে মূলত কোরাণ পড়তে শেখানো হয় এবং কোরাণ মুখস্ত করানো হয়।

কওমির দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ইবতেদায়ি। এটি মূলত প্রাথমিক পর্যায় যেখানে শিক্ষার্থীদের আরবি, উর্দু ও ফার্সি পড়তে ও লিখতে শেখানো হয়। আলিয়া মাদ্রাসায় ইবতেদায়ি থেকে কামিল পর্যন্ত ১৬ বছরের পড়ালেখায় রয়েছে পাচটি ধাপ। এই দীর্ঘ সময়ে তারা কেউই বিজ্ঞান শেখে না ও মুক্ত মনের হয় না। যেমন কাজী নজরুলকে

তারা ইসলামের কবি হিসেবেই দেখেন কিন্তু তার মানবিক ধর্মটা নেয় না। এভাবে প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই তারা ইসলাম খোজে। চাঁদের দাগ পাহাড়কেও ইসলামের আঙ্গীকে ব্যাখ্যা দেয়। আবার ইতবেদায়ি বা প্রাথমিক পর্যায়ে কোরাণ পড়া ও মুখস্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই পর্যায়ের অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামের মৌলিক বিষয়, আরবি, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞান।

দাখিল (মাধ্যমিক) পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোরাণ পড়া ও মুখস্ত করার সঙ্গে যুক্ত হয় কোরানের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসির। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হলো- অবিলম্বে সরকারিভাবে সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগোপুযোগী করা। যেহেতু বাংলাদেশে এই মুহূর্তে একমুখি শিক্ষা নীতি একেবারেই সম্ভব নয়। সেহেতু কারিকুলাম আধুনিকায়ন করে ক্রমশ পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করানোর চেষ্টাই উত্তম।

১৫. বর্তমান ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হয়– এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত জানতে চাই।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ ওয়াজ মাহফিলে প্রকাশ্যে ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিতভাবে নারীদের সম্পর্কে অশ্লীল, মানহানিকর কটূক্তি, নারী উন্নয়ন বিরোধী, প্রগতি বিরোধী বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না। নারী প্রগতি বিরোধী, ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া মানে- বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই বক্তব্য প্রচার এখনই প্রতিহত করতে হবে। সরকার সহ সকল জনগণকে এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ঃ অবিলম্বে এ ধরনের আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি আযোজক, পৃষ্ঠপোষকদের মনে করিয়ে দেয়া দরকার যে, উস্কানিমূলক ও বৈষম্যমূলক বক্তব্য সমাজে বিভেদ তৈরিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। তাছাড়া এ ধরনের বক্তব্য বা মন্তব্য প্রচলিত আইন বিরুদ্ধে এবং সংবিধান বিরুদ্ধে। সংবিধান বিরুদ্ধ মন্তব্য বা বক্তব্যের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা সব ধর্মাবলম্বী জনগণ। এমনকি প্রাণ বিসর্জনকারীদের মধ্যে অমুসলিম তথা হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। অপরপক্ষে স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউই প্রায় অমুসলিম ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াজ মাহফিলে নারী, অমুসলিম ও ভিন্ন মতের লোকদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানকারীর বিচার ও শাস্তির জন্য বিশেষ আইন দরকার।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ঃ এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখ ও বেদনাদায়ক। অসম্প্রদায়িক চেতনা বিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে এ ধরনের বক্তব্য, বিবৃতি ও কর্মকাণ্ড চলতে পারে না। সরকারকে এ বিষয়ে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসীসহ সকল নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি গণতান্ত্রিক, সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার লক্ষ্যে। আমাদের সংবিধানে দেশের সকল মানুষের সমঅধিকারের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে, গত কয়েক দশক ধরেই ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করে এক ধরণের সামপ্রাদায়িক, নারী বিরোধী, অমানবিক পরিবেশ ও মানস গঠন করছে যা আমাদের অনেক বড় বড় অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে এবং সকল বৈচিত্র্যকে ধারণ করে পরমত সহিষ্ণুতা ও সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের মিলেমিশে বসবাসের নীতির ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে– মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ম্লান করছে দেশের সংবিধানকে অবমাননা করা হচ্ছে। পাশাপাশি নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় ওয়াজ মাহফিলসহ যে কোনো ধমীয় আলোচনায় নারী অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রজন্ম '৭১ ঃ সরকারিভাবে এই ধরণের প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ ও বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধক গান, নাটকের প্রসার বাড়াতে হবে।

রিজিওনাল এন্টি টেররিস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (রাত্রি) ঃ ওয়াজে এ ধরণের বক্তব্য দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সম্প্রতির জন্য হুমকি। এদের সকলকে চিহ্নিত ও তালিকা করা উচিত এবং সেটি জনগনের অবগতির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত। যাতে কোনো ওয়াজ মাহফিলে তাদের দাওয়াত দেওয়া না হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রশাসনকে তাদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিতে হবে।

ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঃ হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর সকল পন্থাগুলোকে চিহ্নিত করে আইনের মাধ্যমে তা বন্ধ করা উচিৎ। সেটা যে নামেই করা হোক না কেন। ওয়াজ মাহফিল হোক বা মসজিদে বয়ান হোক বা সামাজিক মাধ্যম হোক হিংসা বিদ্বেষকে অপরাধ হিসাবে আইনের আওতাধীন করা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় নিয়ে সতর্কভাবে করতে হবে যাতে করে বিষয়টিকে পুঁজি করে সমাজে বিভ্রান্তি বা উত্তেজনার পুঁজি করতে না পারে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ঃ সরকার, প্রশাসন ও সুশীলসমাজের উচিত আদর্শিক লড়াইয়ে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা উপস্থাপন করে উগ্র ধর্মান্ধদের পরাস্ত করা। ইসলাম শালীনতা শিক্ষা দেয়, পরমত সহিষ্ণু হতে বলে। মানুষকে বিকৃত নামে ডাকা, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করা, মিথ্যা বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। ওয়াজের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো গড়হিত অপরাধ। এ বিষয়ে যথাযথ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। মোল্লাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, এরা "শক্তের ভক্ত, নরমের যম"।

ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঃ নানা কায়দায় মানুষকে বিভক্ত করতে পারলে সমাজ দুর্বল হয়ে যায়। যেকোনো নামেই হোক অপশক্তি গেড়ে বসার জন্য দরকার একটা দুর্বল সমাজের। মৌলবাদী শক্তি পরিকল্পনা করে সে কাজটাই করে

চলেছে। সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে ওয়াজে হীন ও চটুল বিষয়ের নানাকিছু যুক্ত করে ওয়াজকে আকর্ষণীয় করে তুলছে এবং এই সুযোগে শ্রোতাদের মনের ভিতরে নারী, অমুসলিম ও ভিন্নমতের মানুষদের সম্পর্কে বিষবাষ্প জমিয়ে তুলছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বহু বাধার সম্মুখীন হয়ে তারা ক্ষমতায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারলে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তারা প্রাথমিক বিজয় অর্জন করতে পারবে। সেইসাথে ভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে তারা বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করে।

ধর্মীয় উগ্রবাদীদের এই ধরণের পরিকল্পনা বন্ধ করা জরুরি। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিককে সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া আছে। কেউ এই মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হলে তাকে আইনের আওতায় আনা উচিত। মাঠের ওয়াজ ছাড়াও প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ধরণের ওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে, এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণ দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছে। সরকারের উচিত শক্ত হাতে আপত্তিকর ও উস্কানীমূলক ওয়াজ বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম (বোয়াফ) ঃ বর্তমানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নামে কোথাও কোনো ওয়াজ-মাহফিল হয় বলে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ নেই। আর সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের বিতর্কিত নেতা মামুনুল হক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তে এটাই প্রতীয়মান যে, ওয়াজ-মাহফিলগুলো সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। কে কোথায় যাবে, কোন এজেন্ডা অনুযায়ী কোন বক্তা কী বক্তব্য বা ওয়াজ করবে- এগুলো মূলত হেফাজতের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার ওয়াজ-মাহফিলের বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয়, রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয় যেখান থেকে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বিচারপতি ও নারীর বিরুদ্ধে বিষোধগার ছড়ানো হয়। এগুলো মূলত দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা, মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং ধর্ম ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ ঃ প্রচলিত সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে হুজুররা শরীয়তসম্মত বলে স্বীকার মনে করছে। যে কারণে তাদের মধ্যে গণতন্ত্রবিরোধী রাজনীতির ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। তাদের এই রাজনীতি বর্তমান সরকারের সময় বেশ চাঙা। খুব কৌশলে কবি গান, যাত্রা, গণনাটক ইত্যাদি বন্ধ করা হয়েছে। বাউলদের চুল কাটা দিয়ে শুরু করে এখন তাদের চেষ্টাও সফল হচ্ছে। অথচ তাদের জলসার নামে নারীবিদ্বেষ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা থেমে নেই। আবার এসব মঞ্চে বসে থাকেন রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। তারা কিছুই বলছেন না। সুতরাং ইসলামাইজেশনের নামে একটা চরম ব্যাধি সমাজে ভর করেছে।

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ

বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের তালিকা

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে ৫'শ বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এদেশে তাদের অবস্থান ও সক্ষমতা সম্পর্কে জানিয়েছিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন জামায়াত-বিএনপির জোট সরকার সব সময় বাংলাদেশে এসব সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। ২০০২ সালের ৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৩টি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা ও হত্যাকাণ্ড এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে ৫'শ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সহ জঙ্গিদের সকল বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ভারত, ইসরাইল ও আওয়ামী লীগকে দায়ি করেছে, যদিও জঙ্গি সংগঠন জেএমবি বা হুজি সব সময় এসব হামলার দায় স্বীকার করেছে।

২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের ৫'শ বোমা হামলার পর গণমাধ্যমে জেএমবির সঙ্গে জামায়াতের সম্পৃক্ততার বহু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তখন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সূত্র থেকে অনুসন্ধান করে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' প্রথম ৫৮টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা প্রস্তুত করে এর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পৃক্ততার প্রমাণ উপস্থাপন করেছিল ২৫ আগস্ট (২০০৫)-এর গোলটেবিল আলোচনায়। বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের প্রথম তালিকা ছিল সেটি। এই তালিকায় ছিল–

"১) জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), ২) হরকাতুল জিহাদ, ৩) শাহাদৎ-ই-আল হিকমা, ৪) আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ (আহাব), ৫) হিজবুল তওহিদ, ৬) আল হারাত আল ইসলামিয়া, ৭) আল মারকাজুল আল ইসলামী, ৮) জামায়াতুল ফালাইয়া, ৯) তওহিদী জনতা, ১০) বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, ১১) জুম্মাতুল আল সাদাত, ১২) শাহাদাৎ-ই-নবুয়ত, ১৩) আল্লাহর দল, ১৪) জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, ১৫) আল জিহাদ বাংলাদেশ, ১৬) ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, ১৭) জইশে মোহাম্মদ, ১৮) ওয়ারৎ ইসলামিক ফ্রন্ট, ১৯) জামাত-আস-সাদাৎ, ২০) আল খিদমৎ, ২১) জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), ২২) হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, ২৩) মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, ২৪) হিজবুল মাহাদি, ২৫) বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী দল (বাসবিদ), ২৬) হিজবুত তাহরীর, ২৭) আল কায়দা, ২৮) আল ইসলাম মার্টিয়ার্স ব্রিগেড, ২৯) ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট, ৩০) আমরা ঢাকাবাসী, ৩১) আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স, ৩২) ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, ৩৩) আরাকান পিপলস আর্মি, ৩৪) লিবারেশন মায়ানমার ফোর্স, ৩৫) আরাকান মুজাহিদ পার্টি, ৩৬) রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেন্স ফোর্স, ৩৭) রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেন্স আর্মি,

৩৮) রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট, ৩৯) রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন, ৪০) রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, ৪১) জমিয়তে আহলে হাদিস আন্দোলন, ৪২) জমিয়াতুল এহহিয়া-উৎ-তুরাজ, ৪৩) হায়াতুল ইগাছা, ৪৪) সত্যবাদ, ৪৫) আহলে হাদিস যুব সংঘ, ৪৬) আনজুমানে তালামিযে ইসলামিয়া, ৪৭) তাহফিজে হারমাইন পরিষদ, ৪৮) আইয়াম্মা পরিষদ, ৪৯) আল হারমাইন, ৫১) খেদমতে ইসলাম, ৫১) হিফাজতে খতমে নবুয়ত, ৫২) ইয়ং মুসলিম, ৫৩) রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস), ৫৪) আল জাজিরা, ৫৫) ইসলামী জিহাদ গ্রুপ, ৫৬) ইসলামী সৈন্য, ৫৭) আহলে হাদিস তাবলিগে ইসলাম, ৫৮) ইসলাহুল মুসলেমিন পরিষদ বাংলাদেশ।"

নির্মূল কমিটির বইয়ে প্রকাশিত এই তালিকার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, '১৯৯৯-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত সংবাদ থেকে বাংলাদেশের মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীসমূহের এই তালিকা করা হয়েছে। প্রতি বছরই এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা আধা আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় সারাদেশে তৎপর রয়েছে। এই তালিকায় এদের মূল রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইত্যাদির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেই সঙ্গে এদের ছাত্র এবং অন্যান্য প্রকাশ্য অঙ্গ সংগঠনের নামও এই তালিকায় যুক্ত করা হয়নি। মূলত: নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ছত্রছায়ায় যেসব মৌলবাদী সংগঠন জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে এখানে তাদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদের ডাক', সম্পদনাঃ কাজী মুকুল, প্রকাশকাল ঃ ২৫ আগস্ট ২০০৫, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)

২০০৬ ও ২০০৭ সালে নির্মূল কমিটি যথাক্রমে ১০৯ ও ১২৫টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা প্রস্তুত করে। সর্বশেষ 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' (১২ ডিসেম্বর ২০১৫) অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণার উপর ভিত্তি করে দেশে ১৩২টি জঙ্গি মৌলবাদী দলের তালিকা সহ তার গবেষণার কিছু অংশ উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের অর্থায়ন সহ এ ক্ষেত্রে আবুল বারকাতের গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে– 'বাংলাদেশে জঙ্গি ও মৌলবাদী গ্রুপের সংখ্যা ১৩২টি। ২০১৩ সালের পর থেকেই এদেশের জঙ্গি গ্রুপগুলো আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গিবাদী সংগঠন আল-কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মধ্যে জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা এবিটি ইতিমধ্যে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। জেগে উঠেছে নিষিদ্ধ ঘোষিতরা। এছাড়া জঙ্গিদের সবাইকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে জেএমবি ও এবিটি। এর বাইরে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফা হয় আনুমানিক ২ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। বিগত চার দশকে পুঞ্জীভূত নিট মুনাফার পরিমাণ হবে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা। দেশে ২৩১টি বেসরকারি সংস্থাসহ (এনজিও) ট্রাস্ট-ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৌলবাদের অর্থনীতি ধারণার প্রবর্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ "বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ ঃ মর্মার্থ ও করণীয়"-এ তথ্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

'বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর বৈশিষ্ট্য ও বিকাশকাল বিশ্লেষণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে ড. আবুল বারকাত বলেছেন, ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল হুজি-বি'র আনুষ্ঠানিক গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদী জিহাদের প্রথম পর্ব বা 'দাওয়া' স্তরের শুরু। অতিক্রম করেছে দ্বিতীয় স্তর 'ইদাদ'। এখন তাদের অবস্থান জিহাদের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ 'রিবাত' ও 'কিলাল'-এর মাঝে কোনো একপর্যায়ে। তবে সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণে আমি মনে করি, তাদের অবস্থান জিহাদি সর্বশেষ পর্যায় 'কিলাল'-এর কাছাকাছি অর্থাৎ তারা ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ পরিস্থিতি মারাত্মক ও মহাবিপর্যয়কর।

'ড. আবুল বারকাত লিখেছেন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের সম্পদ হরিলুট করেছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ১৯৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ-সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক মডেল গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে, একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর (কখনো কখনো) একাংশ নতুন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে।

'গবেষণার তথ্যানুসারে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ২ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ ৬৬৫ কোটি টাকা আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ ৪৬৪ কোটি টাকা আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন থেকে; বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খুচরা, পাইকারি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে ১০.৮ শতাংশ ২৬৬ কোটি টাকা আসে; ওষুধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ ২৫৬ কোটি টাকা; স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ ২২৬ কোটি টাকা; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ ২০৯ কোটি টাকা, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ ১৯৩ কোটি টাকা, আর রিকশা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজের মতো পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ বা ১৮৫ কোটি টাকা। বিগত চল্লিশ বছরে (১৯৭৫-২০১৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত নিট মুনাফার মোট পরিমাণ হবে বর্তমান বাজার মূল্যে কমপক্ষে ২ লাখ কোটি টাকা।

'জঙ্গিবাদের কার্যক্রমকে মারাত্মক ও মহাবিপর্যয়কর বলার কারণ ব্যাখ্যা করে ড. আবুল বারকাত বলেন, সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহা জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে এবং এই সংগঠন থেকে তারা অস্ত্র সরবরাহ, বোমা প্রস্তুত পদ্ধতি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ (ম্যানুয়ালসহ), টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে গেরিলা কায়দা-কানুন, অর্থ সরবরাহ, অর্থের উৎস পোক্তকরণ, নিরীহ মুসলমানদের জিহাদের পক্ষে আনার 'বিজ্ঞানসম্মত' পথ পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পাচ্ছে; তারা ইতিমধ্যে শুধু আল-

কায়েদাই নয়, অনুরূপ অন্যান্য বিদেশি জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান-ট্রাস্ট-ফাউন্ডেশন-বেসরকারি সংস্থা-মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং ওদের পরামর্শে সক্রিয়; তৃতীয়ত, হিজবুত তাহরীরসহ আরও কিছু নিষিদ্ধ অথবা এখনো নিষিদ্ধ হয়নি এমন সব জঙ্গি সংগঠনও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিমসহ বেশ কিছু ইসলামী জঙ্গি সংগঠন দেশের সব ইসলামী জঙ্গি সংগঠনসহ ইসলামী জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী সব সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠানকে (মৌলবাদের অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানসহ) একক একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করানোয় সক্রিয় রয়েছে; এদেশের সব ইসলামী জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনা ধারণ করে অর্থাৎ ওদের সবাই বিশ্বাস করে যে, ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই; ওরা যখন যেভাবে যেসব বর্বরতম নৃশংস পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মুক্তচিন্তার মানুষ খুন-হত্যা-জখম করছে, অর্থনীতির প্রাণ সংযোগসমূহ বিনষ্ট করে অর্থনীতিকে বিকল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, প্রশাসন-আদালত-বিমান প্রতিষ্ঠান-দেশজ/সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (প্রাতিষ্ঠানিক উৎসব) ও ব্যক্তি হত্যায় উদ্যত এসবই তো যথেষ্টমাত্রায় প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিত্ব বিকাশ স্তরের মানদণ্ডের প্রাথমিক কোনো পর্যায়ে অবস্থান করছে না।

'পরিস্থিতি মোকাবিলায় ড. বারকাত বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। এগুলো হলো– মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে)। জঙ্গিদের অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা। জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ বন্ধ করা। মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট (শিল্প, সংস্কৃতি ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামায়াত-জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা উদ্ঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী গোয়েন্দা নজরদারি সিস্টেম অনেক বেশি তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুত ফলপ্রদ ও কার্যকর করার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা। সরকারের জঙ্গি দমন ও গ্রেপ্তার জঙ্গিদের মধ্যে জঙ্গিবিরোধী সচেতনতা-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিচালন করা। জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সঙ্গে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটর তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা।

'যত জঙ্গি গ্রুপ ও সমর্থনকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী ইসলামী সংস্থাগুলো হলো— (সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত ও কালো তালিকাভুক্তসহ) আফগান পরিষদ, আহলে হাদিস আন্দোলন, আহলে হাদিস যুব সংঘ (এএইচজেএস), আহলে হাদিস তবলিগা ইসলাম, আহসাব বাহিনী (আত্মঘাতী সুইসাইড গ্রুপ), আল হারামাইয়েন (এনজিও), আল হারাত আল ইসলামিয়া, আল ইসলাম মার্টারস ব্রিগেড, আল ইসলামী সংঘতি পরিষদ, আল জাজিরা, আল জিহাদ বাংলাদেশ, আল খিদমত, আল কুরত আল ইসলামী মার্টারস,

আল মারকাজুল আল ইসলামী, আল মুজাহিদ, আল কায়দা, আল সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী, আল তানজীব আল উম্মাহ, আল্লার দল (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), আল্লার দল ব্রিগেড (আত্মঘাতী দল), আল ইয়াম্মা পরিষদ, আমানাতুল ফারকান আল খাইরিয়া, আমিরাত-ই-দিন, আমরা ঢাকাবাসী, আনজুমানে তালামজিয়া ইসলামিয়া, আনসার-আল-ইসলাম, আনসারুল্লাহ মুসলামিন, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), আরাকান আর্মি (এ এ), আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি), আরাকান লিবারেশন পার্টি, আরাকান মুজাহিদ পার্টি, আরাকান পিপুলস আর্মি, আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স, আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আরকান মুভমেন্ট, ইবতেদাদুল-আল মুসলিমা, ইকতেদুল তালাহ-আল মুসলেমিন, ইকতেদুল তুলাহ-আল-মুসলেমিন (আইটিএম), ইন্টারন্যাশনাল খাতমে নব্যুয়ত মুভমেন্ট, ইসলাহুল মুসলেমিন, ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ, ইসলামী জিহাদ গ্রুপ, ইসলামী লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ (আইএলটিবি), ইসলামী প্রচার মিডিয়া, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ইসলামী সমাজ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, ইয়ং মুসলিম, এবতেদাতুল আল মুসলামিন, এহসাব বাহিনী, ওয়ারেট ইসলামিক ফ্রন্ট, ওয়ার্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যানাত (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), কালেমায়ে-জামাত, কালেমা-ই-দাওয়াত (অধ্যাপক আবদুল মজিদ এ দলের প্রধান), কতল বাহিনী (আত্মঘাতী গ্রুপ), খাতেমী নব্যুয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ (কেএনএপিবি), খাতেমী নব্যুয়াত কমিটি বাংলাদেশ, খিদমত-ই-ইসলাম, খিলাফত মজলিশ, খিতল-ফি-সাবিলিল্লাহ, খিলাফত-ই- হুকমত, ছাত্র জামায়েত, জাদিদ-আল-কায়েদ, জাগ্রত মুসলিম বাংলা, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), জামাত-এশ-সাদাত, জামায়াত-উল-ইসলাম মুজাহিদ, জামা'আতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), জামাত-ই-মুদারাসিন বাংলাদেশ, জামাত-ই-তুলবা, জামাত-ই-ইয়াহিয়া, জামাত-উল-ফালিয়া, জামাতুল ইসলাম মুজাহিদ, জামাতে আহলে হাদিস, জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া, জামিয়াতি ইসলামী সলিডারিটি ফ্রন্ট, জামিয়াতুল ইয়াহিয়া উত তুরাজ, জঙ্গি হিকমত, জয়শে-মুস্তাফা, জয়শে-মোহাম্মদ, জামাতুল-আল-শাদাত, ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান, ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরকান (এনইউপিএ), নিজামায়ে ইসলামী পার্টি, ফার ইস্ট ইসলামী, তা আমির-উল-দীন বাংলাদেশ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), তাহফিজ হারমাইন, তামির উদ্দিন বাংলাদেশ, তানজিম বাংলাদেশ, তানজিন-ই-খাতেমি নব্যুয়ত, তাওহিদী জনতা, তাওহিদ ট্রাস্ট (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত), দাওয়াত-ই-ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলাম রক্ষা কমিটি, বাংলাদেশ জামায়াত-উল-তালাবা-ই-আরাবিয়া, বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী দল, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, মজলিশ ই তাফিজা খাতেমি নব্যুয়ত, মুজাহিদ অব বাংলাদেশ,

মুজাহিদী তোয়াবা, মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা, মুসলিম মিল্লাত শরিয়াহ কাউন্সিল, মুসলিম মুজাহিদীন বাংলাদেশ (এমএমবি), মুসলিম রক্ষা মুজহাদিল, রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেন্স ফোর্স, রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন, রিভাইভাল অব ইসলামী হেরিটেজ (এনজিও), লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স, লুজমা মকবা আল খায়েরা, শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৩ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), শাহাদাত-ই-নব্যুয়াত, শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত বিগ্রেড (আত্মঘাতী গ্রুপ), সত্যবাদ, সাহাবা সৈনিক, হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ, হরকাত-উল জিহাদ-আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), হায়েতুল ইগাসা, হেফাজতে খাতেমী নব্যুয়ত, হিজব-উত-তাহিরির (২০০৯ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত), হিজবা আবু ওমর, হিজবুল মাহাদী, হিজবুল্লাহ আদেলী বাংলাদেশ, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, হিজবুত-তাওহিদ ও হিকমত-উল-জিহাদ।'

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক ২০১৬ প্রকাশিত শ্বেতপত্রে জঙ্গি সংগঠনের তালিকা প্রস্তুতের সময় আমরা অধ্যাপক আবুল বারকাতের তালিকা পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করেছি এতে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক কয়েকটি রাজনৈতিক দল (জামায়াতে ইসলামী ব্যতিত) ও জঙ্গি অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত এনজিওর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– এই তালিকা উল্লেখিত 'নেজামে ইসলাম', 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন', 'খিলাফৎ মজলিশ' প্রভৃতি 'জামায়াতে ইসলামী'র মতো রাজনৈতিক দল এবং জঙ্গিদের মদদদাতা। গণকমিশনের অনুসন্ধানী দল অধ্যাপক আবুল বারকাতের তালিকার বাইরে আরও ২২টি জঙ্গি সংগঠনের নাম সংগ্রহ করেছে যাদের তৎপরতার সংবাদ বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নের তালিকায় অধ্যাপক আবুল বারকাতের তালিকায় প্রকাশের সময় ব্রাকেটে আমাদের মন্তব্য সহ যে সব সংগঠনের নাম নেই সে সব পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তালিকার প্রথমে রয়েছে 'দৈনিক প্রতিদিন'-এ উল্লেখিত নাম, যাদের ভেতর ১২৫টির নাম নির্মূল কমিটি ২০০৭ সালে প্রকাশ করেছে। তারকা (*) চিহ্নিত সংগঠনগুলোর কোনও সাংগঠনিক তৎপরতা বর্তমানে দৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী সংগঠনসমূহ—

১. আফগান পরিষদ
২. আহলে হাদিস আন্দোলন
৩. আহলে হাদিস যুব সংঘ (এএইচজেএস)*
৪. আহলে হাদিস তবলিগে ইসলাম*
৫. আহসাব বাহিনী (আত্মঘাতী সুইসাইড গ্রুপ)*
৬. আল হারামাইয়েন (এনজিও)
৭. আল হারাত আল ইসলামিয়া*
৮. আল ইসলাম মার্টারস ব্রিগেড*

৯. আল ইসলামী সংহতি পরিষদ*
১০. আল জাজিরা*
১১. আল জিহাদ বাংলাদেশ*
১২. আল খিদমত*
১৩. আল কুরত আল ইসলামী মারর্টারস*
১৪. আল মারকাজুল আল ইসলামী (এনজিও)
১৫. আল মুজাহিদ*
১৬. আল কায়দা
১৭. আল সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী*
১৮. আল তানজীব আল উম্মাহ
১৯. আল্লার দল (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
২০. আল্লার দল ব্রিগেড (আত্মঘাতী দল)*
২১. আল ইয়াম্মা পরিষদ*
২২. আমানাতুল ফোরকান আল খাইরিয়া (এনজিও)
২৩. আমিরাত-ই-দিন*
২৪. আমরা ঢাকাবাসী
২৫. আনজুমানে তালামজিয়া ইসলামিয়া (আলিয়া ছাত্রদের সংগঠন)*
২৬. আনসার-আল-ইসলাম
২৭. আনসারুল্লাহ মুসলামিন*
২৮. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) (২০১৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
২৯. আরাকান আর্মি (এ এ)
৩০. আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি)
৩১. আরাকান লিবারেশন পার্টি
৩২. আরাকান মুজাহিদ পার্টি*
৩৩. আরাকান পিপলস আর্মি*
৩৪. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স
৩৫. আরাকান রোহিঙ্গা*
৩৬. ইসলামিক ফ্রন্ট (রাজনৈতিক দল)
৩৭. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)
৩৮. ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আরকান মুভমেন্ট*
৩৯. ইবতেদাদুল-আল মুসলিমা*
৪০. ইকতেদুল তালাহ-আল মুসলেমিন*
৪১. ইকতেদুল তুলাহ-আল-মুসলেমিন (আইটিএম)
৪২. ইন্টারন্যাশনাল খাতমে নব্যুয়ত মুভমেন্ট
৪৩. ইসলাহুল মুসলেমিন
৪৪. ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ*

৪৫. ইসলামী জিহাদ গ্রুপ
৪৬. ইসলামী লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ (আইএলটিবি)
৪৭. ইসলামী প্রচার মিডিয়া*
৪৮. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (রাজনৈতিক দল)
৪৯. ইসলামী সমাজ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
৫০. ইসলামিক ডেমোক্র্যেটিক পার্টি (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
৫১. ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট*
৫২. ইয়ং মুসলিম*
৫৩. এবতেদাতুল আল মুসলামিন*
৫৪. এহসাব বাহিনী*
৫৫. ওয়ারেট ইসলামিক ফ্রন্ট
৫৬. ওয়ার্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ*
৫৭. ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যানাত (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
৫৮. কালেমায়ে-জামাত
৫৯. কালেমা-ই-দাওয়াত (অধ্যাপক আবদুল মজিদ এ দলের প্রধান)
৬০. কতল বাহিনী (আত্মঘাতী গ্রুপ)*
৬১. খাতেমী নব্যুয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ (কেএনএপিবি)
৬২. খাতেমী নব্যুয়াত কমিটি বাংলাদেশ*
৬৩. খিদমত-ই-ইসলাম*
৬৪. খিলাফত মজলিশ (রাজনৈতিক দল)
৬৫. খিতল-ফি-সাবিলিল্লাহ*
৬৬. খিলাফত-ই- হুক্মত*
৬৭. ছাত্র জামায়েত*
৬৮. জাদিদ-আল-কায়েদ
৬৯. জাগ্রত মুসলিম বাংলা*
৭০. জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
৭১. জামাত-এশ-সাদাত*
৭২. জামায়াত-উল-ইসলাম মুজাহিদ*
৭৩. জামা'আতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
৭৪. জামাত-ই-মুদারাসিন বাংলাদেশ (আলিয়া শিক্ষকদের সংগঠন)*
৭৫. জামাত-ই-তুলবা*
৭৬. জামাত-ই-ইয়াহিয়া*
৭৭. জামাত-উল-ফালিয়া
৭৮. জামাতুল ইসলাম মুজাহিদ*

৭৯. জামাতে আহলে হাদিস*
৮০. জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া (একটি মাদ্রাসা)
৮১. জামিয়াতি ইসলামী সলিডারিটি ফ্রন্ট*
৮২. জামিয়াতুল ইয়াহিয়া উত তুরাজ
৮৩. জঙ্গি হিকমত*
৮৪. জয়শে-মুস্তাফা
৮৫. জয়শে-মোহাম্মদ
৮৬. জামাতুল-আল-শাদাত
৮৭. ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান*
৮৮. ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরকান (এনইউপিএ)
৮৯. নেজামে ইসলাম পার্টি (রাজনৈতিক দল)
৯০. ফার ইস্ট ইসলামী (বীমা কোম্পানী)
৯১. তা আমির-উল-দীন বাংলাদেশ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
৯২. তাহফিজ হারমাইন*
৯৩. তামির উদ্দিন বাংলাদেশ
৯৪. তানজিম বাংলাদেশ*
৯৫. তানজিন-ই-খাতেমি নব্যুয়ত*
৯৬. তাওহিদী জনতা
৯৭. তাওহিদ ট্রাস্ট (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)
৯৮. দাওয়াত-ই-ইসলাম
৯৯. বাংলাদেশ ইসলাম রক্ষা কমিটি*
১০০. বাংলাদেশ জামায়াত-উল-তালাবা-ই-আরাবিয়া (মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠন)
১০১. বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী দল*
১০২. বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট*
১০৩. মজলিশ ই তাফিজা খাতেমি নব্যুয়ত
১০৪. মুজাহিদ অব বাংলাদেশ*
১০৫. মুজাহিদী তোয়াবা*
১০৬. মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা
১০৭. মুসলিম মিল্লাত শরিয়াহ কাউন্সিল*
১০৮. মুসলিম মুজাহিদীন বাংলাদেশ (এমএমবি)
১০৯. মুসলিম রক্ষা মুজাহিদীন*
১১০. রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেন্স ফোর্স
১১১. রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট*
১১২. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট*
১১৩. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন(আর এস ও)
১১৪. রিভাইভাল অব ইসলামী হেরিটেজ (এনজিও)

১১৫. লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স
১১৬. লুজমা মককা আল খায়েরা*
১১৭. শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৩ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
১১৮. শাহাদাত-ই-নব্যুয়াত*
১১৯. শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত বিগ্রেড (আত্মঘাতী গ্রুপ)
১২০. সত্যবাদ*
১২১. সাহাবা সৈনিক
১২২. হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ (১২২ ও ১২৩ একই সংগঠন)
১২৩. হরকাত-উল জিহাদ-আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
১২৪. হায়েতুল ইগাসা (এনজিও)
১২৫. হেফাজতে খাতেমী নব্যুয়ত*
১২৬. হিযবুত তাহরীর (২০০৯ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত)
১২৭. হিজবা আবু ওমর
১২৮. হিজবুল মাহাদী*
১২৯. হিজবুল্লাহ আদেলী বাংলাদেশ*
১৩০. হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ*
১৩১. হিজবুত-তাওহিদ
১৩২. হিকমত-উল-জিহাদ।*

৮টি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের তালিকা

১. জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)
২. শাহাদাত আল হিকমা
৩. জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজিবি)
৪. হিজবুত তাহরীর
৫. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি)
৬. আনসারুল্লাহ বাংলাটিম (এবিটি)
৭. আনসার আল ইসলাম
৮. আল্লাহর দল

বর্তমান শ্বেতপত্রের জন্য অনুসন্ধানে প্রাপ্ত আরও ২৭টি জঙ্গি সংগঠনের নামের তালিকা ও পরিচিতি

১. হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি)
২. নব্য জেএমবি
৩. মানহাজি গ্রুপ বাংলাদেশ
৪. আনসার আল ইসলাম

৫. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)
৬. হিযবুত তাহরীর
৭. জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)
৮. হরকাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ
৯. দাওয়াতুল ইসলাম
১০. ইসলামী সমাজ
১১. 'দাওয়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ'
১২. দাওয়াহ ইলাল্লাহ
১৩. স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি (৯ জঙ্গি সংগঠনের জোট)
১৪. আল্লাহর দল
১৫. ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা
১৬. বাংলাদেশ জিহাদী গ্রুপ
১৭. জামায়াতুল মুসলেমিন
১৮. হিলফুল ফুযুল আল ইসলামী বাংলাদেশ
১৯. সাহাবা সৈনিক পরিষদ বাংলাদেশ
২০. দাওয়াতে ইসলামী
২১. মুজাহিদ অব বাংলাদেশ
২২. শহীদ হামজা ব্রিগেড
২৩. জঙ্গি সংগঠন 'বিইএম'
২৪. আল-কায়েদা ইন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS)
২৫. আল তানজীম
২৬. হিজবুত তাওহীদ
২৭. বাংলাদেশ খতমে নবুওয়াত

২৭টি আলোচিত জঙ্গি সংগঠনের পরিচিতি

বাংলাদেশে ইসলামের নামে হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হয়েছে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ, পিডিপি প্রভৃতি দলের ঘাতক বাহিনীসমূহের সহযোগিতায় একদিকে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নারী নির্যাতন করেছে, পাশাপাশি তালিকা প্রস্তুত করে বাঙালিত্বের চেতনায় বিশ্বাসী ভিন্নমতের ও ভিন্নধর্মের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যা করেছে। শেষোক্ত অপরাধের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল জামায়াতের নৃশংস 'আলবদর' বাহিনী। জামায়াতের দর্শন 'মওদুদীবাদ'-এই সব হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে ইসলামের নামে বৈধতা দিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও জামায়াত এবং 'আলবদর' বাহিনী আত্মসমর্পণ না করে আত্মগোপন করেছিল। স্বাধীন

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সহযোগী যারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। কারণ হিসেবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ধর্মের নামে হত্যা ও সন্ত্রাস বন্ধের জন্যই ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ধর্মের নামে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছে তাদের বিচারেরও উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু এবং তার সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত ৭৩টি ট্রাইবুনালে '৭১-এর ঘাতক দালালদের বিচার হয়েছিল, যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় এসে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে দিয়ে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত গণহত্যাকারীদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। সংবিধান থেকে তিনি 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' বাতিল করে, ধর্মের নামে রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে এবং জামায়াতে ইসলামী সহ তাদের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলসমূহকে রাজনীতির সুযোগ দিয়েছিলেন। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির যে মৌলবাদীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন তার মাশুল শুধু বাংলাদেশকে নয়, গোটা বিশ্বকে দিতে হচ্ছে।

২০০৮ সালে নির্মিত শাহরিয়ার কবিরের প্রামাণ্যচিত্র 'যুদ্ধাপরাধ ৭১' (War Crimes 71)-এ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণহত্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বেন কিয়েরনান বলেছেন, 'বাংলাদেশের গণহত্যাকারীদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি আল কায়দাকে ইসলামের নামে গণহত্যা ও সন্ত্রাসে অনুপ্রাণিত করেছে। যেসব পাকিস্তানি জেনারেল '৭১-এর গণহত্যার জন্য দায়ী শাস্তি থেকে অব্যাহতির কারণেই তারা 'আল কায়েদা' গঠন করেছে। বাংলাদেশে গণহত্যার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে জামায়াত এক সময় ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে এবং বহু জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে।*

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার গঠন করে। এর পাঁচ মাস পর ১৯৯২-এর এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রথম জঙ্গি সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় তা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে। ২০০১-২০০৬ সালে জামায়াত-বিএনপি জোট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে 'হরকাতুল জিহাদ' সহ ১২৫টি জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল বাংলা ভাই-এর 'জামাতুল মুজাহিদীন' (জেএমবি) যাকে জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন, 'মিডিয়াসৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র'। পরে বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছিল। ফাঁসিতে ঝুলে বাংলা ভাইদের প্রমাণ করতে হয়েছে তারা মিডিয়া সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র ছিল না।

* You tube-এ দেখুন শাহরিয়ার কবিরের War Crimes 71

আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহ সরকার উৎখাতে মার্কিনীদের অর্থ-অস্ত্র সহযোগিতা এবং পাকিস্তানে সামরিক প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইসলামের নামে উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় গত শতাব্দীর ৮০-৯০-এর দশকে আফগান জিহাদের সময় থেকে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এই জঙ্গি গোষ্ঠীদের মদদ দেয়। পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানে মৌলবাদী জঙ্গি দলগুলোর ব্যাপক প্রসার ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, কাশ্মীর, সৌদি আরব, ইয়েমেন, সুদান, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, লিবিয়া ও মিশর থেকে মাদ্রাসা ছাত্র, শিক্ষক এবং ইসলামী রাজনীতির নামে যারা সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের তথাকথিত আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। নিম্নে বাংলাদেশে বর্তমানে আলোচিত ২৫টি উল্লেখযোগ্য জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল–

১. হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ

দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র, 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বইপুস্তক, সাময়িকী, জঙ্গিবাদী আদর্শের লেখকদের আরবি, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ, আফগান ফেরত কয়েকজন জঙ্গি নেতাদের জবানবন্দিসহ তাদের লিখিত গ্রন্থাদি এবং বিভিন্ন তথ্যের উপর গণকমিশনের অনুসন্ধানে হরকাতুল জিহাদের ইতিহাস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড বিষয়ে জানা গেছে– বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নেয়া বিদেশি জঙ্গিদের নিয়ে পাকিস্তানের নাগরিক দেওবন্দী মাওলানা আরশাদ আহমাদ গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী আল আলমী প্রতিষ্ঠা করেন। এর বাংলাদেশ শাখা প্রথম ১৯৮৬ সালের ১৭ জুন আফগানিস্তানের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ' (হুজি) গোপনে তৎপরতা শুরু করে। প্রায় ছয় বছর গোপনে সংগঠিত হয়ে ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে হুজি।

১৯৮৯ সালে যশোরের আব্দুর রহমান ফারুকী আফগান যুদ্ধ থেকে দেশে ফেরার পরই শুরু হয় বাংলাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের সাংগঠনিক তৎপরতা। তিনি দেশে ফিরে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন। পরে দলটি 'হরকত-উল-জিহাদ অব বাংলাদেশ' সংক্ষেপে 'হুজিবি' বা 'হুজি' নাম ধারণ করে। আব্দুর রহমান ফারুকী দলটির আমির নিযুক্ত হন। দল গঠন করার পর পরই ১৯৮৯ সালে আব্দুর রহমান আবার আফগানিস্তানে চলে যান। এ সময় আরেক আফগান ফেরত জঙ্গি মুফতি আব্দুল হাই দলের ভারপ্রাপ্ত আমির হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তানের নজীবুল্লাহ সরকারের সঙ্গে আফগান মুজাহিদদের এক যুদ্ধে আব্দুর রহমান ফারুকী নিহত হন। এরপর আফগান ফেরত জঙ্গি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার মুফতি আব্দুল হাই হুজির স্থায়ী আমির নিযুক্ত হন।

১৯৯৩ সালে মুফতি আব্দুস সালামকে হুজির আমির নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালে আফগান ফেরত জঙ্গি কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবের বাসিন্দা মুফতি শফিকুর রহমানকে হুজির আমির নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৬ সালে হাফেজ ইয়াহিয়াকে হুজির স্থায়ী আমির নিযুক্ত করা হয়।

হুজি মূলত আফগান যুদ্ধফেরত মুজাহিদদের নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তানভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন। এ সংগঠনের মূল নেতা আফগান মুজাহিদদের অন্যতম জঙ্গি পাকিস্তানি নাগরিক সাইফুল্লাহ আখতার।

২০০৭ সালের এপ্রিল সংখ্যা হুজির মুখপত্র 'মাসিক রহমত' পত্রিকার তথ্য মতে, 'আফগান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদের সেখানে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ থেকেও মাদ্রাসা-পড়ুয়া প্রায় ৫ হাজার যুবক ও কিশোর পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান যায়। হরকাতুল জিহাদ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের পরপরই তারা প্রথমে বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। প্রথম দিকে কওমি মাদ্রাসাগুলো থেকে সদস্য সংগ্রহ করে আফগান যুদ্ধে লোক পাঠানোই ছিল এ সংগঠনের মূল কাজ। আফগান যুদ্ধ শেষে হুজি মিয়ানমারে লোক পাঠানো শুরু করে। এ সময় কক্সবাজার ও বান্দরবানের গহীন অরণ্যে রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে হুজির সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ১৯৯২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি উখিয়ায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় তাদের ৪১ সদস্য সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তারও হয়েছিল।'[১]

২০০৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হরকাতুল জিহাদ সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এ লক্ষ্যে তারা দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে বাছাই করা তরুণদের কক্সবাজার ও বান্দরবানের গহীন অরণ্যে গিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এভাবে তারা প্রায় ২৫ হাজার কর্মীকে আফগান স্টাইলে প্রশিক্ষণ দেয়। এসব কর্মী প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারার ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেতা-কর্মীদের জঙ্গি কার্যক্রমে ভেড়াতে চেষ্টা করে। এ নিয়ে ইসলামী দলগুলোর বিভিন্ন নেতা-কর্মীর সঙ্গে নব্বইয়ের দশকে হাতাহাতি-মারামারির ঘটনা ছিল অনেকটাই নৈমিত্তিক বিষয়। এমনকি ইসলামী দলগুলোর বিভিন্ন নেতাকে তারা হত্যার হুমকিও দিয়েছে বহুবার।'[২]

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের সংগঠন পরিচিতি পুস্তিকায় বলা হয়েছে– 'আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, মুহাম্মদ (সা) আমাদের আখেরী নবী ও পথপ্রদর্শক, কোরআন আমাদের কিতাব, কা'বা আমাদের কিবলাহ, সাহাবায়ে কিরাম আমাদের অনুসরণীয়, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, শাহ ওয়ালী উল্লাহ এর শিক্ষা আমাদের চেতনা, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জীবন চরিত আমাদের জীবনের প্রেরণা, সত্য ও ন্যায়ের পথে শাহাদাত বরণ আমাদের মূল লক্ষ্য।

'উদ্দেশ্য– ১. হুওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকুন, ২. এ আয়াতের প্রেক্ষিতে বিশ্বময় ইসলামকে সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য, ৩.

আমরা দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের হৃত সম্মান ও শক্তি পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ।

'লক্ষ্য ও চিন্তাধারা– ৪. আমরা মুসলিম বিশ্বকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন, একক মুসলিম শক্তি গঠনে বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো, ৫. এ সংগঠনের সকল কার্যক্রম ইসলাম অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যে সীমিত থাকবে, কোনো প্রকার অনৈসলামিক চিন্তাধারা ও পদ্ধতির সাথে এর সংযোগ ও সাযুজ্য থাকবে না, ৬. ওয়া আয়িদ্দু লাহুম মাসতাতোয়া'তুম মিন কুওয়াহ(সুরা আনফাল, (আয়াতঃ ৬০)-র দৃষ্টিতে সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য। এজন্য এমন মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যা ভবিষ্যত বংশধরদেরকে নির্ভিক দেশপ্রেমিক ও ত্যাগী মুজাহিদ রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, ৭. আমরা প্রতিটি মুসলিম দেশের জন্য 'সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন' বা দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে কাজ করে যাবো, ৮. আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা জালিম দখলদারদের কব্জা থেকে মুক্ত না হবে এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত না হবে, ৯. পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনগুলোর অস্তিত্ব ও পবিত্রতা যে কোনো মূল্যে আমরা অক্ষুণ্ন রাখব, ১০. ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান এবং সামাজিক ইনসাফ ও সাম্যের উজ্জল নমুনা।'[৩]

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৯ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হরকাতুল জিহাদের নেতা মুফতি আবদুর রউফ ও মুফতি আবদুল হাইসহ অনেকেই ধরা পড়ে। তখন তাদের সাংগঠনিক মুখপত্র মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকাটির প্রকাশনাও সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে জাগো মুজাহিদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও একই কর্মী বাহিনী নিয়ে এবং চিন্তাধারা এমনকি আকৃতি সব কিছু ঠিক রেখে 'মাসিক রহমত' নামে জাগো মুজাহিদই এখনো বের হচ্ছে মাওলানা মনযূর আহমাদের সম্পাদনায়। জানা গেছে, এ সময় হরকাতুল জিহাদের নেতারা বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের চিন্তা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এ নিয়ে তাদের মজলিশে আমেলার (নির্বাহী কমিটি) কয়েক দফা বৈঠকও হয়। তাতে বড় একটি অংশ বাধা দেয়। এ অংশটি সশস্ত্র জিহাদের পক্ষে কাজ করতে নেতাদের চাপ দিতে থাকে।

এ নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলে ১৯৯৬ সালে প্রথম হরকাতুল জিহাদে ভাঙন ধরে। সে সময় মুফতি আবদুল হান্নান তার অনুসারীদের নিয়ে হরকাতুল জিহাদের নেতৃত্বের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাল্টা কমিটি গঠন করেন। সশস্ত্র পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েই তিনি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। হরকাতুল জিহাদের একটি অংশও তার নেতৃত্বে যোগ দেয়।

জানা গেছে, মুফতি হান্নান হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার পর পাকিস্তানের আরেকটি জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল মুজাহিদীনের নেতা মাওলানা ফজলুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে হান্নানের। পাকিস্তানে এ সংগঠনটি

হরকাতুল জিহাদকে চ্যালেঞ্জ করে গঠিত হয়েছিল বলে এই সংগঠনের কর্মীরা হরকাতুল মুজাহিদীনকে ভালো চোখে দেখে না। এ কারণে মুফতি হান্নান কাগজে-কলমে হরকাতুল মুজাহিদীনের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও তিনি মাঠপর্যায়ে হরকাতুল জিহাদের নামেই কাজ করতেন। তার সঙ্গে মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা মনির ওরফে মদিনা হুজুরও সংগঠনের নীতিনির্ধারণী কমিটিতে স্থান পান। ২০০৫ সালের অক্টোবরে র‍্যাবের হাতে মুফতি হান্নান ধরা পড়েন।

হরকাতুল জিহাদে দ্বিতীয় দফা ভাঙন ধরে ১৯৯৮ সালে। মূল নেতারা সশস্ত্র জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় চিফ কমান্ডার মুফতি আবদুর রউফও নেতাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়েও একে অন্যকে দোষারোপ করলে একপর্যায়ে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে মুফতি আবদুর রউফকে হরকাতুল জিহাদ থেকে বহিষ্কার করার দাবি করেন হরকাতুল জিহাদ নেতারা। তবে আবদুর রউফের অনুসারীরা দাবি করছেন, তারা নিজেরাই বেরিয়ে গিয়ে পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এ সময় তারা আবদুর রউফের নেতৃত্বে তামির-উদ-দীন নামে নতুন জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি হরকাতুল জিহাদের চিফ কমান্ডার থাকায় সংগঠনের বড় একটি অংশ তার নেতৃত্বে যোগ দেয়। অল্প দিনেই দেশের ৩৪ জেলাজুড়ে গড়ে ওঠে এই সংগঠনের নেটওয়ার্ক। তারা সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতে ২০০১ সালে মাসিক আত তাহরীয নামে একটি ম্যাগাজিনের প্রকাশনাও শুরু করে। ডিক্লারেশনবিহীন এ পত্রিকাটি প্রায় ছয় মাস বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্যালয় হিসেবে সাভারের একটি ঠিকানা ব্যবহার করা হতো। সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবদুল হালিম হুসাইনী। আব্দুর রহমান ফারুকী সম্পাদিত 'জাগো মুজাহিদ' নামের এই পত্রিকাটি হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হত।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা হরকাতুল জিহাদের মুখপত্র 'মাসিক জাগো কাফেলা' পত্রিকায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের প্রশ্নেই মুলতঃ তিন গ্রুপে বিভক্ত হয় 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী।' মুফতি আবদুস সালামের নেতৃত্বে মূল অংশ 'হুজি', মুফতি আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে 'হরকাতুল মুজাহিদীন' আর মুফতি আবদুর রউফের নেতৃত্বে 'তাআমির উদ দীন'। তাদের মধ্যে 'হুজি' সশস্ত্র জিহাদের পক্ষে না থাকলেও অন্য দুটি অংশ শুরু থেকেই সশস্ত্র জিহাদের চিন্তা লালন করে আসছে। এমনিক হুজি সংগঠনের নাম পাল্টে প্রথমে 'ইসলামী দাওয়াতি কাফেলা', পরে 'সচেতন ইসলামী জনতা', এরপর 'ইসলামী গণ-আন্দোলন', সর্বশেষ 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি' (আইডিপি) নামে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করে। নির্বাচন কমিশনে আইডিপি নামে তারা নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করে। ২০০৬ সালের ১৮ আগস্ট 'সচেতন ইসলামী জনতা'র ব্যানারে তারা রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে প্রকাশ্যে মিছিল ও সমাবেশ করে।[৪]

২০০৬ সালের ১৯ আগস্ট দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী যাদের হাতে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারা এই সংগঠনটিকে ১৯৯৮ সালে আগস্টে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে।

কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে- মুফতি হান্নান, মাওলানা আবু জাফরের বিতর্কিত ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিচালনা আঁচ করতে পেরেই সংগঠনটির কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তারা হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের এই ক্ষুব্ধ হওয়ার ঘটনাই 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'কে ভাঙনের দিকে ঠেলে দেয়। পরিণতিতে সংগঠনটি ৩ ভাগে বিভক্ত হয়। বিভক্ত অংশগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী ধারা দু'টি এখনও পর্যন্ত হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নামে তৎপরতা চালাচ্ছে আর ইসলামী গণআন্দোলন করছে।

'গণআন্দোলন নেতারা আরও বলছেন, সংগঠনটিকে ১৯৯৮ সালে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলেও সরকার গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশে ২০০৫ সালে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের দাবি 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী' বিপ্লব নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে সরকারপক্ষের প্রকাশ্য বক্তব্য জরুরি। এর মাধ্যমে নির্দোষ ব্যক্তি যেমন নাজেহাল হবেন না; তেমনি প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত হবে।'[৫]

১৯৮৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের জঙ্গিদের বিভিন্ন অংশ নিজ নিজ দেশে ফিরতে শুরু করে এবং আফগানিস্তানে নজিবুল্লাহ সরকার তখনও ক্ষমতাসীন থাকায় বিদেশি জঙ্গিদের একটি অংশ সেখানে রয়ে যায়। তারা নজিবুল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

জঙ্গি মৌলবাদের সমর্থক লেখক ফারুখ হাসানের "আফগান রণাঙ্গন থেকে বলছি" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, '১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী ঢাকায় 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' এর প্রাথমিক কর্মকাণ্ড শুরুর ঘোষণা দেন। ওই বছরের ১১ মে তিনি আফগানিস্তানের খোস্ত রণাঙ্গনে নজিবুল্লাহ বাহিনীর হাতে নিহত হন। ফলে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর প্রাথমিক তৎপরতা থেমে যায়। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে আফগানিস্তানের মস্কোপন্থী নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের মাধ্যমে ইসলামপন্থীরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এ মাসেই বেশিরভাগ বিদেশি জঙ্গি আফগানিস্তান ছেড়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান।

'আফগানিস্তানে ইসলামপন্থীদের বিজয় হলে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ'-এর সদস্যরাও দেশে ফিরে আসে। এ সময় সংগঠনটির অফিস নেয়া হয় রাজধানীর খিলগাও-এর তালতলা এলাকায়।'[৬]

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে– আবু জাফরের ইন্ধনে মুফতি আবদুল হান্নান 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'র প্রচার-সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সংগঠনের প্রতি অনীহা, উগ্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং আমীরের আনুগত্যের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সে সঙ্গে তিনি হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর নেতাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এবং বলেন- দেশে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নয়; হরকাতুল মুজাহিদীনই কর্মকাণ্ড চালাবে। এ অবস্থায় হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ও হরকাতুল মুজাহিদীনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নেতারা মুফতি আবদুল হান্নানকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেন এবং একই বছরের আগস্ট মাসে সংগঠনের মজলিশে শূরার

বৈঠক ডেকে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং বৈঠকে কোনো সশস্ত্র জিহাদে অংশ নেয়া বা নিপীড়নের শিকার মুসলিম দেশগুলোকে স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণের কর্মসূচি পরিত্যাগ করে ইসলামী দাওয়াত ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নতুন সংগঠনের আমির নিযুক্ত হন হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া।

'ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা'-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর অন্যতম নেতা মাওলানা আবদুর রউফ সংগঠনের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজস্ব চিন্তাধারা মোতাবেক কাজ শুরু করেন। ফলে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে দাওয়াতী কাফেলা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কার হওয়ার পর মাওলানা রউফ প্রতিষ্ঠা করেন তানজীমে তামিরউদ্দিন, যা 'হিজবে আবু ওমর' নামে দেশে সক্রিয় আছে। ২০০২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মজলিশে শুরার বৈঠকে ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা এর আমির নির্বাচিত হন মুফতি শফিকুর রহমান।

২০০৮ ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি– আইডিপি নামে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী– হুজি। ২৬ শে সেপ্টেম্বর (২০০৮) রাজধানীতে ইফতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে সাবেক আফগান ফেরত জঙ্গিদের এই সংগঠন আইডিপি। অবশ্য সংগঠনের আহ্বায়ক মাওলানা শেখ আবদুস সালাম বলেছেন, 'তাদের সংগঠন এ দেশে ১৯৯২ সালেই আত্মপ্রকাশ করে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নামে। এরপর ১৯৯৮ সালে তা বিলুপ্তি ঘোষণার পর 'ইসলামী গণ-আন্দোলন' নামে সংগঠন করেছিলাম। সেই সংগঠন থেকে এখন আইডিপি নামে কাজ করছি।' ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মাওলানা শেখ আবদুস সালামের সভাপতিত্বে আইডিপির ইফতার ও আলোচনা সভায় সংগঠনের নেতারা ছাড়াও সংগঠনের ভাষায় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়নের স্বার্থে আমন্ত্রিত' ইংরেজি সাপ্তাহিক ব্লিৎজ-এর সম্পাদক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী, দৈনিক আমার দেশ-এর সহকারী সম্পাদক ও হিউম্যান রাইটস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব চৌধুরী, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের পি কে বড়ুয়া, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু বক্তৃতা দেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী বলেন, 'আইডিপির আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশে নতুন রাজনীতির জন্ম হলো।'

২০০৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– 'শেখ আব্দুস সালাম বলেন, আইডিপির সঙ্গে হরকাতুল জিহাদের নাম জড়িত। এটা এমন একটি সংগঠন, যার সম্পর্কে নানা আলোচনা রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ এবং বালিতে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সত্ত্বেও হিযবুত তাহ্‌রীরের মত সংগঠন যদি এ দেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারে, তাহলে আইডিপি কেন পারবে না। যারা বাংলাদেশকে করদ রাজ্য বানাতে চায়, তারা আইডিপিকে হুমকি মনে করে। সঞ্জীব চৌধুরী বলেন, 'আফগানফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের মূলধারার সদস্যরা আইডিপি গঠন করেছে। পরিচয়সূত্রে আমি এদের সঙ্গে অনেক কাজ

একত্রে করেছি। এ নিয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। আমরা এই অনুষ্ঠান আরও আগে করতাম, কিন্তু সরকারের অনুমতি পেতে দেরি হয়েছে। তাতে একদিকে ভালোই হলো। আজ পবিত্র জুমাতুল বিদার দিন আইডিপির প্রথম প্রকাশ্য মাহফিল হচ্ছে।

'আইডিপির উপদেষ্টা ও খেলাফত আন্দোলনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাজী আজীজুল হক বলেন, 'তথ্য ও যোগাযোগের ঘাটতির কারণে আইডিপি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। হরকাতুল জিহাদ বিলুপ্ত করার পর প্রথমে ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা, তারপর ইসলামী গণ-আন্দোলন এবং এখন আইডিপি নামে সংগঠন হয়েছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই এটা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন আইডিপির সদস্যসচিব মাওলানা রুহুল আমিন, যুগ্ম-আহ্বায়ক কারি হোসাইন আহমদ, মাওলানা আবুল কাশেম রহমানী ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান এবং মাওলানা মুফতি কামাল, মাওলানা মীর ইদ্রিস, মুফতি ফজলে এলাহি, মাওলানা মুফতি নোমান, খেলাফত মজলিসের (ইসহাক) নায়েবে আমির এমদাদুল হক আড়াইহাজারী, খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির জাফর উল্লাহ খান, জৈনপুরী পীর মাওলানা এহছানুল্লাহ আব্বাসী প্রমুখ। এ ছাড়া মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের মেজ ছেলে হাফেজ মাওলানা হামিদুল্লাহ ও মাওলানা আতাউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহস্রাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিল।'[৭]

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারিসহ নানা কারণে সংগঠনটি বিভিন্ন সময় নাম পাল্টালেও এর নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কাঠামো, মজলিশে শুরা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া প্রায় একই থেকেছে। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে প্রথম গোপন এই সংগঠনটি ইসলামী গণ-আন্দোলন নামে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসার চেষ্টা করে। এই লক্ষ্যে ওই বছরের ১৮ আগস্ট জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে 'সচেতন ইসলামী জনতা'র ব্যানারে বড় একটি সমাবেশ করেছিল। তখন সচেতন ইসলামী জনতার আহ্বায়ক হিসেবে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হাফেজ মাওলানা আবু তাহের। এই তাহের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি। তিনি কারাগারে আছেন। আবু তাহের হুজির ঢাকা মহানগর সভাপতি ও মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন নাশকতামূলক ঘটনার পর সরকার ২০০৫ সালের ১৭ অক্টোবর হুজিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

২০০৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইসরাইলের স্বঘোষিত বন্ধু সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর উপস্থিতিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হরকাতুল জিহাদ প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি বা আইডিপি নাম নিয়ে। শোয়েব ২০০৩ সালের ২৯ নভেম্বর ইসরাইল যাওয়ার পথে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আটক হন। সেই সময় ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০০৩ সালের ১ ডিসেম্বর ডেইলী স্টার-এর তথ্য মতে, বিমানবন্দরে তাকে গ্রেপ্তার করার সময় তার কাছে একটি প্রজেক্ট প্রোফাইল পাওয়া যায়, যাতে তিনি ইসরাইলের কাছে তিনটি দৈনিক পত্রিকা যথা দৈনিক সোনালী

দিন, দৈনিক রূপান্তর, দৈনিক পরিবর্তন প্রকাশের জন্য ১২ কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তিনি তার আবেদনে ইসরাইলী বন্ধুদের মুসলিম প্রধান দেশে মিডিয়া গড়ে তোলার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, কোটি কোটি ডলার খরচ করে যুদ্ধবিমান ক্রয়ের চেয়ে মিডিয়া সৃষ্টি করুন, এতে ইসরাইল বেশি লাভবান হবে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা সম্পর্কে লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির নির্মিত 'জিহাদের প্রতিকৃতি' প্রামাণ্যচিত্রে হরকাত নেতা মুফতি হান্নান বলেছেন– হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনাকে হত্যা করা, যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুনী অবসরপ্রাপ্ত মেজর নূর, জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং তারেক জিয়া নিজে। ৪টি গোপন বৈঠকের মাধ্যমেই ২১ আগস্ট হামলার পুরো পরিকল্পনা করা হয় হাওয়া ভবনে। এর আগে ১৪ আগস্ট হাওয়া ভবনের বৈঠকের দেয়া তিনটি প্রস্তাবের একটিকে অনুসরণ করে চালানো হয় মূল হামলা। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে দেয়া জবানবন্দিতে এই অপারেশনের মূল কমান্ডার মুফতি হান্নান নিজেই আবার অপারেশন ব্যর্থ হবার কারণও বর্ণনা করেছেন।

হাওয়া ভবনের ওই বৈঠকে সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও বঙ্গবন্ধুর খুনী ফ্রিডম পার্টি নেতা মেজর নূর এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে শেখ হাসিনাকে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[*]

অনুসন্ধানে জানা গেছে, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের (হুজি-বি) জঙ্গিরা দেশে সাত বছরে অন্তত ১৩টি জঙ্গি হামলা ঘটায়। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১০১ জন। আহত হয়েছেন ৬০৯ জন। এসব হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন হুজি-বি ও হরকাতুল মুজাহিদীনের অন্যতম শীর্ষ নেতা মুফতি আবদুল হান্নান। এর মধ্যে তিনটির মূল লক্ষ্য ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসব বোমা ও গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মুফতি হান্নানের বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা হয়েছে। দুটির বিচার শেষ হয়েছে। এর মধ্যে সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলার দায়ে মুফতি হান্নানসহ তিন জঙ্গির ফাঁসি ও দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। এ মামলায় আসামিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন করে হাইকোর্ট আদেশ দেন। এছাড়া ২০০১ সালে রমনায় বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা মামলায় হান্নানসহ হুজির আট জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ মামলার ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন) হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় আছে। হান্নানের বিরুদ্ধে থাকা আরও ১৩টি মামলার বিচার চলছে। দুটির অধিকতর তদন্ত চলছে।

মুফতি হান্নান ২০০৬ সালের ১৯ নভেম্বর এবং ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর দুই দফায় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে এসব হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

---

[*] You tube-এ দেখুন শাহরিয়ার কবিরের 'Portrait of Jihad'

এর আগে ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর রাজধানীর বাড্ডার বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন মুফতি হান্নান। এরপর বিভিন্ন মামলায় টানা ১২০ দিন রিমান্ডে ছিলেন তিনি। তখনই গোয়েন্দাদের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে মুফতি হান্নান শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করাসহ বিভিন্ন হামলায় জড়িত থাকার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেন। কিন্তু তা তৎকালীন বিএনজি-জামায়াত জোট সরকার প্রকাশ করেনি। বরং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার তদন্ত ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করে। গোয়েন্দাদের কাছে দেয়া হান্নানের ওই জবানবন্দি প্রথম ২০০৭ সালের ২১ আগস্ট প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাসহ বিভিন্ন মামলা নতুন করে তদন্তের উদ্যোগ নেয়।

১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে এ দেশে গোপন জঙ্গি সংগঠন হুজি-বির নাশকতা শুরু হয়। হুজি-বির কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তে মুফতি হান্নান ও মুফতি আবদুর রউফের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় এ হামলা হয় বলে হান্নানের জবানবন্দিতে উল্লেখ রয়েছে। ওই হামলায় ১০ জন নিহত ও দেড়'শ জন আহত হন। এরপর একই বছরের ৮ অক্টোবর খুলনা শহরের আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলা হয়। তাতে আটজন নিহত হন।

২০০০ সালের জুলাইয়ে কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের কাছাকাছি ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রেখে প্রথম আলোচনায় আসেন মুফতি হান্নান ও তার দল। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে থেকে তৎপরতা চালান।

২০০১ সালে ঢাকায় সিপিবির সমাবেশে, রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানসহ ছয়টি বোমা হামলার ঘটনা ঘটায় জঙ্গিরা। এরপর শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে তার সমাবেশে। এতে আওয়ামী লীগের ২৩ জন নেতা-কর্মী নিহত হন। আহত হন শেখ হাসিনাসহ তিন শতাধিক ব্যক্তি।

তার আগে ওই বছরের ২১ মে সিলেটে হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারে বাংলাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর এবং ৭ আগস্ট সিলেটের তৎকালীন মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের ওপর গ্রেনেড হামলা চালায় হুজি-বির জঙ্গিরা। হান্নানের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সর্বশেষ গ্রেনেড হামলা হয় ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি হবিগঞ্জে এক সমাবেশে। ওই হামলায় আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াসহ পাঁচজন নিহত হন।

২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ৪৯ আসামির মধ্যে ২৯ জনই হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের (হুজিবি) জঙ্গি। সংগঠনটি তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নীতিনির্ধারক ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বর্বরোচিত হামলা চালায়। দেশের ইতিহাসে একটি রায়ে একসঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানসহ সাতজন রাজনৈতিক নেতা, ১১ জন সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তা ও ২৯ দুর্ধষ জঙ্গির দণ্ডিত হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন।

রায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ২৯ জঙ্গি : ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে হুজিবির যেসব জঙ্গির ফাঁসির দণ্ড হয়েছে তারা হলো- মাওলানা তাজউদ্দিন (পলাতক), হুজির সাবেক

আমির ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টির আহ্বায়ক মাওলানা শেখ আবদুস সালাম, কাশ্মীরি জঙ্গি আবদুল মাজেদ ভাট, আবদুল মালেক ওরফে গোলাম মোস্তফা, মাওলানা শওকত ওসমান, মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান, মাওলানা আবু সাঈদ ওরফে ডা. জাফর, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হোসাইন আহম্মেদ তামিম, মঈন উদ্দিন শেখ ওরফে মুফতি মঈন ওরফে আবু জান্দাল, মো. রফিকুল ইসলাম সবুজ, মো. উজ্জ্বল রতন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হুজিবির জঙ্গিরা হলো- হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, শাহাদাৎ উল্লাহ ওরফে জুয়েল, মাওলানা আবদুর রউফ, মাওলানা সাব্বির আহমেদ, আরিফ হাসান ওরফে সুমন, আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, মহিবুল মুত্তাকিন ওরফে মুত্তাকিন (ভারতের কারাগারে), আনিসুল মুরছালিন ওরফে মুরছালিন (ভারতের কারাগারে), মো. খলিল ওরফে খলিলুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম বদর (পলাতক), মো. ইকবাল ওরফে ইকবাল হোসেন, লিটন ওরফে মাওলানা লিটন, মুফতি শফিকুর রহমান (পলাতক), মুফতি আব দুল হাই (পলাতক) ও রাতুল আহমেদ ওরফে রাতুল বাবু।

২. নব্য জেএমবি

দেশে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে নব্য জেএমবিকে সবচেয়ে উগ্রপন্থি সংগঠন মনে করা হয়। ২০১৬ সালে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের শক্তির পরিচয় দেয়। এরপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে নব্য জেএমবির অপারেশনাল শক্তি কমতে থাকে। এর পর থেকে সংগঠনটি অনলাইনভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম ও পরপর বেশ কয়েকটি পুলিশ বক্সে হামলা চালায়। বর্তমানে নব্য জেএমবির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাহাদী হাসান জন ওরফে আবুল আব্বাস আল বাঙালি। মাহাদী দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে পলাতক।

নব্য জেএমবি যে সাংগঠনিক কাঠামোতে রয়েছে সেখানে শীর্ষ পদ হলো আমির। এর পরের পদটি নায়েবে আমির। তৃতীয় স্তরে শুরা বোর্ড। বর্তমানে আমির পদে রয়েছেন বিদেশে পলাতক মাহাদী। আর নায়েবে আমিরের দায়িত্ব পালন করছেন আহসান হাবিব লায়ন। নায়েবে আমিরের পাশাপাশি নব্য জেএমবির সামরিক শাখার প্রধানও তিনি।

২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা, নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, ১২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস জিম্মি সংকটের ঘটনা স্তম্ভিত করেছিল পুরো দেশকে। ভয়াবহ ওই হামলার জন্য জঙ্গিরা চার মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিল। যদিও হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে হলি আর্টিজান বেকারিকে বেছে নেওয়া হয় হামলার দুই সপ্তাহ আগে। আর হামলাকারী দলটি তাদের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে জানতে পারে হামলার মাত্র তিন-চার দিন আগে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনা স্তম্ভিত করেছিল পুরো বাংলাদেশকে। একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছিল জঙ্গিবাদের বিস্তারের এক

বিপজ্জনক মাত্রা। জঙ্গিরা হত্যা করেছিলেন ২০ জন দেশি-বিদেশি নাগরিককে; যাদের মধ্যে ৯ জন ইতালীয়, ৭ জন জাপানি, ১ জন ভারতীয় ও ৩ জন বাংলাদেশি। এই হামলায় জড়িত গোষ্ঠীর নাম নব্য জেএমবি; যারা ঘটনার পর নিজেদের আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস (ইসলামিক স্টেট) বলে দাবি করেছিল। গুলশার পর থেকে দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র, গবেষণাধর্মী বিভিন্ন বইপুস্তক, নব্য জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবি'র গ্রেপ্তার জঙ্গিদের আদালতে দেওয়া জবানবন্দি, তদন্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানী দলের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ২০১৭ সালের ১ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। নব্য জেএমবি নামে পরিচিতি পাওয়া জঙ্গিগোষ্ঠী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকায় বিদেশিদের ওপর বড় ধরনের হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আইএস মতাদর্শ অনুসরণকারী এই গোষ্ঠীর কথিত শুরা কমিটি ঢাকা থেকে প্রায় ২৩৫ কিলোমিটার দূরে গাইবান্ধার সাঘাটায় বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নেয়। হামলার পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের আটজন পরবর্তী এক বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছেন।

আক্রমণের পরিকল্পনা : ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে একের পর এক বিদেশি নাগরিক, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, হিন্দু পুরোহিত ও শিয়া অনুসারীকে হত্যাসহ শিয়া ও আহমদিয়া মসজিদে হামলার মধ্য দিয়ে আলোচনায় আসে নব্য জেএমবি। এরই ধারাবাহিকতায় এই জঙ্গিরা রাজধানীতে বড় ধরনের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া বাজারে কলেজ মোড়-সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে তারা শুরা কমিটির বৈঠক করেন।

বৈঠকে নব্য জেএমবির প্রধান সংগঠক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক তামিম আহমেদ চৌধুরী ঢাকার কূটনৈতিক এলাকায় বড় ধরনের হামলার প্রস্তাব করেন। তিনি জানান, বিদেশিদের ওপর আক্রমণ করতে হবে। বিভিন্ন দেশে জিহাদিরা যেভাবে হামলা করে, সে ধরনের আক্রমণ করতে হবে। অন্যরা এমন হামলার সামর্থ্য ও প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চান। পরে হামলার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে শুরা কমিটি।

শুরা বৈঠকে তামিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শুরা সদস্য সারোয়ার জাহান ওরফে মানিক, মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম ওরফে মারজান, জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী, শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ ওরফে রিপন, আবু রায়হান ওরফে তারেক।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, হামলার মূল সমন্বয়ক হবেন তামিম চৌধুরী। সহ-সমন্বয়ক নুরুল ইসলাম ওরফে মারজান। মারজান ছিলেন তামিমের ডান হাত। আনুষঙ্গিক সরবরাহের (লজিস্টিক সাপোর্ট) দায়িত্বে ছিলেন সফটওয়্যার প্রকৌশলী বাশারুজ্জামান ওরফে চকলেট।

আক্রমণকারী নির্বাচন : শুরা কমিটি হামলার প্রস্তাব অনুমোদন করার পর ঘটনা ঘটানোর জন্য পাঁচজন ইসাবা (যোদ্ধা বা আক্রমণকারী) বাছাই করার জন্য নব্য

জেএমবির তখনকার সামরিক কমান্ডার শরিফুল ইসলাম ওরফে খালেদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, ঢাকার ছেলে লাগবে, যারা গুলশান এলাকার পরিবেশ ও পথঘাটের সঙ্গে পরিচিত। তখন নব্য জেএমবির ঢাকার সামরিক কমান্ডার ছিলেন আবু রায়হান ওরফে তারেক (পরে কল্যাণপুরের আস্তানায় পুলিশের অভিযানে নিহত)। আর উত্তরবঙ্গের কমান্ডার ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী (এখন কারাগারে)। এই দুজনকে বাছাই করা এমন কয়েকজন ইসাবা দিতে বলেন খালেদ, যারা আত্মঘাতী হবেন।

তারেক তিনজনের নাম দেন। তারা হলেন রোহান ইমতিয়াজ, নিবরাস ইসলাম ও সামেহ মোবাশ্বের। তিনজনেরই বাসা ঢাকায়। ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর রাজীব গান্ধী দুজনের নাম দেন। তারা হলেন শফিকুল ইসলাম ওরফে উজ্জ্বল ওরফে বিকাশ ও খাইরুল ইসলাম পায়েল ওরফে বাঁধন। এই দুজনের বাড়ি বগুড়ায়। একজন কলেজে, অপরজন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। দুজনই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এ ছাড়া রাজীব গান্ধী আরও একজনকে সরবরাহ করেছিলেন। তার নাম শরিফুল ইসলাম ওরফে ডন, বাড়ি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে। শরিফুল পরে শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে হামলা করতে গিয়ে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন এবং পরে র‍্যাবের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই ছয়জনসহ বেশ কয়েকজন তরুণ ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে কথিত হিজরতের নামে বাড়ি ছাড়েন। তারা বাড়ি ছেড়েছিলেন সিরিয়ায় যাওয়ার লক্ষ্যে। তাদের মধ্যে নিবরাস, রোহান ও সামেহ মোবাশ্বের এবং কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় হামলা করতে গিয়ে নিহত আবিরসহ কয়েকজন বাড়ি ছেড়ে ঝিনাইদহে জঙ্গিদের ভাড়া করা বাড়িতে ওঠেন ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে। তাদের সেখানে নিয়ে যান মারজানের ভগ্নিপতি হাদিসুর রহমান ওরফে সাগর। নব্য জেএমবির নেতা সাগর ওই বাড়িটি ভাড়া করেন। আর গুলশান হামলায় সরাসরি জড়িত অপর দুই জঙ্গিসহ ঘরছাড়া অনেকে বগুড়া, গাইবান্ধা, পাবনায় বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানায় ছিলেন।

প্রশিক্ষণ : বাড়ি ছাড়ার পর এসব তরুণকে বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানায় রেখে জঙ্গিবাদের বিষয়ে তাত্ত্বিক দীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়। গুলশান হামলায় জড়িত পাঁচজনকে দিয়েও ওই সময় ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু পুরোহিত, ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান, শিয়াসহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করানো হয়। এভাবে তাদের মানুষ খুনে অভ্যস্ত করা হয়। পরে তাদের বোঝানো হয়, জিহাদ করতে সিরিয়ায় যাওয়ার দরকার নেই। দেশেও অনেক কাজ আছে।

২০১৬ সালের মে মাসের শুরুতে গুলশান হামলার জন্য নির্বাচিত পাঁচজনকে মারজানের কাছে পাঠান কথিত সামরিক কমান্ডার খালিদ। মারজান তাদের নিয়ে যান গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ফুলছড়ি চরে। সেখানে ক্যাম্প করে ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ছিলেন প্রধান প্রশিক্ষক। তিনি একে-২২ রাইফেল ও পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ দেন। তারেক শেখান বোমার ব্যবহার।

রাজীব গান্ধী জবানবন্দিতে বলেছেন, ওই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তিনি নিজে, তামিম চৌধুরী, সরোয়ার জাহান ওরফে মানিক, মারজান, রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান, খালেদ ও রিপন বিভিন্ন সময়ে যান। তারা সাংগঠনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

তাদের মধ্যে তামিম, মেজর জাহিদ, তারেক ও সারোয়ার পরে র‍্যাব-পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে নিহত হন। রিগ্যান কল্যাণপুরের আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার হন। পরে রাজীব গান্ধীও গ্রেপ্তার হন। বাশারুজ্জামান, খালিদ ও রিপন এখনো ধরা পড়েননি।

অস্ত্র-বোমা সংগ্রহ : হামলার জন্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করতে নব্য জেএমবির জঙ্গি রাশেদ ওরফে রেস (তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পুলিশ এখনো পায়নি) ও সাগরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাশেদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে মে মাসে চারটি পিস্তল আনেন। সেগুলো দেন ছোট মিজানকে (চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাড়ি)। তিনি আমের ঝুড়িতে করে এসব অস্ত্র ঢাকায় এনে বাশারুজ্জামানকে দেন। বাশারুজ্জামান পৌঁছে দেন মারজানের কাছে।

একইভাবে সাগর ও ছোট মিজান পাঁচটি একে-২২ রাইফেল একই সীমান্ত দিয়ে আনেন। রাইফেলগুলো আনা হয় আরও আগে। রাইফেলগুলো প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ভারত থেকে এসব অস্ত্র সংগ্রহে সহায়তা করেন বড় মিজান। তিনি এখন কারাগারে।

হামলায় ব্যবহৃত বোমা আনেন সাগর। মে মাসে যশোরের চৌগাছা সীমান্ত দিয়ে বোমাগুলো তৈরি অবস্থায় আনা হয়। পরে ঢাকায় মারজানের কাছে সেগুলো পৌঁছানো হয়। পুরোনো জেএমবি থেকে নব্য জেএমবিতে আসা সোহেল মাহফুজ ওরফে নসরুল্লাহও বোমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় বলেছেন। সোহেল মাহফুজকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অর্থ সংস্থান : গুলশান হামলা মামলায় গ্রেপ্তার এক জঙ্গি আদালতে তার জবানবন্দিতে বলেছেন, হামলা পরিচালনার জন্য ২০১৬ সালের ২৮ জুন তামিম বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা আনেন। বাশারুজ্জামান ওরফে চকলেট হুন্ডি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকা সংগ্রহ করে তামিমের হাতে দেন।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বাসা ভাড়া : মে মাসের মাঝামাঝি বাশারুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কূটনৈতিক এলাকার কাছাকাছি বসুন্ধরা এলাকায় বাসা ভাড়া করার জন্য। তিনি নব্য জেএমবির আরেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা তানভীর কাদেরিকে নিয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ৬ নম্বর রোডের ই-ব্লকে পাঁচ কক্ষের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেন। ওই বাসার ফ্রিজ ও আসবাবও কেনা হয়। ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসা তানভীর পরে পুলিশের আজিমপুর অভিযানে নিহত হন।

একই সময় ১ জুন শেওড়াপাড়ায়ও একটি বাসা ভাড়া করা হয়। এটিকে জঙ্গিরা তাদের ভাষায় 'কন্ট্রোল রুম' বানান। হামলার শুরুর আগে তামিম ও মারজান সেখানে গিয়ে ওঠেন। এ ছাড়া পল্লবীর রূপনগরে ও নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় আরও দু'টি বাসা ভাড়া করা হয়।

ঢাকার আস্তানায় পাঁচ হামলাকারী : ২০১৬ সালের জুনের ১ তারিখে তানভীর সপরিবারে বসুন্ধরার বাসায় ওঠেন। ৭ জুন ওই বাসায় ওঠেন বাশারুজ্জামান। পরদিন ৮ জুন পাঁচ আক্রমণকারীকে নিয়ে সেখানে ওঠেন মারজান ও তার স্ত্রী। ১১ জুন আসেন তামিম চৌধুরী। তখনো হলি আর্টিজানকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়নি। কয়েকদিন পর মারজান পাঁচটি ব্যাগ (ব্যাকপ্যাক) নিয়ে আসেন। তাতে পিস্তল, একে-২২ রাইফেল,

চাপাতি ও বোমা ছিল। ১ জুলাই পর্যন্ত ওই বাসায় তারা সবাই অবস্থান করেছেন। বড় একটি কক্ষে পাঁচজনকে নিয়ে তামিম সারা দিন জিকির করতেন। তারা ওই কক্ষ থেকে কম বের হতেন। নামাজ পড়তেন ও খাবার খেতেন এই কক্ষে। বাকি কক্ষগুলোতে তানভীর, মারজান, বাশারুজ্জামান, রাজীব গান্ধী ও তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা থাকতেন।

যেভাবে হলি আর্টিজান লক্ষ্যবস্তু : জঙ্গিদের লক্ষ্য ছিল গুলশান-বনানী এলাকার কোথাও হামলাটা চালানো। সিদ্ধান্ত হয়, হামলার জন্য এমন স্থান বেছে নিতে হবে, যেখানে একসঙ্গে বেশিসংখ্যক বিদেশি নাগরিক সমবেত হন ও সিসি ক্যামেরা নেই। সে অনুযায়ী, ২০১৬ সালের জুনের মাঝামাঝি থেকে লক্ষ্যবস্তু চূড়ান্ত করতে গুলশান এলাকার বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ রেকি (আক্রমণপূর্ব পর্যবেক্ষণ) শুরু করে জঙ্গিরা।

একপর্যায়ে জঙ্গিরা হলি আর্টিজানকে বাছাই করেন। তারা নিশ্চিত হন, এখানে অনেক বিদেশি খেতে আসেন। শুক্রবারে ভিড় আরও বাড়ে। এর নিরাপত্তাব্যবস্থা ঢিলেঢালা। সেখানে সিসি ক্যামেরা আছে, তাতে কে আসা-যাওয়া করছে তা দেখা যায় কিন্তু রেকর্ড হয় না। হলি আর্টিজানের পেছনে লেক। হামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কেবল সামনের দিক থেকে মোকাবিলা করতে হবে। এসব বিবেচনা করে সবদিক থেকেই উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে জঙ্গিরা হলি আর্টিজান বেকারিকে বেছে নেয়। ঘটনার তিন-চার দিন আগে হামলাকারী দলটিকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে হলি আর্টিজানই হচ্ছে তাদের টার্গেট।

হামলার জন্য যাত্রা : রাজীব গান্ধীর জবানবন্দির বিবরণ অনুযায়ী, ৩০ জুন সকালে বসুন্ধরার বাসায় আসেন সারোয়ার জাহান। সবাইকে নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। তিনি জানান, পরদিন ১ জুলাই হলি আর্টিজানে হামলা হবে। বিকালে সারোয়ার জাহানের ইমামতিতে সবাই আসরের নামাজ পড়েন। তারপর সারোয়ার জাহান হামলাকারী পাঁচজনের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। সারোয়ার বলেন, 'তোমরা হলি আর্টিজানে হামলার সময় কখনো হতাশ হবে না। একজনের গুলি শেষ হলে আরেকজন ব্যাকআপ দেবে। মনে রাখবে, আমাদের হারানোর কিছু নেই। অপারেশনের সময় তাড়াহুড়োর দরকার নেই। খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজগুলো করবে। আর মুশরেকদের ওপর কোনো দয়া দেখাবে না। এমনকি সে যদি সাংবাদিকও হয়। সর্বদা জিকিরের মধ্যে থাকবে। যদি কেউ বন্দী হয়ে যায়, তাহলে নিজেকে নিজে শেষ করে দেবে।' এরপর সারোয়ার চলে যান। তামিম হামলাকারী পাঁচজনের জন্য পাঁচটি টি-শার্ট ও পাঁচটি জিনসের প্যান্ট কিনতে পাঠান বাশারুজ্জামানকে।

পরদিন ১ জুলাই সকাল ১০টার সময় বাশারুজ্জামান বসুন্ধরার বাসায় এসে হামলাকারীদের প্রত্যেকের ব্যাগে একটি করে একে-২২, একটি পিস্তল, একটি চাপাতিসহ পর্যাপ্ত পরিমাণে গুলি ঢুকিয়ে দেন। চারটি গ্রেনেড (হাতে তৈরি বোমা) নিবরাসদের দুজনের ব্যাগে দুটি করে ঢুকিয়ে দেন। এরপর বসুন্ধরার বাসায় সবাই জোহরের নামাজ পড়েন। বেলা তিনটার দিকে তামিম সিদ্ধান্ত জানান, রাজীব গান্ধী স্ত্রী-সন্তানসহ রূপনগরের নতুন বাসায় চলে যাবেন। তারপর আসরের নামাজের পর রোহান, নিবরাস ও মোবাশ্বের অস্ত্র-গুলির ব্যাগসহ বের হয়ে যাবেন। তার এক ঘণ্টা পর অপর দুজন শফিকুল ও খাইরুল বের হবেন।

নির্দেশ অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণকারী পাঁচজন কিছু পথ রিকশায় এবং কিছু পথ হেঁটে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এর পরপর বাশারুজ্জামান সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে আসেন। এতে চেপে তামিম ও মারজান একসঙ্গে বের হন। তারা শেওড়াপাড়ার বাসায় ওঠেন। যাওয়ার সময় বাকিদের ইফতার সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে যেতে বলে যান। এরপর তানভীর কাদেরি ও বাশারুজ্জামান সপরিবারে ওঠেন পল্লবীর রূপনগরের বাসায়। যেখানে আগে থেকে ছিলেন মেজর জাহিদ ও তার পরিবার।

ইফতারের পর জঙ্গিরা হলি আর্টিজানে আক্রমণ করেন। তারা ভেতরে থাকা সবাইকে জিম্মি করেন। এরপর দেশি-বিদেশি ২০ জনকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করেন। ওই সময় অভিযানে গিয়ে জঙ্গিদের বোমায় নিহত হন দুই পুলিশ কর্মকর্তা।

তামিম ও মারজান শেওড়াপাড়ার বাসায় উঠে ইন্টারনেটে যোগাযোগের অ্যাপ থ্রিমায় হামলার খবরের অপেক্ষায় থাকেন। জঙ্গিরা হত্যাযজ্ঞ শেষ করে জিম্মিদের ফোন থেকে তামিমকে অ্যাপে মেসেজ পাঠায়। হামলাকারীরা সঙ্গে কোনো ফোন নেয়নি। হামলার পরদিন তামিম শেওড়াপাড়ার বাসা থেকে নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় ভাড়া করা বাসায় চলে যান। সঙ্গে যান নব্য জেএমবির মিডিয়াপ্রধান তাওসিফ। মারজান চলে যান রূপনগরের বাসায়।

এই হামলা ও জিম্মি সংকট চলাকালে এর দায় স্বীকার করে সিরিয়া-ইরাকভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের একটা বড় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার আগের বিভিন্ন ঘটনার মতো এই ঘটনায়ও আইএসের দাবি নাকচ করে দেয়।

বাংলাদেশে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবি। তাদের নতুন নতুন পরিকল্পনায় রয়েছে বিধ্বংসী কার্যক্রম। টার্গেটে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে ঘিরে তাই তাদের ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা। আর বান্দরবানে চলে সদস্যদের প্রশিক্ষণ। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একাধিক মিটিংও করেছেন সংগঠনটির শীর্ষ নেতারা। সংগঠনটির প্রধান প্রশিক্ষক ফোরকানসহ তিন সদস্য গ্রেপ্তার হলে বেরিয়ে আসে এসব তথ্য। জানা যায়, সংগঠনের ফান্ড সংগ্রহে মানুষকে ইলেকট্রিক শক থেরাপি দিয়ে অজ্ঞান করে ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা ছিল নব্য জেএমবির সদস্যদের।

ফোরকানের পরিচয় : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জাহিদ হাসান রাজু ওরফে ইসমাঈল হাসান ওরফে ফোরকান। তিনি রসায়ন বিভাগ থেকে অনার্স শেষ করার পর ২০১৬ সালে অনলাইনে 'হোয়াইট হাউসের মুফতি' নামক আইডির মাধ্যমে তৎকালীন আমির মুসার হাত ধরে নব্য জেএমবিতে যোগদান করেন। আমির মুসার সঙ্গে কাজের সুবাদে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের নজরে আসেন তিনি। রসায়নে পারদর্শী হওয়ার কারণে তার মেধা এবং সাহসের জন্য তাকে এই সংগঠনের সামরিক শাখার সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি অল্পদিনে গ্রেনেড ও বোমা বানানোর অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠেন। নিত্য-নতুন কৌশলে আইইডি, বোমা ও গ্রেনেড তৈরিতে পারদর্শী জাহিদ বিশ্বস্ত সহযোগীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতেন।

ফোরকান থেকে বোমা মিজান: ২০১৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রিজনভ্যানে হামলা চালিয়ে এক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে জেএমবির তিন শীর্ষ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ায় জড়িত ছিলেন জাহিদুল ইসলাম মিজান ওরফে বোমা মিজান।

২০২১ সালের ১২ আগস্ট সারা বাংলায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'একুশ শতকের শুরুর দিকে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার কুখ্যাত জঙ্গি নসরুল্লাহর কাছ থেকে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন মিজান। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে লস্কর-ই-তইয়েবার ক্যাম্পে তিনি প্রশিক্ষণ নেন এবং ভারতে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের বোমা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। বোমা তৈরির দক্ষতার কারণেই সংগঠনে তার নাম হয় 'বোমা মিজান' বা 'বোমারু মিজান'।

'জেএমবি'র সেই বোমা মিজান ভারতে গ্রেপ্তারের পর তার অনুপস্থিতিতে নব্য জেএমবিতে বোমা মিজান খ্যাতি পান সামরিক শাখার প্রধান ফোরকান। রসায়নের ছাত্র হওয়ার সুবাদে নতুন কৌশলে আইইডি, বোমা ও গ্রেনেড তৈরিতেও দ্রুত পারদর্শী হওয়ায় জাহিদ নব্য জেএমবিতে এই পরিচিতি অর্জন করেন।'[৮]

৩. মানহাজি গ্রুপ বাংলাদেশ

কয়েকজন আফগান ফেরত জঙ্গি নেতার তত্ত্বাবধানে মানহাজি গ্রুপ অব বাংলাদেশ নামের এই জঙ্গি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২০২০ সালের শুরুতেই। মানহাজি মানে 'ঠিক রাস্তায় অবস্থানকারী'। মানহাজিরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় রাজনীতির বাইরে গিয়ে সরাসরি জিহাদ করে খেলাফত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

মানহাজিরা মনে করে সরাসরি জিহাদ চালিয়ে ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এ লক্ষ্য নিয়ে তারা সাংগঠনিক তৎপরতা চালাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান নেতারা দৃঢ়চেতা জঙ্গিদের 'মানহাজ' বলে চিহ্নিত করতেন।

ওসামা বিন লাদেনের বক্তৃতা সংকলন নিয়ে 'তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ' নামে বইও প্রকাশিত হয়েছে। মূলত আল-কায়েদার আদর্শধারী জঙ্গিরা 'মানহাজি' নামে চিহ্নিত, যারা গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় রাজনীতি বাদ দিয়ে সরাসরি জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত কায়েম করতে চায়। একই সঙ্গে তারা 'গাজওয়ায়ে হিন্দ'-এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তারা নিজেদের মনে করে 'ইলহাক বিল কাফেলা' অর্থাৎ যারা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম কায়েম করে সিরিয়ায় গিয়ে ইমাম মাহদির সঙ্গে মিলিত হবে। চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে সক্রিয় এ জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিচ্ছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর, হুজি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, নব্য জেএমবির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা। এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শীর্ষ নেতাদের 'শায়খ' নামে ডাকেন। তাদের শক্তিশালী রিক্রুট টিম ছাড়াও রয়েছে অনলাইন অ্যাকভিটিস্ট টিম যারা সব সময় জিহাদি প্রচারণা চালায় অনলাইনে।

মানহাজিরা ইসলামের হারানো খেলাফত ও সম্মান ফিরিয়ে আনাই টার্গেট নির্ধারণ করেছে। তারা মনে করে যারা জিহাদ ও খেলাফতের বিরোধিতা করে তারা তাগুত।

যেসব মুসলমান তাদের সহযোগী তারাও তাগুত। গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে যারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা মোনাফেক। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোকে তারা মোনাফেক মনে করে। তাগুত ও মোনাফেকদের সরাসরি হত্যা করা জিহাদ মনে করে উগ্রপন্থি এই সংগঠনের নেতারা। ভারত ও বাংলাদেশের যেসব মাদ্রাসা জিহাদের ডাক দিচ্ছে না তাদের তাগুতের দালাল মনে করে। তাই মানহাজিরা সেজন্য তাদের আদর্শের পতাকা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে ফরজ মনে করে।

হেফাজতের তাণ্ডবে নেতৃত্ব দেয় 'মানহাজি' গ্রুপ' : হেফাজতে ইসলামের একটি বড় গ্রুপের নাম 'মানহাজি'। সংগঠনের ভেতর এই গ্রুপের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এরাই হেফাজতকে বিভিন্ন আগ্রাসী কর্মসূচি দিতে বাধ্য করত। গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন শায়খ মুফতি হারুন ইজহার। এই গ্রুপটির উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক বিশৃঙ্খলা তৈরি করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা। জানা গেছে, সারা দেশে দেড় হাজারের মতো মানহাজি রয়েছে। এদের তালিকা তৈরি করে অভিযানে নেমেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, ধর্মীয় রাজনীতি ও জঙ্গিবাদের পরিভাষায় যারা সরাসরি জিহাদের ডাক দিয়ে কথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের 'মানহাজি' বলে। আরেকটি গ্রুপ উপমহাদেশে একটি যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ ও যোদ্ধাদের শামে (সিরিয়া) নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মুসল্লিদের দলে টানত। এদের বলা হয় 'গাজওয়াতুল হিন্দ'। অরাজনৈতিক দাবি করা হেফাজতে ইসলামের উগ্রপন্থিদের নেতৃত্ব দিতেন সংগঠনটির সদ্য বিলুপ্ত কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক হারুন ইজহার। সংগঠনে তাকে সবাই 'মানহাজি'দের দলনেতা হিসেবে চিনতেন। বক্তব্য-বিবৃতিতে জিহাদের ডাক দেওয়া হারুন ইজহারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জামিনে বেরিয়ে আগের মতোই উগ্রপন্থা মতবাদ ছড়িয়ে কথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন তিনি। হেফাজতকে তিনিই উগ্রবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

২০২১ সালের ১৪ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মাহমুদুল হাসান গুনবী 'মানহাজি' নামক একটি উগ্রবাদী গ্রুপের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবেও কাজ করছেন। তিনিসহ তিনজন এই গ্রুপের অন্যতম দায়িত্বশীল। বাকি দু'জন হলেন মাওলানা হারুন ইজহার ও আলী হাসান ওসামা। এই দু'জন গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। এই মানহাজি গ্রুপও হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গোপনে তৎপর রয়েছে। মানহাজি গ্রুপও আল-কায়েদার মতাদর্শ অনুসরণ করে এবং হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সংগঠিত হয়েছে।

'এর আগে ৩ মে হাটহাজারীর অন্য দুটি নাশকতা মামলাসহ মোট তিনটি মামলায় হারুন ইজহারকে মোট নয় দিনের রিমান্ডে নিয়েছিল পুলিশ। আর ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লালখান বাজারের জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে হারুনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। এই মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক তিনি। তার বাবাও এই মাদ্রাসার পরিচালক। তার বাবা ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও হেফাজতের একসময়ের নায়েবে আমির।'[৯]

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৯ সালে হারুন ইজহারের পরিচালনাধীন লালখান বাজারে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসা ঘিরে আন্তঃদেশীয় জঙ্গিরা একটি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ওই বছরের শেষ দিকে তারা ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ও ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার ছক কষেছিল। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ছিল ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়্যবা। হারুন ইজহার পুরো এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসময় ওই মাদ্রাসায় অভিযান চালিয়ে হারুন ইজহার এবং লস্কর-ই-তৈয়্যবার কয়েকজন সদস্য ও ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০১৩ সালেও একবার হারুন ইজহারকে গ্রেপ্তার করেছিলেন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ওই বছরের ১০ জুলাই হারুন ইজহারের জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসায় গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিন জন নিহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারটি তাজা গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণ গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

দাওয়াতুল ইসলাম মানহাজি প্রকল্পের একটি অংশ: ২০১৭ সালের ১ জুন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম ও হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতা মাহমুদ হাসান গুনোবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুনোবি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট চরমপন্থী দল দাওয়াতুল ইসলামের অন্যতম শীর্ষ নেতা, যারা একটি দাওয়া সংগঠন গ্রুপের আড়ালে কাজ পরিচালনা করে। গুনোবি একসময় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামী (হুজি-বি) এর সাথে জড়িত ছিলেন। হেফাজতে ইসলামের বেশ কয়েকজন নেতার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

দাওয়াত-উল ইসলামের অন্য দুই নেতা হারুন ইজহার এবং আলী হাসান ওসামাকে বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে। এর আগে, দাওয়াত-উল-ইসলামের আমির মাওলানা নাজিমুদ্দিন জঙ্গিবাদের বেশ কয়েকটি অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। হারুন ইজহার হেফাজতে ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুফতি ইজহারুল ইসলামের ছেলে। মুফতি ইজহার আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন, যেখানে তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে কাবুলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করেছেন।

মাহমুদুল হাসান গুণোবি নিরীহ ছেলে-মেয়েদের বিভ্রান্ত করে ইসলামকে অনুসরণ করতে বলত এবং নিজেকে জঙ্গি এবং আত্মঘাতী জঙ্গি সদস্য হিসেবে প্রকাশ করা আবশ্যক বলে অনুপ্রাণিত করত। দাওয়াতুল ইসলাম বান্দরবান জেলার লামা ও খাগড়াছড়িতে দুটি জঙ্গি আস্তানা গড়ে তুলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে এ সংগঠনের ৫০ জনেরও বেশি জঙ্গি নেতা সক্রিয়।

মানহাজী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল জিহাদিদের বংশবৃদ্ধি করা, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের জিহাদি কর্মকাণ্ডের দিকে নিয়োজিত করা।

৪. আনসার আল ইসলাম

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের শাখা (একিউআইএস) ঘোষণার পরই সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত হয় 'আনসার আল ইসলাম'। ২০১৫ সালের ১৫ মে মূলত জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' নিষিদ্ধ ঘোষণার পর এই সংগঠনের নেতাকর্মীরা গড়ে তোলেন আনসার আল ইসলাম। এই সংগঠনের দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তি, ব্লগার, প্রকাশকসহ অধিকাংশ টার্গেট কিলিংয়ে জড়িত।

জঙ্গি জিয়ার পুরো নাম সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক। তার বাবার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ জিল্লুল হক। গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজারের মোস্তফাপুরে। পড়াশুনা করেছেন সিলেট ক্যাডেট কলেজে। কলেজ জীবন শেষে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

২০১২ সালের ১৯ জানুয়ারি সেনা সদর দপ্তর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ব্যর্থ এক অভ্যুত্থানচেষ্টায় জড়িত থাকার দায়ে দুই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সৈয়দ জিয়াউল হক পালিয়ে গেছেন।

ওই সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, 'সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসের অন্য পরিকল্পনাকারী মেজর সৈয়দ মো. জিয়াউল হক ২০১১ সালের ২২ ডিসেম্বর অন্য এক কর্মরত কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে তাকেও রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড তথা সেনাবাহিনীকে অপব্যবহার করার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে প্ররোচনা দেন। ওই কর্মকর্তা বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানালে সদ্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মেজর জিয়ার ছুটি ও বদলি আদেশ বাতিল করে তাকে দ্রুত ঢাকার লগ এরিয়া সদর দপ্তরে যোগ দিতে বলা হয়। বিষয়টি টেলিফোনে ২০১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তাকে জানানো হলেও তিনি পলাতক থাকেন।'

স্কুলে থাকতেই ওমরাহ করেছেন সাতবার : মৌলভীবাজারের মোস্তফাপুরের ছেলে জিয়া ছিলেন সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। তখন থেকেই ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক 'গোঁড়া'। ওই কলেজে ভর্তির আগেই ওমরাহ করেছেন অন্তত সাতবার। কর্মসূত্রে বাবা-মাসহ তার পরিবারের সদস্যরা বসবাস করতেন সৌদি আরবে। ক্যাডেট কলেজে ছুটি থাকলে জিয়া চলে যেতেন সেখানে। মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে এসএসসি পাস করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর জিয়া যোগ দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীর বিএমএতে লং কোর্সের প্রশিক্ষণ শেষে তিনি 'সোর্ড অব অনার' অর্জন করেন। তবে সেখানেও ধর্মীয় বিষয়ে তার 'গোঁড়ামি' নজর কাড়ে কর্তৃপক্ষের।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর বিয়ে করেন জিয়া। তবে ২০০৯ সালে তার স্ত্রী লিপি মারা যান। এ সময় জিয়া হয়ে ওঠেন আরও কট্টর। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর ৪০ দিন পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন পটুয়াখালীর সবুজবাগ এলাকার এক নারীকে। ওই ঘরে দুই সন্তান রয়েছে তার। জিয়ার শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুর জিয়ার ছেলের অভিভাবকত্ব নেন আদালতের মাধ্যমে।

ছয় খুনে সরাসরি জড়িত জিয়া : ২০১৩ সালের পর থেকে ব্লগার, প্রকাশক, মুক্তমনা ও ভিন্নমতাবলম্বী হত্যার ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ নিশ্চিত হয়, জিয়ার পরিকল্পনাতেই মূলত ঘটছিল একের পর এক হত্যাকাণ্ড। ব্লগার হত্যার যতো মামলা আছে, প্রায় সবগুলোতেই চাকরিচ্যুত মেজর জিয়ার নাম এসেছে। ২০১৩ সাল থেকে একে একে জিয়ার হত্যার শিকার হন ব্লগার রাজীব হায়দার, ব্লগার ও লেখক অভিজিৎ রায়, ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান, ব্লগার অনন্ত দাস, ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ব্লগার নাজিম উদ্দিন, সমকামীদের অধিকারকর্মী জুলহাজ মান্নান ও তার বন্ধু মাহবুব তনয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই ৯ হত্যাকাণ্ডের আটটিতেই জড়িত আনসার আল ইসলামের সদস্যরা। এর মধ্যে ছয়টি হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন সৈয়দ জিয়াউল হক।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্লগার ও লেখক অভিজিৎ রায় হত্যামামলার রায়ে বরখাস্ত হওয়া মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক, জঙ্গিনেতা আকরাম হোসেন ওরফে আবির ওরফে আদনানসহ পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্য সবাই ধরা পড়লেও এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন জিয়াউল হক ও আকরাম হোসেন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল ঢাকায় সমকামী অধিকারকর্মী জুলহাজ মান্নান ও তার বন্ধু মাহবুব তনয় হত্যা মামলার ২০২১-এর আগস্টে দেওয়া রায়ে সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত মেজর জিয়াউল হক জিয়া ও আকরাম হোসেন ওরফে হাসিব ওরফে আবির ওরফে আদনান ওরফে আবদুল্লাহসহ ছয় আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

২০১৬ সালের আগস্টে রাজধানীর গুলশান, কল্যাণপুর ও শোলাকিয়া হামলার 'মাস্টারমাইন্ড' তামিম চৌধুরী ও ব্লগার হত্যায় সন্দেহভাজন চাকরিচ্যুত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল হককে ধরিয়ে দিলে ২০ লাখ টাকা করে ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন পুলিশের তৎকালীন আইজিপি একেএম শহীদুল হক। তথ্যদাতার নাম-পরিচয় গোপন রাখা হবে।

২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশি ব্লগার ও লেখক হত্যায় দণ্ডিত পলাতক দুই ঘাতক সৈয়দ জিয়াউল হক ও আকরাম হোসেনসহ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সম্পর্কে তথ্য চেয়ে ৫০ লাখ ডলার (৪২ কোটি ৫০ লাখ টাকা) পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি সার্ভিসের রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস প্রোগ্রাম (আরএফজে) এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। +১২০২৭০২৭৮৪৩ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও সিগনালের মাধ্যমে হত্যাকারীদের সম্পর্কে তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, হামলাকারীরা বাংলাদেশেই অবস্থান করছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২ আসামির কথা উল্লেখ করে একটি পোস্টারসহ টুইট করেছে রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস। ওই পোস্টারে বলা হয়েছে, '২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় একটি বইমেলা থেকে ফেরার পথে আল-কায়েদাসংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীরা

অভিজিৎ রায়কে হত্যা এবং তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদকে আহত করে। বাংলাদেশের আদালতে ছয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করে হামলায় তাদের ভূমিকার জন্য সাজা দেওয়া হয়েছে। ওই অভিযুক্তদের দু'জন সৈয়দ জিয়াউল হক (ওরফে মেজর জিয়া) এবং আকরাম হোসেনের অনুপস্থিতিতে বিচার হয়েছিল এবং এখনো তারা পলাতক। যদি আপনার কাছে হক, হোসেন বা ওই হামলায় জড়িত অন্য কারও বিষয়ে তথ্য থাকে, তাহলে নিচের নম্বরে সিগন্যাল, টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে আমাদের কাছে তা পাঠান। আপনিও পুরস্কার পেতে পারেন।'

সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়ার পলাতক জীবন শুরু ২০১১ সালে। এরপর পেরিয়ে গেছে একদশকেরও বেশি সময়। পলাতক থেকেই বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ও আনসার আল ইসলামের সামরিক কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তার বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা হয়েছে।

২০১৬ সালের ৩ আগস্ট দৈনিক সমকাল পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টায় ২০১২ সালে সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক। এই অভ্যুত্থান চেষ্টায় জড়িত থাকায় দুই সেনা কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হলেও পালিয়ে যান জিয়া। এরপর তিনি যুক্ত হন জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সঙ্গে, পরে যেটির নামকরণ করা হয় আনসার আল ইসলাম।

'মেজর (বহিষ্কৃত) জিয়ার পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঘটে একের পর এক হত্যাকাণ্ড। আনসার আল ইসলামের বেশিরভাগ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হলেও এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে তিনি। এরইমধ্যে কয়েকটি মামলায় তার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়েছে।'[১০]

৫. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)

ব্লগার রাজীব হত্যার মধ্য দিয়ে ২০১৩ আলোচনায় এলেও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের যাত্রা শুরু ২০০৮ সালে। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মুফতি জসিম উদ্দীন রহমানী। ২০০৮ সালে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাবেক ক্যাম্পাসের কাছাকাছি বনানীর একটি মসজিদকে ঘিরে আল-কায়েদার মতাদর্শে বিশ্বাসী এ গোষ্ঠীর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধানত ইংরেজি মাধ্যম বা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে মতাদর্শ প্রচার, উদ্বুদ্ধকরণ, পাঠচক্র পরিচালিত হত। পরে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ব্লগ ব্যবহার করে তৎপরতা শুরু করে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, শুরুতে এ দল বা গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। তবে এর সদস্যরা ঘনিষ্ঠজনদের কাছে নিজেদের আল-কায়েদাপন্থী বলে পরিচয় দিতেন। এই গোষ্ঠীটি আধ্যাত্মিক নেতা মানেন ইয়েমেনভিত্তিক আল-কায়েদার নেতা আনওয়ার আওলাকিকে। আওলাকি ২০১১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর মার্কিন ড্রোন হামলায় ইয়েমেনে নিহত হন।

বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে জানা গেছে, ২০১১ সালের মাঝামাঝি থেকে তারা 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' নাম ধারণ করে। এরপর থেকে এ নামে তাদের মতাদর্শের নানা বইপুস্তক, আলোচনা, আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় নেতা ও দেশি-বিদেশি তাত্ত্বিকদের বক্তৃতা, লেখা ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ করে এবং এ-সংক্রান্ত নানা অডিও-ভিডিও ওয়েবসাইটে প্রচার করতে থাকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিষিদ্ধ জেএমবি ও হিযবুত তাহরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জঙ্গিরা মিলে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম গঠন করে। দলটির সার্বিক তদারকি করতেন জেএমবির কারাবন্দী আমির জামায়াতে ইসলামীর সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা কমিটির সদস্য মুফতি মাওলানা সাইদুর রহমান জাফরের জামাতা ইজাজ ওরফে কারগিল। মুফতি ইজাজ জামায়েতুল মুসলিমীন নামের একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার আমির ছিলেন। এ সংগঠনটির আন্তর্জাতিক আমির জর্দান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শেখ আবু ইসা আলী আররিফাই আল হাশেমী আল কোরাইশি। আবু ইসা ২০০২ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি প্রথম দলটির কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন। ইজাজ পাকিস্তানের একটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানে নিহত হন। এরপর থেকেই দলটির মাস্টারমাইন্ড হিসেবে কাজ করছেন সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টাকারী বহিষ্কৃত মেজর জিয়া।

দলটি আল কায়েদার অনুরূপ আদর্শ, নীতি এবং কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে। সেই লক্ষ্যে তারা ৪ থেকে ৫ জন করে একেকটি ছোট ছোট গেরিলা স্লিপার সেল গঠন করে। সেলগুলোই একেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। বর্তমান সরকার আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামের জঙ্গি সংগঠনটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আবু মুসা ও ইজাজের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আনসারুল্লাহ বাংলাটিমের সদস্য হিসেবে উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে ২০০৮ সালে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তেহজীব, রেজওয়ান শরীফ, নাফিস ও মইনউদ্দিন ইয়েমেন গমন করে। তাদের সঙ্গে আল কায়েদা নেতা আনোয়ার আল আওলাকির ঘনিষ্ট সহযোগী সামির খানের যোগাযোগ হয়। সেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় ২০০৯ সালে রেজওয়ান শরিফ ইয়েমেনে গ্রেপ্তার হন। তেহজীব ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ এয়ারলাইন্স উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টাকালে গ্রেপ্তার হন। তার ২০ বছরের কারাদণ্ড হয়। আর নাফিস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক উড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হন।

শুরুতে প্রকাশ্যে সংগঠনটির প্রধান ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে সামনে আসেন মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানী। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলায় জমি কিনে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করে সংগঠনটি। নাম দেয় মারকাজুল উলুম আল ইসলামী। এটি ছিল সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র। জসীমুদ্দীন এর পরিচালক ও মসজিদের খতিব। জসীমুদ্দীন রাহমানী ২০১৩ সালের আগস্টে বরগুনায় নিজ গ্রামে ৪০ অনুসারীসহ গ্রেপ্তার হন। তিনি বর্তমানে ব্লগার রাজীব হত্যা ও ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীনকে হত্যাচেষ্টা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আছেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (আইআইইআর) মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। মূলত বিদেশে গেলে আনসারুল্লাহ সদস্যরা প্রযুক্তি ও জঙ্গিবিষয়ক প্রশিক্ষণ নেবে। ফিরে এসে তাদের নিয়ে সুদূরপ্রসারী খিলাফত আন্দোলনে যুক্ত করা হবে।

২০০৮ সালের দিকে রাজধানীর বনানীতে কামাল আতার্তুক এভিনিউয়ে থাকা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ক্যাম্পাসে আনসারুল্লাহর যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে শায়খ রাহমানী আফগান ফেরত মুজাহিদদের নিয়ে সংগঠিত হচ্ছিলেন। তিনি ইরাকি আল কায়দা নেতা আনসার উল ইসলাম ও ইয়েমেনভিত্তিক আল কায়দা নেতা আনওয়ার আল আওলাকিকেও অনুসরণ করেন। আল কায়দা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা নামে সক্রিয় এই গোষ্ঠীর প্রধান আওলাকি ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মার্কিন ড্রোন (চালকবিহীন বিমান) হামলায় ইয়েমেনে প্রাণ হারান। শায়খ রাহমানীর ওয়েবসাইট জুমআর খুতবায় আওলাকির জীবন কাহিনী ও মতাদর্শ এবং জিহাদি চেতনার নানা দিক উল্লেখ করা হয়। রাহমানী মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার তালিকাভুক্ত জঙ্গি। তিনি একজন আধ্যাত্মিক নেতা। ২০১৩ সালের ১৭ আগস্ট শায়খ রাহমানীকে ৩০ সহযোগীসহ বরগুনা শহরের উপকণ্ঠ খাজুরতলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এবিটির তাত্ত্বিক নেতা জসিম উদ্দিন রাহমানি গ্রেপ্তার হওয়ার আগে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়েছিল জঙ্গি সংগঠনটি। তাদের কার্যক্রম জোরদার করতে রিসার্চ সেন্টার ফর ইউনিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আরসিইউডি) নামে একটি এনজিওর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তারা উগ্রপন্থি' সাংগঠনকি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এবিটির সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংগঠনিক কর্মী বাড়িয়ে কথিত জিহাদের নামে নাশকতার পরিকল্পনা করছে।

বাংলাদেশে রিসার্চ সেন্টার ফর ইউনিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আরসিইউডি) নামে একটি এনজিওর আড়ালে এবিটির উগ্রপন্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে এটিই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামে কার্যক্রম শুরু করে।

৬. হিযবুত তাহরীর

২০০৩ সালের ২৩ জানুয়ারি রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যদিয়ে দলটি আনুষ্ঠানিক কার্যকম শুরু হয়। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীরের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা। তাকে বাংলাদেশের আধুনিক জঙ্গিবাদের জনকও বলা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন নব্বইয়ের দশকে তিনি কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে লন্ডন যান। সেখানেই তিনি হিযবুত তাহরীর-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে তিনি জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। গোয়েন্দাদের নজরদারি এড়াতে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে ফেরেন। যোগ দেন পুরনো কর্মস্থলে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০২ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে তিনি বাংলাদেশে হিযবুত তাহরীরের শাখা গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন। তার সঙ্গে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর শিক্ষক অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন আহমেদ। দুই শিক্ষকের সঙ্গে যোগ দেন বেসরকারী নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক শেখ তৌফিক। পরে উত্তরার একটি এনজিও কার্যালয়ে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে হিযবুত তাহরীর।

২০০৩ সালে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম চালুর পর দলটির দলীয় কার্যক্রম চালাতে ছাত্রশিবির সহায়তা করে। ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ২৩৪ নম্বর নিউ এলিফ্যান্ট রোডের খায়রুন্নেসা ভবনের নিজস্ব ঘাঁটিতেই দলটিকে দলীয় কার্যক্রম চালানোর জন্য অফিস দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম এখনও চালু আছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, হুজি, জেএমবি, লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মোস্তফা, উলফা, কমতাপুর লিবারেশন ফ্রন্ট, আফিস রেজা কমান্ডো ফোর্সসহ দেশী-বিদেশী বহু উগ্র ও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৯ সালের ২৪ এপ্রিল হিযবুত তাহরীরকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৫৩টি দেশে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে হিযবুত তাহরীর নিষিদ্ধ। মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তানে হিযবুত তাহরীরকে মনে করা হয় তালেবান ও আল কায়েদার সংশ্লিষ্ট সংগঠন। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজস্তান, জার্মানি ও রাশিয়ায় হিযবুত তাহরীরকে আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হিযবুত তাহরীর প্রায় প্রত্যেকটি আরব দেশেই নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে জর্ডান, সিরিয়া, সৌদি আরব, মিসরের মতো দেশসমূহ। তিউনিশিয়া, তুরস্ক এমনকি এই সংগঠনটিকে লেবাবননেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানেও সংগঠনটির সব কাজকর্মকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছে।

২০০৯ সালের ২ এপ্রিল "সাপ্তাহিক"-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– 'হিযবুত তাহরীর'-এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা, 'আল মুজাহিরুনে'র সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়েদার সঙ্গে হিযবুত তাহরীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশের প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবি-এর সহকারী অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহম্মেদ জঙ্গিবাদের সঙ্গে হিযবুত তাহরীরের কোনোরূপ সম্পর্কের কথা বারবার অস্বীকার করে আসছেন। তবে বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের সঙ্গে হিযবুত তাহরীর–এর রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক– এরকমটাই মনে করেন সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞরা। জানা যায়, আল কায়েদার জঙ্গি সাপ্লাইয়ের প্রধানতম দায়িত্ব পালন করছে হিযবুত তাহরীর। তবে তাদের দর্শন তালেবানদের মত পশ্চাৎপদ নয়। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা করছে।[১১]

'হিযবুত তাহরীর' পাঠচক্র ঃ 'ইসলামী বিপ্লবে'র উদ্দেশ্যে নিয়মিত পাঠচক্রের আয়োজন করে। বাংলাদেশের হিযবুত তাহরীর প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। সাধারণত সেসব মহিলাদের হিযবুত তাহরীর দলে ভেড়াতে সক্ষম হয় তাদের মানসিক অবস্থা খুবই দুর্বল থাকে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিকভাবে নিপীড়িত মহিলাদেরকে খুব সহজে তারা দলে টেনে নেয়। মধ্যবিত্ত বা অনেক নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও 'হিযবুত তাহরীর' রাজনৈতিক কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করছে লেখাপড়া শেষে একটা চাকরির আশায়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা শহরে প্রায় ১০টিরও বেশি পাঠচক্র পরিচালনা করে 'হিযবুত তাহরীর'। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন চক্র প্রতি শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২৩৪, খায়রুন্নেসা ভবন, কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোডে অনুষ্ঠিত হয়। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৫টায়, বনানী বাজারের পাশে বনানী মসজিদে। খিলগাঁও পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় প্রতি সোমবার সাড়ে ৬টায় বি/৩৯১, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, মালিবাগে। হিযবুত তাহরীর নারীদের পাঠচক্র আলাদা করে পরিচালনা করে থাকে। নারীদের দ্বারা পাঠচক্রটি প্রতি শনিবার সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হয় এআইবিটির তৃতীয় তলা, বাড়ি নম্বর ৯/এ, রোড ১৫ (নতুন), ধানমণ্ডিতে। এছাড়া পুরনো ঢাকায় পাঠচক্রটি নয়াপাড়ায় প্রতি সোমবার সাড়ে ৬টায় এবং মিরপুরসহ অন্যান্য স্থানে অনুরূপ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা শহরে একাধিক অফিস, অর্থের উৎস অজ্ঞাত ঃ হিযবুত তাহরীর এলিফ্যান্ট রোডের অফিসটি খায়রুন্নেসা ম্যানসন (৪র্থ তলা), ২৩৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোড। সংগঠনটির মতিঝিল অফিস ফাংশন রুম-হোটেল প্যাসিফিক, ১২০/বি মতিঝিল বা/এ (মেট্রোপলিটন বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, টয়োটা বিল্ডিংয়ের পাশে)। মিরপুর অফিস প্লট নং ১০৯, স্ট্রিট-১, ব্লক-এ, সেকশন-২, মিরপুর-ঢাকা-১২১৬ (রাইনখোলা জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে)। উত্তরা অফিস– বাড়ি ৪৬, শাহজালাল এ্যাভিনিউ, সেক্টর নং ৪, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০ (আজমপুর রেলগেটের আগে)। সংগঠনটির এত অফিস ঢাকা শহরে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অর্থের জোগানদাতা কে বা কারা সে বিষয়ে সংগঠনটির কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ঘরের ছাত্র ঃ সংগঠনটি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রদের টার্গেট করে এগুচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম পছন্দ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিডিআর বিদ্রোহের পরে লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে 'হিযবুত তাহরীর'-এর ৩১ নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ। এদের মধ্যে ২৮ জনই ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থী। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ৫ জন। ইস্টওয়েস্ট, স্টামফোর্ড, ব্র্যাক, সাউথইস্ট ও ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও ছিল। এছাড়াও প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও ছিল। নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও দেশের খ্যাতনামা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিযবুত তাহরীরের' তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এমন দাবি করেছেন সংগঠনটির সমন্বয়ক মহিউদ্দীন আহমেদ।

মিশরে কারাদণ্ড ঃ ২০০৪ সালে মিশরের আদালত ২৬ জন 'হিযবুত তাহরীর' সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দেয়। ২৬ বন্দির মধ্যে ৩ জন ব্রিটিশ, ৮ জন মিশরীয় এবং ১ জন ফিলিস্তিনিকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপর ৭ সদস্যকে ৩ বছরের এবং অবশিষ্ট ৭ জনকে ১ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এসব হিযবুত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর সংগঠনটিকে মিশরে সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল।

ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার ঃ ইউরোপের সকল ছাত্র সংগঠন ইউরোপের ছাত্র ইউনিয়ন অধিভুক্ত কিন্তু সম্প্রতি ছাত্রদের এই ইউনিয়ন হিযবুত তাহরীরকে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করেছে। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের বক্তব্য, 'হিযবুত তাহরীর সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে। তারা লেখার মাধ্যমে বর্ণ বৈষম্যকে উস্কে দেয়।' আর এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছাত্রদের ইউনিয়ন থেকে হিযবুত তাহরীরকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২০১১ সালের ১০ জুলাই দৈনিক আল ইহসান পত্রিকায় প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জামায়াত জোট সরকারের নির্দেশে এদেশে হিযবুত তাহরীরের জঙ্গি কার্যক্রম শুরু-২ ঃ ১৯৫৩ সালে জেরুজালেমের বাসিন্দা তকি উদ্দিন আল নাভানী হিযবুত তাহরীর প্রতিষ্ঠা করে। হালনাগাদ বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম রয়েছে। তবে অধিকাংশ মুসলিম দেশই হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হিযবুত তাহরীর সশস্ত্র জঙ্গি সংগ্রামের পক্ষে। ১৯৭৪ সালে মিশর সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আশির দশকে লিবিয়া জঙ্গিবাদের মদদদাতা হিসেবে ও সরকারের বিপক্ষে গোপন কার্যক্রম চালানোর অভিযোগে হিযবুত তাহরীরকে শনাক্ত করে। পরে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল লিবিয়া সরকার। ১৯৯৯ সালে উজবেকিস্তানে সিরিজ বোমা হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল সংগঠনটি।

'আমেরিকায় ৯/১১তে টুইন টাওয়ার হামলার সঙ্গে তাদের যোগসাজশ ছিল। লন্ডনে ২০০৫ সালের ৭/৭-র পাতাল রেল হামলার পর হিযবুত তাহরীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হামলার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিল। এ হামলার জন্য তাদের দায়ী করা হলে শক্ত হাতে মুসলিম বিশ্ব ও হিযবুত তাহরীর মোকাবেলা করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। ২০০৩ সালে রাশিয়ার উচ্চ আদালত হিযবুত তাহরীরসহ সহযোগী ১৪টি জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরে বিপুল পরিমাণ গ্রেনেড ও বিস্ফোরকসহ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত কিরগিজস্তানের বাসিন্দা আলী সার মুজায়ের ও তাজিকিস্তানের বাসিন্দা আকরাম আলোলতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে সিরিয়ায় হামলার সঙ্গে জড়িত হিযবুত তাহরীরের ১২ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল সিরিয়া সরকার। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে হামলা, আজারবাইজানের বাকু শহরে হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিল হিযবুত তাহরীর। ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় এক সভায় হিযবুত তাহরীরের প্রায় এক লাখ সদস্যের সমাবেশ ঘটেছিল। ২০০৭ সালে পাকিস্তান সরকার সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অনেক দেরিতে হলেও বর্তমান মহাজোট সরকার এদেশে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখনই তাদের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব না

হলে ভবিষ্যতে তারা বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে বলে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তথ্য রয়েছে।'[১২]

৭. জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)

২০০৫ সালের ১৭ আগষ্ট ইসলামের ছদ্মবেশে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি নামক সংগঠনের হঠাৎ একসাথে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় (১টি জেলা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে) ৪৩৪টি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

জামা'আতুল মুজাহিদীন অব বাংলাদেশ সংক্ষেপে জেএমবির উত্থান ১৯৯৮ সালে। তাদের দুই শীর্ষ পর্যায়ের নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইসহ ৭ জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ২০০৭ সালের ২৯ মার্চ। একসময় বাংলা ভাইয়ের দলের নাম ছিল জাগ্রত মুসলিম জনতা। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে জেএমবি ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল সময়ে ৭৩ ব্যক্তিকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন দুই বিচারক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এই দল ওই সময় ৬৪ জেলার ৬৩টিতে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ করে। ২০০৫ সালে এই দলকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা আমির শায়খ আবদুর রহমান ১৯৫৯ সালের ৭ জানুয়ারি জামালপুর সদর উপজেলার চরসী ইউনিয়নের অন্তর্গত খলিফাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শায়খ আবদুর রহমান। তার পিতা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ফজল একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিকভাবে তারা আহলে হাদীসের অনুসারী। শায়খ আবদুর রহমান বড়, মেজো ভাই ওবাইদুর রহমান, সেজো ভাই ওলিউর রহমান (সৌদী প্রবাসী), ছোটভাই আতাউর রহমান ওরফে সানী বোন নাজমা ও শিফা-এই চার ভাই দুই বোন ও পিতা-মাতা নিয়ে শায়খ আবদুর রহমানের সংসার। তিনি তার ছোট ভাই আতাউর রহমানকে জেএমবিতে এনে সংগঠনের শূরা সদস্য ও সামরিক শাখার প্রধানের দায়িত্ব দেন। আতাউর রহমানের সাংগঠনিক নাম দেয়া হয় সানী। তবে ১৭ আগস্ট বোমা হামলার পর নিরাপত্তার কারণে সে সাজিদ নামটি ব্যবহার করতো। ১৯৯৯ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ছাত্র থাকার সময় সানী ইসলামী ছাত্র শিবিরে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগ দেয়।

মূলত জেএমবিতে যোগ দেয়ার পর প্রত্যেকের কাছে সাংগঠনিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি নাম চাওয়া হত। নাম দিতে ব্যর্থ হলে সংগঠন থেকে তার নামকরণ করা হত। যেমন শায়খ আবদুর রহমানের সাংগঠনিক নাম এহসান। তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ফজল গ্রামে ১০-১২ বিঘা স্থাবর সম্পত্তির ফসল এবং জামালপুর শহরের নয়াপাড়ায় অবস্থিত নিজের দুই রুম বিশিষ্ট চার ইউনিটের আট রুমের বাড়ি ভাড়া দিয়ে প্রাপ্ত হাজার তিনেক টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। তিনি মদীনায় পড়তে যাওয়ার পর ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে তার পিতা সপরিবারে জামালপুর শহরের নিজের বাসায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

আবদুর রহমান ১৯৬৩ সালে কামালখান হাট সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৮ সালে ফাজিল পাস করেন। এই মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি শিবিরের রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন এবং ৪-৫ বছর অনিয়মিতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহের কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হন। একই বছর তিনি রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভের আশায়। কেননা, সুলতানগঞ্জ মাদ্রাসা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরিভুক্ত থাকায় প্রতিবছর এ মাদ্রাসা থেকে ছাত্ররা বৃত্তি নিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেত। এ মাদ্রাসায় ভর্তির ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছিলেন আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ এর নায়েবে আমির আবদুস সামাদ সালাফির শ্বশুর ও ঐ মাদ্রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল্লাহ।

১৯৮০-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আবদুর রহমান মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিতে ডিগ্রী অর্জন করেন। এখানে অধ্যায়নকালে তিনি জামায়াতে ইসলামী সৌদী আরব শাখার বৈদেশিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এ সময় তিনি মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বহু আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯৮৫ সালে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে দেশে ফেরেন এবং পরের বছর আলম নগর আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন। পড়াশোনা শেষে শায়খ রহমান মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি জামালপুর শহরের পাশে চন্দ্রায় নাবিল সোপ ফ্যাক্টরী নামে একটি সাবান কারখানা দেন।

এ সময় তিনি ও তার পরিবার নয়াপাড়ার নিজের বাসা ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রায় দুই রুমবিশিষ্ট ভাড়া বাসায় ওঠেন। সাবান ফ্যাক্টরীতে ৬/৭ জন শ্রমিক কাজ করতো। সাবান ফ্যাক্টরী, জমিজমা ও বাসা ভাড়ার টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলতো। ১৯৮৭ সালে শায়খের পরিবার এই সাবান ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দিয়ে নয়াপাড়ার নিজের বাড়িতে চলে যায়। ১৯৮৬ সালে তিনি ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসের ভিসা সেকশনে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি স্ত্রীসহ উত্তরায় বসবাস করতেন।

মেহেদী হাসান পলাশ রচিত 'জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ কেন টার্গেট' বইতে বলা হয়েছে– 'জেএমবি'র কার্যক্রম চলাকালে শায়খ রহমানের চোখে পড়ে সংগঠনের মধ্যে অবস্থিত তরুণ আবদুল আউয়ালের প্রতি। আউয়ালের সাংগঠনিক দক্ষতায় খুশি হয়ে শায়খ রহমান তার মেয়ে আফিফার সাথে আউয়ালের বিয়ের বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং সে মোতাবেক খোঁজ-খবর নিতে ছোটভাই সানীকে আউয়ালের স্থায়ী ঠিকানায় পাঠান। আউয়ালের পরিবার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলে আবদুর রহমান নিজেই বিয়ের চূড়ান্ত আলাপ করতে আউয়ালের বাসায় যান এবং দু'পক্ষের আলোচনার পর ২০০১ সালের ২২ জুন শায়খের কন্যা আফিফার সাথে আবদুল আউয়ালের বিয়ে হয়। এই আবদুল আউয়াল পরবর্তী সময় জেএমবি'র শূরা সদস্য ও উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার নিযুক্ত হন।'[১৩]

জেএমবি'র প্রস্তুতিকাল ঃ সৌদী আরবে অবস্থানকালে আবদুল্লাহ ইবনে তাইমিয়্যা এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের কিছু বই পড়ে শায়খ আবদুর রহমানের মনে

জিহাদীর বীজ অঙ্কুরিত হয়। উল্লেখ্য যে–আবদুল্লাহ ইবনে তাইমিয়্যা ১২৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের হাররান-এ জন্মগ্রহন করেন। তাইমিয়্যা তার বংশীয় উপাধি। উচ্চ শিক্ষিত বংশের সদস্য ইবনে তাইমিয়্যা মাত্র ১৭ বছর বয়সে শুধু শিক্ষা জীবনই সমাপ্ত করেননি বরং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। মুসলমানদের প্রথম যুগের আচরিত পন্থার জোর সমর্থক তাইমিয়্যা বিদআতের কঠোর সমালোচনা করেন। পীর দরবেশদের প্রতি অন্ধ ভক্তি, কবর পূজা, মাজার জিয়ারতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি।

জেএমবি'র সদস্যগণ নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত

সাথী ও সুধী ঃ সংগঠনে যখন কেউ প্রাথমিকভাবে যোগদান করে তাকে সদস্য/সাথী এবং যে সমস্ত লোকজন সংগঠনকে সমর্থন এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে তাদেরকে সুধী বলে।

গায়েরে এহসার ঃ যে সকল সাথী দলের জন্য নিবেদিত, কর্মতৎপর ও ইয়ানত (মাসিক চাঁদা) সংগ্রহে পারদর্শী এবং নিজ এলাকায় সংসার ধর্ম পালন করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদেরকে গায়েরে এহসার বলা হয়।

এহসার ঃ উল্লিখিত কর্মকান্ডে পারদর্শী ব্যক্তি যে তার ধর্ম ও জানমাল ত্যাগ করে সংগঠনের জন্য এলাকায় দলীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে তাকে এহসার বলা হয়।

মহিলা ইউনিট ঃ জেএমবিতে ১০-১২ জন করে মহিলা নিয়ে গঠিত শতাধিক মহিলা ইউনিট ছিল। মহিলা সদস্যদের প্রধান কার্যক্রম ছিল ব্যক্তিজীবনে ইসলামের চর্চা করা, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং পরিবারের সদস্যদের জিহাদে উৎসাহিত করা। সাধারণত সংগঠনের সদস্যদের পরিবারের মহিলাগণই এতে যোগ দিত। তবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে অনেক সময় পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছিল বলে ২০০৩ সালেই জেএমবি'র মহিলা ইউনিট ভেঙে দেয়া হয়। পারিবারিকভাবে তার প্রভাব এখনও রয়ে গেছে।

সুইসাইড স্কোয়াড ঃ জেএমবিতে সুইসাইড স্কোয়াড সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণের তথ্য পওয়া যায়নি। তবে কয়েকজনকে ১৭ আগস্ট ২০০৫ আত্মঘাতী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, যাদের দিয়ে পরে কয়েকটি অপারেশনও পরিচালনা করা হয়েছিল।

জনবল সংগ্রহ ব্যবস্থা ঃ ১৯৯৮ সালে জেএমবি'র মজলিসে শূরা গঠিত হওয়ার পর কর্মী তৈরীর উদ্দেশ্যে শূরা সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শূরা সদস্যগণ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে নিজেদের আসল নাম পরিবর্তন করে সাংগঠনিক ছদ্মনামে বাসা ভাড়া নিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করে। জেলার বিভিন্ন থানায় তাবলীগ পদ্ধতিতে সফর শুরু করে প্রেরণা, ধর্মীয় আলোচনা, বক্তৃতা ও দাওয়াতের কর্মী সংগ্রহ বা রিক্রুটিংয়ের কাজ চালাতে থাকে। এক জেলায় কর্মী সংগ্রহ আশানুরূপ হলে শূরা সদস্যগণ পরে অন্য জেলায় গমন করে। যখন সব জেলাতেই কিছু কিছু কর্মী তৈরি হয় তখন তাদের একত্রিত করে বিভিন্ন আহলে হাদীস মসজিদে তাবলীগ বেশে তালিম দেয়া হয়। তালিম দেয়া শেষ হলে সদস্যদেরকে ইউনিট, থানা ও জেলা সংগঠন অনুযায়ী বিভক্ত করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়।

যেভাবে জামায়াতে ইসলামী জেএমবির সঙ্গে যুক্ত হয় ঃ জঙ্গি সংগঠনটির আমির মুফতি মাওলানা সাইদুর রহমান জাফর গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেএমবি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, কারাবন্দী আমির সাইদুর রহমান জাফর ১৯৫৯ সালের ১৪ আগস্ট বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানাধীন কুজাপুর এলাকার মীরপুরবাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী আব্দুল মতিন। মায়ের নাম রুজোনুন্নেছা। মৌলভীবাজার দারুল উলুম ও সিলেট দরগা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন।

তিনি ১৯৭৭ সালে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগদান করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ছাত্র শিবিরের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। ছাত্র শিবিরের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি থাকা অবস্থায়ই ১৯৮০ সালে তিনি মৌলভীবাজার জেলার বাসিন্দা তরিকুন্নেছার সঙ্গে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম ঘরের সন্তানরা হচ্ছে শামীম ওরফে সুমন, নাসিম, ফাহিম, বাশার ওরফে নাইম ও শিরিন। বাশার জেএমবির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা।

১৯৮১ সালে সাইদুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর মৌলভীবাজার জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হন। ১৯৮৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর মৌলভীবাজার জেলা শাখার আমির নিযুক্ত হন। একইসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য হন। জামায়াতে ইসলামীর নেতা থাকা অবস্থায়ই দলের নির্দেশেই তিনি জেএমবিতে যোগ দেন। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে সাইদুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে জেএমবির আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেএমবির শতকরা ৮৫ ভাগ সদস্য ছাত্র শিবিরের।

৮. হরকাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ

১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল হরকাতুল মুজাহিদীন প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানের মাওলানা আরশাদ আহমদ আফগান যুদ্ধে অংশ নেওয়া বিদেশি মুজাহিদদের এক কমান্ডের আওতায় সংগঠিত রাখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে হরকাতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠিত করলেও বিদেশি জঙ্গিদের এক সংগঠনের আওতায় থাকার চেষ্টা সঠিক মনে করেনি পাকিস্তান। ফলে পাক সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বহিষ্কৃত হওয়ার পর মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল আইএসআই-এর সহযোগিতায় 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'- এর মোকাবেলায় 'হরকাতুল মুজাহিদীন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আফগান গৃহযুদ্ধের সময় এ সংগঠনের সঙ্গে ১ হাজার বাংলাদেশি জড়িত ছিল। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রায় ৫ হাজার বাংলাদেশি। এদের সবাই উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এর নেতৃত্ব দেন আইএসআই-এর বিশ্বস্ত এজেন্ট মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল। এই সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গোয়েন্দাবৃত্তি এবং পাকিস্তান বিরোধী একাধিক দেশে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ এই সংগঠনটি এখনো তার চরিত্র বজায় রেখেছে।

হরকাতুল মুজাহিদীন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদের মধ্যে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এবং সংগঠনটির উপর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে। এর অংশ হিসেবে তারা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে অবস্থানরত বিদেশি জঙ্গিদের মধ্যে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এ অবস্থায় ১৯৮৫ সালের ১৬ জুন আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশে সংঘটিত একটি ঘটনায় হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী পাকিস্তান শাখার নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান খলীলকে বহিষ্কার করা হয়। ওই দিন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর তৎকালীন কেন্দ্রীয় আমির প্রয়াত মাওলানা আরশাদ আহমাদ এবং আফগান জঙ্গিদের কমান্ডার মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে একটি দুর্গম পাহাড়ি উপত্যকা পার হচ্ছিলেন আর উপত্যকা নিরাপদ রাখার দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল কিন্তু তিনি তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজাহিদরা যখন রাতের আঁধারে গজনির শারানা রণাঙ্গনে পৌঁছায়, তখন সোভিয়েত বাহিনী চারদিক থেকে অতর্কিতে জঙ্গিদের উপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলে মাওলানা আরশাদসহ ১৬ জন জঙ্গি নিহত হয়। আহত হয় অসংখ্য জঙ্গি।

২০০৬ সালের ১৯ আগস্ট দৈনিক 'যায় যায় দিন'-এর পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ও হরকাতুল মুজাহিদীনের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী লড়াইয়ে আফগানিস্তানের ইসলামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী বা মুজাহিদদের এক কর্মকাণ্ডের আওতায় রাখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর হরকাতুল মুজাহিদীন প্রতিষ্ঠা করা হয় পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মদদে। মূলত হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েই এর কাউন্টার হরকাতুল মুজাহিদীন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৬ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'[১৪]

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজির) সাবেক আমির হাফেজ ইয়াহিইয়া গণকমিশনের অনুসন্ধানী টিমের একজন প্রতিনিধিকে ২০০৮ সালে ১০ নবেম্বর চট্টগ্রামে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন– ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ও হরকাতুল মুজাহিদীনের বেশির ভাগ বাংলাদেশি সদস্য আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসে। এ সময় সংগঠন দু'টি পৃথক অফিস নিয়ে সাংগঠনিক তৎপরতাও শুরু করে এবং ১৯৯৩ সালে দেশের শীর্ষ আলেম-ওলামাদের চাপে সংগঠন দু'টি হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নামে একীভূতও হয়। সংগঠনটিকে পরিচালনার জন্য এর পুরোনো নেতা মুফতি শহিদুল ইসলাম তৎপর হন। মাওলানা আবু জাফর ও মুফতি আবদুল হান্নানকে সক্রিয় করতে উঠে পড়ে লাগেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৬ সালে আইএসআই-এর এজেন্ট ও হরকাতুল মুজাহিদীনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল ঢাকা সফর করেন। ঢাকায় তার দেখভাল করেন খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি শহিদুল ইসলাম। তার সম্মানে ঢাকার শ্যামলীতে এক

বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন মাওলানা ফজলুর রহমান খলীল। এতে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন মাওলানা আবু জাফর, মুফতি আব্দুল হান্নান এবং হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর কয়েকজন শীর্ষনেতা। বৈঠকে মাওলানা খলীল উপস্থিত সবাইকে প্রস্তাব দেন যে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী যদি তার কমান্ডে চলে তাহলে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব নেবেন তিনি। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী নেতারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে মুফতি শহিদুল ইসলাম, মাওলানা জাফর ও মুফতি হান্নান মাওলানা খলীলের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আফগান ফেরত মুজাহিদদের ব্যানারে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' ও হরকাতুল মুজাহিদীনের কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে জঙ্গিবাদী আলেম-ওলামারা আফগান-ফেরত মুজাহিদীনদের এক সংগঠন ও কমান্ডের আওতায় থেকে কাজ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু 'হরকাতুল মুজাহিদীন'র প্রতি অবিশ্বাস থাকার কারণে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' এর সদস্যরা 'হরকাতুল মুজাহিদীন' এর সদস্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন।

১৯৯৩ সালে আলেম-ওলামা ও সংগঠন দু'টির নেতাদের সম্মিলিত বৈঠকে উভয় সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী', হরকাতুল মুজাহিদীন নামে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। এতে সকলে সম্মতি জানালে একীভূত সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই নতুন কমিটির আমির মনোনীত হন বৈঠকে বিলুপ্তঘোষিত 'হরকাতুল মুজাহিদীন' এর শীর্ষ নেতা মাওলানা আবু জাফর ওরফে আবু সাঈদ (২০০৬ সালে তিনি রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন)। প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান মাওলানা জাফরের অনুসারী মুফতি আবদুল হান্নান কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায়, নয়া আমির দায়িত্ব পালন থেকে বিরত আছেন। এর পাশাপাশি তিনি তার ঘনিষ্ঠ অনুসারী মুফতি আবদুল হান্নানকে নিষ্ক্রিয় করেছেন। ফলে ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের কর্মতৎপরতায় স্থবিরতা নেমে আসে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্যরা এ সময় মুফতি শফিকুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এতে রাজি হন এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে দেশব্যাপী সফরও করেন। এ সময়ই তারা জানতে পারেন মাওলানা আবু জাফর ও মুফতি আবদুল হান্নান হরকাতুল মুজাহিদীনের সাংগঠনিক তৎপরতা বজায় রেখেছেন এবং হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর নেতা কর্মীদের তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছেন।

মাওলানা আবু জাফর ও মুফতি আবদুল হান্নানের এই তৎপরতা প্রকাশ হলে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর নেতারা তাদের কাছে হরকাতুল মুজাহিদীনের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু তারা এর সদুত্তর দিতে পারেননি। এ নিয়ে কয়েক দফা বাকবিতণ্ডাও চলে। ফলে তাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার চিন্তাভাবনা চলতে থাকে।

মুফতি হান্নান ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানে যান এবং করাচির জামিয়া ইউসুফ বিন নূরিয়া মাদ্রাসায় ফিকাহশাস্ত্রে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি সীমান্তবর্তী শহর খোস্তে মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ

নেন। যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি পেশোয়ারে কুয়েত আল-হেলাল হাসপাতালে ১০ মাস চিকিৎসা নেন। এরপর করাচির ওই মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করেন।

মুফতি হান্নান ১৯৯৩ সালে দেশে ফেরেন এবং পাকিস্তানভিত্তিক হরকাতুল মুজাহিদীনের হয়ে তৎপরতা শুরু করেন। হুজিতে থাকার পাশাপাশি মুফতি হান্নান হরকাতুল মুজাহিদীনের হয়েও কার্যক্রম চালাতেন।

৯. দাওয়াতুল ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে দাওয়াতুল ইসলাম নামে উগ্রপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা মতাদর্শী এই জঙ্গিগোষ্ঠী। দাওয়াতুল ইসলাম নামের আড়ালে পার্বত্য এলাকায় এই জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন আলোচিত উগ্রবাদী বক্তা মাহমুদুল হাসান গুনবী। তিনি বান্দরবানের লামা ও খাগড়াছড়িতে দুটি জঙ্গি আস্তানাও গড়ে তুলেছেন। সেখানে এই গোষ্ঠী ২০ থেকে ২৫ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে।

২০২১ সালের ১৪ জুলাই প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'উগ্রবাদী ওয়াজের জন্য পরিচিত মাহমুদুল হাসান গুনবী বর্তমানে আনসার আল ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতা। তবে তিনি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, দাওয়াতুল ইসলাম নামের একটি সংগঠনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই সংগঠনের কার্যক্রমের নামে পার্বত্য অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে চরাঞ্চলের কিছু এলাকায় আনসার আল ইসলামের কার্যক্রম ও উগ্র মতাদর্শ প্রচার করে আসছেন। আনসার আল ইসলাম নিজেদের আল-কায়েদার ভারত উপমহাদেশের (একিউআইএস) শাখা দাবি করে থাকে।

'দাওয়াতুল ইসলামের বর্তমান আমির মাহমুদুল হাসান গুনবী। সংগঠনটির এর আগে আমির ছিলেন মাওলানা নাজিমুদ্দিন। তিনি জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিকবার গ্রেপ্তার হন। দাওয়াতুল ইসলামের সদস্য সাইফুল ইসলাম, আবদুল হামিদ, আনিছুর রহমান ও হাসান এর আগে জঙ্গি-সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।'[১৫]

গুনবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা আলী হাসান উসামাকে ২০২১ সালের ৫ মে রাজবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জাতীয় সংসদ ভবনে হামলার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আলী হাসান ওসামার সঙ্গে আনসার আল ইসলামের আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাহমুদুল হাসান গুনবীর নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সঙ্গে যুক্ত থাকার তথ্য সামনে আসে। সংসদ ভবনে হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে শেরেবাংলা নগর থানায় করা মামলায় গুনবীকে পলাতক আসামি হিসেবে দেখানো হয়। ২০২১ সালের মে মাসে ওই মামলার পর গুনবী আত্মগোপনে চলে যান। পরে ২০২১ সালের ১৫ জুলাই ঢাকার শাহ আলী বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে মাহমুদুল হাসান গুনবীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে রোমহর্ষক জঙ্গি হামলা ও পরে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কমান্ডো অভিযান শেষে ঘটনাস্থল থেকে অন্যান্য আলামতের সঙ্গে একটি রুমাল উদ্ধার করা হয়। সাদা কাপড়ের এই রুমালে বাংলায় কালো অক্ষরে লেখা ছিল,

'দাওয়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ টিকে থাকবে'। জঙ্গিদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সেদিন (১ জুলাই) রক্তাক্ত হয় হলি আর্টিজানের নীচতলার প্রায় পুরো মেঝে। তবে মেঝে থেকে উদ্ধার করা রুমালে কোনো রক্তের দাগ ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ধারণা, জঙ্গিরা তাদের সংগঠনের পরিচয় জানান দিতেই মেঝের ওই জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানে রুমালটি ফেলে রাখে।

আন্তর্জাতিকভাবে দাওয়াতুল ইসলাম সংগঠনটি ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। যুক্তরাজ্যে জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশি নেতাকর্মীদের অধিকাংশ দাওয়াতুল ইসলামের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশে দাওয়াতুল ইসলাম বাংলাদেশ কারা চালায় এ ব্যাপারে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। উকিপিডিয়াতে দাওয়াতুল ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি লন্ডনভিত্তিক একটি সংগঠন। পাকিস্তানের জামায়াত-ই-ইসলামী ও ইউকে ইসলামী মিশন সংগঠনটিকে অর্থায়ন করে।

১০. ইসলামী সমাজ

১৯৯৭ সালের ১৭ মে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন মুফতি আব্দুল জব্বার। এরপর ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আফগান মুজাহিদরা বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু করে।

নব্বইয়ের দশকের ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতা কুমিল্লার সৈয়দ হুমায়ন কবির এখন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আমির হিসেবে দায়িত্বে আছেন। কুমিল্লার রায়পুর উপজেলার কুশিয়ারা গ্রামে সংগঠনের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন মুফতি আব্দুল জব্বার। সেটি এখনও বহাল আছে। সংগঠন চারটি স্তরে বিভক্ত। এর মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় আমির। এর পরের ধাপ হচ্ছে মামুর বা অঞ্চল প্রধান। তৃতীয় ধাপ হচ্ছে দারা অর্থাৎ যারা দাওয়াত দিয়ে সংগঠনে আনে। সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে দাওয়াতী অর্থাৎ যারা দাওয়াত গ্রহণ করে এবং সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়। জামায়াত নেতা মুফতি আব্দুল জব্বার জঙ্গি সংগঠনগুলোর আদলেই ইসলামী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। জেএমবি, হিযবুত তাহরীরসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের আদর্শ এবং আহ্বানের সঙ্গে ইসলামী সমাজের পুরোপুরি মিল আছে। ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক কার্যক্রমের ধরনও হিযবুত তাহরীরের মতোই।

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হলেও ইসলামী সমাজ নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা আসে ২০০৮ সালে। এর মধ্যে তারা কুমিল্লার পাশাপাশি বান্দরবান, জামালপুর জেলায় তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করে। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল সেসময় ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট বান্দরবান এবং জামালপুরে প্রকাশ্যে প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ইসলামী সমাজের ১৫ জন নেতাকর্মী। এর মধ্যে বান্দরবান জেলা জজ আদালতের সামনে থেকে ৮ জন এবং জামালপুর থেকে ৭ জনকে আটক করা হয়।

২০০৩ সালে আফগান মুজাহিদদের গড়ে তোলা শাহাদাৎ-ই-আল হিকমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২০০৫ সালে ৩টি সংগঠন দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে

আছে হরকাত-উল-জিহাদ ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি), জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)।

২০০৯ সালে নিষিদ্ধ হয় হিযবুত তাহরীর। ২০০৯ সালে আরও ৮টি সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করা হয়। এগুলো হচ্ছে, হিজবুত তাওহীদ, ইসলামী সমাজ, উলেমা আনজুমান আল বাইয়্যেনিয়াত, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি, তাওহীদ ট্রাস্ট, তমীর উদ দীন, আনসার উল্লাহ বাংলা টিম এবং আল্লাহর দল।

ইসলামী সমাজ-এর আমীরের পরিচিতি: সৈয়দ হুমায়ূন কবীর- আমির, ইসলামী সমাজ। পিতা: মৃত সৈয়দ আব্দুর রব, গ্রাম: কুশিয়ারা, পো: গ্রাম রায়পুর, থানা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা। পিতার জন্মস্থান: চান্দলা সৈয়দবাড়ী, পো: চান্দলা, থানা: ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা: কুমিল্লা।

ইসলামী সমাজের আমির সৈয়দ হুমায়ূন কবীরের বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তিনি ১৯৮৩ ইং সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে এম, এস, সিতে পড়ার সময়েই মুফ্তী আবদুল জাব্বার এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতা মুফ্তী আবদুল জাব্বার হলেন তার রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষাগুরু। সৈয়দ হুমায়ূন কবীর আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত উচ্চ শিক্ষিত বহু উস্তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করেছেন এবং মাদ্রাসায়ও লেখাপড়া করেছেন। ১৯৮৩ ইং সাল থেকে ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারী পর্যন্ত মুফ্তী আবদুল জাব্বার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মুফ্তী আবদুল জাব্বারের মৃত্যুর পর সৈয়দ হুমায়ূন কবীর ইসলামী সমাজ গঠন আন্দোলনের আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করে এখনো দায়িত্ব পালন করছেন। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানাধীন কুশিয়ারা বায়তুল আমান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব এবং কুশিয়ারা ঈদগাহর ইমাম হিসেবে দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

১১. দাওলাতুল ইসলাম বাংলাদেশ

তিনটি জঙ্গি সংগঠনের নেতাদের ঐক্যমতে ২০১৬ সালের শুরুতে দাওয়াতুল ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জোট বেঁধে একই ব্যানারে কার্যক্রম চালাচ্ছে নিষিদ্ধ ঘোষিত তিন জঙ্গি সংগঠন। দেওয়া হয়েছে নতুন নাম 'দাওলাতুল ইসলাম'। এই তিন জঙ্গি সংগঠন হচ্ছে, জামাআতুল মুজাহিদীন (জেএমবি), আনসারুল্লাহ বাংলাটিম (এবিটি) ও হিযবুত তাহরীর।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অব্যাহত অভিযানে ভেঙে পড়া এই উগ্রপন্থি সংগঠনগুলোর সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সদস্যরা একই ব্যানারের নিচে সুসংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সবকিছুই চলে এই মাধ্যমে। এরই মধ্যে গুলশানের হলি আর্টিজান, শোলাকিয়াসহ বেশ কিছু জায়গায় তারা হামলা চালিয়েছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, নতুন করে সুসংগঠিত হতেই জেএমবি ও আনসারুল্লাহ বাংলাটিম ও হিযবুত তাহরীরের সদস্যরা মিলে গড়েছে এই আত্মঘাতী সংগঠনটি। গুলশান শোলাকিয়াসহ এমন ১১টি হামলা চালিয়েছে দাওলাতুল ইসলাম নামের নতুন এ সংগঠনটি। গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় রোমহর্ষক জঙ্গি হামলা ও পরে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কমান্ডো অভিযান শেষে ঘটনাস্থল থেকে অন্যান্য আলামতের সঙ্গে একটি রুমাল উদ্ধার করা হয়। সাদা কাপড়ের এই রুমালে বাংলায় কালো অক্ষরে লেখা ছিল, 'দাওলাতুল ইসলাম বাংলাদেশ টিকে থাকবে'।

ফেসবুক ও কিছু অ্যাপসের সাহায্যে চলে দাওলাতুল ইসলামের সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এ কাজে ব্যবহৃত ছদ্মনাম অ্যাপস পাসওয়ার্ড আর প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানও দেয় সংগঠনটি। তিন ধাপের এই প্রস্তুতি পর্বের পুরোটাই চলে একজন আমিরের তত্ত্বাবধানে। সদস্য সংগ্রহে শুরুতেই ফেসবুকে বিভিন্ন আইডি থেকে দাওয়াত পাঠানো হয়। আবার মুসলিম ছাড়াও অন্য ধর্মের লোকজনের নামেও খোলা হয় কিছু ভুয়া আইডি। পরের ধাপে ফেসবুক বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অ্যাপস এ পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এই অ্যাপসে যাওয়ার জন্য তারা সতর্কতা হিসেবে কিছু সাংকেতিক ভাষাও ব্যবহার করে।

২০১৬ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'টেলিগ্রাম নামের অ্যাপস বেশি ব্যবহার হতে দেখা গেছে এই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদেরকে। দ্বিতীয় ধাপের এই সময়ে আমিরের ডাকে ঘরসংসার ছেড়ে হিযরতের জন্য প্রস্তুত করা হয় সদ্য সংগ্রহীত জঙ্গিদের। আর আমিরের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগ বাধ্যতামূলক রাখা হয়। কোনো কারণে একদিন যোগাযোগ না হলে পুলিশের হাতে ধরা পড়া কিংবা অনাগ্রহী ভেবে তাকে বাদ দেওয়া হয় যোগাযোগের মাধ্যম থেকে। তৃতীয় ধাপের যোগাযোগ হয় নতুন অ্যাপস ট্রিমাতে যা মূলত কোনো অভিযান পরিকল্পনা কিংবা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিদেশি মুদ্রায় এই অ্যাপস ডাউনলোডের খরচ, যোগাযোগের ছদ্মনাম, পাসওয়ার্ড সবই দেওয়া হয় সংগঠন থেকে। কোন কাজ কখন করতে হবে তার নির্দেশনা একমাত্র আমিরই দিয়ে থাকেন। হামলার অন্তত চার দিন আগে ২ থেকে ৫ জনের একটি আত্মঘাতী দলকে নির্ধারিত জায়গায় যেতে বলা হয়। সেখানে তাদের নতুন নামও দেওয়া হয়, যা জানেন শুধু আমির নিজেই। মিশনের আগ মুহূর্তে ছদ্মনামধারী আরো একজন যুক্ত হন তাদের সঙ্গে যেখানে তিনি আত্মঘাতীদের সঙ্গে এক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে দু-একজনকে চূড়ান্ত নির্দেশনা দিয়ে চলে যান এলাকা ছেড়ে। অন্যদের বলা হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনুসরণ করে যেতে।'[১৬]

১২. দাওয়াহ ইলাল্লাহ

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার নামে কথিত যেসব অডিও-ভিডিও বিভিন্ন সময় ছড়িয়েছে সেগুলো জঙ্গিদের নতুন সংগঠন 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' এর নামে প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের ওয়েব সাইটের তথ্যমতে, 'কয়েক বছর সচেতনতামূলক কার্যক্রম

চালালেও ২০১৩ সালের ৫ মে'র পর আটঘাট বেঁধে নামে সংগঠনটি। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশে সক্রিয় হয় সংগঠনটি। প্রথম দিকে মাঠে সরাসরি কোনো ধরনের 'অপারেশনে' না গেলেও অনলাইন কেন্দ্রিক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে দাওয়াহ ইলাল্লাহ। দাওয়াহ ইলাল্লাহকে সহযোগিতা করছে 'বাবউল ইসলাম', 'আনসার আল-মুজাহিদীন' ও 'আল-ফাতাহ' নামে আরো তিনটি সংগঠন। ২০১৪ সালে আইমান আল-জাওয়াহিরির নামে ইউটিউবে যে ভিডিও বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা 'ইসলামের আলো' নামে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে ছড়িয়েছে 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ'।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে– জামায়াত-শিবির, হেফাজতে ইসলামের একাংশসহ, জেএমবি, এবিটি ও হিজবুত তাহবীরের নেতাকর্মীদের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংগঠনটি কার্যক্রম শুরু করে ২০১৩ সালের শেষের দিকে। ওয়ার্ড প্রেসের ফ্রি ডোমেনে সংগঠনের নামে একটি সাইট বানিয়ে সেখানে আল-কায়েদা প্রধান আইমান আল-জাওয়াহিরির নামে বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে 'জিহাদি ডাকে'র অসংখ্য ভিডিও-অডিওসহ কথা বার্তা রয়েছে।

'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' নামের সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://dawahillah.wordpress.com) এ দেখা যায়, ২০১৪ সালে জাওয়াহিরির যে বক্তব্যটি প্রচার করা হয়েছে সেটি 'বালাকোট মিডিয়া'র তৈরি বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। জাওয়াহিরিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার নামে সাইটটিতে রয়েছে নানান 'মেসেজ'। রয়েছে জিহাদের দিক নির্দেশনাও। সাইটটিতে প্রশ্নোত্তর, নানা ধরনের ফতোয়া, বইপত্র, পোস্টার অডিও-ভিডিওসহ রয়েছে প্রচুর কন্টেন্ট। আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন ও আইমান আল-জাওয়াহিরির প্রচুর ছবির পাশাপাশি হেফাজতে ইসলামের কথাও রয়েছে সেখানে। রাজধানীর শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে'র আন্দোলন এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে সাইটটির বিভিন্ন পোস্টে। সাইটগুলোতে তলোয়ারসহ ভারি অস্ত্রশস্ত্রের ছবিও রয়েছে।

অনলাইন পোর্টাল বার্তা বাংলা ডট কম-এ ২০১৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে তরুণ বিশাল অংশ দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর মাধ্যমে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে জড়িত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুফতি হারুন ইজাহার, মাওলানা নূরুল করিম ও মোহাম্মদ শরিফ।'[১৭]

দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, রয়েছে তাদের ফেসবুক পেজও। পেজটিতে প্রতিদিনই আপডেট দেয়া হচ্ছে। গুগল প্লাসেও তারা সক্রিয়। জঙ্গিদের বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে 'ইসলামের আলো' নামে পরিচালিত ইউটিউব চ্যানেলটিতে ১৭০টি ভিডিও ছিল। তাদের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী- 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র ফেসবুক পেজটি ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর খোলা হয়। আর 'ইসলামের আলো' নামের ইউটিউব চ্যানেলটিতে প্রথম ভিডিও আপলোড করা হয় ২০১১ সালের ১ আগস্ট।

১৩. স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি (৯ জঙ্গি সংগঠনের জোট)

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরির বহুল আলোচিত অডিও বার্তায় বাংলাদেশে জিহাদ শুরুর আহ্বানের পর বাংলাদেশে সক্রিয় ও নিষিদ্ধ ঘোষিত মিলিয়ে ৯টি জঙ্গি সংগঠন জিহাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৎপরতা শুরু করে। এ লক্ষ্যে তারা একটি জঙ্গি জোটের নামও চূড়ান্ত করে- 'স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি'। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের (হুজি) মজলিশে আমেলার সিনিয়র সদস্য মাওলানা আবু বকরকে আমির নির্বাচন করে অন্য আটটি সংগঠনের আমিরকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি'র মজলিশে আমেলার সদস্য বানানো হয়।

২০১৪ সালের ৪ মার্চ কালেরকণ্ঠ পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটিতে প্রাথমিকভাবে যে ৯টি জঙ্গি সংগঠন যোগ দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সোহেল মাহফুজের নেতৃত্বাধীন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ ওরফে জেএমবি, মুফতি আবদুস সালামের নেতৃত্বাধীন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ ওরফে হুজি, 'মুফতি আবদুল হান্নানের নেতৃত্বাধীন হরকাতুল মুজাহিদীন', মুফতি আবদুর রউফের তাআমির উদদীন, বায়েজিদ খান পন্নীর প্রতিষ্ঠিত হিজবুত তাওহীদ, মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানীর 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম', মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানির জইশ-ই-মোহাম্মদ, মাওলানা আবদুর রহমান আফগানির আনসারু বাইতিল মাকদিস এবং হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আল্লাহর দল। স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটিতে যোগ দেয়া ৯ সংগঠনের বেশির ভাগ নেতাই বর্তমানে কারাবন্দি। বিশেষ করে জঙ্গি সংগঠনগুলোর এ জোটের মূল উদ্যোক্তা ও নেতৃত্বদানকারী হরকাতুল জিহাদের তিন গ্রুপের তিন আমিরই দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দি। নেতারা কারাগারে থাকলেও তাদের ক্যাডার বাহিনী জিহাদ কায়েমের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর মজলিশে আমেলার এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আপনারা যত যাই বলুন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে দেশে কোনো দিন ইসলাম কায়েম হবে না। আমরা বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আফগানিস্তানে আমরা জিহাদ করেছি। বাংলাদেশে জিহাদ করেই ইসলাম কায়েম করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশটি আমাদের নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা তথা বাংলাদেশ হলো তাদের জন্য ক্যান্সার। আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর বরদাশ্‌ত করা হবে না। আমরা আয়মান আল জাওয়াহিরি অথবা তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের এমন একটি ঘোষণারই অপেক্ষায় ছিলাম। দীর্ঘ অপেক্ষার পর হলেও সেই ঘোষণা পেয়েছি। এখন আর কোনো বাধা রইল না। আমরা জিহাদের পক্ষেই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি।'[১৮]

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব জঙ্গি সংগঠন নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানীতে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে কয়েক দফা বৈঠক করেছে।

বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের প্রশ্নেই মূলত তিন গ্রুপে বিভক্ত হয় হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী। মুফতি আবদুস সালামের নেতৃত্বে মূল অংশ হুজি, মুফতি আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে হরকাতুল মুজাহিদীন আর মুফতি আবদুর রউফের নেতৃত্বে তাআমির উদদীন। তাদের মধ্যে হুজি সশস্ত্র জিহাদের পক্ষে না থাকলেও অন্য দুটি অংশ শুরু থেকেই সশস্ত্র জিহাদের চিন্তা লালন করে আসছে। এমনকি হুজি সংগঠনের নাম পাল্টে প্রথমে ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা, পরে সচেতন ইসলামী জনতা, এরপর ইসলামী গণআন্দোলন, সর্বশেষ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি) নামে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করে। নির্বাচন কমিশনে ২০০৭ সালে আইডিপি নামে তারা নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করে।

১৪. আল্লাহর দল

১৯৯৫ সালে জঙ্গি মতিন মেহেদী ওরফে মুমিনুল ইসলাম ওরফে মতিন মাহবুব ওরফে মেহেদী হাসান ওরফে মতিনুল হকের নেতৃত্বে 'আল্লাহর দল' নামে জঙ্গি সংগঠনটি গড়ে ওঠে। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সাদুল্যাহপুর থানা এলাকা থেকে এই সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ করা হয়। ২০০৪ সালের শেষের দিকে এটি জেএমবি'র সঙ্গে একীভূত হয়ে সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলায় অংশ নেয়। জেএমবি নেতৃত্বশূন্য ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তারা আলাদা হয়ে যায়।

২০১৪ সালে মতিন মেহেদীর নির্দেশে এটি 'আল্লাহর সরকার' নামকরণ করা হয়। এই সংগঠনটি বাংলাদেশের সংবিধানে বিশ্বাসী নয়। তাদের মূল লক্ষ্য, নাশকতায় লিপ্ত হয়ে সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং তাদের কাঠামো অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২০২০ সালের ২১ জুন সংগঠনটি অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি সুসংগঠিত। তারা এরইমধ্যে বেশ কিছু ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা রেখেছে। এমনকি এসব অর্থ দিয়ে অস্ত্র কেনার পরিকল্পনাও ছিল তাদের। তারা বর্তমানে যুদ্ধ অবস্থা চলছে বলে, ঈদ, কোরবানি, হজ পালন করে না, জুমার নামাজ আদায় করে না এবং প্রতি ওয়াক্তে শুধুমাত্র দু'রাকাত নামাজ আদায় করে। এমনকি ইসলামের কালেমার সাথে শেষ নবীর নাম যুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাদের ভিন্ন মত রয়েছে। তারা মনে করে বর্তমান সময়ের জন্য জঙ্গি মতিন মেহেদী আল্লাহর বিশেষ দূত হতে পারে।

নিষিদ্ধ হওয়ার পর সংগঠনের সদস্য পদ সংগ্রহের জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। পারস্পারিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারা চিরকুট ও লোক মারফত দূত পাঠায়। সংগঠনের সদস্যরা জঙ্গি মতিন মেহেদীকে আমির মেনে বায়াত বা শপথ নিয়ে থাকে। তাছাড়া সংগঠনের যেসব সদস্য চাকরি করেন, তাদের মাসিক হারে চাঁদা দিতে হয়। ব্যবসায়ী সদস্যদের চাঁদা দিতে হয় মুনাফা হারে। চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া টাকা তারা নারী সদস্যদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে। সব টাকাই জঙ্গিবাদে ব্যবহার করা হয়।

জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকাতুল জিহাদ, জেএমজেবি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, শাহাদত-ই আল হিকমা, হিযবুত তাহরীর নামের জঙ্গি সংগঠনের পর এবার নিষিদ্ধ করা হয় 'আল্লাহর দল' নামের জঙ্গি সংগঠনকে।

২০১৯ সালের ৬ নবেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'সরকারের কাছে এ মর্মে প্রতীয়মান হয় যে 'আল্লাহর দল' নামক জঙ্গি দল বা সংগঠনটির ঘোষিত কার্যক্রম দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ইতোমধ্যে সংগঠনটির কার্যক্রম জননিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে জেএমবির সিরিজ বোমা হামলার সঙ্গে আল্লাহর দলের সংশ্লিষ্টতার তথ্য মেলে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধানমণ্ডির গ্রিন রোডের সরকারি কোয়ার্টার থেকে র‍্যাব মতিন মেহেদীকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। মতিন মেহেদীর অনুপস্থিতিতে গ্রেপ্তার আব্রাহিম আহমেদ হিরো (৪৬) আল্লাহর দলের ভারপ্রাপ্ত আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় র‍্যাব অভিযান চালিয়ে আব্রাহিম আহমেদ হিরোকে গ্রেপ্তার করে।

বিভিন্ন সময়ে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও নতুন করে ফের সক্রিয় হয়ে তৎপরতা চালিয়ে আসছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'আল্লাহর দল'। তবে এবারে তারা নাম পরিবর্তন করে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল 'আল্লাহর সরকার' নামে। আর বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সদস্যদের যেন সশস্ত্র বা সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে না হয়, সে কারণে বিভিন্ন সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরিচ্যুত সদস্যদেরই দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে তৎপর তারা।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সূত্র থেকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠতে গিয়ে তারা দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয় ও বাহিনীর অবকাঠামোর মতো করে নিজেদের সংগঠনের অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। সেই অনুযায়ী গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। আর নেতৃত্বের জন্য নায়ক, অধিনায়ক, উপঅধিনায়ক, অতিরিক্ত অধিনায়ক, যুগ্ম অধিনায়ক এবং সর্বোচ্চ পদকে 'তারকা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে তারা।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, বিভিন্ন জঙ্গি অপারেশনে যাদের পাঠানো হয়, তাদের সামরিক বা সশস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। যাদের এ প্রশিক্ষণ নেই, তাদের জন্য ব্যবস্থাও করতে হয়। প্রশিক্ষণ বিষয়ক এসব ঝামেলা এড়াতে বিভিন্ন সামরিক, আধা-সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরিচ্যুত সদস্যদের দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে 'আল্লাহর দল'। এ ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত বিজিবি সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তারা। জঙ্গি সংগঠনটির নেতারা মনে করেন, চাকরিচ্যুত সেনা, বিজিবি বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ।

আল্লাহর দল নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ২০০৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি শাহাদত-ই-আল হিকমা, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে হরকাতুল জিহাদ

বাংলাদেশ, একই বছরের ১৭ অক্টোবর জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) ও জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর হিযবুত তাহরীর, ২০১৫ সালের ২৫ মে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং ২০১৭ সালে 'আনসার আল ইসলামকে নিষিদ্ধ করে সরকার।

২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সাপ্তাহিক ধাবমান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর দল' সংগঠনের এককভাবে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে বিধায় তারা এখন হরকাতুল জিহাদের মজলিশে আমেলার সিনিয়র সদস্য মাওলানা আবু বকর-এর নেতৃত্বে মোট ৯টি জঙ্গি দল মিলে সেই 'স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি' নামে যে নতুন দল করা হয়েছে সেখানে কাজ করছে। 'আল্লাহর দল' 'স্বাধীন বাংলাদেশ কমিটি'র মাধ্যমে আইমান আল জাওয়াহেরীর ঘোষণার পর মাওলানা আসেম ওমরের নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে (AQIS)-কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে AQIS-এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ভারতকে হামলা করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা।[১৯]

১৫. ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ও হরকাতুল মুজাহিদীন কিছুদিন একসাথে কাজ করলেও একসময় তাদের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হলে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর নেতারা মুফতি হান্নানকে বহিস্কার করেন এবং একই বছরের আগস্ট মাসে সংগঠনের মজলিশে শুরার বৈঠক ডেকে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠকে কোনো সশস্ত্র জিহাদে অংশ নেওয়া বা নিপীড়নের শিকার মুসলিম দেশগুলোকে মুজাহিদ প্রেরণের কর্মসূচি পরিত্যাগ করে ইসলামী দাওয়াতী ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন জঙ্গি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

এই নতুন সংগঠনের আমির নিযুক্ত হন আফগান ফেরত মুজাহিদ হাফেজ ইয়াহিয়া। ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে হরকাতুল জিহাদের অন্যতম নেতা মুফতী আবদুর রউফ সংগঠনের আনুগত্য অস্বীকার করে। ২০০২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মজলিসে শুরার বৈঠকে ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা এর আমির নির্বাচিত হন মুফতি শফিকুর রহমান। শুরার এই বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে আফগান ফেরত বাংলাদেশি মুজাহিদদের সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল-বোঝাবুঝি নিরসনে 'ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা' সংগঠনটি পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করে 'ইসলামী গণআন্দোলন বাংলাদেশ' নামে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানের আওতায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সংগঠন করা হবে। এই সংগঠন মদিনা সনদ অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম, প্রত্যেক

নাগরিকের জান-মাল ইজ্জতের হেফাজত, সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে সব ধর্মের স্বার্থ সংরক্ষণ, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা দূর করে আর্দশ জাতি গঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

২০০৬ সালের ৭ জুন অনুষ্ঠিত শুরায় 'ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা' আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করে উল্লেখিত নীতির ভিত্তিতে 'ইসলামী গণআন্দোলন বাংলাদেশ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। সংগঠনের আমির নির্বাচিত হন মাওলানা আবদুস সালাম এবং সেক্রেটারী শেখ ফরিদ। যদিও পরবর্তীকালে তারা তাদের উল্লেখিত নীতির অনুসরণ না করে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। 'ইসলামী গণআন্দোলন' দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানের আনুগত্যের কথা বললেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল 'প্রচলিত সংবিধানকে লাথি মেরে জিহাদ' তথা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা।

২০১৪ সালের ২ মার্চ কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হরকাতুল জিহাদ (হুজি) নাম কয়েকবার পরিবর্তন করেছিল। যার উল্লেখযোগ্য– ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা, সচেতন ইসলামী জনতা, ইসলামী গণআন্দোলন এবং সর্বশেষ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি) নামে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করে। নির্বাচন কমিশনে তারা আইডিপি নামে নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করেছিল। ২০০৬ সালের ১৮ আগষ্ট সচেতন ইসলামী জনতার ব্যানারে তারা রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে প্রকাশ্যে মিছিল ও সমাবেশ করেছিল।'[২০]

১৬. বাংলাদেশ জিহাদি গ্রুপ

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে মাওলানা আবু জাফর ওরফে মুফতি আবু সাঈদ 'বাংলাদেশ জিহাদী গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী জঙ্গিদের আদর্শিক নেতা আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদ মাওলানা নুরুল্লাহ কাশেমী। তার ছেলে ফাহাদ এই দলের বোমা তৈরির প্রধান কারিগর। অনুসন্ধানে জানা যায় নুরুল্লাহ কাশেমীর নির্দেশে দেশের স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী, শীর্ষ বুদ্ধিজীবী এবং পরিবারের সদস্যদের 'ইসলামের শত্রু' আখ্যা দিয়ে টার্গেট করে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সংগঠিত করা হয়েছে সংঘবদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'বাংলাদেশ জিহাদি গ্রুপ'। সংগঠনের একটি পতাকাও তৈরি করে তারা।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে, 'ওসামা বিন লাদেনের শিষ্য এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন 'আল-কায়দার' প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলের সদস্য নূরুল্লাহ কাশেমী, তার পুত্র ফাহাদ বিন নুরুল্লাহ কাশেমী এবং আইএস এর ১ জন সহ ১০ জনকে ২০১৫ সালের ৭ জুন গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

এই জঙ্গিদের কাছ থেকে জাহাজের অ্যাঙ্গেলে বিস্ফোরক ভরা দুটি বোমা উদ্ধার করা হয়। জাহাজের একেকটি অ্যাঙ্গেলে দুই কেজি পর্যন্ত বিস্ফোরক ভরা সম্ভব এবং মুঠোফোনের মাধ্যমে এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিরা

বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ব্যবহারের কথা বলে হাটখোলা রোডের রাসায়নিক পদার্থের দোকান থেকে বোমা তৈরির জন্য রাসায়নিক সংগ্রহ করেছিলেন বলে তথ্য মিলেছে। দেড় বছর ধরে এই জঙ্গিরা 'বাংলাদেশ জিহাদি গ্রুপ' সংগঠিত করছিলেন। রিমান্ডে এই জঙ্গি দলের সংগঠকদের স্বীকারোক্তি থেকে বেরিয়ে আসে তাদের নাশকতার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত তথ্য। জঙ্গি অভিযানের জন্যে বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড হ্যাক করে বিপুল অংকের টাকা জালিয়াতির পরিকল্পনা করেছিল নুরুল্লাহ কাশেমী পিতা-পুত্রের নেতৃত্বাধীন সংঘবদ্ধ জঙ্গি দল 'বাংলাদেশ জিহাদি গ্রুপ'।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ও হরকাতুল জিহাদের (হুজি-বি)নিষিদ্ধ হবার পর তাদের সদস্যরা মিলে নতুন করে 'বাংলাদেশ জিহাদি গ্রুপ' তৈরি করেছে।

জঙ্গি কর্মকাণ্ডের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঢাকার খিলগাঁও ও সূত্রাপুর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতি, বিস্ফোরক ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে চারটি মামলা করা হয়ে। এসব মামলায় তাদের সাত দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি পায় ডিবি।

২০১৫ সালের ৮ জুন কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে, 'গোয়েন্দা হেফাজতে জঙ্গিরা জানায়, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের একটি জেলায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল দলটি। আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার ফিদা মুনতাসির প্রসঙ্গে ডিবির যুগ্ম কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় বলেন, ফিদা আইএসের শুভানুধ্যায়ী। জঙ্গি কার্যক্রমে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা ও আইএসের সঙ্গে যোগ দিতে তুরস্ক হয়ে ইরাক যাওয়ার বিষয়ে ফিদা অন্যদের সাহায্য করেছেন বলে তথ্য রয়েছে। মহানগর গোয়েন্দা দলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার জামাল পাশা জানান, ফিদা মুনতাসির পেশায় তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। তার কয়েকটি কম্পিউটার জব্দ করা হয়েছে।

'এ ছাড়া তার ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণও মিলেছে। ফিদা মুনতাসির-এর 'লিংকড ইন' প্রোফাইল থেকে জানা যায়, রাজধানীর 'আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' (এআইইউবি) থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়শোনা শেষ করেছেন তিনি। ২০১৫ সালে বেসিস আয়োজিত কোড ওয়ারিয়র চ্যালেঞ্জের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ফিদা তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২০১৪ সালের হ্যাকাথনের বিজয়ী। ২০১৪ সালে নাসা আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জেও অংশ নেন ফিদা মুনতাসির।'

১৭. জামায়াতুল মুসলেমিন

বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার পাকুল্লা ইউনিয়নের হুয়াকুয়া গ্রামে ২০০৮ সালে 'জামায়াতুল মুসলেমিন'-এর যাত্রা শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা আমির ছিলেন আবদুল্লাহ বিন শওকত। তার বাড়ি কুড়িগ্রামের ৯চিলমারীতে। তিনি মারা যাওয়ার পর বগুড়ার সোনাতলা উপজেলায় পাকুল্লা গ্রামের খালিদ বিন মুসলেমিন আমীরের দায়িত্ব পান। শুরুতে

সংগঠনটি কট্টরভাবে ধর্মীয় আমলের (আচার পালন) ব্যাপারে জোর দিত। পরবর্তী সময়ে কর্মকৌশল নিয়ে মতভিন্নতার কারণে জামায়াতুল মুসলেমিন তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে বগুড়াকেন্দ্রিক অংশটি আগের ধারায় থেকে যায়। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, খুলনা ও চুয়াডাঙ্গাকেন্দ্রিক আরেকটি ধারা জেএমবির সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলে। অপর অংশটি ঢাকাকেন্দ্রিক তৎপরতা শুরু করে। মূলত এ অংশটিই উগ্রপন্থা নিয়ে সক্রিয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জঙ্গিরা শুরুতে মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরে আহলে হাদিস মসজিদকেন্দ্রিক তৎপর ছিল। পরে বাড্ডা, ধানমন্ডি, বনানী, আজিমপুর ও মিরপুর ২ নম্বরে এ সংগঠনটির পাঠচক্র গড়ে তোলে। রাজধানীতে সংগঠনটির একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলও আছে। নিষিদ্ধ সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) অনেক সদস্য আরেক গোপন সংগঠন জামায়াতুল মুসলেমিনে যোগ দিয়েছেন। সংগঠনটির বর্তমান প্রধান এজাজ আগে জেএমবির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে আছেন। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে ৫০০ বোমা ফাটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় জেএমবি। এরপর সরকার সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান ও অন্যতম শীর্ষ নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে বিচারের পর ২০০৭ সালে শীর্ষস্থানীয় ছয় নেতার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এরপর সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে জেএমবির মধ্যম ও নিচের সারির অনেকে জামায়াতুল মুসলেমিনে যোগ দেন। ২০০৮ সালের ১৫ নভেম্বর রাজধানীর মিরপুর থেকে জেএমবির কথিত সামরিক কমান্ডার মো. হানিফ গ্রেপ্তার হন। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, বন্ধু এজাজের মাধ্যমে তারা তিনজন জেএমবি থেকে জামায়াতুল মুসলেমিনে যোগ দেন। জেএমবির প্রতিষ্ঠাকালীন শুরা সদস্য শাহেদ বিন হাফিজও এখন জামায়াতুল মুসলেমিনে আছেন। দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে জামায়াতুল মুসলেমিনের যাত্রা শুরু। পরে সংগঠনটি একাধিক ভাগ হয়ে একাংশ রাজধানীকে কেন্দ্র করে সক্রিয় হয়। এর সদস্যদের বেশির ভাগই আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের ভাবধারায় বিশ্বাসী। অনেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, জামায়াতুল মুসলেমিন নেতা ইমিগ্রেশনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ফিরেই আত্মগোপন করেছেন রিজওয়ান হারুন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সে মোস্ট ওয়ান্টেড। ২০১৭ সালের ১১ মে হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে হারুন। এর পর থেকে গোপনে কর্মী সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করছে জঙ্গি সংগঠনের এই নেতা।

রিজওয়ান হারুনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন জঙ্গি সদস্য সংগ্রহ ও জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর নেতা গোলাম মাওলাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে সে ইংরেজি মাধ্যম লেক এড গ্রামার স্কুল গড়ে তোলে। আনসার উল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান জসিম উদ্দিন রাহমানীসহ অর্ধশতাধিক নিখোঁজ, গ্রেপ্তার এবং পলাতক জঙ্গি নেতা তার স্কুলের সাবেক শিক্ষক ও

শিক্ষার্থী। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে নিহত সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া মেজর জাহিদের যাতায়াত ছিল ওই গ্রামার স্কুলে।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রিজওয়ানের ওপর প্রতিবেদন পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে এ বিষয়ে আনইগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। পাশাপাশি রিজওয়ানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে একাধিক প্রতিবেদন জমা পড়ে। প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায়, যুক্তরাজ্যের নিষিদ্ধ সংগঠন জামায়াতুল মুসলিমীনের আমির শেখ আবু ঈসা আল রাফায়ের প্রভাবে জঙ্গিবাদে জড়ায় রিজওয়ান হারুন। ২০০২ সালে বাংলাদেশে জামায়াতুল মুসলিমীনের দায়িত্ব নেয় রিজওয়ান। এরপর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে। এসব শিক্ষার্থীর কলাবাগানে অবস্থিত তার কারাতে একাডেমিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জঙ্গিবাদে জড়ানোর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে বেশি। মালয়েশিয়ায় পলাতক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. রেজাউর রাজাও তার সংগঠনে জড়িত বলে জানা গেছে।

জঙ্গিনেতা রিজওয়ান হারুন গ্রেপ্তার : ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডির (রোড নং-৬/এ) ঈদগাহ মসজিদের সামনে থেকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জামাতুল মুসলিমিনের (জেএম) জঙ্গিনেতা রিজওয়ান হারুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রিজওয়ান বাংলাদেশের কালো তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুসলিমিনের প্রত্যক্ষ মদদ দাতা এবং বিতর্কিত লেকহেড গ্রামার স্কুলের সাবেক মালিক।

যুগান্তর ও সাপ্তাহিক 'একদুইতিন' পত্রিকার তথ্য অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এই সংগঠনের সদস্যরা জঙ্গি কার্যক্রম দ্রুত বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারই কার্যক্রম হিসেবে রিজওয়ান ২০০৬ সালে লেকহেড গ্রামার স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা লতিফ আহম্মেদের কাছ থেকে কিনে নেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি এখানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মস্তিস্কে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্পর্কে জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এই স্কুলটি আসামি রিজওয়ান জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করতেন।

এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অবগত হলে রিজওয়ান কৌশলে ২০১৭ সালে অপর আসামি খালেদ হাসান মতিনের কাছে লেকহেড গ্রামার স্কুলটির স্বত্ব বিক্রি করে আত্মগোপনে চলে যান। ২০০৫ সালে জামাতুল মুসলিমিনের কার্যক্রম আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরে এলে সংগঠনটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়।

রেজওয়ান ব্রিটেনে থাকা অবস্থায় জামায়াতুল মুসলেমিন নেতা আবু ইসা আল রাফাই (জর্ডান থেকে ব্রিটেনে বসবাসকারী) এর মাধ্যমে সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত হন। ২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশে তিনি জামায়াতুল মুসলেমিন সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। সর্বশেষ জামায়াতুল মুসলেমিনের আমির ছিলেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. রেজাউর রাজ্জাক। গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার পর ড. রেজাউর রাজ্জাক মালয়েশিয়া পালিয়ে যান।

এদিকে, ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে রেজওয়ানকে আইনের আওতায় আনার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই চিঠির আলোকে ৬ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উপ-সচিব হাবিব মো. হালিমুজ্জামান স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনা দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশ সদর দফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

২০১৪ সালের ১৭ আগস্ট প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৩ সালে জুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জঙ্গি প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটিতে উত্থাপিত এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এ দেশে তৎপর 'জঙ্গি সংগঠনের' যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তাতে 'জামায়াতুল মুসলেমিনের' নাম রয়েছে। এর আমির হিসেবে রেজাউল রাজ্জাকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রেজাউল রাজ্জাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ঢাকার বনানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। রেজাউল রাজ্জাক ২০১০ সালের জুন থেকে আর সেখানে নেই। চাকরির নথিতে তার স্থানীয় কোনো ঠিকানা নেই। আমেরিকার একটি ঠিকানা দেয়া আছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া তিন জঙ্গির একজন জিজ্ঞাসাবাদে রেজাউল রাজ্জাকের নাম বলেছেন। তিনি এখন মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন। 'জামায়াতুল মুসলেমিনের' একটি সহযোগী সংগঠন হচ্ছে 'রিসার্চ সেন্টার ফর ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট' (আরসিইউডি)। রাজধানীর ধানমন্ডিতে এর কার্যালয় ছিল। এটি দেশি-বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজ করত। আরসিইউডির কার্যক্রম এখন বন্ধ আছে। এর চেয়ারম্যান ছিলেন মো. আবদুর রশিদ চৌধুরী। তিনি বলেন, আরসিইউডির মূল উদ্যোক্তা রেজাউল রাজ্জাক। তবে রেজাউল কাগজপত্রে কোনো পদে ছিলেন না। আরসিইউডি ও 'জামায়াতুল মুসলেমিনের' কেউ কেউ ইয়েমেনে গিয়ে আল-কায়েদা নেতা আনোয়ার আওলাকির (২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় নিহত) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশি তিনজন নাগরিক তেহজীব করীম, মাঈনুদ্দিন শরীফ ও তার ভাই রেজোয়ান শরীফ ২০১০ সালের শুরুতে ইয়েমেনে আল-কায়েদাবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার হন। ছয়-সাত মাস জেল খেটে পরে দেশে ফেরেন। এই তিনজনই আরসিইউডির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তখন আবদুর রশিদ স্বীকারও করেন। তেহজীব করীম তার মেয়ের জামাই। তেহজীবের ভাই রাজীব করিম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে বোমা হামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে লন্ডনে গ্রেপ্তার হন। দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিনি এখন যুক্তরাজ্যের কারাগারে সাজা ভোগ করছেন।'[২১]

১৮. হিলফুল ফুযুল আল ইসলামী বাংলাদেশ

২০০৩ সালে 'হিলফুল ফুযুল আল ইসলামী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশজুড়ে সিরিজ বোমা হামলার ছক কষছে এমন খবরের মাধ্যমে 'হিলফুল ফুযুল আল ইসলামী বাংলাদেশ' নামে একটি উগ্রপন্থি সংগঠন দেশ জুড়ে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। কয়েকটি উগ্রপন্থি সংগঠনের সঙ্গে মোর্চা করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় গ্যাসবোমা ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল সংগঠনটি।

বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং সরকার উৎখাত করতে জোট বেঁধেছে দেশি-বিদেশি ২৮ সংগঠন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও ইসলামপন্থী আরো সাতটি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে। অন্যগুলো ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী সংগঠন। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও পারস্পরিক স্বার্থে এক হয়ে 'হিলফুল ফুজুল আল ইসলাম আল বাংলাদেশ' নামে কাজ করছে তারা। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান ঘিরে পরিকল্পনা আঁটছে তারা। কৌশলগত স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নাশকতা চালিয়ে সরকারকে কাবু করতে চাইছে এ জোট।

ওই জোটে বাংলাদেশের যে সংগঠনগুলো সক্রিয় রয়েছে সেগুলো হলো– জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ-বি, হিযবুত তাহরীর, হিজবুত তাওহীদ, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, শহীদ হামজা ব্রিগেড ও দাওয়াতে ইসলাম।

পাকিস্তানের সংগঠন জামাত-আল-পাকিস্তান এবং ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে সক্রিয় পাকিস্তানের মদদপুষ্ট সংগঠন জইশ-ই-মুহাম্মদও এই জোটে রয়েছে। জোটভুক্ত ভারতীয় সংগঠনগুলো হলো– জুম্ম হিজাব-উল-মুজাহিদিনি, হরকাতুল জিহাদ-আই ও উলফা। পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতে সক্রিয় লস্কর-ই-তৈয়বাও এই জোটে রয়েছে। মিয়ানমারের সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) ও আরাকান আর্মি। আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখাও (একিউআইএস) এ জোটের প্রভাবশালী সদস্য।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আঞ্চলিক সহায়তা দানের ক্ষেত্র তৈরি করে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে জঙ্গি-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো যাতে অন্য দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে না পারে সে জন্য সরকার বেশ কিছু পরিকল্পনা নেয়। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে আটক উলফা নেতাদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে উলফাসহ ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন সংগঠনের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এতে সরকারের ওপর নাখোশ হয় উলফা। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসও এবং আরাকান আর্মির ঘাঁটি নির্মূলেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এতে এসব সংগঠন ক্ষুব্ধ হয়। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকর করায় পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোও ক্ষিপ্ত হয় সরকারের ওপর। এই সম্মিলিত ক্ষোভ থেকেই সরকার উৎখাত করতে জোট বেঁধেছে ওই ২৮টি সংগঠন।

২০১৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সমকাল পত্রিকায় এক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'উগ্রপন্থি সংগঠনের কার্যকলাপ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার অত্যন্ত কঠোর। মহাজোট সরকার ক্ষমতার আসার পর জঙ্গিদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়। এরপরও কিছু কিছু জঙ্গি সংগঠন নামে-বেনামে গোপনে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তাদের মধ্যে 'হিলফুল ফুযুল আল ইসলামী বাংলাদেশ' একটি।

'নবগঠিত উগ্রপন্থি জোটের পরিকল্পনায় রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর উড়িয়ে দেওয়া, সারাদেশে আবারও সিরিজ বোমা হামলা, সশস্ত্র জিহাদি আন্দোলন পরিচালনা, পোশাকশিল্পে বড় ধরনের নাশকতা, বড় কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো, ব্লগার ও সাংবাদিকদের টার্গেট করে হামলা। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলারও পরিকল্পনা করছে তারা।'[২২]

হিলফুল ফুযুলের ব্যানারে যেসব সংগঠন জোটবদ্ধ হয়েছে সেগুলো হলো- দাওয়াতে ইসলাম, হিযবুত তাওহীদ, হিযবুত তাহরীর, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি), হরকাতুল জিহাদ, জেএমবি, লস্কর-ই-তৈয়বা, জয়ইশ-ই-মুহাম্মদ, ইকতাদুল তুল্লাবুল মুসলেমিন, জামায়াত আল পাকিস্তান, জামায়াত-ই-আল ইসলাম, জম্মুর হিজাব-উল-মুজাহিদীন, দাওয়া কাফেলা, ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, আরাকান আর্মি, আরাকান কালচারাল সোসাইটি, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল লীগ ফর বার্মা, ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান, বার্মা লিবারেশন আর্মি, আরাকান মুভমেন্ট, আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন, একিউআইএস ও ভারতের নাগা বিদ্রোহী পার্টি উলফা।

১৯. সাহাবা সৈনিক পরিষদ বাংলাদেশ

১৯৯২ সালে মাওলানা হাবিবুর রহমান 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৩ সালে লেখক তসলিমা নাসরিনের মাথার মূল্য ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে এই সংগঠন আলোচনায় আসে। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় প্রভাবশালী নায়েবে আমির, আল কায়েদা প্রধান নেতা ওসামা বিন লাদেনের শিষ্য, মৌলবাদী ইসলামী দল খেলাফতে মজলিসের সাবেক আমির, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের নীতিনির্ধারক ও এদেশের জঙ্গিদের গডফাদার মাওলানা হাবিবুর রহমানের 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ' আলোচিত একটি জঙ্গি সংগঠন। 'ইসলামী বিপ্লব' নামে উক্ত সংগঠনের একটি মাসিক মুখপত্র রয়েছে। ১৯৯৮ সালের আগস্ট সংখ্যায় আফগান ফেরত মাওলানা হাবিবুর রহমানের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এই মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে এই মৌলবাদী নেতা বলেছেন, তিনিসহ বিএপি-জামায়াত জোট সরকারের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আজিজুল হকের নেতৃত্বে নয়জন মৌলবাদী নেতা হরকাতুল জিহাদের আমন্ত্রণে আফগানিস্তানে গিয়ে কীভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা করেছেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'সাহাবা সৈনিক পরিষদ' সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হলেও ধীরে ধীরে সারা দেশে উক্ত সংগঠনের জঙ্গিবাদী কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশব্যাপি শাখা সম্প্রসারিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদার একটি ঘনিষ্ঠ সহযোগী সংগঠন। আল কায়েদার যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে

তারা অনুসরণ করে থাকে। একসময় এই সংগঠনের ব্যানারেই জঙ্গিরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিত। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশের সাথে এই সংগঠনটির আহ্বায়ক মাওলানা হাবিবুর রহমান যোগাযোগ রাখতেন। বিদেশ থেকে আনা অর্থ দিয়ে সিলেট জেলার বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়, উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের গহীন অরণ্যে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করতেন। এই সব ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের হালকা অস্ত্র, গ্রেনেড নিক্ষেপ, বোমা তৈরি এবং বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষকরা অধিকাংশই আফগান ফেরত তালেবান জঙ্গি, যারা আফগানে মাওলানা হাবিবুর রহমান এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এই সংগঠনটির সাথে আল-কায়েদা, আফগানিস্তানের তালেবান, পাকিস্তানের হরকাতুল মুজাহিদীন ও হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশসহ দেশ-বিদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

২০. দাওয়াতে ইসলামী

১৯৮১ সালে আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আক্তার কাদিরী রজবী পাকিস্তানের লাহোরে 'দাওয়াতে ইসলামী' গঠন করেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে রেজা খাঁ অনুসারীদের একটি সংগঠনের নাম দাওয়াতে ইসলামী। এ সংগঠনটি ঢাকাস্থ মাদারটেক, মুহম্মদপুর, সায়দাবাদসহ কয়েকটি এলাকায় মসজিদে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সংগঠনটি চেনার উপায় সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় সবুজ পাগড়ি ও গলায় খয়েরি চাদর। অনুসন্ধানে জানা গেছে, তাদের সংগঠনের মূল ইলিয়াস আত্তার কাদেরী নামক এক পাকিস্তানী ব্যক্তি (এ লোকটি 'মাদানী টিভি' নামে একটি টিভি চালিয়ে থাকে)। অনেক আগে কার্যক্রম শুরু করলেও ২০১২ সালে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

উইকিপিডিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সংগঠনটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে, কিন্তু তা পরিচালিত হচ্ছে পাকিস্তান থেকে। দাওয়াতে ইসলামী নামক সংগঠনটি একটি তাবলীগ জামাতের অনুরূপ সংগঠন। তাদের প্রকাশ্য কার্যক্রমঃ দাওয়াত দেয়া, বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করা, চিল্লা দেয়া (তারা চিল্লা বলে না, বলে ইস্তেমা), মসজিদে বেলায় বেলায় 'ফয়জানে সুন্নত' নামক বই পড়া ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে মাদানী টিভি পরিচালনাকারী ইলিয়াস কাদেরীর মূল টার্গেট যে লোক রিক্রুট করা সেটা খুব ভালোভাবে বুঝা যায়।

পাকিস্তানের সুন্নী বেরলভী সংগঠনের ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে, "কিন্তু লোক রিক্রুট করে পরবর্তী উদ্দেশ্য কি? আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন পাকিস্তানে বেরেলভী দলগুলো মধ্যে সবচেয়ে উগ্র সংগঠন তেহরিক। 'সুন্নী তেহরিক' নামক দলটির আবির্ভাব ঘটেছিল দাওয়াতে ইসলামী নামক এ সংগঠনটি থেকেই। মানে ইলিয়াস আত্মার কাদেরীর মুরীদ সেলিম কাদেরী মাধ্যমে দাওয়াতে ইসলামী কর্মীদের নিয়েই সৃষ্টি এ সংগঠনটি। দুটো আলাদা সংগঠন ও বেশভুষা আলাদা হয়ে গেলেও তাদের ভেতর রয়েছে পুরোপুরি আন্তঃযোগাযোগ।"

উইকিপিডিয়ায় তাদের সম্পর্কে আরো বলা আছে, এখানে একটি জিনিস অনুধাবন করা প্রয়োজন পাকিস্তানে সুন্নী তেহরিক নামক উগ্র রেজাখাঁ সংগঠনটি যে কারণেই সৃষ্টি হোক, যেহেতু বাংলাদেশে 'দাওয়াতে ইসলামী' নামক তাদের গুরু সংগঠনের কার্যক্রম আছে তাই বাস্তবতা বিবেচনা করেই উক্ত সংগঠনটির দিকে নজর রাখার দরকার। নিম্নে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো–

১) সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশলে পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্মনির্ভর দলগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত তৈরি করেছে, উদ্দেশ্য পুরো পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে রাখা। মুসলমানরাই নিজেরা নিজেদের বোমা মেরে পরস্পরকে মেরে ফেলছে। কিন্তু আমরা চাই না, বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মত পরিবেশ তৈরীর সুযোগ দেওয়া হোক।

২) দাওয়াতে ইসলামী সরাসরি পরিচালিত হয় পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানে কেন্দ্র থেকে কোনো উপায়ে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা যাচাই করার দরকার আছে।

৩) দেশি সংগঠনগুলো যাই করুক, তারা সবাই বাংলাদেশি। দেশে নাগরিকদের সবকিছু করাও সম্ভব নয়। কিন্তু যখন কোনো সংগঠন পাকিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের প্রচুর সরবরাহকারী ফান্ড (টিভি চ্যানেল চালাতে কত খরচ হয় সেটা সবার জানা) রয়েছে, সেক্ষেত্রে দেশ পাড়ি দিয়ে কার্যক্রম সন্দেহের সৃষ্টি করে। কারণ, দুইদিন পর লোকবল বাড়লে তারাও যে সুন্নী তেহরীকের বাংলাদেশ শাখা খুলবে না তার গ্যারান্টি কি?

২১. মুজাহিদ অব বাংলাদেশ

নতুন নতুন নামে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে নিষিদ্ধ সংগঠন জামাআ'তুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)। জেএমবি থেকে বেরিয়ে তাদের কিছু বিচ্ছিন্ন নেতাকর্মী ২০১৫ সালের শুরুতে গঠন করেন মুজাহিদ অব বাংলাদেশ। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, সদস্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহসহ বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মুজাহিদ অব বাংলাদেশ নামের এই সংগঠনটি নিজেদেরকে ফিলিস্তিনি সংগঠন ইন্তেফাদার আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ইউটিউব ও ফেসবুক থেকে আইএস ও ইন্তেফাদার বিভিন্ন ভিডিও ডাউনলোড করে সেগুলো দেখিয়ে নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আইএসের কথিত সফলতা তাদেরকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে নতুন করে সংগঠিত হতে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৮ সালে ফেসবুক বন্ধ করে সাইবার পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে মুজাহিদীন অব বাংলাদেশসহ জঙ্গিদের ২৩টির বেশি সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ফেসবুক ভাইবার বন্ধ থাকার পরও তারা বিভিন্ন প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। এসব জঙ্গি বিভিন্ন ছদ্মনামে জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সাইবার পেট্রোলিংয়ে জঙ্গিদের বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর পরিকল্পনার তথ্যও পাওয়া যায়। আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের দৃষ্টি

আকর্ষণ করার জন্য তারা নাশকতার কৌশল অবলম্বন করে। তাদের অনেকেই নিজেদেরকে আইএসের অনুসারী হিসেবেও দাবি করে।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সক্রিয় রয়েছে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও হিযবুত তাহরীর হুজি, মানহাজী গ্রুপ, আনসার আল ইসলাম ও জেএমবি'র আদলে 'মুজাহিদ অব বাংলাদেশ'। কয়েক বছর ধরে নতুন এ সংগঠনটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্নভাবে আল-কায়েদার ভাবধারাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠা এ সংগঠনটির সঙ্গে বস্তুত আল-কায়েদার কোনো যোগাযোগ নেই। তবে এর শীর্ষনেতাদের কেউ কেউ নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ২০১৫ সালের ২ ডিসেম্বর মতিঝিল শাপলা চত্বর সোনালী ব্যাংকের সামনে থেকে মুজাহিদ অব বাংলাদেশের ৬ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এলআইসি শাখা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য (দক্ষিণ) বিভাগ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলো, জহিরুল ইসলাম ওরফে আনসার ওরফে চূড়ান্ত লড়াই ওরফে জহির, খন্দকার রাজেশ সোবহান ওরফে রাজু ওরফে কাঁচামরিচ ওরফে আদার ব্যাপারী, আবু বকর সিদ্দিক ওরফে আবীর ওরফে মৌমাছি ওরফে নিয়মের অনিয়ম ওরফে এক টুকরো মেঘ ওরফে সাদাপাতা, আব্রাহাম আহমেদ আল-তারেক, মোরশেদুল ইসলাম ওরফে কিং মোর খান, কাজী বাপ্পী আহমেদ ওরফে সাজ্জাদ ওরফে তারিক বিন জিয়া মোল্লা আকতার মোহাম্মদ মনসুর। ওই সময় তাদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, দশটি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে জহিরুল ইসলাম এ সংগঠনের শীর্ষনেতা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ফেসবুকের মাধ্যমে এরা দ্বীনের দাওয়াতের নামে প্রথমত নামায পড়ার আহ্বান জানায়। বিভিন্ন দ্বীনি আলোচনা করে। ধীরে ধীরে ওহাবী মতবাদের দ্বারা মগজ ধোলাই করতে থাকে। পরে সম মানসিকতার কাউকে পেয়ে গেলে পর্যায়ক্রমে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে প্রশিক্ষণে পাঠায়। প্রশিক্ষণে তাদের ছুরি-চাপাতি চালনা এবং বর্শা নিক্ষেপ শেখানো হয়।

'মুজাহিদ অব বাংলাদেশ' নামের এ নব্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বড় কোনো অর্থের উৎস না থাকলেও ধীরে ধীরে ফান্ড সংগ্রহ করছে। এর সদস্যরা সাধারণত চাকরিজীবী। স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। তাদের বেতনের কিছু অংশ দিয়ে তারা সংগঠনটি চালায়। এদের মধ্যে শিক্ষিত এবং কম শিক্ষিতও আছে। এরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ ও সক্রিয়।

২২. শহীদ হামজা ব্রিগেড

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের জঙ্গিরা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নতুন নামে সংগঠিত হচ্ছে। এটা জঙ্গিদের নতুন কৌশল। এদের অন্যতম হামজা ব্রিগেড (এইচবি)। এই নামের জঙ্গি সংগঠনটি মিয়ানমারের নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সহায়তার লক্ষ্যে গঠিত। সে লক্ষ্যে এই সংগঠনের কর্মীরা

বিস্ফোরক মজুদের পাশাপাশি কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তুলছে। এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রাম নগরীর ফয়সলেক এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট-এ। সিরিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন 'মুজাহিদীন' গ্রুপের আদলে হামজা ব্রিগেড নামের এই সংগঠনটি গঠন করা হয়। এতে তিনটি সামরিক উইং রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– গ্রিন, ব্লু এবং হোয়াইট। প্রত্যেক উইংয়ে ৭ জন করে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য রয়েছে। সংগঠনটির প্রত্যেক সদস্য 'ওয়ান ম্যান আর্মি' হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বর্তমান এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এক সময় জামায়াতুল মুজাহিদীন অব বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), শাহাদাত-ই আল-হিকমা, হিযবুত তাহরীর ও আনসারুল্লাহ বাংলাটিমসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত শিবিরের নেতাদের অনেকে এখন হামজা ব্রিগেড-এর সক্রিয় কর্মী। এ পর্যন্ত হামজা ব্রিগেডের ২৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হাটহাজারী উপজেলার আল-মাদ্রাসাতুল আবু বকর, হালিশহর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার গোল্ডেন কমপ্লেক্স ভবন এবং বাঁশখালীর লটমনি পাহাড়সহ তিনটি আস্তানা সনাক্ত করা হয়েছে এই সংগঠনের। এই সংগঠনের যে ২৮ জন নেতাকর্মী গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সক্রিয় কর্মী রয়েছে।

'হামজা ব্রিগেড' দেশের ভেতরে নাশকতা ও ব্যাংক ডাকাতি এবং দেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক উগ্রপন্থী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) পক্ষে কর্মী সংগ্রহ, কর্মীদের সিরিয়া পাঠানো, তাদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। সংগঠনে ১৫ থেকে ২০ জন জঙ্গি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে নামানো হচ্ছে।

২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''হামজা ব্রিগেড' জঙ্গি সংগঠনের সামরিক শাখার হোয়াইট গ্রুপের প্রধান খালেদ হাসান ওরফে রাকিব সহ যে ২৮ জন নেতাকর্মী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—এইচবি'র সেকেন্ড ইন কমান্ড নাসির প্রকাশ সজল, সদস্য শামসুল, আজিজ, ফাহাদ এবং মোজাহের। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছে বিপুল পরিমান অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। ৮টি একে-২২, ১৫টি বিদেশী পিস্তল, ৭৬টি বোমা, ৩০ প্রকার বোমা তৈরির সরঞ্জাম, বিপুল পরিমান গুলি এবং ১৫০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, যদিও চট্টগ্রামে এ সংগঠনের উত্থান কিন্তু এখন তাদের কর্মপরিধি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সিলেট-কক্সবাজার, মায়ানমারের কিছু অংশ (রোহিঙ্গাদের অবস্থান), ভারতের আসাম-ত্রিপুরা কে নিয়ে আল-কায়েদা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS) ইসলামী খেলাফত রাষ্ট্র বানানোর যে পরিকল্পনা তৈরি করছে– সে পরিকল্পনায় সার্বিক সহযোগিতা করছে 'হামজা ব্রিগেড' নামের এই জঙ্গি সংগঠন।

২৩. বাংলাদেশ ইসলামিক মুভমেন্ট (বিইএম)

বগুড়ায় নতুন একটি জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামিক মুভমেন্ট 'বিইএম' ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবির আদলে বিইএম (বাংলাদেশ ইসলামিক মুজাহীদ) নামে একটি জঙ্গি সংগঠন সারাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দিনকে দিন তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ঢাকাসহ অন্য জেলায় নাশকতার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে এই জঙ্গি সংগঠন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, তারা ভারি অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুদ গড়ে তুলেছে। সেনাবাহিনীর মতোই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত তাদের সংগঠন। রণকৌশল, স্কুল অব ইনফেনট্রি ট্যাকটিস, ইন্টারগেশন সেল ও প্লাটুন লিডারশিপ ইত্যাদি নামে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহারের কৌশলের পাশাপাশি ওইসব ভারি অস্ত্র কীভাবে তৈরি করা হয় তাও শেখানো হচ্ছে এই সংগঠনের স্কুল অব ইনফেনট্রি ট্যাকটিস শাখার মাধ্যমে। মূলত জেএমবির পলাতক জঙ্গিদের নিয়েই নতুন এই সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১৫ সালের ২৪ আগস্ট দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বগুড়ার ঠনঠনিয়ার ইয়াছিননগর এলাকায় এমনই একটি জঙ্গি সংগঠনের আস্তানা উদঘাটন করে র‍্যাব। এ সময় তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অত্যাধুনিক একটি একে-২২ রাইফেল, একটি জার্মান এসএমজি, আমেরিকান পিস্তল, ৮০ রাউন্ড গুলি, ৬০টি বিদেশী চাকু, গুলির বাক্স, দুটি একে-৪৭ রাইফেলের বেয়োনেট, বিপুল পরিমাণ দেশী ধারালো অস্ত্রসহ তাদের সংগঠনের কলাকৌশলের বিভিন্ন কাগজপত্র ও বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- ফিরোজ আলম (৩৫), নাহিদ (২২) ও বারহা শেখ বাবু (২১)। এদের মধ্যে ফিরোজ আলম দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জের একটি মাদ্রাসার শিক্ষক। ওইদিন গভীর রাতে র‍্যাব-১২ বগুড়া ক্যাম্পে গ্রেপ্তারকৃতদের হাজির করা হয় সাংবাদিকদের সামনে।

'বিইএমে'র সদস্যদের সামরিক কায়দায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সাংকেতিক ভাষায় ব্যবহার করে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করছে। ধৃত তিন জঙ্গির কাছ থেকেও উদঘাটন করা হয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

'বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়ার জবানি সরকারি প্রাথমিক স্কুল লেনে দুলালের মালিকানাধীন মেসে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা ২০১৩ সারের আগস্ট মাসের শুরুতে ওঠেন। তিন কক্ষের ওই মেসে বাইরে থেকে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখে আশপাশে আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। তারাই র‍্যাবকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়। এরকম তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে র‍্যাবের স্কোয়াড্রন লিডার মীরান আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়। মেসের প্রথম কক্ষে প্রবেশের পর র‍্যাব দ্বিতীয় কক্ষে বেশ কয়েকজনের উপস্থিতির বিষয়টি আঁচ করতে পারে। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পায় সেখানে ১৪-১৫ জন গোল হয়ে বসে আছেন। একজন ব্যক্তি মাঝখানে বসে

তাদের তালিম দিচ্ছেন। এ অবস্থায় গোল হয়ে বসে থাকা কয়েক ব্যক্তি র‍্যাব সদস্যদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কয়েক ব্যক্তি র‍্যাব সদস্যদের কিল, ঘুষি ও কামড় দেয়। এর মধ্যে ওই কক্ষ থেকে এক ব্যক্তি অন্য একটি দরজা দিয়ে তৃতীয় কক্ষে চলে যায়। সেখান থেকে একটি কালো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। র‍্যাবের এক সদস্যের সঙ্গে ওই ব্যক্তি ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে কক্ষে জানালার গ্রিল খুলে অন্যরা পালাতে থাকে। উপস্থিত র‍্যাব সদস্যরা কালো ব্যাগ বহন করা ব্যক্তিসহ ৩ জনকে আটক করে। ব্যাগ খুললে সেখান থেকে এসব ভারি অস্ত্র ও গোলাবারুদ বেরিয়ে আসে।

'গ্রেপ্তার হওয়া নাহিদ জানিয়েছেন, ঢাকার কমলাপুরে তার বাসা। শিবু নামে এক ব্যক্তি ৫ দিন আগে তাকে বগুড়ায় নিয়ে আসে। মেসে তাকে বাজার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মাঝে মধ্যে মেসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সে অংশ নিয়েছিল। তবে বৈঠকে যেসব কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়, তা তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। অপর জঙ্গি বারহা শেখ বাবু দাবি করেছেন, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে আবদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি তাকে সেখানে নিয়ে আসে বিভিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। এ জন্য তাকে টাকাও দেয়া হবে বলে জানায়। তবে যে ব্যক্তি তাকে মেসে এনেছিলেন, তাকে তিনি আর দেখতে পাননি। মেস থেকে বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় লেখা বেশ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ইলম, কায়দা ও এই তিন নামে তিনটি শ্রেণি রয়েছে। বিইএম নামে সংগঠনটির 'লেভেল ওয়ান পঠানো পরিকল্পনা' বইয়ের ঠিকানা দেয়া হয়েছে বিটিআই ভিলা, ৩৪/৭-এ, গোলাপবাগ, ঢাকা।'[২৩]

২৪. আল-কায়েদা ইন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS)

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি ২০১৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা 'আল-কায়েদা ইন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS)' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'একিউআইএস'-এর প্রধান নেতা হিসেবে পাকিস্তান জঙ্গি-সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'হরকাতুল মুজাহিদীনে'র নেতা মাওলানা আসেম ওমরের নামও ঘোষণা করা হয়। এ-শাখা গঠনকে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারতের আসাম, গুজরাট, আহমেদাবাদ ও কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য 'আনন্দের খবর' বলে অভিহিত করেন আয়মান আল-জাওয়াহিরি। জাওয়াহিরি উক্ত ঘোষণায় ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনকে মেনে না নেওয়ার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করেছেন। ভিডিও বার্তায় জাওয়াহিরীর পাশাপাশি 'AQIS' প্রধান মাওলানা আসেম ওমররা আরবির পাশাপাশি উর্দুতেও প্রদান করেছেন। কারণ পাকিস্তান ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশ এমনকি মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীও যেন এর ভাষা বুঝতে পারে।

'AQIS' শাখা ঘোষণা করার পরপরই-বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ ভারতের কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার উদ্দেশ্যে তৎপরতা শুরু করে। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া, রামু, নাইক্ষণছড়ি, পার্বত্য জেলার বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, নো-ম্যান্স ল্যান্ড, চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, বারৈয়ার হাট, সীতাকুণ্ড, মিরেরসরাই, ফটিকছড়ি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের খাগড়াগড়, বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, ত্রিপুরা, মিজোরাম, ঝাড়খন্ড ও মিয়ানমারের আরাকান ও মন্ডু অঞ্চল নিয়ে 'গাজওয়ায়ে হিন্দ' নামে একটি তথাকথিত ইসলামিক ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'একিউআইএস-বাংলাদেশ' শাখার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে। 'গণকমিশন'-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে- জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ (হুজি) ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) এর নতুন-পুরনো সদস্যরা 'একিউআইএস' বাংলাদেশ শাখার নামে তৎপরতা আরম্ভ করেছে। আল কায়েদার এই শাখা তিন ধাপে তাদের কর্মী সংগ্রহ করছে। তার মধ্যে 'দ্বীন কায়েমের সাথী', 'বায়াতে ফিছাবীলিল্লাহ' ও 'শহিদী কাফেলা', আল্লাহর পথে 'দাওয়াতি কার্যক্রম' চালাতে প্রাথমিকভাবে মগজ ধোলাই শুরু করা হয়।

ভারত-বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার নিয়ে AQIS জঙ্গিদের মহাপরিকল্পনা : গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে- ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি ৪০ পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা 'আল-কায়েদা ইন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস)' বাংলাদেশ শাখা এবং 'ইসলামিক ল ফোর্স অব হিন্দুস্তান' নামের দুটি জঙ্গিজোট।

পরিকল্পনা গুলোর মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি ১৮টি, মধ্যমেয়াদি ১৩টি ও স্বল্পমেয়াদি ৯টি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে উক্ত জঙ্গিজোট তাদের জঙ্গিবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের গ্রহণ করা পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

(ক) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে– ২০২৩ সালের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালিয়ে নিজেদের উপস্থিতি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোকে জানান দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা, কর্মী সংগ্রহ করা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সামরিক বাহিনীতে নিজেদের অনুগতদের টার্গেটভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া।

(খ) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে– চূড়ান্তভাবে সশস্ত্র হামলার জন্য সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, অস্ত্র-যুদ্ধযান ক্রয় করা, জিহাদের জন্য নিজেদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা, বিশ্বস্ত-আত্মঘাতী সৈনিক (মুজাহিদ) তৈরি করা, কওমি-আলিয়া মাদ্রাসাসহ সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দাওয়াতের মাধ্যমে নিজেদের জোটে সম্পৃক্ত করা।

(গ) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে– আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারকে নিয়ে ইসলামিক স্টেট (ইসলামিক সাম্রাজ্য) গঠন

করা। তিন দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে ৭টি, মিয়ানমারকে ১৪টি এবং ভারতকে ২১টি সেক্টরে ভাগ করে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশের ৭ সেক্টর হলো– (১) কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া, রামু, নাইক্ষ্যণছড়ি ও মহেশখালী। (২) চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, বারৈয়ার হাট, সীতাকুণ্ড, মিরেরসরাই, ফটিকছড়ি, পটিয়া ও বাঁশখালী। (৩) রাজধানী ঢাকা হবে তাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র। এর মধ্যে থাকবে পল্টন, বাংলাবাজার, কামরাঙ্গীর চর, লালবাগ, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ি, বাড্ডা, বনশ্রী, টঙ্গি, সাভার, গাজীপুর, কেরাণীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ। (৪) ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে ভালুকা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ সদরসহ টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা। (৫) সিলেট বিভাগ, হবিগঞ্জ, সিলেট সদর ও মৌলভীবাজার। (৬) রংপুর জেলার রংপুর সদর, কুড়িগ্রাম, নন্দীগ্রাম, দিনাজপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁ, নাটোর ও বগুড়া। (৭) বরিশাল ও খুলনা সদর, সাতক্ষীরা, যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, খাগড়াগড়, মিজুরাম, বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, ঝাড়খন্ড, মুর্শিদাবাদ, বিহার। পরবর্তীতে কলকাতা, গুয়াহাটি ও রাঁচির মতো রাজধানী শহরগুলোতে আত্মঘাতী হামলা।

মিয়ানমারের আরাকান ও মন্ডু নিয়ে একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা।

(ঘ) সরকারি যেসব স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা রয়েছে– (১) জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন ভবন, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকের যে কোনো শাখায় হামলা। (২) ঢাকা নগর ভবন, রাজশাহী নগর ভবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবন, চট্টগ্রাম কাফকো, কর্ণফুলী ৩য় সেতু, ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম আদালত ভবন। (৩) সিলেট বিমান বন্দর, শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী।

(ঙ) বেসরকারি যেসব স্থাপনা হামলার পরিকল্পনা রয়েছে– (১) দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ প্রতিদিন, '৭১ টেলিভিশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, এটিএন নিউজ, এবিসি রেডিও কার্যালয়সহ আরো কয়েকটি পত্রিকা ও মিডিয়া ভবনে হামলা। (২) বিদেশি নাগরিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকার ভারতের চারটি ভিসা সেন্টারসহ ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহের ভারতীয় ভিসা সেন্টারে হামলা। (৩) ঢাকার বসুন্ধরা শপিং সেন্টার, যমুনা ফিউচার পার্কসহ দেশের অত্যাধুনিক শপিং মলগুলোতে হামলা। (৪) ঢাকা ও চট্টগ্রাম শিশু পার্ক, সাভার ফ্যান্টাসী কিংডমসহ দেশের বিনোদন কেন্দ্রে হামলা। (৫) বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারসহ নাট্যমঞ্চ ও সিনেমা হলগুলোতে হামলা। (৬) আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের যে কোনো শাখা, শিয়া মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় হামলা। (৭) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, লেখক, প্রকাশক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মুক্তচিন্তার আলেম-

ওলামা সহ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসীদের উপর হামলা। (৮) আবাসিক হোটেল, ক্লাব, বাস টার্মিনাল ও রেল স্টেশনসমূহে হামলা। (৯) চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার দরবার শরীফসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সুফী দরবেশদের মাজারে হামলা। (১০) বাংলা নববর্ষের বৈশাখী মেলা, ২১শে ফেব্রুয়ারির বই মেলা, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে হামলা।

(চ) জঙ্গিসংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর জোট গঠন করা।

(ছ) জামায়াতে ইসলামী, ছাত্র শিবির, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং মূল ধারার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও দলের সদস্যদেরকে জোটে সম্পৃক্ত করা।

২০২১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '"গাজওয়াতুল হিন্দ" বা "হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" সামনে রেখে সংগঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের জঙ্গিরা। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ-জেএমবি, আনসার আল ইসলাম ও জামা'আতুল মুজাহিদীন ইন্ডিয়া-জেএমআই একজোট হয়ে এই অপতৎপরতা শুরু করেছে বাংলাদেশে। জঙ্গিবাদ দমনে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এ অপতৎপরতা বন্ধে একসঙ্গে কাজ করছেন বাংলাদেশ-ভারত গোয়েন্দারা। ঢাকার কাউন্টার টেররিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট-সিটিটিসির দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গের ওই চার জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতার স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এসটিএফ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার মগবাজার, ইস্কাটন ও রাজাবাজার এলাকায় কয়েকটি সিরিয়াল ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে জঙ্গি সম্পৃক্ততা পেয়েছিল মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। এসময় কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা হয় শীর্ষ এক জঙ্গি নেতার মোবাইল ফোন। সেই মোবাইল ফোন থেকেই 'গাজওয়াতুল হিন্দ'-এর জন্য বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের একজোট হয়ে কাজ করা সম্পর্কিত কিছু নথি উদ্ধার হয়।'

২৫. আল তানজীম

তালেবানি কায়দায় খেলাফত রাষ্ট্র বানানোর উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে উত্তর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল-তানজীম' নামের জঙ্গি সংগঠন। এ সংগঠনের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের সদস্যদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিগতভাবে মিল থাকায় অনেকে এটিকে বাংলা ভাইয়ের জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)-এর শাখা সংগঠন বলে ধারণা করলেও আল হারামাইন নামের অপর একটি সংগঠন তাদের মূল আদর্শ বলে জানা গেছে। ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে তাদের সংযোগ রয়েছে বলে সংগঠনটির মুখপত্র 'বাতায়ন'-এ দাবি করা হয়েছে। জামায়াত-শিবির গোষ্ঠীর সঙ্গে আল-তানজীমের সম্পর্কের বিষয়টি উহ্য রেখে বাতায়নে জামায়াত-শিবিরের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামায়াত-শিবির দেশের সেরা ইসলামী সংগঠন। সংগঠনটির নীতিমালা অনুযায়ী এর সদস্যদের

ক্যাডারভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের মুখপত্র 'বাতায়ন'-এ তাদের সদস্যদের দেশে 'রাষ্ট্র বিপ্লব' সম্পন্ন করার জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানানো হয়েছে। 'বাতায়ন'- এর বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসেবে 'ইমারত গঠন' শব্দটি একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি এবং রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ার বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা জুড়ে হরকাতুল জিহাদ-এর পাশাপাশি জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন 'আল তানজীম' ও অন্য জঙ্গি গ্রুপগুলোর একাধিক আস্তানা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে। সেখানে মাদ্রাসা ছাত্রদের দিয়ে বোমা তৈরির কলাকৌশল, সামরিক কায়দায় গেরিলা প্রশিক্ষণ এবং আর্মড কমব্যাট ট্রেনিং দেওয়া হয়।

শস্য খামারের নামে সরকার থেকে পাহাড়ি জায়গা লিজ নিয়ে আল তানজিম-এর নেতারা ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। দিনের বেলায় তারা শস্য খামার কিংবা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাত দেখালেও রাতের আঁধারে সেখানে মশাল জ্বালিয়ে প্রশিক্ষণ চলে। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুমিল্লা, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাদ্রাসা ছাত্রদের এখানে এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

গোপনীয়তার মাধ্যমে সংগঠনটি বিভিন্ন মাদ্রাসায় গিয়ে সদস্য সংগ্রহ করে। পাঁচ ক্যাটাগরির সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিক সদস্যদের মাদ্রাসা কিংবা ঘরে বসে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও বাকিদের বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেশে ইসলামী বিপ্লবের জন্য 'সাইলেন্ট রেভ্যুলেশন-ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন' আদর্শকে সামনে রেখে সংগঠনটি তাদের তৎপরতা চালালেও তানজীম গ্রহণের মাধ্যমে ইনফাক্ব ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর পথে হত্যার সুযোগ সৃষ্টি হয়' বলে এর মুখপত্র 'বাতায়ন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আল তানজীমের'র ৬২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব সম্পন্ন করার দিকনির্দেশনা, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ থাকা, কঠোর কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ক্যাডারভিত্তিক গোপনীয়তার অগ্রসর, রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনার গাইডলাইন থাকা, আক্রমণাত্মক হিট এন্ড রান পদ্ধতি অনুসরণ এবং শক্তি সঞ্চয়ের পর সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বিপ্লবের লক্ষ্যে কঠোর জীবনানুশীলনের প্রয়োজনে আল-তানজীম সদস্য-সদস্যারা নিজেদের মধ্যেই বিবাহ ধারা সৃষ্টি করবে বলে 'বাতায়ন'-এ জানানো হয়েছে।

সংগঠনটি কোনো 'গোপন, নিষিদ্ধ কিংবা প্রকাশ্য' সংগঠন নয় বলে দাবি করা হয়েছে। 'বাতায়ন'-এ উল্লেখ করা হয়, 'আমরা একটি নীরব বিপ্লব সম্পন্ন করতে চাই। আমরা কোনো অপরাধী নই। আমরা ১০০ ভাগ শরিয়তসম্মত, খাঁটি, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসরমান একটি কাফেলা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল নয়। তাই আমাদের সতর্কতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। তালিম তরবিয়তের মাধ্যমে সুগঠিত সুপ্রশিক্ষিত, সুবিন্যাস্ত ও সুষমামন্ডিত জনশক্তি হিসেবে সদস্যদের গড়ে তোলা হবে। 'আল তানজীম'-এর ইসলামী বিপ্লবের জিহাদে সন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য 'বাতায়নে'-এর মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে আহবান জানানো হয়েছে।'

২০০৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ভোরের কাগজ পত্রিকায় এক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'স্মৃতিসৌধ ও মিনারে ফুল দেওয়া, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণে সম্মান জানানো পহেলা বৈশাখ উদযাপন এবং অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোকে 'আল তানজীম' শিরক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ ধরনের আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখাও শিরক বলে তাদের মুখপত্র 'বাতায়ন'-এ উল্লেখ করা হয়। মুখপত্রে জানানো হয়েছে, সংগঠনের দ্বিতীয় স্তরের সদস্য 'মুস্তাকিল সাথীদের' তানজিমী শট কোর্সে পড়ালেখা এবং জিহাদি কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এ সংগঠনের তৃতীয় স্তরের সদস্যদের জিম্মাদার ভাই নামে অভিহিত করা হয়। মূলত প্রাথমিক সদস্যদের ব্রেন ওয়াশ কার্যক্রমও জিম্মাদার সদস্যরাই করে থাকে। কিন্তু 'জিম্মাদার ভাই' কারা, তাদের কীভাবে নির্বাচন করা হয় সে ব্যাপারে তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।

'খিজিরপুর, ফেনী, ঢাকার বাড্ডা, মতিঝিল, পল্লবী, লালবাগ, মিরপুর, কাঁচপুর, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি খুলনায় দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের কাজ শুরু হয়েছে এবং ২০০৬ সালের মধ্যে এর সুফল পাওয়া যাবে বলেও 'বাতায়ন'-এ উল্লেখ করা হয়।

'প্যালেস্টাইনের উগ্রবাদী গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত 'হামাস', 'আল জিহাদ', 'কাতায়েব কাচ্ছাম', 'আল কুদস ব্রিগেড'সহ অন্য ইসলামী দলগুলোকে তারা আদর্শ হিসেবে মানলেও ইয়াসির আরাফাত এবং তার সংগঠন আল ফাতাহকে তারা চরিত্রহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে 'আল তানজীম' সদস্যদের প্রকৃত ঠিকানা না জানানো এবং বেশি দিন এক এলাকার দায়িত্ব পালন না করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। 'বাতায়ন' এ প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরমূলক লেখায় এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের জন্য দশ লাখ লোক যথেষ্ট। বলা হয়েছে তাবলীগ ও জামায়াতের বিপুল সমর্থন থাকলেও বিপ্লবের উপযোগী লোকসংখ্যা (আপাতত) কম। উচ্চতর জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি বছর এ সংগঠনের প্রায় ৫০ জন করে সদস্য দেশের বাইরে যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।'[২৪]

উগ্র মৌলবাদী সংগঠন 'আল তানজীম' সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানা গেছে, কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এখানকার কেউই তাদের প্রকৃত নাম ঠিকানা প্রকাশ করে না। তবে রাজধানী ঢাকা থেকে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। 'জিম্মাদার ভাই'র সঙ্গে সংগঠনের তৃতীয় স্তরের সদস্যরাই একমাত্র বিভিন্ন শাখাগুলোতে গিয়ে আলাপ-আলোচনা সারতে পারে। তবে প্রত্যেক সদস্যেরই বায়োডাটা কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। সকল ধরনের 'ইবাদত' একাকী এবং তা গোপন রাখা এবং দায়িত্বশীলদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রয়োজনে আদিষ্ট হলে তার কাছে ব্যক্ত করা যাবে বলে 'বাতায়ন'-এ সদস্যদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু 'দায়িত্বশীল' কে এ প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। 'আল তানজীম' এর মুখপত্র 'বাতায়ন' অনিয়মিত পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও এতে কোনো ঠিকানা

লেখা নেই। নওশের বিন আহমদকে 'বাতায়ন'-এর প্রতিষ্ঠাতা, আলী আকবর মৃধাকে পৃষ্ঠপোষক, আবদুল্লাহ মাসউদকে সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হিসেবে মুখপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তরের সদস্য 'মুস্তাকিল সাথী'দের কাছে গোপনে এ মুখপত্র সরবরাহ করা হয়।

২৮. হিযবুত তাওহীদ

২০০১ সালে দৈনিক 'বজ্রশক্তির' উপদেষ্টা ও 'দৈনিক দেশের পত্রের' সাবেক সম্পাদক বায়জীদ খান পন্নীর হাত ধরেই যাত্রা শুরু করে হিজবুত তাওহীদ। এখন আমীর মসীহ-উর রহমান এবং ঢাকার আমীর আলী হোসেন। তারা দু'জনই সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন। ঢাকার বাইরেও হিজবুত তাওহীদ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি, রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের কক্ষে যান দুই যুবক। তারা নিজেদের 'হিজবুত তাওহীদের' মুজাহিদ (সদস্য) পরিচয় দিয়ে ওই চিকিৎসককে দাওয়াতপত্র দেন। এরপর সংগঠনকে সহায়তার জন্য চাঁদা দাবি করেন। সেই অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র পেয়ে বিব্রত হন চিকিৎসক।

ওই চিকিৎসকের মতোই অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে হিজবুত তাওহীদ নামের সংগঠনটিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে রাজধানীসহ সারা দেশে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে এ সংগঠন। ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বই, ডকুমেন্টারিসহ তারা নানা প্রচারণা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এই সংগঠনের রয়েছে নিজস্ব প্রচারের জন্য দৈনিক দেশের পত্র ও বজ্রশক্তি নামের দুটি পত্রিকাও। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জঙ্গিবাদ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা এ সংগঠনের বিরুদ্ধেই মৌলবাদী প্রচারণাসহ জঙ্গিবাদের অভিযোগ আছে। 'হিজবুত তাওহীদ' বা এর অঙ্গীভূত কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর, এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ২২ জানুয়ারি জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে 'কালো তালিকাভুক্ত' সংগঠন হিজবুত তাওহীদ বা এর কোনো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সতর্ক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেসব 'সন্দেহভাজন' সংগঠন নিষিদ্ধকরণের পর্যালোচনার তালিকায় আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম 'হিজবুত তাওহীদ'। এক বছর ধরে সংগঠনটি প্রচারণার নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। দলীয় পত্রিকাসহ বিভিন্ন নামে সভা-সেমিনার করছে তারা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরসহ গণমাধ্যম অফিসে তারা তাদের প্রচারপত্র বিলি করছে। তারা সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করারও চেষ্টা করছে। তবে 'হিজবুত তাওহীদের' সংশ্লিষ্টরা বলছে, সংগঠনটির বিরুদ্ধে 'অপপ্রচার' চালাচ্ছে গণমাধ্যম। হিজবুত তাওহীদ নিষিদ্ধ বা কালো তালিকাভুক্ত সংগঠন নয়, এ সংগঠন ইসলামের জন্য কাজ করছে।'[২৫]

ইসলামী বইয়ের আড়ালে হিযবুত তাওহীদ জঙ্গিবাদের দাওয়াত ঃ বিভিন্ন ইসলামী বই বিক্রির নামে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন হিযবুত তাওহীদ দেশের সাধারণ মানুষদের তাদের দলে যোগদানের আহবান জানাচ্ছে। অথচ সংগঠনটি রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারিতে। নিষিদ্ধ ঘোষিত অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলোর মতই এ সংগঠনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড থেমে নেই।

এ সংগঠনের বেশ কিছু নেতাকর্মী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে দাজ্জাল নামক বই উদ্ধার করা হয়।

যুবকদের বেশ কিছু ইসলামী বই পুস্তক বিক্রি করতে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায়। হাতে নিয়ে দেখা যায় তার কাছে থাকা প্রায় সবকটিই উগ্র ইসলামী বই। ধর্মকে ব্যবহার করে জিহাদ, ধর্মীয় অনুশাসন, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের বিষয়ের ওপরও বই রয়েছে তার কাছে। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে 'দাজ্জাল' নামের বইটি।

এছাড়া রাজধানীতে বিভিন্ন যাত্রী পরিবহন বাসে ইসলামী বইয়ের আদলে এ সংগঠনের বই পুস্তক বিক্রি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাদের কাছে এটি জঙ্গি সংগঠন নয় উল্লেখ করে উচ্চ আদালতের একটি রিটের কাগজ দেওয়া হয়।

সংগঠনটির কর্মীরা এর আগে দাজ্জাল নামে একটি উগ্র পুস্তক বিক্রি ও বিলি করত। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসব পুস্তক জব্দ করেছেন। এছাড়া সংগঠনটির বেশ কিছু নারী সদস্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জঙ্গি দল হিযবুত তাওহীদের আমির বায়জিদ খান পন্নী তার বই 'এসলামের প্রকৃত রূপরেখা'তে লিখেছেন, 'জেহাদকে আল্লাহ এসলাম প্রতিষ্ঠার নীতি হিসেবে গ্রহণ কোরলেন।' (এসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃ. ২৮)

তিনি আরো লিখেছেন, 'নামায ঐ জিহাদের জন্য চরিত্র সৃষ্টির অনুশীলন। সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে যে অসাধারণ চরিত্রের মানুষ প্রয়োজন, সেই অসাধারণ মানুষের শারীরিক চারিত্রিক ও আধ্যাতিক গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ হল নামায। কিন্তু উদ্দেশ্য হল সেই সংগ্রাম।" (এসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃ. ২৯)

জঙ্গি দল হিযবুতের আমির আরো লিখেন, 'তাওহীদ ও জিহাদই ইসলামের মূল মন্ত্র। বাকি সব ইবাদত নামায রোযা হজ্জ যাকাত যা কিছু আছে সবই বৃথা যাবে জিহাদ না করলে।' (এসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃ. ২৯)

তিনি আরো লিখেছেন, "যে উম্মাহকে আল্লাহর রসুল (দ) হাতে তরবারি ধরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে পৃথিবীতে বের করে দিয়েছিলেন , সূফিরা সেই উম্মাহের হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে তসবিহ ধরিয়ে দিয়ে পেছন টেনে ধরে খানকায় বসিয়ে দিলেন।" ("বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ" ৩৭ নং পৃ)

জঙ্গি দল হিযবুত তাওহীদের নেতা বায়জিদ খান পন্নী আরো লিখেন, এই দীনের মর্মবাণী হল জিহাদ, কেতাল। ("বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ" ৪১ নং পৃ.)

হিযবুত তওহিদ এমন একটি জঙ্গি দলের নাম যে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। কট্টরপন্থী জঙ্গি দল হিসেবেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু জঙ্গি দলসমূহের লিস্টে নাম

আসার সাথে সাথেই শ্লোগান, লিখা, বই, পত্রিকা, সমাবেশ সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে বাহ্যিকভাবে। সরকারের আমলা ও সমাজের সকলের পরিচিত মিডিয়ার বড় বড় ব্যক্তিদের নিয়ে মিটিং সমাবেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং ধর্ম ব্যবসায়ের বিপক্ষে মুখরোচক সমালোচনা করে এখন জঙ্গি তকমা ঢাকার কূটকৌশলে ব্যস্ত।

টাঙ্গাইলের করটিয়ার গ্রামে হিযবুত তাওহীদ মোহাম্মদ বায়জিদ খান পন্নী জন্মগ্রহণ করেন। বায়জিদ খান পন্নী পরিবারের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান মুসলিম লীগে শক্ত অবস্থান তৈরী করে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বায়জিদ খান পন্নী বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে দেশত্যাগ করে প্রথমে পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যে আত্মগোপন করেন। ১৯৮০ সালে জেনারেল জিয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে বায়েজিদ খান পন্নী বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে বায়েজিদ খান পন্নীর ছোটো ভাই সেলিম পন্নী নিজেকে স্থানীয়ভাবে ইসলামী তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। বড় ভাইয়ের দেশে প্রত্যাবর্তন তাকে আরও দুঃসাহসী করে তোলে। আশির দশকের শেষ দিকে সেলিম খান পন্নী নিজেকে 'ইমামুজ্জামান' বা জগৎ এর সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম রূপে ঘোষণা করে নিজেদের আকিদা বা বিশ্বাস প্রচার করা শুরু করে। এসময় বায়েজিদ খান পন্নী নিয়মিত মধ্যপ্রাচ্য সফর করে সংগঠন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেন। ১৯৯২ সালে বায়েজিদ খান পন্নী হিজবুত তওহিদ নামে নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে এবং সংগঠনের ইশতেহার প্রকাশ করে। দলটি ইশতেহারে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এবং প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদে শারীরিক শক্তি প্রয়োগকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে। নিজেদের নিজস্ব মতধারার বাইরে সকলকেই অমুসলিম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার বিনিময়ে হলেও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞা এবং মানব সৃষ্ট সকল আইনকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে দলটি নিজেরা কট্টর জঙ্গি সন্ত্রাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালে বায়েজিদ পন্নী "This is not true Islam" প্রকাশ করে, বইতে ইশতেহারের বিষয়গুলিকে আরও যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয় ধর্মীয় বিকৃত সব যুক্তির মাধ্যমে, এমনকি ফজর ওয়াক্তের নামাজকে ফরজ হিসেবে স্বীকার না করা এবং প্রচলিত আযানকে কুকুরের ডাকের সাথেও তুলনা করা হয়েছে এই বইতে। এরপর হিজবুত তওহীদ নিজেদের সদস্যদের জন্য নামাজ পড়ার নিয়মে পরিবর্তন করে বিকৃতভাবে নামাজ পড়াকে বাধ্যতামূলক করে। এই বিকৃত নামাজের ভিডিও ইউটিউবে সহজেই পাওয়া যায়। ২০০০ সালে তারা প্রথম সহিংসতা শুরু করে বরিশালের গৌরনদীতে।

২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী (হুজি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) ও শাহাদাত-ই-আল হিকমা নামের চারটি জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ করে। দেশে জঙ্গি তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ২০০৯ সালের প্রথমদিকে দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা হিজবুত তাওহীদ ও হিজবুত তাহরীরসহ আরও আটটি সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্ত করে এবং এগুলোকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়ে স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠায়। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় উস্কানিমূলক কার্যক্রমসহ নানা অভিযোগে বর্তমান সরকার হিজবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ করে।

হিযবুত তাওহীদ ছাড়াও কালো তালিকাভুক্ত অন্য সংগঠনগুলো হচ্ছে– উলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যিনাত, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি), ইসলামী সমাজ, তৌহিদ ট্রাস্ট, তা-আমির উদ-দ্বীন বাংলাদেশ (সংগঠনটিকে হিজবে আবু ওমর নামেও ডাকা হয়) ও আল্লার দল। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে এসব সংগঠনের বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেয়। জেলা ও থানা পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দেয়। নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো ছাড়াও হিজবুত তাওহীদসহ আরও আটটি সংগঠন জঙ্গিদের মদদ দিচ্ছে বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়। এরপরই মন্ত্রণালয় থেকে এসব সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এসব সংগঠনের সঙ্গে কারা জড়িত, অর্থের জোগানদাতা কারা, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু হিজবুত তাহরীর ছাড়া কালো তালিকাভুক্ত আর কোনো সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি সরকার ।

২০০৩ সালে বরিশালেই প্রথম জিহাদি লিফলেট বিতরণ। পরবর্তীকালে বায়জিদ পন্নী "দাজ্জাল/Dajjal" নামে আরেকটি বই প্রকাশ করেন যেখানে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের দাজ্জালের দোসর আখ্যা দিয়ে এদের নির্মূলে সর্বশক্তি নিয়োগের আদেশ করা হয়েছে। ২০০৭ এর দিকে দেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চলে জেএমবি, হুজি এবং হিজবুত তওহিদ মিলিতভাবে জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে সংগঠনটি চিটাগাং প্রেস ক্লাবের সামনে জিহাদি লিফলেট বিতরণকালে তৎকালীন প্রধান রিয়াদ সহ তিন চারজন গ্রেপ্তার হয়। এরপর দলটি নিজেদের প্রচার কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনে এবং নিজেদেরকে সংস্কারমনা, সাহিত্যপ্রেমী উদার ইসলামী দল হিসেবে অনলাইনে মাঠে ময়দানে তুলে ধরতে শুরু করে। তাদের লেখা জঙ্গি সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বইগুলো গোপন করে ফেলে। তাদের পত্রিকার নাম ছিল "দেশের পত্র"। সেটা বদলে পত্রিকার নাম রাখে "বজ্রশক্তি"। দলটি এভাবে সংস্কারের মোড়কে প্রভাবিত করে প্রাথমিক সদস্য করার পর তাদের নিজেদের কট্টর মতবাদ সদস্যকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করতে বাধ্য করে।

কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 'কালো তালিকায়'ভুক্ত উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাওহীদের তৎপরতা চলছে প্রকাশ্যেই। রাজধানীতেও দিন-দুপুরে ভাসমান হকারদের মতোই তারা বিভিন্ন যাত্রীবাহী বাস, ট্রেন ও লঞ্চে উঠে এসব লিফলেট, বই, সিডি বিক্রি ও বিতরণ করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের নামে উগ্র ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের সময় সংগঠনটির কর্মীদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আটক ও গ্রেপ্তার করলেও তাদের কার্যক্রম থেমে নেই।

জঙ্গিবাদি মিশন থেমে নেই হিযবুত তাওহীদের ঃ ২০১৭ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'চট্টগ্রামে জোটবদ্ধ হয়েছে তিন জঙ্গি সংগঠন। এ সংগঠনগুলো হচ্ছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীর,

হিজবুত তাওহীদ এবং আহলে হাদিস। তাদের কাজে সমন্বয় করছে ইসলামী ছাত্র শিবির। শনিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন জঙ্গি সংগঠনের ১৭ নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে লিফলেট, জিহাদি বই এবং সাংগঠনিক নথিপত্র জব্দ করা হয়।

'ডবলমুরিং থানার ওসি একেএম মহিউদ্দিন সেলিম বলেন, ঈদগাহ এলাকার একটি লন্ড্রি দোকানে জঙ্গিরা গোপন বৈঠক করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরো ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হিজবুত তাহরীর, হিজবুত তাওহীদ, আহলে হাদিস এবং ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মী রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছি তাদের বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা ছিল। এসব জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করছে জামায়াত-শিবিরের কয়েকজন নেতা।

'ডবলমুরিং থানার ওসি (তদন্ত) শাহাদাত হোসেন খান বলেন, 'যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এক সময় জামায়াত কিংবা শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানেও কয়েকজন জামায়াত ও শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।'

সংগঠনটির ওয়েব সাইট ঘেঁটে দেখা গেছে এর প্রতিষ্ঠাতা টাঙ্গাইলের করটিয়া এলাকার বায়াজীদ খান পন্নী নামক এক ব্যক্তি। ১৯৯৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি হিযবুত তাওহীদ নামক এই সংগঠনের জন্ম দেন। এবং নিজেকে সংগঠনটির সর্বোচ্চ নেতা ও 'এমামুযযামান' হিসেবে অভিহিত করেন। ২০০৮ সালে তিনি দাবি করেন, বিশেষ এক 'মোজেজা'র মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নাকি নিজেই তাঁকে 'এমামুযযামান' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং 'হিযবুত তাওহীদ'কে বর্তমান সময়ের একমাত্র সত্যাশ্রিত দল হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি বায়জীদ খান পন্নী নামক কথিত এ এমামুযযামানের মৃত্যু হয়। তাঁর পরে 'হিযবুত তাওহীদে'র 'এমাম' হিসেবে দায়িত্বে আসেন হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম নামক এক ব্যক্তি। সংগঠনটির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় এই লোক নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার পোরকরা গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৭২ সালে জন্ম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিসিএস' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার দাবি করলেও অ্যাকাডেমিকভাবে ধর্মীয় কোনো পড়াশোনা নেই তার। তাছাড়া ২০২০ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা গেছে এই লোক একটি মুদি দোকানের দোকানদারি করছেন। এই ছবি যারা ছড়িয়েছেন, তাদের দাবি, বছর দশেক আগে তিনি মুদি দোকানদার ছিলেন। মুদি দোকানের ব্যবসা থেকে বছর কয়েকের ব্যবধানে কীভাবে তিনি 'হকপন্থী' 'একমাত্র' ধর্মীয় সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে উঠলেন।

বর্তমানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত বক্তব্য-বিবৃতি দিলেও ২০১৪ সালে উগ্রবাদ ও নানামাত্রিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল হিযবুত তাওহীদ নামক এই সংগঠন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরকারি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন সম্পৃক্ত না হন, সে-ব্যাপারে কয়েক বছর আগে একটা নির্দেশনাও এসেছিল সরকারের তরফ থেকে। ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদ থেকে একটি চিঠির মাধ্যমে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। এরপরে ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে 'কালো তালিকাভুক্ত' সংগঠন হিজবুত তাওহীদ বা এর কোনো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সতর্ক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২০২১ সালের ডিসেম্বর হিযবুত তাওহীদের এবারের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল– "ব্যর্থ বিশ্বব্যবস্থা: যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির বিকল্প নেই।" যে কালবৈশাখী ঝড়ের আগমনী সংকেত আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, তা বোঝার মত জ্ঞান অধিকাংশ মানুষেরই নেই। তবে আল্লাহর রহমে হিযবুত তাওহীদের সদস্যরা গাফেল নন। তাদের দৃষ্টি আছে, বিবেক আছে, চিন্তাশক্তি আছে। তাদের নেতা আছে, ঐক্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, আনুগত্য আছে এবং সংগ্রামী চেতনা আছে। ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো- জাতির সঙ্গে হিযবুত তাওহীদের অঙ্গীকার আছে। জাতি যদি আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা বলে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই এই জাতির ক্ষতি করার। সুতরাং, এখন সময় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার, জাতিকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দেওয়ার। ২০২২ সাল হবে জাতির ঐক্যের বছর, প্রস্তুতির বছর– এই লক্ষ্য নিয়ে হিযবুত তাওহীদের সদস্যরা মাঠে ময়দানে সর্বস্ব উজাড় করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

২৯. বাংলাদেশ খতমে নবুওয়াত

১৯৯২ সালে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন নাম দিয়ে জামায়াত সমর্থনকারীরা খতিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

বাংলাদেশে কাদিয়ানী বিরোধী খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সূচনা হয় বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে তথা পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে। জাতীয় মসজিদের সাবেক খতিব মওদুদীবাদী জামায়াতপন্থী মওলানা ওবায়দুল হকের হাত দিয়ে এদেশে সৃষ্টি হয় এই আন্দোলনের। জামায়াতপন্থী ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত এ দলে পরে যোগ দেন কওমিপন্থী দেওবন্দী উগ্রবাদী ইসলামী সংগঠনগুলো। এ খতমে নবুওয়াত আন্দোলনে কুয়েত, মিশর, আরব আমীরাত, বাহরাইন, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও সৌদি আরবের কয়েকটি বেসরকারি ইসলামী এনজিও সংস্থা কোটি কোটি টাকা যোগান দিতেন। অর্থের ভাগ বণ্টনে হেরফের হওয়াতে উগ্র দেওবন্দী কওমিরা নিজস্ব খতমে নবুওয়াত আন্দোলন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় তারা ফলও পেয়েছে ২০০৪ সালের ৮ জানুয়ারি কাদিয়ানীদের সকল প্রকাশনা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। এই

আন্দোলনের নেতা কওমি উগ্র আলেম সম্প্রদায়রা কয়েক দলে বিভক্ত। শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ও মহিউদ্দিন খান, ফজলুল হক আমিনী, চরমোনাই পীর ফজলুল করিম, মাহমুদুল হাসান মমতাজি, নূর হোসাইন নূরানীর নেতৃত্বে ৫ দলে পরিণত হয়েছে।

শায়খুল হাদিস আর মহিউদ্দিন খানের নেতৃত্বে তাহফুজে খতমে নবুয়ত আন্দোলনটি আর্থিকভাবে খুবই শক্তিশালী। যার কারণে অন্যান্যরা তাদের দলে যোগ দিলেও অর্থ-অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বারবার। কারণ সৌদি আরব ও আরব বিশ্বের টাকা আসে মহিউদ্দিন খানের মাধ্যমে। অন্যান্যদের জন্যও বাহিরের রাষ্ট্র থেকে সাহায্য আসত কিন্তু কম। যার কারণে নদী ভাঙনের মত খতমে নবুওয়াত আন্দোলনটি ভাঙতে ভাঙতে ৫ দলে এসে ঠেকেছে।

জাতীয় মসজিদের খতীবের নেতৃত্বে মওদুদীবাদী জামায়াত সমর্থকদের খতমে নবুওয়াত আন্দোলনকারীদের সৃষ্টি লগ্ন থেকে উদ্দেশ্য হল আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করে নির্বিচারে হত্যা করে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, যেমন– পাকিস্তানে মওদুদীপন্থীরা শত শত আহমদিয়া নারী-পুরুষ হত্যা করেছিলেন। সেই সাথে বাইরের দাতাদের সাহায্য-সহযোগিতা দু'হাতে লুফে নিয়ে নিজেদের ইসলামী দল নামধারী দলীয় সংগঠনের হাতকে শক্তিশালী করা। আর কওমি উগ্র পন্থিদের মধ্যে শায়খুল হাদীস ও মহিউদ্দিন খানের গঠিত দলেরও উদ্দেশ্য আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করা। সেই সঙ্গে দাতাদের অঢেল অর্থ ভোগ করা কিন্তু ফজলুল হক আমিনী, চরমোনাই পীর, মোমতাজি ও নূরানীদের খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী আদৌ সমর্থকরা কর্মীরা পর্যন্ত জানে না। আমিনী চেয়েছিলেন নিজেকে মুসলিম বিশ্বে একজন নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। যাতে দাতাগোষ্ঠীরা তার মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করে দেন। যার কারণে আমিনীর আন্দোলনকারীরা যত্রতত্র সহিংসতা-উগ্রতা ছড়াত।

১৯৯৩ সালে খতমে নবুয়ত পুনরায় গঠিত হয় ঢাকার মিরপুরের জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসায় মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমীর নেতৃত্বে। তখন তাদের কর্মকাণ্ড মূলত আহমদীয়াবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় সীমাবদ্ধ ছিল। পরে আরজাবাদ মাদ্রাসায় '৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ দিনের খতমে নবুওয়াতের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে আসেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের তৎকালীন সাংসদ কট্টরপন্থি মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিউনিটি। তিনি পাকিস্তানে আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলনের কারণে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে 'কাদিয়ানী আস্তানা বিজয়ী' হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন।

প্রথম প্রতিষ্ঠিত খতমে নবুয়াতের আমীর হলেন বায়তুল মোকররম মসজিদের সাবেক খতিব মাওলানা উবায়দুল হক। তিনি ১৯৯৩ সালে এই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'মজলিশে তাহফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশ' ঘোষণা করেন। তিনি নিজে এর আমীর হন।

২০০৫ সালের ২ জুন প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'খতমে নবুওয়াতের নামে পরিচালিত আন্দোলনের শেঁকড় যে পাকিস্তানে, তার প্রমাণ

মেলে খতিব উবায়দুল হকের পাকিস্তান ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য খতিব উবায়দুল হক ১৯৯৩ সালে পাকিস্তান যান এবং সেখানকার ধর্মীয় উগ্রপন্থি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত সম্মেলনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে '৯৩ সালের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের দৈনিক 'ডেইলি পাকিস্তান' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংবাদে বলা হয়, করাচিতে খতিব উবায়দুল হককে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন 'জামায়াতে ইসলামী করাচির' আমীর মাওলানা মোঃ আনোয়ার ফারুকী, 'খতমে নবুওয়াত' মোবাল্লেগ মাওলানা মোঃ নজর ওসমানী ও হাফেজ মোঃ হানিফ নাদিম।

'ওই সফরে খতিব উবায়দুল হক মজলিশে তাহাফুজে খতমে নবুওয়াত পাকিস্তানের নায়েবে আমীর মওলানা মোঃ ইউসুফ লুধিয়ানী, বিচারপতি তাকি ওসমানী, মাওলানা মোঃ রাফি ওসমানী, ডাঃ হাবিবুল্লাহ বখতিয়ারের সঙ্গে ঢাকার সম্মেলনের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে এক মহাসমাবেশে পাকিস্তান থেকে আগত নেতারা বক্তৃতা করেন। সাবেক খতিব উবায়দুল হক বলেছেন, ঢাকায় খতমে নবুওয়াতের ওই মহাসমাবেশের বিষয়ে আলোচনার জন্য '৯৩ সালে তিনি পাকিস্তান সফর করেছিলেন। এর পর খতমে নবুওয়াতের আরেকটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের নেতা মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের নেতৃত্বে। বর্তমানে তৎপর মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজির নেতৃত্বে 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওযাত মুভমেন্টের' সঙ্গে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার গ্রান্ড আজাদ হোটেলে আয়োজিত 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের' এক সংবাদ সম্মেলনে মাওলানা মমতাজিকে মঞ্চের পেছনের সারিতে বসে থাকতে দেখা যায়।

'২০০৩ সালের তেজগাঁও রহিম মেটাল জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজি নতুন সংগঠন "খতমে নবুওয়াত আন্দোলন সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ' গঠন করেন। এ সংগঠনের নামে মাওলানা মমতাজির নেতৃত্বে প্রথম আহমদীয়াবিরোধী জঙ্গি কর্মসূচি পালিত হয় ২০০৩ সালের ২১ নভেম্বর। ২০০৪ সালের প্রথম দিকে ওই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে দেয়া হয় 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট বাংলাদেশ'। তাতে মাওলানা মমতাজি নিজে আমীর হন।

'বর্তমানে মাহামুদুল হাসান মমতাজি ও নূর হোসাইন নূরানী নেতৃত্বাধীন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়্যত মূভমেন্ট-এর কাজ হলো ইসলামের নামে সহিংসতা-উগ্রতা-সন্ত্রাস ছড়ানো। লাঠি মিছিল আর কাফন মিছিলের মাধ্যমে মানুষের মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা। সেই সাথে বাইরের দাতাদের মন জয় করা, বিদেশি দাতাদের দৃষ্টি ফেরানো একথা জানিয়ে দেয়া যে, এ মুহূর্তে তারাই কেবল আন্দোলনকারী, ইসলামী আন্দোলনের দাবিদার।'[২৬]

২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলাম লেখক আবু আফিয়া আহমদ দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের তথ্যমতে, একটি ভিডিওতে দেখা যায় বাংলাদেশের খতমে নবুওয়ত সংগঠনের নেতা মুফতি মুহাম্মদ শুয়ায়েব স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন

যে, তিনি পাকিস্তানের মুলতানে মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি প্রতিষ্ঠিত খতমে নবুয়ত সংগঠনের অবিকল (তার ভাষায় 'ফটোকপি') সংগঠন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটির পরিচয় এবং তার উদ্দেশ্য কী ছিল? মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, তিনি ছিলেন পাকিস্তানি একজন জঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া নেতা।

মঞ্জুর চিনিউটি সম্বন্ধে পাকিস্তানি পত্রিকার মন্তব্য : 'মিথ্যার ওপরই তার মিশন, ধোঁকা তার পেশা, খতমে নবুওয়তের নামে চাঁদা আদায় করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে' (দৈনিক হায়দার ১/১১/৮৮)।

উল্লেখ্য, চিনিউটবাসীরা মঞ্জুর চিনিউটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। (ইমরুজ ৭/৭/৮৯)। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর প্রচেষ্টারত পাকিস্তানের কুখ্যাত এই জঙ্গি মৌলবাদী নেতা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দৈনিক ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, সংবাদ ইত্যাদি পত্রিকায় তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। জামায়াতে ইসলামীর মৌলবাদীদের দ্বারা প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ যখন আক্রমণের শিকার হন এর পরপরই মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আবার গোপনে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তখন মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ঢাকায় এসেই খতিব উবায়দুল হক, মুফতি আমিনী ও শায়খুল হাদীস এবং জামায়াতে ইসলামী গংদের সাথে বিভিন্ন স্থানে গোপনে বৈঠকও করেছেন। যদিও এই জঙ্গি নেতা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার পরেও এদেশে এসে তার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। তার সম্পর্কে সে সময়ে দেশের পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে।

মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি যে একজন জঙ্গি নেতা ছিলেন তা খোদ পাকিস্তানেরই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তার সাক্ষ্য। পাকিস্তানের একটি দৈনিকে বলা হয়, 'মঞ্জুর চিনিউটি নিজ এলাকায় ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিষ তৈরি করে পরিবেশকে দূষিত করেছে' (দৈনিক মসাওয়াত, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৮)। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে উল্লেখ ছিল, 'মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করেছে, সে একজন ফতোয়াবাজ হিসেবে চিহ্নিত' (দৈনিক দিনকাল, ১ এপ্রিল ১৯৯৪)। কুখ্যাত এই জঙ্গি নেতার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিবিসিতে প্রচারিত উর্দু সংবাদে বলা হয়– ৪৫০ জন ধর্মীয় নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞা। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার মহররম মাসে ৪৫০ জন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার ওপর বিভিন্ন স্থানে সফরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, তারা যেন এমন বক্তৃতা না করতে পারে যার দ্বারা শান্তি শৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এই নেতাদের মধ্যে মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি অন্যতম। এ বিষয়ে পাকিস্তানের দৈনিক জং পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, 'হাফেযাবাদ জেলার মুহাররামুল হারামে ৩৩ জন আলেম ও যাকেরিনদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা। মহররম মাসে শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের ৩৩ জন আলেম ও যাকেরিনদের ওপর হাফেযাবাদ

জেলায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আলেমদের মধ্যে রয়েছেন মিল্লাতে ইসলামিয়া পাকিস্তানের সভাপতি আলস্লামা আলি শের হায়দারি (সিন্ধু), কেন্দ্রীয় সভাপতি আলস্লামা মুহাম্মদ আহমদ লুধিয়ানভি, মৌলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি (সাবেক এমপি চিনিউট) প্রমুখ।' (দৈনিক জং, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

তার বিষয়ে ইসলামী বিপ্লবী জোটের বিবৃতি হলো– 'মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে আক্রান্ত' (দৈনিক জং, লাহোর, ৬ জুন ১৯৮৬)। জঙ্গি নেতা চিনিউটি সম্পর্কে আহরারি মসজিদের খতিব মাওলানা আলস্লাহ ইয়ার আরশাদ এবং ক্বারী মুহাম্মদ আমিন গওহর প্রাদেশিক সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী চিনিউটে একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, 'মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি খতমে নবুওয়তের নাম বিক্রি করে জনগণের কাছে ভোট লাভ করেন এবং পাঞ্জাব অ্যাসেম্বিলিতে গিয়ে যে দুঃখজনক ভূমিকা পালন করেন তা গোটা মুসলমান জাতির জন্য অপমানজনক।' তিনি বলেন, 'এই ব্যক্তি ধর্মের নামে মানুষকে ধোঁকা দেয়, ফতোয়াবাজি তার একমাত্র উদ্দেশ্য।' তিনি বলেন, 'জাতির সাথে এই ধোঁকাবাজি আমরা কখনো চলতে দিতে পারি না।' মাওলানা আল্লাহ ইয়ার আরশাদ বলেন, 'মিথ্যা তার জীবনের মূল লক্ষ্য, ধোঁকা দেয়া তার পেশা এবং প্রাদেশিক সংসদে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে খতমে নবুওয়তের অনুসারীদের মাথা হেট করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'খতমে নবুওয়তের নাম ভাঙিয়ে তিনি (মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি) জাতির কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে ব্যক্তিগত ধনসম্পদ এবং জমিদারি ক্রয় করেছেন।' তিনি স্পষ্ট ভাষায় মাওলানা চিনিউটিকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, 'রাজনৈতিক ফতোয়াবাজি বন্ধ কর, নইলে তোমার সব কার্যকলাপ এবং তোমার অংশীদার জাতির সামনে প্রকাশ করা হবে' (দৈনিক হায়দার, রাওয়ালপিন্ডি, ১ নভেম্বর ১৯৮৮)।

পাকিস্তান থেকে যেভাবে নিয়মিত জঙ্গি মৌলবাদী নেতারা এদেশে এসে তথাকথিত জিহাদি বক্তৃতা দিয়ে আলোচনা উস্কে দিত, ঠিক তেমনি এদেশের জামায়াতে ইসলামীর নেতারা পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়ে আসত। যেমন– ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালের দি ডেইলি পাকিস্তান, লাহোর পত্রিকার একটি খবর ছিল– মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের আমির মাওলানা উবায়দুল হক করাচি পৌঁছে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এছাড়া নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানি মৌলবাদীরা বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন মাদ্রাসায় 'খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা করত, যার বিজ্ঞাপন তৎকালীন পত্রিকায় বিদ্যমান। যেমন– 'জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদের উদ্যোগে ১০ দিনব্যাপী খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষণ কোর্স' শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে দৈনিক ইনকিলাব। এতে উল্লেখ করা হয়– "আগামী ১ জানুয়ারি '৯৪ থেকে আরম্ভ। স্থান : জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা। প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন : কাদিয়ানীদের আস্তানা 'রাবওয়া' বিজয়ী আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন মুনাজেরে ইসলাম আলস্লামা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি" (দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩)।

আসলে এদেশকে তারা পুনরায় পাকিস্তানের রূপে দেখতে চান। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। ১৯৯৪ সালের ২০ জানুয়ারি সালে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়– 'মৌলবাদীরা একটা ইস্যু চাচ্ছিল– রক্তপাত ঘটাবার, নৈরাজ্য সৃষ্টির, সংঘর্ষ বাধাবার মতো ইস্যু। ঠিক যেমনটি করেছিল তাদের গুরু মওদুদী। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে কাদিয়ানী-অকাদিয়ানী দাঙ্গা বাঁধিয়ে হাজার হাজার নরনারী, শিশু-বৃদ্ধের প্রাণহানি ঘটিয়ে। এখানে তারা ব্যাপারটা ঘটাতে চাচ্ছে হাক্কানি আলেম বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তিকে সামনে রেখে, যারা সচেতন বা অসচেতনভাবে এতে শামিল হয়েছেন। এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য নিয়ে আসা হয় কয়েকজন পাকিস্তানি আলেম নামধারী ব্যক্তিকে। এদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভা সমাবেশে। এদের মধ্যে মশহুর একজন হলেন মাওলানা মঞ্জর আহমদ চিনিউটি। একটি জাতীয় দৈনিকে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখলাম, চিনিউটি সাহেব এখন এদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার চিনিহীন রসনা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উসকানির বিষ ছড়াচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও দেখলাম, চিনিউটি সাহেব পাকিস্তানে একজন অর্থবাজ আর 'দাঙ্গাবাজ' মাওলানা হিসেবে চিহ্নিত।

লাহোরের দৈনিক 'আকাক' পত্রিকার সম্পাদক শওকত হোসেন শওকত সম্প্রতি তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'মঞ্জুর অত্যন্ত স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী ও মাওলানা। তার সাতটি পাজেরো গাড়ি রয়েছে। ব্যাংকে আছে কোটি কোটি টাকা। পাজেরো গাড়ি পাকিস্তানে সাধারণত মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও গুন্ডাদের অন্যতম বাহন। মঞ্জুর চিনিউটি জেনারেল মরহুম জিয়াউল হকের একজন সমর্থক।' বায়তুল মোকাররমের খতিব সাহেবের এক ভক্ত মাওলানা সেদিন বললেন, পাকিস্তানি ভূত ছাড়াতে পাকিস্তানি ওঝা এসেছে, এতে দোষ কী? পাকিস্তানি ভূত বলতে তিনি কাদিয়ানীদের বুঝিয়েছেন। কিন্তু ওঝা হিসেবে যাদের আনা হলো আমার তো তাদেরকেই মনে হচ্ছে আরও বড় ভূত। প্রমাণ চিনিউটি সাহেব নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, '৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা ইসলামের স্বার্থেই বাংলাদেশে লড়াই করেছে। এ ধরনের উক্তি যিনি করতে পারেন তার ইসলাম কোন ইসলাম এবং তিনি কেমন মুসলমান তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। এরা ইয়াজিদের মতো, সিমারের মতো মুসলমান।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ জানুয়ারি ১৯৯৪)

এই খতমে নবুওয়তিদের পূর্বসূরিরা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে উদযাপন করে থাকে। যেমন এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ হয় যে, 'পাকিস্তান তাহাফফুজের ঢাকা পরাজয় দিবস পালন। পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে পালন করেছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান

সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। গত ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক জং পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, তাহরিকে খতমে নবুওয়ত (আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত) ১৬ ডিসেম্বর সারাদেশে ঢাকা পরাজয় দিবস পালন করবে। এজন্য বিভিন্ন শহরে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। 'উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতার জন্য তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত নামের সংগঠনটি পরিচিতি অর্জন করে। বাংলাদেশেও এরা তৎপর রয়েছে। এ রকম একটি ধর্মীয় সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসাবে পালনের কর্মসূচি নেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পাকিস্তানের এই উগ্র ধর্মীয় সংগঠনটি যে এখনও মেনে নেয়নি 'ঢাকা পরাজয় দিবস' পালন তারই প্রমাণ বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪)।

১৯৭১ সালে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমনভাবে এরা বিরোধিতা করেছে, ঠিক একই কায়দায় এদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর জন্য মেতে উঠেছে। সম্প্রতি পুনরায় কাদিয়ানী ইস্যু সামনে এনে এরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে।

আহমদিয়া বা কাদিয়ানীবিরোধী খতমে নবুওয়ত আন্দোলন মূলত একটি পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি-মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্যই এরা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত। এছাড়া বাংলাদেশের খতমে নবুওয়ত সংগঠন যেহেতু পাকিস্তানি জঙ্গিদের ফটোকপি তাই পাকিস্তানি জঙ্গিদের কৌশলই এরা অবলম্বন করছে। মূলত এরা এদেশের জনগণের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিকতার সব চেতনা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সব আদর্শ ও মূল্যবোধ, সব অর্জন, অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সবই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তারা গিলে ফেলতে চান শহীদ মিনার, গুঁড়িয়ে দিতে চান মহান বিজয় স্তম্ভ, নিভিয়ে দিতে চান শিখা অনির্বাণ। তারা ছিঁড়ে ফেলতে চান আমাদের গর্বের ধন জাতীয় পতাকা, বন্ধ করে দিতে চান কোটি কোটি জনতার জননন্দিত মহান জাতীয় সঙ্গীত। তারা যে কোনো উপায়ে, যে কোনো উছিলায়, যে কোনো সুযোগে চান দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে। মানুষকে বিভক্ত করতে। সংঘাত বাধাতে, দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় অন্তত কয়েক যুগ পিছনে, সাধের পাকিস্তানি আমলে, মোল্লাতন্ত্র-ফতোয়াতন্ত্র আর ইসলামের নামে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির হুকুমতে। সরকারের কাছে সচেতন মহলের আবেদন থাকবে– যত দ্রত সম্ভব এদেশে তথাকথিত খতমে নবুওয়ত নামে পাকিস্তানপন্থী ইসলামী সংগঠনগুলোর সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। এদের বিরুদ্ধে সরকারকে যেমন আরো কঠোর হতে হবে, তেমনি সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।'

তথ্যসূত্র

১. মাসিক রহমত, এপ্রিল সংখ্যা ২০০৭
২. দৈনিক সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭
৩. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি ও কার্যক্রম, প্রকাশনা ঃ জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, প্রকাশক চেয়ারম্যান, মুফতি আব্দুল হাই, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৯

৪. মাসিক জাগো কাফেলা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০০৮
৫. দৈনিক যায় যায় দিন, হাসানুল কাদির, ১৯ আগস্ট ২০০৬
৬. আফগান রণাঙ্গন থেকে বলছি, লেখক ঃ ফারুক হাসান, প্রকাশনা ঃ মিল্লাত প্রকাশনা, প্রকাশকালঃ ১৯৯৫
৭. প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৮. ১২ আগস্ট ২০২১ সারা বাংলা ডটনেট
৯. প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২১
১০. সমকাল, ৩ আগস্ট ২০১৬
১১. সাপ্তাহিক, ২ এপ্রিল ২০০৯
১২. আল ইহসান, ১০ জুলাই ২০১১
১৩. জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ কেন টার্গেট, লেখকঃ মেহেদী হাসান পলাশ, প্রকাশক ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, প্রকাশকাল ঃ ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ১২
১৪. দৈনিক যায় যায় দিন, ১৯ আগস্ট ২০০৬
১৫. প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২১
১৬. দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, ১৭ আগস্ট ২০১৬
১৭. অনলাইন পোর্টাল বার্তা বাংলা ডট কম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
১৮. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৪ মার্চ ২০১৪
১৯. সাপ্তাহিক ধাবমান, ২৫ জানুয়ারী, ২০১৫
২০. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২ মার্চ, ২০১৪
২১. দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ১৭, ২০১৪
২২. দৈনিক সমকাল, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫
২৩. দৈনিক যুগান্তর, ২৪ আগস্ট ২০১৫
২৪. দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৫
২৫. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
২৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২ জুন, ২০০৫

হলি আর্টিজান হামলা

২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে ভয়াবহ হামলার ঘটনা স্তম্ভিত করেছিল পুরো বাংলাদেশকে। একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছিল জঙ্গীবাদের বিস্তারের এক বিপদজনক মাত্রা। জঙ্গিরা হত্যা করেছিল ২০ দেশি-বিদেশি নাগরিককে; যাদের মধ্যে ৯ ইতালীয়, ৭ জাপানি, ১ ভারতীয় ও ৩ জন বাংলাদেশি।

২০১৬ সালের ১ জুলাই নব্য জেএমবির পাঁচ জঙ্গি ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে ঢুকে প্রথমে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ দেশি-বিদেশি ২২ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়া রাতভর জিম্মি করে রাখে বেকারিতে আসা বেশ কয়েকজন অতিথি ও স্টাফদের। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে পার হওয়া সেই রাত শেষে ভোরে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ইউনিটের নেতৃত্বে পুলিশ ও র‍্যাব যৌথভাবে 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' নামে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে নিহত হয় পাঁচ জঙ্গি। উদ্ধার করা হয় হলি আর্টিজান বেকারিতে জিম্মি অবস্থায় থাকা দেশি-বিদেশি অতিথি ও বেকারির স্টাফসহ প্রায় ৩৫ জনকে।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও মামলার নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, জঙ্গিদের ওই হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা– সহকারী কমিশনার রবিউল ইসলাম ও ওসি সালাউদ্দিনসহ ২২ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ৯ জন ইতালির নাগরিক, ৭ জন জাপানি, একজন ভারতীয় এবং একজন বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক। বাকি দুজন ইশরাত আকন্দ ও ফারাজ আইয়াজ হোসেন বাংলাদেশি নাগরিক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঘটনার সেই রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে পাঁচ জঙ্গি রোহান ইমতিয়াজ, নিবরাস ইসলাম, মীর সামিহ মোবাশ্বের, খায়রুল ইসলাম পায়েল ও শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল গুলশানের ৭৯ নম্বর সড়কে যান। রাত ৮টা ৪২ মিনিটে প্রথমে তিন জন ও এক মিনিট পরে দুই জন ব্যাগে অস্ত্র ও বোমা নিয়ে ওই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করেন। হলি আর্টিজান বেকারিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বিভিন্ন টেবিলে বসে থাকা বিদেশি নাগরিকদের এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে তারা। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তাদের গলায় ও শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। একইসঙ্গে বেকারির টেবিলে বসে থাকা হাসনাত করিম নামে এক ব্যক্তির পরিবার, সাত প্রকাশ নামে একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক, তাহমিদ ও তার দুই বান্ধবীকে জিম্মি করে রাখে তারা। তাদের সঙ্গে জিম্মি করে রাখে বেকারির প্রায় ১৫ জন কর্মীকে।

গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ এই হামলার দুই বছরের মাথায় ২১ জনের সম্পৃক্ততা থাকার প্রমাণ পেয়ে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় মামলার তদন্ত

সংস্থা-কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। তবে ২১ জনের মধ্যে ১৩ জন অপারেশন থান্ডারবোল্টসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য অভিযানে মারা যাওয়ায় জীবিত ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল এই মামলার যুক্তিতর্ক শেষে রায়ে আদালত ৭ আসামির মৃত্যুদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন– জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, হাদিসুর রহমান সাগর, রাকিবুল হাসান রিগ্যান, আব্দুস সবুর খান, শরিফুল ইসলাম ওরফে খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপন। মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান নামে একজনকে খালাশ দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা আদালতে আপিল করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষও খালাস পাওয়া আসামির মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল করেছেন। সবশেষ তথ্য অনুযায়ী এই মামলাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট জঙ্গিবাদ বিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। এর মধ্যে ঢাকার জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গঠিত বিশেষ ইউনিট কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট ২০টি অভিযান চালায়। এসব অভিযানে ৬৩ জন জঙ্গি নিহত হয়। হলি আর্টিজান বেকারিতে নব্য জেএমবি নামে যে জঙ্গি সংগঠনটি হামলা চালিয়েছিল, তাদের প্রায় কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের তদন্তে এসেছে, এই হামলায় জড়িত গোষ্ঠীর নাম নব্য জেএমবি; যারা ঘটনার পর নিজেদের আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস (ইসলামিক স্টেট) বলে দাবি করেছিল। ঘটনার দিন ১ জুলাই সন্ধ্যা নামতেই সেখানে চালানো হয় ইতিহাসের জঘন্যতম জঙ্গি হামলা। ভয়াবহ এ হামলায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ এবং প্রায় ১২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস জিম্মি সংকটের ঘটনায় স্তম্ভিত করেছিল পুরো জাতিকে।

ওইদিন রাত আটটার পর কয়েকবার প্রস্তুতি নেওয়া স্বত্ত্বেও স্পর্শকাতর বিবেচনায় রাতে হলি আর্টিজানে অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরদিন ২ জুলাই সকালে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো সদস্যদের পরিচালিত 'অপারেশন থান্ডারবোল্টে' অবসান হয় জিম্মিদশার, নিকেশ হয় হামলাকারী ৫ জঙ্গি। হলি আর্টিজানে হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্সসহ প্রথমে পৌঁছান গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রিপন কুমার দাস। মামলার এজাহারে ঘটনার বিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেন, ঘটনার দিন গুলশান থানার রোড নম্বর-৭১ থেকে ৯২ এবং এর আশপাশ এলাকায় পেট্রোল ডিউটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

২০২১ সালের ১ জুলাই রাত আনুমানিক পৌনে ৯টায় ওয়্যারলেসে ভেসে আসে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বেকারিতে গোলাগুলির খবর। খবর পেয়েই রাত আনুমানিক ৮টা ৫০ মিনিটে ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসআই রিপন। হলি আর্টিজানের কাছে উপস্থিত হয়ে তারা দেখতে পান, রেস্টুরেন্টের ভেতরে কতিপয় সন্ত্রাসীরা 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করছে।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ ও এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে হামলাকারীরা হলি আর্টিজানের বাইরে থাকা র‍্যাব ও পুলিশসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে দু'টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটান। এতে আহত হন বনানী থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিন ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এসি রবিউল। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দু'জনই।

রাত ১১টার দিকে র‍্যাবের পক্ষ থেকে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ঘটনাস্থল থেকে জানান র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ। তিনি ওই সময় গণমাধ্যমকে বলেন, ভেতরে অন্তত ২০ জন বিদেশিসহ কয়েকজন বাংলাদেশি আটকা পড়েছেন। ভেতরে যারা আছেন, তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমরা বিপথগামী হামলাকারীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি।

রাত ১২টায় পুলিশ, র‍্যাব ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে অভিযানে অংশ নিতে ঘটনাস্থলে আসে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর কমান্ডোরা। ভয়াবহ এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সব বাহিনী সম্মিলিতভাবে 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাস্থলের পাশ থেকে সাধারণ লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়।

রাত দেড়টার দিকে খবর আসে, জঙ্গিরা ভেতরে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। জঙ্গিরা রাতেই ১৭ বিদেশি নাগরিকসহ ২০ জনকে হত্যা করে।

পরবর্তীকালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে ২ জুলাই সকাল আনুমানিক ৭টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন জিম্মিদের উদ্ধার ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করে। ১২ থেকে ১৩ মিনিটের মধ্যেই সব সন্ত্রাসীকে নির্মূল করে ওই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরে জিম্মি থাকাবস্থায় সন্ত্রাসীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হওয়া ২০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সিআইডি ক্রাইম সিন বিভাগের সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদিসহ ভিকটিমদের ব্যক্তিগত মালামাল সাক্ষীদের মোকাবেলায় জব্দ করে নিজ হেফাজতে নেয় পুলিশ।

উদ্ধার করা জিম্মিদের বয়ান অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, জঙ্গিরা হামলার প্রথম ২০ মিনিটেই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা দেশি-বিদেশিদের গুলি করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে/গলাকেটে মৃত্যু নিশ্চিত করে। হত্যার পর ছবি তুলে অ্যাপের মাধ্যমে বাইরে অবস্থানরত নব্য জেএমবির নেতা তামিম চৌধুরী ও মারজানের কাছে পাঠায় তারা। তারা এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে, মৃতদেহের সারি মেঝেতে রেখেই খাবার খায়।

সিটিটিসির অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, প্রায় দেড় বছর আগে পরিকল্পনা এবং দীর্ঘ প্রস্তুতি শেষে নৃশংস এ হামলা সরাসরি বাস্তবায়নে দায়িত্ব দেওয়া হয় আত্মঘাতী পাঁচ জঙ্গিকে। আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস'র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেএমবি'র একটি গ্রুপ বিদেশিদের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয় ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পরবর্তীকালে 'নব্য জেএমবি' নামে পরিচিতি পাওয়া এ গ্রুপটির কথিত শুরাকমিটি গাইবান্ধার সাঘাটায় বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নেয়।

হামলার উদ্দেশ্য: দুই বছরের বেশি সময় ধরে তদন্তের পর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক হুমায়ুন কবির ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে এ মামলার অভিযোগপত্র দেন। সেখানে বলা হয়, হলি আর্টিজানে হামলার পেছনে মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গিদের।

১) কূটনৈতিক এলাকায় হামলা করে নিজেদের সামর্থ্যের জানান দেওয়া।

২) বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করে নৃশংসতার প্রকাশ ঘটানো।

৩) দেশে বিদেশে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পাওয়া এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা।

২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর ৩ ডিসেম্বর মামলার বাদী এসআই রিপন কুমার দাসের জবানবন্দি নেওয়ার মধ্য দিয়ে এ মামলার বিচার শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে সবশেষ সাক্ষ্য দেন তদন্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির।

সাক্ষ্যে তিনি বলেন, হলি আর্টিজানে হামলার আগে জঙ্গিরা বাংলাদেশে বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করে। এর অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে গাইবান্ধার বোনারপাড়া বাজার এলাকার কলেজ মোড়ে একটি বাসায় মিটিং করে প্রথমে তারা হলি আর্টিজানে হামলার পরিকল্পনা করে।

নব্য জেএমবির জঙ্গিরা ছয় মাস ধরে ওই হামলার পরিকল্পনা করে জানিয়ে পরিদর্শক হুমায়ুন বলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র বানানো।

রাষ্ট্রপক্ষে ২১১ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১৩ জনের সাক্ষ্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামিদের বক্তব্য শোনার পর উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শুনানি হয়। সব বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর রায়ের দিন ধার্য করে দেন বিচারক মজিবুর রহমান।

বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মী সকাল থেকেই উপস্থিত ছিলেন আদালত প্রাঙ্গণে। গুলশান হামলায় যেসব দেশের নাগরিকরা নিহত হয়েছিলেন সেসব দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তারাও রায় শুনতে আদালতে এসেছিলেন।

এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১ জুলাই ২০১৬: এই মামলার বাদী এসআই রিপন কুমার দাস গুলশান থানার ৭১ নং রোড থেকে ৯২ নং রোড এবং আশপাশ এলাকায় সকাল ৯টা থেকে পেট্রোল ডিউটি করছিলেন। তিনি রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন, ৭৯ নম্বর রোডের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বেকারিতে গোলাগুলি হচ্ছে। সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ফোর্সসহ রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে বেকারির কাছে গিয়ে দেখতে পান, ভেতরে কিছু সন্ত্রাসী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করছে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের ওপরও বোমা নিক্ষেপ ও এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে সন্ত্রাসীরা। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীদের গুলি ও গ্রেনেডের আঘাতে এসআই ফারুক হোসেন ও তার সঙ্গে থাকা কনস্টেবল প্রদীপ চন্দ্র দাস ও আলমগীর হোসেন গুরুতর আহত হন। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এরপর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়াসহ ডিএমপির সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা ও ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারা বেকারির চারপাশ ঘিরে রেখে সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। তখন এ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে অনবরত গ্রেনেড ও গুলি করতে থাকে। এরপর রাত সাড়ে ৮টার দিকে সন্ত্রাসীরা বেকারির পশ্চিম দিকের ৭৯ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাড়ির সামনে অবস্থানরত পুলিশকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলি শুরু করে। এ সময় ৩০-৩৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও ফোর্স আহত হন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা ছিল গুরুতর। তাদের সবাইকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টা ২০ মিনিটে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন খান মারা যান। এর কিছুক্ষণ পর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহকারী কমিশনার মো. রবিউল করিমও মারা যান।

২ জুলাই ২০১৬: সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন অভিযান চালায়। সে সময় সন্ত্রাসীরা কমান্ডো বাহিনীর ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলি করে। এ অভিযানে পাঁচ জঙ্গি এবং ওই বেকারির এক কর্মীসহ ছয়জন নিহত হয়। পাঁচ জঙ্গি হলো– মীর মোবাশ্বের (১৯), রোহান ইমতিয়াজ (২০), নিবরাস ইসলাম (২০), মো. খায়রুল ইসলাম পায়েল (২২), মো. শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল ওরফে বিকাশ (২৬)। নিহত বেকারির কর্মীর নাম সাইফুল চৌকিদার। এ সময় প্যারা কমান্ডোরা দেশি-বিদেশি জিম্মিদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

এছাড়া নয়জন ইতালীয়, সাতজন জাপানি এবং একজন ভারতীয় ও তিনজন বাংলাদেশি (তাদের একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকার নাগরিক) নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অভিযানে ছয় সন্ত্রাসী নিহত হয়। নিহতদের মৃতদেহ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) পাঠানো হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের

উপস্থিতিতে মৃতদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সিআইডি ক্রাইম সিন বিভাগের সহায়তায় গুলশান থানার এসআই রিপন কুমার দাস, এসআই মফিদুল ইসলাম, এসআই জয়নাল আবেদীন এবং এসআই হুমায়ুন কবির ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যসহ অন্যান্য জিনিস এবং ভিকটিমদের ব্যক্তিগত মালামাল জব্দ করে হেফাজতে নেন।

নিহত যারা: নিহত ইতালির নয় নাগরিক হলেন- মার্কো টোনডাট, ভিনজেনজো ডি'অ্যালেস্ট্রো, সিমোনা মন্টি, মারিয়া রিবোলি, নাদিয়া বেনেভেট্ট, অ্যাডেলে পুগলিসি, ক্লদিও ক্যাপেলি, ক্রিশ্চিয়ান রসি ও ক্লদিয়া মারিয়া ডি'অ্যান্টোনা। জাপানের সাত নাগরিক হলেন- হিডেকি হাশিমোটা, কোয়া ওগাসাওয়ারা, মাকোটো ওকামুরা, হেরোশি তানাকা, ইয়োকি সাকাই, নোবুহিরো কোরুসাকি ও রুই শিমোডাইরা। বাংলাদেশ-আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক অবিন্তা কবির, বাংলাদেশি দুই নাগরিক ইশরাত জাহান আখন্দ ও ফারাজ আইয়াজ হোসেন এবং দুই পুলিশ কর্মকর্তা, সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. রবিউল করিম ও পুলিশ পরিদর্শক সালাউদ্দিন আহম্মেদ খান ভয়াবহ ওই হামলায় নিহত হন। হলি আর্টিজানের দুজন স্টাফ সাইফুল চৌকিদার ও জাকির হোসেন শাওন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সেদিন জঙ্গি হামলায় গুরুতর আহত হন ৩০ থেকে ৩৫ জন পুলিশ সদস্য। তবে যৌথ বাহিনীর কমান্ডো অভিযানে পাঁচ জঙ্গিও নিহত হয়।

হামলার সময় গ্রেপ্তার ৮: ১) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী ওরফে সুভাষ ওরফে শান্ত ওরফে টাইগার ওরফে আদিল ওরফে জাহিদ (৩২), বাবা–মৃত মাওলানা ওসমান গনি মণ্ডল, মা– মোছা. রাহেলা বেগম, সাং–পশ্চিম রাঘবপুর (ভুতমারা ঘাট), থানা– গোবিন্দগঞ্জ, জেলা–গাইবান্ধা। টাঙ্গাইল থেকে গ্রেপ্তার। ২) মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান (৬০), বাবা–মৃত হোসেন আলী, সাং–হাজারবিঘি চানপুর, থানা–শিবগঞ্জ, জেলা–চাঁপাইনবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার। ৩) রাফিউল ইসলাম ওরফে রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান (২২), বাবা– মো. রেজাউল হক, মা–রোকেয়া আক্তার, সাং–ইসলামপুর জামিলনগর, থানা–বগুড়া সদর, জেলা–বগুড়া। কুষ্টিয়া থেকে গ্রেপ্তার। ৪) মো. আব্দুস সবুর খান ওরফে হাসান ওরফে হাতকাটা সোহেল মাহফুজ ওরফে মুসাফির ওরফে জয় ওরফে নসুরুল্লাহ (৩৩), বাবা–রেজাউল করিম শেখ, মা–মনোয়ারা বেগম, সাং–সাদিপুর (কাবলিপাড়া), পোস্ট–শিলাইদহ, থানা–কুমারখালী, জেলা–কুষ্টিয়া। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার। ৫) হাদিসুর রহমান সাগর, বাবা–হারুন রশিদ, মা– মোছা. আসিয়া বেগম, সাং– কয়রাপাড়া কাদোয়া, থানা– জয়পুরহাট, জেলা– জয়পুরহাট। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার। ৬) মো. আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ ইসলাম ওরফে আবু জাররা ওরফে র‍্যাশ (২০), বাবা– মো. আব্দুস সালাম, মা– মোছা. নাসিমা বেগম, সাং–সাবাইহাট কাঞ্চনপুর, থানা–মান্দা, জেলা–নওগাঁ; বর্তমান ঠিকানা: মথুরান ওহাটা, থানা–পবা, জেলা–রাজশাহী। নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার। ৭) শরিফুল ইসলাম

ওরফে খালেদ (২৫), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র, বাবা–আবদুল হাকিম, গ্রাম–শ্রীপুর, থানা–বাগমারা, জেলা–রাজশাহী। ৮) মামুনুর রশীদ ওরফে রিপন (৩০), বাবা–মৃত নাসির উদ্দিন সরদার, মা– কোহিনুর বেগম, সাং– শেকেরমারিয়া, পোস্ট–ভাটারা, থানা–নন্দীগ্রাম, জেলা–বগুড়া।

ঘটনার সময় নিহত জঙ্গিদের তালিকা: ১) রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, বাবা–এম এম ইমতিয়াজ খান বাবুল, মা– জেরিন ইমতিয়াজ, সাং–ব্লক-বি, প্লট-৭/৯ লালমাটিয়া, ঢাকা। ২) মীর মোবাশ্বের (১৭), বাবা–মীর হায়াৎ কবির, মা–খালেদা পারভীন, সাং–বাসা নং ৬৮/এ, রোড ৫, পুরাতন বনানী ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। ৩) নিবরাস ইসলাম (২৪), বাবা–নজরুল ইসলাম, মা–লাইলা ইসলাম রিতা, সাং–বাড়ি ৫, রোড ১৬, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা। ৪) শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল ওরফে বিকাশ (২৬), বাবা–বদিউজ্জামান বদি, মা–আসিয়া খাতুন, সাং–চিথুলিয়া কৈয়াগাড়ী, থানা–ধুনট, জেলা–বগুড়া। ৫) খায়রুল ইসলাম ওরফে পায়েল (২২), বাবা–আবুল হোসেন, মা–পিয়ারা বেগম, সাং–শ্রী কুষ্টিয়া, থানা–শাহজাহানপুর, জেলা–বগুড়া।

হলি আর্টিজানে হামলার পর বিভিন্ন সময় অভিযানে নিহত জঙ্গিদের তালিকা: ১) তামিম চৌধুরী, বাবা–শফিকুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে সফি আহমেদ চৌধুরী, সাং–সোয়াসং বড়গ্রাম, চৌধুরীপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের পাশে, থানা–বিয়ানীবাজার, জেলা–সিলেট। বর্তমান ঠিকানা–পাইকপাড়া শাহসুজা, রোড–নুরুদ্দিন দেওয়ানের বাড়ি, বাড়ি নং ৪১০/১, থানা–নারায়ণগঞ্জ সদর, জেলা–নারায়ণগঞ্জ। ২) সারোয়ার জাহান ওরফে আব্দুর রহমান, বাবা–আব্দুল মান্নান, সাং–চামার মুরশী, থানা–ভোলাহাট, জেলা–চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ৩) তানভীর কাদেরী ওরফে জামসেদ ওরফে আবদুল করিম, বাবা–বাতেন কাদেরী, সাং–পশ্চিম বাটিকমারী, ৯ নং ওয়ার্ড, প্রফেসর কলোনি, থানা–গাইবান্ধা, জেলা–গাইবান্ধা। বর্তমান ঠিকানা–২০৯/৫ লালবাগ রোড, জনৈক হাজী কায়সারের পাঁচতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলা। ৪) নুরুল ইসলাম মারজান, বাবা–নিজাম উদ্দিন, সাং–আফুরি পূর্ব পাড়া (হেমায়েতপুর), থানা–পাবনা সদর, জেলা–পাবনা। ৫) বাশারুজ্জামান ওরফে চকলেট, বাবা–সিরাজ মাস্টার, সাং–মাস্টার বাড়ি, থানা–তানোর, জেলা–রাজশাহী। ৬) মিজানুর রহমান ওরফে ছোট মিজান (২০), বাবা–আয়নাল হক, সাং– শাহাবাজপুর থানা, থানা–শিবগঞ্জ, জেলা–চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ৭) মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ওরফে জাহিদ ওরফে মেজর মুরাদ, বাবা– নূরুল ইসলাম, সাং– পশ্চিম চাঁদপুর, ইউনিয়ন পরিষদ নং ৫ পাঁচতুরি, থানা–কোতোয়ালি, জেলা–কুমিল্লা। ৮) রায়হান ওরফে রায়হানুল কবির ওরফে ফারুক ওরফে তারেক (২০), বাবা–শাহজাহান, মা–রাহেলা খাতুন, সাং–পশুয়া (টাঙ্গাইল পাড়া), থানা–পীরগাছা, জেলা–রংপুর।

হলি আর্টিজান মামলার রায়: গুলশান হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় করা মামলার রায় দিয়েছেন আদালত ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর। রায়ে ৮ আসামির মধ্যে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ১ জনকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো- জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, আব্দুস সবুর খান, রাকিবুল হাসান রিগ্যান, হাদিসুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ওরফে খালেদ ও মামুনুর রশিদ। খালাস পেয়েছে মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান।

মিজানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা যথাযথ প্রমাণ না হওয়ায় এবং ফাঁসিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস দেন। রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আসামি পক্ষের আইনজীবী দোলোয়ার হোসেন বলেন, রায়ে আমরা সংক্ষুব্ধ। সাক্ষীদের নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।

সন্তুষ্ট রাষ্ট্রপক্ষ: রাজধানী ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ হামলা ও হত্যা মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। খালাসপ্রাপ্ত এক আসামির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রায় দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তারা।

২০১৯ সালে ২৭ নভেম্বর রায় ঘোষণার পর মহানগর দায়রা আদালতের প্রধান কৌঁসুলি আবদুল্লাহ আবু একথা জানান। রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। একজনের খালাসের বিষয়ে আমরা পর্যালোচনা করে যদি মনে করি, আপিল করা যাবে।

সন্তুষ্ট নিহত ওসি সালাউদ্দিনের পরিবার: রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সাত আসামির ফাঁসির আদেশ দেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন গোপালগঞ্জের সন্তান বনানী থানার সাবেক ওসি নিহত সালাউদ্দিন খানের পরিবারের সদস্যরা।

রায়ে সন্তুষ্ট সরকার: তিন বছর আগে ঢাকার কূটনীতিকপাড়া গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে নজিরবিহীন জঙ্গি হামলায় ২০ জনকে হত্যার দায়ে নব্য জেএমবির সাত সদস্যের ফাঁসির রায় দিয়েছে আদালত। এ রায়ে সরকার সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এছাড়া আইএসের টুপিসহ এজলাসে আসামির প্রবেশের ঘটনাটি তদন্ত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন আইনমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হলি আর্টিজান: বহুল আলোচিত হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার রায়ের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রকাশ করেছে। বিবিসি হলি আর্টিজানের রায়ের খবরটি তাদের প্রধান সংবাদ হিসেবে '২০১৬ সালের ক্যাফে হামলায় ইসলামী চরমপন্থীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ' শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে '২০১৬ সালে বেশিরভাগ বিদেশিসহ ২০ জন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাত জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ'। বিবিসি বলছে, বাংলাদেশে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের ওই ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হামলা পরিকল্পনা ও পাঁচ হামলাকারীকে অস্ত্র যোগান দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারপর থেকে বাংলাদেশ ব্যাপক জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু করে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরারও 'হলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলা, সাত জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ঢাকার আদালত' শিরোনামে তাদের প্রধান খবর প্রকাশ করে। তারা বলেছে, 'রাজধানী শহরের একটি জনপ্রিয় ক্যাফেতে হামলার ঘটনায় যুগান্তকারী রায় দিয়েছে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রমাণ দিয়েছে বাংলাদেশ।'

মার্কিন সংবাদ সংস্থা এপি 'ক্যাফে হামলায় সাত জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ' শিরোনামে হলি আর্টিজান মামলার রায়ের খবর প্রকাশ করে। তারা বলেছে, বাংলাদেশের একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ২০১৬ সালের ঢাকায় বোমা হামলার ঘটনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি জঙ্গি সংগঠনের সাত সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্স শিরোনাম করেছে, ২০১৬ সালের ক্যাফে হামলার দায়ে সাত জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ। তারা বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির অন্যতম ভয়াবহ এই হামলায় বেশিরভাগ বিদেশিসহ অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। আদালতে এক আসামি 'আল্লাহু আকবর' বলার ঘটনাটিও তারা উল্লেখ করেছে প্রতিবেদনে।

আরেক ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানও '২০১৬ সালের ক্যাফে হামলায় বাংলাদেশে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড' শিরোনামে রায়ের খবর প্রকাশ করে। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচেভেলেও, 'বাংলাদেশ : ক্যাফেতে হামলার ঘটনায় সাত ইসলামি জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। ঢাকার সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই রায় দেন।

ভারতের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক অনলাইন প্রতিবেদনে হলি আর্টিজান মামলার রায়ের খবর প্রকাশ করেছে। '২০১৬ সালের ক্যাফে হামলায় সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ' শিরোনামে রায়ের খবর জানিয়ে তারা বলছে, হামলার সঙ্গে জড়িত এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট শিরোনাম করেছে, '২০১৬ সালে ঢাকায় বিদেশিদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা মামলার রায়ে সাতজন ইসলামী চরমপন্থীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ।' মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউএস নিউজ শিরোনাম করেছে, '২০১৬ সালের ক্যাফে হামলার দায়ে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশ।'

এছাড়াও ভারতীয় প্রায় সব সংবাদমাধ্যম, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক কিছু গণমাধ্যম ও সংবাদ পর্যবেক্ষণ সংস্থা, ইউরোপ আর আমেরিকার গণমাধ্যম, পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ছাড়াও অসংখ্য গণমাধ্যমে বুধবারের হলি আর্টিজান মামলার রায়ের খবর প্রকাশিত হয়।

আপিল করবেন আসামিরা: ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে নজিরবিহীন জঙ্গি হামলায় ২০ জনকে হত্যার দায়ে সাত জনের ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন আসামিরা।

আসামি পক্ষের অন্যতম আইনজীবী দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, আমরা মনে করি সাক্ষ্যগুলো ডাউটলেস না। অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে, অনেক ইনকসিসটেন্সি আছে, লেক অব কোলাবরেশন আছে। আমরা এ নিয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করব।

আইএসআইএস-এর দায় স্বীকার: ইসলামিক স্টেটের অধিভুক্ত সংবাদ সংস্থা, 'আমাক' এই হামলার দায় স্বীকার করে এবং ২০ জনকে হত্যার দাবি জানায়। ঘটনার পর তারা একটি ভিডিও প্রকাশ করে এবং হুমকি দেয় এটি সবেমাত্র শুরু ভবিষ্যতে আরো হামলা হবে। (বিডিনিউজ২৪ ডটকম, ২ জুলাই, ২০১৬)

জাকির নায়েক ও পিস টিভি: আক্রমণের ৫ হামলাকারীর মাঝে একজন ফেসবুকে জাকির নায়েকের অনুসারী ছিলেন বলে বাংলাদেশি পত্রিকা ডেইলি স্টারে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, জাকির নায়েকের বক্তব্য আমাদের জন্য একটি নজরদারির বিষয়। আমাদের এজেন্সিগুলো এর উপর কাজ করছে (ইকোনমিক টাইম, নিউ দিল্লী, ৬ জুলাই, ২০১৬) এর ২ দিন পর মহারাষ্ট্র সরকারের সিআইডি বিভাগ তদন্তের ফলাফল হিসেবে জানায় যে, তারা জাকির নায়েকের বক্তৃতায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ খুজে পায়নি। ডেইলি স্টার উক্ত বিতর্ক নিয়ে জাকির নায়েকের নিকট ক্ষমা চেয়ে মন্তব্য করে যে তারা কখনোই নায়েককে উক্ত হামলার জন্য দোষারোপ করেনি। (ডেইলি স্টার, ৯ জুলাই, ২০১৬) পত্রিকাটি বলে যে, এটি শুধুমাত্র এটাই তুলে ধরেছে যে, কিভাবে তরুণরা তার বক্তব্যকে ভুলভাবে বুঝছে। তবে এঘটনার পরপরই বাংলাদেশ সরকার নায়েকের পিস টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এর কারণ হিসেবে বলেন যে, 'পিস টিভি মুসলিম সমাজ, কুরআন, সুন্নাহ, হাদিস, বাংলাদেশের সংবিধান, আমাদের সংস্কৃতি, আচার-প্রথা ও রীতি-নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।' (বিবিসি নিউজ, ১ জুলাই, ২০১৬)

প্রতিক্রিয়া: এই ঘটনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি একে ধর্ম ও মানবতার অবমাননা বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং ইসলামের নামে মানুষ হত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে যে কোনো মূল্যে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করব। (কালের কণ্ঠ, ২ জুলাই, ২০১৬) রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান। এছাড়া তিনি জিম্মি সংকটের অবসানে যৌথ অভিযানে অংশ নেয়া যৌথ বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। (জনকণ্ঠ, ২ জুলাই, ২০১৬)

ইতালির প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও রেনসি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আমাদের মূল্যবোধ ঘৃণা ও সন্ত্রাস থেকে অনেক শক্তিশালী। এছাড়া তিনি এই ঘটনাকে "বেদনাদায়ক ক্ষতি" বলে মন্তব্য করেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ জুলাই, ২০১৬)

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনযো আবে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি জাপানিদের জীবিত উদ্ধারে ঢাকাস্থ দূতাবাসে নির্দেশনা দেয়ার কথা এক সংবাদ সম্মেলনে জানান এবং তিনি এটিকে "দুঃখজনক" হিসেবে আখ্যা দেন। (দৈনিক জাগরণ, ২ জুলাই, ২০১৬) এছাড়া অন্যান্য জাপানি সরকারি কর্মকর্তা ও সংস্থা যাদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার, মন্ত্রিসভার মুখ্য সহকারী সচিব কোইচি হাগুইদা, মন্ত্রিসভার সহকারী সচিব ইয়োশিহিদে সুগা, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এই ঘটনায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ঢাকায় আক্রমণ আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই।(বাংলা ট্রিবিউন, ২ জুলাই, ২০১৬)

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক হওয়ার কথা বলেন। (বিডিনিউজ ডটকম, ২ জুলাই, ২০১৬)

ভ্যাটিকান সিটি পোপ ফ্রান্সিস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং এই ধরনের হামলাকে "স্রষ্টা ও মানবতার বিরুদ্ধে আঘাত" বলে মন্তব্য করেন। (চ্যানেল আই অনলাইন, ৪ জুলাই, ২০১৬)

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ঢাকায় সন্ত্রাসী ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলেন তার দেশ সবসময় বাংলাদেশের পাশে আছে। বাংলাদেশের জনগণ এ ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি বার্তা পেয়েছে, সেটি হলো সেদেশের সরকার কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-কে প্রশ্রয় দেবে না। (কালেরকণ্ঠ, ২ জুলাই, ২০১৬)

হলি আর্টিজানে হামলার পাঁচ বছরঃ উচ্চ আদালতে আটকে আছে বিচার

২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল এই মামলায় ৭ আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। এরপর আসামিরা সবাই জেল আপিল করে। এছাড়া ট্রাইব্যুনালের রায়ে খালাস পাওয়া একজনের বিরুদ্ধে আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এরপর প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও বিচারিক কার্যক্রমের কোনো অগ্রগতি নেই। উচ্চ আদালতে গিয়ে এক প্রকার থমকে আছে হলি আর্টিজানে ভয়াবহ হামলা মামলা বিচার।

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এ কে এম আমীন উদ্দিন ২০২১ সালের ৩০ জুন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'গুলশানের হলি আর্টিজান মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পেপারবুক তৈরি হয়েছে। এটি এখন আদালতে উঠবে। এর পাশাপাশি কেউ যদি আপিল করে থাকে, সেটি ব্যক্তিগত আইনজীবী বা জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই হোক না

কেন, তা শুনানি হবে। শুনানি শেষে উচ্চ আদালত যে নির্দেশনা বা আদেশ দেবেন, তাই প্রতিপালন করা হবে।'

আদালত ও জেল সূত্রে জানা গেছে, গুলশান হামলা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে তিনজন– মামুনুর রশীদ রিপন, রাকিবুল ইসলাম রিগ্যান ও আসলাম হোসেন র‍্যাশ ২০১৯ সালের ৪ ডিসেম্বর জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে আপিল করে। এছাড়া বাকি চার আসামি– হাদিসুর রহমান সাগর, জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব ওরফে রাজীব গান্ধী, আব্দুস সবুর খান ও শরিফুল ইসলাম খালিদ ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর খালাস চেয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেছে। একই দিনে ডেথ রেফারেন্স অনুমোদনের জন্যেও নথিপত্র উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়।

আদালত সূত্র জানায়, ট্রাইব্যুনালের রায়ে মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান নামে চার্জশিটভুক্ত যে আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপক্ষ সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ আদালতে আপিল করেছে। তবে বিগত ২ বছরেও কোনো আপিলেরই শুনানি হয়নি। উচ্চ আদালতের একজন কর্মকর্তা জানান, এই আপিলের আবেদন শুনানির জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যারা আপিল করেছে, তাদের জন্য আদালত সলিসিটর অফিসের মাধ্যমে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে দেবে। তারপর এ বিষয়ে শুনানি হবে।

আদালতের ওই কর্মকর্তা জানান, তবে ডেথ রেফারেন্স শুনানির জন্য ২০২০ সালের ১৬ আগস্ট আলোচিত এ মামলার পেপারবুক তৈরি হয়ে হাইকোর্টে পৌঁছায়। এক হাজার ৯০০ পৃষ্ঠার এই পেপারবুক শুনানির জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এখন শুধু শুনানির দিন নির্ধারণের অপেক্ষা। করোনা পরিস্থিতির কারণে এখনই মামলাটির শুনানি শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।

কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক গিয়াস উদ্দিন ২০২১ সালের ৩০ জুন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'হলি আর্টিজান মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে রিগ্যান, রিপন ও আসলাম কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে রয়েছে। বাকিরা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম কারাগারে রয়েছে।'

এক নজরে হলি আর্টিজান হামলার বিচার

মামলা দায়ের: ২০১৬ সালের ২ জুলাই, সন্ত্রাস দমন আইনে, গুলশান থানায়।

মামলাকারী: গুলশান থানার এসআই রিপন কুমার দাস।

তদন্তকারী: কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক হুমায়ুন কবির।

জিজ্ঞাসাবাদ: জিম্মি অবস্থা থেকে উদ্ধার হাসনাত রেজাউল করিম ও তাহমিদ হাসিব খানকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও পরে আসামী করা হয়নি।

অভিযোগপত্র দাখিল: ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই। হামলায় জড়িত মোট ২১ জনকে চিহ্নিত করা হলেও জীবিত আটজনকেই কেবল আসামী করা হয়।

হামলায় জড়িত, অভিযানে নিহত: তামিম আহমেদ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মারজান, সরোয়ার জাহান, তানভীর কাদেরী, বাশারুজ্জামান চকলেট, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ছোট মিজান ও রায়হানুল কবির রায়হান।

স্বীকারোক্তি: ৬ আসামি দিয়েছেন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি। স্বীকারোক্তি দেননি শরিফুল ও মামুনুর।

অভিযোগ গঠন: ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর, ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে।

সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু: ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর। প্রথম সাক্ষ্য দেন বাদী এসআই রিপন।

সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ: ২০১৯ সালের ২৭ অক্টোবর।

যুক্তিতর্ক শেষ: ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর।

রায় ঘোষণা: ২০২১ সালের ২৭ নবেম্বর।

নব্য জেএমবি'র গুলশানে হামলা

হামলাকারী জঙ্গিদের নিরস্ত্র করে জিম্মিদের উদ্ধারে নামে কমান্ডো অভিযানে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যান। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার ১১ ঘণ্টা পর এ অভিযান শুরু হয়েছিল।

এক যুগ আগে শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাইসহ শীর্ষ নেতাদের ফাঁসির পর নিষিদ্ধ সংগঠন জামায়াতুল মুজহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) জঙ্গি তৎপরতা কিছুটা স্তিমিত হলেও ঘর গোছানোর কাজ কখনও থামায়নি সংগঠনটি।

বরং তাদের বিদায়ের পর সংগঠনের ভেতরে দেখা দেওয়া কোন্দলের সুযোগে 'নব্য জেএমবি' নামের যে অংশটির আবির্ভাব ঘটে, সেটি আরও বেশি সংগঠিত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং উগ্র মতাদর্শে পরিচালিত।

জেএমবির 'অতি উগ্র' এই অংশটির দ্বারাই ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে ঘটে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হামলার ঘটনা।

ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) বাংলাদেশে নব্য জঙ্গিদের উত্থান এবং তাদের কর্মকাণ্ডের তথ্য বের করে এনেছে।

মামলার অভিযোগপত্রে উঠে এসেছে, কীভাবে অন্তর্কোন্দলে জেএমবি থেকে নব্য জেএমবির জন্ম।

মামলার তদন্তের সময় সারাদেশে জঙ্গিগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, বিভিন্ন সময়ে আটক জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের স্বীকারোক্তি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, জেএমবি থেকে একটি 'অতি উগ্র' অংশের উত্থান ঘটে, যা 'নব্য জেএমবি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই অংশটিই হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালায়।

গুলশান হামলা মামলা অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, নিষিদ্ধ ঘোষণার পরই জেএমবি মরিয়া হয়ে উঠে এবং ২০০৫ সালের ১৭ অগাস্ট ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দেয়।

২০০১ সালে শায়খ রহমানের নেতৃত্বে জন্ম জেএমবির। ২০০৪ সালের দিকে এতে যোগ দেন সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই, আব্দুল আউয়াল, আতাউর রহমান সানিসহ অনেকে।

সেসময় রাজশাহীর বাগমারায় বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে নৃশংস কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে 'সর্বহারা নিধন' শুরু হলে দেশজুড়ে আলোচনার ঝড় ওঠে। এ অবস্থায় ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সরকার জেএমবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সারাদেশে বোমা হামলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় শায়খ রহমান, বাংলা ভাই, আব্দুল আউয়াল, আতাউর রহমান সানিসহ অনেক নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীকালে বিচারকার্যের পরে ২০০৭ সালে আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইসহ ছয় শীর্ষ জঙ্গির ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

শীর্ষ নেতৃত্ব ছেঁটে ফেলার পর জেএমবি কিছুটা দুর্বল হলেও বন্ধ হয়নি সাংগঠনিক তৎপরতা। ওই সময় সংগঠনের দায়িত্ব নেন সাইদুর রহমান। ২০১০ সালে সাইদুর রহমান গ্রেপ্তার হলে 'ডাক্তার' নজরুল অঘোষিত নেতা হিসেবে সংগঠনের মূল দায়িত্ব পালন শুরু করেন কিন্তু নজরুলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেননি জেলে থাকা সাইদুর।

ওই সময় বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন এলাকায় জেএমবির নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। স্পষ্ট হয়ে উঠে কারাগারে থাকা সাইদুর রহমান, সালাউদ্দিন সালেহীন এবং বাইরে থাকা নজরুল, সারোয়ার জাহান (আশুলিয়ায় র‍্যাবের অভিযানে নিহত) পক্ষের বিরোধ। ২০১৩ সালের শেষ দিকে দিনাজপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় নজরুল নিহত হন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সাংগঠনিক কোন্দলের মধ্যে নিজের দল ভারী করতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরোয়ার জাহানের নির্দেশে 'অ্যাডভোকেট' ফারুকের (ফারুক হোসেন ওরফে জামাই ফারুক, যিনি পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেখানে তার নাম বলা হচ্ছে আনোয়ার হোসেন ফারুক) নেতৃত্বে ত্রিশালে প্রিজন ভ্যানে হামলা চালিয়ে আসামি সালাউদ্দিন সালেহীন, রাকিবুল হাসান (পরে বন্দুকযুদ্ধে নিহত) ও জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমা মিজানকে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা।

দল বিভক্ত হওয়ার কারণে আর্থিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লে শুধু উত্তরাঞ্চলে জেএমবির তৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সরোয়ার জাহান এবং তার

সহযোগী মামুনুর রশিদ রিপন মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ইসলামিক স্টেট বা আইএসের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করে এবং তারই অংশ হিসেবে ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাজক, পুরোহিত, মাজারের খাদেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করতে শুরু করে বলে হলি আর্টিজান মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে।

ওই সময়ই আবির্ভাব ঘটে তামিম আহমেদ চৌধুরীর (২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জে অভিযানে নিহত)। কানাডার পাসপোর্টধারী তামিম ২০১৩ সালের অক্টোবরে দুবাই হয়ে বাংলাদেশে ঢোকার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন বলে পুলিশের ভাষ্য।

তামিম চৌধুরীর পরিচয়: অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মে মাসের দিকে তামিমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেএমবির একাংশের নেতৃত্ব দেওয়া সরোয়ার জাহান, মামুনুর রশীদ রিপন ও অন্যরা একত্রিত হয়ে 'আইএসের ভাবধারায় জিহাদ' করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

তারা আইএস ভাবধারার অডিও-ভিডিও যশোর, বগুড়া, গাইবান্ধার বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর পাশাপাশি সদস্য সংগ্রহ শুরু করে। সদস্য হিসেবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র, মসজিদের ইমাম, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের যুবক, ইংরেজি মাধ্যমে পড়া তরুণ এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেছে নেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গিদের জবানবন্দি এবং বিভিন্ন অভিযানে পাওয়া আলামতের ভিত্তিতে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, তামিম চৌধুরী উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় কথিত জিহাদের অপব্যাখ্যা সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয়স্পর্শী নথিপত্রের 'ডকুমেন্ট' তৈরি করে সদস্যদের কাছে সরবরাহ করতেন, যাতে তারা সহজে আকৃষ্ট হন। নতুন সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ফোনে কথা না বলে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন।

তামিম ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের ভেতরে-বাইরের বিভিন্ন উৎস থেকে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল অর্থও সংগ্রহ করেছিলেন বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। আর এই অর্থ জোগাতে খিলগাঁওয়ের চিকিৎসক খন্দকার রোকনউদ্দিনের কথাও আসে তদন্তে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, প্রথম ধাপে সংগ্রহ করা কিছু সদস্যকে ঢাকার মিরপুরের কয়েকটি ভাড়া বাসায় রেখে একমাস ধরে জঙ্গি কোরান-হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এসব আস্তানায় জঙ্গি নেতা নূরুল ইসলাম মারজান (মোহাম্মদপুরে ডিবির সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত), রাকিবুল ইসলাম রিগান (বর্তমানে কারাগারে আটক) প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। মিরপুরের এমনই একটি বাসায় হলি আর্টিজানে হামলাকারী পাঁচ জঙ্গিও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগপত্রে এসেছে।

তামিম-সারোয়ারের নেতৃত্বেই পরে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের নিয়ে গঠন করা হয় 'নব্য জেএমবি'। বাছাই করা জঙ্গিদের দিয়ে বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সংগঠনের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে থাকেন নূরুল ইসলাম ওরফে মারজান, জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী (বর্তমানে কারাগারে), শরিফুল ইসলাম খালেদ, তানভীর কাদেরী (আজিমপুর অভিযানে নিহত), অবসরপ্রাপ্ত মেজর জাহিদুল ইসলাম (রূপনগর অভিযানে নিহত), মিজানুর রহমান ওরফে ছোট মিজান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ অভিযানে বাসারুজ্জামান চকলেটের সঙ্গে নিহত), রায়হানুল কবির রায়হান, আসলাম হোসেন সরদার র‍্যাশ (বর্তমানে কারাগারে) ও অন্যরা।

নতুন সদস্যদের এক মাস আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে 'স্মল সেল টেরোরিজম' ধারণার আলোকে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। তারই অংশ হিসেবে বিদেশি পর্যটক, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, মন্দিরের পুরোহিত, খ্রিস্টান পাদ্রী, লেখক, তৈরি পোশাকের ক্রেতা ও অন্য ধর্মের উপাসনালয়কে 'কৌশলগত শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে ৫-৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত দলকে লক্ষ্যবস্তুতে হামলায় নিয়োজিত করা হয়।

এভাবে ছোট ছোট হামলায় দেশে আতঙ্ক ছড়ানো এবং নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার পর বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নব্য জেএমবি তাদের প্রথম বড় অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। কারণ রেস্তোঁরাটি ছিল বিদেশিদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এরপরই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তামিম-সারোয়ারের সরাসরি সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঘটানো হয় চূড়ান্ত হামলা। যে হামলা বাংলাদেশের দৃশ্যপট অনেকটাই বদলে দেয়। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিপজ্জনক বিস্তারের মাত্রাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওই হামলার মাধ্যমে।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, নব্য জেএমবির ওই হামলার উদ্দেশ্য ছিল, দেশকে 'অস্থিতিশীল করা' এবং বাংলাদেশকে একটি 'জঙ্গি রাষ্ট্র' বানানো।

হলি আর্টিজান হামলা: অভিযুক্ত জঙ্গিদের কার কী ভূমিকা

রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার ঘটনায় ২১ জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। তাদের মধ্যে হামলাকারী, পরিকল্পনাকারীসহ ১৩ জন নিহত হয়েছে বিভিন্ন অভিযানে।

অভিযুক্তরা হামলায় যেভাবে অংশ নেয়: মামলার তদন্তে মোট ২১ জঙ্গির সম্পৃক্ততা পায় সিটিটিসি। তাদের মধ্যে ঘটনাস্থলে পাঁচ জন এবং বিভিন্ন সময় অভিযানে আট জন নিহত হয়। জীবিত রয়েছে আট জন। এই আট আসামি হলি আর্টিজানে হামলা বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা ও সহযোগিতা করেছে বলে তদন্তে

বলা হয়েছে। অভিযোগপত্র অনুযায়ী আট জনের হামলায় যে সম্পৃক্ততা ছিল তা নিম্নরূপ–

জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী: জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে গুলশান হামলার পরিকল্পনাকারী ও হামলায় অংশ নেওয়া জঙ্গিদের সরবরাহকারী হিসেবে তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্টরা। ২০১৭ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকার কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে রিমাণ্ডে নেয় পুলিশ। এরপর আদালতে ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি গুলশান হামলার আদ্যোপান্ত স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয় রাজীব গান্ধী। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে গাইবান্ধা জেলার বোনারপাড়া বাজারে বাইক হাসানের বাসায় তামিম চৌধুরী, মেজর (অব) জাহিদ, সরোয়ার জাহান, রায়হানুল কবির রায়হান, নুরুল ইসলাম মারজান ও শরীফুল ইসলাম খালেদের সঙ্গে বৈঠকে হলি আর্টিজানে আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করে রাজীব। হামলার কয়েকদিন আগে বাসা ভাড়ার জন্য মারজান ও রাশেদুল ইসলামের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে এই টাকা আসে। রাজীব গান্ধী দুই হামলাকারী পায়েল ও উজ্জল খালেদের হাতে টাকা তুলে দেয়। গাইবান্ধার যে এলাকায় হামলাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখানে রাজীব ছিল। এছাড়া হামলার আগে হামলায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গুলশান এলাকা রেকি করে রাজীব গান্ধী। হামলার দিন তামিম চৌধুরীর নির্দেশে বিকাল ৩ টায় বসুন্ধরার বাসা ছেড়ে রূপনগরের ভাড়া বাসায় চলে যায়। রাজীবের বাড়ি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের পশ্চিমরাঘরপুর এলাকার ভূতমারী ঘাট এলাকায়। তার বাবার নাম ওসমান গণি মণ্ডল। স্থানীয় একটি কলেজ থেকে এসএসসি পাস করা রাজীব ২০১৫ সালে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে 'হিজরত' করে। পরে স্থানীয় একটি কলেজ থেকে এসএসসি পাস করেছে। রাজীব বর্তমানে কারাবন্দি আছে।

আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ ওরফে রাশ: গুলশান হামলার পরিকল্পনা সহযোগী ও বাস্তবায়নকারী হিসেবে তদন্তে নাম এসেছে আসলাম হোসেনের। এই গ্রুপের শীর্ষ নেতা তামিম চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সে। তাকে ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের ১০ আগস্ট হামলার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। তার বিরুদ্ধে অর্থ লেনদেন, হামলাকারীদের প্রশিক্ষণকারী জঙ্গিদের কাছে নিয়ে যাওয়া, বোমা চার্জ শিক্ষা দেওয়া এবং তদন্তে হামলায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় সরাসরি অংশ নেওয়া রোহানকে আসাদ গেটের আড়ং থেকে ২০১৫ সালে নিয়ে যায়। পরে প্রশিক্ষক জঙ্গি নেতা রিগ্যানের কাছে পৌঁছে দেয়। সদরঘাটের বুড়িগঙ্গায় হামলাকারীদের নৌকায় করে নিয়ে গ্রেনেড ছোড়া শেখায়। গুলশান হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে হানিফ পরিবহনে করে ঢাকায় আনে। এছাড়া হামলাকারীদের জন্য ঢাকায় বাসা ভাড়া করাসহ নানা রকম লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়। নওগাঁর মান্দা এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ উচ্চ মাধ্যমিক পড়া অবস্থায়ই প্রথমে অনলাইনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে নব্য জেএমবির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। ঢাকায় আসার পর তামিম চৌধুরী ও মারজানের সঙ্গে থেকে জঙ্গি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। গুলশান হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তামিম ও মারজানের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই নাটোর থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে রাশেদ।

সোহেল মাহফুজ ওরফে হাতকাটা মাহফুজ: তার প্রকৃত নাম আব্দুস সবুর খাঁন ওরফে হাসান। জঙ্গি সংগঠনে সোহেল মাহফুজ ওরফে হাতকাটা মাহফুজ ওরফে মুসাফির ওরফে জয় ওরফে নসরুল্লাহ নামে জঙ্গিরা তাকে চিনতো। ২০১৭ সালের ৮ জুলাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে কয়েক দফা রিমান্ড শেষে ২৩ জুলাই গুলশান হামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সোহেল। এ হামলায় অর্থ, অস্ত্র, বিস্ফোরক, বোমা তৈরি ও সরবরাহকারী সোহেল মাহফুজ এক সময় পুরনো জেএমবির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিল। পরবর্তীকালে মতবিরোধের কারণে নব্য জেএমবির সুরা সদস্য হয়। সুরা সদস্যরাই গুলশান হামলার পরিকল্পনা করে সোহেল মাহফুজকে হামলাকারী, অস্ত্র ও বোমা সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয়। পরে সোহেল মাহফুজ ভারতে থাকা পুরাতন জঙ্গি সদস্যদের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে ছোট মিজানকে দেয়। ছোট মিজান ও আসলাম হোসেন রাশ চাঁপাইনবাবগঞ্জে গিয়ে সোহেল মাহফুজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সোহেল মাহফুজ ও ছোট মিজান মিলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক শিবগঞ্জ থানার কানসাট বাজারের আমবাগানের ছোট্ট একটি ঘরে রাখে। তারা দু'জন অস্ত্র ও বিস্ফোরক আসলাম হোসেন রাশের কাছে বুঝিয়ে দেয়। আসলাম সেই অস্ত্র হানিফ পরিবহনের বাসে করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। পরে কল্যাণপুরে রাশের কাছে অস্ত্র বুঝিয়ে দেয়। নুরুল ইসলাম মারজান তার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে তামিম চৌধুরীকে বুঝিয়ে দেয়। এছাড়া শেওড়াপাড়া ও যাত্রাবাড়ির বাসায় বসে গ্রেনেড তৈরি করে। ২০০২ সালে পাবনা জেলা স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়া সোহেল মূলত বোমা তৈরির কারিগর। বোমা তৈরি করতে গিয়ে তার এক হাত উড়ে যায়। ২০১৪ সালে তামিম চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নব্য জেএমবির অস্ত্র ও বোমা তৈরির কারিগর হিসেবে কাজ করতে থাকে। গুলশান হামলায় ব্যবহৃত গ্রেনেডগুলো শেওড়াপাড়ার আস্তানায় বসে নিজের হাতেই তৈরি করে সোহেল। ২০১৭ সালের ৭ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার পুস্কনি এলাকা থেকে তিন সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। তার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শিলাইদহ এলাকার সাদিপুর কাবলিপপাড়া এলাকায়। তার বাবার নাম রেজাউল করিম শেখ।

হাদীসুর রহমান সাগর: ২০১৮ সালের ২১ মার্চ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ৫ মে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। গুলশান হামলার মামলা তদন্তে হাদীসুর রহমান সাগরের বিরুদ্ধে বোমা তৈরি ও অস্ত্র, বোমা সরবরাহের তথ্য-প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পুরানো জেএমবির সদস্য সাগর ২০০১ সালে জয়পুরহাট সদরের

বানিয়াপাড়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করার পর থেকেই জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ভারত থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আনার সবগুলো রুট জানা ছিল তার। ২০১৪ সালে নব্য জেএমবির হয়ে কাজ শুরুর পর হলি আর্টিজানে হামলার জন্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ করে। সাগরের গ্রামের বাড়ি জয়পুরহাটের কয়রাপাড়ায়। বাবার নাম হারুন অর রশিদ। ২০১৮ সালের ২১ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তারের পর তাকে দুই দফা রিমান্ডে নেওয়া হয়। ৫ এপ্রিল গুলশান হামলায় সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়। সাগর আরেক জঙ্গি মারজানের ভগ্নিপতি।

রাকিবুল হাসান রিগ্যান: মামলার তদন্তে রাকিবুল হাসান রিগ্যান ওরফে রাফিউল ইসলাম রাফি ওরফে রিপন ওরফে হাসান ওরফে অন্তরের (২০) নাম এসেছে হামলাকারীদের প্রশিক্ষক হিসেবে। বসুন্ধরার যে বাসা থেকে হামলার পরিকল্পনা হয় সেই বাসায় তার যাতায়াত ছিল। সেখানে হামলাকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়। বয়সে তরুণ রিগ্যান ২০১৫ সালে বগুড়া সরকারি শাহ সুলতান কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ওই বছরের ২৬ জুলাই সকালে কোচিংয়ের কথা বলে ঘর ছাড়ে। নব্য জেএমবির তরুণ প্রশিক্ষক হিসেবে গাইবান্ধা ও বগুড়ার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গুলশান হামলায় অংশ নেওয়া হামলকারীদের ধর্মীয় ও শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয় রিগ্যান। তার বাড়ি বগুড়ার জামিলনগর এলাকায়, বাবার নাম মৃত রেজাউল করিম। ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই কল্যাণপুরের জঙ্গি আস্তানায় অভিযানে পালিয়ে যাওয়ার সময় রিগ্যানকে গ্রেপ্তার করেন সিটিটিসি'র সদস্যরা। ওই বছরের ৩ অক্টোবর হামলায় নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়। এ মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার দেখায় ২০১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। হামলায় অংশ নেওয়া মোবাশ্বর, নিবরাস, খায়রুল, রোহান, পায়েল ও উজ্জলসহ সাতজনকে প্রশিক্ষণ দেয় রিগ্যান।

মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান: গুলশান হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র, বিস্ফোরক ও গোলাবারুদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার সীমান্ত থেকে ঢাকায় আনার দায়িত্ব ছিল মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের। মামলার তদন্তে উঠে এসেছে– আমের ঝুড়িতে করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক ঢাকায় এনে তামিম ও মারজানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো মিজান। ২০১৬ সালের ২ নভেম্বর রাজধানীর দারুস সালাম এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ তাকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ২৬ মার্চ আদালতে জবানবন্দি দেয়। পুরনো জেএমবির সদস্য বড় মিজান চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় নব্য জেএমবি'র আঞ্চলিক সংগঠক ও সামরিক কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো। গ্রেপ্তারের পর ২০২০ সালের ২৬ মার্চ হলি আর্টিজানে হামলার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়।

মামুনুর রশিদ রিপন: গুলশান হামলার পরিকল্পনা ও হামলায় অংশ নেওয়া জঙ্গিদের সরবরাহকারী হিসেবে নাম এসেছে নব্য জেএমবির নেতা মামুনুর রশীদ রিপনের। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটার জঙ্গি সরোয়ার,

মারজানা, বাশার, রায়হানের সঙ্গে হামলার পরিকল্পনার বৈঠক করে। হামলার জন্য জঙ্গি হাদিসুর রহমান সাগরের সঙ্গে একে ২২ রাইফেল, পর্যাপ্ত গুলি এবং চারটি গ্রেনেড, দুটি ৭.৬২ পিস্তল ও ১২ রাউন্ড গুলি মারজানের মাধ্যমে তামিম চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেয়। এক সময় পুরনো জেএমবির শীর্ষ নেতা ছিল রিপন। পরবর্তীকালে নব্য জেএমবিতে যোগ দেয়। বাংলাদেশে এসে তামিম চৌধুরী যে কয়জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে নব্য জেএমবি গঠন করে, রিপন তাদের মধ্যে অন্যতম। সে এক সময় উত্তরবঙ্গের সামরিক কমান্ডার হিসেবে কাজ করতো। গুলশান হামলায় জড়িত থাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে একাধিক হত্যাকাণ্ডেও জড়িত। তার গ্রামের বাড়ি বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার চৌদীঘির মারিয়া এলাকায়, বাবার নাম নাছের উদ্দিন।

শরীফুল ইসলাম খালিদ: রিপনের মতো খালিদও হলি আর্টিজানে হামলার পরিকল্পনায় সহযোগিতা, হামলা বাস্তবায়ন ও হামলাকারী সরবরাহে ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া হামলাকারীদের জায়গা মতো পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের অর্থ সহায়তা করতো। খালিদ জঙ্গি রাজীব গান্ধীর মাধ্যমে হামলাকারী পায়েল ও শরীফুল ইসলাম ডনকে বাছাই করে। এছাড়া আগে থেকেই মোবাশ্বর, রোহান ও উজ্জল তার কাছে ছিল। তাদের সবাইকে গাইবান্ধার চরাঞ্চলে প্রশিক্ষণ দেয়। খালিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল। নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতা তামিম চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম থেকেই যোগাযোগ ছিল তার। রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার শ্রীপুর এলাকায় তার গ্রামের বাড়ি। বাবার নাম আব্দুল হাকিম।

এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালত প্রত্যাশিত রায় দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের তৎকালীন অতিরিক্ত কমিশনার ও সিটিটিসি ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই মামলাটির তদন্তে চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ অভিযুক্তদের পাঁচ জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বিভিন্ন অভিযানে আরও আটজন মারা যায়। তারপরও ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা আলামত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং জীবিত জড়িতদের জবানবন্দির মাধ্যমে অভিযুক্তদের সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি প্রত্যাশিত রায় হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২০১৬ সালের ২ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,
আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা জানেন, গতরাতে (১লা জুলাই) কতিপয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে হামলা চালায়। সেখান অবস্থানরত নিরস্ত্র, বেসামরিক নাগরিকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এবং হত্যাকাণ্ড শুরু করে।

পবিত্র রমজান মাসে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা যখন এশা ও তারাবির নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এই হামলা ধর্ম ও মানবিকতাকে অবমাননা করেছে। এই বর্বর ও কাপুরুষোচিত আক্রমণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশে নজিরবিহীন।

হামলার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আমার সরকার দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেয়। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছায় এবং উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর কমান্ডোরা অভিযানে অংশগ্রহণ করে আজ সকালে জিম্মিদের মুক্ত করে আনে। ৬ জন হামলাকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। তিনজন বিদেশিসহ ১৩ জন জিম্মিকে আমরা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সমর্থ হই।

এ অভিযানে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, ফায়ারসার্ভিসসহ অন্যান্য বাহিনীর যেসব সদস্য অংশ নিয়েছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব সম্প্রদায়ের নেতারা যারা আমাদের সাথে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই নৃশংস হামলায় ২ জন পুলিশ সদস্য নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমি নিহত পুলিশ সদস্য এবং সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা দ্রুত আরোগ্যলাভ করুন– মহান আল্লাহ-তায়ালার কাছে এই প্রার্থনা করছি। নিহতদের স্মরণে দুইদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ যখন একটি আত্ম-মর্যাদাশীল এবং আত্ম-নির্ভরশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন দেশি-বিদেশি একটি চক্র বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে বানচালের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। অস্ত্রের মুখে নিরীহ সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে এরা দেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করাতে চায়।

গণতান্ত্রিক পথে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে এরা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। কোমলমতি যুবক-কিশোরদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মানুষ হত্যা করছে।

বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ ষড়যন্ত্রকারীদের কৌশল বাস্তবায়িত হতে দেবে না। দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে যে কোন মূল্যে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করব।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের উপর আস্থা রাখুন। ত্রিশ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আমরা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মুষ্টিমেয় বিপথগামী সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস-বিরোধী কমিটি, কম্যুনিটি পুলিশ এবং

সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে সন্ত্রাস মোকাবিলায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

যেসব কোমলমতি যুবক-কিশোর বিপথে পরিচালিত হচ্ছেন, যারা তাদের মদদ দিচ্ছেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন– মানুষকে হত্যা করে কী অর্জন করতে চান? ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের নামে মানুষ হত্যা বন্ধ করুন। অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান, আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা দিন। তারা যাতে বিপথে না যায় সেদিকে নজর রাখুন। বিপথগামীদের প্রতি আহ্বান আপনারা সঠিক পথে ফিরে আসুন। ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখুন।

প্রিয় দেশবাসী,

সন্ত্রাসীদের সমূলে নির্মূল করে আমরা বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করবই, ইনশাআল্লাহ। কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবে না। আসুন, আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একটি নিরাপদ বাংলাদেশ, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করি। খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
(সূত্র: কালের কণ্ঠ, ২ জুলাই, ২০১৬)

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

মিয়ানমারের সঙ্গে জলপথে ৬১ কিলোমিটার এবং স্থলপথে ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত বাংলাদেশের। এই সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারে গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের শিকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসে টেকনাফ-কক্সবাজার-বান্দরবান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারী এই রোহিঙ্গাদের এক সময় মানবিক কারণে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ। দীর্ঘকাল এক বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী এ দেশে অবস্থানের কারণে বিষয়টি এখন জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ জননিরাপত্তা– সর্বোপরি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য সমূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্যাতনের বিষয়টি বহু আগে থেকে শুরু হলেও এর মাত্রা বেড়েছে ২০১২ সালে। এ সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয় উগ্রবাদী বৌদ্ধ রাখাইন সম্প্রদায় ও দেশটির সেনাবাহিনী। এক রাখাইন তরুণীকে মুসলিম কর্তৃক ধর্ষণ ও হত্যার গুজবকে কেন্দ্র করে একই বছর ৮ জুন রোহিঙ্গা নিধন শুরু হয়। ২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনার জের হিসেবে প্রায় এক লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়।

২০১৬ সালে মিয়ানমারের সহিংসতার পর হতে টেকনাফ উখিয়া সীমান্তে আদম পারাপারের দালালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদের বেশিরভাগই ১৯৭৮ ও ১৯৯১ সালে আসা অবৈধ ভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নাগরিক যারা জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গেও যুক্ত। রোহিঙ্গাদের বহুল আলোচিত জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও)-এর সাথে স্থানীয় জামায়াত নেতাদের প্রথম থেকেই আঁতাত রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের আগমন চার দশকেরও বেশি সময় থেকে শুরু হলেও ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরে এর মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ওই দিন মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বাংলাদেশ সীমান্ত চৌকির সন্নিকটে মংডু শহরের কাছে রোহিঙ্গাদের প্রায় ৩০০ জনের একটি সশস্ত্র দল মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী সেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ৯ জন বিজিপি (মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী সেনা) নিহত হয়। এরপর ১১ অক্টোবর তটমাদৌ অঞ্চলে একই ধরনের হামলায় আরো ৪ সেনা নিহত হয়। হামলাকারীরা আরএসও-এর সদস্য দাবি করলেও তারা 'হরকাতুল ইয়াকিন' নামে কাজ করছে। এই হামলার পর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ব্যাপকভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন ও বিতাড়ন অভিযান শুরু করে।

এরপর মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী দাবি করেছে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট আরাকানের মংডু এলাকার ৩০টি নিরাপত্তা চৌকিতে আরসা নামক একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী

হাতবোমা ও লাঠিসোটা, দা সহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একযোগে হামলা করেছে। এর প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী দমনের নামে রোহিঙ্গা বসতি এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। তারা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর, পথে ঘাটে যেখানে পেয়েছে সেখানেই নির্বিচারে হত্যা করেছে। নারীদের ধরে নিয়ে বিবস্ত্র করে একসাথে কোনো ঘরে বন্দি রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ চালিয়েছে বর্মি সেনারা। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গা নারীদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ পথের পাশে, বনে-জঙ্গলে অথবা ক্ষেতের আইলের কাছে পাওয়া গেছে।

১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমার সীমান্তবর্তী উখিয়া লণ্ডাখালী পাহাড়ী গুহায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় ৪১ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। লণ্ডাখালী পাহাড়ি গুহাটি ছিল উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের পার্শ্ববর্তী। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও আফগানিস্তান থেকে তালেবান জঙ্গি প্রশিক্ষকগণ সেসময় বাংলাদেশি তালেবানী হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) এবং রোহিঙ্গা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিত। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের উচ্চতর সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো আফগানিস্তানে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেই রোহিঙ্গাদের এনআইডি বাতিল করা হয়। পরে ২০০৮ সালে ৯৮ হাজার রোহিঙ্গা এনআইডি হাতিয়ে নেয়। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে গেছে প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা। এরা ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। দালাল চক্রের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে জনপ্রতিনিধিদের যোগসাজশে প্রথমে জন্মনিবন্ধন হাতিয়ে নেওয়ার পর ইসি থেকে পেয়ে যাচ্ছে এনআইডি। এরপরে যার যার প্রয়োজনে নিচ্ছে পাসপোর্ট। পাসপোর্ট নেওয়ার পর রোহিঙ্গারা বিদেশে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে। লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশি এনআইডিধারী এবং ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রয়েছে।

মিয়ানমারে সৃষ্ট রোহিঙ্গা সংকটের ভয়াবহ প্রতিঘাত অনুসন্ধানের জন্য 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ২০১৭ সালের ১১ অক্টোবর 'বার্মার গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করে। ২০১৭ সালের ২১-২২ অক্টোবর কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুল হুদার নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে প্রায় দুইশ, ভুক্তভোগী জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন যাদের ভেতর হিন্দু রোহিঙ্গাও ছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তিনজন প্রাক্তন বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর দুজন প্রাক্তন মেজর জেনারেল ও পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক সহ বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা।

জবানবন্দিতে রোহিঙ্গারা বার্মার সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় মগদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিবরণ দিয়েছেন। রোহিঙ্গা হিন্দু শরণার্থীরা বলেছেন তারা জঙ্গি রোহিঙ্গা মুসলিমদের সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার কারণে চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ও দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

২০১৭ সালের ২১ তারিখ সন্ধ্যায় নাগরিক কমিশন ত্রাণ-পুনর্বাসন-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। যেভাবে নাগরিক কমিশন ভুক্তভোগী রোহিঙ্গাদের জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন, একইভাবে নাগরিক কমিশনের সচিবালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছয় মাসে দশ হাজার ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা শরণার্থী জবানবন্দি সংগ্রহ করেন। মাঠপর্যায়ে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দী সংগ্রহের জন্য 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে, সে প্রশ্নমালার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে–

১) বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও গণবিতাড়নসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এর জন্য দায়ি ব্যক্তিদের শনাক্ত করা,
২) আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন অনুযায়ী রোহিঙ্গারা কীভাবে বার্মার বৈধ নাগরিক তা প্রমাণ করা,
৩) বার্মায় ধারাবাহিক রোহিঙ্গা নির্যাতন এবং তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়নের কারণ অনুসন্ধান এবং বন্ধের জন্য করণীয় নির্দেশ,
৪) বার্মার সরকার, সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা যায় কি না,
৫) রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বার্মা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে কি না,
৬) সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য 'আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি' এবং রোহিঙ্গাদের অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কোনো দায়-দায়িত্ব আছে কি না, থাকলে কতটুকু এবং এ ব্যাপারে করণীয়।
৭) রোহিঙ্গাদের ভেতর জঙ্গি মৌলবাদ বিস্তারের কারণ এবং রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে কিনা এবং এ বিষয়ে ভারত এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে কিভাবে সতর্ক করা যায়।
৮) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিবেচনা।
৯) বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, পরিবেশ, জন নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার উপর কী ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

অতীতে বিভিন্ন সংকটকালে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যেভাবে নাগরিক কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল— রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলার জন্য একইভাবে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করা হয়। ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব হচ্ছেন যথাক্রমে বিচারপতি শামসুল হুদা ও বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, এঁরা দুজনই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন— বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম,

অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সঙ্ঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, মওলানা ফরিদউদ্দিন মসউদ, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক, অধ্যাপক অনুপম সেন, সাংবাদিক কামাল লোহানী, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, স্থপতি রবিউল হুসাইন, রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বান্দরবানের মারমা রাজা উ চ প্রু, স্বামী তপনানন্দগিরি মহারাজ, ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, অধ্যাপিকা আথিন রাখাইন (প্রাক্তন এমপি), মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাংবাদিক মুহম্মদ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ব্যাংকার ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার (প্রাক্তন আইজিপি), নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোঃ আবদুর রশীদ (অবসরপ্রাপ্ত), নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এ কে মোহম্মাদ আলী শিকদার (অবসরপ্রাপ্ত), মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আমজাদ হোসেন, ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, মানবাধিকার কর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস, কলামিস্ট মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, মানবাধিকার কর্মী পি আর বড়ুয়া (প্রাক্তন ডিআইজি), সমাজকর্মী রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া, সমাজকর্মী প্রমথ বড়ুয়া, ডঃ পি কে বড়ুয়া, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, মানবাধিকার কর্মী নির্মল রোজারিও, মানবাধিকারকর্মী অশোক বড়ুয়া, কবি ফরিদা মজিদ, অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া, মানবাধিকার কর্মী আরমা দত্ত, মওলানা জিয়াউল হাসান ও লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। এই কমিশনকে সহযোগিতার জন্য সাংবাদিক, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে একটি সচিবালয় গঠন করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষণাধর্মী বহু বইপুস্তক, সাময়িকী এবং দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছে গণকমিশনের সচিবালয়ের সদস্যবৃন্দ। গণকমিশনের অনুসন্ধান অনুসারে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী বলতে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী বা উদ্বাস্তুদের বোঝানো হয়েছে।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে। পরে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে ওই দুই লাখ রোহিঙ্গা নিজ দেশে ফিরে যায়। এরপর দ্বিতীয় দফায় রোহিঙ্গাদের প্রবেশ ঘটে ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে। সেসময় প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তাদের কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার ১৪টি অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়। ওই রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে প্রায় দুই লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গাকে কয়েক বছরের মধ্যে ফেরত নেয় মিয়ানমার সরকার। আরও প্রায় ৩৩ হাজার রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া হয় টেকনাফের হ্নীলার নয়াপাড়া ও উখিয়া উপজেলার কুতুপালং আশ্রয় শিবিরে। তৃতীয় দফায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা প্রবেশের করে ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে। সে সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় প্রায় ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা। সবশেষ ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে চতুর্থ বারের মতো প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

এই চার দফায় কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের প্রায় আট হাজার একর বনভূমিতে নির্মিত নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে মোট ৩৪টি আশ্রয় শিবিরে এখন প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, কক্সবাজারে সব মিলিয়ে অন্তত ১১ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে।

২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে এখন ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ রেজিস্ট্রেশনের তথ্যমতে, '২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অবস্থান করছে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর সাথে রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর যোগাযোগের প্রমাণ হচ্ছে কক্সবাজারে অতীতে কয়েকটি স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর হামলার ঘটনা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা নারকীয় হামলা চালায় কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধবিহার ও বড়ুয়াপল্লীতে।

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফে ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের একটি অংশ খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, অস্ত্র ও মাদক পাচার, ডাকাতিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গত ৪ বছরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে হত্যার শিকার হয়েছে ৭১ জন। মামলা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩০০টি। এতে আসামি হয়েছে ২ হাজার ৮৫০ রোহিঙ্গা।

অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরেই অন্তত ২০ থেকে ২৫টি সক্রিয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে উঠেছে। এর বাইরে ক্যাম্পকেন্দ্রিক রয়েছে আরও একাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী। প্রত্যেক বাহিনীতে ৩০ থেকে ১০০ জন পর্যন্ত সদস্য রয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে ক্যাম্পগুলো হয়ে ওঠে অপরাধের অভয়ারণ্য।

ক্যাম্পে বহুল পরিচিত সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে রয়েছে মাস্টার মুন্না গ্রুপ, মৌলভী ইউসুফ গ্রুপ, রকি বাহিনী, শুক্কুর বাহিনী, আব্দুল হাকিম বাহিনী, সাদ্দাম গ্রুপ, জাকির বাহিনী, নবী হোসেন বাহিনী, পুতিয়া গ্রুপ, সালমান শাহ গ্রুপ, গিয়াস বাহিনী, শাহ আজম গ্রুপ ইত্যাদি।

২০২১ সালের ১ অক্টোবর ভোরের কাগজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কক্সবাজার জেলা পুলিশের তথ্যমতে, গত চার বছরে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ১২ ধরনের অপরাধে ১ হাজার ২৯৮টি মামলা হয়েছে। এতে আসামি হয়েছেন ২ হাজার ৮৫০ রোহিঙ্গা। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে– ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, অস্ত্র ও মাদক পাচার, মানব পাচার, পুলিশের ওপর হামলার মতো ঘটনা। এ সময়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৭১টি খুন, ৭৬২টি মাদক, ২৮টি মানব পাচার, ৮৭টি অস্ত্র, ৬৫টি ধর্ষণ ও ১০টি ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে। ৩৪টি মামলা হয়েছে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের অপরাধে। অন্যান্য অপরাধে হয়েছে ৮৯টি মামলা।

'২০১৭ সালে নানা অপরাধে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ছিল ৭৬টি। আসামি ছিল ১৫৯ জন। ২০১৮ সালে ২০৮ মামলায় আসামি ৪১৪ জন। ২০১৯ সালে মামলার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬৩টি। যার আসামি ৬৪৯ জন। ২০২০ সালে ১৮৪ মামলায় হয়েছে ৪৪৯ আসামি। ২০২১ সালের প্রথম ৮ মাসে ৫৭০ মামলায় আসামির সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়ে যায়।'

গণকমিশনের সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বনাঞ্চল উজাড় করে গড়ে উঠেছে অবৈধ রোহিঙ্গা বসতি। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট, মূল্যবান বনজসম্পদ উজাড় করে আশঙ্কাজনক হারে গড়ে ওঠা ওই সব বস্তিতে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা চোরাচালান, ছিনতাই ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড ও রোহিঙ্গা নারীরা পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। আশির দশকে আসা রোহিঙ্গারা বর্তমানে উখিয়া টেকনাফ এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্ব করাসহ স্থানীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তা ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় এসব অপরাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। অথচ রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বিবার আবদ্ধ হওয়া সরকারিভাবে নিষেধাক্কা রয়েছে। ওই সব রোহিঙ্গারা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আলিশান দালান তৈরি করে স্থানীয় হিসেবে বসবাস করছে। এমনকি অনেক রোহিঙ্গা দীর্ঘদিন ধরে এ দেশে বসবাস করায় বাংলাদেশি দাবি করে জাতীয় সনদও সংগ্রহ করে নিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রোহিঙ্গারা মাদক এবং অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদী রাজনীতির একটি উৎসও তারা। রোহিঙ্গাদের অনেকে বাংলাদেশের ভোটার, পাসপোর্টধারী। বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে অনেক রোহিঙ্গাই বিদেশে চলে গেছে।

বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে কক্সবাজার অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি ক্রমশ: জটিল হয়ে উঠেছে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যতই বিলম্বিত হচ্ছে ততই আশ্রিত এ জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে থাকা সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সক্রিয় হচ্ছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে থাকাকালে এদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে বিভিন্ন জঙ্গি বিদ্রোহী গ্রুপের জন্ম হয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাতে রাখাইনে সশস্ত্র সেনা অভিযানের পর যে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে তাদের সঙ্গে এসব বিদ্রোহী সংগঠনের অনেকেও চলে এসেছে। কেউ কেউ সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে এসেছে এমনও ঘটনা পরে ধরা পড়েছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর হামলার মুখে ওরা টিকতে পারেনি। এখন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার সুবাদে এসব বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্যদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উখিয়া-টেকনাফের ৩৪ শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মাঝে গ্রুপিংও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জঙ্গিগোষ্ঠী কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত। বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের এক প্রকারে জিম্মি করে রেখেছে তারা। সশস্ত্র রোহিঙ্গারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সাধারণ রোহিঙ্গাদের হুমকির মুখে রেখেছে। তারা রাতের বেলায় ক্যাম্পে অস্ত্র উঁচিয়ে বিভিন্ন ব্লক ও শেডে ঘোরাফেরা করে থাকে।

আরাকান বিদ্রোহী জঙ্গি গ্রুপের ওই ক্যাডারদের কারণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জঙ্গিবাদ বিস্তৃতি ঘটেছে। এ পারের বিভিন্ন স্থানে ঘাপটি মেরে থাকা আরাকান বিদ্রোহী গ্রুপের ক্যাডারদের কারণে ক্যাম্পে আশ্রিত সন্ত্রাসী রোহিঙ্গারা বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। নতুন জঙ্গিদের সঙ্গে 'আরএসও'র (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন) সাবেক কিছু ক্যাডার বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। পুরনো রোহিঙ্গা নেতাদের লক্ষ্য হচ্ছে, রোহিঙ্গাদের সহসা ফেরত যাওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। পুরনো রোহিঙ্গা নেতাদের কেউ কেউ বিদেশী অর্থ এনে লাভবান হচ্ছে, আবার কেউ কেউ বিদেশি অর্থে বিভিন্ন এনজিও'র ছদ্মাবরণে রোহিঙ্গা সেবার নামে বিভিন্ন স্থাপনা ও ত্রাণ বিতরণের ব্যানারে নিজ স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। ক্যাম্পে অবস্থানকারী সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের (আরএসও) ক্যাডাররা আর্থিক সহযোগিতা দেয়া ছাড়াও তাদের অস্ত্রের জোগান দিচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন আরিফ উল্লাহ (৩৮)। উচ্চ শিক্ষিত এই রোহিঙ্গা নেতা ছিলেন উখিয়ার বালুখালী-২ ক্যাম্পের হেড মাঝি। তিন সন্ত্রাসী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ২০১৮ সালের ১৮ জুন রাতের আঁধারে তাকে গলা কেটে হত্যা করে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরসা'র সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তার পরিবারের সদস্যরা ভয়ে পালিয়ে গেছে টেকনাফের লেদা শরণার্থী শিবিরে। উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের আরেক শীর্ষ মাঝি আবু ছিদ্দিক। ক্যাম্পের ভেতরেই তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃতভেবে বীরদর্পে চলে যায় জঙ্গিরা। পরে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় হাসপাতালে। আবু ছিদ্দিক বেঁচে গেলেও দুই হাত হারিয়ে তিনি এখন পঙ্গু। বালুখালী ক্যাম্পের ডি ব্লকের নুর আলম (৪৫), মো. খালেক (২২) ও কুতুপালং ই ব্লকের মো. আনোয়ারকে (৩৩) ২ সেপ্টেম্বর ক্যাম্প থেকে ধরে নিয়ে যায় সন্ত্রাসী বাহিনী। পরের দিন হোয়াইক্যং ইউনিয়নের পারিয়াপাড়ার পাহাড়ি এলাকা থেকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এই তিন রোহিঙ্গাকে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা গোয়েন্দাগিরিতে সক্রিয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে জঙ্গি সংগঠন। বিভিন্ন ক্যাম্পে অস্ত্র-কিরিচ, ডিজিটাল ব্যানার ও পেস্টুন সরবরাহ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু আরএসও ও হরকাহ ইয়াকিন ক্যাডার রোহিঙ্গা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তারা রাতের বেলায় ক্যাম্প অভ্যন্তরে খোলা মাঠে সন্ত্রাসী যুবকদের প্রশিক্ষণ। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের নিয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা কমিটি গঠন করেছে রোহিঙ্গা কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। নিজস্ব গোয়েন্দা হিসেবে ক্যাম্পে নিয়োজিত করা হয়েছে ১ হাজার ২০০ রোহিঙ্গা যুবককে। তাদের হাতে দেয়া হয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে মুঠেফোন আশ্রয় শিবিরে থাকলেও নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর অভাব নেই দেখে সাধারণ রোহিঙ্গারা পুরনো ওই নেতাদের (আরএসও) কথা অনুসরণ করে চলেছে। স্বদেশে ফিরে যেতে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে রোহিঙ্গারা।

টেকনাফ ও উখিয়ার ৩৪টি অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে ১'শ জন করে মোট বার'শ রোহিঙ্গা গোয়েন্দাগিরি করে প্রতিমুহূর্ত রিপোর্ট দিচ্ছে আরএসও এবং হরকাহ ক্যাডারদের। ওই কমিটির নেতৃত্ব পর্যায়ে ১২ নেতা হচ্ছেন- মিয়ানমারের নিজাম

উদ্দিনের পুত্র মৌলবি ওসমান নেজামী, আবু তাহেরের পুত্র মৌলবি আবদুর রহিম, আলী হোছাইনের পুত্র মৌলবি মোয়াজ্জেম হোছাইন, সিরাজুল মোস্তফা ওরফে ফায়দা হাজীর পুত্র মৌলবি আয়াছ, জাফর আহমদের পুত্র মৌলবি শফিকুর রহমান, মোস্তাক আহমদের পুত্র সেলিম উল্লাহ, মোজাহের হোছাইনের পুত্র মৌলবি ইয়াহিয়া, মোহাম্মদুল্লাহর পুত্র হাফেজ হাশিম, আবদুল কাদেরের পুত্র মো: জুবাইর, আবদুল জলিলের পুত্র মো: রুহুল আমিন, হীলার মৌলবি শামসু প্রকাশ বাইট্টা শামসু ও মৌলবি আবদুল হামিদ। এদের সবাই বর্তমানে রোহিঙ্গা বিভিন্ন ক্যাম্পে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে পুরনো রোহিঙ্গা নেতা (আরএসও) এবং বিদেশি একাধিক চক্র (এনজিও)। তারা দেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে মিয়ানমারে ফেরতের বিষয়ে কাজ করছে। বাছাই করে ১২টি ক্যাম্পে নিজস্ব গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োজিত করা রোহিঙ্গাদের কাজ হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে কারা প্রত্যাবাসনে ইচ্ছুক, তাদের খুঁজে বের করার পর গোপন স্থানে নিয়ে শাস্তি দেয়া। সরকারি সংস্থার লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করা ও ক্যাম্পে প্রত্যাবাসন বিরোধী এনজিও কর্মীদের নানা তৎপরতায় শেল্টার দিচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যদের পাহারায় রেখে ৩৪টি আশ্রিত ক্যাম্পে সন্ত্রাসী ওই রোহিঙ্গারা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রত্যাবাসনবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিয়ানমার মংডুর আন্দাং কুলুং বড়ছরা এলাকার বাসিন্দা মৃত নেজাম উদ্দিনের পুত্র রোহিঙ্গা জঙ্গি মৌলবি ওসমান নেজামী মিয়ানমারের সশস্ত্র জঙ্গি গ্রুপ আল ইয়াকিনের (আরসা) সক্রিয় সদস্য। তার সহোদর ৬ ভাই আরসা সদস্যদের অন্যতম। তারা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সঙ্গে নির্যাতিত রোহিঙ্গা দাবি করে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে বালুখালী ক্যাম্পে। তারা প্রতিটি ক্যাম্পে আরএসও ক্যাডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিরোধী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি ওসমান কয়েক বছর আগে রামু খুনিয়াপালং পাইনবাগানে আস্তানা গাড়লেও তার ৬ সহোদর উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা হিসেবে রয়েছে। ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি বালুখালী ক্যাম্পে সন্ত্রাসী দুই রোহিঙ্গা গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে জঙ্গি ওসমানের এক ভাই। অপর সহোদর ছৈয়দ হোসেন বালুখালী ক্যাম্পের শেড মাঝি হিসেবে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে না যাবার লক্ষ্যে প্রভাব খাটাচ্ছে। যে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে মুঠোফোনে জানিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ক্যাম্পে এক যোগে কাজ করার জন্য আরএসও ক্যাডারদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ।

রোহিঙ্গাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীতে রয়েছে, মৌলবি নুরুল হক, ইয়াছিন, নজির আহমদ, কামাল, মো: শফি উল্লাহ, মাষ্টার সোলতান, রশিদুল্লাহ, আনছারুল্লাহ, মোহাম্মদ নুর, আবু ছিদ্দিক, মনিরুজ্জামানন, মৌলবি আবুল ফয়েজ, নুরুল ইসলাম, জাহেদ, মো: সোয়েইব, ছমি উল্লাহ, জুবাইর, আনোয়ার, নুরুল আমিন, নুর মোহাম্মদ, সোলতান আহমদ, দিল মোহাম্মদ, জাকারিয়া, মো: হেলাল, ইবনে আমিন, কবির আহমদ, হাফেজ আহমদ, শব্বির আহমদ ও শামসুল আলমসহ অনেকে। তারা টেকনাফের উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পের পুরনো ও নতুন রোহিঙ্গা।

কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প অপরাধীদের আখড়া ঃ কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প যেন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। সন্ত্রাস, মানব পাচার, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, জঙ্গি তৎপরতা এখানে অনেকটা অবাধেই চলে।

কুতুপালং ক্যাম্পে প্রতিদিন ইয়াবা এখানে মজুদ করার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। মানব পাচার ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে ক্যাম্পে সংঘবদ্ধ চক্র। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজনকে অপহরণ করে এনে ক্যাম্পে ররখে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনাও ঘটছে। কুতুপালং ক্যাম্পে সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত শরণার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজার ১৭৬। অথচ এই ক্যাম্পে তালিকাবহির্ভূত প্রায় ৮০ হাজার রোহিঙ্গা অবৈধভাবে অবস্থান করছে। তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পের পাশেই আছে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের বস্তি। সেখানে ১০ হাজার ঝুপড়ি ঘরে বাস করছে ৮০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা। সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, এই বস্তি নিয়ন্ত্রণ করছে ৪৮ জনের একটি সিন্ডিকেট। এদের মধ্যে অনেকে জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত।

ক্যাম্পে ৮ হাজার পরিবারের কাছ থেকে প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ভাড়া (চাঁদা) আদায় করছে এই সিন্ডিকেট। প্রতিমাসে আদায় চাঁদার বাইরেও নানা অজুহাতে টাকা আদায় করা হয়। রোহিঙ্গাদের অভিযোগ, সিন্ডিকেটকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে পুলিশ ও ক্যাম্পের কর্মকর্তারা। এদের বিরুদ্ধে কথা বললে চালানো হয় নির্যাতন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, অবৈধ বস্তি নিয়ন্ত্রণ করছে ৪৮ জনের কমিটি অর্থাৎ সিন্ডিকেট। কমিটির চেয়ারম্যান আবু সিদ্দিক, ভাইস চেয়ারম্যান সিরাজুল মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ব্লক ভিত্তিক। তার মধ্যে রয়েছেন ডি-ব্লকের মোহাম্মদ জিয়া, এ-১ ব্লকের আবদুস শুক্কুর, আবদুল হাফেজ, এ-২ ব্লকে মান্নান, বি-ব্লকে মোহাম্মদ নুর, বি-১ ব্লকে আমিন, তাহের, বি-২ ব্লকে মোহাম্মদ আলম, নুরুল ইসলাম, শফিক, বি-৩ ব্লকের আবু তৈয়ুব, নুর হোসেন, জকরিয়া, আমির হামজা। ডি-ব্লকে দায়িত্বে রয়েছেন রফিক, ডি-১ ব্লকে আবু জাফর, আবদুল্লাহ, জাফর, ডি-২ ব্লকে মনিরুজ্জামান, আবদুল মাজেদ, ডি-৩ ব্লকে মোহাম্মদ হোসেন ওরফে কালা বদা, সৈয়দুল আমিন ডাইলু, মজিদ, ডি-৪ ব্লকে রুহুল আমিন, মোহাম্মদ সালাম, শমশু, আবদুস সালাম, ডি-ব্লকে মোহাম্মদ আলী, নুরুল আমিন ও কালু। সি-১ ব্লকে দায়িত্বে রয়েছেন মৌলভী রফিক, মোহাম্মদ আলম, সি-২ ব্লকে মোস্তফা কামাল, উলা মিয়া, ই-১ ব্লকে আবুল কালাম, হাবিব, নুর আলম, ই-২ ব্লকের আলী হোসেন, সলিম, মৌলভী জামাল, মোহাম্মদ বাসের, ফরিদ এবং আবু সৈয়দ।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি ও সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের বেপরোয়া চলাফেরায় স্থানীয়রা আতঙ্কে রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে চলছে ওসব অস্ত্র। তারপরও প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ক্যাম্প অভ্যন্তরে বহু সন্ত্রাসী রোহিঙ্গা অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ায়। তারা অস্ত্র উঁচিয়ে সাধারণ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে রাজি না হতে হুমকি দিচ্ছে। মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশের সময় বিস্ফোরকসহ ওসব ভারী অস্ত্র নিয়ে আসতে পারে বলে ধারণা এলাকাবাসীর। এছাড়াও কিছু পুরনো রোহিঙ্গা নেতা এবং

এনজিও প্রতিনিধিরা প্রত্যাবাসন কাজে বিরোধিতা করতে সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। কিছু এনজিও ফিরে না যেতে রোহিঙ্গাদের উস্কানি দিচ্ছে। সেবার নামে বিদেশি ফান্ড এনে সিংহভাগ নিজেরাই আত্মসাৎ করতে ওই এনজিও কর্মীরা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ষড়যন্ত্র করছে বলে জানা গেছে।

২০১৬ সালের ৩ ডিসেম্বর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জঙ্গলে ভারি অস্ত্র হাতে কয়েক রোহিঙ্গাকে দাঁড় করিয়ে বিদ্রোহীদের দলপতি মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানের ভিডিওচিত্র পোস্ট করে সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুকে। মিয়ানমার সরকার ওই ভিডিওচিত্র দেখে সশস্ত্র রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের (আরএসও) এ ঘটনায় অভিযুক্ত করে। অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর মংডুতে সশস্ত্র সন্ত্রাসী রোহিঙ্গারা দেশটির সেনা সদস্য বহনকারী একটি গাড়িতে অতর্কিত হামলে পড়ে। এরপর থেকে মূলত সেনা-পুলিশ ও রাখাইন সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই ঘটনায় এক সেনা কর্নেলসহ ৬জন নিহত হয়েছে। সন্ত্রাসী রোহিঙ্গারা পুলিশ পোস্টে হামলা, অস্ত্র লুট ও ভিডিওচিত্র ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পোস্ট না করলে হয়ত রোহিঙ্গা জাতির জন্য দেশত্যাগ করার মতো এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না বলে জানিয়েছেন আরাকানে বসবাসরত একাধিক ব্যবসায়ী।' (জনকণ্ঠ, ৩ ডিসেম্বর ২০১৬)

২০১৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দেশ-বিদেশে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর রোহিঙ্গাদের মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বরোচিত হামলার মাধ্যমে পাশবিক নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞের বিষয়টি নিয়ে যখন নিন্দা, ঘৃণা, ধিক্কারের ঝড় বইছে তখন তিনটি টেলিফোন কথোপকথনের ভয়েস রেকর্ড হস্তগত করেছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা। রোহিঙ্গা জাতিগত নিধনের যে নীলনক্সা তৈরি করেছে তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) যে উস্কানি দিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে টেলিফোনে কথোপকথনের ভয়েস রেকর্ডে। পাকিস্তানের মাটিতে মিয়ানমারের আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মিও (আরসা) গঠন করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। বাংলাদেশের ভেতরে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ঠেলে দিয়ে অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির যে ছক কষা হয়েছে তাতে টেলিফোন ভয়েস রেকর্ডে তথ্য পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার আশফাক টেলিফোনে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির(আরসা) সামরিক প্রধান হাফিজ তোহার সঙ্গে কথোপকথন করেছেন তার ভয়েস রেকর্ড সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা।

'গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি) ও আকা মুল মুজাহেদীনের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে আরসার সামরিক কমান্ডার হাফিজ তোহার। গত ২৩ আগস্ট রাতে আইএসআইয়ের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার আশফাকের সঙ্গে ৩৪ মিনিটব্যাপী কথোপকথন হয় হাফিজ তোহার। ওই ফোন কলে হাফিজ তোহার জানান, তারা হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত। সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হয় এসব ফোন কলে। পরে বাংলাদেশী গোয়েন্দা

কর্মকর্তারা ভারতীয় গোয়েন্দাদের বিষয়টি জানায়। আইএসআই কর্মকর্তা আশফাক ফোনে হাফিজ তোহারকে বলেন, 'কালা আদমি রিপোর্টে দিতেহি হামলা হো'। তোহার উত্তর দিয়েছিলেন, 'জি জনাব', 'জো হুকুম। পার ২৪ রাত সে পেহলে নাহি হোগা'। 'কালা আদমি' (কালো মানুষ) বলতে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কোফি আনানকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) কর্মকর্তা আশফাক রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোফি আনানের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পরপরই হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।' (জনকণ্ঠ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

২০১৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিদ্রোহী রোহিঙ্গা সংগঠনের ওই নেতারা মিয়ানমারে হামলা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের দেশান্তর করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করাতে পরিকল্পণা গ্রহণ করে ২০১৬ সালে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা জঙ্গিদের পরামর্শ মতে অস্ত্র ও বোমা সংগ্রহ করে মিয়ানমারে আল-ইয়াকিনের (আরসা) কাছে পৌঁছাতে সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ১৩ মে টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে ১১টি অস্ত্র ও বিপুলসংখ্যক গুলি লুট করে নিয়ে যায় তারা। ওই সময় তাদের গুলিতে আনসার কমান্ডার মোঃ আলী হোসেন (৫৫) নিহত হন। পরে অবশ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লুণ্ঠিত ওসব অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক পুরনো রোহিঙ্গা নেতাকে। এরপর বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুই রোহিঙ্গাকে। পরবর্তীকালে গোয়েন্দা তৎপরতায় আটক করা সম্ভব হয়েছিল বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহকারী রোহিঙ্গা নেতা মৌলবি শফিককে। তবে পুলিশের দুর্বল রিপোর্টের কারণে তারা সহজে বেরিয়ে পড়ে জেলহাজত থেকে। এদিকে জেলা প্রশাসন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রত্যাবাসনবিরোধী আভাস ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে সন্ধ্যার পর এনজিওর কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বিকেল ৫টার আগেই স্থানীয় বা সাধারণ লোকজনকে ক্যাম্প ত্যাগ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ক্যাম্পগুলোয় প্রবেশ ও বহির্গমন পথ নির্ধারণ করে চেকপোস্ট বসানো হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।' (জনকণ্ঠ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

২০১৮ সালের ১৯ জুন কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আরিফুল্লাহ ছিলেন মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত রোহিঙ্গা। তিনি ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী থাকার কারণে বিদেশিদের সঙ্গেও তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। ইউএনও জানান, আরিফুল্লাহ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের লোকজনকে যথেষ্ট সহযোগিতা করে গেছেন। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রমেও তাঁর সহযোগিতা বেশ ভালো ছিল। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধানের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের সময় রোহিঙ্গাদের পক্ষে তিনিই বক্তব্য দিয়েছিলেন। ইউএনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জানান, আরিফুল্লাহ প্রতিপক্ষের হুমকির কারণে বালুখালী শিবিরে রাত যাপন করতেন না। তিনি সিএনজিচালিত ট্যাক্সি নিয়ে বের হওয়ার সময় শিবিরের বাইরে হামলার শিকার হন।' (কালের কণ্ঠ, ১৯ জুন ২০১৮)

দিন যত যাচ্ছে কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে। বাড়ছে অপরাধ। ছিনতাই, অপহরণ, খুনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের একটি চক্র। এরই মধ্যে এ চক্রটি 'রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত। তাদের উৎপাতে ধৈর্য হারাচ্ছে স্থানীয়রা। উচ্ছৃঙ্খল রোহিঙ্গাদের বেপরোয়া আচরণে স্থানীয়রা পড়েছে হুমকির মুখে।

২০১৯ সালের ৯ মার্চ সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করতেই ক্যাম্পে এই 'সন্ত্রাসী চক্র' তৈরি করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা নিরীহ রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দিতে বাংলাদেশ বহুমুখী সমস্যার মুখে রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও। তবে আশ্রয় নেওয়া এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোপনে সক্রিয় 'সন্ত্রাসী চক্র' এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মো. খালেদ নামে এক রোহিঙ্গা ফেসবুকে এক ভিডিওতে হুমকি দিয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের কোনো ক্ষতি করলে, জোর করে দেশে ফেরত পাঠালে বাংলাদেশ সরকারের সব দপ্তর এক রাতেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।' সে প্রধানমন্ত্রীকেও হুমকি দিয়ে বলেছিল, 'রোহিঙ্গাদের ওপর অন্যায্য কোনো আচরণ হলে ছাড় দেওয়া হবে না।

'প্রায় চার বছর ধরে জঙ্গি সংগঠন হুজির রিজিওনের দায়িত্ব পালনে ছিলেন যে ব্যক্তি তিনি এখন ছদ্মবেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ঠিকাদার। যিনি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন আল ইয়াকিনের বাংলাদেশের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে। কুখ্যাত এ রোহিঙ্গার নাম ঈসা সাইদী।' (সমকাল, ৯ মার্চ, ২০১৯)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি বিদেশি ফান্ডের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় গোপনে বিদেশে চলে যায় ঈসা সাইদী। ওই সময় মিয়ানমার সীমান্তে আরএসও'র ঘাঁটিতে থাকা কমান্ডার নাজমুল্লা'র মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে।

২০১৯ সালের ৬ নভেম্বর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আরএসও'র অর্থায়নে তার পরিচালনাধীন কুতুপালং পুরাতন ক্যাম্পে কয়েকটি মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে কুতুপালং পুরাতন রেজিস্ট্রার্ড ক্যাম্পের ফুটবল খেলার মাঠের ইমাম বোখারী মাদ্রাসার বছরের অর্ধেক বাজেট যোগান দেন তিনি। বালুখালী তাজনিরমার খোলা ক্যাম্পের আরএসএরও পরিচালিত ৮টি মাদ্রাসা মসজিদের ইমাম খতীবদের প্রতি মাসের বেতন দেন এই ঈসা সাইদী। এ ছাড়া তিনি রোহিঙ্গা যুবকদের আইটি বিশেষজ্ঞ করে তুলতে ২০২১ সালের রমজান মাসে মাদ্রাসা পড়ুয়া ২০০ রোহিঙ্গা ছাত্রদের ২৬ দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন। তুরস্কের দাউদ আসলাম নামে এক ব্যক্তির অর্থায়নে প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে (রোহিঙ্গা) উন্নত মডেলের একটি করে মোবাইল সেট বিতরণ করা হয়। তার পরিচালনাধীন একটি অনলাইন টিভিও রয়েছে। যেটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আরসার বিরোধিতা করার জন্য। বর্তমানেও অবৈধভাবে প্রশিক্ষণ দিতে কুতুপালং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা যুবকদের বাছাই করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সূত্রে জানা যায়, রোহিঙ্গাদের

স্বাধীনতাকামী আরাকানীদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ ইসলামী বুরমা' '৯৫ সালে হুজির সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করলেও বর্তমানে আরাকানী হুজিরা আল-মাহাদ আল ইসলামী নামে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। আল-মাহাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দায়িত্বে আছেন এই ঈসা সাইদী। কুতুপালং রেজিস্ট্রার্ড ক্যাম্পে ঈসা সাইদীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গারা প্রত্যাবাসনবিরোধী কর্মকাণ্ডে তৎপর।' (জনকণ্ঠ, ৬ নবেম্বর, ২০১৯)

রাখাইন রাজ্যের মংডু জেলার দক্ষিণ বড়ছড়া এলাকার জয়নাল আলী প্রকাশ জানে আলমের ছেলে আবদুল হাকিম বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল টেকনাফের পুরান পল্লানপাড়া এলাকার পাহাড়ে। এরপর গোপনে সেখানে গড়ে তুলেছে বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী। এই রোহিঙ্গাই এখন 'হাকিম ডাকাত', আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তালিকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী। তার সন্ত্রাসী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চাকমারকুল ক্যাম্প-২১ থেকে ক্যাম্প-২৭ জাদিমুড়া পর্যন্ত। তার কথার বাইরে পা ফেলার সুযোগ নেই রোহিঙ্গাদের।

২০১৯ সালের ১৯ নভেম্বর সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'খুন থেকে গুম, মাদক পাচার থেকে আদম পাচার- এমন কোনো অপরাধ নেই হাকিম ডাকাত এবং তার লোকজন করে না। টেকনাফের আলোচিত নুরুল কবির হত্যা, সিএনজি ড্রাইভার মো. আলী হত্যা, নতুন পল্লানপাড়ার সিরাজ মেম্বার ও মুন্ডি সেলিম হত্যা, আবদুল হাফিজ, তোফায়েল হত্যাসহ বহু হত্যা মামলার আসামি এই হাকিম ডাকাত।' (সমকাল, ১৯ নভেম্বর ২০১৯)

শুধু হাকিম ডাকাত নয়, এ রকম আরও কয়েকটি সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে উঠেছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। টেকনাফের নয়াপাড়ার আনসার ক্যাম্পে হামলা করে এক আনসার কমান্ডারকে খুন এবং অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটিয়েছিল রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নুরে আলম বাহিনী।

২০১৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। টেকনাফের নয়াপাড়া মুচনী ক্যাম্পের ই ব্লকের কাপড় ব্যবসায়ী নূর নবীর কাছে চাঁদাবাজি করতে যায় রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী জকির ও তার সহযোগী আমানসহ ১৫-২০ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এখন এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটাচ্ছে জকির বাহিনী। ক্যাম্পে প্রায় নিয়মিত হানা দিচ্ছে তারা, গুলি চালাচ্ছে, কায়েম করেছে ত্রাসের রাজত্ব।

২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'টেকনাফের নয়াপাড়ার সি ব্লকের আমিনের ছেলে জকির (২৮)। একাধিক বিয়ে করেছে সে। জকিরের নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি গ্রুপ রয়েছে। তাদের হাতে দেশি অস্ত্র ছাড়াও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।' (সমকাল, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

২০১৯ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২৫ আগস্টকে 'গণহত্যা দিবস' উল্লেখ করে কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং ক্যাম্পে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। রাখাইনে গণহত্যা, ধর্ষণসহ বর্বর নির্যাতন এবং জড়িত সেনাবাহিনী ও উগ্রপন্থি মগদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবিতে নিহত রোহিঙ্গাদের স্মরণে মহাসমাবেশে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত চলা এ সমাবেশে যোগ দিতে ভোর থেকেই বিভিন্ন ক্যাম্পের

রোহিঙ্গারা কুতুপালং চলে আসেন। মাথায় টুপি, সাদা শার্ট ও লুঙ্গি পরা রোহিঙ্গাদের অনেককেই 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখা টিশার্ট গায়ে জড়ানো দেখতে পাওয়া যায়। আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস নামের সংগঠনের চেয়ারম্যান মুহিব উল্লাহর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রোহিঙ্গা নেতা সৈয়দ উল্লাহ বলেন, 'দুই বছর ধরে আমরা পরবাস জীবন যাপন করছি। নিজ ভিটেমাটিতে এখনো ফিরতে পারিনি। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নেতারা আমাদের দেখতে আসেন, সহানুভূতি জানান কিন্তু কেউ আমাদের নিজ দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নেননি। এতে মিয়ানমারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীও ব্যর্থ।' (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ আগস্ট ২০১৯)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা সমাবেশটির আয়োজনের পেছনে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। সমাবেশ আয়োজনে রোহিঙ্গাশিবিরের ভেতরে ও বাইরে, এমনকি রোহিঙ্গা শিবির থেকে দূরে ইনানিতেও বৈঠক হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করেছে।

২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রেনুলাভ বি কসম্যান নামে এক বিদেশি ২০১৯ সালের ২৪ আগস্ট বাংলাদেশে আসেন। ওই দিন ঢাকার গুলশানের একটি হোটেলে তার থাকার জন্য কক্ষ বুক করা হলেও তিনি সেদিনই কক্সবাজারের কুতুপালং শিবিরে যান। তাঁর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা সমাবেশ আয়োজনে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। তার সঙ্গে সাংবাদিক পরিচয়ধারী এক ব্যক্তিও সার্বক্ষণিক ছিলেন। এ ছাড়া সাংবাদিক পরিচয়ধারী অন্য এক বিদেশি নারীও রোহিঙ্গা সমাবেশে তৎপর ছিলেন।

'রোহিঙ্গা সমাবেশের আয়োজনে বেশ কয়েকটি দেশি-বিদেশি এনজিওর বিরুদ্ধেও সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে কক্সবাজারের মুক্তি নামের একটি এনজিওর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে যে তারা রোহিঙ্গাদের নগদ অর্থ ছাড়াও সমাবেশের প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদানসহ নানাভাবে সহায়তা করেছে। তবে এনজিওটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রণজিত দাশ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

'সমাবেশ আয়োজনে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে আরেকটি স্থানীয় বিতর্কিত এনজিও পালস, বিদেশি এনজিও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যানিটারা, হেলবিটাচসহ আরো কয়েকটির সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধেও।' (কালের কণ্ঠ, ২৭ আগস্ট ২০১৯)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সশস্ত্র শক্তি বাড়িয়ে চলেছে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো। তারা ইয়াবার টাকায় সংগ্রহ করছে ভারি ও ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র। এগুলোর মজুদ তৈরি করে তারা বড় ধরণের নাশকতার পরিকল্পনায় অগ্রসর হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ক্যাম্পগুলোতে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে অন্তত ৮ থেকে ১০ হাজার রোহিঙ্গা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, শতাধিক দেশি-বিদেশি এনজিওতে নানা পদে মাসিক বেতনে চাকরি করছে। নাইটগার্ড, ভলান্টিয়ার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার

কল্যাণকর্মী, নির্মাণকর্মী, শিক্ষক, সুপারভাইজরসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে মাসিক ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে। ক্যাম্প অভ্যন্তর ও সংলগ্ন ১০ থেকে ১২টি হাট-বাজারসহ ক্যাম্পের অলিগলিতে ছোট, মাঝারি ও বড় দোকান রয়েছে অন্তত ৫ থেকে ৬ হাজার। এসব চাকরিজীবী, দোকান মালিক, ব্লক ও হেড মাঝি থেকে স্তরভেদে চাঁদা নির্ধারণ করা আছে। মাসের শুরুতে আল-ইয়াকিনের ধার্য চাঁদা নির্দিষ্ট লোকের কাছে পরিশোধ করতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে। না হলে অনাদায়কারীদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন ও জুলুম।

২০২১ সালের ১ অক্টোবর সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মুহিবুল্লাহর চাচাতো ভাই নুরুল আমিন (৪৫) বলেন, ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজ শেষ করে অফিসে এসে বসেন মুহিবুল্লাহ। সঙ্গে ছিলেন আরও সাত থেকে আটজন। তাদের উদ্দেশ করে মুহিবুল্লাহ বলছিলেন, পরিস্থিতি শিগগির অনুকূলে আসবে। মিয়ানমারের সঙ্গে কয়েকটি দেশের আলোচনা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে তারা রাজি হয়েছে। আমাদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।' মুহিবুল্লাহ কথা শেষ করার আগেই ঘরে প্রবেশ করে ১০-১২ জন মুখোশ পরিহিত সশস্ত্র ব্যক্তি। ঘরের বাইরে ছিল আরও ৮-১০ জন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্র। একজন পিস্তল উঁচিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসে। এরপর সোজা মুহিবুল্লাহকে লক্ষ্য করে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলি করে। মুহিবুল্লাহ চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়েন মাটিতে। এরপর হামলাকারীরা পশ্চিম দিকে পাহাড়ি পথে চলে যায়।' (সমকাল, ১ অক্টোবর ২০২১)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রত্যাবাসনের বদলে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছে মিয়ানমার সরকার। এজন্য তারা বিপথগামী লোভী রোহিঙ্গাদের দিয়ে ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ব দরবারে রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হিসাবে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার করা মামলাটি প্রশ্নবিদ্ধ করাই মিয়ানমারের মূল লক্ষ্য বলে দাবি তাদের।

কক্সবাজারের ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ হত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি তারা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হত্যায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবিও জানিয়েছেন।

২০২১ সালের ৪ অক্টোবর আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সরকারের বিভিন্ন সংস্থা শরণার্থী শিবির ঘিরে এ পর্যন্ত ৩৮টি গ্রুপের নাম পেয়েছে। তার মধ্যে ১৩টি গ্রুপ তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ও বড়। প্রতিটি বাহিনীতেই ৩৫ থেকে ৪০ জন সশস্ত্র সদস্য আছে। বেশির ভাগই রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের

বিপক্ষে। এদের মধ্যে উখিয়ায় সাতটি এবং টেকনাফে ছয়টি বাহিনীর নাম জানা গেছে। প্রতিটি বাহিনীই দলীয় প্রধানের নামে পরিচিত। উখিয়ার সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর মধ্যে আছে মনু বাহিনী, গিয়াস বাহিনী, মুন্না বাহিনী, রহিম বাহিনী, আসাদ বাহিনী, কামাল বাহিনী ও জামাল বাহিনী।' (আমাদের সময়, ৪ অক্টোবর ২০২১)

১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কুতুপালং শিবির সংলগ্ন লগুাখালী এলাকায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় ৪১ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকসহ মোট ৪১ জন জঙ্গিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেই ৪১ জন জঙ্গি জামিনে মুক্তি পেয়ে পলাতক থাকলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘাপটি মেরে থাকা পুরনো রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় শতাধিক রোহিঙ্গা পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ওইসময় আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে মিয়ানমার থেকে অন্তত সহস্রাধিক রোহিঙ্গা (আরএসও জঙ্গি) আফগানিস্তানে গিয়েছিল। সেখানে গেরিলাযুদ্ধে কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা নিহত হয়। মারা যাওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে চট্টগ্রামে ও কক্সবাজারে এনআইডিধারী রোহিঙ্গাদের স্বজনরাও রয়েছে। তন্মধ্যে ইদ্রিছ জিহাদীর সহোদর ইউনুচ জিহাদী অন্যতম। প্রশিক্ষণ শেষে আফগানযুদ্ধে মারা যাওয়া রোহিঙ্গা জঙ্গি ইউনুচ জিহাদীর সহোদর এদেশের নাগরিক দাবিদার ইদ্রিস জিহাদী, ভয়ঙ্কর রোহিঙ্গা জঙ্গি শায়খ ছালামত উল্লাহ, মাস্টার আয়ুব, আবু সিদ্দিক আরমান, এনায়েত, নূর হোসেন, মৌলবি শফিক, আবুসিদ্দিক, রুহুল আমিনসহ এক শ্রেণির রোহিঙ্গা নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে আরসার সঙ্গে। রোহিঙ্গা নেতা মৌলবি আবু সিদ্দিক আরমান, হাফেজ ছলাহুল ইসলাম, শায়খ ছালামত উল্লাহ, হাফেজ হাসিম, বাইট্টা শামসু, মৌলবি শফিক, মৌলবি ইদ্রিস, চট্টগ্রামে বসবাসকারী ব্যবসায়ী নূর কামাল ও মৌলবি নূর হোছাইনসহ অনেকে তালেবান, হুজি, আল কায়েদা, আল্লাহর দল, আরএসও এবং আল-ইয়াকিন ক্যাডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাদের অর্থ যোগানদাতা বলে জানা গেছে। তারা প্রায় সময় সাধারণ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিরোধী নানা অপকর্মে উস্কানি দিয়ে থাকে।' (জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০২১)

গণকশিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২১ সালের ২২ অক্টোবর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের দারুল উলুম মাদ্রাসায় ঘুমন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ব্রাশফায়ার করা হয়। এতে ৬ জন নিহত হয়। আহত হয় ১৫ জন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। ভোর সোয়া ৪টার দিকে উখিয়ার এফডিএমএন ক্যাম্প-১৮ এইচ-৫২ ব্লকের 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আল-ইসলামিয়াহ' মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে চার জন ঘটনাস্থলে, আর বাকি দুই জন হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। নিহত রোহিঙ্গারা হলেন, এফডিএমএন ক্যাম্প-১৮ এইচ-৫২ ব্লকে অবস্থিত 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আল-ইসলামিয়াহ' মাদ্রাসার শিক্ষক ক্যাম্প-১২, ব্লক-জে ৫ এর বাসিন্দা হাফেজ মো. ইদ্রীস (৩২), ক্যাম্প-৯-এর ব্লক-২৯এর মৃত মুফতি হাবিবুল্লাহর ছেলে ইব্রাহীম হোসেন

(২৪), ক্যাম্প-১৮, ব্লক-এইস-৫২-এর ভলান্টিয়ার শিক্ষার্থী আজিজুল হক (২২), মো. আমীন (৩২) ঘটনাস্থলে মারা যান। আর হাসপাতালে মৃতরা হলেন : এফডিএমএন ক্যাম্প-১৮, ব্লক-এফ-২২ মাদ্রাসার শিক্ষক নুর আলম ওরফে হালিম (৪৫), এফডিএমএন ক্যাম্প-২৪-এর মাদ্রাসার শিক্ষক হামিদুল্লাহ (৫৫)।

২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অস্ত্রধারী গোষ্ঠীটি পুরো ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তার করছে। তাদের আলেমদের নিয়ে গঠিত সংগঠন 'উলামা কাউন্সিল' ক্যাম্পের প্রতিটি মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল। ইতিমধ্যে ক্যাম্পের শতাধিক মাদরাসার নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে। যেসব মাদরাসা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেখানে তারা সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে। একাধিকবার তারা হামলা হওয়া মাদরাসাটি নিয়ন্ত্রণে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আরসার একাধিক প্রস্তাবেও কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় রোহিঙ্গারা প্রতিষ্ঠানটি তাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি। এতে ওই ব্লকের রোহিঙ্গা ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের ওপর ভীষণ খেপেছিল আরসার নেতারা। রোহিঙ্গাদের তথ্যমতে হামলার শিকার দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আল-ইসলামিয়াহ মাদরাসা ও মসজিদটি পরিচালনা করে 'ইসলামী মাহাস' নামে রোহিঙ্গাদের একটি সংগঠন। সংগঠনটি রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়সহ মিয়ানমারে ফেরাতে উৎসাহিত করার কাজ করছে। এ ছাড়া সংগঠনটি রোহিঙ্গাদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। রোহিঙ্গাদের দাবি- প্রত্যাবাসন নিয়ে মাহাস নেতাদের সঙ্গে মিয়ানমারের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরসা বা আল ইয়াকিনের দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ হত্যায় জড়িত সন্দেহে যে অর্ধশত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী আটক হয়েছে তাদের বিষয়ে পুলিশকে তথ্য দিয়ে মাহাস নেতারা সাহায্য করেছেন এ ধারণা থেকে ওই মাদ্রাসা-মসজিদে হামলা চালানো হয়।' (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ অক্টোবর ২০২১)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ৩৪ রোহিঙ্গা শিবির ঘিরে ১৫ সন্ত্রাসী গ্রুপের তৎপরতা রয়েছে। এর মধ্যে বড় গ্রুপটি হচ্ছে আরসা বা আল-ইয়াকিন। ক্যাম্পে অবস্থানরত সাধারণ রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে এরা চাঁদা আদায় করে থাকে। এছাড়া অস্ত্রের চোরাচালান, মাদক ও মানব পাচারের সঙ্গে এই ১৫ সন্ত্রাসী গ্রুপের ক্যাডার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের আয়ের মূল উৎসব এসব অপকর্ম থেকে। ১৫ সন্ত্রাসী গ্রুপের ক্যাডার বাহিনী দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের ইতিবৃত্ত

বৃটিশ-বার্মা শাসিত আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে আরাকান রাজ্যে আকিয়াব জেলার বুচিদং শহরের আলী চং গ্রামের বাসিন্দা জাফর হোসাইন কাওয়াল প্রাথমিকভাবে উগ্রবাদী কাওয়ালী গান গেয়ে রোহিঙ্গাদেরকে উগ্রবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। রোহিঙ্গাদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে সশস্ত্র দলে যোগদানের জন্য রোহিঙ্গা যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। তিনি যেখানেই যেতেন সেখাই শত শত লোক তার গান শুনে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি আন্দোলনে যোগদান করত।

তারপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগষ্ট আরাকানের বুচিদংয়ের দারুচং গ্রামে জাফর হোসাইন কাওয়ালের নেতৃত্বে রোহিঙ্গা প্রথম সংগঠন 'মুজাহিদ পার্টি' সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বার্মা স্বাধীনতা অর্জনকালে এ পার্টির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা অথবা পূর্ণস্বায়ত্ব শাসন দাবী করে ব্যর্থ হলে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বুচিদং শহরের ১২ মাইল উত্তরে টং বাজার নামক স্থানে এক সমাবেশ করে আন্দোলনের নীতি পুনর্নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তীকালে ক্রমশ সশস্ত্র উগ্র আন্দোলনে রূপ নেয়। বার্মার আরাকান বা রাখাইন রাজ্যে এটাই সর্বপ্রথম রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পায়।*

জঙ্গি মুজাহিদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাফর হোসাইন কাওয়াল। পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন– মুহাম্মদ আব্বাস, আবদুর রশীদ, আবদুর রহমান, আবদুশ শুকুর এবং আবুল কাশিম বা কাশিম রাজা প্রমুখ। ১৯৫০ সালের ১১ অক্টোবর আততায়ীর হাতে জাফর হোসাইন কাওয়াল নিহত হলে মোহাম্মদ আব্বাস রোহিঙ্গা বিদ্রোহী জঙ্গি সংগঠন মুজাহিদ পার্টির নেতৃত্ব দেন। জাফর হোসাইনকে রোহিঙ্গারা 'মুজাহিদ-ই আযম' বলে সমাদৃত করেন। রোহিঙ্গাদের আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। আব্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী হতে দলত্যাগী কিছু সদস্য মোহাম্মদ কাসিম ওরফে কাসিম রাজার নেতৃত্বে 'রোহিঙ্গা লিবারেশন ফোরাম' নামে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে।

মুহাম্মদ কাশিম মুজাহিদ পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি সশস্ত্র সংগঠন রোহিঙ্গা লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই জঙ্গি সংগঠনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তিনি পালিয়ে কক্সবাজারে চলে আসেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার এলাকায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ মুজাহিদ পার্টির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এরপর রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন 'ইত্তেহাদুল মুসলিমীন অব আরাকান' আত্মপ্রকাশ করে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত -এর জঙ্গিদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এই সংগঠনের নামে। তারপর ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই রোহিঙ্গা লিবারেশন পার্টি (আরএলপি) গঠিত হয়, যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহাম্মদ জাফর হাবিব নামে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। তাদের ঘাঁটি ছিল বুচিদং জঙ্গলে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযানের মুখে তাদের তৎপরতা থেমে যায়। আরএলএফ জঙ্গি সংগঠনের ব্যর্থতার পর মোহাম্মদ জাফর হাবিব গঠন করেন 'রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট' (আরপিএফ)। রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) মিয়ানমারের রাখাইন স্টেট অবস্থিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৬৪ সালের ২৬ এপ্রিল রোহিঙ্গা জনগণের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যে রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রন্ট (RIF) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দলটির নাম

* তাযকারায়ে আরাকান, লেখক ঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক আরাকানী, প্রকাশক ঃ হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) বার্মা, প্রকাশকালঃ জুলাই ১৯৯৭

১৯৬৭ সালে রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি (RIA) এবং তারপর ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) এ পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে মুহাম্মদ জাফর হাবিবকে প্রেসিডেন্ট, রেঙ্গুন-শিক্ষিত আইনজীবী নুরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডা. মুহাম্মদ ইউনূস নামের একজন মেডিকেল ডাক্তারকে মহাসচিব হিসাবে আরপিএফ পুনর্গঠিত করা হয়। সত্তর দশকের শেষের দিকে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট সংগঠনটিতে বিভাজন দেখা দেয় এবং পরে ভেঙেও যায়। এরপরই গড়ে ওঠে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন' (আরএসও)। ডাঃ ইউনুস এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও সালামত উল্লাহ সেক্রেটারি হন। অপরদিকে নুরুল ইসলাম গঠন করে 'আরাকান ইসলামিক রোহিঙ্গা ফোরাম' (এআইআরএফ)। (প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ'র 'রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ')

মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন। ১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবরে, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন ও আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট এর সাথে যুক্ত হয়, এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন (ARNO) প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে কক্সবাজারে নির্বাসনে থেকে পরিচালনা করা হত। এই সংগঠনের সশস্ত্র শাখা হিসেবে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (RNA) প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা আদালয়ের নামে বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহী জঙ্গি সংগঠনসমূহের। এসব জঙ্গি সংগঠনের ইতিবৃত্ত ও বিভিন্ন অজানা তথ্য অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ১৯৭৮ সালে নে উইন সরকার বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অপারেশন কিং ড্রাগন শুরু করলে অনেক রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আশির দশকের শুরুতে জঙ্গি সদস্যরা আরপিএফ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এটিই হয়ে ওঠে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় জঙ্গি সংগঠন। এটি মুসলিম বিশ্বের যেসব সংগঠনের সমর্থন পায় তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তানের জামায়াত-ই-ইসলামী, আফগানিস্তানের হিজব-ই ইসলামি, জম্মু কাশ্মীরের হিজবউল মুজাহিদীন, জইশ-ই-মোহাম্মদ, আল-কায়েদা, হিযবুত তাহরীর, তালেবান, হরকাতুল জিহাদ।

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) জন্য নব্বইয়ের দশকে কক্সবাজার ছিল 'নিরাপদ' ঘাঁটি। আরএসও উখিয়ার শরণার্থী শিবিরে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পও স্থাপন করেছিল আরএসও। কক্সবাজারে উল্লেখযোগ্য এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ফান্ড পেত খুব সহজে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর সংস্থার ফান্ড সরাসরি আরএসও নেতাদের হাতে চলে আসত। সেসব এনজিওদের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের আল-হারামাইন আল-খাইরিয়া, ইউনাইটেড আরব আমিরাতের আল ফুজাইরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলার পর ২০০০ সালের দিকে আরএসও এবং এআইআরএফ আবার একত্রিত হয়। গড়ে ওঠে আরো একটি রোহিঙ্গা সংগঠন। এই সংগঠনের নাম হয় 'আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন (এআরএনও)। এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট

হন নুরুল ইসলাম। সামরিক শাখার দায়িত্ব পান সলিমুল্লাহ। মিয়ানমার আর্মির চাপের মুখে সলিমুল্লাহ কক্সবাজারে পালিয়ে আসেন। 'মমতানীল' নামের একটি বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে। এরপর এই সংগঠনের নেতারা কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে যায়। অনেকে গোপনে এদেশে অবস্থান করে কৌশলে নাগরিকত্ব নেয়। তারপর এক দশক পরে আফগান ফেরত আবদুল কুদ্দুস বর্মি নামে এক রোহিঙ্গা নাগরিক ১৯৯২ সালের ১০ জানুয়ারি গঠন করেছিলেন হরকাতুল জিহাদ ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) নামে একটি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন। সত্তর দশকের শেষদিকে পাকিস্তানভিত্তিক ধর্মান্ধ আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হরকাত-আল জিহাদ আল ইসলামী আল আলমী (হুজি) বাংলাদেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জামায়াতে ইসলামী ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের মধ্যপ্রাচ্যের অর্থায়নে আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে নিয়োগ করে। আফগান ফেরত রোহিঙ্গা জঙ্গিরা পরবর্তী সময়ের তৎকালীন আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রাখাইন অঞ্চলে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। নব্বইয়ের দশকে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও বহু রোহিঙ্গা গেরিলা সংগ্রহ করে। তখনকার অনেক রোহিঙ্গাকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে। তারপর ২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবর মিয়ানমারের কিকানপিন বর্ডার গার্ড হেড কোয়ার্টার ও আশে পাশের দুটি পুলিশ চেকপোস্টে এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে মিয়ানমার পুলিশের ৯ সদস্যসহ ১৪ জনকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন ধরনের ৪৮টি অস্ত্র ও ৬৬২৪ রাউন্ড গুলি লুট করার মধ্যে দিয়ে রাখাইন রাজ্যে আরসা'র মূল সংগঠন হরকাতুল ইয়াকিন নামে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় গঠিত ১২৫টি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা প্রস্তুত করে, যার ভেতর ১৭টি ছিল রোহিঙ্গাদের।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সরকারের সহযোগিতায়, প্রধানত জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ মদদে সারাদেশে শতাধিক জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন এবং পাঁচ শতাধিক ইসলামী এনজিওর অভ্যুদয় ঘটেছে, যাদের অধিকাংশের তৎপরতা হচ্ছে কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন সময়ে এসব এলাকা থেকে গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গিরা স্বীকার করেছে বার্মার আরাকানের সঙ্গে কক্সবাজারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অংশকে যুক্ত করে তারা একটি স্বাধীন ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই সময় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি অনুসন্ধান করে জানতে পারে বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে 'আরএসও'সহ রোহিঙ্গাদের ১৭টি জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি তৎপরতায় নিয়োজিত, যাদের অধিকাংশই জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৭ সালের পর থেকে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে আরো ২৩টি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন।

রোহিঙ্গাদের ১৭টি জঙ্গি সংগঠন (২০০৭) ঃ ১. আরাকান আর্মি, (এএ) ২. আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি), ৩. আরাকান লিবারেশন পার্টি, ৪. আরাকান মুজাহিদ পার্টি, ৫. আরাকান পিপলস্ আর্মি, ৬. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স, ৭. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), ৮. ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আরাকান মুভমেন্ট, ৯. ইত্তেহাদুল তুল্লাবুল মুসলেমিন (আইটিএম), ১০. ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান, ১১. ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান (এনইউপিএ), ১২. মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা, ১৩. রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্স, ১৪. রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট, ১৫. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট, ১৬. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) ১৭. লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স।

২০০৭ সালের পর থেকে নতুনভাবে গড়ে ওঠা ২৩টি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের তালিকা– ১। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ), ২। আকামুল মুজাহিদীন আরাকান, ৩। ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান, ৪। রোহিঙ্গা আজাদী ফোর্স, ৫। জমিয়তে ইত্তেহাদুল রোহিঙ্গা, ৬। জমিয়তে ইত্তেহাদুল ইসলাম, ৭। আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন, ৮। বার্মা আরাকান অর্গানাইজেশন ইউকে, ৯। ভয়েস অব রোহিঙ্গা ইউনাইটেড, ১০। রোহিঙ্গা ভিশন ফোর্স, ১১। রোহিঙ্গা রিফিউজি হিউম্যান রাইটস, ১২। আরাকান মুভমেন্ট, ১৩। দিফা-ই মুসলমানে আরাকান, ১৪। আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, ১৫। জামায়াতুল আরাকান, ১৬। অ্যাসেম্বলি অব রোহিঙ্গা অ্যাসোসিয়েশন, ১৭। আরাকান রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেসি অ্যাসোসিয়েশন, ১৮। রোহিঙ্গা মুসলিম সলিডারিটি গ্রুপ, ১৯। আরাকান ইউনাইটেড ফোর্স। ২০. হরকাতুল ইয়াকিন। ২১. রোহিঙ্গা সাহাবা। ২২. ইসলামী মাহাজ অব রোহিঙ্গা। ২৩. মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি)।

নিম্নে কয়েকটি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল–

১. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO)

মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন' (আরএসও)। ১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবরে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন ও আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট এর সাথে যুক্ত হয় এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন (ARNO) প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে কক্সবাজারে নির্বাসনে থেকে পরিচালনা করা হত। এই সংগঠনের সশস্ত্র শাখা হিসেবে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (RNA) প্রতিষ্ঠিত হয়।*

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) এবং এর ছাত্র সংগঠন ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন– যাদেরকে ১৯৮০ সালের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী

* তাযকারায়ে আরাকান, লেখক ঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক আরাকানী, প্রকাশক ঃ হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) বার্মা, প্রকাশকালঃ জুলাই ১৯৯৭

ছাত্র শিবির আর্থিকভাবে সহযোগিতা, জিহাদি প্রশিক্ষণ, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে পুনর্বাসন এবং দেশ-বিদেশ হতে আরাকানে জিহাদের নামে অর্থের যোগান দিয়ে আসছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র 'মাসিক আল-তাদামুন' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গারা আরাকান পুনরুদ্ধার এবং মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার সময় বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে আরাকানে প্রতিষ্ঠা করা হয় জঙ্গি সংগঠন "রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন" (RSO)। উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমির হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় ড. মোহাম্মদ ইউনুসকে। এর পূর্বে তিনি "রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট' (আরপিএফ)"-এর কমান্ডার ছিলেন। RSO সংগঠনের সশস্ত্র ছাত্র আন্দোলনের নাম হল 'ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন' (ITM)। উভয় সংগঠনের ১০ হাজার কর্মী সদস্য ও মুজাহিদদেরকে ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে কক্সবাজার জেলা বান্দরবানের গহীন অরণ্যে বিশেষ করে নাইক্ষ্যংছড়ির গহীন অরণ্যে সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়। তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমিনুল ইসলাম মুকুল। এদের দু'জনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ফাইন্যান্স এন্ড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ও রাবেতা আল ইসলামির আর্থিক সহযোগিতায় ১০ হাজার রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। RSO-এর সশস্ত্র জঙ্গিদের বিভিন্ন আধুনিক অস্ত্রের জোগান দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির কেন্দ্রীয় কমিটি।'**

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মধ্যে একে-৪৭, চায়না এলএমজি বক্স, চায়না রাইফেল, জি থ্রি রাইফেল, ব্রিটিশ এলএমজি, নাইন এমএম পিস্তলসহ অসংখ্য অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রশিক্ষক ছাড়াও দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে দক্ষভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া অস্ত্র প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ হলে যোগ্যতা যাচাই করে সনদ প্রদান করা হত আনুষ্ঠানিকভাবে। জামায়াত-শিবির মৌলবাদীরা একেক সময়ে একেক পরিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের নামে বিভিন্ন গোপন পরিচয় ধারণ করে সমাজসেবা-মানবসেবা, তথাকথিত ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর আইন ও কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার নামে তাদের স্বপ্নের আলাদা ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বান্দরবান-কক্সবাজার সীমান্তে অন্তত চার দশক ধরে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। তাদের একটাই মিশন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে একটি 'স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা। এ দুটি দেশ ছাড়াও ফিলিপাইন, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এর নেটওয়ার্ক।'

'মাসিক আল-তাদামুন পত্রিকার উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১০ হাজার রোহিঙ্গাকে সশস্ত্র ট্রেনিং এর সনদ প্রদান শেষে আবার সেইসব ছবি RSO এবং

** মাসিক আল তাদামুন (উর্দু ভার্সন), নবেম্বর সংখ্যা, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ৩৩-৩৫

আইটিএম এর বিভিন্ন ভাষার মাসিক মুখপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ থেকে আরাকানে জিহাদের নামে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতারা আর্থিক অনুদান নিয়ে আসতেন।'[***]

২০০৪ সালে ছাত্র শিবিরের প্রকাশিত '২৫ বছর পূর্তি' স্মরণিকার তথ্য মতে, 'জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন-এর মধ্যেকার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে বিভেদ সৃষ্টি হলে RSO-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফাটল সৃষ্টি হয়। জামায়াত সমর্থিত ড. মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে কেন্দ্রীয় নেতা নুরুল ইসলামের দ্বন্দ্বের কারণে RSO ভেঙ্গে যায়। কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর রোহিঙ্গা জঙ্গিরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় অসংখ্য রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন। জামায়াতে ইসলামী ড. মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে তখন আরাকানে জিহাদের পূর্বে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায়।' (ইসলামী ছাত্র শিবিরের ২৫ বছরের পূর্তি স্মরণিকা, প্রকাশকাল ঃ ২০০৪)

অন্যদিকে, আরেকাংশের আমির নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে RSO আফগান ফেরত মুজাহিদরা একে অন্যের সাথে তর্ক বির্তকে লিপ্ত হয়ে সবাই জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের কথা ভুলে ধান্ধাবাজিতে অপরাধ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। RSO-এর প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে একত্রিত হলে তার সাথে RSO এর অনেক নেতা তখন জামায়াতের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মূলত বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তারা জামায়াতের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেতে জামায়াত তখন রোহিঙ্গাদের সুযোগ করে দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীই সবচেয়ে বেশি রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের সুযোগ দিয়েছে। পরবর্তীকালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী শক্তিশালী হওয়ার পিছনে ১০ হাজার রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গিদের অবদান কম নয়। শিবিরের সব ক্যাডারদের এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যখন কেন্দ্রীয়ভাবে অর্ডার আসবে তখন সশস্ত্র বিপ্লব কিংবা আত্মত্যাগে একবিন্দুও পিছপা হবে না।

২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) বাংলাদেশের সমন্বয়কারী কুখ্যাত রোহিঙ্গা জঙ্গি কথিত মাস্টার আয়ুব ১৯৯১সাল থেকে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত করে সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের আশ্রয়প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। সিরিজ বোমা থেকে শুরু করে বিএনপি খালেদা জিয়ার সরকার বিরোধী ৯৩ দিনের নিষ্ফল আন্দোলনে পেট্রোলবোমা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে মাস্টার আয়ুব। তার পরিচালনাধীন লামা-আলী কদম ও নাইক্ষ্যংছড়ির গহীন অরণ্যে (মিয়ানমার অভ্যন্তরে) একাধিক অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে বলে জানা গেছে। ঘাঁটি দেখভাল করে থাকে তার ভাইজি জামাতা আবু বক্কর। ৪৫ বছর বয়সের ভয়ঙ্কর এ রোহিঙ্গা জঙ্গির

[***] প্রাগুক্ত

শ্বশুরবাড়ি চট্টগ্রামের হালিশহরে হলেও অবস্থান করে থাকে ঢাকার গুলশান এলাকায়। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির রোহিঙ্গা জঙ্গি আয়ুবের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সৌদি আরবে বসবাসকারী আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর। আড়ালে-অবডালে জামায়াত নেতাদের সহযোগিতায় জঙ্গিপনার কাজ চালিয়ে গেলেও কতিপয় অসৎ পুলিশের সঙ্গে সখ্য থাকায় এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা জঙ্গি আয়ুব মাস্টারের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। সূত্র মতে, বর্তমানে তার পক্ষে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে জামায়াতী কানেকশনসহ জঙ্গিপনার যাবতীয় কাজ করে চলছে কক্সবাজার শহরের রোমালিয়ারছড়া এলাকার ভাড়া বাসায় বসবাসকারী মৌলভী নুর হোসেন।' (জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০১৬)

তোফায়েল আহমদ স্থানীয় জামায়াত নেতা এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর কেন্দ্রীয় নেতা ও অর্থের যোগানদাতা। ছাত্রজীবনে চট্টগ্রাম থাকাকালীন তিনি ছাত্রশিবিরের আলোচিত শিবির ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। তার পরিচয় হচ্ছে– নাম: তোফায়েল আহমদ, পিতা: মৃত. আবুল হোসেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান। ঠিকানা: পুরাতন বাস স্টেশন সংলগ্ন, উপজেলা সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রামু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ পল্লীতে অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার মামলার অন্যতম আসামি এবং মূল হোতা হিসেবে তার নাম রয়েছে। রামু, উখিয়া ও টেকনাফে ওই সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মোট ১৯টি মামলা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি মামলার আসামি এই জামায়াত নেতা তোফায়েল।

রামুর ঘটনার ১ বছর ৩ মাস পলাতক থাকার পর ২০১৩ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা অফিসে এলে দুপুর ১২ টার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর ২০১৪ সালের ১৯ মার্চ তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন পান এবং ২০১৪ সালের ৮ এপ্রিল মুক্তি পান। আত্মগোপনে থাকার পর ২০১৬ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকার সুন্দরবন হোটেলের ৩১৮ নম্বর কক্ষ থেকে তাকে পুনরায় পিবিআই দল গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করে দিলে তিনি একই বছর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার জামিন নিয়ে বের হয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ রোববারে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বের হয়ে আসার সময় বান্দরবান শহরের রাজারঘাট থেকে ডিবি পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করে।

আরএসও এর জঙ্গি সংগঠনকে সহযোগিতা ছাড়াও এক সময় উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় প্রভাবশালী জামায়াত নেতা হওয়ার সুযোগে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সহায়তা করে চলেছেন অধ্যাপক তোফায়েল আহমদ। এক সময়ের শিবির ক্যাডার থেকে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান রামু সহিংসতার নায়ক তোফায়েল।

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামুর বাসিন্দা উত্তম বড়ুয়া ফেসবুকে ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করে একটি ছবি ট্যাগ করেছে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে উগ্রবাদীরা রামুর ১২টি বৌদ্ধবিহার, ৩০টি বৌদ্ধ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। আর এ ঘটনায় নেতৃত্ব দেন স্থানীয় জামায়াত নেতা তোফায়েল আহমেদ।

তোফায়েল ছাত্রজীবনে শিবিরের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটের নৃশংস আট খুনের অন্যতম আসামি হয়েও তিনি খালাস পেয়ে যান।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে মৌলবাদী-জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযুক্ত তোফায়েল মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও) সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তিনি জাতীয়তার সনদ, জন্মসনদ প্রদান বাংলাদেশি পাসপোর্টে মধ্যপ্রাচ্যে রোহিঙ্গাদের পাঠিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক। শুধু নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়ই তিনি দেড় হাজার একরেরও বেশি জমির মালিক, ক্ষমতার দাপটে দখল করে নিয়েছেন স্থানীয় অনেক অসহায়ের ভূমি। অন্যদিকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি মৌজার ৫৫নং হোল্ডিয়ের মালিক আবুল হোসেন হলেও এই নামের সঙ্গে তোফায়েলের পিতার নাম মিল থাকার কারণে তিনি জায়গাটি তার দেখিয়ে বান্দরবানের নাগরিকতার সনদ লাভ করে পার্বত্য আইন লঙ্ঘন করে বান্দরবানের বাসিন্দা বনে যান। আর ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

গণকমিশনের সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার জেলার কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের বালুবাসা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। বাবা মরহুম আবুল হোসেন ছিলেন ইউনিয়নের মেম্বার। বালুবাসা গ্রামের পার্শ্ববর্তী হাজীরপাড়া পূর্ব পাহাড়ে ছিল জঙ্গি সংগঠন আরএসওর একাধিক ঘাঁটি। ওই ঘাঁটিতে নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল তার। আরএসওর অত্যাধুনিক অস্ত্র দেশে বিভিন্নস্থানে বেচাকেনা এবং অস্ত্রের চালান শিবির ক্যাডারদের কাছে সরবরাহ থেকে শুরু করে সব কাজই করতেন তোফায়েল আহমেদ। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান থাকার সময় তিনি দেশের জাতীয়তার সনদ প্রদান করে পুরো নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাকে রোহিঙ্গা কলোনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিভিন্ন সময় আফগানিস্তান, সিরিয়া, পাকিস্তান ও দুবাই সফর করেছেন তোফায়েল।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও-এর কেন্দ্রীয় নেতা ইব্রাহীম আতিক, পিতা: আতিকুর রহমান, গ্রাম: তাম্যিংচং, থানা: বুচিডং, জেলা: মংডু, আরাকান, মিয়ানমার। ইব্রাহীম ১৯৯৪ সালে অন্যান্য রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে টেকনাফের নয়াপাড়া ক্যাম্পের তালিকাভুক্ত শরণার্থী হয়ে ক্যাম্পে উঠেন ইব্রাহীম। পরে হীলা মুচনি ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয় এ রোহিঙ্গা নাগরিক ইব্রাহীমকে, সেখান থেকে আরএসও জঙ্গিদের সঙ্গে মিলে ক্যাম্প ত্যাগ করে পালিয়ে যান চট্টগ্রাম শহরে। সেই সময়ে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক দাবি ও ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে জামায়াত বিএনপির নেতাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। তার পূর্বের নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম হলেও ভোটার তালিকায় নাম লেখানোর জন্য যুক্ত করেন (আতিক) ইব্রাহীম আতিক। আতিক তার পিতার নাম। সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়- অনেক সাধারণ রোহিঙ্গা নাগরিকদের অভিযোগ রয়েছে এই ইব্রাহীম আতিকের বিরুদ্ধে। তিনি রোহিঙ্গাদের সেবার নামে বিদেশ থেকে অর্থ এনে লুটেপুটে খাচ্ছেন এবং জঙ্গি আবু সালেহকে দিয়ে আরএসও জঙ্গিদের ট্রেনিং এর জন্য ছনখোলা

ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। কোরবানির ঈদে তার নির্দেশে টোকেন নিয়ে মাংসের জন্য যেতে হয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কাছে। কক্সবাজার জেলা জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবশালী ও শহর সেক্রেটারি শহিদুল আলম বাহাদুরের সঙ্গে ইব্রাহীমের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বাহাদুর, ইব্রাহীম আতিক ও আবু সালেহ এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সহযোগিতা করে থাকেন।

আরএসও এর সহযোগিতায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা রোহিঙ্গারা বস্তি তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে। তাদেরকে অনুদানের নামে ইব্রাহীম আতিক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিও সংস্থার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে আরএসও ক্যাডার ইব্রাহীম আতিক এবং কয়েকটি চিহ্নিত এনজিও সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ইব্রাহীম ও এসব এনজিওর কর্মকর্তাদের অপতৎপরতার কারণে রোহিঙ্গা (আরএসও) ক্যাডাররা বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইব্রাহীম আতিক জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা ওয়ামীর একজন স্থানীয় কর্মকর্তা। সেই সুবাদে জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত (মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে) আসামী মীর কাশেম আলীর সঙ্গে তার গভীরভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আরএসও এর সর্বশেষ কমিটি : ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আরএসও সর্বশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয় নতুন কমিটি। একই বছর ৩০ জুলাই নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন যথাক্রমে ড. মোঃ ইউনুছ, হাজী মোঃ জাবেদ ও রাশেদ আহমদ। কমিটির অন্য সদস্য: ইউনুছ আবাদি, আবু আব্দুল্লাহ ছিদ্দিক, মৌলভী আবুল ফয়েজ, নূর মোহাম্মদ মনসুর, মৌলভী মোঃ আয়াছ, আবদুর রশিদ, মোঃ মাজেদ, আবু কাদের, আবু ইয়াহিয়া, মীর আহাম্মদ, আবদুল হামিদ, রুহুল আমিন, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ, আবু সালেহ, আলহাজ হাবিবুল্লাহ, ছৈয়দ আলম, হাফেজ আহমদ চেরাগ, ডাঃ আলম, মৌলভী সেলিম, মোস্তফা কামাল লালু, মৌলভী নুরুল ইসলাম, নূর হোসেন ও মৌলভী নজিরসহ অন্তত ৫০ জনের অধিক সদস্য নিয়োগ করা হয়েছিল। ঐ নির্বাচনে কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন নাইক্ষ্যংছড়ি বিছামারা কলেজ রোড এলাকার বাসিন্দা সাবেক রোহিঙ্গা নেতা এজাহার হোসেন।

২. আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (ARSA)

আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি আরসা (ARSA) নামে বেশি পরিচিত। ২০১৩ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান নেতৃত্বে আছেন মুহাম্মদ আতাউল্লাহ। যিনি আবু আম্মার জুনুনি' নামেও পরিচিত। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারে যে সশস্ত্র হামলার পর রাখাইন প্রদেশ আবার অশান্ত হয়ে উঠেছিল তার জন্য মিয়ানমারের সরকার দোষারোপ করছিল 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' নামক এই সংগঠনটিকে। এর আগে ২০১৬ সালে ৯ অক্টোবরেও রাখাইনে পুলিশ ফাঁড়ির ওপর

হামলার ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে এই গোষ্ঠিটিকে। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি আগে ইংরেজীতে 'ফেইথ মুভমেন্ট' নামে তাদের তৎপরতা চালাতো। স্থানীয়ভাবে এটি পরিচিত ছিল 'হারাকাহ আল ইয়াকিন' নামে।

আরসার নেতৃত্বে রয়েছেন 'আতাউল্লাহ' নামে একজন রোহিঙ্গা। তার জন্ম পাকিস্তানের করাচিতে, বেড়ে উঠেছেন সৌদি আরবে। সংগঠনটি মূলত গড়ে উঠেছে সৌদি আরবে চলে যাওয়া রোহিঙ্গাদের দ্বারা। মক্কায় থাকে এমন বিশজন নেতৃস্থানীয় রোহিঙ্গা এই সংগঠনটি গড়ে তোলে। বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ভারতে এদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। সংগঠনটির নেতা আতাউল্লাহর বাবা রাখাইন থেকে পাকিস্তানের করাচিতে চলে যান। সেখানেই আতাউল্লাহর জন্ম। তিনি বেড়ে উঠেছেন মক্কায়। সেখানে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন। ইউটিউবে তার একটি ভিডিও থেকে জানা গেছে, রাখাইনের রোহিঙ্গারা যে ভাষায় কথা বলে সেটি এবং আরবী, এই দুটি ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে পারেন। ২০১২ সালে আতাউল্লাহ সৌদি আরব থেকে রোহিঙ্গা জাতির অধিকার আদায়ের নামে উগ্রবাদকে চাঙ্গা করতে আরাকান চলে আসেন। এরপর ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর আরাকানে নতুন করে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর তার নাম ছড়িয়ে পড়ে দেশ বিদেশে তার পরিচিতি বাড়তে থাকে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অনুসন্ধানে জানা গেছে, আরসা মূলত (ফেইথ মুভমেন্ট) নামে ২০১৩ সাল থেকে তাদের তৎপরতা শুরু করে। এদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি লাভ করেছে, বিভিন্নভাবে এরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস ব্যুরো তাদের রিপোর্টে বলেছে, আরসা সংগঠনটি মূলত সংগঠিত হয়েছে সৌদি আরবের মক্কায়। সেখানে আগে থেকে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা সদস্যদের একটি গ্রুপ মিলে এ সংগঠনের জন্ম দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১২ সাল থেকে আরসা নেতা আতাউল্লাহ সৌদি আরব থেকে আত্মগোপন করেন। আতাউল্লাহ তার দলবল নিয়ে আরাকান রাজ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই কয়েক দফায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আরসার দাবি হচ্ছে, রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাগরিকত্ব এবং সেখানকার নাগরিকদের সমান মর্যাদা দিতে হবে। তারা আরও দাবি করেছে– তারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বের কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আরসার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তারা বিপুল যোদ্ধা। জানা গেছে, আরসার নেতৃত্বে রয়েছে ২০ রোহিঙ্গা নেতা। যার প্রধান আতাউল্লাহ আবু ওমর আল জুনুনি। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারি অস্ত্রে এবং অস্ত্রধারীদের পাহারায় আতাউল্লাহকে রোহিঙ্গাদের সংগ্রাম নিয়ে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে ২০১৭ সালে।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, ২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবর মিয়ানমারের কিকানপিন বর্ডার গার্ড হেড কোয়ার্টার ও আশে পাশের দুটি পুলিশ চেকপোস্টে এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে মিয়ানমার পুলিশের ৯ সদস্যসহ ১৪ জনকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন ধরনের ৪৮টি অস্ত্র ও ৬৬২৪ রাউন্ড গুলি লুট করার মধ্যে দিয়ে রাখাইন রাজ্যে আরসা'র মূল সংগঠন হরকাতুল ইয়াকিন নামে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ

করে। এরপর ইন্টারনেটে ভিডিও-র মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জিহাদে আহ্বান জানায়। তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গারা দলে দলে সংগঠনটিতে যোগদান করেছিল।

কক্সবাজারে ৩৪টি শরণার্থী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মধ্যে ২৭টিতে রয়েছে আরসার আধিপত্য। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রত্যেক ব্লকে রয়েছে এ সংগঠনের তৎপরতা। এ সংগঠন 'ওলামা কাউন্সিল', 'ওলামা বোর্ড', 'মজলিসে আম' এবং 'আরকান আরমট' এ পাঁচ শ্রেডুতে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পগুলোতে তৎপরতা চালাচ্ছে।

মিয়ানমারের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' (আরসা) নিজেদের আরও মজবুত করতে এবার বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে তাদের নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের গ্রুপে তারা এই মুদ্রার পক্ষে প্রচার শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্পে এই মুদ্রা চালু হয়েছে। অচিরেই প্রত্যেক শরণার্থী ক্যাম্পে এ মুদ্রা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে জঙ্গিগোষ্ঠীটির।

বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আরসার সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন মুদ্রার বিষয়ে প্রচার শুরু করেছে ২০২১ সালের জুন মাসের শুরুতে। কিছু কিছু ক্যাম্পে এরই মধ্যে নতুন মুদ্রা দিয়ে বিনিময় শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এক হাজার, ৫০০ এবং ১০০ টাকার নতুন নোট ছেড়েছে আরসা। মুদ্রায় রয়েছে আরসার নেতা আতাউল্লার ছবি। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন সক্রিয়। তবে সব চেয়ে বেশি বিচরণ করছে 'আরসা'। বাংলাদেশের ৩৪টি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের মধ্যে ২৭টিতেই রয়েছে আরসার একক আধিপত্য। জঙ্গি সংগঠন আরসা শরণার্থী ক্যাম্পে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি কিশোরী-তরুণী থেকে মাদক ও মানব পাচার, ডাকাতি অস্ত্র ব্যবসা, চাঁদাবাজি-সহ নানান অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করতে নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছে।

আরসা কেন্দ্রীয় নেতাদের নামের তালিকা ঃ মুহাম্মদ আতাউল্লাহ আল জুনুনি (সংগঠনের আমির), মুফতি জিয়াউর রহমান খালেদী (সামরিক প্রধান), মুফতি মনসুরুল হক জিহাদী (নায়েবে আমির), মাওলানা নাজমুল হক আরকানী (সমন্বয়ক) মুফতি সোলেয়মান, মুজিবুর রহমান আফেন্দী, মাওলানা ইলিয়াস হোসেন বার্মী, আব্দুল হক আরমান, হাফেজ মুহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুস সালাম, হাফেজ রশিদ উল্লাহ, আবদুর রহমান আফগানি, মুফতি আব্দুল্লাহ আজ্জাম, মাস্টার বজলুর রশিদ, আহসান খালেদ মক্কী, আয়ুবুর রহমান জিহাদী, নুরুল ইসলাম কমান্ডার, আনিসুর রহমান খাকী, শামসুল আলম বার্মী, আব্দুল কুদ্দুস বার্মী, আবুজর আল গিফারী, সুলতান মাহমুদ, কাউসার হোসেন বরইতলী, মুফতি ফয়জুর রহমান সৌদি, মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আরকানী, বশির উল্লাহ মাঝি, সত্তার মাঝি, আকিম উদ্দীন আজাদী।

বাংলাদেশি আরসা কমিটির তালিকা ঃ মাস্টার আইয়ুব, মৌলভী নুর হোসেন, আবু বক্কর, মৌলভী শফিক, ড. ইউনুস, ড. ইউনুসের সহোদর আবু তাহের, মেয়ের জামাই মো. ইউনুছ, মৌলভী মো. সেলিম ওরফে আবু আবদুল্লাহ, মোস্তাক মাঝি, রুহুল আমিন, হারুন,

নেজাম, জকির আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ উল্লাহ, হাসান, মো. আয়াছ, নুর আলম, আবদুল হাকিম, তার ভাই নজির আহমদ ও বশির আহমদ, হোসেন আহমদ, কেফায়েত উল্লাহ, মাস্টার রশিদ, খোরশেদ, মাহামুদুল হাসান, শাহ আলী ও দুদু মিয়া।

৩. অ্যাসেম্বলি অব রোহিঙ্গা অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ

২০১২ সালের রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) প্রধান সামরিক কমান্ডার ও জামায়াতুল আরাকানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সালাহুল ইসলামের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠন 'অ্যাসেম্বলি অব রোহিঙ্গা অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাফেজ সালাহুল ইসলাম। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমারের মংডু থানার নাগপুরা ইউনিয়নের কুয়ারবিলা গ্রাম থেকে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসেছিলেন সালাহুল ইসলাম। বাংলাদেশে আসার পর কেটে গেছে ৪০ বছর। এই দীর্ঘ সময় সালাহুল ইসলাম কক্সবাজার ও বান্দরবানকে কেন্দ্র করে জঙ্গি তৎপরতার জাল বুনেছেন। এরপর রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) প্রধান সামরিক কমান্ডার হয়ে উঠেছিলেন। এখনো সংগঠনটির কার্যকর নেতৃত্ব তার হাতেই। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সুদৃঢ় মতাদর্শিক যোগাযোগ রয়েছে তার। তাদের কাছ থেকে আর্থিক ও আদর্শিক সমর্থন পান তিনি।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার ও বান্দরবানে সরকারি জমি দখল করে একের পর এক মাদ্রাসা নির্মাণ করেছেন সালাহুল। এসব মাদ্রাসায় রোহিঙ্গা জঙ্গি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে থ্রি মার্ডারের একটি মামলাসহ কয়েকটি মামলায় পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যেই চলাচল করেন।

আরএসওর সাবেক প্রধান কমান্ডার হাফেজ সালাহুল বাংলাদেশের কক্সবাজার ও বান্দরবান এবং মিয়ানমারের একটি অংশ নিয়ে 'স্বাধীন আরাকান ইসলাম' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বসে জঙ্গিবাদী নেটওয়ার্ক গড়েছেন। মিয়ানমারের মংডু থানার নাগপুরা ইউনিয়নের কুয়ারবিলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন সালাহুল ইসলাম। ১৯৭৮ সালে তিনি বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। হাফেজ জিয়াউল হক ও ছবেদা খাতুনের ছেলে সালাহুল। সৌদি আরবের রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নেন তিনি। একসময় 'আরএসওর' প্রধান সামরিক কমান্ডারের দায়িত্ব পান। মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রয়েছে তার।

গণকমিশনের সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, সালাহুল ইসলাম ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে মিয়ানমার বিদ্রোহী সংগঠন আরএসও'র সাথে জড়িয়ে যান। আরএসও'র অর্থায়নে তিনি কক্সবাজারের হ্নীলা কওমি মাদ্রাসা জামেয়া দারুসুন্নাহ, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াসহ বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার পর

সৌদি আরব চলে যান। আরএসও'র মাধ্যমেই সৌদি আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক তৈরী হয়। এরপরই বাংলাদেশে আরএসও'র কার্যক্রমে মূল দায়িত্বে চলে আসেন সালাহুল। মূলতঃ আরএসও'র সামরিক ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়কারী ছিলেন তিনি। এসব কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ধনকুবের ও জঙ্গি গোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন সালাহুল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবের ও জঙ্গি গোষ্ঠীর অর্থায়নে কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ, রামু ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় রোহিঙ্গাদের মাঝে কাজ শুরু করেন তিনি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে কক্সবাজারের লিংক রোডের দক্ষিণ মুহুরীপাড়া এলাকায় মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক আল হারামাইন সংস্থার (আল হারামাইন বর্তমানে দেশে ও বিভিন্ন দেশে জঙ্গি কর্মকান্ডের জন্য নিষিদ্ধ) আড়ালে তিনি আস্তানা গড়ে তুলেছেন।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, বিদেশি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা সালাহুল এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিত্তিক ও কক্সবাজার সহ বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শত কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এর মধ্যে আইএইচএইচ (তুর্কী), বায়তুল মাল (ভারত) উল্লেখযোগ্য।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, কক্সবাজারের লিংক রোডে দক্ষিণ মহুরিপাড়ায় সরকারের বন বিভাগের সাত একর ও স্থানীয় মানুষের তিন একরসহ মোট ১০ একর জায়গা দখল করে সেখানে গড়ে তোলেন ইমাম মুসলিম (রা.) ইসলামিক সেন্টার। কার্যত এখান থেকেই আরএসও'র সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর সালাহুলের উত্থান শুরু হয়।

২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১২ সালের জুন মাসের শুরুতে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সংঘটিত সহিংসতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। ওই বছরের ৮ জুন হাফেজ সালাহুলের জন্মস্থান মংডুর কোয়ারবিল মাদ্রাসায় জুমার নামাজের খুতবায় স্বাধীন ইসলামি আরাকান রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন হাফেজ সালাহুল ইসলামের ভাই কোয়ারবিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ হুজ্জাতুল ইসলাম। কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাকে স্বাধীন আরাকান রাজ্যের ভূখন্ড হিসেবে পেতে চায় আরএসও। আরএসওর ওই ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মিয়ানমারের আরো চারটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (আরএনও), আরাকান রোহিঙ্গা ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশন (এআরডিও), আরাকান মুভমেন্ট ও আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি।' (কালের কণ্ঠ, ২০১৪ সালের ১৯)

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২১ মার্চ টেকনাফের হ্নীলার একটি মাদ্রাসায় গোপনে বৈঠক করার সময় হাফেজ সালাহুলকে পুলিশ আটক করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির রায়ের পর তার মুক্তির দাবিতে জামায়াত-শিবির কক্সবাজারে তান্ডব চালায়। এতে তিনজন নিহত এবং কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ১৯ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। ওই ঘটনায় করা তিন মামলায় হাফেজ সালাহুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। যদিও পরে তিনি জামিন পান।

ইমাম মুসলিম (রা.) ইসলামিক সেন্টার নামের মাদ্রাসাটি একটি টিনশেড ও ছোট একটি মসজিদ দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন রয়েছে একটি একতলা ভবন, দুটি তিনতলা ভবন, দুটি অত্যাধুনিক চারতলা ভবন, একটি টিনশেড ভবন ও একটি দোতলা অত্যাধুনিক মসজিদ। মাদ্রাসা কম্পাউন্ডেই সালাহুলের জন্য একটি অত্যাধুনিক বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি নিজের চলাফেরার জন্য একটি মাইক্রোবাস ব্যবহার করেন। বর্তমানে মাদ্রাসায় ১০০০ ছাত্রছাত্রী এবং ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন।

২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইমাম মুসলিম (রা.) ইসলামিক সেন্টার এবং আরো ১২টি মাদ্রাসায় প্রতি মাসের খরচ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে হুন্ডির মাধ্যমে। এসব মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সরকারি কোনো সংস্থার তদারকি নেই। 'ইমাম মুসলিম ইসলামিক সেন্টারের' নামে আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংকের কক্সবাজার শাখায় (হিসাব নম্বর-১০৬৮) ও একই প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ওমাইর এতিমখানার নামে ঢাকা ব্যাংকের কক্সবাজার শাখায় (হিসাব নম্বর-৮১.২০০.৭১০৩) হিসাব রয়েছে। অথচ ওই দুই ব্যাংক-এ কোনো লেনদেন হয় না বলে জানা গেছে।' (কালের কণ্ঠ, ২৯ নভেম্বর ২০১৪)

৪. ইত্তেহাদুল জমিয়াতুল ইসলাম

ইত্তেহাদুল জমিয়াতুল ইসলাম এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন ২০১৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে দুটি শরণার্থী ক্যাম্পে ২০১৬ সালে থেকে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা ফের তৎপরতা শুরু করে। ইত্তেহাদুল জমিয়াতুল ইসলাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শতাধিক জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করছে উখিয়ার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা শরণার্থী ক্যাম্প। কয়েকটি এনজিওর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পকেন্দ্রিক জঙ্গিদের সংগঠিত করার কাজে। উখিয়ার কুতুপালং গ্রামের বাসিন্দা বশির উল্লাহ জানিয়েছেন, ইত্তেহাদুল জমিয়াতুল ইসলাম নামক সংগঠনের নামে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতি বছর ইদুল ফিতরের বিতরণ করা হয় ২০ লাখ টাকা।

ইত্তেহাদুল জমিয়াতুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন সালামত উল্লাহ, মাস্টার ইকবাল ও মৌলভী শামসুল আলম। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাম্পে জঙ্গিদের সংগঠিত করছেন হাফেজ নাঈম, হাফেজ তোফায়েল, মৌলভী আক্তার হোসেন, হাফেজ জালাল, মোহাম্মদ নূরসহ বেশ কয়েকজন।

সারাদেশে জঙ্গি বিরোধী নানান প্রচার ও তৎপরতা চলমান থাকলেও উখিয়া-টেকনাফে অবস্থানকারী মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের টার্গেট করে এখনো গোপনে কাজ করে যাচ্ছে আলোচিত জঙ্গি সংগঠন ইত্তেহাদুল জামিয়াতুল ইসলাম। ৩০ জুলাই ২০১৬ এ সংগঠনের সভাপতি হাফেজ সালাহুল ইসলাম সহ ৪ জন সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের শামলাপুরে গোপন বৈঠক করার সময় বিজিবি'র তাকে আটক করে।

ইত্তেহাদুল জমিয়াতুল ইসলাম কর্মকান্ড চালালেও বারবার তার পূর্বের পরিচয় আরএসওর নাম চলে আসায় এ সংগঠনের নেতারা গোপনে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জঙ্গি নেতা হাফেজ সালাহুল ইসলামের সাথে আরো যেসব শীর্ষ জঙ্গি নেতা রোহিঙ্গা ক্যাম্পভিত্তিক জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে হাফেজ জাবের, হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, হাফেজ সালামত উল্লাহ, সেলিম শাহেদ, মোহাম্মদ ওয়াইস অন্যতম। এরা সবাই ইত্তেহাদুল জামিয়াতুল ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতা। বিশেষ করে ইত্তেহাদুল জামিয়াতুল ইসলামের ছত্রছায়ায় রোহিঙ্গা রিফুউজি ভয়েস অব হিউম্যান রাইটস নামে একটি সংগঠন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরকে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে। ইতিপূর্বে এ সংগঠনের একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হলেও জামিনে বেরিয়ে এসে পুরনায় গোপনে রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাদের জঙ্গি কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনের নেতা মৌলভী আবুল মনজুর, পিতা মোঃ জালাল, সাং কুতুপালং, আনরেজিষ্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘোনা, মৌলভী জানি আলম, পিতা মৃত মৌলভী আবুল হোসেন, সাং কুতুপালং রেজিষ্টার্ড ক্যাম্প ব্লক অ/৩, মৌলভী হামিদ হোসেন, পিতা আলী হোসেন সাং কুতুপালং রেজিষ্টার্ড ক্যাম্প ও মৌলভী শফি জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত। এদের বিরুদ্ধে আন্তজার্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলো থেকে অর্থ এনে রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণের প্রমাণও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, সৌদি আরব, সিরিয়ায় তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সীমান্ত জনপদ উখিয়া টেকনাফের রেডিষ্টার্ড,আন-রেজিষ্টার্ড রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোকে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে।

৫. আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন (এআরইউ)

২০১১ সালের ৩০ ও ৩১ মে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সংগঠনটির জন্ম হয়। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান মুভমেন্ট, আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), হরকাতুল জিহাদ নামের জঙ্গি নামের জঙ্গি সংগঠন গুলো বিভিক্ত হয়ে কাজ করলেও ২০১১ সালের জুন থেকে তারা একজোট ভুক্ত হয়ে কাজ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন (এআরইউ) নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে এসব জঙ্গি জোটভুক্ত হয়ে তৎপরতা শুরু করে। প্রথমে অবৈধ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এনজিও সংস্থার নামে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে এরা সীমান্ত পরিস্থিতি ঘোলাটে করার মিশনে নামে। এ মিশনের অংশ হিসেবে মিয়ানমার সীমান্তে সেনা সমাবেশের গুজব রটানো হয় পরপর ২ বার। ওই ২টি মিশন বিফল হওয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ পরিকল্পনা সফল হওয়ার পর আর্ন্তজাতিক একটি চক্র এ বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ইসলামী সংগঠনের নেতারা বাংলাদেশের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কার্যক্রমে শতভাগ সফল হয়।

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) এখন কয়েকটি অঙ্গ সংগঠন গড়ে উঠেছে। এরই একটি আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন বা আরআরইউ। এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবুল ফয়েজ জিলানী, ডা. মোহাম্মদ ইউনুস ও নুরুল ইসলামকে। সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় সালামত উল্লাহকে। সালামত উল্লাহ বর্তমানে ব্যবসায়ী ও কক্সবাজার এনজিওর সমন্বয়কারী। তিনি মিয়ানমারের বুচিডং এলাকার থামিংচং গ্রামের হামিদ হোসেনের ছেলে। নাম সালামত উল্লাহ, পিতা- হামিদ হোসেন ঠিকানাঃ গ্রাম: থামিংচং, থানা: বুচিদং, আরাকান, মিয়ানমার। বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম: চুনতি, থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম। বর্তমান অবস্থানঃ কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের দক্ষিণ মুহুরিপাড়া তার পরিচালিত আদর্শ শিক্ষা নিকেতন মাদ্রাসায়।

১৯৯২ সালে সালামত উল্লাহ প্রথম বাংলাদেশে আসেন। ১৯৯৪ সালে তিনি আফগানিস্তান যান। আফগানিস্তান থেকে লিবিয়া হয়ে সৌদি আরবে থাকেন কিছুদিন। এরপর বাংলাদেশে ফিরে আসেন ২০০৪ সালে। এরপর ফের দেশের বাইরে যান তিনি। রিয়াদে বৈঠক শেষে ২০১২ সালের ১১ জুন তিনি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও এর কেন্দ্রীয় নেতা থেকে মহাসচিব পদ ছাড়াও বর্তমান একাংশের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সালামত উল্লাহ। কক্সবাজার জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গেও দীর্ঘদিন থেকে জড়িত রয়েছেন তিনি। তাকে এলাকার মানুষ জামায়াত নেতা সালামত উল্লাহ হিসেবে জানেন।

যুদ্ধাপরাধের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের পর ২০১৩ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার শহরে জামায়াত-শিবির দ্বারা সংঘটিত 'সাঈদী মুক্তি পরিষদ' এর ব্যানারে চালানো তাণ্ডবে জড়িত ছিলেন সালামত উল্লাহ। তিনি এই পরিষদ এর একজন দায়িত্বশীল নেতা। তাণ্ডবের ঘটনায় দায়ের হওয়া তিনটি মামলায় তিনি অভিযোগপত্রভুক্ত আসামী। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার রামুতে বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনায়ও অন্যতম অভিযুক্ত তিনি।

সালামত উল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়ার চুনতি এলাকায় বাড়ি বানিয়ে থাকলেও তার সমস্ত কার্যক্রম রোহিঙ্গা জঙ্গি ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারে। তার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে জামায়াতের কেন্দীয় নেতা হামিদুর রহমান আজাদ, মোহাম্মদ শাহাজাহান, হামিদ হোসাইন আজাদ, শাহজাহান চৌধুরী, সামশুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সহ শীর্ষ নেতাদের।

সালামত উল্লাহ ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহরের হোটেল লাওস থেকে পাকিস্তানী নাগরিকসহ গ্রেপ্তার হন। তার সাথে যারা ছিলেন পাকিস্তানের করাচীর বাসিন্দা মোহাম্মদ আলম, মোহাম্মদ আমিন, আব্দুল মজিদ এবং কক্সবাজারের জঙ্গি শফিউল্লাহ। জঙ্গি নেতা শফিউল্লাহর সঙ্গে ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম এর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান সালামত উল্লাহ।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসওএর একটি শাখা হলো আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন (আরআরইউ)। ২০১১ সালের ৩০ ও ৩১ মে সৌদি আরবের রিয়াদে এক সভায় এ সংগঠনের জন্ম। উক্ত সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় সালামত উল্লাহকে।

আরআরইউর কক্সবাজারের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবু সিদ্দিক আরমানকে। ২০১২ সালের ১৩ জুলাই রিয়াদ থেকে বাংলাদেশে ফেরেন তিনি। তিনি একজন জামায়াত সমর্থনপুষ্ঠ রোহিঙ্গা নেতা। ২০১২ সালের ৩০ আগস্ট গোপন বৈঠক চলাকালে কক্সবাজারের রামুর খুনিয়া পালংয়ের দারিয়ারদীঘি এলাকা থেকে পুলিশ আরমানসহ ছয়জন অভিযুক্ত জঙ্গি সদস্যকে আটক করে।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো নিজেদের কোন্দলের জের ধরে যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সবাই মিলে এই সংগঠনের ব্যানারে কাজ করার প্রচেষ্টা চালান। ২০১১ সালের ৩০ ও ৩১ মে সৌদি আরবের রিয়াদে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান মুভমেন্ট, আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), হরকাতুল জিহাদ নামের জঙ্গি নামের জঙ্গি সংগঠন গুলো বিভিক্ত হয়ে কাজ করলেও ২০১১ সালের জুন থেকে তারা একজোট ভুক্ত হয়ে কাজ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন (এআরইউ) এর নেতাদের উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। বৈঠকে ৫টি জঙ্গি সংগঠন একজোট হয়ে আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন নাম দেওয়া হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত মতে সাংগঠনিক দূর্বলতা কাটিয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ, অবৈধ ব্যবসা জোরদার, হুন্ডি ব্যবসায় প্রসারণের জন্য তারা জঙ্গি অনুপ্রবেশকে প্রথম টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তখন থেকে জঙ্গি নেতা সালামত উল্লাহ, নুরুল ইসলাম, আবু সিদ্দিক আরমান, হাবিব উল্লাহসহ কয়েকজন শীর্ষনেতা কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফে অবস্থান নিয়ে কাজ শুরু করেন। এরা উখিয়া ও টেকনাফের শরণার্থী ক্যাম্প কেন্দ্রীক তৎপরতা চালান। প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছেন– জঙ্গি আলী জোহর, হাজি ফজল, রফিক আহমদ, হাফেজ নঈম, লালু মাঝি, শামসু মাঝি, হাফেজ জালাল, মাওলানা শফিউল্লাহ, নুল হক মাঝি, নুর মোহাম্মদ, আবদুল রশিদ, মোহাম্মদ সায়েদ, আবু কাদের, আবু ইয়াহিয়া, হামিদ, রুহুল আমিন, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ, তাজর মুললুক, মাষ্টার হাফিজ, জমির, নুরুল হুদা, মাষ্টার কামাল, মৌলভী মনজুর, মৌলভী শফিক, হাফেজ জকির, মৌলভী মাহছন, টেকনাফ শাপলাপুরের মৌলভী আজিজ উল্লাহ, ডাক্তার খাইরুল আমিন।

৬. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান বার্মা

আফগান ফেরত আবদুল কুদ্দুস বর্মি নামে এক রোহিঙ্গা নাগরিক ১৯৯২ সালের ১০ জানুয়ারি গঠন করেছিলেন হরকাতুল জিহাদ ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) নামে একটি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন। সত্তর দশকের শেষদিকে পাকিস্তানভিত্তিক ধর্মান্ধ জঙ্গি সংগঠন আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হরকাত-আল জিহাদ আল ইসলামী আল আলমী (হুজি) বাংলাদেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জামায়াতে ইসলামী ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের মধ্যপ্রাচ্যের অর্থায়নে আফগানিস্তানে

সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে নিয়োগ করে। আফগান ফেরত রোহিঙ্গা যোদ্ধারা পরবর্তী সময়ের তৎকালীন আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রাখাইন অঞ্চলে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। নব্বইয়ের দশকে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও বহু রোহিঙ্গা গেরিলা সংগ্রহ করে। তখনকার অনেক রোহিঙ্গাকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে। 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান বার্মা' প্রতিষ্ঠাতা আমির আবদুল কুদ্দুস বর্মি বার্মার মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে জন্ম হলেও এক সময় তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হন। পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ার কারণে এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করার বদৌলতে তার সাথে পাকিস্তানী তালেবান ও লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জামাআতুল দাওয়া সংগঠন সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আব্দুল কুদ্দুছ বর্মী আফগান জিহাদ শেষে নিজের দেশে (আরাকান) জঙ্গি সংগঠন (হুজি-আরাকান) গঠন করেন এবং একের পর এক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। তিনি বিভিন্ন সময় তার সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন রোহিঙ্গাদের বাঁচানোর নামে। তার সংগঠনের মুখপাত্র 'তাযকারায়ে আরাকান' এর মাধ্যমে তিনি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেন বিভিন্ন সাময়িকীতে।

উর্দু ভাষায় লিখিত তাযকারায়ে আরাকান গ্রন্থের লেখক হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকানের আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পাদক মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ সিদ্দিক আরাকানী বিন মাওলানা হাসান আলী। তিনি পাকিস্তান করাচীর জামিয়া দারুল উলুম কৌরাঙ্গী থেকে দাওরায়ে হাদিস সনদপ্রাপ্ত। এই রোহিঙ্গা নাগরিক আলোচ্য গ্রন্থে আরাকানে জিহাদী কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ তাদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। উক্ত বইয়ে প্রকাশক- হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বার্মা। 'তাযকারায়ে আরাকান' এর শেষে হরকাতুল জিহাদের একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। এতে জিহাদের জন্য আল্লাহ, কোরাণ-হাদিসের দোহাই দিয়ে অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ব্যক্তি ও সংগঠন ছাড়াও সংগঠনের আরেকটি মুখপাত্র মাসিক আল রিবাত এর জন্যও অনুদান চাওয়া হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উর্দু এবং ইংরেজীতে একটি নাম ও ব্যাংক হিসেবের নাম্বার ও ঠিকানা দেওয়া হয়েছে যেখানে অর্থ পাঠাতে হবে। এই হিসাবটি 'হরকাতুল জিহাদ' আল-ইসলামী আরাকানের প্রতিষ্ঠাতা রোহিঙ্গা জঙ্গি হরকাতুল জিহাদ আরাকান আমির আবদুল কুদ্দুছ বার্মীর নামে। একাউন্ট নাম্বার ও ঠিকানা- A/C, No. ২৮৫৩৫, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ৭৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ডাকযোগের বাংলাদেশে ঠিকানা- পোঃ বক্স-২১, কক্সবাজার। পাকিস্তানের ঠিকানা, ইসলাম মেডিকেল সেন্টার ৩৬ ঝিলান্ডি, করাচী-৩০।

দীর্ঘদিন আব্দুল কুদ্দুছ বর্মী বিভিন্নভাবে রোহিঙ্গাদের উসকে দিয়ে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। এই আব্দুল কুদ্দুছ নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-

পূর্বাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় (হুজি-এ) তার নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটায়। জঙ্গি সংগঠনের উসকানির কারণেই ২০১২ সালে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে; যা পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। বহু প্রাণহানি হয় সেই দাঙ্গায়।

২০১৩-২০১৪ সালে তার নেতৃত্বে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরাকান জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়ে কক্সবাজারের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। সেখানে তারা আরাকান ও কক্সবাজার থেকে সংগ্রহ করা জঙ্গিদের কমব্যাট ট্রেনিং, বোমা বানানো ও ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। রোহিঙ্গা সংকটকে ইস্যু বানাতে আবদুল কুদ্দুছ বর্মীর সহযোগিতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে 'দিফা-ই-মুসলামন-ই-আরাকান' নামে একটি সম্মেলন করে জামাআতু-উদ-দাওয়া ও লস্করে তৈয়বা। সে বছরের আগস্টে আব্দুল কুদ্দুছ বর্মীর মাধ্যমে গোপনে বাংলাদেশে আসে পাকিস্তান জামাআত উদ দাওয়ার সক্রিয় সদস্য ও পাকিস্তানের নাগরিক শহীদ মাহমুদ ও নাদিম আওয়ান। তারা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আস্তানা গড়ে সেখান থেকে আরাকান জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানী জঙ্গিদের একটি শক্ত নেটওয়ার্ক তৈরী করে দেয়।

বাংলাদেশ পুলিশ ২০১২ সালে পাকিস্তানি নাগরিক মাওলানা সিব্বির আহমদ নামের এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি মূলত পাকিস্তানের জইশ-ই-মোহাম্মদ এর সাথে আরাকান জঙ্গিদের মধ্যে দূতের কাজ করতেন এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জঙ্গিদের জন্য অর্থ আনার দায়িত্ব পালন করতেন।একই ধারাবাহিকতায় আবদুল কুদ্দুছ বর্মীর সহযোগিতায় আরাকানের নাগরিক (বর্তমানে পাকিস্তান নাগরিক) আতাউল্লাহ ওরফে আবু আম্মার জুনুনী ওরফে আবু ওমর যিনি দীর্ঘদিন সৌদিতে থেকে বড় হয়েছেন এবং সেইখানেই লেখাপড়া করেছেন। তার মাধ্যমে আবদুল কুদ্দুছ বর্মী বাংলাদেশের একটি ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে আনসার সদস্য আলী হোসেনকে হত্যা করে অস্ত্র লুট করে। এবং 'হরকাতুল ইয়াকিন' নাম ধারণ করে আরাকান মুসলমানদের জিহাদের ডাক দেন।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই আতাউল্লাহ - আব্দুল কুদ্দুছ বর্মীর হাত ধরেই পাকিস্তানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়। আব্দুল কুদ্দুছ বর্মীর হাতে গড়া আরো অনেক রোহিঙ্গা জঙ্গি পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। আব্দুল কুদ্দুছ বর্মী মংডু জেলার প্রাচীনতম কওমী মাদ্রাসা দারুল উলুম এ দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের হয়ে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আল আলমীর মাধ্যমে। এই সংগঠনের উচ্চপর্যায়ের নেতা কমান্ডার সাইফুল্লাহ আখতার যিনি বাংলাদেশসহ একাধিকবার আরাকানে সফর করেছেন। আরাকান হুজির নেতা আব্দুল কুদ্দুছ বর্মীর প্রতিষ্ঠিত 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান'-র গঠনের পেছনে পাকিস্তানি নাগরিক সাইফুল্লাহ আখতারের সহযোগিতা রয়েছে। তার মাধ্যমে ও সহযোগিতায় হুজি-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ হয়ে আরাকানে সফর করার সময় সাইফুল্লাহ আখতারের সঙ্গে আরব বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত আরো দুজন ব্যক্তি

আরাকানে গিয়েছিলেন। একজন হলেন আল ইখওয়ান নেতা শহীদ হাসান আল বান্নার বন্ধু ও সহকর্মী কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, শায়খ আবদুল মইজ আব্দুস সাত্তার মিসরী।

তাদের অনুপ্রেরণায় আবদুল কুদ্দুছ বর্মী হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. রোহিঙ্গা মুজাহিদীন

রোহিঙ্গা মুজাহিদীন সংগঠনটি ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের আরাকানে আত্মপ্রকাশ করে। উর্দুভাষী একটি জঙ্গিবাদী ইন্টারনেট ফোরাম প্রকাশিত কিছু আলোকচিত্র ও তার বিবরণে রোহিঙ্গা, ইন্দোনেশীয় ও বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে গঠিত রোহিঙ্গা মুজাহিদীনের মিয়ানমারে জঙ্গি প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানি তালেবান উগ্রপন্থী মুসলমানদের সংগঠিত করে এ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন বলে ওই ফোরাম জানিয়েছে। এ জঙ্গি গ্রুপের নাম দেয়া হয়েছে 'রোহিঙ্গা মুজাহিদীন'। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ হুমকি পর্যবেক্ষণকারী ইউনিটের বরাত দিয়ে এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই) এ তথ্য জানিয়েছে। তারা বলছে, ২০১৬ সালের ১২ জুলাই বাব-এ-ইসলাম জিহাদি ইন্টারনেট ফোরাম ওই সব আলোকচিত্র প্রকাশ করে। তাদের আলোকচিত্রে দেখা যায়, পাকিস্তানি তালেবানের গড়ে তোলা জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্যরা মিয়ানমারের কোনো একটি জায়গায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বাব-এ-ইসলাম জিহাদি ইন্টারনেট ফোরামের উর্দু ভাষায় দেয়া একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে মিডল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানায়, কমান্ডার আবু সুফিয়ান ও আবু আরিফের নেতৃত্বে নতুন এই জিহাদি বাহিনী মিয়ানমারে প্রবেশ করেছে।

তারা মিয়ানমারের দুটি সামরিক যান ধ্বংস করেছে এবং ১৭ জন সৈন্যকে হত্যা করেছে। এছাড়া তারা তিন জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর শিরচ্ছেদ করেছে, যারা মুসলিম হত্যায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। নিহতদের মধ্যে একজন ধর্মগুরুও রয়েছেন।

ইন্টারনেটে প্রকাশিত আলোকচিত্রে দেখা হয়, এক থেকে দুইশ'র মতো রোহিঙ্গা মুজাহিদীন সামরিক পোশাকে গুলি চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে, বাব-এ-ইসলামের মাধ্যমে মূলত আনসারুল্লাহ জিহাদি ফোরাম উর্দু ভাষায় ইন্টারনেটে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও-এর সাবেক নেতা এবং রোহিঙ্গা মুজাহিদীনের নেপথ্যে রয়েছেন মাওলানা কামাল হোসাইন, পিতা: মৃত আবুল কাশেম, স্থায়ী ঠিকানা: বুচিদং, মংডু, আরাকান, মিয়ানমার। বর্তমান ঠিকানা ঃ পার্বত্য এলাকার নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ঘুমধুম কচুবনিয়া এলাকায়। উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের তালিকা অনুযায়ী মাওলানা কামাল হোছাইন মিয়ানমারের নাগরিক। ক্যাম্পে তার রেজিস্ট্রেশন নং- এমআরসি ৪৮৪৫৩। বর্তমান এই ক্যাম্পেই মাওলানা কামাল হোসাইন তার

স্ত্রীসহ পুরো পরিবারের বসবাস। তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে নিজের সেই রোহিঙ্গা পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশী আইডিকার্ড বানিয়েছেন। কামাল হোসাইন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর সামরিক প্রধান মাস্টার আয়ূব এর সেকেন্ড ইন কমান্ড এবং জামায়াতুল আরাকান ও অ্যাসেম্বলি অব রোহিঙ্গা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান মাওলানা সালাহুল ইসলাম এর বিশ্বস্ত সহযোগী।

কক্সবাজার ও উখিয়ায় মানবপাচারকারী ও অবৈধ হুন্ডি ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে তার। মালয়েশিয়া, সৌদিয়া, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পরিচয়পত্র বানিয়ে এবং দালালদের মাধ্যমে পাসপোর্ট তৈরী করে মানব পাচার সিন্ডিকেটের অন্যতম একজন হোতা।

আয়ূব মাস্টার ও হাফেজ সালাহুল ইসলাম ছাড়াও সালামত উল্লাহ নামে আরেক রোহিঙ্গা জঙ্গির অন্যতম সহযোগী কামাল। মাষ্টার আয়ূব এবং সালামত উল্লাহ যখন আত্মগোপনে ছিলেন তখন তাদের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা কামাল হোসাইন। তিনি বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে প্রায় সময় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যান এবং তহবিল সংগ্রহ করেন সংগঠন পরিচালনার জন্য। তবে টাকার অধিকাংশ মাওলানা কামাল হোসাইন নিজেই আত্মসাৎ করেন। তার সাথে সৌদি নাগরিকসহ আরব বিশ্বের অনেক জঙ্গি নেতার সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষভাবে সৌদি আরবের ইউসুফ ইবনে রাশেদ আল গুফাইলির সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এসব বিদেশীর কাছ থেকে তিনি প্রত্যেক বছর মিয়ানমারের নির্যাতিতদের নামে লাখ লাখ টাকা অনুদান এনে জঙ্গি সংগঠন পরিচালনায় ব্যয় করেন।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাওলানা কামাল হোসাইন জঙ্গি সালামত উল্লাহর প্রতিষ্ঠিত কক্সবাজার লিংক বিসিক এলাকায় অবস্থিত 'আদর্শ শিক্ষা নিকেতনের' পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারীসহ অধিকাংশরা রোহিঙ্গা নাগরিক। যাদের নামে বিভিন্ন দেশ থেকে অনুদান আনার দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করেন। কক্সবাজার ঝিলংজা ইউনিয়নের দক্ষিণ মুহুরীপাড়া লিংক রোড এলাকায় সরকারি বিশাল এলাকা জুড়ে ২০১০ সালে গড়ে তুলেন 'আদর্শ শিক্ষা নিকেতন'নামের জামায়াত শিবির পরিচালিত মওদুদী মতাদর্শের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৮. আকামুল মুজাহিদীন

রোহিঙ্গা নাগরিক আবদুল কুদ্দুস বর্মি তার ঘনিষ্ঠ সহচর হাফেজ তোহাকে নিয়ে ২০১৫ সালের শুরুতে আকামুল মুজাহিদীন গড়ে তোলেন। তিনি এখন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। এর আগে তিনি গঠন করেছিলেন হরকাতুল জিহাদ ইসলামী আরাকান (হুজি-এ) নামে আরও একটি সংগঠন। সংগঠনটির সামরিক শাখার নেতৃত্বে আছেন হাফেজ তোহা। তিনি ছাড়াও শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা ওস্তাদ ওয়াজির ওরফে নুর কবির, ফাইজুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল হামিদ। ২০১৫ সালের দিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 'আকামুল মুজাহিদীন' (এএমএম) নামে

একটি জঙ্গি সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দেশটিতে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গারা দলে দলে সংগঠনটিতে ভিড়েছিল। ২০১৭ সালে পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গা এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে বলে জানতে পেরেছে গণকমিশনের তদন্ত প্রতিনিধি দল। ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুতে পুলিশ বাহিনীর ৪টি ক্যাম্পে একসঙ্গে হামলা চালিয়ে আকামুল মুজাহিদীন তাদের শক্তির কথা জানান দেয়। ওই হামলায় পুলিশের ৯ সদস্যকে হত্যা করে ৬৩টি অস্ত্র লুট করে এএমএম। ঘটনার পরই ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করে হামলার দায় স্বীকার করে সংগঠনটি। এর পরই এএমএম সদস্যদের ধরতে অভিযান শুরু করেছিল মিয়ানমার সেনাবাহিনী।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র মাসিক তরবিয়াত পত্রিকার ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আকামুল মুজাহিদীনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কুদ্দুস বর্মি এবং অপর শীর্ষ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ পাকিস্তানে অবস্থান করে সংগঠনটির জন্য তহবিল সংগ্রহ করছেন। মাওলানা ওস্তাদ ওয়াজির ও ফাইজুল্লাহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। এএমএম নেতারা থাইল্যান্ড সীমান্ত হয়ে আরাকানে প্রায় সময়ই যাতায়াত করেন। হাফেজ তোহার সম্পর্কে জানা যায়, তিনি পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এ জঙ্গি নেতা মংডুতে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার দায়িত্ব নিয়ে ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করেন। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হাফেজ তোহা সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নে মধ্যে রোহিঙ্গাদের দেশত্যাগ না করার আহ্বান জানাচ্ছেন। ওই ভিডিওতে তিনি বলেন, দেশের ভেতরে থেকেই রোহিঙ্গারা এখন প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছেন। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তোহা।' (রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র মাসিক 'তরবিয়াত' পত্রিকার ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা)

আকামুল মুজাহিদীন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন মাওলানা মোহাম্মদ, পিতা: জাফর আহমেদ, মাতা: লালবানু, ঠিকানা: ঝিমংখালী, মধ্যম হ্নীলা, নয়াবাজার টেকনাফ, কক্সবাজার। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়া প্রবাসী। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর শহরের চকিট নামক স্থানে পাকিস্তান জামে মসজিদের খতিব মালয়েশিয়া জ্যাকেল কোম্পানীতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট। ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত পাকিস্তান সফর করে আসছেন। জন্মসূত্রে মাওলানা মোহাম্মদ মিয়ানমারের নাগরিক। যখন তার বয়স ১০ বছর তখন তিনি বার্মা থেকে বাংলাদেশে অবৈধ পথে প্রবেশ করে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার হ্নীলা দারুসসুন্নাহ কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন আল-জামিয়া ইসলামীয়া জমিরিয়া পটিয়া মাদ্রাসা থেকে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি 'দাওরায়ে হাদীস' শেষ করে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন RSO-এর মাধ্যমে সংযুক্ত আরর আমিরাতে চলে যান।

দুবাইয়ে বসে দীর্ঘদিন রোহিঙ্গাদের সাহায্যের নামে অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সহযোগিতা করে আসছেন।

২০১২ সালে মাওলানা মুহাম্মদকে দুবাই সরকার জঙ্গিবাদের অভিযোগের কারণে আজীবন নিষিদ্ধ করে আরব আমিরাত থেকে বহিষ্কার করে দেন; কিছুদিন জেল খাটার পর আরব আমিরাত থেকে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশে ফেরত এসে একই বছর বাংলাদেশি নতুন পাসপোর্ট করে মালয়েশিয়ার জ্যাকেল কোম্পানীতে কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকা এয়ারপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং ২০১৬ সালের ২১ জানুয়ারি পুনরায় মালয়েশিয়ায় ফিরে যান। পরবর্তীকালে আকামুল মুজাহিদীন হয়ে কাজ করেন।

উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পের বাসিন্দা মুজিবুর জিহাদী গণকমিশনের অনুসন্ধানী প্রতিনিধি দলকে বলেন, 'পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইর বিশেষ অপারেশন শাখা রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে আরএসও, এআরএনও, এএমএমসহ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। আরএসওর পাকিস্তান শাখার দায়িত্বশীল নেতা নুর হোসাইন আরাকানি এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এদিকে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সবচেয়ে বড় হলেও এখন এটি অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। এ পরিস্থিতিতে আরএসওর নিচের সারির নেতারা রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন এএমএমে যোগদান করেছিলেন।'

৯. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)

১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবরে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন ও আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট এর সাথে যুক্ত হয় এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন (ARNO) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের সশস্ত্র শাখা হিসেবে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (RNA) প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম-কক্সবাজারকে নিয়ে আরাকান ভূখন্ড তৈরির ষড়যন্ত্র চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৯১ সালে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে তারাও যুক্ত হয় এ প্রক্রিয়ার সাথে। তাদের মদদ দিতে থাকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠান যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর এনজিও 'রাবেতা'। তাদের সহায়তায় জামায়াত গড়ে তুলে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। আরএসও-এর সাথে মিলে রোহিঙ্গারা গড়ে তুলে 'আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)। আরএনওর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে নুরুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। তিনি এক সময় থাকতেন চট্টগ্রামে। তার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে পরিচালিত হতো আরএসও এবং এআরএনও' কার্যক্রম। এদের সহযোগিদের অনেকে এখনো নানা সংগঠনের ব্যানারে চালাচ্ছেন তৎপরতা। এআরএনও' চীফ অব স্টাফ ছিলেন রোহিঙ্গা নাগরিক কমাণ্ডার সেলিম উল্লাহ। তিনি সামরিক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

আওয়ামী লীগের প্রথম মেয়াদের সময় ২০০০ সালে আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে অস্ত্রসহ ধরা পড়ে কমাণ্ডার সেলিম উল্লাহ। ২০০১ বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার রোহিঙ্গাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পায় সেলিম উল্লাহ অনেক রোহিঙ্গা জঙ্গি। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবার কমে যায় রোহিঙ্গাদের তৎপরতা। অনেক রোহিঙ্গা নেতা ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। আবার কেউ কেউ পালিয়ে যায় বিদেশে। আরএসও নেতা নুরুল ইসলাম অবস্থান নেয় লন্ডনে। লন্ডনে থেকে স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের তৎপরতা।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প সক্রিয় হয়ে উঠেছে জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)। লন্ডন থেকে এ সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, সংগঠনের বাংলাদেশের প্রধান কলিম উল্লাহ। তিনি মিয়ানমারের মংডু থানার নাইংছং এলাকার ওককাটা মৃত জহিরুল হকের ছেলে। তার ছোটভাই ইব্রাহিম আরকান রোহিঙ্গা ন্যাশন অর্গানাইজেশন (এআরএনও) সংগঠনের ব্যানারে জার্মানিতে রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা ব্যাপকহারে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার পর থেকে কুতুপালং এলাকার বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করতে দেখা গেছে তাকে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহের আড়ালে কর্মী ও সমর্থক বৃদ্ধি করছেন এ সংগঠন, এমনটাই দাবি রোহিঙ্গা নাগরিক আব্দুল্লাহ মাঝি। অনুসন্ধান করে জানা যায় ২০১৮ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গাদের বিশাল সমাবেশ আয়োজনের পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দিয়েছেন এ সংগঠন।

মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, দুবাই, ইউরোপের যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ এশিয়ার জাপান, মালয়েশিয়া এবং আমেরিকা থেকে সংগঠনের অর্থ আসে। বিশেষ করে সৌদি আরব থাকা তাদের সদস্যরা সংগঠনের অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন।

রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সংগঠনের বাংলাদেশের প্রধান কলিম উল্লাহ গণকমিশনের অনুসন্ধানী প্রতিনিধি দলকে বলেন, 'আমি ২০১৬ সালের পূর্বে সংগঠন ছেড়েছিলেন। তবে, এখনো এ সংগঠনের আদর্শ নিয়ে চলি আমরা। কারণ এটি একটি আদর্শিক সংগঠন। এ সংগঠনে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। তার দেয়া তথ্য মতে, এক সময় সংগঠনের হেডকোয়ার্টাস বাংলাদেশে থাকলেও এখন তা লন্ডনে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংগঠনের প্রধান নুরুল ইসলাম লন্ডন থেকে "এআরএনও" পরিচালিত করছেন।'

রোহিঙ্গা নাগরিক কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা আতিক উল্লাহ গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়ের নামে গঠিত সংগঠনটি শুরুতে তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা নিপীড়ন শুরু হওয়ার পর থেকে সক্রিয় হয়ে উঠেন তারা। বিভিন্ন সময় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দেয় সংগঠনটি। তাদের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি ড: হ্লা মাইন্ট, বাংলাদেশের কলিম উল্লাহ, কানাডার নুর হাশিম,

জাপানের জ্যা.মিন.টাট, যুক্তরাজ্যে রনি এবং আমেরিকার প্রতিনিধি ড: হাবিব উল্লাহর নামে প্রচার করা হয়।

সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছেন মিয়ানমারের আকিয়াব জেলার মংডু থানার নাইংছং চৌধুরী পাড় এলাকার মাস্টার শফিউল আলমের ছেলে ইউছুপ। তিনি সৌদি আরবে অবস্থান করেন। সেখানে বসে নির্যাতিত রোহিঙ্গার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সহানুভূতি পাওয়ার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন। তার সংগৃহীত অর্থ কলিম উল্লাহ ও তার সহযোগীদের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য ব্যয় করে থাকেন। এ সংগঠনের ব্যয় করা অর্থ সংগৃহীত অর্থের সিকি পরিমাণ বলে দাবি করেছেন রোহিঙ্গা নাগরিক। বাকি অর্থ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখেন। উক্ত সংগঠন রোহিঙ্গাদের মাঝে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে ক্যাম্পে তৎপরতা শুরু করেছেন। রোহিঙ্গা যুবকদের টার্গেট করে তারা তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড চালয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন রোহিঙ্গারা।

২০১৮ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গাদের সমাবেশের বিপুল অর্থের যোগান দিতে কলিম উল্লাহ বাংলাদেশে আসেন। ঐদিন কলিম উল্লাহ ও ইব্রাহীম রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে রোহিঙ্গাদের মাঝে নিজেই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণও করেন তারা। যা ইব্রাহীম নিজের ফেইসবুক আইডিতে ভিডিও আপলোড করেন। এছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনেরও বিরোধীতা করে নিজের ফেইসবুকে ভিডিও বার্তা দেন ইব্রাহীম। এদিকে কলিম উল্লাহ, ইব্রাহীম ছাড়াও বাংলাদেশে ইউছুপের হয়ে কাজ করেন তার ছোটবোনের জামাই কায়সার। তিনি চট্টগ্রামে বসবাস করেন। এছাড়া তাদের আরো দুই ভাই কক্সবাজার শহরের সমিতি পাড়ায় বসবাস করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি এআরএনও-এর কৃতজ্ঞতাঃ মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)।

২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বলেছে, 'আমাদের মতো অসহায় এক জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় মুহূর্তে মানবতার প্রথম হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্তর্জাতিকভাবে পূর্বে কোনো সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি না পেয়েও তাঁর সরকার আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে তারা আরো জানিয়েছে, এটি পূর্বের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ১৯৭৪ সালেও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোর ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় মিয়ানমারের সংখ্যালঘু নিধন অভিযান বন্ধে সামরিক জান্তাকে বাধ্য করেছিলেন। নিজেদের নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারও একইভাবে আমাদের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। রাখাইনে হত্যাযজ্ঞ বন্ধে আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের পাশে রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যেমন রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে গিয়ে মুসলিম ভাই

হিসেবে বিবেচনা করতেন, তেমনি এই সরকারের কাছেও আমাদের তেমন সহানুভূতি পাওয়ার দাবি জানাচ্ছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়া আমরা সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী নিধনে মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সরব হওয়ার প্রার্থনা করছি। আমরা চাই বাংলাদেশ সরকারের মধ্যস্থতায় ও আন্তর্জাতিক মহলের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এই অমানবিক কার্যক্রম বন্ধ হবে বলেও আকুতি এআরএনওর।' (২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংখ্যার বিবৃতি 'আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন')

১০. ইসলামী মাহাজ অব রোহিঙ্গা

ইসলামী মাহাজ অব রোহিঙ্গা এই জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বর্তমানে যে কয়টি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা চালাচ্ছে এদের মধ্যে রয়েছে দুই জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামী মাহাজ রোহিঙ্গা এই জঙ্গি সংগঠন।

উখিয়ার বালুখালীর ক্যাম্প-১৩-এর 'বি' ব্লকের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম নুরু গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে বলেন, 'উখিয়ার বালুখালীর ক্যাম্প-১৩-এর 'সি' ব্লকে থাকেন ইসলামি মাহাজের নেতা মৌলভি সেলিম উল্লাহ। একসময় তিনি আরসার কমান্ডার ছিলেন। আরসার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনবিরোধী তৎপরতা, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে চাঁদাবাজি, মাদক ও সোনা চোরাচালান, অপহরণ, ধর্ষণ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় তিনি গোষ্ঠীটি ছেড়ে দেন। পরে তিনি গড়ে তোলেন ইসলামি মাহাজ। মৌলভি সেলিমের নেতৃত্বে ইসলামি মাহাজ নেতারা সাধারণ রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের পক্ষে জনমত গঠন করতেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও নামাজের খুতবায় আরসার অপতৎপরতা নিয়ে সতর্ক করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হয় আরসা।'

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের অভ্যন্তরের ছোট বড় ৩০০ মাদ্রাসার মধ্যে ১৭০টির বেশির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আরসার সহযোগী উলামা কাউন্সিলের কাছে। বাকিগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে ইসলামি মাহাজ। ইসলামি মাহাজের কাছ থেকে এসব মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেষ্টা চালাচ্ছে উলামা কাউন্সিল। এ জন্য মাহাজ নেতাদের একাধিকবার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আরসা ছায়া সংগঠন উল্লামা কাউন্সিল এবং রোহিঙ্গা ইসলামী মাহাজের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই গ্রুপে দ্বন্দ্বের কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে বারবার। একে অন্যের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে জড়াচ্ছে।

২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ হত্যাকাণ্ডে অন্তত ১৫ জন আরসার সক্রিয় সদস্য ধরা পড়েছে। এতে ইসলামি মাহাজের ওপর আরও ক্ষুব্ধ হয় আরসা। তাদের ধারণা, মাহাজের নেতারা পুলিশকে আরসার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন। বিদেশ থেকে ক্যাম্পের মাদ্রাসা-মসজিদের নামে বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা

আসে। এর ভাগাভাগি নিয়েও দুই সংগঠনের মধ্যে বিরোধ আছে। এছাড়া শিবিরে ক্যাম্পে ইয়াবা ও সোনার ব্যবসায় ভাগ বসিয়েছে আরসা। ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের অন্তত ১৪ হাজার দোকানপাট আছে; সেখান থেকে চাঁদা তোলে আরসা। রোহিঙ্গা মাহাজ আর আরসার মধ্যে এ ছাড়া চাঁদাবাজি নিয়ে নিত্য সংঘর্ষ ও মারামারির ঘটনা ঘটে।

১১. ভয়েস অব রোহিঙ্গা ইউনাইটেড

ভয়েস অব রোহিঙ্গা ইউনাইটেড– এই জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মৌলভী মো. সেলিম ওরফে আবু আবদুল্লাহ এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। এই জঙ্গি সংগঠনের অনলাইন ভিত্তিক একটি রেডিও এবং অনলাইন টিভি চ্যানেল রয়েছে। তাদের এই নিজস্ব গণমাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা প্রচার করে। উক্ত জঙ্গি সংগঠন একটি তহবিল সংগ্রহ করেছে এনজিওর নামে। 'মুসলিম এইড', 'করুনা', 'ইমাম মুসলিম', 'দারুল আনসার', 'সমন্বিত মানবিক উদ্যোগ' প্রভৃতি এনজিওর নামে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করেছে। সমসাময়িক বিশ্বের বর্বরতম সেনাবাহিনী ও মগদের বংশধরদের দ্বারা রোহিঙ্গারা চার দশক ধরে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার হয়েছে। ধর্ষিতা রোহিঙ্গা নারীদের আর্তচিৎকারে মগের মুল্লুক মিয়ানমারের আকাশ-বাতাস-নদী-সাগর বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জবরদস্তি নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে নিজভূমে পরবাসী করেছে। অবশেষে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে তাদের নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

৩৪টি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গা বসবাস করছে বর্তমানে। আর এসব ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে সহজে। এসব জঙ্গি গ্রুপগুলোও ক্যাম্পজুড়ে সক্রিয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে বিক্ষোভও করে। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের পেছনে দেশি-বিদেশি অসাধু গোষ্ঠী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে নিজেদের স্বার্থে।

এর আগে ইসলামপন্থী সংগঠনের পক্ষে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের হুমকিও প্রচার করা হয়েছে। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে উখিয়া অঞ্চলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য বড় হুমকি সৃষ্টি হয়েছে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুধু রোহিঙ্গাদের নিয়েই রয়েছে বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। কক্সবাজার ও বান্দরবানে বসবাসরত রোহিঙ্গাকে টার্গেট করে উখিয়া, টেকনাফ, রামু, চকরিয়া থেকে শুরু করে বান্দরবানের অরণ্যঘেরা সীমান্ত নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় হতে চাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলো। বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিভিন্ন ভিডিওচিত্র ও নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে রোহিঙ্গাদের দলে টানার চেষ্টা করছে। সংগঠনগুলো পৃথক কার্যক্রম চালালেও তাদের লক্ষ্য অভিন্ন। এ জঙ্গি সংগঠনগুলোর অন্যতম নেতৃত্বে রয়েছেন মৌলবী মনির, নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের মাস্টার আইয়ুব, মৌলভী নুর হোসেন, আবু বক্কর, মৌলভী শফিক, ড. ইউনুস, ড. ইউনুসের সহোদর আবু তাহের, মেয়ের জামাই মো. ইউনুছ,

মৌলভী মো. সেলিম ওরফে আবু আবদুল্লাহ, মোস্তাক মাঝি, রুহুল আমিন, হারুন, নেজাম, জকির আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, রশিদ উল্লাহ, হাসান, মো. আয়াছ, নুর আলম, আবদুল হাকিম, তার ভাই নজির আহমদ ও বশির আহমদ, হোসেন আহমদ, কেফায়েত উল্লাহ, মাস্টার রশিদ, খোরশেদ, মাহামুদুল হাসান ও দুদু মিয়া।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, বাংলাদেশে ইসলামিপন্থী প্রায় সবগুলো দলের টিম রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। মুসলিম দেশগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রোহিঙ্গাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তারা। পিছিয়ে থাকছে না দেশীয় জঙ্গি সংগঠনগুলোও।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সাহায্য দেওয়ার নামে সক্রিয় ছিল জঙ্গিরা। ২০২১ সালের ২৬ জুন রাজধানীর রামপুরা এলাকা থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা হলেন– সাইয়েদ তাইমিয়া ইবরাহীম ওরফে আনোয়ার, মারুফ চৌধুরী মিশু ওরফে ফারহান ও মো. ফয়জুল মোরসালিন। ২০২১ সালের ২৭ জুন ডিএমপি মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন্স সেন্টারে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ডিএমপি কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের প্রধান ডিআইজি মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'গোপন সেল বা মডিউলের মাধ্যমে তারা সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। এই গোপন সেল বা মডিউলের সদস্যরা কাট আউট পদ্ধতিতে রিক্রুট হয়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সেল বা মডিউলের সদস্যরা কেউ কাউকে চিনতে বা জানতে পারে না। গ্রেপ্তারকৃতরা বিভিন্ন প্রকার এনক্রিপ্টেড অ্যাপসের মাধ্যমে নিজেরা যোগাযোগ করত। তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তারদের মধ্যে সাইয়েদ তাইমিয়া ইবরাহীম আনোয়ার বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় বিবিএ শেষ করে। সে ২০১৫ সালে আনসার আল ইসলামে যোগ দেয় ও ২০১৬ সালে একটি মডিউল বা সেলের দায়িত্ব পায়।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আটক মারুফ চৌধুরী মিশু ওরফে ফারহান ঢাকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে বিবিএ করে একটি গ্রুপে চাকরি করতো। সে ২০১৫ সালে আনসার আল ইসলামে যোগ দেয়। গ্রেপ্তার ইব্রাহীমের সেল গ্রুপের সে একজন সদস্য ছিল।

মারুফ চৌধুরী ২০১৭ সালে সংগঠনের নির্দেশে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আগত রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্যের আড়ালে উগ্রবাদী মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিন মাস মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান করে। গ্রেপ্তার ফয়জুল মোরসালিন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গ্র্যাজুয়েশন করে। সে ফ্রি ল্যান্সার হিসেবে অনলাইনে কাজ করতো। সে ২০১৬ সালে আনসার আল ইসলামে যোগ দেয়।

১২. রোহিঙ্গা রিফিউজি ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস

২০১৭ সালে গড়ে ওঠে রোহিঙ্গা রিফিউজি ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস (আরআরভিএইচআর) জঙ্গি সংগঠন। এ সংগঠনটির ১৫ সদস্যের কমিটিও রয়েছে। ক্যাম্পে এ সংগঠনটিকেই রোহিঙ্গাদের আওয়াজ নামে অবহিত করা হয়। রোহিঙ্গা আওয়াজ

নামের এই জঙ্গি সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন মাওলানা আবু আনোয়ার ওরফে আনোয়ার ছাদেক, কো-চেয়ারম্যান মাওলানা মনজুর ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা হামিদ। রোহিঙ্গা আওয়াজ নামের সংগঠনের উপদেষ্টা মৌলভী হামিদ হোছাইন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন রোহিঙ্গা জঙ্গি নেতা হাফেজ নাঈম উল্লাহ, তোহা মাঝি, হাফেজ জালাল, মৌলভী ডা. মোহাম্মদ শফি, মৌলভী মনজুর, মাওলানা শফি উল্লাহ, মৌলভি আবু সালেহ ও হাফেজ রুহুল আমিন। কমিটির নেতারা টেকনাফ-উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ও সংলগ্ন বস্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের টার্গেট করছে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনগুলোর পাশাপাশি রোহিঙ্গা নাগরিকদের পরিচালিত বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার নামের রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো। তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে দলে ভেড়ানোর কাজ করছে 'রোহিঙ্গা রিফিউজি ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস' নামের একটি জঙ্গি সংগঠন। রোহিঙ্গারা জঙ্গিদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তাদের পেছনে সামান্য টাকা খরচ করলেই তাদেরকে ব্যবহার করা যায়।

কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে গোপনে জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এই জঙ্গি সংগঠন। ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা কুতুপালং ক্যাম্পের একটি মসজিদে তাদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েলি। ওই বৈঠকে নির্দেশনার পাশাপাশি জঙ্গি কাজে ব্যবহারের জন্য অর্থও দেওয়া হয়। রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত ইব্রাহিম নামক সৌদি নাগরিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলে রোহিঙ্গা জঙ্গি নেতারা ক্ষোভ সেঠ বৈঠকে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে জঙ্গি তৎপরতা ও সদস্য সংগ্রহ করতে ৩০ লাখ টাকা বৈঠকে উপস্থিত জঙ্গি নেতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কুতুপালং এ ব্লকের পাহাড়ে আমগাছতলা সংলগ্ন মসজিদে এই জঙ্গি সংগঠনের নিয়মিত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা আবু হানিফ গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে বলেন, 'সংগঠনটির নেতাদের কথামতো ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গাদের চলতে হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের মাধ্যমেই ত্রাণসামগ্রী ও আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়। তবে বিদেশ থেকে পাওয়া অনুদানের বড় অংশ ওই নেতারা অন্য কাজে ব্যবহার করছে।'

রোহিঙ্গা রিফিউজি ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস (আরআরভিএইচআর) জঙ্গি সংগঠনের আরেকজন নেতা মাওলানা আবু সালেহ ওরফে সালেহ আহমেদ, পিতা: মীর আহমেদ, ঠিকানা: মিয়ানমারের বুচিদং থানার মংডু জেলার উলাক্যে গ্রাম। বর্তমান ঠিকানা: দক্ষিণ পাহাড়তলী কক্সবাজার সদর। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সাবেক নেতা এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি এনজিও সংস্থা জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত ওয়ামী এর স্থানীয় কর্মকর্তা আবু সালেহ। প্রকাশ সালেহ আহমদ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিয়ানমার থেকে এদেশে আসেন। তিনি কক্সবাজার রামু বৌদ্ধপল্লীতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের

ঘটনার অন্যতম হোতা। তাকে এই মামলায় ২০১২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জামিন পান। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে তার বসবাস হলেও আরাকান বিদ্রোহী সংগঠন আরএসও-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ত্যাগ করেন সেই ক্যাম্প। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় ৩ বছর ডুলাহাজারা বড় ছনখোলা পাহাড়ি আরএসও এর ঘাঁটিতে ট্রেনিং নেন সালেহ আহমদ। পরবর্তীকালে কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলী এলাকায় বসতি গড়ে জামায়াত নেতা শামসুল আলম বাহাদুর সহযোগিতায় ভোটার তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেন। এরপর অন্যান্য আরএসও জঙ্গিদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন জামায়াত কর্তৃক পরিচালিত এনজিও সংস্থা ওয়ামীর কার্যক্রমের সাথে। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে একাধিকবার সফরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংস্থার সঙ্গে আঁতাত করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জামায়াতপন্থী বানাতে চকরিয়া ডুলাহাজারার ছনখোলায় গড়ে তুলেছেন একাধিক স্থাপনা, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। রোহিঙ্গাদের সেবাদানের কথা বলে এসব স্থাপনা করে থাকলেও; মূলত সেখানে কুংফু কারাতেসহ রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

কক্সবাজার সদর পিএমখালী ছনখোলা গ্রামটি পাহাড়ী জনপদ। এই আস্তানায় মাওলানা আবু সালেহ ও তার বিদেশী সহযোগীরা গোপন বৈঠকে বসে প্রায় সময়। আবু সালেহর মাধ্যমে এই এলাকায় রাস্তার ধারে পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানার নামে বহু স্থাপনা।

আরাকানভিত্তিক কিছু জঙ্গি সংগঠন এর সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের আরএসও এর সঙ্গে যুক্ত করে আরো মজবুত করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে এই আরএসও কমান্ডার জঙ্গি মাওলানা আবু সালেহ। এ কারণে জামায়াতুল আরাকান, আরএসও, আরইউএফ, এআরএনও এআরইউসহ বিভিন্ন রোহিঙ্গা বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর একত্রিত করার ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রথম সারির এ জঙ্গি নেতা।

আবু সালেহ জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের বস্তি তৈরী করে লেদা, শাপলাপুর শহরের বিভিন্ন ভাড়া বাসায় ও কুতুপালং শিবিরের পাশে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

মাওলানা আবু সালেহ সৌদি ও তুরস্ক থেকে রোহিঙ্গাদের নামে অঢেল টাকা এনে এই টাকার অংশ নিজেই ভোগ করে চলেছেন। যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত (কার্যকর হয়েছে) আসামী মীর কাশেম আলীর সঙ্গে সৌদিতে পরিচয় ঘটে আবু সালেহর। সেই সূত্রে তিনি ওয়ামীর মাধ্যমে প্রচুর টাকা আনতে সক্ষম হয়। আবু সালেহ, হযরত আবু বক্কর (রাঃ)'র নামে পাহাড় কেটে তৈরি করেছে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা। পাহাড়ের চূড়ায় নির্মাণ করেছে সুরম্য অট্টালিকা। রামুর বৌদ্ধবিহারে ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনার পর জঙ্গি আবু ছালেহকে গ্রেপ্তার করেছিল কক্সবাজার সদর থানা পুলিশ। কিন্তু বেশিদিন জেলে সময় খাটাতে হয়নি ভয়ঙ্কর এ রোহিঙ্গা জঙ্গিকে। পাকিস্তান ও সৌদি আরবে অবস্থানকারী আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের কাছ থেকে অঢেল টাকা এনে তার অনুসারিরা ব্যাপক তদবির চালিয়েছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, কক্সবাজার সদর পিএমখালী ছনখোলা গ্রামটি পাহাড়ী জনপদ। এলাকাটি অপরাধীদের অভয়ারণ্য হিসেবেও পরিচিত। ওখানে রহস্যময় দালান গড়ছে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা। ওই আস্তানায় মৌলানা আবু সালেহ ও তার বিদেশী সহযোগীরা গোপন বৈঠকে বসে প্রায় সময়। দেখা গেছে, এলাকার রাস্তার ধারে পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানার নামে বহু স্থাপনা। এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পাহাড়ের গহীন জঙ্গলে নির্মাণ করা হয়েছে চারদিকে পাকা দেয়ালে ঘেরা সুন্দর একটি বাড়ি। সামনে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন একটি পাকা গেট। এটি তালাবদ্ধ থাকে সব সময়। বিদেশী মেহমান এবং চিহ্নিত আরএসও জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রথম সারির নেতা ব্যতীত কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ রয়েছে।

কক্সবাজারের 'জঙ্গিপাড়া' বলে পরিচিত এলাকার জঙ্গি নেতা সালাহুল ইসলাম, ইব্রাহিম আতিক ও আবু ছালেহ ওরফে ছালেহ আহমদের মাধ্যমে বিএনপি নেতা ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় পাহাড়তলী, হালিমাপাড়া, ইসলামপুর এবং জিয়ানগর এলাকাকে সন্ত্রাসী রোহিঙ্গা জঙ্গি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

১৩. ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান

২০১৩ সালে ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান হচ্ছে– রোহিঙ্গাদের নতুন প্রজন্মের একটি জঙ্গি সংগঠন। ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান নামের এই সংগঠন শুরুতেই কেবল ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দিয়ে রোহিঙ্গাদের উদ্বুদ্ধ করতো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের তৎপরতা চালাতো। স্থানীয়ভাবে এটি পরিচিত ছিল 'হারাকাহ আল ইয়াকিন' নামে।

মিয়ানমারের সরকার পরবর্তীকালে ফেইথ মুভমেন্টকে একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করেছে। মিয়ানমার বলছে, এই গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছে রোহিঙ্গা জিহাদীরা, যারা বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তবে সংগঠনটি কত বড়, এদের নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত, তার কোন পরিষ্কার ধারণা তাদের কাছেও নেই।

২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ' তাদের এক রিপোর্টে বলছে, 'সংগঠনটি মূলত গড়ে উঠেছে সৌদি আরবে চলে যাওয়া রোহিঙ্গাদের দ্বারা। মক্কায় থাকে এমন বিশজন নেতৃস্থানীয় রোহিঙ্গা এই সংগঠনটি গড়ে তোলে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতে এদের যোগাযোগ রয়েছে। সংগঠনটির নেতা আতাউল্লাহ 'আবু আমর জুনুনি' নামেও পরিচিত। আতাউল্লাহর বাবা রাখাইন থেকে পাকিস্তানের করাচীতে চলে যান। সেখানেই আতাউল্লাহর জন্ম। তিনি বেড়ে উঠেছেন মক্কায়। সেখানে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন। ইউটিউবে তার একটি ভিডিও থেকে বোঝা যায়, রাখাইনের রোহিঙ্গারা যে কথা ভাষায় কথা বলে সেটি এবং আরবী, এই দুটি ভাষাই তিনি অনর্গল বলতে পারেন। ২০১২ সালে সৌদি আরব থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর ২০১৭ সালে আরাকানে নতুন করে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর তার

নাম শোনা যায়। আরাকানে যারা এই সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত, তাদের আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ আছে বলে মনে করা হয়। স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্যে এই সংগঠনটির প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতি আছে। ফেইথ মুভমেন্টের সদস্যদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ রয়েছে। উক্ত সংগঠনের প্রধান দাবি হচ্ছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিকত্ব এবং সমান মর্যাদা দিতে হবে।'

'ফেইথ মুভমেন্ট' নামে তাদের তৎপরতা চালাতো তাদের 'হারাকাহ আল ইয়াকিন'-এর নামে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ' তাদের এক রিপোর্টে বলছে, সংগঠনটি মূলত গড়ে উঠেছে সৌদি আরবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের দ্বারা।

ফেইথ মুভমেন্ট অব আরাকান মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের প্রথম কোনো সংগঠন নয়। সত্তর দশকে প্রথম রোহিঙ্গাদের সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের নাম ছিল 'রোহিঙ্গা পেট্রিয়টিজ ফোরাম (আরপিএফ)। ডিএ জাফরউল্লাহ ছিল সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। সত্তর দশকে এই সংগঠনটিতে বিভাজন দেখা দেয়। শেষতক ভেঙ্গেও যায়। এরপরই গড়ে ওঠে নতুন সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন (আরএসও) ডাঃ ইউনুস এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও সালামত উল্লাহ সেক্রেটারী হন। এভাবে প্রতি বছর রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন নামে জঙ্গি সংগঠনের জন্ম হচ্ছে। দেশ-বিদেশে বসে বসে এসব সংগঠনের ব্যানারে অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন রোহিঙ্গা নেতারা। দেশের বাইরে থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা হয় এনজিওর নাম দিয়ে। প্রতিটি ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট, রয়েছে তাদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য।

১৪. হিলফুল ফুজুল আল ইসলামী

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিলফুল ফুজুল আল ইসলামী নামের জঙ্গি সংগঠনের জোট। এই জঙ্গি জোটের প্রাথমিক পর্যায় লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আর্থিক সহযোগিতা করা। তাদের মাঝে ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম শিক্ষার নামে জঙ্গিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এই জোটের পরর্বতী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় কক্সবাজার বান্দরবান ও চট্রগাম জেলার বড় একটি অংশকে নিয়ে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করা। সেখান থেকে অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন সহ একজোট হয়ে একটি স্বাধীন আরাকান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হিলফুল ফুজুল আল ইসলামী নামের এই জোট গঠন করে। বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং সরকার উৎখাত করতে জোট বেঁধেছিল দেশি-বিদেশি ২৮ সংগঠন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও ইসলামপন্থী আরো সাতটি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে। অন্যগুলো ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী সংগঠন। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও পারস্পরিক স্বার্থে এক হয়ে 'হিলফুল ফুজুল আল ইসলাম আল বাংলাদেশ' নামে কাজ করে তারা। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান ঘিরে পরিকল্পনা তাদের। কৌশলগত স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নাশকতা চালিয়ে

সরকারকে কাবু করতে চাইছে এ জোট। ওই জোটে বাংলাদেশের যে সংগঠনগুলো সক্রিয় রয়েছে সেগুলো হলো– জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ-হুজিবি, হিযবুত তাহরীর, হিজবুত তাওহীদ, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, শহীদ হামজা ব্রিগেড ও দাওয়াতে ইসলাম।

পাকিস্তানের সংগঠন জামাত-আল-পাকিস্তান এবং ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে সক্রিয় পাকিস্তানের মদদপুষ্ট সংগঠন জইশ-ই-মুহাম্মদও এই জোটে রয়েছে। জোটভুক্ত ভারতীয় সংগঠনগুলো হলো– জুম্ম হিজাব-উল-মুজাহিদিনি, হরকাতুল জিহাদ-আই ও উলফা। পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতে সক্রিয় লস্কর-ই-তৈয়বাও এই জোটে রয়েছে। মিয়ানমারের সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) ও আরাকান আর্মি। আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখাও (একিউআইএস) এ জোটের প্রভাবশালী সদস্য।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আঞ্চলিক সহায়তা দানের ক্ষেত্র তৈরি করে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে জঙ্গি-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো যাতে অন্য দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে না পারে সে জন্য সরকার বেশ কিছু পরিকল্পনা নেয়। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে আটক উলফা নেতাদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উলফাসহ ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন সংগঠনের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এতে সরকারের ওপর নাখোশ হয় উলফা। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসও এবং আরাকান আর্মির ঘাঁটি নির্মূলেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এতে এসব সংগঠন ক্ষুব্ধ হয়। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকর করায় পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোও ক্ষিপ্ত হয় আওয়ামী সরকারের ওপর। এই সম্মিলিত ক্ষোভ থেকেই সরকার উৎখাত করতে জোট বেঁধেছিল ২৮টি সংগঠন।

অন্য যে সব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই জোটের সঙ্গে অর্ন্তভুক্ত সে সব সংগঠনের তালিকা– ১। দাওয়াতে ইসলাম, ২। হিযবুত তাওহীদ, ৩। হিযবুত তাহরীর, ৪। আনসারুল্লাহ বাংলাটিম, ৫। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী, ৬। জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), ৭। লস্কর ই তৈয়্যবা, ৮। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ৯। জইশ-ই মুহাম্মদ, ১০। ইত্তেহাদুত তুল্লাবুল মুসলেমীন, ১১। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, ১২। হিযবুল মুজাহিদীন অব জম্মু কাশ্মির, ১৩। দাওয়াতে কাফেলা, ১৪। ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, ১৫। রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, ১৬। আরাকান আর্মি, ১৭। আরাকান কালচারাল সোসাইটি, ১৮। রোহিঙ্গা শলিডারিটি অর্গানাইজেশন, ১৯। ন্যাশনাল লীগ ফর বার্মা, ২০। ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান, ২১। বার্মা লিবারেশন আর্মি, ২২। আরাকান মুভমেন্ট, ২৩। আরাকান

পিপলস ফ্রিডম পার্টি, ২৪। আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন, ২৫। ভারতের নাগা রেবল পার্টি, ২৬। উলফা, ২৭। অ্যাসেম্বলী অব রোহিঙ্গা অ্যাসোসিয়েশন, ২৮। আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা। এই জঙ্গি জোট বর্তমান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সদস্য সংগ্রহ, দাওয়াত ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেদের জোটকে শক্তিশালী করছে।

১৫. আরাকান ইসলামিক রোহিঙ্গা ফোরাম

আরাকান ইসলামিক রোহিঙ্গা ফোরাম ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির এবং রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও-এর কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ফাটল সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে আরএসও প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইউনুস ও নুরুল ইসলামের মধ্যেকার মনোমালিন্য হলে পুরনো সংগঠন আরএসও ভেঙে যায়। তারপর নুরুল ইসলাম গঠন করে আরাকান ইসলামিক রোহিঙ্গা ফোরাম (এআইআরএফ)। ওই সংগঠন তৎপর থাকলেও বিভক্তির কারণে প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের কোন উপকার হয়নি। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলার পর ২০০০ সালের দিকে আরএসও এবং এআইআরএফ আবার একত্রিত হয়। গড়ে ওঠে আরো একটি রোহিঙ্গা সংগঠন। এই সংগঠনের নাম হয় 'আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)। এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হন নুরুল ইসলাম। সামরিক শাখার দায়িত্ব পায় সলিমুল্লাহ।

মিয়ানমার আর্মির চাপের মুখে সলিমুল্লাহ কক্সবাজারে পালিয়ে আসে। এদেশীয় কিছু সমর্থকের সহযোগিতায় সলিমুল্লাহ চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটে এসে আশ্রয় নেয়। 'মমতানীল' নামের একটি বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর এই সংগঠনের নেতারা কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে যায়। আরএসও নেতা মাষ্টার আয়ুব পাড়ি দেন সৌদি আরবে। অনেকে গোপনে এদেশে অবস্থান করে কৌশলে নাগরিকত্ব নেয়।

এছাড়া আরএসও জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত হন টেকনাফ বাহারছড়ার মৌলভী আজিজ উদ্দিন, মৌলভী রফিক উদ্দিন, হাফেজ ছলাউল ইসলাম, সৌদি নাগরিক আবু সালেহ আল গাদ্দানি, টেকনাফ বাহারছড়া শামলাপুরের মৌলভি সৈয়দ করিম ও টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার মাওলানা ইব্রাহিম, টেকনাফ বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর পুরানপাড়ার মৌলভী নাসির উদ্দিনের ছেলে মৌলভী রফিক উদ্দিন, বাহারছড়া ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মৌলভী আজিজ উদ্দিন, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর সামরিক কমান্ডার রোহিঙ্গা নেতা মাষ্টার আয়ুব, সালামত উল্লাহ, মৌলভী আবদুর রহমান, আবু বক্কর, ডাঃ ইউনুচ ও ডাঃ নুরুল আমিন সহ আরো অন্তত ৩০ জন এদেশীয় নাগরিক। এরা বাংলাদেশের অখন্ডতা জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন, জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হত্যা, গুরুতর জখম ও অপহরণ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ক্ষতি সাধন তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য অর্থ সংগ্রহের ষড়যন্ত্রমুলক গোপন পরিকল্পনা ও আশ্রয় দানে জঙ্গি সংগঠন আরএসও'র সাথে গোপন বৈঠক করতো প্রায় সময়। এদের অনেকে গ্রেপ্তারও হন। সংগঠনের নুর

ইসলাম আমেরিকায়, ডাঃ ইউনুস বৃটেনে এবং মাহমুদ কানাডায় রয়েছে। এসব সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয় থাকা মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানে থাকা নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে এখনো মিয়ানমারের বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে।

১৬. আরাকান জমিয়তুল মুজাহিদীন

১৯৯৬ সালে মিয়ানমারে গড়ে উঠে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরাকান মুজাহিদীন। তারই নতুন ভার্সন হচ্ছে রোহিঙ্গা নতুন প্রজন্মের হাতে গড়ে উঠা আরাকান জমিয়তুল মুজাহিদীন নামের নতুন জঙ্গি সংগঠনটি।

জমিয়তুল মুজাহিদীন নামে এই জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা শুরু করেছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। এ সংগঠনটির নেপথ্যে রয়েছেন মাওলানা হানিফ রাগীব নামে একজন রোহিঙ্গা নাগরিক। উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছেন– তিন স্তরের সদস্য। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান হচ্ছেন সৌদি আরব প্রবাসী রোহিঙ্গা নাগরিক মাওলানা আব্দুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে রয়েছেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বর্মী। বাংলাদেশ শাখার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে রয়েছেন মাওলানা হানিফ রাগীব।

তারা রোহিঙ্গা রিভাইভাল ফাউন্ডেশন নামের একটি ইসলামিক এনজিওর মাধ্যমে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন। এই সংগঠনের নেতারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানকারী আলেমদের টার্গেট করে কাজ করছে এই জঙ্গি সংগঠন। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বর্তমানে চারটি জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা চালাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে পুরনো দুই জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামী মানাজ এবং আরাকান জমিয়তুল মুজাহিদীন নামে নতুন দুই সংগঠন। ৩৪টি শরণার্থী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মধ্যে ১৫টিতে তাদের আধিপত্য। এই জঙ্গি সংগঠনের অর্থায়ন হয় সৌদি আরব, আরব আমিরাত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া থেকে। মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তৎপর বিভিন্ন এনজিও, হুন্ডির মাধ্যমে এসব দেশ থেকে আসা টাকা সংগঠনগুলোর কাছে পৌঁছানো হয়। আরাকান জমিয়তুল মুজাহিদীন নামের এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে মরিয়া বিএনপি-জামায়াত জোট ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোকে ভোট ব্যাংক হিসেবে পেতে চেয়েছিল। তাই তাদের অবৈধভাবে নাগরিকত্ব দেবার গোপন মিশন হাতে নিয়েছিল এই জোট। সে মিশন ভেস্তে যাবার পর জামায়াতের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলোর মাধ্যমে কক্সবাজারের টেকনাফ-উখিয়ার ক্যাম্পগুলো থেকে বাছাইকৃত রোহিঙ্গাদের দেওয়া হচ্ছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ। এসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প এখন জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি। দুর্গম অরণ্যে গড়ে তোলা হয়েছে প্রশিক্ষণকেন্দ্র। ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জঙ্গিদের সংগঠিত

করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো। যাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিও। তাদের অর্থয়ানে পরিচালিত দেশি-বিদেশি এনজিওর মাধ্যমে জঙ্গিদের সহযোগিতা করছে তারা। এর আগে রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গিদের অর্থ সহায়তার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর মুসলিম এইড, মুক্তিসহ ৭-৮টি এনজিওর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। তারপরও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল জঙ্গিরা। তাদের সহায়তায় দিন দিন আরো শক্তিশালী হচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী।

অনুসন্ধানে জানা যায়, টেকনাফ-উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর ম্যানেজমেন্ট বা মাঝির দায়িত্বে থাকা অধিকাংশ রোহিঙ্গাই জঙ্গিনেতা। আরাকান জমিয়তুল মুজাহিদীন, নিষিদ্ধ রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরসা, ইসলামী মানহাজ, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), হরকাতুল জিহাদসহ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন এখন প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রুপ হয়ে কাজ করছে। যাদের পেছনে রয়েছে বিএনপি-জামায়াতের মতো বড় রাজনৈতিক শক্তি।

১৭. রোহিঙ্গা সলিডারিটি ফ্রন্ট

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরস্থ তাদের আস্তানায় ৩৩ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা সলিডারিটি ফ্রন্ট নামের একটি জঙ্গি সংগঠনের ব্যানারে শিবিরের অবস্থানরত জঙ্গি ক্যাডারেরা তৎপর হয়ে উঠেছে। আবু ছিদ্দিক ও জঙ্গি নুরুল ইসলাম কুতুপালং ক্যাম্পে অবস্থান করে রোহিঙ্গা সলিডারিটি ফ্রন্ট রোহিঙ্গা জঙ্গি ক্যাডারেরা তাদের সংগঠনের ভিত্তি শক্ত করতে দেশি-বিদেশি লোকজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়েক দফা গোপন বৈঠক হয়েছে। কুতুপালং রোহিঙ্গা বস্তির ডি-৪ ব্লকের মসজিদের ইমাম মৌলভী মঞ্জুর আলম এসব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ক্যাম্প ভিত্তিক জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। এ সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের রেজিঃ ও আন-রেজিষ্টার্ড রোহিঙ্গারা। ৩৩ জনের এ সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতা ও আর্থিক পৃষ্টপোষকতায় রয়েছে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা কক্সবাজারে অবস্থানকারী মিয়ানমার রোহিঙ্গা বিদ্রোহী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের সাবেক কমান্ডার নুরুল ইসলাম। তিনি রোহিঙ্গাদের নিয়ে এইসব কর্মকান্ড তৎপরতার লক্ষ্যে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অনুদান আনতে সক্ষম হয়েছেন। এর আংশিক রোহিঙ্গা শিবিরে ভাগ-ভাটোয়ারা করলেও বেশির ভাগ রোহিঙ্গারা এই অনুদান থেকে বঞ্চিত।

২০১২ সালের পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, রোহিঙ্গা সলিডারিটি ফ্রন্ট-এর সাথে আন্তর্জাতিক পাকিস্তানভিত্তিক সংস্থা ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ২০১৮ সালে

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ বিতরণের নামে প্রশ্নবিদ্ধ কমর্কাণ্ড চালিয়েছিল পাকিস্তানভিত্তিক সংস্থা ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত। যাদের মূল কাজ আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়্যবার তহবিল সংগ্রহ। ২০১২ সালে এই এনজিও'র কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল সরকার।

১৮. ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন (আইটিএম)

ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন সংগঠনটি ১৯৮৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আরাকানে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গা নাগরিক ডা. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন। রোহিঙ্গা ছাত্র যুবকদের মধ্যেও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি দাওয়া এবং জিহাদ চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাদাভাবে ১৯৮৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO)-এর সশস্ত্র ছাত্র সংগঠন ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন (আইটিএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই রোহিঙ্গাদের সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ সশস্ত্র ছাত্রসংগঠন। উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মুহাম্মদ আলী এবং সেক্রেটারি রুহুল আমিন আরকানি। মুহাম্মদ আলী বর্তমান সৌদি আরবে রয়েছেন, রুহুল আমিন রয়েছেন পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের আগে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংস্থার নাম ছিল ইসলাম ছাত্রসংঘ। পরে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এটি ইসলামী ছাত্র শিবির আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলী। ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা মীর কাশেম আলীর মাধ্যমে ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনকে ১৯৮০ সালের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির আর্থিকভাবে সহযোগিতা, জিহাদি প্রশিক্ষণ, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশে পুনর্বাসন এবং দেশ-বিদেশ হতে আরাকানে জিহাদের নামে অর্থের যোগান দিয়ে আসছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র 'মাসিক আল-তাদামুন' পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গারা আরাকান পুনরুদ্ধার এবং মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার সময় বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে আরাকানে প্রতিষ্ঠাতা করা হয় জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (RSO)। উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমির হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় ডা. মোহাম্মদ ইউনুসকে। এর পূর্বে তিনি 'রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট' (আরপিএফ)-এর কমান্ডার ছিলেন। RSO সংগঠনের সশস্ত্র ছাত্র আন্দোলনের নাম হল 'ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন' (আইটিএম)। এই সংগঠনের ১০ হাজার কর্মী সদস্য ও মুজাহিদদেরকে ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে কক্সবাজার জেলা বান্দরবানের গহীন অরণ্যে বিশেষ করে নাইক্ষ্যংছড়ির গহীন অরণ্যে সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হয়। তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র

শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমিনুল ইসলাম মুকুল। এদের দু'জনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ফাইন্যান্স এন্ড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ও রাবেতা আল ইসলামির আর্থিক সহযোগিতায় ১০ হাজার রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আইটিএম-এর সশস্ত্র জঙ্গিদের বিভিন্ন আধুনিক অস্ত্রের জোগান দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির কেন্দ্রীয় কমিটি।' (মাসিক আল তাদামুন (উর্দু ভার্সন), নবেম্বর সংখ্যা, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯১)

চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহরিয়ার কবির নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের সম্পৃক্ততার তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এতে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন 'আরএসও'-এর সশস্ত্র ছাত্রসংগঠন ইত্তেহাদুত তোল্লাবুল মুসলেমিন-এর একজন কর্মীর সাক্ষাৎকার রয়েছে, যার নাম শাকিল জিহাদী। এই সাক্ষাৎকারে শাকিল বলেছে কখন, কীভাবে তারা আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসেছে এবং কীভাবে চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসায় পড়ার সময় জামায়াত-শিবিরের মাধ্যমে 'আইটিএম'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় প্রশিক্ষণের পর শাকিলকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ২০০৩ সালে লিবিয়া পাঠানো হয়েছিল, যেখানে থাকার সময় সে ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জঙ্গিদের সংস্পর্শে এসেছে।

১৯. আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি)

আরাকান লিবারেশন পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ৯ এপ্রিল। এই সংগঠনের সশস্ত্র শাখার নাম আরাকান লিবারেশন আর্মি। প্রতিষ্ঠাকালীন উক্ত সংগঠনকে সার্বিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন 'কারেন জাতীয় ইউনিয়ন' (কেএনইউ)। ১৯৬৮ সালের ২ নভেম্বর দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খাই রায় খাই সহ আরও নয় জন সহযোগীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রাখাইন রাজ্যের সিটওয়ে অঞ্চল থেকে। ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর পার্টির সাধারণ সম্পাদক খাইং সো নাইংকে রাখাইন রাজ্যের রাথেদাউং টাউনশিপে বার্মিজ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের পরে বিভিন্ন অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করলে দলটি ভেঙে দেয় নেতারা।

উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী– ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এএলপি থেকে প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দিদের সাধারণ ক্ষমার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাক্তন সদস্য খাইং মো লুনকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি এএলপি পুনরায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেএনইউ নেতাদের সাথে দেখা করার জন্য কমুরা চলে গেলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত, কেএনইউয়ের সহায়তায় এএলপি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৮০ সালে সমস্ত এএলপি এবং এএলএ বন্দীদের সাধারণ ক্ষমার উপর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে আরাকান লিবারেশন পার্টি তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে থাকে।

আরাকান আর্মি বা সংক্ষেপে এএ হচ্ছে বৌদ্ধ উগ্রবাদীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। যদিও সংগঠনটি আরাকান রাজ্যের বিদ্রোহীদের নিয়ে গঠিত তবে তারা বার্মার কোচিন রাজ্যে যুদ্ধরত। এরা কোচিন রাজ্যের অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে যুক্ত হয়ে মিয়ানমারের সরকারি (সামরিক) বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।

আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) মিয়ানমারের কারেন প্রদেশ ও রাখাইন প্রদেশে জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ৭ হাজারের বেশি।

বাংলাদেশেরই ভূখন্ড পানঝিরি, লেক্রে, বুলুপাড়া, আন্ধারমানিক। অথচ বান্দরবানের এই সীমান্ত এলাকায় অবাধ বিচরণ মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান লিবারেশন পার্টি- এএলপি'র। তাদের নেতৃত্বে চলছে অপহরণ, চাঁদাবাজি, নিষিদ্ধ পপি চাষ। দুর্গম এ এলাকায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারি বাহিনীর চলাফেরা সীমিত; তারই সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। এ দলগুলো মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত। বার্মিজ সরকার তাদের প্রতিনিয়ত খুঁজছে হত্যা করার জন্য। মিয়ানমারের আরাকান আর্মি, আরাকান লিবারেশন পার্টির (এএলপি) মতো গ্রুপগুলো বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের কাছে অস্ত্র পাচার করে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৮৮ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্ত দুর্গম হওয়ার কারণে অনেক স্থান অরক্ষিত। সীমান্তসংলগ্ন বাংলাদেশ অংশে ১০৩৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সড়কে সীমান্তে টহল বাড়ানো যাবে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হচ্ছে। মিয়ানমার সীমান্ত খুবই অপরাধপ্রবণ। ইয়াবাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। দুর্গম ওই পাহাড়ি অঞ্চলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ দল আরাকান আর্মি (এএ) শুধু নয় আরো রয়েছে আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) নামের একটি শক্তিশালী সংগঠন। তবে দু'জনের আলাদা উদ্দেশ্য থাকলেও মিল এক জায়গাতে। তারা আশ্রয় নিয়েছে আমাদের ভূখণ্ডে বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ে।

বান্দরবানের থানচি থেকে তিন্দু, রেমাক্রি, ছোট মদক, বড় মদক, মদকের আগা এরপরেই শঙ্খ নদীর উৎপত্তিস্থল বা রিজার্ভ ফরেস্ট যেখানে নিষিদ্ধ এই দল ঘাঁটি গাড়ছে। শুধু তাই নয় রিজার্ভ ফরেস্টের পরের স্থানটির নাম লিকরি, এরপর পাঞ্জেরি তারও অনেক পরে মিয়ানমারের সীমান্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গিরা যে জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে অর্থাৎ শঙ্খ নদীর উৎপত্তিস্থল সে জায়গা থেকে কমপক্ষে সাতদিন একটানা পায়ে হাঁটলে মিয়ানমারের সীমান্ত।

২০. আরাকান লিবারেশন আর্মি (এএলএ)

আরাকান লিবারেশন আর্মি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। এরা আরাকানের স্বাধীনতা চায়। আরাকান লিবারেশন আর্মি (এএলএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ২০ নভেম্বর। এটি এএলপির একটি সশস্ত্র সামরিক শাখা। উক্ত সংগঠনকে সার্বিক সহযোগিতা করেন

'কারেন জাতীয় ইউনিয়ন' (কেএনইউ)। এএলএ সংগঠনকে গোলাবারুদ, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলো কারেন জাতীয় ইউনিয়ন। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে এই সংগঠনটি ভেঙে যায়।

উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, '১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এএলপি থেকে প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দিদের সাধারণ ক্ষমার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী খাইং মো লুনকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি এএলএ পুনরায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেএনইউ নেতাদের সাথে দেখা করার জন্য কমুরা গ্রামে চলে গেলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত, কেএনইউয়ের সহায়তায় এএলএ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং লুনকে এএলএ-এর সর্বাধিনায়ক-পদে পদে নিয়োগ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এপ্রিল থেকে ১৯৭৭ সালে লনের নেতৃত্বে ১২০ জন এএলএ যোদ্ধারা তাদের সাথে জড়িত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং তাতমাদও (মিয়ানমার সশস্ত্র বাহিনী) এ ভারত-মিয়ানমার সীমানা লুন সহ দশ জন এএলএ যোদ্ধা নিহত হয়েছিল, ভারতীয় ও বার্মিজ কর্তৃপক্ষ ৭০ জনকে ধরে গ্রেপ্তার করেছিল এবং ৪০ জনকে নিরস্ত্র করে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকারী বাহিনীর পশ্চাদপসরণকালে অতিরিক্ত ২০ জন নিখোঁজ হন এবং গ্রেপ্তার হওয়া ৩০ জন ছিলেন শুটিং দ্বারা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা। আরও ৫৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা তৎকালীন সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে; তাদের মধ্যে ১১ ছিল মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত, এবং বাকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯৮০ সালে সমস্ত এএলএ বন্দীদের সাধারণ ক্ষমার উপর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮১ সালে, এএলএ আবারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কেএনইউ দ্বারা সহায়তা করেছিল।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে এদের রয়েছে ২৮টি জঙ্গি ক্যাম্প ও অস্ত্রাগার। পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের উপর নজর রাখেন গবেষক মেহেদী হাসান পলাশ গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে বলেন– 'আমার কথা হলো, এই জঙ্গি গ্রুপটি তাদের যদি আমরা মিয়ানমারের বিদ্রোহী সংগঠন হিসেবে মনে করি, তবে তাদের নাম হওয়া উচিত ছিলো রাখাইন লিবারেশন আর্মি কিন্তু তারা সংগঠনটির নাম দিচ্ছে আরাকান লিবারেশন আর্মি। আবার বাংলাদেশের ভেতরে রয়েছে তাদের ২৮টি অস্ত্রসহ ক্যাম্প! তারমানে তাদের কি রাখাইন দখল করা উদ্দেশ্য? নাকি রাখাইন থেকে শুরু করে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ ফেনী নদী পর্যন্ত প্রাচীন আরাকানটাই তাদের চাই।'

দ্য কমিউনিটি অব জোড্ডা নামক ফেইসবুক আইডিতে ১৬ মার্চ ২০১৩ শাকিল মাহমুদ খান নামক একজন লিখেন, 'আরাকান লিবারেশন আর্টি জেএসএস বা ইউপিডিএফ থেকেও ভয়ানক শক্তিশালী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এক সময়, ওদের নীতিমালা ছিল, বার্মার রাখাইন বা তৎকালীন আরাকান প্রদেশের স্বাধীনতা নিয়ে। কিন্তু বর্মী সেনা অভিযানে ওপার থেকে সহজে গা ঢাকা দিতে বিগত দুই দশক থেকে এরা আধিপত্য বিস্তার করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বার্মা সীমান্তলগ্ন বান্দরবান জেলায়। জেলার দুর্গম থানচি, রুমা, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় এদের বিস্তার চোখে পড়ার মতো। এদের

প্রধান অস্ত্রদাতা থাইল্যান্ড, সহযোগী দেশ হিসেবে আছে হংকং অতঃপর চীন। জেএসএস বা ইউপিডিএফ-এর মতো এরা বাঙালী নিধনে ব্যস্ত না। বরং, এরা নিরীহ খুমী ও ম্রো উপজাতিদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাদক চাষে বাধ্য করায়। এদের মধ্যেও রয়েছে অধিপত্য বিস্তারের লড়াই।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বার্মার সাথে বাংলাদেশের ১৭৬ মাইল তথা ২৮৩ কিলোমিটাররে মতো অরক্ষিত সীমান্তে আরকান লিবারেশন আর্মি নির্বিঘ্নে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের নিয়ে বার্মা সরকার ও উদ্বিগ্ন। অস্ত্র সুবিধা ও জনবল পেতে এদের সাথে সংখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অপরাপর সন্ত্রাসী সংগঠন JSS/UPDF. মতের অমিল থাকায় অনেক সময়ই এরা সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূলত মাদক চাষে বৈদেশিক অর্থ ও অস্ত্র অর্জনে এএলএ- এ অঞ্চলে বিস্তার ঘটিয়েছে। বর্মী বিচ্ছিন্নবাদীরা এ অঞ্চলে মাদক-পপি চাষে অনেকদূর এগিয়েছে শুধুমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দার না থাকায়। এসব অঞ্চল এতটাই দুর্গম যে, জেলা সদরে আসতে ৩ দিন পর্যন্ত লেগে যায় অথচ বার্মা যেতে মাত্র ২-৩ কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিলেই হয়।

২১. রোহিঙ্গালীগ ফর ডেমোক্রেসি বার্মা (আরএলডিবি)

২০১০ সালের শুরুতে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও-এর সাবেক নেতা মাওলানা হুজ্জাতুল ইসলাম, তোফায়েল আহমদ ও শফিউল্লাহর মাধ্যমে রোহিঙ্গালীগ ফর ডেমোক্রেসি বার্মা (আরএলডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিনির্ধারক হচ্ছেন জামায়াত নেতা শফিউল্লাহ, পিতা, মৃত সালেহ আহমদ, ঠিকানা- বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর। শফিউল্লাহ ছাত্রজীবনে ছাত্র-শিবিরের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে শিবির ক্যাডার থেকে জামায়াতের কক্সবাজার জেলার নেতা হয়ে উঠেন। তিনি বর্তমান রোহিঙ্গালীগ ফর ডেমোক্রেসি বার্মা (আরএলডিবি) এর কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকের পদে রয়েছেন। তার বাবা সালেহ আহমদ ছিলেন রোহিঙ্গা জঙ্গিসংগঠন রোহিঙ্গা প্যাট্রোটিক ফ্রন্টের (আরপিএফ) প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। জঙ্গিনেতা শফিউল্লাহ কাগজে-কলমে নাইক্ষ্যংছড়ি কলেজের প্রভাষক পদে নিয়োজিত রয়েছেন।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, মানবকল্যাণ নামে একটি এনজিও গঠন করে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অনুদান এনে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম এবং জামায়াত শিবিরের রাজনীতিতে খরচ করেন। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর এই নেতা দীর্ঘদিন ধরে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও ২০০৯ সালে তার সঙ্গে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা জামায়াতের নেতা ও উপজেলা চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দ্বন্দ্বের কারণে ২০১০ সালে তৎকালীন বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমান বহিষ্কৃত) কাজী মজিবুর রহমান এর হাত ধরে শফিউল্লাহ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ওই বছরে উপজেলা সম্মেলন

আওয়ামী লীগের কমিটির সদস্য সচিব হন। ২০১২ সালে শফিউল্লাহ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক মনোনীত হন। একই বছর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন করে হেরে যান। তিনি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহরের হোটেল লর্ডস থেকে এক পাকিস্তানী নাগরিকসহ আরো চার জনের সঙ্গে শফিউল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। আটক হওয়া পাঁচজন হলেন- শফিউল্লাহ (৪৫), মোহাম্মদ কবির আমীন (৫২), আব্দুল মজিদ (৩৫), সালামত উল্লাহ (৪৫) এবং পাকিস্তানের করাচীর বাসিন্দা মোহাম্মদ আলম (৪৭)। গ্রেপ্তারের পরে শফিউল্লাহ ২০১৪ এর ৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের আদালত থেকে জামিন পান। মুক্ত হয়ে পুনরায় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন।

২০১৬ সালে ২৯ জুলাই নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার জঙ্গি সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি পদে দায়িত্ব পান। অথচ তার বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের জন্য একাধিক মামলা রয়েছে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত নেতা শফিউল্লাহ একটি বেসরকারি কলেজের প্রভাষক হলেও বিপুল অর্থবিত্তের মালিক। নাইক্ষ্যংছড়ি ছাড়াও কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিনসহ বিভিন্ন স্থানে রয়েছে তার বিপুল টাকার সম্পত্তি। রয়েছে পাজেরো গাড়ী। চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে রয়েছে সালেহ ভবন নামে আলিশান বাড়ী, ঢাকার উত্তরাতে ১২ নং সেক্টরের ১৭ নং রোডে তার রয়েছে বিলাসবহুল বাড়ী।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা লীগ ফর ডেমোক্রেসি বার্মা (আরএলডিবি) এর তিনি একজন কেন্দ্রীয় নেতা। শফিউল্লাহর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ আইনে তার যে মামলাটি ২০১৪ সালে হয়েছে সেটি নিস্পত্তি হয়ে গেলেও একই অভিযোগে চট্টগ্রামে আরো একটি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে শফিউল্লাহর বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে বহু আগ থেকে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অতীতে তাকে আটকও করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এরও অনেক আগে থেকে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় জঙ্গি নেতা হিসেবে পরিচিত শফিউল্লাহ। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই আলোচিত জঙ্গি ও আরএসও নেতা শফিউল্লাহ এখন জঙ্গি প্রতিরোধ কমিটির উপজেলা সভাপতি।

২২.মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি)

২০১০ সালের জানুয়ারিতে মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি) গঠন হয়। বান্দরবানের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে সন্ত্রাসীদের তৎপরতা থামছে না। এক দশক থেকে মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি) নামে আরো একটি সশস্ত্র সংগঠন ওই এলাকায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিন আরাকান আর্মি (এএ), আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি), আরাকান কমিউনিস্ট পার্টি (এসিপি) এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান (ডিপিএ)সহ আরো কয়েকটি গ্রুপের অপতৎপরতার পর এই অঞ্চলের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি)। অপহরণ করে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে মুক্তিপণ দাবি করে এই সংগঠন। ২০১৮ সালে তাদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন থানচি উপজেলার পাড়াপ্রধান আথুইমং মারমা (৫৫)। প্রথমে স্ত্রী ও বোনসহ তাঁকে অপহরণ করা হলেও একে একে ছাড়া পান কারবারির স্ত্রী আনিমে মারমা (৪৪) ও বোন মেনু প্রু মারমা (৩০)। টানা ৬ দিন আটকে রেখে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি জওয়ানরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৭ সালের শুরুতে মগ লিবারেশন পার্টি (এমএলপি) সম্পর্কে জানতে পারে এলাকাবাসী। এখন প্রতিটি পর্যটন স্পট, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, যাতায়াতের রাস্তা এবং পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এমএলপি সদস্যরা। এমএলপি সদস্যদের কাছে অত্যাধুনিক ও ভারি অস্ত্র রয়েছে।

২০১৭ সালের ২৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর সঙ্গে রুমা উপজেলার পাইন্দু উজানিপাড়ায় এমএলপি সদস্যদের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা রোমা উপজেলার বটতলা মারমাপাড়া থেকে মংখ্যাইনু মারমা (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মংখ্যাইনু মারমার বাড়ি রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া বালুপাড়ায়। রুমার বটতলী পাড়ার একজন নারীকে বিয়ে করে তিনি এই গ্রামের জামাই হয়েছেন।

মংখ্যাইনু মারমা ২০১২ সালে মগ লিবারেশন পার্টিতে পড়েন। ইতোমধ্যে তিনি মিয়ানমারের কারেন প্রদেশে ও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় সামরিক ও গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে। ২০১৫ সাল থেকে মংখ্যাইনু মারমা নিজেকে একজন 'পাহাড়ি বৈদ্য' পরিচয় দিয়ে এমএলপিতে সদস্য রিক্রুট এবং বিভিন্ন গ্রামের সমমনাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। এই সংগঠন রোহিঙ্গাদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। ওরা রোহিঙ্গাদের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায়নি। চাঁদাবাজি, খুনখারাবী ও অপহরণ করা তাদের নিত্য দিনের ঘটনা।

২৩.আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (আরিফ)

রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (RPF) এর অবশিষ্টাংশ এবং নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে থাকা রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) এর একটি দলত্যাগী গ্রুপকে নিয়ে একত্রিত করার পর ১৯৮৬ সালে আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (এআরআইএফ) মিয়ানমারের (বার্মা) উত্তর রাখাইন রাজ্যে সক্রিয়

একটি রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠী ছিল। ইয়াঙ্গুন শিক্ষিত আইনজীবী বর্তমান লন্ডন প্রবাসী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে রোহিঙ্গা যোদ্ধাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই দলটি।

১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবর রোহিঙ্গা সংগঠন ARIF আরেক জঙ্গি সংগঠন RSO এর সাথে একীভূত হয় এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ARNO) গঠন করে। রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (আরএনএ) এর সশস্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের পুরাতন সদস্যরা পরবর্তীকালে এই জঙ্গি সংগঠন যোগদান করে। নিজেদের এই জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করে।

১৯৮৬ সালে আরএসও থেকে বেরিয়ে গিয়ে নুরল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন আরেকটি জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (আরিফ)। তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। দীর্ঘ কয়েক বছর পর ১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবর আরএসও এবং আরিফ উভয় সংগঠন মিলে নতুন জঙ্গি জোট গঠন করেন। আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজশেন (আরএনও) নামের যৌথ জঙ্গি সংগঠন। এর প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় নুরুল ইসলামকে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, দীর্ঘ অনেক বছর পর ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আরএসও এর সর্বশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই বছর ৩০ জুলাই আরএসও এবং আরিফ এর জোট আরএনও গ্রুপের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ২০১৫ সাল কক্সবাজার শহরের কলাতলীর ওশান প্যারাডাইজ অভিজাত হোটেলে একটি ইসলামিক সংস্থার সেমিনারের নামে আয়োজিত সম্মেলনে গ্রুপের শীর্ষ নেতা লন্ডন প্রবাসী নুরুল ইসলাম ও ডা. মোহাম্মদ ইউনুস উপস্থিত হন। ওই দিন গঠিত হয় আরএসও এর ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি। সভাপতি হিসেবে ডা. ইউনুস সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনিত হন যথাক্রমে জঙ্গি নেতা হাজী মোহাম্মদ জাবের ও রাশেদ আহমদ। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন– ইউনুস আবাদী, আবু আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, মাওলানা আবুল ফয়েজ, নুর মোহাম্মদ মনসুর, আব্দুর রশিদ, মোহম্মদ সায়েদ, আবু কাদের, আবু ইয়াহিয়া, মীর আহমদ, হামিদ, রুহুল আমিন ও আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ। ওই দিনের নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন এজাহার হোসেন। এ কমিটির মধ্য দিয়ে টানা ২০ বছরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরএসও একাংশের প্রেসিডেন্ট নুরল ইসলাম উক্ত সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। তাকে সংগঠনের মূল দায়িত্বের বাইরে রেখে এনজিও বিভাগ, সামরিক বিভাগ ও বহির্বিশ্বের যোগাযোগের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত লন্ডন প্রবাসী নুরুল ইসলাম অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন সমূহকে আর্থিক সহযোগিতা করে চলেছেন।

২৪.রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (আরএনএ)

১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবর আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে কমাণ্ডার সেলিম উল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত হয়। রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি (আরএনএ) ছিল মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন রাজ্যে সক্রিয় একটি রোহিঙ্গা বিদ্রোহী

গোষ্ঠী। এটি ছিল আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনালের সশস্ত্র শাখা। ২৮ অক্টোবর ১৯৯৮-এ, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের সশস্ত্র শাখা এবং আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্টের অবশিষ্টাংশ একত্রিত হয় এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ARNO) গঠন করে, আরএনএ গ্রুপের সশস্ত্র শাখা হিসেবে।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএনএ ২০০১ সালের ৫ এপ্রিল আরাকান সেনাবাহিনীর সাথে একটি যৌথ অভিযান শুরু করে, এতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পাঁচ সৈন্য নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। ২০০১ সালের ২৭ মে আরএনএ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে মংডু থেকে ৩০ মাইল (৪৮ কিমি) উত্তরে বোদালা গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ক্যাম্পে অভিযান চালায়। আরএনএ দাবি অনুযায়ী, মিয়ানমার সেনাবাহিনী ২০ জন নিহত হয়েছিল সেই হামলায়।

উইকিপিডিয়ার তথ্যানুসারে, ২০০২ সালে আফগানিস্তানে সিএনএন আল-কায়দার আর্কাইভ থেকে কয়েক ডজন ভিডিওটেপ পায়, যেখানে দেখানো হয় যে, মিয়ানমার থেকে আসা বিদ্রোহীরা আফগানিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। অন্যান্য ভিডিওটেপগুলোতে আরবী ভাষায় "মিয়ানমার" লেখা ছিল, এবং এটা ধরে নেয়া হয়েছিল যে এই ভিডিও ফুটেজগুলো মিয়ানমারেই নেয়া হয়েছে, যদিও সেটার সত্যতা প্রতিপাদন করা হয়নি। এশিয়ার ইন্টেলিজেন্স সোর্স অনুসারে, আরএসও-তে নতুন রোহিঙ্গা সদস্যদেরকে অংশগ্রহণের জন্য উপহার হিসেবে ৩০,০০০ বাংলাদেশি টাকা (৫২৫ মার্কিন ডলার) প্রদান করা হত, এবং তাদের মাসিক আয় ছিল প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা। যেসব জঙ্গি যুদ্ধে মারা যেত তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হতো। এদের মৃত্যুর পর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকারটি অনেক তরুণ রোহিঙ্গা পুরুষকে পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আফগানিস্তানে আত্মঘাতি হামলা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মি সশস্ত্র সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অস্ত্র চালানোতে খুবই পারদর্শী। এই সংগঠনের রয়েছে প্রচুর গোলাবারুদ ও অত্যাধুনিক অস্ত্র।

২৫.রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ)

১৯৭৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) সংগঠনটি প্রতিষ্টিত হয়। রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) মিয়ানমারের রাখাইন ষ্টেটে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। এই সংগঠন এর এর ৭০ জন যোদ্ধার একটি ছোট এবং দুর্বল সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী ছিল, যারা বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে এবং উত্তর আরাকানে, বার্মার (বর্তমান রাখাইন রাজ্য, মিয়ানমার) বরাবর সক্রিয় ছিল। আরপিএফ এর লক্ষ্য ছিল রোহিঙ্গা জনগণের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম অঞ্চল তৈরি করা।

২৬ এপ্রিল ১৯৬৪ সালে, রোহিঙ্গা জনগণের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যে রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রন্ট (RIF) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দলটির নাম ১৯৬৭ সালে রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি (RIA)। তারপর ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) এ পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে, মুহাম্মদ জাফর হাবিবকে স্ব-নিযুক্ত সভাপতি, রেঙ্গুন-শিক্ষিত আইনজীবী নুরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মুহাম্মদ ইউনূস, একজন মেডিকেল ডাক্তারকে মহাসচিব হিসাবে আরপিএফ পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, জেনারেল নে উইনের সমাজতান্ত্রিক সামরিক জান্তা উত্তর আরাকানে (রাখাইন রাজ্য) অপারেশন নাগামিন (অপারেশন ড্রাগন কিং) শুরু করে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আরপিএফ সদস্যদের গ্রেপ্তার করা। অপারেশনটি RPF-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে, যার ফলে সংগঠনটি বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যার মধ্যে অনেকগুলি পরে ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গা সংহতি সংস্থা (RSO) হয়ে একত্রিত হয়। ১৯৮৬ সালে, আরপিএফ-এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে RSO-এর একটি অংশের সাথে একীভূত হয় এবং আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (ARIF) হয়ে ওঠে।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব মুসলিম আন্দোলনে অনুপ্রাণীত হয়ে রাখাইনে আবার গড়ে ওঠে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট নামে আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ। পরবর্তীকালে এরমধ্য দ্বন্দ্ব শুরু হলে, অপেক্ষাকৃত বেশি কট্টরপন্থিরা বেরিয়ে এসে ১৯৮২ সালে গড়ে তোলে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)। কিন্তু ১৯৮৬ সালে আরএসওতেও ভাঙ্গন ধরে। ১৯৯৮ সালে গড়ে ওঠে আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (এআরআইএফ)। পরবর্তীকালে এই দুটি গ্রুপ এক হয়ে আবার গঠন করে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন।

১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালে মিয়ানমারের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে আরএসও নিজেদের ছোট ছোট ঘাঁটি তৈরি করে। তাদের বড় ধরনের হামলার খবর পাওয়া যায় প্রথম ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে। তাদের অনেক যোদ্ধা বাংলাদেশ থেকে রাখাইনের মংডুতে ঢুকে পড়ে। এরমধ্যে একটি গ্রুপ নৌকা করে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ মংডুর এক গ্রামে। ২৮ এপ্রিল মংডু শহরে তাদের পুঁতে রাখা বোমায় প্রাণ হারায় অনেক বেসামরিক মানুষ। এছাড়া বেশকিছু যোদ্ধা শহরের উপকণ্ঠেও হামলা চালায়। তবে সেসময়ও এই গ্রুপ স্থানীয়দের জোরালো সমর্থন পায়নি। ফলে নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়।

২৬. আরাকান ইউনাইটেড ফোর্স

২০১৩ সালে আরাকান ইউনাইটেড ফোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বান্দরবানে এখনো মিয়ানমারের ১০টি বিচ্ছিন্নবাদী সংগঠনের মোর্চা 'আরাকান ইউনাইটেড' ফোর্স-এর প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য সক্রিয় রয়েছে। এসব গ্রুপ এখনো সীমান্তে লুটপাট, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানসহ নানা অপরাধে জড়িত। ২৬ আগস্ট ২০১৫ থানছি সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে চার ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয় সন্ত্রাসীরা। ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত

যৌথবাহিনী তাদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করে শতাধিক একে-৪৭, অর্ধশতাধিক এম-১৬ রাইফেল, বিপুল পরিমাণ হ্যান্ড গ্রেনেড, লক্ষাধিক গুলিসহ আরো বিপুল পরিমাণের নানা ধরনের অস্ত্র। বান্দরবানের থানচির বড় মদক, ছোট মদক, রেমাক্রী, তিন্দু, রুমা উপজেলার রেমাক্রী প্রাংশা, চাকমা ঝিড়ি, পাইন্দু, রোয়াংছড়ির রাইক্ষং মৌজা, লেম্বু ঝিড়ি, তারাছা মৌজা, রনিন পাড়া, নাইক্ষংছড়ির দোছড়ি, আশারতলী, চাকঢালা ঘুমধুমসহ সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নবাদী দল আরাকান আর্মি (এএ), ডেমক্রেটিক পার্টি অব আরাকান (ডিপিএ), আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি), মিজো বাহিনী, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ), এনএলএফটি, রোহিঙ্গা ন্যাশনাল ও অরগ্যানাইজেশন (এআরএনও), রোহিঙ্গা সলিডারেটি অরগানাইজেশন (আরএসও), 'ন্যাশনাল ইউনাইটেড অব আরাকান' সক্রিয় রয়েছে। এসব সংগঠনের জোটকে আরাকান ইউনাইটেড ফোর্স বলা হয়।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে থাকা অস্ত্রশস্ত্র গুলো দেশীয় সন্ত্রাসী গ্রুপ এর হাতে স্বল্পদামে বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা এসব আধুনিক অস্ত্র চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করছে। সাবেক আরাকান আর্মির সদস্য নুরুছফা গণকমিশনের প্রতিনিধি দলকে জানান, মিয়ানমার সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সশস্ত্র বিভিন্ন গ্রুপ ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। এখনো প্রায় ৫ হাজার বিদ্রোহী সক্রিয় রয়েছে। মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের কিছু সদস্য এখনো সক্রিয় তাদের কাছে এরকম তথ্য রয়েছে। এদিকে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর মধ্য এখনো বেশ সক্রিয় রয়েছে 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও)। বর্তমানে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে দশ হাজার বলে জানিয়েছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এক সদস্য। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরএসও সদস্যরা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের অফিস রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গা শিবির দেশের সর্ব দক্ষিণে সীমান্ত উপজেলা টেকনাফ-উখিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির এখন জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাঁটি। দুর্গম এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পলাতক জঙ্গিদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো। আর অর্থ দিয়ে সহায়তা করছে দেশি-বিদেশি কয়েকটি এনজিও। রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গিদের অর্থ সহায়তার বিষয়টি প্রমাণ হওয়ায় 'মুসলিম এইড' সহ কয়েকটি এনজিওর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে শিবিরগুলোতে জঙ্গিরা দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে।' (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০ এপ্রিল ২০১৪)

টেকনাফ ও উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সরেজমিনে জানা গেছে, শিবিরগুলোর ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে যারা রয়েছে তারাই রোহিঙ্গা জঙ্গি নেতা। শিবিরগুলোতেও জঙ্গি প্রশিক্ষণের ক্যাম্প রয়েছে। যে কারণে জঙ্গি ক্যাডারদের এসব শিবিরই ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাদের যোগাযোগের একটি নির্ভরযোগ্য ঠিকানা

হিসেবেও। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান মুভমেন্ট, আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), হরকাতুল জিহাদসহ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন এখন একটি গ্রুপে কাজ করছে। আরাকান ইউনাইটেড ফোর্স সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের রয়েছে প্রচুর দেশীয় ও বিদেশী অস্ত্র।

২৭. আরাকান মুজাহিদীন

১৯৯৬ সালে মিয়ানমারে গড়ে উঠে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন 'আরাকান মুজাহিদীন'। তাদেরকে প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্নভাবে সহায়তা করছিল ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন। ইতোমধ্যে সংগঠনটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়েছে রাখাইন প্রদেশের ৩০০ রোহিঙ্গা যুবককে। প্রশিক্ষণের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল ইয়াসিন ভটকল। তিনি সেই সময়ে গড়ে উঠা 'আরাকান মুজাহিদীন'-এর অন্যতম ফান্ড। 'স্লিপার সেল' গড়তে সংগঠনের নির্বাচিত তখন কয়েকজনকে বিশেষ প্রশিক্ষণও দিয়েছিল ইয়াসিন ভটকল।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র আর-রিবাত পত্রিকার ২০২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে সংগঠন গড়তে উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্ত লাগোয়া মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে গিয়েছিল ইয়াসিন ভটকল। একই সময়ে করাচি থেকে সেখানে গিয়েছিল লস্কর-ই-তৈয়বার নেতা হাফিজ সাঈদ। বৈঠকে ছিল মিয়ানমারের হিজবুল আরাকান, তেহেরিক-ই-আরাকান, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আর এস ও) এবং বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। ১৯৯৬ সালে মার্চে রাখাইন প্রদেশের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, রোহিঙ্গাদের ওপর হামলার প্রতিরোধ করবে সংগঠনটি। সেইমতো গড়ে তোলা হয় 'আরাকান মুজাহিদীন'। প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলে মাদকাসক্ত রোহিঙ্গা যুবকদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। অর্থ এবং অস্ত্রের সহযোগিতা চাইতে ওই বৈঠকে যোগ দেওয়া রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের তাত্ত্বিক নেতা আবু আরিফ এবং স্বঘোষিত সেনা কমান্ড্যান্ট আবু সুফিয়া মে মাসে ইন্দোনেশিয়ায় যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার উগ্র সংগঠনগুলোর সাহায্য লাভ। ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি থাকায় সেখানকার উগ্র 'আল গুরাবা' সংগঠনের নেতা মুহাম্মদ জিব্রিলের কাছ থেকে সহায়তাও মেলে।' (রোহিঙ্গা জঙ্গিদের মুখপত্র 'আর-রিবাত' পত্রিকা ২০২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যা)

আরাকান মুজাহিদীনের পাশে দাঁড়ায় 'ইসলামিক ডিফেন্ডার ফ্রন্ট' নামে অন্য একটি সংগঠন। এর কিছুদিন পরই রাখাইন প্রদেশের জঙ্গলে শুরু হয় গোপন প্রশিক্ষণ শিবির। মাসিক আরাকান নিউজের তথ্য মতে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, রাখাইন প্রদেশে থাকা আরাকান মুজাহিদ নতুন করে সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু সেই ভুল ভাঙ্গে ১৯৯৬ সালের মে মাসের শেষ দিকে বুদ্ধগয়ায় হামলার পর। অনুসন্ধানে জানা যায়, মিয়ানমারে গড়ে উঠেছে জঙ্গি সংগঠন 'আরাকান মুজাহিদীন'। সেই শিবিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন রোহিঙ্গা যুবক প্রবেশ করে এদেশে এবং ভারতে ধরা পড়লেও

যাতে যোগসূত্র খুঁজে বের করা না যায়, সেই কারণেই জঙ্গি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা যুবকদের বাংলাদেশ ও ভারতে ঢোকানো হয়।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে সরেজমিন অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পুরো রাত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের দখলে থাকে। সেখানে গড়ে উঠছে পাহাড়ি এলাকায় একাধিক অস্ত্র তৈরির কারখানা। ক্যাম্পে ক্যাম্পে পরিচিতি পাচ্ছে অস্ত্রের গুদামের। তৈরি করা অস্ত্র সাতকানিয়া, বান্দরবান, রাঙামাটি, নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা-আলীকদম, আনোয়ারা, বাঁশখালী, পতেঙ্গা, সীতাকুণ্ড, ঘুমধুম, উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্ত হয়ে ক্যাম্পের সন্ত্রাসীদের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

২৮. জামায়াতুল আরাকান

জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর একটি অংশ মিয়ানমারের সকল উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য জামায়াতুল আরাকান নামে একটি জঙ্গি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিল ২০১১ সালে। এই সংগঠনের কয়েকজন সদস্য ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে আটক করা হয়। আটক জঙ্গিদের মধ্যে আব্দুল্লাহ কাফি নামের একজন জঙ্গি কক্সবাজার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন কক্সবাজার ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম নিয়ে আরকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে তারা। এই লক্ষ্যে মিয়ানমারের রাখাইনভিত্তিক সকল জঙ্গি গ্রুপকে একত্রিত করে জামায়াতুল আরকানের পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করে তারা। তিনি আরও জানান, তাদের এই ঐক্য প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে জেএমবি, হিযবুত তাহরীর, হরকাতুল জিহাদ ও পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জয়শ-ই-মোহাম্মদ। তারা অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছে এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তারা বান্দবনের গভীরে প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেছে। (সূত্র: দৈনিক পূর্বকোণ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের ইতিবৃত্ত ও রোহিঙ্গা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনেক জঙ্গি গ্রুপ প্রশাসনের কঠোর নজরদারির কারণে নিজেদের নাশকতা মূলক জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠী অধ্যুষিত ও জামায়াত-শিবিরের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকে। বান্দরবান-মিয়ানমার সীমান্তে একটি স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই কেবল জামায়াত-শিবির ও তাদের লালিত-পালিত জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্য নয়, বরং আস্তে আস্তে পুরো বাংলাদেশকে যেন আরেক আফগানিস্তান নীল নক্শা মাথায় রেখে ষড়যন্ত্র-জঙ্গিবাদের জাল বিস্তার করে চলেছে। দিন-দিন জঙ্গিগোষ্ঠীসমূহের আধিপত্য বেড়েই চলেছে, এখনো অব্যাহত রয়েছে।

২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পাহাড়-অরণ্যঘেরা বান্দরবান ও কক্সবাজারে 'ইসলামি রাষ্ট্র' কায়েমের তৎপরতায় নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে একাধিক ইসলামি জঙ্গি গ্রুপ। বান্দরবানের থানচি ও আলীকদম এবং কক্সবাজার-সংলগ্ন মিয়ানমারের মংডু অঞ্চলের একাংশ নিয়ে দেশের

দুর্গম এলাকায় একটি 'স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার গোপন মিশন নিয়ে কাজ করছে সশস্ত্র জঙ্গিরা। বান্দরবান-মিয়ানমার সীমান্তে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মিশন বাস্তবায়ন করতে প্রথম দফায় ২০১১ সালে থানচি ও আলীকদমের মাংগুমঝিরির গহিন অরণ্যে ঘাঁটি গাড়েন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক শামীম মাহফুজ (৪০)। সে সময় তিনি নিজেকে কৃষক হিসেবে পরিচয় দিতেন। পার্বত্যবাসীরা আপাত 'নিরীহ কৃষক', বিনীয় ও ভদ্র ব্যক্তিটিকে খুব সহজেই বিশ্বাস করেছিল। সরেজমিনে অনুসন্ধানে জানা যায়, এই শামীম ২০০৫ সালে চাষবাস করার নামে থানচির বলিপাড়ায় বিজিবির ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের সংরক্ষিত পাহাড়ি জমি ইজারা নিয়ে ভুট্টার চাষ শুরু করেন। স্থানীয় চাকমা, মারমা, ম্রোসহ অন্য পাহাড়িদের সঙ্গে তিনি সখ্য গড়ে তোলেন। তামাকের চাষের পরিবর্তে ভুট্টার চাষ করায় পাহাড়িদের মুখে মুখে তার নাম হয়ে যায় 'ভুট্টা শামীম' বা 'ভুট্টা কম্পানি'। থানচি ও আলীকদমের মাংগুমঝিরি এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন তিনি। চাষবাসের কাজে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করার নামে দলে ভেড়ান ১৫-২০ জন জঙ্গি।' (কালের কণ্ঠ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামীম মাহফুজের (৪০) গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার কচুয়া সরদারপাড়ায় এবং তার সহযোগী ইসমাইলের (৩৬) গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার বাহরপুর বাংলাবাজারসংলগ্ন এলাকায়। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা বিপুল পরিমাণ জিহাদী বই, লিফলেট, আগ্নেয়াস্ত্র এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত বোমা বানানোর কৌশল-সংক্রান্ত সচিত্র নথি, সফটওয়্যার, সিডি, ডেটা কেব্‌ল, হেডফোন, ছোট কোরআন শরীফ, ইলেকট্রনিক সুইচ, মোবাইল ফোনের অ্যান্টেনা, গান পাউডার, পাথর ভাঙার রড, পেরেক, আটটি জ্যাকেট, আটটি কম্বল, বোমা তৈরির কলাকৌশল ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। শামীম ছাত্রজীবনে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। বিএনপি-জামায়াত আমলে চারদলীয় জোট সরকারের সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেলেও পরে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জামায়াতুল আরাকান সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের গহিন অরণ্যে তাদের ঘাঁটির মাধ্যমে জঙ্গিদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতেন।

২৯. হরকাতুল ইয়াকিন

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আরাকান বার্মা এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কুদ্দুস বর্মি আতাউল্লাহকে নিয়ে ২০১৩ সালের শুরুতে ইয়াকিন গড়ে তোলেন। বর্তমানে সংগঠনটির আমির ও সামরিক শাখার নেতৃত্বে আছেন আতাউল্লাহ। তিনি ছাড়াও শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা মুফতি জিয়াউর রহমান, মুফতি আবুজার আজ্জাম, মাওলানা আবুল কালাম,মুহাম্মদ হামজা,ফাইজুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল হামিদ। শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কুদ্দুস বর্মি এবং অপর শীর্ষ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ পাকিস্তানে অবস্থান করে সংগঠনটির জন্য তহবিল সংগ্রহ করছেন। মাওলানা ওস্তাদ ওয়াজির,আবুজার ও ফাইজুল্লাহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বর্তমানে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে হরকাতুল ইয়াকিন তথা আল ইয়াকিন নামের একটি সশস্ত্র রোহিঙ্গা গ্রুপ বেশ সক্রিয় রয়েছে। আল ইয়াকিন নামের সংগঠনটির বেশির ভাগ রোহিঙ্গা আগে আরএসও নামক সংগঠনে ছিল। আল ইয়াকিন সংগঠনকে রোহিঙ্গাদের অনেকেই আরসা হিসেবেও বলে থাকে। সংগঠনটিতে রয়েছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা তরুণ ও যুবক। সাধারণ রোহিঙ্গাদের কাছে আল ইয়াকিন নামের সশস্ত্র সংগঠনটি একটি বড় ধরনের আতঙ্কের নাম। অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের কাছে আরেক ত্রাস হিসেবে পরিচিত হচ্ছে 'ডাকাত বাহিনী'। এসব রোহিঙ্গা মূলত ডাকাতি এবং মানবপাচার কারবারের জন্যই এমন সশস্ত্র পেশা বেছে নিয়েছে। তবে ক্যাম্প ছেড়ে এসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডেও মাঝে মাঝে ডাকাতি করায় তারা এখন দেশের নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। উখিয়া-টেকনাফের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সশস্ত্র রোহিঙ্গারা।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজারের মূর্তিমান আতঙ্ক 'আল-ইয়াকিন'। রোহিঙ্গাসহ স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে এ বাহিনীর সদস্যরা। কক্সবাজার ও টেকনাফের প্রতিটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন আল-ইয়াকিনের সদস্যরা। মিয়ানমারের পাশাপশি বাংলাদেশেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে 'আল-ইয়াকিন'। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরে মাদক বিক্রি, মানবপাচার, অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়, ডাকাতি ও মাদকের টাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহসহ নানা অপরাধে জড়িত এই বাহিনী। ইউটিউবে তাদের বেশ কয়েকজন নেতা নিয়মিত ভিডিও প্রচার করেন। ২০১৭ সালের ইউটিউবে প্রকাশিত এক ভিডিওতে আল-ইয়াকিনের নেতারা দাবি করেন, 'চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার আরাকানের অংশ। তারা এতদিন মিয়ানমারের রাখাইনে ছিলেন। এখন তাদের আরেক রাজ্য কক্সবাজারে এসেছেন। তারা এখানেই থাকবেন।' রোহিঙ্গাদের দাবি আদায়ের কথা বললেও ক্যাম্পের ভেতরে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত আল-ইয়াকিনের সন্ত্রাসীরা। ২০২০ সালের মার্চে উখিয়ার বালুখালি ক্যাম্পে ভয়াবহ যে আগুনের ঘটনা ঘটে তা ছিল আল-ইয়াকিনের নাম রয়েছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তারা আগুন দিয়ে রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। প্রতিনিয়ত তাদের হাতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন অসংখ্য রোহিঙ্গা নারী। আল-ইয়াকিন সদস্যদের ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়া বেশ কয়েকজন নারী গর্ভপাত করাতে ক্যাম্পের আশপাশের পল্লি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিপণ দিতে না পারলে নির্জন পাহাড়ে হত্যা করে লাশ মাটিচাপা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। মুফতি আবুজার আজ্জাম হরকাতুল ইয়াকিন আন্তর্জাতিক নেতা এবং সামরিক কমান্ডার হরকাতুল জিহাদ উজবেকিস্তান। মুফতি

আবুজার আল ইয়াকিনের সাথে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করেন। পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগান, কাশ্মীর ও সিরিয়াসহ আরব দেশের সাথে ইয়াকিনের সম্পর্ক তৈরিতে তিনি কাজ করেন।

মুফতি আবুজারের একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, প্রিয় বার্মাবাসী,আপনাদের আমি একটা কথা স্মরণ করে দিতে চাই, যতদিন বার্মায় সেনাশাসন ছিলো ততদিন আমরা জুলুম, অত্যাচারের মধ্যেই ছিলাম, যখন অং সান সূচি গণতন্ত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসলো, রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অত্যাচার কমে আসবে, এটা ছিলো আমাদের ভুল ধারণা। গণতন্ত্র মুসলমানদের শান্তি দিতে পারে না, এখন যে জুলুম চলছে এটা অং সান সূচির গণতন্ত্রের আমলেই চলছে। অতএব, আমার মুসলমান ভাই ও বোনেরা, প্রিয় বর্মী ওলামায়ে কেরাম, বর্মী মুজাহিদ নেতারা আপনারা জিহাদের জন্য বের হয়ে আসুন। যতদিন আমরা এই অস্ত্র হাতে না উঠাবো, কাফেরদের মাথায় এই অস্ত্র দিয়ে গুলি না করবো; ততদিন তারা আমাদের ভয় পাবে না। নবী (সঃ) বলেন, শক্তিশালী মুসলমান দুর্বল মুসলমানের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। যদি আপনারা বার্মার রোহিঙ্গা মুনলমানদের ভালোবাসেন; তাহলে হে যুবক ভাইয়েরা, বড় ভাইয়েরা, ওলামায়ে কেরামগণ আমার পক্ষ হতে আপনাদের কাছে আবেদন,আপনারা জিহাদের জন্য বের হয়ে আসুন। হে বার্মার মুসলমান আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা চেষ্টা করছি কাফেরদের বড় শক্তিকে ধ্বংস করতে, আমার ভাইয়েরা জিহাদের মাঠে আছি আপনারাও আসুন, অর্থ আর অস্ত্র কোনো কমতি হবে না।

২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবর মিয়ানমারের কিকানপিন বর্ডার গার্ড হেড কোয়ার্টার ও আশে পাশের দুটি পুলিশ চেকপোষ্টে এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে মিয়ানমার পুলিশের ৯ সদস্যসহ ১৪ জনকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন ধরনের ৪৮টি অস্ত্র ও ৬৬২৪ রাউন্ড গুলি লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে হামলাকারীদের দুই জনকে ধরে ফেলে। বাকী জঙ্গিরা মংডু শহরে অবস্থান নেয়। মিয়ানমার সরকারের তখনকার অফিসিয়াল বক্তব্য অনুযায়ী, হামলাকারীরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে এই হামলার জন্য অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিল। পুলিশের উপর এই হামলার দায় স্বীকার করে একটি জঙ্গি সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে। হামলাতে অংশ নেওয়া ১২ জন জঙ্গি বাংলাদেশের হ্নীলা রিফিউজি ক্যাম্পের। বিবিসির বিভিন্ন পাতা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, হরকাতুল ইয়াকিন নামের এই জঙ্গি সংগঠনটি সরাসরি পাকিস্তানের তালেবান ও আল কায়েদা থেকে সহযোগিতা পায় এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরাকান প্রদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরমপন্থী মতবাদ ছড়িয়ে মিয়ানমার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি ভিডিওতে রোহিঙ্গাদের আহবান জানিয়ে জিহাদের ডাক দিয়েছেন।

২০১৭ সালের ১৫ আগস্ট রাখাইন রাজ্যে হরকাতুল ইয়াকিন নামে রোহিঙ্গা সংগঠনটি মুসলিমদের ওপর বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের আহবান জানালেন। আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গারা দলে দলে সংগঠনটিতে যোগ দিয়েছিল।

২০১৭ সালে অক্টোবর থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫ হাজার রোহিঙ্গা যোগ দিয়েছিল বলে জানা গেছে। ৯ অক্টোবর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুতে পুলিশ বাহিনীর ৪টি ক্যাম্পে একসঙ্গে হামলা চালিয়ে হরকাতুল ইয়াকান তাদের শক্তির কথা জানান দেয়। ওই হামলায় পুলিশের ৯ সদস্যকে হত্যা করে ৬৩টি অস্ত্র লুট করে। ঘটনার পরই ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করে হামলার দায় স্বীকার করে সংগঠনটি।

৩০. আরাকান রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেসি এসোসিয়েশন

২০১৬ সালে আরাকান রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেসি এসোসিয়েশন নামে জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কক্সবাজার জেলার উখিয়ার কুতুপালং রেজিষ্ট্রাট ক্যাম্পের এফ ব্লকের বাসিন্দা মোঃ ইউনুছ এ দেশীয় জঙ্গিদের সহযোগিতায় রোহিঙ্গাদের উৎসাহিত করতে একটি নতুন জঙ্গি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ওই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে রয়েছেন। তার সাথে রয়েছে ইউমং এলাইচ মোঃ জাবের। ওই কমিটির সেক্রেটারী মোঃ নাজিম উদ্দিন হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা মোঃ ফারুক, আইনি পরামর্শক এম এ রহিম, অর্থ সংগ্রহকারী সদস্য ডাঃ নুরুল হক সহ ২০ জন সদস্য নিয়ে এ আরাকান রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেসি এসোসিয়েশন (এ আর এস ডি এ) গঠন করা হয়েছে। এই সংগঠন আটকা পড়া রোহিঙ্গাদের এবং বহিরাগত রোহিঙ্গা শিবিরের পাশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। গঠন করা হয় এই রোহিঙ্গা সংগঠনের ক্যাম্প ম্যানেজম্যন্ট কমিটিও। এ সব রোহিঙ্গারা জঙ্গি মনোভাব নিয়ে আচরন করলেও ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না।

ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশে বিদেশে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি কার্যক্রমের চিত্র পাচার করে আসলেও দেখার কেউ নেই। যার ফলে উগ্রপন্থী এ সব রোহিঙ্গারা দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গাদের শাসন করছে ওই রোহিঙ্গা জঙ্গিরা। ক্যাম্পের চার পাশে ঘেরা ভেড়া না থাকায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রতিদিন অচেনা মানুষের আনা গোনা বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনের নজর নেই। আরাকান রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেসি এসোসিয়েশন নামের জঙ্গি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মোঃ ইউনুছ কুতুপালং ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এ জঙ্গি তৎপরতা চালালেও ক্যাম্প পুলিশের টনক নড়ছে না। যার ফলে সাধারন রোহিঙ্গাদের হুমকি দিয়ে জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়ে পুরো রোহিঙ্গা শিবির শাসন করছে। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ অনুদান এনে ক্যাম্পে অবস্থানকারী শাহ আলম, শুক্কর, বশির আহম্মদ, কালাম, সেলিম, লালু চেয়ারম্যান, আবদুল আব্বাস, জুবায়ের, মৌলানা জলিল, রহিম মৌলা, জিয়াউল, মোঃ ইলিয়াছ, মোঃ দেলোয়ার ও মোঃ ইউছুপ ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের প্রত্যবাসন বিরোধী কার্যকালাপ চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা ছাত্র যুবকদের কাছে এই জঙ্গি সংগঠনের জনপ্রিয়তা রয়েছে। রোহিঙ্গা ছাত্র যুবকরা এই সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩১. রোহিঙ্গা সাহাবা

২০২১ সালের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা নাগরিক আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে উখিয়া বালুখালী শরণার্থী ক্যাম্পে আত্মপ্রকাশ করে রোহিঙ্গা সাহাবা নামের একটি সংগঠন। ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালংয়ের লম্বাশিয়ায় ক্যাম্পের ভেতরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ। তিনি আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান ছিলেন।

২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে সোচ্চার থাকা রোহিঙ্গাদের শীর্ষনেতা মাস্টার মুহিবুল্লাহ'র হত্যাকাণ্ডের পর দেশে-বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কারা কী কারণে তাকে হত্যা করেছে তা নিয়ে চলে নানা রকম যুক্তি উপস্থাপন। সেই সঙ্গে সন্দেহ করা হয় আরসা ও আল ইয়াকিন নামের সংগঠনকে। এরপর আলোচনায় এসেছে 'রোহিঙ্গা সাহাবা' নামে একটি নতুন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন।

'রিয়েল ভয়েজ অব রোহিঙ্গা' নামের ওয়েবপেজের একটি অডিও বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, দলে ভেড়াতে না পেরে মুহিবুল্লাহকে হত্যা করে সংগঠনটির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এই সংগঠন থেকেই মুহিবুল্লাহকে হত্যার ১৫-২০ দিন আগে থেকে হুমকি দেয়া হচ্ছিল। রিয়েল ভয়েজ অব রোহিঙ্গা নামের ওয়েবসাইটের ওই অডিওতে শোনা যায়, রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন সাহাবার এক নেতা বলছেন, রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহকে ডেকে জানতে চেয়েছি, কেন সে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ ছাড়া করতে চায়। কেন রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে পাঠাতে চায়। অডিওর শেষের দিকে বলা হয়, দলে ভেড়াতে না পেরে মুহিবুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ ১৯৯২ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠার পর মুহিবুল্লাহ মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আসেন। এরপর থেকেই তিনি কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। তবে মাঝেমধ্যেই তিনি মিয়ানমারে গিয়েও অবস্থান করতেন। সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনাদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে মংডু টাউনশিপের সিকদারপাড়া গ্রাম থেকে তিনি দ্বিতীয় বার বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। ২০০০ সালের শুরুতে ১৫ জন সদস্য নিয়ে মুহিবুল্লাহ গড়ে তোলেন 'আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' (এআরএসপিএইচ) নামের একটি রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়ের সংগঠন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বেশ কিছু সংগঠন কাজ করলেও মুহিবুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এআরএসপিএইচ সংগঠনটি বেশ শক্তিশালী। রাখাইন রাজ্যে থাকতে মুহিবুল্লাহ স্কুলে রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। এজন্য তিনি মাস্টার মুহিবুল্লাহ নামেও পরিচিত। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের পক্ষে বেশ সক্রিয় ছিলেন রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ। মাস্টার মুহিবুল্লাহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে

রোহিঙ্গাদের অধিকার ও স্বার্থ নিয়ে কথা বলতেন। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা হলেও মুহিবুল্লাহ বিচরণ করেছেন অনেক দেশে। সাক্ষাৎ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে। জাতিসংঘ মহাসচিবসহ যত বিদেশি প্রতিনিধি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গেছেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই রোহিঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে মুহিবুল্লাহ'র সাক্ষাৎ হয়েছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে একাধিকবার সফর করেছেন তিনি।

২০১৯ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ১৭ দেশের যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৭ প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন সেখানেও যোগ দেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের এ সফর দেশজুড়ে আলোচনায় আসলে মুহিবুল্লাহ বেশ পরিচিতি লাভ করেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত হন। তবে তার মূল উত্থান হয় ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা ঢলের ২য় বর্ষপূর্তিতে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে সমাবেশের আয়োজনের মাধ্যমে। ওই দিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রস্তুতিতে তিনি কয়েক লাখ রোহিঙ্গার সমাবেশ ঘটিয়ে আলোচনার তুঙ্গে চলে আসেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সরকারসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে আসছিলেন মাস্টার মুহিবুল্লাহ। আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে রোহিঙ্গা গণহত্যার তথ্য সরবরাহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধানে জাতিসংঘ গঠিত স্বাধীন সত্যানুসন্ধানী মিশনের তদন্তেও নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন মুহিবুল্লাহ। তার প্রচেষ্টায় মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্বকে জবাবদিহির আওতায় আনার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সমর্থন মিলেছিল। এইসব কারণেই রোহিঙ্গাদের কাছে তার তুমুল জনপ্রিয়তা ছিল। ২০২১ সালের শুরু থেকে মুহিবুল্লাহ প্রচার করছিলেন যে, মিয়ানমারে জাতীয় ঐক্যমতের সরকার (ইউএনজি) ক্ষমতাসীন হলে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। রোহিঙ্গারা নিজ ভূমে মিয়ানমারে ফিরে যেতে চান জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছিলো মুহিবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন রোহিঙ্গাদের সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'।

২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হত্যাকাণ্ডের সময় মুহিবুল্লাহর সঙ্গে এআরএসপিএইচ এর অফিসে অবস্থানকারী প্রত্যক্ষদর্শী মুহিবুল্লাহর ভাই হাবিবুল্লাহর দাবি, 'তার ভাই মুহিবুল্লাহকে হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নেতা নামে পরিচিত মাস্টার আব্দুর রহিম, মুর্শিদ, লালুসহ ২০ থেকে ২৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ।' (প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১)

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে এনজিওগুলোর কার্যক্রম

এনজিও ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে বৈদেশিক অনুদান নিয়ে কাজ করে এমন দেশি-বিদেশি ২ হাজার ৬২৫টি এনজিও রয়েছে। এর মধ্যে বিদেশি এনজিও ২৫৯ এবং দেশি ২ হাজার ৩৬৬। এনজিও ব্যুরোর কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নয়টি খাতে কাজ করছে দেশি-বিদেশী শতাধিক এনজিও। খাতগুলো হলো খাদ্য, স্যানিটেশন, বাথরুম, নলকূপ স্থাপন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, কম্বল বা কাপড় বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদি বিতরণ।

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশনের তথ্যমতে, কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৩৪টি আশ্রয়শিবিরে অবস্থান করছে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা। এসব রোহিঙ্গা শিবিরে ১৫৬টি এনজিও কাজ করছে। এর মধ্যে ৮০টি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং বাকিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও। তারা রোহিঙ্গাদের আবাসন, খাদ্য, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ৪৭৩টি স্থানীয় ও ২৫টি বিদেশি এনজিওকে এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তখনকার জোট সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল যুদ্ধাপরাধী আলী আহসান মুজাহিদ।

২০২১ সালের ২০ জুন দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ইউএন, আন্তর্জাতিক, জাতীয়, স্থানীয়সহ মোট ১৫৬টি বেসরকারি সংস্থা কাজ করে। এর মধ্যে ৯টি ইউএন, ৫৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার এনজিও। বাকিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, টেকনাফ ও উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ মোট ১৪৬টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করেছিল টেকনাফে।'

বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে ৪১টি বেসরকারি সংস্থাকে (এনজিও) প্রত্যাহার করা হয়েছে। মিয়ানমার থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া থেকে সর্বমোট ১৫৬টি এনজিও ক্যাম্পগুলোতে কার্যক্রম চালিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের ১৭ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো তালিকা ধরে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪১টি এনজিওর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নিষিদ্ধ ঘোষিত এনজিও: ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা সঙ্কট শুরুর পর নানা অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইসলামিক এইড, মুসলিম এইড ইউকে, অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার, মেদসা সঁ ফ্রতিয়ে (এমএসএফ), স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ও নমিজান আফতাবি, ফ্রেন্ডশিপ, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, আল মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গ্রামীণ

কল্যাণ, অগ্রযাত্রা, নেটওয়ার্ক ফর ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস অ্যান্ড রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট, আল্লামা আবুল খায়ের ফাউন্ডেশন, ঘরনী, ইউনাইটেড সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, পালস, মুক্তি, ব্যুরো-বাংলাদেশ, এসএআর, আসিয়াব, এসিএলএবি, এসডব্লিউএবি, ন্যাকম, এফডিএসআর, জমজম বাংলাদেশ, আমান, ওব্যাট হেলপার্স, হেল্প কক্সবাজার, শাহবাগ জামেয়া মাদানিয়া কাসিমুল উলুম অরফানেজ, ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাফেয়ার্স, লিডার্স, লোকাল এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, অ্যাসোসিয়েশন অব জোনাল অ্যাপ্রোচ ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান এইড অ্যান্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিশ, হোপ ফাউন্ডেশন, ক্যাপ আনামুর, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ইনকরপোরেশন, গরীব, এতিম ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনসহ ৪১টি এনজিও।

বিদেশি অর্থায়নে বেশ কয়েকটি ইসলামিক এনজিও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে অর্থ এসেছে মূলতঃ জাকাত, ফেতরা, ধর্মীয় শিক্ষা ও এতিমখানা পরিচালনার নামে। অনাধুনিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির আদলে গড়ে ওঠা কওমি মাদ্রাসার নামে টাকা এনে কোমলমতি কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদেরকে জিহাদির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৯৯১ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর দুর্গতদের জন্য অন্যান্য সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু ইসলামিক এনজিও সাহায্য দেয়ার নামে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এরপরে আন্তর্জাতিক ইসলামিক এনজিওগুলো শক্তিশালীভাবে কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল– বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, বসত-বাড়ি নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, সেনিটেশন মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এরপরেই ইসলামিক এনজিওগুলো শুরু করে তাদের মূল কার্যক্রম, অর্থাৎ সন্ত্রাসী জঙ্গি তৈরির মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়েম। এজন্য তারা প্রথমেই বেছে নেয় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো। তারা জঙ্গি তৈরির জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের গোপন আস্তানা গড়ে তোলে। এজন্য ব্যবহার করে মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো। এসময় রাজশাহীতে আত্মপ্রকাশ করে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ– সংক্ষেপে জেএমবি। জানা যায়, সৌদি আরব-ভিত্তিক ইসলামিক এনজিও আল হারমাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন সে সময় রাজশাহী অঞ্চলে বিশ কিছু মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সাহায্য প্রদান করেছিল। এছাড়াও রমজান মাসে মসজিদে ইফতার পার্টির নামেও অর্থ এনেছে। এর নেতৃত্ব দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক আসাদুল্লাহ গালিব। তিনি প্রতি রমজান মাসে ইফতারের জন্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করেন রাজশাহীর বিভিন্ন মসজিদে। পরবর্তী সময় খুলনা-সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলে ইসলামিক এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। পাশাপাশি আল মারকাজুল ইসলামী, রাবেতা আল ইসলামীসহ কয়েকটি এনজিও বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন খাতে।

বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে অর্থ প্রদানকারী এনজিওসমূহ ঃ

১. রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী, ২. সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্মস, ৩. কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, ৪. আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, ৫. ইসলামী রিলিফ এজেন্সি, ৬. আল ফোরকান ফাউন্ডেশন, ৭. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, ৮. কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, ৯. মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ১০. রিভাইভেল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, ১১. ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম, ১২. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৩. সেন্টার ফর ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড কালচার, ১৪. আল্লামা মওদুদী ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৫. ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামি), ১৫. নওমুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৬. বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ১৭. আল হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৮. কুয়েত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ১৯. অ্যাসোসিয়েট অব মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

কক্সবাজার জেলার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওদের তালিকাঃ

১. পালস (PHALS), ২. বাংলা জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস), ৩. বাস্তব, ৪. প্রশিকা, ৫. আশা, ৬. সার্ভ, ৭. মুক্তি কক্সবাজার, ৮. জেলা উপকূলীয় পল্লী উন্নয়ন পরিষদ (ডিসিআর ডিসি), ৯. ব্র্যাক, ১০. আরডিএফ, ১১. ওয়ার্ল্ড ভিশন, ১২. কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ১৩. বায়তুশ শরফ, ১৪. কেয়ার বাংলাদেশ, ১৫. আই ডি এফ, ১৬. উদ্দীপন, ১৭. বিসিভিডি, ১৮. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স ষ্টাডিজ (সিএনআরএস), ১৯. ইসলামিক রিলিফ -ওর্য়াল্ড ওয়াইড, ২০. এফডি এস আর এসপিও, ২১. সিডিএস, ২২. প্রত্যয়, ২৩. কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোসাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট), ২৪. হেলপ কক্সবাজার, ২৫. মেরি স্টোপস, ২৬. গণস্বাস্থ্য, ২৭. এফ.পি.এ.বি., ২৮. একলাব, ২৯. সেইভ দ্য চিলড্রেন, ৩০. ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), ৩১. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), ৩২. স্কটিশ কেয়ার ফর বাংলাদেশ, ৩৩. রিক, ৩৪. প্রত্যাশী, ৩৫. মেঘনা সোস্যাল হেলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৩৬. সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই), ৩৭. সিসিডিবি, ৩৮. শেড, ৩৯. আনন্দ, ৪০. ইসডো (ISDO), ৪১. আজাদ, ৪২. কারিতাস বাংলাদেশ, ৪৩. হীড বাংলাদেশ, ৪৪. ঘরণী, ৪৫. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সিডিএস), ৪৬. ব্যুরো-বাংলাদেশ, ৪৭. নোঙর, ৪৮. গ্রীন-কক্সবাজার, ৪৯. এসিস্ট্যান্স ফর সেইফ কমিউনিটি (এএসসি), ৫০. উবিনীগ (UBINIG), ৫১. ওসেড (OSED), ৫২. ওয়েস্কা ম্যানগ্রোভ, ৫৩. TIB, ৫৪. জনতা, ৫৫. এক্সপেউরুল, ৫৬. ডাকভাঙ্গা, ৫৭. সিলেট যুব একাডেমি, ৫৮. চট্টগ্রাম তৃণমূল ফাউন্ডেশন, ৫৯. শহীদুল আলম ফাউন্ডেশন, ৬০. শক্তি ফাউন্ডেশন, ৬১. ওয়েট এন সি, ৬২. হোপ ফাউন্ডেশন, ৬৩. বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা), ৬৪. গ্রীন-বাংলাদেশ, ৬৫. নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (নেকম), ৬৬. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) (VERC), ৬৭. প্রয়াস, ৬৮. মুসলিম এইড, ৬৯.

কান্ট্রি ভিশন, ৭০. উন্নত বাংলাদেশ, ৭১. হিউম্যান অ্যাপিল, ৭২. PHREB, ৭৩. ACF International, ৭৪. দুর্জয় নারী সংঘ, ৭৫. পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ৭৬. সিসিডিআর, ৭৭. প্রকাশ গণকেন্দ্র, ৭৮. বিয়ান মনি সোসাইটি, ৭৯. সচেতন বাংলাদেশ, ৮০. রিসো কোসেই কাই বাংলাদেশ, ৮১. PULSE (Peoples Uplifment in livelyhood and Social Empowerment), ৮২. সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল, ৮৩. বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ৮৪. অগ্রযাত্রা, ৮৫. খান ফাউন্ডেশন, ৮৬. দি লেপ্রসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল, ৮৭. এসডিআই, ৮৮. সোশ্যাল ভিলেজ ডক্টরস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এসভিডিডিও, ৮৯. ক্যাপ এনামুর, ৯০. অধিকার কক্সবাজার, ৯১. পপি, ৯২. স্টেপ ফর হিউম্যানিটি, ৯৩. রোকেয়া ফাউন্ডেশন, ৯৪. রুপুপ, ৯৫. এইড কুমিল্লা, ৯৬. রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী, ৯৭. মুসলিম এইড (ইউকে), ৯৮. ইসলামিক রিলিফ সংস্থা, ৯৯.ইমাম মুসলিম সেন্টার, ১০০. দারুল আনসার, ১০১. আল হারামাইন বাংলাাদেশ, (বর্তমান নাম, সমন্বিত মানবিক উদ্যোগ) ১০২. ইনসান হকভি হুরিয়েত লারি ইনসানি ইয়ারদিম ভাকভি (আইএইচএইচ, তুর্কীস্তান), ১০৩. বায়তুল মাল (ভারত), ১০৪. রোহিঙ্গা ভয়েস হুমেরে, ১০৫. শরিকা আল হওয়াদী, ১০৬. গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টার (জিআরসি) নেদারল্যান্ড, ১০৭. করুনা, ১০৮. মেফসা সঁ ফ্রতিয়ে (এমএসএফ) হল্যান্ড, ১০৯. ন্যাশনাল খ্রিষ্টান কাউন্সিল অব বাংলাদেশ, ১১০. এ সি এফ, ১১১. ভার্ক, ১১২. আর টি আই, ১১৩. রিভ, ১১৪. সেভ দ্যা চিল্ড্রেন, ২০. অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার, ১১৫. ইসলামী আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা (আইআইআরও), ১১৬. ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড (আই আর ডাব্লিউ), ১১৭. ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ূথ (ওয়ামি), ১১৮. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ফাইন্যান্স এন্ড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, ১১৯. ইসলামিক ডিফেন্ডার ফ্রন্ট, ১২০. আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), ১২১. মসজিদুল আনসার, ১২২. ইন্টিগ্রেটেড হিউম্যান এ্যপ্রোচ, ১২৩. রোহিঙ্গা আওয়াজ, ১২৪. সোর্স অব বাংলাদেশ, ১২৫. কেয়ার অব বাংলাদেশ, ১২৬. সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল।

এনজিও সংস্থার আড়ালে জঙ্গি তৎপরতা: বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী (এনজিও) সংস্থার আড়ালে কক্সবাজার ও (টেকনাফ, উখিয়াসহ) বান্দরবান জেলার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সংগঠন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার নামে সরব এসব সংগঠন।

২০১৫ সালের ২৩ নবেম্বর চট্টগ্রামে আটক হয় পাকিস্তানি নাগরিক ও গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টারের পরিচালক মো. আলম, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সৌদি নাগরিক আব্দুল মজিদ, সালামত উল্লাহ, নাইক্ষংছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও রোহিঙ্গাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা মো. শফি উল্লাহসহ পাঁচজন। তারা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার নামে ৫০ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহে মাঠে নেমেছিল। তারা ২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। সে টাকায় মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা বলে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে তারা সংগ্রহ করেন।

সশস্ত্র জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাধীন আরাকান রাষ্ট্র গঠন করতে দীর্ঘদিন নিজেদের মিশন বাস্তবায়নে আরএসওসহ তৎপর রয়েছে রোহিঙ্গাদের আরও বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। তারা মিয়ানমারসহ কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার কিছু অংশ নিয়ে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সশস্ত্র মিশন বাস্তবায়নে কাজ করছে আশির দশক থেকে।

বাংলাদেশ সরকার জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে ফ্রান্সের ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স, অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার ও যুক্তরাজ্যের মুসলিম এইড সহ কয়েকটি এনজিওর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টার তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছে। ২০১৪ সালে গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টারের যাত্রা শুরু হয়। ভারতের দিল্লিতে এই প্রতিষ্ঠানের ভারত শাখা খোলা হয় ২০১৪ সালে। গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টারের পেছনে কুশীলব হিসেবে কাজ করছে কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) সঙ্গে রয়েছে এই এনজিওর গভীর সখ্য।

২০১৫ সালের ২৩ নভেম্বর আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং জঙ্গি সংগঠন জেএমবি, জেএমজেবি, হুজি এবং পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশে মুহাম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলো এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) সহ বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দেয়। আর এদের অর্থ সহায়তা প্রদান করে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও তুরস্ক। ফলে এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো সক্রিয়ভাবে মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে নানা রকমের জঙ্গি অপারেশন পরিচালনা করে। 'রাবেতা আল ইসলামী' নামে একটি এনজিও মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় নানা ছদ্মবেশে রোহিঙ্গাদের মধ্যে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্র তৎপরতায় জড়িত।'

উখিয়া পালংখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা সোহেল জানান, কিছু এনজিও রোহিঙ্গাদের প্রকৃত সেবায় এগিয়ে এলেও অধিকাংশ এনজিও সেবার নামে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য যেসব বরাদ্দ নিয়ে আসে তার চার ভাগের এক ভাগও তারা পায় না। আবার রোহিঙ্গাদের অসহায় দেখিয়ে সাহায্যের নামে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন কিংবা সংস্থা গড়ে তুলে মধ্যপ্রাচ্যে বেপরোয়া চাঁদাবাজি করছে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী। অসহায় ও দুস্থ লোকদের জীবনচিত্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি ও স্থানীয় ধনকুবের কাছে তুলে ধরে তাদের মাঝে সহানুভূতি সৃষ্টি করে এসব ব্যক্তিরা কোটি কোটি টাকার সাহায্য হাতিয়ে নিচ্ছে। কক্সবাজার জেলার প্রায় প্রতিটি এলাকায় এই ধরনের অসংখ্য সাহায্যকারী সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

কক্সবাজার ও বান্দরবানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সহায়তার নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে আত্মসাৎ করছে সংঘবদ্ধ এই গ্রুপ। বিতর্কিত এই এনজিও কর্মকান্ডের কারণে রোহিঙ্গারা বেপরোয়া শরণার্থী ক্যাম্পে। এরা ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি ফর মুসলিম ইয়ুথের (ওয়ামি) নামে কক্সবাজারে সক্রিয়।

রোহিঙ্গাদের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয় সৌদি আরবভিত্তিক এনজিও রাবেতা আল আলম ইসলামীর মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার থেকে আসা তিন লক্ষাধিক রোহিঙ্গার জন্য এই সৌদি এনজিও সেবার আড়ালে জামায়াত শিবিরের আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। সেই সময়ই কক্সবাজারের রামু উপজেলার ধোয়া পালং এলাকায় সরকারি ১০ একর জমি নিয়ে এনজিওটি স্থাপন করে একটি হাসপাতাল। এই হাসপাতালে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি প্রশিক্ষণের অভিযোগ থাকায় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এনজিওটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

প্রতিবছর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সময় কক্সবাজার সীমান্তের রোহিঙ্গাদের জন্য কোটি কোটি টাকার তহবিল পাঠানো হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশের এনজিও ও ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো এসব তহবিল রোহিঙ্গাদের দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি অনুমোদন থাকে না। এ কারণেই সীমান্তের রোহিঙ্গা শিবির নিয়ন্ত্রক হিসেবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা কাজ করেন তারা এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) নেতারা এই তহবিলের টাকা পেয়ে থাকেন। সরকারের অনুমতি ছাড়া রোহিঙ্গা শিবিরে ব্যক্তিগতভাবে কোরবানির গরুর মাংস বিলি করতে গেলে ২০১২ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্কের একজন সাবেক পার্লামেন্ট সদস্যসহ ১৭ বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছিল।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৯ সালের পর থেকে এ দেশীয় মৌলবাদীগোষ্ঠী জামায়াত-হেফাজত বিএনপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোহিঙ্গারা। সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন এবং মিছিল মিটিংয়ে যোগ দেয় বেশিরভাগ সন্ত্রাসী রোহিঙ্গার দল। অনুসন্ধানে জানা যায়, কক্সবাজার জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ মসজিদের ইমাম রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত। বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিক্ষকতা করছে রোহিঙ্গা মৌলভীরা। ওই সব ইমাম কিংবা শিক্ষক বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্রদের ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদ সংশ্লিষ্ট উগ্রপন্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে। একই সঙ্গে তারা স্থানীয় মুসলমানদের ব্ল্যাকমেইল করে তাদের পক্ষে টানছে। ভুয়া ঠিকানা সংবলিত পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানো রোহিঙ্গাদের অপরাধের কারণে ইমেজ সঙ্কটে পড়ছে; বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাংলাদেশি শ্রমিকরা।

এছাড়াও রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসওর সংশ্লিষ্ট এনজিও ইন্টিগ্রেটেড হিউম্যান এপ্রোচ, মানবকল্যাণ, করুণা, সমন্বয়হীনতায় মানবিক উদ্যোগ, ওয়ামী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ, টিউবওয়েল স্থাপন করে ফটোসেশনের মাধ্যমে চিত্র সংগ্রহ করে বহির্বিশ্বে প্রেরণ করে থাকে। ওই সব এনজিও সংস্থার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নামে বিপুল অর্থ আনা হয় অবৈধ পথে। এ সব এনজিও কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলে পরিচালিত ওয়ামী একাডেমি, কক্সবাজারের কলাতলী ইসলামী সেন্টার ও বিসিক এলাকায় আদর্শ শিক্ষা নিকেতনসহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোহিঙ্গা শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাঠদান ও সহযোগিতার নাম দিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

আরএসও জঙ্গিদের এ তৎপরতার সাথে মুসলিম এইড, ইসলামী রিলিফ, করুণা, ইমাম মুসলিম, দারুল আনসার, সমন্বিত মানবিক উদ্যোগ নামের কয়েকটি এনজিও

সরাসরি সহায়তা রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং, টেকনাফের নয়াপাড়া ও লেদায় অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সেবায় ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে ফ্রান্স ভিত্তিক এসিএফ, হল্যান্ডভিত্তিক এমএসএফ, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক মুসলিম এইড সহ বেশ কিছু বিতর্কিত দেশী-বিদেশী এনজিও রোহিঙ্গাদের মাঝে কথিত সেবার নামে বিতর্কিত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত এসব এনজিও এখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নানা সুযোগ-সুবিধা ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি মানবাধিকারের ধুয়ো তুলে কক্সবাজারস্থ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের হাফেজ সালাহুল ইসলাম বাংলাদেশবিরোধী নানা অপপ্রচার চালিয়েছিল।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার জেলাসহ বিভিন্ন উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে জামায়াত শিবির সমর্থিত ও পরিচালিত দেশি বিদেশি কয়েকটি এনজিও। তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে রোহিঙ্গারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড, মানবপাচার, জলদস্যুতা, সড়ক ডাকাতি, মাদক ব্যবসা, দেশীয় তৈরী অস্ত্রের ব্যবসাসহ বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। এসব এনজিও সংস্থার দেশি-বিদেশি কর্মকর্তারা মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারী অবৈধ রোহিঙ্গাদের ধর্মান্তকরণ ও দেশে না ফিরতে উদ্বুদ্ধকরণ, নাশকতা ও সরকারবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের সাথে জামায়াত শিবির ও বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে ।

পরবর্তীকালে রোহিঙ্গাদের সেবার নামে সীমান্ত এলাকায় আসে নিষিদ্ধ ঘোষিত এনজিও ইসলামী আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা (আইআইআরও), ইসলামী রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (আইআরডাব্লিউ), আল হারামাইন, ইত্তেহাদুল মুসলেমিন, ওয়ামি, মুসলিম এইডসহ আরো অনেক এনজিও। এসব এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ থাকায় রোহিঙ্গা শিবিরে তাদের কার্যক্রম সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপরও 'রোহিঙ্গা সেবকদের' তৎপরতা থেমে নেই। পাকিস্তান, সুদান, সৌদি আরব, চীন, আফগানিস্তান, তুরস্ক ও মালয়েশিয়া থেকে নানা এনজিওর নামে প্রতিনিধিদল সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে আসে। বাস্তবে বিদেশি এনজিও রোহিঙ্গাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ালেও 'রোহিঙ্গা ব্যবসায়ী'রা সেই সাহায্য নানা কৌশলে হাতিয়ে নেয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তৎপর কিছু বিদেশি এনজিও: কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কিছু বিদেশি এনজিও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিদেশি কর্মকর্তারা রোহিঙ্গাদের নানাভাবে উস্কানি ও প্রত্যাবাসন বিরোধী কাজ করছে। তারা ভাসানচরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের অনশনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। নিরুৎসাহিত করছে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়ে। তাদের অনেকে নিজেদের অবস্থান গোপন রাখতে গোপনে বাড়ি ভাড়ার চেষ্টা করেন। অন অ্যারাইভাল ভিসায় তারা দেশে প্রবেশ করছেন। কর্মকর্তাদের অধিকাংশই এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন ছাড়াই কাজ করছেন।

এ ধরনের কাজে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সহযোগিতা করছেন। জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় সাবেক এমপি প্রার্থী শাহজালাল চোধুরীসহ একাধিক জনপ্রতিনিধি রোহিঙ্গাদের নিয়ে ভোটব্যাংক গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জাতীয় নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শৃঙ্খলা এবং সরকারের ভাবমূর্তির জন্য হুমকি বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় লোকজন। তারা মনে করেন কক্সবাজারে অবস্থানরত বিদেশি এনজিও'র কর্মীদের বাংলাদেশে আগমন, প্রস্থান, পুনরায় আগমন ও গতিবিধির উপর ব্যাপক নজরদারি দরকার। একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ভোটব্যাংক বানানোর জন্য স্থানীয় এমপি প্রার্থীদের কর্মকাণ্ডের দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। কক্সবাজার জেলার বালুখালী, কুতুপালং, আঙ্গুমানপাড়া ও নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সন্দেহভাজন বিদেশি নাগরিক, এনজিও'র গোপন তৎপরতা চোখে পড়ে। ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবিক বিষয়কে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় যে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল বা মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, জঙ্গি গোষ্ঠী আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গাদের ব্যবহারের চেষ্টা চালাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্য দেয়ায় কাজে নিয়োজিত এনজিওগুলোয় স্থানীয়দের পরিবর্তে রোহিঙ্গাদের চাকরি দেয়া হচ্ছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরকারবিরোধী প্রচারণা এবং এনজিওগুলোর হালচাল: মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সেবায় কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৯২টি কর্মসূচিতে কাজ করছে এনজিওগুলো। রোহিঙ্গাদের ঠকিয়ে রমরমা বাণিজ্য করছে দেশি-বিদেশি এনজিওগুলো। পাশাপশি এনজিওগুলোর সরকারবিরোধী প্রচারণা, জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, রোহিঙ্গা শিশুদের বাংলা ভাষায় পাঠদানসহ নানা বির্তকিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া এবং ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করায় তাদের বিরুদ্ধে সুপারিশ গেছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে। প্রতিবেদনে ত্রাণ বিতরণে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, অগ্রযাত্রা বাংলাদেশ, কাতার চ্যারিটি, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল এজেন্সি ফর ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ছওয়াব), প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, নেটওয়ার্ক ফর ইউনিভার্সেল সার্ভিসেস অ্যান্ড রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট (নুসরা), দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ইউনাইটেড সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের (উষা) বিরুদ্ধে আর্থিক সহ অন্যান্য অনিয়ম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ত্রাণ বিতরণে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

রোহিঙ্গা কার্যক্রমে নিষিদ্ধ এনজিও ভিন্ন নামে সক্রিয় : সন্দেহজনক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে রোহিঙ্গা শিবিরে নিষিদ্ধ তিন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এখনও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইসলামিক রিলিফ, ইসলামিক এইড এবং মুসলিম এইড বাংলাদেশ গোপনে অন্য সংগঠনের ব্যানারে সেখানে সক্রিয় রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন অভিযোগে বিতর্কিত

'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন' নামে অন্য একটি এনজিও তাদের ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মুসলিম এইড এবং ইসলামিক রিলিফ আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা। এই দুই এনজিওর স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিদের প্রায় সবাই জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে জড়িত। দেশের ৬৪টি জেলাতেই তাদের কার্যক্রম রয়েছে। দেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের সন্দেহে সরকার ১১টি এনজিওর ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে। এই এনজিওগুলোর মধ্যে মুসলিম এইড বাংলাদেশ এবং ইসলামিক রিলিফ অন্যতম। এই এনজিওগুলোর মাধ্যমে অর্থ পাচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গি গ্রুপ। অন্যদিকে ইসলামিক রিলিফের সঙ্গে ইতিপূর্বে আর্থিক লেনদেন বন্ধ করেছে এইচএসবিসি ব্যাংক। সংস্থাটির কার্যক্রম 'আইনগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' উল্লেখ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইসলামিক রিলিফের সঙ্গে ব্যাংকিং বন্ধ করে।

'কক্সবাজার আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আয়াছুর রহমান জানান, ১৯৯১ সালে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনার পর মুসলিম এইড ইউকে কক্সবাজারে কার্যক্রম শুরু করেছিল। তখন তাদের কার্যক্রম ছিল সন্দেহজনক। তারা রোহিঙ্গা জঙ্গিদের অর্থ সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশে শরণার্থী সমস্যা দীর্ঘায়িত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় মুসলিম এইড ইউকের বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এই সংস্থাটিই পরে মুসলিম এইড বাংলাদেশ নামে আবারও কার্যক্রম শুরু করেছে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, উখিয়ার কুতুপালং, বালুখালীসহ বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে ইসলামিক এইড, মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিলিফ তাদের ব্যানার-সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলেছে। ক্যাম্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে জানিয়েছে, তিনটি সংস্থাই এখন গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একজন এনজিও কর্মী জানান, এতদিন এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তারাই ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার নামে কাজ করছে।

২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কুতুপালং ও বালুখালী ক্যাম্প ঘুরে জানা গেছে, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম-১১ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ড. আবু রেজা মুহম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এই এনজিওর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজের জন্য তারা অনুমতিপত্র পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও তাকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ত্রাণ তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। রোববার পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন তারা। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

'আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী বিশাল গাড়িবহর নিয়ে কুতুপালং ও বালুখালী ক্যাম্পে ২০১৭ সালের ১৬ অক্টোবর ত্রাণ বিতরণ করেছেন। এমপি নদভী এবং তার স্ত্রী এর আগেও কয়েক দিন ক্যাম্পে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন। নদভীর স্ত্রী রিজিয়া রেজা চৌধুরী মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মুমিনুল হক চৌধুরীর মেয়ে তিনি। নিজেও এক সময় ইসলামী

ছাত্রী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জামায়াত নেতার পিতৃপরিচয় ছাপিয়ে রিজিয়া এখন সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আসার পর এলাকায় বিতর্কিত। অবশ্য মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগে রিজিয়া রেজা চৌধুরী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে সমালোচনার মুখে তাকে বাদ দেওয়া হয়।'

দুর্যোগ-আক্রান্ত দেশ ও দরিদ্র মানুষের সেবার জন্য ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যে মুসলিম এইড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যাবৎ সংস্থাটি বিশ্বের ৭০টি দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। মুসলিম এইডের প্রধান নির্বাহী ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা হামিদ আজাদ। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হামিদ হোসাইন আজাদ যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা মুসলিম এইডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৪ সালের ১১ এপ্রিল জামায়াতের মুখপত্র সাপ্তাহিক সোনার বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৪ সালের ৫ এপ্রিল সংস্থার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'চার বছর তিনি মুসলিম এইডের সহকারী প্রধান নির্বাহী ছিলেন। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার বৈদেশিক কর্মসূচির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফেইথ রিজেনের কমিউনিটি ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির প্রধান হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন।

'সাহায্য সংস্থা ও কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচিতে তার ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুসলিম এইডের চেয়ারম্যান ড. মানাজির আহসান বলেন, 'মুসলিম এইডের প্রধান নির্বাহী হিসেবে হামিদ আজাদকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা নিপীড়ন নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণজনিত ঘটনার পর লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠার পাশাপাশি যেখানে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিয়ে প্রক্রিয়াগত আলোচনা শুরু হয়েছে সেখানে ইসলামী নামধারী কয়েকটি অনিবন্ধিত এনজিও সংস্থা ইস্যুটি জিইয়ে রাখার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপ ঘোষণার পরও এসব অনিবন্ধিত এনজিও রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধানের বিপরীতে নিজেদের অশুভ স্বার্থে জিইয়ে রাখতেই তৎপর বলে অভিযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশের পক্ষে এসব এনজিও সংস্থাকে অবৈধ পথে বিপুল অঙ্কের অর্থ যোগান দিচ্ছে।

২০১৮ সালের ১ জুলাই জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এনজিওগুলো যত না সহায়তাদানকারী, তার চেয়ে বেশি নিজেদের স্বার্থ হাসিলে তৎপর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ মিডিয়ায় রোহিঙ্গাদের ওপর চলা নির্যাতন ও বর্বরতার দৃশ্য দেখিয়ে এসব অনিবন্ধিত সংস্থাগুলো মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন ইসলামী দেশের সরকারী-বেসরকারী সাহায্য সহায়তার পণ্যের পাশপাশি মোটা অঙ্কের অর্থও গ্রহণ করেছে। এসব অর্থ ও সাহায্য সহযোগিতা সামান্য পরিমাণ লোক দেখানোর জন্য প্রদান করা হয়েছে।...

'উগ্র রোহিঙ্গাদের ধারণা, প্রত্যাবাসন যতই বিলম্ব হবে ততই তারা এদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিদেশ গমনেরও সুযোগ পাবে। যত বিলম্ব হবে ততই প্রত্যাবাসন বিষয়টি একপর্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে বলেও তারা মনে করে। মিয়ানমারের ওপর বর্তমানে সারাবিশ্বের যে চাপ এই ইস্যুতে অব্যাহত রয়েছে একপর্যায়ে তাতেও ভাটা পড়বে। অভিযোগ রয়েছে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সরকারী নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ট্যুরিস্ট ভিসায় আসা পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা নগদ অর্থ ও সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। এছাড়া তুরস্ক ভিত্তিক কয়েকটি এনজিও সংস্থা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন অপতৎপরতায় লিপ্ত থেকে তাদের ফিরে না যেতে উস্কানিও দিচ্ছে।'

কিছু এনজিও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তা নিয়েই তৎপর। কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত দুই শতাধিক এনজিও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে আরব দেশসমূহের ইসলামী ব্যানারের এনজিওর কার্যক্রম সাহায্য সহায়তাভিত্তিক হলেও প্রকারান্তরে প্রত্যাবাসন বিরোধী বলে নয় জানা গেছে।

২০১৮ সালের ২ জুলাই জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ২১ ঘাঁটিতে হামলার ঘটনাটির জন্য মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে দায়ী করে আসছে। এর মধ্যে আরসা অন্যতম। আরসা গ্রুপ প্রধান আতাউল্লাহ জুনুনীর নামটি রয়েছে সর্বাগ্রে। যিনি ইতোমধ্যে মিয়ানমার ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন বলে অসমর্থিত বিভিন্ন সূত্রে খবর মিলেছে। আরাকান বিদ্রোহী গ্রুপগুলো তাদের স্বার্থ হাসিলে ইসলামী ব্যানারের এনজিওগুলোর সহায়তা পাচ্ছে। এসব এনজিও সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রোহিঙ্গাদের নগদ টাকাসহ বিভিন্ন সহযোগিতা দিচ্ছে। এদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিদ্রোহী সংগঠন আরএসও, এআরইউ অন্যতম। ইউরোপ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মান, ফ্রান্স, তুরস্কসহ কয়েকটি দেশের এনজিও রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর নেতাদের মাধ্যমে যোগসাজশ রেখে কিছু অবৈধ কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের পুরনো নেতা আবু সিদ্দিক আরমান, সেলিম উল্লাহ, মৌলবি ওসমান, জোবায়ের, মৌলবি সফিক, আবদুল হামিদ, রুহুল আমিন, নুর হোসেন, মোঃ আয়াজ, আবদুর রহিম, হাফেজ মোঃ হাসিম বিদেশ থেকে নগদ অর্থ আনতে সক্ষম হয়েছেন, যার কিছু অংশ রোহিঙ্গাদের মাঝে ইতোমধ্যে বন্টন করা হয়েছে।'

২০১৯ সালের ৩১ মার্চ জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের দোহাই তুলে লাখ লাখ টাকা কামাই করছে পুরনো রোহিঙ্গা নেতারা (আরএসও)। তারা বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে রোহিঙ্গাদের সেবার নামে নিয়ে আসছে বিদেশী অর্থ। ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট প্রদর্শন করার সময় ওরা (রোহিঙ্গা জঙ্গি) বাংলাদেশী নাগরিক। আবার গন্তব্যস্থানে (বিদেশে) পৌঁছে তারা বনে যায় রোহিঙ্গা নেতা। রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের কথা বলে তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করা ধনাঢ্যশালী রোহিঙ্গাদের কাছ

থেকে বিপুল অর্থ আনছে ওই পুরনো রোহিঙ্গা জঙ্গিরা। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নতুবা ভাসানচরে স্থানান্তর করা হলে ওসব রোহিঙ্গা জঙ্গিদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যেসব এনজিও রোহিঙ্গাদের উস্কানি দিচ্ছে, তাদেরও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একই অবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তারা রোহিঙ্গাদের বিভিন্নভাবে উস্কানি দিচ্ছে।' (জনকণ্ঠ, ২ জুলাই, ২০১৮)

২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সংবাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়ার বিষয়টি শুরুতে স্বাভাবিক ছিল। আর তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার বিষয়টি সবার নজরে আসে ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা নির্যাতনের দুই বছর পূর্তিকালে। ২৬ আগস্ট উখিয়ার কোটবাজার ভালুকিয়া সড়কে কামারের দোকানে বানানোর সময় রোহিঙ্গাদের সরবরাহের জন্য তৈরি করা ছয় শতাধিক দেশীয় অস্ত্র (ধারালো নিড়ানি) উদ্ধার করে প্রশাসন। এনজিও ব্যুরোকে অবগত না করে 'মুক্তি কক্সবাজার' নামের এক এনজিও গোপনে ওইসব অস্ত্র তৈরি করে তা রোহিঙ্গাদের মধ্যে সরবরাহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই ২৯ আগস্ট 'মুক্তি কক্সবাজার'-এর ছয়টি প্রকল্পের সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে এনজিও ব্যুরো।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, উখিয়া-টেকনাফের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে এনজিওগুলোর ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বেশ কিছু এনজিও শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার নামে অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন ও ভাসানচরে স্থানান্তরে নিরুৎসাহিত করছে এসব এনজিও। কোনো কোনো এনজিও রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দিচ্ছে। সেইসঙ্গে স্থানীয়দের জমি দখলেও সহায়তা করছে। ফলে এনজিওগুলোর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে শরণার্থীরা। এদিকে রোহিঙ্গা সমাবেশে আর্থিক সহায়তা এবং প্রত্যাবাসনে বাধা দেয়ার অভিযোগে ২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক এনজিও আদ্রা এবং আল মারকাজুল ইসলামীর সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের ধারাল অস্ত্র সরবরাহ করার দায়ে ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট মুক্তি কক্সবাজার নামে একটি এনজিওর রোহিঙ্গা সংশ্লিষ্ট ছয়টি প্রকল্প বাতিল করে সরকার।

২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পূর্বপশ্চিমবিডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সকালে এনজিও ব্যুরো থেকে পাঠানো এ সংক্রান্ত একটি চিঠি কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. আশরাফুল আশরাফ। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক দু'টি সংস্থার কার্যক্রম বন্ধের জন্য এনজিও ব্যুরোর পাঠানো একটি চিঠি সকালে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে এসে পৌঁছেছে। এতে 'আল মারকাজুল ইসলামী' ও 'আদ্রা'র সব ধরণের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ব্যাংক লেনদেন বন্ধ রাখারও নির্দেশনা রয়েছে। চিঠির বরাত দিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক এ সংস্থা দু'টির বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রত্যাবাসনবিরোধী উস্কানি এবং গত ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সহিংস অভিযানের ২ বছর পূর্তিতে বিশাল সমাবেশ

আয়োজনে গোপন সহায়তার অভিযোগ রয়েছে। এনজিও ব্যুরোর নির্দেশনা মতে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও জানান এই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।'

২০১৯ সালের ২২ আগস্ট রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় দফা প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার জন্য প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহল থেকে কিছু এনজিও সংস্থার অপতৎপরতাকে দায়ী করা হয়। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে রোহিঙ্গারা। এই সমাবেশ আয়োজনে গোপন সহায়তার অভিযোগ উঠেছে কয়েকটি এনজিও'র বিরুদ্ধে। এরপর বিশাল সমাবেশ নিয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত চালানো হয়। এতে রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রত্যাবাসনবিরোধী উস্কানি ও সমাবেশ আয়োজনে গোপন সহায়তার জন্য কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই তদন্ত প্রতিবেদন এনজিও ব্যুরোর কাছে পাঠানো হয়।' (পূর্বপশ্চিমবিডি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রতিটি রোহিঙ্গা শিবিরেই রয়েছে কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রভাব। রোহিঙ্গা নেতাদের হাতে রেখে এবং রোহিঙ্গাদের অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তারা। গত দুই বছরে এসব এনজিও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে থেকে বিভিন্ন অসঙ্গতিমূলক দাবি তুলে ধরতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশেই আয়েশি জীবন উপহার দেয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তারা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, এনজিওরা যা বলে তাই করে রোহিঙ্গারা। এনজিওগুলো নিরুৎসাহিত করায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি হয়নি রোহিঙ্গারা। আপত্তি জানিয়েছিল ভাসানচরে স্থানান্তরেও।

২০১৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভোরের কাগজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টির পর ১৩৯টি বেসরকারি সংগঠন ওই এলাকায় তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। নাগরিকত্ব বা নিরাপত্তার প্রশ্নসহ দাবি-দফার মীমাংসা ছাড়া রোহিঙ্গারা যে মিয়ানমারে ফেরত যেতে রাজি নয়, এর পেছনে দেশি-বিদেশি কিছু এনজিওর হাত রয়েছে। এসব এনজিও সেখানে রাজনীতি করছে বলে মনে করছে সরকার। অপকর্মে লিপ্ত থাকায় ইতোমধ্যে মোট ৪৩টি এনজিওকে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে সব ধরনের কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট মুক্তি নামের একটি বেসরকারি সংগঠনের ছয়টি প্রকল্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ধারাল অস্ত্র তৈরি করে রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিতরণের অভিযোগ রয়েছে।'

২০১৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২৬ মে উখিয়া উপজেলার কোটবাজারের একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার নিড়ানি (ধারালো অস্ত্র) জব্দ করে প্রশাসন। অভিযোগ ওঠে, নিড়ানিগুলো রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য তৈরি করেছিল 'মুক্তি-কক্সবাজার' নামে বেসরকারি সংস্থা। এরপর ২৮ আগস্ট এনজিওটির ছয়টি প্রকল্প স্থগিত করা হয়।

'মুক্তি-কক্সবাজারের প্রধান নির্বাহী বিমল দে সরকার বলেন, নিড়ানিগুলো তৈরি হচ্ছিল সংস্থাটির উপকারভোগী স্থানীয় টেকনাফের কৃষক পরিবারের সবজি চাষের

জন্য। কিন্তু মহলবিশেষের অপপ্রচারে ৬টি প্রকল্প বন্ধ হলেও আরও ২৪টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। কিন্তু কাজ সামলাতে হচ্ছে মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে।

'সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (আরআরআরসি) সূত্র জানায়, ২০১৮ সালে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সরকার দেশি-বিদেশি ৪১টি এনজিও কার্যক্রম বন্ধ করেছিল। এর মধ্যে সাতটি ছাড়া অন্যগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

'রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ১২ ধরনের অপরাধে মামলায় আসামি হয়েছেন দুই হাজার জনেরও বেশি রোহিঙ্গা। ওই ১২ অপরাধের মধ্যে আছে– অস্ত্র, মাদক, ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, পুলিশ আক্রান্ত, ডাকাতি-ডাকাতির প্রস্তুতি, হত্যা, নারী নির্যাতন, মানব পাচার ও মারামারি ইত্যাদি। তবে এ পর্যন্ত নিজ দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুকদের বাধাদানকারী তথা প্রত্যাবাসনবিরোধী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কোনও থানায় একটি মামলাও রুজু হয়নি বলে জানা গেছে। উল্লেখিত ১২ অপরাধে যারা কারাগারে গেছে, তাদেরও ক্ষেত্র বিশেষে বেশি দিন জেলের ঘানি টানতে হয়না।'

জানা যায়, ক্যাম্পগুলোতে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিওতে নানা পদে মাসিক বেতনে চাকরি করছেন। নাইট গার্ড, ভলান্টিয়ার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার কল্যাণ কর্মী, নির্মাণ কর্মী, বাসার বুয়া, শিক্ষক, সুপারভাইজারসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল, নন টেকনিক্যাল পদে মাসিক ১০ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে যাচ্ছে রোহিঙ্গারা। এছাড়াও ক্যাম্প সংলগ্নবাজারসহ ক্যাম্পের অলি গলিতে ছোট, মাঝারি ও বড় অন্তত ২০ হাজার দোকানে চাকরি করছে ১৫ হাজার রোহিঙ্গা কিশোর। ওইসব রোহিঙ্গারা শরণার্থী আইন মানছেনা মোটেও।

কয়েকটি এনজিওর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি–

১. বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০১৪ সালে যুদ্ধাপরাধ মামলার বিচার চলাকালে যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামি হিসেবে মৃত্যুবরণ করা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নায়েবে আমির মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি নামের এনজিওটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে এনজিওটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমির প্রয়াত মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল, তাকে ১৩টি অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। ২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। দীর্ঘ ১৫ বছর চেষ্টা করার পরেও এনজিওটি নিবন্ধিত হতে পারেনি। এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমানের আমলেও এনজিওটিকে নিবন্ধন দেয়া হয়নি। সর্বশেষ বিএনপি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে এনজিওটি সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। এরপর ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় থাকাকালে এনজিও ব্যুরো এ্যাফেয়ার্স থেকে এনজিও হিসেবে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়।

এই এনজিওর মাধ্যমে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করত জামায়াত। সেই অর্থ নিজেদের রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দেয়ার পাশাপাশি, জঙ্গী ও সন্ত্রাসের কাজে অর্থায়ন করা হতো। ২০১২-১৬ সালে মোস্তাক আহমেদ খাঁ তুরস্কের ধর্মীয় উগ্রগোষ্ঠী থেকে অর্থ এনে হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় জঙ্গীবাদ বিস্তার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন করে। পরবর্তীতে মোস্তাক আহমেদ খাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়।

২০২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণের নামে তারা অধিকাংশ বিদেশী অনুদান সংগ্রহ করলেও তা চাষীদের কল্যাণে ব্যয় করা হতো না। নিজেরাই ইচ্ছেমতো মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে কিছু অংশ ব্যয় করত। বাকি টাকা দেশে মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রচারে কাজে ব্যয় করত। এ সংক্রান্ত হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও সদর থানায় এবং ঢাকার রমনা মডেল থানায় ও কাফরুল থানায় একটি করে মোট তিনটি মামলা আছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ও নির্দেশনায় মামলাগুলোর তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের মানিলন্ডারিং ইউনিট। জামায়াত সমর্থিত কৃষিবিদ মোস্তাক আহমেদ খাঁ ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কের উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এ অর্থ তিনি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে জঙ্গিবাদ বিস্তারে ব্যয় করেন।

'এনজিওর আড়ালে জঙ্গি কার্যক্রম চালাতে বিদেশি উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে সহজে অর্থ সংগ্রহ এবং জঙ্গি বিস্তারে আরও এনজিও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল জামায়াত সমর্থিত কৃষিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত 'কৃষিবিদ ব্লকের'। জামায়াতের এনজিও 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে তুরস্ক থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কৃষিবিদ মোস্তাক দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিবাদ বিস্তারে কাজ করে আসছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে তিনি সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তুরস্কে তার পরিচিত উগ্রপন্থী অনেক দাতা রয়েছেন। 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তিনি অর্থ সংগ্রহ করে আসছিলেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের নাম করে আরও এনজিও প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল জামায়াতে ইসলামীর। জঙ্গি কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত করতে তিনি নিজেও একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।'

২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারি যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'চাষী কল্যাণ সমিতি সব অর্থ জামায়াতে ইসলামীকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে ব্যয় হয়েছে। ১১ বছরে 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সাড়ে ৬২ কোটি টাকা বিদেশি অনুদান এসেছে। এসব টাকা নাশকতা ও জঙ্গিবাদের বিস্তারে ব্যয় করেছে জামায়াতে ইসলামী।'

২. রাবেতা আল আলম আল ইসলামী

'রাবেতা আল আলম আল ইসলামী'– বাংলা করলে দাঁড়ায় মুসলিম বিশ্ব-সংঘ। এই নামটি বিএনপি-জামায়াত ঘরানার বুদ্ধিজীবী এবং 'ইসলামী' এনজিও কর্মীদের ভাল পরিচয় আছে।

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, "নামের ভেতর 'রাবেতার' পরিচয়। 'রাবেতা' শব্দ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। শব্দটি এর মূল ধাতু রাবত্ থেকে নির্গত, যার অর্থ পারস্পরিক সংযোগ। কিন্তু উসমানী খেলাফতকালে রাবেতা শব্দটি রাজনৈতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আর পরবর্তীকালে একই অর্থে এই শব্দটি কয়েকটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের নাম ফলক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।"

উইকিপিডিয়াতেও বলা হয়েছে, 'রাবেতা আল আলম আল ইসলামী' একটি ওয়াহাবী সংগঠন যার পৃষ্ঠপোষকতা করে সৌদী সরকার। অতএব রাবেতা আল আলম আল ইসলামী ধর্মীয় কোন কর্তৃত্বের নাম নয় বরং এটি এক রাজার রাজনৈতিক সংগঠন যার সদস্যবর্গ প্রধানত 'সালাফী' তথা 'ওয়াহাবী', অন্তত ওয়াহাবী মতবাদের সমমনা এবং তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো সৌদি সরকার।

'রাবেতা আল আলম আল ইসলামী'-এর গোড়াপত্তন ১৯৬২ সালে ক্রাউন প্রিন্স ফয়সালের মাধ্যমে। কিন্তু এর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পরিচয় রয়েছে তা সব সময় গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয় সৌদি আরবভিত্তিক এনজিও রাবেতা আল আলম ইসলামীর মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার থেকে আসা তিন লক্ষাধিক রোহিঙ্গার জন্য এই সৌদি এনজিও সেবার আড়ালে জামায়াত শিবিরের আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। সেই সময়ই কক্সবাজারের রামু উপজেলার ধোয়া পালং এলাকায় সরকারি ১০ একর জমি নিয়ে এনজিওটি স্থাপন করে একটি হাসপাতাল। এই হাসপাতালে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি প্রশিক্ষণের অভিযোগ থাকায় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এনজিওটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

প্রতিবছর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সময় কক্সবাজার সীমান্তের রোহিঙ্গাদের জন্য কোটি কোটি টাকার তহবিল পাঠানো হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশের এনজিও এবং ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো এসব তহবিল রোহিঙ্গাদের দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি অনুমোদন থাকে না। এ কারণেই সীমান্তের রোহিঙ্গা শিবির নিয়ন্ত্রক হিসেবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি যাঁরা কাজ করেন তারা এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) নেতারা এই তহবিলের টাকা পেয়ে থাকেন। সরকারের অনুমতি ছাড়া রোহিঙ্গা শিবিরে ব্যক্তিগতভাবে কোরবানির গরুর মাংস বিলি করতে গেলে ২০১২ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্কের একজন সাবেক পার্লামেন্ট সদস্যসহ ১৭ বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছিল।

'রাবেতা আল আলম আল ইসলামী'র সাংগঠনিক অবকাঠামোকে একটু ভালোভাবে দেখলে ওয়াহাবী মতবাদের সমর্থক ও সমমনা অনেকেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। রাবেতা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-কমিটির নয়জন সদস্যের মাঝে তিনটি নাম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ ১। মিশরের 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন' তথা মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার জামাতা জনাব সাইদ রামাদান। ২। 'জামায়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আল মওদুদী ৩। মাওলানা আবুল হাসান নাদভী (নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত)।

২০১৪ সালের ২ নবেম্বর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর বিরুদ্ধে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশকে (জেএমবি) আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী বিশ্বব্যাপী মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ নামে পরিচিত। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের পাকিস্তান শাখার প্রধান ছিলেন আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের বোনজামাই মোহাম্মদ জামাল খলিফা। মাদাগাস্কারের সরকারি বাহিনীর অভিযানে ২০০৭ সালে তিনি নিহত হন।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনৈতিক সাহায্যপুষ্ট রাবেতা আলম আল-ইসলামীর এক সময়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর ছিলেন জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলী। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নামে সাহায্যের টাকা এনে জঙ্গি প্রশিক্ষণে অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে।

১৯৮০ সালে জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলী যখন ইসলামী ছাত্রশিবির হয়ে জামায়াতে যোগ দেন, তখন রাবেতা আলম আল-ইসলামীর সমন্বয়ক ছিলেন তিনি। তিন বছর পর ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া মীর কাশেম এরপরই বিভিন্ন খাতে ব্যবসা বাড়াতে থাকেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মীর কাশেম জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম মজলিসে শুরার সদস্য, যে দলটির অর্থ জোগানদাতা হিসেবেই তিনি পরিচিত।

১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের চালা গ্রামে জন্ম নেন মীর কাশেম আলী। তার পিতা তাইয়েব আলী ছিলেন টেলিগ্রাফ অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। পিতার চাকরির সুবাদে চট্টগ্রামে বেড়ে উঠা মীর কাশেম আলীর। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন মীর কাশেম। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম নগর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তান ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা হিসেবে চট্টগ্রামের কুখ্যাত আল বদর বাহিনীর নেতৃত্ব দেন মীর কাশেম। চট্টগ্রাম শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে গড়ে তোলেন টর্চার সেন্টার। এর মধ্যে অন্যতম ডালিম হোটেল বা মহামায়া ভবন। স্বাধীনতার পর দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের দায়ে জামায়াতে ইসলামী ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংঘকে

নিষিদ্ধ করা হয়। শাস্তির ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান মীর কাশেমও। এরপর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগে দেশে ফেরেন মীর কাশেম। ১৯৭৭ সালে ছাত্র সংঘের পুরনো দোসরদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী ছাত্রশিবির। নিজে হন সভাপতি। ছাত্র শিবির প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের বদৌলতে ফের দেশে রাজনীতি করার অনুমতি পায় জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন মীর কাশেম। একই সঙ্গে ওই সময় তিনি ছিলেন রাবেতা আল আলম আল ইসলামির এ দেশীয় কোঅর্ডিনেটর। এই এনজিওটির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে বিপুল পরিমাণ অর্থ। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের এই বিপুল অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজেদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে জামায়াতে ইসলামী ও মীর কাশেম আলী।

জামায়াতে ইসলামী দলের 'ফান্ড রেইজার' হিসেবে দলের শীর্ষ নীতি নির্ধারণী কমিটিতে উঠে আসেন মীর কাশেম আলী। বলা চলে জামায়াতের আর্থিক বিষয়গুলোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল মীর কাশেম আলীর হাতে। ধীরে ধীরে সারা দেশে তিনি নিজের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করে চলেন। জামায়াতের শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো ও মীর কাশেম আলীর বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দেন মীর কাশেম। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। ট্যুরিজম থেকে শুরু করে টেলিকম, এ রকম নানা বিষয়ে ছড়িয়ে ছিল তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নানা উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত ১৯৮০ সালে এনজিও রাবেতা আলম আল ইসলামীর হাত ধরেই মীর কাসেমের উত্থান। '৭১-এর গণহত্যা ছাড়াও রাবেতার মাধ্যমে জঙ্গিদের অর্থ সহায়তা এবং জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী মৌলবাদী দলগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর অভিযোগও ছিল জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর বিরুদ্ধে।

৩. ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত

উখিয়া-টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার তহবিল সংগ্রহকারী এনজিও ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশনের (এফআইএফ) নামে প্রকাশ্য কার্যক্রমেও অংশ নিয়েছিল ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, নামে-বেনামে দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার হয়ে এই এনজিও কাজ করছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। ২০১৭ সালের পর আসা শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্থানীয়ভাবে সংগঠনটির কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন স্থানীয় জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা। তারা দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত উখিয়া টেকনাফ এলাকায় মাদ্রাসাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন। এরপর দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিওর নামে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থা এফবিআই ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেজারির তথ্য অনুযায়ী, করাচিভিত্তিক ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশনের (এফআইএফ) নাম রয়েছে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেজারির কাউন্টার টেরোরিজমের তালিকায়। লস্কর-ই-তৈয়বা বাংলাদেশের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে। কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতা ও স্থানীয় জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের নেতার নাম উঠে আসে, যারা ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

২০১৮ সালের ১৯ জুলাই খোলা কাগজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের মধ্যে লস্কর-ই-তৈয়বার সরাসরি প্রতিনিধি ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করছেন, কুতুপালংয়ে অবস্থিত রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের বাসিন্দা মৌলভি শফি। তিনি ১৯৯২ সালে আগত শরণার্থী। ক্যাম্পের তালিকাভুক্ত শরণার্থী হলেও তিনি অবাধে দেশে ও দেশের বাইরে যাতায়াত করেন। স্থানীয় জামায়াত নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল প্রথম থেকেই। ক্যাম্পের বাইরে অবাধে যাতায়াতের সুবাদে তিনি দেশের অন্য সক্রিয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। লস্কর-ই-তৈয়বার নামে সরাসরি কোনো সংগঠন না থাকলেও লস্কর-ই-তৈয়বার ছাত্র সংগঠন আল মোহাম্মদী স্টুডেন্টসের কার্যক্রম রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরে।

'টেকনাফ উপজেলা জামায়াতের আমির, হোয়াইক্যং ইউপি চেয়ারম্যান নূর আহমদ আনোয়ারি, স্থানীয় বিতর্কিত আওয়ামী লীগ নেতা কুতুপালংয়ের ইউপি মেম্বার মৌলভি বখতিয়ার, টেকনাফ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও হেফাজত নেতা মৌলভী রফিক উদ্দিন, কক্সবাজার উপজেলা জামায়াতের নেতা শাহ আলম ওরফে সি লাইন শাহ আলম, কক্সবাজার শহর জামায়াতের নেতা ও পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি আইয়ুব মোল্লাসহ বেশকিছু নেতৃস্থানীয় জামায়াত ও হেফাজত নেতা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে লস্কর-ই-তৈয়বার ফালাহ-ই-ইনসানিয়াতের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এদের মধ্যে শাহ আলম রামু ও উখিয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন ও হামলা-মামলাসহ নানা সময়ে ৬টি নাশকতা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। বিতর্কিত আওয়ামী লীগ নেতা মৌলভি বখতিয়ার এক সময় জামায়াতের রোকন ছিলেন। ২০০৯ এ ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর রাতারাতি আওয়ামী লীগের লোক বনে যান। আর আইয়ুব মোল্লা যুদ্ধাপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ২০১৭ সালের আগস্টের পরপরই এফআইএফের হয়ে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পুত্র শামীম সাঈদীকে ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতেও দেখা গেছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মূলত উখিয়া ও টেকনাফের কয়েকজন জামায়াতপন্থী জনপ্রতিনিধি ও জামায়াত নেতাদের সাহায্যে উখিয়ার কুতুপালং, টেকনাফের হোয়্যাইক্ষং, হ্নীলা ও শামলাপুরে স্থাপিত অস্থায়ী রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি এনজিওর নামে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি কার্যক্রম সংগঠিত করছে। আর তাদের কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও মদদ দিচ্ছে লস্কর-ই-তৈয়বাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী। বিভিন্ন সময় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার নামে বাংলাদেশে এসেছেন বেশ কয়েকজন পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সৌদি নাগরিক। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সাংগঠনিক কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা দেয়।

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংগ্রাম কমিটির সমন্বয়ক ও উখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, জামায়াত-হেফাজতসহ বিভিন্ন ইসলামী দল এখানে নানাভাবে স্বার্থ হাসিল করছে। ত্রাণ ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মসজিদ বানানোর কথা বলে কোটি কোটি টাকা তারা বিভিন্ন ইসলামি দেশগুলো থেকে সংগ্রহ করে। আশঙ্কা থেকে যায়, সেসব অর্থ দিয়ে তারা দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করবে আর রোহিঙ্গাদের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবে। এর মধ্য দিয়ে সরকার মিয়ানমারের সঙ্গে যে শরণার্থী প্রত্যাবাসন চুক্তি করেছে সেটিকে নানা কায়দায় ব্যর্থ ও প্রলম্বিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে একটি গোষ্ঠী।

৪. মুসলিম এইড বাংলাদেশ

মুসলিম এইড ইউকে একটি আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা। দুর্যোগ-আক্রান্ত দেশ ও দরিদ্র মানুষের সেবার জন্য ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যে মুসলিম এইড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যাবৎ সংস্থাটি বিশ্বের ৭০টি দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। মুসলিম এইডের প্রধান নির্বাহী ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা হামিদ আজাদ। এটার বাংলাদেশ শাখার নাম মুসলিম এইড বাংলাদেশ। এই এনজিওর স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের প্রায় সবাই জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে জড়িত। দেশের ৬৪টি জেলাতেই তাদের কার্যক্রম রয়েছে। ২০১৭ সালের ২১ জুন বাংলাদেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের সন্দেহে বাংলাদেশ সরকার ১১টি এনজিওর ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করে। এই এনজিওগুলোর মধ্যে মুসলিম এইড বাংলাদেশ অন্যতম।

পাকিস্তানের নাগরিক ইউসুফ ইসলামের গড়া মুসলিম এইড এনজিও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানিতে কাজ করে। বাংলাদেশে মুসলিম এইডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন '৭১-এর গণহত্যার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা মাওলানা আবদুস সুবহান। এনজিওটির বিরুদ্ধে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা, হিজবুল মোজাহিদীন ও জইশ-ই-মোহাম্মদের সম্পর্ক থাকার অভিযোগ রয়েছে।

১৯৯১ সালে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনার পর মুসলিম এইড ইউকে কক্সবাজারে কার্যক্রম শুরু করেছিল। তখন তাদের কার্যক্রম ছিল সন্দেহজনক। তারা

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের অর্থ সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশে শরণার্থী সমস্যা দীর্ঘায়িত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় মুসলিম এইড ইউকের বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই সংস্থাটিই পরে মুসলিম এইড বাংলাদেশ নামে আবারও কার্যক্রম শুরু করেছে।

'মুসলিম এইড বাংলাদেশ' বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ৬ নবেম্বর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এবং নিবন্ধিত হয়। এটি ২০০৯ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়।

'মুসলিম এইড বাংলাদেশ' ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট, ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে এবং বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নিবন্ধন পেয়েছে।

'মুসলিম এইড বাংলাদেশ' এখন বেশ কয়েকটি অখ্যাত সংগঠনের ব্যানারে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে 'ইমাম মুসলিম', 'দাওয়াতে ইসলাম', 'ইয়াহিয়াউস সুন্নাহ বাংলাদেশ'সহ আরও কয়েকটি সংগঠন। তারা রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থও বিতরণ করেছে।

২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'উখিয়ায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আন্দোলনের নেতা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আদিল উদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে এখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ হচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে অজ্ঞাত লোকজন শিবিরে গিয়ে গোপনে রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করছে। এদের কার্যক্রম যথেষ্ট সন্দেহজনক। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আন্দোলনের আরেক নেতা মাহমুদুল হক চৌধুরী বলেন, ইসলামী সংগঠনের নামে কিছু লোক রোহিঙ্গাদের গাড়িতে তুলে সীমান্ত থেকে নিয়ে আসছে। এরা রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে পৌঁছে দিচ্ছে; গোপনে রোহিঙ্গাদের নগদ অর্থও দিচ্ছে তারা।'

৫. আল-মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে ১৯৯১ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর দুর্গতদের জন্য অন্যান্য সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু ইসলামিক এনজিও সাহায্য দেয়ার নামে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এদের অন্যতম আল-মারকাজুল ইসলামী। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ যেমন: বসত-বাড়ি নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, সেনিটেশন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য। এসব সেবার আড়ালে এই সংস্থা তাদের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ জঙ্গি-মৌলবাদী সন্ত্রাসী তৈরি করে দেশে জঙ্গিবাদ বিস্তারে

ভূমিকা রেখে চলেছে। দুর্গত অঞ্চল দিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮৮ সালে প্রথম আল মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ নামে এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন মুফতি শহীদুল ইসলাম। এই সংস্থাটি প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এনজিও কার্যক্রমের আড়ালে তিনি হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন।

নব্বই দশকের শুরুতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মারকাজুল ইসলামী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বাবর রোড ও শ্যামলীতে সংস্থাটির নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ওই সময়ে দেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অর্থ-সহযোগিতা দিনে-দিনে পরিসর বাড়ে সংস্থাটির। এই অর্থায়নে সৌদি আরব, কাতার, দুবাই, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ছিল।

মারকাজের অর্থায়নে দুর্গম অঞ্চলে মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের কাজও করা হয়েছে এই এনজিওর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এসবের আড়ালেই হরকাতুল জিহাদসহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

'আল-মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সাবেক কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির, আফগানফেরত মুজাহিদ ও 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুফতি শহীদুল ইসলাম। আল-মারকাজুল এই সংস্থার মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেবার নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড পরিচালনা এবং মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মুফতি শহীদুল ইসলাম।

মুফতি শহীদুল ইসলাম 'আল-মারকাজুল ইসলামী'র মাধ্যমে জনকল্যাণ, মানব কল্যাণ ও সেবাখাতের নামে বিদেশ থেকে আনিত অর্থ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ছাড়াও নিজের রাজনীতিতেও ব্যয় করেছেন। আল-মারকাজুল ইসলামীর ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রশিদ সংস্থার টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হন। এই সংস্থা উগ্র জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তরুণদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করেন।

হেফাজতে ইসলামের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে মুফতি শহীদুল ইসলাম অন্যতম। ১৯৬০ সালের ১৫ মার্চ ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। হেফজ এবং লেখাপড়া জামেয়া আরাবিয়া গওহরডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ মাদ্রাসায়। তিনি আল-মারকাজুল ইসলামী বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম যত না রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত তার চেয়ে বেশী পরিচিত বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কারণে। তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী-এনজিও আল-মারকাজুল ইসলামী-এর মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জঙ্গিদের অর্থায়নের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দেশব্যাপী আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে তৎকালীন বিরোধী

দলীয় নেত্রী বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে দ্বিতীয়বারের মত আলোচনায় আসেন।

ইসলামী ঐক্যজোট-এর ব্যানারে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। উপ-নির্বাচনে জিতে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ-এর শুরু থেকেই সরাসরি সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন তিনি। সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে হরকাতুল জিহাদকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠার পেছনে শহীদুল ইসলামের অনেক অবদান রয়েছে।

মুফতি শহীদুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী (দাওরায়ে হাদিস) পাশ করে ইফতা (ইসলামী আইন) বিষয়ে পাকিস্তানের জামেয়া বিন্নুরী টাউন মাদ্রাসায় পড়ার সময় আফগান, পাকিস্তান ও কাশ্মীর এবং বাংলাদেশি মুজাহিদদের সঙ্গে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী পাকিস্তান শাখার সদস্য হিসেবে সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন। আফগান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হয়ে আফগান গিয়ে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আফগান জিহাদে সশস্ত্র বাংলাদেশি ৫০০০ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুফতি শহীদুল ইসলাম ছিলেন অন্যতম নেতা।

আফগান জিহাদ শেষে ১৯৯২ সালে ৩০ এপ্রিল হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ শাখা আত্মপ্রকাশ করে মুফতি শহীদুল ইসলাম সহ অন্যান্য জেহাদীর নেতৃত্বে। এই শিবিরে বহুল আলোচিত জঙ্গি আব্দুর রহমান ফারুকী, জঙ্গি আব্দুল হাই, জঙ্গি মনজুর হাসান সহ কয়েকজন আলোচিত আফগান ফেরত মুজাহিদ মুফতি শহীদুল ইসলামের সহযোদ্ধা ছিলেন।

মুফতি শহীদুল ছাত্রজীবনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছাড়াও তিনি সে সময়ে নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলনের রাজনীতি করেছেন মুফতি শহীদুল ইসলাম। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসার পরিচালক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির তিনি সহ-সভাপতি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন বহু বছর।

৬. হায়াতুল ইগাসা আল-ইসলামী আল আলমী বাংলাদেশ

হায়াতুল ইগাসা আল-ইসলামী আল-আলমী (আন্তর্জাতিক ইসলামি ত্রাণ সংস্থা) একটি দাতব্য সংস্থা যা সৌদি আরবকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়াতুল ইগাসা বাংলাদেশ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী ও আহলেহাদীছ বাংলাদেশ শাখার কয়েকজন নেতার উদ্যোগে। আহলেহাদীছ নামের জঙ্গি সংগঠনটি জিহাদের মাধ্যমে দেশে শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে হায়াতুল ইগাসার অর্থায়নের মাধ্যমে।

২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিবকে গ্রেপ্তার করা হলে অর্থায়ন হিসেবে এই সংস্থার নাম স্বীকার করেন। সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে এই সংস্থা আলোচনায় আসে। হায়াতুল ইগাসার অর্থায়নে আহলেহাদীছ রাজশাহী অঞ্চলে বেশকিছু মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণ করে। রমজান মাসে ইফতার পার্টির নামে জঙ্গিদেরকে একত্রিত করে নিজের দলে টানে আসাদুল্লাহ আলগালিব। পরবর্তী সময় খুলনা-সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'হায়াতুল ইগাসার' অর্থায়নে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। আহলেহাদীছ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কয়েকটি এনজিওতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে হায়াতুল ইগাসা।

হায়াতুল ইগাসা আল-ইসলামী আল আলমী বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারী সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন বুলারাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই সাথে আমীর হিসাবে আছেন। তিনি মাসিক আত-তাহরীক নামক একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। ২০১৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রফেসর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং জামালপুরের আরামনগর কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৯ সালে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে তিনি কলারোয়া সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা থেকে আইএ এবং সরকারী মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা থেকে বিএ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। অত:পর ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাস করেন।

৭. রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি

'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন লাভ করে। এরপরই দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে হেরিটেজের কার্যক্রম। প্রতি বছর ২৮ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে আসে কুয়েত থেকে। এ পর্যন্ত হেরিটেজ ১ হাজারেরও বেশি ইমামকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৯টি কওমি মাদ্রাসা এতিমখানাও পরিচালিত হচ্ছে এদের অর্থে। রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির নিবন্ধন ২০০৭ সালের ৬ মে বাতিল করে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হলেও নামে বেনামে এখনো সক্রিয় রয়েছে এই এনজিও।

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত কুয়েতভিত্তিক এনজিও 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে শুরু করে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার পরপরই।

২০০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর দৈনিক ভোরের কাগজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' বাংলাদেশে ৯টি মাদ্রাসা ও

এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে। এসব মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ শতাধিক। এগুলো হলো বগুড়ার নশিপুরে 'আল-মারকাজুল ইসলামী ওয়া দারুল আইতাম' একটি। এখানে ৮৭ জন এতিম শিক্ষার্থী রয়েছে।'

'বাগেরহাটের কালিদিয়ার 'আল-মারকাজুল ইসলামী' এতিমখানায় ৫০ জন, রাজশাহী নওদাপাড়া আল-মারকাজুল ইসলামী আস সালফী মাদ্রাসায় ৬০ জন, সাতক্ষীরার বাকুলে এলাকার 'আল-মারকাজুল ইসলামী' দারুল হাদিস মাদ্রাসায় ১০০ জন, গাজীপুরের কাওরাইদের আল-খুরাফী ও আল হাসমী মাদ্রাসায় ৩৭০ জন, ময়মনসিংহের গোলপুকুরপাড় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এতিমখানায় ১৫০ জন, ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈলের আল-ফুরকান ইসলামিক সেন্টারে ১৭০ জন, ঢাকার উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টরের ৮ নম্বর সড়কের খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ মাদ্রাসায় ১৫০ জন এবং উত্তরার ৬ নম্বর সেক্টরের উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।'

২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৭ সালের ২১ জুন আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জঙ্গি সংগঠনকে অর্থ দেয় এমন ১৭টি বিদেশি এনজিওকে শনাক্ত করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গি সংগঠনগুলোকে অর্থায়ন করে এমন এনজিওর ওপর নজরদারি করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। জঙ্গিবাদে অর্থায়নে যুক্ত থাকা ১৭টি বিদেশি এনজিওকে চিহ্নিত করে বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ওই এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে, রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, মুসলিম এইড বাংলাদেশ, রাবেতা আল-আলম ইসলামী, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, ইসলামিক রিলিফ এজেন্সি, আল-ফুরকান ফাউন্ডেশন, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ সংস্থা, হায়তুল ইগাছা, তাওহিদী নুর, আলমুনতাদা আল ইসলামী।'

৮. আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুর জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার তৎকালীন প্রধান পরিচালক মাওলানা জমিরউদ্দিন 'আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামের এই এনজিও চালু করেন। এই এনজিও সৌদি আরব থেকে সবচেয়ে বেশি ফান্ড সংগ্রহ করেন তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ থেকেও ফান্ড নিয়ে আসেন। এই এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা একজন পীর। ওনার দেশ বিদেশে প্রচুর ভক্ত রয়েছে। তাদের মাধ্যমেও ফান্ড সংগ্রহ করে থাকেন।

এই এনজিওর বর্তমান চেয়ারম্যানসহ ৩ জন পরিচালক জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার মধ্যে ৩ জন পরিচালকই সহোদর।

সবাই হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা। এই এনজিওর বর্তমান চেয়ারম্যান মাওলানা হেলালউদ্দীন হচ্ছেন হেফাজতের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। মাওলানা সালাহউদ্দীন হচ্ছেন হেফাজতের নায়েবে আমির। আরেকজন হচ্ছেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য।

'আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' বাংলাদেশ সরকারের এনজিও ব্যুরো ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত একটি এনজিও। আল্লামা জমিরউদ্দিন নানুপরী ২০১১ সালে মারা যান। এরপর তার তিন সন্তান মাওলানা হেলাল উদ্দিন বিন জমির, মাওলানা শিহাব উদ্দিন বিন জমির ও মাওলানা ফরিদ উদ্দিন বিন জমির ফাউন্ডেশনটি পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান মাওলানা হেলাল উদ্দিন জমিরউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এস এন কিবরিয়া ও মাওলানা শিহাবউদ্দিন জমিরউদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন জমিরউদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী ও আবুল কালাম আজাদ এবং জেনারেল ম্যানেজার ইসমাইল চৌধুরী।

আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান মাওলানা হেলাল উদ্দীন হেফাজতে ইসলামের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক। তিনি জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসার মুহাদ্দিস। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন নানুপুর গ্রামে। তার পিতা উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসার সাবেক পরিচালক, কথিত পীর মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানুপুরী। মাওলানা হেলাল উদ্দীন ছাত্রজীবন শুরু করেন তার পিতা মাওলানা শাহ জমির উদ্দীনের হাত ধরেই। জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। তার পিতা উক্ত মাদ্রাসার পরিচালক হওয়ার সুযোগে তিনি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে মুহাদ্দেসের দায়িত্ব পেয়ে যান। আস্তে আস্তে তিনি মাদ্রাসার নীতি নির্ধারণী কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

তিনি ছাত্রজীবনে হরকাতুল জিহাদ (হুজিবি) এবং 'নেজামে ইসলাম পার্টি' 'ইসলামী ঐক্যজোটের' রাজনীতির পাশাপাশি ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসা থেকে যে সব জঙ্গি-মৌলবাদী হরকাতের সদস্য বা জঙ্গি ট্রেনিং নিতেন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করেছেন। তার নেতৃত্বে ফটিকছড়ি নানুপুরের খিরাম পাহাড়-জঙ্গলে জঙ্গি ট্রেনিং হতো। তার জঙ্গি-উগ্র কর্মকাণ্ডের প্রভাব কাটিয়ে 'নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসার' প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সুলতান আহমদ নানুপুরীর ছেলের কাছ থেকে পরিচালকের আসন কেড়ে নিয়ে নিজের বড় ভাইকে দিয়ে দেন।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, চিকিৎসাসেবা, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে আল-মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এছাড়াও সংস্থার উদ্যোগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নতুন ৩০০ টিউবওয়েল এবং ১ হাজার টয়লেট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ১ নবেম্বর উক্ত

এনজিওর মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয় চাল, ডাল, তেল, পিয়াজ, আলু, লবণসহ শুকনো খাবার-দাবার। আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উখিয়া কুতুপালং বি ব্লকের ৩-৫ নম্বরে ৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। আল মানাহিল এনজিও পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদেরকে এসব ত্রাণ বিতরণের নেপথে রয়েছে লোক দেখানো এবং জঙ্গিবাদী কার্যক্রমকে আড়াল করা। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ বিতরণের সময় মূলত রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সাথে আল মানাহিল কর্তৃপক্ষ দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ নিয়েছেন। চট্টগ্রামে করোনায় ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ২৩০টিরও বেশি লাশ দাফনের পর ২০২০ সালে জুন মাসে ৭০ শয্যার একটি করোনা হাসপাতাল চালুর উদ্যোগ নিয়েছে আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন।

২০২০ সালের ২৩ জুন কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামের হালিশহরে একটি ছয়তলা ভবনে করোনা চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। নামকরণ করা হয়েছে 'আল মানাহিল নার্চার হাসপাতাল'। হাসপাতালে বসানো হয়েছে ১০টি আইসিইউ বেড। এর মধ্যে থাকছে পাঁচটি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা। ছয়তলা ভবনজুড়েই রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম। হালিশহরের বি-ব্লকের চৌধুরীপাড়ায় হাসপাতালটি অবস্থিত। ছয়তলা বিশিষ্ট হাসপাতালটির নিচের তলায় থাকছে রিসেপশন, জরুরি বিভাগ ও অবজারভেশন ওয়ার্ড। বাকি পাঁচটি তলায় বসানো হয়েছে ৭০টি শয্যা।'

৯. আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার সংসদ সদস্য মাওলানা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন'। আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ১৯৬৮ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার মাদার্শা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ এবং মাতা রহিমা খাতুন। উক্ত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন। তার পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি দেশজুড়ে তাদের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত এই সংগঠন সৌদি আরব, কুয়েত, ওআইসি, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়াসহ বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ফাউন্ডেশনটি ২০০০ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন (২৩১৬/২০০০) পায়। একই বছর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোরও নিবন্ধন (১৭৭০/২০০২) লাভ করে।

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ১৯৮৯ সালে জামেয়া দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে আন্তর্জাতিক ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকীকরণ, এর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি টানা দুই বার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ফিকাহ, বিজ্ঞান এবং আরবি সাহিত্যে খুবই দক্ষ হওয়ার কারণে সহজে আরবদেশ সফর করে থাকেন। আরব দেশের রাজা বাদশাদের সাথে নদভীর গভীর সম্পর্ক থাকাতে এনজিওর নামে প্রচুর ফান্ড সংগ্রহ করেন।

সৌদি বাদশার নিজস্ব সাহায্য সংস্থা 'কিং সালমান হিউম্যানেটেরিয়ান এইড এন্ড রিলিফ সেন্টার' (King Salman humanitarian aid & relief centre) অর্থায়নে এবং প্রকল্পের কৌশলগত অংশীদার ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ (World Muslim League) এর সহযোগিতায় ও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া কুতুপালং, ভাসানচরে বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১০. ইমাম মুসলিম ইসলামিক সেন্টার

'ইমাম মুসলিম ইসলামিক সেন্টার'-এই এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাফেজ সালাহুল ইসলাম। তিনি একজন মিয়ানমারের নাগরিক। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমারের মংডু থানার নাগপুরা ইউনিয়নের কুয়ারবিলা গ্রাম থেকে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসেছিলেন সালাহুল ইসলাম। বাংলাদেশে আসার পর কেটে গেছে ৪০ বছর। এই দীর্ঘ সময় সালাহুল ইসলাম কক্সবাজার ও বান্দরবানকে কেন্দ্র করে জঙ্গি তৎপরতার জাল বুনেছেন। এরপর রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) প্রধান সামরিক কমান্ডার হয়ে উঠেছিলেন। এখনো সংগঠনটির কার্যকর নেতৃত্ব তার হাতেই। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সুদৃঢ় মতাদর্শিক যোগাযোগ রয়েছে তার। তাদের কাছ থেকে আর্থিক ও আদর্শিক সমর্থন পান তিনি।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার ও বান্দরবানে সরকারি জমি দখল করে একের পর এক মাদ্রাসা নির্মাণ করেছেন সালাহুল। এসব মাদ্রাসায় রোহিঙ্গা জঙ্গি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে থ্রি মার্ডারের একটি মামলাসহ কয়েকটি মামলায় পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যেই চলাচল করেন।

আরএসওর সাবেক প্রধান কমান্ডার হাফেজ সালাহুল বাংলাদেশের কক্সবাজার ও বান্দরবান এবং মিয়ানমারের একটি অংশ নিয়ে 'স্বাধীন আরাকান ইসলাম' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বসে জঙ্গিবাদী নেটওয়ার্ক গড়েছেন। মিয়ানমারের মংডু থানার নাগপুরা ইউনিয়নের কুয়ারবিলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন সালাহুল ইসলাম। ১৯৭৮ সালে

তিনি বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। হাফেজ জিয়াউল হক ও ছবেদা খাতুনের ছেলে সালাহুল। সৌদি আরবের রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নেন তিনি। একসময় 'আরএসওর' প্রধান সামরিক কমান্ডারের দায়িত্ব পান। মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রয়েছে তার।

ভিনদেশি রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশি কয়েকটি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক এনজিও রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে জঙ্গিবাদে উস্কানি দিয়ে থাকেন। কুয়েত, সৌদি আরব, তুরস্ক, জার্মান ও ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশের এনজিও সংগঠন এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করা রোহিঙ্গাদের নগদ অর্থ ও ত্রাণ দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের নামে মূলত জঙ্গি কার্যক্রম চালায় এসব এনজিও।

২০১৩ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশে সহায়তা, নাগরিকত্ব, পার্সপোর্ট করার ব্যবস্থা করেন রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সামরিক শাখার প্রধান হাফেজ সালাউল ইসলাম। তিনি মূলত বিদেশিদের থেকে অর্থ আনার ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে সব সময় থাকেন করিমুল্লা নামে আরেক ব্যক্তি।

'কক্সবাজারের সদরে অবস্থিত হাফেজ সালাউলের ইমাম মুসলিম সেন্টারে অবৈধ সৌদি নাগরিকদের অর্থায়নে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ মসজিদ উদ্বোধনের জন্য ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে চার সৌদি নাগরিক বাংলাদেশে আসে। তাদের নাম হচ্ছে, ওমর সামরান, রায়ান স্বাদ, রায়েফ ওমর ও আব্দুল্লা সুলতান।'

গণকমিশনের সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, সালাহুল ইসলাম ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে মিয়ানমার বিদ্রোহী সংগঠন আরএসও'র সাথে জড়িয়ে যান। আরএসও'র অর্থায়নে তিনি কক্সবাজারের হ্নীলা কওমি মাদ্রাসা জামেয়া দারুসুন্নাহ, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াসহ বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার পর সৌদি আরব চলে যান। আরএসও'র মাধ্যমেই সৌদি আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক তৈরী হয়। এরপরই বাংলাদেশে আরএসও'র কার্যক্রমে মূল দায়িত্বে চলে আসেন সালাহুল। মূলতঃ আরএসও'র সামরিক ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়কারী ছিলেন তিনি। এসব কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ধনকুবের ও জঙ্গি গোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন সালাহুল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবের ও জঙ্গি গোষ্ঠীর অর্থায়নে কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ, রামু ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় রোহিঙ্গাদের মাঝে কাজ শুরু করেন তিনি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে কক্সবাজারের লিংক রোডের দক্ষিণ মুহুরীপাড়া এলাকায় মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক আল হারামাইন সংস্থার (আল হারামাইন বর্তমানে দেশে ও বিভিন্ন দেশে জঙ্গি কর্মকান্ডের জন্য নিষিদ্ধ) আড়ালে তিনি আস্তানা গড়ে তুলেছেন।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, বিদেশি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা সালাহুল এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিত্তিক ও কক্সবাজার সহ বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের

জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শত কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। দাতাদের মধ্যে আইএইচএইচ (তুরস্ক), বায়তুল মাল (ভারত) উল্লেখযোগ্য।

গণতদন্ত কমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, কক্সবাজারের লিংক রোডে দক্ষিণ মহুরিপাড়ায় সরকারের বন বিভাগের সাত একর ও স্থানীয় মানুষের তিন একরসহ মোট ১০ একর জায়গা দখল করে সেখানে গড়ে তোলেন ইমাম মুসলিম (রা.) ইসলামিক সেন্টার। কার্যত এখান থেকেই আরএসও'র সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর সালাহুলের উত্থান শুরু হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২১ মার্চ টেকনাফের হ্নীলার একটি মাদ্রাসায় গোপনে বৈঠক করার সময় হাফেজ সালাহুলকে পুলিশ আটক করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির রায়ের পর তার মুক্তির দাবিতে জামায়াত-শিবির কক্সবাজারে তান্ডব চালায়। এতে তিনজন নিহত এবং কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ১৯ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। ওই ঘটনায় দায়ের করা তিন মামলায় হাফেজ সালাহুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়, যদিও পরে তিনি জামিন পান।

ইমাম মুসলিম ইসলামিক সেন্টার নামের মাদ্রাসাটি একটি টিনশেড ও ছোট একটি মসজিদ দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন রয়েছে একটি একতলা ভবন, দুটি তিনতলা ভবন, দুটি অত্যাধুনিক চারতলা ভবন, একটি টিনশেড ভবন ও একটি দোতলা অত্যাধুনিক মসজিদ। মাদ্রাসা কম্পাউন্ডেই সালাহুলের জন্য একটি অত্যাধুনিক বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি নিজের চলাফেরার জন্য একটি মাইক্রোবাস ব্যবহার করেন। বর্তমানে মাদ্রাসায় ১০০০ ছাত্রছাত্রী এবং ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভেতর জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম

বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে বিদেশি যোগাযোগের আরেকটি পথ হচ্ছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। কক্সবাজার, বান্দরবানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের এবং আরাকান বিদ্রোহী সংগঠনকে ১৯৮০ সাল থেকে সশস্ত্র সহায়তা প্রদান করে আসছে মৌলবাদী রাজনৈতিক যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত-শিবির গোষ্ঠীর নেতাকর্মীরা। টেকনাফ-উখিয়ায় আশ্রিত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ ওই মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় আরএসও, আরএনও, এআরএনও, এআরইউ, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন হরকত-উল জিহাদ, হিযবুত তাহরীর, জেএমবি, আল-হারামাইন ও 'আল্লার দল'সহ বিভিন্ন পরিচিত-অপরিচিত সংগঠনের সদস্যরা জামায়াত-শিবিরের গোপন অপতৎপরতার সঙ্গে লিপ্ত রয়েছে।

মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া সরকারের আমলে সীমান্ত পেরিয়ে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে ব্যাপকহারে রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটে।

ওই সময় একাধিক মৌলবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী, রোহিঙ্গা জঙ্গি ও কতিপয় এনজিও সংস্থার প্ররোচনায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প ছেড়ে লোকালয়ে মিশে যায়। জামায়াত-শিবিরসহ একাধিক মৌলবাদী গোষ্ঠী ওই সব রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য কৌশলে এ দেশের নাগরিক বলে দাবি করতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ওই সব রোহিঙ্গারা বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন ও রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উপর লিখিত দেশ বিদেশের বিভিন্ন বইপুস্তক ও গণকমিশনের দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, আশির দশকের শুরু থেকেই রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জামায়াত-শিবির যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা শুরু হলেও আশির দশকের শেষে এসে সেই সম্পর্ক ভয়াবহ রূপ নেয়। রোহিঙ্গা ও পাহাড়ী জঙ্গিগোষ্ঠীসমূহের সাথে মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীসমূহের সম্পর্কের কারণ হলো– নির্যাতিত মুসলমানদের নামে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ এবং জিহাদের নামে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা।

বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলাসহ সীমান্ত এলাকায় একাধিক ইসলামী সশস্ত্র গ্রুপ একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগকে মূল ভূ-খন্ড থেকে আলাদা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় আসার পর জামায়াত-শিবির ও উগ্রপন্থীদের জঙ্গিবাদী গোপন মিশনের কার্যক্রম ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন হয়। জামায়াত-শিবিরের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র জিহাদী প্রশিক্ষণ থেকে আরম্ভ করে এমন কোন নাশকতা ও দেশদ্রোহীমূলক কর্মকান্ড ছিল না, যা রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠীসমূহ গ্রহণ করেনি। জামায়াত-শিবিরের সার্বিক সহায়তা ও মদদে সশস্ত্র জঙ্গি গ্রুপগুলো দেশে ও বিদেশে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের গহীন অরণ্যের পাহাড়গুলোকে প্রশিক্ষণক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলো এবং এদের মদদদাতা জামায়াত শিবির গোষ্ঠী। বিভিন্ন মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের টার্গেট করে জঙ্গি সংগঠনগুলো। শুরুতে ধর্মীয় আলোচনা এবং পরে বই-পুস্তক দেওয়া হয় পড়তে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিহত মুসলিম শিশুর ভিডিও দেখানো হয়। ইরাক, ফিলিস্তিন, আরাকানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য, ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল জাওয়াহিরি ও অন্যান্য জঙ্গি নেতাদের বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন জিহাদবিষয়ক ভিডিও, আফগান যুদ্ধ, বিভিন্ন স্থাপনায় বোমা হামলার দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে। একসময় জিহাদে উদ্বুদ্ধ হলে তাদের আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস, আল-শাবাব, আল-কায়েদা, আল-নুসরার বাংলা অনুবাদ করা জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণের বিভিন্ন ভিডিওচিত্র দেখিয়ে বোঝানো হয়। এরপর তাদের প্রশিক্ষণে নেওয়া হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেখিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। কীভাবে বিমান হাইজ্যাক কিংবা কাউকে অপহরণ করতে হবে এর ভিডিওচিত্র দেখানো হয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে। এই প্রশিক্ষণ শেষ হলে দুর্গম পাহাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৪৫ দিনের দুর্ধর্ষ জঙ্গি প্রশিক্ষণে। বেশির ভাগ দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের

ভৌগোলিক ও অন্যান্য সুবিধার কথা চিন্তা করে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের দুর্গম পাহাড়ে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুর্গম পাহাড়ে তাদের বিমান ছিনতাই, গেরিলা ট্রেনিং, সামরিক কায়দায় ফায়ারিং, বোমা তৈরি ও হামলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা নারকীয় হামলা চালিয়েছে বৌদ্ধবিহার ও বড়ুয়াপল্লীতে। মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় রোহিঙ্গারা এ দেশের বিরুদ্ধেই নানা ষড়যন্ত্রসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

'মিয়ানমারের নিপীড়িত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জনগণকে বিচ্ছিন্নতাবাদে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীন আরাকান রাজ্য গঠনের কথা বলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত কোটি ডলার দেশে এনেছেন মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসি হওয়া জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলী। রোহিঙ্গাদের জন্য আনা সেই বিপুল অর্থে বিত্তশালী হয়েছেন মীর কাশেম, অর্থ-বিত্তে শক্তিশালী করেছেন জামায়াতকেও।

'আবার সেই অর্থ দিয়ে রোহিঙ্গা তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র, দিয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ। তবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা অর্থের বড় অংশই নিজের তহবিলে রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিপুল বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়েছিলেন এই আলবদর কমান্ডার।'

২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বাংলানিউজ২৪.কম-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কক্সবাজার-বান্দরবান এবং রাঙামাটিতে মধ্যপ্রাচ্যের অনুদানপ্রাপ্ত রাবেতা আল ইসলাম হাসপাতালে পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের নামে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) সদস্যদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হতো তার সহযোগিতায়। ১৯৮০ সালে কক্সবাজারে রাবেতা আল আলম ইসলামী হাসপাতালে জামায়াতের মদদে মীর কাসেমের সহায়তায় রোহিঙ্গা তরুণ-যুবকদের নিয়ে আরএসও সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মোঃ ইউনুছ রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) নামে প্রথমে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলীর পরামর্শে এ সংগঠনটি আরএসও নাম ধারণ করে। নিজেদের কৌশলপত্র নির্ধারণ, মানচিত্র, পতাকা তৈরিসহ নিজস্ব সংবিধানও রয়েছে আরএসও জঙ্গি সংগঠনের। ২০১২ সালে উইকিলিকসের ফাঁস করা তথ্যে জানা যায়, আরএসও ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন আল কায়েদার সঙ্গেও নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। আরএসও'র অনেক সদস্য আল কায়েদার হয়ে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তখন।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পাহাড় ও সমুদ্র চরাঞ্চল এলাকায় আরএসও গড়ে তোলে ১০টি মাদ্রাসা-এতিমখানা ও রোহিঙ্গা বস্তি। এসব স্থাপনা তৈরি করতে আরএসও ক্যাডাররা অবৈধ দখলে নেয় অন্তত দু'শ একর বন বিভাগের জমি। এর নেপথ্য অর্থ যোগানদাতা মীর কাশেম আলীর রাবেতা এনজিও।

অনুসন্ধানে জানা যায়, আশি ও নব্বইয়ের দশকজুড়ে মীর কাশেম আলী নিজেই কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙামাটির গহীন অরণ্যে গিয়ে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। রাবেতা আল ইসলামের মাধ্যমে পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণের আড়ালে তখন হাজার হাজার রোহিঙ্গা তরুণ-যুবককে মিয়ানমার থেকে কক্সবাজারে এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা তরুণ-যুবকদের সামনে স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। আর সেগুলো প্রচার করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি ডলার অনুদান আনতেন। সেই অনুদানের একটি বড় অংশ যেত নিজের ও জামায়াতের তহবিলে। এভাবেই ধনকুবেরে পরিণত হন মীর কাশেম।

জানা গেছে, যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতাদের বিচার শুরু হলে, সেই বিচার বানচালে মীর কাশেম আলী প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা যুবকদের কাজে লাগানো শুরু করেন। আফগান ও পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা নেতা মাস্টার আয়ুব, আবু ছালেহ, থোয়াইঙ্গাকাটার আরএসও জঙ্গি মওলানা আনিস, রোমালিয়ারছড়ায় বসবাসকারী মৌলভী শফিক, টেকপাড়ার ইসমাইল, আবু আবদুল্লাহ, মৌলভী আবদুর রহমান, মাস্টার এনাম, আবু সিদ্দিক, রামুতে বসবাসকারী মৌলভী মোয়াজ্জেম হোছাইন ও হাফেজ নায়েমসহ বহু রোহিঙ্গা জঙ্গি জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে মিলে বহু নাশকতায় অংশ নিয়েছে।

একসময় রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র ট্রেনিং এর সনদ প্রদান শেষে আবার সেইসব ছবি জঙ্গি সংগঠন RSO এবং আইটিএম-এর বিভিন্ন ভাষার মাসিক মুখপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ থেকে আরাকানে জিহাদের নামে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতারা আর্থিক অনুদান নিয়ে আসতেন।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সচিত্র মুখপত্র ও জামায়াতে ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী ও বইপুস্তক পর্যালোচনা করে অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের নো-ম্যান্স ল্যান্ডের পাহাড়ি দুর্গম অরণ্যে আশির দশকের শুরু থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী আরএসও, আরিফ, এআরএনও, আরপিএফ, নুপা, এআরএমএফ, এএ সহ একাধিক রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের আর্ম ট্রেনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান ও অস্ত্র পাচার করা হয়ে আসছে। প্রায় ২০ হাজার রোহিঙ্গা সামরিক কলা কৌশল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ত্রাসী বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদের সাথে যুক্ত হয়ে অনেক বাংলাদেশী ধর্মীয় উগ্রবাদী জঙ্গি সামরিক কলা কৌশলের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরকাতুল জিহাদ, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানানোর দুঃস্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলছে। এসব প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গাদের অনেকে বিভিন্ন স্থান থেকে বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে জাতীয়তা সনদ নিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রধারী হয়ে গেছে এবং সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান, লিবিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়েছে ।

২০১৪ সালের ২৫ নবেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মিয়ানমার ও বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা নিয়ে আরকানিস্তান (আরকান) নামের একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে এই ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) বান্দরবান ও কক্সবাজারের স্থানীয় জামায়াত নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও কার্যক্রম চলছে।'

২০০২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এশিয়া টাইম সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, 'আরএসওর বিভিন্ন প্রকাশনা যাচাই করে এবং এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সহযোগিতায় ১৯৯৮ সালে আরএসও সীমান্ত এলাকায় লিফলেট ছাপিয়ে আরকানিস্তান (আরকান) নামক একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মহাপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে সেই সময়। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের ফেনী থেকে শুরু করে পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার এবং মিয়ানমারের সাবেক আরাকান রাজ্যের মংডু, বুচিদং ও ক্যালাডং জেলা অঞ্চল নিয়ে আরকানিস্তান গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আরএসও নেতারা কাজ করছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার (বার্মা) থেকে বাংলাদেশে আসা ব্যক্তিরাই এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমানে এদের অনেকেই বাংলাদেশি নাগরিক।'

১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি উখিয়ার পাহাড়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে গ্রেফতার হয়েছিল ৪১ জঙ্গি। ওই সময়ে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র। ক্যাম্পে জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষক ছিলেন আরাকানের বুচিদংয়ের রোহিঙ্গা জঙ্গি নুরুল ইসলাম। এই জঙ্গি চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে অন্যদের সঙ্গে জামিনে বেরিয়ে আসে। জঙ্গি নুরুল ইসলাম এখন টেকনাফের লেদা ক্যাম্পে রয়েছে। এখানে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সঙ্গে মিশে রয়েছে আবদুর রহিম, হাফেজ মুহাম্মদ আয়ুব, হাফেজ রফিকুল ইসলাম, জামাল হোসেন, মো. জাবের, মৌলভী আইয়ুব নদভীসহ আরও রোহিঙ্গা জঙ্গি। টেকনাফের নয়াপাড়া ক্যাম্পে রয়েছে জঙ্গি গ্রুপের আমির মৌলানা জুবাইর আহমদ, কমান্ডার মৌলানা ছাব্বির আহমদ ও মৌলানা ফরিদ উদ্দিনসহ আরও কয়েকজন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, বিদেশী বিভিন্ন এনজিও সংস্থা রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিত্তিক ও কক্সবাজার-বান্দরবান তথা চট্টগ্রাম সহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অনুদান দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায়।

২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার শহরে 'সাঈদী মুক্তি পরিষদ' এর ব্যানারে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালান জামায়াত নেতা তোফায়েল। এ ঘটনায় তিনজন নিহত হয়। এ ছাড়া জামায়াত নেতা সাঈদীর রায়ের পর ২৮ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাহ এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয় তোফায়েলের নেতৃত্বে।

রামুর বৌদ্ধ জনপদে নারকীয় হামলায় সম্পৃক্ত রোহিঙ্গা জঙ্গিরা কতিপয় জামায়াত নেতা তোফায়েলের সহযোগিতায় কক্সবাজার ও নাইক্ষ্যংছড়িতে আবার সংগঠিত হতে থাকে। জানা গেছে, বৌদ্ধ জনপদে হামলার চক্রান্ত ও তদারকির দায়িত্ব পালনকারী জঙ্গি নেতা হাফেজ সালামত উল্লাহর নির্দেশে ওয়ামি কার্যালয় থেকে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী-জঙ্গিদের ফের সংগঠিত করা হয়। রামু, উখিয়া ও টেকনাফে বৌদ্ধ বিহার, মন্দির ও সংখ্যালঘু লোকজনের বাড়িঘরে হামলা-অগ্নিসংযোগ ও লুটের ঘটনার পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বদানকারী তোফায়েল-সালামতসহ অনেক নেতা জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত।

২০১৫ সালের ১৪ নভেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জামায়াতের সহযোগিতায় মামলা থেকে রেহাই পেতে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আত্মগোপনে থাকা রোহিঙ্গা জঙ্গিরা মালয়েশিয়া-সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের এবং দেশে অবস্থানকারী নিষিদ্ধ ঘোষিত একাধিক এনজিওর কাছ থেকে অঢেল টাকার ফান্ড সংগ্রহ করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী পুরনো রোহিঙ্গা নেতাদের কাছ থেকে বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে ওই টাকা নিয়ে আসেন।

'রামু, উখিয়া ও টেকনাফে বৌদ্ধ বিহার-মন্দির ও সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নারকীয় হামলায় গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতকারী ও রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সঙ্গে কারাগারে গিয়েও বহু রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী ও জামায়াত নেতারা সাক্ষাত করেছে। বৌদ্ধ জনপদে হামলা ঘটনায় এজাহারভুক্ত জামায়াত নেতাদের স্বজনরা যোগাযোগ করে চলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সঙ্গে। রামুর বৌদ্ধ জনপদে ধ্বংসলীলার পরিকল্পনাকারী রোহিঙ্গা জঙ্গি নেতা আবু ছালেহ ওরফে ছালেহ আহমদের সঙ্গে তার স্ত্রীসহ অচেনা লোকজন কক্সবাজার কারাগারে গিয়ে সাক্ষাত করছে জামায়াত নেতা শহীদুল আলম বাহাদুরের সঙ্গে। বর্তমানে আবু সালেহ জামিনে মুক্ত আছেন।'

১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়ায় গ্রেপ্তার করা ৪১ জন হুজি জঙ্গি সদস্যদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ শেষে আফগানিস্তানে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এ সময় ৪টি বিশাল তাবুও টাঙ্গানো ছিল সেখানে। এসব তাবুতে অবস্থান নিয়েছিল আরও বিপুল সংখ্যক তালেবানী হুজি সদস্য। পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীদের অভিযানের সময় তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়। এ সময় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা হয় ৮টি অত্যাধুনিক বন্দুক, গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণ গুলি, ক্যামেরা, বাইনোকুলার, সামরিক পোষাক, পরচুলা, তালেবানী মুজাহিদ প্যান্ট, ১০টি ছোরা, জিহাদ লেখা পতাকা সহ ২৭ প্রকারের অন্যান্য সামগ্রী। যা মামলায় আলামত হিসেবে জব্দ দেখানো হয়।

রোহিঙ্গা নেতা ড. ওয়াকার উদ্দীন জামায়াতে ইসলামীর নেতা যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশে থাকাকালিন মীর কাশেম আলীর চট্টগ্রাম কক্সবাজার ভিত্তিক ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। সেই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. ওয়াকার উদ্দীনের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা রোহিঙ্গাদের জন্য লবি নিয়োগ করেছেন। উক্ত ওয়াকার উদ্দীন নিজেও একজন রোহিঙ্গা

বংশোদ্ভূত। আইটিএম নামের একটি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে তাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। মিয়ানমারের ইউনাইটেড মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় আইটিএম কক্সবাজার জেলা ও পার্বত্য জেলায় এবং পুরো চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় রোহিঙ্গাদের হয়ে কাজ করছেন। তাদের লক্ষ্য যে কোনো মূল্যে এ দেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ধরে রাখা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কক্সবাজার জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ মসজিদের ইমাম রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত। বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানায়ও শিক্ষকতা করছে রোহিঙ্গারা। এসব ইমাম কিংবা শিক্ষক বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্রদের ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদ সংশ্লিষ্ট উগ্রপন্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন ।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, টেকনাফ উপজেলা জামায়াতের সিনিয়র নেতা নুর হোসেন ছিদ্দিক উখিয়ার জামতলা আশ্রয় ক্যাম্পে আবু ওমর নামের রোহিঙ্গা নাগরিককে নিজের ড্রাগ লাইসেন্স ভাড়া দিয়েছেন। শরণার্থী আইন অনুসারে রোহিঙ্গারা আশ্রিত ক্যাম্পে ব্যবসা করা যেমন অবৈধ, তেমনই তাদের ব্যবসায় সহযোগিতা দেয়াও অবৈধ। কিন্তু বিভিন্ন ক্যাম্পজুড়ে জামায়াত নেতাদের রয়েছে ড্রাগ লাইসেন্সের ফটোকপিযুক্ত রোহিঙ্গাদের একাধিক ফার্মেসি। নুর হোসেন ছিদ্দিক রুমা ফার্মেসি নামে ওষুধ ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্সটি নিয়েছেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। পরে এক রোহিঙ্গাকে লাইসেন্সটি ভাড়া দিয়ে ফার্মেসি ব্যবসা চালাচ্ছেন উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের এলাকা জামতলীতে। উখিয়ার পালংখালীর জামতলা রোহিঙ্গা বাজার ক্যাম্প-১৫ এ আশ্রিত এক রোহিঙ্গা ক্যাম্প অভ্যন্তরে বিশাল আকারে ফার্মেসি খোলে সেখানে টাঙিয়ে দিয়েছে জামায়াত নেতা নুর হোসেন ছিদ্দিকের ছবিযুক্ত ট্রেড ও ড্রাগ লাইসেন্সের ফটোকপি। ওই রোহিঙ্গা জানায়, লাইসেন্সটি মাসিক ভাড়ায় এনে ব্যবসা করছে।

২০২০ সালের ১৮ জুলাই জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গারা মানবিক কারণে এদেশে আশ্রয় পেয়ে বেমালুম ভুলে গেছে যে, তারা সাময়িক আশ্রিত মাত্র। বাধাহীন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পেরে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গারা। বালুখালী ক্যাম্প অভ্যন্তরে রাখাইন রাজ্যের শহর বলিবাজারের নামে 'বলিবাজার মার্কেট' খোলে নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আশ্রিত রোহিঙ্গারা। কুতুপালং, বালুখালী, ময়নাঘোনা, হাকিমপাড়া, থাইংখালী, পালংখালী, চাকমারকুল, পুটিবনিয়া, নয়াপাড়া, মুচনী ও শাপলাপুর ক্যাম্পে অন্তত ২০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গাদের মালিকানাধীন দোকানপাট রয়েছে।'

স্বাধীন আরাকান মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বান্দরবান ও কক্সবাজার নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা জামায়াত শিবিরের রণীতির অংশ। ২০১২ সালে মাঝামাঝি সময়ে আরএসও সভাপতি ও জামায়াত নেতা সালামত উল্লাহ ও আরএসও সহ-সভাপতি ও আ'লীগের নেতা শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে আরএসও, আরাকান মুভমেন্ট, আরাকান পিপলস ফ্রিডম পার্টি, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও), হরকাতুল জিহাদসহ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের নেতারা চট্টগ্রামে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে তারা একসাথে কাজ করার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছান। এর আগে

আরএসওর প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ ইউনুছ, রোহিঙ্গা নেতা ড. ওয়াকার উদ্দিন, আবুল ফয়েজ জিলানী, নুরুল ইসলাম, সালামত উল্লাহ, মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, নাজমুল আলমসহ শীর্ষ কয়েক নেতা সৌদি আরবের রিয়াদে বৈঠক করেন। বৈঠকে দ্বিধাবিভক্ত রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো ও হরকাতুল জিহাদসহ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকের পরপরই জঙ্গি নেতারা তহবিল সংগ্রহে নামেন।

সালামত ও শফিউল্লাহ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কাজ করার আড়ালে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সাথে যুক্ত। রোহিঙ্গাদের সহায়তার নামে জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত তারা। জামায়াত নেতা শফিউল্লাহ'র মসজিদুল আনসার, ইন্টিগ্রেটেড হিউম্যান অ্যাপ্রোচ, দারুল আনসার খাইরিয়াসহ একাধিক নামে এনজিও রয়েছে। তার এনজিওতে আছেন মৌলানা নজির, মৌলানা ছৈয়দ আলম নামে দুইজন জঙ্গি। রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য তিনি স্থাপন করেছেন তিনটি মাদ্রাসা।

জঙ্গি সংগঠন 'ইত্তেহাদুল জামিয়াতুল রোহিঙ্গা'র ১৮ সদস্যের সূরা কমিটির বেশীরভাগ সদস্যই জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। এই সংগঠনের সভাপতি হাফেজ সালাহুল এবং সেক্রেটারি সালামতউল্লাহসহ ১৮ সদস্যের একটি সূরা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর এই সংগঠনের সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলার তৎকালিন চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা তোফায়েল। উখিয়া থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সংগঠনটিকে পরিচিতি করার কাজ করছেন মুহাম্মদ জুবায়ের, যিনি ভারতভিত্তিক সংগঠন বায়তুল মাল ইন্ডিয়ার নেতা। আর সামরিক শাখার কমান্ডারের দায়িত্বে আছেন মাস্টার আইয়ুব যিনি আফগান, সিরিয়া ও ইরাকযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

রোহিঙ্গা জঙ্গি নেতা সালাহুল ইসলাম, আবু ছালেহসহ ৪৩৮ জঙ্গির জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল হয়নি। এদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সহযোগী স্থানীয় কতিপয় জনপ্রতিনিধিসহ রোহিঙ্গাবান্ধব ৫১ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও গ্রহণ করা হয়নি আইনানুগ কোন ব্যবস্থা। অথচ রোহিঙ্গাদের ভোটার ও জাতীয় পরিচয়পত্র পাইয়ে দেওয়ার পেছনে সহযোগিতা ও তদবিরকারী রোহিঙ্গাবান্ধব ওই ৫১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারি নির্দেশনা দেওয়া হয় কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। এদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি দেখে ওই জঙ্গিরা জাতীয় পরিচয়পত্র বহন করে নিজেদের স্থানীয় বাসিন্দা বলে দাবি করছে। জেএমবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে নাশকতায় লিপ্ত হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাডাররা। জঙ্গিদের সহযোগিতায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গারা বস্তি তৈরি করে লেদা ও কুতুপালং ক্যাম্পের পাশে বসবাস করছে ১৯৯২ সাল থেকে। এ রোহিঙ্গা সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে আরএসও ক্যাডার ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি চিহ্নিত সাহায্য সংস্থার (এনজিও) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ওসব এনজিওর কর্মকর্তাদের অপতৎপরতার কারণে রোহিঙ্গা জঙ্গি ক্যাডাররা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালীরা উখিয়া-টেকনাফ ও পার্শ্ববর্তী নাইক্ষ্যংছড়ি রোহিঙ্গা বান্ধব ৫১ ব্যক্তির তালিকায় থাকা পালংখালী ইউপি চেয়ারম্যান গফুর উদ্দিন, টেকনাফ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাফর আহমদ ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ইউনুছ বাঙ্গালী, বাহারছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলভী আজিজ, হ্নীলা ইউপি চেয়ারম্যান মাষ্টার মীর কাশেম, সাবরাং ইউপি চেয়ারম্যান হামিদুর রহমান, বাহারছড়া ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ, সেন্টমার্টিন ইউপি চেয়ারম্যান নূরুল আমিন, হ্নীলার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এসকে আনোয়ার, টেকনাফ পৌর কাউন্সিলর ও সাংসদের সহোদর মৌলভী মুজিবুর রহমান, আবু হারেছ, একেরামুল হক, হাছান আহমদ, নূরুল বশর, রুবিনা আক্তার, সাবরাং ইউনিয়নের ইসমাইল, আব্দুস সালাম, নূর মোহাম্মদ, টেকনাফ সদরের হামজালাল ও খোরশিদা বেগম, সেন্টমার্টিনের আবুল বশর, আব্দুর রহমান, শামশুল আলম ও কবির আহমদ, হ্নীলার আলী আহমদ, আবুল হোছন ও শফিক আহমদ, বাহারছড়ার জোৎস্না বেগম, হোয়াইক্যংয়ের জাহেদ হোছনের নাম রয়েছে। এছাড়াও নাইক্ষ্যংছড়ি নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ মাঈনুল হক ছাড়াও চাকঢালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশংকর রুদ্র, বাইশারির তোফান আলী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহীদুল ইসলাম, আছারতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক উ ক্যা সিং মাষ্টার, বিছামারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ সাইফুল ইসলামসহ তালিকায় নাম না আসা আরো শতাধিক রোহিঙ্গা বান্ধব ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা সনদ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়সহ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের উৎসাহ যোগানোর প্রমাণ রয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে হেফাজতের কর্মকাণ্ড

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য সংগঠনের মতো হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশও কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের মধ্যে কাজ করছে। সাম্প্রদায়িক এ সংগঠনটি নিজস্ব অর্থায়নে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করছে । তাদের পড়ালেখার পাশাপাশি রাতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ারও অভিযোগ আছে হেফাজতের বিরুদ্ধে। হেফাজতে ইসলামের নেতাদের পরিচালিত বিভিন্ন এনজিও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে প্রায় তিন হাজারের মতো মসজিদ, মক্তব, ফুরকানিয়া ও মাদ্রাসা রয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প বিশেষ করে উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্প ২-এ ৫১টি মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে হেফাজত। এমন ছোট একটি জায়গায় এতোগুলো মাদ্রাসা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থাকলেও হেফাজতের নেতারা বলছেন দ্বীনি শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্যই এই মাদ্রাসা-মসজিদগুলো করেছেন।

২০১৮ সালের ৮ মে একাত্তর টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'হেফাজত ইসলামের অর্থায়নে কক্সবাজারের ২৪টি ক্যাম্পে আড়াই হাজার মসজিদ-মাদ্রাসা চলছে। এর মধ্যে

শুধু বালুখালী-২ ক্যাম্পেই রয়েছে ৫১টি। এছাড়াও কুতুপালংয়ের ৬, ৭ ও ৮ নং ক্যাম্পের বিভিন্ন অংশে গড়ে ৪০টি করে মসজিদ-মাদ্রাসা রয়েছে। স্থানীয় হেফাজত নেতা হাফেজ সালামত উল্লাহ বলেন, বিশৃঙ্খল রোহিঙ্গাদের দ্বীনি পথে আনার জন্য আলেম, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দানশীল ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় কক্সবাজারে প্রায় ২ হাজার ৫শ'রও বেশি মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনা করছি আমরা।'

২০১৮ সালের ১ জুন আওয়ার ইসলাম টোয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নির্মিত মসজিদ-মক্তব ও মাদ্রাসা সংরক্ষণের বিষয়ে কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিশনারের সাথে হেফাজত নেতৃবৃন্দের আলোচনা হয়েছে। মিয়ানমারের সামরিকজান্তা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত রোহিঙ্গারা এদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের জান, মাল, ঈমান, ইজ্জত রক্ষার জন্য। তাদের শিক্ষা, ধর্মীয় নিরাপত্তা, মানবিক সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। দেশের আলেমসমাজ তাদের ঈমান আকিদার হেফাজতের লক্ষে নিজেরা অর্থ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মসজিদ, কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কায়েম করেছে বলে বিবৃতি প্রকাশ করেছে হেফাজতে ইসলাম। ২০১৮ সালের ২৯ মে হেফাজতের পক্ষ থেকে আমরা সাক্ষাৎ করেছি কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিশনারের সাথে। হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদীর সাথে ছিলেন, ঢাকা মহানগর হেফাজতের যুগ্মসম্পাদক মাওলানা ফজলুল করিম কাসেমী ও কক্সবাজার জেলা সেক্রেটারি মাওলানা ইয়াসিন হাবিব।'

স্বাধীন আরাকানিস্তান গড়তে হেফাজতের জিহাদীরা প্রস্তুত: রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমার সরকারের হত্যা আর নির্যাতনের প্রতিবাদে নিন্দাজ্ঞাপন করে হেফাজতে ইসলাম রাখাইন রাজ্যকে স্বাধীন ও সার্বভৌম আরাকানিস্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জিহাদ করার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলমান ভাইদের সহযোগিতায় হেফাজতে ইসলাম ঘোষিত এই জিহাদকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতারও দাবি জানিয়েছে হেফাজতের নেতারা। তাদের এই জিহাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়েছে ধর্মভিত্তিক উগ্র মতাদর্শী এই সংগঠনটি।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০১৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমের সামনে জুমার নামাজের পর এক বিক্ষোভে এই আহ্বান জানান সংগঠনটির তৎকালীন নায়েবে আমির প্রয়াত নূর হোসাইন কাসেমী।

২০১৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আরাকানে গণহত্যা চালাচ্ছে। আমি এই গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানাই। সেই সঙ্গে সরকারকে বলব, কূটনৈতিকভাবে সমস্যাটির সমাধান করুন। যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান না হয় তবে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করুন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে হেফাজতে ইসলামের তরুণেরা প্রস্তুত রয়েছে জিহাদের জন্য। রোহিঙ্গাদের ওপর যে জুলুম হয়েছে, তা মেনে নেয়া যায় না। আসুন, আমরা

আরাকানকে স্বাধীন করি। স্বাধীন আরাকানিস্তান এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের সকল মুসলমানের উচিৎ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। সরকার যদি এই জিহাদে নেতৃত্ব দেয়, দেশের মুসলিম জনতা তাতে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হেফাজতে ইসলামের তরুণরা এখনই মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।' আর কালক্ষেপণ না করে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

'বিক্ষোভে আরো বক্তব্য দেন হেফাজতের ঢাকা মহানগরীর সহ-সভাপতি জোনায়েদ আল হাবীব। আমরা আরাকানকে স্বাধীন রাষ্ট্র আরাকানিস্তান হিসেবে দেখতে চাই। রোহিঙ্গাদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তা দেখলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না। রোহিঙ্গা সমস্যার একটাই সমাধান, সেটা হলো জিহাদ। জিহাদের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য আরাকানিস্তান স্বাধীন করে দিয়ে আসতে চাই। আমরা চাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে এই জিহাদের ঘোষণা আসুক। বাংলার মুসলমান এই জিহাদের জন্য প্রস্তুত।

'হেফাজতের ঢাকা মহানগরীর সহ-সভাপতি আব্দুর রব ইউসুফী বলেন, বাংলার মুসলমান স্বাধীন আরাকানস্তান চায়। সরকারের উচিত হবে আরাকানি যুবকদের হাতে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে আরাকানে মুক্তিযুদ্ধের জন্য পাঠানো। আরাকানের স্বাধীনতাই রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান। হাটহাজারী মাদ্রাসার জুনায়েদ বাবুনগরীর প্রতিনিধি মাওলানা রকিবুল ইসলাম সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'রোহিঙ্গাদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তার একমাত্র সমাধান জিহাদ। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, হেফাজতে ইসলাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রকাশিত নির্বাচিত কলাম ও অভিমত

১. রোহিঙ্গা ইস্যু নিরাপত্তার জন্য বিষফোঁড়া

মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.)*

সমস্যাটি প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের কিন্তু সেটি এখন বাংলাদেশের জন্য স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তের বিপরীতে মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনীর তিনটি ক্যাম্পের ওপর সশস্ত্র বিদ্রোহীদের আক্রমণের জের ধরে নতুন করে রোহিঙ্গা ইস্যুটি আলোচনায় এসেছে। আক্রমণে মিয়ানমারের ৯ জন সীমান্ত বাহিনীর সদস্য নিহত হয়। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর ধারণা ওই আক্রমণ চালিয়েছে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠন আরএসও (রোহিঙ্গা সোলিডারিটি অরগানাইজেশন)। ফলে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কম্বিং অপারেশনের জের ধরে গত সপ্তাহে কয়েকশত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু পরিবার বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বিজিবি বেশ কিছু দলকে পুশব্যাক করতে সক্ষম হলেও উদ্বাস্তুদের স্রোত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নতুন ঘটনা নয়। ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার (আগের নাম বার্মা) স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু রোহিঙ্গা পরিবার কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় এসে বসতি গেড়েছে ও সবার সঙ্গে মিশে গেছে। এটা নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। তবে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে মিয়ানমারের মূলস্রোতের সমাজ, রাজনীতি এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে রোহিঙ্গাদের বহু আগ থেকেই একটা বড় দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে আছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে রোহিঙ্গাদের কিছু স্থানীয় নেতা রাখাইন বা আরাকান অঞ্চলকে পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, যদিও সেটি তখন তেমন গুরুত্ব পায়নি। সুতরাং ১৯৪৮ সাল থেকেই মিয়ানমারের সর্ববৃহৎ জাতিগোষ্ঠী বার্মিজ এবং তাদের শাসকদের কাছে রোহিঙ্গারা জাতিগতভাবে সন্দেহের পাত্রে পরিণত হয়। বার্মিজ শাসকদের বৈষম্য, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে বিদ্রোহী সংস্থা, যা এক সময়ে এসে সশস্ত্র সংগঠনে রূপ নেয়। কিন্তু সশস্ত্র তৎপরতা বেশি দূর এগোতে পারে না। কারণ, নিকট প্রতিবেশী কোনো দেশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর সশস্ত্র তৎপরতা চালানো সম্ভব হয় না। সংগত কারণেই চীন ও ভারতের কাছ থেকে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ কখনোই ছিল না। আর পাকিস্তান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের

* রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

সহযোগিতা প্রদানের বিষয় নিয়ে বেশি জড়িত থাকায় রোহিঙ্গাদের প্রতি কখনো গুরুত্ব দেয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার দৃঢ় নীতির কারণেই রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠনের আর কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু পঁচাত্তরের পরে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় টিকে থাকার অবলম্বন হিসেবে উগ্র ইসলামিস্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীসহ জামায়াতের মতো ওয়াহাবিবাদীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ধর্মীয় গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠায় রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠনগুলো নতুন আশায় আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ফলে ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকার সব রোহিঙ্গাকে বিতাড়ন করার উদ্দেশে অভিযান চালায় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। সমস্যা সমাধানের বদলে আরও জটিল করে তোলা হয়। এ সমস্যার সঙ্গে বাংলাদেশকে জড়ানোর ফলে সমস্যা আরও বহুমুখী জটিল রূপ ধারণ করে। সাধারণ রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য মহামানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হলেও সশস্ত্র সংগঠনগুলোর জন্য নতুন সুযোগ আসে। আর এভাবেই মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বাংলাদেশের জন্য মহাযন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যের বোঝা আমাদের মাথায় পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দেশের জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে তা এখন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। গত শতকের আশির দশকের মধ্যভাগে পাকিস্তানের সেনাশাসক জিয়াউল হক প্যান ইসলামিজমের নীতি বিস্তারের পরিকল্পনায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মতো আরএসওকেও করাচিতে অফিস খোলার সুযোগসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেয়, যার ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তখন দ্বিতীয় সামরিক শাসক এরশাদ সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

জামায়াতসহ উগ্র ইসলামীস্টদের পোয়াবারো হয়। রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র গ্রুপগুলো কক্সবাজারে অবাধে চলাফেরা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পায়। এর মধ্যে ১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে ১৯৯১ সালে দ্বিতীয়বার মিয়ানমার সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে আরও প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়। মিয়ানমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সব রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে পারলে তাদের সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়েছে। এটা এখন বাংলাদেশ ও মিয়ানমার, উভয়ের জন্য বড় ধরনের জটিল নিরাপত্তা সংকটের সৃষ্টি করেছে। ২০১২ সালে এক শ্রেণির উগ্র ইসলামীস্টের প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনায় কক্সবাজারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর যে আক্রমণ হয় এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলে তার পেছনেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে রোহিঙ্গা ইস্যু। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে মিয়ানমার সরকারের ভ্রান্ত নীতি থেকেই এ সংকটের উত্পত্তি। একটা জনগোষ্ঠীকে বিনাশ-বিতাড়ন করার প্রচেষ্টা কখনোই কোনো সমাধান দেবে না। তবে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক একটা প্রেক্ষাপট তো রয়েছেই, তার সঙ্গে বাংলাদেশের দুই সামরিক শাসক এবং জামায়াত-বিএনপি সরকার বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে আমাদের জন্য এটা এখন একটা বিষবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে।

একদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেও বাধা হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের ভিতরে এবং বহির্বিশ্বে রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বহু রকম স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উগ্রবাদিতার স্বার্থে এই সংকটকে জিইয়ে রাখতে চায়, পরিপূর্ণ সমাধান চায় না। ফলে দেখা গেল জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কফি আনান কমিশন রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই আরএএসও কর্তৃক মিয়ানমারের নিরাপত্তা ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ এবং তার অজুহাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নতুন করে কম্বিং অপারেশন, নতুন উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সমস্যা। ১৯৭৮ ও ৯১ সালে দুই দফায় প্রায় ছয়-সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পাঠাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণের ভয়ে এবং ভালো সুযোগের সন্ধানে চোরাই পথে প্রতিনিয়তই বিক্ষিপ্তভাবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। মাঝখানে একবার প্রায় দেড় লাখের মতো রোহিঙ্গাকে ফেরত দেওয়া হয়। এখনো প্রায় পাঁচ লাখের মতো অবৈধ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গায় এক রকম স্থায়ী বসতি গেড়ে বসে গেছে। বৈধ শরণার্থী হিসেবে আছে মাত্র ২৮ হাজার। কক্সবাজারের স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে নানা রকম অপকর্ম যেমন মানব পাচার, অবৈধ ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় রোহিঙ্গারাও তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। শোনা যায় বিরাট সংখ্যক রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এটা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য অশনি সংকেত। এভাবে চলতে থাকলে এক সময়ে কক্সবাজারের সংসদীয় আসনগুলোর জয়-পরাজয়ের বড় ফ্যাক্টর হবে রোহিঙ্গা ভোটাররা। রোহিঙ্গাদের তখন আর ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না। যার সুযোগ নেবে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠনগুলো এবং তাতে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ আরও সংকুচিত হয়ে যাবে। স্থায়ী ও অনিরাময়যোগ্য বিষফোঁড়া গায়ে নিয়ে বাংলাদেশকে চলতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় সত্য হলো– মিয়ানমার সরকারের সদিচ্ছা ব্যতিরেকে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিদেশি কোনো সশস্ত্র সংগঠন বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় দেওয়া হবে না, এই নীতির সুযোগ নিয়ে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরত নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতায় এলে সেটা উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক হতো। সহজ সমাধানের একটা পথ বের হতো। বাংলাদেশের বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার এই নীতির বাস্তব প্রতিফলন ভারতের সঙ্গে দেখিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তাই মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশকে আস্থায় নিয়ে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তা একটা ইতিবাচক পথের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু তা না হলে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করলে সব রকম সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর আনাগোনা এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় শতভাগ বন্ধ করা কখনো সম্ভব হবে না। এর সুযোগ নেবে দেশি-বিদেশি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এবং বহুরূপী স্বার্থান্বেষী মহল। এটাই বাস্তব ও কঠিন সত্য কথা। কিন্তু মিয়ানমারের পক্ষ থেকে এখনো তেমন কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

নোবেল জয়ী অং সান সু চির দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর একটা আশা মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবাইকে হতাশ করেছেন। তবে বাংলাদেশকে বসে থাকলে চলবে না। বিষফোঁড়া নিয়ে বসে থাকার যন্ত্রণা বড় কঠিন যন্ত্রণা। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয়, সব ওষুধ ও চিকিৎসার সন্ধান করতে হবে। মিয়ানমারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। বন্ধুসম তৃতীয় পক্ষকে কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে অথবা সুযোগ নিয়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য কেউ যাতে পয়েন্ট অব নো রিটার্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা নীতির আওতায় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

২. রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান কোন পথে

অমিত গোস্বামী*

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মিয়ানমারের ব্যর্থতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা হলেও ভারত সরকার সমর্থনের পৈতা ধরেই রেখেছে। এর কারণ ভারত চায় মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে। এটা নয়াদিল্লির 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' বাস্তবায়নেরই অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ দুটির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ছে ব্যাপক হারে।

মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। কী সেনা আমল, কী গণতান্ত্রিক আমল, সব সময়ই এ সম্পর্ক অটুট ছিল। বলা যায়, মিয়ানমারের পরীক্ষিত বন্ধু চীন। উত্তর কোরিয়া হাজার অন্যায় করেও যেমন সমর্থন পায় চীনের, মিয়ানমারও তেমনি সব কাজে চীনের ভালোবাসা পেয়ে থাকে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ একাধিকবার রাখাইন প্রদেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েও শুরু করতে পারেনি শুধু চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতায়।

গত অক্টোবরে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের নিধনের ঘটনায় জাতিসংঘ তদন্তে এলেও সরকার ও সেনাবাহিনী সমর্থন জানায়নি, কোনো সহযোগিতা করেনি। কিন্তু চীন মনে করে, মিয়ানমার যা করেছে ঠিক করেছে। মিয়ানমারকে সাম্প্রতিক সময়ে চীনের কূটনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার একাধিক কারণও রয়েছে। রাখাইন রাজ্যের কিয়াকফু এলাকায় বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে চায় চীন। অবস্থান জোরদার করতে চায় ভারত মহাসাগরে। শুধু তা-ই নয়, গত এপ্রিলে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের বেইজিং সফরে দুই দেশের মধ্যে অশোধিত তেলের পাইপলাইন নির্মাণ নিয়ে সমঝোতা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। বেইজিং সম্প্রতি আরাকানি রাজনীতিবিদদের সে দেশে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের একজন হলেন আরাকান ন্যাশনাল পার্টির চেয়ারম্যান ড. আয় মং। কট্টর

* কবি ও কলামিস্ট

জাতীয়তাবাদী আয় মং অতিসম্প্রতি রাখাইন প্রদেশে সেনা মোতায়েন এবং ওই এলাকায় জরুরি অবস্থার দাবি জানান। তিনি রোহিঙ্গাবিরোধী মানুষ। রোহিঙ্গাদের ওপর এত অত্যাচার, নির্যাতন চলছে, তবু চুপ চীন।

কাজেই রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য সেই থেকে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ঝুলে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সাত লাখের ওপর রোহিঙ্গা রয়েছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়নের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে। বিশ্ব মিডিয়া রাখাইন রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারায় সেখানে ঠিক কী হচ্ছে তা বলা মুশকিল। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত অনুযায়ী, রাখাইন রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে সে দেশের সেনাবাহিনী 'শুদ্ধি অভিযান' চালাচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিন রোহিঙ্গারা দলে দলে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। রোহিঙ্গারা মূলত পাকিস্তানপন্থি। ১৯৪৮ সালে বৌদ্ধ ধর্মের দেশ বলে রোহিঙ্গারা পাকিস্তান ইউনিয়নে যোগ দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ওরা তখন বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের লাইনে রওনা দিল। ফলে বেশ কয়েকটা মুজাহিদ গ্রুপের জন্ম হয়েছে, সন্ত্রাস করেছে, আত্মসমর্পণ করেছে। এই সন্ত্রাসী মুজাহিদদের দাবি কী ছিল? ওরা মুসলিম, ওরা মিয়ানমারের নাগরিকত্ব মানে না, ওরা রাখাইন প্রদেশ নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। রোহিঙ্গাদের হামলায় মিয়ানমারের এথনিক বার্মিজরা সব সময় অতিষ্ঠ হয়ে থাকত। ২০১২ সালে যে ভয়াবহ রায়ট হলো সেটা শুরু করেছিল রোহিঙ্গারা। ২৮ মে মা থিডা টিয়ে' নামে একজন রাখাইন নারীকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা গ্যাং র‍্যাপ করে হত্যা করেছিল। সেটার পর অহিংস বৌদ্ধ তথা রাখাইনরা তাৎক্ষণিক ক্ষোভে আক্রমণ করে তাদের ওপর। সেখানেই বিষয়টি থেমে যেত, কিন্তু ৯ জুন ২০১২ মসজিদে নামাজের পর রোহিঙ্গা মুসলিমরা মংডু শহরে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে, যা ১০ জুন বেপরোয়াভাবে চলে রাখাইনদের ঘর-বাড়ির ওপর। ১১৯২টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। রাখাইনরা ও পুরো দেশ তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়ে রোহিঙ্গাদেরও ১৩৩৪টি ঘর পুড়িয়ে দেয়। রোহিঙ্গা মুসলিমরা বেশি বেপরোয়া ছিল মূলত মনে করেছিল, টিকতে না পারলে পেছনে বাংলাদেশের ভূমি আছে। সে জন্য ওরা কখনো আপসকামী হয়নি। ওরা সেদিন টিকতে না পেরে কয়েক লাখ বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়।

১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৮ সালে সামরিক শাসক জিয়ার সরকার মুসলিম বিশ্বে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সামরিক সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাবে বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়। বার্মা থেকে পালিয়ে আসা দুই থেকে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা তখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার ও উখিয়ায় উদ্বাস্তু হিসেবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশন সহযোগিতা করতে শুরু করে। এর পর ১৯৯১-৯২ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের আধাসামরিক বাহিনী নাসাকা এবং অন্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত আক্রমণের পর নতুন করে আবার প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ

রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে বলে জাতিসংঘ স্বীকার করে। অথচ কক্সবাজারের স্থানীয়দের মতে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ৪ থেকে ৫ লাখের বেশি। বাস্তবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বর্তমানে ৭ লাখেরও বেশি।

যারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছিল তাদের কর্মকাণ্ড কী? সত্তর দশকের শেষদিকে পাকিস্তানভিত্তিক ধর্মান্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ (হুজি) বাংলাদেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জামায়াতে ইসলামী ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে নিয়োগ করে। আফগান ফেরত রোহিঙ্গা যোদ্ধারা পরবর্তী সময়ে রাখাইন প্রদেশে ঢোকে ও একাধিক জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো রাখাইন অঞ্চলে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য নতুন করে আবার সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। এসব সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও) ও আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলএফ) জাতীয় বেশ কয়েকটি সংগঠন। যেগুলো আরাকান অঞ্চলে সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালিত করে বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল থেকে। মিয়ানমার সরকারের অভিযোগ হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের বেনামি জঙ্গি সংগঠন জেএমবি, জেএমজেবি, হুজি এবং পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তৈয়বা, জইসী মুহাম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলো এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেয়। আর এদের অর্থ সহায়তা প্রদান করে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও তুরস্ক। ফলে এই রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনগুলো সক্রিয়ভাবে মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে নানা কিসিমের জঙ্গি অপারেশন পরিচালনা করে।

তা হলে উপায় কী? সাধারণ রোহিঙ্গারা এই জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষের শিকার হতেই থাকবে? এই ছিন্নমূল মানুষদের দেশে দেশে প্রত্যাখ্যান, যখন তারা খিদে তেষ্টায় মারা যাচ্ছেন তখনো রেহাই নেই– কোনো দেশই তাদের দায় নিতে চাইছে না। রাশিয়া থেকে চীন, মার্কিন দেশ থেকে আরব বিশ্ব সবাই মিয়ানমারের লোভনীয় সম্পদ ব্যবহারে আগ্রহী। বিনিয়োগে আগ্রহী। আগামী দশ বছরের মধ্যে মিয়ানমারে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। এমন একটা অবস্থায় ব্যবসাবান্ধব আন্তর্জাতিক রাজনীতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে কখনই চাপ দিতে চাইবে না বরং ক্ষমতাধর দেশগুলো রোহিঙ্গা ইস্যু ঝুলিয়ে রাখবে যাতে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক (!), ব্যবসাবান্ধব আর সুখে অভ্যস্ত মিয়ানমারকে বাগে আনা সহজ হয়। সে জন্য চীন জানিয়ে দিয়েছে, জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ উত্থাপনে তারা বাধা দেবে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মিয়ানমারের বাড়তি গুরুত্বের কারণ হলো বিশ্বশক্তি হওয়ার পথে দ্রুত ধাবমান চীন ও ভারতের অবস্থান এই অঞ্চলে। সঙ্গত কারণেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত ও চীন উভয়েই তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। তা ছাড়া মিয়ানামার ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অভ্যন্তরে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে তেল-গ্যাসের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে জনশক্তি এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও এসব দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং মিয়ানমারে কৃষি উপযোগী জমির তুলনায় জনসংখ্যা কম হওয়ায় এ দেশগুলোতে বিপুল জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। ফলে ওইসব দেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। কাজেই কী দরকার মিয়ানমার নিয়ে মাথা ঘামানোর? গত কয়েক মাসে রাখাইনে নতুন করে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর দিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। তাদের মতে, রোহিঙ্গা ইস্যুটি অত্যন্ত জটিল। তাই এই ইস্যুতে ভারতের জড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত আর এমন নয় যে, ভারত মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর আচরণকে প্রভাবিত করার মতো সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। কাজেই যে কোনো ইস্যুতে তারা কেন ভারতের কথা শুনবে? কিন্তু রূঢ় বাস্তব হলো মিয়ানমারের নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব থেকেই দিল্লির এই নীরবতা। বঙ্গোপসাগর থেকে চীনকে দূরে রাখা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির ক্ষেত্রে মিয়ানমারের গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের মতো ঘটনার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ইস্যুটি তার ভোটব্যাংককে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না। এছাড়া ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থও রয়েছে, যা নির্ভর করছে মিয়ানমারের শাসকদের সদিচ্ছার ওপরও। ২০১৫ সালে মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর বহরের ওপর নাগা বিদ্রোহীদের হামলার ঘটনা ঘটে। এর পর ভারতীয় বাহিনী ইয়াঙ্গুনের নীরব সম্মতিতে মিয়ানমারের সীমান্তে গোপন অভিযান চালায়। ওই সমঝোতা ক্ষতিগ্রস্ত হোক ভারত তা চায় না।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশে একটি মহল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোরও চেষ্টা করছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ছবি ছড়িয়ে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রতি অনুকম্পা ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের মিত্ররা নানাভাবে বাংলাদেশে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। এবারও শুধু মানবিকতা দেখিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে নতুন করে সীমান্ত খুলে দিয়ে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশ সব সময় রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা করেছে। ২০১২ সালে মিয়ানমারে জাতিগত দাঙ্গার সময়ও বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়েছে। আজও প্রতিদিন শত শত রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশু ভিটেমাটি ছেড়ে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে, ডুবে মারা যাচ্ছে। শিশুদের নিথর দেহ বয়ে নিয়ে আসছেন স্বজনরা। জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে রোহিঙ্গাদের বাড়ি, পলায়নপর নারী-শিশুদের ওপর চালানো হচ্ছে নির্বিচারে গুলি। তবু নির্বিকার মাও সেতুংয়ের চীন ও মহাত্মা গান্ধির ভারত।

নরেন্দ্র মোদির এই সফরের আগেই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। শরণার্থীদের ব্যাপারে যে ভারতের নীতির কোনো বদল এখনো হচ্ছে না, সেটা জানিয়েছেন বিদেশ দপ্তরের যুগ্ম-সচিব। কাজেই রোহিঙ্গা সমস্যায় সবাই নীরব আছে ও থাকবে। দায় কার ওপর বর্তাচ্ছে? হ্যাঁ, শুধু বাংলাদেশের ওপর। কারণ পূর্বসূরিদের নির্বুদ্ধিতায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা আজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, আরও

আসছে। আমরা জানি যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্ট মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড, জঙ্গি হামলা, যুদ্ধ, অস্ত্র ব্যবসা, তেল ব্যবসা এবং সর্বোপরি মানুষ হত্যার পেছনে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি ও কূটকৌশল জড়িত। রোহিঙ্গা ইস্যু দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্ট সেই রাজনীতিরই অংশ। এটাকে সস্তা মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই। এটাকে আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ কূটনৈতিক কৌশল দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে এবং উদ্যোগী হতে হবে বাংলাদেশকেই। কোনো অবস্থায়ই ভারত বা চীন উদ্যোগ নেবে এ দুরাশা করাটাই বাতুলতা। করলে সেটা ঐতিহাসিক ভুল হবে।

আমাদের সময়, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৩. অ্যাডভেঞ্চারিজমের সুযোগ নেই

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী*

রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশ প্রায় দশক ধরে ভুগছে। যখনই রাখাইন স্টেটে কোনো অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে, তখনই তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে 'পুশইন' করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা মাঝে মধ্যেই মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা, সংলাপ করেছি, কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছি; কিছু কিছু তারা ফেরতও নিয়েছে। কিন্তু যতজনকে তারা ফেরত নিয়েছে; এই সময়ে তার চেয়ে আরও বহুগুণ বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের ভেতর ঠেলে দিয়েছে। আগের কোনো ঘটনায় চলে আসা রোহিঙ্গাদের অধিকাংশ ফেরত না নেওয়ার আগেই তার চেয়ে বেশি রোহিঙ্গা ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরেও তাদের কয়েকটা ঘাঁটিতে হামলা হয়েছিল। সেই অজুহাতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগই নেওয়া সম্ভব হয়নি। মিয়ানমার এ ব্যাপারে আলোচনায় আসতেই চাইছিল না। তার আগেই আবার এত বড় ঢেউ এসে হাজির। আমি বলব, এবারের ঢেউ গত চার দশকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। গত ১৫ দিনেই এই সংখ্যা জাতিসংঘের হিসাবেই তিন লাখের মতো। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবে, বলা বাহুল্য।

রাখাইন স্টেটে এবারের অস্থিতিশীলতা এমন সময় শুরু হলো, যখন কফি আনান কমিশন তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং মিয়ানমারের পত্রপত্রিকার খবর অনুসারে সুচি সরকার কমিশনের সুপারিশমালার প্রতি প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৩০টি পুলিশ ও সেনা চৌকিতে একযোগে হামলা চালানো হয় বলে মিয়ানমার অভিযোগ করেছে। তারপরই সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনপদগুলোতে নির্বিচারে হামলা চালানো শুরু করে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় উগ্রপন্থি ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা আসলে রাখাইন রাজ্য ও মিয়ানমার সরকারেরই মদদপুষ্ট। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়াও

---

* কোষাধ্যক্ষ, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ও সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

হামলায় জাতিসংঘের হিসাবেই এক হাজারের বেশি রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি।

এসব হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও সহিংসতার মতোই ভয়াবহ আরেকটি দিক হচ্ছে, গোটা রাখাইন রাজ্য এখন বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে কী হচ্ছে, আমরা জানি না। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন বা বিবিসির মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম থেকে আমরা কিছু কিছু চিত্র পাচ্ছি কিন্তু সেগুলো কেবল লোকালয়ের বা আশপাশের। প্রত্যন্ত এলাকায়, পাহাড়ে বা জঙ্গলে কী হচ্ছে– আমরা জানি না। লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে যে ভীতিকর চিত্র বর্ণনা করছে, তাতে অনুমান করা কঠিন নয় যে, আরও মানুষ প্রাণভয়ে লুকিয়ে রয়েছে। দিনের পর দিন তাদের খাদ্য ও পানীয় সংকটে ভুগতে হচ্ছে। এবারের সহিংসতা শুরুর পরপরই রাখাইনে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সরিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন যা পাচ্ছি, তা প্রাথমিক তথ্য নয়। পূর্ণাঙ্গ চিত্র তো নয়ই কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যে ও চিত্রে এটাকে গণহত্যাই বলা যায়।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে এই গণহত্যা দেখা অত্যন্ত আতঙ্কজনক। এটা বিশ্বমানবতার জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। মিয়ানমার সরকার ভেবেছে, তারা এটা করেও পার পেয়ে যাবে। দুঃখজনক হচ্ছে, এর আগে তারা বারবার পার পেয়েও গেছে। বাংলাদেশের দিক থেকে এই সংকট কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় নয়। কারণ এটা আমাদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার সমস্যা। রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে মিয়ানমারের বাইরে বাংলাদেশই সবচেয়ে বড় দুর্ভোগের শিকার। আগেই বলেছি, বাংলাদেশ এই সংকটের কারণে চার দশক ধরে ভুগছে। বিশ্বের অন্যান্য অংশেও এভাবে শরণার্থী সংকট তৈরি হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভূমি অনেক বেশি। বাংলাদেশ নিজেই তার জনসংখ্যা নিয়ে চাপের মুখে রয়েছে। আমরা সম্প্রতি জাতীয়ভাবে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি; কিন্তু এখনও অনেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। এর ওপর আরও কয়েক লাখ বাড়তি মানুষের ভার নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই।

আমি মনে করি, বাংলাদেশকে সবকিছুর আগে নিজের স্বার্থ দেখতে হবে। আমরা মানবিক হবো; কিন্তু সেটা নিজেদের বিপন্ন করে নয়, নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করে নয়। যারা শরণার্থী বা উদ্বাস্তু হিসেবে আসছে, তাদের আমরা সাময়িক আশ্রয় দিতে পারি কিন্তু এই ভার আমরা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে পারব না। আমি মনে করি, যারাই আসছে, তাদের অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারা যাতে মূলধারার মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও শরণার্থীরা স্রোতের মতো প্রবেশ করেছে। কিন্তু দেখা যাবে, তারা প্রত্যেকের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করেছে। আগে থেকে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আছে; তাদেরও চিহ্নিত করে মূলধারা থেকে আলাদা করতে হবে। ঠেঙ্গারচরে রোহিঙ্গাদের বসতি স্থাপনের যে উদ্যোগ আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি, আমি মনে করি সেটা যথার্থ। তবে মনে রাখতে হবে, ওই ব্যবস্থাও সাময়িক। আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রোহিঙ্গাদের নিজভূমে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রয়োজনে নিজের অর্থে হলেও রোহিঙ্গাদের

রেজিস্ট্রেশন এবং অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে দিতে হবে। তখন জাতিসংঘসহ অন্যান্য পক্ষও সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা।

এখন রোহিঙ্গারা যেভাবে বাংলাদেশে থাকছে, তা কেবল আর্থ-সামাজিকভাবে আমাদের জন্য নেতিবাচক নয়, নিরাপত্তার দিক থেকেও বিপজ্জনক। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আমরা রিপোর্ট দেখছি, বিভিন্ন জঙ্গি ও উগ্রবাদী গোষ্ঠী তাদের দলে ভেড়াতে চাইছে। উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের টিকে থাকার প্রয়োজনেও নানা রকম আপস করতে হয়। নিবন্ধনবিহীন রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা আরও বেশি। হাংরি ম্যান আর অ্যাংরি ম্যান। হতাশা থেকে তারা উগ্রবাদীদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে।

আমি মনে করি, দেশীয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালানোর পাশাপাশি ভারত, চীন, থাইল্যান্ডে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যাওয়া উচিত। তাদের বোঝানো উচিত যে, বাংলাদেশ এই ভার একা বহন করতে পারবে না। আর রাখাইনে অস্থিতিশীলতা মানে, গোটা অঞ্চলের জন্য অস্থিতিশীলতা। মিয়ানমারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখা উচিত এবং কূটনৈতিকভবে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা উচিত।

জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়াও ভারত, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ একা মিয়ানমারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারবে না। অনেকে ওআইসির কথা বলছেন কিন্তু আমার এ ব্যাপারে খুব বেশি আস্থা নেই। খোদ মধ্যপ্রাচ্যেই সংকট মোকাবেলায় এই সংস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

মূল কথা হচ্ছে, রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য খুবই বড় ও দীর্ঘমেয়াদি সংকট। এ ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চারিজমের সুযোগ নেই। অনেকে বলছেন, রাখাইন স্টেটে রোহিঙ্গাদের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বাংলাদেশের কথা বলা উচিত। আমি মনে করি, এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাংলাদেশকে শুধু নিশ্চিত করতে হবে, শরণার্থীর ঢেউ যেন আমাদের বইতে না হয়। এর আগে আফগান জিহাদে বাংলাদেশ থেকে কিছু সংখ্যক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট তরুণ গেছে। এর ফলে জঙ্গিবাদ এ দেশে আমদানি হয়েছে। এই বিভ্রান্ত তরুণরাই কিন্তু পরে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একসময় বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। সেটাও আমাদের আইন-শৃঙ্খলার জন্য ব্যুমেরাং হয়েছে। জঙ্গিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যোগসূত্র ও অস্ত্রের সংযোগ তৈরি হয়েছিল। রাখাইনে অসন্তোষের আগুনে ঘি ঢালার দায়িত্ব বাংলাদেশের নয়।

রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন ও নজরদারি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ওই ইস্যুতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নজরদারি রাখতে হবে। রাখাইনের বৌদ্ধ ও মুসলিম বা রাখাইন ও রোহিঙ্গা বিরোধের ধোঁয়া যেন আমাদের এখানেও ভেসে না আসে, তা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকট ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই বোঝা আরও ভারি করা উচিত হবে না।

সমকাল, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৪. রোহিঙ্গাদের সর্বনাশ জামায়াত বিএনপির পৌষ মাস

জাফর ওয়াজেদ*

নাফ নদীর বানের মতো পালে পালে দলে দলে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে বাংলাদেশে। বর্মী বাহিনীর অমানবিকতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন এ রোহিঙ্গারা। তাদের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়া কারও কারও পালে হাওয়া লাগিয়েছে। বিশেষ করে জামায়াত-শিবির এবং তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র বিএনপি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আত্মগোপনে থাকা জামায়াত-শিবিররা সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। বিএনপির প্রাণেও যেন জোয়ার জেগেছে। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কোনো ধরনের নোংরা রাজনীতি না করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ তথা সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তার মতে, রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিএনপি রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতে ওঠেছে। অবশ্য এই ওঠা তাদের জন্য স্বাভাবিক।

তাই বিরত থাকার এই আহ্বানে বিএনপি যে থেমে যাবে না তা স্পষ্ট। কারণ বিএনপি একটি মোক্ষম ইস্যু হাতে পেয়েছে। পেট্রোলবোমা মেরে অসাধ্য সাধন করতে না পারার ব্যর্থতা থেকে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে খাবি খেতে খেতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম; তখন তাকে তীরে উঠে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার পথ করে দিয়েছে এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ইস্যু। ষড়যন্ত্র যেহেতু বিএনপির মজ্জাগত রাজনৈতিক চর্চা, যার বিস্তার ক্ষমতায় আসীন হতে সহায়তাও করেছে। তাই সেই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন লক্ষণ দলটির মধ্যে কস্মিনকালে গড়ে উঠেনি, উঠবেও না। আর রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হয়ে এ দেশে আসা শুরু হয় ক্ষমতা দখলদার ও রাজাকার পুনর্বাসনকারী সাময়িক জান্তা শাসক জিয়ার আমলে ১৯৭৮ সালে। সৌদিসহ বিদেশি সাহায্য-সহায়তা মিলবে বিপুল পরিমাণে– সেই আশাবাদ থেকে জিয়া সীমান্ত খুলে দিয়েছিলেন। রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের বন ও পাহাড় কেটে বসত গড়ে তোলে সৌদি অর্থ সহায়তায়। জিয়া রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগও নেন। গড়ে উঠে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন। তারা অস্ত্র সহায়তাও পায় কিন্তু আরাকানের স্বাধীনতার জন্য তারা সামান্য অভিযানও চালায়নি। খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আবার সীমান্ত অবাধ করে দেয়া হয় ১৯৯২ ও ২০০৪ সালে।

তখন লাখে লাখে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। বিএনপি-জামায়াত সরকার অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সে সুযোগে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। দুর্বল কূটনৈতিক কারণে বিষয়টি নিস্পত্তিতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগও করতে পারেনি। এর আগে শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর জন্য ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। তখন কয়েক হাজার

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)

রোহিঙ্গাকে ফেরত নেয়া হয়। আর ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের অনাগ্রহের কারণে মিয়ানমার তাদের তালিকাভুক্ত নাগরিক রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে আবারও অস্বীকৃতি জানায়। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বন্ধ ঘোষণা করে মিয়ানমার। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনও চাইছিল প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখার জন্য। শরণার্থী না থাকলে সংস্থাটিকে যে ডালপালা গুটিয়ে নিতে হবে সেই শঙ্কায় তারা ফেরত পাঠাতে অনুৎসাহী ছিল। পরবর্তীকালে রোহিঙ্গারা নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। ফলে তাদের সম্পর্কে সর্বত্র নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

এমনিতে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা নেই বলে ভাল-মন্দ বোধে ঘাটতি রয়ে যায়। এরা ধর্মের ক্ষেত্রেও কট্টর। সৌদি আরবের ওহাবী মতবাদের অনুসারী হয়ে আরাকানে তারা স্বতন্ত্র অবস্থান রাখতে সচেষ্ট ছিল। জনজীবনের মূলধারায় সংযুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেশি বৌদ্ধ এবং মগদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নেই। ফলে এরা প্রায় নিজেদের মধ্যেই সঙ্কুচিত রয়ে গেছে। এদের কোনো নেতা নেই বলে রাজনৈতিকভাবে কিছুই মোকাবেলা করতে পারছে না। শরণার্থী হিসেবে নিবন্ধিত বা নিবন্ধনহীন রোহিঙ্গারা জাতিসংঘের আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসলেও সৌদি আরবও অর্থ পাঠাত। যা জামায়াতের মাধ্যমে বিতরণ হতো। এই সুবাদে জামায়াত সংযোগ গড়ে তোলে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে। তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পাকিস্তানের আইএসআই। কিন্তু অলস রোহিঙ্গারা বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করার মতো দৈহিক শক্তিমত্তা ধারণ করে না বলেই কোনো অভিযান চালাতে পারেনি। বিএনপির ছত্রছায়ায় রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের নেতারা চট্টগ্রামে বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করে। কিন্তু আরাকানীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে পারেনি যেমন, তেমনি ব্যাপকহারে রোহিঙ্গা নিধনের জন্য মিয়ানমারের বিররুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতেও অভিযোগ করতে পারেনি। মূলত রোহিঙ্গাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি কখনই গড়ে ওঠেনি তাদের মধ্য থেকে।

বিএনপি তখন ক্ষমতায়। একানব্বই সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা থেকে ফোন করেন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক আতাউস সামাদ। জানালেন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের প্রতিনিধি শ্রীলঙ্কার বংশোদ্ভূত আরাপান আররুলাই চট্টগ্রামে যাচ্ছেন, তাকে সহযোগিতা যেন করি। আমি তখন দৈনিক সংবাদের চট্টগ্রাম ব্যুরো চীফ। নিউজ কভার করতে সাতাশি সালের বিশ জুলাই চট্টগ্রাম যাই এবং সেখানেই রয়ে যাই। বিবিসি সাংবাদিক রোহিঙ্গা নেতাদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের তৎকালীন সভাপতি সংবাদ অফিসে বসে বিবিসিকে যে সাক্ষাতকার প্রদান করেন, তাতে বলেছিলেন, রোহিঙ্গাদের মধ্যে সেই মনোবল নেই, যা থাকলে প্রতিরোধ গড়া যায়। এমনিতে তারা দেশে দুস্থ ও গরিবী হালে বসবাস করত। শরণার্থী জীবনে আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। সুতরাং সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা কঠিন বলেই অর্থ ও অস্ত্র বল থাকা সত্ত্বেও মিয়ানমারের জান্তা শাসকের বিররুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া যাচ্ছে না। রোহিঙ্গারা কখনই লড়াকু জাতি ছিল না। বরং তারা চিরকালই নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় জাতি হিসেবে পৃথিবীতে টিকে আছে। রোহিঙ্গা নেতার সেদিনের ভাষ্য স্পষ্ট

করেছিল যে, উদ্বাস্তু জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ তাদের জন্য লৌকিকভাবে খোলা নেই।

পাকিস্তান যুগে রোহিঙ্গাদের নেতা ছিলেন কাশেম রাজা। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা শাসক আইউব খানের সহায়তায়। দু'একবার হামলা চালিয়েও কোনো ধরনের সুবিধে করতে না পেয়ে কাশেম রাজা পাকিস্তান চলে আসেন। তিনি তার অনুগতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় কিন্তু পাকিস্তান তার বন্ধু চীনের চাপে এই অবস্থান থেকে সরে যায়। এমনকি কাশেম রাজাকে আটক করে কারারুদ্ধ করা হয়। তার অবর্তমানে আর কোনো নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি এবং তা অদ্যাবধিও নয়।

২০০৬ সাল থেকে রাখাইনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলেও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। ২০০৮ সাল থেকে অদ্যাবধি সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে এবার ব্যাপক মাত্রায় শরণার্থী এসেছে। এদের আগমন দেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এবার তিন লাখ উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ভাবিয়ে তুলছে বিশ্ববাসীকে কিন্তু উল্লসিত করছে বিএনপি ও জামায়াতকে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তারা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করছে। তাতে কেউ বাধা দেয়নি। দেয়ার কথাও নয়। একই ইস্যুতে সভা, সমাবেশ, মিছিল করার সুযোগও এসে গেছে। যা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার কাজটুকু এগিয়ে নেয়ার পথ করে দিচ্ছে এটা হতেই পারে। যা কোনো দোষেরও নয়। মানবতার ডাকে সাড়া দেয়া রাজনৈতিক দলের কর্তব্য কিন্তু রোহিঙ্গাদের কেন্দ্র করে এক ধরনের 'ধর্মীয় জিগির' চালানোর চেষ্টাও চলছে। রোহিঙ্গারা মুসলমান, তাই তাদের নিধন করা হচ্ছে বলে জজবা তোলা হচ্ছে, কিন্তু আগত অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ও রয়েছে। খ্রীস্টানও থাকতে পারে এদের মধ্যে। সুতরাং ধারণা করা যায়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'রোহিঙ্গা' খেদাও এবং গণহত্যা চালানো হচ্ছে। এই মুসলমানদের ধোয়া তুলে বিএনপি ফায়দা নিতে চাচ্ছে। তাদের সহায়তাকারী ধর্ম ব্যবসায়ী দলগুলো মাঠে নেমেছে ইতোমধ্যে। সমাবেশ ও মিছিল করছে। যাতে ধর্মীয় উস্কানির ভাষাও উচ্চারিত হচ্ছে। এমনকি আরাকান দখলের হুমকিও দিচ্ছে। তলে তলে এরা যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে মদদ দিতে পারে তাদের ভাষা তাই প্রমাণ করে। তারা দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচি দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতে চাচ্ছে। এমনকি আইএসের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশে এরা সম্ভবত পিছপা হবে না। তারা ক্রমশ দলে ভারি হয়ে উঠতে পারে ধর্মের জজবা ধরে। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে শিবির কর্মীরা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছে। দলে দলে লোক যাতে এগিয়ে আসে সেই আহ্বান জানাচ্ছে। সিরিয়ায় আইএস যা করেছে, এখানে তারা তা করার সুযোগ হয়তো পাবে না কিন্তু ইসলাম রক্ষার জন্য নারী-পুরুষদের এগিয়ে আসার নামে আইএস চেতনাকে সম্প্রসারিত করতে পারে। যা বিপজ্জনক এবং অবশ্যই ভয়াবহ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে সামাজিক মাধ্যমে যেসব বক্তব্য আসছে তাতে স্পষ্ট হচ্ছে কে কোন পন্থী। জামায়াত-শিবির ও বিএনপির লোকজনের ভাষা অতীব উগ্র। আবার সরকারী দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী জামায়াত-শিবিরপন্থীদের মনোভাবও

স্পষ্ট হচ্ছে। ছাত্রলীগের এক কেন্দ্রীয় নেতা ফেসবুকে লিখেছেন, রোহিঙ্গা মুসলিমদের এ দেশের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের রাখাইনে পাঠিয়ে দিতে। তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে সংগঠনের আরও কেন্দ্রীয় নেতা রয়েছেন। ছাত্রলীগে যে শিবিরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে যে প্রচার রয়েছে এসব স্ট্যাটাস তা স্পষ্ট করে যে, বিষয়টি অসত্য নয়। মিয়ানমারের বিররুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফেসবুকে এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এসবই জঙ্গিবাদের বিকাশ ও বিস্তারের সহায়ক। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য প্রদানের নামে ধর্ম ব্যবসায়ী দল ছাড়াও ধর্মের ধ্বজাধারী অনেক এনজিও ক্যাম্পগুলোতে যাতায়াত করছে। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ বলে মনে হলেও আসলে তা ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতারই অংশ। রোহিঙ্গাদের নিয়ে নানা সিন্ডিকেট গড়ে উঠছে। এদের অনেকে পাচার হয়ে যাবে অতীতের মতোই বিভিন্ন দেশে।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোহিঙ্গা ইস্যুকে জটিল করে তোলার মধ্যে এক ধরনের ফায়দা অর্জনের অপচেষ্টাও রয়েছে। সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা বিএনপি-জামায়াতের সহযোগিতায় দেশে অরাজক অবস্থা তৈরি করে অস্থিতিশীলতা বাড়াতে চাইবে। পেট্রোল বোমাকে এখন জঙ্গিতে পরিণত করার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করবে না তারা। জেএমবি, নতুন জেএমবি, হিযবুত তাহরীরসহ জঙ্গি সংগঠনগুলো অসহায়, দরিদ্র, অশিক্ষিত রোহিঙ্গাদের দলে ভেড়াতে সক্রিয় হতে পারে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারকে সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মানুষকেও এ ক্ষেত্রে সংগঠিত করতে হবে। জনগণকে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। রোহিঙ্গাদের সর্বনাশের এইকালে জামায়াত-বিএনপির হাওয়া বদলের পৌষমাসের অশুভ কর্মকান্ড বিষয়ে দেশ ও জাতির জন্য সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই।

জনকণ্ঠ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৫. রোহিঙ্গা ॥ কী বলছে আনান কমিশন!

মনজুরুল আহসান বুলবুল*

সমস্যাটি পুরনো। ইতিবাচক অগ্রগতিটি হলো; যারা সমস্যাটি সৃষ্টি করেছেন তারা সমস্যার গভীরতাটি বুঝতে পেরেছেন এবং সমাধানের জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছেন। এ পর্যন্ত এসে সমাপনী মন্তব্যটি করা গেলে খুবই ভাল হতো কিন্তু নাফ নদে অনেক জল শুধু গড়ায়নি, হায়েনাদের ছোবলে সেই জল রক্তবর্ণ হয়েছে, মাছ নয় ভেসে উঠছে মৃত রোহিঙ্গাদের লাশ; ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত না হয়েও সমস্যার ভারে জবুথবু বাংলাদেশ। যে পর্যায়ে এসে এই লেখা সেই পর্যায়ে সমস্যার সমাধান সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হচ্ছে নতুন দাবি : রাখাইন রাজ্যে যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের বিচার করতে হবে।

* এডিটর ইন চিফ, টিভি টুডে ও সাবেক সভাপতি, বিএফইউজে

সমস্যার গভীরতার এই পর্যায়ে এসেও যেহেতু সমাধান খুঁজতেই হবে; সেহেতু মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আপাতত; জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট ও তাদের ৮৮ দফা সুপারিশকেই সমাধান সূত্র বলে মানছেন সবাই। ইতিবাচক দিকটি হলো: এই কমিশন বা সুপারিশগুলো কোনো চাপিয়ে দেয়া বিষয় নয়। আর সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য মিয়ানমার সরকার যে আগ্রহ দেখিয়েছে তাতেও কোনো আন্তর্জাতিক চাপ ছিল না।

কফি আনান কমিশন কিভাবে হলো ঃ ২০১৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচির আনুষ্ঠানিক অনুরোধে কফি আনান ফাউন্ডেশন এবং সুচির দফতর যৌথভাবে রাখাইন রাজ্যের জন্য উপদেষ্টা কমিশন নামে এই কমিশন গঠন করে। নয় সদস্যের এই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান, অপর আট সদস্যের মধ্যে ৬ জন মিয়ানমারের; নাগরিক বাকি দু'জন আন্তর্জাতিক সদস্য। এটিই কফি আনান কমিশন নামে পরিচিত লাভ করে।

কেন এই কমিশন ঃ কমিশনের কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়, তারা রাখাইন রাজ্যের সব সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থান বিশ্লেষণ করবে এবং সেখানে যে সহিংসতা হচ্ছে, মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে ও সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করবে, পাশাপাশি কমিশন এই অঞ্চলের অনুন্নয়ন ও পিছিয়ে পড়ার কারণগুলো চিহ্নিত করবে। এই কাজ সম্পাদনের জন্য কমিশনকে সময় বেঁধে দেওয়া হয় এক বছর।

কমিশন কিভাবে কাজ করেছে ঃ এই দায়িত্ব পালন করার জন্য কমিশন বড় দাগে তাদের কাজের পাঁচটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে। এগুলো হচ্ছে সংঘাত নিরসন, মানবিক সাহায্য, পুনরেকত্রীকরণ, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং উন্নয়ন। অং সান সুচির অনুরোধে কমিশন রিপোর্টে 'রোহিঙ্গা' বা 'বাঙালি' পরিচিতিটি ব্যবহার করেনি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বলা হয়েছে 'মুসলিম' বা 'রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী।' 'কামান' বলে যে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে চিহ্নিত এই রিপোর্টে তাদের কথা বলা হয়নি। কার্যকালে কমিশন রাখাইন রাজ্য সরকার, রাখাইন পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, গ্রামের সমাজপতি, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, রাজ্যেও প্রধান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর (কামান, চীনা, হিন্দু এবং ম্রো) প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিশন মিয়ানমারের রাষ্ট্রপতি, স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি, সেনাবাহিনী প্রধান এবং রাখাইন রাজ্যে শান্তি স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সমস্যার জটিলতা বুঝতে মিয়ানমারের সীমা ছাড়িয়ে ঃ রাখাইন রাজ্যের সমস্যাটি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হলেও তার প্রভাব পড়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে। সে কারণে আনান কমিশন সমস্যার গভীরতা বোঝার জন্য এই সমস্যার সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জড়িয়ে পড়া দেশগুলোর সঙ্গেও মতবিনিময় করে। বাংলাদেশ সফরকালে কমিশন সদস্যরা কক্সবাজোরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং ঢাকায় উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। ব্যাংককে থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে

বৈঠক ছাড়াও কমিশন চেয়ারম্যান ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। কমিশনের সদস্যরা ভারত, চীন এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি ছাড়াও জাতিসংঘ কর্মকর্তা, মিয়ানমারভিত্তিক নানা আন্তর্জাতিক সহায়তা গোষ্ঠী, এনজিও, আঞ্চলিক সংস্থা এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কমিশন মিয়ানমার ও রাখাইনের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ঢাকা, কক্সবাজার, ব্যাংকক, জেনেভায় ১৫৫টি বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রায় ১১০০ জনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

শুরু থেকেই নানামুখী জটিলতা ঃ একটি শুভ ইচ্ছা থেকে এই কমিশন গঠন করা হলেও শুরু থেকেই এই কমিশনকে নানা চড়াই-উৎরাই পথ পাড়ি দিতে হয়। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সনের আগস্ট পর্যন্ত কমিশনের কার্যকালে মাঝে মধ্যেই পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। রাখাইনে যেমন নানা সহিংস ঘটনা ঘটেছে পাশাপাশি কমিশনের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য নানা প্রকাশ্য তৎপরতাও চালানো হয়েছে। কমিশন কাজ শুরুর সময়েই মিয়ানমার পার্লামেন্টে এই কমিশন নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্রস্তাব আনা হয়। ওই প্রস্তাবটির পক্ষে অবস্থান নেয় আরাকান ন্যাশনাল পার্টি, সেনা সমর্থিত বিরোধী দল ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডি) এবং পার্লামেন্টে সেনাবাহিনী থেকে মনোনীত ১১০ জন সদস্য। দেখা যাচ্ছে বেসামরিক নেতা অং সান সুচি এই কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিলেও শুরু থেকেই মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, সেনা সমর্থিত রাজনৈতিক দল এবং উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সুচির দলের দৃঢ় অবস্থানের কারণে কমিশন নিষ্ক্রিয় করার এই প্রস্তাবটি জাতীয় পার্লামেন্টে পাস হয়নি কিন্তু এরপর রাখাইন রাজ্য পার্লামেন্টে প্রায় একই ধরনের একটি প্রস্তাব পাস হয়, ফলে রাখাইন রাজ্য পর্যায়ে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবেই এই কমিশনকে বয়কট করে।

অন্যদিকে কমিশন গঠনের মাত্র এক মাসের মধ্যে ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসে রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এত ঝুট ঝামেলা অতিক্রম করে প্রায় এক বছর ধরে কাজ করে এই কমিশন।

অন্তর্বর্তী রিপোর্ট ও মিয়ানমারের আগ্রহ ঃ ২০১৭ সালের ১৬ মার্চ কমিশন অন্তর্বর্তী রিপোর্ট ও সুপারিশমালা হস্তান্তর করে। মিয়ানমার সরকার এই সুপারিশগুলো জনসন্মুখে প্রকাশ করে এবং এর বেশিরভাগ বাস্তবায়নেই তাদের আগ্রহের কথা জানায়। সে সময়ই মিয়ানমার সরকার ঘোষণা দেয় যেহেতু রাখাইন রাজ্যের সমস্যার জন্য বাংলাদেশে অনেক শরণার্থী ঢুকে পড়েছে সে জন্য সমস্যা সমাধানে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে এবং যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার কথা তখন মিয়ানমারের পক্ষ থেকেই বলা হয়।

কমিশনের অবস্থান ঃ রাখাইন রাজ্যের সমস্যা সমাধানে কমিশনের অবস্থান তুলে ধরে কমিশনের চেয়ারম্যান তার সূচনা বক্তব্যে লিখেছেন : অং সান সুচি তাদের একটি জোরালো সুপারিশ দেওয়ার কথা বলেন; সে জন্য নানা জটিলতার মধ্যেও কমিশন সাহসিকতার সঙ্গে সেই কাজটি করে। কমিশন কঠোর নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন রাখাইন রাজ্যের জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তেমনি এর

সমাধানের জন্য সুদূরপ্রসারী সুপারিশমালাও তুলে ধরে। কমিশন মনে করে এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মূল দায়টি হচ্ছে : মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় ও রাখাইন রাজ্য সরকার, জাতীয় ও রাজ্য পার্লামেন্ট, ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতারা সর্বোপরি রাখাইন রাজ্যের জনগণের।

কমিশন প্রস্তাব করে : এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন এমন একটি পদ্ধতি বের করে যাতে ধারাবাহিকভাবে এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের পথটি সুগম হয়। কমিশন নিজেও এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেছে যে, এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে জন্য কমিশন মিয়ানমারের কমান্ডার-ইন-চীফ, সিনিয়র জেনারেল মিন অং হলেইঙ্গ এবং সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গেও দফায় দফায় বৈঠক করে।

কমিশনের ভাষ্যে নেপথ্য চিত্র ঃ রাখাইন সমস্যা নিয়ে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। এই বিভ্রান্তির কিছুটা অজ্ঞতাপ্রসূত, বেশিরভাগই পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক। আনান কমিশন বিস্তর গবেষণা শেষে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছে; রাখাইন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৩০ সালে, তখন এর রাজধানী ছিল মারুক ইউতে এবং বাংলার সুলতানদের সঙ্গে এই রাজ্যের চমৎকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ১৭৮৪-৮৫ সালে সেখানে বার্মার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৮২৪-১৮২৬ ব্রিটিশ-বার্মিজ যুদ্ধের সময় রাখাইন চলে যায় ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। বার্মিজ নিয়ন্ত্রণের আগে থেকেই রাখাইনে মুসলমানরা বসবাস করত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই গবেষণায় যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ রাখাইনে মুসলমানদের বসবাস ১৯৮৪ সালেরও আগে থেকে এবং বার্মিজরা সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে যাওয়ার আগে থেকেই।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে তারা কৃষিকাজ, বিশেষত ধানচাষের দিকে নজর দেয়। সে জন্য প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন হলে বেঙ্গল থেকে বহু শ্রমিক সেখানে কাজ করতে যায়। তবে বেশিরভাগই যায় মৌসুমী কাজ করতে, অনেকে আবার স্থায়ী বসতিও গড়ে সেখানে।

১৮৮০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত সময়কালে রাখাইনে মুসলিম জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ নিয়ে রাখাইন এবং মুসলিমদের মধ্যে কোনো বৈরিতা ছিল না। মূলত উনিশ শতক থেকে মুসলিম-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রিটিশ-জাপান যুদ্ধে দুই সম্প্রদায়ই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয় ২০১২ সাল থেকে। এর নেপথ্যে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের ইন্ধন আছে বলে দাবি বিভিন্ন মহলের।

তিন প্রধান সঙ্কট ঃ কমিশন প্রাথমিকভাবে রাখাইন রাজ্যের তিনটি সঙ্কট চিহ্নিত করে। এই তিন সঙ্কট হলো ঃ উন্নয়ন সঙ্কট, মানবাধিকার সঙ্কট এবং নিরাপত্তা সঙ্কট। এসব খাতের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ৮৮টি সুপারিশ করেছে আনান কমিশন।

পিছিয়ে পড়া রাখাইন ঃ উন্নয়ন সঙ্কট বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাখাইন রাজ্য সার্বিকভাবে দেশের অন্য অংশের চাইতে সকল অর্থেই পিছিয়ে আছে। মিয়ানমারে সামগ্রিকভাবে দরিদ্রের হার যখন ৩৭.৫৪ শতাংশ. তখন রাখাইনে দরিদ্রের হার প্রায় ৭৮ শতাংশ। উত্তর রাখাইনে ৬০ ভাগ পরিবার গৃহহীন। তবে রাখাইন রাজ্য ঘিরে

রয়েছে ভারত ও চীনের বিশাল প্রকল্প। যেমন, ভারত-মিয়ানমার যৌথ উদ্যোগে কালাদান মালটি-মডেল ট্রান্সপোর্ট ট্রানজিট প্রকল্প ভারতের মিজোরামকে চীন ও রাখাইন হয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযোগ করবে। এই প্রকল্পের অন্যান্য অংশজুড়ে রয়েছে ভারতের বাজার সম্প্রসারণের। অন্যদিকে রাখাইন থেকে গ্যাস পাইপলাইন যাবে চীনের ইউনানে। এছাড়া স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং ডিপ সি পোর্টেও পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে চীন।

সাম্প্রদায়িক সংঘাত, জাতিগত বৈরিতা, ভূমি সমস্যা এবং শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ অন্যান্য রাজ্যে চলে যাওয়ায় রাখাইন রাজ্যের উন্নয়নে কখনই চাঙ্গাভাব আসেনি। বিশেষত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নানা বিধিনিষেধ রাজ্যের অগ্রযাত্রায় তাদের ভূমিকার পথও সঙ্কুচিত করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রাখাইন রাজ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়নি স্থানীয়ভিত্তিক জাতিগত বৈরিতা, সহিংসতা ও বিচ্ছিন্নতার জন্য। ফলে কিয়কপিউতে তেল-গ্যাসভিত্তিক বিনিয়োগও তেমন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি। অন্যদিকে কেন্দ্র সরকারের নানা সিদ্ধান্ত রাখাইন ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবেই ঠেলে দিয়েছে।

এই খাতে সঙ্কট উত্তরণের জন্য আনান কমিশনের মোট ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূমি সমস্যার সমাধান, শ্রমবাজার মূল্যায়ন, নারী শ্রমিকদের মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী ঃ মানবাধিকার সঙ্কট বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাখাইন রাজ্যে দৃশ্যত সব সম্প্রদায়ই কোনো না কোনোভাবে সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার। বিশেষত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিত নিপীড়ন তাদের জীবনকে শুধু দুর্বিষহই করে তোলেনি বরং তাদের 'রাষ্ট্রহীন' এক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছে। কমিশন বলছে, বিশ্বের রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগেরই বাস মিয়ানমারে এবং রাখাইন রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠী হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় একক রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে এমন কিছু নিষেধাজ্ঞার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয় যা দৃশ্যত তাদের সকল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার সদস্য অভ্যন্তরীণভাবে ঠিকানাহীনদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে সব রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

নাগরিকত্ব সমস্যা ঃ মানবাধিকার সঙ্কট বিশ্লেষণ করে প্রধানতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নাগরিকত্বকে। কমিশন বলছে, ৩৫ বছরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাগরিকত্বের বিষয়টিকে একটি জটিল জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালের সংবিধানকে কমিশন বলছে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অগ্রহণযোগ্য। বস্তুত এই নাগরিকত্ব সমস্যাই রাখাইন রাজ্যে উত্তেজনা ও সহিংসতার মূল কারণ।

বার্মা/মিয়ানমারের স্বাধীনতার পর থকে দশকের পর দশকজুড়ে রাখাইন রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৬২ সালের সেনা অভ্যুত্থানের আগেও রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী অনেক মর্যাদা ও অধিকার নিয়েই বসবাস করতেন। ১৯৭৮ এবং ১৯৯১ সালে সেনা সরকারই ২ লাখেরও বেশি

মুসলিমকে 'পুশইন' করে বাংলাদেশে। দেখা যাচ্ছে, নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন দিয়ে যেটিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হয়। একে তো এই আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, পাশাপাশি এই আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে ইচ্ছামাফিক, সুবিধামতো। আনান কমিশন সুপারিশ করছে, ১৯৮২ সালের আইনটিকে আবার যাচাই বাছাই করতে হবে। এই যাচাই-বাছাইয়ে 'নানা ধরনের নাগরিকত্বের' বিষয়টি বাতিল করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন বলছে, কাউকে রাষ্ট্রবিহীন রাখা যাবে না। নতুন আইনে যারা স্থায়ীভাবে দেশে অবস্থান করছেন তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সরকারি নীতির কারণে যে সব নাগরিক তাদের কাগজপত্র হয় সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন অথবা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান করতে হবে দ্রুত, স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে রাখাইন ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। নাগরিকত্ব বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে যথাসম্ভব জটিলতা কমিয়ে। কাউকে নাগরিকত্ব না দিলে তার কারণও স্পষ্ট করে বলতে হবে। নাগরিকত্ব না নিয়েও যারা দেশটিতে অবস্থান করবেন তাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ-আপত্তি দেখা দিলে তা নিষ্পত্তি করতে হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

মানবাধিকার বিষয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ৬টি সুপারিশে। এতে বলা হয়েছে, রাখাইন রাজ্যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে সব পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে।

ভয়ের রাজ্য রাখাইন ঃ নিরাপত্তা সঙ্কট রাখাইন রাজ্যকে দৃশ্যত একটি ভয়ের রাজ্যে পরিণত করেছে। ২০১২ সালের সহিংসতার ঘটনার পর মুসলমানদের যেমন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তেমনি রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় যে, তারা একদিন মুসলমানদের চাইতে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতির দ্রুত অবসান না হলে দুই গোষ্ঠীই চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। কমিশন মনে এই নিরাপত্তা সঙ্কট দূর করতে সেনা অভিযানই একমাত্র সমাধান নয়, বরং অতিমাত্রার সেনা অভিযান পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার যদি নিশ্চিত করা না যায় তা আরও জটিলতার সৃষ্টি করবে এবং তা উগ্রবাদী শক্তি বৃদ্ধিতেই সহায়তা করবে।

পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হলেও কমিশন বলছে, এই তিনটি সমস্যাই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। কমিশন জোর দিয়েই বলছে, আর্থিক ও কারিগরি সীমাবদ্ধতা এবং মিয়ানমারের জনগোষ্ঠীর কিছু অংশের বিরোধিতা থাকলেও দেশেটির রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে রাখাইন অঞ্চলের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নিরাপদ ও নিরাপত্তা, সকল জাতি গোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে দৃঢ় হাতেই। এ অঞ্চলে রাখাইন ও মুসলিম জনগোষ্ঠী একত্রে বাস করবে এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়, বরং

বিচ্ছিন্নতা নয়, অন্তর্ভুক্তির দর্শন নিয়ে তারা কিভাবে পরস্পর মিলিত জীবনযাপন করবে নিশ্চিত করতে হবে সে বিষয়টিই।

আনান কমিশন রাখাইন রাজ্যে ঠিকানাবিহীন মানুষের ঠিকানা নিশ্চিত করা, মানবিক সাহায্যের পথ প্রশস্ত করা, গণমাধ্যমের প্রবেশ অবাধ করা, রাখাইনবাসীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক অংশাদারিত্ব নিশ্চিত করা, আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি স্থাপন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে।

আনান কমিশনের রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি হচ্ছে ঃ বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যু এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে আনান কমিশন। কমিশন বলছে রাখাইন রাজ্যের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আন্তরিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য যৌথ সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ওপরও জোর দিয়েছে কমিশন। আনান কমিশনের ৭৮ নম্বর সুপারিশে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কমিশনের অন্তর্বর্তী সুপারিশের অনুসরণে মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ কমিশন করার যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাকে কমিশন স্বাগত জানায়। ৭৯ নম্বর সুপারিশে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। ৮০ নম্বর সুপারিশে বলা হচ্ছে, প্রত্যাবাসনের পর সকল শরণার্থীকে নিরাপত্তা দেয়ার পাশাপাশি যাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছে তাদের বসতভিটা গড়ে তোলার দায়িত্বও নেবে মিয়ানমার সরকার। ৮১ নম্বর সুপারিশে জোর দেয়া হয়েছে যৌথভাবে সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ওপর, সবাই স্মরণ করতে পারেন এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাবও রয়েছে টেবিলে। কমিশন মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়ানোর সুপারিশও করেছে।

রোহিঙ্গা সমস্যার আপাত সমাধান সূত্র আনান কমিশনের রিপোর্ট এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মিয়ানমার তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে নজর দেবে তাতেও কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু কিছু দুর্বৃত্তকে দমনের জন্য একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূল করা হবে এটি আইন, মানবিকতা এবং আন্তর্জাতিক বিধি কখনই সমর্থন করে না। লাখ লাখ অসহায় শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে উদার মানবিক বাংলাদেশকে গোটা বিশ্ব যেভাবে প্রশংসা করেছে, সেই আন্তর্জাতিক সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্যার মূলোৎপাটনের যাত্রা শুরু করার জন্য। বাংলাদেশ তার কাজটুকু করেছে এবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব তাদের কাজ করার।

জনকণ্ঠ, ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৬. রোহিঙ্গাদের একনদী দুঃখ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ

মুনতাসীর মামুন*

১

পাশ্চাত্য একেক সময় একেকটি বিষয়ে নতুন সংজ্ঞা দেয় এবং সে-অনুযায়ী আমরা কাজ করি। ধরা যাক, গণহত্যা। এর সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে, 'ম্যাস-মার্ডার' থেকে একে আলাদা করা হয়েছে। 'এথনিক ক্লিনজিং' এবং 'গণহত্যা' আবার ভিন্ন। নাম বা সংজ্ঞা যা-ই হোক, প্রতিটি জঘন্য অপরাধ এবং চরম শাস্তিযোগ্য। যিনি 'এথনিক ক্লিনজিং' করছেন তার অপরাধ ৯ ভাগ– যিনি 'গণহত্যা' চালাচ্ছেন তার অপরাধ ৯.৫ ভাগ– এগুলো হাস্যকর ব্যাপার। তিনটি বিষয়ের ভিত্তি হল হত্যা এবং হত্যার অপরাধ কখনও তামাদি হয় না।

মিয়ানমার বা বার্মা দীর্ঘদিন ধরে গণহত্যা চালাচ্ছে; বিশেষ করে সেখানে নে উইন ক্ষমতায় আসার পর থেকে– ব্রিটেনে বসবাসরত মিয়ানমারের গণতন্ত্রকামী ড. মং জার্নি এ কথা জানিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৭৮ সাল থেকে এই গণহত্যা চলছে। পৃথিবীর বর্বরতম আইনী সন্ত্রাসী বাহিনী যা মিয়ানমার সেনাবাহিনী নামে পরিচিত তারা শুধু রোহিঙ্গা নয়, মিয়ানমারের শান, কাচিন প্রভৃতি গোষ্ঠীর ওপরও গণহত্যা চালিয়েছে। ২০১১ সালে কাচিনে লিম পা গ্রামে মর্টার চালিয়ে সেখানকার সব খ্রিস্টান অধিবাসীকে তারা হত্যা করেছিল।

মিয়ানমারের অধিবাসীদের যাদের অনেক সময় 'মগ' নামেও অভিহিত করা হয়, তারা দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ওপর দমন চালিয়ে আসছে। তাদের সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যঃ এক মানুষ, এক ভাষা, এক দেশ কায়েম, অর্থাৎ বর্মন (আমাদের ভাষায়, বার্মিজ) ছাড়া আর কেউ সে দেশে থাকতে পারবে না।

মিয়ানমার-সংলগ্ন চীন ও ভারত বিষয়গুলো জানে। কিন্তু দেশটির খনিজ সম্পদের ওপর তাদের লোভ অনেকদিনের। সে জন্য তারা এতদিন এসব অগ্রাহ্য করেছে। তাদের এই সমর্থনের বিষয়টি এতদিন কেউ গুররুত্বসহকারে না নিলেও বোধহয় এখন তারা গণহত্যাকারী সমর্থক হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হবে। পৃথিবী অনেক নিষ্ঠুর বটে, তবে সাধারণ মানুষও যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন।

আমরা দেখছি মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর কী হচ্ছে। গণমাধ্যম প্রথমে একে 'এথনিক ক্লিনজিং' বলেছে। প্রশ্ন হল, যারা বাংলাদেশে এসেছেন তাদের ৭০ ভাগ নারী-শিশু, পুররুষরা নারীর সমসংখ্যক হলে তারা কোথায় গেল? ধরে নিতে হবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা (আলবদর/ আলশামস/ রাজাকার বলতে পারেন) খুন করেছে। জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ খুন 'গণহত্যা' হবে না তো কী?

রোহিঙ্গা সমস্যা এই প্রথম স্পষ্ট করল, পৃথিবীতে এখন আদর্শগত রাজনীতি মুখ্য বিষয় নয়, বাণিজ্য-স্বার্থই প্রধান। বিশ শতক পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে

* সভাপতি, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টি ও ইতিহাসবিদ

আদর্শের একটি স্থান ছিল। একুশ শতকে তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। এখন শুধু বাণিজ্য নয়, পরমাণু-সমর্থিত সামরিক শক্তিও একটি উপাদান।

সুচি কী বলবেন তা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু তারা ভুলে গেছেন যে, তিনি আগেও রোহিঙ্গা বিতাড়ন সমর্থন করেছিলেন। চুলে অর্কিড গোঁজা, পরিপাটি সুচির যে চিত্র পাশ্চাত্য তুলে ধরেছিল এবং আমরাও মোহাবিস্ট হয়েছিলাম, আশা করি এখন তা কেটে যাবে। বাংলাদেশে যারা ইসলাম ও মুসলমানিত্ব নিয়ে রাজনীতি করেন রোহিঙ্গা সমস্যা তাদের জন্য চপেটাঘাত বিশেষ। কারণ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৌদি আরব থেকে ইরান সবাই ইসলামী স্বার্থ নয়, নিজ স্বার্থে বিশ্বাসী অথবা খ্রিস্টান দেশসমূহের ভৃত্য। প্যান-ইসলাম বা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলে এখন আর কোনো বিষয় নেই। মানবতার কথা বললে, ইউরোপ (বা খ্রিস্টান সমাজ) মুসলমান, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ সমাজ বা যে কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে ঢের বেশি মানবিক।

মিয়ানমার যে যুক্তি দিয়ে রোহিঙ্গা বিতাড়ন করছে তা সর্বৈব এবং ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা। এ বক্তব্য কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়নি। বর্তমানে মিয়ানমারের একটি অংশ আরাকান, আগে যা ছিল স্বাধীন। প্রাচীনকালে দুটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল আরাকান– স্যানডায়ে বা দক্ষিণ আরাকান এবং মূল আরাকান। এই দুই অংশ মিয়ানমারের সঙ্গে একীভূত হয় ১৭৮৫ সালে। একাদশ শতাব্দী থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত আরাকানের রাজধানী ছিল আকিয়াবের আটটি শহরে।

মিয়ানমার ও আরাকান সমুদ্রতীরবর্তী। প্রাচীন আমল থেকেই অঞ্চল দুটি পরস্পরের বিররুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্যানেরা দশম শতকে আরাকানের অংশ দখল করে। বাংলা বা বঙ্গের শাসকরাও আরাকান আক্রমণ করতেন। আরাকানিরা বঙ্গের চট্টগ্রাম কখনও কখনও দখল করেছে।

২

আরাকানের আসল নাম 'রাখাইং'। এটি একটি গোত্রের নাম। বার্মা নামকরণটিও হয়েছে বর্মণ গোত্রের নামে। মুসলমান লেখকরা যারা এ এলাকাটি আমাদের কাছে পরিচিত করে তুলেছেন তারা এর নামকরণ করেছিলেন 'রাখাং' বা 'আরখাং'। রোহিঙ্গাদের ধারণা, এ নামকরণ আরবি সাল রুকন থেকে। মুসলমান কবিরা লিখতেন 'রোসাং'। ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা এসে ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দখল করা এলাকার নাম নিজেদের মনমতো করে লেখে। 'রাখাইং'এর নামও দেয় তারা 'আরাকান'। 'রোসাঙ্গ' চট্টগ্রামী উচ্চারণে হয়েছে 'রোহাং'। আর এর অধিবাসীরা পরিচিত হয়ে ওঠে 'রোহাঙ্গি' বা 'রোহিঙ্গা' নামে।

অষ্টম শতকে আরব বণিকরা এ এলাকার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়িত হন। ৭৮৮-৮১০ সালের মধ্যে কোনো এক সময় আরব বণিকদের কয়েকটি জাহাজ ডুবে যায় উপকূলের কাছে। নাবিকরা সাঁতরে তীরে ওঠেন। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন মাহাতোইং। তিনি তাদের বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি দেন। এই প্রথম আরাকানে মুসলমান বসতির শুরু।

পঞ্চদশ শতকে আরাকানের যুবরাজের আমন্ত্রণে বাংলার অনেক মুসলমান সেখানে চলে যান। বর্মী রাজার কাছে হেরে আরাকান রাজা বাংলায় চলে গিয়েছিলেন। বাংলার সুলতানের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধার করেন এবং আরাকানি রাজা বঙ্গীয় রাজের আধিপত্য মেনে নিয়ে মুদ্রায় ফার্সিতে তাদের নাম উৎকীর্ণ করেন। এ কারণেই যুবরাজ মুসলমানদের আমন্ত্রণ জানান। সেই রাজার নাম মিন-সাউ-মুন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তাদের সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়ে।

বাংলার উপকূল থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষজনকে আরাকানের মগ বা পর্তুগিজ জলদস্যুরা অপহরণ করত। এদের অনেককে বিক্রি করা হয় আরাকানে। পরে কেউ কেউ মুক্তি পেয়ে সেখানেই বসবাস শুররু করেন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা ১৬৬০ সালে পালানোর সময় আরাকানে যান। সেখানেও প্রায় হাজারখানেক মুসলমান আশ্রয় নেয়।

আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন, এভাবে বহিরাগতরা আরাকানবাসী হয়ে যান। যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। সপ্তদশ শতকে তাদের রাজধানী রোসাঙ্গ সমৃদ্ধ এক শহরে পরিণত হয়। মধ্যযুগীয় বিখ্যাত কবিরা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন; তাদের মধ্যে আলাওল, কাজি দৌলত, সর্দার নররুদ্দীন বা কোরাইশী মাগন ছিলেন রোসাঙ্গবাসী। অনেক মুসলমান আরাকান রাজদরবারের মন্ত্রী ছিলেন– বুরহান উদ্দিন, আশরাফ খান (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী), মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুসা, নবরাজ মজলিস (প্রধানমন্ত্রী), সৈয়দ মোহাম্মদ, শ্রী মন্ত সোলায়মান মন্ত্রী প্রমুখ।

সুতরাং যাদের এখন বর্মীরা বিতাড়ন করছে মুসলমান এবং বাঙালি বলে তাদের পূর্বপুররুষরা ৫০০-৬০০ বছর আগে থেকেই সেখানকার আদি অধিবাসী, বহিরাগত বা বিদেশি নয়। সেই সময় আরাকানে কত দেশ থেকে যে মানুষজন এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একই সময় এই ঢাকায়ও প্রচুর বিদেশি এসেছেন। যে দেশ/শহর সমৃদ্ধ সেখানে বণিকরা যাবেনই। আলাওলের কবিতায় সেই চিত্র পাই:

নানা দেশি নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবি, মিছরি, সামি তরুকি, হাবসি রুমি
খোড়াছানা উপজেগী সাল ॥
লাহুরি সুলতান সিন্ধি কাশ্মিরি দক্ষিণী হিন্দি
কামররুপি আর বঙ্গ দেশি।
অহপাই খোটনচারি? বর্ণালি মলয়াবারী
আবি, কুচি, কর্ণাটক বাসী ॥
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি ॥
আভাই বরমা শ্যাম ত্রিপুরা কুকীর নাম
কতেক কহিব ভাতি ভাতি ॥
আরকানি ওলন্দাজ দীনমার ইঙ্গ'রাজ

কাস্তিলাল আর ফরাঙ্গিস।
হিসপানি, আল সানি ছোলদার নছরাণী
নানা জাতি আছে পুর্ত্তকীস।

১৭৮৫ সালে বার্মার রাজা বাদাউপ্যা আরাকান দখল করে বার্মার সঙ্গে একীভূত করেন। ১৮২৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্মা দখল করে ও আকিয়াবের পত্তন ঘটায়। আকিয়াব তখন থেকে আরাকানের রাজধানী। ১৮২৬ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আরাকানের জনসংখ্যা ছিল এক লক্ষ যার ৩০ ভাগ ছিল মুসলমান। এরা নামবাইকতা, জেরবাদি, কামানন্তি এবং রোহিঙ্গা গোষ্ঠী। যার মধ্যে রোহিঙ্গারা হল ৮০ ভাগ। ১৯৮১ সালে বার্মার আদমশুমারি অনুযায়ী এরা সবাই বিদেশি। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী-বিষয়ক কমিটি রোহিঙ্গা জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ বলে উল্লেখ করেছে। বিশ শতকে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি বার্মায় বসতি স্থাপন করেন যা শরৎচন্দ্র ও অন্যান্যদের উপন্যাসে আছে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালিদের অনেকে বার্মা ত্যাগ করেন। ব্রিটিশরাও বর্মী রাজাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। অমিতাভ ঘোষ তা নিয়ে দ্য গ্লাস প্যালেস নামে চমৎকার এক উপন্যাস লিখেছিলেন।

১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে এবং তখন থেকেই রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন শুররু হয়। জেনারেল নে উইনের আমলে সিদ্ধান্ত হয় রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করার। অথচ ১৯৮২ সালের আইন অনুযায়ীও রোহিঙ্গারা বর্মী নাগরিক।

৩

ঐতিহাসিকভাবে বর্মীরা বিদেশি বা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী ছাড়া সবার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেছে। মিয়ানমারের অন্যান্য গোষ্ঠী, যেমন, কাচিনদের বিররুদ্ধেও দমননীতি চালু ছিল। তখন কাচিনসহ অন্যান্যরা চীনে আশ্রয় নিচ্ছিল। পরে চীনের ধমকে বর্মী মিলিটারি পিছু হটে। সে এলাকায় এখন আপাতত এক ধরনের অস্বস্তিকর স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। বর্মীদের নিপীড়নে তারাও বিদ্রোহী দল সংগঠিত করেছে। শান ও কাচিনদের অনেকে থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে আরাকানিরা নিপীড়িত হয়ে গঠন করেছে আরসা। সুতরাং মিয়ানমারে দমননীতির শিকার ও বিদ্রোহী কেবল আরাকানিরাই নয়।

বার্মা ১৯৪৮ সাল থেকেই বলা যেতে পারে সেনাবাহিনী দ্বারা শাসিত। এদের বিররুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অনেক বর্মীও নিতে হয়েছেন। সুচি এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও আদৃত হয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে রাখিনি যে, তিনিও এক জেনারেলের কন্যা। জেনারেলদের প্রতি এক ধরনের টান তার নিজের মধ্যেও রয়েছে, থাকার কথা। পাশ্চাত্যের চাপে এক ধরনের সমঝোতায় তিনি বাহ্যত ক্ষমতা লাভ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা সেখানে এখনও সেনাবাহিনীর হাতে। এসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরাও গিয়েছি। সুতরাং সে ইতিহাস নতুন করে বলার কিছু নেই।

পার্থক্যটা হল, আমাদের রাজনীতিবিদরা সেনাশাসন অপসারণ করেছেন। যদিও সেনাবাহিনী এখনও ক্ষমতাশালী। শেখ হাসিনার সঙ্গে সুচির পার্থক্য এখানেই যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; শেখ হাসিনা তা নন। কারণ এদেশের মানুষ

সেনাশাসন-বিদ্বেষী। সেনাবাহিনী এ সত্য মেনে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছে এবং রাষ্ট্রও তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে যা একসময় আবার চরম তিক্ততার সৃষ্টি করবে।

সেনাবাহিনী যেমন আমাদের দেশে জাতির পিতাকে হত্যা করে ধর্মব্যবসায়ীদের শক্তিশালী করেছে, মিয়ানমারেও তাই হয়েছে। যিনি স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বার্মায়, সুচির পিতা অং সানকে হত্যা করেছে তারা। একই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মূল সুরের বিপরীত গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও মুসলমান-বিদ্বেষী করে তোলা হয়েছে।

শ্রীলংকায় ঠিক এমনটি ঘটেছে। সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মুসলমানবিদ্বেষী। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম এখন বিভক্ত। মুসলমানদের মধ্যে যেমন সৃষ্টি হয়েছে জঙ্গি ইসলামের, তেমন উত্থান হয়েছে মূল বৌদ্ধ ধর্মবিরোধী জঙ্গি বৌদ্ধদের। সে দিক থেকে বলতে গেলে, বাংলাদেশের বৌদ্ধরা এখনও বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি অহিংসা মেনে চলছেন। তারা রোহিঙ্গা-বিরোধী বৌদ্ধদের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন।

মিয়ানমারে জংলি সেনা শাসন চীন ও ভারত সব সময় সমর্থন করেছে। চীন বার্মায় আধিপত্য বিস্তার ও ভারতের বিররুদ্ধে ঘাঁটি করতে চায়। ভারত আরাকানে প্রভাব বিস্তার করতে চায় চীন ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। শোনা যায়, এক সময় এ দুটি শক্তি আরাকান ভাগ করে নেবে নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া। চীনে কমিউনিস্ট আদর্শ এখন নামেমাত্র। কারণ ওই আর্দশ থাকলে সাম্রাজ্য বিস্তার বা পুঁজির বিকাশ ঘটানো যাবে না। গণহত্যা নিয়ে চীন কখনও মাথা ঘামায়নি। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কর্তৃক চীনাদের গণহত্যার বিষয়টি তারা স্বীকার করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের রাষ্ট্রটি যখন ছিল তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অধিকার-সংগ্রামে তারা সহায়তা করেছে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে অনেক রাষ্ট্র হয়েছে। ওদিকে ভারতে এখন সেক্যুলার আদর্শ বিপন্ন। তাছাড়া, ১৯৪৮ সাল থেকেই ভারত বার্মার বন্ধু। সেখানে এখন মোদি না থেকে অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকলেও তাদের নীতি একই রকম হত। ধর্মের শুরু যেদিন থেকে সেদিন থেকেই মানবসমাজ বিভক্ত। এ বিভক্তি তীব্রতর হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে বটে কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে আমরা মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছি যেখানে ধর্ম প্রধান উপাদান।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান যে খুব নাজুক তা না বললেও চলে। আমরা সেনাবাহিনীকে যতই আধুনিক বানাই, তাদের জন্য যত বেশি অর্থ খরচ করি না কেন, তারা নিজ দেশ ছাড়া আর কোনো শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। এটি বাস্তবতা। বাংলাদেশের আকাশসীমা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি এটা ঠিক, কিন্তু চীন বা ভারতের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান আমরা নিতে পারব না। আওয়ামী লীগের বিশাল দল গেছে চীনা কংগ্রেসে যোগ দিতে। আর এখনও আমরা বার্মা থেকে বেশি দামে চাল আমদানির উদ্যোগ নিচ্ছি। এই উদ্যোগ বাতিল করলে তবু বলা যেত যে, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যখন এই চুক্তি হবে তখন আমাদের অবস্থান কোথায় থাকে?

তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অকারণে বিএনপির রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে নানা কথা বলা মিয়ানমারের পক্ষেই যাচ্ছে। রোহিঙ্গা বিতাড়নে সেনাপ্রধান থেকে সুচি, বর্মি নাগরিক থেকে ভিক্ষুরা ঐকমত্যে আছে। আমরা বহুধাবিভক্ত। এটি হল বাস্তবতা।

৪

যেভাবে রোহিঙ্গারা দেশ ছাড়ছেন তা দেখে আমাদের প্রজন্মের সবার ১৯৭১ সালের কথা মনে পড়ছে। এভাবে বাঙালিরাও ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। মনে রাখা দরকার, তখন মিয়ানমার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং বাঙালিদের আরাকানে আশ্রয়গ্রহণে বাধা দিয়েছে। ওই দুঃখকষ্ট শুধু একই রকম কিন্তু পার্থক্য বিরাট। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। রোহিঙ্গারা কোনো ধরনের স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতিও কাজ করছে। ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা যদি থেকে যায় তাহলে পরিস্থিতি কী হতে পারে? কারণ আমাদের দেশটি তো খুব ছোট, আর সম্পদই-বা কতটুকু?

শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলাদেশের কথা তুলে ধরবেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ সমর্থন জানাবে। ইত্যেমধ্যে গণমাধ্যমে ১৯৭১ সালের মতো রোহিঙ্গারা জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এই ইস্যু সজীব রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে এ ইস্যুর মোকাবেলা করতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ চাই। শুধু আমলা দিয়ে এ প্রচার অব্যাহত রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী প্রমুখকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। প্রচারের লক্ষ্য, সরকার থেকে সাধারণ। ১৯৭১ সালে অধিকাংশ পরাশক্তি ও রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারত সরকার প্রচারের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ মানুষ বাধ্য করেছিল নিজ নিজ সরকারকে বাংলাদেশের পক্ষ নিতে।

স্বীকার করি গত শতকের ষাট ও সত্তর দশক ছিল লিবারেল সময়, এখন রক্ষণশীলতার সময়। তা বলে লিবারেল বা সেক্যুলারপন্থীরা কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আমেরিকাতে মার্কিনিরাই ট্রাম্পের বিররুদ্ধে প্রতিনিয়ত সমাবেশ করছেন। মালয়েশিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য সুচি ও বর্মী সেনাপতিদের আন্তর্জাতিক গণআদালতের বিচার শুরু হয়েছে। তাদের বিররুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে কাচিন, শান, বৌদ্ধ, তারাং, রোহিঙ্গা ও খ্রিস্টানদের বিররুদ্ধে গণহত্যা চালানো। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে এ ধরনের গণআদালত সংঘটন ইস্যুটি সজীব রাখবে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে সুচি আর কোথায় যেতে না পারেন এবং যদিও-বা যান ধিক্কারের মুখে পড়েন। বর্মী দেখলেই মানুষ যেন বুঝে নেয় এদের এবং মানুষে তফাৎ আছে।

৫

ট্রাইবুনালে ফ্রি বার্মা কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মং জার্নি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের অন্যতম নৃ-গোষ্ঠী উল্লেখ করে বলেন, প্রখ্যাত স্কটিশ ভূগোলবিদ ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৭৮ সালেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আরাকানের 'নেটিভ' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিকসহ সব বিবেচনায় তারা আরাকানের নাগরিক। তিনি নে উইন সরকারের ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনটি রোহিঙ্গাদের বিররুদ্ধে জেনোসাইড চালানোর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিচারক প্যানেল থেকে প্রশ্ন করা হয় যে, কাচিন, শানসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপরও

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলে, তার সঙ্গে রোহিঙ্গা-বিরোধিতার কীভাবে পার্থক্য দেখেন? উত্তরে ড. মং জার্নি জানান যে, অন্যদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের তফাত হল, তাদের মুছে ফেলাটাই নীতি হিসেবে নেওয়া হয়েছে, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

ড. মং উল্লেখ করেন, ১৯৭৮ সালে যখন প্রথম রাখাইন তাড়ানো শুরু হয় তখন বাংলাদেশ-বার্মা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, রোহিঙ্গাদের ফেরত না নিলে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করা হবে। তখন জেনারেল নে উইন পিছিয়ে যান। কিন্তু ১৯৮২ সালে প্রতিশোধ হিসেবে নে উইন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেন।

মিয়ানমারের সেনাবহিনী, অং সান সুচি, চীন, ভারত ও রাশিয়া যা বলছে তা নস্যাৎ করেন ড. মং। রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা আরসার দ্বারা ২৫ আগস্টের হামলা বা এর আগের হামলার কারণে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সন্ত্রাস দমনের অংশ হিসেবে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছে বলে যে ধারণা মিয়ানমার বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে, তিনি তা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, শুধু জাতিগত পরিচয়ের কারণে রোহিঙ্গা মুসলিমরা মিয়ানমারে পদ্ধতিগতভাবে গণহত্যার শিকার হচ্ছে। তাদের রাষ্ট্রবিহীন হয়ে পড়া এবং তাদের সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সঙ্গে মিয়ানমারে গণতন্ত্র আসা বা না-আসা কিংবা আরসার ২৫ আগস্ট বা তার আগে-পরের হামলা, বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিপথগামী কোনো রোহিঙ্গা গোষ্ঠী হাত মেলানো– রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূল অভিযানের সঙ্গে এসব কিছুরই কোনো সম্পর্ক নেই।

ট্রাইবুনালে সাক্ষী দেন রাজিয়া সুলতানা। তিনি ২১ জন রোহিঙ্গা নারীর সাক্ষী গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'ওই ২১ নারীর ১৯ জন স্বামীহারা হয়েছেন। ১৭ থেকে ৫১ বছর তাদের বয়স। তাদের একজন স্বামীর খোঁজ পান মংডু জেলে। ২১ নারীর মধ্যে ১১ নারীর ১৬ শিশু নিহত হয়েছে। দু'টি শিশুকে মায়ের সামনে পুড়িয়ে মারা হয়। একটি শিশুর গলা কাটা হয়েছে। আরেকটি শিশুকে বুটের তলায় পিষে মারা হয়েছে। আরেকটি ছোট শিশুকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, তার মস্তিষ্কে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ইয়ে খাত চং গ সান গ্রামের একজন বলেছেন, আমাদের সবাইকে গ্রামের বাইরে একটি ক্ষেতে জড়ো করা হয়। সৈন্যরা সুন্দরী তরুণীদের আলাদা করে। আমাদের গ্রুপে ১০০ নারী ছিল। এর মধ্য থেকে তারা ১০ সুন্দরী তরুণীকে বাছাই করে। তাদের কয়েকজনের বয়স ছিল ১০-১২ বছর। এই ভাষ্য কি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের কুর্কমের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না? মনে করিয়ে দিচ্ছে না সেদিনের কথা?

৬

বাংলাদেশের অবস্থা নাজুক সেটি বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের দরকার নেই। সুচি ও তার সহযোগী জান্তার বিরুদ্ধে এখন একটি অস্ত্র; তা হল, আন্তর্জাতিক জনমত। এই জনমত সৃষ্টি ও সংহতকরণে বাংলাদেশকেই ১৯৭১ সালের মতো সংহত পদক্ষেপ নিতে হবে। চীন ও ভারতকেও কুটনৈতিক ভাষায় বোঝাতে হবে যে, বাংলাদেশ একেবারে তাদের ওপর নির্ভরশীল তা নয়। তারাও অনেক কিছুর জন্য বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। গত কয়েক বছরে ইউরোপে কয়েক লক্ষ শরণার্থী নিয়ে তুলকালাম

কাণ্ড হচ্ছে। বাংলাদেশ এক মাসে তাদের থেকেও বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশ নৈতিকভাবে এ দিক এগিয়ে আছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ যে অনেক মানবিক তা-ও প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বজনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে এটি সহয়তা করবে এবং নোবেল প্রাইজ যে সুচির নয়, শেখ হাসিনার প্রাপ্য সেটিও প্রতিভাত হবে। অন্তিমে নৈতিকতা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের কাছে। এ নৈতিক বলের কারণেই গণহত্যার সমর্থনকারীরা ক্রমশ হারবে ১৯৭১ সালের মতো।

শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন, ১৬ কোটি লোককে খাওয়াতে পারলে ১০ লক্ষকেও পারব। এ ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা করতে হবে সিভিল সমাজকে, যেভাবে ভারতীয় সিভিল সমাজ ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করেছিল ১৯৭১ সালে। সুচি এবং তার সেনাবাহিনী যা করছে তা যে নিছক গণহত্যা তার প্রমাণ সুচি নিজেই দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়েছে যে, বাস্তব চিত্রের সঙ্গে সুচির বক্তব্যের মিল নেই। তিনি এটিও বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক চাপের বিষয়টি বার্মা পাত্তা দেয় না। তার এ ভাষণ পৃথিবীজুড়ে তাঁকে 'সুন্দরী মিথ্যাবাদী' হিসেবে প্রমাণ করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তাঁকে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। কোনো নোবেল লরেট এর আগে এমনভাবে ধিকৃত হননি। ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান যে ধরনের ভাষণ দিয়েছিলেন সুচির ভাষণ অনুররুপ। যারা এই গণহত্যায় সমর্থন দিচ্ছে তাদের বিররুদ্ধেও আমাদের প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা শুধু বাণিজ্য বা বিনিয়োগ দেখব তা হতে পারে না। আমাদের কত ক্ষতি হবে তাতে? চীন, রাশিয়া বা মিয়ানমারে বাঙালিরা অভিবাসিত হতে যায় না। জনমত সজীব রাখতে পারলে, হয়তো মিয়ানমার পিছু হটতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের যে দাবি তাতে অটল থাকতেই হবে অর্থাৎ মিয়ানমারের বাসিন্দাদের শুধু ফেরত নয়, নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তাও দিতে হবে। বাস্তব অবস্থা হল, মিয়ানমার এদের ফিরিয়ে নেবে না। তারা যে নিরাপত্তার কথা বলছে তা ফালতু। আজ ইয়াঙ্গুনে যদি সন্ত্রাসী হামলা হয় তাহলে কি ইয়াঙ্গুনের সমস্ত বাসিন্দাকে ইয়াঙ্গুন ছাড়তে বাধ্য করা হবে? শেখ হাসিনা নিয়ত লড়াই করছেন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। সে জন্য কি পাড়ার পর পাড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছেন? তাই এটাই সত্য যে, রোহিঙ্গারা যাবে না (গেলে তাদের ও আমাদের ভাগ্য)। সুতরাং তাদের বছরের পর বছর আশ্রয় কেন্দ্রে রেখে নতুন যাতনা সৃষ্টি করা কি ভালো হবে? নাকি এখন থেকে ভাবা উচিত যে, যদি শুভ উদ্যোগ ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের কর্মশীলতার মধ্যে এনে দেশ ও তাদের উন্নয়নে রাখার চেষ্টা করা দরকার?

বাস্তবে থাকা ভালো। মিয়ানমার একমাত্র শক্তি বোঝে। তাদের সেনারা জানে চীন বা ভারত তাদের বিররুদ্ধে কিছুই করবে না। কেননা তাদের অস্ত্রের ও পণ্যের বাজার মিয়ানমার কিন্তু তারপরও বলব, পৃথিবীতে শক্তির দম্ভ করে শেষ পর্যন্ত কেউ টিকতে পারেনি। সুচি বা মিয়ানমারের অসভ্য জান্তারাও পারবে না। তবে এটাও ঠিক যে, এরই মধ্যে কয়েকটি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে চিরতরে। আশা রাখি তবু, যদি বর্বরাই সব সময় জিতে যেত তাহলে সভ্যতা এ পর্যন্ত এগুতো না।

বিডি নিউজ২৪.কম, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

৭. সঙ্কট সমাধানে প্রতিবেশীসুলভ পদক্ষেপ কাম্য

মুহম্মদ শফিকুর রহমান*

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা এখন আর বাংলাদেশের একার সমস্যা নয়। প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী কূটনৈতিক সাফল্যে সমস্যাটি এখন বিশ্ব সমস্যা হিসেবে বড়-ছোট সব দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, বিশ্বসমাজ শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়িয়ে সঙ্কট মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এটি শেখ হাসিনার রাষ্ট্র নেতৃত্বে সাফল্যের আরেকটি যুগান্তকারী উদাহরণ।

অবাক করা বিষয় হলো, এক শ্রেণির (মানসিকভাবে অসুস্থ) লোক এ ইস্যুটিকে পুঁজি করে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এদের ওভারগ্রাউন্ড নেতা ও নেতৃত্ব জামায়াত-বিএনপি হলেও আন্ডারগ্রাউণ্ডে অন্য প্রভু রয়েছে। বাংলাদেশে এদের নাম জামায়াত, হেফাজত ইত্যাদি। বিদেশে আইএসআই, আইএস, আল কায়েদা, বোকো হারাম, রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান, সৌদী আরব প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। সেদিন একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে দেখলাম বাবু নগরী নামে এক হেফাজত নেতা কক্সবাজারের উপকূলের শরণার্থী শিবির অঞ্চলে মানববন্ধনের মতো দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন সীমান্ত অতিক্রম করে রাখাইন অঞ্চলে ঢুকে রোহিঙ্গা স্টেট বা আরাকান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এখনই মিয়ানমার আক্রমণ করা এমন মন্তব্যও করেছেন তিনি। তার কথার মর্মার্থ এটাই দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিফ নজরুল নামের এক অধ্যাপকের কথা হলো সরকার কেন মিগ যুদ্ধবিমান নিয়ে ঘরে বসে আছে? তার বক্তব্যের মর্মার্থও একই। তাদের দুই মূল নেতা মীর্জা ফখররুল ইসলাম আলমগীর এবং রুহুল কবির রিজভী কখন কি বলছেন বোঝাই মুশকিল। তাদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপার হলো একজন যদি পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের কিছু ব্রিফ করেন অপরজন জাতীয় প্রেস ক্লাবে হল ভাড়া করে প্রেস কনফারেন্স করেন। রুহুল কবির রিজভী অবশ্য পার্টি অফিসেই বেশিরভাগ কথা বলেন। এরা কেন এসব বলেন তাও সচেতন নাগরিকদের কাছে অজানা নয়। ২০১৮ সালের শেষে অথবা ১৯-এর প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ সময় দেশাভ্যন্তরে একটা ঝগড়া-ফ্যাসাদ লাগানো গেলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারবেন। তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আসলে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাহীনতা তাদের বেপরোয়া করে তুলেছে। তাই একটা কিছু করতে হবে। তারা ভুলে যান বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম সাহসী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায়।

যারা সরকার ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি এ ধরনের হুমকি দেন তাদের জানা দরকার প্রতিবেশীর সঙ্গে সঙ্কট দেখা দিলে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হয়, যুদ্ধ

* সংসদ সদস্য ও সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

করে নয়। শেখ হাসিনা এবং তার সরকার সে পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াত জোট ছাড়া গোটা জাতি শেখ হাসিনার পাশে রয়েছে। কেননা, শেখ হাসিনার বৈদেশিক নীতির প্রধান দিক হলো মানবতাবাদ এবং এরই মধ্যে তিনি প্রটেক্টর অব হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার সুরক্ষায় মানবতার জননী অবিধায় ভূষিত হয়েছেন। ব্রিটিশ মিডিয়া তাকে এই সম্মানে সম্মানিত করেছে।

এটা এমনি এমনি অর্জিত হয়নি। ভূমধ্যসাগরের কূলে পড়ে থাকা আইলানের মৃতদেহটি যারা দেখেছেন বা অতি সম্প্রতি কোনরকমে সন্তান কোলে যে মা বাংলাদেশ সীমান্তে এসে তার দুই মাসের মৃত শিশুটিকে আদর করছেন এই দুই ছবির মধ্যে পার্থক্য আছে কি? অবশ্য এটি অনুধাবন করার জন্য সংবেদনশীল মন লাগে এবং মমতাময়ী মায়ের হৃদয় দিয়ে তা অনুধাবন করতে হয়। তাই তো ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের দৃশ্য দেখে অঝোর ধারায় কেঁদেছেন। পরক্ষণেই চোখের জল মুছে বলছেন, 'আমরা ১৬ কোটি মানুষ যখন খেতে-পরতে পারছি, তখন ৭-৮ লাখ রোহিঙ্গাকেও খাওয়াতে পারব। প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব।' একজন মমতাময়ী মা বা বড় বোনের কণ্ঠ হতেই কেবল এটা উচ্চারিত হতে পারে, অন্য কারও কণ্ঠ হতে নয়। এমনি এক সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেয়েছিলাম ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন এক কোটি বাঙালী ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে কলকাতায় ফিরে কাঁদতে কাঁদতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (আকাশ বাণী বেতারের মাধ্যমে শুনেছিলাম) তা আজও কানে বাজে। যেন তিনি এক কোটি বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে মিশে গেছেন এবং দুর্দশা লাঘবে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার জন্মদিনে। উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত মানুষ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশার কথা ভেবে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন না করার জন্য দলকে বলে দিয়েছেন।

এই তো মাত্র ক'দিন আগে অবিরাম বর্ষণে হাওড় এলাকাসহ উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় ৩০ লক্ষাধিক টন খাদ্যশস্যের ক্ষতি হলো। সেই সঙ্কট কাটতে না কাটতেই গত ২৫ আগস্ট শুরু হয় বাংলাদেশ সীমান্তে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর লাইন। কি করুণ সেসব দৃশ্য! সন্তান কোলে কাদা-মাটি মাড়িয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম কি দুঃসহ চিত্র। পথে পথে লাশ, নাফ নদীতে ভাসছে শিশু– এ যেন মার্কিন কবি এ্যালেন গিনসবার্গের 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' শিরোনামের কবিতারই চিত্র কিংবা ভারতীয় শিল্পী পণ্ডিত রবি শঙ্কর আর মার্কিন পপ গায়ক বব ডিলনের 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ...' কনসার্টের মতো একই দুর্দশার কাহিনী, একই অসহায় মানবতার জন্য কান্না।...

কিন্তু না, শেখ হাসিনা চোখের জল ফেলে ঘরে বসে থাকেননি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছেন কক্সবাজার সীমান্তে, বিশ্বমানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব থেকে শুরু করে পুরো বিশ্ব সংস্থা আজ শেখ হাসিনার পাশে। এমনকি আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, চীন, ইসরায়েল, ইউক্রেন, বেলাররুশ,

বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ডসহ যেসব দেশ মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র, গোলাবারুদ বিক্রয় করে তারা রাখাইন রোহিঙ্গা তথা মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কড়া অবস্থানের বিরোধিতা করছে না, কারণ বিষয়টি মানবাধিকারের প্রশ্ন।

মিয়ানমার দেশটির আধুনিক নাম ব্রহ্মদেশ। বার্মা থেকে মিয়ানমার। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ কলোনি অর্থাৎ ব্রিটিশ অকোপেশন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান মিয়ানমার রাষ্ট্রনেতা (স্টেট কাউন্সিলর) নোবেল লরেট আউং সান সুচির পিতা জেনারেল আউং সান দেশটির প্রতিষ্ঠাতা পিতা। সুচিও দীর্ঘদিন প্রবাসে উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়ে দেশবাসীর ডাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মিয়ানমারে আসেন এবং সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রে উত্তরণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছেন। ঠিক আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো। দেশ হিসেবে তুলনা করলে মিয়ানমার আয়তনের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বড়, অর্থাৎ আয়তন ৬ লাখ ৭৬ হাজার ৫৭৮ বর্গকিলোমিটার, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র ৫ কোটি ১৪ লাখ ৮৬ হাজার ২৫৩ জন। জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৭৬ জন। রয়েছে কাঠ ও খনিজসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ। শিক্ষিতের হার ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ৭৫১ ডলার। সামরিক শক্তির চিত্র হলো মিয়ানমারে ৪ লাখ ৬ হাজার নিয়মিত মিলিটারিসহ মোট ৫ লাখ ১৬ হাজার সশস্ত্র মিলিটারি রয়েছে। সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে রয়েছে ১২৭টি যুদ্ধবিমানসহ মোট ২৬৪টি সামরিক বিমান, ৮৬টি হেলিকপ্টার, ৮৮৬টি অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, ৪১১২টি মিসাইল, ১২০০ সাঁজোয়া সামরিক যান, ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র, ১২০০ এ্যান্টি ট্যাঙ্ক অস্ত্র, ২৭ নেভাল ফ্রিগেট, ৪০টি পেট্রোল কারসহ ১৫৫টি রণতরী, অর্থাৎ সামরিক শক্তিধর দেশের তালিকায় ৩১তম (তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া)।

বস্তুত, দেশটি ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মিলিটারির হাতে পড়েছে। সুচির নেতৃত্বে বর্মী জনগণ গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে নির্বাচিত পার্লামেন্টের চার-পঞ্চমাংশ আসনে জয়লাভ করার পরও সূচিকে ক্ষমতায় বসতে দেয়া হয়নি, হাউস এ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে প্রায় ১৬ বছর এবং তার দল এনএলডির (National League for democracy) অন্য নেতাদের ওপর চলে নির্যাতন। সর্বশেষ দশ বছর আগে আবার একটি আই-ওয়াশ অমিলিটারি সরকার গঠন করলেও পার্লামেন্টে প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসনে বসেন উর্দিপরা মিলিটারি অফিসার। তারা পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীতে অংশগ্রহণ করেন। বরং বলা চলে একটু বেশি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এখন অমিলিটারি সরকার প্রধান হলেও সুচির ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ। তার পদের নামও স্টেট কাউন্সিলর, প্রেসিডেন্ট নয় (মিয়ানমার সংবিধানে সরকার পদ্ধতি প্রেসিডেন্ট শাসিত)। মিয়ানমারের জনসংখ্যার মধ্যে বার্মিজ ৬৮%, শান ৯%, কারেন ৭%, রাখাইন ৪%, চীনা ৩%, মগ ২%, রোহিঙ্গাসহ অন্য ৫%। এর মধ্যেও মিলিটারিরা এত ভীত যে, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের 'রাষ্ট্রহীন মানুষে' পরিণত করে হত্যা-নির্যাতনের পথ ধরেছে। এমনকি রোহিঙ্গাদের শিক্ষার সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এরপরও যাদের ঘাড়ে যুদ্ধের ভূত চেপেছে তাদের উদ্দেশে বলব এমনি এক বৈরী পরিবেশে থেকে ম্যাডাম সুচি স্বীকার করেছেন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে, উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস করছে এবং তাদের ফেরত নেয়া হবে, যদিও তিনি যাচাই-বাছাইয়ের শর্ত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, কে যাচাই-বাছাই করবে? এর জবাব হলো জাতিসংঘকে এর দায়িত্ব দিতে হবে এবং এই বিশ্ব সংস্থা ঘোষিত 'আনান কমিশনের রিপোর্টের' মধ্যেই সঙ্কটের সমাধান খুঁজতে হবে। রিপোর্টের মূল বিষয় হলো হত্যা-নির্যাতন বন্ধ এবং নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া। এর বাইরে যাবার কোনো সুযোগ নেই। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই মিয়ানমার মূলত 'মগের মুল্লুকের' আধুনিক সংস্করণ মাত্র। বহু আগে থেকেই আমাদের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে মগরা জলদস্যু হিসেবে লুণ্ঠন করত, আর এখন সর্বনাশা 'মাদকাস্ত্র ইয়াবা'র অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে আমাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, যা গোটা দেশকে গ্রাস করছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। আরও যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা হলো এই 'মাদকাস্ত্রের' বাহকও রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের একটি গোষ্ঠী আসতে শুরু করে এবং তখন থেকে ৪ লাখ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। 'মাদকাস্ত্র' বহনকারীদের অনেকের সঙ্গেই কক্সবাজার এলাকায় বসবাসকারীদের কারও কারও সম্পর্ক রয়েছে মাদক ইয়াবা চোরাচালানে। এবারে আসা প্রায় সাড়ে ৪ লাখসহ মোট ৮ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে এবং শরণার্থী সঙ্কট নিরসন অর্থাৎ তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো আরও জটিল করে তুলেছে।

তাছাড়া আনান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী হত্যা-নির্যাতন বন্ধ বা নিরাপদ বসবাস বা নাগরিকত্ব দিলেই চলবে না, তাদের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। সুচিকে এই লক্ষ্যে এগুতে হবে। নইলে যেভাবে তার অর্জিত সম্মাননা বা এওয়ার্ড বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা স্থগিত করছে একদিন না আবার নোবেল পুরস্কার ধরে টান দেয় সে ভয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তারপরও বাংলাদেশকে সুচির সঙ্গে বসেই সঙ্কটের সমাধান খুঁজতে হবে। মিলিটারির সঙ্গে বসে সমাধান হবে না। যেমনটি জনকণ্ঠের বিশিষ্ট কলামিস্ট স্বদেশ রায় তার 'রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান' শিরোনামে এক কলামে দেখিয়েছেন 'টেবিলের এক পাশে শেখ হাসিনা অপর পাশে আউং সান সুচি'- এভাবেই সমাধান সম্ভব।

তাছাড়া আমাদের তো উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও রয়েছে। মিলিটারি জিয়াউর রহমান ও মিলিটারি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ মিলিটারি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের বিদ্রোহ দমন করতে পারেননি, বরং দিনে দিনে তাদের সশস্ত্র ক্ষমতা বেড়ে চলছিল। তবে শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর টেবিলে বসে সঙ্কটের সমাধান করেন। ১৯৯৭ সালে বান্দরবানে সাড়ে ১১শ' সশস্ত্র পাহাড়ী যুবক শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। এমনকি ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী ৪০ হাজারের বেশি পাহাড়ী দেশে ফিরে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করে এবং এখনও করছে। সেদিন একদিকে যেমন ছিলেন শেখ হাসিনা অপরদিকে ছিলেন পাহাড়ী বিদ্রোহীদের পক্ষে তাদের নেতা সন্তু লারমা। রাজনৈতিক সঙ্কট রাজনৈতিকভাবেই সমাধান হয়।

জনকণ্ঠ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৮. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দায় মেটাতে এগিয়ে বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল মো. আব্দুর রশীদ (অব.)*

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জাতি নিধনের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত ও পাশবিকভাবে সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে। বর্মী সেনাদের অবর্ণনীয় পৈশাচিক দমন ও পীড়ন থেকে বাঁচতে সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা অধ্যুসিত মংডু, বুথিডং ও রাথিডং এলাকা থেকে রোহিঙ্গা জনস্রোত বাংলাদেশে ঢুকেই চলেছে। জাতিসংঘের গণনায় ইতিমধ্যে ৪ লাখ ৩০ হাজার সীমান্ত এলাকা উখিয়া-টেকনাফ ও বান্দরবনে আশ্রয় নিয়েছে। সহিংসতা চলতে থাকলে এই সংখ্যা ১০ লাখে পৌছতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা বিতাড়নে বর্মী সেনাদের বর্বর কৌশল মানবতার ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। নির্যাতিত ও বিপন্ন রোহিঙ্গা জাতিকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিশ্বের দেশগুলো ভীষণভাবে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জলতর হতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে এক অনন্য উচ্চতা লাভ করে। বর্মী সেনাদের হত্যা, ধর্ষণ, গ্রাম জ্বালিয়ে রোহিঙ্গা জাতিসত্তাকে নিধন করার সুকৌশলী প্রক্রিয়া উন্মোচিত হলে নিন্দার ঝড় ওঠে বিশ্বব্যাপী।

প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে গিয়ে নির্যাতিত ও আতঙ্কিত রোহিঙ্গাদের জীবনের নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেন। স্বজন হারানোর ব্যথা দূর না করতে পারলেও জীবনের অনিশ্চয়তার অবসান করে চোখের পানি ঝরিয়েছেন আবার মুছেও দিয়েছেন। তার অতুলনীয় মমত্ববোধ উপলব্ধি করে বিবিসির সংবাদদাতা শেখ হাসিনাকে মানবতার জননী (Mother of humanit)– আখ্যায়িত করেন। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মানবতার বিশাল বোঝা সাদরে মাথায় তুলে নিলে বিশ্ব চমকে ওঠে। বিশ্ব মানবতা জেগে ওঠে, কুটনীতিতে আকস্মিক বাঁক দেখা যায়, মিয়ানমারের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকা দেশগুলো সরে আসতে থাকে সন্তর্পণে।

১৯৬২ সালে সেনাশাসন শুরু হলে সেনাশাসকরা মিয়ানমারের ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীকে অস্বীকার করতে শুররু করে এবং জাতীয় মূল্যবোধ সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতা থেকে সরে গিয়ে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উপর ভর করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মা জাতি মিয়ানমারের জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ ভাগ। বহু জাতিসত্তার দেশ হিসাবে ১৩৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা স্বীকৃতি পেলেও রোহিঙ্গাদের অস্বীকার করে এসেছে শুরু থেকেই। রাখাইন

* নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

ও রোহিঙ্গা সংঘাত ঐতিহাসিক হলেও যা ক্রমেই বেড়েছে রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্কের অনাস্থা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে। রাখাইন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ, কৌশলগত অবস্থান আঞ্চলিক শক্তিদের কাছে মিয়ানমারকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। চীন ও ভারতের কৌশলগত স্বার্থ এবং প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভুত গুরুত্ব পরোক্ষভাবে মিয়ানমারকে উৎসাহিত করেছে রোহিঙ্গা নিধনের মত বর্বর কৌশলে লিপ্ত হতে। রাখাইনে রোহিঙ্গা আধিক্য কমিয়ে জনমিতির নতুন ভারসাম্য তৈরির মনস্তত্ব থেকে ২০১২ সালে জাতিগত দাঙ্গার মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা নিধনের ঘটনা নতুন করে শুরু হয়। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা পুরনে রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ২০১৬ সালে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির মত দলের জন্ম হয় এবং নিপীড়ন বন্ধের উপায় হিসাবে সন্ত্রাসের পথে হাঁটতে শুররু করে। গত বছরের অক্টোবরে তিনটি সীমান্ত চৌকিতে হামলা করলে নতুন করে সেনারা সন্ত্রাস দমনের নামে রোহিঙ্গা বিতাড়নের লক্ষ্যে গণহত্যা, নির্যাতনকে উপায় হিসাবে নিয়ে জাতি নিধনের পথে হাঁটতে শুররু করে। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গণতন্ত্রী নেতা অং সান সুচি সেনাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষমতা প্রদর্শনের বদলে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে গণতন্ত্রের মুল্যবোধকে বিকিয়ে দিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করেছেন নির্দ্বিধায়। বিশ্ব ধিক্কারের মুখে মার্চ মাসে সেনা অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হলেও উগ্র রাখাইনদের রোহিঙ্গাদের উপর নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ রোধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সামাজিক সংঘাত বন্ধ করে সম্প্রীতি তৈরির জন্য কোনো কৌশল তৈরি করেনি।

গত ২৫শে আগস্ট ভোর রাতে উত্তর রাখাইনে নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকিতে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নামের একটি সংগঠন হামলা চালালে ১২ জন নিরাপত্তা সদস্য এবং ৭০ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়। সন্ত্রাস দমনের নামে বর্মী সেনারা বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় দমন-পীড়ন শুরু করে। নিরীহ মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, গ্রাম জ্বালিয়ে রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভুমি থেকে বিতাড়ন করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়। সাথে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদে রাখাইনদের উজ্জীবিত করে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সম্প্রীতির মনস্তত্বকে হত্যা করে সহিংসতা ও বিদ্বেষকে কৌশল বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে বেছে নেয়। সরকারী পৃষ্টপোষকতায় হত্যা, লুন্ঠন, জ্বালাও পোড়াও করে সেখানে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে। এমনকি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ পথে স্থল মাইন পুতে নিরীহ মানুষকে ঘায়েল করার অমানবিক পন্থা অনুসরণ করে। লন্ডন ভিত্তিক আমন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনাল বর্মী সেনাদের মাইন পোতার বিষয়টির সত্যতা পেয়েছে এবং গণহারে গ্রাম জ্বালানোর প্রমাণ তারা হাতে পেয়েছে। ১৬৭টি রোহিঙ্গা গ্রাম জনশূন্য হয়েছে। ৫ হাজারের মত বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, ৪ হাজারের মত মানুষ হত্যা করা হয়েছে। অগণিত নারী সেনাদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এক কথায় মিয়ানমারে সংঘঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ সুস্পষ্ট এবং অসংখ্য। মালোশিয়ার গণআদালত

মিয়ানমার সেনা প্রধান ও অং সান সুচিকে অপরাধী করেছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বিষয়টি এড়িয়ে যাবার সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গণতন্ত্রের নেতা হিসাবে পরিচিত অং সান সুচি'র সরকার রোহিঙ্গা জাতিসত্তাকে অস্বীকার করার সামরিক ফন্দির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তার নৈতিক স্বত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ঘৃণা কুড়িয়েছেন। নোবেল পদকের যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক এবং ১৫ বছর গৃহবন্দী থেকেও সেনাদের জাতি নিধনের পৈশাচিকতায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে রোহিঙ্গা জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে জন্ম দিলেন মানবতার সংকট। বিশ্বের ১২ জন নোবেল বিজয়ীদের যুক্তবার্তা অং সান সুচি'র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে।

নিজেদের অপরাধ ঢাকতে এবং রোহিঙ্গা বিতাড়নের পরিকল্পিত সামরিক প্রক্রিয়াকে বৈধতা দিতে রোহিঙ্গাদের বাঙ্গালি সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে কট্টর ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা ও জাতি নিধনের মত মারাত্মক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। রাখাইন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মিয়ানমারের ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুররুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চীন ও ভারতের মত প্রতিবেশিদের কাছে এবং একে অপরের প্রাধান্য কমাতে প্রতিযোগিতাও রয়েছে। বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির ক্ষেত্র হিসাবে মিয়ানমারের চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমাদের বিনিয়োগের আগ্রহ থেকে জন্ম নেয়া ষ্ট্রাটেজিক স্বার্থ মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা নিধনে উৎসাহিত করেছে। রোহিঙ্গাদের মানবিক অধিকারের বিষয়টি পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গুররুত্ব পেলেও আঞ্চলিক দেশ ভারত ও চীনের প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার পাইনি। তিন সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ বিপন্ন মানবতার কথা তুলে ধরেছে বিশ্বের কাছে। সন্ত্রাস দমনের অধিকার ও আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে সাফাই গাইতে থাকা দেশগুলোর অবস্থান বিশ্ব মানবতার দুঃখ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। গত মার্চে নিরাপত্তা পরিষদে চীন ও রাশিয়া ভেটো দিয়ে মিয়ানমারের বিররুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আটকে দিলে মিয়ানমার আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

মিয়ানমারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গারা অতীতে সম্পৃক্ত ছিল। বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারে দুই নারীসহ ১৭ জন রোহিঙ্গা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। শুধু এমপি-মন্ত্রীই নন, মিয়ানমার সরকারের সচিবসহ শীর্ষ বিভিন্ন পদেও ছিলেন রোহিঙ্গারা। ১৯৯০ সালের নির্বাচনেও সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের চারজন প্রতিনিধি ছিলেন দেশটির পার্লামেন্টে। ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেয়া হয় ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়নের নামে। নাগরিক অধিকার কেড়ে নেবার পাশাপাশি তাদের ভোটাধিকার হরণ করে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এখন মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করে জাতি নিধনের পথে হাঁটছে।

সন্ত্রাসী হামলার শঙ্কার উপর ভর করে মিয়ানমার বিশ্বের কাছে রোহিঙ্গা নিধনকে সন্ত্রাসী নিধনের গল্প তৈরি করে বিশ্বকে বোঝাতে চেষ্টা করলে বিশ্বের বেশিরভাগ

দেশগুলো মেনে না নিলেও ভারত, চীন ও রাশিয়ার মত দেশগুলো তাদের যুক্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রোহিঙ্গা জাতিকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধ। সন্ত্রাসের দমন অভিযানের নামে শিশু-নারীদের হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নিদর্শন এবং সভ্য সমাজ তা মেনে নিতে পারে না। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান সুস্পষ্ট এবং নিজ ভূমি কোন সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করতে না দেবার জন্য সংকল্পবদ্ধ। সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়ে মিয়ানমারের অসত্য বর্ণনাকে অচল করে দিয়েছে। গত ১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসী হামলাকে নিন্দা জানিয়ে সমানভাবে সহিংস সেনা অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অনতিবিলম্বে বন্ধ করে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরির দাবি জানায়। জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানও মিয়ানমার জাতিগত নিধন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এবং জাতিসংঘের মহাসচিব তাকে সমর্থন করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে গত ৯ বছর পর প্রথম বিবৃতির মাধ্যমে সেনা অভিযানে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা, আইন-শৃঙ্খলা ফেরত আনা ও বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা ও শরণার্থী সমস্যার সমাধানের আহবান জানানো হয়। নিরাপত্তা পরিষদের খোলা অধিবেশনে আলোচনার দাবি সোচ্চার হতে থাকে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশ হয়েছে মিয়ানমারকে নিন্দা জানিয়ে এবং অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছে। রেজ্যুলেশনে বলা হয়, ইইউ সদস্যরা ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের জন্য প্রস্তুত এবং মিয়ানমার যেসব বাণিজ্য সুবিধা পেয়ে থাকে সেটি পুনর্বিবেচনা করার বিষয়েও বলা হয়। ৫০-এর অধিক ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য এই যৌথ রেজ্যুলেশন সংসদে নিয়ে আসেন এবং বিতর্কের পরে এটি গৃহীত হয়।

পাশাপাশি রাখাইনে হত্যা, সহিংস ঘটনা, বেসামরিক নাগরিকের সম্পদ ধ্বংস এবং বাস্তুচ্যুত হবার ঘটনায় ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধের জন্য মিয়ানমার সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি জোরালো আহ্বান জানায়।

এছাড়া মিয়ানমার সরকার ও বিশেষ করে স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি'কে আহ্বান জানানো হয় সব ধরনের জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংসতাকে নিন্দা জানানোর জন্য। বাংলাদেশ সীমান্তে ল্যান্ডমাইন সরিয়ে ফেলার জন্য তারা মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

কফি আনান কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়ে রেজ্যুলেশনে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়, ২০১৫ সালের ১৮ মে অং সানর সুচি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র বলেছিলেন, মিয়ানমারের সরকারের উচিৎ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া।

এছাড়া সহিংসতা বন্ধে ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের চীন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, 'আসিয়ান ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ যেন মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ

করে এবং সব বেসামরিক মানুষকে সুরক্ষা ও শরণার্থীদের সহায়তা দেয়। এবং রাখাইনে ত্রাণ পাঠান। নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা হবার পর স্টেটমেন্ট প্রকাশিত হয়।

বিশ্বের প্রতিবাদের মুখে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর এবং সরকারি দল এনএলডি'র নেতা অং সান সুচি জাতির উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ভাষণ দেন। রাখাইনে সহিংসতার নিন্দা করলেও দায় নিরুপণের কোনো চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা কেন পালিয়ে গেছে তিনি জানেন না। সেনা অভিযান বন্ধ করেছেন ইত্যাদি সত্য-মিথ্যার সুন্দর সংমিশ্রণ করে নমনীয় মনোভাবের উপস্থিতি দেখিয়ে বিশ্ববাসির সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে বেশির ভাগ দেশ তার ভাষণ প্রত্যখ্যান করে। অসত্য কথা বলে সেনাদের অপরাধ ঢাকার অপচেষ্টা বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ হয়েছে।এবারের অভিযানের পাশবিকতা বিশ্ব বিবেককে নিদারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বব্যাপি। ভারত, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ অনেক দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। রোহিঙ্গাদের কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় একদিকে যেমন কোন রোহিঙ্গা নেতার অস্তিত্ব নেয় তেমনি নির্যাতিত মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে জিহাদি সংগঠনের জন্য জায়গা প্রশস্ত করেছে। রাজনৈতিক দলের অভাবে কোনো গণ-আন্দোলনের অস্তিত্ব দেখা যায়নি এবং গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে নাগরিকত্বের দাবি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপ লাভ করেনি তথাপি রোহিঙ্গারা সবচেয়ে নির্যাতিত বৃহৎ রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত।

রোহিঙ্গা সংকট তৈরি করেছে মিয়ানমার এবং মিয়ানমারকেই সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গা জাতিসত্তাকে বিলীন করে দিতে বাঙ্গালি অবৈধ অভিবাসী বলে অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষে এবারের সাড়ে চার লক্ষ ও আগের চার লক্ষ শরণার্থীদের বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। রোহিঙ্গাদের প্রলম্বিত অবস্থান অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য ঝুঁকির জন্ম দেবে। নিরাপদ পরিবেশ বিনির্মাণ করে রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সাথে তড়িৎ প্রত্যাবাসন বাংলাদেশের জন্য যেমন অপরিহার্য তেমনি প্রয়োজন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশের বিদেশ নীতি ও পদক্ষেপ খুবই কার্যকরী হয়েছে যদিও শুরুতে অনেকেই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের চতুরমুখী পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বকে রোহিঙ্গাদের পক্ষে আনতে সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছে। শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক সমাধানের পথ শুভফল বয়ে এনেছে সহজেই।

অনেকেই সামরিক শক্তি ব্যবহারের জন্য উত্তেজনাকর ধারণা ছড়ালেও যুদ্ধের উত্তেজনা রোহিঙ্গা ইস্যুকে গৌণ করে ফেলতো সহজেই। মিয়ানমারের আকাশসীমা লঙ্ঘনের বিররুদ্ধে কূটনৈতিক প্রতিবাদকে অনেকেই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বলে

অভিযোগ তুলেছেন। যুদ্ধ মানব ও সম্পদের ধ্বংস বয়ে আনে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে উপনিত হতে পারে না। সে সত্যকে অস্বীকার করে অহংকারের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধকে শৌর্যের প্রতীক গণনা করে উদ্ভট ধারণার জন্ম দিচ্ছে। ২০০০ সালে নাফ যুদ্ধে মিয়ানমারের ৬০০ সৈন্য নিধন করেছেন বলে নির্জলা মিথ্যা বলে বীর সাজছেন। যুদ্ধ হচ্ছে শেষ বিকল্প যখন শান্তিপূর্ণ সকল বিকল্প ব্যর্থ হয় তখন প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের অনুসরিত পররাষ্ট্রনীতি ইতিমধ্যে মিয়ানমারের উপর অচিন্তনীয় আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ ধরে বিশ্বকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। গতবার বাংলাদেশের আলোচনার প্রস্তাবের জবাব দিতে মিয়ানমার দু'মাস সময় ব্যয় করেছিল এবার নিজেরাই আলোচনায় উদগ্রীব হয়েছে।

সমস্যা সমাধানের অনেক অস্ত্র, উপায় ও বহুমুখী কৌশল থাকে। '১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারলে আরো ১০ লক্ষ রোফিঙ্গাকে খাওয়াতে পারবো। দরকার হলে খাবার ভাগ করে খাবো" শেখ হাসিনার এই মমতাভরা কথাগুলো কূটনীতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে বিশ্বের দেশগুলোকে পাশে আনতে। তার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থিতি ও সাইড লাইনের কূটনীতির প্রতিফলন দেখা গেছে ত্রাণের মাত্রা বৃদ্ধি ও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মত তিনটি স্থায়ী সদস্য সহ ৭ দেশের নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহবানের মধ্যে। পশ্চিমা দেশগুলোর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতি নিধনের সরব অভিযোগ এবং মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের চাপ ক্রমাগতভাবে ভারী হচ্ছে। ওআইসি ও আসিয়ান দেশগুলো কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত হয়েছে। ভারত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চাপ বজায় রেখেছে নিজস্ব কৌশল নিয়ে। মিয়ানমারের অনেক পুরোনো বন্ধু হিসাবে চীনের কৌশল রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনের পক্ষে হলেও মিয়ানমারের উপর শান্তিমূলক ব্যবস্থার বিপক্ষে। চীনের কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত হলেও মিয়ানমারের সম্পর্ককে ধরে রেখেই এগুতে চাই।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেয়া ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অবস্থান সুস্পষ্ট করে ৫ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করে সবার নজর কাড়েন। প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপঃ

- অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারের জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করতে হবে।
- দ্রুত মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের একটি বিশেষ অনুসন্ধানী দল প্রেরণ।
- জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মিয়ানমারের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়নে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিশেষ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা।
- রাখাইন রাজ্য থেকে বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গার নিরাপদে ঘর-বাড়িতে প্রত্যাবর্তন এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
- কফি আনান কমিশনের প্রস্তাবনা দ্রুত এবং নিঃশর্ত বাস্তবায়ন করা।

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবগুলো সংকট উত্তরনের উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অতীতে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী ফেরত পাঠিয়েছে কিন্তু স্থায়ী সমাধানকে উপেক্ষা করার ফলে রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ হয়নি এবং বারবার বাংলাদেশকে শরণার্থী ভারে জর্জরিত হতে হয়েছে। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত আছে চিরস্থায়ী সমাধান। ৫টি প্রস্তাবকে একটি সম্পূর্ণ কৌশল অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে অপরাপর ৪টি প্রস্তাবের সামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলেও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিশেষ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলার প্রস্তাবটির অভিনবত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের দ্রুত ফেরত পাঠাবার জন্য এর চেয়ে উত্তম বিকল্প খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুরক্ষা বলয়ের ব্যাপারে হিউম্যান রাইট ওয়াচ নামের আন্তর্জাতিক সংগঠন দ্বিমত পোষণ করেছে বসনিয়া ও শ্রীলঙ্কার তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুরক্ষা বলয়ের ধারণার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে অনন্যতা ও ভিন্নতা রয়েছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নিধন থেকে উদ্ভুত সহিংসতার প্রকৃতি পৃথিবীর অন্যান্য সংঘাতের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। মিয়ানমারের সহিংসতার প্রকৃতির বিবেচনায় প্রস্তাবিত সুরক্ষা বলয়ের ধারণায় নতুনত্ব আছে এবং বাস্তবভিত্তির গভীরতা বেশি। মিয়ানমারের শাসন ব্যবস্থায় সেনা আধিপত্য থাকলেও গণতন্ত্রের সাথে সহাবস্থান লক্ষ্যণীয় এবং মিয়ানমার ভেঙে পড়া রাষ্ট্র নয়। বিকারগ্রস্ত সেনা শাসকদের আধিপত্য হটাতে হলে নবীন গণতন্ত্রের যাত্রা আন্তর্জাতিক নজরদারিতে বেশি নিরাপদ থাকবে। কূটনৈতিক রীতি নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি মিয়ানমারের অতীতের অবজ্ঞা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। মানবতাকে হত্যা করে মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে বেশি দূর এগুনো যাবে না সেটা উপলব্ধি করে সুচি'র উপর বন্দুক রেখে রক্ষা পেতে চেষ্টা করছে সেনা শাসকরা। সার্বিয়ার মেলোসিভেচের মত মিয়ানমারের জেনারেলদের আন্তর্জাতিক আদালতের মুখোমুখি করার পথ প্রশস্ত করার ভেতরে গণতন্ত্র বিকাশের পথ লুকিয়ে আছে তা অং সান সুচির উপলব্ধির বাইরে থাকার কথা নয়। মানবতা রক্ষার দায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। রোহিঙ্গা সংকট উত্তরণে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের দেশগুলো একত্রিত হচ্ছে। মিয়ানমারের পুথিগত জাতি নিধনের রাষ্ট্রীয় কৌশলের বিররুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে। সামরিক সহযোগিতা থেকে সরে এসেছে যুক্তরাজ্য এবং অন্যরাও অনুসরণ করবে অচিরেই। সেনা জেনারেলদের স্বস্তি ও দুর্বৃত্তায়ন কমাতে হবে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ করে। বাংলাদেশ মানবতা রক্ষার জন্য রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সংকট উত্তরনে বিচক্ষণতা ও যৌক্তিক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আছে বিশ্ব দরবারে।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৯. রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান

শাহরিয়ার কবির*

প্রতিবেশি বার্মার রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সে দেশের সামরিক বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। যদিও গত চার দশক বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বোঝা বহন করছে– এতকাল এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খুব একটা উচ্চবাচ্য করেনি। বিষয়টা ছিল বার্মা ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক। মাঝে মাঝে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ইসলামী দেশগুলোর সংস্থা ওআইসি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংঘঠনগুলো রোহিঙ্গা নির্যাতন ও বার্মার সরকারের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সমালোচনা করেছে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিপীড়ন, মানবাধিকার হরণ, হত্যা ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। ১৯৭৮ সাল থেকে নির্যাতিত রোহিঙ্গারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসছে।

শরণার্থীর ইতিহাসের কোনও দেশ এত বেশি সময় এত সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়নি যা বাংলাদেশ দিয়েছে। শুধু রোহিঙ্গা নয়, ১৯৭২ সালে থেকে বাংলাদেশ প্রায় তিন লক্ষ পাকিস্তানিকে আশ্রয় দিয়েছে, যাদের পাকিস্তান ফেরত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নেয়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশকে শরণার্থীর এই বিপুল বোঝা বইতে হচ্ছে– এ নিয়ে বাংলাদেশকে সহানুভূতি জানাবার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমন কথাও বলেছে– কেন আরও রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ আশ্রয় দিচ্ছে না। তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। যারা এক সময় এ নিয়ে বাংলাদেশের সমালোচনা করেছে তারা তখন প্রশংসা করছে।

২৫ আগস্ট বার্মার সামরিক অবস্থানে জঙ্গি হামলা ও হত্যার পর থেকে বাংলাদেশে যে পরিমাণে রোহিঙ্গা শরণার্থী এসেছে এক মাসে তার সংখ্যা চার লাখ অতিক্রম করেছে। 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৫ আগস্ট থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর (২০১৭) পর্যন্ত বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার। এর আগে ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর থেকে দশ মাসে এসেছে ৮৭ হাজার শরণার্থী। ১৯৭৮ সাল থেকে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা যোগ করলে (এই নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত) বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর মোট সংখ্যা নয় লাখেরও বেশি হবে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপো গ্রান্ডি বাংলাদেশে এসে বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কোথাও এত দ্রুততার সঙ্গে শরণার্থী সংকট এমন প্রকট হয়নি।' গত ২৪ সেপ্টেম্বর (২০১৭) কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা

---

* লেখক সাংবাদিক। সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

সাংবাদিকদের জানিয়েছেন জাতিসংঘের হাই কমিশনার। তিনি বলেছেন, 'তারা নারকীয় সব ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। এসব ঘটনা তাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে।' (প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

বার্মায় রোহিঙ্গা নির্যাতন এবং এর কারণে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়টি এতকাল বার্মার অভ্যন্তরীণ বিষয় বা দুই প্রতিবেশি দেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয় হিসেবে পশ্চিমা বিশ্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার মহাজোট সরকারের কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যা এখন আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর (২০১৭) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্মায় রোহিঙ্গা জাতিনিধনের বিবরণ তুলে ধরে এই মানবিক বিপর্যয়ের স্থায়ী সমাধানের জন্য যে পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে জামায়াত-বিএনপি গং তার সমালোচনা করলেও জাতিসংঘের মহাসচিব সহ বিশ্ব নেতারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের মানুষ জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছে, মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে স্মরণকালের নৃশংসতম গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রত্যক্ষ করেছে। এই বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, জাতির পিতার হত্যাকান্ড, নিজ দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন প্রভৃতি যেমন প্রত্যক্ষ করেছে, একইভাবে জাতিগত বিরোধে সংঘাতের পরিবর্তে কীভাবে শান্তি স্থাপন করা যায় সে সব ঘটনাও কাছে থেকে দেখেছে। এসব সমস্যা ও সংঘাতের সঙ্গে বসবাস করা এবং একে মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের যতটা আছে বিশ্বের খুব কম জাতিরই তা আছে। যে কারণে জনসংখ্যার বিপুল ভার এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে বলতে পারেন নিজেরা আধবেলা খেয়ে দশ লক্ষ শরণার্থীকে খাওয়াব– বিশ্বের অন্য কোনও নেতা সেভাবে বলতে পারেন না।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন– ভারত দরিদ্র দেশ, আমরা জানি দারিদ্র্যের সঙ্গে কীভাবে বাস করতে হয়। বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসাও দিচ্ছি। আমি চাই বাঙালি জাতির নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানের পাকিস্তানকে বাধ্য করবার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উদ্যোগী হবেন। অত্যন্ত বৈরি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূলে আনার জন্য ১৯৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছিলেন, ২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা-ই করছেন– সংঘাতের পথ এড়িয়ে শান্তির পথে।

গত এক মাসে টেলিভিশনের বিভিন্ন টক শো-এ এবং গোলটেবিল বৈঠকে জামায়াত-বিএনপির নেতারা এবং তাদের তল্পিবাহক পেশাজীবীরা তারস্বরে বলছেন বাংলাদেশ কেন যুদ্ধ করে আরাকান দখল করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সেখানে পুনর্বাসন করছে না।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর জন্য রাখাইন রাজ্যে যে নিরাপদ বলয় গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, জামায়াত-বিএনপির জোট তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

হেফাজতে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে কক্সবাজারে তারা মহাসমাবেশ করবে। বাংলাদেশের মানুষদের বোঝাবার কোনো দরকার নেই– বার্মায় সামরিক বাহিনী কীভাবে রোহিঙ্গা নিধন করছে। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ এ ক্ষেত্রে এক পঙক্তিতে অবস্থান করছে। হেফাজতিরা যদি কিছু করতে চান তাহলে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে বলুন উম্মাহর স্বার্থে রোহিঙ্গা মুসলিমদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। ২০১৩ সালে মহাতান্ডবের পর শেখ হাসিনার সরকার হাজার হাজার আলেম হত্যা করেছে– এসব মিথ্যাচার করে হেফাজত নেতারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহু অর্থ এনেছেন। রোহিঙ্গাদের সাহায্য করতে চাইলে এই অর্থ তারা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দিতে পারেন। ঘোষিত মহাসমাবেশ করতে গিয়ে হেফাজতের যে টাকা খরচ হবে সেটা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দিলে দলের নেতাদের মিথ্যাচারের গুণাহ খাতা কিছুটা হালকা হতে পারে। রোহিঙ্গাদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে না পারে সেদিকে সবার কঠোর নজর রাখা দরকার।

এবার দূর্গাপূজার প্রাক্কালে 'জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদ' বলেছে পূজার জাঁকজমক যতটা সম্ভব কমিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। তাদের এই ঘোষণা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জামায়াত-হেফাজতী মোল্লাদের মুখে এবার শুনিনি কোরবাণী ঈদের আগে এমন কোনও ঘোষণা দিতে।

বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ সীমিত সাধ্য নিয়ে যেভাবে অসহায় নির্যাতিত শরণার্থীদের পাশে দাড়িয়েছে তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ কথা ঠিক যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আরও কয়েকটি দেশ আশ্রয় দিয়েছে। ২০১২ সাল থেকে তুরস্ক, জর্ডান, লেবানন ও মিশর আশ্রয় দিয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ সিরীয় শরণার্থীকে। এর আগে বহু দেশ আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। তবে এসব দেশে শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার জন্য যেমন প্রচুর জমি আছে, তেমনি তাদের আর্থিক সঙ্গতিও বাংলাদেশের কয়েক গুণ বেশি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নয় লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে পশ্চিমের ধনী দেশগুলোর পাশাপাশি তথাকথিত মুসলিম উন্মাহকে বুঝিয়ে দিয়েছে মানবতার প্রকৃত অর্থ কী।

গত ৮ সেপ্টেম্বর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান এবং বি-মৌলবাদীকরণ ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সুইডেন শাখা। সেমিনারের মূল প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে রোহিঙ্গাদের কথা বলেছি– দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগে জামায়াত কীভাবে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে সাহায্যের নামে তাদের জঙ্গি সন্ত্রাসী বলয়ে রিক্রুট করছে। সেমিনারে উপসালার জাতিসংঘ সমিতির সভাপতি মানবাধিকার নেত্রী মোনা স্ট্রিন্ডবার্গ ইউরোপের দেশগুলোর শরণার্থী নীতির সমালোচনা করে বলেছেন, তারা মানবতাবোধ বিসর্জন দিয়ে সিরীয় শরণার্থীদের বোঝা তুরস্কের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, বলছে তোমরা ওদের রাখো, টাকা যা লাগে আমরা দেব।

সিরীয় শরণার্থীদের অবশ্য জার্মানি ও সুইডেনও আশ্রয় দিয়েছে। তবে দু'বছর আগে ইউরোপে যখন সিরীয় শরণার্থীদের ঢল নেমেছিল তখন পশ্চিমের অনেক সভ্য বিত্তশালী দেশ তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। সিরীয়দের আশ্রয় দিতে না চাইলেও আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো গত ২০ বছরে নেপালে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষাধিক ভূটানী শরণার্থীকে ভাগাভাগি করে গ্রহণ করেছে। মানবতাবাদীদের অনেকে বলছেন মুসলমান হওয়ার কারণে সিরীয় ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমের দেশগুলোর আগ্রহ নেই। জামায়াত ও পাকিস্তানের আইএসআই-র কারণে রোহিঙ্গা যুবকদের ভেতর জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার কীভাবে ঘটছে এ নিয়ে আমরা গত এক যুগ ধরে লিখছি।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল প্রথম বার দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী সৌদি আরবে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিম নিধনের মৃদু প্রতিবাদ করলেও সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যারা অহরহ মুসলিম উম্মাহর কথা বলে মাতম করে– বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সৌদি আরব রাখাইন রাজ্যে তেলের পাইপ লাইন বসাচ্ছে। বাংলাদেশকে কিছু ত্রাণ পাঠিয়ে এবং অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রধান মোড়ল তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। অথচ সৌদি আরব চাইলে দশ লক্ষ রোহিঙ্গা অনায়াসে আশ্রয় দিতে পারত, এতে তাদের তথাকথিত উম্মাহরও মান বাঁচত।

মুসলিম দেশগুলোর ভেতর একমাত্র ব্যতিক্রম তুরস্ক। সুইডেন থেকে গত ১১ সেপ্টেম্বর আমি দশ দিনের সফরে তুরস্ক গিয়েছিলাম টার্কিশ পেন ক্লাবের আমন্ত্রণে। এর ফাঁকে তুরস্কের লেখক, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা ও কোনিয়ায়। বলা বাহুল্য আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল রোহিঙ্গা সমস্যা। তুরস্কের সকল টেলিভিশনে দেখেছি প্রতিদিনের প্রধান সংবাদ– বার্মার নির্যাতিত রোহিঙ্গারা কীভাবে বাংলাদেশে আসছে, কীভাবে থাকছে, বাংলাদেশ কী করছে ইত্যাদি। আঙ্কারায় আমাদের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে তুরস্কের নেতিবাচক মনোভাব এখন আর নেই। বিশেষভাবে গত বছর গুলেনপন্থীদের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশ যেভাবে এর নিন্দা করে সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাতে বাংলাদেশের প্রতি তুরস্কের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার কারণে তুরস্কের সাধারণ মানুষও বাংলাদেশের পক্ষে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে জামায়াতিরা তুরস্ককে সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত করেছিল বটে, তবে হালে তাদের বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্র সেখানে আর কল্কি পাচ্ছে না। আমি তুরস্কে থাকাকালে সে দেশের ফার্স্ট লেডি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের অবস্থা জানার জন্য বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ ছাড়াও তুরস্ক রোহিঙ্গাদের জন্য ১ লক্ষ ঘর বানিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সাহায্য পাঠানো জরুরি, তবে তার চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে বার্মায় চলমান রোহিঙ্গা নির্যাতন/নিধনরোধে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সর্বাত্মক কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো। বাংলাদেশের দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু ভারত সবার আগে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সাহায্য প্রেরণ করলেও রোহিঙ্গা গণহত্যার নিন্দা এখন পর্যন্ত করেনি। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অপর প্রধান বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান করলেও পরবর্তীকালে অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। চীন রোহিঙ্গা নিধনের নিন্দার পরিবর্তে জাতিসংঘে এর বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশের দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে এসব দেশের মনোভাবও পাল্টাচ্ছে।

ভারত, রাশিয়া ও চীনকে এ কথা বোঝাতে হবে– বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর চলমান নির্যাতন ও জাতিগত নির্মূলন বন্ধ না হলে ইসলামের নামে জঙ্গি মৌলবাদের আন্তর্জাতিক বলয় শক্তিশালী হবে এবং সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশ ছাড়াও থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান ও সৌদি আরব সহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী এবং পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-র মদদপুষ্ট বিভিন্ন জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন অর্থের বিনিময়ে রোহিঙ্গা তরুণদের জিহাদের জন্য রিক্রুট করছে। ২০১০ সালে নির্মিত আমার প্রামাণ্যচিত্র 'জিহাদের প্রতিকৃতি'তে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন 'আরএসও' (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন) ও 'হরকতুল জিহাদ'-এর কয়েকজন জঙ্গির সাক্ষাৎকার রয়েছে। তারা বলেছে কীভাবে জামায়াতের মাধ্যমে তারা জঙ্গি কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, কোথায় তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে কীভাবে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে।

রোহিঙ্গা জঙ্গিরা শুধু বার্মায় নয়, বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, বসনিয়া ও চেচলিয়ায় সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। আমি যখন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তখন আইএস-এর উত্থান ঘটেনি। গত ১২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের 'দি টেলিগ্রাফে'-এ নিকোলা স্মিথের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম হচ্ছে– 'Malaysia warns Rohingya crisis could lead to ISIL attacks in Burma.' প্রতিবেদনে মালয়েশিয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি হিশামউদ্দিনের সতর্কবাণী উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা মুসলমান নির্যাতনের সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে 'আইএসআইএল', যার মূল্য দিতে হবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে।

বিভিন্ন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জেনেছি এবং বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নিকটও এ তথ্য রয়েছে যে, ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের একটি অংশ আল কায়দার উপমহাদেশীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিজেদের অবস্থান গুটিয়ে 'আইএস'-ও দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের কর্মপরিধি বিস্তৃত

করতে চাইছে– এ সম্পর্কে গত বছর প্রকাশিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র শ্বেতপত্রে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের আইএসআই-র সহযোগিতায় জামায়াতে ইসলামী কীভাবে কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলায় তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে, কীভাবে তাদের এনজিওগুলো এসব এলাকায় জঙ্গি মৌলবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কীভাবে রোহিঙ্গাদের ভেতর জিহাদী উন্মাদনা ছড়াচ্ছে এ নিয়ে আমরা গত ১২ বছর ধরে লিখছি। আরএসও'র আরবি মুখপত্র 'আল তাদামুন'-এ ইশতেহার ছেপে বার্মায় জিহাদের জন্য অর্থ প্রেরণের জন্য জামায়াত তাদের ইসলামী ব্যাংককে কীভাবে ব্যবহার করেছ– আরএসও-র কমান্ডার ডাঃ মোহাম্মদ ইউনুসের হিসাব নম্বর সহ আমি লিখেছি। আইএসআই এবং জামায়াতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রোহিঙ্গা নির্যাতনের সুযোগ নিয়ে বার্মার আরাকানের একটি অংশ এবং বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজারকে নিয়ে স্বাধীন রোহিঙ্গা মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। এ তথ্য হরকতুল জিহাদের প্রকাশনা* থেকে ১২ বছর আগেই আমরা জেনেছি।

মৌলিক অধিকার হরণ করে কিংবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের বিক্ষোভজনিত বিদ্রোহ কখনও দমন করা যায় না। বার্মার সরকারকে এবং সাধারণ মানুষদেরও এটা বোঝাতে হবে রোহিঙ্গা বা মুসলমান মাত্রেই সন্ত্রাসী নয়। যে কোনো সংজ্ঞা ও আইনে তারা বার্মার নাগরিক। রোহিঙ্গাদের ভেতর কিছু জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আছে এ বিষয়ে আমরা জানি। তার অর্থ এই নয় যে রাখাইন রাজ্যের সবাই সন্ত্রাসী। সামরিক বাহিনী সন্ত্রাস দমনের নামে যেভাবে আরাকানকে রোহিঙ্গাশূন্য করতে চাইছে তার চরম মাশুল শুধু বার্মাকে নয়, প্রতিবেশী সকল দেশ, এমনকি পশ্চিমা বিশ্বকেও দিতে হবে। রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নির্যাতন বন্ধ না হলে জামায়াত, আইএসআই, আল কায়েদা ও আইএস-এর বিশ্বব্যাপী জঙ্গি জিহাদী কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে, ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে।

এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের দমনের জন্য কখনও শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। সন্ত্রাস দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগের সময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হয় জননিরাপত্তাকে। পাকিস্তানে সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে উত্তরাঞ্চলে আমেরিকার ড্রোন হামলায় একজন তালেবান নিহতের পাশাপাশি দশজন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হচ্ছে। যার ফলে 'ফাটা' ও 'কেপি'তে তালেবানদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধির পাশাপাশি আমেরিকার প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্মায় বাণিজ্যিক স্বার্থে চীন, ভারত, রাশিয়া, সৌদি আরব, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিধর দেশ চলমান রোহিঙ্গানিধন উপেক্ষা করছে বটে, যখন একের পর এক ৯/১১-এর মতো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটবে তখন বোঝা যাবে আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। চলমান রোহিঙ্গা নিধনকে কেন্দ্র করে বার্মার প্রতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেভাবে সমালোচনা, নিন্দা ও ঘৃণা

* উর্দুতে প্রকাশিত এ গ্রন্থের নাম 'তাযকেরায়ে আরাকান।' লেখখ ঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক আরাকানী, প্রকাশক ঃ হরকতুল জিহাদ আল ইসলামী বার্মা, প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৯৭

বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্তিমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বার্মার স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কও বিপর্যস্ত হবে। এ কারণে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী অনাবাসী বার্মিজদেরও বার্মায় চলমান সংখ্যালঘু জাতিসত্তা নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বার্মায় জাতিনিধনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেভাবে তার প্রশংসা করেছে– বার্মা স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত এবং কিছুটা কোনঠাসা হয়েছে, যার কারণে তাদের প্রতিনিধি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বার্মার সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। বিএনপি-জামায়াতের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করবে, দেশে সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে এবং সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে পাকিস্তানের মতো আমেরিকা ও ন্যাটোর যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। এটি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের আইএসআই-এর নীল নকশার অন্তর্গত। পাকিস্তান সেই সব আফগান ও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে যারা তাদের সন্ত্রাসী বলয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সহানুভূতি যেহেতু বেড়েছে বাংলাদেশের উচিৎ হবে ওআইসি ও পশ্চিমের দেশগুলোকে অনুরোধ করা– যতদিন পর্যন্ত শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত এর ভার যেন মিলিতভাবে বহন করা হয়। এর পাশাপাশি রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের জন্য বাংলাদেশ ও বন্ধুদেশগুলো আন্তর্জাতিক আদালত (ICC)-এর শরণাপন্ন হতে পারে। মালয়েশিয়া গত সপ্তাহে ইটালির 'পার্মানেন্ট পিপলস কোর্ট'কে আমন্ত্রণ জানিয়ে গণআদালত বসিয়ে বার্মার বিচার করেছে, যার রায়ে বার্মার সরকারকে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে বার্মার বিচারে বহু দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা আগ্রহী হবে, যার উদ্যোগ বাংলাদেশ নিতে পারে।

বার্মার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গানিধনের উদ্যোগ নিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল গ্রহণ করেছে। তাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে রাখাইন রাজ্যকে রোহিঙ্গামুক্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে অং সান সু চিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। সেনাবাহিনী বার্মার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় রয়েছে সু চির দল 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' (এনএলডি)। ২০১৫ সালের নির্বাচনে সু চির দল জাতীয় সংসদের ৮৬% আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। দেশে ও বিদেশে সু চির জনপ্রিয়তা বার্মার সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই সুনজরে দেখেনি। সেনাবাহিনী যত নির্যাতনই করুক রোহিঙ্গা সংকট তীব্রতর করা এবং চলমান গণহত্যার দায় সু চিকেই নিতে হবে। সেনাবাহিনী এবং তার নির্বাচকমন্ডলিকে তুষ্ট করবার জন্য সু চি আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের ঘটনা যেমন অস্বীকার করছেন তাদের যাবতীয় মৌলিক অধিকারও অস্বীকার করছেন। এরপর সামরিক বাহিনী যদি আবার ক্ষমতা দখল করে সু চির পক্ষে হৃত ভাবমূর্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না।

এর বিপরীত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেখিয়েছেন কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে জাতিবিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। এর ২০ বছর পর সর্বাধিক সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে তিনি মানবতার মানসপ্রতিমার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ মাসের শুরুতে ২০ দিনের ইউরোপ ও তুরস্কের কয়েকটি শহরে গিয়ে দেখেছি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এখন উজ্জ্বল।

সরকারের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– ১) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তালিকা তৈরি করা, ২) তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করা, ৩) সরকারি-বেসরকারি-আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বিত করা, ৪) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া, যাতে কোন মহামারী ছড়িয়ে না পড়ে, ৫) বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা এবং ৬) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। রোহিঙ্গারা শরণার্থী নয়– 'অনুপ্রবেশকারী', এ ধরনের কথা বলা হলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সৃষ্ট সহানুভূতি হারাবে।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে নিরাপত্তার বিষয়কে। বান্দরবানের অধিকাংশ মাদ্রাসা এখন 'আরএসও' সহ বিভিন্ন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। কক্সবাজার ও বান্দরবান সহ গোটা পার্বত্য অঞ্চলের মাদ্রাসা ও মসজিদ কঠোর নজরদারিতে রাখতে হবে, যাতে করে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। বাংলাদেশ বার্মাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সীমান্তে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছে। একই ধরনের প্রস্তাব ভারত, রাশিয়া ও চীনকেও বাংলাদেশ দিতে পারে। বাংলাদেশের এই তিন বন্ধু রাষ্ট্র কমবেশি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসের শিকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালেই দক্ষিণ এশিয়ায় জঙ্গি সন্ত্রাস দমনের জন্য যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিষয়টি এখন আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

১০. বার্মায় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ ঃ আন্তর্জাতিক আদালতে অপরাধীদের বিচারের বাস্তবতা

তুরিন আফরোজ*

রোহিঙ্গারা পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী। ধর্মের বিশ্বাসে এরা অধিকাংশই মুসলমান। রাখাইন স্টেটের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল রোহিঙ্গা। এরা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে

* সদস্য সচিব, বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন ও সাবেক প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

নিপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলোর একটি। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সেদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, রোহিঙ্গা মুসলমানরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের সরকারের মতে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা হল বাংলাদেশি, যারা বর্তমানে অবৈধভাবে মিয়ানমারে বসবাস করছে।

ইতিহাস বলে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যীয় মুসলমান ও স্থানীয় আরাকানিদের সংমিশ্রণ ছিল এই জাতির মধ্যে। পরবর্তীকালে চাটগাঁইয়া, রাখাইন, আরাকানি, বার্মিজ, বাঙালি, ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্যীয়, মধ্য এশীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়দের মিশ্রণে উদ্ভুত এই শঙ্কর জাতি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভাষাভিত্তিক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিজেদের রাজ্য ছিল। মিয়ানমার সরকারের দাবি– রোহিঙ্গা মুসলমানরা হল ভারতীয়, বাঙালি ও চাটগাঁইয়া সেটলার, যাদেরকে ব্রিটিশরা আরাকানে এনেছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, ব্রিটিশরা তদানীন্তন বার্মায় শাসক হিসেবে আসার কয়েক শতাব্দী আগে হতেই রোহিঙ্গা মুসলমানরা আরাকানে একটি জাতি হিসেবে বিকশিত হয়েছিল।

মিয়ানমার সরকার তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার না করায় সকল প্রকার নাগরিক ও মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রোহিঙ্গা মুসলমানরা। মিয়ানমারে ভ্রমণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পরিচয়পত্র থাকা খুব জরুরি। কিন্তু সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের পরিচয়পত্র ইস্যু করে না। ফলে এমনিতেই পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠী আরও পিছিয়ে পড়ছে।

মিয়ানমারের সরকারের ভূমি ও সম্পত্তি আইন অনুসারে বিদেশিরা কোনো সম্পত্তি ও ভূমির মালিক হতে পারে না। রোহিঙ্গা মুসলমানরা সরকারের দৃষ্টিতে অবৈধ অভিবাসী তথা বিদেশি। তাই তারা কোনো ভূমি বা স্থায়ী সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। বর্তমানে তারা যে সকল ভূমিতে বসবাস কছে, সরকার চাইলে যে কোনো মুহূর্তে সেগুলো দখল করে নিতে পারে।

সরকারি নিপীড়নের সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাখাইনসহ অন্যান্য বৌদ্ধ আরাকানিদের উস্কানি দিচ্ছে অবশ্য সরকার নিজেই। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে বৌদ্ধ মৌলবাদে সরাসরি ইন্ধন ও মদদ যোগাচ্ছে তারা।

সুচি-র বক্তব্য

মিয়ানমারে যে রোহিঙ্গা নির্যাতন নিপীড়ন নিধন চলছে সেই ব্যাপারে প্রথম দিকে মিয়ানমার সরকারের ডি-ফ্যাক্টো প্রধান শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচি নীরব থেকেছেন। গত ২৫ আগস্টে রাখাইন রাজ্যে একটি পুলিশ ক্যাম্পে হামলার পর সামরিক অভিযান চালায় দেশটির সেনাবাহিনী। অভিযানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। হত্যা করা হয় নিরীহ মানুষদের। পুড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়িঘর। এরপর বিষয়টি নিয়ে কথা না বলায় আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়েন সুচি।

তারপর মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নিধন অভিধান নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তিনি। এই ভাষণে যে সব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো হল ঃ

- আনান কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশ মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন সুচি।
- সীমান্ত সুরক্ষায় বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায় মিয়ানমার। সুচি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে চাই।
- সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা জানিয়েছেন সুচি। তিনি বলেন, সব সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের সুরক্ষা দিতে আমরা প্রতিজ্ঞ।
- অনেক মুসলমানের বাংলাদেশে চলে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন। শরণার্থী হিসেবে যারা বাংলাদেশে গেছে যে কোনো সময় পরিচয়পত্র পর্যবেক্ষণ করে তাদের ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত মিয়ানমার।
- মুসলমানদের সব বসতি নষ্ট হয়নি দাবি করে রাখাইন পরিদর্শনে কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানান সুচি। তিনি জানান, সহিংস ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত হবে।
- সুচি বলেছেন, কোনো রকম আন্তর্জাতিক চাপকে ভয় করে না মিয়ানমার। রাখাইনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানান তিনি।

জাতির উদ্দেশে দেয়া সুচির এই ভাষণ আমাদেরকে হতাশ করেছে, কারণ মূল বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে কতগুলো চটকদার কথাই শুধু বলেছেন। উপরন্তু তিনি এও বলেছেন যে, মিয়ানমার কোন রকম আন্তর্জাতিক চাপকে ভয় করে না। তাহলে তো পুরো ব্যাপারটি হয়ে গেল শুভঙ্করের ফাঁকি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘে জোর দাবি জানিয়েছেন। একটি গণহত্যার স্বীকৃতি যখন হয় না তখন এটি অন্য একটি গণহত্যার পথকে সুগম করে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে ৫ দফা দাবি তুলে ধরেছেন। এই ৫ দফা প্রস্তাব হল–

১. অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা।
২. অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা।
৩. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা।
৪. রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
৫. কফি আনান কমিশনের সুপারিমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গণআদালত

১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মত বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ফরাসী মনীষী জাঁ পল সার্ত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে গণ আদালতের আয়োজন করেন। এই গণআদালত ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর অনুপ্রেরণায় ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয় তাও জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘন ইস্যুতে ইটালির পার্মানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অনেকগুলো প্রতীকী বিচার ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। গত সপ্তাহে এই ট্রাইবুনালের উদ্যোগে মালয়েশিয়াতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা বিষয়ে একটি প্রতীকী বিচার সম্পন্ন হয়েছে এবং রায়ে বার্মায় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য সে দেশের সরকারকে দায়ী করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের বিচার

আজকে বিশ্বে গণহত্যা বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত রয়েছে যার নাম হল International Criminal Court বা আইসিসি। কেন মিয়ানমারকে আইসিসি আইন অর্থাৎ Rome Statute 1998 এর অধীনে বিচারের মুখোমুখি করবার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্ব সচেষ্ট হচ্ছে না? Rome Statute এর ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ৩ উপায়ে আইসিসিতে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে বিচার করা সম্ভব।

প্রথম উপায়টি হল, Rome Statute এর পক্ষভুক্ত কোনো রাষ্ট্র যখন নিজেই তার রাষ্ট্রীয় সীমানার অধীনে সংঘটিত গণহত্যার বিচারের ব্যাপারে অপারগতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে বিচারের দাবিতে আইসিসিতে আবেদন জানায়। এমনকি কোনো রাষ্ট্র যদি পক্ষভুক্ত নাও হয়ে থাকে তবে বিশেষ ঘোষণা দিয়ে সে আইসিসিতে বিচারের আবেদন জানাতে পারে। কিন্তু যেহেতু মিয়ানমার রাষ্ট্র নিজেই মুসলমানদের উপর সচেতনভাবে এই গণহত্যা সংঘটিত করছে সেহেতু আমরা আশা করতে পারি না যে, মিয়ানমার এই কাজ করবে। মিয়ানমার রাষ্ট্র Rome Statute এর পক্ষভুক্ত রাষ্ট্র নয় এবং সঙ্গত কারণেই ঘোষণা দিয়ে এই গণহত্যার বিচার তারা আইসিসিতে চাইবে না। তাহলে Rome Statute ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপায় থাকে আর মাত্র দুইটি।

একটি হল, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রেজ্যুলেশন পাস করে মিয়ানমারে মুসলমানদের উপর সংঘটিত গণহত্যার বিচারের বিষয়টি আইসিসিতে রেফার করে পাঠাতে পারে। ইতোমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ মিয়ানমারে মুসলমানদের উপর সংঘটিত গণহত্যার বিচারের উপর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তবে এখনও তারা এ ব্যাপারে আইসিসিতে বিচারের কোনো রেজ্যুলেশন পাস করেনি।

Rome Statute এর ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শেষ যে উপায় রয়েছে তা হল, আইসিসির প্রসিকিউশন টিম স্বপ্রণোদিত হয়ে মিয়ানমারে মুসলমানদের উপর সংঘটিত গণহত্যার সুষ্ঠু

তদন্ত করে মিয়ানমার রাষ্ট্রকে আইসিসিতে বিচারের মুখোমুখি করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দেখছি আইসিসির সংশ্লিষ্ট টিম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ বার্মায় গণহত্যার ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে কঠিন প্রতিকূলতা মোকাবেলা করছে। আমাদের সঙ্গে কিছু বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রও রয়েছে যারা সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু বিষয়টি শুধু শরণার্থী সহায়তার নয়, আরও ব্যাপক। এখানে একটি আইনি লড়াইয়েরও সুযোগ রয়েছে। গণহত্যাকারী রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। শুধু ত্রাণ-সহায়তার আশ্বাস দিয়ে, কিংবা সমালোচনার ঝড় তুলে বার্মায় রোহিঙ্গা নিধন বন্ধ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক মহলের উচিৎ গণহত্যাকারী মিয়ানমার রাষ্ট্রকে আইসিসিতে বিচারের মুখোমুখি করা।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যার বিচারিক প্রক্রিয়া

Rome Statute ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইসিসি প্রসিকিউশন স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের তদন্ত সাপেক্ষে আইসিসিতে মিয়ানমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে বিচারিক কার্যক্রম শুরু করতে পারে। অনেকে অজুহাত দেখান যে, আন্তর্জাতিক আদালতে কোনো রাষ্ট্রের বিচার করতে গেলে তাদের সম্মতি নেয়া জরুরি। এই কথাটি International Court of Justice (ICJ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ICJ হল জাতিসংঘের কাঠামো অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক আদালত। আইসিসি জাতিসংঘের কাঠামো অন্তর্ভুক্ত কোনো আন্তর্জাতিক আদালত নয়। আইসিসির কার্যক্রম পরিচালিত হয় ১৯৯৮ সালের Rome Statute অনুযায়ী। সুতরাং আইসিসিতে মিয়ানমারের বিচার করার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সম্মতি গ্রহণ করা জরুরি নয়। এছাড়া আইসিসিতে প্রসিকিউশন-এর পক্ষে স্ব-প্রণোদিতভাবে তদন্ত কার্যক্রমের সূত্রপাতের প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে ২০১০ সালে কেনিয়াতে, ২০১১ সালে আইভরিকোস্টে অথবা ২০১৬ সালে জর্জিয়াতে আইসিসি প্রসিকিউশন ভাবে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ সহ অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে স্ব-প্রণোদিতভাবে তদন্ত ও মামলার কাজ শুরু করেছে। তাই বিশ্ববাসীর উচিত হবে যথা দ্রুত সম্ভব আইসিসি প্রসিকিউশন-এর কাছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর সংঘটিত গণহত্যা ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণের যোগান দিয়ে তাদেরকে মিয়ানমারের গণহত্যার তদন্তের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য আবেদন জানানো।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে– এক, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা ইত্যাদি অপরাধের বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত এবং আইনি প্রমাণ আমরা কোথায় পাব? এবং দুই, এই গণহত্যা ইত্যাদি অপরাধের বিষয়ে আমরা কার ওপর দায়ভার অর্পণ করব? রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যার কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি অনুসন্ধানে জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিস ইয়াংঘি লী এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০-২৩ তারিখ মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের কক্সবাজার পরিদর্শনে আসেন। তার পরিদর্শন শেষে জাতিসংঘের Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) একটি

রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে মিয়ানমারে যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে চলেছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

OHCHR রিপোর্ট অনুযায়ী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর সেখানকার সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং তাদের মদদ প্রাপ্ত উন্মত্ত জনতা নির্দ্বিধায় ব্যাপক ভাবে গণ-ধর্ষণ, শিশু হত্যা, নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন, গুম এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনে ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। ইয়াংঘি লী যাদের সাথে কথা বলেছেন তাদের বেশির ভাগই স্বচক্ষে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিহত হতে দেখেছে। অনেকের পরিবারের সদস্যরা এখনও উধাও রয়েছে। শিশুদের এমনকি যাদের বয়স ৮ বছর, ৫ বছর অথবা মাত্র ৮ মাস তাদেরকেও জবাই করে মেরে ফেলা হচ্ছে।

OHCHR এর রিপোর্টে আরও জানা যায় যে ইয়াংঘি লী তার পরিদর্শনের সময় মোট ১৯১ জন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নারী দাবি করেন তারা মিয়ানমারে ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকারের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। একজন নির্যাতিতা নারী জানান তাকে যখন মিয়ানমারের সেনাসদস্যরা ধর্ষণ করছিল তখন তার ৫ বছরের কন্যা তাকে বাঁচাতে গেলে সেনাসদস্যরা তার সেই কন্যাকে হত্যা করে। ঠিক একইভাবে OHCHR রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় যে একজন নির্যাতিতা নারী যখন ৫ জন সেনা সদস্য দ্বারা গণ ধর্ষণের স্বীকার হচ্ছিলেন তখন তার চোখের সামনেই নির্যাতনকারী সেনা সদস্যরা তার ৮ মাসের সন্তানকে হত্যা করে।

OHCHR রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাড়িঘর, স্কুল, হাট-বাজার, দোকান, মাদ্রাসা এবং মসজিদ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। তাদের খাদ্য শস্য, ক্ষেতখামার এবং গবাদি পশু সমুহ লুট করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাদের বাসস্থান এবং দেশ হতে জবরদস্তি বিতাড়িত করা হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি মালায়শিয়ার আন্তর্জাতিক গণআদালতের রায় অনুযায়ী মিয়ানমারের সেনা সদস্য, পুলিশ এবং তাদের মদদ প্রাপ্ত জনগণ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ সহ নানা প্রকার ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটন করছে। এই গণআদালতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য আইনজ্ঞ এবং মানবাধিকার নেতারা অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা রকম তথ্য-উপাত্ত, এমনকি ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা মুসলমানদের পক্ষে জবানবন্দীও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সকল কিছুর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক গণ আদালত মিয়ানমারকে গণহত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তার রায় ঘোষণা করে।

এছাড়াও আমাদের দেশি এবং বিদেশি গণমাধ্যম কর্মীরা নিয়মিতভাবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধন নির্যাতনের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করে চলছে। বর্তমানে ৮ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তাদের লিখিত বক্তব্য, অডিও ভিজ্যুয়াল ফুটেজ সংগ্রহ করে আইসিসি প্রসিকিউশন-এর কাছে দাখিল করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমার রাষ্ট্রের গণহত্যা, নির্যাতন সহ অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে তথ্য উপাত্ত বা প্রমাণাদি অভাব হবে না।

এখন প্রশ্ন হল মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর সংঘটিত অপরাধের দায়ভার কার উপর বর্তাবে? আমরা জানি অপরাধগুলো সংঘটনের পেছনে রয়েছে সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং তাদের মদদপ্রাপ্ত মিয়ানমারের উন্মত্ত জনতা। Rome Statute অনুযায়ী অপরাধীদের উপর দুই ধরনের দায়ভার অর্পণ করা যায় ঃ ১) ব্যক্তিগত অপরাধের দায়ভার (Individual Criminal Responsibility) এবং ২) ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের দায়ভার (Superior Responsibility).

আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে প্রথম দফাতেই নেত্রীস্থানীয় অপরাধীদের বিচার শুরু করা হয়। এরপরে আমরা দেখি সরাসরি Superior Responsibility-র জন্য ১৯৪৫ সালে ম্যানিলার ট্রাইব্যুনালে জাপানি জেনারেল ইয়ামাশিতার মৃত্যুদণ্ড হয়। মিয়ানমারের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছে তার দায়ভার সে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপর বর্তায়। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করা উচিত তারা হলেনঃ মিয়ানমারের ডি-ফ্যাক্ট সরকারের প্রধান অং সান সুচি, মিয়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিন অং হিলেইং (Senior General Min Aung Hilaing), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. জেনারেল কায়া সুই (Lt. General Kzaw Swe), প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লে. জেনারেল সেইন উইন (Lt. General Sein Win) এবং সীমানা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী লে. জেনারেল ইয়ে অং (Lt. General Ye Aung)।

উপসংহার

অনেকে প্রশ্ন করেন– আন্তর্জাতিক বিশ্ব কি মিয়ানমারের উপরে শুধুমাত্র কূটনৈতিক চাপই সৃষ্টি করবে? মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করলে তা কি কূটনৈতিক তৎপরতাকে ব্যাহত করবে? আমরা মনে করি মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সবধরনের চাপ প্রয়োগই জরুরি এবং গণহত্যা বন্ধের জন্য আইন প্রক্রিয়া গ্রহণ একই সাথে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘকালের সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটেনি।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

১১. বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন-এর উদ্দেশ্য ও বিবেচ্য বিষয়

এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক*

বার্মায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর চলমান গণহত্যা বিশ্ববিবেককে প্রকম্পিত করলেও এ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বহু

* চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচার

দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গণহত্যার নিন্দা করলেও চলমান গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধের জন্য এখন পর্যন্ত বার্মার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বার্মার রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর দীর্ঘকালের বৈষম্য, নির্যাতন, বাস্তুচ্যুতি, হত্যা ও সন্ত্রাসের কারণে তাদের ভেতর বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিদ্রোহ ও জঙ্গি মৌলবাদ যেভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তা শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বার্মার সামরিক বাহিনীর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের একটি অংশের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সংবাদ প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। বার্মার সামরিক বাহিনীর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বাস্তুচ্যুত প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশে অপ্রত্যাশিতভাবে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, পরিবেশ ও জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমূহ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ বিপন্নদের পাশে দাঁড়ালেও রোহিঙ্গাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে একটি চিহ্নিত মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের প্রতিনিধিরা 'বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করেছেন। এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে দলনিরপক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্যঃ এই কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্মায় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিবেক জাগ্রত করা এবং জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে চাপ দেয়া। যদিও জাতিসংঘের মহাসচিব এবং রিফিউজি কমিশনার বার্মার ঘটনাকে নারকীয় গণহত্যা বলে উল্লেখ করেছেন, তা থামানোর দাবি জানিয়েছেন। দাবি করেছেন বার্মা থেকে বিতাড়িত লোকদের ফেরত নেওয়ার, তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার– তা সত্ত্বেও এগুলো কার্যকর করার মতো কোনো পদক্ষেপ বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা এখন পর্যন্ত নিতে পারেনি। কেন পারেনি আমরা তা পর্যালোচনা করব।

বাংলাদেশের পর সবচেয়ে বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে মালয়েশিয়ায়। গত মাসে (১৮-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে রোমে অবস্থিত 'পিপল্‌স পার্মানেন্ট কোর্ট' রোহিঙ্গানিধনের জন্য বার্মার সরকারের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক গণআদালত' বসিয়েছিল। এই গণআদালতের রায়ে বার্মার সরকারকে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়েছে। এই ধরনের গণআদালতের আইনগত ভিত্তি না থাকলেও আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই গণআদালতের কার্যক্রমও আমাদের কমিশন পর্যালোচনা করবে।

জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন (Advisory Commission on Rakhaine State) বার্মার অং সান সু চির সরকারের নিকট একটি ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদান করেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ

পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যে ৫ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন সেখানে আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

আনান কমিশনের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের নজরে এসেছে। নয় সদস্যের এই কমিশন যৌথভাবে গঠন করেছে বার্মার সরকার এবং কফি আনান ফাউন্ডেশন। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেও বাকি আট সদস্যের ভেতর ছয়জন বার্মার সরকারের প্রতিনিধি। ২৪ আগস্ট (২০১৭) আনান কমিশনের রিপোর্ট বার্মার সরকারপ্রধান দাও অং সান সু চির নিকট হস্তান্তরের রাতেই বার্মার নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকটি স্থাপনার উপর জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে, যাকে অজুহাত করে বার্মার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আনান কমিশনের প্রতিবেদনে স্বাভাবিকভাবেই চলমান গণহত্যার উল্লেখ নেই, তবে প্রচ্ছন্নভাবে সন্ত্রাসের উল্লেখ রয়েছে। আমাদের কমিশনের প্রতিবেদনে আনান কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বার্মার সরকার, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ

১) বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও গণবিতাড়নসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা।

২) আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন অনুযায়ী রোহিঙ্গারা কীভাবে বার্মার বৈধ নাগরিক তা প্রমাণ করা।

৩) বার্মায় ধারাবাহিক রোহিঙ্গা নির্যাতন এবং তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়নের কারণ অনুসন্ধান এবং বন্ধের জন্য করণীয় নির্দেশ।

৪) বার্মার সরকার, সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা যায় কিনা।

৫) রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বার্মা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে কি না।

৬) সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য 'আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি' এবং রোহিঙ্গাদের অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কোনও দায়-দায়িত্ব আছে কি না, থাকলে কতটুকু এবং এ ব্যাপারে করণীয়।

৭) রোহিঙ্গাদের ভেতর জঙ্গি মৌলবাদ বিস্তারের কারণ এবং রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে কিনা এবং এ বিষয়ে ভারত এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে কিভাবে সতর্ক করা যায়।

৮) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিবেচনা।

৯) বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, পরিবেশ, জন নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার উপর কী ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং

১০) আনান কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কি করা প্রয়োজন– এই সব বিষয় কমিশন বিবেচনা করবে।

আমাদের কমিশনের অস্থায়ী দফতর হবে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় (গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২)। আগামী এক সপ্তাহের ভেতর কমিশনের প্রথম বৈঠক আহ্বান করা হবে, যেখানে পরবর্তী কার্যক্রম চূড়ান্ত হবে। এ মাসের ভেতর কমিশন কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে আমরা তিন থেকে চার মাসের ভেতর আমাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

১১ অক্টোবর ২০১৭

১২. দৈনিক সমকালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

'বাংলাদেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধি দলের মিয়ানমার যাওয়া উচিত'

– সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের*

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের পঞ্চাশের দশকে তার গুরু বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরসহ ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এর প্রধান। গুরু শুদ্ধানন্দ ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের জন্য দেশের বাইরেও বিপুল সমাদৃত ও সম্মানিত। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘের সহ-সভাপতি। সমাজসেবায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে। এ ছাড়াও ১৯৯৭ সালে অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক, ২০০৫ সালে বাংলা একাডেমি ফেলো পুরস্কার, ২০০৭ সালে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পদক লাভ করেন। তার জন্ম ১৯৩৩ সালে চট্টগ্রামে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে বর্ণিত হলো–

সমকাল ঃ আপনি জানেন, রাখাইনে কীভাবে রোহিঙ্গাবিরোধী সহিংসতা চলছে। শরণার্থীদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বৃহত্তর চট্টগ্রামে...

সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ এই মুহূর্তে দেশের পরিস্থিতি খুবই জটিল। বাংলাদেশ এমনিতেই জনবহুল দেশ। তার ওপর নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাপ। কিন্তু আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও এভাবে প্রতিবেশী দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে বিপদ মোকাবেলা করেছিলাম। একাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে, তার পরিবার বন্দি ছিল একটি বাড়িতে। সেখানে হাতেগোনা যে ক'জন খবরাখবর আদান-প্রদান করতে পারত, আমি তার একজন ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের এই মহাবিহারে নেতৃস্থানীয় অনেককে আমরা লুকিয়ে রেখেছিলাম। গোপন দু'টি কক্ষে তারা থাকতেন। দুই-একজন ছাড়া বিহারেরও কেউ জানতেন না। বঙ্গবন্ধু আমার গুরুকে ও আমাকে ভালোবাসতেন। আমরা যখনই

* সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও সহসভাপতি, বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংঘ

প্রয়োজন, তার কাছে গেছি। ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের চরম বেদনাহত করেছিল। শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর তার সঙ্গে আমরা দেখা করেছি। তিনিও এখানে এসেছেন। সব সময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি মনে করি, এখনকার সংকটের সময়ও জাতীয় ঐক্য জরুরি। সবাই মিলে এ সংকট উত্তরণ করতে হবে।

সমকাল ঃ আমরা জানি, এ বছরের মার্চে আপনি মিয়ানমার গিয়েছিলেন। তখন দেশটির 'স্টেট কাউন্সেলর' অং সান সু চির সঙ্গেও আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ সময় কি রোহিঙ্গা বা রাখাইন ইস্যুতে আপনাদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম মূলত আমার মাসি ও মেসোমশাইয়ের সমাধিস্থলে সম্মান জানাতে ও প্রার্থনা করতে। এ সময় সু চি আমাকে 'দান' দিতে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আপনার পিতার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমাদের এলাকায় তার সফরেও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু অকালে নিহত হওয়ার কারণে আর পারেননি। আপনার পিতার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল। তারাও মিয়ানমারেরই মানুষ। বাংলাদেশে শরণার্থী হয়ে তারা খুবই কষ্টের জীবনযাপন করছে। অত্যন্ত অবমাননাকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। আপনি আরাকানে তাদের জন্য একটি অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেন, যেখানে তারা শান্তিতে থাকতে পারবে। আমি বলেছিলাম, আপনাদের অনেক পর্বত জনবসতিহীন। এর একটা দিয়ে দিলেই বাংলাদেশে আটকে থাকা পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা থাকতে পারবে। আরাকানে হাজার বছর ধরে সবাই মিলে-মিশে থেকেছে। আপনি চাইলে এখনও সে পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারেন।

সমকাল ঃ এর উত্তরে তিনি কী বলেছিলেন?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ অন্যান্য বিষয়ে তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে এই বিষয়ে তিনি কেবল মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। কোনো জবাব দেননি বা কোনো মন্তব্য করেননি।

সমকাল ঃ সু চির পিতার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ কীভাবে?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ আমার গুরু বিশুদ্ধানন্দ মহাথের দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুবই পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার সঙ্গে জেনারেল অং সানের যোগাযোগ ছিল। তারা প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। ১৯৫২ সালে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পর অনেক বিখ্যাত মানুষ এখানে এসেছেন। ১৯৬০ সালে থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল ও রানী এসেছিলেন। আমাকে একবার চীনের প্রেসিডেন্ট চৌ এন লাই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন– ভিক্ষু আপনি, কী চান? তাকে বলেছিলাম– কিছুই চাই না। শুধু অতীশ দীপঙ্করের চিতাভস্ম পেলে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই। তিনি সেখানকার সন্তান। আমাদের এই মহাবিহার আচার্য অতীশ দীপঙ্করের সেই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করছে। আমাদের আলোচনা শেষে আপনাকে নিয়ে যাব। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন– কী চান? আমি বলেছিলাম, ভারতে বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য একখণ্ড জমি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিলেন। আমাদের এ অঞ্চল আসলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তিনি অন্য ধর্মের কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়

পিছপা হননি। বাংলাদেশেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব ধর্মের মানুষকে মাতৃ-মমতায় আগলে রেখেছেন। আমরা বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করে এসেছি। খ্রিস্টানরা পরে এসেছে এ অঞ্চলে; কিন্তু তারাও আমাদেরই মানুষ। একে অপরের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছি।

সমকাল ঃ রাখাইনে যে সংকট দেখা দিয়েছে; এ ক্ষেত্রে কী করার আছে?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ সেখানে সহিংসতা দেখা দেওয়ামাত্র আমরা কিন্তু নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছি। ঈদের আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়েছি আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে। এই মহাবিহারে টিভি চ্যানেলগুলো এসেছে। আমরা বলেছি, রাখাইনে যা কিছু ঘটছে, খুবই দুঃখজনক। সেখানে মানবতা লঙ্ঘিত হচ্ছে। অং সান সু চির প্রতি আহ্বান জানিয়েছি, অনুরোধ জানিয়েছি– দৃঢ়হস্তে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন। আমরা ২০ লাখ বৌদ্ধ যেভাবে বাংলাদেশে শান্তিতে বসবাস করছি, রাখাইনেও রোহিঙ্গারা যেন সেভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আমাদের ধর্মের অন্যরা এসব দাবিতে মানববন্ধন করেছেন, মিয়ানমার দূতাবাসে স্মারকলিপি দিয়েছেন। আমি নিজে অসুস্থ থাকায় কক্সবাজার যেতে পারিনি। কিন্তু আপনি দেখবেন, আমাদের বৌদ্ধ সমাজের মানুষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে সাধ্যমতো দাঁড়িয়েছে।

সমকাল ঃ রাখাইনের এই সহিংসতা বাংলাদেশে কি কোনো অস্বস্তি তৈরি করছে?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। ধর্মীয়ভাবে আমাদের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু সামাজিকভাবে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি। পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। যেমন এই মহাবিহার থেকে ১০ বছর ধরে আমরা রোজাদারদের ইফতার করাই। আমাদের বিদ্যালয়ে সব ধর্মের মানুষ পড়াশোনা করতে পারে। ফ্রি পড়াশোনা। আমাদের এখান থেকে ১২ জন মুসলিম শিশু এখন এমএ পাস করেছে। আমরা বিহার থেকে সবার জন্য পানি ফ্রি করে দিয়েছি। আশপাশের যার প্রয়োজন নিয়ে যাবে। আমার সহকর্মীদের বলা আছে, আমি একজন গরিব ভিক্ষু, কিন্তু কেউ যেন আমাদের এখানে এসে ফিরে না যায়। সবার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব। বায়তুল মোকাররমের আগের খতিব, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার খুবই হৃদয়তা ছিল। আমরা একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতাম, আলোচনা করতাম। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের এই সম্প্রীতির ঐতিহ্য এত ঠুনকো নয় যে, কোনো একটি ঘটনায় ভেঙে পড়বে। তারপরও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অতীতে কিছু গোষ্ঠী এই সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা করেছে। তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নয়। ফলে সরকারকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

সমকাল ঃ রাখাইনে বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো কেন?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ এটা আসলে ধর্মীয় সমস্যা নয়, সামাজিক সংকট। রোহিঙ্গাদের মধ্যে মুসলিম বেশি; কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধও রয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলিম রয়েছে। কারণ যাই হোক, বাংলাদেশকে এই সংকট দেখতে হবে মানবিকভাবে। তাদের আশ্রয় দিতে হবে। আবার তারা যাতে

নিজের দেশে ভালোভাবে ফেরত যেতে পারে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে; সেই চেষ্টাও চালাতে হবে। আমি মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে দু'হাত তুলে আবেদন জানাই– এদের ফিরিয়ে নিন। নিজের দেশে থাকতে দিন। বাংলাদেশ এমনিতেই জনবহুল, সেই সঙ্গে দুর্যোগপ্রবণ। আমরা চাইলেও আমাদের সামর্থ্য সীমিত। আমি চাই– বিশ্ববিবেক জাগ্রত হোক। মিয়ানমার ছাড়াও চীন, ভারত– সবাই রোহিঙ্গাদের সংকটকে মানবিক দিক থেকে দেখুক।

সমকাল ঃ রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বলছে, রাখাইনে আইন- শৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় রাখাইন জনগোষ্ঠী ছাড়াও কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুও তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়। তারা রোহিঙ্গাদের বিররুদ্ধে সাধারণ রাখাইনদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হচ্ছে অহিংসা; সকল জীবের প্রতি প্রেম। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ। আমি বিশ্বাস করতে পারি না– কোনো ভিক্ষু কারও বিররুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারেন। যদি কেউ ধরে থাকে, তাহলে সে প্রকৃত ভিক্ষু নয়। আমি রাখাইনের ভিক্ষুদের প্রতি আবেদন জানাই– আপনারা বরং রোহিঙ্গাদের রক্ষায় এগিয়ে আসুন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের অভয় দিন, হামলাকারীদের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ কররুন। বলুন– এরা আসলে ধর্মের শত্রু, মানবতারও শত্রু।

সমকাল ঃ তিব্বতের ধর্মীয় গুরু দালাই লামাও অং সান সু চির কাছে চিঠি লিখেছেন। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে গৌতম বুদ্ধের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন। তার এ আহ্বান কি মিয়ানমার আমলে নেবে?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ আমি দালাই লামাকে সমর্থন করি। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ মানুষ। সর্বশেষ ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হয়েছিল। তিনি মঞ্চে উঠেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমরা মতবিনিময় করেছি। তিনি সু চিরও ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী। মিয়ানমারের উচিত তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

সমকাল ঃ বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি দল কি মিয়ানমার যেতে পারে সেখানকার সরকার ও ভিক্ষুদের বোঝানোর জন্য?

শুদ্ধানন্দ মহাথের ঃ আমি তো মনে করি, যাওয়াই উচিত। বাংলাদেশের একটি বৌদ্ধ প্রতিনিধি দল মিয়ানমার যাওয়া উচিত। কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টিও ভাবতে পারে। আমার নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যদি সরকার প্রয়োজন মনে করে। আমি গেলে অং সান সু চির সঙ্গে অবশ্যই দেখা ও কথা হবে। তিনি এর আগেরবার এক লাখ মানুষ নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি তাকে বলব, আপনি মিয়ানমারের নেতা। মিয়ানমারের সব অধিবাসীর নেতা। বাংলাদেশের মানুষও আপনাকে অনেক ভালোবাসে। আপনি যখন কারাগারে ছিলেন, তখন আমরা বাংলাদেশ থেকে আপনার মুক্তি কামনা করেছি। আপনার মুক্তির দাবি করেছে সবাই। আপনি রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দূর করে দিন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ শেখ রোকন

জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০১৭

১৩. রোহিঙ্গা গণহত্যা ঃ বাংলাদেশে মানবতা বনাম সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত

শাহরিয়ার কবির*

বার্মার সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত পরিকল্পিত রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সোচ্চার হলেও বার্মা থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন বন্ধ এবং শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী গত ২৫ আগস্ট থেকে ৩ নবেম্বর পর্যন্ত ৭০ দিনে ৬ লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এর সঙ্গে পুরনো ৪ লক্ষ যোগ করলে বাংলাদেশকে এখন ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর বোঝা বইতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারণে বিপন্ন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছেন। পশ্চিমা গণমাধ্যম তাকে 'মানবতার জননী' হিসেবে অভিহিত করেছে। কঠিন সত্য হচ্ছে– বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ বোঝা বেশিদিন বহন করা সম্ভব নয়।

রোহিঙ্গা সংকটের ভয়াবহ প্রতিঘাত অনুসন্ধানের জন্য আমরা ১১ অক্টোবর (২০১৭) 'বার্মার গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করেছি। গত ২১-২২ অক্টোবর কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুল হুদার নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে প্রায় দুইশ, ভুক্তভোগী জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তিনজন প্রাক্তন বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর দুজন প্রাক্তন মেজর জেনারেল ও পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক সহ বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা।

জবানবন্দিতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা বার্মার সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় মগদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিবরণ দিয়েছেন। অন্যদিকে রোহিঙ্গা হিন্দু শরণার্থীরা বলেছেন তারা জঙ্গি রোহিঙ্গা মুসলিমদের সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার কারণে চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ও দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নাগরিক কমিশনের সদস্যরা ত্রাণ, পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসন কেন্দ্রের এবং সেনাবাহিনী ও বিজিবির সহযোগিতাও পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে

---

* লেখক সাংবাদিক। সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ রয়েছে বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর। গত ৭০ দিনে কক্সবাজারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর আকস্মিক আগমনে এলাকায় পরিবেশ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে আশঙ্কা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা সাময়িকভাবে মোকাবেলা করা গেলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রতিঘাত বাংলাদেশের জন্য প্রলয়ঙ্করী হতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং কক্সবাজারের রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের নেতারা নাগরিক কমিশনকে জানিয়েছেন–

১) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বনবিভাগের যে ৩ হাজার একরেরও অধিক জমি বরাদ্দ করা হয়েছে সেখান থেকে বন উজাড় হয়ে গিয়েছে। রোহিঙ্গারা নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কেটে তাদের আবাস নির্মাণ করছে, পরিবেশের উপর যা সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশে বনাঞ্চল কমতে কমতে জাতিসংঘের হিসেবে এখন ১০%-এ দাঁড়িয়েছে, যা প্রয়োজনের চেয়ে ১৬% কম।

২) বনাঞ্চলে যত্রতত্র ঘর বানাতে গিয়ে রোহিঙ্গারা না জেনে বন্যপ্রাণীর আবাস ধ্বংস করে দিচ্ছে। দু সপ্তাহ আগে বান্দরবানে ৮ জন রোহিঙ্গা বন্য হাতির পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। বন্য হাতির আবাস ও চলাচলের পথে বনবিভাগের সতর্কিকরণ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে, যা রোহিঙ্গারা পড়তে পারেনি। বন্য হাতি তার আবাস খুঁজে না পেলে স্বাভাবিকভাবেই লোকালয়ে হামলা করবে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর কারণে এলাকায় বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

৩) কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়া উপজেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হলেও জীবিকার প্রয়োজনে তাদের অনেকে স্থানীয় শ্রমবাজারে ঢুকে পড়েছে। এলাকার বাঙালি ও পাহাড়ী দিনমজুররা সারাদিন যে কাজ করে চার/পাঁচশ টাকা আয় করত রোহিঙ্গারা সে কাজ এক'শ/দেড়'শ টাকায় করছে। যার ফলে স্থানীয় কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের ভেতর রোহিঙ্গাদের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বাড়ছে। অথচ এসব এলাকার মানুষই সবার আগে রাখাইন রাজ্য থেকে আগত আহত, বিপর্যস্ত রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

৪) কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়ায় বাঙালি জনসংখ্যার তিনগুণেরও বেশি এখন রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা। রোহিঙ্গাদের একটি অংশের ভেতর সন্ত্রাস প্রবণতা আগে থেকেই ছিল। তারা আবাস নির্মাণ করতে গিয়ে ফসলের জমি নষ্ট করছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাঁশ, গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ শিবিরের বাইরে এসে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দোকানও ফেঁদে বসেছিল। বাধা দিতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রোহিঙ্গাদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসন এসব সংঘাতের ঘটনা প্রচার করছে না।

৫) নতুন করে আসা শরণার্থীদের সঙ্গে চার লাখের মতো পুরনো শরণার্থীর যোগাযোগ নতুন কোনো বিষয় নয়। রোহিঙ্গা যুবকদের অনেকে মাদক ও অস্ত্র পাচারের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। নতুন আসা রোহিঙ্গা যুবকদের অনেক এরই মধ্যে চুরি-

ডাকাতি-খুন-জখমের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে মানব পাচার ও দেহব্যবসা। এ পর্যন্ত পুলিশ দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আট শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে শিবিরে ফেরত এনেছে। শিবিরের বাইরে যেতে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করছে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য সন্ত্রাসীচক্র।

৬) রোহিঙ্গারা বহু বছর ধরে নিজেদের দেশে স্বাস্থ্য সুবিধা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ৩০ বছরের নিচে শতকরা ৯০ ভাগ রোহিঙ্গা জীবনে কখনো টিকা বা ইঞ্জেকশন নেয়নি। স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত রেখে একটি জনগোষ্ঠীকে যেভাবে বার্মার সরকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে তা গণহত্যার অন্তর্গত। এশিয়ার দেশগুলোর ভেতর সবচেয়ে বেশি এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে বার্মায়। শরণার্থী শিবিরে এ পর্যন্ত ৫৫ জন এইডস আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে কলেরা ও উদরাময় যে কোনো সময়ে মহামারীর রূপ ধারণ করতে পারে, যা স্থানীয়দের ভেতরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৭) কুতুপালং ও উখিয়া উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেগুলো সরকারে বিভিন্ন ত্রাণ ও সেবা কার্যক্রমের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই নবেম্বরে আরম্ভ হওয়ার কথা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা, বর্তমানে যার কোনও সম্ভাবনা নেই। শরণার্থীজনিত সংকটের কারণে আমাদের শিশুদের শিক্ষাজীবনও বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

৮) রোহিঙ্গারা ত্রাণসামগ্রীর পাশাপাশি নগদ অর্থ সাহায্যও পাচ্ছে। পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় স্থানীয় বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গাদের অনেকে বাজার থেকে বেশি দামে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনছে। এর পাশাপাশি কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পেও ধ্বস নেমেছে। যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

৯) শরণার্থী রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ পুঁজি করে জামায়াত-বিএনপি এলাকায় সরকারবিরোধী প্রচারণা করছে। তারা বলছে হাসিনা সরকারের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে। রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধ হয়নি, শরণার্থীরাও কখনও ফিরে যেতে পারবে না; অথচ খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে বার্মা দুই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী ফেরত নিয়েছিল। এসব প্রচারণা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগের কিছু তরুণ কর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে– আমাদের নেত্রীর এত উদার হওয়া, এত মানবতা দেখানো ঠিক হয়নি।

১০) সরকারবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারণার জন্য জামায়াত সমর্থক তিনটি এনজিওর কার্যক্রম বন্ধ করা হলেও ত্রাণের নামে বহু জামায়াতি প্রতিষ্ঠান এখনও রোহিঙ্গা তরুণদের মগজে জিহাদ ও জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসের বিষ ঢোকাচ্ছে। তারা বলছে বাংলাদেশ চাইলেই যুদ্ধ করে আরাকান দখল করে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। জামায়াতীদের জিহাদী প্রচারণা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য সমূহ হুমকির কারণ হতে পারে। বাড়তি পুলিশ দিয়ে রোহিঙ্গা শিবিরে জামায়াতের জঙ্গি জিহাদি তৎপরতা

বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্থানীয় তরুণদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করা, যারা জঙ্গি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

১১) কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে জামায়াতের উদ্যোগে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর যে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছিল বহু রোহিঙ্গা যুবক এতে অংশগ্রহণ করেছিল। জামায়াতিরা এখন বিভিন্ন বৌদ্ধ এলাকায় প্রচার করছে– যেহেতু বার্মার সামরিক বাহিনী ও বৌদ্ধরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নির্যাতন করছে– বাংলাদেশে কোনো বৌদ্ধ থাকতে পারবে না, এ দেশের সব বৌদ্ধকে বার্মায় পাঠিয়ে দিতে হবে। একই ভাবে হিন্দু প্রধান এলাকায় এসব মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা প্রচার করছে– ভারত ৪০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে আশ্রয় দিতে চাইছে না, বাংলাদেশের সব হিন্দুকে ভারতে তাড়িয়ে দিতে হবে। তারা রোহিঙ্গাদের ভেতর ত্রাণকার্যে নিয়োজিত খৃষ্টান এনজিওদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে– নাকি এসব এনজিও রোহিঙ্গাদের খৃষ্টান বানাচ্ছে। জামায়াত এবং তাদের অপরাপর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সহযোগিদের এসব সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে রামু ও নাসিরনগরের চেয়ে ভয়াবহ বহু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনা আগামীতে ঘটতে পারে। বিশেষভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কক্সবাজারে জামায়াত-বিএনপি রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্ব, দারিদ্র ও ক্ষোভকে পুঁজি করে বহু ঘটনা ঘটাতে পারে। তারা এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় দরিদ্র বাঙালিদের ক্ষোভও পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার বোধে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রতিবাদে একাধিক সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে। আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলেছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছি– বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি প্রতিনিধি দল বার্মা পাঠাবার জন্য। সরকার উদ্যোগী হলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বর্ষীয়ান ধর্মীয় নেতা সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের'র নেতৃত্বে এ দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি প্রতিনিধি দল বার্মায় শান্তি সফরে গিয়ে সরকার প্রধান অং সান সু চি ও সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের এ কথা বলতে পারেন– চলমান রোহিঙ্গা নির্যাতন ও গণহত্যা শুধু ভগবান বুদ্ধের শান্তির ধর্মকে কলঙ্কিত করছে না, বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও বিপন্ন করতে পারে। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীতে জঙ্গি মুসলিম মৌলবাদীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে, যার ব্যানারে লেখা ছিল– 'সব বৌদ্ধকে হত্যা কর!' সন্ত্রাসের কাছে ধর্ম পরাজিত হবে– এটা কোনো ধর্মের অনুসারীই চাইতে পারেন না।

বার্মার রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যারা দায়ী তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে (ICC) বিচারের জন্য আমরা একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিয়েছে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন'। রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধের জন্য বার্মার উপর যত রকমের চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব সবই করতে হবে।

দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আগামী কয়েক বছরে বার্মায় প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমরা দেড় মাস আগেই সরকারকে বলেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত বার্মার সরকার আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না করছে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জাতিসংঘের সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে। ইতিপূর্বে জাতিসংঘের উদ্যোগে নেপালে আশ্রয় নেয়া দেড় লাখেরও বেশি ভূটানি শরণার্থীকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো ভাগ করে নিয়েছে। জাতিসংঘের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর সংস্থা ওআইসি এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে। তুরস্ক ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে দুই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা সেসব দেশেও পাঠানো যেতে পারে। বার্মায় গণহত্যার শিকার বিপন্ন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে মানবতার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হলে তার কঠিনতম মূল্য বাংলাদেশকে তো দিতে হবেই, অন্যান্য দেশও রেহাই পাবে না।

পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সম্পর্ক নিয়ে গত চার দশক ধরে লিখছেন সন্ত্রাস ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াতের জামানায় বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় জঙ্গি মৌলবাদীদের বোমা হামলার পর আমরা জামায়াত ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে গঠিত ১২৫টি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা প্রকাশ করেছিলাম, যার ভেতর ১৭টি ছিল রোহিঙ্গাদের। এগুলোর ভেতর 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও) সবচেয়ে পুরনো ও সংগঠিত, যার সদর দফতর করাচীতে। 'আরএসও'র সঙ্গে পাকিস্তানের 'লস্কর-ই তৈয়বা' ও 'জামাত উদ দাওয়া'র ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অজানা নয়। ২০১২ সালে 'লস্কর-ই তৈয়বা' ও 'আরএসও' পাকিস্তানে রোহিঙ্গাদের নিয়ে সম্মেলন করেছে 'দিফা-এ মুসলমান আরাকান' নামে। একই বছর লশকরের দুই নেতা শহীদ মোহাম্মদ ও নাদিম আওয়ান গোপনে বার্মা-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘুরে গেছেন।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দ্বিতীয় বৃহৎ সংগঠন 'হরকত-উল জিহাদ আরাকান'-এর সদর দফতরও করাচিতে। এই সংগঠনের প্রধান আবদুস কুদ্দুস বর্মী পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে করাচীতে বসে বিদেশি সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এবং আরাকানে স্বাধীন রোহিঙ্গা মুসলিম রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। পাকিস্তানের শীর্ষ জঙ্গি মৌলবাদী নেতা হাফিজ সাঈদের সঙ্গে এক মঞ্চে বর্মীর ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। হুজি আরাকানের নতুন ফ্রন্ট হিসেবে এখন বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে তৎপর হয়েছে 'আকা উল মুজাহিদীন'। গত বছর (২০১৬) ৯ অক্টোবর এই সংগঠনই মংদুর তিনটি পুলিশ চৌকিতে হামলা করেছিল যাতে বার্মার নিরাপত্তা বাহিনীর নয় জন নিহত হয়েছিল। এর জবাবে সেই সময় মংদুতে নিরাপত্তা বাহিনী যে ব্যাপক হামলা করেছিল তার কারণে প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা তখন বাংলাদেশে এসেছিল।

বার্মায় রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ না হলে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বেশি দিন বাংলাদেশে অবস্থনে করলে তাদের জঙ্গি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ

শুধু বৃদ্ধি পাবে না, পাকিস্তানের 'আইএসআই', 'আলকায়দা' ও 'আইএস' এই অঞ্চলে জিহাদের ক্ষেত্র প্রসারিত করবে, যার অভিঘাত থেকে বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন, রাশিয়া কেউই মুক্ত থাকবে না। এই অঞ্চলে ভারতের কাশ্মীর, রাশিয়ার চেচনিয়া বা চীনের সিনকিয়াঙের মতো দীর্ঘমেয়াদী জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হবে, যদি ভারত, চীন ও রাশিয়া সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এগিয়ে না আসে। অনেক দেশ মানবতার মর্ম বুঝতে অক্ষম হলেও তারা নিজেদের নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। নিজেদের বিপদ বুঝতে পারলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আরও সক্রিয় হবে।

৫ নবেম্বর ২০১৭

১৪. রোহিঙ্গাদের টেকসই সমাধান না দিতে পারলে আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টের দায় বর্তাবে এশিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রের উপর

মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুর রশীদ (অব.)*

মিয়ানমার থেকে ৬ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গা জনস্রোত কমলেও এখনও থামেনি। বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত ও রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে রোহিঙ্গারা চিহ্নিত। বহু জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত মিয়ানমারে ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী বারে বারে নিষ্পেষিত হয়েছে সেনা শাসকদের হাতে। উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করে সেনাশাসকরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার প্রয়াস হিসাবে রোহিঙ্গা বিতাড়ন করছে। রাখাইন রাজ্যের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে রোহিঙ্গা মুক্ত করার অমানবিক ও পৈশাচিক কৌশল মিয়ানমারকে আরো ভঙ্গুর করলেও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে রাজনৈতিক শক্তি ও সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচিকেও অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দুর্বল করেছে। গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচি'র সম্মানের মুকুটগুলি একে একে স্খলিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মানবতার বিপর্যয় ঠেকাতে রুরুখে দাঁড়াবার মত নৈতিক সাহস বিবর্জিত হয়ে বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হচ্ছেন। তিন মাসের অধিক সময় পার হলেও মিয়ানমার সরকার তাদের নাগরিকদের ফেরত নেবার কোন প্রক্রিয়া শুরু না করলেও এশিয়া ইউরোপের আসেম সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক কূটনীতি সমাধান খুঁজতে সক্রিয় ওঠে। একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক সমাধানের ইঙ্গিত বহন করলেও বাস্তবতার নিশ্চিত পরিবেশ দেখা যায়নি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে তুলে ধরা প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির প্যাটার্ন থেকে সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে বিশ্ব মোড়লদের বিভাজন স্পষ্ট। তবুও ১৩৫ দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও চীন, রাশিয়া ও আসিয়ান জোট

* নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

বিপক্ষে ভোট দিলেও বাংলাদেশের জনগণ বেশি আহত হয়েছে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার বন্ধুদেশগুলো নির্বিকার ভূমিকায়। রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস ঢাকায় রোহিঙ্গাদের মানবিক বিপর্যয় রুখতে নির্বিকার থাকার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে ঘিরে উন্নয়নের অর্থনৈতিক বলয় তৈরি করে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়ে বাংলাদেশ এগুতে চাইছিল। চীনের এক অঞ্চল এক পথ উদ্যোগে যোগ দিয়ে চীনের সাথে উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়িয়ে উন্নয়নের নতুন পথে পা দিয়েছিল বাংলাদেশ। রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক ও সামরিক সহযোগিতার মাত্রাকে বাড়িয়ে ঐতিহাসিক বন্ধুকে জড়িয়ে ফেলেছিল। ভারতের সাথে সমন্বিত সম্পর্ক প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়েও উঁচুতে রেখেছিল। মিয়ানমারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ধরে রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রোহিঙ্গাদের নিজ বাস্তুভিটায় ফেরত পাঠানোর বাংলাদেশি প্রচেষ্টা এবং সংঘাত নিরসনে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা বিষয় উত্থাপিত হলেও চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতার কারণে মিয়ানমারের বিররুদ্ধে কোন কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি দিয়েও পিছিয়ে এসেছে। রোহিঙ্গা জাতি নিধনের কারণে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠেছে। মিয়ানমারের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা কমেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র জাতীয়তাবাদের চর্চা সামাজিক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতাকে আঘাত করেছে ফলে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন মিয়ানমার সফরকালীন অং সান সুচি'র নেতৃত্বে নবীন গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবরোধ আরোপের পথ থেকে সরে আসেন।

মিয়ানমারে ইউরোপ ও এশিয়ার ৫১টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের সম্মেলন (আসেম) হয়ে গেল। সেখানে রোহিঙ্গা নিয়ে কোন আনুষ্ঠানিক এজেন্ডা না থাকলেও রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল। চারটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারে যাবার প্রাক্কালে ঢাকা ঘুরে রোহিঙ্গা সমস্যা সচক্ষে অবহিত হয়েছিলেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসে রোহিঙ্গা সংকট উত্তরণের উপায় ও কৌশল নিয়ে কথা বলেন। ন্যাপিডো গিয়ে সেনাপ্রধান ও অং সান সুচি'র সাথে আলোচনা করে উদ্যোগী হয়ে চীনের পক্ষ থেকে তিন দফার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। তাৎক্ষণিক অস্ত্রবিরতি, রোহিঙ্গা গমন বন্ধ করা, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত আনা ছিল প্রস্তাবের মূল কাঠামো। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনায় বসে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমস্যা নিরসনে নিযুক্ত হলে চীনের মুখরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শান্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে মিয়ানমারকে মুক্ত রাখা যাবে। রোহিঙ্গা সমস্যার উপর ভর করে পশ্চিমা শক্তির উপস্থিতি চীন হুমকি হিসাবে দেখছে। দক্ষিণ চীন সাগরের সামরিক উত্তেজনা, উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষার ফলে মার্কিনী সামরিক উপস্থিতি চীনের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। চীনের বাণিজ্য ও সরবরাহ সমুদ্র পথ মালাক্কার মত ঝুঁকিপূর্ণ প্রণালি দিয়ে প্রবাহিত। মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছানো চীনকে কৌশলগতভাবে বিকল্প

সরবরাহ ও বাণিজ্য পথ খুলে দিয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তার মাত্রাকে উঁচুতে উঠিয়েছে। স্বভাবতই স্থিতিশীল মিয়ানমার চীনের কাছে অনেক গুররুত্বপূর্ণ।

চীনের দূতিয়ালি সংকট উত্তরণে যৌক্তিক সমাধানে কার্যকরী হবে অনেক বেশি। চীনের দূতিয়ালির তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপের দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা ইতিমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মিয়ানমার সরকার ও সেনাপ্রধানকে শান্তির পথে নিয়ে আসতে চীন এখন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমারের সেনাপ্রধান চীন সফরে গিয়েছিলেন এবং স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি অনুসরণ করেছেন। মিয়ানমারকে যৌক্তিক সমাধানে বাধ্য করার চীনা প্রয়াস যথেষ্ট গুররুত্ব বহন করছে। প্রাথমিক সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের নীতিগত ঐক্যমত্য তৈরি করলেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা না হলে স্থায়ী ও টেকসই পদ্ধতি খুঁজে পেতে অনেক পথ হাঁটতে হবে। তাই চীন চেষ্টা করবে সমতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হতে দুই দেশকে সমানভাবে উৎসাহিত করতে। শেষ ধাপে রাখাইন রাজ্যের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। ভারত চীনের উদ্যোগকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতের কৌশলগত স্বার্থ ও বিনিয়োগের সুরক্ষার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটোর মুখে কোনো প্রস্তাব না উঠলেও পরিষদ সভাপতির ভাষণ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রত্যাবাসনের দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে মিয়ানমার হুমকি দিলেও পুরোনো পথেই হেঁটেছে। ভূ-রাজনীতির খাদে পড়ে রোহিঙ্গা সংকট ঘনীভূত হয়েছে বেশি। সমাধানের পথে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধানের পক্ষে থাকা দেশগুলো মূলত মিয়ানমারকে সুরক্ষা দিতে চাচ্ছে। সেনা পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে বিশ্ব মানবতা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি সোচ্চার। বিশ্বের মানুষের দাবির মুখে মিয়ানমারকে দায়মুক্তি দেয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী দেশগুলোও চাপে আছে। সন্ত্রাসের বিররুদ্ধে অভিযানের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে বলে চীন ও রাশিয়া অনেক খোঁড়া যুক্তি তুলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে খুন, ধর্ষণ, শিশুহত্যা, যৌনদাসী ও গ্রাম জ্বালিয়ে জাতি নিধনের অধিকার কোন রাষ্ট্রের নেই। দ্বিপাক্ষিকভাবে সংকট উত্তরণ একটি সঙ্গত অজুহাত হবে এবং কূটনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

সীমিত সম্পদ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রোহিঙ্গাদের বোঝা বহন করা বাংলাদেশের জন্য দুষ্কর। নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ক্ষোভ ও দুর্ভোগকে পুঁজি করে জঙ্গিবাদে যুক্ত করা অসম্ভব নয়। রোহিঙ্গারা নিঃসন্দেহে জ্বিহাদী মতাদর্শে উজ্জীবিত জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে পরিণত হলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার অতিমাত্রার ঝুঁকির বলয়ে রয়েছে, ঝুঁকির বিস্তৃতি চীন ও আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলোতেও ঘটবে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকারসহ তাদের বাস্তুভিটায় পুনর্বাসিত করা অত্যন্ত জররুরি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেতু ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দেশ হিসাবে মিয়ানমারের ভূ-রাজনৈতিক গুররুত্ব অপরিসীম। ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর জন্য চীনের স্থলপথ এবং ভারতের পূর্বমুখী নীতির ক্ষেত্র। ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারের স্তম্ভ হিসাবে চীনের কাছে আদরণীয়। দেশটির নতুন বাজার

ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা সবাইকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ দেশটি থেকে সুবিধা পাওয়া দেশগুলো স্বভাবতই আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে মিয়ানমারকে সমর্থন দিয়ে যাবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূমিকা খুব অর্থবহ। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে চলমান আন্তর্জাতিক কূটনীতি নিজ নিজ দেশের স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থের বলয় থেকে বের হতে পারেনি। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আশু প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিরোধ না থাকলেও সমস্যা উত্তরণের উপায় নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

মার্কিনী উদ্যোগের তীব্রতা এবং বিশ্বনিন্দার মুখে মিয়ানমারকে অন্ধভাবে সমর্থন দেয়া দেশগুলোর মধ্যে অনড় চীনকে এখন দূতিয়ালির ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার সমর্থনের কারণে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের পথে বড় কাঁটা হয়ে থাকা চীনের উদ্যোগ সমাধানের পথ খুলে দিয়েছে। রাশিয়া ও ভারতের সমর্থন উদ্যোগকে বেগবান করবে। শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক সমাধান খুঁজতে ভারতের কূটনীতিকরা যোগাযোগের মাত্রা আগের থেকে বাড়িয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে চীন তার স্বার্থ আদায় করার কৌশল হিসাবে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা, সেনা অভিযানের নামে রোহিঙ্গা জাতি নিধন ও গণহত্যা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছে না। রোহিঙ্গা নির্যাতন ও বিতাড়নকে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত করে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার নীতিতে এখন অটল। অপর দিকে মার্কিনীরা মিয়ানমারের সহিংসতার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ি করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর।

২৫শে আগস্টে ৩০টি সীমান্তরক্ষী ফাড়িতে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নামের সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলাকে অজুহাত করে সেনাবাহিনীর চালানো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে হত্যা, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রাণঘাতী পরিকল্পনা মিয়ানমার সেনাবাহিনী অনেক আগে থেকেই করে রেখেছিল এবং সন্ত্রাসী হামলাকে উপলক্ষ করে তা কার্যকরী করেছে মাত্র। অং সান সুচি'র রাজনৈতিক সরকার নির্বিকার ছিল। আরসা সন্ত্রাসীদের অস্তিত্বের বাস্তবতা থাকলেও তাদের সংগঠনটি আকারে ছোট, নেতৃত্ব দুর্বল, অপ্রশিক্ষিত এবং দেশিয় অস্ত্রের বাইরে কোন আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার করতে পারেনি। হাতে তৈরি কিছু বোমা দেখা গেলেও আরসা দমন করতে সেনাদের অনিয়ন্ত্রিত বল প্রয়োগ ছিল অচিন্তনীয় এবং বহুল মাত্রায় অতিরিক্ত। অসংখ্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। গণহত্যার সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে সেনাবাহিনী। সব রোহিঙ্গাকে হত্যা না করলেও তাদের বিতাড়ন করে জাতি নিধনের পুঁথিগত উদাহরণ হিসাবে জাতিসংঘের আখ্যা পেয়েছে। নিরীহ মানুষের উপর অনিয়ন্ত্রিত সহিংসতার দায়ভার চিহ্নিত করার আন্তর্জাতিক দাবির মুখে সেনাদের সাথে সমঝোতা করে ভাগাভাগি করে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকা গণতন্ত্রী নেতা অং সান সুচি সেনাদের দায়ি না করে বরঞ্চ নিজে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে সহিংসতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলেছেন। সেনাদের তৈরি করা সংবিধান মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুলভাবে জয়ী হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতার ভাগাভাগিতে রাজনৈতিক সরকার আদতে ক্ষমতাহীন রয়ে গেছে।

গত ৬৫ বছরের সামরিক শাসন কালে সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শান, কারেন, কাচিন, কারেনিস, মন, চিন সহ হাজার হাজার সংখ্যালঘুদের হত্যা করেছে। তবে জাতিনিধন ও গণহত্যার শিকার হয়েছে রোহিঙ্গারা। কারণ– সেনাদের মুসলিম ভীতি আতংকে রূপ নিয়েছিল। মিয়ানমারের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বর্মণ বাদে অন্য সব জাতি গোষ্ঠি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহ করেছে। মূলত ১৯৬২ সালের সেনা অভ্যুত্থান হয়েছিল নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের ফেডারেল পদ্ধতি চালু বন্ধ করতে। সেনাবাহিনী উগ্র বৌদ্ধ **জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার বঞ্চিত করে জনপ্রিয় থেকে ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকতে** চেয়েছে।

মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অর্ধশত বছরের সামরিক শাসনে অভ্যস্ত সেনাকর্তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে কখনই সম্মত ছিল না। পশ্চিমা বাণিজ্যিক ও অস্ত্র অবরোধের মুখে গণতন্ত্রের পথকে উন্মুক্ত করলেও নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে নিজেরাই সংবিধান তৈরি করে নির্বাচনের আয়োজন করলে পশ্চিমারা যেমন স্বস্তি পেয়েছিল ঠিক তেমনি অং সান সুচি ক্ষমতার স্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর তৈরি করা সংবিধানের কারণে তিনি দেশের বিধিবদ্ধ সরকারপ্রধান হতে পারেননি। সেনাদের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগাভাগির মিশ্রিত গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখলেও তিনি তার রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে সাহস দেখাননি। মিয়ানমারে গণতন্ত্রের বিকাশের পথ সুগম করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১২ সাল থেকে অবরোধ শিথিল করতে থাকে এবং ২০১৬ সালের অক্টোবরে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে। মিয়ানমার বিশ্বের কাছে নতুন বাজার ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে পরিণত হয়। এক বছরের মাথায় আবার অবরোধের চাপে পড়েছে দেশটি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর নির্যাতনের জন্য সেনা নেতৃত্বকে দায়ি করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন সুস্পষ্টভাবে সেনা কর্তৃত্বকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন এবং রোহিঙ্গা নির্যাতনের দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্তের দাবি থেকে সরে আসতে চাচ্ছে না। ৪২ জন কংগ্রেসম্যান চিঠি লিখেছেন লক্ষ্যকেন্দ্রিক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে। সিনেটে বিল উপস্থাপন করতে ডেমোক্রাট ও রিপাবলিক্যানদের যুক্ত উদ্যোগ লক্ষণীয়।

ইয়াঙ্গুনে অং সান সুচি'র দল এনএলডি আন্ত:ধর্মীয় সমাবেশ করে দেখাতে চেয়েছে মিয়ানমার বহু সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে। যদিও রোহিঙ্গা নিয়ে কিছু উচ্চারিত হয়নি। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর উপর অবরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আইন পাশ করার উদ্যোগের খবর বের হলে সহিংসতার দুই মাস পর তড়িঘড়ি করে অং সান সুচি রাখাইন রাজ্য সফর করে দেখাতে চেয়েছেন রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রয়েছে।

মিয়ানমার শুরুরু থেকে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে অস্বীকার করে এসেছে। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান বলে রোহিঙ্গা বিতাড়নকে রাষ্ট্রের বৈধ অধিকার বলে দাবি করছে। কিন্তু ৬ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার বিষযটি আড়াল করার কোনো অবকাশ নেই। তবুও চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের সেনা অপারেশনকে অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দা

প্রস্তাব পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে আভ্যন্তরীণ বিষয় বিবেচনা করে। মিয়ানমার নিজেই তার আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অধিকার রাখে বলে অন্যদের দূরে ঠেলে রাখছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অস্তিত্বকে আমলে নিতে চাচ্ছে না। মিয়ানমারের স্বপক্ষে চীনের শক্ত অবস্থানকে রাশিয়া সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষক আঝদার কুরতভ মনে করেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি সরাতে পশ্চিমা বিশ্বের অপচেষ্টা। রোহিঙ্গা সংঘাতের সব দিক বিবেচনা নেবার পরামর্শ দিয়েছে যা মূলত মিয়ানমারের দৃষ্টি ভঙ্গির অনুরূপ।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার, টেকনাফ ও বান্দরবনের সীমান্ত অঞ্চলে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প গণহত্যা ও সন্ত্রাসের অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুসন্ধান করতে বাংলাদেশে বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সামরিক জেনারেল, পুলিশ মহাপরিদর্শক নিয়ে বেসরকারিভাবে গঠিত সিটিজেন কমিটি নভেম্বরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন, সাক্ষ্যগ্রহণ ও নথিভুক্ত করেন, কয়েক শত রোহিঙ্গার সাথে কথা বলেন। প্রাথমিকভাবে নির্যাতনের অনেক চিহ্ন দেখতে পান। গণধর্ষণের অগণিত অভিযোগের সত্যতা মেলে। সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলার বিবরণ শোনেন। শিশুহত্যা থেকে শুররু করে গ্রাম জ্বালানো, হত্যা, দেশত্যাগে বাধ্য করতে ভিতি প্রদর্শন, ধর্ষণ, যৌনদাসী বানানো সহ কিছুই বাদ রাখেনি। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা। নিজ দেশে ফেরত যাওয়া ও বিচারের পাবার আকুতি বিবেককে দাররুণভাবে নাড়া দেয়। অপরদিকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পরিদর্শন করেছেন নিকট বন্ধু আরাকান রোহিঙ্গা লিবারেশন আর্মি বা আরসা নামের তথাকথিত জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও তাদের সংগঠনিক আকৃতি ও কর্মকৌশল অস্বচ্ছ ও শক্তিশালী নয়। সাধারণ মানুষ তাদেরকে আলিকান বলে চিনে। সম্ভবত হরকাহ আল ইয়াকিনের আঞ্চলিক সংক্ষেপ।

অধিকারহীন রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে তাদের মধ্যে জিহাদী মতাদর্শের অনুপ্রবেশ সহজ হয়েছে। নির্যাতনের স্বীকার বাস্তহীন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব দেখা গেছে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রত্যয় শক্ত। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উপস্থিতি বহুমাত্রিক ঝুঁকি তৈরি করেছে। পরিবেশ ও স্থানীয় জনমিতির ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক অস্থিরতা বাংলাদেশের সীমানায় আটকে থাকলেও জঙ্গিবাদ, মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালানের মত ঝুঁকি বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পুরো অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরবে। শিশু ও নারীদের পাচার করে অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে আন্তঃদেশীয় অপরাধ চক্রের সক্রিয়তা ইতিমধ্যে নজরে এসেছে। সমুদ্র শান্ত হলে উন্নত জীবনের আশায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে যাবার আশঙ্কা অনেক বেশি। উপকূলের ভূমি প্রকৃতি এ ধরনের মানবযাত্রার উপযোগী। দালাল চক্রের নেটওয়ার্ক বেশ সংগঠিত ও অভিজ্ঞ। রোহিঙ্গা সংকট থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির বহুমাত্রিকতা দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হয়ে বিশ্বে প্রসারিত হবার ইঙ্গিতগুলো এখনি অনুভূত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের জিহাদি দলগুলো

বিভিন্নভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জিহাদি মতাদর্শে উজ্জীবিত করতে সক্রিয় হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের রাজনীতির একটি নতুন এজেন্ডা হিসাবে আবর্তিত হচ্ছে। তড়িৎ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অত্যন্ত আবশ্যকীয় স্থিতিশীল অঞ্চলের জন্য।

অং সান সুচি ও তার নেতৃত্বকে আমাদের সমর্থন করা দরকার এবং সরকারের সাথে সেনাদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব অগ্রহণযোগ্য। সহিংসতা বন্ধ হতে হবে। নির্যাতন বন্ধ হতে হবে। জাতিনিধন বন্ধ হতে হবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক কূটনীতি স্বার্থ হাসিলের চক্রে ঘুরছে এবং পারস্পরিক দর কষাকষির ইঙ্গিত বহন করছে। অবরোধ আরোপের পথ থেকে মার্কিনীরা হঠাৎ সরে গিয়ে কূটনৈতিক সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর চীন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির ভাষণকে গ্রহণ করলো। ভারতের উদ্যোগে সক্রিয়তা বাড়লো। সংকট উত্তরণে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত উপায় বের না হওয়া পর্যন্ত কূটনৈতিক তৎপরতাকে অব্যাহত রাখতে হবে। মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর আধিপত্য রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং বাংলাদেশের জন্য সহায়ক নয়। পর্দার অন্তরালে চীনের দূতিয়ালি থাকলেও আন্তর্জাতিক চাপ শিথিল হলে সংকট উত্তরণ কঠিন হবে। আঞ্চলিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে অবলম্বন করেই এ সমস্যা থেকে উত্তরিত হতে হবে।

৬ ডিসেম্বর ২০১৭

১৫. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ষড়যন্ত্রের লক্ষণ

মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.)*

১৬ জানুয়ারি মিয়ানমার-বাংলাদেশের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩ জানুয়ারি প্রথম ৩০০ জনের একটি দল ফেরত যাওয়ার দিন নির্ধারিত থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যেই ষড়যন্ত্রের লক্ষণ শুধু নীরবে নয়, সরবে শুরু হয়ে গেছে। ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশের একটি প্রধান দৈনিকের প্রধান শিরোনাম ছিল– 'রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নস্যাৎ করতে বহুমুখী ষড়যন্ত্র'। গত ১৯ জানুয়ারি মো. ইউসুফ নামের এক রোহিঙ্গা নেতা, যিনি ফিরে যাওয়ার পক্ষে কাজ করছিলেন তাকে বালুখালী ক্যাম্পের ভিতরেই মুখোশধারী একটি চক্র গুলি করে হত্যা করে। পত্রিকায় খবর এসেছে, রোহিঙ্গারা যাতে ফেরত না যায় তার জন্যও ২০টি এনজিও সক্রিয়ভাবে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে কাজ করছে। জানা যায়, এসব এনজিওর কর্মকাণ্ড সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও তারা পুরোদমে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে তা এক বিরাট প্রশ্ন।

এতে বোঝা যায়, ষড়যন্ত্রের নেটওয়ার্ক কত শক্তিশালী ও বিস্তৃত। এর মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতর থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ একজন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার

* রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পেছনে ফিরে একটু বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে এই যে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা এখন প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন বা নতুন ঘটনা নয়। নিজ নিজ হীন রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশের ভিতর থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এসব অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে। গত বছর ২৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এবারের মতো মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা বিতাড়নের প্রেক্ষাপট এবং তার অব্যবহিত পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ একটি পক্ষের অবস্থান ও কথাবার্তা লক্ষ্য করলেই বুঝতে বাকি থাকে না এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা কাজ করছে এবং কেন করছে। এটা এখন সবাই জানেন দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রোহিঙ্গা সমস্যাটির একটা স্থায়ী সমাধানের পথে সর্বজনগ্রাহ্য কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদন একটা সম্ভাবনাময় প্রেক্ষাপট তৈরির প্রাক্কালেই কীভাবে সেটিকে অকার্যকর ও ভণ্ডুল করে দেওয়ার চেষ্টা করে রোহিঙ্গাপ্রসূত সশস্ত্র সংগঠন আরসা বাহিনী। একইভাবে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সম্প্রতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দিনই ওই আরসা বাহিনী আবারও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর চেষ্টা করে। এটা তো সহজেই বোঝা যায়, রোহিঙ্গাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার মতো সক্ষমতা আরসা বাহিনীর নেই এবং ভবিষ্যতেও তা হবে না। তারা অপতৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে শুধু তাদের পৃষ্ঠপোষকদের অঙ্গুলি হেলনে, সমস্যাটি জিইয়ে রাখার জন্য। বেলজিয়ামভিত্তিক ক্রাইসিস গ্রুপের প্রতিবেদন পড়লে সবাই জানবেন ২০১৩ সালে জন্ম নেওয়া আরসা বাহিনীর মূল পরিচালক পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং আর্থিক সমর্থন পাচ্ছে সৌদি আরবের কিছু সংস্থা থেকে। ২৫ আগস্টের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এই মর্মে খবর বের হয় যে, কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদনকে বানচাল করার জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই আরসা বাহিনীকে দিয়ে মিয়ানমার সেনাক্যাম্পের ওপর আক্রমণ চালায়। সাম্প্রতিক সময়েরও বহু আগে থেকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা রোহিঙ্গা সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে সব রকমের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। ২০১৬ সালের ১২ মে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত বাংলাদেশের আনসার ক্যাম্প আক্রমণ করে রোহিঙ্গাদের পুরনো গ্রুপ আরএসও (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন)। আক্রমণকারীরা আনসার কমান্ডার আলী হোসেনকে হত্যা করে এবং ১১টি অস্ত্র লুট করে নিয়ে যায়। এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় পাকিস্তানের একজন নাগরিক, যিনি পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হয়ে এখন বাংলাদেশের জেলে আছে। গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের তত্ত্বাবধানে আরএসও পাকিস্তানের করাচিতে অফিস স্থাপন করে, যা এখনো কার্যকর বলে জানা যায়। পাকিস্তানি লেখক হোসেন হাক্কানি তার লিখিত 'পাকিস্তান বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি' গ্রন্থে এসবের উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান আপাতত দু-তিনটি লক্ষ্যসহ আরেকটি চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে পাকিস্তান সরাসরি জড়িত, এ বিষয়ে নতুন করে তথ্য উত্থাপনের প্রয়োজন নেই। ঢাকাস্থ

তাদের দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তা জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত থাকার কারণে পাকিস্তানে ফেরত যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে তাতে তাদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনটি ভাবার কারণ নেই। তাই রোহিঙ্গা সমস্যাটি চলমান থাকলে এনজিওসহ অন্যান্য ভায়া-মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জঙ্গিদের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সহযোগিতা প্রদানের অতিরিক্ত একটি চ্যানেল তা হলে খোলা থাকে।

দ্বিতীয়ত, সার্ক অকার্যকর হওয়ায় আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ঠেকাতে পাকিস্তানের প্রয়োজন BCIM এবং BIMSTEC-এর অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখা, যা সম্ভব হবে যদি রোহিঙ্গা সমস্যাটি প্রলম্বিত হয়। তৃতীয় কারণটি হলো, বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে রাজনৈতিক সংকটে ফেলা এবং জনপ্রিয়তা নষ্ট করা, যাতে ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা পুনরায় ক্ষমতায় আসতে না পারে। পাকিস্তানের চূড়ান্ত লক্ষ্যটিই তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্যই উপরে উল্লিখিত তিনটি লক্ষ্য তাদের অর্জন করা দরকার। আর এই চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো, বাংলাদেশে ২০০১-২০০৬ মেয়াদের সরকারের মতো আরেকটি সহায়ক পরিবেশ যদি তাদের জন্য আবার সৃষ্টি হয় তাহলে আগের মতো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা প্রদান ও পরিচালনার জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে রোহিঙ্গাপ্রসূত সশস্ত্র সংগঠনগুলো। বহির্দেশীয় ষড়যন্ত্র আছে। এই আজন্ম পুরনো শত্রু আমাদের অজানা নয়, চিনতেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু দেশের ভিতর থেকে বহুরূপী ও ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ, কথায় আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ২৫ আগস্টের পর যখন হাজার হাজার রোহিঙ্গা দলে দলে প্রতিদিন বাংলাদেশে প্রবেশ করছে তখন বড় একটি রাজনৈতিক পক্ষ ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের কথা এবং সভা-সেমিনারে তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প বোধহয় নেই। শুরুর দিকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সাহায্য বিতরণের ছদ্মবেশে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে রোহিঙ্গা যুবকদের জিহাদি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ওই বড় রাজনৈতিক দলের সাবেক এক এমপি ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা তো পত্রিকায় কলাম লিখে রোহিঙ্গা যুবকদের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন।

যারা এসব বলছেন তারা এর পরিণতি না বুঝে বলেছেন সেটি কখনই আমার কাছে মনে হয়নি। মিয়ানমার সেনাশাসকদের পক্ষ থেকে উসকানি তো স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেছে এবং তার সঙ্গে বাংলাদেশের এই পক্ষের উত্তেজনাকর উসকানিতে বাংলাদেশ পা দিলে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, যার পরিণতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ চিহ্নিত হতো আগ্রাসী দেশ হিসেবে। যার দায় ও ভার বহন করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের ওই পক্ষ তখন আন্তর্জাতিকভাবে সর্বজনগ্রাহ্য কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদনকে শুভঙ্করের ফাঁকি হিসেবে উল্লেখ করে রোহিঙ্গাদের উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেমনটি করেছে আরসা বাহিনী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধীরস্থির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কোচিত

পদক্ষেপের কারণে দেশি-বিদেশি সব পক্ষের ষড়যন্ত্র তখন ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। ফলে মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে বাধ্য হয়েছে। দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রত্যাবাসনের কাজ করার জন্য ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চুক্তি মিয়ানমার স্বাক্ষর করেছে। এই সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে ১০ লাখ রোহিঙ্গা কত দিনে, কত বছরে নিজ ভূমিতে ফেরত যেতে পারবে সে ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ থাকলেও একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হলো মিয়ানমার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিল, তাদের নাগরিকরা জীবনের নিরাপত্তার অভাবে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে, যার দায় মিয়ানমার সরকারকেও বহন করতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যাটি বহু পুরনো ও দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে ১৯৭৮ সাল থেকে, প্রায় ৩৯ বছর। স্থায়ী সমাধানের কোনো পথ এ পর্যন্ত বের হয়নি। বরং মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের ভ্রান্তনীতি, বাংলাদেশের উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর উন্মাদনা, সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইর অপতৎপরতা এবং আন্তর্জাতিক জিহাদিতন্ত্রের বিরূপ প্রভাব, সব মিলে সমস্যাটিকে দিনকে দিন আরও জটিল করে ফেলেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে এসে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির সমীকরণের জায়গা থেকে এ সমস্যাটির সমাধানে চীনের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় চীনকে দুই কূলই রক্ষা করতে হবে। এটা চীন জানে ও বোঝে। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন কাজটির প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি শুরু হতেই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা সেটিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে, যে কথা লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ জানুয়ারি ২০১৮

১৬. রোহিঙ্গা সংকট ॥ জাতিসংঘ প্রতিবেদন ও গণহত্যার দায়

হাসান আজিজুল হক*

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিররুদ্ধে গণহত্যার জন্য দেশটির সেনাপ্রধান ও আরও পাঁচ শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করতেই হবে– এ কথা বলেছেন মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং মিশনের চেয়ারপারসন। তিনি তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন উপলক্ষে ২৭ আগস্ট জেনেভায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন। রাখাইনে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের ওপর চালানো সহিংসতাকে গণহত্যা বলে প্রথমবারের মতো আখ্যা দিল জাতিসংঘ। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সর্বশেষ নিধনযজ্ঞ শুরু হয় ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট। তখন নতুন করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ঢল নামে। বাংলাদেশ সরকার তো বটেই, বিভিন্ন বেসরকারি

* কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

পক্ষও তখন এই বিপন্ন-বিপর্যস্ত-সর্বহারাদের দিকে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিল। মানবিকতার দরজা খুলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সহানুভূতি, মমত্ববোধ বিশ্বব্যাপী আলোচনার নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় লাভের এক বছর পূর্ণ হলো। রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি যখন বিভিন্নভাবে বিশ্বসভায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তখন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর এক সময়ের প্রতিবাদী নেত্রী, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চির একটি নতুন দাবি পুনরায় তাকে নিন্দার তীরে বিদ্ধ করেছে। তিনি দাবি করেছেন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান কমিশনের ৮৮টি সুপারিশের মধ্যে ৮১টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে!

এক সময়ের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নেত্রী অং সান সু চির নতুন দাবিটি করা হলো মিয়ানমার থেকে নতুন পর্যায়ে রোহিঙ্গা বিতাড়নের এক বছর পর, যা জলজ্যান্ত মিথ্যা বই কিছু নয়। আমাদের স্মরণে আছে, কফি আনান কমিশন তাদের প্রতিবেদন মিয়ানমার সরকারের কাছে পেশ করার পরপরই রোহিঙ্গাদের ওপর পৈশাচিকতার মাত্রা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ৭ লাখ রোহিঙ্গার বাড়িঘরই তখন শুধু পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি, একই সঙ্গে ঘটেছিল আরও বীভৎস কর্মকাণ্ড, যা সভ্যতা-মানবতার বড় ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। গত ২১ আগস্ট সু চিকে উদ্ধৃ করে সে দেশের স্টেট কাউন্সেলরের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়, 'রাখাইন রাজ্যে টেকসই শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য ড. কফি আনান কমিশনের ৮৮ সুপারিশের মধ্যে আমরা ৮১টিই বাস্তবায়ন করেছি।' ধারণা করা যায় যে, তিনি মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে এই মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। কফি আনান কমিশনের ৮৮টি সুপারিশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে, মিয়ানমার সরকার এগুলোর একটিও বাস্তবায়ন করেনি। ওই সুপারিশগুলোর মধ্যে বিশেষ গুররুত্বপূর্ণ ছিল রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের নাগরিক আইন পর্যালোচনা।

প্রশ্ন হচ্ছে, মিয়ানমার সরকার কি এ ব্যাপারে এই পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ কিংবা পদক্ষেপ নিয়েছে? এটি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত। সু চির নতুন এই মিথ্যাচার সভ্য দুনিয়ার জন্য লজ্জার। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে অবস্থান নতুন না হলেও ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের কারণে ৭ লাখ রোহিঙ্গা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের অবস্থান। তাদের কিছু অংশ পরে সেখানে ফেরত গেলেও আরও ৩-৪ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। সেই হিসাব-নিকাশে বলা যায়, এখন প্রায় ১০-১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কক্সবাজার ও টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গাদের মানবিক বিপর্যয় অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র, সংস্থা ও সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে। রোহিঙ্গা নিধন, যা স্পষ্টতই গণহত্যা তা জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুররু করে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বীকার করেছেন। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিষয়টি এখন আমাদের জন্য নানারকম সংকটও সৃষ্টি করেছে।

আমাদের এও মনে আছে, ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে মিয়ানমারের বিধ্বস্ত জনপদ রাখাইনে অং সান সু চি সফরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন রাখাইনে তখনও বাংলাদেশ সীমান্তে নির্যাতিত-নিপীড়িত রোহিঙ্গারা ভিড় করছিল। রাখাইন সফরে গিয়ে সু চি বলেছিলেন, 'তোমরা ঝগড়া করো না।' তার ওই মন্তব্য তখন সমালোচনার আরও খোরাক জুগিয়েছিল। কারণ রাখাইনে যা চলছিল তা 'ঝগড়া' নয়, স্পষ্টই জাতিগত নিপীড়ন। টানা সামরিক অভিযানে গণহত্যা, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, লুটতরাজসহ অমানবিক বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর তখন বর্বরতার ধরনও পাল্টে গিয়েছিল। সেই সময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত-প্রচারিত হয়েছিল, এর ফলে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঢল নামে। বিদ্যমান ওই পরিস্থিতিতে সু চি যখন রাখাইন সফর করছিলেন, তখন অনেকেই এই সু চির মাঝে সেই সু চিকে খুঁজছিলেন। তার অতীত-বর্তমান মিলিয়ে দেখলে হতাশ হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। তার রক্ষণশীল বলে মোটেই পরিচিত ছিলেন না। তিনি উদারনীতিরই মুখপাত্র ছিলেন। বিশ্ব তাকে চিনত গণতন্ত্রের এক মানসকন্যা হিসেবেই। তার লড়াইটা ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। মিয়ানমারের জঙ্গি শাসকরা গণতন্ত্রের কণ্ঠ আক্ষরিক অর্থেই চেপে ধরেছিল, তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বিপদগ্রস্ত গণতন্ত্রের পক্ষে। তার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে কারাগারে। এসব তো সচেতন মানুষ মাত্রেরই জানা। সামরিক জান্তা তার বিররুদ্ধে নানা রকম মামলা দিয়েছিল। সু চির বিররুদ্ধে মামলাগুলোর সবই ছিল রাজনৈতিক। মামলা যারা করেছিল তারা নিজেরাই আবার বিচারক ছিল। কিন্তু সু চি ভয় পাননি। সামরিক শাসকদের জঙ্গিপনার সঙ্গে আপোস করেননি। তারা তাকে বছরের পর বছর আটকে রেখেছে। সু চিকে লন্ডনে অসুস্থ স্বামীর কাছে যেতে তৎকালীন মিয়ানমার সরকার চাপ দিচ্ছিল এ কারণে যে, একবার দেশের বাইরে তাকে পাঠাতে পারলে আর দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেদিন সু চি সেই ফাঁদে পা দেননি। দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। স্বামী মারা গেছেন লন্ডনেই। শেষ দেখাটা পর্যন্ত হয়নি। দু'টি পুত্রসন্তান, তারাও বিদেশেই থাকে।

তার পরিবার ঐতিহ্যগতভাবেই রাজনৈতিক। পিতা অং সান আধুনিক বার্মা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বার্মার স্বাধীনতা অর্জন তার নেতৃত্বেই ঘটে। বার্মার আধুনিক সেনাবাহিনীর গঠনও তিনিই করেছেন। সু চির শিক্ষাজীবনও আলোকিত। পড়াশোনা শুররু করেন রেঙ্গুনের খ্রিষ্টান মিশনারিদের ইংরেজি স্কুলে। পরে মায়ের সঙ্গে দিল্লিতে গিয়ে পড়েছেন মিশনারিদেরই স্কুল ও কলেজে। সেখান থেকে চলে যান অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডে বিএ পাস করেন তিনটি বিষয় নিয়ে। এর পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এমএ করেন রাজনীতি বিষয়ে। কর্মজীবনের শুরু নিউইয়র্কে, জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। আরও পরে এমফিল করেছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে। ১৯৯০ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারারি ফেলো পদবি দিয়ে সম্মানিত করে। ভারতের সিমলাতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে তিনি গবেষণার কাজও করেছেন। সু চির কর্মযজ্ঞ ও খ্যাতির সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেই সু চি ও আজকের সু চির মধ্যে তফাত কতটা বিদ্যমান বাস্তবতাই এর সাক্ষ্যবহ।

যে সু চি দীর্ঘদিন গণতন্ত্রের জন্য লড়েছেন, দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করেছেন সেই সু চি জাতিগত নিধনযজ্ঞের নীরব সমর্থক হবেন তা ভাবতেও আজ বিস্ময় লাগে। বৌদ্ধধর্ম হিংসায় বিশ্বাস করে না। সু চি মানবকল্যাণকামী নীতিরই অনুসারী ছিলেন। সেই মানুষটি স্বধর্মীদের একাংশকে উগ্র বর্ণবাদী আচরণে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তিনি নিন্দিত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং এ দাবিও বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে যে, তিনি যেন তার নোবেল পুরস্কারটি ফিরিয়ে দেন। সু চির নৈতিক স্খলন প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছে। বিশ্বের অনেক সম্পদশালী কিংবা ধনী রাষ্ট্র যখন দশ-বারো হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে অনীহা প্রকাশ করে সেখানে বাংলাদেশ ১০-১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে, নিজের সম্পদ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছে এবং সমগ্র বিশ্বকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে সত্যি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, সংকটের স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিতে হবে যে, বাংলাদেশ তার সীমিত সামর্থ্যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে দীর্ঘদিন আশ্রয় দিতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়াতেই হবে। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ বিবেকবান মানুষকে স্পর্শ না করে পারে না। তাদের এই বিক্ষোভ কেবল ঘরে ফেরার নয়, এটি মনে রাখতে হবে। তারা নৃশংসতার বিচার দাবি করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে এই নৃশংসতার বিচারের যে দাবি উঠেছে তা খুবই সঙ্গত। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এখন মিয়ানমার এ ব্যাপারে আবার যেন অবস্থান পাল্টানোর ফন্দি আঁটছে। তাদের ফেরত যাওয়ার মতো পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সবরকম ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের পাশে আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশের তরফে কূটনৈতিক ও মানবিক কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা জরুরি বলে মনে করি। মিয়ানমার দ্রুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। বোধোদয় ঘটুক অং সান সু চির। সভ্যতা-মানবতা আজকের যুগে এভাবে পরাজিত হতে পারে না।

সমকাল, ২৯ আগস্ট ২০১৮

১৭. নিরাপত্তা ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে

এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার*

১৬ সেপ্টেম্বর একটি প্রধান দৈনিকের শেষ পাতায় বড় শিরোনাম ছিল– 'রোহিঙ্গাদের এনআইডি কার্ডপ্রাপ্তি, তদন্তে দুদক। প্রতিবেদনে প্রকাশ, চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রাপ্তি নিয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনায় তদন্তে

* রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

দুদকের দল নিশ্চিত ছিল– চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে বসেই ওই অপকর্ম চালিয়েছে একটি জালিয়াত চক্র। ১৭ সেপ্টেম্বর আরেকটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনাম– 'নানা কৌশলে ভোটার হচ্ছেন রোহিঙ্গারা'। এর আগে ৮ সেপ্টেম্বর শুরুতে উল্লিখিত একই দৈনিকের শেষ পাতায় আরও একটি বড় উদ্বেগজনক খবর ছাপা হয়। তাতে বলা হয়– 'রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন আবদার, অবাধ চলাফেরা, ফোন ও ইন্টারনেট সেবা দাবি।' এ বিষয়ে সরব অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও এইচআরডব্লিউ। একটা জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল্য টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। অথচ নির্বাচন কমিশনের কিছু দুর্নীতিবাজ লোক স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সহায়তায় জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপকর্ম করে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। উল্লিখিত খবরগুলো যে নতুন শুনছি, তা নয়।

১৯৭৮ সালের পর থেকে অদ্যাবধি রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ রকম খবর প্রায়ই পত্রপত্রিকায় আসছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট বানের স্রোতের মতো রোহিঙ্গা আসার আগ পর্যন্ত এর ভয়াবহ পরিণতি অনুধাবন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ২০১৭ সালের আগে সাড়ে তিন-চার লাখ রোহিঙ্গা অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল দীর্ঘদিন ধরে। এদের ঘিরে এনআইডি, পাসপোর্ট প্রদানের খবরসহ আরও মারাত্মক সব খবরের সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পরও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের যতটুকু সতর্ক হওয়া দরকার ছিল. তার কিছুই আমরা করিনি। সে সময়ে সব ব্যাপারে যদি আমরা সতর্ক হতাম, তাহলে হয়তো ২০১৭ সালে এত বড় দুর্যোগ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ত না। ওই সাড়ে তিন-চার লাখ রোহিঙ্গার নিবন্ধন ২০১৭ সালের আগ পর্যন্ত করা হয়নি। ফলে সঠিক হিসাব তখন কেউ জানতেন না। তারা সেখানে কী করত, সে খবর কেউ গুরুত্বসহকারে ধর্তব্যের মধ্যে নিয়েছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। ২০১৭ সালের আগে এই রোহিঙ্গা ইস্যু সম্পর্কে আমি বেশ কিছু লেখা লিখেছি। টেলিভিশনের টক শোতে একাধিকবার বলেছি, এই অবৈধভাবে, নিবন্ধনহীন ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা আমাদের রাষ্ট্রের ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য বিষফোঁড়া। তখন কক্সবাজারে জাতিসংঘের ক্যাম্পে রোহিঙ্গার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০-৩২ হাজার। অবশিষ্ট সাড়ে তিন-চার লাখের কোনো হিসাব কারও কাছে ছিল না।

এখনকার তুলনায় তখন সংখ্যা কম থাকায় স্থানীয় জনগণ আজকে যে রকম বিপদের সম্মুখীন, সেটি তারা সে সময়ে বুঝতে পারেনি। তখন অনেক রোহিঙ্গা এনআইডি পেয়েছে, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গেছে। অনেকে ভোটার হয়েছে, সে খবরও পত্রিকায় বিভিন্ন সময় ছাপা হয়েছে। এসব পুরনো রোহিঙ্গা আজ সব ক্যাম্পের নেতা হয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রত্যাবাসনের পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ কাজে সহায়তা করছে স্থানীয় ক্ষমতাবান দুর্বৃত্ত চক্র, যারা শুধু ক্ষমতা ও টাকা ছাড়া দেশ-জাতির ভালোমন্দ চিন্তা করে না। সে সময় রোহিঙ্গারা নিজেদের মতো করে মাদ্রাসা করেছে, স্কুল করেছে– কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি। সন্ত্রাসী সংগঠনের নামে রামুতে একটি মাদ্রাসা তখন হয়েছিল, যার নাম সম্প্রতি পরিবর্তন করা হয়েছে। রামুতে যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই ওই মাদ্রাসা দেখিয়ে দিতে

পারে। এই কয়েকদিন আগে উখিয়া উপজেলার ময়নাগোলা ক্যাম্প থেকে সাব্বির আহমদ মনজু নামের এক রোহিঙ্গার কাছ থেকে অত্যাধুনিক একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই লেখাটি লিখতে বসে কক্সবাজারের কয়েকজন সাংবাদিক ও পরিচিতজনের সঙ্গে কথা বলে যে বিষয়গুলো জানলাম তা সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মোটেও ভালো খবর নয়।

বিষয়গুলো একেক করে এখানে তুলে ধরছি– এক. প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ৩২টি ক্যাম্পের ভেতরে কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সরকারি কোনো প্রতিনিধি থাকেন না। শুধু তিন প্রধান প্রবেশপথে তিনটি পুলিশ পোস্ট থাকে। ক্যাম্পের ভেতরে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গার বড় একটা অংশ নিরীহ হলেও পাশাপাশি অনেক দুর্বৃত্ত চক্র তৈরি হয়েছে। এই দুর্বৃত্ত চক্র কী করছে, তার হদিস রাখার মতো ওই সময়ে ক্যাম্পের ভেতরে কেউ থাকে না। ক্যাম্পের ভেতরে ফাঁড়ি নেই এবং রাতের বেলায় পুলিশের টহল দলও থাকে না। গত দুই বছরে ক্যাম্পের ভেতরে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে ৩০ জনের বেশি রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে; দুই. ক্যাম্পের ভেতরে রোহিঙ্গারা শত শত দোকানসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের পসার বসিয়েছে। ব্যবসা করে অনেক রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে বিপুল টাকার মালিক হয়েছে; তিন. ক্যাম্পের ভেতরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জাতিসংঘসহ দেশি-বিদেশি এনজিওর পক্ষ থেকে প্রায় ৫০ হাজার রোহিঙ্গাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, যাদের মাসিক বেতন ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত; চার. জাতিসংঘসহ এনজিওদের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে দুই হাজার নেতা বা মাঝি নিয়োগ কিংবা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যারা ক্যাম্পের ভেতরে সবকিছুর মাতবরি-সর্দারি করে। টেকনাফ, উখিয়া উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে। উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাউকেই কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি। কিন্তু অন্যদিকে স্থানীয় সাধারণ জনগণই আজ সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তার হুমকির মধ্যে আছে; পাঁচ. একজন সাংবাদিক তথ্য দিলেন, তিনি একদিন দিনের বেলায় একটি ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী, পিয়ন, সিকিউরিটি কাউকেই দেখতে পাননি। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান ওই সাংবাদিক জানালেন, এতদিন অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার যে কর্মকর্তা সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ভোগবিলাস আর বিদেশি সংস্থাগুলোর গিফটের পর গিফট নিয়ে বাংলাদেশকে ২০০ বছরের ক্ষতির মধ্যে ফেলে গেছেন। শোনা যায়, ২২ আগস্ট মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গাদের অনেকেই আগের রাতে অপহৃত হয়েছে কথিত রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লার লোকজন দ্বারা; ছয়. একজন আরেকটি তথ্য দিলেন। তিনি জানালেন, বিভিন্ন সাহায্যসমগ্রী নিয়ে জাতিসংঘসহ বিদেশি এনজিওদের কার্গো বিমান ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবতরণ করে। সেখান থেকে কাভার্ড ট্রাকে সেগুলো সরাসরি জাতিসংঘ ও বিদেশি এনজিওদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় চলে যায়। এই কার্গোতে কী সব দ্রব্য আসে এবং কী পরিমাণ আসে, তা দেখার জন্য বাংলাদেশি কোনো প্রতিনিধি থাকেন না।

ক্রমিক নম্বর এক থেকে ছয় পর্যন্ত বর্ণিত তথ্যাদির অর্ধেকও যদি সঠিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দুটি নিয়েই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। উদ্বাস্তু শরণার্থীরা তো ওয়ার্ক পারমিট বা কাজের অনুমতি পাওয়ার কথা নয়। তাহলে তারা কী করে জাতিসংঘ এবং এনজিওগুলোতে হাজার হাজার টাকা বেতনের চাকরি পেল? কী করে তারা হাটবাজার তৈরি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে? এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে চাইবে না- সেটাই স্বাভাবিক। আর নিরীহ রোহিঙ্গারা নিজ ভিটেমাটিতে ফেরত যেতে চাইলেও শক্তিশালী সিন্ডিকেট, ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তো রোহিঙ্গাদের ফেরত যেতে দেবে না। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে রোহিঙ্গারা যখন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে স্রোতের মতো বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তখন কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে ওইসব নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। দুই বছরের মাথায় এসে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত হলো কী করে।

স্থানীয় জনগণ এখন একটা ভীতিময় পরিস্থিতির মধ্যে আছে। স্থানীয়রা বলেন, স্কুল-কলেজে মেয়েদের পাঠিয়ে তারা সব সময় শঙ্কায় থাকেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে শুধু স্থানীয় জনগণ নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও বড় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হবে। এটা সবাই জানেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কিছু ধর্মান্ধ উগ্রবাদী গোষ্ঠী হতাশাগ্রস্ত সাধারণ রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগে বহু রকম উস্কানিমূলক অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করেছে সবসময়। কক্সবাজারের স্থানীয় কিছু ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দুর্বৃত্ত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নিয়ে ড্রাগ, মানব পাচার ও অস্ত্র চোরাচালানের মতো ভয়ঙ্কর সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। কিছুদিন আগে স্থানীয় এক যুবলীগ নেতা ড্রাগ ব্যবসার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, সেগুলো নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের একটা সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ পর্যালোচনা মাত্র। বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আরও বহু কারণ রয়েছে। গত দুই বছরে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান হয়নি বা তারা ফেরত যায়নি, সেটা বৈশ্বিক শরণার্থী সংকটের দীর্ঘসূত্রতার তুলনায় হতাশ হওয়ার মতো কিছু নয়। হোস্ট কান্ট্রি বা শরণার্থী গ্রহণকারী দেশ হিসেবে সতর্কতার বিষয় হলো, এই হতাশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা দেশ যেন দুরভিসন্ধি আঁটতে না পারে, তার জন্য শুরু থেকে কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছে। এর পরিণতিতে বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

সমকাল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

১৮. রোহিঙ্গা-বাঙালি দাঙ্গার পাঁয়তারা

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ*

গত ২২শে অগাস্ট দ্বিতীয় দফায় প্রত্যাবাসন শুরুর সব প্রস্তুতি ভেস্তে যাওয়া এবং সঙ্কটের দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে শরণার্থী শিবিরে বিশাল সমাবেশের পর থেকে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে হঠাৎ করেই যেন জনমানসে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। ক্ষোভটা আগে ছিল স্থানীয় পর্যায়ে।

রোহিঙ্গারা যখন দলে দলে সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসছিল তখন মানবিকতা এবং মুসলিম ভাতৃত্ববোধ স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল গতি প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো দেশের জনগণেরই সাধারণত গভীর ধারণা থাকে না। স্থানীয়রাসহ অনেকেই ভেবেছিলেন, এ আগমনটা সাময়িক। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, দুই বছর পার হয়ে গেলেও রোহিঙ্গারা ফিরে তো যায়ই নাই, বরং মাঝে মাঝে সীমানা অতিক্রম করে আরো অনেকে এসেছে।

এ পর্যন্ত কী পরিমাণ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। আনুমানিক হিসেবে ২০১৭ সালে সেনা অভিযান থেকে বাঁচতে সেসময় সাত লাখ ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সব মিলিয়ে এখন কমপক্ষে ১২ লাখের মত রোহিঙ্গা বিভিন্ন ক্যাম্পে বাস করছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালে এর সাথে যোগ হয়েছে আরো ৪০ হাজার নবজাতক। উখিয়া এবং টেকনাফে মূল জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬০ শতাংশ এখন রোহিঙ্গা। আজকে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবির পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে।

জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়ে দুই বছর আগে যখন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসা শুরু করে, তখন তা আওয়ামী লীগের সরকারকে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। জিয়াউর রহমানের সময় থেকে আসতে থাকা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়ে ততদিনে কয়েক লাখে পৌঁছে গেছে।

বিএনপি, জামায়াতের মত মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং 'ইসলামপন্থার' রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলগুলো রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে সরকারকে বেকায়দায় ফেলবার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখে। তারা ধরে নিয়েছিল, এমনিতেই কয়েক লাখ রোহিঙ্গাদের ভারে ভারাক্রান্ত দেশে আওয়ামী লীগ সরকার কোনভাবেই রোহিঙ্গাদের জন্য সীমানা উনুক্ত করে দিবে না। এতে তারা বলতে পারবেন, আওয়ামী লীগ সরকার ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেষী। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সমর্থকরা এ প্রচারণা শুরু করেও দিয়েছিলেন।

* শিক্ষক, স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিস, আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

অপরদিকে, সীমানা খুলে দেওয়া ছাড়া সরকারের সামনে আর কোনো বিকল্পও ছিল না। সীমানা না খুললে এক করুণ মানবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হত, যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দুইভাবেই সরকারের এক নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরত। পাশাপাশি, মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং 'ইসলামপন্থী' দলগুলি জনমতের বড় অংশকে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে সমর্থ হত। ফলে, সরকারের সীমানা খুলে দেবার নীতি রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়া বিএনপি, জামায়াতকে হতাশ করে– একটা নিশ্চিত ইস্যু তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে।

সীমানা খুলে দেওয়া হলেও আগত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের নিয়ে ভবিষ্যতে কী করা হবে, অথবা কীভাবেই বা তাদের ফেরত পাঠানো হবে, এ ধরণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের সামনে ছিল না। সেসময় তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল সেটা হল রোহিঙ্গা ইস্যুতে জনমত যাতে তাদের বিপক্ষে চলে না যায়।

রোহিঙ্গাদের প্রবেশ করতে দিলেও সরকার তাদের আজ পর্যন্ত শরণার্থীর মর্যাদা দেয়নি। ফলে, এ বিপুল জনগোষ্ঠী মৌলিক নাগরিক সুবিধা হতে বঞ্চিত, যা মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্যে অভিবাসী, সংখ্যালঘু বা শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দেখলে ডান, বামসহ আমাদের দেশের যাদেরকে সোচ্চার হতে দেখা যায়, সেই তারাই শুরু থেকে রোহিঙ্গাদের মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়ে বিস্ময়করভাবে নিরব রয়েছেন।

জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়ে অন্য একটি দেশে আসা জনগোষ্ঠী যতক্ষণ না তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারছে, ততক্ষণ তারা সেই দেশটিতে শরণার্থী মর্যাদার দাবি রাখে। এ বিষয়টি বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির অ্যাক্টিভিস্টসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ওয়াকিবহাল কিনা, সেটিই একটি দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা টেকনাফ, উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে অনেকটা বন্দি জীবন যাপন করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী জাপানিজ আমেরিকানদের সে দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে যেভাবে আটকে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে রাখা হয়েছে অনেকটা সেইরকমভাবে; যদিও, সে সমস্ত ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলি থেকে অনেক বেশি ছিল।

সন্ধ্যার পর রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প থেকে বাইরে বের হওয়া নিষেধ। চাকরি, ব্যবসা বা কোন প্রকার কাজ করবার অধিকার তাদের নেই। মোবাইল এবং ইন্টারনেটের সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। এ অসহায়ত্ব বোধ অনেক রোহিঙ্গাকে মরিয়া করে তুলছে যেকোনো ভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্ট বা জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে।

চিকিৎসার সুবিধা তাদের জন্য অত্যন্ত সীমিত। রেজিস্টার্ড ক্যাম্পগুলিতে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা থাকলেও রেজিস্ট্রেশনবিহীন ক্যাম্পগুলিতে সে সুবিধাও নেই। ক্যাম্পে নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। জীবন যুদ্ধে টিকে থাকবার লড়াইয়ে অনেক নারীকে বাধ্য হয়ে খুঁজে নিতে হচ্ছে যৌনবৃত্তি। তদুপরি, গত দুই বছরে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে একজন নারীসহ নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৫ জন রোহিঙ্গা।

যেকোনো রাষ্ট্রে যেভাবেই একজন ব্যক্তি অবস্থান করুক না কেন, শিক্ষা তার মৌলিক অধিকারের একটি। রোহিঙ্গাদের মধ্যে শিক্ষার হার এমনিতেই কম। তার উপর রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে নারী শিক্ষার প্রতি এ যুগে এসেও তাদের রয়েছে প্রবল অনীহা। একশ বছর আগে বাঙালি মুসলমান সমাজেও আমরা এরকম রক্ষণশীলতা এবং নারী শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রত্যক্ষ করেছি। এরকম রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে, ক্যাম্পের প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও একটি রোহিঙ্গা মেয়ে যখন কক্সবাজারের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পর্যায়ের ছাত্রী হিসেবে পড়াশোনা শুরু করে, বিবিসিসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়া একে ইতিবাচক সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করে। কিন্তু এ সংবাদটি প্রকাশিত হবার পর তার ছাত্রত্বই স্থগিত করে দেওয়া হয়।

সিভিল সোসাইটির অ্যাক্টিভিস্ট এবং মানবাধিকার কর্মীরা বিস্ময়করভাবে এখানেও নিরব থাকেন। এর চেয়েও বিস্ময়কর হল, শুধু সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নয়, এমনকি প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও রোহিঙ্গাদের এমন মানবেতর জীবন যাপনকে স্বর্গে বসাবাসের সাথে তুলনা করে অনেকের বক্তব্য দিতে শুরু করে।

একথা ঠিক যে, সামাজিক নানা সূচকে অনেক অগ্রগতি হলেও, দেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করবার মত একটা অংশ রোহিঙ্গাদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন করেন। বাস্তবতা হল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের জীবন মানের মানদণ্ডে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র শ্রেণি চরমতম মানবেতর অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। ফলে রোহিঙ্গারা যখন ক্যাম্পগুলিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির সহায়তায় অবস্থান করছেন, সেটা অনেকের মাঝেই ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। তারা ভাবতে শুরু করেছেন, তাদেরকে বঞ্চিত করেই রোহিঙ্গাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া টেকনাফ এবং উখিয়াতে গত দুই বছরে সাত/আটজন বাঙালি রোহিঙ্গাদের হাতে খুন হবার ফলে একটা শীতল দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানীয়দের।

রোহিঙ্গারা যখন মিয়ানমারে ছিলেন তখন তারা নিজেরা যেমন একদিকে মূলধারার সাথে একাত্ম হতে চাননি; অপরদিকে, মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীও চেষ্টা করেছে কোনো অবস্থায় তারা যাতে মূলস্রোতের সাথে মিশে যেতে না পারেন। এ বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদেরকে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার সাথে পরিচয় ঘটবার সুযোগ দেয়নি। ফলে, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে 'ইসলামপন্থা'র রাজনীতিকে ভিত্তি করে। কেননা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একমাত্র ইসলামের সাথেই প্রায় সব রোহিঙ্গা পরিচিত।

প্রতিরোধের অংশ হিসেবে ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে তারা গড়ে তুলেছেন আরকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নামক সশস্ত্র সংগঠন, যার প্রায় সাড়ে তিন হাজার সদস্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে তারা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে কঠোর ইসলামি আইন চালুর চেষ্টা করছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে সক্রিয় রয়েছে সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত নানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

বামপন্থা, সেকুলার জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি রোহিঙ্গাদের কাছে অপরিচিত শব্দ। ফলে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গারা অধিক সংসক্তি বোধ করছেন 'ইসলামপন্থী' দল এবং 'ইসলামভিত্তিক' এনজিওগুলির সাথে। এ বিষয়টা বাংলাদেশের 'ইসলামপন্থী' দল এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত এনজিওগুলিকে একটি বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। প্যান ইসলামিজমের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যেমন একদিকে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে চায়; তেমনি, তারা এটাও চায়, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান করুক। এটি সরকারকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে তাদেরকে রাজনীতিতে একটা বাড়তি সুবিধা দিবে বলে তারা মনে করছেন। এর পাশাপাশি কিছু ছোট এনজিও- যাদের প্রাপ্ত ডোনেশনের একটা বড় অংশ নির্ভর করে রোহিঙ্গাদের মাঝে তাদের কার্যক্রমের উপর- তারাও রোহিঙ্গারা সহসা প্রত্যাবর্তন করুক, এ বিষয়টি চাচ্ছে না।

এসব কিছুর সাথে প্রত্যাবাসনের আগে রোহিঙ্গাদের কিছু দাবি- যেমন নাগরিকত্ব প্রদান, জমি-জমা ও ভিটেমাটির দখল ফেরত, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, রাখাইনে তাদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেজন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি যুক্ত হবার ফলে- বাংলাদেশের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তারা বোধহয় আর ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। আর এ ধারণা থেকেই ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং সামাজিক মিডিয়াতে কিছু বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকসহ এক শ্রেণির মানুষকে দেখা গেছে নাৎসিদের মত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষমূলক বক্তব্য নিয়ে সরব হতে। এ সমস্ত মিডিয়াতে পুরো রোহিঙ্গা জাতি গোষ্ঠীকে 'বিষফোঁড়া', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি নানা নেতিবাচক অভিধায় অভিহিত করে এরা যে মননগতভাবে নাৎসি বা মিয়ানমার সরকারের মত একই জাতি বিদ্বেষমূলক মননকে ধারণ করেন- এ অনভিপ্রেত বিষয়টি সবার সামনে স্পষ্ট করেছেন। এসব বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হল রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে জনমানসে ভীতির সঞ্চার করে আপামর জনগণকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা।

ভীতির সঞ্চার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতেও হয়েছে। তাদের মধ্যে নানাবিধ ভয় কাজ করছে। তারা একদিকে যেমন ভয় পাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে প্রত্যাবাসনে বাধ্য করে কিনা, তেমনি অপরদিকে ভয় পাচ্ছে– তাদেরকে যদি বাধ্য হয়ে ফিরে যেতেই হয়, তাহলে মিয়ানমারে গিয়ে তারা আবার নতুন কি ধরণের নিপীড়ণের মুখোমুখি হবেন, এ বিষয়টিও। পাশাপাশি এ বিষয়টা তারা বুঝতে পারছেন যে, স্থানীয় জনগণের ক্ষোভের ফলে ইতিমধ্যে তারা অনাহুত অতিথিতে পরিণত হয়েছেন।

যে বিষয়টা প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকারসহ অনেকেই বুঝতে পারেননি সেটা হল– নাৎসিদের মত জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের অংশ হিসেবে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা শুন্য করবার প্রকল্প হাতে নিয়েই রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে এমনভাবে বিতাড়ন করা হয়েছে, যাতে তারা আর প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। এরই প্রক্রিয়া হিসেবে মিয়ানমারে অবস্থানরত ৬ লাখ রোহিঙ্গার উপর নতুন করে নিপীড়ন শুরু হয়েছে যাতে তাদেরকেও বাংলাদেশ বা ভারতে ঠেলে দেয়া যায়।

বাংলাদেশ এ মুহূর্তে নতুন করে আরো ৬ লাখ রোহিঙ্গা সীমানা অতিক্রম করে প্রবেশ করে কিনা এ ঝুঁকিতে রয়েছে। পাশাপাশি, আসামের নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ

পড়া ১৫ লাখ ভারতীয় নাগরিককে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবার কথা সেখানকার শাসক দল বিজেপির নেতারা প্রকাশ্যেই বলছেন।

১৫ লাখ ভারতীয় নাগরিকের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার নির্ভর করে আছে ভারতীয় সরকারের 'শুভ ইচ্ছা'র উপর। অর্থাৎ, ভারতীয় সরকার দয়া করে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেবে না, এ আশার উপর। কিন্তু যদি রোহিঙ্গাদের মত তাদেরও ঠেলে দেয়, তাহলে বাংলাদেশে সরকারের করণীয় কী হবে, নীতিনির্ধাকদের কেউই সেটা নিয়ে ভাবতে রাজি নন। 'বন্ধু' দেশের 'শুভ ইচ্ছা'-ই এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একমাত্র ভরসা।

রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেন্দ্রিক। বাংলাদেশের বিদেশ নীতি এখনো পরিচালিত হচ্ছে শীতল যুদ্ধোত্তর আমেরিকা-কেন্দ্রিক, এক বিশ্ব ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে। চীনের উত্থান এবং রাশিয়ার পুনুরুত্থান যে বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতা বদলে দিয়েছে, সেটা আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে অর্থে এখনো উপলব্ধি করতে পারেনি।

রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে তাদের দৌড়ঝাঁপ মূলত পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকামুখী। আর ইউরোপ এবং আমেরিকা দুই পক্ষই একে জাতিগত সমস্যার চেয়ে ধর্মগত সমস্যা হিসেবে দেখতে আগ্রহী। ফলে তাদের মিডিয়াতে রোহিঙ্গা শব্দটির সাথে সব সময় মুসলিম শব্দটি জুড়ে দিয়ে রোহিঙ্গাদের 'রোহিঙ্গা মুসলিম' হিসেবে অভিহিত করা হয়; যদিও এ জাতিগোষ্ঠীর ১ শতাংশ হিন্দু এবং বৌদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখানে তাদের চিরাচরিত ইসলাম কার্ড খেলে মিয়ানমারকে চাপে রাখবার কৌশল নিতে আগ্রহী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দৌড়াচ্ছেন আসিয়ান এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছেন না যে, এদের কারোরই মিয়ানমারকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা নাই।

মিয়ানমার সরকারকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা রাখে একমাত্র গণচীন। এরপর যে রাষ্ট্রটির প্রভাব মিয়ানমারের উপর রয়েছে সেটি হল রাশিয়া। সামরিক, অর্থনৈতিক সবভাবেই মিয়ানমার গণচীনের উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে চীনের তরফ থেকে এ সম্পর্কটা মূলত স্ট্রাটেজিক। পুরো এশিয়াতে চীনের নির্ভরযোগ্য তিন মিত্র হচ্ছে উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমার এবং পাকিস্তান।

১৯৭৫ পরবর্তী সময় থেকে বাণিজ্যিক, সামরিক সব দিক থেকে বাংলাদেশ চীনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটালেও এবং সম্প্রতি বিপুল চীনা বিনিয়োগ হলেও চীন বাংলাদেশকে তার স্ট্রাটেজিক পার্টনার হিসেবে দেখে না।

অপরদিকে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনাম এবং ভারতের পরেই রাশিয়া মিয়ানমারকে তার মিত্র মনে করে। সম্প্রতি সামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাশিয়া মিয়ানমারে তার উপস্থিতি বাড়ালেও, রাশিয়াও চীনের মত মিয়ানমারকে দেখে স্ট্রাটেজিক পার্টনার হিসেবে।

রাশিয়া এবং চীন কোন ভাবেই চায় না যে, মিয়ানমারে তাদের প্রভাব হ্রাস পাক বা দেশটি মার্কিন বলয়ে চলে যাক। দুটি দেশের কাছেই মিয়ানমারের গুরুত্ব

বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘসহ সমস্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে এ দুটি দেশ মিয়ানমারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে আসছে। পাশাপাশি, তার কূটনৈতিক দক্ষতা দেখিয়ে মিয়ানমার ভারত, এমনকি ঘনিষ্ঠ মার্কিন মিত্র ইসরায়েল এবং জাপানের সমর্থনও আদায় করতে পেরেছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশ কূটনীতিক অর্জন এ ক্ষেত্রে একেবারে শূন্য।

আজকে চরম বাস্তবতা হচ্ছে, রোহিঙ্গা সমস্যা তখনই সমাধান হবে যদি কেবল চীন এবং রাশিয়া মনে করে তাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া উচিৎ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কূটনীতিক সফলতার পুরোটাই নির্ভর করছে কতটা দক্ষতার সাথে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার চীন এবং রাশিয়াকে বোঝাতে পারে, তার উপর। কিন্তু চীন এবং রাশিয়া যদি মিয়ানমার সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে তাদের বাংলাদেশে থেকে যাওয়াই উচিৎ বলে মনে করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ ফিরে যাবার সম্ভাবনা যত বিলম্বিত হবে, বাঙালিদের সাথে রোহিঙ্গাদের দ্বন্দ্ব তত বৃদ্ধি পাবে, যা এক সময় দাঙ্গায় রূপ নিলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

বিডিনিউজ২৪.কম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

১৯. রোহিঙ্গা গণহত্যা: বাংলাদেশে মানবতা বনাম জাতীয় নিরাপত্তা

শাহরিয়ার কবির*

বার্মার সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত পরিকল্পিত রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সোচ্চার হলেও বার্মা থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন বন্ধ এবং শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রায় সোয়া ৭ লাক্ষ রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এর সঙ্গে পুরনো ৪ লক্ষ যোগ করলে বাংলাদেশকে এখন ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর বোঝা বইতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারণে বিপন্ন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছেন। পশ্চিমা গণমাধ্যম তাকে 'মানবতার জননী' হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে কঠিন সত্য হচ্ছে– বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ বোঝা বেশিদিন বহন করা সম্ভব নয়।

রোহিঙ্গা সংকটের ভয়াবহ প্রতিঘাত অনুসন্ধানের জন্য আমরা ১১ অক্টোবর (২০১৭) 'বার্মার গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করেছি। এর দশ

---

* লেখক সাংবাদিক। সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

দিন পর ২১-২২ অক্টোবর কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুল হুদার নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে দু দিনে প্রায় দুই'শ ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তিনজন প্রাক্তন বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর দুজন প্রাক্তন মেজর জেনারেল ও পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক সহ বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা। গত দুই বছরে আমাদের কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা গণহত্যার শিকার ১০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গার জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন।

জবানবন্দিতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা বার্মার সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় মগদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিবরণ দিয়েছেন। অন্যদিকে রোহিঙ্গা হিন্দু ও খৃস্টান শরণার্থীরা বলেছেন তারা জঙ্গি রোহিঙ্গা মুসলিমদের সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার কারণে চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ও দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নাগরিক কমিশনের সদস্যরা ত্রাণ, পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসন কেন্দ্রের এবং সেনাবাহিনী ও বিজিবির সহযোগিতাও পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ রয়েছে বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর। গত দুই বছরে কক্সবাজারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর আকস্মিক আগমনে এলাকায় পরিবেশ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সমূহ আশঙ্কা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা সাময়িকভাবে মোকাবেলা করা গেলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রতিঘাত বাংলাদেশের জন্য প্রলয়ঙ্করী হতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং কক্সবাজারের রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের নেতারা নাগরিক কমিশনকে জানিয়েছেন–

১) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বনবিভাগের যে ৩ হাজার একরেরও অধিক জমি বরাদ্দ করা হয়েছে সেখান থেকে বন উজাড় হয়ে গিয়েছে। রোহিঙ্গারা নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কেটে তাদের আবাস নির্মাণ করছে, পরিবেশের উপর যা সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশে বনাঞ্চল কমতে কমতে জাতিসংঘের হিসেবে এখন ১০%-এ দাঁড়িয়েছে, যা প্রয়োজনের চেয়ে ১৬% কম।

২) বনাঞ্চলে যত্রতত্র ঘর বানাতে গিয়ে রোহিঙ্গারা না জেনে বন্যপ্রাণীর আবাস ধ্বংস করে দিচ্ছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে বান্দরবানে ৮ জন রোহিঙ্গা বন্য হাতির পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। বন্য হাতির আবাস ও চলাচলের পথে বনবিভাগের সতর্কিকরণ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে, যা রোহিঙ্গারা পড়তে পারেনি। বন্য হাতি তার আবাস খুঁজে না পেলে স্বাভাবিকভাবেই লোকালয়ে হামলা করবে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর কারণে এলাকায় বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

৩) কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়া উপজেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হলেও জীবিকার প্রয়োজনে তাদের অনেকে স্থানীয় শ্রমবাজারে ঢুকে পড়েছে। এলাকার বাঙালি ও পাহাড়ী দিনমজুররা সারাদিন যে কাজ করে চার/পাঁচশ টাকা আয় করত রোহিঙ্গারা সে কাজ এক'শ/দেড়'শ টাকায় করছে। যার ফলে স্থানীয় কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের ভেতর রোহিঙ্গাদের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বাড়ছে। অথচ এসব এলাকার মানুষই সবার আগে রাখাইন রাজ্য থেকে আগত আহত, বিপর্যস্ত রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

৪) কক্সবাজারের কুতুপালং ও উখিয়ায় বাঙালি জনসংখ্যার তিনগুণেরও বেশি এখন রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা। রোহিঙ্গাদের একটি অংশের ভেতর সন্ত্রাস প্রবণতা আগে থেকেই ছিল। তারা আবাস নির্মাণ করতে গিয়ে ফসলের জমি নষ্ট করছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাঁশ, গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ শিবিরের বাইরে এসে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দোকানও ফেঁদে বসেছে। বাধা দিতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রোহিঙ্গাদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসন এসব সংঘাতের ঘটনা প্রচার করছে না।

৫) নতুন করে আসা শরণার্থীদের সঙ্গে চার লাখের মতো পুরনো শরণার্থীর যোগাযোগ নতুন কোনো বিষয় নয়। রোহিঙ্গা যুবকদের অনেকে মাদক ও অস্ত্র পাচারের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। নতুন আসা রোহিঙ্গা যুবকদের অনেক এরই মধ্যে চুরি-ডাকাতি-খুন-জখমের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে মানব পাচার ও দেহ ব্যবসা। এ পর্যন্ত পুলিশ দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে শিবিরে ফেরত এনেছে। শিবিরের বাইরে যেতে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করছে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য সন্ত্রাসীচক্র।

৬) রোহিঙ্গারা বহু বছর ধরে নিজেদের দেশে স্বাস্থ্য সুবিধা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ৩০ বছরের নিচে শতকরা ৯০ ভাগ রোহিঙ্গা জীবনে কখনো টিকা বা ইঞ্জেকশন নেয়নি। স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত রেখে একটি জনগোষ্ঠীকে যেভাবে বার্মার সরকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে তা গণহত্যার অন্তর্গত। এশিয়ার দেশগুলোর ভেতর সবচেয়ে বেশি এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে বার্মায়। শরণার্থী শিবিরে এ পর্যন্ত শতাধিক এইডস আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে কলেরা ও উদরাময় যে কোনো সময়ে মহামারীর রূপ ধারণ করতে পারে, যা স্থানীয়দের ভেতরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৭) রোহিঙ্গারা ত্রাণসামগ্রীর পাশাপাশি নগদ অর্থ সাহায্যও পাচ্ছে। পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় স্থানীয় বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গাদের অনেকে বাজার থেকে বেশি দামে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনছে।

এর পাশাপাশি কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পেও ধ্বস নেমেছে। যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

৮) শরণার্থী রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ পুঁজি করে জামায়াত-বিএনপি এলাকায় সরকারবিরোধী প্রচারণা করছে। তারা বলছে হাসিনা সরকারের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে। রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধ হয়নি, শরণার্থীরাও কখনও ফিরে যেতে যাবে না।

৯) সরকারবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারণার জন্য জামায়াত সমর্থক তিনটি এনজিওর কার্যক্রম বন্ধ করা হলেও ত্রাণের নামে বহু জামায়াতি প্রতিষ্ঠান এখনও রোহিঙ্গা তরুণদের মগজে জিহাদ ও জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসের বিষ ঢোকাচ্ছে। তারা বলছে বাংলাদেশ চাইলেই যুদ্ধ করে আরাকান দখল করে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। জামায়াতীদের জিহাদি প্রচারণা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য সমূহ হুমকির কারণ হতে পারে। কয়েক হাজার বাড়তি পুলিশ দিয়ে রোহিঙ্গা শিবিরে জামায়াতের জঙ্গি জিহাদী তৎপরতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্থানীয় তরুণদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করা, যারা জঙ্গি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

১০) কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে জামায়াতের উদ্যোগে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর যে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছিল– বহু রোহিঙ্গা যুবক এতে অংশগ্রহণ করেছিল। জামায়াতিরা এখন বিভিন্ন বৌদ্ধ এলাকায় প্রচার করছে– যেহেতু বার্মার সামরিক বাহিনী ও বৌদ্ধরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নির্যাতন করছে– বাংলাদেশে কোনো বৌদ্ধ থাকতে পারবে না, এ দেশের সব বৌদ্ধকে বার্মায় পাঠিয়ে দিতে হবে। একইভাবে হিন্দুপ্রধান এলাকায় এসব মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা প্রচার করছে– ভারত ৪০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে আশ্রয় দিতে চাইছে না, বাংলাদেশের সব হিন্দুকে ভারতে তাড়িয়ে দিতে হবে। তারা রোহিঙ্গাদের ভেতর ত্রাণকার্যে নিয়োজিত খৃষ্টান এনজিওদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে– নাকি এসব এনজিও রোহিঙ্গাদের খৃষ্টান বানাচ্ছে। জামায়াত এবং তাদের অপরাপর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সহযোগীদের এসব সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে রামু ও নাসিরনগরের চেয়ে ভয়াবহ বহু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনা আগামীতে ঘটতে পারে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার বোধে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রতিবাদে একাধিক সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে। আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতারা এবং সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলেছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছি– বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি প্রতিনিধি দল বার্মা পাঠাবার জন্য। সরকার উদ্যোগী হলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বর্ষীয়ান ধর্মীয় নেতা সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের'র নেতৃত্বে এ দেশের

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি প্রতিনিধি দল বার্মায় শান্তি সফরে গিয়ে সরকার প্রধান অং সান সু চি ও সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাদের এ কথা বলতে পারেন– চলমান রোহিঙ্গা নির্যাতন ও গণহত্যা শুধু ভগবান বুদ্ধের শান্তির ধর্মকে কলঙ্কিত করছে না, বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও বিপন্ন করতে পারে। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীতে জঙ্গি মুসলিম মৌলবাদীরা বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে, যার ব্যানারে লেখা ছিল– 'সব বৌদ্ধকে হত্যা কর!' সন্ত্রাসের কাছে ধর্ম পরাজিত হবে– এটা কোন ধর্মের অনুসারীই চাইতে পারেন না।

বার্মার রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যারা দায়ি তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে (ICC) বিচারের জন্য আমরা একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিয়েছে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন'। রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধের জন্য বার্মার উপর যত রকমের চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব সবই করতে হবে।

এগার লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আগামী কয়েক বছরে বার্মায় প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমরা দেড় বছর আগেই সরকারকে বলেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত বার্মার সরকার আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না করছে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জাতিসংঘের সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে। ইতিপূর্বে জাতিসংঘের উদ্যোগে নেপালে আশ্রয় নেয়া দেড় লাখেরও বেশি ভূটানি শরণার্থীকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো ভাগ করে নিয়েছে। জাতিসংঘের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর সংস্থা ওআইসি এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে। সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা সেসব দেশেও পাঠানো যেতে পারে। সম্প্রতি কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড প্রায় তিন লাখ প্যালেস্টাইনি শরণার্থীকে তাদের দেশে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তৃতীয় বিকল্প হিসেবে রোহিঙ্গাদের তৃতীয় দেশে স্থানান্তরে সরকারকে কার্যকর কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বার্মায় গণহত্যার শিকার বিপন্ন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে মানবতার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হলে তার কঠিনতম মূল্য বাংলাদেশকে তো দিতে হবেই, অন্যান্য দেশও রেহাই পাবে না।

পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সম্পর্ক নিয়ে গত চার দশক ধরে লিখছেন সন্ত্রাস ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। ২০০৫ সালে বিএনপি-জামায়াতের জামানায় বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় জঙ্গি মৌলবাদীদের বোমা হামলার পর আমরা জামায়াত ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে গঠিত ১২৫টি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা প্রকাশ করেছিলাম, যার ভেতর ১৭টি ছিল রোহিঙ্গাদের। এগুলোর ভেতর 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও) সবচেয়ে পুরনো ও সংগঠিত, যার সদর দফতর করাচীতে। 'আরএসও'র

সঙ্গে পাকিস্তানের 'লস্কর-ই তৈয়বা' ও 'জামাত উদ দাওয়া'র ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অজানা নয়। ২০১২ সালে 'লস্কর-ই তৈয়বা' ও 'আরএসও' পাকিস্তানে রোহিঙ্গাদের নিয়ে সম্মেলন করেছে 'দিফা-এ মুসলমান আরাকান' নামে। একই বছর লশকরের দুই নেতা শহীদ মোহাম্মদ ও নাদিম আওয়ান গোপনে বার্মা-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘুরে গেছেন।

রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দ্বিতীয় বৃহৎ সংগঠন 'হরকত-উল জিহাদ আরাকান'-এর সদর দফতরও করাচীতে। এই সংগঠনের প্রধান আবদুস কুদ্দুস বর্মী পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে করাচিতে বসে বিদেশি সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এবং আরাকানে স্বাধীন রোহিঙ্গা মুসলিম রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। পাকিস্তানের শীর্ষ জঙ্গি মৌলবাদী নেতা হাফিজ সাঈদের সঙ্গে এক মঞ্চে বর্মীর ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। হুজি আরাকানের নতুন ফ্রন্ট হিসেবে এখন বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে তৎপর হয়েছে 'আকা উল মুজাহিদীন'। ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর এই সংগঠনই মংদুর তিনটি পুলিশ চৌকিতে হামলা করেছিল যাতে বার্মার নিরাপত্তা বাহিনীর নয় জন নিহত হয়েছিল। এর জবাবে সেই সময় মংদুতে নিরাপত্তা বাহিনী যে ব্যাপক হামলা করেছিল তার কারণে তৎক্ষণিকভাবে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা তখন বাংলাদেশে এসেছিল।

বার্মায় রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ না হলে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বেশি দিন বাংলাদেশে অবস্থনে করলে তাদের জঙ্গি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ শুধু বৃদ্ধি পাবে না, পাকিস্তানের 'আইএসআই', 'আলকায়দা' ও 'আইএস' এই অঞ্চলে জিহাদের ক্ষেত্র প্রসারিত করবে, যার অভিঘাত থেকে বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন, রাশিয়া কেউই মুক্ত থাকবে না। এই অঞ্চলে ভারতের কাশ্মীর, রাশিয়ার চেচনিয়া বা চীনের সিনকিয়াঙের মতো দীর্ঘমেয়াদী জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হবে, যদি ভারত, চীন ও রাশিয়া সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এগিয়ে না আসে। অনেক দেশ মানবতার মর্ম বুঝতে অক্ষম হলেও তারা নিজেদের নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। নিজেদের বিপদ বুঝতে পারলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আরও সক্রিয় হবে।

১৭ অক্টোবর ২০১৯

২০. রোহিঙ্গা সংকট ও চীনা কূটনীতি বাংলাদেশ-মিয়ানমার

তুরিন আফরোজ*

দুই বছর ধরেই চীন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধানের উপায় খুঁজতে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার, দুই দেশেরই বন্ধু চীন।

* সদস্য সচিব, বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন ও সাবেক প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ফলে চীনের দাবি, রোহিঙ্গাদের মতো একটি স্পর্শকাতর ইস্যুর সমাধান করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দু'টি দেশই যেন লাভবান হয়।

গত ২৪ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে রোহিঙ্গাবিষয়ক এক সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেছেন, রোহিঙ্গা সমস্যার 'টেকসই' সমাধানে চীন নিজস্ব 'রোডম্যাপ' অনুসারে কাজ করছে। তিনি মনে করেন, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মিয়ানমার সরকারের 'বিশ্বাসের ঘাটতি' দেখা দিয়েছে। রোহিঙ্গা ও মিয়ানমারের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে রোহিঙ্গা উত্তেজনা মোকাবিলায় লি জিমিং তার প্রস্তাবিত ডিপ্লোম্যাটিক সমাধানের নাম দিয়েছেন 'ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু' (১+১+২)।

চীনের 'ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু' (১+১+২) ফর্মুলাটি আসলে কী? ওই সেমিনারে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এই ফর্মুলা উপস্থাপন করেন। তার বয়ান অনুসারে, বাংলাদেশে আশ্রিত একটি রোহিঙ্গা পরিবার তার পরিবারের একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবে, যে কিনা মিয়ানমারে ফিরে যাবে। চীন তাদের দু'টি মোবাইল ফোন দেবে। একটি ওই প্রতিনিধির কাছে থাকবে, আরেকটি থাকবে বাংলাদেশে আশ্রিত তার পরিবারের সদস্যদের কাছে। মিয়ানমারে গিয়ে প্রতিনিধি স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখবেন, রাখাইনের পরিস্থিতি ভালো ও নিরাপদ কিনা তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করবেন। সেই আলোকে তারা দেখবে, সামনে এগোনো যাবে কিনা। পরিস্থিতি ভালো থাকলে বাংলাদেশে আশ্রিত পরিবার মিয়ানমারে যাবে। পরিস্থিতি খারাপ থাকলে বাংলাদেশে আশ্রিত পরিবার মিয়ানমারে যাবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কতটা কার্যকর হবে? প্রতিনিধি রাখাইনে গিয়ে দেখল যে পরিস্থিতি ভালো, তাহলে তো কথাই নেই। পরিবারের বাকি সদস্যরা নিশ্চিন্তে সীমানা পেরিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে গেল। কিন্তু প্রতিনিধি যদি রাখাইনে গিয়ে দেখে যে পরিস্থিতি ভালো না, তাহলে সে নিজে কি ফেরত আসতে পারবে বাংলাদেশে? নিদেনপক্ষে ফিরতি ফোনকল করে কি সেটা জানানোর সময় পাবে? এই নিশ্চয়তা কে দেবে? চীনের এই 'মোবাইল ডিপ্লোম্যাসি' কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে চীনের সদিচ্ছা কতটুকু, তা বলা মুশকিল। জাতিসংঘের মতে, আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা। বছরের পর বছর 'জাতীয় নিরাপত্তা' রক্ষার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার রাষ্ট্রের যে নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে আসছে, তার থেকে চোখ ফিরিয়ে বিশ্বশান্তির কথা বলা, এমনকি চিন্তা করাও নিতান্ত হাস্যকর। রোহিঙ্গাদের ওপর যে নির্মম নিপীড়ন চালানো হয়েছে, তাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। অথচ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চীন রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টিকে মিয়ানমারের 'একান্তই অভ্যন্তরীণ' বিষয় বলে অভিহিত করেছে। গণহত্যা কবে থেকে একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়!

রোহিঙ্গা সমস্যার কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি অনুসন্ধানে জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিস ইয়াংঘি লি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের কক্সবাজার পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন শেষে ইউএনওএইচসিএইচআর বা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের দপ্তর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে মিয়ানমারে যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে চলেছে, তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের ওপর সেখানকার সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও তাদের মদদপুষ্ট উন্মত্ত জনতা নির্দ্বিধায় ব্যাপকভাবে গণধর্ষণ, শিশু হত্যা, নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। ইয়াংঘি লি যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের বেশিরভাগই স্বচক্ষে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিহত হতে দেখেছে। অনেকের পরিবারের সদস্যরা এখনও উধাও। শিশুদের, এমনকি যাদের বয়স আট বছর, পাঁচ বছর অথবা মাত্র আট মাস, তাদেরও জবাই করে মেরে ফেলা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, ইয়াংঘি লি তার পরিদর্শনের সময় মোট ১০১ জন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি দাবি করেন, তারা মিয়ানমারে ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও বিভিন্ন প্রকারের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। হাজার হাজার রোহিঙ্গার বাড়িঘর, স্কুল, হাটবাজার, দোকান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের খাদ্যশস্য, ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশু লুট করা হয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাদের বাসস্থান ও দেশ থেকে জবরদস্তি বিতাড়ন করা হয়েছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও রোহিঙ্গা সংকটে চীন আন্তর্জাতিক ফোরামে মিয়ানমারের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। এই যে নিরপেক্ষতার অভয়বাণী চীন দিয়ে যাচ্ছে, তার পেছনে চীনের সুবিধাজনক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। মিয়ানমারে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ যে দেশটির, তা হচ্ছে চীন। পশ্চিমা দেশগুলোর বিনিয়োগ মিলিয়ে এর ধারেকাছেও নেই। তাহলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো পাওয়ারের অধিকারী চীন কখনই মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যাবে না, তা মুখে যতই নিরপেক্ষতার কথা সে বলুক না কেন।

চীনের বৈদেশিক আমদানি পণ্যের মধ্যে আছে জ্বালানি বা তেল-গ্যাস। এই পণ্যগুলো যায় মালাক্কা প্রণালি দিয়ে। চীন এ ব্যাপারে খুবই সচেতন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি তাদের কোনো সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রণালিটি অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। এ জন্যই তারা কৌশলগত কারণে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার একটা পথ ব্যবহার করতে চায়। ইতোমধ্যেই মিয়ানমারের আকিয়াব বন্দর থেকে চীনের ইউনান বা কুনমিং পর্যন্ত পাইপলাইন দিয়ে তেল-গ্যাস সরবরাহ চলছে। একটা রেললাইনও করার কথা আছে। তা ছাড়া তারা মিয়ানমারে অর্থনৈতিক জোন করবে। এরই মাঝে আন্তর্জাতিকভাবে চীন সরকার সমর্থিত গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসে ১০ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল– 'রাখাইন সহিংসতার জন্য কি সু চি

দায়ী?' শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়, তারা এ জন্য সু চিকে দায়ী করতে চায় না; বরং মিয়ানমারের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা না বুঝে সু চির সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর কঠিন সমালোচনা করা হয়েছে। এদিকে উইঘুর মুসলিমদের নিয়েও চীন বেশ সমস্যার মধ্যে আছে। 'মুসলিম' রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিয়ে সম্ভবত সে কারণে তাদের ভয়টা একটু বেশি। সবশেষে মনে রাখতে হবে, চীনের স্বার্থ যদি মিয়ানমারের পক্ষে থাকে, তবে চীন সেদিকেই অবস্থান নেবে। কোনো কূটনীতি বা এর কোনো সাফল্যই তাদের বাংলাদেশের পক্ষে আনতে পারবে না। তাই চীনের এই নব্য 'মোবাইল ডিপ্লোম্যাসি' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেটওয়ার্কই খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ।

সমকাল, ১২ ডিসেম্বর ২০১৯

২১. রোহিঙ্গাদের পক্ষে রায় : অতঃপর?

এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক*

গত ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক আদালত যে রায় দিয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থেই উল্লাস করার মতো। বঙ্গবন্ধু বর্ষের শুরুর মাসে বাংলাদেশের জন্য এর চেয়ে বেশি গৌরবের কোনো উপহার হতে পারত না। এই অন্তর্বর্তীকালীন রায় বিশ্বমানবতার জয়, মানবাধিকারের জয়, জয় বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সার্থক কূটনীতির।

এ রায় বাংলাদেশের মানুষের মনে একদিকে যেমন স্বস্তি ও প্রশান্তি এনেছে, অন্যদিকে তেমন ছড়িয়ে দিয়েছে অগণিত প্রশ্ন যার ভিত্তি এ রায়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। অনেকের মনেই প্রশ্ন এ রায়ে আমরা কী পেলাম, রায়ের ভবিষ্যৎ কী ইত্যাদি। একজন আশাবাদী হিসেবে আমার ধারণা ইতিবাচক। প্রথমত ২৩ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল এই মর্মে ঘোষণা যে, এ মামলাটি আইসিজেতে চলতে পারে। এ মামলাটি আইসিজেতে চলতে পারে না এ কথাটি বলার জন্যই স্বয়ং সু চি দ্রুততম গতিতে ছুটে চলে গিয়েছিলেন হেগে। তিনি সম্ভবত তার কৌঁসুলিদের কাছ থেকে এ মর্মে ভ্রান্ত উপদেশ পেয়েছিলেন যে মামলাটি চলতে পারে না।

আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়ে আইসিজে সু চির এ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। এ মামলা মূল শুনানিতে যেতে বেশ কয়েক বছর লাগবে বিধায় সেদিন যে চারটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা আইসিজে দিয়েছে সেগুলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কেননা মূল শুনানি শেষে চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পাথেয় হচ্ছে এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনাসমূহ। সৌভাগ্যবশত এ নির্দেশনাগুলো পূরণ হলে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে

* চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচার

ফিরে যাওয়ার কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কেননা এই চার নির্দেশনার অন্যতম হচ্ছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। আইসিজে এ নির্দেশনা দিয়েছে মিয়ানমার যেন ১৯৮৪ সালের গণহত্যা কনভেনশন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এছাড়া এ ব্যাপারে মিয়ানমার কী কী পদক্ষেপ নিল নিয়মিত তা আইসিজেকে জানানো। আরও যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো, অচিরেই অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং তথ্য-প্রমাণ যেন নষ্ট না হয়, তার নিশ্চয়তা। অনেকে মনে করছেন আইসিজে এই মর্মে রায় দিয়ে দিয়েছে যে, মিয়ানমারে গণহত্যা হয়েছে। এ ধারণা ভুল। যে আদেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো অন্তর্বর্তীকালীন। মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষ হওয়ার আগে কোনো আদালতই মূল প্রশ্নের ব্যাপারে ঘোষণা, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে গণহত্যা হয়েছে মর্মে ঘোষণা, দিতে পারে না। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত শুনানির পর। আইসিজে আরও কটি অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি যা গাম্বিয়া চেয়েছিল, যেমন মিয়ানমারে পর্যবেক্ষক পাঠানোর নির্দেশ। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা যা গাম্বিয়া চেয়েছিল কিন্তু আদালত দেয়নি তা হলো এই মর্মে আদেশ যে, মিয়ানমারে যেসব অপরাধ ঘটানো হয়েছে যথা– গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা এবং ঘরবাড়ি ধ্বংসকে জেনোসাইড কনভেনশনের অপরাধ হিসেবে গণ্য করে অন্তর্বর্তীকালীন ঘোষণা।

পর্যবেক্ষক নিয়োগের আদেশ দিলে সেটি খুবই ফলপ্রসূ হতো এ কারণে যে, মিয়ানমার আইসিজের আদেশমতো কাজ করছে কিনা, পর্যবেক্ষকরা তা নিশ্চিত করতে পারতেন। যা হোক, গাম্বিয়া প্রয়োজনে ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত করতে পারবে, কেননা রায়ে আইসিজে বলেছে, মিয়ানমারকে পর্যায়ক্রমে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হবে এবং গাম্বিয়া সে প্রতিবেদন পাওয়ার পর আইসিজের দ্বারস্থ হতে পারবে। তাই ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষক পাঠানোর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চেয়ে আবেদনের পথ খোলা থাকবে। অনেকের মনে প্রশ্ন, মিয়ানমার আইসিজের রায় ও নির্দেশনা মানতে বাধ্য কিনা। আইসিজে হচ্ছে জাতিসংঘের ছয়টি অঙ্গের একটি। জাতিসংঘ সনদের ৯৪ অনুচ্ছেদে এই মর্মে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে যে, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই আইসিজের রায় এবং আদেশ মানতে বাধ্য। সুতরাং আইসিজের আদেশ অমান্য করা মানে শুধু আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করাই নয়, বরং জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন করা। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদালতসমূহ যেমন তাদের রায় পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে, আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়, কেননা সব রাষ্ট্রই সার্বভৌম বিধায় কোনো প্রয়োগকারী বাহ্যিক কর্তৃপক্ষকে কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো সম্ভব নয়। (নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া) তা ছাড়া জাতিসংঘের কোনো পুলিশ বাহিনীও নেই আইসিজের রায় বাস্তবায়নের জন্য। অনেকে ভুল করে ইন্টারপোলকে জাতিসংঘের পুলিশ বলে মনে করে। এটি ঠিক নয়। ইন্টারপোল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের

পুলিশ বাহিনীসমূহের একটি সমিতি মাত্র। যদিও বিভিন্ন দেশের এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন দাফতরিক নথিতে ইন্টারপোলের উল্লেখ রয়েছে, তবু পৃথিবীর কোনো দেশেই ইন্টারপোলের কোনো স্টেচুটারি অবস্থান নেই। আইসিজের রায় অমান্য করার অর্থ জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন করা বিধায় আইসিজের রায় অমান্য করার ঘটনা খুবই কম। তবে রায় লঙ্ঘনের কিছু নজির যে নেই, তা নয়। আইসিজে ১৯৮৪ সালে নিকারাগুয়ার পক্ষে রায় দিলে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে রায় লঙ্ঘন করেছিল। ১৯৭৩ সালে ফ্রান্স আইসিজের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে আণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল, ১৯৪৫ সালে আইসিজে যুক্তরাজ্যকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য আলবেনিয়াকে নির্দেশ দিলেও আলবেনিয়া তা মান্য করেনি।

আইসিজের রায় অমান্য করলে একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হওয়া। জাতিসংঘ সনদের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ রায়প্রাপ্ত দেশকে এ অধিকার দিয়েছে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ কী সিদ্ধান্ত নেবে বা আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত নেবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপার, যেখানে ভোট ও ভেটো দুটোই চলে। আইসিজে নিরাপত্তা পরিষদকে বাধ্য করতে পারে না। আইসিজের দেওয়া চারটি আদেশই বিচারপতিদের সর্বসম্মত নির্দেশনা হওয়ায় এগুলো অনেক ওজনদার। তাই মিয়ানমার আন্তর্জাতিকভাবে প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়বে এই নির্দেশনাসমূহ মান্য করতে। চূড়ান্ত আদেশের জন্য গাম্বিয়া তার আরজিতে যা চেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো– এই মর্মে ঘোষণা এবং নির্দেশনা যে, বিতাড়িত বা বিতাড়িত হতে বাধ্য করা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার এবং মর্যাদাসহ নিরাপদে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং ঘটিত অপরাধসমূহের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তার নিশ্চয়তা। গাম্বিয়া তার আরজিতে এই মর্মে নালিশ করেছে যে, মিয়ানমার জাতিগত নিধন (Genocide) করেছে, তা করার ষড়যন্ত্র করেছে, জনগণকে এসব করার জন্য উৎসাহিত করেছে, এসব অপরাধ বন্ধ করতে, অপরাধীদের সাজা দিতে এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে। আরজিতে আরও বলা হয়েছে, অপরাধীদের যেন ফৌজদারি বিচারের আওতায় আনা হয়।

আইসিজের রায় বা নির্দেশনার বিরুদ্ধে কোনো আপিল হয় না। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনাগুলো থেকে এটা আশা করা যায় যে, চূড়ান্ত আদেশেও গাম্বিয়ার প্রার্থিত আদেশসমূহ থাকবে, বিশেষত এই কারণে যে, অন্তর্বর্তীকালীন আদেশসমূহ হয়েছে ১৭ বিচারপতির সবার সর্বসম্মতিক্রমে। মিয়ানমারের প্রাথমিক ধারণা ছিল, আইসিজেতে এ মামলা চলতে পারে না বলে তাদের প্রার্থনা গৃহীত হবে। কিন্তু আদালত তাদের সেই যুক্তি নাকচ করায় মিয়ানমারের মোহভঙ্গ হয়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, মিয়ানমার, বিশেষ করে সু চি আরও অধিক আন্তর্জাতিক লাঞ্ছনা ও নিন্দা এড়ানোর জন্য সম্ভবত চূড়ান্ত শুনানির আগেই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধসমূহ বন্ধ করে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে উদ্যোগী হবেন। বিশেষজ্ঞদের এ ধরনের মতামতের পক্ষে যুক্তি রয়েছে। একদিকে আইসিজে

যেমন অপরাধীদের ফৌজদারি বিচারের নির্দেশনা দিয়েছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের (আইসিসি) প্রসিকিউটরও এরই মধ্যে উক্ত আদালতের প্রাকবিচার চেম্বারের অনুমোদন পেয়ে তদন্তকাজ শুরু করে দিয়েছেন। আইসিসি জাতিসংঘের অংশ নয়, এটি রোম চুক্তি নামক একটি বহুজাতিক চুক্তির সৃষ্টি। এ আদালত জেনোসাইড এবং মানবতাবিরোধী অপরাধসহ চারটি অপরাধের বিচার করতে পারে। তবে অপরাধ হতে হবে চুক্তিভুক্ত দেশে। মিয়ানমার চুক্তিভুক্ত দেশ না হলেও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে পারবে এই কারণে যে, মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে দেশান্তর করা আর এই অপরাধ তখনই সংঘটিত হয় যখন বিতাড়িত ভুক্তভোগী অন্য দেশের মাটিতে পা রাখেন, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ রোম চুক্তিভুক্ত হওয়ায় এ অপরাধটি বাংলাদেশের মাটিতে ঘটে যাওয়ায় আইসিসি এ অপরাধের জন্য সু চিসহ মিয়ানমারের সেসব ব্যক্তি এ অপরাধ সংঘটনে ভূমিকা পালন করেছেন বা অপরাধ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের বিচার করতে এবং সাজা দিতে পারবে। আইসিসি আইসিজের মতো দেওয়ানি আদালত নয়। এটি ফৌজদারি আদালত, যেটি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিতে পারে।

তদন্ত শুরু হয়ে যাওয়ায় এখনই প্রসিকিউটর সু চিসহ অন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারির আদেশ চাইতে পারেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সঙ্গে সঙ্গে আইসিসি রোম চুক্তিভুক্ত সব দেশকে বলতে পারে পরোয়ানায় নামীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে আইসিসির কাছে হস্তান্তর করতে। এমন একটি পরোয়ানা সুদানের সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি ওমর আল বশিরের ওপর জারি রয়েছে যার কারণে বশির রাষ্ট্রপতি থাকাকালে এ ভয়ে কোনো দেশে যেতেন না যে সে দেশ তাকে আইসিসিতে সোপর্দ করে দিতে পারে। সু চি এবং তার অপরাধী জেনারেলদেরও একই অবস্থা হতে পারে– এই ভয়ে তারা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং অপরাধসমূহ বন্ধ করার প্রস্তুতি নিতে পারেন বিষয়টি বেশি দূরে গড়ানোর আগে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। তার পরও বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। মিয়ানমার যদি রায় বা নির্দেশনা না মানে তবে গাম্বিয়াকে নিরাপত্তা পরিষদে যেতে হবে এবং এজন্যই নিরাপত্তা পরিষদে জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক ঘোষণা ও নির্দেশনার পর চীন এবং রাশিয়া তাদের মত পরিবর্তন করতে পারে বলেও অনেক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২২. রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ হত্যা এবং সন্ত্রাসবাদের অশনিসংকেত

অজয় দাশগুপ্ত*

সম্প্রতি কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা নেতা মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। চল্লিশোর্ধ্ব এ রোহিঙ্গা নেতা মাস্টার মুহিবুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। 'আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি পিস ফর হিউম্যান রাইটস' নামে একটি সংগঠনের চেয়ারম্যান মুহিবুল্লাহ ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে আলোচনায় আসেন। জেনিভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থায়ও রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে তিনি 'রোহিঙ্গাদের কণ্ঠস্বর' হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। মুহিবুল্লাহর পরিবারের সন্দেহ তার হত্যার সঙ্গে জড়িত 'আরাকান রিপাবলিকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা)'।

এ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মুহিবুল্লাহকে হত্যার জন্য বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে। তার মানে হচ্ছে, মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্ব সংঘাত এবার বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। মুহিবুল্লাহর এ হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে রোহিঙ্গাদের আরও শীর্ষ নেতা বাংলাদেশে ঘাপটি মেরে রয়েছে। তাদের কেউ কেউ যথেষ্ট শক্তিশালী। কেননা, অন্য একটি দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়ার পরও তারা প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতের নেতাদের নির্মূল করতে সশস্ত্র হামলা চালানোর ব্যাপারে আশ্রয় নেওয়া দেশটির আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভয়ে ভীত নয়।

এই যে নেতাগিরি, এর ভিত্তি কী! আমরা যদি একাত্তরে ফিরে যাই তাহলে দেখবো, শরণার্থী জীবনে আমাদেরও নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো মাথার ওপর ছিলেনই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমাদের দিকভ্রান্ত জাতিকে সামাল দিয়েছিলেন জাতীয় চার নেতা। তারা শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে নেতা হননি। তাঁদের জীবনই ছিল রাজনীতি। ধারাবাহিক সংগ্রামে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল ১৯৫২ সালে। রোহিঙ্গাদের কি তেমন কোনো ইতিহাস, তেমন কোনও নেতা আছেন? এ পর্যন্ত আমরা কি তার কোনো সন্ধান পেয়েছি? তাহলে প্রশ্ন রেখেই এগোতে হয়, এখন যারা রোহিঙ্গাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের মূল উদ্দেশ্যটা কী? তারা কি মিয়ানমারে ফিরে যেতে চান? স্বাধীন আরাকান চান? স্বাধীন আরাকানই যদি চান, তাহলে যে দেশটি বিপদে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিল সেখানে বসেই তারা কেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন? কেন আশ্রয় দেওয়া দেশটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন?

২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইনে সেনা অভিযান শুরুর পর প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ সীমান্তে নামে রোহিঙ্গাদের ঢল। সব মিলিয়ে এখন ১১ লাখের মতো রোহিঙ্গা রয়েছে বাংলাদেশে। তখন একটি বড় অংশ ধর্মের দোহাই দিয়ে রোহিঙ্গাদের

* সিডনি প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট

আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে সোশাল মিডিয়ায় টানা ক্যাম্পেইন চালিয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জুড়ে হাহাকার আর রোহিঙ্গা নারীদের দরকার পড়লে বিয়ে করার ঘোষণার মধ্য দিয়ে তথাকথিত 'জিহাদ' এ শরীকের কথাও কেউ কেউ সদম্ভে বলেছিলেন।

তবে তখন কেউ ঘূণাক্ষরেও ভাবেননি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন কীভাবে হবে। এমনকি এ ধরনের পরিস্থিতিতে সমাধানে কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সে ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিরও সঠিক দিক-নির্দেশনা ছিল না। নেই এখনো সুদূরপ্রসারী কোনো 'রোডম্যাপ'। প্রাথমিকভাবে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের কিছু অংশকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হলেও, রোহিঙ্গা নেতারাই এর বিরোধিতা করছেন। রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ আবার ভাসানচরের তাবৎ সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে পালিয়েও আসছেন। অদ্ভুত!

অং সাং সুচির ক্ষমতাগ্রহণের আগে মিয়ানমারের সামরিক সরকার নোবেল জয়ী এ প্রধান নেতাকে ঘরে বন্দি রেখে মৃত্যুর সময় তার স্বামীর সাথে দেখা করতে দেয়নি। এখন আবার তাঁকে এমন এক ঘরে রেখেছে, যেখানে টয়লেট আর বিছানা পাশাপাশি। কাজেই রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতাদখলকারী সরকারের কাছ থেকে কোনও কূটনৈতিক শিষ্টাচার আশা করাটা অবান্তর। আবার দেখুন মানবতার বার্তা নিয়ে যে অং সান সুচি শান্তিতে নোবেল পেলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর গণহত্যার প্রচ্ছন্ন সাফাই গেয়েছেন নানা কূটনৈতিক কথা বলে।

মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে মোকাবেলার জন্য দরকার বুদ্ধি, কূটনীতি আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। আমি ঠিক জানি না বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কার্যকর কী পদক্ষেপ নিয়েছে। বরং বরাবরই দেখছি সরকারী দল ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ দায়ী করছেন যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ নানা শক্তিকে। এই আমাদের আর এক রোগ। জঙ্গি ধরা পড়লে বলি এক দেশের উস্কানি, চোর ধরা পড়লে বলি আরেক দেশের নাম। ছেলেবেলা থেকে পাশের দেশ, দূরের দেশ, আমেরিকা-রাশিয়া-চীন এদের দোষ দিতে দেখে বড় হওয়া আমরা জেনেছি এটা হলো দুর্বলের কাজ।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আমার মনে হয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জায়গায় আমরা ভুল অবস্থানে ছিলাম। এর কুফল ভোগ করতে হবে দীর্ঘকাল। বাড়ি চট্টগ্রামে হওয়াতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি কক্সবাজার থেকে টেকনাফ, বিশেষ করে গহীন অরণ্যের এলাকাগুলো দীর্ঘকাল থেকেই সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য ছিল। সেখানে জঙ্গি ট্রেনিং-অস্ত্র-মাদক চোরাচালানের কথা সবাই জানেন। টেকনাফের অবস্থা এমনই, নেতার নাম পর্যন্ত হয়ে গেছে মাদকের নামে। তাহলে কি করে ভাববো যে সে এলাকায় বসবাসরত আশ্রয়হীন, কম লেখাপড়া জানা একদল শরণার্থী, যারা নতুন জীবনের জন্য মরীয়া- তারা খুব বেশিদিন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে থাকবেন?

দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কোটি কোটি টাকার খোয়াবে মশগুল সমাজের গডফাদারেরা এদের ওপর ভর করবে এটাই স্বাভাবিক। এবার চট্টগ্রাম গিয়ে শুনি সেখানকার মাদক ও নেশার জগত এখন রোহিঙ্গাদের দখলে। দখলে বলতে, সাপ্লাই

আসার পর বিতরণ করে বিক্রি করানো হয় রোহিঙ্গা তরুণদের দিয়ে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন অসহায় ও একরোখা এদের তরুণ-তরুণীদের টাকা দিয়ে বশ করা সহজ। আরো একটি কথা সবাই বলেন, এরা নাকি খুব 'অপরাধপ্রবণ'। এর প্রমাণ অবশ্য আমি সিডনিতেই দেখেছি। এখানেও কিছু শরণার্থী নামের উদ্বাস্তু বাংলাদেশ দূতাবাসের কোনো কোনো কর্মচারীর সহায়তায় জাল পাসপোর্ট বাংলাদেশি পরিচয় নিয়ে ঢুকে পড়েছেন। সাথে শরণার্থী হিসেবে আসা রোহিঙ্গারাও আছেন। আমি নিজের চোখে সিডনিতে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের প্রকাশ্যে-রাস্তায় এদেশের নিয়ম ভেঙে মারামারি করতে দেখেছি। পুলিশের তৎপরতা আর চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ঘটনা সেদিন বেশিদূর আগায়নি।

মিয়ানমারের অবহেলিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। জাতিগতভাবে তাদেরকে মূলধারায় কখনো ঢুকতে দেয়নি মিয়ানমার সরকার। নাগরিক হিসেবে দেয়নি স্বীকৃতি। কাজেই তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা থাকবে সেটিই স্বাভাবিক। যারা আবেগ নিয়ে একসময় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য নানা ধরনের লম্ফঝম্প করছিলেন, তাদের আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। তারাই এখন এদের বিদায় না করতে পেরে সরকারকে দুষছে। কিন্তু পানি তো গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। বলও চলে গেছে কোর্টের বাইরে। রোহিঙ্গাদের হাতে স্থানীয় বাঙালিদের মার খাওয়ার খবরও সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি। এখন এটা মানতেই হবে এদের ফিরিয়ে দিতে যত দেরি হবে ততই বাড়বে মাদক, নেশা আর মারামারি।

নেশা, সন্ত্রাস আর দাঙ্গার অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে এলাকা। দুর্ভাবনা এটাই মুহিবুল্লাহকে হত্যার পরও কি আমরা আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করতে পারবো রোহিঙ্গাদের নিজভূমে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য? আমরা কি পারবো এমন কোনো চাল দিতে, যাতে মিয়ানমার সরকার কূটনৈতিকভাবে দারুণ পর্যুদস্ত হয়? যদি না পারি, তাহলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির কেবল শুরুর ইঙ্গিত দিল মুহিবুল্লাহর হত্যা। আবেগ সরিয়ে মগজ খাঁটিয়ে এ সমস্যা সমাধান করতে হবে। আর এজন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-এশিয়ার মানচিত্র ২০ বছর পর কী হতে পারে, তা দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে হবে আমাদের কূটনীতিবিদদের।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১২ অক্টোবর ২০২১

বার্মার জান্তা বাহিনীর নিপীড়ন, ধর্ষণ ও গণহত্যার শিকার ভুক্তভোগী ১০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জবানবন্দি

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নের সূত্রপাত ঘটেছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। দেশটিতে জান্তা সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকেই একের পর এক নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসতে থাকে আরাকান রাজ্যে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের উপর।

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি'- বিএসপিপি গঠন করেন। আরাকানের মগরা দলে দলে এই পার্টিতে যোগদান করলেও রোহিঙ্গারা জান্তা সরকার গঠিত বিএসপিপিতে যোগদান থেকে বিরত থাকে। এরপর থেকেই মূলত শুরু হয় রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন। যার ফলাফল পাওয়া যায় ১৯৬৪ সালে। সেসময়ে নে উইন সরকার রোহিঙ্গাদের ইউনাইটেড রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন, দি রোহিঙ্গা ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশিনসহ রোহিঙ্গাদের সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি চাকরি থেকেও মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করা হয়।

১৯৭০ সালে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সনদ দেওয়া বন্ধ করে দেয় জান্তা সরকার। ১৯৭৪ সালে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি আরকানদের 'রাখাইন স্টেট' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ, সম্পদ লুট, বিনা কারণে আটক করে কারাগারে নিক্ষেপসহ প্রভৃতি নির্যাতনের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে কিয়াক্টাও, ম্রোহং, পায়ুক্টাও, মিনবিয়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে রোহিঙ্গা মুসলমানরা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ করে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার চরমপত্র দিলে মিয়ানমার সরকার উদ্বাস্তুদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এর তিন বছর পরই ১৯৭৮ সালে অপারেশন নাগামিন বা ড্রাগন কিং নামে ভয়াবহ রোহিঙ্গা বিরোধী অভিযানে নামে জান্তা সরকার।

১৯৮২ সালে মিয়ানমার নাগরিক আইন জারি করে। ওই আইনে দেশটিতে বসবাসরত ১৩৫টি জাতিকে স্বীকার করে নিলেও, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়। এই আইন এখনও বলবৎ আছে। এরপর নানা সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন অব্যহত রাখে ক্ষমতাসীনরা। আত্মরক্ষার জন্য রোহিঙ্গাদের অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

রোহিঙ্গাদের আগমন চার দশকেরও বেশি সময় থেকে শুরু হলেও ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরে মূলত এর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ওই দিন মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বাংলাদেশ সীমান্ত চৌকির সন্নিকটে মংডু শহরের কাছে রোহিঙ্গাদের প্রায় ৩০০ জনের

একটি সশস্ত্র দল মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী সেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ৯ জন বিজিপি (মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী সেনা) নিহত হয়।

মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী দাবি করে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট আরাকানের মংডু এলাকার ৩০টি নিরাপত্তা চৌকিতে আরসা নামক একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী হাতবোমা ও লাঠিসোটা, দা সহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একযোগে হামলা করে। এর প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী দমনের নামে রোহিঙ্গা বসতি এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। যার ভুক্তভোগী বাংলাদেশে অবস্থানকারী প্রায় চৌদ্দ লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে ২০১৭ সালের ১১ অক্টোবরে 'বার্মার গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠিত হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগ তদন্তের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের ভেতর সন্ত্রাসী কার্যক্রম সম্পর্কে অনুসন্ধান ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুল হুদার নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ২০১৭ সালের ২১-২২ অক্টোবর কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে। কমিশনের সদস্যরা এসময় প্রায় দুই'শ, ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন যাদের ভেতর হিন্দু রোহিঙ্গাও ছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তিনজন প্রাক্তন বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর দু'জন প্রাক্তন মেজর জেনারেল ও পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক সহ বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা ছিলেন।

২০১৭ সালের ২১ তারিখ সন্ধ্যায় নাগরিক কমিশন ত্রাণ-পুনর্বাসন-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। যেভাবে নাগরিক কমিশন ভুক্তভোগী রোহিঙ্গাদের জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন, সেভাবেই নাগরিক কমিশনের সচিবালয়ের অনুসন্ধানী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা একটি প্রশ্নমালা তৈরি ছয় মাসে দশ হাজার ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জবানবন্দি সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে থেকে ১০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর জবানবন্দি এখানে তুলে ধরা হলো।

মাঠপর্যায়ে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি সংগ্রহের জন্য 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে, সে প্রশ্নমালার বিবেচ্য বিষয় ছিল–

১) বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও গণবিতাড়নসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা।
২) আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন অনুযায়ী রোহিঙ্গারা কীভাবে বার্মার বৈধ নাগরিক তা প্রমাণ করা।
৩) বার্মায় ধারাবাহিক রোহিঙ্গা নির্যাতন এবং তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়নের কারণ অনুসন্ধান এবং বন্ধের জন্য করণীয় নির্দেশ।
৪) বার্মার সরকার, সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা যায় কি না।
৫) রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বার্মা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে কি না।

৬) সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য 'আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি' এবং রোহিঙ্গাদের অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কোনও দায়-দায়িত্ব আছে কিনা, থাকলে কতটুকু এবং এ ব্যাপারে করণীয়।

৭) রোহিঙ্গাদের ভেতর জঙ্গি মৌলবাদ বিস্তারের কারণ এবং রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে কিনা এবং এ বিষয়ে ভারত এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে কিভাবে সতর্ক করা যায়।

৮) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিবেচনা।

৯) বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, পরিবেশ, জন নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার উপর কী ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি

১. মো. শফি (২৫), পিতার নাম ঃ আবদুস সালাম, মাতার নাম ঃ মরিয়ম খাতুন, দাদার নাম ঃ আব্দুল মাবুত, স্ত্রীর নাম ঃ সেনুরা বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নয়াপাড়া, থানাঃ বুচিদং, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। পরিবারে নিহতের নাম ঃ বাবা আবদুস সালাম ও মা মরিয়ম খাতুন।

মো. শফি বলেন, আমি একজন শ্রমিক। আমরা ৩ ভাই। আমার কোনো পাসপোর্ট নেই, শুধু আইডি কার্ড ছিল। যেটা বার্মিজ সেনারা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি একটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলাম আর আমার বাপ দাদারাও নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা আমাদের কাছে ভোট চাইতে আসতেন। আমাদের গ্রাম প্রধান/সর্দারের নাম হচ্ছে আমান উল্লাহ। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমান উল্লাহ আমাদের প্রাণে বাঁচার জন্য নির্দেশ দেন, যে যেদিকে পার, পালিয়ে যাও। আমি অং সান সুচির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)কে সমর্থন করতাম। আমাদের ছেলে মেয়েদের সরকারি কোনো স্কুলে ভর্তি করার সুযোগ ছিল না। সরকারি স্কুলগুলোতে বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। রোহিঙ্গা মুসলিমরা ফোরকানিয়া, মক্তব, ঘরবাড়ি এবং মাদ্রাসাতে পড়ে শিক্ষা অর্জন করতো। সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা ও আরবি ভাষায় পাঠদান দেওয়া হতো। মসজিদ তৈরি করা, মসজিদে নামাজ পড়া, কোরবানি দেওয়াসহ ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বার্মিজরা আমাদেরকে সবসময় বাধা প্রদান করত। বাপ-দাদার আমল থেকেই আমরা আরাকানের বুচিদং থানায় বসবাস করি। আমার বাড়ি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক দূরে। আমার জায়গাজমি ও বসতবাড়ি বাপ-দাদার সূত্রে পেয়েছি। ঐসব জায়গাজমি দলিলও রেকর্ড করা। খতিয়ানের মাধ্যমে এইসব জায়গা-জমি নির্ধারণ করা হতো।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে আমার বাবা মাকে বার্মিজ সৈন্যরা গলা কেটে হত্যা করে। মিলিটারী ও বার্মিজরা যৌথভাবে ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে এবং সবকিছু লুটপাট

করে নিয়ে যায়। আমাদের গ্রামে ২৫০টির মতো বাড়িতে ওরা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আমার ৬০ লক্ষ বার্মিজ টাকা সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের গ্রামে ৩ বার হামলা হয়। পুলিশ, মিলিটারি ও বার্মিজরা আমাদের উপর হামলা করে। হামলা করার সময় ধারালো অস্ত্র, বন্দুক এবং একে-৪৭ ব্যবহার করে। আক্রমণের সময় হামলাকারীরা আমাদেরকে বলেছিল 'তোরা বাঙালি, তোরা বাংলাদেশে চলে যা। বাংলাদেশ তোদের বাপ-দাদার দেশ, এই দেশে কোনো মুসলিম থাকতে পারবে না'। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন, হরকাতুল জিহাদ এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করি না। এসব জঙ্গি সংগঠন কোনো শান্তি চায় না। ঝগড়া লাগিয়ে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু এর খেসারত দিতে হয় রোহিঙ্গা জনসাধারণকে। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করি না। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করি না। হরকাতুল জিহাদ রোহিঙ্গাদের নামে বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা এনে নিজেরাই খরচ করতো। এসব রোহিঙ্গা সংগঠনের কারণে আরাকানে শান্তি আসেনি। জিহাদের নামে যুবকদেরকে দলে টেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সবসময়। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের নেতা আতাউল্লাহ জুনুনী ও হাফেজ সালামত উল্লাহ এবং আবদুল হাকিমের নাম শুনেছি।

২. লাল মতি (৫৩), পিতার নাম ঃ মরহুম ইয়াকুব আলী, মাতার নাম ঃ সাহারা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম মজিদ আলী, স্বামীর নাম ঃ মো. জামাল আহমদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ শীগ পুগে, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মোঃ জামাল আহমদ।

লাল মতি বলেন, আমরা ৫ ভাই, ৩ বোন। কার্ড না থাকায় আমি ভোট না দিলেও বাপ-চাচারা ভোট দেয়। আমাদের স্কুলে পড়ার সুযোগ না থাকলেও মাদ্রাসা ও মক্তবে পড়ালেখা করতাম। হামলার দিন বার্মিজ সেনারা ঘরবাড়ি লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছে। আমাদের নারীদের ধরে নিয়ে গেছে, ধর্ষণ করেছে। প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছি। হরকাতুল জিহাদ ও আল ইয়াকিনের নাম শুনেছি। তারা যুবক বয়সীদের দলে নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। এসব সংগঠনের কারণেই বার্মিজ সেনারা আমাদের উপর হামলা করেছে।

৩. মোস্তফা খাতুন (৬০), পিতার নামঃ আহমদ আলী, মাতার নামঃ আসিয়া বেগম স্বামীর নামঃ মোস্তফা আজাদ, গ্রাম/ পাড়াঃ রোয়ামায়, থানাঃ বুথিডং, রাজ্যঃ আরাকান।

মোস্তফা খাতুন বলেন, আমি রোয়ামায় গ্রামের বাসিন্দা। আমার বাপ দাদারা শত বছর ধরে ওখানেই বসবাস করে আসছেন। ওখানেই আমার জন্ম। আমি ছোটকালে লেখাপড়া তেমন শিখিনি। সাত-আট বছর বয়সে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিল। দুই বছর মতো গেছি। পরে আর যাইনি। ওখানে মুসলমান মেয়েরা স্কুলে যায় না। ছেলেরাই ১০ ক্লাসের পর পড়তে পারে না। আরাকানে দেশে ১৮-এর আগে বিয়ে নিষেধ। আমার স্বামী হালচাষ করত। চার ছেলে চার মেয়ে রেখে মারা গেছে। ছোট মেয়ে ইসমত

আরাকে স্কুলে পাঠাতাম। ক্লাস সিক্সে পড়ে। মেয়ের পড়ার শখ আছে। সব সময় আরাকানের ছেলেরা উৎপাত করে আমার মেয়ে ইসমতকে। লুন্টিন (পুলিশ) তো আছেই। ওরা বোরখার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চেক করে। এতে অস্বস্তি হয়। সহ্য করতে হয়। নইলে নির্যাতন হবে দ্বিগুণ। কোনো কিছুর কোনো বিচার নেই। কিছু বললে কেটে ফেলবে। এখন তো বাংলাদেশে চলে এসেছি বড় মেয়ের কাছে। ওরা এখানে আগেই এসেছে। সে আরেক গল্প। আমরা হাসপাতালে যেতে পারি না। বর্ডারে ঘুষ দিয়ে বাংলাদেশে এসে চিকিৎসা করাতে হয়। সেটা করারও সুযোগ পাইনি। কত মেয়ে যে প্রতিবছর বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। এখন বাংলাদেশে এসেছি। আমার এই মেয়ের আর বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। কী যেন করেছে।

মিয়ানমারে আমাদের পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। মানুষ খুন করে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়েছে। সাত দিন পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে তারপর পালংখালী দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি। কফির দানা আর সিম বিচি খেয়ে থেকেছি। পায়ের ভেতর গাছের ডাল ঢুকে গিয়েছিল। নখ উঠে গেছে। তবু ভালো আছি। দেশ ছাড়ার পথে কত রোহিঙ্গার লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। থাকতে দিলে আমি বাংলাদেশেই থেকে যাব। এখানে মরে গেলে অন্তত একটা কবর তো পাব। শিয়াল কুকুর লাশ খাবে না। কেউ পুড়িয়েও দেবে না। আর আমার মেয়ে ইসমত পড়াশোনা করতে চায়। এখানে যদি পড়ার একটু সুযোগ পাওয়া যায় তাতেই জীবনে অনেক আনন্দিত হবো। জানি না স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে কতদিন কত বছর লাগবে। রোহিঙ্গা জিহাদি সংগঠন আরএসও এবং আরসার নাম জানি। আরসার নেতার নাম আতাউল্লাহ। ওরা অস্ত্রধারী। এই জিহাদি দলকে সমর্থন করি না।

৪. **সৈয়দা খাতুন (২৭),** পিতার নাম ঃ সালেহ আহমদ, মাতার নাম ঃ জমিলা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম তৈয়ব আলী, স্বামীর নাম ঃ শাহ আলম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ শীতা পুডিফা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী শাহ আলম।

সৈয়দা খাতুন বলেন, আমি একজন গৃহিণী। আমি মংডু থানার বাসিন্দা। খতিয়ানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জায়গা জমি নির্ধারণ করা হতো। হামলার দিন বার্মিজ সেনারা এসে আমাদের উপর জুলুম নির্যাতন করল এবং আমাদের গ্রামের অনেক যুবককে গুলি করে মারল। বেশ কয়েকজন যুবতী নারীকে ধরে নিয়ে যায় আর মারার সময় বলতে লাগলো সব। আমার বাসায় বার্মিজ সেনারা হামলা করলে আমার স্বামী তাদেরকে বলেছিল, ভাই আমাদের ছেলেগুলোকে ছেড়ে দাও, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাই। একথা বলার সাথে সাথে আমার স্বামীকে তাদের হাতে থাকা বল্লম দিয়ে মারে এবং রশি দিয়ে বেঁধে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখে আর আমাদের বলে 'শালার রোহিঙ্গারা যদি বাঁচতে চাস, যে দিকে মনে চায় সে দিকে চলে যা, বার্মা ছেড়ে যা।' তোদের এখানে আর না দেখি আবার দেখলে ব্রাশফায়ার করব মনে রাখিস। তাই আমরা প্রাণের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হই। আমি জিহাদি সংগঠন

হারাকাহ ইয়াকিনের নাম শুনেছি। এই সংগঠনের নেতার নাম হাফেজ আতাউল্লাহ জুনুনী। আমি এই সব সংগঠনকে সমর্থন করি না।

৫. **নুরুছাফা বেগম** (২৮), পিতার নামঃ কুদরত উল্লাহ, মাতার নামঃ খাদিজা বেগম, গ্রামের নামঃ জাদিতং, জেলাঃ বুচিডং, রাজ্যঃ আরাকান, নিহতের নাম স্বামী সেলিম ও ছেলে এয়াকুব এবং ওমর আমি আরাকানের বুচিডং জাদিতং এলাকার বাসিন্দা।

নুরুছাফা বেগম বলেন, '২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাতের দিন বার্মিজ আর্মি আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। বিকালে তখন আমি তিন সন্তানকে ভাত খাওয়াচ্ছিলাম। এর মধ্যে গুলি করতে করতে বাড়িতে আর্মি আসতে দেখলে আমি এক ছেলে আনোয়ার শাহকে (৫) নিয়ে একদিকে দৌড় দিই। তখন আমার পেছনে থাকা ছেলে মো. এয়াকুব (৭) ও মো. ওমরকে (৬) তারা ধরে ফেলে। আর্মিরা যাওয়ার পর ঘরে এসে দেখি তাদের জবাই করে হত্যা করেছে। মৃতদেহ যখন পড়া ছিল তখনো তাদের মুখে ভাত ছিল। ছেলেদের বাঁচাতে পারলাম না। স্বামী ও দুই সন্তানকে হারিয়ে একমাত্র সন্তান আনোয়ার শাহকে নিয়ে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্প এসেছি।

আমার বড় বোন ও বোনের স্বামীকে বার্মিজ আর্মিরা হত্যা করেছে। বোনের নবজাতক সন্তানটিও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আমাদের বাড়িতে আসার সময় বোনের ছেলেকে পেয়েছি। অন্য তিনজনকে খোঁজার সময় পাইনি। নিজেরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমার বড় বোন একটি কন্যাসন্তান প্রসবের কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেনাবাহিনী গুলি করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন ধাত্রীসহ বাড়ির আটজন নারী কিন্তু সন্তান প্রসবের পর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বিছানায় নবজাতকসহ শোয়া ছিলেন হামিদা। পরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওই দিন রাতে মো. জোহার (৯), আনোয়ার সাদেক (৭) ও শামছুন নাহারকে (২) সঙ্গে নিয়ে বড় ভাই শামছুদ্দোহা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ওই সময় আবার গোলাগুলি শুরু হলে চার ভাইবোন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মাস দুয়েক আগে আমার স্বামী মোহম্মদ সেলিম এবং আমার দুলাভাই সলিমকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। বাড়ির পাশের মসজিদে মাইকে নামাজ পড়তে দিচ্ছে না। আমার স্বামী সেলিম (৪০) মাইক ছাড়া মসজিদে নামাজ পড়ে বেরিয়ে এসে আশপাশের বাড়িতে গিয়ে লোকজনকে নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার জন্য বলতে গিয়েছিলেন। এ জন্য তাকে হত্যা করেছে আর্মিরা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করি না। এসব জঙ্গি সংগঠন কোনো শান্তি চায় না। ঝগড়া লাগিয়ে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু এর খেসারত দিতে হয় রোহিঙ্গা জনসাধারণকে।

৬. **ইকবাল আহমদ (৩৫),** পিতার নাম ঃ আবু জাফর, মাতার নাম ঃ মৃত. ইসমাঈল, দাদার নাম ঃ মরহুম ইমাম হোসেন, স্ত্রীর নাম ঃ মাহমুদা খাতুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ আবু জাফর।

ইকবাল আহমদ বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মৌলভীর জায়গা গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। আক্রমণের সময় হামলাকারীরা আমাকে খারাপ ভাষায় গালাগালি করে। আমার পিতা আবু জাফর ছিলেন আরাকান রাজ্য স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মধ্যে একজন বীর মুজাহিদ কারণ উনি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। উনি একজন বীরপুরুষ। বার্মিজ সেনারা যখন হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে বললো তোমাদের মধ্যে এমন কোনো পুরুষ আছ যারা আরাকান স্বাধীন চাও যদি থাক তাহলে কাপুরুষের মতো না থেকে আমাদের সামনে আসো তোমাদের আরাকান রাজ্য তোমাদের স্বাধীন করে দিব। তখন আমার পিতা আবু জাফর বুঝতে পারেননি তাদের ভাষা, ঘর থেকে বের হয়ে বললেন এই ভাইয়েরা আমার মুসলমান ভাইয়েরা সকলে বের হয়ে যাও আরাকান রাজ্য স্বাধীন কর মুসলমানদের আজাদ কর। একথা বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলো, তার কথাগুলোর এমন স্পীড আমি দেখতে পেলাম অনেকে হাতের কাছে যেটা পেল সেটা নিয়েই বের হয়ে আসার সাথে সাথে সৈন্যরা তাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করলো। এসময় আমার বাবাও মারা যান। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি। এসব রোহিঙ্গা সংগঠনের কারণে আরাকানে শান্তি আসেনি।

৭. **দশতিয়া বিবি** (৩৫), পিতার নাম ঃ ফজল হক, মাতার নাম ঃ রহিমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. আবু জব্বার, স্বামীর নাম ঃ হারুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ খুদা পাদ্রী, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী হারুন।

দশতিয়া বিবি বলেন, আমি একজন গৃহিণী। আমি খুদা পাদ্রী গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। আরাকানে থাকাকালীন আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনে মাত্র একবার ভোট দিয়েছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। ওরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কি বলবো স্যার দুঃখের কথা। আমার মতো অনেক অসহায় নারীদের ওরা ধরে নিয়ে অনেক নির্যাতন করেছে। আমি খুব কষ্ট করে চলে আসি বাংলাদেশে। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা। হাফেজ ত্বোহা পাকিস্তানে শুনেছি।

৮. **মোঃ হারেস (২৪),** পিতার নাম ঃ নজিবুল আলম, মাতার নাম ঃ নুর বেগম, দাদার নাম ঃ আব্দুল সালাম. স্ত্রীর নাম ঃ হাছিনা আক্তার। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মেরুল্লাহুন, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মোঃ হারেস এর ছোট ভাই হারুন।

মোঃ হারেস বলেন, আরাকানে থাকাকালীন আমার ব্যক্তিগত পাসপোর্ট ছিলনা। একটা আইডি কার্ড ছিল। সেটা বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় নিয়ে আসিনি। যেদিন হামলা করে বার্মিজ বাহিনী সেদিন আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম। সেনারা ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাকে এবং আমার বাবাকে আঘাত করে। আমার ছোট ভাই

হারুনকে খুন করে বার্মিজ পিচাশগুলো। ভাইয়ের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। শৈশব থেকে আমরা দু'জন বন্ধুর মতো ছিলাম। সবকিছু করতাম একসঙ্গে। আমার এমন ভাইকে হারিয়ে আজ আমি একা। আরাকান রাজ্য দখল করার জন্য বার্মিজ সৈন্যরা যখন রোহিঙ্গা নিধন শুরু করল। আমি ও অন্যান্য রোহিঙ্গাদের মতো প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে অনেক কষ্ট করে পালিয়ে আসি। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও-এর নাম শুনেছি। এই সংগঠনের নেতার নাম কমাণ্ডার নাজমুল্লাহ। এই সংগঠনকে আমি সমর্থন করি না। আমি বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকেও সমর্থন করি না।

৯. **খোরশিদা** (৩০), পিতার নাম ঃ ছালামত উল্লাহ, মাতার নাম ঃ ফাতেমা খাতুন, দাদার নাম ঃ আবু বক্কর মরহুম, স্বামীর নাম ঃ রুস্তাম আলী। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ পোখালী, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ রুস্তাম আলী।

খোরশিদা বলেন, আমি আরাকানের মংডুর পোখালী এলাকার বাসিন্দা। হামলার সময় আমি ও আমার স্বামী একসাথে ঘরে ছিলাম। সেদিন এক ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই আমার স্বামীর বুকে গুলি করে হত্যা করে। স্বামীকে হত্যার পর আমার উপরও হামলা করেছে তারা। আমি নিজেই আহত হয়েছি। আমাদের ঘরের সাথে লাগানো আরও ২০টা ঘর ছিল। সেগুলোও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সব ঘর আসবাবপত্র সহ জ্বলেপুড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। মিলিটারি ও বার্মিজ নাগরিক মিলে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমি স্বামী হারা একজন অসহায় নারী। আমাদের দুঃখের সীমা নেই, বার্মিজ সেনাবাহিনীর লোকেরা এমন অবিচার অনাচার জুলুম ধর্ষণ, নির্যাতন আমাদের উপর করেছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের বাংলাদেশে আসতে বাধ্য করল। এগুলো বলতে গেলে চোখে পানি চলে আসে আর বলবো না। আরসা আর ইয়াকিন এই সংগঠনের জিহাদকে আমি সমর্থন করি না। ওদের কারণে রোহিঙ্গারা বাস্তহারা, ভিটেমাটি হারা।

১০. **সখিনা খাতুন (৬৫),** পিতার নামঃ হাকিম আলী, মাতার নামঃ ফয়জিয়া বেগম, স্বামীর নাম: ইউছুফ আলী গ্রামের নাম: কন্দুপ্রাং, থানাঃ বুচিডং, মংডু, আরাকান, নিহতের নাম: স্বামী ইউছুফ আলী ও ছেলে।

সখিনা খাতুন বলেন, আমি বুচিডং কন্দুপ্রাং গ্রামের বাসিন্দা। আমার পরিবারটি ছিল রাখাইনের বুচিডং কন্দুপ্রাং এলাকার অতি বনেদি পরিবার। স্বামী ইউছুফ আলী (৬৫) ছিলেন ব্যবসায়ী। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট সকালে বার্মিজ সেনাবাহিনীর একটি দল আমার বাড়িতে প্রবেশ করে। সেনাসদস্যরা আমার স্বামী ইউছুফ আলী (৭০), তিন ছেলে সালাম (৩৪), সেলিম (৩০) ও তোফায়েলকে (১৩) ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে যায়। এরপর সালাম ও সেলিমকে বলতে থাকে, 'তোরা আরসা সদস্য।' আমার স্বামী ও ছেলেরা অস্বীকার করলেও সেনাসদস্যরা রাইফেল দিয়ে

মারতে থাকে, ছুরি দিয়ে খোঁচাতে শুরু করে। তাদের রক্তে ঘর ভিজে যায় কিন্তু সেনাসদস্যদের নির্যাতন বন্ধ হয় না। আমার বড় ছেলে বাবার সঙ্গে ব্যবসা দেখত। মেজ ছেলে ছিল মাদ্রাসা শিক্ষক। তারা নিজেদের আরসা সদস্য নয় জানালেও সেনাসদস্যরা তাদের কথা শোনেনি। চোখের সামনে দুই ছেলের হাত কেটে ফেলে। এরপর পা বিচ্ছিন্ন করে। সবশেষে জবাই করে। এমন দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি। জ্ঞান ফেরার পর দেখতে পাই– ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে স্বামীসহ তিন ছেলের খণ্ডিত মৃতদেহ। ঘটনার সময় আমার ছেলে সালামের স্ত্রী মোহছেনা বেগম পুকুরঘাটে ছিল। সেনাসদস্যদের আসতে দেখে সে ধানক্ষেতে লুকিয়ে পড়ে। তাই বেঁচে গেছে। মিলিটারি আমাকে কেন মারল না। এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো, কার কাছে থাকবো। বার্মিজ সেনাসদস্যরা আমার একমাত্র মেয়ে খতিজা বেগম (২২) ও তার স্বামী আবদুর রশিদকেও (৩০) হত্যা করে। মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে হয় খতিজার। একই পাড়ায় তাদের বাড়ি ছিল। আমি ঘটনার দিন মেয়ের বাড়ি গিয়ে দেখি, আগুন জ্বলছে। ওই আগুনে পুড়ছিল কয়েকটি মানুষের দেহ। এর মধ্যে মেয়ে ও জামাই ছিল বলে প্রতিবেশি একজন সে সময় জানায়।

মিলিটারি শুধু আমাদের বাড়ি নয়, পুরো পাড়া জ্বালিয়ে দেয়। সবাই প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াতে শুরু করে। পাঁচ দিন হেঁটে বাংলাদেশের এপারে আসতে পেরেছি, তিন দিন আগে জঙ্গলে বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক সহযাত্রী সামান্য কিছু ভাত খেতে দিয়েছিল। এরপর থেকে আর কিছু খাইনি। আমার জীবন এখন চরম বিষাদেভরা। আমার সবকিছু হারিয়ে আজ নিজেই মৃত্যুপথের যাত্রী। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন অথবা এই সব সংগঠনের কোনো নেতার নামও জানি না।

১২. রহমত উল্লাহ (১৭), পিতার নাম ঃ ছালামত উল্লাহ, মাতার নাম ঃ হাসিনা, দাদার নামঃ মরহুম আবু বকর। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাংচং নাকপুড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ রহমত উল্লাহ-এর দাদী ফুলবানু।

রহমত উল্লাহ বলেন, যেদিন হামলা করে বার্মিজ সেনারা সেদিন আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম। বার্মিজ সৈনিকরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু করলে ঘরে আটকে পড়ি। ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাকে এবং আমার বাবাকে জোরে আঘাত করে। আমার বৃদ্ধ দাদি ফুলবানুকে খুন করে বার্মিজ সেনারা। আমি সরকারি কোনো স্কুল কলেজে পড়ালেখা করিনি। রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি মাদ্রাসায় পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছিলাম মাত্র কয়েক জামাত। যেদিন বার্মিজ সৈনিকরা যখন হামলা করে সেদিন অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করেছিল। বার্মা ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দিয়েছিল। আমি আমার পরিবার অনেক কষ্টে বার্মা ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হই। বার্মিজ সৈন্যরা কত পাষাণ আর কত খারাপ নিজে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তারা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, লুটপাট করার তো করলো সেসময়। আমরা বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে চলে আসি। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনিনি। হারাকা ও আরএসও সংগঠনের নাম জানি। এই দুটি সংগঠনকে আমি সমর্থন করি না।

১৩. আহম্মদ হোসেন (৬২), পিতার নাম ঃ মৃত. সাইর মোহাম্মদ, মাতার নাম ঃ মৃত. মুবিনা, স্ত্রীর নাম ঃ দিলারা বেগম, দাদার নাম ঃ ইব্রাহীম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ রাসিডং, থানা ঃ রাসিডং, জেলাঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ আহম্মদ হোসেন এর ছেলে, নজিবুল্লাহ, শেফায়াত উল্লাহ।

আহম্মদ হোসেন বলেন, আমি মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রাসিডং এর বাসিন্দা। আমি আমার দুই ছেলে ও স্ত্রী দিলারা বেগমকে নিয়ে সুখের সংসার ছিল। আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা করে সংসার চালাতাম। আরাকান স্যালভেশন আর্মির (জঙ্গি সংগঠন আরসর) সদস্য সন্দেহে কোরবানি ঈদের পরদিন আমার পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় মিয়ানমারের পুলিশ ও সেনারা। তা দেখে ভয়ে আমি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে পালাতে চেষ্টা করি। টের পেয়ে সেনা সদস্যরা আমাদের ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে আমার দুই ছেলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বড় ছেলে নাজিবুল্লাহর পিঠ দিয়ে গুলি ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে যায়। চোখের সামনে সে ছটফট করতে থাকে। ছোট ছেলে শেফায়াত উল্লাহর বাঁ হাতে গুলি লাগে। আমি বুঝতে পারলাম, বড় ছেলেকে আর বাঁচাতে পারবো না। বাধ্য হয়ে আমি স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত পালাতে শুরু করি। এ সময় গুলিবিদ্ধ আমার বড় ছেলে বার বার চিৎকার করে বলতে থাকে, 'বাবা আমাকে ছেড়ে যেও না।' পরে অদূরে প্যারাবনে লুকিয়ে থাকি আমরা। আর্মিরা চলে গেলে বড় সন্তানকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করি। কিন্তু আর্মিরা আবার এসে আমার পরিবারকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে গুলিবিদ্ধ আমার বড় সন্তানকে ছুরি চালিয়ে জবাই করে হত্যা করে। দূর থেকে এই অমানবিক দৃশ্য লুকিয়ে দেখেছি আমি আর আমার স্ত্রী। এরপর থেকে আমার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিজেও আমার কানে বার বার ছেলের ওই চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। যদি জানতাম সারাজীবন এমন ডাক কানে বাজবে, তাহলে ছেলের আগেই আমি নিজেই জবাই হয়ে যেতাম।

আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল ও সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেল এবং আমার ছেলে ২ জনসহ আরও কয়েকজন যুবক ছেলেকে উলঙ্গ করে বেঁধে প্রথমে বলল তোরা আর কোনো আরাকান দাবি করবি? স্বাধীনতা চাইবি? এভাবে প্রশ্ন করে করে সবাইকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে একথাগুলো বলতে লাগল এবং তলোয়ার নিয়ে বলল তোরা একজন একজন এখানে এসে শুয়ে যা তোদেরকে জবাই করে স্বাধীন আরাকানের স্বাদ মিটিয়ে দিব। এই বলে বেশ কয়েকজনকে টুকরা টুকরা করে হত্যা করা হয় আর আমাদের বাধ্য করা হয়। দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসি। আরাকান রাজ্যে ফিরতে চাই। আমি আতাউল্লাহর নাম শুনেছি। হারাকা ইয়াকিনের আমির এই আতাউল্লাহ।

১৪. লায়লা বেগম (২৫), পিতার নাম ঃ জামাল আহমেদ, মাতার নাম ঃ নাসিমা, দাদার নামঃ উমর হামজা, স্বামীর নাম ঃ নূর কামাল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বুড়া সিকদার পাড়া, থানা ঃ নায়াপুরা, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী, ভাসুর।

লায়লা বেগম বলেন, বুড়া সিকদার পাড়ায় আমার বাড়ি। আমার স্বামীর নাম নুর কামাল। আমার তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট দুপুরে মিয়ানমার পুলিশের সদস্য ও রাখাইন বৌদ্ধরা আমার বাড়িটি ঘিরে ধরে। তিন মেয়ের মধ্যে দুই মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় তারা। আর দুই ছেলে, এক মেয়ে ও তার স্বামীকে বাড়ির পুকুরপাড়ে নিয়ে গুলি করে পুলিশ সদস্যরা। তারপর সবার মৃতদেহ পুকুরে ফেলে দেয়। আমি ছাড়া তার পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। যে পুকুরে আমার স্বামী শখ করে মাছ চাষ করতেন, সেখানেই আমি ভাসতে দেখেছি স্বামীর লাশ। আমি বাড়ির মুরগির ঘরের পেছনে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করি। পরে পাশের বাড়ি দুই ছেলে আব্দুল্লাহ ও কাশেমের সঙ্গে সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে চলে আসি। স্বামী ও সন্তানদের হারিয়ে বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি আমি। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন সমর্থন করি না।

১৫. জুলেখা (৪০), পিতার নাম ঃ লালু মিয়া, মাতার নাম ঃ আয়েশা, দাদার নাম ঃ উড় মিয়া, স্বামীর নাম ঃ মোঃ ইসমাইল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চৌপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মেয়ে ও মেয়ের জামাই।

জুলেখা বলেন, তিনদিন হেঁটে বাংলাদেশে পৌঁছাই আমি। এদেশে পৌঁছানোর পরও ধর্ষণের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরেছিল আমার। তিনজন সেনা আমাকে ধর্ষণ করেছিল বারবার। তারপর তারা যখন চলে গেল আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে আমার দুই সন্তানের হাত ধরে জীবন বাঁচাতে দৌড়াতে লাগলাম। ঘটনার সময় এলাকার আমার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। সেই থেকে তার সঙ্গে দেখা নেই। জানি না আমার অন্য সন্তানরা কোথায় আছে, কেমন আছে। আমি যখন আমার মেয়ে ও মেয়ের জামাইকে বাঁচাতে পারলাম না বার্মিজ সেনাদের হাত থেকে। মিয়ানমারের সেনারা রোহিঙ্গা নারীদের খেলনা হিসেবেই দেখত। তাদের নগ্ন করে গ্রামে প্যারেড করাতো। হেয় করার জন্য বিভিন্ন কুৎসিত কথা বলত। কিন্তু এখন ধর্ষণ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে দেশ, নিয়েছে বাড়িঘর, গরু ছাগল, টাকা পয়সা। সব কেড়ে নিয়েছে। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠন কিংবা নেতার নাম জানি না।

১৬. হারুন (৪২), পিতার নাম ঃ মরহুম জালাল আহমেদ, মাতার নাম ঃ হামিদা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম আবুল বাশর, স্ত্রীর নাম ঃ খোরশিদা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জোকুওয়ার বিল, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মেয়ে হাদিসা।

হারুন বলেন, আমি আরাকানের মংডুর জোকুওয়ারবিল গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার দিন বার্মিজ সেনারা আমাকে বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চোখ খুললে বুঝতে পারলাম আমাকে একটা 'গোয়াল ঘরে নিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে দেখলাম ঘরভর্তি মানুষ। আমার মতই তাদেরকেও ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে আমাদেরকে নিয়ে গরুর রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। যখন বেঁধে রেখেছিল তখন দুইজন পাহারা দিয়েছে, কারও বের হওয়ার সুযোগ

ছিল না। পরে প্রচণ্ড মারধর করে আমাকে। আমার সামনে কয়েকজনকে জবাই করেছে আবার কাউকে কাউকে গুলি করে মেরেছে। গুলি মারার পর তখনো যদি কেউ নড়তে থাকে তাহলে তাকে জবাই করে দেয়। পাহারাদাররা যখন দরজা থেকে সরে গেছে তখন তাদের অবস্থান দেখে আমি পালিয়ে আসি। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন আসরের সময় আর আমি পালিয়ে আসি এশার সময়। আমি যখন ওইখান থেকে বের হয়ে আসি তখন যাদেরকে তখনো হত্যা করেনি তাদের সবার হাত পা বাঁধা ছিল। এরপর কি করেছে আমি জানি না। আমি যখন এসেছি তখনো ঐখানে অনেক মানুষ ছিল, শুধু ছিল পুরুষ মুসলিম, কোনো মহিলা ছিল না। আমি যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন দেখি আমার ঘর আগে যেরকম ছিল সেরকম আর নেই। আমার বাড়ি বোমা মেরে জ্বালিয়ে দিয়েছে নাকি ম্যাচের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে সেটা আমি জানি না, কিন্তু আমার প্রতিবেশিরা বলেছে বোমা মেরে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার মেয়ে হাদিসাকে সেনারা খুন করে। আমার সবকিছু সেনারা লুটপাট করে নিয়ে গেলো। পরে বোমা মেরে দিলো ঘরের উপর। এরপর থেকে আমার মা বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি, বাংলাদেশে এসেও তাদের খোঁজ পাইনি। আমি বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে সমর্থন করি।

১৭. সমুদা খাতুন (৬৫), মাতার নামঃ মাছুরা খাতুন, পিতার নামঃ জেবেল হোসেন, স্বামীর নাম: সালাম মিয়া, গ্রামের নাম: গজিরবিল, থানাঃমংডু,রাজ্যঃ রাখাইন, নিহত ও ধর্ষিতার নাম: রহিমা বেগম (১৯)।

সমুদা খাতুন বলেন, আমি আরাকানের মংডুর গজিরবিল এলাকার বাসিন্দা। আমার ভাতিজিকে সেনাবাহিনী ধর্ষণ করেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মাঝপথে সে মারা যায়। বার্মিজ সেনা এসে পড়ায় গোলপাতার বাগানে তাকে একটা কাপড় মুড়ে ফেলে রেখে আমরা কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে এসেছি। আমার মনে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ কারন আমার ভাতিজির মৃতদেহটা দাফন করতে পারলাম না। আমার নিজের ছেলে ও ভাইপোকেও আমরা একই অবস্থায় ফেলে এসেছি। বার্মিজ সেনাদের সামনে থেকে কেউ পালাতে চাইলে গুলি করে অথবা জবাই করে হত্যা করে। আমার আরো দুই আত্মীয়কে এক বাসায় রেখে এসেছিলাম। সকালে গিয়ে তাদের গলাকাটা লাশ পেয়েছি। হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছিল। অনেক কষ্ট করে বাংলাদেশে এসেছি।

আমার স্বামী সন্তান নিয়ে সুন্দর একটি সাজানো গোছানো সংসার ছিল। সেনারা হামলা করে আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। আমার জীবনে জাহান্নামের আজাব নেমে এসেছে মনে হচ্ছে। এভাবে কেমনে বেঁচে থাকবো জানি না। জীবনে এতো কষ্ট এতো জ্বালা পাবো ভাবতেই পারিনি। বার্মিজ সেনাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আজকে আমি অসহায় হয়ে গেলাম। রোহিঙ্গা কোনো সংগঠনকে সমর্থন করি না।

১৮. জান্নাত আরা (১৮), পিতার নাম ঃ নুরু কামাল, মাতার নাম ঃ রশিদা, দাদার নামঃ মরহুম নুর মোস্তফা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জিয়ালতলী, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা-মা, ভাইবোন।

জান্নাত আরা বলেন, আমি জিয়ারতলী গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। হামলার দিন আমি বার্মিজ সৈন্যদের রোষানল পড়ি। সন্ত্রাসী বার্মিজ সৈন্যদের আক্রমণে নিজের বাড়িঘর মালপত্র টাকা পয়সা হারালাম। আমার মা বাবা ভাইবোন গণহত্যার শিকার হয়ে নিহত হয়। আমার বাবাকে আগেই ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চোখের সামনে মাঠে আগুন জ্বেলে আমার দুই ভাই সহ মামা, খালু, চাচা, ভাই সহ ৩০ জন আত্মীয়-স্বজনকে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। মহিলাদের ধর্ষণসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে পাড়ার এক আত্মীয়ের সাথে অর্ধাহারে-অনাহারে বনে-জঙ্গলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে সময় লেগেছে ১৫ দিন। বনে-জঙ্গলে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমার বাবা মা ভাইবোনকে হারিয়ে আজ আমি এতিম হয়ে গেলাম। জীবনের সামনের দিনগুলো কীভাবে কাটাবো সেটা ভাবতেই দুচোখ অন্ধকার হয়ে আসে। রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠন কিংবা নেতার নাম কোনো দিন শুনিনি।

১৯. **ছেনুআরা (২৫),** পিতার নাম ঃ আব্দুল গনি, মাতার নাম ঃ খতিজা, দাদার নাম ঃ চুম্মত, স্বামীর নাম ঃ আবুল হাসেম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ওদম, থানা ঃ মংডু, জেলাঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা আব্দুল গনি।

ছেনুয়ারা বলেন, আমি ওদম গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। আরাকানে থাকাকালীন আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল যেটা এখন নাই। আমি খুব স্মরণ করি এবং স্মরণ করছি প্রতিটি দমে দমে সন্ত্রাসীদের যে গণহত্যা, গণনির্যাতনের শিকার হয়ে আমার পিতা আব্দুল গণিকে হারালাম, সেদিনের কথা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কারণে বার্মিজ সেনারা হামলা করে রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করি না। এসব জঙ্গি সংগঠন কোনো শান্তি চায় না। ঝগড়া লাগিয়ে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু এরপর তার ফল ভোগ করতে হয় রোহিঙ্গা জনগণকে।

২০. **বদিউর রহমান (৭১),** পিতার নাম ঃ আমির হামজা, মাতার নাম ঃ গুলবাহার, দাদার নাম ঃ বদু উদ্দিন, স্ত্রীর নাম ঃ সারা খাতুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ তুলাতলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্ত্রী সারা খাতুন।

বদিউর রহমান বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি তুলাতুলি গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। আক্রমণের সময় হামলাকারীরা আমাকে খারাপ ভাষায় গালাগালি করে। আমার পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ একমাত্র বার্মিজ নরপশুর জাতি বার্মিজ শাসকগোষ্ঠী। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা। হাফেজ ত্বোহা একজন পাকিস্তানি নাগরিক যদিও তার বাবা একজন রোহিঙ্গা। হাফিজ ত্বোহা পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সাথে মিলে রোহিঙ্গাদের জন্য অশান্তি সৃষ্টি করতো সবসময়।

২১. **দাউদ সালাম (৩০),** পিতার নাম ঃ অজি উল্লাহ, মাতার নাম ঃ মৃত. কুলসুমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুল মজিদ, স্ত্রীর নাম ঃ রহিমা বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চারকোম্ব, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে আক্কাস আলী।

দাউদ সালাম বলেন, আমি একজন দিনমজুর। আমি মংডু থানার চারকোম্বা গ্রামের বাসিন্দা। আমি নির্বাচনে দুইবার ভোট দিয়েছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। হামলার সময় বার্মিজ সৈন্যরা অকথ্যভাষা গালাগালি করে এবং আরাকান রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। আমাদের কি অপরাধ ছিল? তারা আমাদের সর্বশান্ত করে দিল। আমার ১০ বছরের ছেলেকে ওরা হত্যা করে। আমি আমার বাড়িঘর টাকা পয়সা ধ্বংস ও লুটপাট করে। যেদিন আমার বাড়িতে হামলা করে সেদিন এক সেনাসদস্য আমার ছেলে আক্কাস আলীকে সামনে পেয়ে আঘাত করে। ছুরি চালিয়ে তার গলা কেটে ফেলেন ওই সেনাসদস্য। ওই সেনাসদস্য এতটাই হিংস্র রূপ ধারণ করেন যে, আমার ছেলের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমার ছেলের এ অবস্থা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। আমি ফিরে গিয়ে আমার ছেলেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আমাকে থামিয়ে দেয়। কারণ সেখানে প্রচুর সেনাসদস্য ছিল। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃজনক ঘটনা যে, আমার ছেলের জন্য আমি কোনো কিছুই করতে পারিনি। আমার ও আশপাশের কয়েক ডজন গ্রামে সেনাবাহিনী জাতিগত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন পরিচালনা করে গণহত্যা চালিয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর রক্তাক্ত এই অভিযানে আমার ছেলে ছাড়াও ৫ জন আত্মীয় মারা গেছেন। আমি আরাকানের একজন নাগরিক কিন্তু জান্তা সরকার আমার নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। রোহিঙ্গাদের কোনো দেশ থাকার পরও আজ নেই। আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল দেশ ত্যাগ করতে। আমি গণহত্যার বিচার চাই।

২২. **রহিমা জাহান (২৮),** পিতার নাম ঃ খাইরুল্লাহ, মাতার নাম ঃ জহুরা বেগম, দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুর রহিম, স্বামীর নাম ঃ রফিক। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মোড়ীবোয়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ দাদা আব্দুর রহিম।

রহিমা জাহান বলেন, বার্মিজ সন্ত্রাসীরা আমাদের ঘরবাড়ি ক্ষেত খামার সবকিছু ধ্বংস করল। আমাদের আরাকান মুসলমানদের যেখানে পাচ্ছে সেখানে হত্যা করছে। প্রথম দিকে মনে করলাম ছোট খাটো কোনো ঘটনা ঘটছে কিন্তু না আমি নিজ চোখে যখন দেখলাম বিশ্বাস না করার উপায় নাই। আমার দাদা আব্দুর রহিম চাচা পাশের বাড়ির খালেক ভাগিনা নুর বশর সবাইকে বার্মিজ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। আমাদের আরাকান রাজ্যে মনে হচ্ছে ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। সবাই জান বাঁচানোর জন্য এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আমিও পালাতে গিয়ে পায়ে কাটা ফুটে যায়। আর কতজন কে কোন জায়গায় গেছে তার কোনো খোঁজ নাই। কোনো রকমে নদী পেলাম

সে নদীর নাম নাফ নদী, মাঝি মাল্লাকে কাকুতি মিনতি করে টাকা পয়সা দিব বলে কোনোমতে পার হয়ে আসি। আসার পর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। যা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন কিংবা নেতার নাম জানি না।

২৩. **গোল ফরাজ (৭৫),** পিতার নাম ঃ মরহুম সহর মুলুক, মাতার নাম ঃ আমিনা খাতুন মৃত., দাদার নাম ঃ মরহুম ইউছুফ আলী, স্বামীর নাম ঃ মরহুম খলিল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ তুলাতুলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে, নাতি-৬, ছেলের বউ।

গোল ফরাজ বলেন, আমার পরিবারের শুধু আমিই বেঁচে রয়েছি। আমার পুরো পরিবার আগুনে জ্বলে পুড়ে মারা গেছে। বার্মিজ সৈন্যরা পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় আমার বাড়িতে, তাতে আমার সবকিছু শেষ হয়ে যায়। আমি প্রাণে বাঁচার জন্য আরাকান রাজ্য থেকে বাংলাদেশে চলে আসি। আমার পরিবারে ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনি সহ মোট আট জন আগুনে পুড়ে মারা যায়। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি। বহু বছর আগ থেকে হরকাতুলের নাম শুনেছি। এই সংগঠন রোহিঙ্গাদের নামে বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা এনে নিজেরাই ব্যবহার করতো। এসব রোহিঙ্গা সংগঠনের কারনে আরাকানে শান্তি আসেনি।

২৪. **ফাতেমা খাতুন (৩৫),** পিতার নাম ঃ দেলওয়ার হোসেন, মাতার নাম ঃ মাহমুদা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. কালো মোহমদ, স্বামীর নাম ঃ ছৈয়দুল আমিন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ তুলাতলী, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ফাতেমার ছেলে, মা, বাবা ও ভাই।

ফাতেমা খাতুন বলেন, মংডুর তুলাতলী গ্রামে হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়ার মধ্যে আমি একজন। ২০১৭ সালের ৩০শে আগস্ট সেখানে যা ঘটেছে তা বার্মিজ সেনাদের বর্বরতম নির্যাতনের নজির। তারা গ্রামবাসীদের নদীর ধারে নিয়ে প্রথমে সেখানে পুরুষদের নারী ও শিশুদের থেকে আলাদা করে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নির্যাতন করা হয় বেয়নেট দিয়ে। আমি আমার ছেলেকে কোলে আকড়ে ধরে রেখেছিলাম। চার-পাঁচজন সেনা নারীদের দফায় দফায় নিয়ে যাওয়া শুরু করে। তারা আমাকেসহ আরো চার নারীকে একটি বাড়ির মধ্যে নিয়ে যায়। আমার কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে। এরপর তার গলা কেটে ফেলে। কারো মুখে মা ডাক শোনার জন্য আমি তড়পাচ্ছি। ১০ বছরের এক ছোট ভাই ছিল আমার। তাকেও সেনারা নিয়ে গেছে।

আমাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে আমার সঙ্গে আরো তিন মা ছিলেন। আর ছিলেন ৫০ বছরের এক বৃদ্ধা এবং এক তরুণী। সেনারা ওই বৃদ্ধাকে বাদে বাকি সবাইকে ধর্ষণ করে। আমার কাছে মনে হয়েছে কমপক্ষে দুই তিন ঘণ্টা ধরে আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে সেনারা। এরপর নারীদের লাঠি দিয়ে মারতে থাকে

সেনারা। নারীদের চোখে কয়েকবার টর্চের আলো দিয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে মারা গেছে কিনা। পরে আমাদের বাড়ির ভেতর তালাবদ্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের তাপে জ্ঞান ফেরে আমার। বাঁশের দেয়াল ভেঙে বাইরে এসে পালাতে সক্ষম হই আমি। একটি পাহাড়ে একদিন লুকিয়ে থাকি। পরে পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে বের হয়ে আমার গ্রামের আরো তিন নারী ও একজন অনাথের সঙ্গে দেখা হয় আমার। পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের রেখে যাওয়া কাপড় পরে সম্ভ্রম ঢাকি আমি। সীমান্ত পেরুনোর পর এক বাংলাদেশি আমাকে কুতুপালংয়ে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এখানেই এক ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় আমাকে। বাংলাদেশে এসে স্বামী ছৈয়দুল আমিনের সঙ্গে দেখা হয় আমার। তুলাতলীতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে নদী সাতরে পালাতে সক্ষম হন ছৈয়দুল আমিন। আমি, আমার ভাই আর আমার স্বামী এখানে আছি। আমি পুরো বিশ্বকে এই ঘটনা জানাতে চাই যেন তারা কিছুটা শান্তি আনতে পারে। সেনারা আমার পরিবারের সাত জনকে মেরে ফেলেছে। আমার মা, মাহমুদা খাতুন, বাবা দেলওয়ার হোসেন, রোকেয়া বেগম ও রুবিনা বেগম যাদের একজনের বয়স ১৮, আরেকজনের ১৫, আমার দুই বোনকেই সেনারা নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে। মুসা আলি আমার ভাই, ১০ বছর বয়স। আমার ধারণা সেও মারা গেছে। আমার নিকটাত্মীয় খালিদার বয়স ২৫ আর তার ছেলে রুজুক আলি যে মাত্র আড়াই বছরের আর আমার ছেলে মোহাম্মদ সাদিক যার বয়স ছিল এক বছর চার মাস। আমার দুই ছেলেসহ পুরো পরিবার হত্যার বিচার চাই। আমি দুনিয়াতে বেঁচে থেকেও মৃতের মতো কারণ যাদের নিয়ে আমার সংসার আমার সুখ দুঃখ আমার আশার আলো, আমার জীবন মরণ। আজ যখন তারা (আমার ২ ছেলে) বেঁচে নেই। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

২৫. **আহম্মদ কবির (৬০),** পিতার নাম ঃ আক্কাল আলি, মাতার নাম ঃ গুলসা বেগম, দাদার নাম ঃ ফজল কবির, স্ত্রীর নাম ঃ দিলজুহার। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ কুয়ানচিবন, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বড় ভাইয়ের বউ হালিমা।

আহম্মদ কবির বলেন, আমার বাড়ি মংডুর কুয়ানচিবন গ্রামে। আমি বার্মিজ সেনাদের কাছ থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছি। আমাদের ওখানে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। সেনারা গুলি ও জবাই করে মানুষ মেরেছে। নারীদের রেপ (ধর্ষণ) করেছে, বাচ্চা শিশুদের আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলেছে। এরপর আমাদের যে কিসিমের (পদ্ধতিতে) জুলুম করেছে, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর, নারীদের ধর্ষণের পর আমরা বাংলাদেশে এসে অনাহারে-অর্ধপেটে স্থান পেয়েছি। আমাদের যে তারা স্থান দিয়েছে তার জন্য বেশি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করছি। মিয়ানমারের সেনা সদস্যদের বর্বরতার শিকার পরিবার-পরিজন নিয়ে কীভাবে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছি তা বর্ণনা করা যাবে না। আমার পরিবারের কেউ হত্যাকান্ডের শিকার হয়নি কিন্তু বড় ভাইয়ের বউকে সেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। বার্মিজ সন্ত্রাসী সৈন্যরা আমাদের বাড়িঘরে হামলা করে, আসবাবপত্র লুটতরাজ করে নেয়। আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

ধ্বংস করে দেয়। আমার বড় ভাবি ও অন্যান্য অনেক লোককে নির্যাতন করে হত্যা করে আমার সামনে। আমি ও আমার আরাকানবাসীদের জবরদস্তি করে আরাকান রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও আরএসও-এর নাম জানি। একজন নেতার নাম কমাণ্ডার নুরুল ইসলাম।

২৬. **আমান উল্লাহ (২০),** পিতার নাম ঃ ছিদ্দিক আহম্মদ, মাতার নাম ঃ হাসিনা আক্তার, দাদার নাম ঃ ছিদ্দিক আকবর। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাইনছং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছিদ্দিক আহমদ।

আমান উল্লাহ বলেন, আমি আরাকানের মংডুর নাইনছং গ্রামের বাসিন্দা। যেদিন আমার বাড়িতে হামলা করে সেদিন এক সেনাসদস্য আমার বাবাকে জাপটে ধরে। ছুরি চালিয়ে তার গলা কেটে ফেলেন ওই সেনাসদস্য। ওই সেনাসদস্য এতটাই হিংস্র রূপ ধারণ করেন যে, আমার বাবার মাথা প্রায় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বাবার এ অবস্থা দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। আমি ফিরে গিয়ে আমার বাবাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কিন্তু কয়েকজন স্বজন আমাকে থামিয়ে দেয়। কারণ সেখানে প্রচুর সেনাসদস্য ছিল। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃজনক ঘটনা যে, আমার বাবার জন্য কোনো কিছুই করতে পারি নাই। আমার ও আশপাশের কয়েক ডজন গ্রামে সেনাবাহিনী জাতিগত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন পরিচালনা করে গণহত্যা চালিয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর রক্তাক্ত এই অভিযানে আমার বাবা ছাড়াও আমার ৫ জন আত্মীয় মারা গেছেন। রোহিঙ্গাদের সরকারি কোন স্কুলে পড়তে দিত না। বেসরকারি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানেও কোন ধরনের পড়ালেখার পরিবেশ ছিল না। কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। আমার বাবা এবং দাদা যুগযুগ ধরে ওখানের বাসিন্দা। আমি রোহিঙ্গা। আমি আরাকানের একজন নাগরিক। আমার নাগরিক অধিকার বলতে ওখানে কিছু ছিল না। রোহিঙ্গা সংগঠন হারাকা ইয়াকিন এর নেতা আতাউল্লাহর নাম শুনেছি। এসব সংগঠনকে সমর্থন করি না।

২৭. **রাইদা বেগম (৩৭),** পিতার নাম ঃ শাইর মোহাম্মদ, মাতার নাম ঃ হাবিয়া খাতুন, দাদার নাম ঃ আলি আকবর, স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ ছালামত। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বালুখালি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাগিনা নুর বশর।

রাইদা বেগম বলেন, আমি মংডু থানার বালুখালি গ্রামের বাসিন্দা। বার্মিজ সেনারা আমাদের বাড়িঘর, ছাগল, গরু, টাকা-পয়সা, অলংকারাদি যা কিছু ছিল সব লুটে নিয়ে যায় এবং আমাদের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। হত্যা ও ধর্ষণের মতো পাশবিকতা চালায় আমাদের উপর। আমার ভাগিনা নূর বশরকেও সন্ত্রাসী বার্মিজ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। আমি বার্মিজ সেনার বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকে সমর্থন করি না। এসব জঙ্গি সংগঠন সবসময় অশান্তি সৃষ্টি করে।

২৮. **জুহারা বেগম (৫৩),** পিতার নাম ঃ ছদর জামান, মাতার নাম ঃ ধলাবিবি, দাদার নাম ঃ জমির উদ্দিন, স্বামীর নাম ঃ খায়র উল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মলই ডামা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বোনের ছেলে মোহাম্মদ খালেক।

জুহারা বেগম বলেন, বার্মিজগুন্ডা বাহিনীরা নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে তারা অশান্তি আর দাঙ্গা হাঙ্গামার লোক। তারা শুধু মুসলিম না, কোনো জাতিরই ভাল চায় না– এটাই তারা প্রমাণ করে দিল। ওদের হামলার শিকার হয়ে আজ আমরা নিঃস্ব। আমাদের ঘরবাড়ি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমাদের লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাইবোনকে গণহত্যা ও গণধর্ষণ করেছে। আমি আমার ভাগিনা হত্যাসহ গণহত্যা ও ধর্ষণের বিচার চাই। আরাকানে ফেরত যেতে চাই। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

২৯. **আবুল হাসেম (২৯),** পিতার নাম ঃ সুলতান আহমদ, মাতার নাম ঃ বুরুজ্জামান, দাদার নাম ঃ আহমদ, স্ত্রীর নাম ঃ ছেন্নু আরা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ওদম, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ সুলতান আহমদ।

আবুল হাসেম বলেন, আমি আরাকানের মংডুর ওদম গ্রামের বাসিন্দা। আমার গ্রামে কয়েকবার হামলা করেছে বার্মার সেনাবাহিনী ও মগরা। ২৫ আগস্ট যখন বার্মিজ সেনারা হামলা করে তখন আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম। সেনারা হামলা শুরু করলে আমরা সবাই মধ্যরাতে বাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকি। সেনাদের চোঁখ ফাঁকি দিতে আমরা বিভিন্ন গ্রামে লুকিয়ে ছিলাম। এরপর নাথ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে আসতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। যাত্রাপথে আমার বাবা সুলতান আহমদ মারা যান। তাকে হারিয়ে আমি এতিম হয়ে গেলাম। এই সংগঠনগুলোকে আমি সমর্থন করি না। বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকেও আমি সমর্থন করি না। আমাদের শান্তির রাজ্যকে অশান্ত করার জন্য অংসানসুচি ও বার্মিজ গুন্ডা বাহিনীই দায়ী। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা। হাফেজ ত্বোহা একজন পাকিস্তানি নাগরিক যদিও তার বাবা একজন রোহিঙ্গা।

৩০. **উম্মে ছালমা (২৮),** পিতার নাম ঃ হাবির আন, মাতার নাম ঃ দিলবাহার, দাদার নাম ঃ ওমর, স্বামীর নাম ঃ ছৈয়দ উল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ওদম পাড়া, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই মোহাম্মদ জয়নাল।

উম্মে ছালমা বলেন, আমার বাড়ি আরাকানের মংডুর ওদম পাড়া গ্রামে। আমার নাম উম্মে ছালমা। আমি তিন দিন আগে মংডু থেকে পালিয়ে এসেছি। আরাকানে আমার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলেছে বার্মিজ সেনারা। ছেলে-মেয়েগুলো ফেলে আমি আসতে চাইনি। নৌকা নিয়ে পার করানো হচ্ছিল সেটাও করতে দিচ্ছিল না। সেনারা মানুষ মেরে মেরে প্যারাবনে ফেলে রাখা হচ্ছে। আমার বাড়ির কাছেই খাল। কিছু

মানুষ দেখলাম খালে ঝাঁপ দিল। আমি এ পরিস্থিতি দেখে আর অপেক্ষা করতে পারিনি। বিকালে কাছাকাছি সময় তখন। তখনই আমি বের হয়ে পড়ি। খালের মধ্য দিয়ে যখন কাটা-ছেড়াগুলো (মরদেহ) আনা হচ্ছিলো তা দেখে আমি আর সহ্য করতে পারিনি। অনেক দুঃখ সহ্য করে বাংলাদেশে চলি আসি। কবে কখন আরাকানে ফিরব জানি না। বার্মিজ সেনারা মানুষ নয়, ওরা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের অর্থাৎ আরাকান রাজ্যে হামলা আমার চোখের সামনে ঘটা ঘটনা। আমি ও আমাদের দেশের সকল জনগণ এর সাক্ষী। আমাদের ঘরবাড়ি ও জান মাল ইত্যাদি সবকিছু বিনষ্ট করেছে বার্মিজ গুণ্ডা বাহিনীরা। আমাদের চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র লুণ্ঠন করেছে। হাজারো প্রাণহানি করেছে এই গুন্ডা বাহিনীরা। আমার ভাই জয়নালকে নির্যাতন করার পর গুলি করে হত্যা করেছে। আমি কোনো রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন সমর্থন করি না।

৩১. **লাল আশি (১৮),** পিতার নাম ঃ আব্দুল হামিদ, মাতার নাম ঃ তাহেরা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুর রহমান। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ নানি কুলসুম।

লাল আশি বলেন, বার্মিজ পাষণ্ড বাহিনীরা আমার আরাকানের শান্তশিষ্ট জনগণের উপর নিমর্ম হত্যা, গুম, খুন ইত্যাদি ঘটনা ঘটালো। এতে আমাদের ঘরবাড়ি টাকা পয়সা ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে। আমার আরাকানের লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করল এবং বিনা বিচারে হত্যা করল। আজ আমরা খুবই অসহায়, আমাদের পায়ের নিচে মাটি নাই। আমাদের স্বাধীন আরাকান পাওয়ার মতো কোন আশা পাচ্ছি না। আমি নানিকে হারালাম, আমার মা আত্মীয় স্বজন আরও অনেক আরাকানবাসীকে হারালাম। আমি এই গণহত্যা ও গণধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমি বার্মিজ বাহিনীদের ধিক্কার জানাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। এই দলের আমীরের নাম আতাউল্লাহ জুনুনী। আতাউল্লাহর পাকিস্তানে জন্ম। পরে সৌদি আরব থেকে আরাকানে এসে সংগঠন তৈরি করে। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করি না। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করি না।

৩২. **হোসনা আক্তার (১১),** পিতার নাম ঃ আব্দুল হামিদ, মাতার নাম ঃ তাহেরা বেগম, দাদার নাম ঃ আব্দুর রহমান। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাইচিদম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ চাচা কাসেম।

হোসনা আক্তার বলেন, আমি আরাকানের মংডুর নাইচিদম গ্রামের বাসিন্দা। আমি জন্মগতভাবে ওখানকার বাসিন্দা। আমার বাপদাদারা শত বছর ধরে ওখানে বসবাস করে আসছেন। সেনারা হামলা শুরু করলে আমরা সবাই মধ্যরাতে বাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকি। সেনাদের চোঁখ ফাঁকি দিতে আমরা পথে পথে বিভিন্ন গ্রামে লুকিয়ে ছিলাম। এরপর নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে আসতে আমার চারদিন লেগেছে। এই বিপজ্জনক যাত্রায় পরিবারের সদস্য আমার চাচা কাসেমকে চিরতরে হারিয়েছি আমি। বার্মিজ সৈন্যরা আমাদের ঘর-বাড়ি সব কিছু

জ্বালিয়ে লণ্ডভন্ড করে, আমাদের মা বোনদের তুলে নিয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম না কেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে এরা মূলত কী চায়? কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ করে এই হামলা করে তারা। তাদের অনেককে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে ওরা আমাদের আরাকান রাজ্যকে মুসলিমশূন্য ও আরাকান রাজ্য দাবিদার শূন্য করতে চায়। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করি না।

৩৩. **ফাতেমা (৪২),** পিতার নাম ঃ ওলামিয়া, মাতার নাম ঃ বিলকিস খাতুন, দাদার নাম ঃ আলি আহম্মদ, স্বামীর নাম ঃ সবির আন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মেরুল্লা, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মেয়ের জামাই আরিফ হোসেন।

ফাতেমা বলেন, আমি আরাকানের মংডুর মেরুল্লা গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার দিন আমার ছেলেকে বাড়ি থেকে চোখ বেধে নিয়ে যায় বার্মিজ সেনারা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই জানতে পারিনি। আমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারপর আমার ছেলেকে ধরে চোখ বেধে ফেলে। আমার ছেলেকে নিয়ে যাবার সময় আমাকে কয়েকবার মারধর করে সেনারা। আমার সামনে চাচাতো ভাই মামুনকে জবাই করে হত্যা করে। আমি যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন দেখি আমার ঘর আগে যেরকম ছিল সেরকম আর নেই। আমার মেয়ের জামাই আরিফকে সেনারা খুন করে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরএসও নাম জানি অনেক আগ থেকে কিন্তু কিছু দিন থেকে হারাকাহ ইয়াকিনের নাম শুনেছি। হারাকাহ এর আমিরের নাম আতাউল্লাহ। এই জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ আমি সমর্থন করিনা। রোহিঙ্গাদের উপর হামলার জন্য এসব জঙ্গি সংগঠন দায়ি।

৩৪. **রহিমা খাতুন (২১),** পিতার নাম ঃ সাফির আহম্মদ, মাতার নাম ঃ ফাতেমা আক্তার, দাদার নাম ঃ ছালামত, স্বামীর নাম ঃ মোঃ আলম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মেরুল্লা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বোনের জামাই জামাল।

রহিমা খাতুন বলেন, সবাই আমাদের রোহিঙ্গা ডাকে। আমরা মুসলিম সম্মানিত জাতি হওয়ার পরও আমাদের বোঝানো হচ্ছে ছোট জাতি হিসেবে। আমাদের সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছে যাযাবর এর চাইতে খারাপ। আমাদের চেয়ে কুকুর এর মান আরও বেশি। আমরা মুল্যহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। বার্মিজ পাষণ্ড বাহিনী আজ আমাদের আরাকান রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে। আমাদের আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে। আমি বোনের জামাই জামাল হত্যাসহ গণহত্যা, গণধর্ষণের বিচারের দাবি জানাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। এই সংগঠনগুলোর কারণে বার্মিজ সেনারা হামলা করে রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল।

৩৫. **তাসলিমা বেগম (৭০),** পিতার নাম ঃ হামজা, মাতার নাম ঃ বদর জামান, দাদার নাম ঃ আব্দুল জসিম, স্বামীর নাম ঃ নবী হোছাইন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ধুমসা পাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে মোহাম্মদ খালেক।

তাসলিমা বেগম বলেন, আমার বাড়ি আরাকানের মংডুর ধুমসা গ্রামে। হামলার দিন আমাদের পাড়ার ২৫০ মানুষকে আমার চোখের সামনেই জবাই করে হত্যা করেছে সেনারা। আমার এক ছেলেকে সেনারা খুন করে। কোনোমতে বাকী সন্তানদের জীবনটা বাঁচুক– এ কথা চিন্তা করেই আমি চলে এসেছি বাংলাদেশের মাটিতে। আমাদের আরাকানে বার্মিজ সেনারা নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে। অতিরিক্ত জুলুম করছে রোহিঙ্গাদের ওপর। কোথায় খাওয়া, কোথায় পানি, ভাত-পানি খেতে না পেরে কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আরাকান রাজ্যে বর্বর অসভ্যতার হামলার কথা প্রায় সমগ্র পৃথিবীবাসী জেনে গেছে। আমিও সেই বার্মিজ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর শিকার। আমার ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সেই গুণ্ডা বাহিনীরা আগুন লাগিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, বৃষ্টির মতো গুলি করে আরাকানবাসিকে হত্যা করা হয়েছে। আমার মা বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সেই পাষণ্ড সৈন্যরা আমার ছেলে খালেককে প্রথমে গুলি করে পরে কেটে টুকরা টুকরা করে হত্যা করে। আমি রোহিঙ্গা কোনো সংগঠনকে সমর্থন করি না।

৩৭. **আজিজুর রহমান (৩০),** পিতার নাম ঃ নুর হোসেন মৃত., মাতার নাম ঃ নুর নাহার, দাদার নাম ঃ আবুল সুফিয়ান, স্ত্রীর নাম ঃ হাসিনা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ গড়াতলি বিল, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মা নুর নাহার।

আজিজুর রহমান বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মংডু থানার গড়াতলি গ্রামের বাসিন্দা। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। সৈন্যরা আমাদের বাড়িঘরে হামলা করে আমার ঘর-বাড়ি সমস্ত কিছু তছনছ করে এবং জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। শুধু তাই নয়, আরাকান নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করে। আমাদের অনেকগুলো নিষ্পাপ বাচ্চা ছেলে মেয়েকে তারা কেটে টুকরা টুকরা করে। আমার মা নূর নাহারকে হত্যা করে। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। তাদের অত্যাচারের বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকা ইয়াকিনের নেতা আতাউল্লাহকে দেখেছি।

৩৭. **ফিরোজা আক্তার (৩০),** পিতার নাম ঃ নুর আহম্মদ, মাতার নাম ঃ গুলমের, দাদার নাম ঃ নবী হোছাইন, স্বামীর নাম ঃ ছলিম উল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মেরুল্লা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মেয়ে ফাতেমা।

ফিরোজা আক্তার বলেন, আমার বাড়ি মিয়ানমারের আকিয়াব জেলার মংডু উপজেলার মেরুল্লা গ্রামে। আমার স্বামী ও তিন ছেলে, দুই মেয়ে। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে সুখে সংসার করে দিন কাটছিল আমার। তবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমার সেই সুখের সংসারে নেমে আসে বিপদের কালোছায়া। সেদিন ছিল শনিবার। সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে পরিবারের সবাই তখন খাবার টেবিলে। ঠিক তখনই গ্রামে আর্তচিৎকারের রোল পড়ে। আমরা বুঝতে পারি গ্রামে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ঢুকে পড়েছে। দ্রুত আমার স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আশ্রয় নেন পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে।

স্বামী চলে গেলেও অবুঝ সন্তানদের ফেলে যেতে পারিনি আমি। মুহূর্তেই সেনাবাহিনী এসে ঘিরে ফেলে বাড়িটি। তারা প্রথমে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়িতে। এরপর চোখের সামনে হাত-পা বেঁধে দুই ছেলে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। সেইসঙ্গে আমার মেয়ে ফাতেমাকে ধরে নিয়ে যায় সেনারা। দুই ছেলেকে যখন জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থার, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সেনাবাহিনী চলে গেলে পোড়া বাড়ির পাশ থেকেই আমার স্বামী এলাকাবাসির সহযোগিতায় আমাকে উদ্ধার করে। এসময় আমার শরীরের অধিকাংশই পুড়ে গিয়েছিল। পরে স্থানীয় একটি কবিরাজির দোকানে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিলাম। একদিন পর এক ছেলে ও মেয়েকে পার্শ্ববর্তী অন্য আরেক গ্রামে পাওয়া যায়। দুই সন্তানকে হারিয়ে কোনও মতে টেকনাফ সীমান্ত দিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বাংলাদেশে পৌঁছেই কুতুপালং ইউএনএইচসিআর হাসপাতালে চিকিৎসা করলাম। আমি এখন অনেকটা সুস্থ, তবে ক্ষতচিহ্নগুলো রয়ে গেছে। চোখে আগের মতো এখন দেখতে পারি না। সেনারা বেশিরভাগ মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। যাতে করে মৃতদেহের কোনও চিহ্ন না থাকে। আমাদের পুরো গ্রামে এখন পোড়ামাটির গন্ধ। একের পর এক ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। নিয়ে গেছে বাড়িতে থাকা গবাদি পশু, স্বর্ণ ও জমানো অর্থকড়ি। গ্রামের অধিকাংশ যুবক এখনও নিখোঁজ। শত শত মা-বোনের ওপর নির্যাতন করেছে। সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যুবকরা। সন্ত্রাসী বার্মিজ সৈন্যরা আমাদের ছোট ছোট কোমলমতি শিশুদের ধরে নিয়ে যায়। আমার মেয়েকে এখনো খুঁজে পাইনি। আল্লাহ জানে আমার মেয়ের সঙ্গে কি করেছে। আমি ভুলতে পারছি না হামলার সময়টুকু। আমি আমার মেয়ের গুম ও নির্যাতনের বিচার চাই। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনিনি।

৩৮. **সমজিদা আকতার (২৩),** পিতার নাম ঃ নুর হোসেন, মাতার নাম ঃ ফাতেমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. উমে দারাস, স্বামীর নাম ঃ জাহেদ হোসেন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জীম্মাখালী, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী জাহেদ হোসেন, ছোট ভাই আতাউল।

সমজিদা আকতার বলেন, আমি মংডু থানার জীম্মাখালী গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার দিন আমার স্বামী জাহেদ ও ছোট ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে বার্মিজ সেনারা। আমার ঘর-বাড়ি ক্ষেত খামার সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আমি নিঃস্ব হয়ে যাই। আমাদের মেয়েদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে অত্যাচার-জুলুম-নির্যাতন-ধর্ষণ করে হত্যা করে। আমি এসব নির্যাতনকারীদের ঘৃণা নিন্দা জানাই। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রমকে সমর্থন করি না।

৩৯. **ইয়াছমিন (৩০),** পিতার নাম ঃ ইলিয়াছ, মাতার নাম ঃ মাবিয়া খাতুন, দাদার নামঃ মনজুর হাসান, স্বামীর নাম ঃ নজীব উল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ কুয়ারবিল, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মাবিয়া খাতুন।

ইয়াছমিন বলেন, আমি আরাকানের মংডুর কুয়ারবিল এলাকার বাসিন্দা। আমার বাবা মোহাম্মদ শফি পাহাড়ে লাকড়ি আনতে দিয়ে বার্মিজ আর্মিদের হাতে মারা যায়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার পর কোনো রকমে জীবন নিয়ে সমুদ্রের কাছে চলে আসি। কিন্তু টাকা না থাকায় নৌকায় তোলা হচ্ছিল না আমার পরিবারকে। স্থানীয় লোকজন সহযোগিতা করে কিছু টাকা দিয়ে নৌকায় তুলে দেন। আমার মা ও ভাইবোন নিয়ে কোন মতে চলে আসি বাংলাদেশ। আমার বাবা একজন কাঠুরিয়া ছিলেন। বাবার কাজকর্মের টাকায় আমাদের সংসার চলতো। আমার বাবাকে হারিয়ে ভাইবোনেরা আজ এতিম হয়ে গিয়েছি। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করি না।

৪০. **সুমাইয়া বেগম (১৫),** পিতার নাম ঃ ফরিদুল আলম, মাতার নাম ঃ সোরা খাতুন, দাদার নাম ঃ খলিল আহমদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ তুলাতুলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা ফরিদ, মা সোয়া খাতুন, ৪ ভাই মজিবুর, হাবিবুর, সাইদ ও রশিদ।

সুমাইয়া বেগম বলেন, মংডুর তুলাতুলি আমার গ্রামে হামলার সময় কারো সহযোগিতা পাইনি। আমার দু'হাতে ছোট ছোট সাদা দাগ। এগুলো হামলার দাগ। আমি নিজেও হামলার শিকার। বার্মিজ সেনারা আমার গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। যাকে পাচ্ছে হত্যা করছে। আমার বাড়ির সামনে আমার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করে। প্রাণ বাঁচাতে পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। টানা ১২ দিন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। চারদিন পর সঙ্গে আনা খাবার শেষ হয়ে যায়। তারপর গাছের লতাপাতা, কলা খেয়ে কোনোরকম জীবন বাঁচাই। নিঃশ্বব্দে কেঁদেছি। যেন কেউ শুনতে না পারে। জঙ্গলে রাত দিন মশার কামড়ে হাতে সাদা সাদা দাগ হয়ে অবশেষে বাংলাদেশে আসি। আমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা মনে পড়লে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি আমার বাবা মা ভাইবোনকে হারিয়ে চির অসহায় আজ। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনিনি।

৪১. **জাহেদ হোসেন (৩৩),** পিতার নাম ঃ আব্দুল হাকিম, মাতার নাম ঃ কমলা খাতুন, দাদার নাম ঃ আমির হোছাইন, স্ত্রীর নাম ঃ সাহিদা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জিম্মাখালি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই ফারুক।

জাহেদ হোসেন বলেন, আমার বাড়ি আরাকান রাজ্যের মংডুর জিম্মাখালী গ্রামে। নির্যাতনের মুখে পরিবারের আট সদস্যকে নিয়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে লেদা রোহিঙ্গা বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার ভাই ফারুক হোসেন ও চাচাতো ভাই মোহাম্মদ হাশিমকে হত্যা করার পর ভাতিজা অলি আহমদকে ধরে নিয়ে যান মিয়ানমারের সেনাসদস্যরা। আমার গ্রামে ৪০০ ঘরবাড়ি ছিল। এর মধ্যে ২০০-এর বেশি ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের অনেকে প্রাণে বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে আমিও পরিবার নিয়ে চলে আসি। হত্যা,

নির্যাতন করে রোহিঙ্গাদের গ্রাম ছাড়া করছে বার্মিজ সেনারা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি। বহু বছর আগ থেকে হরকাতুলের নাম শুনেছি। এসব রোহিঙ্গা সংগঠনের কারণে আরাকানে শান্তি আসেনি। জিহাদের নামে যুবকদেরকে দলে টেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বার্মিজ সেনারা এলাকায় হামলা করে এসব সংগঠনের কারণে।

৪২. **রাবিয়া খাতুন (৩৫),** পিতার নাম ঃ ওলা মিয়া, মাতার নাম ঃ মলিকা, দাদার নামঃ মকবুল আহম্মদ, স্বামীর নাম ঃ আলি আহম্মদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ওয়াসসা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী আলি আহম্মদ।

রাবিয়া খাতুন বলেন, সহিংসতার আগে আমার একটি নির্বিঘ্ন জীবন ছিল। আমি স্বামী, এক ছেলে ও মেয়ে নিয়ে সুখেই ছিলাম। যদিও বার্মিজ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঝেমধ্যে আমাদের হুমকি দিত। তবে খাওয়া-পরা বা আশ্রয় নিয়ে আমাদের কোনো ঝামেলা পোহাতে হয়নি। যেদিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে আমাদের গ্রামে এলোপাতাড়ি গুলি করা শুরু করল, তখন আমরা দৌড়ে দিগ্বিদিক পালাতে থাকলাম। আমি দৌড়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকালাম। তখন একজন বলল, আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমি খুব ভয় পেলাম এবং আমার খুব অসহায় লাগছিল। সেনাবাহিনী তখন সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আমি আর আমার স্বামী আলি আহমদ এর মৃতদেহটা আনতে পারলাম না। তাকে রেখেই আমি বাংলাদেশের দিকে পা বাড়াই। মেয়েদের নিয়ে আমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে গ্রাম ছাড়ি। একদিন একটা পরিত্যক্ত দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা সেই দোকানে প্রবেশ করি। সেখানে কিছু খাবার আমরা পাই। সত্যিকার অর্থে যাত্রাপথের ১০ দিনের মধ্যে সেদিনই শুধু কিছু খাবার খেতে পেরেছিলাম। যাত্রাপথে আমি শুধু অনবরত কেঁদেছি। আমার কাছে কোনো পয়সা ছিল না। প্রতিবেশীরাই পথে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসার পথে নদী পার হওয়ার জন্য টাকাও দিয়েছে। মিয়ানমার ছেড়ে আসা আমার জন্য খুবই যন্ত্রণার। সেখানে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি, আমার বাড়িঘর-জমি সবকিছু হারিয়েছি।

আমরা এখানে থাকার মতো একটি অস্থায়ী ঘর পেয়েছি। বাংলাদেশের মানুষ আমাদের খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু আমার তো উপার্জন করার মতো সুযোগ নেই, এখানে আমার জন্য কোনো কাজ নেই। আমাদের যদি অর্থই না থাকে, তাহলে আমাদের সামনে কেমন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে জানেন কি? সবাই হয়তো মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাইবে কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না যে এটা কখনও সম্ভব হবে কিনা। সেখানে কখনোই নিরাপদে থাকা যাবে না। যদি আমরা মিয়ানমারে ফিরেও যাই, তাহলে আবারও আমাদের নির্যাতিত হতে হবে বা মরতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ব আমাদের এ দুরাবস্থা দেখছে। বিশ্ববাসীর কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। আমাদের দুঃখের, মৃত্যুর গল্প, কিন্তু একই অবস্থা তাদের

হলে তারা কী করতেন! আমি সেদিনের নিষ্ঠুর সময় কোনদিন ভুল পারবো না। বার্মিজ সেনারা অনেক নিষ্ঠুর ও ভয়ানক। ওদেরকে মানুষ বললে মানুষের কলঙ্ক হবে। ওরা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। আমার স্বামী আলি আহম্মদ মারা যায়। আমার বাড়ি-ঘর বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়। বাগানের বিভিন্ন ফল মূলের সব নষ্ট করে দেয়। টাকা পয়সা অর্থ সম্বল যা ছিল সব লুটে নিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে কত মা বোনকে ধর্ষণ করেছে। নির্যাতন করে জুলুম অত্যাচার করল তার কোনো সীমারেখা নেই সবাইকে একসাথে ব্রাশ ফায়ার কর কোনোকিছুরই তাদের কোনো তোয়াক্কা ছিল না হত্যাটা তাদের খেলার পুতুলে পরিণত করছিল তারা। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

৪৩. জহুরা আকতার (১৭), পিতার নাম ঃ আলী আকবর, মাতার নাম ঃ হামিদা আকতার, দাদার নাম ঃ সমির মিয়া। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বেকুয়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা আলী আকবর।

জহুরা আকতার বলেন, আমি আরাকানের মংডুর বেকুয়া গ্রামের বাসিন্দা। প্রতিদিনের মতো পাহাড়ে গাছ কাটতে গিয়েছিলেন আমার বাবা আলী আকবর। শুনেছি হঠাৎ করেই পাহাড়ের জঙ্গল ঘিরে ফেলে আর্মিরা। সেদিন যারা জঙ্গলে ছিলেন তাদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কারও মৃতদেহ পরিবারের কাছে দেওয়া হয়নি। ওইদিন বনের ভেতরে ১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আমার প্রিয় বাবা। আমাদেরসহ চারপাশের গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে যায়। একের পর এক গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছিল। সবার সঙ্গে আমিও পালাতে শুরু করি। জীবন বাঁচাতে ১১ দিন বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। সামান্য কিছু খাবার খেয়ে জীবন রক্ষা করেছি। ১২ দিনের মাথায় বাংলাদেশে আসি। এখন শরণার্থী ক্যাম্পে আমি আমার মা ও ভাইবোন নিয়ে অসহায়ভাবে দিন কাটছে। আমার বাবার শুন্যতা কোনদিন পূরণ হবে না এই দুনিয়ায়। যতদিন বাঁচবো বাবা ছাড়া বাঁচতে হবে না। আমি এই হামলার পরিকল্পনাকারী ও হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। এই দলের আমীরের নাম আতাউল্লাহ জুনুনী। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করি না। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করি না।

৪৪. **জুহারা বেগম (৩০),** পিতার নাম ঃ নুর মোহম্মদ, মাতার নাম ঃ জুলেখা বেগম, দাদার নাম ঃ নাজির, স্বামীর নাম ঃ রুহুল আমিন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মলিজ্জাগার, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মা জুলেখা বেগম।

জুহারা বেগম বলেন, আমি মংডু থানার মলিজ্জাগার গ্রামের বাসিন্দা। আমার মা জুলেখা বেগমকে বার্মিজ সৈন্যরা খুন করে। বার্মিজ সেনার হামলায় আমরা সবকিছু হারিয়ে সর্বহারা হয়ে বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে চলে আসি। আমি হামলাকারীদের বিচার চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। এই দলের আমীরের নাম আতাউল্লাহ জুনুনী।

৪৫. **ফিরোজা খাতুন (৩০),** পিতার নাম ঃ নুর আহম্মদ, মাতার নাম ঃ গুল নাহার, দাদার নাম ঃ নবী হোছাইন, স্বামীর নাম ঃ ছলিম উল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মেরুল্লাহি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ দাদা নবী হোছাইন।

ফিরোজা খাতুন বলেন, আমার দাদা নবী হোছাইনকে বার্মিজ পাষণ্ড বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। আমাদের আরাকানবাসীদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় সেটা পৃথিবীর নজিরবিহীন হামলা, এসব হামলা পৃথিবীর কোনো দেশে ঘটে নাই। আমাদের দেশের বিশাল ক্ষতিসাধন করেছে বার্মিজ সৈন্যরা। আমার ঘরবাড়ি দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আমার দাদা নবী হোছাইন, খালেদ নুরু, সালাম মাষ্টার, আইয়ুব, মো. রহিউল্লাহ সহ আরও অনেক আত্মীয়স্বজনকে হারিয়ে এক পর্যায়ে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য করা হই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করি না। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করি না।

৪৬. **রেজুমা খাতুন (২০),** পিতার নাম ঃ লোকমান হাদিস, মাতার নাম ঃ সুরা খাতুন, দাদার নাম ঃ মিয়া হোসেন। ঠিকানা ঃ গ্রামের নাম ঃ ছিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ নানা আজিবর, নানী সফুর বেগম, মামা রশীদ আহমদ।

রেজুমা খাতুন বলেন, আমি রাখাইন রাজ্যের মংডু ছিকনছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৭ সালের ২৬ আগস্ট একদল অস্ত্রধারী বার্মিজ সেনা আমার গ্রামে হানা দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। প্রথমে ঘরে ঢুকে দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমার স্বামী এসে আমাকে বাঁচিয়েছে। সেনারা আমাকে মেরে ফেলার জন্য আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি আমার স্বামী সন্তান নিয়ে বেঁচে গেলেও আমার নানার বাড়ির কাউকে বাঁচাতে পারিনি। স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার জীবনের সময় কেটে যেতো বেশ ভালোভাবে। কিন্তু বার্মার সরকার আমার সেই সুখের ঘরে আগুন দিয়ে সবকিছু পুড়ে তছনছ করে দেয়। আমার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। বার্মিজ সৈন্যরা যেভাবে লুটতরাজ চাঁদাবাজি, গণহত্যা, ধর্ষণ, জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। এই হামলা থেকে আরাকান রাজ্যের কোন মুসলমান না শুধু কোনো হিন্দুও বাঁচতে পারে নাই। অনেক নর-নারীকে হত্যা করেছে পাষণ্ড সেনারা, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে। আমার নানা, নানি, মামা, মামিকে গুলি করে হত্যা করে। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আহত হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসি। আমি রোহিঙ্গা কোনো রোহিঙ্গা সংগঠন বা নেতার নাম জানি না।

৪৭. **ওয়াজেদ আলী (৩২),** পিতার নাম ঃ ছৈয়দ আকবর, মাতার নাম ঃ মৃত. নাছিমা আকতার, দাদার নাম ঃ নাছির উদ্দীন, স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ মেয়ে সমিরা।

ওয়াজেদ আলী বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি নাচিডং গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। বার্মিজ পাষণ্ড বাহিনীরা আমাদের আরাকান রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে। আমাদের অনেক মা-বোনকে গণধর্ষণ করে হত্যা করেছে। আমার মেয়েকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। আমাদের রাজ্যের কোনো কিছু বাকি রাখেনি। সবকিছু ধ্বংস করেছে পাষণ্ড বাহিনী। আমি হামলাকারীদের প্রতি নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই। এই সব গুণ্ডাদের বিচার চাই। আমি বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জিহাদি সংগঠনগুলোর সংগ্রামকে সমর্থন করি।

৪৮. **হাসিম উল্লাহ (৩৫),** পিতার নাম ঃ ইসলাম মরহুম, মাতার নাম ঃ মরহুম মদিনা, দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুল মতলব, স্ত্রীর নাম ঃ হাছিনা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মিতাপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ বোন, ৫ ছেলে, ৫ মেয়ে।

হাসিম উল্লাহ বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মংডু থানার মিতাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি এলাকায় ছিলাম। আমার ছেলেমেয়েসহ মোট ১০ জনকে হত্যা করেছে বার্মিজ সেনারা। আমার পাঁচ মেয়েকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। আবার বোনটাকে উলঙ্গ করে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি-ঘর টাকা পয়সা সবকিছু ধ্বংস করেছে পাষণ্ড বাহিনী। আমরা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে চলে আসি। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা। হাফেজ ত্বোহা একজন পাকিস্তানি নাগরিক।

৪৯. **রেহেনা বেগম (৫৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. আব্দুস শুকুর, মাতার নাম ঃ মরহুম মোস্তাফা, দাদার নাম ঃ মরহুম আলি মদন, স্বামীর নাম ঃ নজির আহমদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ ৫ সদস্য খুন, আহত রেহেনা বেগম নিজেই।

রেহেনা বেগম বলেন, আমার বাড়ি আরাকানের মংডুর নাচিডং এলাকায়। আমার এলাকায় রোহিঙ্গাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যারা অংশ নিয়েছে, তাদের প্রায় সবাই ছিল সেনাপোশাক পরা ছিল। আমার পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। আমার স্বামী নাজির আহমদকে মেরে ফেলা হয়। বার্মিজ সেনারা আমার মেয়ে মোহসিনাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। গ্রামের অন্তত ১২ জন নারীকে ধর্ষণের পর ঘর তালাবদ্ধ করে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া রোহিঙ্গা শিশুদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করে সেনাসদস্যরা। তিন মাস ধরে আমি গ্রামের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে পারিনি। কেউ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে পারত না। সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরতে হতো। সীমান্তের তল্লাশি চৌকিতে হামলার পর গণহারে হত্যা করা হয়। রোহিঙ্গাদের এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ছিল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় আমার গ্রামের দু'জন খুন করে বার্মিজ সেনারা। আমি নিজে আহত হয়েছি। নির্যাতনে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছি। আমি আমার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের কঠিন সাজা দাবি করছি। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠন বা নেতার নাম জানি না।

৫০. **জেরিফা আক্তার (৩৮),** পিতার নাম ঃ আবু তাহের, মাতার নাম ঃ মরিয়ম খাতুন, দাদার নাম ঃ মোঃ হোসেন, স্বামীর নাম ঃ আবু ছিদ্দিক। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ হল্লামা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী আবু ছিদ্দিক।

জেরিফা আকতার বলেন, আমি আরাকানের মংডুর হল্লামা গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার দিন স্বামী আবু ছিদ্দিককে জবাই করে হত্যা করে সেনারা। তারা কত নিষ্ঠুর এবং নৃশংস তা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার পাড়ার সব ঘরবাড়ি লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয় বার্মিজ সেনা ও বৌদ্ধরা। আমার বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে দেয় হামলাকারীরা। আমার ক্ষেতখামার ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। আমার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জিনিস মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। আমি সহ যারা এই হামলার শিকার হয়ে মালামাল টাকা পয়সা নষ্ট হয়েছে যাদের তাদের সব মালামাল টাকা পয়সার ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই। এর দায়ভার বার্মিজ সরকারকে নিতে হবে। কোনো ধরনের জিহাদ আমি সমর্থন করি না। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গাদের জন্য বারবার অশান্তি ডেকে আনে।

৫১. **হাসিনা বেগম (২০),** পিতার নাম ঃ মোঃ শফি, মাতার নাম ঃ নুরু জাহান, দাদার নাম ঃ এয়াকুব, স্বামীর নাম ঃ ছৈয়দ হোসইন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ আট্টাপুরমা, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা মোঃ শফি।

হাসিনা বেগম বলেন, আমার বাবা মোহাম্মদ শফি বার্মিজ সৈন্যদের হামলায় মারা যান। তারপর আমি ও আমার ফ্যামেলির অন্য সদস্যরা কোনোরকম প্রাণ বাঁচিয়ে বাংলাদেশে চলে আসি।

আমার বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করেছে, টাকা-পয়সা লুটতরাজ করেছে। সকল নারী পুরুষকে গ্রাম শূন্য করেছে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। এই সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করিনা।

৫২. **নুর ফাতেমা (২০),** পিতার নাম ঃ আমির হোসেন, মাতার নাম ঃ মরিয়াম খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুল মতলব, স্বামীর নাম ঃ সিরাজুল ইসলাম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বলিবাজার, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই মনির।

নুর ফাতেমা বলেন, আমি আরাকানের মংডু বলিবাজারের বাসিন্দা। যেদিন বার্মিজ সেনারা হামলা করে সেদিন গ্রাম ঘিরে ফেলার পর সেনাসদস্যরা নারীদের আলাদা করে ঘরে ঢোকায়। আমাকে সহ বাড়ির আরও চার নারীকে সেনারা ধর্ষণ করেছে। এরপর

আমার সঙ্গের সব নারীকে হত্যা করা হলেও আমি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই। ধর্ষণের শিকার রোহিঙ্গা অনেক নারী লোকলজ্জার ভয়ে মুখ খুলবে না। বাস্তবে প্রতিটি গ্রামেই নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আমি ভুক্তভোগী আমি জানি তা কতটা নির্মম এবং যন্ত্রণাময়। আমার সঙ্গে যা ঘটেছে তার দুঃসহ স্মৃতি তাড়া করছে আমাকে সবসময়। জীবনটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। রোহিঙ্গা নারীর জীবন কতটা অনিরাপদ তা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের এলাকায় যখন হামলা চালায় তখন তিনটা কিংবা ৪টা বাজে যখন মানুষ ঘুমে থাকে মানুষ তখন আমরা তাড়াহুড়ার মধ্যে যে যেদিকে পেরেছি পালিয়েছি। কেউ কিছু নিয়ে আসতে পারিনি। আমার ভাইকে বার্মিজ সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। কোনো মতে এক এলাকার পর অন্য এলাকা পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছি। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকা ইয়াকিনের নাম শুনেছি।

৫৩. **আব্দুল হামিদ (৪৮),** পিতার নাম ঃ আব্দুর রহমান, মাতার নাম ঃ নুরু জাহারুন, দাদার নাম ঃ আমিনা, স্ত্রীর নাম ঃ তাহেরা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাইচদম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই মনছুর।

আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা তাই আমাদের কোনকিছুতেই আমাদের কোনো অধিকার দিত না। বার্মিজ প্রশাসন মনে করত, আমরা যদি লেখাপড়া কাজ কর্ম কোনো কিছুতে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমরা যোগ্য হয়ে যাব। আমরা দেশ স্বাধীনের পথ পেয়ে যাব। এই ভয়-ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করতো তাই তারা আমাদের সঙ্গে তারা হিংস্র প্রাণীর মতো আচরণ করতো। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি। এসব রোহিঙ্গা সংগঠনের কারণে আরাকানে শান্তি আসেনি।

৫৪. **দীল মোহাম্মদ (৬৫),** পিতার নাম ঃ মৃত. জালাল আহমদ, মাতার নাম ঃ মৃত. রবিয়া খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. পেটান আলী, স্ত্রীর নাম ঃ আছিয়া খাতুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীরজায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে শামসু আলম।

দীল মোহাম্মদ বলেন, আমি মনে করি, জাতিগতভাবে রাখাইন উত্তরসুরীর মধ্যে ভুল ছিল। তা না হলে আজ আড়াই শত বছর পরে এসে আমরা কিসের খেসারত দিচ্ছি? আমরা আজ গভীর থেকে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি। আমার মনে হয় না আমাদের মতো লাঞ্ছিত এই পৃথিবীতে আর কোনো জাতি আছে। যুগ যুগ ধরে যত অসভ্য শাস্তিসমূহ কি শুধু আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন? আমরা কেন আজ এতো অবহিলত জাতিতে পরিণত হলাম? আমার মনে হয় এসব কিছুর মূলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরই ভুল আছে। সব ভুলতো এক সাথে বলা যাচ্ছে না। তবে পৃথিবীর যতই জাতি লোক বসবাস করি সবার জন্য একটি কথাই বলা যায় আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো যেন কোনো ভুল আর কেউ না করে। যার কারণে সারাজীবন আমাদের মতো ভুলের মাসুল দিতে হবে কেঁদে কেঁদে। আরাকানে থাকাকালীন রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন

হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করি না।

৫৫. **ছৈয়দ উল্লাহ (৩০),** পিতার নাম ঃ আব্দুল গনি, মাতার নাম ঃ খদিজা বেগম, দাদার নাম ঃ ছমদ আলী, স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে ছালমা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ওদম পাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ আমার ভাই এনামুল হক।

ছৈয়দ উল্লাহ বলেন, আমার বাড়ি আরাকানের মংডুর ওদম পাড়া গ্রামে। আমার এলাকায় হত্যাকাণ্ডের আগে সেনাপোশাকে আসা লোকজন প্রথমে গ্রাম ঘিরে ফেলে। পরে এলোপাতাড়ি গুলি করে হত্যা করে। গুলিতে না মারা গেলে ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তরুণীদের বাছাই করে আলাদা ঘরে আটক রাখা হয়। এরপর তাদের কাউকে কাউকে ধর্ষণের পর ঘর তালাবদ্ধ করে দিয়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে হত্যা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহগুলো গর্ত খুঁড়ে সেখানে পুঁতে রাখা হয়। আমি নিজে একটি খাল থেকে ১৫টি শিশুর মৃতদেহ তুলেছি। আমার ভাই এনামুল হক বার্মিজদের জঘন্যতম হামলায় মারা যায়। আমি নিন্দা করি এই হামলাকারীদের। ওরা গণহত্যা, গণধর্ষণের মতো জঘন্য ঘৃণিত কাজ। আমি এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাই। আমি ধিক্কার জানাই ঐ ঘাতক সন্ত্রাসীদের বিচার যেন আরাকান রাজ্যের মাটিতে হয়। আমি বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে সমর্থন করি।

৫৬. **ফয়েজ আহমদ (৫৭),** পিতার নাম ঃ ইসা আলী, মাতার নাম ঃ আয়েশা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. জব্দর ইকবাল, স্ত্রীর নাম ঃ সাজেদা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ দোয়াখালী, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ আহত ফয়েজ আহমদ নিজেই।

ফয়েজ আহমদ বলেন, আমি আরাকানের মংডুর দোয়াখালী এলাকার বাসিন্দা। আমার গ্রামে বার্মিজ সেনারা নিপীড়ন আর অত্যাচারের খড়ক চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। জনবসতির কোনো আলামত রাখেনি। আমার বাড়িঘরসহ পাড়ার আরও ২৫ টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। কেবল আমার এলাকা নয়, মিয়ানমারের মংডুর তুলাতুলি, দিয়েলতলি, হোয়াইকং, গারতিবিল, বলিবাজার, বড়চরা, নাড়িরবিল, টমবাজার, খুল্লুং, হাসুরতা, রাজারবিল, জীবনখালিসহ অন্তত ১৬টি গ্রাম এবং বুথিডংয়ের নাতিডং, খুন্দু প্রাং, দক্ষিণ ফাতিয়া, চৌ পরাংসহ আটটি গ্রামে সেনারা জুলুম করছে। আমাদের পাশের একটি গ্রামের সাতটি পরিবারের একজন সদস্য ছাড়া বাকি সবাইকে মেরে ফেলেছে সেনারা। বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে আমি সমর্থন করি। আমি আরসা'র নাম শুনেছি, এর প্রধান আতাউল্লাহ।

৫৭. **মোঃ আলম (২৮),** পিতার নাম ঃ মোঃ আলিম, মাতার নাম ঃ মরহুম হালেমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মরহুম নুর আহমদ, স্বামীর নাম ঃ ছমিরা খাতুন। ঠিকানা ঃ

পাড়া/গ্রামঃ রোহিঙ্গা দমপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা মোঃ আলিম।

মো আলম বলেন, আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল, এখন নাই। আমি কোনো নির্বাচনে ভোট দেইনি কিন্তু আমার বাপ দাদারা নির্বাচনের সময় ভোট দিতেন। নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা আমাদের কাছে ভোট চাইতে আসতেন। আমাদের গ্রামের সর্দারের নাম হচ্ছে মাস্টার শফি আলম। ঘটনার দিন বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন যে যেদিকে পারি পালিয়ে যাই। আমার বাবা মো. আলিম বার্মায় গণহত্যার শিকার হয়ে মারা যায়। আমি উনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং সাথে সাথে জোর দাবি জানাচ্ছি যে, আন্তর্জাতিক গণআদালতে বার্মিজ সেনাদের যেন বিচার করা হয়। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। এই দলের আমীরের নাম আতাউল্লাহ জুনুনী। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করি না। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করিনা।

৫৮. **রেহেনা বেগম (২০),** পিতার নাম ঃ অলি চান, মাতার নাম ঃ মরহুম রহমত, দাদার নাম ঃ দরবেশ আলী, স্বামীর নাম ঃ মোঃ কাসেম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

রেহেনা বেগম বলেন, আমার বাড়ি মিয়ানমারের আরাকানের নাচিডং। পরিবারের অপর চার নারী সদস্যের সঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিলাম আমি। এমন সময় গ্রামে হামলা চালায় বার্মিজ সেনারা। ওরা ঘরে ঢুকে নারীদের একটি ঘরের মধ্যে যেতে বাধ্য করে। আমার শিশু সন্তানকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে 'ফুটবলের মতো' লাথি মারে। সেনারা নারীদের বিবস্ত্র করে ফেলে। এক সেনা আমার গলায় ছুরি রেখে আমাকেসহ প্রত্যেক নারীর ওপর ধর্ষণযজ্ঞ চালায় সেনারা। কয়েক ঘণ্টা চলে আমাদের উপর ওই বিভীষিকা। আমার মনে হয়েছিল ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ভয় হচ্ছিল, আমার ছেলে মনে হয় মারা গেছে। বাংলাদেশে হেঁটে আসতে আট দিন সময় লেগেছে আমার। আমার সঙ্গে ধর্ষণের শিকার হওয়া পরিবারের আমার দুই বোন রাস্তায় মারা যান। আমার বোন দু'জন এতো দূর্বল ছিল যে মারাই গেল পথের মধ্যে। আমি আমার চোখে দেখা কয়েকটি দৃশ্য কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমি নিজে ধর্ষিতা। বার্মা হলো একটি আজব দেশ যেখানে শুধু বার্মিজ উগ্রবাদীরাই থাকবে অন্য কোনো জাতি থাকতে পারবে না। আমি রোহিঙ্গা কোনো সংগঠনের নাম জানি না।

৫৯. **দিল মোহাম্মদ (৪০),** পিতার নাম ঃ লাল মিয়া, মাতার নাম ঃ রশিদা, দাদার নামঃ অলি চান, স্ত্রীর নাম ঃ সোমেরা বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ গধুরা শীয়াপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্ত্রী সোমেরা বেগম।

দিল মুহাম্মদ বলেন, আমরা না হয় সবকিছু বুঝি কিন্তু যারা শিশু, নাবালক, ওদের কি অপরাধ ছিল? বার্মিজ সৈন্যরা শিশুদেরও ধর্ষণ ও হত্যা করেছে। আমি এই জঘন্য নারকীয় কায়দায় হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ

ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। এই সংগঠনের কারণে বার্মিজ সেনারা হামলা করে রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম আমি সমর্থন করিনা।

৬০. **মনিরা আক্তার (২০),** পিতার নাম ঃ নুরু ছালাম, মাতার নাম ঃ রাশিদা, দাদার নাম ঃ ছৈয়দ আমিন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ হাসুসুরাতা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা নুরু ছালাম।

মনিরা আক্তার বলেন, বার্মিজ সেনাদের আক্রমণে আমাদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেতখামার ধ্বংস হয়ে গেছে। মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে। আমরা গণহত্যার শিকার হয়েছি। আমার পিতা নুরু ছালাম এই গণহত্যার শিকার হয়েছেন। আমাদের আরাকান রাজ্যের কেউ আজ নিরাপদ নাই। সবাই অনিরাপদ। আজ আমরা হয়ে গেলাম রোহিঙ্গা শরণার্থী। আমাদের কোনো ঠিকানা নাই। এমন এক নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের কোনো জায়গা জমি নেই, নেই কোনো গ্রহণযোগ্য অভিভাবক, যদিও কোনো একজন বীর পুরুষ বুক ফুলিয়ে আমাদের সাহায্য করতে আসে তাকেও হারাতে হয়। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

৬১. **ইলিয়াছ (৪০),** পিতার নাম ঃ দিল মোহাম্মদ, মাতার নাম ঃ মৃত. রেহেনা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. মোঃ সোলাইমান, স্ত্রীর নাম ঃ নুর বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ লোদাইং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই সালামত।

ইলিয়াছ বলেন, বার্মিজ সেনাবাহিনীর হামলায় আমার বাড়িঘর, রুজির যত জায়গা ছিল সব বরবাদ হয়ে যায়। সৈন্যরা আমার ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। আমাদের যা ছিল সবকিছু সৈন্যরা লুটে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছি। বাংলাদেশে এসেও শান্তি নেই। বন্দিশালার মতো জীবনযাপন ভাল লাগে না। তারপরও বন্দিশালা হলেও শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহর দরবারে এতোটুকু পাওয়ার। আশ্রয় মিলছে তাই সবাই আমাদের ডাকে রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৬২. **নাছিমা খাতুন (২০),** পিতার নাম ঃ মৃত. ফোরকান আলী, মাতার নাম ঃ মৃত. ফাতেমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মৃত. ছৈয়দ আহমদ, স্বামীর নাম ঃ এনাম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ তুলাতুলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা ফোরকান আলী।

নাছিমা খাতুন বলেন, বার্মিজ সৈন্যরা আমার বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। অল্পতে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। আমরা আরাকান রাজ্যের লোকের আমাদের তেমন কোনো বড় চাহিদা ছিল না। আমাদের চাহিদা ছিল একটাই, আমাদের মুসলিম জীবনযাপন যেমন– আযান, মিলাদ মাহফিল দ্বীনের পথে চলার বিষয়াদি যেন

স্বাধীনভাবে আদায় করতে পারি এটাই চাইছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে পাষণ্ড সৈন্যরা আমাদের উপর চড়াও হয়ে আমাদের আরাকান রাজ্যে গজব ঢেলে দিল। আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করে হত্যা করল। বাড়িঘর ধ্বংস করল। আমি এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পনাকারীদেরসহ জড়িত সবার ফাঁসির দাবি জানাই। আরাকান রাজ্যে ফেরত যেতে চাই। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনিনি।

৬৩. **জামাল হোছাইন (২৫),** পিতার নাম ঃ এজার হোছাইন, মাতার নাম ঃ রহিমা খাতুন, দাদার নাম ঃ আবুল খাইর, স্ত্রীর নাম ঃ ছেতারা বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জুলটলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ মা রহিমা খাতুন।

জামাল হোছাইন বলেন, বার্মিজ সৈন্যরা যে হামলা করেছিল সেই হামলায় কত মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করল তার কোনো সীমা নেই। আর কত মানুষের প্রাণ নিল তারও কোন সীমারেখা নেই। অগণিত মানুষকে হত্যা করেছিল বর্বর অসভ্য সৈন্যরা। আমার মা রহিমা খাতুনকেও হত্যা করেছে। আমাদের ঘরবাড়ি তো গেল আমাদের রুজির পথও বন্ধ করে দিল। আমাদের বাংলাদেশে আসার জন্য বাধ্য করা হলো। আমি জবরদখলকারী ঘাতকদের ফাঁসি চাই, বিচার চাই, আরাকান রাজ্যে ফেরত যেতে চাই। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকা ইয়াকিন এর নাম জানি।

৬৪. **পারভিন আকতার (২২),** পিতার নাম ঃ কলিমুল্লাহ, মাতার নাম ঃ মাহসুক আকতার, দাদার নাম ঃ মৃত. নজির আহমদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা কলিমুল্লাহ।

পারভিন আক্তার বলেন, আমরা মৌলভীর জায়গায় বাসিন্দা ছিলাম। আমরা খুব সুখী জীবনযাপন করছিলাম। হঠাৎ করে বর্বর হামলার শিকার হয়ে আমরা চির অসহায় হয়ে যাই। বার্মিজ সৈন্যদের বর্বর হামলায় আমার বাবা নিহত হয়। আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের বাঁচার মতো কোনো পথ খোলা ছিল না। তাদের জুলুম নির্যাতনের তাণ্ডবে নিরুপায় হয়ে বাংলাদেশে চলে আসি। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা।

৬৫. **তাহেরা বেগম (৪০),** পিতার নাম ঃ মৃত. হোসেন আহমদ, মাতার নাম ঃ নুর বাহার, দাদার নাম ঃ মরহুম রকিব উদ্দীন, স্বামীর নাম ঃ শহিদুল ইসলাম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ স্বামী শহিদুল ইসলাম।

তাহেরা বলেন, আমি আমার শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে লাম্বার বিল হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করি। আরাকানে আমার সামনে গ্রামে তিনজন তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আমি এখনো সেই দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

হামলার দিন মিয়ানমারে উগ্র বৌদ্ধরা মুসলিম বেশ ধারণ করে সবাইকে মসজিদে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিল। কোনো কিছু না বুঝেই মুসলিমরা যখন দল বেঁধে মসজিদে যাচ্ছেন, তারা বার্মিজ আর্মিকে খবর দেয়। এরপর চারপাশে জড়ো হয়ে ওই মসজিদের সব রোহিঙ্গা মুসলিমকে গুলি করে মেরেছে। কোনো কোনো মসজিদের চারপাশে কেরোসিন ও পেট্রল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তারা। এভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালায় বার্মিজ সেনারা। আমরা কোন অপরাধ করলাম না অথচ তারা আমাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আমার স্বামীকে বার্মিজ সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি করে হত্যা করে। আমরা যে যেদিকে পারি কোনোমতে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছি। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম শুনিনি।

৬৬. **ফয়েজ আহমদ (৪৭),** পিতার নাম ঃ জাফর আহমদ, মাতার নাম ঃ মৃত. ইসমত আরা, দাদার নাম ঃ মৃত. ইমারত আলী, স্ত্রীর নাম ঃ কোবরা ইয়াছমিন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ফোহাম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্ত্রী কোবরা ইয়াছমিন।

ফয়েজ আহমদ বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মংডু থানার ফোহাম গ্রামে বাসিন্দা। আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনে তিনবার ভোট দিয়েছি। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন যে যেদিকে পারি পালিয়ে যাই। আমি আমার স্ত্রী ছাড়াও অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি বার্মিজদের বর্বর হামলায়। আমি বার্মিজ সেনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে সমর্থন করি।

৬৭. **মুনমুন বেগম (৬৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. নজিবুল্লাহ, মাতার নাম ঃ মৃত. রুমেনা বেগম, দাদার নাম ঃ মৃত. কেরামত উল্লাহ, স্বামীর নাম ঃ মৃত. শরিফ হোসেন। ঠিকানাঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী শরিফ হোসেন।

মুনমুন বেগম বলেন, বার্মিজ সেনারা আমাদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন করেছে, এটা পৃথিবীর নজিরবিহীন ঘটনা যা বিশ্ববাসী দেখেছে। আমার স্বামীকে বার্মিজ সৈন্যরা হত্যা করেছে। সমস্ত আঘাত ক্ষয়ক্ষতি জ্বালাও পোড়াও চিহ্ন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে আপনারা দেখেছেন– আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙে তছনছ করেছে কিভাবে। আমার আরাকান রাজ্য ধ্বংস করেছে, অসংখ্য নারী পুরুষকে হত্যা করেছে, ধর্ষণ নির্যাতন করে উলঙ্গ অবস্থায় নারীদের হত্যা করেছে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৬৮. **ফাতেমা বেগম (৩৫),** পিতার নাম ঃ আবু বক্কর, মাতার নাম ঃ নুর জাহান, দাদার নামঃ মোঃ হাসিম, স্বামীর নাম ঃ মোঃ ইলিয়াছ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ কিংআনদম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে রজিবুল।

ফাতেমা বেগম বলেন, আমি একজন গৃহিণী। আমি মংডু থানার কিংআনদম গ্রামের বাসিন্দা। আরাকানে থাকাকালীন আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনে মাত্র একবার ভোট দিয়েছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা হামলার সময় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং দেশ ছাড়ার হুমকি দেয়। এই হামলার শিকার হয়ে অনেক আত্মীয়স্বজনকে হারিয়েছি। আমার নিজের ছেলেকেও হারিয়েছি। আমার চোখের সামনে আমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছে পাষণ্ড সৈন্যরা। আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন আরাকানে বারবার ঝামেলা লাগিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এসব সংগঠন রোহিঙ্গা জাতির জন্য ক্ষতিকর মনে করি।

৬৯. **জয়নাল আবেদিন (২২),** পিতার নাম ঃ মৃত মাসুদ মিয়া, মাতার নাম ঃ মালেকা বেগম, দাদার নাম ঃ মৃত শামসুর আলম, স্ত্রীর নাম ঃ আমেনা খাতুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর বাজার, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ভাই শফিউল।

জয়নাল আবেদীন বলেন, মৌলভীর জায়গায় আমার বাড়ি ছিল। বার্মিজ সৈন্যরা অতর্কিত হামলা করে আমার ভাই শফিউলকে হত্যা করে। এখন সেখানে কিছুই নেই আমাদের ক্ষেতখামার গরু ছাগলের খামারও নাই। চাষাবাদের জিনিসপত্র কিছুই নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা বার্মিজ বাহিনীর অত্যাচারে অসহ্য হয়ে আমাদের উপর জুলুম নির্যাতনের মাত্রা এমন করেছিল যে আমরা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসি। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন বার্মার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করলে সেই জিহাদকে আমি সমর্থন করি না।

৭০. **আরেফা বেগম (৩৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. হাবিব আহমদ, মাতার নাম ঃ লায়লা বেগম, দাদার নাম ঃ মৃত. আমির হোছাইন, স্বামীর নাম ঃ আনোয়ার। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ স্বামী আনোয়ার।

আরেফা বেগম বলেন, আমার বাড়ি মংডুর নাচিডং এলাকায়। আমি একজন গৃহিণী। আমার স্বামী দিনমজুরি করে আয় রোজগার করতেন। হামলার দিন পাহাড় থেকে গাছ কেটে বাড়ি ফেরার পথে মিলিটারিরা আমার স্বামীকে হত্যা করে। ঘটনার একদিন পর খবর পাই আমি। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই আমি। কিন্তু মৃতদেহ পাইনি। শুনেছি যাদের হত্যা করা হয়েছিল সবার মৃতদেহ সেনারা সরিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখি ঘর নেই। পোড়া মাটির গন্ধ। আমার বাড়ি আমিই চিনতে পারছিলাম না। সবাই জীবন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। আমিও আমার মেয়েদের নিয়ে পালানোর চেষ্টা করি। বাড়ির সামনে দেখি মিলিটারিরা একের পর এক যুবকদের

হত্যা করছে। মানুষকে জবাই করে পুকুরে মৃতদেহ ফেলে দিচ্ছে। এসব দেখে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। অনেক কষ্টে সাগর পাড়ি দিয়ে মেয়েদের নিয়ে বাংলাদেশে আসি। উঠেছি বালুখালি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে। আমার স্বামী জীবন থেকে হারিয়ে গেল। বাবা হারা হয়েছে মেয়েরা। আমার মেয়েরা আর কোনোদিন বাবার দেখা পাবেনা। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠন সমর্থন করি না, কারণ ওদের কারণে রোহিঙ্গাদের ওপর বারবার হামলা হয়।

৭১. **জরিনা খাতুন (৪০),** পিতার নাম ঃ আবু বক্কর, মাতার নাম ঃ শরিদা খাতুন, দাদার নাম ঃ নুরু উদ্দীন, স্বামীর নাম ঃ নুরু ছালাম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী নুরু ছালাম।

জরিনা খাতুন বলেন, বার্মিজ সৈন্যরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমি নিজ চোখে দেখেছি কিভাবে আমাদের আরাকান রাজ্য শেষ করছে বার্মিজ সৈন্যরা। তাদের সাথে লড়াই করার জন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই, আমরা কিভাবে তাদের সাথে লড়বো। আর এর আগে দুই একবার হামলা করেছে ওরা কিন্তু এবারের হামলাটি হচ্ছে একেবারে ভিন্ন। এরা চাইছিল আমাদের একেবারে ধুলায় মিশিয়ে দিতে আপনাদের মাধ্যমে বার্মিজ সেনাদের বিচার চাই। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করি না।

৭২. **কবির আহম্মদ (৫০),** পিতার নাম ঃ আলি আহম্মদ, মাতার নাম ঃ চুরি খাতুন, দাদার নাম ঃ জমির উদ্দিন, স্ত্রীর নাম ঃ জুহরা আক্তার। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ কুল্লুম পাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ ছেলে আহত।

কবির আহম্মদ বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মংডু থানার কুল্লুম পাড়ার বাসিন্দা। আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল কোনো পাসপোর্ট ছিল না। আমি নির্বাচনে বহুবার ভোট দিয়েছি। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন যে যেদিকে পারি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বাড়ি-ঘর, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে আমাদের সব শেষ করে দেয় বার্মিজ সেনারা। এই হামলাতে আরাকান রাজ্যের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই হামলায় আমার ছেলেকে আহত করেছে বার্মিজ সৈন্যরা। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না। কোনো নেতাকেও চিনি না।

৭৩. **জাবেদ হোসেন (২৮),** পিতার নাম ঃ নুর হাকিম, মাতার নাম ঃ মরহুম নুর বাহার, দাদার নাম ঃ জমির উদ্দীন, স্ত্রীর নাম ঃ তাসলিমা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বামব্রুভিল, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বোন আমেনা।

জাবেদ হোসেন বলেন, আমি মংডু থানার বাসিন্দা। বার্মিজ সৈন্যরা আমার বোন আমেনাকে হত্যা করে। আমার আরাকান রাজ্যের ইতিহাস হয়তো বা শুনেছেন,

ইতিহাসভিত্তিক কোনো বই পুস্তকে পড়েছেন। আমরা হচ্ছি সেই আরাকান রাজ্যের হতভাগা বাসিন্দা যাদের প্রায় আড়াইশত বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে মুছে নতুন ইতিহাস গড়তে চায় বার্মিজরা। আমি রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকা ইয়াকিন-এর নাম শুনেছি।

৭৪. **ইমাম হোসেন (৪৫),** পিতার নাম ঃ মরহুম মোঃ জলিল, মাতার নাম ঃ মজুমা খাতুন, দাদার নাম ঃ মোঃ হোছাইন, স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ হাসিনা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ দুমছেপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান, আহতের নাম ঃ ইমাম হোসেন আহত।

ইমাম হোসেন বলেন, আমি একজন কৃষক। আমি মংডু থানার দুমছে পাড়ার বাসিন্দা। আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনে তিনবার ভোট দিয়েছি। বার্মিজ সেনাদের হামলায় আমি আহত হয়েছি। বাড়ি-ঘর গরু ছাগল ক্ষেতখামার টাকা পয়সা আসবাবপত্র সবকিছু আমাদের ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের পরিবারের ৫১ লক্ষ টাকার মতো মালপত্র নষ্ট করেছে বার্মিজ সেনারা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৭৫. **আয়েশা (৪৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. এনাম, মাতার নাম ঃ মৃত. ফাতেমা, দাদার নাম ঃ মৃত. আয়কন আলী, স্বামীর নাম ঃ বেদারুল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বেদারুন।

আয়েশা বলেন, আমি নচিডং গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। আমি একজন গৃহিণী। আরাকানে থাকাকালীন আমার শুধু আইডি কার্ড ছিল যেটা এখন নাই। আমি কোনো নির্বাচনে মাত্র একবার ভোট দিয়েছিলাম। নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা আমাদের কাছে ভোট চাইতে আসতেন। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। রোহিঙ্গা ছেলে মেয়েদের সরকারি কোন স্কুলে ভর্তি করার সুযোগ ছিল না। মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে নামাজ আদায়, কোরবানি দেওয়াসহ ধর্মীয় কাজে বার্মিজরা রোহিঙ্গাদেরকে বাধা দিত। আক্রমণের সময় হামলাকারীরা আমাদেরকে বলেছিল তোরা বাঙালি, তোরা চলে যা। ঐ তোদের বাপ দাদার দেশ, এই দেশে কোনো রোহিঙ্গা থাকতে পারবে না। বার্মিজ সৈন্যরা আমার স্বামীকে হত্যা করে।

আমার বাড়ি-ঘর আসবাবপত্র বিভিন্ন দামি দামি জিনিসপত্র লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। পাহাড়ে লাকড়ি কাটত আমার স্বামী বেদারুল। একদিন লাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে বার্মিজ সেনারা। আমি আমার স্বামীর লাশের দাফন কাফনও করতে পারিনি। প্রাণ বাঁচাতে পালানোর চেষ্টা করি। কিন্তু টাকা ছাড়া নৌকা তোলা হবে না। শেষ পর্যন্ত স্বর্ণের নাকফুল নৌকার চালককে দেয়া হলে আমাকে বাংলাদেশে আনা হয়। কেবল আমার স্বামী শুধু নয়, আমার আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী অনেককেই চোখের সামনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দেখেছি। আক্রোশে

জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। এখন আমার ভবিষ্যত কি নিজেও জানি না। মগ আর বার্মিজ সেনারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে। আমার জীবনের সবকিছু ধ্বংস করে দিল হামলাকারীরা। আজকে নিজ দেশ থেকে আরেক দেশে চলে আসতে হলো, এর চেয়ে কষ্ট আর কী হতে পারে? আমার ও আমার আরাকান রাজ্যের অনেক মানুষের যাদের দলিল জরুরি কাগজপত্র ছিল সব কেড়ে নিয়ে যায়, আবার কত কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি আমাদের কাগজপত্র মালপত্র টাকা পয়সা সবকিছু ফেরত চাই। বার্মিজ সেনাদের বিচার চাই। আরাকানে নিরাপদে ফেরত যেতে চাই। আমি কোনো রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

৭৬. **আমেনা বেগম (৩০),** পিতার নাম ঃ মৃত. আব্দুস শুকুর, মাতার নাম ঃ মৃত. রেহেনা, দাদার নাম ঃ আলী আকবর, স্বামীর নাম ঃ লোকমান। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। আহতের নামঃ আমেনা আহত নিজেই।

আমেনা বেগম বলেন, আমি বার্মিজ সেনাদের হামলার শিকার হই। আমার উপর নির্যাতন করে। আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। আমি কৌশলে কোনোমতে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসি। আমার মতো আরও অনেক নারী পুরুষ বাংলাদেশে চলে আসে। আমরা এখন রোহিঙ্গা শরণার্থী। আমরা ঠিকানাহীন এক জাতি। আমাদের দেশের লোকদের ওরা পুতুলের মতো ব্যবহার করতো। আমি রোহিঙ্গা কোনো জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি না।

৭৭. **নবী হোসেন (২৯),** পিতার নাম ঃ আকবর আলি, মাতার নাম ঃ সাজেদা বেগম, দাদার নাম ঃ হাবিব উল্লাহ, স্ত্রীর নাম ঃ গোলসোনা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্ত্রী গোলসোনা।

নবী হোসেন বলেন, বার্মিজ সৈন্যরা আমার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। রাখাইনে বার্মিজ বাহিনীরা যে অসভ্য হামলা করেছে, এটা সারা বিশ্বে একটা নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। সারা বিশ্বব্যাপী এর চাক্ষুস প্রমাণ যা ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারা যত কঠোর হস্তে আমাদের দমন নিপীড়ন করেছে ঠিক তেমনি কঠোরভাবে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ময়লা আবর্জনায়। তারা কোনোদিন আর মুখ দেখাতে পারবে না। আমি হামলাকারীদের ফাঁসি চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন।

৭৮. **মনজুর আলম (১৮),** পিতার নাম ঃ আব্দুস ছালাম, মাতার নাম ঃ জমিলা খাতুন, দাদার নাম ঃ মোঃ হাদির। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ দুরচি, থানা ঃ রাচিডং, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। আহতের নাম ঃ মনজুর আলম নিজেই আহত।

মনজুর বলেন, আমি দুরচি গ্রামের রাচিডং থানার বাসিন্দা। আরাকানে থাকাকালীন আমার কোনো পাসপোর্ট ও আইডি কার্ড ছিল না। বার্মিজ সেনারা যে হামলা করেছে সে হামলায় আমরা ঘর-বাড়ি, ফসলাদির ক্ষেতখামার সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের পাঁচ পরিবারের প্রায় ১৮ থেকে ২১ লক্ষ টাকা সমপরিমাণ নষ্ট হয়েছে। এখন আমাদের কাছে বাঁচার মতো আর কিছুই নেই। আমরা আমাদের হারানো, কেড়ে নেওয়া সবকিছু ফেরত চাই। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা।

৭৯. **ফোরকান বাদশা (৫৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. ছৈয়দ আকবর, মাতার নাম ঃ মৃত. আয়েশা বেগম, দাদার নাম ঃ মৃত. মিয়া হোসেন, স্ত্রীর নাম ঃ মরিয়াম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ নাচিডং, থানা ঃ মংডু জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ স্ত্রী মরিয়াম।

ফোরকান বাদশা বলেন, নাচিডং গ্রামের মংডু থানার আদিবাসী। ২০১৭ আগস্টে বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের ওপর হামলা শুরু করে তার দু'দিন পরেই আমার স্ত্রী মরিয়ামকে গুলি করে হত্যা করে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। এই দলের আমীরের নাম আতাউল্লাহ জুনুনী।

৮০. **শাহেদা আকতার (২৪),** পিতার নাম ঃ মৃত. এজাহার মিয়া, মাতার নাম ঃ মৃত. ফাতেমা, দাদার নাম ঃ মৃত. ওসমান, স্বামীর নাম ঃ মৃত. লিয়াকত। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ দোওহাম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী লিয়াকত।

শাহেদা আকতার বলেন, হামলার সময় আমি বাড়িতে ছিলাম। আমার বাড়ির চতুর্দিকে যখন হৈচৈ গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল আমরা এলাকাবাসী আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যাই। বার্মিজ সৈন্যরা আমার স্বামী লিয়াকতের বুকের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যা করে। আমাকে দুইজনে তুলে নিয়ে যায় পাশে একটি সুড়ঙ্গের মতো জায়গায়। আমি ঐখানে দেখতে পেলাম আমার মতো আরও অনেক নারীকে যাদেরকে একের পর এক ধর্ষণ করছে বার্মিজ সেনাবাহিনীরা। ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভাগাভাগি কারণে আটকে যায়, তখন অবস্থা বুঝে সুকৌশলে কতগুলো মেয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে আমাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি। বহু বছর আগ থেকে হরকাতুলের নাম শুনেছি।

৮১. **হালিমা বেগম (২৫),** পিতার নাম ঃ ছালামতুল্লাহ, মাতার নাম ঃ মর্জিনা বেগম, দাদার নাম ঃ মোঃ আব্দুল্লাহ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ফোহম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ বাবা ছালামতুল্লাহ।

হালিমা বেগম বলেন, নারীরা বেশী ধর্ষিতা ও হিংস্র নির্যাতনের বলি হয়েছিলাম। হালিমা বেগম বলেন, আমি হালিমাও ছিলাম ঐ নির্যাতিত নারীদের মধ্যে একজন। যদি

সম্ভব হতো ভিডিও করে রাখতাম। আমাদের কিভাবে নির্যাতন করেছিল ঐ সৈন্যরা। বার্মিজ সৈন্যরা আমার বাবাকে আমার চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করে। আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন।

৮২. **কেরামত আলী (২৭),** পিতার নাম ঃ হজরত আলী, মাতার নাম ঃ রেহেনা বেগম, দাদার নাম ঃ সরওয়ার, স্ত্রী নাম ঃ রহিমা বেগম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ ফুহম, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ আহত কেরামত আলী নিজেই।

কেরামত আলী বলেন, আমার এলাকার অনেকগুলো ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, খেতখামার, দোকানপাট, ইনকামের সব পথ ধ্বংস হয়েছিল, চলার মতো কোনো কিছুই বাকী ছিল না। আমার এলাকার অধিকাংশ নারী পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা আমাকে বনে নিয়ে গিয়ে সবাইকে উলঙ্গ করে আমাকে ওদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতে বলে। আমি তা করিনি, মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। এভাবে তামাশা করে বেড়াচ্ছিল। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যাই এবং বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসি। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৮৩. **ধলা বিবি (৩৭),** পিতার নাম ঃ হারুন মিয়া, মাতার নাম ঃ ফাতেমা, দাদার নাম ঃ মনছুর আলম, স্বামীর নাম ঃ মনির আহমদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী মনির আহমদ।

ধলা বিবি বলেন, আমি আমার চোখের সামনে ৩০ জনকে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছি। মৌলভীর গ্রাম জ্বালানোর পর কোনোমতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসি আমি। আমার স্বামী মনির আহমেদকে হত্যা করেছে বার্মিজ সেনারা। শুধু আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেকেই হারিয়েছেন স্বামী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের। বার্মিজ আর্মি ছাড়াও বিজিপি, নাসাকা বাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধরা এ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আরাকানে জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম। আমার জীবনের সবচেয়ে দামি বস্তু আমার স্বামীকে হারালাম। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি।

৮৪. **আবু রহিম (৫৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. খাইরুল আমিন, মাতার নাম ঃ মৃত. আমেনা খাতুন, দাদার নামঃ মৃত. বাদশা মিয়া, স্ত্রী নাম ঃ কামরুননাহার। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বুচিডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নামঃ স্ত্রী কামরুননাহার।

আবু রহিম বলেন, ঘটনার দিন বার্মিজ সৈন্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আমার স্ত্রীকে খুন করে। আমার ঘরবাড়ি ভেঙে চুরমার। থাকা-খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

রুজির কোনো ব্যবস্থা নেই। আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছিলাম। ভয় ছিল কোন সময় বার্মিজ সৈন্যরা এসে হামলা করে। ২০১৭ সালের ২৬ আগস্ট যে হামলা হয়েছিল সেটি হলো পৃথিবীর নজিরবিহীন হামলা। সারা বিশ্ববাসী তা দেখেছে বিভিন্ন মাধ্যমে। আমি এই হামলাকারী বার্মিজ সৈন্যদের নিন্দা জানাই। আমি ধিক্কার জানাই যারা আমাদের আরাকান রাজ্যের মুসলমানদের উপর গণহত্যা, গণধর্ষণ, নির্যাতনের মাধ্যমে মনে করেছিল আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। জঙ্গি সংগঠনকে আমি সাপোর্ট করিনা। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকেও সমর্থন করি না।

৮৫. **শাহেদ (৫৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. ফারুক আহমদ, মাতার নাম ঃ মৃত. রেহেনা, দাদার নাম ঃ মৃত. আকরাম, স্ত্রী নাম ঃ সানজিদা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্ত্রী সানজিদা।

শাহেদ বলেন, আমার বাড়িটা মৌলভীর জায়গায় মংডু থানার আকিয়াব আরাকান রাজ্যে। ২০১৭ সালের ২৬ আগস্ট যে হামলা হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এতো বড় ঘৃণিত আক্রমণ আর হয়নি। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমাদের কোনো দোষ ছিল না। এই হামলার দায়ে বার্মিজ সেনাদের দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানো উচিত। এই হামলার কারণে অনেক অগণিত মা বোনের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। এর কারণে অগণিত মানুষের প্রাণ গেছে। বার্মিজ সৈন্যরা আমার স্ত্রীকে খুন করে। এই হামলার কারণে আমাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়েছে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন।

৮৬. **ছলিমা খাতুন (৫৭),** পিতার নাম ঃ মৃত. আবুল কাশেম, মাতার নাম ঃ মৃত. আমিনা, স্বামীর নাম ঃ মৃত. আরমান। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ মৌলভীর জায়গা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী মো. আরমান।

ছলিমা খাতুন বলেন, ২৫ আগস্ট হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে তিন দিন ধরে রাখাইনের মংডুর মৌলভী পাড়ার এলাকায় এক দল যুবক মাইকে ঘোষণা দিয়ে বলছে, 'তোমরা বাংলাদেশে চলে যাও, এখানে কাউকে রাখব না। তোমাদের ঠিকানা বাংলাদেশ। কেউ বাঁচতে পারবে না। না গেলে এখানে মরতে হবে। ৩০ আগস্ট রাতে আমার স্বামী আরমানকে বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ অবস্থায়ই এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে আজ বাংলাদেশে চলে এসেছি।

বার্মিজ সেনা আর মগরা কত বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। মারার পর তারা মৃতদেহগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। যেভাবেই হোক সন্তানদের বাঁচাবই– এই ভেবে পালিয়ে এসেছি বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে। এই বার্মিজ হামলায় আমি আমার পরিবারের অনেকে আহত হয়েছি। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৮৭. **আলমাস খাতুন (৭০),** পিতার নাম ঃ হাবিবুর রহমান, মাতার নাম ঃ জরিনা খাতুন, দাদার নাম ঃ বাহার মিয়া, স্ত্রী/স্বামীর নাম ঃ সৈয়দ করিম। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ নাইচডং, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। আহতের নাম ঃ আহত আলমাস খাতুন নিজেই।

আলমাস খাতুন বলেন, আমি একজন গৃহিণী। আমি নাইচডং গ্রামের মংডু থানার বাসিন্দা। আরাকানে থাকাকালীন আমার আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনে চারবার ভোট দিয়েছিলাম। বার্মিজ সৈন্যরা যখন আমাদের উপর হামলা করে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। আমার বাড়িঘর ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। আমার আত্মীয়স্বজন অনেকে আহত, নিহত হয়েছে। আমি নিজেই আহত হয়েছি। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি।

৮৮. **মনির আহমদ (১২),** পিতার নাম: জকরিয়া, মাতার নাম: ওমস খাতুন, গ্রামের নাম: রাচিডং, থানাঃ মংডু, রাজ্যঃ আরাকান, নিহতে নাম: বাবা জকরিয়া।

মনির বলেন, হামলার দিন আমার বাবা জকরিয়াকে গলা কেটে হত্যা করেছে বার্মিজ সেনারা। এরপর আমরা দুই ভাই ও দুই বোনকে নিয়ে মায়ের বাড়িঘর ছেড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছি। আমার বাবা একজন কৃষক, তিনি কৃষিকাজ করতেন। আমার মায়ের নাম ওমস খাতুন। বাবাকে হারিয়ে আজ একজন এতিম হয়ে গেছি। আমার মা আর দুই ভাই, দুই বোন নিয়ে অনেক কষ্ট করে দিন কাটাই। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন ভোটের সময় ভোট দিতে যেতেন। আমার বাবার জন্য আমার ভাই বোন সবাই সবসময় কান্নাকাটি করে। আমি আমার বাবার হত্যার বিচার চাই। আমি আমার মা আর ভাইবোনকে নিয়ে আরাকানে ফিরে যেতে চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি।

৮৯. **মুজিব উল্লাহ (২২),** পিতার নাম: তাহের মুস্তফা, মাতার নাম: সুফিয়া খাতুন, ঠিকানাঃ গ্রাম/ পাড়া,ঝিমনতলী, বলিবাজার, মংডু, রাজ্যঃ আরাকান। নিহতের নাম: বাবা মুস্তফা ও মা সুফিয়া।

মুজিব বলেন, আমি আরাকানের মংডুর বলিবাজার ঝিমনতলীর বাসিন্দা। আমার সাজানো-গোছানো সংসার ছিল। ছিল পুকুর ভরা মাছ আর মাঠভরা ফসল। ৫ একর জমি নিয়ে ভালো কেটে যাচ্ছিল বাবা-মা, দুই বোন ও তিন ভাইয়ের সংসার। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট ঘুম থেকে উঠেই যেন দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি হলাম। ভোরে ২০-২৫ জনের সেনা ও মগ তরুণ দল আমার বাড়িতে হানা দেয়। বাবা-মাকে উঠানে বের করে গুলি করে হত্যা করা হয়। জীবন বাঁচাতে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই আমরা ৫ ভাইবোন। বোনেরা কোনদিকে গেল তা আমার জানা নেই। বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছি। দৌড়ানোর সময় বুলেটবিদ্ধ হয়েছি আমি। ২০১৭ সালের ৩০ আগস্ট ভোরে টেকনাফের উলুবনিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে

ভর্তি হই। চোখের সামনে বাবা-মাকে হত্যা করতে দেখেছি আমি। ভাইবোনদের কি হয়েছে তা আমি জানি না। আমার বাবা মায়ের হত্যাকারী বার্মিজ সেনাদের বিচার চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন।

৯০. **নুর আয়েশা (৪৫),** পিতার নামঃ আব্দুল হামিদ, মাকার নামঃ সবুরা বেগম, স্বামীর নামঃ রবিউল হুসাইন, গ্রাম/ পাড়াঃ কিয়েত ইয়ো পিন, থানাঃ মংডু, রাজ্য আরাকান। নিহতের নাম স্বামী রবিউল হুসাইন, পাঁচ ছেলে ও মেয়ে।

নুর আয়েশা বলেন, আমি রাখাইন রাজ্যের মংডু শহরের কিয়েত ইয়ো পিন গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৭ সারের ২৬ আগস্ট আমার বাড়ির সামনে আনুমানিক ২০ জনের একটা বার্মিজ দল এসে হাজির হয়। আমাদের সবাইকে বাইরে বের করে আমার ৫ ছেলে সন্তানকে বাড়ির একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। স্বামীকে গুলী করে এবং দুই মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে তারা। আমাকে ধর্ষণ করলেও পরে ছেড়ে দেয়। তারপর লুকিয়ে থাকা ৫ বছরের মেয়ে নেওয়াজকে নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছি। আমি আরাকানে থাকাকালীন আমার কোনো পাসপোর্ট ছিল না। আমার একটি আইডি কার্ড ছিল। আমি নির্বাচনের সময় তিন বার ভোট দিয়েছিলাম। বার্মিজ সরকার আমরা যারা রোহিঙ্গা তাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আমরা রাজ্য ও রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিক হয়ে গেলাম। আমার স্বামী ব্যবসা করতো। দোকান ছিল শহরে। আমার সুখের সংসার ছিল। স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার জীবনের সময় কেটে যেতো আনন্দে। কিন্তু বার্মার সরকার আমার সেই সুখের ঘরে আগুন দিয়ে সবকিছু পুড়ে তছনছ করে দিল। আমার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিল। আমার টাকা-কড়ি লটপট করে নিয়ে গেলো। পুরো জীবনটা জাহান্নাম করে দিল বার্মিজ সৈন্যরা। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও হারাকাহ ইয়াকিনের নাম জানি।

৯১. **ছৈয়দ হোছাইন (১৯),** পিতার নাম ঃ জামাল উদ্দিন, মাতার নাম ঃ ফাতেমা, দাদার নাম ঃ হোছাইন আহম্মদ, স্ত্রীর নাম ঃ আয়েফা খাতুন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ দলসা পাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ দাদি আরাফা খাতুন।

ছৈয়দ হোসাইন বলেন, আমার দাদি আরাফা খাতুন এর কথা আমার এখন, স্মরণ আছে। দাদি বলেছিল, আমার নাতি যদি আরাকান রাজ্য স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চাও তবে ঘুমিয়ে স্বপ্ন না দেখে বাস্তবে কিছু কর। যদি স্বাধীন রাষ্ট্র চাও অনেক কষ্ট নির্যাতন, নিপীড়ন, সম্ভ্রম ও প্রাণের বিসর্জনের মাধ্যমে ফিরে পেতে পারো। একদিন স্বাধীন আরাকান রাজ্য হবে, সন্ত্রাসী বার্মিজ সৈন্যরা আমার দাদিকে নির্মমভাবে কেটে টুকরা টুকরা করে হত্যা করেছে। আকামুল মুজাহিদীন নামের জঙ্গি সংগঠনের নাম জানি। এই সংগঠনের আমিরের নাম হাফেজ ত্বোহা।

৯২ **ফিরোজা বেগম (৩৫),** পিতার নাম ঃ ফাতেহ আহমদ, মাতার নাম ঃ ফাতেমা বেগম মৃত., দাদার নাম ঃ মরহুম আব্দুল হাকিম, স্বামীর নাম ঃ দীন মোঃ আহমেদ। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ জামরনিয়াপাড়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী দীন আহমদ।

ফিরোজা বলেন, বার্মিজ সন্ত্রাস বাহিনী আমাদের আরাকান রাজ্যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করছে। পুরো দেশটাই ধ্বংস করেছিল বার্মিজ সন্ত্রাস বাহিনীরা। আমার স্বামী দীন আহমদকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। আমার বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করেছে। কেরোসিন, গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় পুরো এলাকা। এসব আমি গণহত্যার বিচার চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ এর নাম জানি। জঙ্গি সংগঠনের জিহাদকে সমর্থন করি না।

৯৩. **মমতাজ বেগম (৩০),** পিতার নাম ঃ গুরা মিয়া, মাতার নাম ঃ আমিনা আক্তার, দাদার নাম ঃ ঈসমাইল, স্বামীর নাম ঃ আবুল মোহাম্মদ হোসেন। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ তুলাতুলি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান। নিহতের নাম ঃ স্বামী মোহাম্মদ আবুল হোসেন।

মমতাজ বেগম বলেন, হামলার দিন বার্মিজ সেনারা আমার স্বামী আবুল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে। বার্মিজ সৈন্যদের ভয়ে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসি। আমি আমার অনেকগুলো আপন লোকদের হারিয়েছি। আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিন এবং আরএসও এর নাম শুনেছি আরাকানে থাকাকালীন।

হিন্দু রোহিঙ্গা শরণার্থীর জবানবন্দি

২০১৭ সালের ২১-২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় নাগরিক কমিশনের সচিবালয়ের অনুসন্ধানী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দশ হাজার ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জবানবন্দি সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৯৩ মুসলিম রোহিঙ্গা শরণার্থীর জবানবন্দি তুলে ধরা হয়েছে। এসময় মুসলিমদের পাশাপাশি পৃথক ক্যাম্পে অবস্থানকারী হিন্দু রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরও জবানবন্দি সংগ্রহ করা হয়। এদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি নিম্নে বর্ণিত হলো- যারা মূলত রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের নির্যাতনের শিকার।

১. **পরিমল ধর (৪৫),** পিতার নাম ঃ বিনোদ ধর, মাতার নাম ঃ নিরবালা, দাদার নাম ঃ প্রসন্ন ধর, স্ত্রীর নাম ঃ পারুল ধর। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ বারমা, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

পরিমল ধর বলেন, আমি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা। আমার গ্রাম মংডুর বারমা এলাকায়। আমি বাপদাদার আমল থেকে ওখানে বসবাস করি। জন্মসূত্রেই আমি রোহিঙ্গা নাগরিক। আমার রোহিঙ্গা নাগরিকত্বের আইডি কার্ড আছে। আমার মিয়ানমারের কোনো পাসপোর্ট ছিলনা। রোহিঙ্গা হিন্দু হিসেবে আমার পরিচয়। রোহিঙ্গা হিসেবে শতশত বছর ধরে আমরা হিন্দুরা রাখাইনে জীবনযাপন করছি।

বার্মিজ সেনারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর হামলা করলে কিংবা কোনো সময় নির্যাতন করলে হিন্দুদের উপরও নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসতো। ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ২৫ আগস্টের সেই ভয়াবহ ঘটনাগুলোর সময় রোহিঙ্গা হিন্দুদের উপর হামলা করেছে জঙ্গিরা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের হামলার ঘটনার পরদিন থেকে বার্মিজ সেনাদের পাশাপাশি রোহিঙ্গা মুসলিম জঙ্গিরাও হিন্দুদের বেশি চড়াও হয়েছিল।

রোহিঙ্গা জঙ্গিরা সন্দেহ করতো আমরা বার্মিজ সেনাদেরকে গোপন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করি। এই সন্দেহ থেকে হিন্দুদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাত। তাছাড়া মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়েছে কিন্তু মুসলমানদের দেয়নি। ওই কারণে হিন্দুদের প্রতি ভিন্নচোখে দেখে আমাদেরকে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট ঘটনার দিন কালো মুখোশধারী এক দল লোক আমার উপর আক্রমণ চালায়। মুখোশধারী কালো কাপড় আর কালো চশমাপরা দলটি হচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গি গ্রুপ হারকাহ আল ইয়াকিন। জঙ্গি দলের কয়েকজন সদস্য আমার বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর আমি ঘর থেকে বের হতেই আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আমাকে অন্যত্র চলে যেতে বলে। জঙ্গিরা চলে যাবার পর আমি প্রাণে বাঁচতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হই।

রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা মংডুর বারমা এলাকায় হামলা চালিয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, লুটপাট ও ভাঙচুর করে। হিন্দু মহিলাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে কয়েকজনকে অপহরণ করে পাহাড়ে জঙ্গিদের আস্তানায় নিয়ে আটকে রাখে। মহিলাদেরকে স্বামী সন্তান হত্যার ভয় দেখিয়ে ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে বাধ্য করে। যে সকল মহিলা ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন তাদের স্বামী ও বাবাদের ধরে নিয়ে জঙ্গিরা হত্যা করে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারকাহ ইয়াকিনের সদস্যরা রোহিঙ্গা হিন্দুদের প্রতি সবসময় হিংসাত্মক আচরণ করে। যখন তখন হুমকি দিয়ে ভয় দেখান। জঙ্গিরা চায় না হিন্দুরা মুসলমানদের সম্পর্কে জড়াক। হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে জঙ্গিরা উল্লাস করে।

২. **সুভাষ রুদ্র (৫০),** পিতার নাম ঃ কির রুদ্র, মাতার নাম ঃ অনবালী, দাদার নাম ঃ শরৎ রুদ্র, স্ত্রীর নাম ঃ মালতি বালা, ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

সুভাষ রুদ্র বলেন, বার্মিজ সেনারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর হামলা করলে কিংবা কোনো সময় নির্যাতন করলে দ্বিতীয় পর্যায়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করতো রোহিঙ্গা জঙ্গিরা। এর আগে হামলা করলেও রোহিঙ্গা মুসলিম জঙ্গিরা হিন্দুদের ওপর

চড়াও হয়েছে মূলত ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে। ওই দিন কালো মুখোশধারী এক দল আমার ছোট ভাই সুশীল রুদ্রকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে। তারপর আমার উপরও হামলা চালিয়ে আহত করে আমাকে পরিবারসহ অন্যত্র চলে যেতে বলে। জঙ্গিরা চলে যাবার পর আমি প্রাণে বাঁচতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হলাম। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের কারণে হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে গেছে।

৩. **বলরাম পাল (৬০),** পিতার নাম ঃ মহেন্দ্র শিং মৃত, মাতার নাম ঃ গেন বালা, দাদার নাম ঃ মৃত. শুরত, স্ত্রীর নাম ঃ সর বালা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

বলরাম পাল বলেন, আমি রাখাইনের মংডুর চিকনছড়ির বাসিন্দা। রোহিঙ্গাদের উপর বার্মিজ গুলাগুলির পরে হিন্দু এলাকায় হামলা করে জঙ্গিরা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাখাইনের অলিগলি মানুষের আহাজারি হাহাকার শুনতে পাচ্ছিলাম। যার যেদিকে চোখ যায় সেদিকে দৌঁড়াতে থাকি। জঙ্গিগোষ্ঠী হিন্দুদের ঘরবাড়ি ঘেরাও করে অত্যাচার চালায়। শিশু ও মহিলাদেরকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেল। পুরুষদের ধরে নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় আটকে রাখে। আমরা হিন্দুরা জুলুমের শিকার হয়েছি। জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা হিন্দুদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করে। মুসলমানদের নাগরিকত্ব না দিয়ে হিন্দুদের দেওয়ায় রোহিঙ্গা জঙ্গিরা আমাদের উপর চড়াও হয়। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট ঘটনার দিন কালো মুখোশধারী এক ব্যক্তি আমার কাকাকে হত্যা করে। আমার উপরও হামলা করেছিল তারা। ভয়ভীতি দেখিয়ে আমাদের অন্যত্র চলে যেতে বলায় প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি বাংলাদেশে।

মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। এর মধ্যে 'প্রকৃত নাগরিক' ও 'গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসী'দের গ্রিনকার্ড দেওয়া হয়। এছাড়া রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সরকার আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্ব প্রদান করেছিল। রোহিঙ্গা মুসলিমদের আমাদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে তারা। মুসলিম রোহিঙ্গারা মগদের মতো প্রথম শ্রেণির (প্রকৃত নাগরিক) নাগরিকত্বের দাবি করে আসছিল।

৪. **জগদীশ পাল (২২),** পিতার নাম ঃ রবীন্দ্র পাল, মাতার নাম ঃ তুলসী বালা পাল, দাদার নাম ঃ বিভূতি পাল, ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

জগদীশ পাল বলেন, আরাকানে থাকাকালীন আমার ব্যক্তিগত পাসপোর্ট ছিল না। একটা আইডি কার্ড ছিল। আমি একবার ভোট দিয়েছিলাম নির্বাচনের সময়। আমি অন সাং সূচির দলকে সমর্থন করতাম। ওনার দলকেই ভোট দিয়েছিলাম। আমার বাপ দাদারা নির্বাচন আসলে ভোট দিতেন। আমার বাবাও অন সাং সূচির দলকে ভোট দিতেন এবং সাপোর্ট করতেন। আমি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস

করার পর আর পড়ালেখা করিনি। বাবার সাথে নিজেদের জমিতে কৃষি কাজে নিয়োজিত হই।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা জঙ্গিরা কালো মুখোশপরা অবস্থায় আমাদের চিকনছড়ি গ্রামে হামলা করে। হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেয়। জঙ্গিরা কয়েকজন হিন্দু মহিলাকে ধরে নিয়ে যায়। সেইসব মহিলাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মুসলিম জঙ্গিরা হামলার সময় অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছিল। হিন্দুদের উপর নির্যাতন এবারই প্রথম নয়। রাখাইনে কোন সমস্যা দেখা দিলে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা হিন্দুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের কারণে রাখাইনে আমরা অশান্তির মধ্যে বসবাস করছি। জঙ্গিরা যতদিন তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড বন্ধ করবেনা,ততদিন রাখাইনে শান্তি আসবে বলে মনে হয় না। হিন্দুরা বারবার জঙ্গিদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে।হিন্দুদের উপর জঙ্গিগোষ্ঠীর আক্রোশ দিনদিন বাড়ছে।

৫. **বসুরাম রুদ্র (২৮)**, পিতার নাম ঃ মহন রার রুদ্র, মাতার নাম ঃ সোনা বালা রুদ্র, দাদার নাম ঃ মৃত. বলরাম রুদ্র, স্ত্রীর নাম ঃ বুদু বালা রুদ্র। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রামঃ চিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

বসুরাম রুদ্র বলেন, আমি রাখাইনের মংডুর খা মং সেইক গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট সকাল আটটার দিকে রাখাইনের মংডুর উত্তরাঞ্চলের আহ নুক খা মং সেইক গ্রামে হিন্দুদের ওপর চড়াও হয় রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিনের সদস্যরা। কালো পোশাকপরা সশস্ত্র জঙ্গিদের সঙ্গে স্থানীয় রোহিঙ্গা মুসলিম গ্রামবাসী মিলে হিন্দু নারী, পুরুষ ও শিশুদের ঘিরে ফেলে। ওইসব লোকজন বাড়িঘর লুটের পর তারা ৫৩ জন হিন্দুকে চোখ বেঁধে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে জঙ্গিরা হিন্দু নারী, পুরুষ ও শিশুদের আলাদা করে ফেলে। সাত ঘন্টা নির্যাতনের পর প্রথমে পুরুষদের হত্যা করা হয়। জঙ্গিরা আট হিন্দু নারী ও আট শিশু সন্তানকে তুলে নিয়ে যায়। পরে জঙ্গিরা জোরপূর্বক হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মে 'ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা হয়। হিন্দুদের উপর রোহিঙ্গা জঙ্গিদের নির্মম নির্যাতন ও গণহত্যার কথা বলতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। সেইদিনের ভয়াবহতা ছিল বর্ণনার বাইরে।

রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে অস্ত্র, ছুরি ও বড় বড় রড ছিল। তারা হিন্দুদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখত। চোখ বেঁধে রাখত। জঙ্গিরা আমার ঘরবাড়িতে লুটপাট চালায়। ঘরে যা কিছু ছিল সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমার কাকা বিজয় রুদ্রকে জঙ্গিরা হত্যা করে। আমার কাকার মৃতদেহও খুঁজে পাইনি। জঙ্গিরা যখন আমাদের বাড়িঘর ঘেরাও করে তখন আমি পাশের বাজারে গিয়েছিলাম। বাজার থেকে আসার পথে খবর পেলাম আমাদের গ্রামে জঙ্গিরা প্রবেশ করে হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। রোহিঙ্গা জঙ্গি গোষ্ঠী হিন্দুদের উপর আক্রমণ করেছে কয়েকবার। ২০১২ সালের দাঙ্গার সময় আমাদের এলাকায় কয়েকশ' জঙ্গি দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের উপর হামলা করে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের সময়ও জঙ্গিরা হিন্দু নারী পুরুষের উপর বর্বর হামলা ও গণহত্যা চালায়। জঙ্গিদের নির্যাতন নিপীড়ন থেকে বাঁচতে আমি আমার

পরিবারের সাথে বাংলাদেশে চলে আসলাম। বর্তমান উখিয়া রোহিঙ্গা হিন্দু শর্ণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছি।

৬. **তরুণ রুদ্র (৩৩)**, পিতার নাম ঃ মোহিত চন্দ্র, মাতার নাম ঃ মনি বালা, দাদার নামঃ রাম কুমার, স্ত্রীর নাম ঃ কল্পনা বালা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানাঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

তরুণ রুদ্র বলেন, আমি রাখাইনের মংডুর আহ নুক খা মং সেইক গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট সকালের দিকে হঠাৎ দেখি অস্ত্র নিয়ে একদল লোক আমাদের গ্রামে হিন্দুদের ওপর এলোপাতাড়ি পিটাইতে শুরু করে। পরে জানতে পারলাম ওরা জঙ্গি গ্রুপের সদস্য। এসব সশস্ত্র জঙ্গিদের সঙ্গে কিছু মুসলিম একজোট হয়ে হিন্দু নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে আক্রমণ করে। আমি প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। জঙ্গি সদস্যরা আমার বাবা মায়ের উপর হামলা করে। আমার বাড়ির আরও কয়েকজনকে আহত করে।

জঙ্গিরা আট হিন্দু নারী ও আট শিশু সন্তানকে তুলে নিয়ে যায়। পরে জঙ্গিরা মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায়। জঙ্গিরা আমার ঘরে হামলা চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে চলে যায়। আমার বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে আহত করে। রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে বার্মিজ ধারারো ছুরি ও আধুনিক অস্ত্র দেখতে পেয়েছি। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের হাতে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মংডুর চিকনছড়িতে আমার এক আত্নীয়ের বাসাতে জঙ্গিরা হামলা করে ৩ জনকে খুন করে। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিনের একজন ভয়ংকর জঙ্গি তার নাম আতাউল্লাহ জুনুনী। সেই জঙ্গি নেতা জুনুনীর নেতৃত্বে আমাদের গ্রামে হামলা ও লুটপাট করা হয়েছে। জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিনের সদস্যরা হামলা করার আগেও আরেকবার ২০১২ সালে আমাদের গ্রামে ভয়াবহ হামলা চালায়। সেইসময় আমার ঘরের জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছিল। এলাকার প্রতিটি হিন্দুদের ঘর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। জঙ্গিরা বারবার হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালায়।

৭. **চিত্তরঞ্জন পাল (৫৫),** পিতার নাম ঃ তেজেন্দ্র পাল, মাতার নাম ঃ কুসুমবালা, দাদার নাম ঃ জগবন্ধু পাল, স্ত্রী নাম ঃ মিংগৃ বালা। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

চিত্তরঞ্জন পাল বলেন, আমি রাখাইন রাজ্যের মংডুর চিকনছড়ি গ্রামের একজন বাসিন্দা। আমার জন্ম মিয়ানমারে। সেইসূত্রে আমি মিয়ানমারের নাগরিক। ২০১২ ও ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাথে বার্মিজদের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে। ২৫ আগস্ট সকালবেলা একদল কালো মুখোশপরা জঙ্গিরা হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ করে। জঙ্গিরা চিকনছড়ি গ্রামে দলবদ্ধভাবে হামলা করে। হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে পেট্রোল দিয়ে আগুন

জ্বালিয়ে দেয়। আমার ঘরে আগুন লেগে আসবাবপত্র পুড়ে যায়। জঙ্গিরা হিন্দু যুবকদের টার্গেট করে আক্রমণ করে। ওদের হামলা থেকে বাঁচতে নারী পুরুষ দৌঁড়ানো শুরু করে। আমাকে জঙ্গিরা আঘাত করলে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কখন কিভাবে হুঁশ ফিরছে আমার জানা ছিল না। জঙ্গিরা হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছিল বলে বলাবলি করতে শুনেছি। জঙ্গিরা মালাউন বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছিল হামলার সময়। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে সীতারানীকে জঙ্গিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে মেয়েটা জোরপূর্বক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। মুসলিম জঙ্গিরা হিন্দুদের উপর সেইদিন যেভাবে আক্রমণ করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। হিন্দুদের উপর জঙ্গিদের হামলা বন্ধ না করলে আমরা রাখাইনে টিকে থাকতে পারব না। আমার জীবনে এরকম অত্যাচার নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ দেখিনি। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের কারণে রাখাইনে অশান্তি আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে।

৮. **মধুরাম পাল (৩০),** পিতার নাম ঃ গুরুধন পাল, মাতার নাম ঃ বীনা বালা পাল, দাদার নাম ঃ তেজন্দ্র পাল, স্ত্রীর নাম ঃ হরিয়া বালা পাল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ চিকনছড়ি, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

মধুরাম পাল বলেন, আমি রাখাইন রাজ্যের মংডুর চিকনছড়ির একজন বাসিন্দা। আমার জন্ম মিয়ানমারে। আমার বাপ-দাদা যুগযুগ ধরে রাখাইনে বসবাস করে আসছেন। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা জঙ্গি আর বার্মিজ সেনাদের মাঝে গোলাগুলি ও হাঙ্গামা শুরু হলে রাখাইনের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠে। ৩৫ আগস্ট সকালবেলা একদল কালো মুখোশপরা জঙ্গি আমাদের মহল্লায় আক্রমণ করে। জঙ্গিরা চিকনছড়ি গ্রামে দলবদ্ধভাবে হামলা করে। হিন্দুদের বাড়িঘরে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমাদের ঘরবাড়ি আগুনে জ্বলে পুড়ে তছনছ হয়ে যায়। জঙ্গিরা হিন্দু যুবকদের এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ওদের হামলা থেকে বাঁচতে আমরা যেদিকে পারি পালাতে থাকি। জঙ্গিরা হিন্দু যুবকদের উপর বেশি নির্যাতন চালায়। ওরা কয়েকজন হিন্দু মহিলাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। পরে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সেইসব মহিলাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। জঙ্গিরা বাড়ি-ঘরে হামলার সময় খুবই খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। হিন্দু যুবকদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করে ওরা থামেনি। কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমার মামাকে গুলি করে হত্যা করে। আমার মামীকে আহত করে। আমার পরিবারের মধ্যে বড় ভাইকে ধারালো ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত করে। পরে বাংলাদেশের আসার পর চিকিৎসা করে সুস্থ হয়েছে। রোহিঙ্গা জঙ্গিরা হিন্দু মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে। কিছু মহিলাকে জোর করে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

৯. **বিজয় রাম পাল (৩৫),** পিতার নাম ঃ সাধন পাল, মাতার নাম ঃ জোছনা বালা পাল, দাদার নাম ঃ তেজেন্দ্র পাল, স্ত্রীর নাম ঃ গের্নদা পাল। ঠিকানা ঃ পাড়া/গ্রাম ঃ উঠিং শেরোয়া, থানা ঃ মংডু, জেলা ঃ আকিয়াব, রাজ্য ঃ আরাকান।

বিজয় রাম পাল, আমি রাখাইনের মংডুর শেরোয়ার বাসিন্দা। আমি মিয়ানমারের নাগরিক। আমি হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ২০১২ সালে বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের সামপ্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দুদের উপর রোহিঙ্গা জঙ্গিরা কয়েকবার বর্বর হামলা করে। হামলার সময় হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। অনেক পরিবারকে বাস্তহারা করে রোহিঙ্গা জঙ্গি ও কিছু মুসলিম। ২০১২ সালের মারামারি করে হিন্দু যুবকদের এলাকা ছাড়া করে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের দলে যোগদান করেনি বলে হিন্দুদের উপর বারবার আক্রমণ করে জঙ্গিরা। জঙ্গি সংগঠনে ভিড়তে হিন্দু যুবকদেরকে বহু জোরাজুরি করার পরও যখন কোন কাউকে পাচ্ছে না তখন নিপীড়নের মাত্রা বাড়তে থাকে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট পুরো রাখাইন জুড়ে বার্মিজ সৈন্য আর জঙ্গিদের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হলে হিন্দু জনগোষ্ঠী বেকায়দায় পড়ে যায়। হিন্দুদের উপর জঙ্গিদের ক্রোধ বেশি। যখনই বার্মিজ সেনা অথবা বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের কোন ঝামেলা হয় তখনই হিন্দুদের উপর স্টিমরোলার চালায়।

জঙ্গিরা যখন হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে তখন প্রাণ বাঁচাতে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হলাম। রোহিঙ্গা জঙ্গি সংগঠন হারাকাহ ইয়াকিনের নেতা জঙ্গি আতাউল্লাহ একজন সৌদি নাগরিক। সৌদি আরব থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখাইনে এসে বার্মার সেনা ক্যাম্পে হামলা করে হত্যাকান্ড ঘটায়। এসব জঙ্গিদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে মুসলমান যেমন বারবার মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসছে, একইভাবে হিন্দুরাও দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। জঙ্গিদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে জঙ্গি দমন করতে হবে। জঙ্গিরা যখন হামলা করে তখন সবাই কালো মুখোশপরা অবস্থায় থাকে। কালো মুখোশধারী জঙ্গিরা মানুষের নামে কলংক। ওরা মানুষকে খুন করতে কোন দ্বিধা করে না।

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিদের জিহাদ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিদের জিহাদ

বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী জঙ্গিরা এখন অনলাইনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে অনলাইনে জঙ্গি কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে গত কয়েকবছর থেকে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশান হলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলাকারী জঙ্গিরা নিজেরা যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাকির নায়েকের মতো উগ্র প্রচারকদের জিহাদি প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক জিহাদি বলয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, একইভাবে নিজেরাও প্রচারের জন্য এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। গুলশানের হামলার পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান ও তীক্ষ্ণ নজরদারির কারণে বাংলাদেশের জঙ্গিরা এখন কৌশল বদলে 'সাইবার জিহাদ' সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক ব্লগার মারুফ রসুল চলমান সাইবার জিহাদ সম্পর্কে নির্মূল কমিটির মুখপত্র জাগরণ-এ লিখেছেন– 'ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো গত কয়েক বছরে তাদের অপকর্মের পদ্ধতি যে পরিবর্তন করেছে সে বিষয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ একমত। ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের উগ্রবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর তৎপরতার কারণে তার অনেকটাই এখন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এ হলো দৃশ্যত পরিসংখ্যান– অন্তত গত কয়েক বছরের বিবেচনায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম থেমে গেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজের ধরন পরিবর্তনের কারণে উগ্রবাদী এই গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি এখন সাইবার জগতে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপি চলমান কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সাইবার জগতে মানুষের উপস্থিতি ও নির্ভরশীলতা আগের চেয়ে বেড়েছে এবং একই সঙ্গে বেড়েছে জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতাও। এই চিত্র যে কেবল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান, তা নয়; বরং গোটা পৃথিবীতেই জঙ্গিবাদী কার্যক্রম এখন সাইবার জিহাদে পরিণত হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক গবেষণায় 'সাইবার জিহাদ'কে 'সাইবার সন্ত্রাস'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাইবার সন্ত্রাসের অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে। আমরা বাংলাদেশের বিবেচনায় যে সংজ্ঞায়নটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি, তার সারার্থ হলো– এটি তথ্যের বিরুদ্ধে তথ্যের একটি 'রাজনৈতিক মতাদর্শ-প্রসূত' আক্রমণ, যার লক্ষ্য কোনো একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের (রাজনৈতিক ও ধর্মীয়) সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা জনগণ।

'বাংলাদেশের সাইবার জগতে উগ্রবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা বিশ্লেষণ করলে আমরা তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাই, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– 'জনমত প্রতিষ্ঠা'। আরও একটু বিস্তারিত বললে যেটা হয়, সাইবার জগতকে ব্যবহার করে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো যতোটা না সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার চেয়ে বেশি

তাদের এই বিষয়ে জনমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে বা কোনো একটি সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনার পটভূমি তৈরির চেষ্টা করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সাইবার জগতকে তারা ব্যবহার করে না। কখনো কখনো দুটো কাজ একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি–

এক: সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ–

২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ব্লগার ও বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায়কে নির্মমভাবে হত্যার হুমকি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং হত্যা-পরবর্তী সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়ায় উগ্রবাদীরা সাইবার জগতকে ব্যবহার করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্লগার ফারাবী নিজেও ব্লগিং ও অনলাইন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উগ্রমত ছড়িয়ে দিতো এবং অভিজিৎ রায়সহ অন্যান্য মুক্তচিন্তার ব্লগারদের তালিকা জঙ্গিগোষ্ঠীর কাছে সরবরাহের কাজ করতো। এক্ষেত্রে তার তথ্যের সূত্রও থাকতো সাইবার জগৎ।

দুই: সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট বা তার পক্ষে জনমত তৈরি–

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের রামুতে যে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য সাইবার জগতকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘটনাটি বাংলাদেশের সাইবার জিহাদের প্রকৃতি বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর (৩০ অক্টোবর ২০১৬), রংপুরের গঙ্গাচড়া (১০ নভেম্বর ২০১৭), ভোলার বোরহানউদ্দীন (১৯ অক্টোবর ২০১৯) বা ২০২১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালানো হয়েছে– তার সব ক'টির প্রক্রিয়া একই ধরনের। ফেসবুককে ব্যবহার করা হয়েছে 'ধর্মীয় উস্কানি' তৈরিতে এবং পরবর্তীকালে 'এই আক্রমণ কেন যৌক্তিক' সে বিষয়ে জনমত তৈরির চেষ্টা চলেছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের ধর্মীয় সংবেদনশীলতা' ব্যবহার করে। তাতে জঙ্গিগোষ্ঠী সফলও হয়েছে, কারণ প্রতিটি ঘটনাতেই একজন নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা সনাতন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; এবং তারা 'ফেসবুক কী' সেটা না জানলেও তাদের জামিন হতে অনেক সময় লেগেছে। এটা ঘটেছে সেই জনমতের কারণেই, যেটা সাইবার জগতকে ব্যবহার করে তৈরি করেছিল জঙ্গি সন্ত্রাসীরা। কারণ কোনো ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কাউকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি।

এ বিষয়ক আরেকটি উদাহরণ হলো, ২০১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ব্লগার ও স্থপতি রাজীব হায়দারকে হত্যার ঘটনা। জঙ্গিগোষ্ঠী রাজীবকে হত্যার পরপরই তার নামে নূরানীচাপাসমগ্র নামে একটি ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে রাজীব হায়দারের নাম দিয়ে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছিল, যাতে সমাজে তার হত্যাকাণ্ড জায়েজ বা 'ব্লগার মানেই নাস্তিক' এই ধরনের জনমনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, সে সময়ে এ নিয়ে বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও জনমতের হেরফের হয়নি।

বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের উদ্দেশ্য মূলত দুটি– মুখ্য উদ্দেশ্য: জনমনস্তত্ত্ব তৈরি এবং গৌণ উদ্দেশ্য: সাংগঠনিক বিস্তার।

মুখ্য উদ্দেশ্য: জনমনস্তত্ত্ব তৈরি– জনমনস্তত্ত্বকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ জাতিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক। এর মানে এই নয় যে, সকলেই সমানভাবে অসাম্প্রদায়িকতা ধারণ করেন কিন্তু বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এমনভাবে সহাবস্থানের সহমর্মিতা বিরাজমান যে, এটি তার সামাজিক কাঠামোর অংশ হয়ে গেছে। ফলে যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও (সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক) একটি সহমর্মিতার সামাজিক বলয়ে সে থাকে। ফলে তার জনমনস্তত্ত্ব স্বার্থের কারণে ধর্মান্ধতা বা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দিলেও আবার স্বার্থের কারণেই তাকে সহমর্মী হতে হয়। এ কারণেই বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে আমরা দেখি– কোনো ধর্মভিত্তিক দল এককভাবে উল্লেখ করার মতো আসন পায় না। অথচ সে ধর্ম এবং টাকা– দুটোকেই সমানভাবে নির্বাচনে ব্যবহার করে। আবার কোনো জঙ্গিগোষ্ঠীর বিষয়ে জনগণ কোনো আবেগ অনুভব করে না। সরকার ও আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী যখন জঙ্গিবাদের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে, তখন জনগণ সাধুবাদ জানায়। আচারে-বিশ্বাসে ধর্মপ্রাণ মুসলমানও এ বিষয়ে বলেন বা লেখেন যে, ইসলামও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না। তিনি ইসলামের আলোকে জঙ্গিবাদের নেতিবাচকতা তুলে ধরেন। এই জনমনস্তত্ত্বের জেনেটিক কোড বদলের উদ্দেশ্যটাই বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। কারণ বাংলাদেশের জনমানস সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং রাজনীতির বিষয়ে সে তীব্রভাবে সাড়া দেয়। সুতরাং জঙ্গিগোষ্ঠী বুঝে গেছে, জঙ্গি তৎপরতাকে রাজনৈতিক মোড়কে নেয়া না হলে, তা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই মাঝে মাঝে মতামতের আড়ালে 'বাংলাদেশের প্রশাসনে কতো শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী রয়েছেন' বা 'বিপুল সংখ্যক ভারতীয়রা বাংলাদেশে উচ্চ বেতনে চাকুরি করছেন' বা 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য' ইত্যাদি উদ্ভট বক্তব্য সাইবার জিহাদের অংশ হয়ে ওঠে– যাকে আমরা গুজব বা 'ফেক নিউজ' বলি।

বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশে সাইবার জিহাদ সংঘটিত হয়ে থাকে তা বয়ানের আগে বলা প্রয়োজন– সাইবার জিহাদের প্রক্রিয়া নির্ধারণে ডার্ক ওয়েব ও এই সংক্রান্ত ওভারলে নেটওয়ার্কভিত্তিক আলোচনা আমরা এখানে করছি না। কারণ, এই সংক্রান্ত অনুসন্ধান নিশ্চয়ই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা করে থাকে বা করছে। ফলে তাদের গোপনীয়তার প্রসঙ্গ এখানে যেমন জরুরি, তেমনি ডার্ক ওয়েবভিত্তিক সাইটগুলোর আলোচনা কোনো পাবলিক ধারণাপত্রে থাকা উচিৎ নয়। এতে অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। তবে এইটুকু তথ্য জানা প্রয়োজন যে, আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডার্ক ওয়েব প্রজেক্টের তথ্য মতে, বর্তমান পৃথিবীতে ডার্ক ওয়েবভিত্তিক জিহাদি ওয়েবসাইটের সংখ্যা কম-বেশি ৫০ হাজার। বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্টরা গবেষণা করবেন, কেননা এই সাইটগুলো একসেস করলেই বোঝা যায় জঙ্গিগোষ্ঠীর সাইবার নেটওয়ার্ক ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই বক্তব্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও সত্য।

প্রকাশ্যে বা প্রচলিত অনলাইন প্লাটফর্মে সাইবার জিহাদের যে প্রক্রিয়াটি আমরা দেখতে পাই, তা নিম্নরূপ–

১. ধর্মীয় সংবেদনশীলতার রাজনীতিকরণ

জঙ্গিগোষ্ঠীও বোঝে– রাজনৈতিক মোড়ক না থাকলে সাধারণ জনগণ ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্নে সাধারণত সাড়া দেন না বা দিতে দেরি করেন, ব্যতিক্রমও আছে। এর উদাহরণ হচ্ছে– বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাৎসরিক জলসাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। সংবিধান মতে, যে কোনো নাগরিকের তার ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে কোনো কর্মসূচিকে ঘিরে জঙ্গিগোষ্ঠী একটি রাজনৈতিক বক্তব্য দাঁড় করায়– যার সঙ্গে প্রশাসন, সরকার এমনকি বিচারব্যবস্থাও জড়িত। ফলে প্রশাসন অনেক সময় পিছপা হয়, কখনও কখনও জঙ্গিদের ছড়ানো ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তও হয়। আদতে জয়ী হয় জঙ্গিদের পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সুবিধাটি হচ্ছে, একে তো খুব সহজেই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলের (যেমন: জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি, এবি পার্টি ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করে অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে (যেমন: আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্যান্য বামধারার সংগঠন) তাদের স্থানীয় নেতারাও বিভ্রান্ত হয়ে জঙ্গিদের ফাঁদে পা দেয়। দুর্গা পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা বা বড়দিনের উৎসবের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে। আযানের সময় কীর্তন বন্ধ রাখতে হবে– এমন ফতোয়া এখন আর জঙ্গিভাবাদর্শের কাঠমোল্লাদের দিতে হয় না, সরকারি প্রশাসনই দেয়, কিন্তু একবারও ভাবে না সনাতন ধর্মের বিধানের কোনো কোনো ব্রতে কীর্তন বন্ধ করার নিয়ম নেই। দুর্গা পুজায় মাইকের ব্যবহার নিয়ে হঠাৎ শরৎকালে উদগ্রীব হয়ে উঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী কিন্তু রমজান মাসে সেহেরীর সময় অযাচিত মসজিদের মাইকের ব্যবহার নিয়ে তারা চিন্তিত নন। এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না এমনকি তুললে প্রশ্ন-উত্থাপনকারীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্মম মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে। কারণ, রাজনৈতিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, এদেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' এবং সেটা 'ক্ষমতার ইসলাম'।

২. রাজনৈতিক প্রপঞ্চের ধর্মীয় লেবাস

প্রথমটির উল্টো পদ্ধতি এটি। যে কোনো একটি রাজনৈতিক বিষয়কে জঙ্গিগোষ্ঠী সাইবার মাধ্যমে একটি ধর্মীয় লেবাস পরিয়ে দেয়। তখন আর ব্যাপারটি রাজনৈতিক থাকে না, হয়ে ওঠে ধর্মীয় ইস্যু। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর। রাজনৈতিকভাবে এ বিষয়ে যে কারও দ্বিমত থাকতে পারে। তার প্রতিবাদও হতে পারে কিন্তু বিষয়টি যেহেতু ভারত সেহেতু তাতে ধর্মীয় রঙ লাগানোটা সহজ এবং সেটাই ঘটেছে। নরেন্দ্র মোদি বা

বিজেপির হিন্দুত্ববাদী সংকীর্ণ রাজনীতির আলোচনা বা প্রতিবাদ কিন্তু হয়নি, হয়েছে দেশব্যাপী হেফাজতে ইসলামের নারকীয় সন্ত্রাস। এই পদ্ধতি ব্যবহারে জঙ্গিগোষ্ঠী আরেকটি সুবিধা পায়; তা হলো, অনেকটা অপ্রকাশ্যে থেকেই সে যা চায় তা ঘটিয়ে নিতে পারে। যেমন- ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন বিষয়ক প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন বামপন্থীরা কিন্তু হেফাজত তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সারা দেশে সন্ত্রাস চালালো। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে সাইবার জগতে জঙ্গিগোষ্ঠী কিছু রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে এমন কিছু পক্ষের সমর্থন পায়, যা বিস্ময়কর। ফলে ভারতবিরোধিতার রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণটিই মুখ্য। এটা না বুঝে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যখন ভারতবিরোধিতা করেন তখন আদতে লাভবান হয় জঙ্গিগোষ্ঠী। ইসরাইল-ফিলিস্তিনী ইস্যুতেও তাই। স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীর লেখা প্যালেস্টাইনপ্রীতির সৎ কলামটিই সাইবার জগতে 'ইহুদিবাদ নিপাত যাক' ফেস্টুনে পরিণত হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে রূপান্তর। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো মূলধারার গণমাধ্যমের বিষয়কে সাইবার জগতে বিদ্বেষমূলক ভাবাদর্শরূপে প্রচার করে। এই পদ্ধতি অনেকটা পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক। রাজনীতিও অনেক সময় এই পদ্ধতি থেকে সুবিধা আদায় করে। তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে এটুকু বলা যায়– আমাদের পাহাড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর যে নির্যাতন চালানো হয় তার বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক লড়াইকে দুর্বল করতেই ধর্মীয় লেবাসটি পরানো হয়।

৩. ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চরিত্রহনন

বর্তমান বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে, এটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চরিত্রহনন। এতে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো জনমনস্তত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষমূলক চরিত্র নির্মাণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে, তা সবচেয়ে সফলভাবে করা যায়। এখানেও সে আসলে পর্দার আড়ালেই থাকে। বক্তব্যটি তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত তার কাজ, বাকিটা সাধারণ জনগণই বুঝে না-বুঝে করে থাকে।

বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তার মানুষদের হত্যার মধ্য দিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠী আঁচ করতে পেরেছে যে, হত্যার মাধ্যমে ব্যক্তিকে শেষ করা গেলেও আদর্শ শেষ করা যায় না। ফলে তাদের নতুন পদ্ধতি হচ্ছে সমাজে ভূমিকা রাখতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ভুল-মিথ্যা তথ্য ছড়ানো। এতে সমাজের কাছে সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় কারণ সমাজ তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগুচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ষাটের দশকের একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের চরিত্র হনন করা হয় তবে মিলিনিয়াম জেনারেশনের বৃহৎ অংশের কাছে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না– সেই জেনারেশন ইতিহাস সচেতন হলেও থাকে না। সে তখন ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে 'সুবিধাবাদী', 'আপোসকামী' ইত্যাদি নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষায়িত করে।

সাইবার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে প্রায় এক দশক ধরে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করা হয়েছে। একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, ছায়ানট, উদীচী, খেলাঘর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, জাতীয় কবিতা পরিষদ, গ্রাম থিয়েটার ফেডারেশন, প্রজন্ম '৭১ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগুলো সম্পর্কে দেশব্যাপী ভুল প্রচারণা চালানো হয়েছে সাইবার জগতে। এই মিথ্য প্রচারণাগুলো তৈরি করে জঙ্গিগোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতারা কিন্তু বিতরণ করে সাধারণ মানুষ– যাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক রেষারেষি থাকতে পারে বা অনেকক্ষেত্রে না জেনেই অনেকে এগুলো শেয়ার করেন।

বাংলাদেশে সাইবার জিহাদের ক্ষেত্র

সাইবার জিহাদের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি বর্তমানে ফেসবুকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের পেইজ এবং তাদের শেয়ার করা সংবাদের লিংক। ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ, বিভিন্ন অ্যাপসভিত্তিক গোপন চ্যাটরুম বা অন্যান্য মাধ্যমও কাজ করছে কিন্তু সেগুলো আমাদের আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী খুঁজে বের করেছেন বা সেগুলো নিয়ে কাজ করছেন। ফলে ওই পদ্ধতির চেয়ে প্রকাশ্য পদ্ধতিতেই বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো কাজ করছে। এতে তার সুবিধা হচ্ছে দুটো–

১) যে কোনো বিষয়, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা সম্পর্কে জঙ্গিগোষ্ঠী তাদের মত প্রতিষ্ঠা করে ফেলছে খুব দ্রুত এবং ২) এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের পাবলিক পারসেপশন তৈরি হচ্ছে, যার ফলে একজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষও প্রভাবিত হচ্ছেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– ২০২১ সালের ২২ জুন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হবার প্রকাশিত খবরের নিচে যে মন্তব্যগুলো এসেছিল, তা বিশ্লেষণ করলে মোটা দাগে পাঁচটি বিষয় দাঁড়ায়–

- গান গাওয়া হারাম এবং রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি।
- হামদ-নাত গাইলে কোভিডে আক্রান্ত হতেন না।
- কোনো মুসলমানের কোভিড হয় না।
- নারী শয়তানের রক্ত থেকে সৃষ্টি, তাই তাদের কোভিড হওয়া উচিৎ।
- রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাও হিন্দু এবং ভারতের নাগরিক।

'এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম ও পাঁচ নম্বর ধারণা জঙ্গিবাদী প্রকল্পের অর্থাৎ জনমনস্তত্ত্বে এই দুটি ধারণা বদ্ধমূল করে ফেলতে পারলে রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য ভাঙলে বা তাঁর বই পোড়ালে কেউ কিছু বলবে না এবং শ্রদ্ধেয় শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নিরাপত্তা বিঘ্ন হতে পারে– এমন কোনো উদ্যোগ নিলেও একজন শিল্পী জীবনের প্রশ্নে জনগণ প্রতিবাদী হবে না। দুই, তিন ও চার নম্বর বক্তব্যগুলো হচ্ছে– ওয়াজের দর্শক-শ্রোতাদের মনস্তত্ত্ব। এতে জঙ্গিবাদের ফায়দা হলো সরকার যে মাঝেমধ্যে ওয়াজ বা খুতবার মাধ্যমে জঙ্গিবাদবিরোধী ক্যাম্পেইন করে, সেটা হালে পানি পায় না। কারণ প্রকৃত ইসলাম যিনি জানেন, তিনি তো এসব আহাম্মকি কথা বলবেন না। আবার এসব

কুরুচিপূর্ণ আহাম্মকি কথা না বললে ওয়াজের দর্শকও হবে না, যেহেতু দর্শক বা শ্রোতা ইতোমধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। সে মনেই করে নারী বা ভিন্ন ধর্মের অবমাননা না করলে ওয়াজ জমে না। এ কারণেই বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যে সব ওয়াজবাদীরা (সাঈদী থেকে আজাহারী) পরিচিতি পেয়েছে, সকলেই তাদের ওয়াজে ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত এবং নারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে।

'গণমাধ্যমের ফেসবুক পেইজ বা ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট সেকশনে কাজ করা জঙ্গিদের পক্ষে অনেক নিরাপদ। কারণ, ফেসবুকে আইডি খুলতে হলে মোবাইল নম্বর ছাড়া আর কিছুই লাগে না। এই কাজটি সে করে ভুয়া একাউন্টের মাধ্যমে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সর্বোচ্চ পাঁচটি মোবাইল সিম বৈধভাবে কেনা যায়। এবার কথাটিকে এভাবেও বলা যায়, বাংলাদেশে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচটি ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া যে কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেহেতু ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বর সহজে কাউকে দেয় না (যদি বিক্রি না করে), সেহেতু প্রাথমিকভাবে তাকে ধরে ফেলার সুযোগ কম।

'উপরোক্ত উদাহরণের (শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সংবাদটি) ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধান হচ্ছে, ছয়টি গণমাধ্যমের (২টি পত্রিকা, ২টি অনলাইন গণমাধ্যম ও ২টি টেলিভিশন চ্যানেল) ফেসবুক পেইজে সংশ্লিষ্ট সংবাদটির নিচে মোট ১৬'শ নেতিবাচক মন্তব্য দেখা গিয়েছে, যাদের বক্তব্যের বিষয় এক হলেও ভাষা ও প্রকাশ আলাদা। তারপর আমরা এই মন্তব্যকারীদের প্রোফাইলগুলো দেখতে থাকি। ৪৮৯টি প্রোফাইল লক করা। ১ হাজারেরও বেশি প্রোফাইল হলো ফেইক অর্থাৎ ভুয়া একাউন্ট। তাদের একাউন্টগুলো পুরোনো কিন্তু টাইমলাইনে কোনো তথ্য নেই। মানুষের ছবি যেসব প্রোফাইলে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো তাদের নিজের ছবি নয়; কারণ ২০টি একাউন্টের প্রোফাইলের ছবি গুগল ইমেজে সার্চ দিয়ে দেখা যায়, এগুলো অনলাইনের নানা ডেটিং সাইট বা অন্য কারও ফেসবুক প্রোফাইল থেকে নেওয়া। বাকি ১০১টি প্রোফাইল ভুয়া না প্রকৃত, সে ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। কিছু কিছু প্রোফাইল অবশ্যই প্রকৃত, কারণ তাদের টাইমলাইন দেখলেই বোঝা যায়, তারা সাম্প্রদায়িক ও নারী-বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে। যে ১৬শ' মন্তব্যের হিসেব আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানে এই ১০১টি প্রোফাইল থেকেই বিভিন্ন মিডিয়ার ফেসবুক পেইজে বারংবার জঘন্য মন্তব্যগুলো করা হয়েছে। একই আইডি একাত্তর, প্রথম আলো, সময়, বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম বা অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোর পেইজে সংশ্লিষ্ট সংবাদের নিচে একই মন্তব্য কপি-পেস্ট করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সংবাদমাধ্যমের ফেসবুক পেইজের বিভিন্ন সংবাদ লিংকের নিচে একটি একাউন্ট থেকেই সর্বোচ্চ ২৩টি মন্তব্য করা হয়েছে।

'এখন এই ভুয়া একাউন্টগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হলে একদিকে সরকারকে আইনি পদক্ষেপ চালাতে হবে অর্থাৎ আইডির পিছনের লোকগুলো খুঁজে বের করতে হবে অন্যদিকে ফেসবুকের সঙ্গে দেন-দরবার করতে হবে। প্রথম কাজটি আমরা খুব সহজেই করতে পারি কারণ ফেসবুকে বিভ্রান্তি, গুজব, মিথ্যাচার বা কমেন্ট সেকশনে

জিহাদ চালানোর আইডির সংখ্যা অনেক হলেও প্রকৃত ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম। অর্থাৎ ১০ জন ব্যক্তি মিলে ৫০০টি ফেসবুক আইডি অপারেট করতে পারে, যদি তারা এটাকে মাসিক বেতনভুক্ত নয়টা-পাঁচটা চাকুরি হিসেবে নেয়।'

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জিহাদি কার্যক্রম চালাচ্ছে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। ২০ থেকে ৩০ বছরের তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করে সদস্য সংগ্রহে চলে প্রথম ধাপের দাওয়াতি কার্যক্রম। প্রথম ধাপের ধর্মের নানা বিষয়ে অপব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গি কার্যক্রমে উৎসাহ দিতে মগজ ধোলাই-এর কাজ করে জঙ্গি সদস্যরা। প্রথম ধাপে সফল হলে পরবর্তীকালে সংগঠনের সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তাদের শারীরিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়। এমনকি অস্ত্র পরিচালনার বিষয়টিও অনলাইনে পরিচালনা করে আসছে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা।

দেশে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়া তরুণদের ৮২ শতাংশই ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তারা এই মাধ্যম ব্যবহার করছেন- গ্রেপ্তার হওয়া ২৫০ জন জঙ্গির ওপর চালানো এক সমীক্ষার ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে পুলিশ। ২০১৭ সালের ১২ থেকে ১৪ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৪ দেশের পুলিশ প্রধানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৫০ জন জঙ্গির মধ্যে ৫৬ শতাংশ বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসা, ২২ শতাংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা। অন্যরা নানা জায়গা থেকে আসছেন।

পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে তৈরি করা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন পুলিশ সদর দপ্তরের তৎকালীন সহকারী মহাপরিদর্শক (গোপনীয়) মো. মনিরুজ্জামান। এতে বলা হয়, ২৫০ জন জঙ্গির ধরন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাদের ৮০ শতাংশ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে থ্রিমা, উইচ্যাট ও মেসেঞ্জারের মতো অ্যাপস ব্যবহার করেছে। কেউ কেউ পৃথক অ্যাপও তৈরি করে নিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব জঙ্গি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভুয়া পরিচয় দিয়ে তৈরি আইডি ব্যবহার করা। এ ছাড়া প্রয়োজন শেষে দ্রুত তথ্য মুছে ফেলার প্রবণতা, দ্রুত প্রযুক্তি পরিবর্তন ও সরকারের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ না থাকা বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

জঙ্গি সংগঠনগুলো তরুণদের উগ্রবাদের দিকে ধাবিত করতে অনলাইনে চলছে তাদের কর্মকাণ্ড। জঙ্গিদের বিভিন্ন সাময়িকী পর্যালোচনা করে জানা গেছে, অনলাইন জগতের নিয়ন্ত্রণ নিতে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা বিনিয়োগ করছে। জঙ্গিরা এখন অনলাইন বা ইন্টারনেটকে তাদের যোগাযোগ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। পারস্পরিক যোগাযোগ থেকে শুরু করে উগ্র ধর্মীয় মতবাদও প্রচার করছে অনলাইনে। পুলিশের কথায়, এসব পেজের অ্যাডমিন বা ব্যবহারকারীরা বেশিরভাগই

বিদেশে অবস্থান করে। ফলে তাদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় না কিন্তু একটি বন্ধ করা হলে জঙ্গিরা নতুন নামে আরেকটি পেজ বা আইডি খুলে একই কাজ শুরু করছে।

২০১৭ সালের ২২ মার্চ প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অনলাইনে জঙ্গিরা সার্বক্ষণিক যে প্রচার করে তা রোধ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। একক কোনো দেশের পক্ষে এটা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এসব সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বিভিন্ন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ জরুরি। জঙ্গিদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। প্রযুক্তি জ্ঞানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো আগের চেয়ে সমৃদ্ধ হলেও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে অনেক সময় পেরে উঠছে না।'

২০১৩ সাল থেকে ব্লগার, লেখক-প্রকাশকসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ফেসবুক ও টুইটারে। হত্যার পর দায় স্বীকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় হামলা চালিয়ে দেশি-বিদেশি নাগরিকদের হত্যার কথা জঙ্গিরা ওই রাতেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

২০২১ সালের ২ মার্চ জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গি তৎপরতায় এখন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। উচ্চবিত্তের সন্তানরাও খুব অল্প সময়ে জঙ্গিতে রূপ নিচ্ছে এবং ধর্মের নামে মানুষ খুন করতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে কার্পণ্য করছে না। ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীরা প্রতিদিনই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কিছু না কিছু তথ্য যোগ করেন। স্মার্টফোনের বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশনগুলোও ব্যবহারকারীদের ধারণার চেয়ে বেশি তথ্য নিয়ে থাকে। তরুণ-তরুণীদের মগজ ধোলাইয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো ব্যবহার করছে বিভিন্ন ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম। আর এই কাজটা জঙ্গিদের নিয়োগদাতারা করছে খুবই সুনিপুণভাবে। তাদের সেই কাজের কিছু নমুনা পাওয়া যায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের ফেসবুক কর্মকাণ্ড ঘাটলে। ফেসবুকের একটি পাতার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বোমা তৈরির কৌশলসহ, কাকে, কেন, কিভাবে হত্যা করা উচিত কিংবা কেন তথাকথিত 'ইসলাম প্রতিষ্ঠায়' নিজের জীবন উৎসর্গ করে জিহাদ করা উচিত সেই জ্ঞান দেওয়া হয় প্রকাশ্যে। অনলাইনে নিয়মিত বয়ানেরও ব্যবস্থা করা হয় পাতাটি থেকে, যেখানে তাদের সঙ্গে লাইভ আড্ডায় অংশ নিতে পারে যে কেউ। ফেসবুক যদিও তাদের অপতৎপরতা রোধে সক্রিয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে জঙ্গিদের গতি ফেসবুকের গতির চেয়ে অনেক বেশি। জঙ্গিদের একটি পাতা বন্ধ হলে আরেকটি চালু হয়ে যাচ্ছে। নতুন পাতা বন্ধ করতে ফেসবুক কয়েকদিন সময় নিচ্ছে। আর সেই সময়ের মধ্যে জঙ্গিদের তৎপরতা অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। আবার ফেসবুক পাতা বন্ধ হলেও ওয়ার্ডপ্রেসে তাদের ওয়েবসাইট ঠিকই সক্রিয় থাকছে। ফলে তরুণদের জঙ্গি বানানোর প্রক্রিয়া ঠিক থামছে না।'

২০২১ মার্চ ০৯ বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ফেক আইডি খুলে বিভিন্ন ধরনের দাওয়াতি কার্যক্রম নিয়ে

উঠতি বয়সীদের নক করে তারা। ভিপিএন ব্যবহার করে ফেক আইডি পরিচালনা করায় তাদের কার্যক্রমের স্থান শনাক্ত করা অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

'আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের মুখপত্র 'আন নাবা' ২০২০ সালের মার্চের শেষভাগে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছিল। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ 'আন নাবা'য় প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বিশ্লেষণ করেছে। ক্রাইসিস গ্রুপ বলছে, 'হামলার লক্ষ্যস্থল হিসেবে আইএসের পছন্দ পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের ভাষায় পশ্চিমের নাস্তিক্যবাদী সরকারের সহযোগিতায় চলা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো। ক্রাইসিস গ্রুপ ৩০টি দেশের ৪৭ জন সদস্যের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মঞ্চ। এই মঞ্চে তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করে থাকে। বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাবেক কর্মকর্তারা এর সদস্য।'

২০২০ সালের ০১ জুলাই প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রগুলো বলছে, ভার্চুয়াল যোগাযোগের একটা অংশ বিদেশ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দুই পক্ষকেই বাংলায় কথা বলতে শুনেছে। আগে শুধু টেলিগ্রাম নামের অ্যাপে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা থাকলেও এখন তারা হুপ ও ট্যামট্যাম নামের অ্যাপে চ্যানেল চালু করেছে। এগুলো পরিচালনা করছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর মিডিয়া উইংয়ের লোকজন। তারা নিজেদের তৈরি কনটেন্ট কিংবা বিদেশি ভাষা থেকে অনুবাদ করে বিভিন্ন কনটেন্ট আপলোড করছে। কার কী প্রতিক্রিয়া দেখে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করছে। কাউকে কাউকে দলভুক্ত করছে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো প্রচারণার জন্য বেছে নিচ্ছে জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো। তারা আনসার আল ইসলামের ১০০টি প্রচারপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার ৩০ ভাগ পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানবিরোধী। ২৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরোধী। এ ছাড়া দুর্নীতি, আইনের প্রয়োগহীনতা বা অপপ্রয়োগ নিয়ে ২৫ ভাগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন-সংক্রান্ত আর জিহাদ ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনা আছে মাত্র ২০ ভাগ প্রচারপত্রে।

দেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে উৎকণ্ঠা থেকেই গেছে। এখনো অনলাইনে সদস্য সংগ্রহ করা, আদর্শ প্রচার এবং নাশকতার পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

২০২০ সালের ১ জুলাই কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নব্য জেএমবির শক্তিশালী নেতৃত্ব কাঠামো না থাকলেও মতাদর্শী কতিপয় মানুষ আছে। তাদের অনলাইনে একাকী হামলা বা 'লোন উলফ' ধরনের হামলায় উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অনলাইনে বেশি সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম (আগের নাম এবিটি)। পলাতক শীর্ষ নেতা মেজর (বরখাস্ত) জিয়াউল হকের নির্দেশনায় সদস্য সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে জঙ্গিরা। অনলাইনে উগ্র মতাদর্শীদের দলে ভেড়ানোর পাশাপাশি নব্য জেএমবি ও পুরনো জেএমবির জঙ্গিদের সঙ্গে সমন্বয় করে শক্তি বাড়াতে চাইছে সংগঠনটি।'

২০২০ সালের ২৪ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'তারা সিলেট থেকে যে পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই অনলাইনের

মাধ্যমে নব্য জেএমবিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এদের সেল প্রধান নাইমুজ্জামান অন্য সদস্যদের অনলাইনের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহের পাশাপাশি বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দিতো। অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকার পল্টন, নওগাঁর একটি মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা। এছাড়া সিলেটের শাহজালালের মাজারেও বোমা মেরেছিল। কিন্তু 'কাঁচা হাতের তৈরি' বলে সেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি।'

হামলায় অংশ নিতে অনলাইনে প্রশিক্ষণ বা বোমা তৈরির কৌশল শেখানোর বিষয়টি কিছুটা শঙ্কার। জঙ্গিরা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি এড়াতে অনলাইন কৌশল বেছে নিয়েছে। যাতে যে কোনো জঙ্গি নিজের ঘরে বসেই বোমা তৈরি করতে পারে। একারণে অনলাইনেও ব্যাপকহারে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যেসব সাইটে জঙ্গিবাদের উপকরণ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে এগুলোর পরিচালনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে শিরিনা খাতুন ওরফে তাহসিন আব্দুল্লাহ নামে নব্য জেএমবির নারী শাখার সেকেন্ড ইন কমান্ডকে গ্রেপ্তার করে কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগ। শিরিনা নব্য জেএমবির নারী শাখার প্রধান আসমানী খাতুন ওরফে আসমা ওরফে বন্দী জীবনের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন এনক্রিপ্টেড অ্যাপসের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ, অনলাইনে জিহাদি ট্রেনিং ও কথিত হিজরতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো।

২০২০ সালের মার্চে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে নব্য জেএমবির জেডএস ফোর্সের যে দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারাও অনলাইনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে সাফফাত ও আরাফাত নামে ওই দুই তরুণ জঙ্গি জানিয়েছে, অনলাইনের মাধ্যমে ইরাকের আবু গারিব কারাগারে থাকা এক নারী জঙ্গির খোলা চিঠি পড়ে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হন তারা। পরে অনলাইনের মাধ্যমে নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। পরবর্তীকালে শীর্ষ নেতাদের নির্দেশে তারা কথিত হিজরতের নামে ঘর ছাড়ে। অনলাইনে পাওয়া নির্দেশনা মতো তারা শারীরিক ব্যায়ামসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণও নিয়েছে।

অনলাইনে জঙ্গিবাদের প্রচারণামূলক নানা উপকরণ রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে জঙ্গিবাদের পক্ষে কোরাণ-হাদিসের খণ্ডিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে জঙ্গিদের কথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর লেখালেখি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে 'জঙ্গি গুরু' হিসেবে খ্যাত জসিম উদ্দিন রাহমানীর সব বই ও ভাষণগুলো অনলাইনে পাওয়া যায়। উম্মাহ নেটওয়ার্ক নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে শায়খ তামিম আল আদনানী নামে কথিত এক ব্যক্তি নিয়মিত জঙ্গিবাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন।

২০২০ সালের ২৪ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দীর্ঘদিন অনলাইনকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদ পর্যবেক্ষণ করে আসা তানভীর হোসেন জোহা বলেন, বাংলাদেশে অনলাইনে জঙ্গিবাদ যেভাবে নজরদারি করা হয় তা এখনও পর্যাপ্ত

নয়। জঙ্গিরা এখন ব্যাপকহারে অনলাইনকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এজন্য আমাদের সিস্টেমকে ঢেলে সাজাতে হবে। তা না হলে জঙ্গিদের অনলাইনকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না।

'তিনি বলেন, আমাদের ইন্টারনেট গেটওয়ের সেশন ও ডেটালিংকে ইন্টারসেপশন দরকার। এই দুই লেয়ারে যতক্ষণ ইন্টারসেপশন না করা যাবে ততক্ষণ অনলাইনকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। আমাদের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা পুনরায় সুসজ্জিত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও বেশি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। কারণ সচেতনতাই যে কোনও অপরাধ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান বিষয়। সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে কেউ ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় জঙ্গিবাদে জড়ানোর আগে সেই ব্যাখ্যা যাচাই করার সুযোগ পাবে।'

তরুণদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করতে দ্রুততম বার্তা প্রেরণ অ্যাপ্লিকেশন 'টেলিগ্রাম' ব্যবহার করছে নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম। এর আগেও বিভিন্ন সময় দেশীয় জঙ্গি সংগঠনগুলোর যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে এ অ্যাপসটি ব্যবহারের তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল। জোবাইদা সিদ্দিকা নাবিলা নামে আনসার আল ইসলামের এক নারী সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর আবারও এ অ্যাপসের মাধ্যমে জঙ্গিদের যোগাযোগের বিষয়টি সামনে এসেছে।

২০২১ সালের ৩০ আগস্ট দৈনিক সংবাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নাবিলাকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) জানিয়েছে, এই তরুণী আনসার আল ইসলামের মতাদর্শ প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে টেলিগ্রাম অ্যাপস ব্যবহার করত। টেলিগ্রামে চারটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১৫টিরও বেশি চ্যানেল চালাত সে। এসব চ্যানেলে আনসার আল ইসলামের বিভিন্ন উগ্রবাদী সহিংস ভিডিও, অডিও, ছবি ও ফাইল ও বই শেয়ার করত। সবগুলো টেলিগ্রাম চ্যানেল মিলে আনুমানিক ২৫ হাজার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে, যারা নিয়মিত এসব অনুসরণ করে।

'পুলিশের তথ্যমতে, নাবিলা ২০২০ সালের প্রথমদিকে নিজের নাম-পরিচয় গোপন করে ছদ্মনামে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলে। এক সময় সে আনসার আল ইসলামের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'তিতুমীর মিডিয়া'র খোঁজ পায়। তখন সে ওই পেইজে যুক্ত হয়ে আনসার আল ইসলামের বিভিন্ন উগ্রবাদী ভিডিও, অডিও এবং আর্টিকেল সম্পর্কে ধারণা পায় এবং তাদের মতাদর্শ নিজের ভেতরে লালন করতে শুরু করে। একপর্যায়ে তার সঙ্গে তিতুমীর মিডিয়ার পেজ অ্যাডমিনের যোগাযোগ হয়। সেই পেইজ অ্যাডমিন তাকে উগ্রবাদী জিহাদি কন্টেন্টসহ আনসার আল ইসলামের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলোর লিংক দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে ওই তরুণী আনসার আল ইসলামের মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে যুক্ত হয়। বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছদ্মনামে একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলে নাবিলা কাজটি করত।'

জঙ্গিবাদী অনলাইন মিডিয়াসমূহ

জঙ্গিরা বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়া ও অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের ভার্চুয়াল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে জঙ্গিরা তাদের বিভিন্ন মতবাদ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে নির্দেশনাও আদান-প্রদান করছে।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে জঙ্গিদের ৬০টি মিডিয়া ও অনলাইন পত্রিকা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য–

লোন উলফ

বাংলা ভাষায় জঙ্গিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন হলো লোন উলফ। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে টেলিগ্রাম একাউন্টের মাধ্যমে 'লোন উলফ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০১৭ সালে অনলাইন-অফলাইন মিডিয়া হিসেবে আলোচনায় আসে। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলায় 'লোন উলফ' ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা (AQIS) এর প্রতি অনুগত বাংলাদেশি জিহাদিরা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এ ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য 'বাংলাদেশে গ্লোবাল জিহাদের কাজকে অগ্রসর করা'। এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে সেটা প্রচ্ছদেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাগাজিনের শিরোনাম রাখা হয়েছে, 'লেটার টু দা ইনসাইডার' ('ভিতরের ভাইয়ের প্রতি চিঠি')।

বাংলাদেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর লোগো স্থান পেয়েছে প্রচ্ছদে। বাংলাদেশ নেভী, বিমান, পুলিশ, র‍্যাব এবং এসএসএফ-এর লোগোর মাঝখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো। প্রচ্ছদে এসএসএফ-এর লোগো রাখার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের তিন সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত লোগোও স্থান পেয়েছে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে। ম্যাগাজিনের নতুন এই সংখ্যাটি পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদের সমর্থনে জিহাদিরা যেসব যুক্তি, কারণ ও তর্ক উপস্থাপন করে সেগুলো সুক্ষ্ম, গভীর এবং উন্নত। একজন মুসলিমের কাছে অনেক সময় জিহাদিদের এ কথাগুলো প্রামাণিক এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়। একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য এই বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করা বেশ কঠিন। এই যুক্তি ও তর্কগুলো বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের নেতা ও চিন্তাবিদদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসগত ও পদ্ধতিগত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের ফসল। এই ম্যাগাজিনে এধরণের যুক্তি ও আলোচনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কাউকে নিজেদের মতাদর্শে দীক্ষিত করার জন্য জিহাদিরা সাধারণত যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে সেগুলো উঠে এসেছে এ ম্যাগাজিনে।

'লোন উলফ' অর্থ হলো একাকী শিকারী বা একাকী মুজাহিদ। একজন লোন উলফ মুজাহিদ চিন্তাধারা বা ভাবগত দিক থেকে বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনকে সমর্থন করে নিজে নিজেই হামলা চালায়। এছাড়া অল্প সংখ্যক কথিত মুজাহিদ মিলে স্লিপার সেল গঠন করে হামলা চালানোকেও 'লোন উলফ' বা 'উলফ প্যাক' হামলা বলা হয়। গোটা দুনিয়া জুড়েই লোন উলফ জিহাদ বা লিডারলেস জিহাদ ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি ভারতে 'লোন উলফ' হামলার পরিকল্পনা করেছে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের একটি ভারতীয় প্রপাগান্ডা চ্যানেল বালাকোট মিডিয়া থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় লেখা একটি ম্যাগাজিনে এই হামলার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। জঙ্গিরা হামলার কলা-কৌশল ও কাদের টার্গেট করা হতে পারে তা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। টেলিগ্রামভিত্তিক জঙ্গিদের বালাকোট চ্যানেল থেকে 'হুমকি' সম্বলিত এই ম্যাগাজিনটি পাওয়া গেছে।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত ওই ম্যাগাজিনে লোন উলফ হামলা কী, অপারেশনের মূলনীতি, নিজেকে প্রস্তুত করা, কমিউনিকেশনের কৌশল, সিসি ক্যামেরা এড়িয়ে চলা, টার্গেট সিলেকশন, টার্গেট প্রোফাইলিং, যাতায়াতের কৌশল, রেকি করার পদ্ধতি, অপারেশনের পরিকল্পনা, সিকিউরিটির জন্য ডুস অ্যান্ড ডোন্টস অর্থাৎ কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, প্রয়োজনে টিম সিলেকশন, প্র্যাকটিস, অপারেশন পরিকল্পনার নমুনা, নিরাপত্তা সতর্কীকরণ, কিলিংয়ের বিষয়ে নির্দেশনা, স্যাবোটাজ, অপারেশনের পর বিবৃতি দেওয়ার কৌশলগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করেছে।

লোন উলফ হামলার হুমকি দেওয়া ওই ম্যাগাজিনে 'আমাদের টার্গেট' শিরোনামের একটি অধ্যায়ে বাংলাদেশ ও ভারতের কাদের ওপর হামলা করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলাকে 'লোন উলফ' হামলা উল্লেখ করে ওই ম্যাগাজিনে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, 'এদেশের সামরিক ফ্যাসিলিটিতে ট্রেনিং নিতে আসা বা ট্রেনিং দিতে আসা আমেরিকা, ইসরায়েল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি ও ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ এবং ভারত বা মিয়ানমারের অমুসলিম সামরিক পুরুষ ও নারী তাদের টার্গেট বলে আখ্যায়িত করেছে। এছাড়া জাতিসংঘ, ইউএনএইচসিআর, অ্যাকশন এইড, ক্রিশ্চিয়ান এইড ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো হারাবি বা কাফেরকে হত্যা করা যেতে পারে উল্লেখ করা হয়েছে।'

তিতুমীর মিডিয়া

২০১০ সালে 'তিতুমীর মিডিয়া' নামে জঙ্গিদের একটি অনলাইন মিডিয়া চালু হয়। আনসার আল ইসলাম-এর উপদেষ্টা আলী হাসান উসামা জঙ্গিদের অনলাইন মিডিয়া এই মিডিয়ায় 'শাসক ছাড়া জিহাদের বিধান' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কিছু মানুষ এ কথা বলে বেড়ায় যে, শাসক ছাড়া কোনো জিহাদ নেই। শাসকের অনুপস্থিতিতে যেসব লড়াই সংঘটিত হয়, তা সবই ফিতনার লড়াই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সালাফে সালেহিন ও উম্মাহর ইমামগণের ইজমা অনুযায়ী এ মতের কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি স্পষ্ট

ভ্রান্ত মত, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস এবং শরীয়া নীতি ও ফিকহি মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন: কোরাণের যে সমস্ত আয়াত ও রাসুলুল্লাহ-এর যে সকল হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলোতে এ ধরনের কোনো শর্তারোপ করা হয়নি; বরং এ আয়াত ও হাদিসগুলো ব্যাপক ও শর্তমুক্ত। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ একযোগে সমস্ত মুমিন-মুসলমানকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন কোরাণে ইরশাদ হয়েছে : 'তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে'। জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়ো হালকা অবস্থায় থাকো বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাও।'

মুওয়াহহিদ মিডিয়া

মুওয়াহহিদ মিডিয়া জঙ্গিদের অনলাইন মাধ্যম হিসেবে ২০১৫ সালে প্রথম চালু হয়। 'কীভাবে অনলাইনে জিহাদি সংগঠনে যুক্ত হবেন?' শিরোনামে একটি লেখায় বলা হয়েছে– 'অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু আবেদন বা ম্যাসেজ পেয়েছি, যেখানে অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা মুজাহিদদের সাথে যুক্ত হওয়া ও কাজ করার আগ্রহ পেশ করেছেন। অনেক মুখলিস ভাই আছেন, যারা বাস্তবেই মুজাহিদদের সাথে যুক্ত হতে চান। তাই ভাইদের পরামর্শ ও বড়দের অনুমতিতে এই বিষয়ে গাইডলাইন হলো–

১. আল-কায়েদার মুজাহিদীন অনলাইনে সাথী রিক্রুট করে না, বরং উম্মাহকে জাগানোর প্রচেষ্টা করেন। সুতরাং অনলাইনে আবেদন করে তাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন না।
২. তাগুত-কাফেররা মুজাহিদ ও মুজাহিদীন সমর্থক ধরার প্রচুর ফাঁদ পেতে রেখেছে, সুতরাং অনলাইনে যুক্ত হতে যাবেন না বা অনলাইনে অর্থ প্রদানও করবেন না।
৩. অফলাইনে মুজাহিদদের সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনলাইন সূত্রগুলোকে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কাজে লাগান।
৪. অনলাইনে মুজাহিদীন যদি কোনো অনলাইনভিত্তিক কাজ করার সুযোগ রাখে, তাহলে সে গাইডলাইন ফলো করে নিরাপদ পদ্ধতিতে তাতে অংশগ্রহণ করুন।
৫. লোন উলফ গাইডলাইন অনুযায়ী নিজেকে একাকী মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলুন, যার জন্য তানজিমে যুক্ত হওয়া জরুরী নয়। আর যারা একাকী মুজাহিদ হতে চান, তারা অবশ্যই অনলাইনে কোনো তানজিম, গ্রুপ বা ব্যক্তির সাথে যুক্ত হওয়া থেকে ১০০% নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।'

ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

২০১৩ সালে 'ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' এর আত্মপ্রকাশ হয়। ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'বালাকোট মিডিয়া' কর্তৃক 'জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা' শিরোনামে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা নেতা আইমান আল-জাওয়াহিরী লিখেছেন–

১. এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, এ পর্যায়ে আমাদের কর্মকাণ্ড দু'টি ধারায় বিভক্ত: প্রথমটি হচ্ছে সামরিক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দাওয়াত।

২. সামরিক কর্মকাণ্ড: সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রথম টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে কুফরের (আন্তর্জাতিক) কেন্দ্র আমেরিকা ও তার মিত্র ইসরায়েল এবং দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে তাদের স্থানীয়/আঞ্চলিক মিত্র যারা মুসলমানদের দেশগুলোর শাসক।

'আমরা কায়েদাতুল জিহাদের (আল কায়েদাহ) অধীনস্থ সংগঠনের প্রধানদের এবং আমাদের সকল সমর্থক এবং সহানুভূতিশীলদের এই মর্মে আহ্বান জানাচ্ছি যে, এই নির্দেশনাগুলো তাদের অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হোক তা দায়িত্বশীল কোনো অবস্থান অথবা সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ। কারণ এই নথির মধ্যে লুকায়িত কোন গোপন বিষয় নেই, বরং এটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। এর উদ্দেশ্য হলো, শরীয়াতের হুকুমের পরিপন্থী নয় এবং এর মূলনীতিগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী জিহাদি কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পর্যায়ে শরীয়তের বিধি বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত ইসলামের স্বার্থসমূহের সংরক্ষণ করা এবং এগুলোকে সকল প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে হেফাজত করা।'

আনসার আল-ইসলাম মিডিয়া

২০১৪ সালে জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের 'আনসার আল-ইসলাম মিডিয়া'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০১৭ সালে ১৪ মে 'আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ'-এর বাংলাদেশি শাখা 'আনসার আল-ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে 'মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান' শিরোনামে লিখেছেন, 'অনলাইনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ ইলাল্লাহ জারি রাখুন। বিভিন্ন ই-মেইল গ্রুপ, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ, এ সংক্রান্ত বই, প্রশ্নোত্তর, অডিও, ভিডিও ছড়িয়ে দিন। মুজাহিদীনের প্রচারণার কাজে ইন্টারনেট বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সময়ের অপচয় এবং অন্তরে নিফাক্ব ও রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক। এ হল এমন এক অস্ত্র যা অস্ত্রধারণকারী এবং শত্রু উভয়েরই ক্ষতি করতে সক্ষম।

'আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন। কঠিন পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন থাকার অভ্যাস করুন। আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করুন। নিজ পরিবার-আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ঘরকুনো মনোভাব ত্যাগ করে মাঝে মাঝে একা কয়েকদিন দূরের পথ সফর করুন। নিজেদের কোরবানীর পশু নিজে জবাই করুন। কঠিন ও পরিশ্রমের কাজ করুন। মাঝে মাঝে পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করুন, ক্যাম্পিং করুন। নিজেকে কষ্টসহিষ্ণুতার শিক্ষা দিন। নিজের কাজ নিজে করতে শিখুন। যেমনঃ রান্না করা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, ঘর মোছা, টয়লেট পরিষ্কার ইত্যাদি। নিজেকে আনসার হিসেবে গড়ে তুলুন। নিজের বাসায় একটি রুম মুজাহিদ ভাইদের জন্য বরাদ্ধ রাখুন। দুই-তিন জন মুজাহিদ ভাই যাতে দীর্ঘদিন আপনার বাসায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারেন, এ রকম ব্যবস্থা রাখুন।'

আন নাসর মিডিয়া

gazwah.net-কে দেখলে একটি নিউজ সাইটের মতো মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি জঙ্গি মৌলবাদী সাইট যা পাকিস্তান, ভারত, কাশ্মীর, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে জিহাদি গোষ্ঠীর আক্রমণ এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আন নাসর মিডিয়া বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে থাকে। ২০১০ সালে 'আন নাসর মিডিয়া' টেলিগ্রাম একাউন্ট চালু হয়। ২০১৩ সালে এটি জঙ্গিদের অনলাইন মিডিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত, আস সাহাব উপমহাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত ও আন নাসর মিডিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'আরাকান, কাশ্মির ও বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের মজলুমদের সাহায্য করার পথ ও পদ্ধতি' শিরোনামে একটি লেখায় আল কায়েদা উপমহাদেশ শাখার মুখপাত্র উসামা মাহমুদ লিখেছেন– 'জিহাদি কাফেলায় নিজে যুক্ত হবো এবং অন্যকেও যুক্ত করবো, তবে সেটা এমন কাফেলা হতে হবে, যার উদ্দেশ্য শরীয়াহ বাস্তবায়ন এবং মাজলুমদের সহায়তা করা, যারা দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে কঠোর আর মুসলিমদের সাথে এবং মুসলিম জনসাধারণের সাথে বিনয়ী হয়, নিজে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ুন। আর শাহাদাত লাভের ফযিলত ও মহত্ব সবই আমাদের জানা বিষয়।

'সম্পদের মাধ্যমে মুজাহিদদের সাহায্য করবেন, জীবন দিয়ে জিহাদ করার পাশাপাশি মাল দ্বারাও জিহাদ করা ফরজ, আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে মাল দ্বারা জিহাদ করা ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন। সব যুগের ন্যায় বর্তমানেও জিহাদের জন্য সম্পদ প্রয়োজন। ভারত এবং মিয়ানমারের দূতাবাসসহ দ্বীনের অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যতটুকু জানেন, সুযোগ মতো এক্ষেত্রে মুজাহিদদের সহায়তা করবেন।'

দাওয়াহ ইলাল্লাহ

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম (https://dawahilallah.com) এটি একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি মৌলবাদী গোষ্ঠীর ওয়েবসাইট। ২০১২ সাল থেকে চালু হয় আল কায়দার অফিসিয়াল সাইট 'দাওয়াহ ইল্লাল্লাহ'। সংগঠনটির ভারতীয় উপমহাদেশ বাংলাদেশ শাখার জঙ্গি নেতা মুফতি মাহমুদুল হাসান এই মিডিয়ার ওয়েবসাইটে লিখেছেন, 'জিহাদ দুই প্রকার : (ক) প্রথম প্রকার হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ। অর্থাৎ শত্রুভূমিতে গিয়ে শত্রু তালাশ করা। এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্যও ইমাম বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। হ্যাঁ, যখন ইমাম নিজ দায়িত্বে জিহাদ সম্পাদন করতে থাকবে, তখন তার অনুমতি ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত জিহাদে নেমে পড়া ও স্বেচ্ছাচারিতা করা যাবে না। কারণ এ বিষয়টির দায়িত্ব মূলত তাকে দেওয়া হয়েছে। তাই তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে। তবে তা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করবে, সে গোনাহগার হবে ঠিকই; কিন্তু তার জিহাদ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি ইমাম না-ই থাকে বা হারিয়ে গিয়ে থাকে কিংবা নিহত হয়ে যায় তাহলে জিহাদ বন্ধ করে থাকবে না।

'দ্বিতীয়টি হলো– প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। ইমাম বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ঝাণ্ডা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, আল্লাহর দীন বুলন্দ করার ইচ্ছা করাও শর্ত নয়, কোনো আলিমের ফতোয়াও শর্ত নয়, কাতার এক হওয়াও শর্ত নয়, পর্যাপ্ত শক্তি থাকাও শর্ত নয়, বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত নয়। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মুজাহিদদের জন্য এক কাতারে এক আমিরের অধীনে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব নয়। এটা ওয়াজিব বটে; কিন্তু তা জিহাদের শুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়। তাই যেক্ষেত্রে অসম্ভব হবে, সেক্ষেত্রে এই অজুহাত দেখিয়ে কিছুতেই জিহাদ পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত অবিরল জিহাদ চলবে।'

২০১৬ সালের ১৫ জুন আল কায়দা এই সাইটে মুফতি মাহমুদুল লিখেছেন, 'আমরা জানি হারবি কুফফার মারার ব্যাপারে কোন সমস্যা নাই, এদেরকে ম্যাস কিলিং করা যায়। আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার সামর্থ্য থাকলে ইন্ডিয়া, রাশিয়া, চীন বা আমেরিকায় চলে যান। ভ্রমণ ভিসা হলেও যেতে পারেন ইনশাআল্লাহ। অথবা আপনার কোনো আত্মীয় যদি সেই দেশগুলোর কোনো একটিতে থেকে থাকে তাদেরকে জিহাদের জন্য তাহরিদ করুন। যখন সেই আত্মীয় জিহাদের ব্যাপারে রাজি হয়ে যাবে তখন নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাঝে যেটি ইচ্ছা তাকে এপ্লাই করতে বলুন-

১. একটা বড় ট্রাক নিয়ে টার্গেট করা দেশের কোনো জনবহুল স্থানে চলে যাবে। সেটা হতে পারে ঢাকার নিউ মার্কেটের মত কোনো ক্রাউডেড প্লেস/সমুদ্র সৈকত। তারপর আল্লাহর নামে সমানে ওদের উপর গাড়ি চালানো শুরু করবে। ইনশাআল্লাহ ১০০ এর নিচে মরবে না। ২. কিছু ইলেট্রিক করাত পাওয়া যায়। তা নিয়ে কেউ যদি দিল্লি/ নিউ ইয়র্ক সিটির ব্যস্ত মোড়ে সামনে কাফেরদের গলা কাটা শুরু করে তাহলে ইনশাআল্লাহ একটা ম্যাস কিলিং করা সম্ভব। আল্লাহ চাইলে ১০০ মরবেই ইনশাআল্লাহ।'

অধ্যাপক জাফর ইকবাল সম্পর্কে ২০১৭ সালের ১২ মে আল কায়দার অফিসিয়াল সাইট দাওয়াহ ইল্লাল্লাহ'তে লিখেছেন, 'আল কায়দার হিট লিস্টের মধ্যে অন্যতম হলো জাফর ইকবাল। তাঁর সম্পর্কে আল কায়দার একজন মুখপাত্রের মন্তব্য হলো, 'আলহামদুলিল্লাহ। আমরা বিশ্বাস করি ভূত বলতে কিছু নেই। তারা ভূত বলতে যার কথা বলছে এটা আসলে তাদের একটি মিথ্যাচারী, যাতে করে মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোকা দেওয়া যায় ভূতের কথা বলে বলে। জ্বিন আমাদের মতই তারা আল্লাহর মাখলুক, আল্লাহ মানুষ এবং জ্বিন জাতিকেই তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শয়তানের নাম রাখছে জাফর (জাফর একজন বিখ্যাত সাহাবীর নাম) আরেকটা নাম হচ্ছে ইকবাল। (ইকবালও বিখ্যাত মানুষের নাম) লজ্জা হয়, দুইজন বিখ্যাত মানুষের নামে নাম হওয়ার পরও সে হলো ইসলাম বিদ্বেষী।'

আল-ফিরদাউস মিডিয়া

alfirdaws.org-কে দেখলে একটি নিউজ সাইটের মতো মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি জঙ্গি মৌলবাদী সাইট যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে জিহাদি গোষ্ঠীর আক্রমণ এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। তাদের সাম্প্রতিক নিবন্ধগুলোর মধ্যে একটিতে কীভাবে আল-শাবাবের মুজাহিদিন, পূর্ব

আফ্রিকার আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদি গোষ্ঠী, উগান্ডার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধরত এলাকা দখল করে তার বর্ণনা দেওয়া আছে।

আল-ফিরদাউস মিডিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সংবাদপ্রচার প্রতিষ্ঠান আল-ফিরদাউস নিউজ। পত্রিকার সম্পাদক ইবরাহীম হাসান ও নির্বাহী সম্পাদক আহমাদ উসামা আল-হিন্দি এবং সহকারী সম্পাদক হাসান বিন আব্দুল্লাহ।

২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইসল্যান্ড থেকে চালু করা এই সাইটটি বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠক রয়েছে। অধিকাংশই পরস্পর সংযুক্ত, একে অপরের বিষয়বস্তু শেয়ার করে এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য নিজেদের কার্যক্রম প্রচার করে। এদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে সব শেয়ার করে আবার কেউ গোপনে।

দারুল ইলম

দারুল ইলম (darulilm.org) ২০১০ সাল থেকে জঙ্গিদের অনলাইন ওয়েবসাইট হিসেবে চালু হয়। বাংলাদেশে নারীবাদের প্রভাব প্রবন্ধে ইয়াহিয়া আব্দুল আজিজ লিখেছেন, 'ইসলামের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক যুদ্ধে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে সবচেয়ে কার্যকরী ও বহুল ব্যবহৃত তীরগুলোর মধ্যে নারীবাদ অন্যতম। পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম ভূখন্ডগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পলিসি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি অন্য যে কাজটি করে তা হল নারীবাদের আদর্শ প্রচার করা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়ন করা।

'বাংলাদেশে সবচেয়ে কুখ্যাত নারীবাদীরা সরাসরি পশ্চিমা নারীবাদীদের অনুসরণ করে। যেমন: বেগম রোকেয়ার লেখা নারীবাদের প্রথম পর্যায়ের ধারণাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। তসলিমা নাসরিন, সুলতানা কামাল, খুশি কবিররা নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তব্যগুলোই নানান রঙ মিশিয়ে তুলে ধরে। আর হাল আমলের শাহবাগী আর উইমেনচ্যাপ্টারের লোকেরা নারীবাদের তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো বাংলাভাষায় তুলে ধরে।

'কাজেই নারীবাদ সরাসরি আমাদের সমাজ ও দেশজ বাস্তবতাকে প্রভাবিত করেছে, করছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। নারীবাদী চিন্তার প্রভাবে বাংলাদেশে বিয়ে সংক্রান্ত আইন বদলেছে ('বাল্যবিবাহ বেআইনি হওয়া')। আমাদের সমাজে জিনা-ব্যাভিচার ও ডিভোর্সের সংখ্যা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। নগ্নতা ও অশ্লীলতাও বেড়েছে। এগুলোর পিছনে নারীবাদ একমাত্র কারণ।'

ইসলামী হিন্দ

২০১৩ সালে 'ইসলামী হিন্দ' নামে একটি অনলাইন মিডিয়া চালু হয়। ইসলামী হিন্দ (Islamihind.com) জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক একটি ওয়েবসাইট। ২০২১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা-এর সাবেক নেতা আব্দুল্লাহ আযযাম 'কেন আমরা জিহাদ করবো?' প্রবন্ধে লিখেছেন– আমি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলছি যে, জিহাদ এবং জিহাদের দিকে হিজরত মূলত এই মুদ্রার এপিঠওপিঠ যার মধ্য

হতে কোনো অংশকে ধর্মের মৌলিকতা থেকে পৃথক করা যায় না। যে ধর্মের মধ্যে জিহাদ নেই বাস্তবে সে ধর্ম না পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে আর না ধর্মের পুষ্পমালা প্রস্ফূটিত করতে পারে। বরং জিহাদই হচ্ছে ধর্মের মূল শক্তি। ধর্মের অস্তিত্বরক্ষা করতে হলে জিহাদের এ শ্রোতধারাকে সর্বকালে অব্যখতে রাখতে হবে। সতরাং সশস্ত্র জিহাদের জন্য সবাই প্রস্তুতি নিতে হবে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী পত্রিকাসমূহ

সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে অনলাইন অডিও ভিডিওর পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে জঙ্গি সংগঠন সমূহের বিভিন্ন মুখপত্র। রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এসব পত্রিকা পাওয়া যায়। এছাড়া সবগুলো পত্রিকা অনলাইনে বিনামূল্যেও পড়তে পারবে সংগঠনের কর্মীরা। এই সব পত্রিকায় তরুণদের নিজ উদ্যোগে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। এগুলো হলো–

১. **দাবিক** ঃ উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে, "দাবিক" হচ্ছে সিরিয়ার একটা ছোট শহরের নাম। এই শহরের নামেই নামকরণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) এর অনলাইন সাময়িকীর। দাবিক যে কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– আরবি, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি এবং বাংলা। দাবিক সর্বপ্রথম ২০১৪ সালে ৫ জুলাই প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায়। বাংলাদেশীদের জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'দাবিক'-এর বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০১৪ সালের ১৮ অক্টোবর। একই সাথে বিভিন্ন ওয়েব সাইটেও দাবিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।

বাংলায় প্রকাশিত 'আইএস'-এর ওয়েব সাইটগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দাওয়াতুল খিলাফাহ' ও 'আত-তামকি'। বাংলা ভাষায় এসব প্রকাশনার সম্পাদক-প্রকাশক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে– ফুরাত মিডিয়া, আল-হায়াত মিডিয়া, আল-ফোরকান মিডিয়া ফাউন্ডেশন ও উলাইয়াত হালাব মিডিয়া সেন্টারের নাম। এই পর্যন্ত দাবিকের ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

২. দ্বিমাসিক শরিয়ত ঃ ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আল-কায়েদা ইন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউ আইএস)-এর বাংলাদেশ শাখার মুখপত্র দ্বিমাসিক শরিয়ত এর প্রকাশনা শুরু হয়। মুফতী হাসান ইমতিয়াজ– সম্পাদক, মাসিক শরিয়ত (মুখপত্র AQIS) এবং কেন্দ্রীয় সদস্য।

মাওলানা ইসহাক খান, মাসিক শরিয়ত প্রকাশক, খান প্রকাশনী- দোকান নং ৩৮, ১ম তলা, ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। সম্পাদক ও প্রকাশক, আলোর মিনার (জঙ্গিবাদী মুখপত্র), ভারত উপমহাদেশ আল-কায়েদা আমির এবং মুখপাত্র মাওলানা আসেম ওমর এর লেখা মূল বইয়ের (ইসলাম ও গণতন্ত্র) এর সম্পাদক। আল-কায়েদা বাংলাদেশ শাখাকে অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান লাইট হাউজ (Light House) (অফিসঃ আল শামস পাজা, শাহ আলী প্লাজার পূর্ব পার্শ্বে, ২য় তলা,

বাড়ি নং-৭, রোড নং-০২, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬) এর বাংলাদেশ সমন্বয়ক এবং AQIS-বাংলাদেশ মুখপত্র মাসিক শরিয়তের সহায়তাকারী।

দ্বি-মাসিক শরিয়ত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা আছে, 'যৌবনকাল হলো জিহাদের সময়। যৌবনকাল হলো এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহর পথে সচেষ্ট হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা যায়! এই সময়ে তোমার কাঁধে বেশি দায়িত্বের বোঝা চাপেনি। কারণ সম্ভবত তুমি একা অথবা তোমার স্ত্রী এবং সন্তান আছে। আগামীতে, সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তোমার দায়িত্ব আরও বাড়বে, দুনিয়ার সমস্যাগুলো তোমাকে ঘিরে ধরবে। তুমি তোমার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয় স্বজনের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবে। এসব কাজগুলো করতে তোমার অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যাবে।

'তুমি এখন তোমার শ্রেষ্ঠ বয়সে রয়েছ, যে বয়সে তুমি নিজেকে মুজাহিদ এবং আত্মত্যাগী হিসেবে গড়ে তুলতে পার। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, আমি বিস্মিত হই সেইসব যুবকদের দেখে যারা খুব ভীতু! তাদের কী হয়েছে যে, তারা এতো ভয়কাতর? কী তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে? যদি সে এই বয়সে ভীতু হয় তাহলে আগামীতে কী হবে?' ('দ্বি-মাসিক শরীয়ত' ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৫)

৩. **মাসিক রহমত** ঃ ১৯৯২ সালে খেলাফত আন্দোলনের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা আমির মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর সম্পাদনায় 'মাসিক রহমত' কামরাঙ্গীরচর মাদ্রাসা থেকে প্রকাশনা শুরু হয়। এরপর আর্থিক কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করে দেয়। এর ফলে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি)র মুখপত্র 'জাগো মুজাহিদ'-এর জঙ্গিদের সামনে নতুন সুযোগ আসে। তারা 'মাসিক রহমতকে' পত্রিকা হিসেবে বেছে নেয়। জাগো মুজাহিদ যারা বের করত তারাই এখন 'মাসিক রহমত' প্রকাশ করে। পত্রিকাটির সম্পাদক মনযুর আহমাদ। অফিস ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের আশরাফাবাদের মাদ্রাসা-ই-নূরিয়া।

'মাসিক রহমত' পত্রিকার পাঠক মূলত এক শ্রেণির মাদ্রাসার ছাত্র। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রও এর পাঠক। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তালেবানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করার জন্য খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার কাছে আহ্বান জানিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাফিজুল ইসলাম লিখেন, 'তালেবান মুসলমানদের অনুপ্রেরণার উৎস। এ যুগে খাঁটি ইসলামি আন্দোলন বলতে তালেবান আন্দোলনকেই বুঝায়।' ওই চিঠিতে তিনি আরো লেখেন, 'যেখানে তালেবানদের নিয়ে সকল মুসলমানের গর্ব করার কথা, সেখানে আমাদের মতো মুসলিম দেশে তালেবান আর্দশের অস্তিত্ব দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্নের কারণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে, দোহাই আপনাদের, আপনারা আপনাদের স্বার্থবাদী রাজনীতির জালে তালেবান নাম জড়িয়ে তাদের কলঙ্কিত করবেন না। তালেবান নামের অপব্যবহার করবেন না।'

এ পত্রিকায় সব সময় 'তালেবানের মতো জিহাদে' ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। পত্র লেখকরা পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রায়শ জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার, রণাঙ্গনে ছুটে চলার আহ্বান জানান। সেপ্টেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় মোহাম্মদ আব্দুস

সালাম ছালিক (ঠিকানা ঃ রাউলি, জাউয়া, ছাতক, সুনামগঞ্জ) লিখেছেন, 'আগে ভয় পেতাম, এখন পাই না। শহীদ হওয়া আমার স্বপ্ন। আমি সেই দিনের অপেক্ষায়, কবে হব। যারা শহীদি মৃত্যু চায়, তারা দুনিয়ার কারো রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। আমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, লাদেন, মোল্লা ওমর তোমরা ন্যায়ের পথে এগিয়ে চলো। আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে।

মুসলিম তরুণদের জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে ২০০৪-এর জুলাই সংখ্যায় মোহাম্মদপুর জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া থেকে লিখেছেন এ কে এম উবাইদুর রহমান ফরিদপুরী। তিনি লিখেছেন, 'কোনো কাফেরের বিরুদ্ধে বুক উঁচিয়ে লড়াই করার কথা শুনলে কেন তোমার কণ্ঠনালী শুকিয়ে যায়? কেন রকেট লাঞ্চার, মিসাইল, কালাশনিকভের নাম শুনলে তোমার বুকের মাঝে ধুক-ধুকানি শুরু হয়? মউত থেকে কেন তুমি দূরে সরে থাকো?' একই সংখ্যায় সিরাজগঞ্জের বেলকুচি বগুড়া থেকে মুহাম্মদ আবু বকর সিরাজী লিখেছেন, 'একজন মুজাহিদ কেড়ে নিতে পারে অসংখ্য কাফেরের প্রাণ। উড়িয়ে দিতে পারে ওদের সেনাক্যাম্প বা বোমারু। এ সব কিছুই জিহাদের বরকত।' মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানদের পুনরায় তরবারি হাতে তুলে নিতেই হবে।'

এ পত্রিকায় 'বিশেষ খবর' নামে একটি বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগে প্রধানত গুরুত্ব দেয়া হয় তালেবানদের 'সাফল্যের খবর, তালেবান যেকোনো সময় আফগানিস্তানের শাসনভার ফিরে পেতে যাচ্ছে, তালেবানহীন আফগানিস্তান আজ বড়ই খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে ইত্যাদি খবর।

বর্তমানে বাজারে পাওয়া না গেলেও 'রহমত২৪.কম' নামের অনলাইন নিউজ পোর্টাল চলমান রয়েছে। এর প্রকাশক ছিলেন প্রয়াত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে প্রয়াত মাওলানা শাহ আহমুদল্লাহ আশরাফ। 'জাগো মুজাহিদ'-এর মালিক ছিলেন জঙ্গি নেতা আবদুল হাই। রহমতের সংস্করণগুলোতে ইসলাম ধর্মের নামে বিভিন্নভাবে উগ্র মতবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ রয়েছে।

৪. **মাসিক দা'ওয়াত** ঃ এই পত্রিকাটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশনা শুরু করে। 'মাসিক দা'ওয়াত'-এর সম্পাদক হেফাজতের সাবেক নায়েবে আমির ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান এবং হরকাতুল জিহাদের উপদেষ্টা, জঙ্গিনেতা মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী। এই পত্রিকার মাধ্যমে কওমি ছাত্রদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সম্পাদক নিজেই কখন আফগানিস্তানে জিহাদে গিয়েছিলেন, কিভাবে গিয়েছিলেন এবং ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর সহ জঙ্গিনেতার সাথে দেখা করার সব খবরাখবর লিখতেন। কিভাবে ইসলামি খিলাফতের নামে ইসলামি রাজনীতির আড়ালে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া যায় সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই 'মাসিক দা'ওয়াত' পত্রিকায়।

দা'ওয়াত পত্রিকার ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়– 'যুব সমাজ জাগ্রত হও, ইমাম মাহদীর বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। বাংলাদেশ

আজ অশান্তির নরককুণ্ড। জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে আজ শান্তি এবং নিরাপত্তার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ভূলুণ্ঠিত। সমগ্র জাতি দলীয় মাস্তানদের হাতে জিম্মি। মন্ত্রীর পরিবর্তন কোনো চিকিৎসা নয়। আল্লাহর সাথে নাফরমানীর কারণেই আসমান থেকে খোদায়ী গজব ধেঁয়ে আসছে, তা অনুধাবন করাই একজন আল্লাহ বিশ্বাসী বুদ্ধিমানের কাজ। দলীয় ক্যাডার ও পুলিশের কর্মকাণ্ডে আজ জাতি দিশেহারা। বিদ্যুৎ ঘাটতি লোডশেডিং ও নিরাপত্তাহীনতা আজ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। একজন দেশপ্রেমিক মুমিনের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা দুস্কর হয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে ঈমান বিধ্বংসী পরিবেশ। অতি সম্মানের অধিকারী নারী সমাজকে সহশিক্ষা, গার্মেন্টসে চাকুরি ও এনজিওতে ঋণের নামে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উস্কানী দ্বারা সুকৌশলে তাদের সতীত্ব ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতে করে নারীদেরকে একদিকে নিজেদের ভোগ-বিলাসের পাত্রী অন্যদিকে ঈমান-ইসলাম ও সতীত্বের প্রাচীর ডিঙাতে প্ররোচিত করে ভবিষ্যতে ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে দাড় করানোর সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি চলছে। ইহুদী কুটচালের এটাই চিরাচরিত নিয়ম। তারা সর্বকালে ইসলামের প্রতি আঘাত হানতে নারীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।' ('দা'ওয়াত' এপ্রিল-মে সংখ্যা, ১৯৯৯)

৫. **মাসিক দেশজগত ঃ** এই পত্রিকাটি ১৯৯০ সাল থেকে প্রকাশনা শুরু করে। 'মাসিক দেশজগত' পত্রিকার সম্পাদক হলেন মুফতি হারুন ইজহার। তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা এবং মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর ছেলে। হারুন ইজহার তার মাসিক দেশজগতে কওমি ছাত্রসহ স্কুল কলেজের ছাত্রদের কিভাবে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করা যায় সে বিষয়ে সবসময় লিখে থাকেন। তার কথায় এবং লিখার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বাবার মাদ্রাসার (জামেয়া ইসলামিয়া লালখান বাজার) ছাত্র এবং কলেজের ছাত্ররা মিলে বোমা বানানোর সময় মারা যান। বর্তমান 'মাসিক দেশজগতে'র সম্পাদক এই জঙ্গিনেতা মুফতি হারুন ইজহার জেল হাজতে আছেন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে পরিচালনার দায়ে।

৬. **মাসিক দাওয়াতুল হক ঃ** এই পত্রিকাটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশনা শুরু করে এখনো প্রকাশিত হয়। 'মাসিক দাওয়াতুল হক' এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক নায়েবে আমির মুফতি হাবিবুর রহমান কাসেমী। তিনি ফটিকছড়ি-নাজির হাট নছিরুল ইসলাম মাদ্রসা-চট্টগ্রাম-এর মহাপরিচালক। কওমি ইতিহাস, নারী নীতি, জিহাদের নামে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড– এসব বিষয়ে এই পত্রিকায় লেখালেখি হয়। নারীদের পর্দার নামে গৃহবন্দি কিভাবে করা যায় এবং জিহাদের অন্তরালে জঙ্গিবাদী কাজে কিভাবে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করা যায়– এসব বিষয়ে প্রাধান্য পায় এই পত্রিকায়।

৭. **আলোর মিনার ঃ** এই পত্রিকাটি ২০১৩ সালে এর প্রকাশনা শুরু হয়। 'আলোর মিনার' সম্পাদক ও প্রকাশক মাওলানা ইছহাক খান। তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের আমির মাওলানা আসেম ওমরের জীবনী

এবং 'গাজওয়ায়ে হিন্দের' ইতিহাস তথ্য জানিয়ে হিন্দুস্তানে হামলা করবার জন্য AQIS সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। আসেম ওমরের মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। বলা যায় 'আলোর মিনার' পত্রিকা AQIS-বাংলাদেশ এর মূখপত্র। জঙ্গিদের সহায়তার অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

৮. **মাসিক নতুন ডাক ঃ** এই পত্রিকাটি ২০১৩ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 'মাসিক নতুন ডাক' কওমি ইতিহাস, কওমি শিক্ষা-তাবলিগ জামায়াত জিহাদ-ফি-সাবিলিহ, নারী পর্দা– এসব বিষয়ে এ পত্রিকায় লেখা হয়। সম্পাদক হলেন সিদ্দিকুর রহমান।

৯. **মাসিক রহমানী পয়গাম ঃ** এই পত্রিকাটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশনা শুরু করে এখনো প্রকাশিত হয়। **'**মাসিক রহমানী পয়গাম' হেফাজতের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক হলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। তিনি শায়খুল হাদিস আজিজুল হক-এর ছেলে। মৌলবাদী সংগঠন 'খেলাফত মজলিস' তথা ইসলামী ঐক্যজোটে মুখপত্র হিসেবে ব্যাপক পরিচিত রয়েছে। ইসলামী হুকুমতের নামে এই পত্রিকার মাধ্যমে জিহাদ তথা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে কওমি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা এই পত্রিকার কাজ।

১০. **মাসিক আল আমানাহ ঃ** এই পত্রিকাটি ২০০৭ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 'মাসিক আল আমানাহ'র সম্পাদক মাওলানা আবদুস সামাদ। তিনি বর্তমান হেফাজতে ইসলামের একজন কেন্দ্রীয় নেতা এবং হরকাতুল জিহাদের সাবেক পৃষ্ঠপোষক। তিনি পত্রিকার মাধ্যমে হেফাজতের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য-উদেশ্য প্রচার করে যাচ্ছেন।

১১. **মাসিক আল কাউছার ঃ** ২০০৪ সালে এই পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। 'মাসিক আল কাউছার'-এর সম্পাদক মুফতি আবুল হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনিও হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগর নেতা। আল কাউছার পত্রিকায় লেখালেখি করে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যারা হরকাতুল জিহাদসহ জঙ্গিবাদী সংগঠনের সহযোগি হিসাবে কাজ করে থাকেন।

১২. **মাসিক মঈনুল ইসলাম ঃ** এই পত্রিকাটি ১৯৯০ সালে প্রকাশনা শুরু করে এখনো প্রকাশিত হয়। **'**মাসিক মঈনুল ইসলাম'-এর সম্পাদক হলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমির মৌলবাদী-জঙ্গিবাদের ঘাঁটি হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া। মাসিক মঈনুল ইসলাম হেফাজতে ইসলাম এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার মুখপত্র হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পত্রিকায় মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী আদর্শ প্রচার করা হয়।

মাসিক মুঈনুল ইসলাম ২০১৪ সালের মে সংখ্যার জিজ্ঞাসা-সমাধান নামের একটি বিভাগ রয়েছে। আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ইসলাম আইন ও গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি মাসে ফতোয়া

প্রদান করা হয়। নরসিংদীর মাধবদী থানার হাফেজ আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করেন, '১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাদেরকে বর্তমান সরকার বেতন-ভাতা দিচ্ছেন, তারা মারা গেলে পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক এসে দাফন কাজে শরীফ হয়ে থাকেন। প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত জনতার সম্মুখে মৃতদেহ রেখে গানের সুরে বাঁশি বাজিয়ে সম্মান জানান এবং এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। শরীয়তের আলোকে এসব জায়েয হবে কি?'

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মাসিক মুঈনুল ইসলাম ফতোয়া বিভাগ কর্তৃক লিখেছেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কোনো সুযোগ আর বাকী থাকে না। কারণ, তার আত্মা তখন ইহজগতে থাকে না, বরং উর্ধ্বজগতে চলে যায়। অতএব, তার সম্মানে যা কিছুই করা হোক তা মৃত ব্যক্তির কোনো উপকারে আসে না। বরং জীবদ্দশায় সে যেভাবে জীবন-যাপন করেছেন, মৃত্যুর পর সে অনুপাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তার সুখ-দুঃখ শুরু হয়ে যায়। তাই মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে কোনো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মূলক কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

'সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে গান বাদ্য করা, বাঁশি বাজানো নিরর্থক এবং ইসলামী শরীয়তে এর বৈধতার কোন সুযোগ নেই। তেমনিভাবে নিরবতা পালন করে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ পদ্ধতিও ইসলামে বৈধ নয়। কারণ, এসব দ্বারা খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যতা হয়। এ মর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'প্রাপ্ত বয়স্ক কারো পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং দিনভর সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপ থাকা কোনো ইবাদত নয়'।' ('মাসিক মুঈনুল ইসলাম' মে সংখ্যা, ২০১৪)

১৩. মাসিক আত-তাওহীদ ঃ এই পত্রিকাটি ১৯৭০ সাল থেকে প্রকাশ হচ্ছে। 'মাসিক আত-তাওহীদ'-এর প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম বোখারী, তিনি হেফাজতে ইসলাম-এর উপদেষ্টা। বর্তমানে সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের উপদেষ্টা ও হেফাজতে ইসলামের সাবেক নায়েবে আমির আফম খালিদ হোসেন। তিনি বর্তমান পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রসার পরিচালক। মাসিক আত-তাওহীদের মাধ্যমে তার মাদ্রাসার কার্যক্রম তথা মৌলবাদী-জঙ্গিবাদী উগ্রতার সব বিষয়ে লেখালেখি করে তা প্রচার-প্রসার করে চলেছেন। যার দরুন কওমি মাদ্রাসা ছাত্ররা বিশেষ করে তার নিজের মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তার নিজের উগ্রবাদী বক্তব্য মাসিক আত-তাওহীদে ছাপানো হয় যেখানে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

১৪. সাপ্তাহিক লিখনী ঃ ১৯৯৬ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশনা শুরু হয়। 'সাপ্তাহিক লিখনী' পত্রিকার সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক। তিনি মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই) এর একজন কেন্দ্রীয় নেতা এবং উক্ত পত্রিকার নির্বাহী মাওলানা মুহিবুর রহমান (মুহিব খান)। তিনি উক্ত সংগঠনের নেতা এবং

যুদ্ধাপরাধী মাওলানা আতাউর রহমান খান-এর সন্তান। তারা এই লিখনী পত্রিকায় সবসময় হেফাজত-জামায়াত 'ইসলামী আন্দোলন' সহ উগ্রবাদী যত সংগঠন আছে সে সব সংগঠনের প্রচার করে থাকেন।

১৫. মাসিক আল হক ঃ এই পত্রিকাটি ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকাশ হচ্ছে। 'মাসিক আল হক' সম্পাদক এসএম ফুরকান উল্লাহ খলিল। এই পত্রিকাটা মূলত প্রকাশ হয় আফগান ফেরত জঙ্গি এবং হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব (সাবেক) দারুল মা'আরিফ মাদ্রাসা চট্টগ্রামের পরিচালক মাওলানা সুলতান যওক নদভীর মাদ্রাসা থেকে। তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং উপদেষ্টা। এই পত্রিকায় মূলত লেখালেখি হয় কওমি-মৌলবাদী-জিহাদী তথা জঙ্গিবাদী বিষয়ে।

১৬. মাসিক নেয়ামত ঃ ১৯৭২ সালে 'মাসিক নেয়ামত' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুখপত্র মাসিক নেয়ামত। এই পত্রিকার সম্পাদক হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ। মাসিক নেয়ামত ২০১৪ সালের মে সংখ্যার আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী 'শাপলা চত্বরের শহীদান' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হচ্ছে– 'হয়তো হবে না আদৌ তোমাদের শহীদ মিনার/ জুটবে না বুটের সেলামী ফুল রক্তপণ ডলার-দীনার/ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে আসিবে না কপটের দল/ নির্দিষ্ট একটি দিনে কবরে হবে না কোলাহল/ চল্লিশ বছর পরও সীমারদের হবে না বিচার/ লিখিবে না কেউ কোন পত্রিকায় রঙীন ফিচার/ শহীদের সংখ্যা কত কোন দেশে কাহার নিবাস/ কোন মা কেঁদেছে কোথা ভেবে আমি হই যে উদাস/ কোন শহীদের ঠাঁই হলো কোন নিভৃত কাননে/ গভীর নিশিথে বধি এজিদেরা রাখিল কোনখানে/ কেউ কি জানাযা দিল, হয়েছে কি দাফন-কাফন/ সমর্পিতে সমাধিতে ছিল কেউ পর কি আপন?/ কারবালার শহীদদের পাওয়া যায় কোথাও কবর?/ মুমিনের অন্তরে শহীদ চিরদিন চির ভাস্বর/ শহীদের প্রতি ফোঁটা রক্ত জেনো সুগন্ধি কস্তুরী/ কাফির দেখে না হায় প্রহরীছে প্রহরী বেহেশতী/ শহীদের নামগুলো সমুজ্জ্বল মুমিন-অন্তরে/ লেখা আছে সেগুলো দীপ্তিমান সমুজ্জ্বল সোনালী অক্ষরে/ বেহেশতের গাছে গাছে শহীদেরা স্বচ্ছন্দে বিচরে/ আসিবে না তাহা কোন অবিশ্বাসী কাফিরের গোচরে।' ('মাসিক নেয়ামত' মে সংখ্যা, ২০১৪)

১৭. আল-জামিয়া ঃ ১৯৮২ সালে মাসিক আল-জামিয়া পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া মাদ্রাসার মাসিক মুখপত্র 'আল-জামিয়া'। এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক কওমি মাদ্রাসা, শিক্ষা বোর্ড বেফাকের সভাপতি ও আল হাইয়াতুল উলিয়া লিলজামিয়া কওমি মাদ্রাসা-এর চেয়ারম্যান মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও সম্পাদক মুফতি নেয়ামতুল্লাহ আল-ফরিদী। আল-জামিয়া ২০১৩ সালের জুন সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের প্রায় সবাই অহর্নিশ একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সংশ্রব নেই। পাঁচ বছরে এ বিষয়টি প্রমাণ করার কোনো সুযোগই তারা হাত ছাড়া করেননি। যে সকল কথা ও কাজের দ্বারা

এ বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে, অতি ক্ষিপ্রতার সাথে তারা সেটা সম্পন্ন করেছেন। এই অশুভ উদ্দেশ্যেই আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস উচ্ছেদ করা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোরআন-সুন্নাহকে নির্বাসিত করা হয়েছে, নাস্তিক ব্লগারদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, ইসলাম ও মহানবীর মর্যাদা রক্ষার দাবিতে অবস্থানরত নিরস্ত্র তৌহিদী জনতার উপর দেড় লক্ষ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং এখনও সারা দেশের নিরীহ মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ও হয়রানি চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হয়ে এহেন ইসলাম বৈরিতা প্রমাণের হেতু কি?' ('আল-জামিয়া' জুন সংখ্যা, ২০১৩)

১৮. মাসিক হেফাজতে ইসলাম ঃ ১৯৭৩ সাল থেকে মাসিক হেফাজতে ইসলাম পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়েছে। আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর মুখপত্র 'মাসিক হেফাজতে ইসলাম'। এই পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা রশীদুর রহমান ফারুক হামিদী ও সম্পাদক মুহাম্মদ আবদাল হোসেন খান। এই পত্রিকার ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় জহির উদ্দিন বাবর লিখেছেন, 'রক্তের জিহাদের যত না প্রয়োজন চিন্তার জিহাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি। ধারালো তলোয়ারের যত প্রয়োজন শাণিত কলমের প্রয়োজন আরো বেশি। কেননা নবুওয়তে মুহাম্মদীর ওপর আজ তলোয়ারের হামলা যতটা না চলছে, তার চেয়ে অধিক চলছে যুক্তি-প্রমাণের হামলা, চিন্তা ও দর্শনের মামলা। উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন বিংশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.। আল্লাহ তাআলা এই মহান সাধককে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। তার হৃদয়কাড়া আকুতি ও উদাত্ত আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলার আলেমরা ব্যাপকভাবে কলম হাতে নিয়েছিলেন। ১৯৮৪ এবং ১৯৯৪ সালে দু'বার তিনি বাংলাদেশে সফরে এসেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গনে ওলামায়ে কেরামের নিদারুণ অনুপস্থিতি তাকে যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত করেছিল। এজন্য দু'বারই তিনি বিভিন্ন স্থানে আলেমদেরকে খেতাব করতে গিয়ে কলম হাতে তুলে নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।' ('মাসিক হেফাজতে ইসলাম' ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০১৩)

১৯. কাফেলা ঃ ২০১৩ সাল থেকে 'কাফেলা' এর প্রকাশনা শুরু হয়। জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া সিলেট কাজির বাজার মাদ্রাসার আল ইসলাহ ছাত্র সংসদ-এর মুখপত্র 'কাফেলা'। এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আফগান ফেরত জঙ্গি মুজাহিদ ও হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাবেক নায়েবে আমির এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাবেক চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান। সম্পাদক মাওলানা ফাহাদ আমান। আল ইসলাহ ছাত্র সংসদ-এর মুখপত্র কাফেলার ২০১৩ সংখ্যায় হাফিজ মিজানুর রহমান 'জিহাদ ও নেতৃত্ব' নামের একটি কবিতায় লিখেছেন, 'জিহাদ মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যায়নি আর মানুষও জিহাদের চেতনা চিরতরে হারায়নি। মানুষের ভেতর জিহাদের চেতনা বা স্পৃহা এখনো নিভু নিভু করে অগ্নি শিখার ন্যায় জ্বলছে। প্রধান সমস্যা হল, সঠিক নেতৃত্বের অভাব কিন্তু কেন এমন হবে?

এর কারণই বা কী? অতীতে যারা সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা সর্বদা সাফল্যের মুখ দেখিয়েছেন, তারাও তো আমাদের মত মানুষ ছিলেন। তাহলে আমরা কেন পারব না? নিশ্চয় তাদের নেতৃত্ব ছিল স্বার্থহীন। আমরাও যদি তাদের মত হতে পারি, তাহলে অবশ্যই সর্বত্র আমাদের সাফল্য আসবে।' ('আল ইসলাহ ছাত্র সংসদ'-এর মুখপত্র কাফেলা সংখ্যা, ২০১৩)

জঙ্গিদের কয়েকটি মিডিয়া ও অনলাইন পত্রিকা

(১) সংযোগ মিডিয়া, (২) উপমহাদেশে আল কায়দা, (৩) ইসলামী হিন্দ, (৪) ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, (৫) আত তিবিয়ান পাবলিকেশন্স, (৬) আন নাসর মিডিয়া, (৭) আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, (৮) আর রিবাত মিডিয়া, (৯) আল কিতাল বাংলা টিম, (১০) আল আকসা বাংলা টিম, (১১) আল ফজর, (১২) আল কাদিসিয়া মিডিয়া, (১৩) আল হিকমাহ মিডিয়া, (১৪) আস সাদিক মিডিয়া, (১৫) মাসিক আর রীবাত, (১৬) তিতুমীর মিডিয়া, (১৭) মাসিক আল বালাগ, (১৮) শরীয়ত মিডিয়া, (১৯) মাসিক ইসলামী শরীয়ত, (২০) বালাকোট মিডিয়া, (২১) আস সাহাব মিডিয়া, (২২) আল ফোরকান মিডিয়া, (২৩) মাসিক লোন উলফ, (২৪) আল ফিরদাউস মিডিয়া, (২৫) মাসিক আল ফিরদাউস (বাংলা, আরবী ও ইংরেজি), (২৬) আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, (২৭) আল ইহসার মিডিয়া, (২৮) মাসিক আল ইহসার, (২৯) কালো পতাকার দল, (৩০) জান্নাতের আলো, (৩১) ইসলামের আলো, (৩২) ইসলামী ইনসানিয়াত, (৩৩) আল ফুসতাত, (৩৪) তোহফা মিডিয়া, (৩৫) পুষ্প মিডিয়া, (৩৬) তাওহীদের পতাকা, (৩৭) আল ইরফান মিডিয়া, (৩৮) দারুল ইরফান, (৩৯) বাংলাদেশ জিহাদী গ্রুপ, (৪০) এসো আল্লাহর পথে, (৪১) জিহাদী মিডিয়া, (৪২) আল ফাতাহ মিডিয়া, (৪৩) ইসাবাহ মিডিয়া, (৪৪) মুজাহিদীন মিডিয়া, (৪৫) আল মাগাজি মিডিয়া, (৪৬) স্বাধীন মিডিয়া, (৪৭) আল মানহাজ মিডিয়া, (৪৮) মিল্লাতে ইব্রাহিম, (৪৯) উসামা মিডিয়া, (৫০) আল বুরকান মিডিয়া, (৫১) দাওয়া ইলাল্লাহ, (৫২) উম্মাহ গাজওয়াহ্ নেটওয়ার্ক, (৫৩) ফিলহাল, (৫৪) ভয়েস অব ইসলাম, (৫৫) সাহম আল হিন্দ মিডিয়া, (৫৬) সাউতুল মালাহিম, (৫৭) ফুরকানুল হিন্দ, (৫৮) ওয়ে টু জান্নাত, (৫৯) নবধারা মিডিয়া, (৬০) গুরাভা মিডিয়া।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি মৌলবাদী জিহাদের বিরুদ্ধে সরকার ও সাইবার যোদ্ধাদের করণীয় সম্পর্কে অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টদের বক্তব্য

১. আসিফ মুনীর

সভাপতি, আইটি সেল, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়াতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী মতবাদের প্রচার ও প্রসার উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই শুরু হয়েছে। হানাফী মতবাদের অনুসারীরা ভারতের উত্তর প্রদেশে দেওবন্দ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এরা বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও জড়িত ছিল। এ মতবাদের অনুসারীরাই ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সাথেও জড়িত হয়ে পড়েছিল। সৌদি আরবের অর্থায়নে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের দেওবন্দ বিশ্বাসীরা সত্তরের দশকে হানাফী মতবাদ থেকে সালাফি মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সালাফী অনুসারীরা ইসলামের আদি ও বিশুদ্ধ ফর্ম ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রমশ চরমপন্থা, জঙ্গি ও সশস্ত্র সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছে। গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে ২০ ভাগ দেওবন্দ আন্দোলনের অনুসারী। পাশাপাশি পাকিস্তানে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামের গোড়াপত্তনও ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে। কাজেই ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জামায়াত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– উভয় দেশেই জামায়াত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

এই দেওবন্দ-সালাফী এবং জামায়াতপন্থী ও তদের অপভ্রংশ উগ্র, মৌলবাদী, সশস্ত্র ধর্মের নামে অপতৎপরতা স্বাধীন বাংলাদেশের একটি মৌলিক ভিত্তি, অসাম্প্রদায়িকতাকে ক্রমাগত কলুষিত ও হুমকির দিকে ধাবিত করছে। একারণেই বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভাব পড়েছে। রক্ষণশীল ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে নারী অধিকার লঙ্ঘন এমনকি নারী নির্যাতন, ভিন্ন মত ও ভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণুতা, ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, ওয়াজের নামে ধর্মের অপব্যাখ্যার প্রচার, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ, ভাস্কর্য ধ্বংস করা– এ সবই ইসলামের বিকৃতরূপে প্রকাশের সুসংগঠিত প্রয়াস। আর এই প্রয়াসকে কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক দল রোহিত করা তো দূরের কথা, সরবে-নীরবে কখনো সমর্থন করেছে কখনো বা পাশ কাটিয়ে গেছে আবার কখনো নিজেরাই প্রভাবিত হয়ে গেছে।

এই ইসলামী অপসংস্কৃতির বিগত এক যুগের একটি উল্লেখযোগ্য স্বরূপ– অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অন্তরজাল বা ইন্টারনেটে উগ্রপন্থী, মৌলবাদী ইসলাম সম্পর্কে তরুণদের মগজ ধোলাই করা। তরুণরা যে দেশের ভবিষ্যৎ, এই কথা ইসলাম

ধর্মভিত্তিক নেতারা ভালভাবেই বোঝেন। আজকের সকল শ্রেণির তরুণদের মধ্যে অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম, অনলাইন বিভিন্ন অ্যাপ, ব্লগ, ভিডিও, টিকটক, চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম, গেম অনেক জনপ্রিয় ও দিনের বা রাতের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে। আর এই তরুণদের ইসলামী গোষ্ঠীরা তাদের ভাবধারায় বিশ্বস্ত আরেক দল তরুণকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে প্রভাবিত করছে। সালাফী মতবাদের প্রচার ও সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দেয়ার নতুন মাধ্যম ইন্টারনেট ও নানা ধরণের তথ্য প্রযুক্তি। অনেক সময় পারিবারিক পরিমণ্ডলে থেকেও একটি ছেলে বা মেয়ে তার স্মার্টফোনে কি দেখছে আর তার মগজ ধোলাই হচ্ছে, তার পরিবারও বুঝতে পারে না।

এই মগজ ধোলাইকে হোয়াইট ওয়াশ করে আবার বিশুদ্ধ করতে প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক অনলাইন সংস্কৃতি। দেশে বিদেশে কিছু নিবেদিত অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট আছেন কিন্তু তারা মৌলবাদী অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টদের চেয়ে সংখ্যায় কম এবং কম সংগঠিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্লগার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন ২০১৩ সালের গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের আগে ও পরে। প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সুলিখিত, সুচিন্তাপ্রসুত এইসব তরুণদের আবার সেই সুসংগঠিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তরুণরাই নাস্তিক বলে অপপ্রচার করে কোণঠাসা করে দেয়। এমন কি প্রগতিশীল এই ব্লগারদের কয়েকজনকে হত্যা ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। এইসব দেশদ্রোহী, ধর্মান্ধ, উগ্র ও পথভ্রষ্ট তথাকথিত ইসলামীপন্থীদের কারো কারো বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তাদের বিশাল কর্মীবাহিনীর অনলাইন দুর্বৃত্তগিরি বন্ধ করা যায়নি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ ও পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের তৎপরতায় আংশিক সফলতা এসেছে মাত্র।

বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও সাংবিধানিক ভিত্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে অনলাইন ভিত্তিক নতুন একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার। সেখানে সরকার, নাগরিক সমাজ, তরুণ এ্যাক্টিভিস্ট, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী– সকলকে সমন্বিত, সংগঠিত, শানিত, সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যাকে রুখতে হলে প্রগতিশীল ইসলামী চিন্তাবিদ ও তাদের লেখালেখির সাথেও পরিচিত থাকতে হবে। এই পদক্ষেপ শুধু সারা দেশের সকল প্রান্তে নয়, প্রবাসেও বাংলাদেশি নবীন-প্রবীণদেরকে অনলাইনে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। এমনকি ভিনদেশি অসাম্প্রদায়িক এ্যাক্টিভিস্ট ও সংগঠনকেও সম্পৃক্ত রেখে তাদের কার্যকরী উদ্যোগ থেকে শিক্ষা কাজে লাগানো উচিৎ।

এসব প্রস্তাব নতুন নয়, কিছু কিছু কাজ হচ্ছেও– তবে গঠনমূলক কাজের চেয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির সমাজ ধ্বংসের অপতৎপরতা অনেক বেশি বেগবান। তাই অসাম্প্রদায়িক শক্তির গতিপ্রকৃতি আশু পরিবর্তন ও শক্তিশালী করা বর্তমান সময়ের প্রধান কর্তব্য। সুফী মতবাদ থেকে শুরু করে ইসলামের অনেক মতবাদ আছে যা গঠনমূলক ও মানব কল্যাণে সহায়ক– অনলাইন মাধ্যমে যেমন তার প্রসার দরকার, তেমনি হাজার বছরের বাঙ্গালি-আদিবাসী সংস্কৃতির মাঝে যে মিলনের বাণী, অসাম্প্রদায়িকতার আর সার্বজনীনতার সুর আছে– তারও প্রচার দরকার।

২. কানিজ আকলিমা

সভাপতি, ব্লগার এ্যান্ড অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক

জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তাদের জিহাদি কাজকে সংগঠিত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বেশি সক্রিয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করা সহজ ও এর বিস্তার বেশি। এটি তেমন সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল নয় এবং এতে শারীরিক উপস্থিতির দরকার নেই। তাই যে কোনো জায়গা থেকে নিঃশব্দে তারা পৌঁছে যাচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে। এরা ধর্মীয় খোলসে প্রচার চালায়, তাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে। ইতোমধ্যে তাদের নানারকম বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বিশেষত ওয়াজের ছলে দেশবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, নারী বিরোধী, চারু ও কারুকলা এবং শিল্প সংস্কৃতিবিরোধী প্রচারণা নিয়ে নিম্নবিত্তের মধ্যে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এরা আশঙ্কাজনকভাবে পৌঁছে গেছে। একজন সাধারণ মানুষ যা পছন্দ করে জঙ্গিরা সেভাবেই নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে। যেহেতু এদের প্রচারণার বিরুদ্ধে অন্য কেউ তেমন জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ করছে না, তাদের বক্তব্য খন্ডন করছে না ফলে সাধারণ মানুষ নানারকমের বিভ্রান্তিতে পড়ছে। যে তরুণ সম্প্রদায় সৃজনশীলতার সঙ্গে জড়িত ছিল তারাও আলোর অভাব বোধ করছে। মৌলবাদীদের কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে শক্তিশালী রূপটি জঙ্গি জিহাদিরা কাজে লাগাচ্ছে তার পিছনে তারা লক্ষ্য স্থির করে উপাদান যোগ করছে। সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা, উপাদান সরবরাহ, বিষয়বস্তু তৈরি ও প্রচারের কাজে বেকার তরুণ থেকে শিক্ষকসহ সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষকে তারা যুক্ত করছে। বলাই বাহুল্য এই সকল কাজের জন্য স্তর বিন্যাস করে নিবেদিত ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের তারা পুরস্কৃত করে।

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করলে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের রুখে দেওয়া সম্ভব। তবে কোনো কোনো সেক্টরে কিভাবে কাজ করতে হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে হবে। অবশ্যই তা যেনতেন প্রকারে নয়, সমাজবিদ এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সমন্বয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মত সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। জঙ্গি মোকাবেলাকে রাজনৈতিক অঙ্গীকারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জঙ্গি দমন ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদের উন্নয়নকে একই গুরুত্বে এগিয়ে নিতে হবে। কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচারের জন্য সাইবার যোদ্ধাদের সহায়তা দিতে হবে। দেশের মানুষের কাছে ধর্ম ও ধর্মান্ধদের পার্থক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা সহজ করে তুলে ধরতে প্রশাসনিক সমর্থন ও সহায়তা দিতে হবে।

দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা জিহাদিদের বিরুদ্ধে যে কাজ করে যাচ্ছে তা আরও বেগবান হবে যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেহেতু তরুণরা বেশি সক্রিয় থাকে তাই মুক্তবুদ্ধির তরুণদের নিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সামাজিক সেল তৈরি করে সাইবার যুদ্ধটা চালিয়ে যেতে হবে। অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ ও

প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর ইতিহাস আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জঙ্গিদের সাইবার কার্যক্রমের দিক থেকে যেকোনো বয়সের নারী পুরুষ মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তাদের কন্টেন্টকে শেয়ার করা ও বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জঙ্গিদের সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে যাতে তারাও জঙ্গিদের ছলচাতুরী ধরতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তাদের পরিবারের কাছে বার্তা পাঠাতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় নেতার আবরণে যারা জঙ্গিবাদ চালায় সে ব্যাপারে সরকার সচেতন থেকে তাদের প্রশ্নবোধক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সামনে নিয়ে এলে অসাম্প্রদায়িক তরুণ প্রজন্মের সাইবার যোদ্ধারা তা বিপুলভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

দেশকে মৌলবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নকে স্থায়ী করতে হলে একই সাথে মানসিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দরকার। অনলাইনে ছোট ছোট লেখা, আনন্দময় চিত্র বা নানা বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সুন্দর জীবনের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা দরকার যেন তারা জঙ্গিদের প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়তে পারে। নতুবা মানবসৃষ্ট যে কোনো দুর্যোগে দেশের পুরো কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। সিরিয়া আফগানিস্তানের মত দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে শুধু মৌলবাদের বিস্তারে। না বুঝে ধর্মের টোপ গিলে এই মৌলবাদকে প্রশয় দিয়েছিল সেই সব দেশের সাধারণ মানুষই যাদের কাছে আজ স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তাটুকু নেই। ফলে মৌলবাদকে রুখতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতেই হবে। আর যাত্রাটিকে সফল করতে উপযুক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে, প্রচারণার ধরণ নির্ণয় করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও সাইবার যোদ্ধাদের নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে যেতেই হবে।

৩. সাব্বির খান

কম্পিউটার প্রকৌশলী ও আইটি বিশেষজ্ঞ

জঙ্গি-মৌলবাদী গোষ্ঠী শুরু থেকেই সামাজিক মাধ্যমকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। জামায়াত-শিবির এক যুগের বেশি সময় পেইড ক্যাম্পেইনার নিয়োগ করে অনলাইনে তাদের মতধারা প্রচার করছে। ২০০৭ সাল থেকে প্রগতিশীল ঘরানার তরুণদের একটি দল ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে প্রচারণায় সক্রিয় হলেও ২০১৩ সাল থেকে সরকারের অসহযোগিতার কারণে প্রগতিশীলতার পক্ষে নতুনদের অংশগ্রহণ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়। একই সাথে সরকারের একাধিক নীতিনির্ধারণী মহল মনে করছেন যে, ফেসবুক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারা কী লিখছে সেটা মোকাবিলা করা কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ নয়! অথচ আমরা জানি, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় না। জঙ্গি-মৌলবাদের আস্ফালন ও বিস্তার কোনোভাবেই থেমে থাকেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে!

যেহেতু ফেসবুক বাংলাদেশিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম তাই এখনও চরমপন্থীরা এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছে

দীর্ঘদিন। এছাড়াও তরুণদের আকৃষ্ট করা ও জিহাদের প্রচারে অসংখ্য আইপি, ওয়েবসাইট, ফোরাম, ব্লগ এবং বার্তা চ্যানেল রয়েছে, যেখানে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বইপুস্তকে পূর্ণ এবং যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে 'জিহাদ' তথা 'আল্লাহর শাসন' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে তারা। সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনলাইনে মৌলবাদী কার্যকলাপের বিশাল সংখ্যার ওপর সহজে নজর রাখতে পারে না বা সম্ভবও হয় না এবং তাদের সংখ্যাও কমাতে পারছে না। এমনকি কোনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে মৌলবাদী প্ল্যাটফর্ম বা তাদের উগ্রবাদী ও জিহাদি কার্যকলাপ মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট রসদও নেই।

২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় দেশের সবচেয়ে ভয়ংকর জঙ্গি হামলার পর বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা মারা পড়েছে আবার জীবিতও আটক হয়েছে। গুলশান হামলার পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা জোরদারের সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে জঙ্গিবাদী আদর্শ মোকাবেলার বিষয়টি। গুলশান এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলায় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আইএস দায় স্বীকার করলেও বাংলাদেশ সরকার কখনোই দেশের মধ্যে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়নি। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও শরিয়া আইন কায়েম করাই জিহাদিদের মূল লক্ষ্য। তাদের মতে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের তাগুতী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করতে হবে। তারা সফলভাবে তরুণদের একটি অংশকে বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের উপর অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে ধর্মযুদ্ধ করাটা হলো মুসলমানদের বীরত্ব প্রদর্শনের একমাত্র সুযোগ। এই কাজে তারা নির্বিচারে, বিরামহীন এবং বাধাহীনভাবে ব্যবহার করছে অনলাইনের বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৌলবাদীরা সংগঠিতভাবে প্রচারণা চালায়। অনলাইন প্রচারণার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীবাহনী এবং বেতনভোগী লোকজনও তাদের রয়েছে। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষে যারা লেখালেখি করেন তারা অসংগঠিত। তাদের মধ্যে আবার অনেকের ধারণা যে, অসাম্প্রদায়িক চেতনা-প্রসারে লেখালেখি করলে একদিকে যেমন তাদের উপর জঙ্গি হামলার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে আইসিটি আইনে গ্রেপ্তার হওয়ারও ভয় থাকে। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফেসবুক ও ব্লগে লেখার পরিবর্তে বিভিন্ন ইস্যুতে নিজ দলের পক্ষে জবাব দেওয়া এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করাকে দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা জরুরি মনে করছেন। অনেকের মতে, এই প্রবণতা থেকেই মূলত অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষের কর্মীদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের মতে, 'জনগণের বিশেষভাবে তরুণ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সাইবার যুদ্ধে

সাম্প্রদায়িক অপশক্তির জিহাদ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সাইবার যুদ্ধ সার্বক্ষণিক। এই যুদ্ধ কোনো আন্তর্জাতিক আইন বা কনভেনশন মানে না। যেভাবে সর্বত্র জিহাদের ভাইরাস ছড়ানো হচ্ছে তার ফলে ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়ার মতো ভবিষ্যতে বিশ্বে বহু গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যা সংঘটিত হতে পারে।' মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনলাইনের একজন যোদ্ধা এবং আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে শাহরিয়ার কবিরের এই পরামর্শের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে জঙ্গি বা উগ্রবাদ প্রতিহত করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মডেল থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি এবং তা আমাদের মতো উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারি। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শুধু আভিযানিক পদক্ষেপ তথা পদ্ধতির মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দমন শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের কোথাও সম্ভব নয়। লড়াইটা যেহেতু আদর্শিক তাই এর মোকাবেলার পদ্ধতিও হতে হবে একই পন্থায়। তরুণদের মধ্যে একাত্তরের পক্ষের আদর্শকে গ্রহণযোগ্য করতে অনলাইন যোদ্ধাদের সাথে সরকারকে একই মঞ্চে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞ অনলাইন যোদ্ধা যারা আছেন, প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ নিয়ে সরকারকে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনলাইন যুদ্ধটা বাহ্যিকভাবে দেখতে যতটা সহজ মনে হয়, কঠিন তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি। সুতরাং এ যুদ্ধে জিততে হলে মেধা, মনন, ঐকান্তিক ইচ্ছা ছাড়াও একটা প্রযুক্তিক শিক্ষিত ও চৌকষ কর্মীবাহিনী তৈরি করতে হবে, যা কারো পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। সরকারকে অবশ্যই এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এগিয়ে আসতে হবে এবং অনলাইনের এই যুদ্ধযজ্ঞে প্রয়োজনীয় রসদ যোগাতে হবে। এর ব্যত্যয়ে যে অমানিশার সৃষ্টি হবে, তা থেকে সরকার, জনগণ এবং একাত্তরের আদর্শ, কিছুই রেহাই পাবে না।

৪. মারুফ রসুল

ব্লগার ও গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক

সাইবার জগতে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আমার মতামতগুলো হলো-

১. সর্বপ্রথম আমাদের প্রত্যাশা– সাইবার জগতটিকে সরকার আমলে নেবেন। সারা পৃথিবীতেই সাইবার জগৎ এতোটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, এখনই যদি এর লাগাম আমরা ধরতে না পারি, তো ভবিষ্যতে তল খুঁজে পাবো না। এজন্য এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধিদপ্তর রাখা উচিৎ, যারা কেবল সাইবার জিহাদ মোকাবেলা করবেন তা-ই নয়, তার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন এবং এ বিষয়ে আইনি দিকগুলো মোকাবেলা করবেন।

২. আমাদের সরকারের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পর্কে যে তথ্যাদি গণমাধ্যম সূত্রে পাই, একজন নাগরিক

হিসেবে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমাদের মন্ত্রী পদমর্যাদার একজন ফেসবুক বা গুগলের কোনো তৃতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে বসতে পারেন না– এটা প্রটোকল সম্মতও নয়। তারা ব্যবসায়ি, সুতরাং তাদের সিইও বা পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গেই আমাদের দেন-দরবার করা উচিৎ।

৩. সম্প্রতি গুগল এবং অ্যামাজন ভ্যাট নিবন্ধন করেছে। এটা সুসংবাদ অবশ্যই কিন্তু আইনি বিষয় সম্পর্কিত জটিলতাগুলো পরিষ্কার নয়। একটু ব্যাখ্যা করে যদি বলি, ইউটিউব (যার স্বত্বাধিকারী গুগল) এবং ফেসবুকে এমন অগণিত কন্টেন্ট আছে, যেগুলো বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বৈধ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আইনি দেন-দরবারটি তাদের সঙ্গে কীভাবে করা যায়? মনে রাখা প্রয়োজন, এসব মাধ্যমে যে কন্টেন্টগুলো ছড়ানো হয়, সেগুলো টাইম সেনসেটিভ। ধরা যাক, একজন ব্যবহারকারী ধর্মীয় উন্মাদনাকে উসকে দিতে একটি পোস্ট দিয়েছে। সরকারের নজরে আসার পর সরকার সেটি নামানোর জন্য ফেসবুক বা গুগলকে অনুরোধ করবে, যাকে আমরা Take Down Request (TDR) বলি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো তারা সাড়া দেন না। ফলে দুর্ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে যায়। ফেসবুক বা গুগল যদি সাড়া দেয়ও, তখনও নানা আইনি জটিলতা থাকে। কারণ তারা বাংলাদেশেরই কোনো আইনি প্রতিষ্ঠান বা আইনজীবীদের দিয়ে বিষয়টি পরীক্ষা করান, তারপর সরকারকে জানিয়ে দেন– অমুক অমুক আইনের তমুক তমুক ধারাবলে আপনার অনুরোধ রাখা যাবে না। প্রশ্ন হতে পারে, এরা কি এটা সবার সঙ্গেই করে? উত্তর হচ্ছে– না, সিঙ্গাপুর এমনকি কম্বোডিয়ার মতো দেশেও তারা সংশ্লিষ্ট দেশের সমস্ত আইনকানুন মেনে তাদের ব্যবসা চালায় কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা সরকারের নির্দেশ গায়ে মাখে না। এ বিষয়ে সরকারকেই কঠোর হতে হবে এবং তাদেরকে আইনি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে হবে। সম্প্রতি ভারত এ বিষয়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

৪. যেহেতু পূর্বে উল্লেখ করেছি, গণমাধ্যমগুলোর ফেসবুক পেইজ বা ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট সেকশন বর্তমানে সাইবার জিহাদের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সেহেতু এ বিষয়ে সরকার একটি আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিলেই হবে। পদক্ষেপটি হলো– যেহেতু সকল গণমাধ্যমই নিজস্ব ফেসবুক পেইজ বা ইউটিউব চ্যানেল নিজেরাই অপারেট করে, তাই তাদেরকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল করে তোলা অর্থ্যাৎ এই নির্দেশনা রাখা যে, তাদের নিউজ লিংকের নিচের কমেন্ট সেকশনও তাদেরই দায়-দায়িত্ব। সেখানে যদি জঙ্গি তৎপরতা চালানো হয়, ভুল বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়, তবে সেই গণমাধ্যমকে আইনির মুখোমুখি হতে হবে। তাহলে গণমাধ্যমগুলোও এ বিষয়ে সতর্ক হবে। চাইলে তারা তাদের মন্তব্য সেকশনে করা কোনো জঙ্গি অপতৎপরতার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। ২০২০ সালে সারাবাংলা ডটনেট পেইজে ঘোষণা দিয়ে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫. সবশেষ বিষয়টি হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আধিপত্য বাড়ানো। সত্য ইতিহাস, তথ্য, মেধা আর সৃজনশীলতা দিয়েই এটা সম্ভব। শুধু সরকারের সদিচ্ছাটুকু প্রয়োজন। সরকার যদি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য লোক নিয়োগ করে (এই নিয়োগ সরকারি হতে হবে, আউটসোর্সিং করলে সরকারি নথি বেহাত হয়ে যাবে) তাহলে কর্মসংস্থানও বাড়বে আবার সাইবার জগতে সরকারের উপস্থিতিও বাড়বে। আউটসোর্সিং করে সরকার বিভিন্ন উপলক্ষ্য (জাতীয় দিবস, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সপ্তাহ ইত্যাদি) ধরে যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য কন্টেন্ট তৈরিতে স্পন্সর করে, তাহলেও অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো। যেমন ধরা যাক, জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ বা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সরকার নানা খাতে বরাদ্দ রেখেছে কিন্তু তার কতোখানি সাইবার জগতের জন্য? টেলিভিশনের জন্য প্রোডাকশন বানানো হচ্ছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য হচ্ছে না। এতে কম বাজেটে সরকার অনেকগুলো ভালো মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস সম্বলিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে পারবে। এই ধরনের কাজ কিছুটা হয়েছিল ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে, নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য হলো- সাইবার জিহাদের যে দৃশ্যত রূপ আমরা দেখি, সেটা উপরিতল। তাকে মোকাবেলার জন্য আমাদের একটু সচেতন আর উদ্যোগী হলেই চলবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন জঙ্গিবাদের যে উপস্থিতি আছে, সেটা সাম্প্রদায়িক জনমনস্তত্ত্ব তৈরির প্রক্রিয়া। একে ধসিয়ে দিতে পারলে সাইবার জিহাদের উপরিতলটাকে আমরা পরিষ্কার রাখতে পারবো কিন্তু সাইবার জিহাদের যে জটিল নেটওয়ার্ক, তাকে পরাস্ত করতে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর দক্ষতা ও তৎপরতার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

৫. অমি রহমান পিয়াল

ব্লগার, সাংবাদিক ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

'আর ক'টা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি'- শুনতে শুনতেই কয়েক বছর পার করে দিলাম আমরা! আমরা বলতে অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টরা, যারা 'বুলবুলিতে ধান খাচ্ছে" সোচ্চারে দিনমান লড়ে যাচ্ছি। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার লেবাসে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রসার ঠেকানো যায়নি। তবু লড়ে যাচ্ছি। হলি আর্টিজানকাণ্ডে গোটা বিশ্ববাসী যখন চমকালো, তখনও সরকারের টনক ঠিক নড়েনি। সেটা নড়লো ২০২১ সালের ২৬ মার্চ যখন এই জঙ্গিরা তাদের হিংস্রতার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখালো। সরকারও বুঝলো এদের দমনের সময় এসেছে কিন্তু জেলে ভরলেই কি এই শ্বাপদকুল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব? আমরা তো দেখছি প্রশাসন প্রায়ই জেএমবির এই সেল সেই সেলের কুশীলবদের গ্রেপ্তার করছে। তারা কিছুদিন পর জামিনে বেরও হয়ে যাচ্ছে। কোনো মনিটরিং নেই। হেফাজতের জঙ্গিদের গণগ্রেপ্তারের মাধ্যমে আটক রাখা হলেও তাতে কি প্রলয় বন্ধ হয়েছে? হয়নি বরং জঙ্গিবাদের থাবা আরো ব্যাপ্তি পাচ্ছে অনলাইনে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে লোকালয়ে।

একটু ঘেঁটে দেখলেই বোঝা যায়, যে সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের উৎসমূল কোথায়। এই শক্তিই একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, এই শক্তিই মুক্তিযুদ্ধে

আমাদের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের হোতা। এই শক্তিই মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি ও সংবিধান বিরোধিতায় বলীয়ান হয়ে চেতনার স্তম্ভে দিনরাত হাতুড়ি ঠুকে যাচ্ছে। ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে উগ্রতা মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে এরাই। এরাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সৃষ্ট গণআদালতের নেতৃত্বকে ইসলাম বিরোধী নাস্তিক ও মুরতাদ ঘোষণা করেছে। শাহবাগ আন্দোলনকে একইভাবে ট্যাগিং দিয়েছে। ব্লগারদের হত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে। হত্যার পর তা জায়েজ করতে ফতোয়া দিয়েছে। এই খুনীদের এবং হলি আর্টিজান গণহত্যায় জড়িতদের ব্রেইনওয়াশের মাধ্যম ছিল অনলাইন। আইএস এদের রিক্রুট করেছে অনলাইনেই। তাদের বাহবা দেওয়া এবং কৃতিত্ব নেওয়াটাও ঘটেছে অনলাইনে। এটাই চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র- এই উপলব্ধিবোধে দেরি যতো হবে, সর্বনাশ ও ক্ষতির সম্ভাবনা ততো বাড়তে থাকবে।

অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে প্রধান সমস্যা তাদের যুথবদ্ধতার অভাব। এই সুনির্দিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে তারা একমঞ্চে নেই। এই ফোকাসের অভাব আরো প্রকট হয়ে ওঠে নিজস্ব এজেন্ডা ও পারস্পরিক হানাহানিতে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিতে অনুপ্রবেশ প্রচুর এবং তাদের উস্কানিতে এ্যাক্টিভিস্টরা এক হয়ে লড়তে পারেনি কখনও। অথচ সময়ের দাবি একসঙ্গে লড়ার। এই লড়াইটা দেশের জন্য, স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার লড়াই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লড়াই। এই বোধ নিয়েই সব ইগো ভুলে, সমস্যা মিটিয়ে এক মঞ্চে লড়তে হবে। সেটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন যার যা আছে, যে অবস্থানে যে আছে, সেখান থেকেই লড়ে যেতে হবে। কারো আশায় বসে থাকা যাবে না। অনলাইনে যারাই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লিখছে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। তাদের পোস্টে গিয়ে মন্তব্য করতে হবে। পোস্ট শেয়ার করে ছড়িয়ে দিতে হবে। উন্নাসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

সরকারের দায়িত্ব অনলাইন প্লাটফর্মগুলোয় নজরদারি বাড়ানো এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এ্যাটিভিস্টদের উৎসাহ যোগানো, তাদের পাশে থাকা। উগ্রবাদীরা কাউকে ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছে বলে মিছিল করলেই তাকে ধরে জেলে ভরা উচিত হবে না। ফেসবুক এবং ইউটিউবসহ গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্মগুলায় কিভাবে উগ্রবাদ ছড়ানো হচ্ছে তার জন্য একটা সেল খুলতে পারে তারা। সেখানে ইউজাররা ক্ষতিকর লিংকগুলো দিয়ে অভিযোগ করতে পারবে। হ্যান্ডসেট ও সিমকার্ড নিবন্ধনের যে নীতিমালা তৈরি হয়েছিল তা থেকে সরে আসাটা একটা বড় ধাক্কা। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বেনামে উগ্রবাদ প্রচারে একটা বড় ধাক্কা দেয়া যেত। সরকার চাইলেই একটা ঘোষণা দিয়ে জঙ্গিবাদ বিরোধী এ্যাক্টিভিস্টদের একাট্টা করতে পারে। তাদের লড়াইটা সুচারু ও পরিকল্পিতভাবে লড়তে উৎসাহ যোগাতে পারে। এজন্য নতুন কোনো মন্ত্রণালয় খোলার দরকার নেই। সদিচ্ছার সঙ্গে একটা ঘোষণাই যথেষ্ট।

৬. লীনা পারভীন
কলামিস্ট ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

বর্তমান বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই মাধ্যমটির উপস্থিতি যেমন অস্বীকার করা যায় না আবার এর নেতিবাচক ব্যবহারের মাত্রা দিনেদিনে বেড়ে যাওয়াও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে কোনো একটি ইস্যু এলেই একে কেন্দ্র করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক লেখালেখি চলতেই থাকে। এর মধ্যে কখনও কখনও নেতিবাচক বা ভুয়া সংবাদ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে সরকারের পক্ষেও সে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়না। আর এই গুজব বা ভুয়া সংবাদগুলো কারা ছড়াচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তরে এক বাক্যে বলা যায় এর পিছনে সক্রিয় আছে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী যাদের লড়াইটা সত্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মূলত এরা ফেসবুককেন্দ্রিক হলেও এদের কার্যক্রম ছড়িয়ে আছে ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম বা এমন আরও কিছু সামাজিক মাধ্যমে। এটি এখন পানির মত সহজ হিসাব যে, নানা ধরণের ভুলভাল ও মিথ্যা কন্টেন্টকে কেন্দ্র করে তারা রাষ্ট্র বিরোধী কাজও করে যাচ্ছে। কয়েকজন আছে যারা দেশের বাইরে বসে মিথ্যাচার করে যাচ্ছে সমানতালে।

এখন কথা হচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে কিভাবে কী করা যায়? এই ইস্যুটি নিয়ে অনেকদিন থেকেই আলোচনা হচ্ছে কিন্তু সঠিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এখানে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার ও শক্ত হওয়া উচিৎ। সরকার তার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে চাইলেই ফেসবুকে যেসব মৌলবাদী গ্রুপ বা পেইজ আছে তাদের বিরুদ্ধে একটি মিশন নিতেই পারে। এক্ষেত্রে অন্যতম একটি পদক্ষেপ হতে পারে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনায় যাওয়া। ফেসবুকের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অথচ এদের উপর আমাদের সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যেসব অনলাইন যোদ্ধারা আছে তাদেরকে নানাসময়ে নানা অযুহাতে ফেসবুক নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের নামে তাদের আইডি ব্যান থেকে কার্যক্রমকে সীমিত করে রাখে। অথচ যারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে তাদের আইডি রিপোর্ট করলেও ফেসবুকের কোন নিয়ন্ত্রণ পড়ে না। এটি একটি বৈষম্যমূলক কার্যক্রম যেখানে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী মূলত তরুণ ও যুবকদের টার্গেট করে কাজ করে। তারা সরাসরি ফাইটের চেয়েও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের কৌশলে আগায়। মিথ্যাকে বহুল প্রচারের মাধ্যমে সত্যের দুয়ারে হাজির করে ফেলে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সত্য আর মিথ্যার মধ্যে ফারাক বুঝতে পারে না। আর এর জন্য দায়ী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লড়াকুদের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক লড়াইয়ের মানষিকতার অভাব, আত্মঅহমিকা। মৌলবাদীদের মধ্যে ঐক্য অত্যন্ত শক্ত। কোনোভাবেই এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা

সম্ভব হয় না কারণ তারা জানে তারা কেন লড়ছে আর কী তাদের লক্ষ্যবস্তু। অথচ ঠিক এই জায়গাটিতেই আমরা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছি। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ। দিনশেষে আমরা ভেঙ্গে যাই, ভেঙ্গে ফেলি অনেক কিছু। শক্ত হাতে লড়াইটা করে ফলাফল অর্জনের পথটা তাই হয়ে যায় কঠিন।

আমাদেরকে আরও অনেক সক্রিয় হতে হবে সামাজিক মাধ্যমে। ইতিবাচক প্রচারণাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গুজব ছড়ানোর আগেই। হাজার হাজার ফেইক আইডি চালিয়ে অনলাইন জগতকে দখলে রাখছে তারা। এই জায়গায় আমাদের কোনো কৌশলই নেই। সেইসব ফেক আইডিগুলোকে চিহ্নিত করতে পারছে না আমাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার লোকেরা। পর্ন সাইটে কখনও গুজব ছড়ায়না। তাই আমাদের ফোকাস ঠিক করতে হবে। ফোকাসলেস যুদ্ধ দিয়ে অর্জনের ঝুড়ি ভরা যাবে না।

অনলাইনে লড়াই চালাতে গেলে সরকার ও অনলাইন যোদ্ধাদের মিলিত লড়াই লাগবে। সরকার করবে তার আইন কানুন ও রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার দিয়ে আর অনলাইন যোদ্ধারা সেই ছায়ায় থেকে লড়াই করে যাবে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে। লড়াইটা খুব কঠিন না কিন্তু সম্মিলিত কৌশল নির্ধারণ করাটাই চ্যালেঞ্জ।

৭. শওকত খান

ব্লগার, সাংবাদিক ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

জঙ্গিবাদী মনোভাবের প্রকাশ, ঘৃণার চাষাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, দেশবিরোধী অপপ্রচার– এই বৈশ্বিক সমস্যাগুলো শুধু আমাদের চারপাশেই নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভার্চুয়াল জগতেও ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে বাস্তব জগতে অনেকখানি চাপের মধ্যে থাকায় দুর্বৃত্ত, জঙ্গি, সন্ত্রাসী, উগ্রবাদীরা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় হচ্ছে আগের চেয়েও অনেক বেশি। ভার্চুয়াল জগতে খুব সহজেই তরুণদের ব্রেনওয়াশ করা সম্ভব। যেখানে দেশে প্রায় ১৪ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সেখানে ঝুঁকির মাত্রাটা স্বভাবতই অনেক উচ্চ।

জঙ্গিবাদ বা উগ্র মতাদর্শ প্রচার প্রতিরোধ একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হওয়া উচিৎ। লাঠিচার্জ ও বলপ্রয়োগ করে এসব দমন করা যায় না। এটার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তাই সমূলে উৎপাটন করতে হলে সরকারের পাশাপাশি তরুণ সমাজকেও এতে সম্পৃক্ত করতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধই এই বৈশ্বিক সমস্যাকে হঠিয়ে দিতে পারে।

সরকারের করণীয় কী: ধর্মীয় শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে পৃথক করা জরুরি। এটি কর্মক্ষেত্রে জরুরি নয়। মূলত ধর্মীয় শিক্ষার নামে সূক্ষ্মভাবে উগ্রবাদের চাষাবাদ করা যায়। যুগোপযোগী ও কর্মোপযোগী শিক্ষায় উগ্রবাদী মতাদর্শ প্রচারকদের আবেদন কমিয়ে দিবে। একজন শিক্ষার্থী যখন শিক্ষাজীবন শেষে দ্রুত কর্মসংস্থান করতে পারবে তখন তার হতাশা কমে যাবে। সুস্থ জীবন-যাপনকারী তরুণদের ভুল পথে পরিচালিত করা কঠিন। পাঠ্যপুস্তকেও এ বিষয়ে সচেতনতামূলক পাঠ সংযোজন করা যায়।

উগ্র মতাদর্শ, উস্কানিমূলক ও দেশবিরোধী বক্তব্য, জঙ্গিবাদী মনোভাব, ধর্মীয় বিবাদ প্রচারের পথ বন্ধ করতে হবে। উগ্রবাদ প্রচারের সুযোগ যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়– এই ম্যাসেজটা দিতে হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ঘৃণাবাদ ছড়ানো হয় গণমাধ্যমগুলোর ফেসবুক পেজের কমেন্ট সেকশনে। তাই সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক, যেন তারা পেজের কমেন্ট সেকশন মডারেশন করে। উস্কানিমূলক মন্তব্য মুছে দেয়, আইডি ব্যান-এর ব্যবস্থা যেন নেয়। এতে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর জায়গাটা সংকুচিত হয়ে যাবে। এছাড়া জনগণের ক্ষোভকে ট্রিগার করা, উস্কে দেওয়া সংবাদ শিরোনামের ওপরেও সেন্সরশিপ আরোপ জরুরি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাইবার সেলকে আরও সক্রিয় করতে হবে। ডেডিকেটেড হটলাইন নাম্বার, ই-মেইল, ফেসবুক পেজ, অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ করলে তা যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়। অভিযোগ গুরুতর না হলেও অভিযুক্তের পরিচয় বা আইডি মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা জরুরি। যেন পরবর্তীকালে আবারও অভিযোগ পেলে পূর্ববর্তী অভিযোগও খতিয়ে দেখা যায়। এ সংক্রান্ত অভিযোগ বা মামলাগুলো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় থাকলে দ্রুত সমাধান মিলবে।

পুলিশ কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে পারেন। এতে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আইন কত কঠোর, তা বুঝতে পারলে অনেকেই শুধরে যাবে। এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন হবে শিক্ষার্থীরা। তবে এসব কার্যক্রমে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা জরুরি। ধর্মীয় উপাসনালয়, ওয়াজে ধর্মীয় বক্তাদের ওপর নজরদারি করতে হবে। জুমার খুতবার নামে, ধর্মসভা বা ওয়াজে উগ্র মতবাদ ও ঘৃণা যেন ছড়াতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। দেশ, সমাজ ও ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করা যায়– এমন বিভ্রান্তিকর, রাষ্ট্রবিরোধী এবং অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। বিশেষ করে ওয়াজের আয়োজনের পূর্বে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে সরকারকে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেন হয় তাদের পলিসি– সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। মার্কিন বা ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড আর বাংলাদেশি স্ট্যান্ডার্ড এক নয়। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস বিকৃতিও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, যা সোশ্যাল মিডিয়ার কমিউনিটি রুলস ভঙ্গ করে– ফেসবুককে দিয়ে সেটি নিশ্চিত করাতে হবে। পলিসি আমাদের আইন অনুযায়ী হলে তার সুষ্ঠু ফলাফল মিলবেই।

সাইবার যোদ্ধাদের করণীয় কী: সাইবার যোদ্ধারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ভার্চুয়ালি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করতে পারে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপ বা পেজে সচেতনতামূলক পোস্ট, ভিডিও কন্টেন্ট প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতে পারে। জঙ্গিবাদ আর ধর্ম প্রচার যে এক নয়, সেটা তুলে ধরতে হবে। উগ্রবাদীরা সাইবার যোদ্ধাদেরকে যেন ধর্মবিদ্বেষী বলে আখ্যা দিতে না পারে, সেজন্য নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরতে হবে।

কীভাবে ক্ষতিকর কন্টেন্ট চিহ্নিত করে তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়- এ বিষয়ে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উগ্র মতাদর্শী বক্তব্য ফেসবুকে রিপোর্ট করা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরে আনা– এসব কাজ দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কন্টেন্ট রিমুভ কিংবা আইডি রিপোর্ট করানোর যথাযথ ও কার্যকর প্রক্রিয়া জানতে হবে। কন্টেন্ট রিমুভ করাতে পারলে অনেক সমস্যা গোড়াতেই সমাধান করা যায়।

তবে সাইবার যোদ্ধাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতি-সক্রিয় থাকা জরুরি। কোনো উগ্রবাদী বক্তব্য কিংবা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর মিথ্যাচার দেখে এড়িয়ে যাওয়া মানে অত্যন্ত সাধারণ ইউজারদের মাথায় ঘৃণার চারা গজানোর সুযোগ করে দেওয়া– এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে যথাযথ তথ্য উপাত্ত এবং দলিল উল্লেখপূর্বক মিথ্যাচারের জবাব দিতে হবে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভয় দেখিয়ে উগ্রতাকে দমন করা যায় না। জঙ্গিবাদী মতাদর্শ ঠেকাতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত জবাব। তারা যে ভ্রান্তির পথ দেখাচ্ছে, সেটা এক্সপোজ করতে হবে। যৌক্তিক আলোচনায় কাজ না হলে এবং উগ্রতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে আনতে হবে। যেন তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নজরদারি জারি রাখতে পারে।

পরিশেষে, সরকারকে একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে সাইবার যোদ্ধাদের সাথে সমন্বিত আলোচনার মাধ্যমে এই গাইডলাইন প্রণয়ন করা যায়। সেই স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার অনুসরণ করা গেলে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ঘৃণা এবং উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডকে সহজেই চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তরুণ প্রজন্মের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদ একটি পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে।

৮. সুলতান মির্জা

অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

সরকারের যা করণীয়ঃ

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ঘৃণাবাদ ছড়ানো হয় ফেসবুক পেজের কমেন্ট সেকশনে। তাই সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্দেশ দিতে হবে, যেন তারা কমেন্ট সেকশন মডারেশন করে। উস্কানিমূলক মন্তব্য নিয়মিত রিমুভ করার মাধ্যমে প্রকাশ্য ঘৃণা ছড়ানো নিরুৎসাহী করে। এছাড়া গণমাধ্যমের টুইষ্ট সাংবাদিকতা যার মাধ্যমে অধিক ভিউ হয় অর্থ্যাৎ জনগণের ক্ষোভকে উস্কে দেওয়া সংবাদ শিরোনামের ওপরেও সেন্সরশিপ আরোপ জরুরি।

দক্ষ লোকজন দ্বারা প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অধীনস্থ সাইবার সেলকে আরও সক্রিয় করতে হবে। এ সংক্রান্ত অভিযোগ বা মামলাগুলো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় দ্রুত বিচার সম্পাদন করলে খুব দ্রুত সমাধান মিলবে। ধর্মীয় উপাসনালয় ও বক্তাদের ওপর নজরদারি করা জরুরি। শুক্রবার মসজিদে জুমার খুতবার নামে, ওয়াজে উগ্র মতবাদ ও ঘৃণা যেন

ছড়াতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু ধর্মীয় বিবেচনায় না দেখে যেকোনো ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করার পূর্বে আয়োজকদের প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের ব্যানারে জঙ্গি মৌলবাদ জিহাদ উস্কে দেওয়া বা সমর্থন করা ধর্মীয় ধারা ওহাবীবাদ মওদুদীবাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মসজিদ মাদ্রাসাগুলোতে তারা সক্রিয় হয়ে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ জিহাদ বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। কাজেই শুধু ধর্মরক্ষা বা ধর্ম অবমাননারোধ এইসব বিবেচনা না করে, মসজিদ মাদ্রাসার আলেম ওলামাদের ব্যক্তিগত পরিচয় তারা কোন মতাদর্শের অনুসারী সেইসব নির্ণয় করে তাদের মসজিদ মাদ্রাসা থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

সাইবার যোদ্ধাদের করণীয়ঃ

সাইবার যোদ্ধারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ভার্চুয়ালি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করতে পারে। জঙ্গিবাদ আর ধর্ম প্রচার যে এক নয়, সেটা তুলে ধরতে হবে। কীভাবে ক্ষতিকর কন্টেন্ট চিহ্নিত করে তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এ বিষয়ে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাইবার সেলকে সাহায্য করতে পারে।

৯. শরীফুল হাসান সুমন

অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

বিগত চার দশকে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা, পোষাকে, মননে, শিক্ষায়, চলনে-বলনে ইসলামীকরণের যে প্রয়োগ হয়েছে তার ফলাফল আমরা বর্তমানে আমাদের আশেপাশে প্রকটভাবে দেখতে পাচ্ছি। এই ইসলামীকরণ যতই সহীভাবে বা শরিয়ত মেনে করা হোক না কেন ফলাফল এটাই হবে, এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গত চার দশকে ধর্মকে মুখ্য উপজীব্য করা মানুষের সংখ্যাটা ভয়ঙ্করভাবে বেড়েছে। তারা দিনের পর দিন মানব সভ্যতার অগ্রগতি আর জ্ঞানকে অস্বীকার করে হাজার বছর আগের কাহিনী, জীবন-যাপনের ত্বরিকা গলধঃকরণ করে অন্ধ, গোয়ার, জনগোষ্ঠি হিসাবে বেড়ে উঠছে। এই বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়িত কাফের আর বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধের রীতি, শত্রুতা, চরমভাবাপন্ন জীবনযাপন প্রণালী তাদের একমাত্র সম্যক জ্ঞান আর জানাশোনার গণ্ডি। মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে তারা দেখছে পাশের বাসার ছেলেটাও চলনে-বলনে, কথায় অনেক এগিয়ে এবং সকলের কাছে অধিক প্রশংসিত! এই জ্ঞান আর ত্বরিকা নিয়ে মেয়েদের কাছে তারা পাত্তা পাচ্ছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না। উন্নত সমৃদ্ধ জীবন পাচ্ছে না। যেই হাদীস কোরাণের আয়াতকে মুখ্য আর একমাত্র উপজীব্য করে বেড়ে উঠেছে এতদিন, সেই উপজীব্যের মাধ্যমে আয় উন্নতি খুঁজে পাচ্ছে না তারা। কোথাও নিজেদেরকে শক্তভাবে দাঁড় করাতে পারছে না তারা। এইসব জায়গা থেকে ব্যর্থ হয়ে তাদের মানসিক ক্ষোভ বাড়ছে। যা সে জানে না, যা সে শত চাইলেও বুঝতে পারছে না এমন সব কিছুর প্রতি

বিদ্বেষ থেকে সেটা ধ্বংস করে দিতে চাইছে, নয়তো নিজের শত্রু মনে করছে। এই মানসিকস্থিতি থেকে দিন দিন তাদের মধ্যে চরমভাবাপন্ন মানসিকতা গড়ে উঠছে।

এই সম্পূর্ণ ইসলামীকরণ আর চরমপন্থার মধ্যে ফারাকটি খুবই সূক্ষ্ম। আমরা বিভিন্ন সময়ে এই ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে চরমপন্থী আকার ধারণ করতে দেখেছি, সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন হোক কি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অপসারণ। এই পন্থায় বিশ্বাসী দলগুলোকে খুব সহজেই ধর্মের নামে, হারাম-হালাল এবং জিহাদের নামে প্ররোচিত করা যায়, উস্কে দেওয়া যায়।

সমস্যা মূলত দুইটি, এক হচ্ছে পশ্চাতমুখী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামীকরণ, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে নিজ মতে বা স্বার্থে এদের ব্যবহার করা। এই সকল সমস্যা সমাধানে সরকারের সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা। যুগোপযোগী ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি দরকার অন্যান্য বাস্তবধর্মী একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা এবং জ্ঞান। সেইসাথে দরকার কড়াকড়ি তত্ত্বাবধান, যেন সেই সূক্ষ্ম ফারাক অতিক্রম করে কেউ চরমপন্থী হয়ে না ওঠে। এতো বেশি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণ আমাদের দরকার নেই আসলে, বরং বর্তমানে এদের সংখ্যা সীমিত করা আর সঠিক তত্ত্বাবধান বেশি প্রয়োজন।

মাদ্রাসার শিক্ষাদান পদ্ধতি আর শিক্ষকের মান উন্নয়ন আরো বেশি প্রয়োজন। বড় হুজুরের কথায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় হুজুরই তাদের সর্বোচ্চ দিক নির্দেশনাকারী। রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এই সকল হুজুরেরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে অনেক রকম রাজনৈতিক আর ঘৃণার দর্শন যেন মাদ্রাসার ছেলেদের মধ্যে ঢুকিয়ে না দিতে পারে সেই জন্য প্রয়োজনে মাদ্রাসার সকল ক্লাসরুমে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সকল শিক্ষকদের জন্য কড়া আইন আর নীতিমালার প্রয়োজন যা তাদের বিপথে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এ তো গেল ভবিষ্যতের মৌলবাদ কিভাবে আটকানো সম্ভব সে আলোচনা। ইতিমধ্যে যারা দিকভ্রান্ত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মৌলবাদি আচরণ করছে এবং তাদের কিতাবের আর জানাশোনার বাইরে সবকিছুর প্রতি খরগহস্ত হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কি?

একটি লম্বা সময় ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবস্থানের মাধ্যমে জানি যে এদের বুঝিয়ে বা চোখ খোলার চেষ্টার মাধ্যমে কোনোভাবেই এদের বদলানো সম্ভব না। এমনকি আল্লাহ হাজির-নাজির হয়েও যদি তাদের বলে যে, "এটা সঠিক নহে" সেটাও তারা মানবে না, তারা মানবে সেটাই যা তাদের বড়হুজুর বা লেবাসপন্থী বড়ভাই বুঝিয়েছে। যেহেতু তাদের পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাহলে থাকে একমাত্র উপায়– এদের প্রতিহত করা। সেটা কি আদৌ সম্ভব? হলেই বা কিভাবে? এদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তাদের একাত্মতা আর সংঘবদ্ধ অবস্থান, সেটা গ্রুপের মাধ্যমে হোক অথবা পেজের মাধ্যমে। এই সমস্ত সংঘবদ্ধ অবস্থানগুলোকে প্রথমে থামাতে হবে। এদের প্রচারিত ওয়াজ, ভিডিও, নির্দিষ্ট কিছু পেজের মাধ্যমে ঘৃণার আবাদ, দলবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করা, এই সবগুলো জায়গায় কাজ করতে হবে বিটিআরসি এবং

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। এই সংঘবদ্ধ অবস্থান নতুন করে আরো অনেককেই প্ররোচিত করে তাদের মতো অনলাইন এবং অফলাইনে জিহাদ করতে। কারণ ওরা বোঝাতে চায় যে জিহাদে নেকী বেশি এবং নিশ্চিত বেহেশত। এই সংঘবদ্ধ অবস্থানগুলোকে রুখে দিতে পারলে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোন কোন পেজ বা গ্রুপ থেকে এই বিভেদিকরণ আর ঘৃণার চাষ হচ্ছে সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানকারী ব্লগার এন্ড অনলাইন এ্যাক্টিভিটিস্ট অনেকেই জানেন, প্রশাসন চাইলে সেই তথ্য এ্যাক্টিভিস্টরা দিতে রাজি থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় এবং স্বীকৃত ব্লগার এন্ড অনলাইন এ্যাক্টিভিটিস্টদের নিয়ে একটা গোপন প্যানেল যদি তৈরী করতে পারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, যাদের কাজ হবে রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস এবং তথ্য যোগাড় করা ঐ সকল মৌলবাদী গ্রুপ এর এবং কর্ম পদক্ষেপের। প্রতিমাসে এই প্যানেলের দেওয়া তথ্য এবং রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ঐ সকল গ্রুপ এবং লিংকগুলোকে বন্ধ করে দিবে বিটিআরসি, প্রয়োজনে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিবে। এটা বিটিআরসির পক্ষে করা সম্ভব কারণ আমরা দেখেছি বিগত সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বিতর্কিত বক্তব্যের অডিও/ভিডিও স্বল্প সময়ের মধ্যে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সবার আগে সরকার ও সুশীল সমাজকে বুঝতে হবে ঘৃণা, মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ধারক এই গোষ্ঠীকে প্রতিহত করা। প্রতিরোধ না করার অর্থ এদের সহানুভূতি দেখিয়ে এদের ব্যাপারে চুপ থাকা। আর এর অর্থ দাঁড়ায় এদেরকে ক্রমে সংখ্যায় বড় হতে দেওয়া এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মরুভূমির জাতীয়তাবাদে পরিবর্তন হতে দেখা। লক্ষ কোটি আফগান, লিবিয়া, ইরাকি, পাকিস্তানি, সিরিয়ান, মিশরিয়রাও ভেবেছিল যে তারা দেশকে ইসলামীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে নিরাপদ থাকবে, ভেবেছিল যে এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনোদিন অস্ত্র ধরবে না। দুর্ভাগ্যবশত এদের সকলেই হয় মেশিনগানের গুলি খেয়ে নয়ত সহীভাবে কতল হয়ে মারা গেছে! আর এদের পরিবারের নারীদের পরিচিত হতে হয়েছে গণিমতের সেবা দাসী হিসাবে!

১০. আজাদ মাষ্টার

অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট

বাংলাদেশ পুলিশ ২০১৭ সালের দিকে একটা ইন্টারেস্টিং জরিপ চালায়। তারা দেশে গ্রেপ্তার হওয়া ২৫০ জন জঙ্গির উপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৪ দেশের পুলিশ প্রধানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেই প্রতিবেদনে নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাতে যে উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলো সামনে আসে সেগুলো হলো, দেশে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়া তরুণদের ৮২ শতাংশই ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তারা

এই মাধ্যম ব্যবহার করছেন, নিজেদের কার্যক্রম সমন্বয় করার ক্ষেত্রে তারা থ্রিমা, ইউচ্যাট মতো এনক্রিপ্ট অ্যাপস ব্যবহার করছেন যেইগুলিতে আড়িপাতার কাজ গোয়েন্দা সংস্থাগুলির জন্যে দুঃসাধ্য, তরুণ জঙ্গিদের মধ্যে অনেকেই নামকরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার্থী তারা অনেকেই আবার প্রচলিত অ্যাপসের বাইরেও নিজেরাও কেউ কেউ পৃথক অ্যাপও তৈরি করে নিয়েছে।

প্রতিবেদনে এ ছাড়াও জঙ্গিদের কোনো ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে উঠে এসেছে সেই দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। এই ২৫০ জনের মধ্যে ৫৬ শতাংশ বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসা। ২২ শতাংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা। অন্যরা নানা জায়গা থেকে আসছেন। অর্থ্যাৎ মৌলবাদী জঙ্গি ধ্যান ধারণা বিস্তারের কাজটা বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানতালে চলছে, কাজেই ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করতে চাইলে আমাদের কর্ম পরিকল্পনাও হতে হবে বহুমাত্রিক। জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় পুলিশের স্পেশাল ইউনিট হচ্ছে বিদেশ হতে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে ক্রয় করা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি– এইগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কিন্তু জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে বড় সফলতা আসবে না যদি না আমরা তার বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক / আদর্শিক / চিন্তাধারার সংগ্রামের কাজকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হই এবং এই ফ্রন্টেই নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল সংগঠনগুলিকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে অনলাইন জগৎকে সক্রিয় হয়ে এই কাজটা চালাতে হবে?

একটা সময় জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সংগঠন পরিত্যাগ করেছেন এইরকম সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ইউটিউব চ্যানেল কিংবা অনলাইন অডিও পডকাস্ট তৈরি করা যায়। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক এড হুসেইন বা মোহাম্মদ মাহবুব হুসেইনের কথা এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি তার যুবক বয়েসে মৌলবাদী সংগঠনের জড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে দি ইসলামিস্ট বলে একটা বই লিখেছেন। বইটির বাংলা অনুবাদ করে সেটা নিয়ে অনলাইনে আলোচনা করলে সেটার ভালো ইমপ্যাক্ট হতো একইরকমভাবে এক সময়ে সক্রিয়ভাবে হিযবুত তাহরিরের রাজনীতি করেছেন কিন্তু সংগঠন ত্যাগ করেছেন মাজিদ নেওয়াজ। তার লেখা Radical: My Journey out of Islamist Extremism বইটির ভালো বাংলা অনুবাদ করে এর সারাংশ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে তৎপরতা চালালে আমার বিশ্বাস অনেক তরুণ তরুণীকে বিপথে যাওয়া হতে রক্ষা করা যেতো।

ইসলামের ইতিহাসের নানা দিক জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব– এই সব নিয়ে জিজ্ঞাসু তরুণেরা নির্মোহ নিরপেক্ষ আলোচনা বই পড়তে আগ্রহী। দুঃখের বিষয় নানা মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংস্থা অনলাইনে ই-বুক কর্মাস সাইটের আড়ালে নিজেদের আদর্শের মোড়কে এই সব টপিকে বই প্রকাশ করে সুলভে বই বিপণন করে মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কাজে নিয়োজিত আছে। এই স্রোতকে রুখতে হলে নানা প্রগতিশীল, সচেতন লোকজনকেও সমাজ ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন ইস্যুতে পেপারব্যাক ফরম্যাটে সুলভে বাংলা অনুবাদে গ্রন্থ প্রকাশ করে ই-বুক কর্মাস সাইটে সক্রিয় হতে হবে। এইরকম অসংখ্য পদক্ষেপ/উদ্যোগ যদি গ্রহণ করা সম্ভব হয় শুধু তখনই সাইবার স্পেসে মৌলবাদকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

জঙ্গি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বিস্তারে ওয়াজের ভূমিকা

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর ভিত্তি করে অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশ নামক একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াজের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের দ্বারা তৃণমূলে জঙ্গি মৌলবাদের যে বিস্তার ঘটছে, এটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী তেমনি অসাম্প্রদায়িক মানবিক বিনির্মাণেরও অন্তরায়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ওয়াজে ধর্মের নামে উন্মাদনা ছড়ানো হচ্ছে। জাতির পিতা এবং তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে। জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হচ্ছে। বিষোদগার করা হচ্ছে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন মত এবং ভিন্ন জীবনধারার অনুসারীদের প্রতি। হেয় করা হচ্ছে সুফি সাধক, বাউল, গায়ক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে। ওয়াজের নামে উগ্র রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে জঙ্গি জিহাদি উন্মাদনা সরাসরি তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াজের নামে প্রতিনিয়ত নারী নেতৃত্ব ও নারীদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং বিষোদগার করা হয়। অন্য ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা মশকরা ও হেয় করার প্রবণতা ওয়াজে লক্ষণীয় যা সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা ছড়াচ্ছে। সাধারণ প্রান্তিক মানুষের ভেতর তিল তিল করে এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে নারী বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। ওয়াজে অশ্লীল ও সাম্প্রদায়িক উপস্থাপন শুরু করেছিলেন যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। 'আলিফ খালি বে এর নিচে এক নখতা'র মতো দেখবেন, এই যুগের নারীর বুক খালি পেট খালি কপালের ওপর এক নখতা নাভির নিচে'- সাইদীর এমন ওয়াজ ভোলেননি অনেকে। নিশ্চয় ভোলেননি মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদানের দাবীতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আন্দোলন। সাইদী শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে ওয়াজের মধ্যে বলতেন, 'জাহান্নামের ইমাম'! রাস্তায় যৌন উত্তেজক ওষুধের বিক্রেতা বা ক্যানভাসারদের মতোই সাইদী বা একালের অনেকের ওয়াজ আজও দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই ওয়াজকারীরা উসকানি দিয়ে বলে, রবীন্দ্রনাথ কাফের কাজেই জাতীয় সংগীত বদলাতে হবে, চাপিয়ে দেয়া যাবে না!

ওয়াজ আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি। এক সময় আল্লাহর পথে ডাকার অন্যতম মাধ্যম ছিল ওয়াজ-নসিহত। বাংলা ভাষায় যখন ইসলামী বইপুস্তক ব্যাপকভাবে রচিত হয়নি, তখন সাধারণ মুসলমানরা এই

ওয়াজিন, পীর ও আওলিয়াদের ওয়াজ-বয়ান থেকেই ধর্মীয় জ্ঞান নিতেন। বর্তমানে ওয়াজে ইসলাম ধর্মের গুণকীর্তন করার চেয়ে অন্য ধর্ম সম্পর্কে অনেক বেশি উপহাস করা হয়। এই কাজে চড়া মূল্যে মাঠ দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন শতাধিক উগ্র বক্তা। তাদের কারো কারো তোহফা বা হাদিয়ার অঙ্ক কয়েক লক্ষ টাকা। কয়েকজনকে মাহফিলে নিতে হয় হেলিকপ্টারে। ফেসবুক, ইউটিউবেও তাদের বাজার রমরমা।

এদের কেউ কেউ আবার একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেন না। বাজার গরম রাখার কৌশল হিসেবে তারা একজন আরেকজনকে কাফের বানানোসহ নানা অপবাদও দেন। নামের আগে আল্লামা, শায়খুল হাদিস, মুফাসসিরে কুরআন, মুফতি, মুহাদ্দিসসহ বহু বিশেষণ তাদের। আর নামের শেষে যোগ করা হয় মাদানি, আজহারি, আমিনী, আফসারি, আব্বাসি, জিহাদি, নূরানি, যশোরী, চাঁদপুরী, ভৈরবী, শরীয়তপুরী, তাহেরী, জাহেরী, আনসারী ইত্যাদি। নানা নামাবলির এই ওয়াজিরা বাজার বুঝে তামাশার সঙ্গে নানা মন্তব্য ও বিতর্ক ছুঁড়ে নিজেদের আলোচিত-সমালোচিত করার কৌশলও নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তারা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তারাই ইসলাম, তারাই সঠিক। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা মস্ত গুনাহ। ওয়াজে কিছু বলার পরই জানতে চাওয়া হয় 'ঠিক কি-না'? প্যান্ডেল থেকে 'ঠিক ঠিক' বলে রব আসে।

ওয়াজের ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার কন্ট্রাক্ট এদের আয়ের নতুন খাত। পাশাপাশি মাইক-ডেকোরেটর ব্যবসাও জমজমাট। ভিডিও প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে কাজ আসছে। মানুষকে বিভাজিত রাখতে দলাদলি ও তরিকা তৈরিও চলে গেছে ব্যবসার পর্যায়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ওহাবি, সুন্নি, দেওবন্দি, মাজারি, বাজারি, খানকাপন্থী, তাবলিগি, কেয়ামি-লাকেয়ামি ইত্যাদি বিভক্তি তৈরি করা হয়েছে। তাদের অনুসারীও অগুনতি। ভক্ত-অনুসারীদের কখনো কখনো মারামারিতেও জড়িয়ে যাচ্ছেন তারা। এ নিয়ে মামলাবাজির ঘটনাও ঘটছে।

সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ আর গণতন্ত্র নিয়ে ওয়াজের নামে প্রতিনিয়ত বিষোদগার করছেন এক শ্রেণির বক্তা। এগুলোকে কুফরি বলে ফতোয়া দিচ্ছেন তারা। ভোট দেয়াকে কখনো হারাম, আবার কখনো খ্রিস্টানদের রীতি আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে ভোট দিতে নিষেধ করছেন। গণতন্ত্রকে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য-ঘৃণিত ও হারাম বলেও আখ্যা দিচ্ছেন ওয়াজকারীদের অনেকেই।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফুরি মতবাদ বলেও ফতোয়া দিচ্ছেন এক শ্রেণির বক্তা। কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয় সঙ্গীতও কুফুরি বলে বলে দাবি করেন তারা। প্রকাশ্যে হত্যার নির্দেশও দিচ্ছেন এসব বক্তাদের অনেকে। আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক উৎসব– যাত্রা, পালাগান, পুতুল নাচ, মেলা, বাউলগান এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উৎসব গ্রাম থেকে হারিয়ে গিয়েছে সারা বছর ওয়াজ মাহফিলের দাপট ও ফতোয়ার কারণে।

বাংলাদেশে ওয়াজ মাহফিল কয়েকটি ধারায় বিভক্ত: ২০১৯ সালের ২১ মার্চ বাংলা ট্রিবিউনের একটি প্রতিবেদনের তথ্য ও গণতদন্ত কমিশনের প্রতিনিধি দলের ওয়াজ

মাহফিল নিয়ে অনুসন্ধানের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ওয়াজ মাহফিল বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় বিভক্ত। এর পেছনে রয়েছে আদর্শ, বিশ্বাস, ধর্মপালনের রীতিনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অর্থের ভূমিকা। বাংলাদেশের ওয়াজকারীরা মোটামুটি পাঁচ ধারার ইসলাম প্রচার করেন। এই পাঁচ ধারার মধ্যে আবার কওমি, মাজার-খানকা ও সালাফি অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তি রয়েছে।

পাঁচটি ধারার মধ্যে কওমি ধারা হলো উলামায়ে দেওবন্দের ধারা। এটি সবচেয়ে বড় ধারা। দ্বিতীয় ধারাটি আলিয়া মাদ্রাসাকেন্দ্রিক আলেমদের ধারা ও তৃতীয় ধারাটি মাজার-ওরসকেন্দ্রিক আলেমদের ধারা, এটাকে সুন্নী ধারা বলা হয়। চতুর্থ ধারা জামায়াত বা মওদুদীবাদের অনুসারীদের। পঞ্চমটি আহলে হাদিস বা সালাফি মতবাদের অনুসারীদের। এদের লা মাজহাবিও বলা হয়ে থাকে। এর বাইরেও বাংলাদেশে ইলমে তাসাউফের চার তরিকার অনুসারীরাই আছেন। পীর সাহেবরা তাদের অনুসরণ করেন। ওয়াজ-মাহফিলে এরও প্রভাব আছে। এই চার তরিকা হচ্ছে– হযরত আবদুল কাদের জিলানীর কাদেরিয়া, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর চিশতিয়া, মুজাদ্দেদে আলফে সানীর মুজাদ্দেদিয়া ও হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দির নকশবন্দিয়া তরিকা।

কওমি বা দেওবন্দি ঘরানার মধ্যে তিনটি ভাগ আছে। একটি হচ্ছে সাধারণ ধারা, যারা কোরান হাদিস থেকে আক্বিদা, তাওহিদ, বিদআ'তের নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই ধারার অনুসারী বেশি। 'উলামায়ে দেওবন্দ' হিসেবে ঘরানাটি সবচেয়ে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে পীরপন্থী ধারা। যারা জিকির, পীরের অনুসরণ সম্পর্কে সরাসরি পীরের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে থাকেন। এই উপধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরমোনাই ধারা। এছাড়া চাঁদপুরের উজানী, মুন্সীগঞ্জের মধুপুর, মৌলভীবাজারের বরুনা ও সন্দ্বীপ জেলার সন্দ্বিপী পীর প্রমুখ ঘরানা রয়েছে।

চরমোনাই ধারার পীর-মুরিদ ও অনুসারীদের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। কয়েক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে দলটি ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ছায়া সংগঠন মুজাহিদ কমিটির উদ্যোগে সারাদেশে ওয়াজ মাহফিল হয়ে থাকে। এসব আয়োজনে ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাই পীর মাওলানা সৈয়দ রেজাউল করিম, নায়েবে আমির মাওলানা ফয়জুল করিম ও মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী ছাড়া আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এসব মাহফিলে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা মুজাহিদ কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমেই চরমোনাইপন্থী ওয়াজ মাহফিলগুলো অনুষ্ঠিত হয়। রমজান ও কোরবানি ঈদের কয়েকদিন বাদ দিয়ে বছরের বেশিরভাগ সময়ই মুজাহিদ কমিটির মাহফিল থাকে।

আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলেমদের কয়েকজন জামায়াত ঘরানার বক্তা হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তানের আবুল আলা মওদুদির মতাদর্শকে সামনে রেখে এই ধারার বক্তারা মাহফিলে বক্তব্য দেন। এর পুরোধা হিসেবে এখনও পরিচিত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। জামায়াতে ইসলামীর এই নেতার হাত ধরেই ওয়াজে জামায়াতি ঘরানার যাত্রা শুরু। এরপর মাওলানা কামালুদ্দিন জাফরী এবং আরও কয়েকজন এই ধারা চালু রেখেছেন। জামায়াতের ধারার মধ্যে সরাসরি ইসলাম শাসিত রাষ্ট্র ও সমাজ অগ্রাধিকার পায়। আবুল আলা মওদুদীর মতোই তারা মনে করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়। জামায়াত-শিবিরের উগ্রবাদী আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে এসব বক্তারা।

ওয়াজ মাহফিলের অঙ্গনে বিগত ১০-১২ বছর প্রকাশ্যে এসেছে সালাফিবাদ বা সালাফি মতাদর্শ। লা মাজহাবি বা 'মাজহাব মানে না' ধারার কয়েকজন আলেম ও অধ্যাপক এই মতাদর্শের প্রচারক হিসেবে কাজ করছেন। এটি ইতোমধ্যে অন্তত ১৬টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই মতবাদের মূল ব্যক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সালমান বিন আলী আত-তায়মী (১৭০৩-১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ)। মধ্যপ্রাচ্যে লা মাজহাবিদের অনুসারী বেশি। তাদের অর্থায়নেই এদেশে সালাফিদের অনুসারী তৈরি হচ্ছে। ঢাকায় তাদের আলাদা মসজিদ রয়েছে। টাঙ্গাইল ও রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন মসজিদ তৈরি করে তারা নিজেদের মতাদর্শ চর্চা করছে। সৌদি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারীরাই লা মাজহাবি বা সালাফি। তাদের আক্বিদা মতভেদপূর্ণ।

২০১৯ সালের ২১ মার্চ বাংলা ট্রিবিউনকে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান মাদানী বলেন, 'বাংলাদেশে সালাফিরা ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এগুলো হলো- ড. বারী গ্রুপ, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব গ্রুপের আহলে হাদিস আন্দোলন, আবদুর রাজ্জাক ইউসূফী, ইলিয়াস আলী গ্রুপ, বংশালের আবদুস সামাদ গ্রুপ ও রাজশাহীর অধ্যাপক শামসুল আলম গ্রুপ। ঢাকা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন এলাকায় তাদের অবস্থান আছে।'

আহলে হাদিসের রাজশাহী বিভাগের নেতা মাওলানা রফিকুল ইসলাম বলেন, '২০১২-১৩ নয়, ১৯০৬ সালে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে 'জমিয়তে আহলে হাদিস' নামে উপমহাদেশে আহলে হাদিস অনুসারীরা প্রকাশ্যে আসে। পরে ১৯৪৬ সালে রংপুরে নিখিল বঙ্গ-আসাম জমিয়তে আহলে হাদিস গঠন করেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী নামে মুসলিম লীগের সাবেক একজন নেতা। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬০ সালে মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী মরণোত্তর বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। দেশভাগের সময় নাম পরিবর্তন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিস নামে রূপান্তরিত হয়। পরে আবদুল্লাহেল কাফীর ভাতিজা ড. বারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে মারা যান তিনি। তার মৃত্যুর পর সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক শামসুল আলম।'

বর্তমানে সারাদেশে ১৬টি গ্রুপে বিভক্ত আহলে হাদিস অনুসারীরা। কোনো গ্রুপ থানাকেন্দ্রিক, কোনো গ্রুপ জেলাভিত্তিক, কোনোটি শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক। এর মধ্যে ২-৩ জনের গ্রুপ আছে। মাওলানা ইব্রাহিম, মনজুরে আলম নামে কয়েকজন ব্যক্তি সহিহ আক্বিদা (সংস্কারপন্থী) দাবি করে আলাদা গ্রুপের চর্চা করছেন।

১৯৭১ সালে গৌরবময় স্বাধীনতার পর ওয়াজ মাহফিলের চরিত্র ও কাঠামোতে এসেছে নতুনত্ব। ১৯৭৫ সালের পর ওয়াজ মাহফিলের ধরন বদলে গেছে। পরিবর্তনের ছোঁয়ায় আর্থিক জীবনের নিশ্চয়তা পেয়েছেন দেশের বেশিরভাগ বক্তা (যারা ওয়াজ করেন)। বাংলা অঞ্চলে ওয়াজের সূচনার সময় এই 'নিশ্চয়তা' অনেকাংশে অনুপস্থিত ছিল। যদিও এখন মাহফিলেই বক্তারা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন নিজেদের বাড়ি-গাড়ির কথাও। ওয়াজ থেকে প্রাপ্ত সম্মানীর মাধ্যমে কোনো কোনো বক্তার মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। ২০১৯ সালের ১৯ মার্চ বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সংগীত শিল্পীগোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে, যারা মাহফিলে 'সম্মানী'র বিনিময়ে হামদ-নাত ও ধর্মীয় উৎসাহব্যঞ্জক গান পরিবেশন করে থাকে।'

ওয়াজ মাহফিলের আয়োজক ও বক্তাদের সঙ্গে সরেজমিনে আলাপ করে কথা বলে জানা গেছে, ইংরেজি বর্ষের অক্টোবর, আরবী বর্ষের সফর-রবিউল আউয়াল ও বাংলা বর্ষের আশ্বিন-কার্তিক নাগাদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ শুরু হয়। মার্চ-এপ্রিল (জমাদিউস সানী-রজব) অবধি মাহফিল হয়ে থাকে। ছয় মাসব্যাপি সারাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, মসজিদ কমিটি, যুবসংগঠন, ওলামা সংগঠনগুলো ওয়াজ মাহফিলের আয়োজক হিসেবে ভূমিকা রাখে। তবে বিশেষভাবে চরমোনাইপন্থী মুজাহিদ কমিটির উদ্যোগে সারাবছরই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

২০১০ সাল থেকে নতুনভাবে ওয়াজ মাহফিলের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠেছে ভিডিও। এগুলো ইউটিউবে আপলোড করা হয়। রাজিব ভিডিও সেন্টারের সত্ত্বাধিকারী ও ভিডিও ব্যবসায়ী রাজিব হোসেন জানান, ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে সারাদেশে অন্তত পাঁচ শতাধিক ভিডিও প্রতিষ্ঠান চলছে। এক্ষেত্রে বক্তা কিংবা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ পেয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা। ভেন্যুর দূরত্ব অনুযায়ী ও বক্তা প্রতি ভিডিওতে খরচ হয়।

সাধারণত ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের ওয়াজের আগে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে কোরান তেলাওয়াত, হামদ-না'ত পরিবেশন করা হতো। গত কয়েক বছরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েকটি পেশাদার ইসলামি সংগীতশিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনা। তাদের মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে মুহিব খান, গোষ্ঠী হিসেবে কলরব শিল্পীগোষ্ঠী, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, আল-মদিনা শিল্পগোষ্ঠী, দাবানল শিল্পীগোষ্ঠী, স্বপ্নসিঁড়ি, আহ্বান উল্লেখযোগ্য।

লাখ লাখ অনুসারী নিয়ে বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর তারকা হয়ে উঠেছেন ওয়াজের নামে ভিন্নধর্ম ও নারীদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো বক্তারা। বিশেষ করে ফেসবুক ও ইউটিউবে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। ইউটিউব ও ফেসবুক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাংলাদেশের শীর্ষ পাঁচ ওয়াজকারী হলেন মিজানুর রহমান আযহারী, হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, গিয়াস উদ্দীন তাহেরী, এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী এবং শায়খ আহমাদুল্লাহ। বর্তমানে মালয়েশিয়াপ্রবাসী মিজানুর রহমান আযহারীর ইউটিউব চ্যানেলটি কোনো ভিডিও প্রকাশের আগেই সংগ্রহ করেছিল ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবার।

বক্তাদের নিজস্ব চ্যানেল তো বটেই, শুধু ওয়াজ প্রচার করে এমন চ্যানেলগুলোর ভিউসংখ্যাও অবিশ্বাস্য। শুধু ওয়াজ প্রচার করে 'রোজটিভি২৪' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল ৯৩ কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে এ পর্যন্ত। এটিই শুধু নয়, এক কোটি থেকে ৯০ কোটিরও বেশিবার দেখা অন্তত ২০টি চ্যানেলের খোঁজ পাওয়া যায় ইউটিউবে– যারা শুধু ওয়াজই প্রচার করে থাকে। কেন এই জনপ্রিয়তা– তার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান গিয়ে দেখা গেল, মূলত বিতর্ক, ঠাট্টা, দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা এবং ভিন্নমত ও ভিন্নধর্মবিদ্বেষী চরম উস্কানিমূলক বক্তব্যের সমন্বয়ে বিকৃত মানসিকতার অশ্লীল বিনোদনের মাধ্যম এসব ভিডিও। এগুলো অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করছে।

২০২১ সালের ৩১ জুলাই বিজনেস স্টান্ডার্ড-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে ওয়াজের ভিডিওগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছে বক্তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের কারণে দর্শকদের কাছে এই প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে আরও নাটকীয়। লক্ষ লক্ষ ভিউ পাওয়া এরকম অসংখ্য ভিডিও ইউটিউবে পাওয়া যায়, যেখানে একজন বক্তা একই বিষয়ে অন্য বক্তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। বক্তারা পরস্পরের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একজন আরেকজনের ব্যাখ্যা বা বক্তব্য নাকচ করে দেন। খুব ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের ওয়াজ ব্যবসা গড়ে উঠেছে প্রধানত ধর্মীয় বক্তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। ওয়াজের মঞ্চে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, মাস্তানি ধরনে কথা বলা, গোপালগঞ্জের ছেলে বলে হুমকি দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী আমার শাশুড়ি বলে কদর্য মিথ্যাচারের মতো নানান বিষয় নিয়েও অনেককে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। গান গেয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, বিড়ি খাওয়ার পদ্ধতি দেখানো, বিভিন্ন অশ্লীল গানের শ্লোক গেয়ে শোনানোর মোড়কে আগত শ্রোতাদর্শকদের মস্তিষ্কে জঙ্গি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবিষ্ট করা এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বক্তা এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী নিজেই আব্বাসী টিভি নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করে থাকেন। ওই চ্যানেলে থাকা পাঁচ শতাধিক ভিডিও দেখা হয়েছে প্রায় চার কোটিবার। কিছু বক্তা ইসলামের নামে বিভিন্ন মাহফিল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উসকানি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ফেসবুক ও ইউটিউবে তাঁদের সেই বক্তব্য রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। এসব বক্তব্য শুনে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কয়েকজনের বক্তব্য শুনে কথিত জিহাদের নামে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে তরুণরা। অনেকে নিজেদের বিবেচনায় ইসলামের শত্রু শনাক্ত করে হামলা চালাতে গিয়ে গ্রেপ্তারও হয়েছে। পাল্লাপাল্টি বক্তব্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্বেষ। লাখ লাখ অনুসারী থাকার সুবাদে নিজেদের প্রয়োজনে অনুদানের নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন কিছু বক্তা। আবার কেউ কেউ নিজের ব্যবসার প্রচারেও কথিত ইসলামী বক্তাদের ব্যবহার করছে।

২০২১ সালের ২৯ মে কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'তলোয়ার নিয়ে হামলা চালানোর আগে আল সাকিব নামের এক যুবককে সংসদ ভবন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শেরে বাংলানগর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায়

রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাকিব ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মোবাইল ফোনে আলী হাসান উসামা, মাহমুদুল হাসান গুনবী, আমির হামজা, হারুন ইজহারসহ কয়েকজনের কথিত জিহাদি হামলার ভিডিও দেখে উগ্রপন্থী হন। এই বক্তাদের কিছু ভিডিও লিংকের উদ্ধৃতি দেন সাকিব, যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ওপর হামলার কথা বলা হয়েছে। সাকিব ব্যক্তিগতভাবে উসামা গুনবীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা ক্বিতাল সন্ত্রাসী হামলার কথা বলেন। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাকিব ফেসবুকে গ্রুপ তৈরি করে হামলার ঘোষণা দেন। তদন্তের সূত্র ধরে উসামাকে রাজবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকার আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। ২৪ মে কুষ্টিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আমির হামজাকে। তিনিও ২০২১ সালের ৩১ মে ঢাকার মহানগর হাকিম আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। এতে তিনি বলেছেন, ইউটিউবে তাঁর বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ প্রচার করা হয়। এর ফলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এতে 'মুসলিম টিভি', 'ইসলামের খুঁটি', 'ওয়াজ মিডিয়া', 'তাহজীব সেন্টার রাজশাহী', 'মেগা টিভি' নামের ইউটিউব চ্যানেল জড়িত বলে দাবি করেন আমির হামজা।'

করোনার কারণে ওয়াজ মাহফিল কিছুদিন বন্ধ থাকলেও আগের ধারণ করা ওয়াজ এবং অনেকের ভিডিও ও বক্তব্য ফেসবুক ও ইউটিউবে বেশি ছড়িয়ে পড়ছে। 'উম্মাহ নেটওয়ার্ক' নামের একটি গ্রুপ রয়েছে, যারা সরাসরি জঙ্গিবাদে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। 'তামীম আল আদনানী' নামের এক ব্যক্তি বিদেশে বসে ভিডিও বার্তায় জঙ্গিবাদে উসকানি দিচ্ছেন। বাংলাদেশে অসংখ্য শিশু বক্তা রয়েছে। এসব শিশুদেরকে জামায়াত-হেফাজত নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে ওয়াজের মাধ্যমে।

২০১৯ সালের ৫ জুলাই একুশে টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশুদের ইসলামের কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো অধিকার নেই।' এছাড়া তাদের দিয়ে এমন দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজ করানো উচিত নয় বলেও জানান তিনি।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ বলেন, 'শিশুদের ওপর যেখানে নামাজ, রোজা বা হজ যাকাত ফরজ না সেখানে তাদের এসব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কবি শামসুর রহমান, হুমায়ন আজাদসহ প্রগতিশীল বিভিন্ন ব্যাক্তিদের শিক্ষা নিয়েও বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছে এসব শিশুরা। তবে, এসব শিশু বক্তাদের এক জায়গায় বেশ মিল পাওয়া যায়, তা হলো নারী বিদ্বেষ। এ বিষয়ে নারী অধিকার কর্মী সুলতান কামাল বলেন, এটা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে সরকারকে সাংবিধানিকভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।'

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারাদেশে ইসলামী জলসায়, ওয়াজ মাহফিলে, ফেসবুক, ইউটিউবে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেয়া এমন ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করে ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ তালিকা তৈরি করেন বাংলাদেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ইসলামী জলসা, ওয়াজ মাহফিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে যায় শীত

মওসুমে। করোনাভাইরাসের মধ্যেও দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ইসলামী জলসা, ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে যেসব বক্তা থাকেন তাদের নামের আগে ও পরে বড় আলেম, ওলামা মাশায়েক, আউলিয়া, হুজুর পদবির ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন। নামের আগে ও পরে এই ধরনের পদবির ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ আল্লাহ, রসুল, দ্বীন ও ধর্মের প্রচারের নামে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেয়া এমন বক্তব্য দিচ্ছেন।

২০২১ সালের ১৫ জানুয়ারি জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এক বিজ্ঞপ্তিতে জঙ্গিবাদী প্রচারণার আয়োজক ও বক্তাকে নজরদারিতে রাখাসহ ৬ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার ৬ দফা সুপারিশে বলা হয়েছে, যেসব বক্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় রাজনীতি বা মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন বক্তারাই বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দিচ্ছে। এই ধরনের কয়েক বক্তার কারণে ইসলামী জলসা বা ওয়াজ মাহফিল নিয়ে যাতে ভ্রান্ত কোন ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষকদের মধ্য থেকে ওয়াজের জন্য বক্তা হিসেবে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ অন্যতম। এছাড়া সুপারিশে বলা হয়েছে, ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের যারা হেলিকপ্টারে গিয়ে বড় অঙ্কের অর্থ নেন, তারা আয়কর দেন কিনা, তা আয়কর বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে। ওয়াজ মাহফিলে কোনো বক্তা উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিলে স্থানীয় প্রশাসন তাদের সতর্ক করতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে তাদের ওয়াজ করার অনুমতি না দেয়ার ব্যবস্থা নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আইনের আওতায় আনার সুপারিশও করা হয়েছে।'

২০১৯ সালের ৩১ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ১৫ জন বক্তার নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মবিদ্বেষ, নারীবিদ্বেষ, জঙ্গিবাদ, গণতন্ত্রবিরোধী ও দেশীয় সংস্কৃতিবিরোধী বয়ান দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটিতে উল্লেখিত ১৫ জন বক্তা হলেন– ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম, জামিয়া রাহমানিয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হক, মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবি, ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন, আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, মুফতি ইলিয়াছুর রহমান জিহাদি, মুজাফফর বিন বিন মুহসিন, মতিউর রহমান মাদানী, মাওলানা আমীর হামজা, মাওলানা সিফাত হাসান, দেওয়ানবাগী পীর মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, হাফেজ মাওলানা ফয়সাল আহমদ হেলাল ও মোহাম্মদ রাকিব ইবনে সিরাজ।

সাম্প্রদায়িক কয়েকজন বক্তার তালিকা ও পরিচিতিঃ সারাদেশে কওমিপন্থী প্রায় ১০০ জন আছেন, যারা ওয়াজ মাহফিলের বক্তা হিসেবে পরিচিত। এর বাইরে জামায়াতপন্থী ১০০ জন, মাজারপন্থী ৫০ জন, আলিয়া মাদ্রাসাভিত্তিক ৫০ জন এবং আহলে হাদিসের ৫০ জন বক্তা হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। ইউটিউবের সুবাদে জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় এখন একপ্রান্তের বক্তারা আমন্ত্রণ পাচ্ছেন দেশের আরেক

প্রান্তে। এমনও দেখা যায়– কোনও কোনও বক্তা একদিনে অন্তত ১০টি মাহফিলে অংশ নিয়ে থাকেন!

সারাদেশে ওয়াজ মাহফিল করেন এমন উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে– ১. মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী, ২. মাওলানা সাজিদুর রহমান, ৩. মুফতি রেজাউল করিম, ৪. মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম, ৫. মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী, ৬. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (বাশার), ৭. মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, ৮. মুফতি দিলওয়ার হোসাইন সাইফী, ৯. মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী, ১০. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ভূজপুরী, ১১. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফতেহপুরী, ১২. মাওলানা মুহিব খান, ১৩. মুফতি সাঈদ আহমদ কলরব, ১৪. মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন, ১৫. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী, ১৬. মাওলানা আব্দুর রহিম বিপ্লবী, ১৭. মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, ১৮. মাওলানা বজলুর রশিদ, ১৯. মুফতি নাজিবুল্লাহ আফসারী, ২০. মাওলানা ওয়াসেক বিল্লাহ নোমানী, ২১. মুফতি নূর হোসেন নুরানী, ২২. মুফতি কাজী ইব্রাহিম, ২৩. মাওলানা গোলাম রাব্বানী, ২৪. মাওলানা মুজাফফর বিন মহসিন, ২৫. মাওলানা মোস্তফা মাহবুবুল আলম, ২৬. মাওলানা মাহমুদুল হাসান গুনবি, ২৭. মাওলানা শায়েখ সিফাত হাসান, ২৮. মাওলানা মোহাম্মদ রাকিব ইবনে সিরাজ, ২৯. মাওলানা ফয়সাল আহমদ হেলাল, ৩০. মাওলানা মতিউর রহমান মাদানী, ৩১. মাওলানা মুজিবুর রহমান, ৩২. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, ৩৩. মাওলানা হাফিজুর রহমান ছিদ্দীকী, ৩৪. মাওলানা আজিজুল ইসলাম জালালী, ৩৫. মাওলানা মেরাজুল হক কাসেমী, ৩৬. মুফতি মুহসিনুল করিম, ৩৭. মাওলানা আব্দুল বাসেত খান, ৩৮. মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব শরিয়তপুরী, ৩৯. মুফতি মাহমুদ উল্লাহ আতিকী, ৪০. মুফতি উসমান গণি মুছাপুরী, ৪১. মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মাদ তানভীর, ৪২. মুফতি শিহাবুদ্দীন, ৪৩. মুফতি মুসতাঈন বিল্লাহ আল-উসওয়ায়ী, ৪৪. মাওলানা আশরাফ আলী হরষপুরী, ৪৫. মাওলানা জাকারিয়া, ৪৬. মুফতি আমজাদ হোসাইন আশরাফী, ৪৭. মুফতি আনোয়ার হোসাইন চিশতী, ৪৮. মাওলানা আতিকুল্লাহ, ৪৯. মাওলানা বশির আহমদ, ৫০. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মিরপুরী, ৫১. মাওলানা রিজওয়ান রফিকী, ৫২. মাওলানা আবরারুল হক হাতেমী, ৫৩. মাওলানা রাফি বিন মুনির, ৫৪. মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম জাবেরী, ৫৫. মাওলানা মোতাসিম বিল্লাহ আতিকী, ৫৬. মুফতি শেখ হামিদুর রহমান সাইফী, ৫৭. মাওলানা আজহারুল ইসলাম আজমী, ৫৮. মাওলানা কামাল উদ্দিন দায়েমী, ৫৯. মাওলানা কামাল উদ্দিন কাসেমী, ৬০. মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন নুরী, ৬১. মাওলানা মাজহারুল ইসলাম মাজহারী, ৬২. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফেরদাউস, ৬৩. মুফতি এহসানুল হক জিলানী, ৬৪. মাওলানা মাহবুবুর রহমান জিহাদি, ৬৫. মুফতি আব্দুল হক, ৬৬. মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদী, ৬৭. মাওলানা ইসমাঈল বুখারী, ৬৮. মাওলানা জয়নুল আবেদীন হাবিবী, ৬৯. মাওলানা ইউসুফ বিন এনাম, ৭০. মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী, ৭১. মুফতি জাহিদুল ইসলাম যায়েদ, ৭২. মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম জামী, ৭৩. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ৭৪. মাওলানা

ইসমাইল হোসাইন, ৭৫. মুফতি আব্দুর রহিম হেলালী, ৭৬. মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদী, ৭৭. মাওলানা মুশাহিদ আহমদ উজিরপুরী, ৭৮. মাওলানা কাজিম উদ্দীন (অন্ধ হাফেজ), ৭৯. মাওলানা ফেরদাউসুর রহমান, ৮০. মুফতি হারুনুর রশিদ, ৮১. মাওলানা আবুল কাসেম, ৮২. মুফতি ওয়ালী উল্লাহ, ৮৩. মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মাদ তানভীর, ৮৪. মাওলানা জাকারিয়া নাটোর, ৮৫. মাওলানা আবুল হাসান (সাদী), ৮৬. মুফতি রুহুল আমিন নুরী, ৮৭. মুফতি মামুনুর রশিদ কামালী, ৮৮. মাওলানা আবদুল কালাম আজাদ, ৮৯. মাওলানা ডা. সিরাজুল ইসলাম সিরাজী (নওমুসলিম), ৯০. মাওলানা শামসুল হক যশোরী (নওমুসলিম), ৯১. মুফতি হাবিবুর রহমান মিসবাহ, ৯২. মাওলানা মুফতি ওলিউল্লাহ, ৯৩. মাওলানা বেলাল হুসাইন ফারুকী, ৯৪. মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদী, ৯৫. মাওলানা আমির হামজা, ৯৬. মাওলানা মিজানুর রহমান আযহারী, ৯৭. মাওলানা তারেক মনোয়ার, ৯৮. মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী, ৯৯. মাওলানা আতাউল্লাহ হাদেমী, ১০০. মাওলানা আফম খালিদ হোসেন, ১০১. মাওলানা মামুনুল হক, ১০২. মুজিবুর রহমান হামিদী, ১০৩. মাওলানা মুশতাকুন্নবী, ১০৪. মাওলানা সালাহ উদ্দীন নানুপুরী, ১০৫. মাওলানা কুতুব উদ্দীন নানুপুরী, ১০৬. মাওলানা বেলাল উদ্দীন, ১০৭. মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী, ১০৮. মাওলানা রুহুল আমিন যুক্তিবাদী, ১০৯. মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী, ১১০. মাওলানা রফিকুল্লাহ আফসারী, ১১১. মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-আমিন, ১১২. মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন সাইফী, ১১৩. মাওলানা আলাউদ্দীন জিহাদি, ১১৪. মাওলানা আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া, ১১৫. জৈনপুরী সিলসিলার মাওলানা এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী, ১১৬. মাওলানা মাহবুবুর রহমান জৈনপুরী প্রমুখ।

ওয়াজের মাধ্যমে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ান এমন কয়েকজনের নাম ও ওয়াজের নমুনা নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী

এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী নামের এই ওয়াজ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অনলাইন প্লাটফর্মগুলোতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও জঙ্গিবাদ প্রচারের অভিযোগ রয়েছে। তার উগ্র বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুবকরা জড়িয়ে পড়ছে সহিংস জঙ্গি কার্যক্রমে।

এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তিনি 'তাহরিকে খতমে নতুয়্যাত বাংলাদেশ' নামক একটি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনের আমির। এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্দিরগঞ্জ থানার অর্ন্তগত পাঠানটুলীতে ১৯৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঠানটুলী আব্বাসী মঞ্জিল জৈনপুরী দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনাশীন পীর।

এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী নিজেকে শাহ কারামত আলী জৈনপুরীর বংশধর দাবী করেন এবং সেই সাথে সাইয়েদ বংশ বা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহি ওয়াসল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাদি.) এর বংশধর হিসেবে নামের শেষে আব্বাসী

ব্যবহার করে থাকেন। অনুসন্ধান বলছে তিনি আব্বাসী উপাধি ব্যবহারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি প্রথমে স্কুলেই পড়াশোনা করেন। ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেন। এইচএসসি শেষ করে তিনি ঢাকার 'জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর ও মাদ্রাসা দারুর রাশাদ পল্লবী, মিরপুর হতে মিশকাত জামাত পর্যন্ত পড়ে চলে যান ভারতের নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ। সর্বশেষ তিনি দারুল উলুম করাচি পাকিস্তান হতে হাদিসের সনদ গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ রয়েছে।

২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর 'Amontron TV' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, 'এক বিচারপতি বলেছে মাদ্রাসা হচ্ছে সন্ত্রাসের আতুড়ঘর। বিচারপতি তুমি রিটায়ার্ড করেছো। তাই বেঁচে গিয়েছো। বিচারপতি তোমার মাথায় শয়তানে প্রশ্রাব করেছে। শুনে রাখেন ডারউইনের আষাঢ়ে গল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানী কেউ বের হয় না, নাস্তিক বের হয়। নাস্তিকদের গোমর এইবার ফাঁস হয়েছে। ইসলামপন্থীরা নাস্তিকদের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা এখন সব জায়গাতে ফার্স্ট হয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা টিএসসিতে আড্ডা দেয়, গাঁজা-হেরোইন খায়।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://m.youtube.com/watch?v=MbdV0Ls8cNs)

২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর 'Real Muslim' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী বলেন, 'যারা সমাজে ওয়াজ বন্ধ করতে চায়, তারা আল্লাহর জিকির বন্ধ করতে চায়। আল্লাহর জিকির যেখানে বন্ধ হয়, শয়তান আর তাগুতের জিকির সেখানে শুরু হয়। স্বাধীন বাংলায় তা কোনদিন হবে না। হতে দেয়া হবে না। এই দেশ ইসলামের বাংলাদেশ। কোনো মন্ত্রীর কথায় দেশ চলবে না। বাংলাদেশ কোরানের বাংলাদেশ। এটা মুসলমানের বাংলাদেশ। ইসলামের বাংলাদেশ। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে দেশ থেকে বাদ দিবা তোমাকে এই দুঃসাহস কে দিয়েছে? ৩০ লক্ষ হিন্দুর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই, ৩০ লক্ষ মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হইছে। যতদিন পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যাবে ততদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে থাকবে, থাকবে।

'দেশ স্বাধীন করতে ৩০ লক্ষ মুসলমান যদি রক্ত দিয়ে থাকে তবে এদেশে ইসলাম টিকিয়ে রাখতে ৭২ এর সংবিধানে বাংলাদেশ ফিরবে না। ১৪০০ বছর আগের মদিনার শাসনে বাংলাদেশ ফিরে যাবে ইনশাল্লাহ।'

বক্তব্যের লিঙ্কঃ (https://www.youtube.com/watch?v=WGxsThK-8fI)

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর কুমিল্লার নানুয়ার দিঘির পাড়ে পূজা মন্ডপে কোরান পাওয়াকে কেন্দ্র করে কুমিল্লাতে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। অনেকগুলো মন্দিরে আগুন দেয়া হয়। তার পরের দিন ১৪ অক্টোবর এক ভিডিওতে এসে এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ তোলেন মূর্তির পায়ের উপর কোরান রেখেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা। তার এই বক্তব্যের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের মন্দির, বাড়িঘরে হামলা চালায় উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা। ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর MTV Bangla নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ওই ভিডিওতে তিনি বলেন,

'আমরা দেখেছি কুমিল্লায় নানুয়ার দিঘিরপাড়ে হিন্দুদের পূজামন্ডপে মূর্তির পায়ের নিচে পবিত্র কোরান রেখে কোরানের অবমাননা করা হয়েছে। যেই কোরানুল করিমকে মুসলমানরা জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে সেই কোরানকে কুমিল্লার উগ্রবাদী হিন্দুরা মূর্তির পায়ের নিচে রেখে কোরানের অবমাননার দ্বারা পৃথিবীর ২০০ কোটি মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত করেছে। পুলিশ এসে কোরানকে মূর্তির পায়ের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু কোরান অবমাননার এতবড় ধৃষ্টতা উগ্রবাদী হিন্দুরা দেখিয়েছে, তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না। যেখানে আলেম ওলামাদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখানে এতবড় ধৃষ্টতা দেখানোর পরও উগ্রবাদী হিন্দুদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না। যদি সিসি ক্যামেরা অন্য কেউ সরিয়ে থাকে তবে পূজা কমিটির লোকজন হিন্দুরা সেটি প্রশাসনকে কেন জানায় নি?

'তাহলে বোঝা যায় সম্পূর্ণ ঘটনাটি তাদেরই সাজানো। কোরান করিমকে অবমাননার মাধ্যমে উগ্রবাদী হিন্দুরা তাদের সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত বিষবাস্প বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চায় কিংবা বাংলাদেশে একটা গৃহযুদ্ধ চায়। অতএব আমরা সুস্পষ্টভাবে বলব উগ্রবাদী হিন্দু যারা কোরানের সাথে বেয়াদবি করেছে অনতিবিলম্বে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং কোরানের সাথে বেয়াদবি করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

'কতিপয় আলেম-ওলামারা বন্দী। এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, এজন্য আলেম ওলামারা চুপ থাকবে। যদি সমস্ত বাংলাদেশকে কারাগার ঘোষণা করে ওলামায়ে একরামকে বন্দী করা হয়, আর যদি তাদের ঠেকানোর জন্য সমস্ত বুলেট শেষ হয়ে যায়, তারপরও আল্লাহর কোরানের ইজ্জত রক্ষায় এদেশের মানুষ জানমাল নিয়ে নামতে বাধ্য হবে।'

বক্তব্যের লিংকঃ (https://youtu.be/MuP4dNRjpJo)

২. মাহমুদুল হাসান গুনবি

মাহমুদুল হাসান গুনবি নামের এক ওয়াজ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে সাধারণ মানুষের মাঝে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। তিনি জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতা। তাছাড়া জঙ্গি সংগঠন দাওয়াতুল ইসলামীর সাথেও যুক্ত রয়েছেন। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে তিনি জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন দাওয়াতের নামে। তার একাধিক জঙ্গিবাদী ভিডিওতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সয়লাব। ২০২০ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে 'Sylhet Islamic Media' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, 'আমরা যদি মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে, আমরা যদি ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে আমরা যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হই– তাহলে শুনে রাখ নরাধমরা, মালাউনরা, তোরা ভাস্কর্যের পক্ষে কথা বলার কারণে তোরা হলি খোদাদ্রোহী। তোদের কোনো ছাড় দেয়া যাবে না। আমাদের নম্রতা ভদ্রতাকে এরা দুর্বলতা মনে করে। দুর্বলতা দেখাবেন না এদের সামনে।

তোরা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কট্টর হস, আমরা তাইলে ইসলামের পক্ষে কট্টর। তোরা যদি শিরকের পক্ষে কথা বলোস, তাইলে আমরা ঈমানের পক্ষে কথা বলি।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (bwe https://youtu.be/GGZek32qcSQ)

মাহমুদুল হাসান গুনবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ২০০৮ সালে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা থেকে তিনি পঞ্চম শ্রেণি-দাওরায়ে হাদিস (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকাসহ কুমিল্লা-নোয়াখালী খাগড়াছড়ি বান্দরবান ও কক্সবাজারের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। পাশাপাশি ধর্মীয় মতাদর্শের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। ২০১৪ সাল থেকে ধর্মীয় বক্তব্য প্রচারে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং সে ধর্মীয় বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

মাহমুদুল হাসান গুনবি ওয়াজের নামে কৌশলে তৃণমূলে জঙ্গিবাদ প্রচার করে থাকেন। Sylhet Islamic Media নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ২০২১ সালের ২৮ শে মার্চ প্রকাশিত এক ওয়াজে তিনি বলেন, 'রসুল (স) এর এগারোটা তরবারি ছিল। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম ছিল। একটার নাম ছিল জুলফিকার। তরবারির নাম জুলফিকার। আজকে আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানরা শিখায় ইসলামে কোনো মারামারি নাই। ইসলামে কোন কাটাকাটি নাই। ইসলাম শুধু শান্তি, শুধু শান্তি। আপনারাই কন, ইসলামে মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই তাইলে মোহম্মদ রসুলের এগারোটা তরবারি কিল্লাই? চুমা দিবার লাই নাকি? এগারোটা তরবারি, আপনারা হাদিস পড়েন। এগারোটা তরবারির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট। আল্লাহ রসুলের বল্লমের পোশাক ছিল সাতটা। যুদ্ধপোশাক। আল্লা রসুলের তীর ধনুক ছিল দুইটা। আল্লা রসুলের লোহার টুপি ছিল। এভাবে আপনি হিসেব করে দেখেন। আছে আজকে আমাদের? অস্ত্র কখনো সাহাবায়ে একরামরা নিজেদের থেকে আলাদা করে নাই। ওই যে মসজিদের মেহেরাব। মেহেরাব মানে কি? অস্ত্র রাখার জায়গা।

'সবচেয়ে বেশি জুলুমের শিকার আল্লার এই ফরজ বিধানটার নাম জিহাদ। এটার নাম ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম এবং সংরক্ষণ করা এই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব না। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করছেন। এজন্য আল্লাহ জানেন কোন জায়গায় তিতা ওষুধ দিতে হবে, কোন জায়গায় মিডা ওষুধ দিতে হবে আর কোন জায়গায় অপারেশন করতে হবে। ইসলামে এই অপারেশনটার নাম জিহাদ।'

ইউটিউব লিঙ্ক ঃ (https://m.youtube.com/watch?v=HYyQi4CjPDc)

৩. শায়খ সিফাত হাসান

শায়খ সিফাত হাসান নামে এক ওয়াজ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তৃণমূলে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের ২৪ শে জানুয়ারি 'Waaz Official' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ ও

বিএনপি যারা করেন তাদের যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন জীবনের সব জায়গায় আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য তোদের চেষ্টা কি ছিল? তখন কি জবাব দেবেন কন? জবাবটা কি দেবেন? আল্লাহ বলেন, আরে মানুষ কোরানকে শুধু প্রশংসা করার জন্য নাজিল করি নাই। বরং সংসদ ভবন থেকে কোরানের বিধানগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য কোরান নাজিল করেছি। কেউ যদি মনে করেন কোরান শুধু ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে পালন করতে হবে রাষ্ট্রজীবনে পালন করার দরকার নাই, আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার ঈমান নাই।

'আমাদের দেশে শরীয়াহ ভিত্তিক আইন ফলো করা হয় না। আমাদের দেশের অর্থনীতি ১০০% শরীয়াহ ভিত্তিক না। আমাদের দেশে চুরি করলে হাত কাটা হয় না, জেনা করলে বেত্রাঘাত করা হয় না। মদ খাইলে দোররা মারা হয় না। ডাকাতি করলে শুলে চড়ানো হয় না। মানুষ খুন করলে তারে খুন করা হয় না। আমি আপনাদের অনেক বিধি বিধানের কথা বলতে পারব। ওই ৩০০ আসনের ওইখানে বসে আল্লাহর এইসব বিধি বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা আল্লাহর হুকুম। এই জন্যই বলি, সব জায়গায় মানতে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://m.youtube.com/watch?v=-hh0sFrxm78)

২০২১ সালের ২৬ নভেম্বর দৈনিক কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অনলাইনে এসব মৌলবাদী জঙ্গিবাদী প্রচারণার ফলে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো উৎসাহিত হতে পারে। ধর্মের নামে হিংসা-বিদ্বেষ প্রচারণার ফলে মৌলবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বাংলাদেশ কোনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে না। হবে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কিন্তু জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। ফিরিয়ে এনেছিল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। ফিরিয়ে এনেছিল স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে। সামরিক শাসক এরশাদও একই কাজ করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইসলাম আমাদের দেশের মানুষের প্রাণের ধর্ম। সেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে। তারা রাষ্ট্র, সংবিধান, জাতীয়সংগীত, জাতীয় পতাকাকে চ্যালেঞ্জ করছে।'

৪. মুফতি আমির হামজা

জামায়াত সমর্থিত বক্তা মুফতি আমির হামজা ১৯৯১ সালে খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মুফতি আমির হামজা অল্প বয়সেই কোরানের হাফেজ হন। এরপর তিনি কওমী মাদ্রাসা থেকে মুফতি হন। পাশাপাশি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও আলিম পাস করেন। তারপর তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে "আল- কোরান" এর উপর অনার্স ও মাস্টার্স করেন।

মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে তৃণমূলে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ইউটিউবে 'AL-Hikmah Media' নামের একটি চ্যানেল

থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, 'কিছু কুলাঙ্গার যাদের রক্তের ঠিক নেই, জন্মেরও ঠিক নেই। তারা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কিছু নর্তকীকে সঙ্গে নিয়ে স্লোগান দিলো, ম' তে অমুক, ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই। তাদের জন্যই সাঈদী সাহেব আজকে জেলে। আরেক জনের নাম দেখেন ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল। ওই শয়তানটা কয়েকদিন আগে মারা গেছে। ওই শয়তানটা আলেমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে।'

২০২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'Rangdhanu Islamic TV' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, 'দেশে শিরক চলতেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কার হাতে, ও মুসলমান? রাষ্ট্রের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে কিন্তু আমরা কি বলতেছি? বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল– ওর চৌদ্দ গোষ্ঠী পিপল। আল্লাহ বলতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে আর আমরা বলতেছি রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের হাতে। এর চেয়ে শিরক আর কি হতে পারে? শিরক এই জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর আইন-এর সাথে শিরক করো না। আল্লাহ চোর সম্পর্কে বলেছে যে, চোর যদি চুরি করে তবে তার হাত কেটে দাও। আল্লাহর হুকুম কি? তার আইন কি? কিন্তু আমরা বলছি চোর যদি চুরি করে তবে তার ৩ মাস থেকে ৩ বছর জেল দাও। এইটা হইল আল্লাহর সাথে শিরক করা।

'আরো শিরক আছে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'– নাউজবিল্লাহ বলেন সবাই। ধর্ম যার যার উৎসব সবার এইটা কোন মুসলমানের স্লোগান নয়। মুসা, ঈসা এমনকি আপনার আমার নবী মুহম্মদ (সা.) ও এই স্লোগান দেন নাই। ইসলামে এই স্লোগান নাই। ইহুদি মুনাফিকদের আবিস্কার করা এই স্লোগান। এটা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় শিরক। এসো শপথ করি, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শিরকে মাথা ঠেকানো যাবে না।' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Nwz7RYPYRVU)

৫. শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন

শায়খ মুজাফফর বিন মুহসিন রাজশাহী জেলার বাগমারা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহীর দারুল উলুম ইসলামী কমপ্লেক্স মাদ্রাসার পরিচালক। তিনি মাসিক ইখলাস পত্রিকার সম্পাদক। মুজাফফর বিন মুহসিন একজন আহলে হাদিসের বক্তা। তার বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে তৃণমূলে জঙ্গিবাদ প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি 'Enlight for Islam' নামে এক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'তুমি নতুন বুঝ দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করবা তা হবে না। হাদিস মানব না এইটা বলা মানে রাসুলকে অবমাননা করা। ফতোয়াটা আপনারা ভাল করে শুনে নেন। রাসুলুল্লাহর সুন্নতকে মানার নামে তুমি বেদাত করছো এটা রাসুলকে অপমান করা। আল্লাহর নবীকে যেই কটূক্তি করবে, অপমান করবে, সে কাফের হোক, মুশরিক হোক, আর মুসলমান হোক, পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এইটা এত জটিল পর্যায়ের ফতোয়া যে, যত পর্যায়ের হারাম বিষয় আছে, সবচেয়ে বড় পর্যায়ের হারাম বিষয় এইটা। কটূক্তি করলে আর মাফ নাই। তওবা করলে মাফ আছে কিন্তু

এইখানে তওবা করলে কোন মাফ নাই। আল্লাহ এবং রাসুল কেউ এইখানে ছাড় দেন নাই। কেয়ামতের মাঠে তওবা কাজে লাগতে পারে কিন্তু দুনিয়াতে তার বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নাই। একজন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় তবে তওবা করলে তার বাঁচার সুযোগ আছে। কিন্তু রাসুলকে নিয়ে কটূক্তি করলে তার বাঁচার সুযোগ নাই।

'যারা বলে হযরত মুহম্মদ (সা.) শেষ নবী না, গোলাম মোহম্মদ কাদিয়ানী হচ্ছে শেষ নবী তারা হচ্ছে কাফের। এই কথা কেউ যদি বলে তবে সে মুসলমান থাকবে না, ওনি কাফের হয়ে যাবে। কথাটা কিন্তু খুব গভীরভাবে নিতে হবে। কাদিয়ানী গোষ্ঠীটা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এইসব বিভ্রান্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য আমরা অনেক আগে থেকে বলে আসছি আল্লাহ রসূলের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদেরকে ডাইরেক্ট কাফের ঘোষণা করতে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/d5H U4YrajfY)

৬. গোলাম রাব্বানী যুক্তিবাদী

মাওলানা গোলাম রাব্বানী যুক্তিবাদী ১৯৮০ সালে গাইবান্ধা জেলা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বগুড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদের খতিব। গোলাম রাব্বানী জামায়াত সমর্থিত একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে তৃণমূলে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার সম্প্রীতি ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে। ২০১৯ সালের ১লা অক্টোবর 'Islami Waz Bogra' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'হিন্দুদের দূর্গাপূজা যখন আসবে তখন বড় বড় নেতারা বক্তব্য দিতে গিয়ে বলে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এইটা কি কোনোদিন হয়? আমি তাদেরকে বলতে চাই, নারকেল গাছ যার যার ডাব সবার, তাই কি হবে? যারা মুসলমান তারা বলবে ধর্ম যার যার উৎসব তার তার। মুসলমানদের মসজিদে জুমার নামাজ যখন আদায় হয় তখন কোন হিন্দু ভদ্রলোককে কি পাওয়া যায়?

'হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাইয়া তাদের অনুষ্ঠানে শরিক হইছো, নারু খাইছো, প্রসাদ খাইছো, আড্ডা দিছো? আরে বেটা মরে দেখ জম্মের খাওয়া কবরের মধ্যে বসে খাওয়াবে। আগে ঢুকে দেখ কবরে। ভাইয়েরা আমার, ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগান জায়েজ না হারাম? অবশ্যই হারাম। এই স্লোগানের পরিবর্তে যদি বলা হইতো, ধর্ম যার যার উৎসব তার তার তাইলে ঠিক আছে। ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এই স্লোগান দিলে ঈমান ধ্বংস হবে।'

ওয়াজের লিঙ্ক: (https://youtu.be/vRIE0o_z_Xw)

৭. আলী হাসান উসামা

মুফতি আলী হাসান উসামা ১৯৯৫ সালের ২২ আগস্ট সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে

পরিচিত। বাংলাদেশে সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আল-কায়েদার অনুসারী আনসার আল ইসলাম অন্যতম। আগে এই সংগঠনটি 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' নামে পরিচিত ছিল। ২০১৩ সাল থেকে মুক্তমনা ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, ভিন্নমতাবলম্বী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের টার্গেট কিলিং করে আলোচনায় আসা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমকে ২০১৫ সালের ২৫ মে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর নাম পাল্টিয়ে নিষিদ্ধ এই সংগঠনের সদস্যরা 'আনসার আল ইসলাম' নামে তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। ২০১৭ সালের ৬ মার্চ আনসার আল ইসলামকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে আনসার আল ইসলামের অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন থেকেই এই সংগঠনের কোণঠাসা নেতাকর্মীরা নতুন করে টার্গেট কিলিং বন্ধ করে জিহাদ দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করে। করোনাকালীন সময়ে তারা অনলাইনে নিজেদের প্রচারণা চালিয়ে নতুন নতুন সদস্য সংগ্রহ করেছে।

আনসার আল ইসলামের সদস্যরা আগে মাওলানা জসিম উদ্দিন রাহমানীকে তাদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মেনে চলতো। নিজেদের সদস্যদের মধ্যে তারা জসিম উদ্দিন রাহমানীর বিভিন্ন ওয়াজ ও বক্তব্য এবং কথিত জিহাদের সপক্ষে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে বেড়াতো। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া অনেক জঙ্গি রাহমানীর বক্তব্যে মোটিভেটেড হয়ে জঙ্গিবাদে জড়িয়েছে বলে স্বীকার করেছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে কাশিমপুর কারাগারে রয়েছে রাহমানী। রাহমানী কারাগারে থাকায় তার নতুন কোনও ওয়াজ বা বক্তব্যের প্রচারণা বন্ধ হয়ে গেছে। ২০১৪ সাল থেকে আলি হাসান উসামাকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে মেনে আসছিল আনসার আল ইসলামের নেতাকর্মীরা। আলী হাসান উসামা রাজবাড়ী জেলায় একটি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই বসবাস করে আসছিল। রাজবাড়ী থেকেই বিভিন্ন ওয়াজে কথিত জিহাদের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি ইউটিউবে উগ্রবাদী মতাদর্শ ছড়াতো। উসামার ওই মাদ্রাসা ছিল জঙ্গিদের আস্তানা।

আলী হাসান উসামার বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি 'Today Waz' নামক ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'আফগানিস্তানের মোল্লাদের কাছে হয়তো বাহ্যিক উন্নতির উপকরণ নেই কিন্তু ভিতরে এমন একটা জিনিস আছে যা বদরের সাহাবীদের মধ্যে ছিল। এই জিনিসটা পৃথিবীর যার মধ্যে চলে আসবে তাকে থামানোর ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে দেন নাই। বদরের সাহাবীদেরকে কাফেররা থামাতে পারেনি। বদরের যুদ্ধে আমার আল্লাহ নিজে যুদ্ধ করেছেন। কারো যদি জিহাদ নিয়ে চর্মরোগ চুলকানি থাকে, কেউ যদি জিহাদকে বিকৃত করতে চায়, জিহাদের নামে ভিন্ন কিছু উপস্থাপন করতে চায় তবে তার উচিৎ আমার রবকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কোন রবের উপাসনা করা।'

বক্তব্যের লিঙ্ক (https://m.youtube.com/watch?v=zFgzyPQRTTg)

২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে 'Today Waaz' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'আপনারা মনে রাখবেন আল্লাহ সেই নপুংশক জাতিকে খেলাফত দান করবে না, যারা খেলাফতের নাম শুনলে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমাদের নবী খলিফা ছিলেন না? জিহাদ মানেই যদি জঙ্গি হয় তাহলে তো বলতে হয় আমাদের নবী সবচেয়ে বড় জঙ্গি ছিলেন। কারণ তিনি ২৭ টা জিহাদ করেছেন। আরো ৪৭ টা বাহিনী পাঠিয়েছেন। আপনারা কয়টা জিহাদ করেছেন?'

ইউটিউব লিঙ্ক ঃ (https://m.youtube.com/watch?v=uL01ndzdNwM)

২০২১ সালের ৭ মে বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ওয়াজের নামে জঙ্গিবাদ ছড়ানো এবং ভারতীয় জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে ২০২১ সালের ৫ মে গ্রেপ্তার করা হয় উগ্রবাদী ইসলামী বক্তা আলী হাসান উসামাকে। ভারতীয় জঙ্গিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উসামা একাধিকবার সেদেশে গিয়েছিল তিনি। তার সঙ্গে একাধিক ভারতীয় জঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকার তথ্য পেয়েছে ঢাকার কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট সিটিটিসি। সিটিটিসির কর্মকর্তারা বলছেন, উসামার ব্যবহৃত মোবাইল ও ল্যাপটপের ফরেনসিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। কার কার সঙ্গে সে যোগাযোগ করতো তা জানার চেষ্টা চলছে।

'২০২১ সালের ৫ মে রাতে সংসদ ভবনে হামলা করতে আসা মোহাম্মদ আল সাকিব নামে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই রাতেই রাজবাড়ী থেকে আলি হাসান উসামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, যার বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে সন্ত্রাস ছড়ানো ও জিহাদের ডাক দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, আলি হাসান উসামা আনসার আল ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতা ছিল। তার নির্দেশেই সংসদ ভবনে হামলার পরিকল্পনা করেছিল আনসার আল ইসলামের সক্রিয় সদস্য সাকিব।'

৮. মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী

হেফাজতে ইসলামের সাবেক সহকারী মহাসচিব ও বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজীর বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'বিডি ইসলামিক সেন্টার' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ওয়াজে মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, 'নামাজের জামাতে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক করা নাকি অসাংবিধানিক? এই দেশে অনেক কিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ছবি টানানো বাধ্যতামূলক করা হয়, মঙ্গল শোভাযাত্রা বাধ্যতামূলক করা হয়। নামাজ আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। প্রয়োজনে বাংলাদেশের সংবিধান একশ বার কাঁটাছেড়া করো। দল মত ভিন্ন হতে পারে, তবুও যদি তোমরা এই ধরনের নোংরা কথাবার্তা বলো তবে দেশের মানুষ কাগজ জমাইয়া তোমার গদিতে আগুন ধরাইয়া দেবে।

'আমরা কর্মসূচি পালন করেই যাব। যদি কেউ মনে করে আমরা কর্মসূচি পালন করে ক্লান্ত হয়ে যাব তবে আপনারা ভুল করবেন। আমরা শাপলা চত্বরে রক্ত দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই নাই। দরকার হলে বঙ্গোপসাগর পরিমান রক্ত দেব। এই রক্তের স্রোতে কাদিয়ানী আর তাদের দোসররা বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাবে। হে মুসলমানরা শোনো, লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি লাগে। আমরা প্রস্তুত আছি। জুনায়েদ বাবুনগরী, ওলামায়ে একরাম যখনই আমাদের ডাকবে তখনই আমরা রাজপথে নেমে আসব ইনশাল্লাহ।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://m.youtube.com/watch?v=lVdDpAx8Fmc)

২০২১ সালের ৭ই মার্চ 'Jadid Media' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ওয়াজে দেখা যায় মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজী বলছেন, 'কেন আমরা আল্লাহর নবীর দুশমনদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই, তোমরা জানতে চাও? আমার কাছে এক কোটি যুক্তি আছে। যদি রসুলের কটূক্তিকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা না হয় তবে এর উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। যদি মুসলমান হিসেবে মরতে চাও, মুনাফেক হিসেবে মরতে না চাও, তবে দেশের জন্যে, ঈমানের জন্যে, শান্তির জন্যে এমন একটি আইন চাই যেখানে কটূক্তিকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে। না হলে আল্লাহর কসম বলছি, আমাদের গায়ে আগুন লাগলে আমরা সারা বাংলাদেশে আগুন ছড়িয়ে দেব। তোমাদেরকে ইজ্জত পুনরুদ্ধারের তরিকা বলে দেই। যদি বাংলার জমিনে হেফাজত থাকে তবে আল্লাহ তোমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দেবে। আর যদি বাংলাদেশে হেফাজত না থাকে তবে তোমাদের ইজ্জত কতটা যাবে তা আল্লাহই জানেন। আমরা যদি বাংলাদেশে কোরান বাধ্যতামূলক করতে চাই তবে নাস্তিক মুরতাদদের গায়ে আগুন ধরে যায়। পাকিস্তানেও স্কুল কলেজে কোরান শেখা বাধ্যতামূলক।

'হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করেছিলাম, এদেশে মুসলমানদের জন্য কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিন্তু স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলোতে আমরা তা দেখতে পাই না। তোমরা কাকে পরোয়া করো? আজকে প্রাইমারি স্কুলে, হাইস্কুলে কোটি কোটি শিক্ষার্থী কোরান পড়তে পারে না। তাই কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভালভাবে বলছি। যদি না শোনো তবে আঙুল ত্যাড়া করতেও আমরা জানি।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/2Entb8Z4vso)

২০২০ সালে 'Islamic Jihad TV' ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত– কুষ্টিয়া শাহ মিরপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার একটি ওয়াজ মাহফিলে মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বলেন, ''আমার সোনার বাংলা' গানটি লেখা হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তখন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে রবিঠাকুর এটা লিখেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গ হলে সেদিন আমাদের এই পূর্ববাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়তো। রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাওয়ার বেশ সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের নির্যাতিত মুসলিম ও দলিত শ্রেণির প্রজাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হতো।

'এছাড়া তখন বঙ্গভঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শোষক জমিদারশ্রেণীর জমিদারিত্ব হুমকির মুখে পড়তো। তাই নিজের জমিদারিত্ব, পূর্ববাংলার মুসলমান ও দলিত শ্রেণির প্রজাদের শোষণ এবং অভিজাত বর্ণহিন্দুর আধিপত্য নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে রবিঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এই গানটি লিখেছিলেন।

'গানটি এমনকি পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাংলার একত্রীকরণের কিংবা অখণ্ড বাংলার ঐতিহাসিক প্রেরণাও জোগায়। ফলে এটি কোনোভাবেই বাঙালি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের চেতনার প্রতি সর্মথন দেয় না। অথচ আজকের বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অধীন একটি পরজীবী অঙ্গরাজ্য মাত্র! 'আমার সোনার বাংলা' গানটা আগাগোড়াই পৌত্তলিক ভাবপুষ্ট। হিন্দু সম্প্রদায় যেভাবে গরুকে 'মা' বলে পূজা করে, ঠিক সেভাবে দেশকেও 'মা' কল্পনা করে পূজা করার মতো একটা শেরেকি ভাব এই গানটির মধ্যে নিহিত আছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মজাত মাতৃভক্তিবাদ ফুটে ওঠে গানটিতে।

'মুসলমানরা দেশের মাটি, বাতাস, আলো, বায়ু ইত্যাদিকে আল্লাহ'র দান ও তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে তাঁর প্রশংসায় শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক সিজদাবনত হয়। অথচ গানটিতে তথাকথিত 'মা'-এর বন্দনা করা হয়েছে, যেন দেশ নিজেই একটা মাতৃদেবী! আর ইসলামের বিশ্বাসব্যবস্থায় কেবল আল্লাহ'র প্রতি ব্যতীত আর কোনো বিশেষ ভক্তিবাদের স্থান নেই, কারণ তা শিরক বলে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক কয়েকটি লাইন গানটি থেকে তুলে না ধরলেই নয়। তা হলো:

'ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে / দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে / ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিবো চরণতলে / মরি হায়, হায় রে।

'এখানে বিশেষত 'তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে' এবং 'গরিবের ধন যা আছে তাই দিবো চরণতলে'– এ দুটি লাইনে যেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে দেবীর পাদদেশে পূজার অর্ঘ্য নিবেদনের গভীর আর্তি জেগে ওঠে! তাছাড়া দেশকে 'মা' হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা একসময় ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ছিল না; হিন্দুদের স্বভাবজাত ধর্মীয় মাতৃভক্তিবাদপ্রসূত 'দেশমাতা' ভাবনার জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিকভাবে সেটা ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। গরুকেও হিন্দুরা ধর্মীয় 'মা' হিসেবে পূজা করে। সুতরাং মাতৃভক্তিবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ধর্মাচার মাত্র। তাই, পৌত্তলিক ভাবপুষ্ট হওয়ায় 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নিয়ে বিশেষত ওলামায়ে কেরামের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। আমি এই সংগীতের পরিবর্তন চাই।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/O-eh0Ojqxk0)

৯. জুনায়েদ আল হাবিব

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি, ঢাকার জামিয়া কাসেমিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক ও হেফাজতে ইসলাম-এর সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব জুনায়েদ

আল হাবিবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে জঙ্গিবাদ এবং ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ১৫ এপ্রিল, 'NH Media' নামক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট থেকে দুজন বিচারপতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। লতিফ সিদ্দিকী হজ আর তাবলীগের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। মনে রাখবা বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে আমরা পাহারাদার। তসলিমা নাসরিন কোরান পরিবর্তনের কথা বলে, শাহবাগে নাস্তিক মুরতাদরা আল্লাহর ইজ্জতের উপরে আক্রমন করেছে। আমরা পাহারাদার। শিখা চিরন্তন জ্বালাইছেন, আমরা পাহারাদার। আমরা শাইখুল হাদিসের নেতৃত্বে আবার শাপলা চত্বর রক্তে রঞ্জিত করে আমরা পাহারাদার হব।

'তোমরা যারা স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি তারা স্বাধীনতার কথা বলো। তোমরা ৫২'র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছো, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছো। মনে রাখবা আমাদের শাহ আব্দুল আজিজকে ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চার ভাগের একভাগও হবে না। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করতে তাদেরকে আনতে হবে। শাহ আব্দুল আজিজের ফতোয়ায় অনুপ্রানিত হয়ে সর্বপ্রথম সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। তাদের শাহদাতের ইতিহাস বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা হবে না। তোমরা ৯ মাস যুদ্ধ করেছো আর আমরা পৌনে দুইশ বছর লড়াই করেছি স্বাধীনতার জন্য। এই দেশ মুসলমান এবং আলেম ওলামাদের রক্তে অর্জিত। আমরা দেশ রক্ষা করব ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। তোমাদের যদি আলেম ওলামাদের পছন্দ না হয়। তবে তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাও। এই দেশ তোমাদের জন্য না। এই দেশে থাকতে হলে আলেম ওলামাদের ফতোয়া মেনেই থাকতে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://m.youtube.com/watch?v=o581OBXd9KE)

২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল জুনায়েদ আল হাবিবকে শাপলা চত্বরের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

১০. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারী সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন বুলারাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই সাথে আমীর হিসাবে আছেন। তিনি মাসিক আত-তাহরীক নামক একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। ২০১৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রফেসর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং জামালপুরের আরামনগর কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৯ সালে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে তিনি কলারোয়া সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা থেকে আইএ এবং সরকারী মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা থেকে বিএ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। অত:পর ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাস করেন।

তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও সংস্থাসমূহ: ১. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (১৯৭৮), ২. আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা (১৯৮১), ৩. তাওহীদ ট্রাস্ট (১৯৮৯), ৪. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (১৯৯২), ৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ (১৯৯৪), ৬. সোনামণি (১৯৯৪), ৭. মাসিক আত-তাহরীক (১৯৯৭), ৮. সালাফিয়া ট্রাস্ট (২০০২), ৯. ইসলামিক কমপ্লেক্স (২০১০)

আসাদুল্লাহ আল গালিবের বিরুদ্ধে কৌশলে জঙ্গিবাদ প্রচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০২১ সালের ২৮ আগস্ট 'Mukti TV' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত বক্তব্যে দেখা যায় তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে তালেবানের জঙ্গিবাদী আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি বলেন, 'তালেবান ক্ষমতায় এসেছে, কতজনে যে কতকিছু বলছে। খুশি হলাম আজকের খবরটি পড়ে। সেখানে তালেবান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে কোথাও কোন গণতন্ত্র চলবে না। দেশ চলবে সুরা কাউন্সিলের পরামর্শের ভিত্তিতে। এখানে আমিরের উপর আনুগত্যের ভিত্তিতে চলবে সবকিছু। কোন প্রকার গণতন্ত্র আর গণভোট কিছুই এখানে চলবে না। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ।

'এইসব শুনেই আজ মসজিদে আসছি। ভাবলাম যে এইসব শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আবার গণতন্ত্র হয়ে যায় কিনা। ইতিহাস ভুললে আমাদের চলবে না। উসমানীয় খেলাফত নষ্ট করেছে এইসব গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। একসময় তুর্কী যুবকদের ভিতরে জাতীয়তাবাদ ঢুকিয়ে দেয়া হল। তাদেরকে বলা হলো তোমাদেরকে কেন আরবরা চালাবে? তাদেরকে জাতীয়তাবাদ আর গণতন্ত্রের চর্চা করতে বলা হলো। তাদেরকে আরো বলা হলো– রাষ্ট্র চলবে সবার জন্য, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষ ঢুকিয়ে উসমানীয় খেলাফতকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। যারা ইতিহাস জানে না তাদের কোরান হাদিস ধরাই উচিৎ না। এত সহজে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুরব্বি এবং যুবকরা যখন একত্রিত হবে তখনই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এর আগে নয়।

'যুদ্ধে আগের নিয়ম ছিল প্রতিপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। মুসলমানের জিহাদ হবে, রাজত্ব হবে, এই সবকিছু হবে আল্লাহর জন্য। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কারো ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়। মুসলমানরা লড়াই করে, যুদ্ধ করে শুধু আল্লাহর হুকুম কায়েম করার জন্য। আল্লাহর বিধান না মেনে শুধু আল্লাহ আল্লাহ করলে হবে না। আজকে আফগানিস্তানে তালেবান যদি কোরান সুন্নাহ মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে তারা হবে আদর্শের অধিকারী। আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন তাদেরকে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনার তৌফিক দান করেন।

'আমাদের প্রতিটি পা ফেলতে হবে জান্নাতের স্বার্থে। তখনই আসবে বিপ্লব। যখন এদেশের যুব সমাজ এগিয়ে আসবে তখনই তালেবানের মত বিজয় আসবে। হে যুবকরা শোনো, তোমাদের রক্ত ব্যয় করতে হবে তালেবানের মত আখিরাতের পথে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/8AvwL8X43WY)

১১. মুফতি কাজী ইব্রাহিম

মুফতি কাজী ইব্রাহিম নরসিংদী জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস। তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মাওলানা আব্দুল গনি ও মায়ের নাম আছিয়া বেগম। তার দাদা ছিলেন নোয়াখালীর আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। তার মামা মুফতি দীন মোহাম্মদ লালবাগ মাদ্রাসার মুফতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা পরবর্তী সময় তার মামাকে নিয়ে এসে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব হিসেবে নিয়োগ দেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বায়তুল মোকাররমের প্রথম খতিব তিনি। কাজী ইব্রাহীমের গাজীপুরে একটি মাদ্রাসা আছে। দক্ষিণখানে নির্মাণাধীন আরও মাদ্রাসা রয়েছে।

২০২১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জাকির হোসেন রোড থেকে মুফতি ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওয়াজ নসিহতের নামে সাম্প্রদায়িকতা, উল্টাপাল্টা ও ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে মুফতি কাজী ইব্রাহিমকে আটক করা হয়েছে।

মুফতি কাজী ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কৌশলে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের ২৬ শে মার্চ 'TAFSIR MEDIA KJB' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, 'এই পৃথিবীতে সবচেয়ে আল্লাওয়ালা, অলি আউলিয়া টাইপের যদি কোনো মুসলমান থাকে তারা ওই তালেবানরা। তালেবানরাই এই জমানার ওলি আউলিয়া। যেই ইসলাম পালন করে আমরা আপনারা হালুয়া খাই, সেই ইসলাম পালন করার কারণেই তাদের উপর বুশদের বোমা পড়ে। তাহলে কে হক? আপনারা নাকি তারা? অবশ্যই তারা। ইমাম মাহাদী ঈসাদের সহযোগী এই তালেবানরাই হবে। হাদিসে আফগানিস্তানের এই তালেবানদের কথাই বলা আছে। আমাদের দেশে কিছু আবেগহীন মানুষ আছে তারা তালেবানদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ায়। তাদের উপর হেদায়েত আসুক। এদের জন্য আমরা দোয়া করি। নবীজির উম্মতের একদল মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে থাকবে, তারা কারা? যারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশে দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রেখেছে তারা।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/MG3Dy5DfC1Y)

মুফতি কাজী ইব্রাহিম এর আগে করোনা ভাইরাস এবং টিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত হন। ২০২১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেন– মুফতি ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ ছিল। তিনি ফেসবুক, ইউটিউব ও ওয়াজে উল্টাপাল্টা কথা বলেন। তার এসব কথার জন্য মানুষের কাছে ভুল মেসেজ যায়। ওইসব অভিযোগ যাচাই করতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি।'

২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জুমার নামাজের খুতবা, ওয়াজ মাহফিল, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক আইডি ও পেজে ইব্রাহীম নানা ধরনের বক্তব্য, তত্ত্ব ও সূত্র দিয়ে আলোচিত-সমালোচিত হন। তার

বক্তব্যের অনেক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কাজী ইব্রাহীমের সমালোচিত মতবাদের মধ্যে একটি হলো– করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার কারণে নারীর দাড়ি গজাচ্ছে, পুরুষের কণ্ঠ পাল্টে নারীকণ্ঠ হচ্ছে। মুফতি ইব্রাহীম আরেক বক্তৃতায় করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের গাণিতিক 'সূত্র'ও দিয়েছিলেন! এক প্রবাসী 'স্বপ্নে' ওই সূত্র পেয়েছেন, তিনিই তাকে বিষয়টি বলেছেন বলে জানান। তার এমন বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বহু হাস্যরস তৈরি হয়েছে। এভাবে কাজী ইব্রাহীম জুমার খুতবায় বিভিন্ন সময় করোনার চিকিৎসা, করোনায় মুসলিমরা আক্রান্ত হবে না, পৃথিবীর সৃষ্টি ও ভৌগোলিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রল হয়েছেন। 'হিটলার মারা যাননি', 'শেকসপিয়ারের প্রকৃত নাম শেখ যুবায়ের' প্রভৃতি বক্তব্য বিভিন্ন সময় ভাইরাল হয়েছে।'

১২. মিজানুর রহমান আযহারী

মাওলানা মিজানুর রহমান আযহারী ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার ডেমরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস কুমিল্লার মুরাদনগরের পরমতলা গ্রামে। তার বাবা একজন মাদ্রাসার শিক্ষক। তার পরিবারে মা-বাবা ও এক ভাই রয়েছে।

মিজানুর রহমান আযহারী ঢাকার ডেমরায় অবস্থিত দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ২০০৪ সালে দাখিল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ২০০৬ সালে আলিম পরীক্ষা পাস করেন। ২০০৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মিসর সরকারের শিক্ষাবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট করার জন্য মিসরে যান। সেখান থেকে ডিপার্টমেন্ট অব তাফসির অ্যান্ড কোরানিক সায়েন্স থেকে ২০১২ সালে অনার্স উত্তীর্ণ হন। মিসরে পাঁচ বছর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করার পর ২০১৩ সালে মালয়েশিয়া যান। সেখানে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কোরান অ্যান্ড সুন্নাহ স্টাডিজ থেকে ২০১৬ সালে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন শেষ করেন।

২০১৮ সালের ৩ অক্টোবর, তারিখে 'ISLAMER ALO Official' নামে এক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে মিজানুর রহমান আজহারি বলেন, 'আপনি এক মুফাচ্ছিরকে কারাগারে রাখবেন তো দেখবেন লক্ষ লক্ষ মুফাচ্ছির ঘরে ঘরে। আপনি এক জায়গায় মুফাচ্ছিরকে আটকিয়ে রাখবেন তো দেখবেন দশ জায়গায় মুফাচ্ছিররা ইসলাম কায়েম করে ফেলবে। ময়দানে ময়দানে মুফাচ্ছিররা এখনো আছে। সিংহকে জেলে বন্দি করলেও সিংহের বাচ্চাগুলো আছে। মনে রাখবেন সিংহের বাচ্চা যেগুলো সেগুলো সিংহই, বানর না। তাদের গর্জনে একসময় বন কেঁপে কেঁপে উঠবে। কোরান আমাদের প্রাণের কিতাব। এই কিতাব মানলেও ছোয়াব, এই কিতাবের জন্য মরলেও ছোয়াব। আপনারা এই কিতাবের জন্য মরতে রাজি আছেন? কোরানের জন্য মরলে আপনি মরবেন না, আজীবনের জন্য জীবিত থেকে যাবেন।

'আল্লাহ বললেন খবরদার, কোরানের রাজ কায়েম করতে গিয়ে আমাদের জমিনে যারা রক্ত ঢাললো, কোরানকে মসনদে বসাতে গিয়ে, কোরানের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা জীবন দিলো তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। কেয়ামতের দিন তারা জীবিত পাখি হয়ে জান্নাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবেন।

'যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে উদ্দেশ্য করে মিজানুর রহমান আজহারি বলেন, একজন মুফাচ্ছির এদেশে ছিল। যার জন্য ১৭ কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা ছিল। ওই মুফাচ্ছিরের জন্য মানুষ জীবন দেয়। ওই মুফাচ্ছিরের জন্য চাকমা মুসলমান হয়েছে, নাস্তিক আস্তিক হয়েছে, হিন্দুরা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। এই বাংলার জমিনে কোরানের আইন চালু হোক তা আমরা চাই। যারা কোরানের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই। কোরানের বিরুদ্ধে একটা আইনও বানালে সেই আইন আমরা মানব না।'

ওয়াজের লিঙ্ক: (https://youtu.be/CtkB2b8aJ7o)

১৩. মুফতি নূর হোসাইন নূরানী

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য ও খতমে নবুয়ত আন্দোলনের প্রধান নূর হোসাইন নূরানীর বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে তৃণমূলে ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং জঙ্গিবাদ প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। মোঃ সানাউল্লাহ নামের এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত 'Istema Media' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ প্রচারিত এক ওয়াজে তিনি বলেন, 'ওই কুত্তার বাচ্চাদেরকে আমরা বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেব না। অপেক্ষা করো রাম ধোলাই আসতেছে। কেউ ছাড় পাবে না। ন্যাশনাল ফতোয়া বোর্ড গঠন করব। আমরা রায় দেব আর বাংলার গাছে গাছে ওদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেব। একটাও রেহাই পাবে না ইনশাল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে শেখ হাসিনা, জিয়া থেকে খালেদা কারা কখন নবীজীকে গালি দিয়েছে তার তালিকা বানিয়ে আমরা শ্বেতপত্রে প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। একটাকেও রেহাই দেব না ইনশাল্লাহ। ৭২ সালের সংবিধানে লেনিনের নাম, কার্ল মার্কসের নাম যারা লিখেছে, যারা আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম লিখেছে এমনকি আমার সীমানার শত্রু বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যারা লিখেছে কিন্তু মুহাম্মদ (স) নামটা লিখতে পারে নাই সেই ড. কামাল আর মালাউনের বাচ্চা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত একটাও রেহাই পাবে না। ঠিক কিনা জোরে কন। এরা মরে গেলেও জাতি এদের কবরে গিয়া জুতা মারবে।

'যেই মাহফিলে বাধা দেবে, যদি দেখেন পুলিশের পোষাক পরে আসুক আর রাজনৈতিক দলের নেতার সুরত ধরে আসুক মাহফিলে বাধা দিলেই মনে করতে হবে ওইটা ইন্ডিয়ান রাজাকার। সাথে সাথে মাহফিলের প্যান্ডেলের বাঁশ ভেঙে এমন পিটান পিটাবেন, মাথা ভাঙবেন কোমর ভাঙবেন, পা ভাঙবেন, সম্ভব হলে মাহফিলের প্যান্ডেলে কবর দিয়ে দেবেন। নাস্তিক মুরতাদ যারা লাফালাফি করছো ইসলামের আকাশে চাঁদ উঠেছে। তোমাদের সময় এসে গেছে ঠিক কিনা জোরে কন। খোদার

কসম, কেউ রুখতে পারবে না ইনশাল্লাহ। শেখ হাসিনার চেয়ে ক্ষমতাবান প্রধানমন্ত্রী আর আসবে দেশে? তারপরেও তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়া ধরার সাহস পায় নাই। জুনায়েদ বাবুনগরী, আল্লামা মামুনুল হক, ফজলুল করিম এরা বাংলার জিন্দা শাহজালাল।

'মমতাজের গান দিয়া আর কোনোদিন বাংলাদেশের পার্লামেন্ট চলবে না। ২০৪০ সালের পরে পার্লামেন্টে বার তসবির জিকির হয়ে সুরায়ে হাশরের আখেরিতে এনায়েত হয়ে সংসদ শুরু হবে ইনশাল্লাহ। আমরা ঘাস কাটি না। উনিশ বছর মামুনুল হক আমরা ঘাস কাটব না, বাবুনগরী ঘাস কাটবে না, ফয়জুল করিমরা ঘাস কাটব না। উনিশ বছরে বাংলাদেশে মেয়েগুলির জন্যে এত এত মহিলা মাদ্রাসা বানাব, এত এত কওমী মাদ্রাসা বানাব। যুবকগুলি ওমর আর খালিদ বিন ওলিদ হয়ে যাবে। ২০৪০ সালের পর বাংলাদেশ অটো ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে।'

ইউটিউব লিঙ্ক: (https://youtu.be/CnJzW8M3ZNs)

২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মুন্সিগঞ্জে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য ও খতমে নবুয়ত আন্দোলনের প্রধান মুফতি নূর হোসাইন নূরানীকে (৫৪) মুন্সিগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২২ এপ্রিল রাত সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মুন্সিরহাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলছে, ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালের দিন সিরাজদিখান উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উসকানিদাতা হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

মুফতি নূর হোসাইন নূরানী ওয়াজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ান। ২০২০ সালের ১৩ই নভেম্বর 'হাতপাখা মিডিয়া' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'আমি আজকে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি বঙ্গবন্ধুর সুসন্তান নাকি কুসন্তান? যদি কুসন্তান হন তবে আমাদের কোন পরামর্শ আপনার শোনার দরকার নাই। যা মন চায় করেন। মূর্তি বানান আমরা তা ভেঙে ফেলে দেব। আর যদি সুসন্তান হন তবে আমাদের পরামর্শ হলো মূর্তি না বানিয়ে ওলামায়ে একরামগণ কিভাবে প্রস্তাব করেছেন সেইভাবে মিনার বানান। আপনার সবচেয়ে প্রিয় রাষ্ট্র ভারতে তাজমহল আছে। পর্যটক যায়। আপনি একটা মুজিব মিনার তৈরি করেন এবং সেই মিনার ৩৬০ ফুট উঁচু করেন। মক্কা শরীফের ঘড়ি টাওয়ারের মত ঘড়ি দেন। যেন ওইদিকে মাওয়াঘাট, এইদিকের টঙ্গীবাসী এই ঘড়ি দেখতে পায়। আর ডিজিটাল মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সেই মিনার থেকে চালু করেন। আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর সুসন্তান হন তবে শোনেন, পাঁচ ওয়াক্ত আজান শোনার পর আপনার বাবা সওয়াব পাবে কবর থেকে।

'আর মূর্তি যদি বানান, পারবেন না চ্যালেঞ্জ করে বলছি। এয়ারপোর্ট গোলচত্তর মোস্ট ইন্টারন্যাশনাল পয়েন্ট– সেখানে পারে নাই মূর্তি বানাইয়া রাখতে, ভেঙে

দিয়েছি। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি বাহাদুরি দেখান তবে আপনাকে দেখে নেয়া হবে ইনশাল্লাহ। মূর্তি বানালে সে মূর্তি থাকবে না। বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেব। সংগ্রামী ভাইয়েরা, আমরা অনেক ছাড় দিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি ধরাকে সরা জ্ঞান করবেন না। এই দেশ আপনার বাপ দাদার একার নয়। মসজিদের শহর ঢাকা, মূর্তির শহর বানাতে দেব না, দেব না, দেব না। মূর্তি বানিয়ে দেখুন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই মূর্তি বুড়িগঙ্গায় জমা হবে ইনশাল্লাহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মূর্তি কিভাবে ভেঙে দিতে হয় সেই শিক্ষা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়ে গিয়েছেন। সময়মত দেখবেন মূর্তি কিভাবে ভাঙা হয়। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে অনুরোধ করি মসজিদের শহর ঢাকায় মূর্তি বানিয়ে জনগণের মনে আঘাত দেবেন না। নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আজকে তো কেবল শুরু হলো মূর্তিবিরোধী আন্দোলন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূর্য উঠতে দেখবেন, ডুবতে আর দেখবেন না। অপেক্ষা করেন, মূর্তির সাথে আপোস বাংলার মুসলমানরা আর করবে না।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: https://youtu.be/n8EEBmoGEEg)

১৪. ওয়াসেক বিল্লাহ নোমানী

মাওলানা ওয়াসেক বিল্লাহ নোমানীর বাড়ি নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায়। তিনি সানকিপাড়ার ফজলুল হক মারকাযুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলে ওয়াজ করেন। মোঃ সানা উল্লাহ নামের এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত 'ইজতেমা মিডিয়া' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ২০২১ সালের ২৯শে মার্চ প্রকাশিত হয় ওয়াসেক বিল্লাহ নোমানীর ওয়াজ। উক্ত ওয়াজে তিনি বলেন, 'অমুসলমান, এখন থেকে আমরাও তৈয়ার। আমাদেরকে ঘাড় ভাঙবি, আমরাও ঘাড় ভাঙব। কারা কারা তৈয়ার আছো। যতদিন বাঁচব বাঘের মত বাঁচব। আর যদি মরতেই হয় তবে দুই চার দশটাকে সাথে নিয়া মরব। সবাই রাজি আছো তো ইনশাল্লাহ? তাজা রক্ত দিতে হবে। রক্ত চাই, রক্ত। আমার বয়ানই আজকে রক্ত নিয়ে। রক্ত দিতে রাজি আছেন? ভয় পাচ্ছেন না তো? রক্ত দেবেন তো ইনশাল্লাহ?'

অতপর জমায়েতের ভিতর থেকে হ্যা হ্যা চিৎকার ভেসে আসে। রক্ত চাই, রক্ত চাই, নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর ইত্যাদি স্লোগানে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ওয়াজের মজলিশ। 'আল-জাজিরা তো মিডিয়ার খেলা। যদি আল্লাহ আমাদেরকে খেলার তৌফিক দেয়, আর যদি ইনশাল্লাহ খেলাফত কায়েম করতে পারি, আল্লাহর কসম, সংবাদ দেখার টাইম পাবি না, সংবাদ দেখার টাইম পাবি না। একটা একটা ধরব আর জবাই করব, জবাই করব ইনশাল্লাহ।'

তিনি আরও বলেন, 'ও মুসলমানরা রাজি আছো তো ইনশাল্লাহ? আজিব ব্যাপার সারা পৃথিবীতে আমাদের মুসলমানদের অত্যাচার করা হয়, আমাদের মা বোনদের ধর্ষণ করা হয়, মুসলমানদের বাড়িঘর লুট করে নেয়া হচ্ছে। শুনলে আপনারা অবাক হবেন, যে রোহিঙ্গারা ইসলামের জন্য দেশ ছেড়েছিল তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার পর এমন

খেলা খেলেছে বাবা, দশ হাজার রোহিঙ্গা যারা ইমানের জন্য দেশ ছেড়েছিল তারা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে। আমি ছিলাম হিন্দুর বাচ্চা। ২২ বছর শত শত বলি দিয়েছি। এই যে অভ্যাস এইটা আমি কাজে লাগাইতে চাই। চিন্তা করলাম সামনে গাজুয়াতুল হিন্দ আসতেছে। আমার খুব শখ, খুব স্বপ্ন। মানুষের অনেক স্বপ্ন থাকতে পারে না? আমারও তেমন স্বপ্ন যদি আল্লাহ সুযোগ দেয়, ভারতের ছোট্ট একটা বাবু আছে না? নরেন্দ্র মোদী দাদা। মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করতেছে। খুব শখ, বলি দেওয়ার অভ্যাসটা ওখানে কাজে লাগাইতে চাই। ঠিক কিনা, ঠিক কিনা ভাইয়েরা আমার?

'যদি মরতে হয় বাঘের মত মরব। যদি মরতে হয় দুই চার দশটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তারপরে মরব ইনশাল্লাহ। রাজি আছো তো মুসলমানরা? সবাই রাজি আছো তো? যতদিন বাঁচবেন কাউকে ভয় পাবেন না। ভয় পাবেন একমাত্র আল্লাহকে। যতদিন বাঁচব বাঘের মত– আর যদি মরতে হয় তবে দুই চার দশটাকে কতল করে তারপর মরব। প্রতিটা যুবক টার্গেট করো মিনিমাম দশটা। ইনশাল্লাহ, দেখা হবে গাজুয়াতুল হিন্দের ময়দানে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://m.youtube.com/watch?v=SJBlqXYS1JM)

১৫. মুফতি নাজিবুল্লাহ আফসারী

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্যারোডি তৈরি করে প্রচারের অভিযোগ উঠেছে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার সিদ্ধেশ্বরী দারুল কুরআন আল আরাবিয়্যাহ মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি নাজিবুল্লাহ আফসারীর বিরুদ্ধে। ২০২০ সালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বিকৃত করে এই 'ইসলামী সংগীত' সৃষ্টি করে নিজের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের দিয়ে গাইয়েছেন। প্রচার করেছেন নিজের ফেসবুক আইডি ও ইউটিউবেও। ভিডিওতে তিনি লিখেছেন, 'দারুল কুরআন আল আরাবিয়্যা মাদ্রাসার জাতীয় সংগীত' এটি।

'আমার দয়ার আল্লাহ, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার দয়ায়, তোমার মায়ায়, অধম আমি বেঁচে আছি' শীর্ষক পুরো সুরটি জাতীয় সংগীতের আদলে। নিজের এই সংগীত তিনি ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর তার ফেসবুক আইডিতে (singernajibullah.afsari) শেয়ার করেন। এরপর ১৫ অক্টোবর তার ইউটিউব (najibullah tv) চ্যানেল নাজিবুল্লাহ টিভিতে আপলোড করেন। এরপর কয়েকদিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার এই সংগীত নিয়ে কওমি মাদ্রাসা ঘরানার শিক্ষার্থী ও আলেমদের মধ্যেও সমালোচনার সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস (যুগ্ম সচিব) জাফর রাজা চৌধুরী ২০২০ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'জাতীয় সংগীত বিকৃত করার কোনো সুযোগ নেই। আর এটা তো কেবল জাতীয় সংগীতই নয় যে, কোনো ব্যক্তি একটি গান লিখেছেন, এখন আমার ইচ্ছে হলো একটি শব্দ বা দুটো শব্দ যোগ করে দিয়ে কিছু একটা করবো। এটা করলেই আমাদের সেকশন ৭৮ -এ কপিরাইট লঙ্ঘন হবে। বিষয়টি আমাদের নজরে এলে আমরা ওই শিক্ষককে ডাকবো।'

নাজিবুল্লাহ আফসারী লিখিত তার প্রতিষ্ঠানের সংগীতটি হলো–
আমার দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি/ চিরদিন তোমার দয়ায়/ তোমার মায়ায় অধম আমি বেঁচে আছি.../ দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি/ তব দয়াতে/ এই ধরাতে আমি/ তব দয়াতে/ এই ধরাতে আমি/ নেয়ামতে ডুবে আছি/ দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি/ আমারও এ বুকে/ রেখেছি তোমাকে/ যপি তোমায় দিবানিশি.../ দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি.../ যে তোমায় ভুলে যায়/ তাকেও দাও ঠাঁই/ যে তোমায় ভুলে যায়/ তাকেও দাও ঠাঁই/ যদি তওবা করে ফিরে আসি.../ দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি/ চিরদিন তোমার দয়ায়/ তোমার মায়ায়/ অধম আমি বেঁচে আছি.../ দয়ার আল্লাহ/ আমি তোমায় ভালোবাসি...
ভিডিওর লিঙ্ক: (https://youtu.be/Xvh-LyZ94vY)

১৬. মাওলানা বজলুর রশিদ

মাওলানা বজলুর রশিদ জামায়াত সমর্থিত একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী। তিনি বগুড়ার জেলার কাহালু থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে তৃণমূলে সাধারণ মানুষের মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে Bogra TV নামে একটি পেজে প্রকাশিত ভিডিওতে তিনি বলেন, '১৬ ডিসেম্বর এক মজার কাহিনী ঘটেছে। দেখি ছেলে পেলেরা রাস্তার উপর বিজয় দিবস লিখতেছে। আমি তাদেরকে কাছে ডেকে নিয়ে এসে বললাম, বাজানরা শোনো তোমরা যে ১৬ ডিসেম্বর লিখতেছো, ১৬ ডিসেম্বর তোমাদের দেশে কি বিজয় হইছে? এই বাংলাদেশ কি বিজয়ের স্বাদ পাইছে। তারা বলল, হুজুর আপনি কি বলতে চান?

'আমি বললাম, তোমরা তো হইছো কয়দিন হইছে। এই মালোয়ানের বাচ্চা ভারতেরা সবসময় শঙ্কা করেছে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান একত্রে যদি থাকে তাহলে আমরা মাথা তুলে দাড়াতে পারব না। মাথা তুলে দাড়াইতে হইলে আগে এদেরকে ভাঙ্গা লাগবে। এই দুই ভাই দুই ভাইকে ঘৃণা করা লাগবে। এখন কিভাবে ঘৃণা করা যায়? দীর্ঘদিন সেই পায়তারা করছে জানেন আপনারা? বাংলাদেশকে তারা সহযোগিতার নামে স্বাধীনতা দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। বলেন ঠিক কিনা?' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://fb.watch/amk4exRCjy/)

১৭. আরিফ বিল্লাহ

কুষ্টিয়ার মাওলানা আরিফ বিল্লাহ নামে এক বক্তার বিরুদ্ধে ওয়াজের নামে সাধারণ মানুষের মাঝে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০১৯ সালের ২৫ মে 'MHR BANGLA WAZ' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর পক্ষে বলেন, 'এই গোটা পৃথিবীতে

তাফসির করতেন সাঈদি সাহেব, তার মানে এই নয় বাংলার মাটিতে তাফসির বন্ধ হয়ে যাবে। এক সাঈদি জেলে যাবে কিন্তু লক্ষ সাঈদি বাংলার জমিনে ঘুরে বেড়াবে। যদিও বাংলাদেশের ১৫ জনের লিস্টের মধ্যে আমার নামটা ঢুকাইছে। আলহামদুলিল্লাহ। হইছে কি তাতে? আমার বক্তব্য হলো হকের আওয়াজ যারাই দিবে ব্লাক লিস্টে তাদের নামটাই যাবে। তবে শিরোনামটা বলে দেই মনে রাখবেন। এটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা নয়। এটা হলো শাহরিয়ার কবির, রাশেদ খান মেননদের পরিকল্পনা। এটা প্রধানমন্ত্রীর কোনো পরিকল্পনা নয়। এটা নাস্তিক পীর মুরিদদের পরিকল্পনা। আমাদেরকে বলা হয় আপনারা মাহফিলে উত্তেজিত করেন কেন? কি করছি? উত্তেজিত করার ফলে ঈমান শক্ত হয়, বাতিলের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মাহফিলে তকবির হবে না তো কি হবে? হরি রাম হরিপদ হবে? আমাদেরকে যারা উত্তেজিত করতে বারণ করে, যারা এসব বলে তাদের মতলব বেশি ভাল না।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/kyQ5dDBeE_E)

চলচিত্র নির্মাতা, প্রযোজক এবং পরিচালক মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী এক ফেসবুক স্টাটাসে বলেছেন, 'ওয়াজের মধ্যে অনেক হুজুররে দেখতেছি ভুল তথ্য দেয়, জঘন্য ভাষায় ঘৃণা ছড়ায়, মিসোজিনি ছড়ায়, বিধর্মী বা তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম বিরোধীদের পারলে সেখানেই শেষ করে দেয়! কথা হইলো, এই রকম ওয়াজে মানুষ বিগড়াইলে তার বিধান কী? একবার ভাবেন, 'যে ছেলেটা ওয়াজে যায় এটা ভেবে যে হুজুর যা বলতেছে সেটাই ঠিক, ও ওখান থেকে কি শিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছে! তারপর সেই শিক্ষার আলো সে যখন সমাজে ছড়াবে তখন সেই সমাজের চেহারা তো লালমনিরহাটের নারকীয় ঘটনার মতোই হবে!

'চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎকসদের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। সিনেমা মুক্তি দিতে হলে সেন্সর বোর্ডের অনুমতি নিতে হয়। ওয়াজ মাহফিল সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেললেও এ বিষয়ে কোনো বিধি বিধান কি আছে?' (তথ্যসূত্র: পূর্ব-পশ্চিম, ২ নভেম্বর, ২০২০)

১৮. রফিকুল ইসলাম মাদানী

রফিকুল ইসলাম মাদানী হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য। একের পর এক বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো রফিকুল ইসলাম মাদানীর নেশা। "শিশুবক্তা" হিসেবে পরিচিত রফিকুল ইসলাম কখনও সরকার, কখনও প্রধানমন্ত্রী কিংবা সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একের পর এক রাষ্ট্রবিরোধী ও রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে কটাক্ষ করে এবং উসকানিমূলক কথাবার্তা বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক বির্তকিত সমালোচিত তিনি।

ইউটিউবসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও প্ল্যাটফর্মে তার এসব বক্তব্যগুলো ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় খুব অল্পসময়ের ভেতরেই পেয়েছেন পরিচিতি। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় লেদিরকান্ডা গ্রামে ১৯৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন রফিকুল ইসলাম মাদানি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া রফিকুলের বাবা ও ভাইরা

কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা সবাই রফিকুল ইসলামের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। অত্যন্ত অসচ্ছল পরিবার থেকে উঠে আসা রফিকুল ইসলাম মাদানী কারাগারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নেত্রকোনা ও গাজীপুর জেলায় দু'টি মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন।

রফিকুল ইসলাম মাদানী প্রথমে স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন, এরপর জামিয়া হুসাইনিয়া মালনি মাদ্রাসায় হিফজুল কোরাণ পড়াশুনা করেন। তারপর তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি মাদ্রাসায় আসেন। সেখানে কয়েক বছর পড়াশোনা শেষে তিনি চলে চলে যান গাজীপুরের কোনাবাড়িতে একটি মাদ্রাসায়। এরপর ঢাকার বারিধারা জামিয়া মাদানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ২০১৯ সালে ঢাকার বারিধারা জামিয়া মাদানি মাদ্রাসায় দাওয়ারা-ই-হাদিস (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি নেন। এরপর ওয়াজকে পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি।

তার এক ওয়াজে নিজের বয়স সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম বলেন, '১৯৯৫ সালের শেষের দিকে আমার জন্ম। এখনও আমাকে শিশু বক্তা বানিয়ে রাখবেন কেন। আমি ছয় বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে পড়াশোনা করেছি। তারপর ক্লাস সিক্স পর্যন্ত স্কুলে পড়েছি। এরপর মাদ্রাসায় ভর্তি হই। নূরানিতে পড়েছি এক বছর। আল্লাহ রহমতে দুই বছরে হেফজ শেষ করেছি। এখানে তিন বছর, আগের ১২ বছর মোট হলো ১৫ বছর। এরপর আট বছর কিতাবখানায় পড়েছি।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/pA0Ed0NEXls)

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন বিভিন্ন মাহফিলে ওয়াজ করতেন রফিকুল। শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত রফিকুল ইসলাম বরাবরই ওয়াজে অপ্রাসঙ্গিক, বিতর্কিত বক্তব্য রেখে সমালোচিত হয়েছেন। তার নামে "মাদানী" কেন, এমন প্রশ্নের উত্তরে রফিকুল জানান, মাদানী মাদ্রাসা থেকে সে দাওরাহ-ই-হাদিস ডিগ্রি অর্জন করে, এ কারণে তাকে মাদানী বলা হয়। রফিকুল সৌদি আরবের ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব মদিনা থেকে স্নাতক করেননি বলে একটি আইনি নোটিসও পেয়েছেন।

রফিকুল ইসলাম মাদানীকে তার একটি বক্তব্যে বলেছেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতে আসলে আবার একটি যুদ্ধ হবে। কসাই মোদীকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে রক্ত দিব, প্রাণ দিব তবুও মোদীকে আসতে দেওয়া হবে না।' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/ijKtVukFNLs)

২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে বিক্ষোভের সময় মতিঝিলে থেকে পুলিশ আটক করে মাদানীকে। এর কয়েকঘণ্টা পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর ২০২১ সালের ২৭ মার্চ তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। রফিকুল ইসলাম মাদানীর মোবাইল ফোন চেক করলে একাধিক পর্নো ভিডিও'র অস্তিত্ব পাওয়া যায় বলে জানান র‍্যাব। তাছাড়া মাদানীর ব্যক্তিগত মেসেঞ্জার অ্যাকাউন্টে বিভিন্নজনকে আপত্তিকর ছবি পাঠানোর প্রমাণও পাওয়া যায় বলে অভিযোগ করেন র‍্যাব। মাদানী দু'বছর আগে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে বিয়েও করেছেন। তবে বিয়ের বিষয়টি তাদের পরিবারের কেউও জানতো না। বিয়েটা পরিবারের অমতে করেছেন বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী কওমী ঘরোনার ওয়াজকারী হিসেবে বেশি পরিচিত। তার একটি বয়ানের অংশ ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায় ২০২১ সালের শুরুতে।

তার ভাইরাল হওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মানি যতক্ষণ সে আল্লাহকে মানে। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মানি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহকে মানে। এই কচুর প্রধানমন্ত্রী মানি না যে ইসলামের বিরুদ্ধে যায়। কিসের বিএনপি কিসের আওয়ামী লীগ? তুমি মুসলমান তোমার বড় পরিচয় সেটা। কিসের শুধু আওয়ামী লীগ? বিএনপির মির্জা ফখরুল এতো বামপন্থী লোক সে বলতেছে আমরা শরীয়তের আইনে বিশ্বাসী না। সরাসরি বলতেছে আমরা মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেই না। মৌলবাদের সাথে নাই।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/JaqpsMTiUkc)

১৯. নুরুল ইসলাম ওলিপুরী

শায়েস্তাগঞ্জ নুরে মদীনা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী। তিনি একজন উগ্র মৌলবাদী বাগ্মী। তার বয়ানে এক সময় জামায়াত-শিবির ও মওদুদীবাদ বিরোধিতা স্থান পেত কিন্তু জামায়াত-হেফাজত সমঝোতার পর তিনি আর জামায়াত বিরোধিতা করেন না।

১৯৫৫ সালে হবিগঞ্জ জেলার নুরপুর থানার ওলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হেফাজতের এ নেতা। তার পিতা মাওলানা আবদুর রহিম। মাওলানা ওলীপুরী তিনি ৫ ভাই এবং ২ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। মাওলানা ওলীপুরী যখন পাঁচ বছরের শিশু, তখনই মাতা-পিতাকে হারিয়ে এতীম হয়ে পড়েন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তার পিতা-মাতা, বড় ভাই মাওলানা আব্দুস সামাদ ও বড় বোন গুলেনূর মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে পরিবারের প্রধান চারজনের ইন্তেকালে তার পরিবার ও তিনি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

গ্রামের একটি প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নের পর নেজামে ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাহার আলী প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ জেলার কওমি মাদ্রাসা বর্তমান হেফাজতীদের নিরাপদ ঘাঁটি জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের জন্য তিনি হবিগঞ্জ জেলার রায়ধর জামিয়া ছাদিয়ায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে মুজাহিদ মাওলানা মোখলিসুর রহমানের নিকট তথাকথিত বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালে লালবাগ মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর প্রথমে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানাধীন শাহপুর আল-জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে

কর্মজীবন শুরু তার। সদর থানার রায়ধর জামিয়া ছাদিয়ায় আরবী, নাহু, ছরফ, মানতিক, ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় আট বছর অধ্যাপনা করেন। সদর জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সুবহানিয়া মাদ্রাসায় এক বছর শিক্ষকতার পর হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানাধীন মনতলা দারুস সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসায় এক যুগেরও অধিককাল প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে তিনি শায়েস্তাগঞ্জে নুরে মদীনা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি আল-ফারুক ইসলামি গবেষণা পরিষদ শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। হবিগঞ্জ জেলা শাখার একজন অন্যতম নেতা হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগের সহ-সভাপতির পদে নিয়োজিত আছেন।

তিনি তার প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে জিহাদের প্রতি যুব সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। জঙ্গি মুজাহিদদের বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন নিষিদ্ধ করে দেয়, তারপর থেকে ওলিপুরীর ওয়াজ হচ্ছে জঙ্গি প্রচারণার মূল হাতিয়ার।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ 'Olipuri Media' নামক ইউটিউবে মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী হবিঞ্জের এক মাহফিলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জানাযায় অংশ নেওয়া নাজায়েজ বলে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। নূরুল ইসলাম ওলীপুরী কওমী ঘরোনার একজন আলোচক এবং হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা। এক মাহফিলে অংশ নিয়ে নূরুল ইসলাম ওলীপুরী বলেন, 'আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠন গুলো রাসুলের খাটি উম্মতদের হত্যা করার কারনে তারা ইসলাম বিদ্বেষি দল এবং মুসলমানিত্ব থেকে চির তরে বহিষ্কার হয়ে গেলো। আলেম উলামাদের উপর আক্রমণ করার মতো ক্ষমা অযোগ্য সীমাহীন এসব অপরাধের কারণে তারা মারা গেলে তাদের জনাজায় কোন আলেম বা সমাজের জ্ঞানি কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করা একেবারে নাজায়েজ। নিরস্ত্র মুসলমানদের জন্য এটাই হবে দ্বিতীয় স্তরের জিহাদ।

'নুরুল ইসলাম ওলীপুরী বলেন, খতমে নবুওয়ত আমাদের ঈমানের অঙ্গ। একজন কাদিয়ানী মুসলিম পরিচয়ে বাংলাদেশ থাকা অবস্থায়ও আমাদেরকে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। নিজের জীবন উজাড় করে হলেও চূড়ান্ত বিজয় নিয়ে আমরা ক্ষান্ত হবো। এ পর্যায়ে নূরুল ইসলাম কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত দাবি সমূহ প্রমানসহ উপস্থিত ইমাম-খতিবদের সামনে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কাদিয়ানীরা ইজতেমা করার সাহস দেখালে ঢাকার বকশীবাজারে তাদের আস্তানার প্রতিটি ইট খুলে নেয়া হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://www.youtube.com/watch?v=E57zHIPzpd4)

২০. মাহমুদুল হাসান ভূজপুরী

ফটিকছড়ি 'জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর' মাদ্রাসার প্রধান মুফতি এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান চট্টগ্রাম জেলা ফটিকছড়ি উপজেলাধীন ভুজপুর থানার পশ্চিম ভুজপুর গ্রামে ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছাত্রজীবন শুরু করেন কাজির হাট ভুজপুর থানাধীন এমদাদুল উলুম ভুজপুর মাদ্রাসায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে মাওলানা মাহমুদুল হাসান উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফটিকছড়ি 'আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায়' চলে আসেন। সেখানে তিনি কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে যান। সেখানে করাচী নিউটাউন মাদ্রাসায় ইফতা বিভাগে (ফতোয়া) ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি দেশে ফিরে আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কয়েক বছর উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার পর তিনি পরিচালকের (মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী) সঙ্গে রাগ করে ২০০২ সালে চলে যান 'জামিয়া নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসায়'। বছর দুয়েক পর তিনি পুনরায় 'আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রসায়' চলে আসেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদ্রাসার প্রধান মুফতির দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি এই মাদ্রাসার প্রধান মুফতি ছাড়াও তার জন্মস্থান ফটিকছড়ি ভুজপুরে একটা মাহাদুল ইসলাম বালক-বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি সে মাদ্রাসার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান একজন উগ্র জিহাদি বক্তা হিসেবে পরিচিত।

তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় 'নেজামে ইসলাম পার্টির' মাধ্যমে। তিনি হরকাতুল জিহাদের একজন উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে হবে। ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী ঐক্যজোট এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হয়ে তিনি জঙ্গি-মৌলবাদীদের সমস্ত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির' ফটিকছড়ি থানার নায়েবে আমির ছিলেন। জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ যখন নিষিদ্ধ হয়, ২০০৭ সালে হরকাতুল জিহাদের নেতৃবৃন্দ সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেছিলেন। এর ব্যানারে হাটহাজারীতে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। হাটহাজারীর সেই জঙ্গি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুফতি মাহমুদুল হাসান।

কওমিপন্থী যত মৌলবাদী জঙ্গি রাজনৈতিক দল আছে তাদের অনুষ্ঠানে মাওলানা মাহমুদুল হাসান উপস্থিত থাকেন। তিনি জঙ্গিবাদী উগ্র বক্তব্য দিয়ে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দেন। Qadim Media নামক ইউটিউবে প্রকাশিত একটি বক্তব্যে মুফতি মাহমুদুল হাসান বলেছেন, 'ভুজপুর থানার পশ্চিম ভুজপুর বড়বিল এলাকার এক পীরের মাজার তার নেতৃত্বে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

সেখানে তিনি তলোয়ার হাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার এলাকায় (ভুজপুর থানা) কোন দরবার মাজার পীর আউলিয়া থাকতে পারবেন না। তার জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে যুব সমাজ সহজে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজের এলাকায় আপনি যত ভালভাবে জিহাদের কাজ করতে পারবেন অন্য জায়গায় তা এত সহজে কখনই পারবেন না। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু থেকে শুরু করে অস্ত্র সরবরাহের জন্য বিকল্প রাস্তা, মুজাহিদদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা, দ্বীনে আনসার তৈরি– এসব কাজের জন্যই নিজের দেশেই সর্বচ্চো জিহাদের খেদমত সম্ভব।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://www.youtube.com/watch?v=Nv2WgMs-Chs)

২১. বেলাল উদ্দীন বিন জমির

হেফাজতে ইসলাম-এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য এবং চট্টগ্রাম ফটিকছড়ির 'জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর' মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা বেলাল নানুপুরীর ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানা অন্তর্গত নানুপুর গ্রামে। তার পিতা শাহ মাওলানা জমিরুদ্দিন নানুপুরী ছিলেন পীর এবং নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসার মহাপরিচালক। তার পিতা পরিচালিত মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কওমি সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। তিন হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা সালাউদ্দিন নানুপুরীর ছোট ভাই।

মাওলানা বেলাল উদ্দীন নানুপুর উবায়দিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। পিতা পরিচালক হওয়ায় (বর্তমান পরিচালক তার বড় ভাই সালাহউদ্দীন নানুপুরী) তিনি আস্তে আস্তে উক্ত মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির মেম্বারের দায়িত্ব পালন করছেন। তার পিতা শাহ জমির উদ্দীন যদিও রাজনীতি ভালোবাসতেন না কিন্তু মাওলানা বেলাল ছাত্র জীবনে সর্বপ্রথম নেজামে ইসলাম পার্টি এবং পরে হরকাতুল জিহাদে যোগদান করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে এক সময় মাওলানা বেলাল সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন।

২০২০ সালে 'Al-Amin Islamic Media' চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ওয়াজে মাওলানা বেলাল উদ্দিন বলেন, 'মাজার জিয়ারত করা মাজার পূজার শামিল। তাই মাজার জিয়ারত ও এর জন্য সফর উভয় হারাম। মাজার-দরগাহে যাওয়া যাবে না। এসব ভেঙ্গে ফেলতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেটা করে নাই সেটা করা যাবে না। এসব মাজার ভাঙার জন্য প্রয়োজনে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। আমাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সবাইকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আরাকানে মুসলমানদের গণহত্যার প্রতিশোধ ও প্রতিরোধে আল্লাহর সিংহরা প্রস্তুত হচ্ছে! মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনাদের কাছে আবেদন এবং অনুরধ আপনারা সকলে এই উদ্বুদ্ধকর ভিডিওটি দেখুন। অবশ্যই দেখবেন ইনশা'আল্লাহ। ঈমান আরও দৃঢ় করুন। প্রত্যেকের মধ্যে জিহাদের আলোড়ন ছড়িয়ে দিন। অন্যান্য মুসলিম ভাই ও বোনদের মাঝে প্রচার করে দিন। বেশি বেশি করে শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। সু বার্তাটি পৌঁছিয়ে দিন।' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/S_41D-osgqg)

২২. খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী

রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা, উত্তরা গাউসুল আজম জামে মসজিদের খতীব হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ঢাকার অদূরে সাভারের সুগন্ধা হাউজিংয়ে তার মারকাজুত তাকওয়াহ মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। হেফাজতে ইসলামের নাশকতা ও সহিংসতার ঘটনায় খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবীর বিরুদ্ধে পল্টন থানায় মামলা ছিল। তাকে ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সিংগাইর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিতর্কিত হেফাজত নেতা মামুনুল হকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী। হেফাজতের নতুন কমিটি গঠন ও বক্তাদের নিয়ে রাবেতাতুল ওয়ায়েজিন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার পেছনে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। ওয়ায়েজীনদের বৃহৎ প্লাটফর্ম ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংগঠনটির পুরোনো কমিটি ভেঙে মাওলানা আব্দুল বাসেত খান সিরাজীকে সভাপতি ও মাওলানা হাসান জামিলকে মহাসচিব করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২০২০ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর প্রেস ক্লাব সংলগ্ন বিএমএ মিলনায়তনে দিনব্যাপী 'ওয়ায়েজ, খতীব ও দায়ী ওলামায়ে কেরামের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনটির উপদেষ্টা মাওলানা মামুনুল হক ও মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ূবীর যৌথ সঞ্চালনায় অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (পীর সাহেব দেওনা) কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। দেশের সকল ওয়ায়েজদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে আনার জন্যে ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ নামে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এতদিন ধরে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে মুফতি উমর ফারুক যুক্তিবাদী ও নির্বাহী সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কেন্দ্রীয় মহাসচিব হিসেবে মাওলানা ইউসুফ বিন এনাম শিবপুরী দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'-এর কমিটির সাথে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের আমির তৎকালিন আল্লামা শাহ আহমদ শফী একাত্মতা পোষণ করেছিলেন এবং মুঠোফোনে বক্তাদেরকে শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের চেতনার পক্ষে ওয়াজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। সেই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। ওই সংঘাতে প্রাণ হারান অন্তত ১৮ জন। সেসব ঘটনায় একাধিক মামলা হয়। মামলার আসামিদের ধরতে অভিযান শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। এ পর্যন্ত হেফাজতের অন্তত এক ডজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন মাওলানা আইয়ুবী।

'Bangla Waz 24' ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ূবী বলেন, 'বাংলাদেশে ইহুদী-চক্র নাস্তিক-মুরতাদ বিশেষ করে কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের হীন চক্রান্তে মেতে উঠেছে। ইসলামী আন্দোলনকারী ও কাদিয়ানী বিরোধী সংগ্রামকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে সত্যিকার মুসলমানকে মৌলবাদী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী, রাজাকার ইত্যাদি অশুভ শ্লোগানের মাধ্যমে তাদের পাতানো ফাঁদে ফেলে মুসলমানের রক্তে হোলি খেলার চক্রান্তে অগ্রসর হচ্ছে। হে মুসলমানগণ, আপনারা যদি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের না হন, তাহলে আমাদের লক্ষ লক্ষ ছাত্র শিক্ষক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যখনই ডাক আসবে তখন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/y8pNiWl-m4c)

২৩. মুফতি ইলিয়াস হামিদী

মারকাজুল কোরাণ ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক, ঢাকা বায়তুল আকসা জামে মসজিদের খতিব, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সভাপতি মুফতি ইলিয়াস হামিদী ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার ঘাটারচর তারবিয়াতুল উম্মাহ মাদ্রাসার বর্তমান পরিচালক তিনি। ২০২১ সালের ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে ফেরার পথে মুফতি ইলিয়াস হামিদিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

হেফাজত নেতাদের জরুরি বৈঠক শেষে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ঢাকা ফেরার পথে রাত ১০টার দিকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে র‍্যাবের একটি দল সাদা পোশাকে হামিদীর ভাড়া করা গাড়ির গতিরোধ করে। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর সহ-সভাপতি মুফতি ইলিয়াস হামিদীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব হাসান রিমান্ডের এই আদেশ দেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানায় করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় তার ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ।

নাশকতার পরিকল্পনা, ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, মুফতি ইলিয়াসসহ মোট নয় জনের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের (সংশোধন-২০১৩) ১০/১১/১২/১৩ ধারায় মামলা হয়েছে। র‍্যাব-২ এর ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে এই মামলা করেন।

২০২০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'মাদানী HD মিডিয়া' চ্যানেলে প্রকাশিত নেত্রকোণার একটি ওয়াজ মাহফিলে মুফতি ইলিয়াস হামিদী বলেন, 'হে যুবক ভাইয়েরা, এখন সমগ্র বাংলাদেশে চলছে দাওয়াতের কাজ। আমাদের কাজ এখন দাওয়াত দেওয়া। যখন সময়

আসবে জিহাদের তখন সবাইকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সামনে সেই দিন আসতেছে। যখন জিহাদের ডাক আসবে তখন আর ঘরে বসে থাকা যাবে না।

'হে মুসলীম ভাইয়েরা, আর দেরি নয় এখনই নেমে পড়ুন, ইসলাম রক্ষার জন্য, ঘরে বসে থাকলে চলবেনা, ওরা আল্লাহর কোরান ফুরিয়েছে, ওরা আমাদের ভাইদের কে মেরেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর বদলা নিতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসবো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন। ওহে নাস্তিকদের দল হুঁশিয়ার হও এখনি। নইলে বাংলার মুসলমান রা ছাড়বে না তোমাদের কোন দিন দরকার হলে যশোরেরে মাটি থেকেই তোমাদের বিতাড়িত করার তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে ইনশা আল্লাহ।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/83lhV6rEkJg)

২৪. খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী

ইত্তেফাকুল ওলামা ময়মনসিংহ এর সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি ও হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী। ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার মাইজদী গ্রামে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী সদর উপজেলার মাইজবাড়ি এলাকার মাওলানা আরিফ রব্বানীর ছেলে। তিনি হেফাজতে ইসলামের সদ্য বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি (নায়েবে আমির) পদে ছিলেন। এছাড়া ইত্তেফাকুল ওলামা কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি পদে রয়েছেন।

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী সদর উপজেলার মাইজবাড়ি এলাকার মাওলানা আরিফ রব্বানীর ছেলে। মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ সাদী হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ১৪০০-১৪০১ হিজরি শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদিসের সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'মাওলানা' সনদ লাভ করেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সাওতুল হেরার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই মাদ্রাসার মুরুব্বি ও শায়খুল হাদিস। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কওমি আলেমদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম 'ইত্তেফাকুল উলামা মোমেনশাহী' প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা রয়েছে। ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক হিসেবে, পরবর্তীকালে সম্পাদক এবং বর্তমানে মজলিসে আমেলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তিনি ২০১৫-১৮ সেশনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী মহাসচিব নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি পদে রয়েছেন।

নির্বাসিত লেখিকা তাসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন, ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের আন্দোলনসহ ধর্মবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সংগঠিত নানা আন্দোলনে মাওলানা সাদী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ময়মনসিংহ বিভাগে জঙ্গি কর্মকাণ্ড প্রসারতা লাভ করে।

ঢাকা মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক নুর মসজিদ ও টঙ্গী বাজার বায়তুল মামুর জামে মসজিদে বেশ কিছুদিন খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে তিনি ওয়াজ মাহফিলের জন্য সফর করে থাকেন। তিনি প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে উগ্রবাদ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন।

'আহবাব মিডিয়া' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে খালিদ সাইফুল্লাহ সাদী বলেন, 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় চোর ডাকাতে ভরে গেছে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা আজকাল চোর ও দুর্নীতিবাজদের দখলে চলে গেছে। আজকাল চোরকে চোর আর ডাকাতকে ডাকাত বলা যায় না। বড় বড় চোর ডাকাত যারা তারা হচ্ছে ঋণ খেলাপী কিন্তু তাদেরকে কিছু বলা যাবে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করে এসব লুটেরাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। জিহাদই একমাত্র পথ এদেরকে হটানোর জন্য। আমাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকে। এই রাষ্ট্র আমাদের কোন কল্যাণে আসবেনা। ইসলামী হুকুমত ছাড়া শান্তি আসবেনা। ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। এই হুকুত কায়েম করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিতে হবে। আপনারা কে কে রাজী আছেন হাত তোলেন? সবাই জীবন দিতে তৈরি থাকুন।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/v8PdEQVP-DU)

২০২০ সালে 'Anubad Media' ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ওয়াজে মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী বলেন, 'আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীগুলি স্বার্থবাদী হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেশের এসব লোকদেরকে সবাই বুদ্ধিজীবী বলে ডাকেন। আমি তাদেরকে সম্মান করে বাদুড় মার্কা বুদ্ধিজীবী বলি। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীগুলি সবসময় আল্লাহ, রাসুল, কোরাণ ও হাদিসের নাম শুনলে চোখে অন্ধকার দেখে। এজন্য আমি তাদেরকে এই উপাধি দিয়েছি। সমাজের যেটা কল্যাণকর সেটা এসব বুদ্ধিজীবীরা করে না। সমাজের যেটা কল্যাণকর নয়, সেটাই এসব বুদ্ধিজীবীরা করে থাকে।'

বক্তব্যের বক্তব্য: (https://youtu.be/24kYImJpFBQ)

২৫. মাওলানা আব্দুর রহিম বিপ্লবী

হেফাজতে ইসলামর নেতা মাওলানা আব্দুর রহিম বিপ্লবী গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার পশুরাম থানার পশ্চিম সাহেব নগরে। বর্তমানে রাজধানীর পশ্চিম দোলাইরপাড় এলাকায় বসবাস করেন। মাওলানা বিপ্লবী কেরানীগঞ্জ শুভাঢ্যা ইউনিয়নের আমিনপাড়া মুহুরিপট্টি জামে মসজিদের ইমাম ও কেরানীগঞ্জের কাজীরগাঁওয়ে অবস্থিত বাইতুল কোরাণ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। তিনি ওই মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলে ইসলামিক বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

ওয়াজ মাহফিলে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া ও পরে সেই বক্তব্য ইউটিউবে প্রচার করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ২০২১ সালের ২১ অক্টোবর। গ্রেপ্তার আব্দুর রহিম ওরফে বিপ্লবী (৩৯) দোষ স্বীকার করেছেন। নিজের ওই বক্তব্য ইসলামসম্মত নয় বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি দাবি

করেছেন, উত্তেজনার বশে তিনি ওই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। পাশাপাশি তার ওই বক্তব্যের জন্য তিনি অনুতাপও প্রকাশ করেছেন।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর ওয়াজ মাহফিলে ইসলামিক বক্তব্য দেওয়ার সময় কুমিল্লায় ধর্মীয় সহিংসতা নিয়ে উগ্র বক্তব্য দেন আব্দুর রহিম ওরফে বিপ্লবী। মূর্তির পায়ে যারা পবিত্র কোরাণ শরিফ রেখেছে তাদের ১৪ অক্টোবরের মধ্যে গ্রেপ্তার না করলে ১৫ অক্টোবর শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদ থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং বাংলাদেশে একটি পূজামণ্ডপও রাখব না। এছাড়া এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেসব পুলিশ সদস্য মুসলমানদের গায়ের ওপর গুলি ছুড়ছে সে সমস্ত পুলিশ সদস্যদের পিতৃপরিচয়হীন অবৈধ সন্তান, হারামখোর, ঘুষখোর।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Gx5bFhAmqL8)

২০২০ সালে 'RMB Media' ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ওয়াজে মাওলানা আব্দুর রহিম বিপ্লবী বলেন, 'আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, থানা ও জেলার কোথাও কোরাণের আইন না থাকার কারণে অন্ধকার আর অন্ধকার। যদি কোরানের আইন থাকতো তাহলে এই অন্ধকার থাকতো না। কোরাণের আইন না থাকার কারণ পুলিশের ঘরে ঐশীর মতো মেয়ে জন্ম হয়। হেফাজতের আমির আল্লামা আহমদ শফী যখন মেয়েদেরকে প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ার জন্য আহবান জানান তাতে কোন সমস্যা দেখছি না। আমার পরিস্কার কথা হচ্ছে- বাংলাদেশের মেয়েরা স্কুল-কলেজ ও বিশ্বিবদ্যালয়ে পড়ুক তাতে কোন সমস্যা নাই কিন্তু প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে। সবখানে মেয়েদের জন্য মহিলা শিক্ষিকা রাখতে হবে। মহিলা শিক্ষিকা ছাড়া মেয়েদেরকে কলেজ-বিশ্ববদ্যালয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই।'

২০২১ সালের ২৭ অক্টোবর দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৩ অক্টোবর ২০২১ জুড়াইন মেডিকেল রোডে অবস্থিত এনামুল উলুম মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত দেয়। আমি ওই ওয়াজ মাহফিলে প্রায় ৪০ মিনিট বক্তব্য দিই। ওই ওয়াজ মাহফিলে কুমিল্লায় পূজামণ্ডপে মূর্তির পায়ে পবিত্র কোরান শরিফ রাখার ইস্যু নিয়ে কথা বলি। ওই বক্তব্যের একপর্যায়ে আমি উত্তেজনাবশত কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। এ ধরনের বক্তব্য আমার প্রদান করা উচিত হয়নি এবং আমার দেওয়া বক্তব্য ইসলামসম্মত নয়। আমি আমার উক্ত বক্তব্যের জন্য অনুতপ্ত।'

২৬. হাসান জামিল

মাওলানা হাসান জামিল হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সহকারী মহাসচিব, রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি, এলিফেন্ট রোড ঢাকার বাইতুল মামুর জামে মসজিদের খতিব এবং ঢাকা নিউমার্কেট দারুল উলুম রহমানিয়া মাদ্রাসার পরিচালক। দেশের সকল ওয়ায়েজদের ঐক্যবদ্ধ করে এক প্লাটফর্মে আনার জন্যে ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল গঠন করা হয় 'ইত্তেফাকুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ' নামে

একটি সংগঠন। দেশের পরিচিত অনেক ওয়ায়েজ যুক্ত ছিলেন এ সংগঠনের সাথে। সংগঠনের পরিসর বাড়িয়ে কাজকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে নাম বদল করে রাখা হয় 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'। এছাড়াও সংগঠনটির পুরোনো কমিটি ভেঙে মাওলানা আব্দুল বাসেত খান সিরাজীকে সভাপতি ও মাওলানা হাসান জামিলকে সেক্রেটারি করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে দিনব্যাপী 'ওয়ায়েজ, খতীব ও দায়ী ওলামায়ে কেরামের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনটির উপদেষ্টা মাওলানা মামুনুল হক ও মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ূবীর যৌথ সঞ্চালনায় অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (দেওনা পীর) কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন বাংলাদেশ'-এর কমিটির সাথে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের প্রয়াত সাবেক আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী একাত্মতা পোষণ করেছিলেন।

২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নিজেদের নেতাকর্মীদের নিয়ে সারাদেশে 'রাবেতাতুল ওয়ায়েজীন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এমনকি সেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সংগঠনটি সারাদেশে ওয়াজ মাহফিল নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও দাবি করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের যুগ্ম-কমিশনার মো. মাহবুব আলম তার কার্যালয়ে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় এ কথা জানান।

'যুগ্ম কমিশনার মো. মাহবুব আলম বলেন, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আয়োজকদের বাধ্য করা হচ্ছে হেফাজত নেতাদের বিভিন্ন ওয়াজে নেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে তারা উগ্রবাদী বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারছেন। এছাড়া মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের ব্যবহার করে হেফাজত নেতারা বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন। মাদ্রাসা দখলের মতো অপকর্ম ও অনেকের নারী বিলাসের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।'

হাসান জামিল এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর 'Khatib Media' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে হাসান জামিল বলেন, 'মুসলমানদের এই জমিনে মুসলমানরাই থাকবে। আল্লাহ নবীর দুশমনেরা থাকতে পারবে না। আহমদ শফির এই জমিনে জয় শ্রীরাম স্লোগান যে কুলাঙ্গার দেবে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। তোমার এই পরমাণু অস্ত্রের উপর কোন মুসলমান ভরসা রাখে না। মুসলমানের ভরসা আল্লাহর উপর। হে যুবক, হুমকি ধামকি আসবে, তুমি ভেবো না আমাদের কাছে অস্ত্র নাই। যেই অস্ত্র আছে এইটা যার কাছে ছিল ইতিহাস বলে সে জয়ী হয়েছে। বুকে হিম্মত রাখো। শুনে রাখ কুলাঙ্গাররা, আমি এই স্বপ্ন দেখি যেদিন দিল্লীর লাল কেল্লায় আবারো কলেমার পতাকা পতপত করে উড়বে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/fdMB5td0bmk)

'Khatib Media' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মাওলানা হাসান জামিল বলেন, 'হে শায়খুল হিন্দের রুহানি সন্তানরা আপনারা জিহাদের কথা ভুলে গেলেন। আজকে জিহাদের কথা ভুলে গেলেন বলেই নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে কোনো বিচার হয় না। অভিজিৎ এর রক্ত কি নবীর ইজ্জতের চেয়ে বেশি দামি? যারা অভিজিৎকে হত্যা করেছেন তাদেরকে ফাঁসি কেন? তাদের ফাঁসি আমি মানতে পারি না। এটা মানতে পারছি না। যারা নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে তাদেরকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত শাহবাগী নাস্তিকদের ফাঁসি দিবেন না, ততদিন হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবেনা।আমরা সবকিছু বরদাস্ত করবো কিন্তু নবীর শানের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা বরদাস্ত করা হবে না। আমরা জিহাদ চাই জিহাদ। জিহাদ ছাড়া মুসলমানদের কোনো পথ খোলা নেই। যতদিন পর্যন্ত নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবেনা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের শার্দুল যুবকরা নিজ হাতে শাস্তি দিবে। এটা কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Ai01vh9bIdM)

'RT Media Centre' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে হাসান জামিল বলেন, 'আমাদেরকে শুধু জঙ্গি জঙ্গি বলে দমাইয়া রাখতে চায়। ওরা জানে মুসলমানদেরকে কিছুতেই দমানো যাবে না। ওরা জানে ইসলামের সবচেয়ে মজলুম বিধান হচ্ছে 'জিহাদ'। নবী প্রেমিকদের আবার জাগতে হবে। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জিহাদের ডাক আসবে। তখন সবাইকে জিহাদের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমরা বাংলাদেশের কোথাও কাদিয়ানীদের অস্তিত্ব রাখবো না। কাদিয়ানীদের মূলোৎপাটন করতে হবে। কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কথা বললে যারা চোখ রাঙাবে তাদের চোখ উঠিয়ে ফেলবো। সবাই শ্লোগান ধরো আমার সাথে। জিহাদ জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই। বাংলাদেশে কোন হিন্দু দেশের দালাল থাকতে পারবে না। আল্লামা আহমদ শফী যদি ডাক দেন তাহলে কারা কারা জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন হাত উঠিয়ে দেখান? আপনারা জিহাদের ডাক আসার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়বেন। ঘুমানোর সময় নেই। আমাদের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে ইসলামের জন্য। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন। এদেশে জিহাদের বিকল্প কিছু নেই।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/qrgxH2WwWzw)

২৭. মুফতি গিয়াস উদ্দিন তাহেরী

মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী 'দাওয়াতে ঈমানী বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যান। গিয়াস উদ্দিন তাহেরী নরসিংদীর রায়পুরার মাস্তানগঞ্জ নামক একটি মহল্লায় খাজা বাবার দরবার নাম দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি আস্তানা গড়ে তুলেছেন। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাপাইর গ্রাম। এই জেলার ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও আলিম পাস করে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ফাজিল ও কামিল পাস করেন। তাহেরীর বাবার নাম মাওলানা নজিবউদ্দিন। বাবা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক। মা মোহছেনা বেগম গৃহিণী। পারিবারিক জীবনে তাহেরী দুই সন্তানের জনক।

ওয়াজ মাহফিলের নামে মুফতি মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তাহেরী কোনো ভুল বার্তা দিচ্ছেন নাকি বুঝে বা না বুঝে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন, এমন প্রশ্ন উঠেছে জোরালোভাবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নানা রকম সমালোচনায় বিদ্ধ করা হচ্ছে তাকে। ভাইরাল হয়েছে তার ওয়াজের কয়েকটি ভিডিও। ইউটিউবেও তার ওয়াজের ভিডিও দেখছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ।

২০১৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দাওয়াতে ঈমানী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তাহেরীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের ওপর আঘাত সৃষ্টির অভিযোগে মামলার আবেদন করা হয়েছে ২০১৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনাল আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালতে এ মামলার আবেদন করেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যকরী সদস্য মো. ইব্রাহিম খলিল। মামলার বাদী ইব্রাহিম খলিল বলেন, তাহেরীর বিরুদ্ধে পিটিশন মামলার আবেদন জমা দিয়েছি। ইসলাম ধর্মে ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে নাচ-গান সমর্থন করে না। কিন্তু গিয়াস উদ্দিন তাহেরী তার মাহফিলে এমনটাই করছেন। ওয়াজ মাহফিলের নামে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ইব্রাহিম খলিল।'

'BD Islam HD' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে গিয়াসউদ্দিন তাহেরী বলেন, 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের আগমন নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের ভাবমর্যাদাকে উজ্জল করবে। বাংলাদেশের জনগণ এসব রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে অবশ্যই স্বাগত জানাবে। তবে যে নরেন্দ্র মোদির হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত, মোদী পানি না দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করছে। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীদেরকে হত্যা করছে, সে নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানাতে পারেনা। মোদির আগমন কোনো ভাবেই বরদাশত করা হবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। নরেন্দ্র মোদি পানি না দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানাচ্ছে। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীদেরকে হত্যা করছে। সেই নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানাতে পারেনা। বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদির আগমন বন্ধ করতে হবে।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সাম্প্রদায়িক মোদিকে বাংলাদেশে এনে জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এ দেশের সব মানুষকে অপমান করবেন না। জাতীয় স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মোদির আগমন মানায় না। মোদি ভারতে বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির বানাচ্ছে। এটা মুসলমান কখনো সহ্য করতে পারে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ভারতের মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত নরেন্দ্র মোদিকে আসতে দেব না। বাংলাদেশের মাটিতে এমন কোনো দেশের নেতাকে স্বাগত জানাব না, যাঁর হাত মুসলিমদের এবং মজলুম মানুষের রক্তে রঞ্জিত। এ দেশের মানুষ মোদিকে স্বাগত জানায় না। মুসলিমবিদ্বেষী মোদিকে এ দেশের মানুষ দেখতে চায় না। নরেন্দ্র মোদির

ভারতে মসজিদে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একবার বিবৃতি প্রদান করুন। আপনি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য একবার প্রতিবাদ করুন। নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে আসলে আবার যুদ্ধ হবে আবার যুদ্ধ হবে। যুবকরা জীবন দিতে প্রস্তুত আছো কি? যখন ডাক আসবে তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে। মুসলমান মৃত্যুকে ভয় পায় না।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/GyMb_0Ux78c)

২৮. তারেক মনোয়ার

'৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির জন্য তদবির নিয়ে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাড়িতে গিয়ে তোলপার সৃষ্টি করেছিলেন সাঈদীর পুত্র শামীম সাঈদী এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা তারেক মনোয়ার।

২০১৯ সালের ১ এপ্রিল মধ্যরাতে লকডাউন পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চরম্বা ইউনিয়নের বড়ুয়া পাড়ায় গিয়ে ঐ জনৈক রকি বড়ুয়ার সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তারা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির বিষয়ে আলাপ করার জন্যই রকি বড়ুয়ার সাথে বৈঠক করেছেন জামায়াত নেতারা।

গণকমিশনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াতে ইসলামের বিতর্কিত বক্তা তারেক মনোয়ার এবং সাঈদীপুত্র শামীম সাঈদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহায়তায় সাঈদীকে মুক্তির বিষয়ে রাতভর বৈঠক করেন রকি বড়ুয়া সাথে। তারা রকি বড়ুয়ার বাড়িতে রাতে খাওয়া দাওয়াও করেন। বৈঠক শেষে সকাল ৮টায় সড়ক পথে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরে যান শামীম সাঈদী ও তারেক মনোয়ার সহ জামায়াত নেতারা। জামায়াত নেতা ও তারেক মনোয়ারের সাথে বৈঠকের ছবি রকি বড়ুয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোষ্ট করার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়।

বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী-এমপিদের সাথে নিজের সখ্যতা আছে উল্লেখ করে রকি বড়ুয়া বলেন, সাঈদী সাহেবের লোকজন মনে করেছেন যে, আমাকে দিয়েই এই কাজ হবে, এবং সেই কারণেই এই লকডাউনের মধ্যে তারা আমার বাড়িতে ছুটে এসেছেন। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কথা হয়েছে। তারা আমার বাড়ির মন্দির পরিদর্শন করেছেন। এভাবেই মাওলানা তারেক মনোয়ার জামায়াতের নেতা যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মুক্ত করার নামে মাঠে ময়দানে ও গোপনে কাজ করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে।

মাওলানা তারেক মনোয়ার জামায়াতে ইসলামী ও শিবির গোষ্ঠীর নিকট জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা হিসাবে বেশ পরিচিত। তার বেশ কিছু বক্তব্য ২০১৯ সাল থেকে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ওয়াজে তিনি অসংলগ্ন কিছু কথা বলেছেন।

২০২০ সালের ২৭ মার্চ 'Waz Media Bogra' ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ওয়াজে মাওলানা তারেক মনোয়ার বলেন, 'সৌদি আরব রিয়াদের এক ঈমাম সাহেব আমাকে বলতে এসেছিলেন, উনি সাঈদী হুজুরকে চাঁদে দেখতে পেয়েছেন। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/2QLdnkkc9u4)

২০২১ সালে 'Anupom HJ Chanel' প্রচারিত একটি ওয়াজে তারেক মনোয়ার বলেন, 'বর্তমান বাংলাদেশে যেসকল বক্তা ওয়াজ করেন আমি সবাইকে মন থেকে ভালোবাসি। আমরা মাঠে ময়দানে একে অন্যের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি করলে ইসলামের দুশমানরা শক্তি পাবে। আমাদের ভুল হতে পারে, একে অন্যের সাথে দ্বিমত থাকতে পারে তাতে কোন সমস্যা দেখছিনা। আমি ওয়াজের মাঠে মাওলানা আমির হামজাকে ভালোবাসি, মিজানুর রহমান আজহারী, হেফাজতের মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের সন্তান মামনুল হককে ভালোবাসি। আমরা কে কোন দল করি সেটা দেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের সবার মিশন এক ও অভিন্ন। আমরা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আমাদের দাওয়াত পৌঁছে দেবো এটাই একমাত্র অঙ্গিকার। সবাই আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের বিজয় হবেই ইনশাআল্লাহ।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Tnbr1LIiw_4)

'Tafsir Media' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মাওলানা তারেক মনোয়ার বলেন, 'আজকে সারা পৃথিবীতে ইসলামের কথা বললে কান খাড়া করে রাখে। আগামীর দিন হচ্ছে ইসলামের দিন। ইসলামকে সবাই দমানোর চেষ্টা করছে কিন্তু পারছেনা। বাংলাদেশের মাটিতেও ইসলামের বিজয় হবেই। বিশ্বনবী (সা.) বদরের যুদ্ধে তিনশত তের জন সাহাবি নিয়ে যুদ্ধে গেলেন। সেই তিনশত তের জন থেকে ওহুদের যুদ্ধে এক হাজার হয়ে গেলেন। তাবুকের যুদ্ধে তিন হাজার হয়ে গেলেন। ফতেহ মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার হয়ে গেলেন। বাড়তে বাড়তে সারা পৃথীতে বর্তমান মুসলমানদের সংখ্যা একশত বিশ কোটি। আমাদের দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। আমাদের যুব সমাজকে ইসলামের পতাকা উড়াতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই দেশে জিহাদের মাধ্যমে একদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/KIrMzpx7rbU)

২৯. মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন

মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন মিরপুর মাদ্রাসা আকবর কমপ্লেক্স-এর মহাপরিচালক। তিনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মনোহরগঞ্জ সাবেক লাকসাম থানাধীন বান্দুয়াইন গ্রামের মোল্লাবাড়ীতে ১৩৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ। মুফতি দিলওয়ার হোসাইন একজন পাকিস্তানপন্থী হিসেবে অধিক পরিচিত।

তিনি পাকিস্তানের করাচীর জামিয়া বান্নুরীর শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী এর সুদীর্ঘ ১১ বছরের সংশ্রবপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন। মুফতি দিলাওয়ার বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

মুফতি দিলওয়ার হোসাইনের বিভিন্ন পদ, পদবী ও দায়িত্ব: প্রিন্সিপাল, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা। জামিয়া আশরাফিয়া চারাবাগ, সাভার, ঢাকা। দারুল উলূম বান্দুয়াইন, কুমিল্লা। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১২, ঢাকা। শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা। জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া (রেলওয়ে কলোনী) কওমী মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ। প্রধান মুফতী, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। চেয়ারম্যান, আত-তাখাস্সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা বিভাগ। জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। পৃষ্ঠপোষক, আন্-নাহদাতুল আদাবিয়্যাহ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা এর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক আরবী পত্রিকা। খতীব, মসজিদুল আকবার, মিরপুর-১, ঢাকা। চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী বাংলাদেশ (ইসলামী ফেকাহ একাডেমী বাংলাদেশ)।

মুফতি দিলাওয়ার হোসাইনের অসংখ্য ওয়াজ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, তিনি ওয়াজের মাধ্যমে যুব সমাজকে উগ্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষের দিকে ধাবিত করছেন। জিহাদের নামে যুব সমাজকে মগজ ধোলাই করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। মুফতি দিলওয়ার হোসাইন কওমি ঘরানাদের মাঝে একজন ফতোয়াবাজ হিসেবে পরিচিত। তিনি হেফাজতে ইসলামের ফতোয়া বোর্ডের একজন উপদেষ্টা। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে তিনি বিভিন্ন সময় প্রগতিশীল লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি এবং ফতোয়া প্রদান করে আসছেন। ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে তিনি ফতোয়া দিয়ে সর্বশেষ আলোচনায় এসেছিলেন ২০২০ সালে।

২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনে দেশের শীর্ষ উলামা মাশায়েখরা কোরান সুন্নাহর আলোকে ফতোয়া প্রকাশ করেছেন। শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচজন আলেম ভাস্কর্য বা মূর্তি সম্পর্কিত ফতোয়া প্রস্তুত করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা মাশায়েখরা প্রকাশিত ফতোয়াকে পুর্ণসমর্থন জানিয়েছেন। ২০২০ সালের ২ ডিসেম্বর সেগুনবাগিচাস্থ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে দেশের শীর্ষ উলামা মাশায়েখ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ফতোয়া প্রকাশ করা হয়।

'সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুফতি দিলওয়ার হোসাইন। তিনি বলেন, 'ভাস্কর্য ও মূর্তির বিধান নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিভ্রান্তি। ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণ করা জায়েজ নাই।' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/sNYiNCCKBK8)

'Qawmi Media Centre' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মুফতি দিলওয়ার হোসাইন বলেন, 'আমাদের দেশে বহু পীরের মাজার আছে। এসব ভন্ডদের মাজার ভেঙে দিতে হবে। ওরা মুরিদানদেরকে জান্নাতের পথ দেখানোর নামে

জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এইসব পীরেরা বলেন সবকিছু দিয়ে দিতে। গরু ছাগল থেকে শুরু করে সবকিছু পীরের নামে উৎসর্গ করে খালি হাতে চলে যেতে হয়। এসব মাজারের বিরুদ্ধে, পীরের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাংলাদেশের কোথাও মাজার ও পীরের আস্তানা রাখা হবেনা। মাজার, পীর এসব মুসলমানরা পূজা করতে পারে না। ইসলামে এসব হারাম হারাম। আমি যুব সমাজকে বলবো এদেরকে যেখানে পাবেন সেখানে প্রতিহত করবেন। ইসলামের জন্য আমাদের রক্ত দিতে বেশি করে করে। ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/pnp2hN94_QQ)

'Qawmi Media' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে মুফতি দিলওয়ার হোসাইন বলেন, 'দেশত্যাগ করা কতটা বেদনাদায়ক সেটা সবাই বুঝবেনা। যারা কয়েক বছরের জন্য প্রবাসে যায় তারা বুঝবেন। কয়েকটা বছর দেশের বাইরে থাকলে কেমন লাগে তার সঠিক মর্ম প্রবাসে গেলে বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রিয় নবীজী (সা.) নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন নিজ দ্বীন-ধর্মের জন্য। দ্বীনের খাতিরে তিনি নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করেছিলেন। ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য, মুসলমানদের কল্যাণের জন্য এবং জিহাদের জন্য আমাদেরকে হিজরত করতে হবে। স্পেন বিজয়ের মহানায়ক ইসলামের ঝান্ডা উড়াতে সুদূর আফ্রিকা থেকে স্পেন পর্যন্ত সফর করেছিলেন। ইসলামের বিজয় আনতে আমাদেরকে প্রয়োজনে সবকিছু ছেড়ে হিজরত করতে হবে। আমরা ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজেকে যেকোনো সময় বিলীন করে দিতে হবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Spw6hFU3i8M)

৩০. মুফতি ইলিয়াছুর রহমান জিহাদী

মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান জিহাদী মিরপুর মুক্তবাংলা মার্কেট মসজিদ-এর খতীব। সাম্প্রদায়িক ও উস্কানিমূলক বক্তব্য, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেয়া, ধর্মের নামে বিভিন্ন উপদল ও শোবিজ তারকাদের নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ ধরনের বক্তব্য প্রতিরোধে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ছয়টি সুপারিশও করে তারা। সেই বিতর্কিত বক্তাদের মধ্যে মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান জিহাদী একজন।

মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান জিহাদীর ওয়াজ মাহফিলের বয়ানের প্রধান অংশ হয়ে ওঠে– দেশের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, চিত্রনায়ক ও গায়কদের নিয়ে বিষোদ্গার। তার প্রতিটি ওয়াজে থাকে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা। তার এক বয়ানেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শাশুড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। যদিও ইউটিউব লিঙ্কটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ২০২০ সালের শেষের দিকে দেওয়া ওই একই বক্তব্যে মাওলানা জিহাদী বলেন, শিক্ষিত হতে হতে কবি শামসুর রাহমানের মাথার চান্দিতে চুল আছিলো না।

মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান গানের শিল্পীদের গান গেয়ে সেই শিল্পীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। মাওলানা জিহাদী প্রয়াত রকসংগীতের কিংবদন্তি আইয়ুব বাচ্চু,

লোকগানের শিল্পী মমতাজ, নগরবাউল জেমসসহ অনেকের গান গেয়ে শোনান। শ্রোতারাও হাসাহাসি করেন। বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/AnG3oF3ooiA)

'RS TV' নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত একটি ওয়াজে জিহাদী বলেন, 'বাংলাদেশে সুপার স্টারও মরে আবার আল্লাহর ওলিও মরে। একজন হচ্ছেন ব্যান্ড শো'র সুপার স্টার আরেকজন আল্লাহর ওলি সুপার স্টার। ব্যান্ড শো সুপার স্টারের কাজ হচ্ছে গান গেয়ে গেয়ে মাঠে-ময়দানে শয়তানের খোরাক যোগানো আর আল্লাহর ওলি সুপার স্টারের কাজ হচ্ছে, মাঠে ময়দানে ওয়াজ করে বেহেশতের খোরাক যোগানো। দুজনের মাঝখানে অনেক তফাৎ রয়েছে। কয়কদিন আগে বাংলাদেশে মারা গেলেন গানের শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু আরেকজন সিলেটের প্রিন্সিপাল আল্লামা হাবিবুর রহমান। প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমানের লক্ষ লক্ষ ভক্ত। আর আইয়ুব বাচ্চুর কোন মুরীদ নেই। দুজন লোক একইদিনে মারা গেলেন কিন্তু পরকালে কী জবাব দিবেন আইয়ুব বাচ্চু? আইয়ুব বাচ্চু গানের মাধ্যমে যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতেন।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/AnG3oF3ooiA)

মাদারীপুরে অগ্রিম টাকা (বায়নার টাকা) নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে অংশ না নেওয়ায় মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান জিহাদীর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর বিকালে সদর উপজেলার খাগছাড়া এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে এলাকার দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এ সময় তারা অভিযুক্ত মাওলানা জিহাদীর বিচার দাবি করেন। এ সময় তারা অভিযোগ করেন, ১৩ ডিসেম্বর ওয়াজ মাহফিলে অংশ নেওয়ার জন্য ৪ মাস আগে ১০ হাজার টাকা বায়না দিয়ে মাওলানা মুফতি ইলিয়াছুর রহমান জিহাদিকে আমন্ত্রণ জানায় এলাকাবাসী। কিন্তু ১১ ডিসেম্বর দুপুরে তিনি মুঠোফোনে জানান এই ওয়াজ মাহফিলে অংশ নিতে পারবেন না।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ 'বাংলা নববর্ষ' উৎসব পালিত হয়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত আধুনিক বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে এই দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চান্দ্রসৌর বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ১৫ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পালিত হয়। এছাড়াও দিনটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ছুটির দিন হিসেবে গৃহীত। বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা দিনটি নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করার উপলক্ষ হিসেবে বরণ করে নেয়।

এই উৎসবটি শোভাযাত্রা, মেলা, ইলিশ আর পান্তাভাত খাওয়া, হালখাতা খোলা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী শুভেচ্ছা বাক্য হল 'শুভ নববর্ষ'। নববর্ষের সময় বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই উৎসব শোভাযাত্রাকে 'মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের এই সংস্কৃতির উৎসবকে নিয়ে ওয়াজ ব্যবসায়ী মাওলানা ইলিয়াছুর রহমান জিহাদি কটুক্তি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বলেন, 'এই উৎসব মুসলমানদের উৎসব হতে পারেনা, এটা হিন্দুদের উৎসব।' 'Bangla Waz HD' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত এক ওয়াজে তিনি বলেন, 'আমরা মুসলমান কখনো পহেলা

বৈশাখের মতো হিন্দুদের উৎসব পালন করতে পারিনা। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে হিন্দুদের উৎসব। হিন্দুরা এই দিনে পূজা দিবে এটাই স্বাভাবিক কারণ এটা তাদের উৎসব। মুসলমানদের উৎসব হচ্ছে ১০ মহররম ও দুই ঈদের দিন। পহেলা বৈশাখের দিনে মুসলমানের ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-পোশাক বানাতে পারেনা। হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন পোশাক বানাবে। পহেলা বৈশাখে যারা নতুন পোশাক বানাবে তারা কাফের কাফের কাফের। আমি বাঙালির নববর্ষ মানি। বাঙালির বছরের নতুন দিন মানি কিন্তু সেইদিন নতুন নতুন পোশাক বানানো, সকালে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তাভাত খাওয়া এসব মানিনা মানিনা মানিনা। পহেলা বৈশাখের সময় নারী পুরুষ মিলে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে। ওটা সম্পূর্ণ হারাম হারাম। যারা মঙ্গলবার শোভাযাত্রা করে তারা মুসলমানদের সন্তান হতে পারেনা। হিন্দুদের পূজার দিনে পহেলা বৈশাখে যা মন চায় করবে কিন্তু মুসলমানরা করতে পারবেনা। আমি একদিন দেখলাম টয়লেটের টিস্যুতে পহেলা বৈশাখ খাড়া করে রাখছে। পরে সেই টিস্যু দিয়ে নিজেকে পরিস্কার করে টয়লেটে নিক্ষেপ করলাম। পহেলা বৈশাখের দিনে সকালে পান্তা-ইলিশ খাওয়া আর দুইদিন ভাত পঁচাইয়া রেখে মদ খাওয়া একই সমান। এসব মুসলমানদের খাবার হতে পারেনা। হে মুসলমানদের যুবকরা, তোমরা এসব অপসংস্কৃতি থেকে বিরত থাকুন। পহেলা বৈশাখ আমাদের কোন দিবস কিংবা উৎসব নয়। সবাই এসব উৎসব থেকে দুরে থাকবেন।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/PHCVxNNzem8)

৩১. মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম

সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর। সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারি বরিশাল জেলার চরমোনাই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই। দাদা সৈয়দ মুহাম্মদ ইছহাক। তার মোট ৬ ভাই ও ১ বোন। তিনি চরমোনাই শায়েখে সানি হিসেবে প্রসিদ্ধ তাদের দল ও মুরিদদের নিকট। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি ও বাংলাদেশ কোরাণ শিক্ষা বোর্ডের সহ-সভাপতি এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য। তিনি চরমোনাই জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া থেকে শিক্ষাজীবনের সূচনা করেন। ১৯৯৫ সালে এর আলিয়া শাখা থেকে কামিল পাশ করেন। পাশাপাশি এর কওমি শাখায়ও ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন। এরপর বরিশালের সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ফিকহ ও হাদিসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়ায় কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি চরমোনাই জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়ার আলিয়া শাখার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে দীর্ঘদিন আলিয়া ও কওমি উভয় শাখার সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। ২০০৬ সালের ২৫ নভেম্বর তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ওয়াজ বক্তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য, জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেওয়া, ধর্মের নামে বিভিন্ন উপদল ও শোবিজ তারকাকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ ১৫ জন ওয়াজ বক্তাকে চিহ্নিত এবং এ ধরণের বক্তব্য প্রতিরোধে ছয়টি সুপারিশ করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই বক্তাদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম একজন।

মুফতি ফয়জুল করীম তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, '১৯১১ সালে বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে যে ইউনিভার্সিটির প্রস্তাব করা হয়েছিল একমাত্র হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। সেই ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছিল ১৯২১ সনে নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে। কোনো খ্রিষ্টান, কোনো হিন্দু বা নাস্তিকদের প্রস্তাবে এই ইউনিভার্সিটি করা হয়নি। কাজেই ইউনিভার্সিটি মুসলমানদের ইউনিভার্সিটি, এখানে কোনো নাস্তিক থাকতে পারবে না।

'সিলেবাসে যে বই আছে তাতে দেব-দেবীর নামে কোরবানি করে খাওয়া বৈধ বলা হয়েছে। এছাড়া 'এই লাল গরুটা' কবিতার মধ্যে গরুকে দেবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। ফয়জুল করীম বলেছেন, যেই সিলেবাসের মধ্যে নবী (সা:) এর জীবনী থাকবে না, ওমরের জীবনী থাকবে না, যেখানে এমন মহৎ লোকদের জীবনী থাকবে না– এরকম সিলেবাসের বই বাংলাদেশে পড়ানো হবে না, এমনকি পড়তে দেয়া হবে না।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/JBWXogGCyOw)

২০২০ সালের ১৩ নভেম্বর সৈয়দ ফয়জুল করিম ধোলাইখালের নিকটে গেন্ডারিয়া নামক স্থানে তার নসিহত শুনতে আসা সাধারণ মুসলমানদের হাত উঁচু করে শপথ পড়িয়ে নেন যে, 'আন্দোলন করব, সংগ্রাম করব, জেহাদ করব। রক্ত দিতে চাই না, দেয়া শুরু করলে বন্ধ করব না। রাশিয়ার লেলিনের বাহাত্তর ফুট মূর্তি যদি ক্রেন দিয়ে তুলে সাগরে নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে আমি মনে করি শেখ সাহেবের এই মূর্তি আজ হোক, কাল হোক খুলে বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করবে।'

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/b3GIEXx1zqE)

৩২.শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আল জামিয়াতুস সালাফিয়া রাজশাহী মাদ্রাসার পরিচালক। তিনি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের দেবীনগর উপজেলার অধীন মাওলা বক্স হাজীরটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

এলাকার মক্তবে শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হওয়ার পর তিনি নাচল নবাবগঞ্জ মাদ্রাসা থেকে হাদিসের অন্যতম কিতাব মিশকাত শরীফ পর্যন্ত পড়েন। তারপর উচ্চ শিক্ষার আশায় ভারত গমন করেন এবং উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম মউনাথভাঞ্জান

থেকে দাওরা হাদীস শেষ করেন। তারপর দেশে ফিরে কর্ম জীবনের পাশাপাশি ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস ও তাফসীর নিয়ে কামিল পাশ করেন। গাইবান্ধায়, জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ অবস্থিত আল মারাকাজুল ইসলামীতে শিক্ষকতা করার মাধ্যমে তিনি তার কর্ম জীবনের শুরু করেন। তারপর ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি আল মারকাজুল ইসলামী আস সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে একজন মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি অত্র মাদ্রাসায় প্রায় ৫ বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি মাসিক আত তাহরিক পত্রিকার ফতোয়া বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি আল জামিয়াতুস সালাফিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করছেন।

ছাত্র জীবনে থেকেই বক্তব্য দেয়ার অভ্যাস থাকায় দারস দানের পাশাপাশি তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতের নামে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মিশনে নামেন । তিনি বাংলা ভাষাভাষী আলেমদের মাঝে একজন সবচেয়ে বিতর্কিত বক্তা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ডাঃ জাকির নায়েকের পীস টিভিতেও নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে থাকনে। তিনি এ পর্যন্ত সৌদী আরব, দুবাই, ভারত ও মালদ্বীপে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি হাদিসের আরবী পড়ে তারপর নিজের মনগড়া অনুবাদ করে থাকেন। নিজের সুবিধামতো হাদিসের অনুবাদ করে মানুষকে ভয়-ভীতি দেখান। প্রতিটি বক্তব্যে সমালোচনা ও বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া ভালো কিছু থাকে না। সমাজের মানুষের কাছে হিংসা-বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা ও পরস্পরের সাথে ঝগড়াঝাটি লেগে থাকার মতো বক্তব্য রাখেন সবসময়।

তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ– আইনে রাসুল দোয়া আধ্যায় ও তাওজীহুল কোরাণ। তার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, আল জামিয়াতুস সালাফিয়া, রুপগঞ্জ নারায়নগঞ্জ, আল মাদ্রাসাতুস সালাফিয়া, আটমল, বগুড়া, বীরকুস্টিয়া দারুল হাদীস সালাফিয়া মাদ্রাসা বগুড়া। যেসব প্রতিষ্ঠানকে তিনি সহযোগিতা করেন সেগুলো হচ্ছে, আল মারকাজুল ইসলামী আস সালাফী, রাজশাহী এবং মহিলা সালাফিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী ।

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বিরুদ্ধে তৃণমূলে জঙ্গিবাদ এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'Islamic Multi Video' নামের একটি চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ওয়াজে তিনি বলেন, 'কুষ্টিয়ায় লালন শাহের নামে সেতু হলো কেন? কুষ্টিয়ায় পাকশি সেতু হবে। আমার টাকাও সেখানে আছে। লালন শাহ আবার কে? হিন্দু কি মুসলমান আমি নিজেই জানি না। তার নামে সেতু হবে মানে? এইটা কি কারো বাপের টাকা নাকি? এইটা আমার টাকা। নিজের বাপের টাকা দান করে লালন শাহ সেতু করতে হবে। সেইদিন আর বেশি দূরে নয়, যেই দিন অক্ষরে অক্ষরে বোঝাতে হবে এই টাকা কার। কেন হবে ব্যক্তির নামে বিমানবন্দর? কেন হবে ব্যক্তির নামে সেতু? এত ছবি মূর্তি রাস্তাঘাটে কেন হবে? আমি মূর্তি গড়তে আসিনি, আমি মূর্তি ভাঙতে এসেছি।

'সামাজিক কুসংস্কারে সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ল্যাংটা মেয়েকে সাজিয়ে দিয়ে রাস্তাঘাটে লাক্স সাবান বিক্রি করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে জাহেলিয়াত। টিভিটা অন করলে

দেখা যায় ল্যাংটা মেয়ে পাউডার বিক্রি করছে, আমাদের টিনগুলিতে আছে গরুর ছবি-মূর্তি, জায়নামাজে আছে কাবাঘরের ছবি, মসজিদের দুইদিকে আছে কাবাঘরের টাইলস। এটাই হচ্ছে জাহেলিয়াত। জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস পালন করা জাহেলিয়াত। ২৬ শে মার্চ পালন করা জাহেলিয়াত, ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করা জাহেলিয়াত, ১৬ ডিসেম্বর পালন করা জাহেলিয়াত, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার তৈরি করা জাহেলিয়াত। শহীদ মিনারে ফুল দেয়া জাহেলিয়াত, সংসদ ভবনে নিরবতা পালন করা জাহেলিয়াত। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে জাহেলিয়াত। আমি কি হিন্দুর বাচ্চা? ইলিশ মাছ পান্তা ভাত নিয়ে আমি বটগাছের নিচে গিয়ে খাব কেন? এই সমাজ জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এগুলো জাহেল নেতাদের কাজ।'

বক্তব্যের লিঙ্কঃ (https://youtu.be/tdXVtb7luf8)

২০১৯ সালের ৩১ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অধিশাখা-২ থেকে ১৫ জন ইসলামী বক্তার একটি তালিকা তৈরি করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। উক্ত ১৫ জন বক্তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ একজন।

২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় কবি ও পীর-আউলিয়াদের নিয়ে কটাক্ষ করার অভিযোগ এনে নারায়ণগঞ্জের আল জামিয়াহ আস সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসার পরিচালক শায়েখ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে এক হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করা হয়েছে। মামলা নং-১৫/১৮। ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি দুপুরে আমল গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জগন্নাথপুরের বিচারক সাইফুর রহমানের মজুমদারের আদালতে এই মামলা করেন জেলার জগন্নাথপুর পৌর এলাকার বাসিন্দা আবুল হাসনাত বেলাল।

'মামলায় উল্লেখ করা হয়, ইন্টারনেটে ভিডিও শেয়ারিং'এর মাধ্যম ইউটিউবে প্রচারিত শায়েখ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের ওয়াজ মাহফিলে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রাহ.), হযরত শাহ জালাল (রাহ.), হযরত শাহ পরান (রাহ.), গোলাপ শাহ, জাতীয় সঙ্গীত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কটাক্ষ করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পীর-আউলিয়াদের কবর ভেঙে চৌচির করে দিতেও বলেছেন। জাতীয় পতাকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামকে নিয়ে অপমানজনক বক্তব্য দিয়েছেন, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।'

৩৩.মুহিব খান

কওমি মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদিস শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক করেন মুহিব খান। তিনি ন্যাশনাল মুভমেন্ট বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান। ইসলামী সঙ্গীত চর্চা ও ওয়াজের নামে যুব সমাজকে উগ্রতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। গানে গানে তৈরি করেছেন অগণিত উগ্রবাদী ভক্ত। ১৯৭৯ সনের অক্টোবরে কিশোরগঞ্জ

শহরের নূর মনযিলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা আতাউর রহমান খান। বর্তমানে তিনি 'জাগ্রত কবি মুহিব খান' নামে অধিক পরিচিত। তিনি কওমি-মৌলবাদী মুখপত্র হিসেবে পরিচিত 'সাপ্তাহিক লিখনী'র সাবেক নির্বাহী সম্পাদক। তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন। ২০০১ সালে প্রকাশিত 'লাল সাগরের ঢেউ' তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া 'প্রাণের আওয়াজ', 'অচিনকাব্য', 'বারোটি সুন্দর গল্প' তার রচনা। হেফাজত নেতা মুহিব খান জিহাদি সংগীত, লেখালেখি, কবিতা ও ভিডিওর মাধ্যমে যুব সমাজকে উগ্র জঙ্গিবাদের দিকে সর্বদা আহবান জানান।

২০২১ সালের ৬ এপ্রিল গাজী ইসলামিক টিভি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত, 'যদি আমার দেশের সীমানা বন্ধু মুছে দিতে কেউ চায়' নামের মুহিব খানে যুবকদের মাঝে উন্মাদনা উগ্রবাদ ছড়ানো একটি কবিতা–

যদি আমার মাটির ধন-সম্পদ লুটে নিতে কেউ চায়/ যদি আমার পাহাড়ে আমার সাগরে ভেড়ায় লোভের চোখ/ আমি প্রতিবাদে জ্বলে উঠবোই তবে যা হবার তাই হোক/ এই শান্ত সবুজ পতাকায় যদি পড়ে শকুনের থাবা/ এই সুপ্ত-বারুদ জাতি নিয়ে ফের খেলে যদি কেউ দাবা/ কোটি মানুষের প্রাণের কুটিরে আগ্রাসনের হাত যদি কেউ বাড়ায় তবে.....

আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে।/ যদি ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে কেউ আমার দেশকে ঘিরে/ রেসকোর্সের তপ্ত ভাষন আবার আসবে ফিরে/ দুশমন যদি খর্গ চালায় নকল বন্ধু সেজে/ কালুর ঘাটের দৃপ্ত ঘোষনা আবার উঠবে বেজে/ সেই স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র আবার গর্জে উঠবে/ আর বাংলামাটির সূর্য সেনারা রাইফেল হাতে ছুটবে/ হোক নমস কিংবা নবঝড় জাতি জীবন মরন লড়াই করেই মুক্ত রবে.....

আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে।/ যদি ইট পাথরের দূর্গ দেয়াল ভেংগে ভেংগে যায় পড়ে/ শহীদ তীতুর বাঁশের কেল্লা আবার তুলবো গড়ে/ যদি রক্তের নদী পেড়িয়ে আবার নতুন রক্ত ঝরে/ সেই ভাংগা কেল্লায় উড়াবো নিশান আবার নতুন করে/ এই মুসলমানের অভয়ারন্যে কাউকে দেবোনা ঢুকতে/ মোরা পাথরের নয় পাঁজরের বাঁধ গড়বো তাদের রুখতে/ কোন তাবেদার, কোন গাদ্দার যদি মীরজাফরের সেই কালোপথ মাড়ায় তবে.....

আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে, আবার যুদ্ধ হবে,আবার যুদ্ধ হবে।/ মোরা পৃথিবীর কোন পরাশক্তির মানিনা খবরদারী/ কোন শৃংখল কোন অবরোধ কোন হুমকি বা হুশিয়ারী/ এই পৃথিবীর বুকে বন্ধু সবাই, প্রভূ নয় কেউ কারো/ দখল, শোষন, উৎপীড়নের সব পায়তারা ছাড়ো/ মোদের ইতিহাস আছে সম্মান আছে না থাক বস্ত্র অন্ন/ এই দেশের জন্য লড়েছি আমরা, মরেছি ভাষার জন্য/ যদি জল-স্থল কিবা অন্তরীক্ষে কেউ আমাদের বাধার শিকল পড়ায় তবে....

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Po75XlIItac)

২০১৮ সালের ১২ জুলাই Holy Media নামক ইউটিউবে প্রকাশিত কথিত নাস্তিকদের নিয়ে মুহিব খানের বিদ্বেষ ছড়ানো একটি কবিতা–

মুহাম্মাদের নিন্দা ছড়ায় কোন হারামীর বেটা?/ ধইরা তারে মাজায়-ঘাড়ে মুগুর দিয়ে পেটা।/ ধর্মদ্রোহী নাস্তিকেরা বাড়বেড়েছে বড্ড এরা।/ ভিনদেশিদের দাস-দাসী সব, প্রভুর চরণ চাটা।/ ওই ছাগুদের কান কেটে দে, চান্দিতে মার ঝাঁটা।/ জাগরে সবাই বজ্র রোষে, তীব্র জোশে ওঠরে ফুঁসে।/ দ্বীন ঈমানের দেখতে সুদিন, জ্বলছে যাদের গা- টা।/ মুসলমানের দেশ থেকে ওই,পরগাছাদের ছাটা।/ ওই প্রগতির অন্তরালে, ব্যস্ত ওরা ঘৃণ্য চালে।/ তাল মেলাতে ওদের তালে, দেখতো লাফায় ক্যাঠা?/ আয় নিয়ে আয় দা লাঠি বাঁশ, খুন্তি শাবল ট্যাঁটা।/ মুসলমানের রাষ্ট্রে বসে, ধর্ম নিয়ে হিসাব কষে।/ ওই শালাদের কে দিয়েছে, এত্তো বুকের পাটা?/ সব শালারে ঠেঙ্গা মেরে, জাহান্নামে পাঠা।/ খুব হয়েছে! এবার যদি-শাস্তি না হয়,/ জ্বলবে গদি ভয় কি তোদের!/ আজকে ভয়ের সব দরোজাই আঁটা।/ বাঁচতে হলে কাঁটার জোরেই, তুলতে হবে কাঁটা।/ ধর্মনিরপেক্ষতা আজ, ধর্মগ্রাসের তিক্ত আওয়াজ।/ কণ্ঠ চেপে ধর শালাদের, আর দিবি না ভাটা।/ আর দেরি নয়,থাকতে সময় হাড্ডি ওদের ফাটা।/ দেশকে নিয়ে খেলছে ওরাই, ওদের সাথেই আজকে লড়াই।/ আয় ছুটে আয় এক সাথে সব, এক পথে ধর হাঁটা।/ প্রাণ খুলে তাকবীর ধ্বনি দে, হাঁক জোরে কালমা-টা।/ ধর্ম নিয়ে পেঁচগি বাধায়, কোনখানে কোন হারামজাদায়।/ এ বলো আর সে বলো সব, এক কাঁঠালের আঠা।/ সব কটাকে লাথি মেরে, দেশ থেকে আজ হঠা।

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/Avf3QwAkztM)

৩৪.আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

জামায়াতে ইসলামী সমর্থক বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (বাশার) কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা নাম মোঃ আব্দুল হাকিম ও মাতার নাম শাফিয়া বেগম। পারিবারিক জীবনে তিনি চার ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি গাছবাড়িয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শুরুতে এ মাদ্রাসায় হিফজুল কোরাণ বিভাগে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তারপর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুপুয়া ছফরিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ছুপুয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৫ইং সালে দাখিল পাশ করে ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লার দেবিদ্বারস্হ ধামতী আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসায় তিনি আলিম, ফাজিল ও কামিল(হাদীস) অধ্যয়ন করেন।

অতপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স ও মাস্টার্স সমাপ্ত করেন। তারপর ঢাকা পীরজঙ্গি জামেয়া দ্বীনিয়া থেকে দাওরা হাদীস ও সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা থেকে কামিল ফিকহ সমাপ্ত করেন। অতপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট

থেকে ২০১৩ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বি-বাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলা সদরের নারায়ণপুর ফাজিল মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ তেজগাঁও মদিনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দ্বীনের দাওয়াতি কাজের নামে জামায়াতে ইসলামীর মিশন বাস্তবায়ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। মুফতি আবুল কালাম আজাদ বাশার প্রতিটি ওয়াজে জামায়াতে ইসলামীর নেতা যুদ্ধাপরাধী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির নামে যুবকদেরকে উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

২০২০ সালের ২৮ মার্চ 'New Waz TV' চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (বাশার) যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তি বিষয়ে বলেন, 'করোনাভাইরাসের এই সঙ্কটময় ৮১ বছর বয়সের সাঈদী দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ডায়বেটিস-সহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত। তার হার্টে পাঁচটি রিং বসানো। তিনি দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কারাগারে আছেন। এ অবস্থায় অন্যের সাহায্য ছাড়া ওঠা-বসা, চলাচল বা নিত্যদিনের কাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তা ভুলবার নয়। আমি আশা করছি, সেই সাথে মানবিক বিবেচনায় জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনি আল্লামা সাঈদীকে মুক্তির মাধ্যমে গোটা জাতির কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আল্লামা সাঈদী ভাইরাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যাতে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত থেকে পরিবারের কাছে দিন কাটাতে পারেন সে জন্য মানবিক, ধর্মীয় ও বার্ধক্য বিবেচনায় তাকে মুক্তি দেয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবি।' বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/KeWC9qgMIpk)

২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারীর একটি ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সেই ভিডিও তে তিনি বলেছিলেন, যে যুবকদের আমি পারিনি সিনেমা হল থেকে ফেরাতে, আমি পারিনি তাদের ক্রিকেট খেলার মাঠে থেকে কোরানের তাফসির মাহফিলে আনতে কিন্তু আমার এক ভাই, আল্লাহর এক বড় নেয়ামত উনার মাহফিলে এক হাজার, ১০ হাজার, ২০ হাজার যুবক, লাখ লাখ একত্রিত হচ্ছে। এজন্যই আজকে মিজানুর রহমান আযহারীর বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/bCPnVqnLM9I)

৩৫. মুফতি সাঈদ আহমদ

মুফতি সাঈদ আহমদ 'কলরব শিল্পীগোষ্ঠী'র নির্বাহী পরিচালক। সাঈদ আহমদের জন্ম ঢাকায় হলেও গ্রামের বাড়ি গোয়াল বাথান মাগুরা জেলায় । তার পিতার নাম আবদুল খালেক। সাঈদ কোরান শরীফ হিফজ (মুখস্থ) করেন রাজধানীর ডেমরা হাফেজিয়া মাদ্রাসা থেকে। ২০১৩ সালে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) শেষ করেন জামিয়া ইকরা

মাদ্রাসায়। ইফতা (উচ্চতর ফিকহ) সমাপ্ত করেন যাত্রাবাড়ীর কাজলা থেকে। তিনি যাত্রাবাড়ী বাইতুল আকবার জামে মসজিদের খতিব।

এছাড়াও মাদ্রাসাতুল আসাদ আল ইসলামী নামে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তিনি কলরব শিল্পীগোষ্ঠীতে যোগ দেন ২০০৫ সালে। তখন থেকেই ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে নিয়মিত কাজ করছেন। ২০০৪ সালে উগ্রবাদী জিহাদি ইসলামি সংগীত শিল্পী আইনুদ্দীন আল আজাদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরব। দেশব্যাপী উগ্র ইসলামী সংস্কৃতি ও তথাকথিত জাগরণী সংগীত প্রসারে কাজ করছে সংগঠনটি। এরই মধ্যে সংগঠনটির ইউটিউব চ্যানেল ৫ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের মাইলফলক অর্জন করেছে।

উক্ত উগ্রবাদী মিউজিক ব্র্যান্ড কলরব শিল্পীগোষ্ঠীর নির্বাহী পরিচালক সাঈদ আহমদ নিজেকে একাধারে ইসলামী সংগীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার এবং বক্তা হিসেবে পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরেক উগ্রবাদী তথাকথিত ইসলামী সংগীত শিল্পী মাওলানা আইনুদ্দীন আল আজাদকে অনুসরণের চেষ্টা করেন বলে দাবি করেন তিনি। ওয়াজের সময় কথার ফাঁকে ফাঁকে ইসলামী সঙ্গীত গাওয়ার প্রচলন শুরু করেন মাওলানা আইনুদ্দীন আল আজাদ কিন্তু, তখন বিষয়টি তত জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। বর্তমানে মাওলানা সাঈদ আহমদসহ অনেক বক্তাই ওয়াজে কথার ফাঁকে ফাঁকে ইসলামী সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। মাওলানা সাঈদ আহমদের অনেক ওয়াজ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে তিনি ওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে মূলত সংগীতের নামে তরুণ যুবকদেরকে উগ্রবাদী গজল শুনিয়ে মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন এবং শ্রোতা দর্শকদের উত্তেজিত করে থাকেন। তার প্রতিটি সংগীত জিহাদের নামে উগ্রবাদকে উস্কে দেন। সাঈদ আহমদ তার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বেশিরভাগ সংগীতের মাধ্যমে গাজওয়ায়ে হিন্দ, ইমাম মাহদীর আগমন এবং বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের বিষয়টা ইঙ্গিত করা হয়। ২০০৬ সালে তার প্রথম এ্যালবাম "হক কথা" প্রকাশ হয় কলরব অডিও হাউস থেকে। ২০০৮ সালে দ্বিতীয় এলবাম "চাই না এমন দেশ" এবং ২০১৩ সালে "বদলে যাও" প্রকাশিত হয়ে। ২০০৮ সালে কলরবের সহযোগী পরিচালকের দায়িত্ব দেন স্বয়ং আইনুদ্দীন আল আজাদ। সাঈদ আহমদের সাড়া জাগানো সঙ্গীতের তালিকায় রয়েছে, "আমি দেখিনি তোমায়, চোখের তারায়", "রুখতে হবে দাজ্জাল", "বিশ্বনবীর অপমানে যদি" "ফেসবুক" এবং "কেমন মুসলমান"। সাঈদ আহমদ বর্তমানে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে ইসলামী সঙ্গীত প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

২০২১ সালের ২৩ জুন দৈনিক নয়া দিগন্তের এক সাক্ষাতকারে মুফতি সাঈদ আহমদ বলেন, 'আমাদের অনেক ভাইবোন নিজেকে মোমিন-মুসলমান দাবি করেও অনৈসলামিক নিষিদ্ধ গান বাদ্যে আসক্ত। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও আশঙ্কার কথা। মানুষকে অনৈসলামিক গানের আসক্তি থেকে ফিরিয়ে ইসলামী বৈধ গানে অভ্যস্ত করে তোলাও আমাদের কলরব শিল্পীগোষ্ঠীর লক্ষ্য। এ জন্যই আমরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি।

ইনশাআল্লাহ, একদিন ইসলামী গানের মাধ্যমে অপসংস্কৃতি বিদূরিত হয়ে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে।'

মুফতি সাঈদ আহমেদ এর লেখা গাজওয়ায়ে হিন্দকে যুবকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'আসছে মহাকাল' শিরোনাম নামের সংগীতটি হলো:

কই মাহদীর সৈন্যরা গর্জে ওঠো/ শহীদি তামান্না বুকে নিয়ে।/ সুফিয়ানা মতবাদ রুখতে হলে/ এখন থেকেই থাকো তৈরি হয়ে।/ আসবেই মহাকাল,/ রুখতে হবে দাজ্জাল।/ যার একহাতে থাকবে জান্নাত/ একহাতে থাকবে জাহান্নাম।/ মানুষকে বলবে ডেকে ডেকে/ আমিইতো তোমাদের খোদা মহান।/ যার দিলে থাকবে ঈমান/ হবেনা তো সে বেঈমান।/ মুমীন বলবে ডেকে ঈমান নিয়ে বুকে/ নিশ্চিত তুই দাজ্জাল।/ আজ বিশ্বের চারিদিকে মুমীন মরছে ধুকে/ একটু কি দিলে দয়া হয় না।/ ওরে কাপুরুষ ঘরে বসে ভাবছো হিসাব কষে/ এখনো তো সময় হলো না।/ মুমীনরা হয়ে যাবে মাজলুম/ গাজওয়ায়ে হিন্দ ভাঙাবে ঘুম।/ পদে পদে আসবে মসিবত/ চারিদিকে পড়বে পাপের ধুম।/ মুর্খরা গড়বে সমাজ/ উঠে যাবে ইলম ও লাজ।/ আসছে কেয়ামত রুখতে মুসিবত/ হাঁকছে আজান বিলাল।/ আসবেই মহাকাল/ রুখতে হবে দাজ্জাল!

বক্তব্যের লিঙ্ক: (https://youtu.be/LmAIN6AyRUc)

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস
তদন্তে গণকমিশনের নিজস্ব সরেজমিন
প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তাণ্ডবের সরেজমিন প্রতিবেদন

২০২১ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হেফাজতে ইসলামীর ডাকা প্রতিরোধ সভা এবং হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিএনপি-জামায়াত-শিবির-হেফাজতে ইসলাম এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তাণ্ডবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত: হিন্দু সম্প্রদায় ও জামায়াত-হেফাজতবিরোধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং মারধরের ঘটনা ঘটে। এমনকি হত্যা, লুণ্ঠন ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরের নজিরবিহীন ঘটনাও ঘটিয়েছে এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তাণ্ডবের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান–

১. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আগুনে পুড়েছে দুর্লভ বই-পুস্তক ও স্মৃতি স্মারকসমূহ। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের। ক্ষতি হয়েছে কয়েক কোটি টাকার অমূল্য সম্পদ।

২. ২৮ মার্চ ২০২১ হেফাজতের ডাকা হরতালের দিন তাণ্ডব চালানো হয়েছে অন্তত শতাধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্দির, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে।

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর হাসপাতাল সূত্রমতে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে অন্তত ১২ জন। পুলিশ সদস্যসহ আহত হয়েছে অন্তত দুই শত। এরমধ্যে প্রায় একশ'র বেশি পুলিশ সদস্য রয়েছে।

৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সদর উপজেলা ভূমি অফিসের একটি কাগজও রক্ষা পায়নি আগুন থেকে।

৫. ২৮ মার্চ হরতাল চলাকালে হেফাজত নেতা-কর্মীরা সকাল থেকে দুপুর নাগাদ জেলা পরিষদ কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন, প্রেস ক্লাব, আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তন, সদর উপজেলা ভূমি অফিস, পুলিশ লাইন, সদর থানা, খাঁটি হাতা বিশ্বরোড হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি, দক্ষিণ কালী বাড়ি, রেলওয়ে স্টেশন, শিল্পকলা একাডেমি, জেলা আওয়ামী লীগ ও সংসদ সদস্যের কার্যালয়, সরকারি গণগ্রন্থাগার, গ্যাস ফিল্ড কার্যালয়, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল-মামুন সরকারের

কার্যালয়, তার নিজের ও শশুর বাড়ি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা চৌধুরী আফজাল হোসেন নেসারের বাড়ি, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আনার, জামাল খানের বাড়ি, বিজয়নগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়ার কার্যালয়, ইউনির্ভাসিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোকতাদির চৌধুরী মহিলা কলেজ, বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসিমা মুকাই আলীর বাড়ি, মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ছাত্রলীগ সভাপতি রুবেল হোসেনের বাড়ি, সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভনের বাড়ি, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ ভাষা চত্বরের উন্নয়ন মেলা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, চৌধুরী মঞ্জিলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে।

৬. আশুগঞ্জ ও সরাইলের একাধিক স্থানে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আশপাশের ড্রেন থেকে কংক্রিটের স্ল্যাব উঠিয়ে রেললাইনে এনে রাখা হলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রেললাইন থেকে ক্লিপ খুলে ফেলা হয়। তালশহর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনের মাঝখানে একটি সেতুতেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পৌর এলাকার মূল সড়কের অনেক স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে রাস্তা আটকে রাখা হয়।

৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবেও হামলা করা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের সভাপতি দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রিয়াজউদ্দিন জামি ক্লাবে ঢোকার সময় হামলা করা হয় তার ওপর। তার মাথায় ছয়টি সেলাই লেগেছে। এছাড়া একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি মীর মো. শাহীন, ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি মাসুক হৃদয়, এটিএন নিউজের ক্যামেরাপারসন সুমন রায়, আমাদের নতুন সময়ের জেলা প্রতিনিধি আবুল হাসনাত মো. রাফি, ডেইলি ট্রাইব্যুনালের জেলা প্রতিনিধি ইফতেয়ার উদ্দিন রিফাত, লাখো কণ্ঠের মো. বাহাদুর আলম হামলার শিকার হন।

৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবিসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমস্ত স্থাপনা ও ছবি পোস্টারে ভাঙচুর-আগুন ধরিয়ে দেয়।

৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ভূমি অফিসের দূর্লভ দলিল দস্তাবেজ ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

১০. ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষাচত্বরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সম্পর্কে গণকমিশন-এর তদন্ত ও গণশুনানি

২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউজে সকাল সাড়ে ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাস সম্পর্কে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি ককাস-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'-এর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গণকমিশন-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের নেতৃত্বে গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর আহ্বায়ক জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, প্রাক্তন আইজিপি নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোট-এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান, গণকমিশন-এর সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, গণকমিশন-এর সচিবালয়ের সমন্বয়কারী কাজী মুকুল, সচিবালয়ের সদস্য মওলানা হাসান রফিক, সমাজকর্মী এসএম শহীদুল্লাহ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন, সাংবাদিক সাইফ রায়হান প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণকমিশনের গণশুনানিতে ৩৩ জন ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের নারকীয় তাণ্ডবের লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য প্রদানকারীর মধ্যে ছিলেন 'আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস'-এর সদস্য উবায়দুল মুকতাদির চৌধুরী এমপি, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আল মামুন সরকার, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এডভোকেট কাজী মাসুদ আহমেদ, জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম, ২০১৬ সালের সাম্প্রদায়িক হামলার ভুক্তভোগী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের রসরাজ দাস, জেলা নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও আশুগঞ্জ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিন সিকদার, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আইন সহায়ক কমিটির সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আইনজীবী এডভোকেট নাসির মিয়া, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন তামি, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ রহিম বিজন, জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক সাংবাদিক এডভোকেট আব্দুর নুর, জেলা আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মনির হোসেন, এডভোকেট সৈয়দ মোঃ জামাল, জেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্রী মদন মোহন চক্রবর্তীর ছোট ছেলে জীবন কুমার চক্রবর্তী, আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরের বিভাষ রঞ্জন রায়, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি দিলীপ নাগ, সাংবাদিক উজ্জ্বল চক্রবর্তী, জেলা খেলাঘর আসরের সভাপতি ডা. আবু সায়েদ, জেলা খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক নিহার রঞ্জন সরকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জেলা সভাপতি সাথী চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাবেক জেলা সভাপতি নন্দিতা গুহ, আশুগঞ্জ থেকে শাহীন শিকদার, আশুগঞ্জ থেকে সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গণের সেক্রেটারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম, ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি মাসুক হৃদয়, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট শফিউল আলম লিটন, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান রাজন, জেলা উদীচীর সভাপতি জহিরুল ইসলাম স্বপন, সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর জেলা সংগঠক এডভোকেট রাকেশ রায়, সাম্প্রদায়িক

সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এডভোকেট আবু তাহের, কালের কণ্ঠের সাংবাদিক বিশ্বজিৎ জান বাবু, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াহিদ খান লাভলু, জেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপক চৌধুরী বাপ্পি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণকমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণকারী ৩৩ জনের জবানবন্দি

১. র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সম্পর্কে গণকমিশনকে লিখিত বক্তব্য দেন–

প্রথমত; আমাদের জানতে হবে এই 'হেফাজতে ইসলাম' বলে পরিচিত লোকজন কারা? ২০১০ সালের দিকে এই দলটি গঠিত হয়েছিল মূলত কয়েকটি বড় বড় মাদ্রাসার শিক্ষক (মাদারেরস), ছাত্র (তালেবুল এলম) এবং এদের ওপর নির্ভরশীল কওমি ধারার লোকদের নিয়ে। চরমোনাইয়ের পীর, বাহাদুরপুরের পীরদের সংগঠনগুলোও এদের সাথে যুক্ত হয়। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আহমদ শফী সাহেব (যাকে যন্ত্রণা দিয়ে তারই শিষ্যগণ হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে)। তাদের সকলেই তথাকথিত ইসলামী ধারার রাজনীতির সাথে জড়িত। এদের বাইরে আরও ইসলামী ধারা রয়েছে, যারা সন্ত্রাসী অবস্থান নেয় না বলে শক্তি অর্জন করে সরকারের নজরে আসতে পারছে না, যেমন তাবলীগ জামাতের মূল ধারা– পীর মাশায়েখদের অন্যান্য ধারা। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাসমূহে (১) জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না (এবং এরা জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন চায়) (২) এরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে না (চাঁদ তারা মার্কা পতাকা চায়) (৩) এরা জাতীয় দিবসসমূহ পালন করে না (৪) এরা বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে (৫) এরা বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে গ্রহণ করে না (৬) এরা শাসনতন্ত্র (সংবিধান) মানে না (৭) এরা সর্বোপরি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মানে না (কেননা এদের প্রধান স্লোগান হচ্ছে 'হাইয়া আলাল জিহাদ'– জিহাদের জন্য এগিয়ে আসো এবং (৮) এদের বাইরে যারা আছেন তারা কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, নাস্তিক ইত্যাদি বিধায় তাদের হত্যা করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, অগ্রগতির বিপক্ষের সকল ডান-বাম তাদের বন্ধু। ইসলামে তাদের আবির্ভাব হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় থেকেই। উত্তরাধিকারসূত্রে এরা খারেজি (পথভ্রষ্ট ইসলামি একটি গোষ্ঠী) যারা হযরত আলী ও আমর ইবনুল আস-কে হত্যা করেছিল। মুয়াবিয়াকে হত্যাচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিল। এরা এই তিনজন খ্যাতিমান সাহাবীকে হত্যা করা বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল, যেমন করে হেফাজতিরা অন্য মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ বলে ডিক্রি (ফতোয়া) দিয়ে থাকে। হেফাজতিদের এই প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পরপরই আমরা ২০২১ সালের ২৬-২৮ মার্চ-এর ঘটনাবলীতে যেতে চাই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর আগেও বাংলাদেশে এসেছিলেন। তখন কিন্তু এতটা গুরুতর কিছু ঘটেনি। তাহলে এবার কেন ঘটল? বস্তুত; মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কোনোটাই হেফাজতপন্থীরা মেনে নেয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখুন

এরা মুজিব জন্মশতবর্ষ প্রতিপালন থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। এক মুহূর্তের জন্য তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি শতবর্ষ পালনের। অনুরূপ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও ওরা প্রতিপালনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। মোদির বাংলাদেশে আগমন তাদের হাতে সুযোগ এনে দেয় (বস্তুত; তারা এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে)।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ ছিল শুক্রবার। মসজিদগুলোর (বিশেষত বায়তুল মোকাররম মসজিদ) জুমার নামাজের সমাবেশের সুযোগ নিয়ে, বিভিন্ন মিথ্যাচার ও ভন্ডামির আশ্রয় নিয়ে তারা এক তাণ্ডব চালায়। সেকেন্ডে এই তাণ্ডবের সাথে মিলে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে তার অনুবৃত্তি ঘটায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও এক ব্যাপক তাণ্ডবকর্ম পরিচালনা করে। বস্তুত; স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ছিল ওদের টার্গেট। ওরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় (কখনও স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে এমন উদাহরণ কেউ খুঁজে পাবে না)। তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ওরা সহ্য করতে পারেনি। তাই যেখানে যেখানে সম্ভব ওরা 'হাইয়া আলাল জিহাদ' শ্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হচ্ছে তাদের প্রধানতম কেন্দ্র। কেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া? ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ যে নারকীয় তাণ্ডব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার আলোকে বিচার করতে হবে, কেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২০২১ সালের ২৬ মার্চ শুক্রবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয় তার প্রাথমিক সমাপ্তি ঘটে জুমার আগে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেওয়া ছিল অন্যতম অনুষ্ঠান। দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিট থেকে ১টা এই সময়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় 'মলয়া সংগীতের' আসর বসবে। স্বাধীনতাপ্রেমী সকল মানুষই জুমা, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদি কারণে মাঠে অনুপস্থিত। এমনই সময়ে বেরিয়ে আসে হেফাজতি দানবেরা। প্রত্যেকের হাতে লাঠিসোটা এবং ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না পুলিশ বলতে পারবে। তাদের নেতৃত্বে বড় মাদ্রাসার বড় বড় মানুষেরা। মাওলানা সাজিদুর রহমান (হেফাজতের নায়েবে আমির), মাওলানা মোবারকউল্লাহ (জেলা হেফাজতের নেতা) প্রমুখ (ভিডিও ফুটেজ পুলিশকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে)।

প্রথমে ওরা হামলা করল রেলস্টেশনে (কেন রেল স্টেশন? আমাকে একজন বলেছেন যে, এতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ হয় সহজে)। পুরো রেলওয়ে স্টেশন পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। সিগন্যাল সিস্টেম, কম্পিউটারাইজড টিকিটিং সিস্টেমসহ পুরো স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হলো (২০১৬ সালে ওরা এমনটি করেছিল। এজন্য তাদের আইনের আওতায় আসতে হয়নি, কেন?)। তারা শহরের কেন্দ্রস্থলে থানা ও বড় মাদ্রাসা বলে পরিচিত জামিয়া ইউনুছিয়ার নিকটবর্তী বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে আক্রমণ চালায়। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ও অন্য আরেকটি বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিনষ্ট করা হয়। পৌরসভায় আক্রমণ চালানো হয়। আরেক দল এসপি অফিস, ২নং পুলিশ ফাঁড়ি, ফাঁড়িতে কর্মরত একজন ইন্সপেক্টরকে প্রাণঘাতী আক্রমণ করে আহত করে, জেলা

মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সিভিল সার্জনের অফিস, সার্কিট হাউসে সমবেত মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাগণের ওপর, সার্কিট হাউসের গাড়ির ওপর, পার্শ্ববর্তী জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, ডিজিএফআই-এর কয়েকজন কর্মকর্তার মোটরসাইকেলে আক্রমণ করে। পরপরই তারা জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের বাসভবনে আক্রমণ করে। এই বাসভবনগুলোর পাশেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের জেলা স্মৃতিসৌধ। ভোরে সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের জনগণ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছিল, উচ্ছৃঙ্খল হেফাজতিরা সকল পুষ্পস্তবক মুড়িয়ে তছনছ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি যেখানে পাওয়া যায় সবই ভেঙে ফেলা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অসহায় দর্শকের মতো শুধুই দেখে গেছে। কোথাও প্রতিহত করার চেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এরইমধ্যে হেফাজতি দুষ্কৃতিকারীরা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় গুলিতে মিথ্যা মৃত্যুর গুজব। জনগণের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত মসজিদগুলোতে 'হাইয়া আলাল জিহাদ' ধ্বনি হতে থাকে। ইতোমধ্যে এদের সাথে যুক্ত হয় বিএনপি কর্মী, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং জামাতে ইসলামীর লোকজন। ২৬ তারিখ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হেফাজতি দুষ্কৃতিকারীরা এক অবর্ণনীয় দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক তাণ্ডব। গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশের কোনো রাস্তা খোলা না থাকায় (প্রশাসন ও দলের বন্ধুদের পরামর্শে) আমি শহরে আসতে পারিনি।

২০২১ সালের ২৭ মার্চ শনিবার সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিতে আমি শহরের প্রবেশ করি। সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচিতে অংশ নেই। এখানেও ২৬ মার্চ হামলা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ফুলের বাগান বিনষ্ট করা হয়। ভেতরে ভাঙচুরের অপপ্রয়াস হয়। তারপরও আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান করি। পরপরই সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে যাই। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেয়র, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করা হয়। বিকাল ৪টায় জেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভার আয়োজন ছিল পূর্ব থেকেই।

পৌর মিলনায়তনে আমরা সমবেত হই ৪ টার সময়। আলোচনা সভাকে প্রতিবাদ সভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানে আমাদের জেলা নেতাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে, সভা শেষে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হবে। যথারীতি সভা হয় এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। একেবারেই শান্তিপূর্ণ মিছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা এবং স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান দিয়ে মিছিলটি দক্ষিণ কালিবাড়ী মোড়ে পৌঁছলে আমি মিছিল থেকে বের হয়ে যাই। মিছিলটি সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেলক্রসিংয়ে গিয়ে শেষ হয়। আমরা যখন দক্ষিণ কালিবাড়ী মোড়ে তখন আমাদের থেকে অনেক দূরে মাদ্রাসা রোডের মোড়ে কিছু ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে বলে আমরা শুনেছি। যার সাথে আমাদের মিছিলের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই নিয়ে ২০১৬ সালের মতোই মাদ্রাসাওয়ালারা মিথ্যাচার করা শুরু করে এবং আজগুবি সব কথাবার্তা বলে। এখানেও তারা 'হাইয়া আলাল জিহাদ' ঘোষণা দেয় মাদ্রাসা মসজিদ থেকে বড় বড় মাওলানাদের উপস্থিতিতে।

মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী এলাকাটি বিএনপির ঘাঁটি বলে পরিচিত। মাদ্রাসাওয়ালা ও বিএনপি মিলে মাদ্রাসা আক্রমণের মিথ্যা প্রচার চালাতে থাকে এবং মুরতাদ ছাত্রলীগ-যুবলীগদের হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাতে থাকে মসজিদের মাইকে।

আমাদের মিছিল কিন্তু বেশ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তারপরও আমাদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হয়। ডাহা মিথ্যাচার যেহেতু পার পেয়ে যায় না, সেহেতু তারাও মিথ্যাচারে দাঁড়াতে পারেনি। একই সময়ে মূল শহর থেকে অনেক দূরে কুমিল্লা-সিলেট-ঢাকা সড়কের সংযোগস্থলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে উচ্ছৃঙ্খল হেফাজতি, ছাত্রদল যুবদলের সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়। এদের কেউ মাদ্রাসা পড়ুয়া নয়। এই অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয়রা বসে সিদ্ধান্ত নিই যে, ২৮ তারিখ হরতালের দিন আমরা প্রতিরোধ করব না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। সিদ্ধান্তের পর আমি গ্রামে চলে যাই। আমাদের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকারের মানুষদের সাথে বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে সরকারি পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, হরতাল আহ্বানকারী হেফাজতিরা ধ্বংসাত্মক কিছু করবে না। আমাদেরও কোনো সমাবেশ না করতে অনুরোধ করা হয়। সে-মতে, আমাদের সাংগঠনিক কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই হরতালের মুখোমুখি হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২০২১ সালের ২৮ মার্চ, রবিবার সত্যিই এক নারকীয় দিন। মৃত্যুর মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মাদ্রাসা ও হেফাজতওয়ালারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। ছাত্রদল, যুবদল, দলত্যাগী দুষ্কৃতিকারী দল, হেফাজতি দানব মিলে সারাশহরে এক বাধাহীন নারকীয় তাণ্ডব চালায়। ১৪৪ ধারা বা কারফিউ কোনো কিছুরই আশ্রয় নেওয়া হলো না। ওদের নেতা সাজিদুর রহমান, মোবারক উল্লাহর আশ্বাসের ওপর ভরসা করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা পৌরসভায় আগুন দিল, জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আগুন দিল। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেউ সহায়তায় আসেনি। অদূরেই ফায়ার সার্ভিস, এক ফোঁটা পানিও তারা ছিটায়নি। সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও তারা সাহায্য করতে অপারগতা জানায়। পুড়িয়ে দেওয়া হলো উন্নয়ন মেলা, শিল্পকলা একাডেমি, আল মামুন সরকারের অফিস। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। অনেক সংস্কৃতি সংগঠনের অফিস ভাঙচুর হয়েছে। পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকারের পৈতৃক বাড়ি, ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল হোসেন রুবেলের ভাড়া বাসা, সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন সুমনের পৈতৃক নিবাস। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গন, সদর উপজেলা ভূমি অফিস, সরকারি গণগ্রন্থাগার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস, মেয়রের বাসভবন, আনন্দময়ী কালীবাড়ি, বিজিসিএল-এর ১ নম্বর লোকেশন ও সেখানে রাখা গাড়ি, জেলা আওয়ামী লীগের তথা সংসদ সদস্যের অফিস ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। যাদের বাড়িঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হয়েছে তারা সাহায্য চেয়েও কোনো সাহায্য পাননি। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

এতসব ঘটনার পরও দুষ্কৃতিকারীদের নেতা সাজিদুর রহমান, মুবারক উল্লাহ বা অন্য মিথ্যা গুজব সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় কেন আনা হচ্ছে না? সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে আমরা নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করছি–

১) ২৬ তারিখ রেল স্টেশনকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার দায় কার? বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে হামলা ও বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুরের দায় কার? মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ও পৌর মার্কেটের সামনের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ও পৌরসভা ভবন ভাঙচুরের জন্য দায় কার? স্মৃতিসৌধে অর্পণ করা পুষ্পস্তবক পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার দায় কার? এসপির অফিস, ২নং পুলিশ ফাঁড়ি, সার্কিট হাউস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা মৎস্য অফিস, সিভিল সার্জন অফিস, জেলা জজের বাসভবন, ডিসি-এসপি-এর বাসভবন ডিজিএফআই কর্মকর্তাদের মোটরসাইকেল ও সার্কিট হাউসের নারী সমাবেশে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের জন্য দায় কার? এই দিনও ভাঙচুরের সময় হেফাজত নেতা মোবারক উল্লাহ ও সাজিদুর রহমানসহ অন্যদের ভূমিকা কী ছিল? ছাত্রদল, যুবদল, জামাত ও বিএনপির এবং আওয়ামী লীগ ত্যাগকারীদের ভূমিকা ইত্যাদি যাচাই হওয়া দরকার। মাদ্রাসা ও হেফাজত নিয়ন্ত্রিত মসজিদ থেকে 'হাইয়া আলাল জিহাদ' এবং হাটহাজারী ও ঢাকায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর অপপ্রচার কেন চালানো হয়েছিল, কারা চালিয়েছিল তা বের হওয়া দরকার।

২) ২৭ তারিখে পুলিশের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে অনেক দূরে (প্রায় ২০ কিমি) খাটিহাতা ও নন্দনপুর এলাকায় যে সংঘর্ষ হয়, তার কার্যকারণ খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভা ও প্রতিবাদ মিছিল আদৌ কোনো বিরূপতার কারণে হয়েছিল, না-কি ছাত্রদল, যুবদল, ছাত্র অধিকার পরিষদ, জামাত-বিএনপির পূর্ব পরিকল্পনার কারণে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সময়ে পুলিশের ভূমিকা কি ছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার।

৩) ২৮ তারিখ যে সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হয় শহরব্যাপী, এর দায় কার? পৌরসভা পুড়িয়ে দেওয়া, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বর পুড়িয়ে দেওয়া ও ব্যাপক ভাঙচুর, আওয়ামী লীগের জেলা সাধারণ সম্পাদকের সামাজিক কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া, জেলা শিল্পকলা একাডেমি পুড়িয়ে দেওয়া, আওয়ামী লীগ ও সংসদ সদস্যের কার্যালয় ভাঙচুর করা, আনন্দময়ী কালীবাড়িতে দেবীর স্বর্ণালংকার লুটপাট করা, উপজেলা চেয়ারম্যান নাসিমা মুকাই আলীর বাড়িতে হামলা, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, উপজেলা ভূমি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ভাঙচুর করা এবং মেয়র নায়ার কবিরের বাসায় ভাঙচুর করার দায় কার?

হরতালের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আল মামুন সরকারের বাসভবন পুড়িয়ে দেওয়া, তার শ্বশুর বাড়িতে ভাঙচুর, ছাত্রলীগ সভাপতি রবিউল হোসেন রুবেলের বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন শোভনের পৈতৃক বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া, আওয়ামী লীগ

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল বারি মন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুল হক খোকনের বাসভবনে আক্রমণ, প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা নেসার চৌধুরীর বাসভবনে আক্রমণ, মোকতাদির চৌধুরী মহিলা কলেজে ভাঙচুর ইত্যাদির জন্য দায় কার? যখন পুরো শহর পুড়ছিল তখন দমকল বাহিনীর নিকট থেকে এক ফোঁটা পানিও বের হয়নি এজন্য দায় কার? আক্রান্তরা চেষ্টা করেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতদের নিকট থেকে কোনো সাহায্য-সহায়তা পাননি। কেন? দায় কার? দেশের বৃহত্তম গ্যাস ফিল্ড বিজিএফসিএল-এ হামলার দায় কার? বাখরাবাদ গ্যাসের সাপ্লাই বন্ধ করার মতো নাশকতার দায় কার?

৪) আমরা মনে করি উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতে ও ভবিষ্যৎ নিরাপদ অবস্থান সৃষ্টি করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন। এই দাবি আমরা উত্থাপনও করেছি জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। অধিকন্তু ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে হেফাজতের যে তাণ্ডব হয়েছিল তাও বিচারের আওতায় আনা দরকার।

৫) জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা এবং 'হাইয়া আলাল জিহাদ' ইত্যাদি প্রশ্নে একটি জাতীয় কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। হেফাজতিরা কেন এসবের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের করণীয় কি হওয়া উচিত তাও নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন।

৬) বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও জাতীয় কমিশনের পাশাপাশি চলমান ফৌজদারি কার্যক্রমও অব্যাহত রাখতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বৃহৎ মাদ্রাসাগুলোকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি হেফাজতবিরোধী ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানের আলোকে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সরষের মধ্যে ভূত খুঁজে বের করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ক্ষেত্রে তথাকথিত আলেমদের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

২. মো. মনির হোসেন, পিতা আব্দুর রহিম, বয়সঃ ৩১ জন্মঃ ১৯৭৮ ডিসেম্বর মাসে, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পেশাঃ শিক্ষক এবং সাংবাদিক।

মো. মনির হোসেন বলেন, আমি স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসবাস করছি ৩০ বছর ধরে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছি, দেশ রূপান্তরে কাজ করি। সর্বশেষ তাণ্ডব লক্ষ্য করেছি ২০২১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরের পর থেকে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে। এদিন দুপুরের পর থেকেই আমি আনন্দ বাজারে ছিলাম হঠাৎ শুনলাম শহর উত্তপ্ত। লোকজন ছুটাছুটি করছে। আমি জুমারলাল মোড়ে এসে দেখি মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াচ্ছে। আমি কমপ্লেক্স এর সামনে দেখেছি হামলাকারীরা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল এবং ছবি ভাঙচুর করছে। রেলস্টেশনে ভাঙচুর করতে দেখেছি। মোকতাদির সাহেবের ঐদিন অনুষ্ঠান ছিল, তিনি অনুষ্ঠানে ছিলেন। আমি নিজে দেখেছি মানুষকে মারছে, আগুন লাগাচ্ছে। আমি পরে ভিডিওতে জেলা সুপারের ডাকবাংলো, পুলিশ সুপারের কার্যালয় জ্বলতে দেখেছি। আমি পরবর্তীকালে জায়াগুলো পরিদর্শন করেছি। আমি ভিডিওতে দেখেছি মাদ্রাসার শত শত লোক ছিল। ভিডিওতে যা ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

আগামী ৩০ বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ আরো ভুগবে। তাণ্ডবকালীন বিভিন্ন পুরাতন দলিল ও রেকর্ড পুড়িয়ে দিয়েছি হামলাকারীরা। সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁর অফিসটি এইবার নিয়ে দু'বার ভাঙচুর করে। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এর পুরাতন চিঠি সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিস ধ্বংস করে। সদর উপজেলার সকল রেকর্ড সেখানে ছিল। আগুন লাগানো ভূমি অফিস থেকে কোনো কাগজ উদ্ধার হয়নি। আমি যখন ভূমি অফিসে যাই দেখি শতভাগ পুড়ে গেছে। ২৭ তারিখে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ অফিসের অনুষ্ঠান ছিল। আওয়ামী লীগের মিছিলও বের করলে পিছন থেকে জিহাদ জিহাদ বলে চিৎকার করতে থাকে। নন্দনপুর, সুহিলপুর, বুধল, ভাঙচুর করে। পুলিশ বাহিনী এক পর্যায়ে চরম অসহায় হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার সন্তান ৯৯৯ নম্বরে বার বার ফোন দিয়েও কোনো সাড়া আসেনি। তারা আমার বাড়িতেও হামলা করতে চেয়েছিল।

৩. মো. শাহিন শিকদার, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আশুগঞ্জ উপজেলা ও সাধারণ সম্পাদক, আশুগঞ্জ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা।

শাহিন শিকদার লিখিত বক্তব্যে বলেন, কোনোরকম উস্কানি ছাড়াই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাজুড়ে হেফাজত, জামায়াত-বিএনপি নারকীয় তাণ্ডব চালায়। ২০২১ সালের ২৬ মার্চের আগে থেকেই তারা গোপনে গোপনে সংগঠিত হতে থাকলেও এ বিষয়ে পুলিশ ও বিভিন্ন এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবহিত করলেও তারা কোনো কর্ণপাত করেনি। এর দু'দিন পর ২৮ মার্চ ভোর ৫ টায় থেকে আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপি-জামায়াত হেফাজত নেতারা বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা থেকে এসে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে আশুগঞ্জ গোল চত্বর, রেলগেট, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন গেট ও আশুগঞ্জ থানার সামনে টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধ করে রাখে এবং সরকারবিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতারা বিভিন্ন গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে তাদের সমর্থকদের এনে একসাথে জড়ো হয়ে আশুগঞ্জ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু টোল প্লাজা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং হাইওয়ে রোডে অবস্থিত জাতির জনক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংবলিত বিভিন্ন তোরণ ব্যানার-ফেস্টুন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে এবং আশুগঞ্জ বাজারের কাচারি বীথিকায় অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি লোহার রড, শাবল দিয়ে ভাঙতে থাকে। এ বিষয়ে আমি আশুগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জকে ফোন করলে তিনি সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থানা থেকে পুলিশকে বাহিরে যাওয়ার নিষেধ আছে বলে জানান। এরই মধ্যে খবর পেয়ে আশুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী সফিউল্লাহ মিয়া একটি অটোযোগে রেলগেইট এসে উপস্থিত হন, এর অল্প সময়ের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু নাসের আহমেদ ১৫-২০ জনের একটি মিছিল নিয়ে গোলচত্বর দিক

থেকে রেলগেইটে এসে উপস্থিত হন, তারও অল্প সময়ের মধ্যে আশুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হানিফ মুন্সি মোটরসাইকেল যোগে রেলগেইটে এসে উপস্থিত হন। খবর পেয়ে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা রেলগেইট এলাকায় উপস্থিত হন। বিএনপি-জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা সোহাগপুর, দুর্গাপুর, বাহাদুরপুর, খড়িয়ালা, বগুইর, মৈশার এলাকায় বিভিন্ন মসজিদের মাইকে ঘোষণা করতে থাকে যে, 'আওয়ামী লীগ তার লোকজন নিয়ে বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় হামলা করছে আপনারা তৌহিদী জনতা ঈমানী দায়িত্ব পালন করুন এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করুন।

হামলার সময় আমাদের যুবলীগ, ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন। এক পর্যায়ে আমি, আশুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মো. ছফিউল্লা মিয়া, উপজেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ম-আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু নাছের আহমেদ, হেবজু মিয়া, আওয়ামী লীগ সদস্য জাকির হোসেন বাদল, আওয়ামী লীগ সদস্য তোফায়েল আলী রুবেল সিকদার, যুবলীগ নেতা ইলিয়াস একটি ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পরি। তারা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু নাসের আহমেদের বাসভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে এবং তার পরিবারকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাঁচ কিলোমিটার এলাকা আশুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় হেফাজতে ইসলাম পাঁচটি কওমি মাদ্রাসা পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যে কোনো সময় ঠুনকো অজুহাতে তারা হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্রকে রাস্তায় নামিয়ে তাণ্ডব চালায়। এখানে গাওয়া হয় না জাতীয় সঙ্গীত, সম্মান প্রদর্শন করা হয় না জাতীয় পতাকাকে। কওমি মাদ্রাসাগুলো সম্পূর্ণ পাকিস্তানি ভাবধারায় পরিচালিত হয়।

৪. সাজিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটি

সাজিদুল ইসলাম বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ শুক্রবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের পার্টি সারাদেশে প্রত্যেকটি জেলায় জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকার মিছিল করার কথা ছিল। এদিন বিকাল ৪টায় আমরা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিলাম। বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে সময় দেখলাম ঝড়ের বেগে একটি মিছিল দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসছে। তার আগেই রাস্তায় থাকা হকার, দোকানের মালিকরা ছুটোছুটি করছে এবং তাদের বন্ধ করে দিয়েছে। মিছিলের প্রথম ভাগে প্রায় ২০/৩০টি শিশু যাদের বয়স ১০-১৩ বছর, বাকীরা ২০-৩০ বছর বয়সী। সবার হাতে ছিল দেশীয় অস্ত্র। সবাই সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের নেতাকর্মীদের প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় তলায় পাঠিয়ে আমরা ৪-৫ জন নিচে অবস্থান করি। আমাদের সম্মুখ দিয়ে মিছিল দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যায়। রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি রাস্তায় যা পেয়েছে মিছিলকারীরা তাই ভাঙচুর করে।

প্রেস ক্লাবের সামনে চা'র দোকানদার, জুতা পালিশওয়ালাসহ যারা আমাদেরকে চেনে সবাই বলছেন আজ যেন আমরা মিছিলটা না করি। আমাকে যারা অনুরোধ

জানিয়েছেন তারা সবাই আমাদের পরিচিত ও শুভাকাঙ্খী। যে সকল সাধারণ মানুষ আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছে সবাই বলছেন কাউতলী পুলিশ ফাঁড়ি, জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, রেলস্টেশন, সিভিল সার্জন অফিস, মৎস্য অফিস ও জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে থাকা অনেক গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গণপূর্ত ভবন, সড়ক ভবন, টিএনটি অফিস ভাঙচুর করে। পুলিশ ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে পথচারীরা জানায়– প্রেস ক্লাব, সদর হাসপাতাল, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস, মুক্তিযোদ্ধা ভবন, কুমারশীল মোড়ের মত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছিল আমাদের অবস্থান, সেই সমস্ত এলাকায়ও একজন পুলিশ বা কোন নিরাপত্তা কর্মী চোখে পরেনি। তারপর পাইকপাড়াস্থ পার্টি অফিসে সুবর্ণজয়ন্তীর আলোচনা শেষে রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে যখন বাসায় যাই, শহর প্রায় জনমানবহীন, ঔষধের দোকান সহ সকল দোকানপাট বন্ধ, হকাররা তো বিকাল ৪টায় শহর ছেড়েছে, ফলে আমি এবং আমার ২/৪ জন ছাড়া শহরের রাস্তায় আর কেউই নেই। শহর যেন ভূতের গলির রূপ ধারণ করেছে। ২৬ মার্চ কাউতলী ২নং পুলিশ ফাঁড়ি পোড়ানোর সময় পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সন্ধ্যায় বিশ্ব রোডের পাশে নন্দনপুরে হেফাজতের নেতৃত্বে বিজিবির গাড়ি শহরে আসার সময় অবরোধ করেছে মৌলবাদী গোষ্ঠী। সেখানে দীর্ঘ সময় বিজিবির সাথে হেফাজতের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এক পর্যায়ে বিজিবি গুলি করতে বাধ্য হয়। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে ৫ জন। এই পরিস্থিতিতে হেফাজতের সাথে সাধারণ মানুষ যুক্ত হয়। ৫ জন মৃতের মধ্যে ৪ জন সাধারণ মানুষ এবং একজন হেফাজত কর্মী। রাত থেকেই শহরে র‍্যাব, পুলিশ ও বিজিবির অবস্থান ছিল শক্তিশালী।

২০২১ সালের ২৭ মার্চ শহরে সারাদিন থমথমে অবস্থা থাকলেও কোনো প্রকার অঘটন ঘটেনি। জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা একাধিকবার মিছিল করার চেষ্টা করলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান শক্ত থাকায় মিছিল করতে ব্যর্থ হয়। বিকাল সম্ভবত ৪টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সাংসদ র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নেতৃত্বে টি.এ রোডে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার সামনে গেলে হেফাজতের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তখন মাদ্রাসা থেকে মাইকে অনেক অপপ্রচার করা হয়। ছাত্রলীগ মাদ্রাসা ভেঙ্গে ফেলেছে, অনেক মাদ্রাসার ছাত্র শহীদ হয়েছে। কাজেই এখন ছাত্রলীগের রক্ত হালাল প্রভৃতি। এইভাবে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে উত্তেজিত করেছে। সরকারি মাইকে প্রচার করা হয় রাত্র ৯ টার মধ্যে শহর ছেড়ে যার যার বাসায় চলে যেতে হবে।

২০২১ সালের ২৮ মার্চ সকাল থেকে হেফাজত কর্মীরা মাঠে নামে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তাদের দখলে নিয়ে যায়। সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয় ভয়ানক তাণ্ডব। শহরের তাণ্ডবে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। হেফাজতের সাথে যুক্ত হয় হেলমেট, প্যান্ট শার্ট পড়া যুবক, বয়স ২০/৩০ হবে, তাদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ৫০ থেকে ১০০ জন। ৪/৫টা ভাগে বিভক্ত, তাদের হাতে গান পাউডারের কৌটা দেখা গেছে। সেদিন পৈরতলা বাসস্ট্যান্ডে থাকা বিজিবি ও পুলিশ লাইনে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী

হামলা চালালে গুলি চালায় বিজিবি ও পুলিশ। তখন সেখানে একাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। পুলিশ সুত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হতাহতের সংখ্যা মোট ১৩ জন।

৫. এডভোকেট কাজী মাসুদ আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

কাজী মাসুদ বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে নানান আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠান জুম্মার নামাজের আগেই শেষ হয়। নামাজের সময় থেকেই হেফাজতিরা গুজব রটায় ঢাকায় ৭ জন মারা গেছে। এরপর ২ টা ৩০ থেকে ৩ টার সময় হেফাজতিরা তাণ্ডব শুরু করে। রেলস্টেশন পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সিগনাল, ক্রসিং গেট ভেঙ্গে দেয়। জেলা পরিষদ মিলনায়তন, ২ নং পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে রাখা সকল গাড়ি, মোটর সাইকেল, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৎস্য অফিসে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা পরিষদ ভবন, বিটিসিএল এর কার্যালয়, পৌরসভা, ইন্ডাস্ট্রিয়েল এলাকায় উন্নয়ন মেলা, বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সকল পোস্টার ব্যানার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। শহরের দক্ষিণ দিকে বিয়াল্লিশ্বর থেকে ভাদুঘর পর্যন্ত কুমিল্লা সিলেট সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে রাখে। শহর বাইপাস সড়কের পীর বাড়ির মোড়ও অবরোধ করে রাখে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিভাতে কোথাও যায়নি।

অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার বিভিন্ন গ্রুপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনেক পেজ গ্রুপ থেকে গুজব ছড়ানো শুরু করে। সংগঠনগুলো হচ্ছে– আলোকিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সেবার লক্ষ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্য মোদের জনের সেবা, কওমি ব্লাড গ্রুপ, ব্লাড ফর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিএনপি লাইন ফিফটিন গ্রুপ। ২০২১ সালের ২৭ মার্চ হেফাজতের আমির সাজিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি মুবারক উল্লাহর নেতৃত্বে হরতালের সমর্থনের একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরে বের হয়। দুপুর ৩টায় শহরের উত্তর পাশে নন্দনপুর বিশ্বরোড, সুহিলপুর হেফাজত-জামায়াত, সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদ ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক অবরোধ করে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। তারা গুজব ছড়াতে থাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মাদ্রাসায় আক্রমণ করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপর অবরোধকারীরা আক্রমণ করে। তাদের গুলিতে অবরোধকারীদের মধ্যে ৪ জন মারা যায়। এদের মধ্যে একজন সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য ছিল।

এদিকে, আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে অনুমানিক বিকাল ৫টায় শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। শহরের টিএ রোড থেকে মাদ্রাসা রোড অতিক্রম করার সময় মিছিলের শেষাংশের সাথে মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। তখন মাদ্রাসার মাইকে প্রচার করে– 'ছাত্রলীগ মাদ্রাসায় আক্রমণ করেছে,

ছাত্রলীগ মুরতাদ, ছাত্রলীগকে হত্যা করা ওয়াজিবুল কতল, তৌহিদি জনতা এখন রক্ত দেওয়ার সময় হয়েছে– এই সমস্ত কথা প্রচার করে মাদ্রাসাকে রক্ষার জন্য আহ্বান জানান। তখন আগে থেকেই প্রস্তুত কওমি মাদ্রাসা ছাত্র, ছাত্রদল-যুবদল-সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা আওয়ামী লীগের মিছিলে হামলা করে।

আওয়ামী লীগের মিছিলের পিছনের অংশটি শহর খানের ব্রিজটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে মঠের গোড়ায় চলে আসে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যদিও তাদের সংখ্যা আক্রমণকারীদের তুলনায় নগণ্য। অপরাংশ দক্ষিণ দিকে কালীবাড়ি মোড়ে চলে যায় এবং মিছিল শেষ করে যার যার মত করে কালীবাড়ি মোড় ত্যাগ করে। ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হেফাজতের জেলা আমির সাজিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুবারক উল্লাহর নেতৃত্বে হরতালের সমর্থনে সকালে মিছিল বের হয়। মিছিল বের হওয়ার ১০-১৫ মিনিট পর থেকে শহরে নারকীয় তাণ্ডব শুরু হয়। পৌরসভা ভবন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তন, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ ভাষা চত্বর, ভাষা চত্বরে অবস্থিত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কার্যালয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন, সদর উপজেলা ভূমি অফিস, জেলা ক্রীড়া সংস্থা অফিস, আল মামুন সরকারের বাড়ি ও শ্বশুরের বাড়ি, ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল হোসেন রুবেল ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভনের বাড়ি, যুবলীগের এক নেতার মুরগীর ফার্ম, ৫৮টি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে। বিশ্বরোডে হাইওয়ে থানায় আক্রমণ করে থানা কলাপসিবল গেইট, জানালায় গ্রিল ভাঙ্গার চেষ্টা করে। তখন হাইওয়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে একজন মারা যায়।

আশুগঞ্জে টোলপ্লাজা ভাঙচুর করে হামলাকারীরা। আশুগঞ্জ উপজেলা সমিতির যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু নাছের, তার ভাই, চাচাসহ তাদের বহুতল ভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। আশুগঞ্জের কাচারী পাড়ের বঙ্গবন্ধুর বিশাল ছবির একটি ম্যুরাল ছিল, এটি হেফাজতিরা ভাঙচুর করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানা দিনভর ঘেরাও করে রাখে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদককে মাদ্রাসা থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে তার বাড়ি আক্রমণ করবে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে ফোন করলে তার ফোন রিসিভ করেননি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাকে আশ্বস্ত করেছে কিছুই হবে না।

২০২১ সালের ২৯ মাচ সকালে জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্যরা পুরো শহর ঘুরে ঘুরে দেখেন শহরের বিভৎস দৃশ্য। দেখা যায়, আগুন জ্বলছে সঙ্গীতাঙ্গনে। শাহাদৎ হোসেন শোভনের বাড়িতে যাওয়া লোকজন বলছিল ২৭ তারিখ রাতেই তার বাড়ির লোকজন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ২৮ মার্চও শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিল। নারকীয় তাণ্ডব শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। কোথাও কোনো সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনি আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী। কোনো কোনো জায়গায় আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্যও পুলিশ মুভ করেনি। হেফাজত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৬-২৮ মার্চ তাণ্ডব চালিয়ে ৩১

মার্চ সংবাদ সম্মেলন করে জেলার সমস্ত ঘটনায় স্থানীয় এমপি উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর উপর চাপিয়ে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার জন্য প্রথমে স্থানীয় এমপি উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে দায়ি করে। মন্ত্রী ও হেফাজতের বক্তব্য মিলে যাওয়ার রহস্য কি? ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার কেন এখনও সাজিদুর রহমান এবং মুফতি মুবারক উল্লাহকে গ্রেপ্তার হচ্ছে না? প্রশাসনকে এমন প্রশ্ন করা হলে বারবার উত্তর দিচ্ছে– তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ হবে তখনই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাহলে কি দাঁড়ালো? হেফাজতের আমির সাজিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোবারক উল্লাহর বিরুদ্ধে এখনও অপরাধ প্রমাণত হয়নি? সংসদ সদস্য র.আ.ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর ডিজিটাল নিরাপত্তার এজাহার করেন। এখনও এজাহারটি প্রাথমিক তথ্যবিবরণী হিসেবে রেকর্ড হয়নি। পুলিশ প্রশাসন বলছে তারা যে বক্তব্যটি দিয়ে মোকদ্দমা করেছে, সেই পেজ ডিসেবল করে ফেলেছে। যদিও এখনও অনেক পেজে উক্ত বক্তব্য প্রচার হচ্ছে। ডিজিটাল মাধ্যমে অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি বড় ধরনের প্রচার আছে হেফাজতের সঙ্গে সরকারের সমঝোতা প্রক্রিয়া চলছে। এই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় হেফাজতের জেলা আমির সাজিদুর রহমান ও মুফতি মুবারক উল্লাহ আছেন বিধায় তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না।

৬. এডভোকেট আবদুর নূর, আহ্বায়ক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আবদুর নূর বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরোধিতা করে আসছিল মৌলবাদী সংগঠন হেফাজতে ইসলাম। এরই ধারাবাহিকতায় সুবর্ণজয়ন্তীর দিন ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাদ জুমা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যেই ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের বাঁধার সম্মুখীন হয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনার সত্য মিথ্যার মিশেলে ভুল বার্তা দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও তাদের অনুসারীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর প্রেক্ষিতে হেফাজতের তাণ্ডবে লণ্ডভন্ড হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জল জনপদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহর।

তিনদিন ধরে চলা তাণ্ডবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি স্থাপনা। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শহরবাসী যখন মধ্যহ্ন বিরতিতে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে ঠিক তখনই মৌলবাদী হেফাজতিরা কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকর ভাদুঘর সিরাজিয়া মাদ্রাসার সামনের রাস্তায় টায়ারে আগুন দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সূত্রপাত করে। হেফাজতিরা প্রথম ভাদুঘর থেকে সংঘটিত হয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে শহরের দিকে এগুতে থাকে। আনুমানিক ৩টা/সাড়ে ৩টার দিকে জেলা শহর থেকে একদল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী আখাউড়ার স্থলবন্দরের সংবাদ কাভার করার জন্য যাবার পথে প্রথমে হেফাজতিদের বাঁধার সম্মুখীন হন। অশোভন আচরণসহ তাদের বাঁধার কারণে সংবাদকর্মীরা আখাউড়ায়

যেতে না পেরে ওখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এরই মধ্যে হেফাজতীদের দুর্গ খ্যাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিপাড়ায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকদের নেতৃত্বে রাস্তায় নেমে এসে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে অংশ নেয়। ভাদুঘর সিরাজিয়া মাদ্রাসা এবং শহরের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মিলে এসে একইদিন বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে পূর্ব পরিকল্পিত হামলা চালিয়ে স্টেশনের সিগন্যাল প্যানেল বোর্ড, সিগন্যাল পয়েন্ট, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশসহ স্টেশনটির সমস্ত আসবাবপত্র বাইরে এনে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ হেফাজতিরা স্টেশন প্ল্যাটফরমে ঝুলানো বৈদ্যুতিক ফ্যানগুলোও ভাঙচুর করে।

২৬ মার্চ হেফাজতিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ওইদিন তারা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সার্কিট হাউজ, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদের ডাকবাংলো, আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়সহ বেশকিছু সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিন বিকালে তাণ্ডব চলাকালে বিক্ষুব্ধ হেফাজতিরা জেলা শহরের যেখানেই জাতির জনকের ছবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন দেখেছে বা পেয়েছে সেখানেই হামলে পড়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর ছবি লণ্ডভণ্ড করাসহ বিভিন্নভাবে অবমাননা করেছে। ওইদিন হেফাজতি তাণ্ডব চলাকালে তারা বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে অবস্থিত জাতির জনকের ম্যুরাল শাবল দিয়ে ভাঙচুর করে, জাতির জনকের ছবি পদপিষ্ট করে। এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্যান্টশার্ট পরিহিত কজন যুবকও ভাঙচুরে অংশ নেয়। এতে হেফাজতের সাথে অন্য অপশক্তিও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে অংশ নিয়েছে বলে ধারণা করা যায়। হেফাজতি তাণ্ডব চলাকালে ফায়ার সার্ভিসসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো কর্মতৎপরতার দৃশ্যমান ছিল না। হেফাজতি তাণ্ডবের পর একইদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহর যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। ওই সময় জেলা প্রশাসনের কর্মতৎপরতাও শহরবাসীর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এদিকে, ২৬ মার্চের হেফাজতি সহিংস ঘটনার পর ওইদিন রাত থেকেই শহরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়। পরদিন ২৭ মার্চ শহরের পরিস্থিতি কিছুটা থমথমে থাকলেও হেফাজতিরা রণেভঙ্গ দেয়নি। জেলা শহরের আশপাশ এলাকাগুলোয় তারা সংগঠিত হতে থাকে পরবর্তী নৈরাজ্যে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। একইদিন সকালে জেলা শহরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে ছিল দু'দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এদিন স্থানীয় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তনে ছিল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা আওয়ামী লীগের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানশেষে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাংসদ র.আ.ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকারের নেতৃত্বে জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল টিএ রোড জামিয়া মাদ্রাসা এলাকা অতিক্রমণকালে মিছিলের শেষ প্রান্ত থেকে

আকস্মাৎ সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে।

এ সময় মাদ্রাসা থেকে মাইকিং করে মাদ্রাসা আক্রমণের বিষয়টি এলাকাবাসীকে অবহিত করে মাদ্রাসা রক্ষার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালে বিএনপি অধ্যুষিত কান্দিপাড়া মহল্লার স্থানীয় লোকজনও হেফাজতিদের সাথে যোগ দেয়। এ সময় অপপ্রচার চালানো হয় যে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসায় আক্রমণ করেছে। হেফাজতিরা প্রকাশ্যে মাইকিং করে মাদ্রাসা রক্ষায় 'কতলে জেহাদ' এ অংশ নিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীকালে হেফাজতিদের পক্ষ থেকে অপপ্রচার চালানো হয় যে, সাংসদ মোকতাদির চৌধুরীর নেতৃত্বে মাদ্রাসা আক্রমণের ঘটনা থেকেই বিষয়টি গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে। জেলা আওয়ামী লীগের মিছিলের আগেই বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৩টা/৪টার দিকে শহরতলীর নন্দনপুর এলাকায় হেফাজত ও সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতৃত্বে ধর্মান্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপপ্রচার চালানো হয় যে, মাদ্রাসা আক্রমণ করা হয়েছে এবং মাদ্রাসা ছাত্র মারা গিয়েছে। এ কথা বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে নন্দনপুরে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসময় টহলরত বিজিবি রাস্তার দুদিকের ব্যারিকেড পড়ে গেলে তাদের ওপর জনতা আক্রমণ করলে তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

৭. আল মামুন সরকার, পিতা- মরহুম শফিউর রহমান সরকার, মাতা- আনোয়ারা বেগম। সাং- জুসেফ পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

আল মামুন সরকার ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর গণকমিশনের তদন্ত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে ২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় হেফাজত, বিএনপি জামায়াত ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতা কর্মীরা। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বঙ্গবন্ধু স্কয়ার, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বর, রেলওয়ে স্টেশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, পৌর মেয়রের বাসভবন, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, জেলা মৎস্য অফিস, সার্কিট হাউজ, পৌরসভা কার্যালয়, জেলা পরিষদ কার্যালয় ও ডাকবাংলো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব, খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানা ভবন, আলাউদ্দিন সঙ্গীতাঙ্গন, আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তন, মাতৃসদন, এসিল্যান্ডের কার্যালয়, সরকারি গণগ্রন্থাগার, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল-মামুন সরকারের কার্যালয়, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কালীবাড়ি, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির বাসভবন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের বাসভবনসহ প্রায় অর্ধশতাধিক সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

আমার রাজনৈতিক কার্যালয়, নিজের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দিনভর হেফাজত জামায়াত ও বিএনপির তাণ্ডবে টার্গেট করে আমাদের দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাকে প্রাণ রক্ষার ভয়ে পরিবারসহ নিরাপদ জায়গায় থাকতে হয়েছে। আমার জীবনের অর্জন করা সব স্মৃতি তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বারবার অবহিত করলেও তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। সেসময় হেফাজতের সঙ্গে যোগ দেয় জামায়াত-শিবির, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কর্মীরা। জেলার বাইরে থেকে শিবিরকর্মীরা যোগ দেয় হরতালে। শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে হাজার হাজার লোক প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইনে ৫ দফা হামলা চালিয়েছে হামলাকারীরা। জেলার অন্যতম কেপিআই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডের সদর দফতরে ৫ দফা হামলার পর বিকাল ৪টার দিকে গাড়ির গ্যারেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দোষীদের বিচারের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

৮. মুশতাক আহমদ খন্দকার, পিতাঃ খলিলুর রহমান, গ্রামঃ ঘাটুরা, সুহিলপুর, সদর উপজেলা, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আহমদিয়া মুসলিম জামাত এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সভাপতি।

মুশতাক আহমদ খন্দকার বলেন, ২০২১ সালের ২৭ মার্চ হরতালের পূর্বে সন্ধ্যায় শহরে ভয়াবহ তাণ্ডব চালায় হেফাজতকর্মীরা। রাত প্রায় ৮টায় কান্দিরপাড়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা সড়কে বিজিবি ও পুলিশের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন হতাহত হন। পরদিন হরতাল চলাকালে সকাল থেকে পুলিশ ও বিজিবি শহরের মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংখ্যক হেফাজতকর্মীকে শহরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে অনেকটা মারমুখী হয়ে উঠে তারা। তাদের হাতে দা-লাঠি, বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দেখা যায়। অদৃশ্য হয়ে যান সড়কে এবং শহরে অবস্থানকারী আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এ সুযোগে নারকীয় ধ্বংসলীলা চালায় হেফাজতি ও জামায়াত শিবির গোষ্ঠী। হরতালের নামে মৌলবাদীরা পুরো জেলাতে অরাজকতা সৃষ্টি করে, ওরা ইসলামের অনৈসলামিক কার্যকলাপ চালিয়ে মানুষের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওদের কঠোর বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর হামলা চালিয়েছে ওরা। আমাদের ২ জন কর্মীকে আহত করেছে।

৮. সাংবাদিক শাহাদাত হোসেন, দৈনিক প্রথম আলোর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক।

শাহাদাত হোসেন বলেন, হেফাজত নেতা-কর্মীরা ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হরতাল চলাকালে সকাল থেকে দুপুর নাগাদ জেলা পরিষদ কার্যালয়, পৌর সভা কার্যালয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন, প্রেস ক্লাব, আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তন, সদর উপজেলা ভূমি অফিস, পুলিশ লাইন, সদর থানা, খাঁটি হাতা বিশ্বরোড হাইওয়ে পুলিশ

ফাঁড়ি, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি, দক্ষিণ কালী বাড়ি, রেলওয়ে স্টেশন, শিল্পকলা একাডেমি, জেলা আওয়ামী লীগ ও সংসদ সদস্যের কার্যালয়, সরকারি গণগ্রন্থাগার, গ্যাস ফিল্ড কার্যালয়, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল-মামুন সরকারের কার্যালয়, তার নিজের ও শশুর বাড়ি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা চৌধুরী আফজাল হোসেন নেসারের বাড়ি, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আনার, জামাল খানের বাড়ি, বিজয়নগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়ার কার্যালয়, ইউনির্ভাসিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোকতাদির চৌধুরী মহিলা কলেজ, বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসিমা মুকাই আলীর বাড়ি, মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ছাত্রলীগ সভাপতি রুবেল হোসেনের বাড়ি, সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভনের বাড়ি, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ ভাষা চত্বরের উন্নয়ন মেলা, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল স্কুল, চৌধুরী মঞ্জিলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে।

এছাড়া জেলার আশুগঞ্জ, সরাইলের একাধিক স্থানে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। আশপাশের ড্রেন থেকে কংক্রিটের স্ল্যাব উঠিয়ে রেললাইনে এনে রাখা হলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্টেশনের কাছের রেলগেটের ব্যারিয়ার বাঁকা করে ফেলা হয়। রেললাইন থেকে ক্লিপ খুলে ফেলা হয়। তালশহর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনের মাঝখানে একটি সেতুতেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পৌর এলাকার মূল সড়কের অনেক স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে রাস্তা আটকে রাখা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবেও হামলা করে কাচ ভেঙে ফেলা হয়েছে। প্রেসক্লাবের সভাপতি দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রিয়াজউদ্দিন জামি প্রেস ক্লাবে ঢোকার সময় তার ওপর হামলা করা হয়। তার মাথায় ছয়টি সেলাই লেগেছে। এছাড়া একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি মীর মো. শাহীন, ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি মাসুক হৃদয়, এটিএন নিউজের ক্যামেরাপারসন সুমন রায়, আমাদের নতুন সময়ের জেলা প্রতিনিধি আবুল হাসনাত মো. রাফি, ডেইলি ট্রাইব্যুনালের জেলা প্রতিনিধি ইফতেয়ার উদ্দিন রিফাত, লাখো কণ্ঠের মো. বাহাদুর আলম হামলার শিকার হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে নরকে পরিণত করে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। গণমাধ্যমের কর্মীরাও রেহাই পায়নি তাদের হামলা থেকে। ওই সময়কার ধ্বংসের কথা ভুলতে পারবো না কোনোদিন।

৯. মনজুরুল আলম, সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক ও চ্যানেল আইয়ের জেলা সাংবাদিক।

মনজুরুল আলম বলেন, এইবারেই প্রথম নয়, ২০১৬ সালের ১২ জানুয়ারিতেও এখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১৯৫৬ সালে সঙ্গীতাঙ্গনটি প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান আমলে মৌলবাদী সরকার ক্ষমতায় থাকলেও দেশ স্বাধীনের আগে এ ধরণের ঘটনা ঘটেনি। এবারের ধ্বংসযজ্ঞে গান পাউডার ব্যবহার করা হয়। পোড়া গন্ধ আসে পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন থেকে। সেইসময়কার পোড়া দৃশ্য দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলেন না অনেক মানুষ। তিনদিন ধরে আগুন জ্বলছে এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কোনো কর্মী আগুন নেভাতে আসেনি।

বারবার ফোন করেও কোনো সহযোগিতা পাইনি। বিনোদনের এ মিলনায়তনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিভিন্ন সময়ে হওয়া হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীদের হাতে সাধারণত লাঠিসোটা দেখা যায়। দাঁড়ি, টুপি পরা লোকজনই সাধারণত ওই আন্দোলনে অংশ নেন। তবে এই হরতালের সময় দা, হকিস্টিকসহ দেশীয় অস্ত্র দেখা গেছে। জিন্স প্যান্ট ও টি শার্ট পরা যুবকরাও এতে অংশ নেন। এসব বিষয়সহ সার্বিক পরিস্থিতিতে ধারণা পাওয়া যায়, হেফাজতে ইসলামের পাশাপাশি একটি 'বিশেষ চক্রও' হরতালের সময় যোগ দেয়। লাঠিসোটা হাতে দেখা যায় শিশুদেরকেও। পুরো সঙ্গীতাঙ্গন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেও সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর একান্ত সার্বিক সহযোগিতায় পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী আবার ভর্তি হবে সুরের বিদ্যাপীঠে। মৌলবাদী সাম্প্রতিক গোষ্ঠীরা বারবার পোড়াবে আর আমরা পুনরায় উঠে দাঁড়াবো এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

১৩. মঞ্জুর হোসেন, পিতাঃ আলী হোসেন, কান্দিপাড়া, সদর ইউনিয়ন, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আহমদিয়া মুসলিম জামাত এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক।

মঞ্জুর হোসেন বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ হরতালের সময় পুরো জেলাতে হেফাজতীরা ভয়াবহ তাণ্ডব চালায়। তাদের হাতে দা-লাঠি, বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দেখা যায়। হেফাজতীদের আক্রমণ আর তান্ডবলীলার সময় প্রশাসনের কোনো বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে দেখা যায়নি। এ সুযোগে নারকীয় ধ্বংসলীলা চালায় হেফাজতি ও জামায়াত শিবির গোষ্ঠী। হরতালের নামে মৌলবাদীরা পুরো জেলাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে, ওরা ইসলামের নামে মানুষের জানমাল ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওদের কঠোর সাজা দিতে হবে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়েছে ওরা। আমাদের সহ-সভাপতি রিয়াজ ভাইয়ের উপর হামলা করেছে ওরা। উনাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। উনার মুদির দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে। লুটপাট করেছে পাশের দোকানগুলোতে। আমাদের আরেকজন সাধারণ নিরীহ কর্মীকে মেরে আহত করেছে। মৌলবাদীরা বারবার আঘাত করছে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর। ওদের অত্যাচার জুলুম ও শারীরিক মানসিক নির্যাতন থেকে আমরা রেহাই পাচ্ছি না। আমরা দুর্বল তাই বারবার এই আক্রমণ। আমরা নিরাপত্তাহীন, আমাদের সদস্যদের নিরাপত্তা চাই।

মৌলবাদীরা আমাদের কয়েকটি মসজিদ জোরপূর্বক জবরদখল করে নিজেদের আওতায় নিয়ে নিয়েছে। কান্দিপাড়া মসজিদে মোবারক নামের আমাদের ঐতিহাসিক মসজিদটি ১৯৮৭ সাল থেকে ওরা জবরদখল করে রেখেছে। আমরা আমাদের মসজিদটি ফিরে পেতে চাই। আমাদের লোকজন মারা গেলে কবর দিতেও বাধা সৃষ্টি করে ওরা। আমরা সামাজিকভাবে অনেক নিগৃহীত ও অবহেলিত। আমরা রাষ্ট্রের কাছে আমাদের নাগরিক অধিকার চাই। আমরা মারা গেলে কবরস্থানে জায়গা পেতে চাই।

১৮. এডভোকেট আব্দুল জব্বার মামুন, পিতা মরহুম আফতাব উদ্দিন আহম্মেদ, মাতা দিলারা বেগম, সাং- বাতীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সদর।

আব্দুল জব্বার বলেন, ২০২১ সালের ২৫ শে মার্চ জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা হতে বিশাল একটি মিছিল বের হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে আসে। সেখান থেকে হুমকি প্রদান করা হয়– যদি নরেন্দ্র মোদি আসে, তাহলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শেষ করে দিব। ২৬ তারিখ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের অনুষ্ঠান ছিল। হঠাৎ করে দুই দিক থেকে শত শত লোকজন এসে উগ্রভাব নিয়ে স্টেশন ভাঙা শুরু করল। কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলাম দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। অফিস ভেঙ্গে আগুন দিয়েছে। সবাই মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। পাঞ্জাবি ও টুপি পড়া সবাই। এমপি'র সাথে কথা বলে সাধারণ সম্পাদক মামুন ভাইয়ের নিকট দিক নির্দেশনার জন্য গেলে তার পরামর্শে প্রেস কনফারেন্স করি। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত একটি দিন ছিল। বিশাল প্রতিবাদ সভায় লোকজন উপস্থিত ছিল। দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। সভায় সকলের সিদ্ধান্তে শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে যায়। তখন মাদ্রাসার সামনে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মাদ্রাসার ছাত্ররা ঢিল ছুঁড়তে থাকে। ২৮ মার্চ আমি খবর পাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে আগুন দেয়। এক পর্যায়ে অন্যান্য লোকজন যোগ হয়ে লুটতরাজে লিপ্ত হয়। পুলিশ মাইক দিয়ে সদর থানা থেকে হুজুরদের বলেন, আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান আমরা বাধা দিব না। আপনারা থানায় আক্রমণ করবেন না। হামলাকারীরা ফেসবুক ইউটিউব ব্যবহার করেন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য।

১৯. দিলিপ কুমার নাগ (৭৩), পিতা মৃত. রবিন্দ্র মোহন নাগ, মাতা রুমা নাগ, সাং- শাহরাজপুর, থানা সরাইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা সমাজ সেবায় কর্মরত ও হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ জেলা সভাপতি।

দিলিপ কুমার বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বিভিন্ন জায়গা হতে ভাঙচুরের ঘটনা শুনি। আমার বাড়িতে ইট পাটকেল ছুঁড়ে। ইউএনওকে ফোন করি, তিনি বলেন আমরা বিপদে আছি। আপনারা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করুন। চেয়ারম্যানকে নিয়ে আমরা জনপ্রতিরোধ করি। দুঃখের বিষয় দেখা গেল, আমাদের গ্রামে একটি কওমি মাদ্রাসা আছে, সেখান থেকে ট্রাকে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা আসছে। আমি বাইরে এসে দেখি পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণের জানমালের রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল না।

২০. সাংবাদিক আব্দুল নূর, পিতা মো. রমিজ আলী, মাতা জাহেরা খাতুন, সা- মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা সাংবাদিক, দৈনিক সমকাল স্টাফ রিপোর্টার।

আব্দুল নূর বলেন, ২০২১ সালের ২৬ শে মার্চ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলার দিন পুলিশ শহরে ছিল না। সংবাদকর্মী হিসেবে যখন স্টেশনে গিয়েছি সেখানে শত শত দেশীয়

অস্ত্র নিয়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা সিগনাল মেশিন সহ স্থাপনা ভাঙচুর করছে। ভাঙচুর করছে এসপি অফিস, ডিসি অফিস, ভূমি অফিসের সব রেকর্ড, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন। তারা নারায়ে তাকবির আল্লাহ আকবর শ্লোগান দেয়। তারা গান পাউডার দিয়ে আগুন লাগায়।

২১. জীবন কুমার চক্রবর্তী, পিতাঃ মদন কুমার চক্রবর্তী, মাতাঃ মৃত নিসত চক্রবর্তী, সাং- শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর।

জীবন কুমার বলেন, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কালী বাড়ি প্রধান পুরোহিতের ছোট ছেলে। হামলার সময় জিন্স, হাফ প্যান্ট পড়া হুজুর ১৫/২০ জন লোক আমাদের উপর হামলা করে। হামলাকারী একজনকে চিনেছি। তার নাম পলাশ। আমাদের পূর্ব পুরুষদের বসবাস প্রায় ১০০ বছরের চেয়েও বেশি। আমি মনে করি কালী মন্দিরের ঘটনা আর আমাদের উপর হামলা একই ঘটনার অংশ। পরপর দু'বার হামলা হয়, দ্বিতীয়বার যখন হামলা হয় তখন গোপাল স্যার সহ আমি অনুরোধ করি। ২০২১ সালের ২৮ মার্চ আনুমানিক ১১.৩০ মিনিটে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেই। পুলিশ বলে যে, পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন আছে কিন্তু পুলিশ আসেনি। ২৯ তারিখ বিকালে পুলিশ, সিআইডি, র‍্যাব এসেছিল। ট্রাস্টি কমিটি একটি মামলা করেছে।

২২. ডা. মো. আবু ছায়েদ, মাতা- শরীফা বেগম, চিকিৎসক, ফাউন্ডার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ।

আবু ছায়েদ বলেন, ২০২১ সালের ২৮ তারিখে আমার মেডিকেল কলেজের সামনে বঙ্গবন্ধু একটি ভাস্কর্য ছিল। একদল যুবক আনুমানিক সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে এসে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যটি ভেঙ্গে খালে ফেলে দেয়। আমি সাথে সাথে পুলিশকে জানাই। পুলিশ আমাকে বলে আমরা দেখছি বিষয়টি। আপনি স্থানীয়ভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। ভাস্কর্যটি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের সামনে।

২৩. এডভোকেট আক্তার হোসেন ছাইদ, সাং-কাইতলা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

তিনি বলেন, ধোয়া উড়ছে, গন্ডগোল লেগেছে। আমার বাড়ির পাশের একটি ছেলে মারা গেছে। পরবর্তীকালে শুনলাম শহরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুর করছে। ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মোবারক উল্লাহ সাজিদুর রহমান এর নেতৃত্বে ভাঙচুর করেছে। গান পাউডার দিয়ে আগুন দেয়, পরবর্তীকালে গিয়ে ভাঙচুর দেখেছি। ২০২১ সালের ২৮ মার্চে পৌরসভা, ভূমি অফিস, মেয়রের বাড়ি, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির বাড়ি ভাঙচুর করেছে আমি পরে গিয়ে দেখেছি।

২৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপক চৌধুরী বাপ্পি, পিতা- প্রয়াত ভূপেষ চৌধুরী, আমাদের সময় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার।

দীপক চৌধুরী বলেন, ২০২১ সালের ২৫ মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে হেফাজত ইসলামের মাওলানা সাজিদুর রহমান, মাওলানা মুবারক উল্লাহ সহ

অনেকে মিছিল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ সকল দেশকে অচল করার হুমকি দেয় এবং শ্লোগান দেয় 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। ২৬ তারিখে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান শেষে ২টা ৩০ মিনিটের পরে তারা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ করে। মিছিলকারীরা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুর করে– আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন আক্রমণ করে। এসপি, জেলা জজ, রেলস্টেশন আক্রমণ করেছে শুনেছি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বাড়ি আক্রমণ করতে আমি দেখেছি। পরবর্তীকালে যারা আক্রমণ করে তারা সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। বিল্লাল আহম্মেদ নামে একজন মাদ্রাসা ছাত্র ছিল। তাকে ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়। হামলার দিন কোনো প্রশাসন ছিল বলে আমার মনে হয় না। স্থানীয় এমপি ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য পাইনি।

২৫. ওয়ালিদ সিকদার রবিন, পিতা- আশিদুল্লা সরদার, সাং- নাটাই।

রবিন বলেন, আমি ঢাকায় থাকি, পেশায় সাংবাদিক ছিলাম বর্তমানে ব্যবসা করি। টিকেট কাটার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম। দেখলাম হঠাৎ শ'খানেক লোক স্টেশনে আক্রমণ করেছে। স্টেশনে আগুন দেয়, ধোয়া উড়ছে। টিএ রোড যাওয়ার সময় দেখি মাদ্রাসার ছাত্ররা ভাঙচুর করছে। শুনেছি তারা ভাদুঘর মাদ্রাসা থেকে এসেছিল। কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুর করে। একটি ভীতিকর পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ২৭ মার্চে ৩টায় নন্দনপুরে যাওয়ার সময় লোকজন সিএনজি আটক করে ব্যারিকেড দেয়। তখন পুলিশ টিআর শেল নিক্ষেপ করে। এর পরদিন বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু মিছিল বের করেন ১০/১২ জন হুজুর এবং এসময় সাধারণ লোকজনও ছিল।

২৬. ওয়াহিদ শামীম, পিতা- মৃত হাবিব উল্লা, পেশা- ব্যবসা, সাং- বালাই।

ওয়াহিদ শামীম বলেন, আমার ব্যবসার কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। ২০২১ সালের ২৬ মার্চে সোয়া ৪ টায় স্টেশনে গিয়ে দেখি সেখানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। পরদিন সুহিলপুর বাজারে যেতে চাইলেও পারিনি। ২৭ মার্চে মাইকিং করা হয় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মাদ্রাসায় আক্রমণ করা হয়েছে'। সবাই বেরিয়ে আসে ইসলাম রক্ষার জন্য। সাধারণ ছাত্র অধিকারের পরিষদের লোকজন ছিল। আমি তাদেরকে চিনতে পেরেছি।

২৭. মুফতি মকবুল হোসেন, পিতা- হাজী দুল মিয়া সরদার, পেশা সাবেক কাউন্সিলার বর্তমানে ব্যবসা করি, সাং- ঝাউতলী।

মকবুল হোসেন বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ আমি আনুমানিক ৩টায় হঠাৎ উত্তেজিত বিএনপি জামায়াত ও হেফাজতের লোকজনকে দেখি। দেশীয় অস্ত্র, চাইনিজ কুড়াল ছিল তাদের হাতে। তারা সরকারি সকল স্থাপনায় হামলা করে। শুনেছি বিভিন্ন স্থাপনায় তাদের আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আমি বাধা দিতে গেলে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে। নিরাপরাধ অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন পুলিশের হাতে। আমি গ্রেপ্তারের কপি দিব, লিখিত জবানবন্দি দিব। আমি জামিয়া ইউনুছিয়ার ছাত্র। আমি চাই অপরাধীদের বিচার হোক।

২৮. মাসুম বিল্লাহ, পিতা- মো. নিজাম উদ্দিন, সাং- পূর্ব মেড্ডা, পেশা শিক্ষানবিশ আইনজীবী।

মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমি জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। আমরা যখন মিছিল নিয়ে ঝাউতলীর উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম তখন হঠাৎ মাদ্রাসার ছাত্ররা আক্রমণ করে। তখন তারা দহাই আল্লাহ জিহাদ, ছাত্রলীগ কাফের শ্লোগান দেয়। ২০২১ সালের ২৭ মার্চে হেফাজত নেতা (বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব) মাওলানা সাজিদুর রহমানের মাদ্রাসা থেকে মিছিল বের হয়। বড় মাদ্রাসা থেকে কিছু ছাত্র ভূমি অফিসে আগুন দিয়েছে, আমি দেখেছি। অন্য একদল লোক সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁর অফিস ভাঙচুর করে। তখন কিছু লোক বলছে আল মামুন সরকারের বাসায় চল। ইসলামী ছাত্র খেলাফত জুনায়েদ আহম্মেদের নেতৃত্বে ভূমি অফিস এবং আলাউদ্দিন খাঁ অফিসে আক্রমণ করে।

১৫. মাওলানা শাব্বির আহমদ, পিতাঃ মীর আহমদ, গ্রামঃ ঘাটুরা, সুহিলপুর, সদর উপজেলা, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা সদরের কান্দিপাড়া জামে মসজিদ বায়তুল ওয়াহিদ–এর ইমাম।

মাওলানা শাব্বির আহমদ বলেন, ২০২১ সালের মার্চে হেফাজত ইসলামের ডাকা হরতালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। হেফাজতের তাণ্ডবের সময় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে, এলাকার সাধারণ লোকজন তখন ভীত হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। বিক্ষুব্ধ হরতালকারীরা জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, দি আলাউদ্দিন সঙ্গীতাঙ্গন ও ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করে। ট্রেনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং আগুন দিয়ে পুরো রেলস্টেশন জ্বালিয়ে দেয়। সেইসময় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বিশ্বরোড মোড়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং রাস্তায় ব্যারিকেড ও অগ্নিসংযোগ করে হেফাজতের নেতা-কর্মীরা। আমাদের মসজিদেও হেফাজতিরা ব্যাপক হামলা চালায় তখন। হেফাজতের তাণ্ডবের সময় আমরা ঘরবন্দী ছিলাম।

হেফাজত, জামায়াত ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে সবসময়। ইসলামের নামে জ্বালাও পোড়াও করে বিশ্বের দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত করছে। ওদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে আরও সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। ওদেরকে আইনের আওতায় এনে সাজা না দিলে এসব ঘটনা বারবার ঘটতে থাকবে।

১০. জীবন কুমার চক্রবর্তী, জেলা সদরের শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্রী মদন মোহন চক্রবর্তীর ছোট ছেলে।

জীবন কুমার চক্রবর্তী বলেন, হেফাজতের হরতালের সময় আমাদের মন্দিরে হামলা হয় তিন দফা। প্রথম দফায় হরতাল সমর্থনকারীরা এসে হামলা চালায়। তাদের একজনের হাতে থাকা বালতিতে পাউডার জাতীয় কিছু ছিল। কয়েকজন যুবক মন্দিরের প্রথম

গেট ভাঙচুর করার পরে সবাই মন্দিরে প্রবেশ করে লুটপাট চালাতে থাকে। ওই দিন পুজা থাকার কারণে ভক্তরাও বেশি ছিল। হামলার সময় সবাই আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। এসময় কালী মন্দির থেকে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে ধ্বংসলীলা এখনো বিদ্যমান।

১১. মো. শোয়েব আহমেদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার।

মো. শোয়েব আহমেদ বলেন, ২০২১ সালের মার্চে হেফাজতের তাণ্ডবে অন্তত কয়েকশ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে পুরো জেলাতে। এছাড়া পুড়ে ছাই হয়েছে অনেক অমূল্য সম্পদ। অনেক দুর্লভ ডকুমেন্ট আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনোদিন। ২০২১ সালের ২৮ মার্চ হেফাজতের ডাকা হরতালের দিন তান্ডব চালানো হয়েছে অন্তত শতাধিক সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্দির, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে। আগুনে পোড়া থেকে বাদ পড়েনি কোরআনও। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের রেলস্টেশন। পুরো স্টেশন জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে ছেড়েছিল মৌলবাদীরা।

সেদিন বিকালে কয়েক'শ মাদ্রাসাছাত্র স্টেশনে এসে হামলা চালায়। এসময় তারা প্যানেল টিকিট কাউন্টার, প্যানেল বোর্ড ও যাত্রীদের চেয়ার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

১২. শফিক সিকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তনের অফিস সহকারী।

শফিক সিকদার বলেন, হেফাজতের হরতালের সময় যখন সঙ্গীতাঙ্গনে গান পাউডার দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল তখন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কী করবো বুঝে উঠার আগেই জীবন রক্ষার্থে পাশের একটি হাসপাতালে কোনোমতে আশ্রয় নিয়েছি। হরতালকারীরা যখন আমাদের খুঁজছে তখন ওই হাসপাতালের লোকজন আমাকে ওখান থেকে সরে যেতে বলেন। এইভাবে ওইদিন প্রাণে বেঁচে গেছি। হরতালের সময় পুরো জেলা শহর মৌলবাদীদের জ্বালাও পোড়াও তাণ্ডবে তছনছ হয়ে যায়। ওরা আমাকে পেলে মেরে ফেলতো। শতশত লোকজন লাঠি, হকিস্টিক ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে।

১৪. কুদ্দুস উল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত ডিফেন্স এর একজন কর্মকর্তা।

কুদ্দুস উল্লাহ বলেন, ২০২১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে জামায়াত শিবির এবং কওমি অঙ্গনের উগ্রপন্থীরা তথাকথিত ওলামাদের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন এলাকাতে এক নজিরবিহীন তাণ্ডবের মাধ্যমে থানা, প্রেস ক্লাব, ভূমি অফিস, ওস্তাদ আলাউদ্দিনের স্মৃতি ভাঙচুর, রেল ষ্টেশন, রেলের বগী, কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ী পুড়িয়েছে। নানা উস্কানি দিয়ে মানুষ হত্যা করিয়েছে। তাদের দাবি ভারতের নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর বাতিলের চেষ্টায়

তারা এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন। হুমকি দিয়েছেন ভবিষ্যতে আরও তাণ্ডব চালাবেন। এই মৌলবাদীরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে কেন? ওদেরকে কি বিচারের আওতায় আনা যাবে না? ওদের কঠিন সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।

জামায়েতে ইসলামী তাদের ভ্রষ্টাচারিতার মাধ্যমে কওমি অঙ্গনের বেশ কিছু আলেমকে বিপুল অংকের অর্থের বিনিময়ে তাদের ফ্যাস্টিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। বর্তমানে হেফাজতে ইসলামের নেতারা একে একে জামায়াতে ইসলামীর এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছেন। গ্রামে গ্রামে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মানুষ হত্যার উস্কানি দিচ্ছেন আর এ সবই ঘটাচ্ছেন মহান ইসলামের নাম ব্যবহার করে।

১৬. শামীম হোসেন, স্থানীয় বাসিন্দা আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী।

শামীম হোসেন বলেন, ২০২১ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজত জামায়াত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস ও স্থাপনায়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় অনেক বাড়ি-ঘর। রেলস্টেশন থেকে থানা, পুলিশ ফাঁড়ি, হিন্দুদের উপাসনালয়, ভূমি অফিস– বাদ যায়নি কিছুই। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গনও। হামলার টার্গেট ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির প্রতি ছিল তীব্র ক্ষোভ। প্রতিটি প্রতিকৃতিই খুঁচিয়ে নষ্ট করা হয়েছে। বলতে গেলে ওই তিনদিন যেন একাত্তরের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে। রীতিমতো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল পুরো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত স্থাপনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও ম্যুরালের প্রতিও প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল তাণ্ডবকারীদের। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল দেখামাত্রই তারা খুঁচিয়ে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। জেলার জাতীয় বীর আব্দুল কুদ্দুস মাখন পৌর মঞ্চে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর দুটি ম্যুরাল, ব্যাংক এশিয়ার সামনে ও বিপরীতে দুটি, কাউখালীতে একটি ও পৌর আধুনিক সুপার মার্কেটের সামনে থাকা একটি ম্যুরালকে খুঁচিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। হামলাকারীরা এই দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ড দেখলেই তা বোঝা যায়। তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, ছবি, ব্যানার সবকিছুতেই আগুন দিয়েছে। ওই সময় প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যময়। পুলিশের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তাণ্ডবকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ নিজেদেরকে আত্মরক্ষায় বেশি ব্যস্ত ছিল সেইসময়। যার কারণে পুরো জেলাকে একটি নরকে পরিণত করেছিল মৌলবাদী হায়েনার দল।

১৭. আক্তার হোসেন, শহরের কুমারশীল এলাকার বাসিন্দা ও ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী।

আক্তার হোসেন বলেন, হেফাজতে ইসলামের হরতাল চলাকালে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। ওদেরকে কি আইনের আওতায় আনা যাবে না? বারবার ওরা পার পেয়ে যাবে এভাবে? আমাদের সরকার কি করে? প্রশসন কি করে? ওরা কি সরকারের চেয়ে শক্তিশালী? ওদের কঠিন সাজার ব্যবস্থা করা হোক এটাই দাবি।

সরেজমিন প্রতিবেদন: চট্টগ্রাম

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার আগমনের বিক্ষোভ শুরু করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের পর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে পুলিশের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এসময় এসিল্যান্ডের গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনার পাশাপাশি হাটহাজারী মডেল থানা ও উপজেলা ডাকবাংলো এবং ভূমি অফিসে ভাঙচুর করা হয়। এ সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এর চারদিন পর ২০২১ সালের ৩০ মার্চ রাতে হাটহাজারী থানায় পুলিশ বাদী হয়ে চারটি ও ভূমি কর্মকর্তার দুটিসহ মোট ছয়টি মামলা করা হয়। অভিযোগগুলো হলো- ভূমি অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। এসব মামলায় ২ হাজার ৫'শ অজ্ঞাতকে আসামী করা হয়।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক হিন্দুদের মন্দির ও ঘর-বাড়িতে আক্রমণ এবং ভাঙচুর করা হয়েছে। এসব পরিস্থিতিতে পুলিশের ব্যর্থতায় হতাহতের ঘটনাসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। হামলায় দেশ-বিদেশের কারা ইন্ধন জুগিয়েছে তা নিয়ে নানা বক্তব্য রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক হামলা ও সহিংসতার ঘটনার শুরুটা হয়েছিল কুমিল্লা শহরের নানুয়া দীঘির উত্তর পাড়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে করা একটি পূজামণ্ডপ থেকে। ১৩ অক্টোবর সকালে এই পূজামণ্ডপে কোরাণ অবমাননার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে কুমিল্লা শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। সেসময় চারটি মন্দির ও সাতটি পূজামণ্ডপে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘটনার জের ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম মহানগরীসহ বিভিন্ন উপজেলায়, নোয়াখালীর চৌমুহনী, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, ফেনী, রংপুরের পীরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়। মন্দির-মণ্ডপে হামলা, ভাঙচুরের পাশাপাশি আক্রমণের শিকার হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

কুমিল্লার ঘটনার জেরে ১৫ অক্টোবর ২০২১ বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের আগে চট্টগ্রাম নগরীর জেএমসেন হল পূজামণ্ডপে হামলা করা হয়। সাম্প্রদায়িক এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ২০২১ সালের ১৬ অক্টোবর ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চট্টগ্রামে আধাবেলা হরতালের ডাক দেওয়া হয়। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এ হরতালের ডাক দেন। এদিকে, মণ্ডপে হামলার অভিযোগে ১৫ অক্টোবর শুক্রবার প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা নগরীর ২৭৬টি পূজামণ্ডপে প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত রাখা হয়। পরে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে আশ্বস্ত করার পর প্রতিমা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেন পূজা উদযাপন পরিষদ।

সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর 'বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'-এর তদন্ত ও গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি ককাস-এর যৌথ উদ্যোগে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এ শুনানি হয়।

গণকমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাস সম্পর্কে তদন্ত ও গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, প্রাক্তন আইজিপি নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, গণকমিশনের সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, গণকমিশন সচিবালয়ের সমন্বয়কারী কাজী মুকুল এবং সচিবালয়ের সদস্য সাংবাদিক শওকত বাঙালিসহ সচিবালয়ের অন্যান্য সদস্যরা।

এছাড়া তদন্ত ও গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডা. মাহফুজুর রহমান, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি চট্টগ্রামের সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আলাউদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা শাখা নির্মূল কমিটির সহসভাপতি দিপঙ্কর চৌধুরী কাজল, যুগ্ম-সম্পাদক আবু সাদাত মোঃ সায়েম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সুচিত্রা গুহ টুম্পা, সমাজকর্মী মওলানা হাসান রফিক, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিনসহ চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিশিষ্টজনেরা।

চট্টগ্রাম গণকমিশনের গণশুনানিতে ১৩ জন সাক্ষী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের নারকীয় তাণ্ডব এবং সারাদেশে পূজা মণ্ডপে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলার মৌখিক সাক্ষ্য দেন। লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন ৪২ জন। সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন শিববাড়ি শ্রী শ্রী শ্মশানেশ্বর শিব বিহঙ্গ মন্দির কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার মজুমদার (৭০), সহ-সভাপতি সজল কুমার দাস (৩৫), সাবেক সদস্য দেবরাজ রতন (৩৮), অমিত কুমার হোড় (৬৫), দুলাল কান্তি মুহুরী (৭৪), নাপুড়া শেখের খীল কালিবাড়ি পূজা উদযাপন পরিষদ-এর রাজিব কান্তি গুহ (৪২), নাপুড়া, বাঁশখালীর সুপল মিত্র (৩৪), বিকাশ দাস (১৮), পেকুয়া সুশীল পাড়া পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কুমার কাঞ্চন মনি (৩৯), চট্টগ্রামের জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্যামল পালিত কাঞ্চন, শ্যামল কান্তি দাস, জেলে পাড়া সীতাকুন্ডু থেকে দক্ষিণা রঞ্জন দাস, বাঁশখালী উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. চন্দন দত্ত।

চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুর ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা সম্পর্কে 'বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'-এর নিকট সাক্ষীদের জবানবন্দি

১. বাবু শ্যামল কুমার পালিত, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি।
শ্যামল কুমার বলেন, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির-পূজামণ্ডপ, প্রতিমা ভাঙচুর, বাড়ি-ঘরে পূর্ব-পরিকল্পিত হামলা, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা। ২০২১ সালের ১০ নভেম্বর গণতদন্ত কমিশনের প্রতিনিধি দলকে একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টায় এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান বাবু শ্যামল কুমার পালিত।

২. অসীম কুমার দেব, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক।
অসীম কুমার বলেন, ২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর জুমার নামাজের পর নগরীর আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে একদল বিক্ষোভকারী মুসল্লি। এ সময় পুলিশ নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে; বন্ধ করে দেওয়া হয় জেএমসেন হলে যাওয়ার পথ। বিক্ষুব্ধ মুসল্লিরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ টিয়ারশেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় পাঁচ পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়। মিছিলকারীরাদের একটি অংশ পালিয়ে যাওয়ার সময় জেএমসেন হলের সামনে পূজার ব্যানার ও তোরণের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে, মন্দিরে ঢিল ছুঁড়ে মারে। এ সময় অন্তত ৫০ জনকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদে একইদিন প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা নগরীর ২৭৬টি পূজামণ্ডপে প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত রাখি আমরা। পরে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে আশ্বস্ত করার পর প্রতিমা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বারবার আমাদের উপর হামলা করে পার পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ কিন্তু সেই অবস্থা বর্তমানে নেই। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে বারবার। আমরা সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন চাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টায় চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

এর জের ধরে ১৫ অক্টোবর ২০২১ বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের আগে চট্টগ্রাম নগরীর জেএমসেন হল পূজামণ্ডপে হামলা হয়। ওইদিন দুপুরে জুমার নামাজ

শেষে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ গেইটে ৫'শ থেকে ৭'শ লোক 'কুমিল্লার ঘটনার প্রতিবাদ' জানিয়ে সমাবেশ করে। দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে নিউ মার্কেট এলাকার আমতল, গোলাম রসুল মার্কেট ও রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকা থেকে আরও হাজারখানেক লোকের একটি মিছিল তুলসীধামের মন্দির এবং নন্দনকানন লোকনাথ মন্দির হয়ে আন্দরকিল্লায় আসার চেষ্টা করে। সেখান থেকে তারা মিছিল নিয়ে জেএমসেন হলের দিকে এগিয়ে যায়। শুরুতেই তারা আন্দরকিল্লা মোড়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মিছিলটি কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটি গ্রুপ সিরাজদ্দৌল্লা সড়কে, একটি গ্রুপ রেডক্রিসেন্ট গলিতে এবং অপর গ্রুপটি মসজিদে ঢুকে পড়ে। তবে এই ফাঁকে শ'খানেক লোক চলে যায় চেরাগি পাহাড় মোড়ের দিকে। এই গ্রুপটিই মূলত জেএমসেন হলের তোরণের ব্যানার ও কাপড় ছিঁড়ে নেয় এবং মন্দিরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওইদিন মিছিলকারীরা যদি মন্দিরে প্রবেশ করতো তাহলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এসব অমানুষদের অতি দ্রুত কঠোর শাস্তি চাই।

৩. এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক।
নিতাই প্রসাদ ঘোষ বলেন, চট্টগ্রাম শহর ও কয়েকটি উপজেলাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের মন্দির-পূজামণ্ডপ, বাড়ি-ঘরে পূর্বপরিকল্পিত হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানো এবং হিন্দুদের ভয়ভীতি দেখাতে এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি, সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের আহবান জানাচ্ছি। আমার মনে হয়েছে, বড় ধরনের কোনো এজেণ্ডা বাস্তবায়নের জন্য এবারের হামলার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। জানি না কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বর্বরোচিত হামলা হয়েছে? অতি দ্রুত দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

৪. আশিষ কুমার ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি।
আশিষ কুমার ভট্টাচার্য বলেন, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে হামলার প্রতিবাদ জানাই। আমি পূজা কমিটির পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি জানাচ্ছি। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে– '৭২-এর সংবিধানের আলোকে সকল সম্প্রদায়ের সম-অধিকার নিশ্চিত করা। এবারের দুর্গাপূজা চলাকালীন চট্টগ্রামের প্রধান পূজামন্ডপ জেএমসেন হলসহ সারাদেশে দূর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, মঠ মন্দিরে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও পূজার্থীদের উপর হামলায় জড়িতের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার আইনে আলাদা আলাদা মামলা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। ক্ষতিগ্রস্ত মঠ মন্দির, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করে দেওয়া। নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে

সহযোগিতা করা। হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি অনুদান দিয়ে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া। এছাড়া রাজনীতি ও নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৫. শ্রীপাদ লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, চট্টগ্রাম জেলার ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ।

শ্রীপাদ লীলারাজ বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সব ধর্মের সব জাতিসত্তার সমন্বয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ সুখী বাংলাদেশ। এই জন্য তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, এটি আমাদের মাতৃভূমি হলেও একদিন হয়তো আমরা এদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা এখনো অটুট কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমাদের আস্থা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আমরা চাই, সকল সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার হোক। ক্ষতিগ্রস্ত মঠ-মন্দির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পুনঃর্নির্মাণ ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হোক।

৬. মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন ভূঁইয়া, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চন্দনপুরা দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন বলেন, ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন কুমিল্লার নানুয়ার দিঘীর পাড়ে একটি পূজামণ্ডপে প্রতিমার নিচে কোরাণ রাখার কথিত অভিযোগ তুলে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূজামণ্ডপ ও মঠ-মন্দিরে হামলা-ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং ঘৃণা প্রকাশ করছি। কোরাণে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে কোনো ধরনের হত্যা, সন্ত্রাস, অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে যেন মানুষ না যায়। রাসুল (সা.) এর কঠোর নির্দেশনা হচ্ছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও সংখ্যলঘুদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে। আমি মনে করি, আল্লাহর এই ঘোষণা, রাসুলের (সা.) এই নির্দেশনা অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত আলেমকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে পারে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৭. মাওলানা মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, চট্টগ্রামের চন্দনপুরা দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ।

মাওলানা মাহবুবুল বলেন, নবী (সাঃ) হাদিসে বলেছেন– তোমরা যদি তাদের ক্ষতি কর অথবা তাদের উপর অতিরিক্ত কাজ দাও অথবা তাদের ন্যায্য পাওনা না দাও তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তাদের পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবো–আল হাদীস। এমনকি যুদ্ধের সময়ও হিন্দু মন্দির ভাঙচুর করা, বাড়ি-ঘরে আগুন দেয়া, তাদের ক্ষেত ফসল নষ্ট করা নিষেধ। এসব আয়াত ও পবিত্র হাদীস দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ভাই-বোনদের বাড়ি-ঘরে, মন্দিরে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে

হামলা করা, ভাঙচুর করা, অগ্নিসংযোগ করা শুধু নিষেধ নয় চরম দণ্ডনীয় অপরাধও। যারা ইসলাম ধর্ম মানে এবং কোরাণ-হাদীস পড়ে, আল্লাহ-রাসূলকে ভালবাসে এবং মৃত্যু ও আখিরাতের ভয় রাখে তারা এ ধরনের অপকর্ম করবে না বরং তারা হিন্দু এবং অমুসলিম ভাইদের ভালবাসবে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করবে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, যারা অমুসলিমদের ভিটাবাড়ী দখল করে, তাদের বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, মন্দিরে হামলা করে এবং ভাঙচুর চালায়, চিংড়ি ঘের দখল করে, তারা যে ধর্ম, যে দলের, যে পর্যায়ের, যে নামের লোকই হোক তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে।

৮. সুমন দে, সাধারণ সম্পাদক, মেলঘর পশ্চিমপাড়া পূজা উদযাপন কমিটি, বরুলিয়া ইউনিয়ন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সুমন দে বলেন, ২০২১ সালের ১১ অক্টোবর রবিবার রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তরা এই প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। আগের দিন রাতে কে বা কারা পূজা মণ্ডপের গ্রীল ভেঙ্গে প্রতিমার মাথা ভেঙে রেখে যায়। পরদিন ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর সোমবার ভোর ৫টার দিকে প্রতিমা নির্মাণের কারিগর মণ্ডপে কাজ করতে আসলে পূজামণ্ডপের নির্মিত প্রতিমার মাথা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে কমিটির লোকজনকে খবর দেন। পরে তারা এসে পটিয়া থানা ও উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তাকে মোবাইল ফোনে ঘটনাটি অবহিত করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টায় এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

৯. হিমাংশু বিমল নাথ, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরার উত্তর মছজিদ্দা মগপুকুর দক্ষিণপাড় মহাশ্মশান মগদ্বেশ্বরী মন্দির কমিটির সভাপতি ও পূজারী।

হিমাংশু বিমল নাথ বলেন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভের মধ্যেই আমাদের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরার উত্তর মছজিদ্দা মগপুকুর দক্ষিণপাড় ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর মহাশ্মশান মগদ্বেশ্বরী ও শিতলা মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে বট ও অশ্বত্থ গাছ ঘিরে জগন্নাথ, মগেদ্বশ্বরী ও শীতলা মন্দির। প্রায় ৩০ বছর আগে পাশাপাশি এ তিনটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রতিবছর ৩টি করে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা মগেদ্বশ্বরী মন্দিরের গেট ভাঙার চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং বাঁশ দিয়ে ঘট উল্টে দেয় পাশাপাশি শীতলা মন্দিরের ঘট ভেঙে দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। আমি এসব হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই, সেইসঙ্গে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

১০. মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সচিব ও হেফাজতে ইসলামের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সচিব।

মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন, পূজামন্ডপে মূর্তির পায়ের নিচে কোরাণ রেখে অবমাননার নিন্দা ও প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি। বিরানব্বই ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নিরাপত্তা ও অতিমাত্রায় নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন। তারপরও কিছু স্বার্থান্বেষী চিহ্নিত মহল বারবার ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট করার পাঁয়তারা করছে। সব ধর্ম ও মতাদর্শের মানুষ ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে এ শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং কোনো উপাসনালয়ে হামলা যে কোনো আইনের চোখে অপরাধ। শান্তির ধর্ম ইসলাম এ বিষয়ে সর্বাধিক সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে অন্য ধর্মের উপাসনালয় রক্ষায় যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। সব ধর্মের উপাসনালয় রক্ষা কোরাণের দাবি।

১১. মাওলানা আহমদ উল্লাহ, হেফাজতে ইসলামের চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী প্রচার সম্পাদক ।

মাওলানা আহমদ উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চক্রান্ত চলছে। কুমিল্লায় পূজামন্ডপে কোরাণ অবমাননা করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সেই চক্রান্ত বাস্তবায়নেরই অংশ কিনা তা সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় দেশের মুসলিম সমাজ ক্ষুব্ধ। কারণ মুসলমানরা কোরাণকে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোরাণ অবমাননা করলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করবে, এটাই স্বাভাবিক। অথচ আমরা কুমিল্লায় লক্ষ্য করছি, ঘটনাস্থলে অপরাধীদের গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনা না করে প্রশাসন উল্টো প্রতিবাদকর মুসলমানদের উপরই চড়াও হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে কোরাণ অবমাননাকারী দাঙ্গাবাজদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

১২. স্বপন মজুমদার, ফিরিঙ্গি বাজারের শিব বাড়ি লেনের শ্রী শ্রী শ্মশানেশ্বর শিব বিহঙ্গ মন্দির কমিটির সভাপতি।

স্বপন মজুমদার বলেন, আমাদের এই মন্দির শত বৎসরের ঐতিহ্য বহন করছে যা শিববাড়ি হিসেবে এলাকাটি শিববাড়ি নামে পরিচিত। স্বাধীনতাবিরোধী কাশেম সাত্তার যুদ্ধের সময় মন্দিরের পুজারিদের বাধ্য করে দলিল সৃষ্টি করেন এবং পরে জোর করে মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়। যুদ্ধের পর আবার আমরা সংস্কার করতে গেলে দেখি নতুন একটি দলিল সৃষ্টি হয়েছে। আবার '৭৫-এর পরে দলিলে তার নাম আবুল কাশেম নামকরণ করেন। এ ঘটনায় মামলা করি কোতোয়ালী থানায়। তদন্তের দায়িত্ব পান বদিউজ্জামানকে। অতীতে কোথাও বলার সুযোগ হয়নি, আজকের শুনানির এজেন্ডার বাইরে তারপরও বিষয়টি আমরা মন্দিরের স্বার্থে এ অভিযোগটি দিতে বাধ্য হয়েছি।

১৩. অমিত কুমার হোড় (৬৫), পিতা- হিমাংশু হোড়, মাতা- সুখময় হোড়, শিববাড়ি, ফিরিঙ্গি বাজার।

অমিত কুমার বলেন, শিববাড়ি মন্দির যিনি ভেঙেছিলেন তিনি যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় আছেন। তার নাম আবুল কাশেম, তার ছেলে নাছির উদ্দীন বাহাদুর তাদের নেতৃত্বে

১৯৭১ সালে মন্দিরটি ভেঙেছে, এর প্রেক্ষিতে করা মামলা দীর্ঘ ৪৫ বছর চললেও সুরাহা হয়নি, ৪৫ বছর মামলা চলে। এখনও সুরাহা হয়নি। ১৯৭৮ সাল থেকে মন্দিরটি কোনোমতে দাঁড় করিয়ে পূজা করছি। পূজা আসলে দুর্বৃত্তরা গণ্ডগোল শুরু করে, তারা কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। কাশেম এতে জড়িত থাকতে পারে। মামলার কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানার ফিরিঙ্গিবাজারে ২০২১ সালের ১০ অক্টোবর রাত ১১ টার দিকে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। প্রতিমা ভাঙচুর করার প্রতিবাদে পূজার্থীরা কোতোয়ালি থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভের মুখে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

ফিরিঙ্গি বাজার শিববাড়ি পূজামণ্ডপের জন্য মিনি ট্রাকে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফিরিঙ্গিবাজারে ফলের আড়তের সামনে ট্রাক থেকে জাম্বুরা নামানো হচ্ছিলো। ঢোলবাদ্য সহকারে প্রতিমা নেওয়ার সময় দোমায়াপুকুর পাড় এলাকায় আড়তের সামনে থেকে জাম্বুরা ছুড়ে মারা হয়। ছুঁড়ে মারা জাম্বুরার আঘাতে দুর্গা ও স্বরস্বতী প্রতিমার একটি করে হাত ভেঙে যায়। বিক্ষোভের মধ্যেই পুলিশ অভিযান শুরু করে। ফলের আড়তে গিয়ে জাম্বুরাবোঝাই ট্রাকের চালক ও সহকারীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। বিপুল সংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত ফিরিঙ্গিবাজারে স্মরণকালের মধ্যে কখনোই প্রতিমা ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেনি। এমনকি নিকটতম সময়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। আমরা এসব হামলার বিচার চাই।

১৪. দুলাল কান্তি মুহুরী (৭৪), পিতা- মৃত. সত্যেলাল মুহুরী, মাতা- মৃত. যুবমায়া মুহুরী, সরকারি চাকুরীজীবী (অব.) এখন ব্যবসায়ী, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী।

দুলাল কান্তি মুহুরী বলেন, ১৯৯৪ সালে দুর্গাপাড়ায় পুকুর ক্রয় করি। ইরফান উদ্দীন চার্চিল ইশরাত উদ্দীন জুয়েল এই দুই ভাই পুকুরটি দখল করার চেষ্টা করলে আদালতে মামলা করি। এরা আমাদের ক্রয় করা জায়গা গিয়াস উদ্দীনের সহযোগিতায় দখল করতে চায়। তারা বিভিন্ন কৌশলে পুকুর ভরাটে চেষ্টায় রত। প্রায় পুকুর ভরাট করে ফেলেছে। অথচ আদালতে মামলা চলে। জায়গার সমস্ত রেকর্ড আমাদের নামে। আমাদের পাশের ব্যক্তিগত মন্দিরগুলোতে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করে এই দুই ভাই। তাদের লক্ষ্য জায়গা দখল।

১৫. শ্যামল পালিত কাঞ্চন, সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ।

শ্যামল পালিত বলেন, কর্ণফুলি, বাঁশখালিতে, হাটহাজারীতে হামলার চেষ্টা হয়। কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এখানে পুলিশের ভূমিকা ভাল ছিল। পুলিশ সুপার রশিদুল হক একদিন এক রাত বাঁশখালিতে ছিলেন। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করার পরও সনাতন ধর্মালম্বীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

১৬. প্রফেসর রঞ্জিত কুমার দে (৭৮), পিতা- মৃত সুধাংশ বিমল দে, পেশা- অধ্যাপনা (চবি), সভাপতি, একাউন্টেট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম জেলা।

রঞ্জিত কুমার দে বলেন, সরকারি, বিরোধীদল, পুলিশ– কোনো সেক্টরের সমন্বয় ছিল না। বিষয়টি কোনো হিন্দু করেনি সেটা যদি জানাতো তাহলে ঘটনা এতো ভয়াবহ আকার ধারণ করতো না। সেটা অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট নজরে রাখা দরকার ছিল। তাদের এই উদাসীনতার কারণে আজকে এই নারকীয় কাণ্ডের কোনো সুরাহা হয়নি। আমি এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করছি, পাশাপাশি আমাদের নিরাপত্তা বিধানের আবেদন করছি।

১৭. এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, পিতা- অরবিন্দ ঘোষ, সভাপতি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম জেলা।

এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ বলেন, ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর দশমী শুক্রবার আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ নামাজ আদায় করার পর নামাজের পর মুসল্লিরা মিছিল সহকারে জেএমসেন হলে হামলা করে গেট ভেঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। এসময় প্রশাসনিক অবহেলা এবং সমন্বয়হীনতা অনুভব করি। সরকারের কোনো এমপি, মন্ত্রী, কোনো জনপ্রতিনিধি, মেয়র কেউ মাঠে ছিল না।

১৮. দক্ষিণা রঞ্জন দাশ, পেশা- প্রাইভেট চাকুরি, বড় কুমিরা জেলেপাড়া, সীতাকুণ্ড।

দক্ষিণা রঞ্জন বলেন, কালী মন্দিরে লোকনাথ মন্দিরে হামলা করার চেষ্টা করছিল কে বা কারা। হামলকারীরা মুখোশধারী ছিল। পুলিশ ঘন্টাখানেক পর এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এলাকার মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সিসি টিভি বসিয়েছে।

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সাম্প্রদায়িক হামলা

বাঁশখালীতে হামলার সময় ঘর-বাড়ি ও দোকান লুট: অষ্টমীর দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখীল ও নাপোড়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। শেখেরখীলের মোহাম্মদ সাবের আহমেদ, গণ্ডামারার মোহাম্মদ রিদোয়ান ও নাপোড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম এসব হামলায় নেতৃত্ব দেন বলে রানা দাশগুপ্ত লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, সেদিন শেখেরখীল সার্বজনীন মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। হরি মন্দিরের সামনের সড়কে হিন্দুদের ২০টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। শেখেরখীল সার্বজনীন মহাশ্মশানের সীমানা প্রাচীর ও মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। নাপোড়ায় সার্বজনীন কালীবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নাপোড়া বাজার থেকে কালীমন্দির পর্যন্ত সড়কে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩০টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় বলেও জানানো হয়। হামলায় শেখেরখীলে সুকুমার দাস, সমীর দেব, দুলাল দেব, জুয়েল শীল ও লিটন দেব এবং নাপোড়ায় জহর লাল দেব,

রতন শিকদার, আশুতোষ দেব, অনুপম দেব, জগদীশ পাল ও বোটন দেব আহত হন বলে লিখিত বক্তব্যে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে।

বাঁশখালীর পশ্চিম চাম্বল বাংলাবাজার করুণাময়ী কালীবাড়ির সার্বজনীন পূজা কমিটির দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে মন্দিরের তৈজসপত্র লুট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। এসময় প্রদীপ দাস, রঞ্জিত দাস, সবিতা বালা আহত হন। এছাড়া শীলকূপে দাস পাড়া সার্বজনীন দুর্গা মণ্ডপ, কৈবল্য যুব সংঘ পূজামণ্ডপ ও শীলপাড়া পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় বলে তথ্য দেওয়া হয় লিখিত বক্তব্যে।

১. রাজিব কান্তি গুহ (৪২), পিতা- মৃত জগদিশ কান্তি গুহ, মাতা- কুমকুম গুহ, সভাপতি, নাপুড়া শেখের খীল, কালিঘাড়া পুজা উদযাপন পরিষদ, নাপুড়া, বলছড়ি ইউনিয়ন, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

রাজিব কান্তি গুহ বলেন, ২ হাজার সনাতন পরিবারের ১০ হাজার লোকের বসবাস এখানে। ১৯৩১ সালে বাংলা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর অষ্টম দিনের মতো দুর্গা পূজা শুরু করি। শুনতে পাই বিভিন্ন পুজা মণ্ডপে হামলা হচ্ছে। একইদিন রাত ৯টায় বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো হয়ে হাজার হাজার লোক শ্লোগান দিয়ে মন্দিরে হামলা করতে আসছে শুনতে পাই। পূজা তাড়াতাড়ি শেষ করে আমরা মন্দিরে অবস্থান নেই। চাম্বল বাজার সংলগ্ন বাজারে গেটে ছিল। সেটি ভাঙছে, আমরা প্রতিবাদ করি। এই ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ৩০/৪০ জন লোক আহত হয়েছে। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছে। রাতে অন্ধকারে আমরা কাউকে চিনতে পারিনি। অনেকে মুখোশপরা ছিল। প্রায় ৫ হাজার মতো লোক হামলায় অংশ নেয়। আমরা এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

২. শ্যামল কান্তি দাশ (৫৫), পিতা- মৃত. অমরজিৎ দাশ, মাতা- মিনা রানী দাশ, পেশা- ব্যবসা, বাঁশখালী পৌরসভা।

শ্যামল শান্তি দাশ বলেন, ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর ঘটনার দিন পৌরসভার বিভিন্ন পুজা মণ্ডপে পরিদর্শন করছিলাম। এসপি সাহেব মামলা করতে বলেন, আমি আইনজীবী হিসেবে মামলার আরজি তৈরি করি। আমাদের দাবি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার করার কিন্তু পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। বাঁশখালীতে বারবার এমন ঘটনায় হতাশ স্থানীয় এমপি মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেছেন, পুলিশ তার কথা শুনে না। তিনি ঘটনার সময় এলাকায় ছিলেন। এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আক্রমণকারীরা হুমকি দিচ্ছে আমাকে।

৩. ডা. আশীষ শীল, বাঁশখালী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি।

ডা. আশীষ শীল বলেন, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর অষ্টমীর দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখীল ও নাপোড়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক

হামলা চালানো হয়। ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর বাশখালী পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় হামলা হয়। পৌরসভা এলাকা চাম্বল, বাংলা বাজার ও জেলেপাড়ায় হামলা করে মাদ্রাসার ছাত্ররা। এছাড়া পৌরসভার অফিস গণ্ডিতেও হামলা করে তারা। এ সময় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। এরপর থেকে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। যদিও এ মামলার আরজি ছিল আমার ও বাদী পুলিশ।

৪. এডভোকেট উত্তম কারণ, বাঁশখালী উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

এডভোকেট উত্তম কারণ বলেন, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে হঠাৎ করেই বাঁশখালীর পশ্চিম চাম্বল বাংলাবাজার জলদাশ পাড়ার পূজামণ্ডপে হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই তাণ্ডবে মোট ১৫টি মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। একটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করাসহ বাকি ১৪টি মন্দিরের তোরণ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। হামলার সময় নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় মো. সাবের আহমেদ, মো. রিদোয়ান ও মো. শামছুল ইসলাম। এরা সবাই শেখেরখীল, গণ্ডামারা, নাপোড়ার বাসিন্দা। এদের হামলায় শেখেরখীল সর্বজনীন মন্দির ধ্বংস হয়েছে, হরি মন্দিরের সামনের সড়কে ২০টি হিন্দুর দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। এসময় ৪০-৪৫ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৪ জনকে চট্টগ্রাম পাঠাতে হয়েছে। যাদের পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে ২ জন চিকিৎসা নিয়ে চলে আসে। একজন একদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। অন্য একজন দুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে যায়। আরও একজন চকরিয়া খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় চলে যায়। তবে হামলার সময় আমাদের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান খুব কার্যকর ভূমিকা নিয়েছেন। উনি নিজে রাতেই বিভিন্ন মন্দিরে গেছেন রাত ৩টা-৪টা পর্যন্ত। উনার ভূমিকার কারণে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

৫. সাংবাদিক উজ্জ্বল বিশ্বাস, দৈনিক কালের কণ্ঠের বাঁশখালী উপজেলা প্রতিনিধি ও বাঁশখালী প্রেস ক্লাবের সদস্য ।

উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে হঠাৎ করেই বাঁশখালীর পশ্চিম চাম্বল বাংলাবাজার জলদাশ পাড়ার পূজামণ্ডপে হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তান্ডবলীলা। কয়েকদিনের ঘটনায় মনে হয়েছে, এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কোনো এক অপশক্তি কোথাও থেকে কলকাঠি নাড়ছে দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করতে। কিন্তু যে বা যারাই ঘটনা ঘটাক না কেন তা খতিয়ে দেখা, ক্ষতিগ্রস্তদের অভয় ও নিরাপত্তা দেওয়া এবং অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে শাস্তির ব্যবস্থা তো সরকারকেই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ দেশের সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের ওপরই ভরসা করে। দেশে কয়েকদিন ধরে যা ঘটেছে তাতে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। কিছু ক্ষতি তাৎক্ষণিক যেমন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষত্ন হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল তাতে সংঘটিত ঘটনাগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এছাড়া সুদূরপ্রসারী যে ক্ষতিটা হলো তা হচ্ছে, শেখ হাসিনার শাসনকালেও সংখ্যালঘুরা উৎপীড়িত হলো! শরীরে জখমের দাগ হয়ত একদিন শুকিয়ে যাবে, বাড়িঘর, মন্দির আবার নির্মিত হবে কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত কখনো শুকাবে না ব্যথিতদের।

দীর্ঘদিন বাঁশখালীতে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লিখে কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করে সাংবাদিক উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি দরখাস্ত দিয়েও কোনো প্রতিকার পাইনি। লিখিত দরখাস্তে বলেছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমস্কার; আমি আপনার দপ্তরে সরাসরি উপস্থিত হয়ে ২০২১ সালের ৯ মার্চ একখানা অভিযোগ দিয়েছিলাম। তাতে লিখেছিলাম দেশে নাশকতার আশংকার ভয়ঙ্কর তথ্য। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব ইফতিখার উদ্দিন আরাফাতের ভাই জিয়া উদ্দীন ফাহাদ একজন ভয়ঙ্কর জঙ্গি। তার হাত দিয়েই চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় ইউএনও'র তালিকা হয়। সেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এই জঙ্গি এখন কাতারের দোহায় পলাতক। দেশটির রাষ্ট্রদূত তাকে সেখানে নিয়ে গেছেন। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জঙ্গি জিয়াউদ্দিনের এলাকায় জায়গা কিনেছে। এছাড়া বাঁশখালী তে ২০১৩ সালে নাশকতার ঘটনায় ওএসডি হওয়া ইউএনও শাব্বির ইকবাল চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তার ৪ ভাই চট্টগ্রাম মহানগরীর জামায়াতের বড় নেতা। তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। বিষয়টি তদন্ত করলে নাশকতার পুরো রহস্য বের হবে।

৬. সুপল মিত্র (৩৪), বাবা- পরিমল মিত্র, মাতা- কৃষ্ণা মিত্র, পেশা- ব্যবসা, নাপুড়া, বাঁশখালী।

সুপল মিত্র বলেন, ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর নবমী দিন রাত ১০টায় কালী বাড়ির সামনে ৫ হাজার লোক নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিতে দিতে আমাদের এলাকায় আসে। সবাইকে চিনতে পারিনি। পরিচিতদের মুখ বাধা ছিল। শার্ট, পাঞ্জাবী এইসব পড়েছিল। এসেই ইট পাটকেল মারতে থাকে, আমিও আহত হই। আমাদের ৩৫ জন আহত হয়। হিন্দুদের ধর, জ্বালিয়ে দে, ভাইদের ধর মার– এই সব বলে আক্রমণ করে। তবে প্রতিমা ভাঙতে পারেনি। এসময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কার্যত কোনো ভূমিকা তারা রাখেনি। ঘটনার পর মামলা করা হয়, আসামীও ধরা হয়েছে। মামলার বাদী মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

৭. ডা. গুরুধন দাশ, পশ্চিম চাম্বল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, পশ্চিম চাম্বল করুণাময় কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি।

ডা. গুরুধন দাশ বলেন, ১৩ অক্টোবর ২০২১ রাতে পূজার শেষের দিকে ওরা হামলা করে। গেইট ভাঙ্গতে শুরু করলে আমরা এগিয়ে গেলে আমি আহত হই। মাথায় ব্যাথা পাই। হামলার সময় আমিসহ ৩৫ জন আহত হয়েছে। বাঁশখালীতে যারা আহত হয়েছেন তাদের তালিকা লিখিতভাবে গণকমিশনের নিকট প্রদান করেছি।

আহতদের নামের তালিক– ১) রাম প্রসাদ (৩০), পিতা: মৃত. যুগ্ম দাশ, সন্ধ্যা মোহন দাশ (৭৮), পিতা: সোনাই চরণ দাশ, ৩) মধুরাম দাশ (৩০), পিতা: মৃত সাধন

চন্দ্র দাশ, ৪) রতন দাশ (৩০), পিতা: বাবুল দাশ, ৫) কাজল দাশ (২৮), পিতা: মৃত. গৌর হরি দাশ, ৬) ভূবন দাশ (২৫), পিতা: সাধন দাশ, ৭) অধীর দাশ (৩০), পিতা: মৃত রামকৃষ্ণ দাশ, ৮) রবি দাশ, পিতা: বাইট্টা দাশ, ৯) রাশনা দাশ, স্বামী: গোপাল দাশ, ১০) প্রদীপ দাশ (২৮), পিতা: বাইচ'টা দাশ, ১১) সজীব দাশ (২২), পিতা: মৃত সুখলাল দাশ, ১২) সজল দাশ (২০), পিতা: মৃত সুখলাল দাশ, ১৩) পরি দাশ (৪০), পিতা: মৃত ভুতা রাম দাশ, ১৪) কালু দাশ (৫০), পিতা: মৃত পেটান দাশ, ১৫) ব্রজন্দ্র দাশ (৬০), পিতা: মৃত গোপাল দাশ, ১৬) শ্রীধর দাশ (৪০), পিতা: মৃত কালীপদ দাশ, ১৭) সুখলাল দাশ (৫৫), পিতা: মৃত রামকৃষ্ণ দাশ, ১৮) সাগর দাশ (২০), পিতা: সুনীল দাশ, ১৯) রতন দাশ (৪৫), পিতা: মৃত নিকুঞ্জ দাশ, ২০) নিয়তীর মা (৫৫), স্বামী: মৃত মনোরঞ্জন দাশ, ২১) ললিতা দাশ (৬০), স্বামী: মৃত সুরেশ দাশ, ২২) শ্যামাপদ দাশ (৪০), পিতা: মৃত রাধা মোহন দাশ

চট্টগ্রাম কর্ণফুলীতে হামলা

২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর কর্ণফুলী থানার জুলধা জেলেপাড়া পূজামণ্ডপে স্থানীয় জয় বাংলা ক্লাব থেকে এসে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া স্থানীয় দুই ভাই জয়নাল ও মনিরের নেতৃত্বে এই হামলা হয়। স্থানীয় ওসি দুলাল মাহমুদ হামলা হতে পারে- এমন খবর আগে থেকে জানা সত্ত্বেও হামলা প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

১. রুপেন চৌধুরী, কর্ণফুলী পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি।
রুপেন চৌধুরী বলেন, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার জুলধা ইউনিয়নের শাহমিরপুর এলাকার সনাতন পাড়ায় হামলায় মণ্ডপের তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর হয়। জুলধা ইউনিয়নের সনাতন পাড়ায় জুরধা-শাহমিরপুর সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদের মণ্ডপে ৩০-৩৫ জনের একদল লোক এসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে হামলা চালায়। এতে তিনটি মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চট্টগ্রামের বন্দর থানার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাশে জুলদা জেলেপাড়া পূজামণ্ডপে স্থানীয় জয়বাংলা ক্লাবের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় ইলিয়াস মেম্বার, জয়নাল ও মনিরের নেতৃত্বে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টায় এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

২. সজল দাশ, কর্ণফুলী পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি।
সজল দাশ বলেন, অষ্টমীর দিন ১৩ অক্টোবর ২০২১-এ ১৫/১৬ বৎসরের এক কিশোর এসে গান বাজনা বন্ধ করতে বলে, আমরা বন্ধ করে পূজা করি। এরপর ইউএনও আসে। মাগরিবের পর পূজামণ্ডপে ১৫০ জন লোক আসে। এদের মধ্যে দুলাল নামের

একজন জেনারেটর বন্ধ করতে বলে, গালাগালি করে, মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এরপর সবাই মিলে মূর্তি ভাঙচুর, বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর, মেয়েদের গালিগালাজ করে। হামলার পরের দিন ঘটনা ধামাচাপা দিতে ফারুক চেয়ারম্যান ৩ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল আমাদের। কিন্তু আমরা তার এ প্রস্তাব অস্বীকার করলে তিনি আমাদের হত্যার হুমকি দেন। তার ভয়ে আমি এখন বাসায় থাকতে পারি না। আমি মামলা করেছিলাম। কিন্তু ওসি, ফারুক চেয়ারম্যান, ইলিয়াছ মেম্বার বৈঠক করে মামলা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছেন। ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার না করে অন্যদের ধরা হয়েছে। আমাদের ২২০ পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

৩. দেবরাজ রতন, পিতা- মাস্টার রতন চন্দ্র শীল, মাতা- মায়া দেবী, সাবেক কর্ণফুলী পূজা উদযাপন পরিষদ, ২নং ওয়ার্ড চর লক্ষ্মী, কর্ণফুলী।
দেবরাজ বলেন, ইউএনওসহ আমরা হামলা হওয়া জায়গায় পরিদর্শনে গেলে আসামীরা সবাই স্পটে ছিল। তারা বলেন, উনাকে দিয়ে কি হবে-বলে হুমকি দেয়। বড় উঠানের পূজা মন্ডপে ছিলাম। জামতলা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে গেল। জয় বাংলা সংগঠনটি জামায়াত বিএনপি কর্মীদের নিয়ে গঠিত। এলাকাটি বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। আশেপাশের কেউ হামলা করেনি। জাকির পাড়া থেকে হামলা হয়। জয় বাংলা সংগঠনের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে এ হামলা করা। হামলাকারীদের অতীতের নাশকতা মামলার আসামীও আছে। স্থানীয় বাসিন্দা জয়নাল, সেলিম, ইলিয়াছ মেম্বাররা সংগঠনটি চালায়। মনির জামায়াতের কর্মী ছিল, এখন যুবলীগ কর্মী হামলার সময় তিনি নেতৃত্ব দেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় পূজামণ্ডপসহ হিন্দু বাড়িতে হামলা

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পেকুয়া উপজেলা শাখার সভাপতি প্রদীপ কুমার সুশীল বলেন, দুর্বৃত্তদের হামলায় পেকুয়া সদরের বিশ্বাসপাড়া পূজামণ্ডপের গেটসহ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া শিলখালী ইউনিয়নের শীলপাড়া পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে পুলিশসহ আইন-শৃংখলা বাহিনীর টহল জোরদার হলেও স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানান তিনি।

১৩ অক্টোবর রাতে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার শীলখালীর দু'টি পূজামণ্ডপে প্রতিমা এবং স্থানীয় হরিমন্দিরে লুটপাট ও ভাঙচুরের পাশাপাশি ১৬টি বসতঘরও লুট করা হয়। এছাড়া মগনামা ইউনিয়নের ১২টি ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট এবং একটি ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। স্থানীয় সরস্বতী মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। পেকুয়া সদর, বারবাকিয়া ইউনিয়ন এবং চকরিয়ায় ৫টি মণ্ডপ ও স্থানীয় লোকনাথ মন্দিরে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়।

১. কুমার কাঞ্চন মনি, পেকুয়া সুশীল পাড়া পুজা পরিষদের সভাপতি।

কুমার কাঞ্চন বলেন, ২০০৫ সাল থেকে মণ্ডপে পূজা করে আসছি। প্রতিবারই পূজা শুরুর আগে মন্দিরে পুলিশ থাকে কিন্তু এইবার (২০২১ সালে) ছিল না। সমন্বয় সভা করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ। প্রশাসনের উদাসীনতায় সেই সভা না হওয়ায় পুলিশ মোতায়েন হয়নি মন্দিরে। যদিও থানার ডিউটি অফিসার আব্দুর রউফ আগে থেকে বলেছিলেন সাম্প্রদায়িক হামলা হতে পারে। স্থানীয় চেয়ারম্যানও এই কথা বলেছিলেন। তিনি সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা সংখ্যায় কম, মাত্র ৩০টি পরিবার। ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর শুনতে পাই হামলা হবে। প্রতিরোধ করব সিদ্ধান্ত নিই। আমার ছোট ভাই ফোন করে বলল মিছিল নিয়ে আসছে, মন্দিরে হামলা হবে। বিশ্বাসপাড়া মন্দিরে ইতিমধ্যে হামলা শুরু হয়েছে, গুলির শব্দ শুনি। বাইরের লোক জেনারেটর বন্ধ করে বলেন, আমরা করিনি। আমাদের উপর হামলা শুরু করলে ডিউটি অফিসার, ওসি এদের ফোন করলে কোনো সাড়া পাইনি। ইউএনও, এএসপি, এডিসি সবাইকে ফোন করি। সবাই দেখছি বলে, কিন্তু কোনো সহযোগিতা করেনি। যাদের ফোন করি ওসি ছাড়া সবাই আমাদের সনাতন ধর্মের। আমি আমার বাড়িতে বসে ফোন করেছি। চৌকিদারগুলো তথ্য সরবরাহ করেন হামলা করে আমার গেট ভাঙ্গা হয়। সঙ্গে থাকা র‍্যাব পুলিশ ছিল মিছিলকে সহযোগিতা করেছে। আমি দেখতে পাইনি তবে যারা দেখেছে তারা বলেন, প্রতিবেশী হামলায় সহযোগিতা করেন। আমার বাড়ির পাশে ৫০/৬০টি মুসলিম বাড়ি আছে। সন্ধ্যা পূজার প্রস্তুতি চলছে তখন আমার বাড়ির পশ্চিম পাশে মুসলিম বাড়ি আছে সেখানে তারা নিজ থেকে আগুন জালিয়ে দিল। বিষয়টি পরিকল্পিত মনে হয়। ১৩ অক্টোবর ২০২১ শিববাড়ি হরি মন্দিরে ভাঙ্গার পর আমি দেখি প্রতিমা ভাঙার পর প্রস্রাব করে দেয়। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও জড়িতদের আসামী করা হয়নি।

২. রঘু মনি (৩০), পিতা- সুরেষ কুমার সুশীল, মাতা- কুন্তে রানী সুশীল, পেশা- আইনজীবী, পেকুয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।

রঘু বলেন, পুজা মন্ডপের গেইট ভাঙার পর আমাদের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করে। আমরা শহরে থাকি, উৎসবে বাড়িতে যাই। প্রতিবেশিরাই আমাদের গেট ভেঙেছিলেন। ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা নির্ঘুম ছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বিনা কারণে আমরা হামলার শিকার হয়েছি তাই বাড়িতে থাকব না। আমাদের পরিচিত একজন বাদি হয়ে মামলা করেছেন। তবে আমার ধারণা যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের আসামি না করে যারা আক্রমণ ঠেকাতে গিয়েছে তাদের মামলার আসামী করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুর ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা সম্পর্কে ‘বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন’-এর নিকট সাক্ষীদের লিখিত জবানবন্দি

১. সাংবাদিক তপন চক্রবর্তী, বিএফইউজের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলানিউজ২৪ চট্টগ্রাম ব্যুরো চীফ।

সাংবাদিক তপন বলেন, আমরা ২০২১ সালের ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করি। উক্ত সমাবেশে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা তাদের বক্তব্যে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান। সিইউজে সাধারণ সম্পাদক ম শামসুল ইসলামের সঞ্চালনায় ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আলী আব্বাস এর সভাপতিত্বে এ সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, সিইউজে সভাপতি মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি রতন কান্তি দেবাশীষ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সহ-সভাপতি শহীদ উল আলম, মোস্তাক আহমেদ, আবু তাহের মোহাম্মদ, দৈনিক জনকণ্ঠের যুগ্ম-সম্পাদক মোয়াজ্জেমুল হক, বিএফইউজের সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব আসিফ সিরাজ, সিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্মল চন্দ্র দাশ, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহসিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক নজরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নুর উদ্দিন, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক আপ্যায়ন সম্পাদক রোকসারুল ইসলাম, বিএফইউজে সদস্য আজহার মাহমুদ, সিইউজের টিভি ইউনিটের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) মাসুদুল হক, সিইউজের সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহমেদ কুতুব, সাংবাদিক বিশ্বজিৎ বড়ুয়াসহ বিএফইউজে, সিইউজে ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বর্তমান ও সাবেক নেতারা।

সম্প্রীতি সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজের যুগ্ম-মহাসচিব মহসীন কাজী, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি মনজুর কাদের মনজু, সিইউজের সহসভাপতি অনিন্দ্য টিটো, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের আপ্যায়ন সম্পাদক আইয়ুব আলী, প্রচার সম্পাদক রাশেদ মাহমুদ, সিইউজের অর্থ সম্পাদক কাশেম শাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইফতেখারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ইফতেখার ফয়সাল, নির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ মহরম হোসাইন, দৈনিক আজাদীর ইউনিট প্রধান খোরশেদ আলম, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের ইউনিট প্রধান স ম ইব্রাহিমসহ চট্টগ্রামে কর্মরত সকল গণমাধ্যম কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে রুখে দাঁড়াতে হবে। হিন্দুদের বসতবাড়ি, মন্দিরসহ বিভিন্ন স্থানে আগুন, হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। ধর্মীয় পরিচয় নয়, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। যারা এই সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে চায় তাদের শনাক্ত করতে হবে। ধর্ম, মত ও পথ ভুলে এক্ষেত্রে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্ম পালনের অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

২. প্রীতম দাশ, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন এর সদস্য ও দৈনিক ভোরের কাগজের চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি।

প্রীতম দাশ বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটানো এবং হিন্দুদের ভয়ভীতি দেখাতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে আমি মনে করি। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর থেকে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের ফলাফল হচ্ছে এসব ঘটনা। আমি ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষী ও ইন্ধনদাতাদেরকে অতিদ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

২০২১ সালের ১০ অক্টোবর নগরীর ফিরিঙ্গী বাজার শিববাড়ির মন্দিরে একটি প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়। ১১ অক্টোবর পটিয়া থানার বরলিয়ার একটি মন্দিরে ভাঙচুরও হামলা চালানো হয়। ১৩ অক্টোবর কুমিল্লার বিভিন্ন মন্দির ও পূজা মণ্ডপে হামলার পরেও সরকার কেন হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলো না? এতো বড় একটি সাম্প্রদায়িক হামলার পরিকল্পনার কথা গোয়েন্দা বিভাগের কেউ কি জানেন না? ১৩ অক্টোবরের ঘটনার সাথে সাথে দেশব্যাপী হিন্দুদের মন্দির ও পূজা মণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন করা দরকার ছিল কিন্তু সরকার সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কুমিল্লার ঘটনার পরপরই চট্টগ্রাম জেলার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আমাদের সংগঠনের নেতারা বৈঠকে বসেছেন। সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা বলা হলেও কোনো ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাইনি। যার ফলে ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম শহরে ও বিভিন্ন উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালির রক্তে মিশে আছে। তাই তো ধর্মের ভিত্তিতে গড়া রাষ্ট্র পাকিস্তান টিকতে পেরেছিল মাত্র ২৩ বছর। একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। বাংলাদেশের সংবিধানেও সেই চেতনার ঠাঁই হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি। কিন্তু সামরিক শাসকরা বারবার নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় একাত্তরের পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। এরশাদ আরও একদফা বাড়িয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে হেফাজতের তাণ্ডব সম্পর্কে 'বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'-এর নিকট সাক্ষীদের জবানবন্দি

১. ড. মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী, হাটহাজারীর স্থানীয় বাসিন্দা ও বাশখালী নজির আহম্মদ কলেজের প্রভাষক।

ড. মোহাম্মদ মাসুম বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ জুমার নামাজ শেষে হাটহাজারী দারুল উলুম মইনুল ইসলামসহ মাদ্রাসা এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মাদ্রাসা ও মসজিদ থেকে মিছিল বের করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এসময় মিছিল থেকে হাটহাজারী থানায় ভাঙচুর করা হয়। পরে তারা হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ভূমি অফিসে নথি বের করে এনে তাতে আগুন দেওয়া হয়। তাদের অগ্নিসংযোগ থেকে বাদ যায়নি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িও। উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করে প্রাথমিকভাবে সুবিধা পাওয়া গেলেও চূড়ান্তভাবে এরা ক্ষতিকর। এদের সঙ্গে সমঝোতা করে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান তার জ্বলন্ত উদাহরণ। যেকোনো আন্দোলন বা প্রতিবাদের শিষ্টাচার আছে। হেফাজতে ইসলাম নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করেছে। থানা কিংবা ভূমি অফিস জনগণের সম্পদ। এসবের ক্ষতি করা কোনো আন্দোলনের কর্মসূচি হতে পারে না।

নরেন্দ্র মোদির সফরকে ঢাল হিসেবে দেখিয়ে হেফাজতে ইসলাম সরকারকে তাদের অতীতের আচরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে। কারণ হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্ব নির্বাচনে এবার সরকারপন্থি কওমি নেতাদের হস্তক্ষেপ ছিল। কিন্তু এর ভেতরে থাকা সরকারপন্থিরা হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে আসতে পারেনি। এসব নিয়ে সংগঠনটির শীর্ষ নেতারা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করছেন নানাভাবে। যার ফলে মোদিবিরোধী কর্মসূচির নামে তারা সহিংসতা প্রদর্শন করে থাকতে পারে।

৩. একরামুল হক শিকদার, হাটহাজারী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের নাজির।

একরামুল হক বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে হেফাজতকর্মীদের তাণ্ডবে সদর ভূমি অফিস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় এসি ল্যান্ড অফিসও। উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়ে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের তাণ্ডবের ঘটনায় আমি একটি মামলা করি। সেই মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। তাণ্ডব চালিয়ে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা হাটহাজারী উপজেলা সদর, ফতেপুর ও মেখল ইউনিয়নের ১৭টি মৌজার নামজারি খতিয়ান, খাজনা ও খতিয়ান

বইসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল-দস্তাবেজ তছনছ করে। এসি-ল্যান্ড শরীফ উল্যাহ'র সরকারি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এসি-ল্যান্ড অফিসের বাইরে লাগানো ৬টি সিসিটিভি ক্যামেরাও ভাঙচুর করে তারা। সেদিন মূল ফটক বন্ধ থাকায় সীমানা দেয়াল টপকে সদর ভূমি ও এসি ল্যান্ড অফিসে ঢুকে তারা। হেফাজতের নেতাকর্মীদের তাণ্ডবে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। তাদের বিচারের আওতায় এনে সাজা না দিলে অপরাধীরা বারবার হামলা করার সাহস পেয়ে যাবে।

৪. আক্তার কামাল চৌধুরী, সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা।

আক্তার কামাল চৌধুরী বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে হেফাজতকর্মীদের তাণ্ডবে সদর ভূমি অফিস তাণ্ডব চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক দলিল দস্তাবেজ নষ্ট করে দেয়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ভূমি অফিসে। সেইদিন হেফাজতের কর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে পুরো সদর ভূমি অফিস ধ্বংসলীলায় পরিণত করে। তাণ্ডব চালিয়ে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা উপজেলা সদর, ফতেপুর ও মেখল ইউনিয়নের ১৭টি মৌজার নামজারি খতিয়ান, খাজনা ও খতিয়ান বইসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল-দস্তাবেজ তছনছ করে দেয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জমিন এর দলিল পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এরপর আমি নিজে বাদি হয়ে একটি মামলা করি। মামলাটির বর্তমান কার্যক্রম চলছে।

৫. শাহাব উদ্দিন, হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় হাটহাজারী মাদ্রাসার গেটসংলগ্ন শাহ প্রিন্টিংয়ের মালিক।

শাহাব উদ্দিন বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরে হাটহাজারী উপজেলায় দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা ও আশেপাশের কয়েকটি কওমি মাদ্রাসার ছাত্র এবং হেফাজতে ইসলামের কর্মী আর পুলিশের মাঝে সংঘাত- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । ওইদিন হাটহাজারী ভূমি অফিস ও ডাকবাংলোতেও হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা ভাঙচুর চালিয়েছে। ২৬ মার্চ দুপুর সোয়া ২টার দিকে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে মিছিল নিয়ে হাজারখানেক ছাত্র আনুমানিক ৫'শ মিটার দূরে থানার সামনে যায়। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল। তবে মাদ্রাসার মাইক থেকে তাদের ফেরত যেতে বলা হচ্ছিল কিন্তু ছাত্ররা থানার সামনে গিয়ে হঠাৎ ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। থানার সামনে লাগানো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্রদের ছোঁড়া ইট-পাথরের টুকরায় থানার সামনের কাঁচের দরজা ভেঙে যায়। বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ প্রথমে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে। এরপর পুলিশ ও হেফাজত কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশ আরও কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার পর মাদ্রাসার ছাত্ররা পিছু হটে। হেফাজতের তাণ্ডবের কারণে ৪দিন ধরে কোনো ব্যবসা করতে পারিনি ওই সময়টাতে। ঘটনার সময় আমার দোকান ভাঙচুর করেছে ছাত্ররা। এখনো আতংকের মধ্যে থাকি সবসময়।

৬. মাওলানা রফিকুল ইসলাম, হাটহাজারী কাচারি রোড়ের আমির এরশাদ শপিংমলে অবস্থিত শেফা ট্রেডিং কর্পোরেশন এর স্বত্ত্বাধিকারী।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ জুমার নামাজ শেষে হাটহাজারী দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসা এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মাদ্রাসা ও মসজিদ থেকে মিছিল বের করে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এসময় মিছিল থেকে হাটহাজারী থানায় ভাঙচুর করা হয়। পরে তারা হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ভূমি অফিসে নথি বের করে এনে তাতে আগুন দেওয়া হয়। তাদের অগ্নিসংযোগ থেকে বাদ যায়নি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িও। পুলিশ হেফাজতের কর্মীদের মাঝে সংঘাত ও গোলাগুলির কারণে আমরা কয়েকদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারিনি। ২৬ মার্চ পুলিশের গুলিতে ৪ জন হেফাজতের কর্মী নিহত হলে হাটহাজারী আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। হেফাজতে ইসলামের উচিত ছিল মানুষের জান মালের কোনো ধরনের ক্ষতি না করা। মানুষের জান মালের ক্ষতি করা ইসলাম সমর্থন করে না। ২০২১ সালের ২৭ মার্চ সরাসরি রাস্তায় দেয়াল নির্মাণ করে হেফাজত একটি অমানবিক কাজ করছে বলে আমি মনে করি। নিরপেক্ষ তদন্ত করে এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

৭. সাংবাদিক মুহাম্মদ সেলিম, হাটহাজারী সদর উপজেলার বাসিন্দা ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার চট্টগ্রাম বিভাগের সিনিয়র রিপোর্টার।

সাংবাদিক মুহাম্মদ বলেন, ঢাকার বায়তুল মোকাররমে মুসল্লি ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় হামলার প্রতিবাদে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ জুমার নামাজের পরে মিছিল বের করে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মী ও দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসাসহ কয়েকটি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। তারা হাটহাজারী মাদ্রাসার সামনে থেকে মিছিল সহকারে এসে হাটহাজারী থানা ঘেরাও করে। এ সময় হেফাজত কর্মীরা বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে থানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ভাঙচুর করে থানা কম্পাউন্ড। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ রাবার বুলেট ছুঁড়লে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় হাটহাজারী সদর এলাকা। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের পর হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা পিছু হটলেও থানার অদূরবর্তী এলাকায় অবস্থান নেয় এবং চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

এ সময় পুলিশ বাধা দিলে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ ফাঁকা গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চারজন মারা যায়। এদের মধ্যে তিনজন মাদ্রাসা ছাত্র ও একজন পথচারী। নিহতরা হলেন– হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র কুমিল্লা জেলার মো. রবিউল ইসলাম, মাদারীপুর জেলার মো. মেহরাজুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জেলার মো. আব্দুল্লাহ মিজান এবং পথচারী হাটহাজারী

উপজেলার মো. জসিম। ২৬ মার্চ হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্ররা চার পুলিশকে অবরুদ্ধ করে। মাদ্রাসায় নিয়ে তাদের মারধর করা হয়। তাদের মধ্যে এএসপি (শিক্ষানবীশ) প্রবীর ফারাবী ও এসআই মেহেদীকে মারধর করার কারণে গুরুতর আহত হয়।

৮. সাংবাদিক বাবলু দাস, হাটহাজারী প্রেস ক্লাব এর সদস্য ও দৈনিক ভোরের কাগজের হাটহাজারী উপজেলা প্রতিনিধি।

সাংবাদিক বাবলু বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের পর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে পুলিশের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় হাটহাজারী থানা, ভূমি অফিস ও উপজেলা ডাকবাংলোতে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। পুলিশের গুলিতে ৪ হেফাজত কর্মী নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এ সংঘর্ষের চারদিন পর ৩০ মার্চ রাতে হাটহাজারী থানায় পুলিশ বাদি হয়ে চারটি ও ভূমি অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটিসহ মোট ছয়টি মামলা করে। এসব মামলায় কারও নাম উল্লেখ না করে কয়েক হাজার অজ্ঞাত আসামী করা হয়। পরবর্তীকালে পুলিশ কয়েকজন হেফাজত নেতাকর্মীদের আটক করে। হাটহাজারীতে হেফাজতের নেতাকর্মীদের তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। হেফাজত বারবার ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে আর সবসময় পার পেয়ে যায়। আমার দাবি হচ্ছে, কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে ওদেরকে।

৯. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, হাটহাজারী সদর উপজেলার বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী।

মুহাম্মদ সাইফুল বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে হেফাজতকর্মীরা মিছিল বের করে। এ সময় মিছিল থেকে হাটহাজারী থানায় আক্রমণ করে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। এ নিয়ে পুলিশ গুলি চালালে হেফাজতে ইসলামের ৪ কর্মী নিহত হয় এবং বহু আহত হয়। পরে হেফাজতের কর্মীরা হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ভূমি অফিসের নথি বের করে এনে তাতে আগুন দেওয়া হয়। তাদের অগ্নিসংযোগ থেকে বাদ যায়নি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি। গাড়িটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল সবার চোখের সামনে। ফায়ার সার্ভিসের কোনো গাড়ি স্পটে আসতে দেয়নি হেফাজতের কর্মীরা। ২৬ মার্চের ঘটনার পরেও হাটহাজারীতে হেফাজতের নেতাকর্মীরা কয়েকদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল সদর উপজেলা। ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক ভাবে করতে দেয়নি। সেদিন হেফাজতের মিছিল থেকে থানায় ইটপাটকেল ছুঁড়ে মেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। আমি মনে করি হেফাজতে ইসলামের এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী এবং দেশদ্রোহী কাজ। তাদেরকে আইনের আওতায় এনে সাজা দেওয়া হোক।

১০. মাওলানা ইউনুস আলী, প্রত্যক্ষদর্শী হাটহাজারী উপজেলার চারিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

মাওলানা ইউনুস আলী বলেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার প্রবীর ফারাবি হাটহাজারী সরকারি ডাকবাংলোয় থাকেন। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ তাকে সেখান থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে পেটাতে থাকে হেফাজতের কর্মীরা। সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সরকারি গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ভূমি অফিসে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা। এরপর হেফাজত কর্মীরা তেড়ে যায় হাটহাজারী মডেল থানায়। সেখানে পুলিশের ওপর হামলা করে। কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে গুলি করতে বাধ্য হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গুলিবিদ্ধ আটজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

২০২১ সালের ২৭ মার্চ হাটহাজারীতে বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা এমনকি থানায় হামলার পরদিন চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে ইটের দেয়াল তুলে বিক্ষোভ করে মাদ্রাসার ছাত্র ও হেফাজতের কর্মীরা। দেয়ালের সঙ্গে কিছু লোহার কলাপসিবল গেটও রাখা হয়। ওই সময় মানুষের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। হেফাজতে ইসলাম নিজেকে একটি ইসলামিক সংগঠন দাবি করে, আমার কথা হচ্ছে তাদের এসব ধ্বংস ও মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কি ইসলাম অনুমোদন দেয়? হেফাজতের এসব কর্মকাণ্ড অবৈধ বলে মনে করি। সরকারের উচিত হেফাজতের লাগাম টেনে ধরা।

১১. মাওলানা মীর ইদ্রীস, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক।

মাওলানা মীর ইদ্রীস বলেন, ২০২১ সালের ২৬ মার্চ জুমার নামাজের পর হেফাজতের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ কোনো কারণ ছাড়াই হেফাজত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে। পরে পুলিশের সঙ্গে হেফাজত নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিনা উস্কানিতে পুলিশ সেদিন হেফাজতের মিছিলে গুলি চালিয়ে আমাদের ৩ জন কর্মী ও একজন পথচারীকে হত্যা করে। হেফাজতের নেতাকর্মীরা কোনো ধরনের হামলা করেনি। সরকার দলীয় ক্যাডার বাহিনী সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে হেফাজতের নামে চালিয়ে দিয়েছে। হেফাজতে ইসলাম মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হোক সেটা চায় না। হেফাজতে ইসলামের আদর্শ জ্বালাও পোড়াও নয়। পুলিশ বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে হয়রানি করছে। আমাদের অনেক নেতাকর্মী বিনা দোষে কারাগারে রয়েছেন। আমি এসব নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করছি।

কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী থেকে রংপুরের পীরগঞ্জঃ সাম্প্রদায়িক হামলার সরেজমিন প্রতিবেদন

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক হিন্দু মন্দির, ঘরবাড়ি আক্রমণ ও ভাঙচুর করা হয়েছে।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশের ১৭টি জেলায় মোট ২০ বার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর বিভিন্ন মাত্রায় হামলা হয়। সবচেয়ে বেশি জায়গায় হামলা হয়। এদিন একযোগে ১০ জেলায় হামলা চলে। জেলাগুলো হচ্ছে: কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। ১৪ অক্টোবর হামলা চলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী ও বান্দরবান– এই তিন জেলায়। ১৫ অক্টোবর হামলার শিকার হন ৩টি জেলার নোয়াখালী, সিলেট ও চট্টগ্রাম-এর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৬ অক্টোবর হামলা হয় মুন্সিগঞ্জ ও ফেনীতে। ১৭ অক্টোবর হামলা হয় রংপুরের পীরগঞ্জের মাঝিপাড়ায়। রংপুরের ঘটনার পরও ২১ অক্টোবর নতুন করে হামলা হয় বগুড়ায়। এরপর ২২ অক্টোবর হবিগঞ্জে হামলা চলে।

৯ বছরে হিন্দুদের উপর ৩৬৭৯ হামলা : মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যায়, গত নয় বছরে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ৩ হাজার ৬৭৯টি হামলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১ হাজার ৫৫৯টি বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা। এই সময়ে হিন্দুদের ৪৪২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। প্রতিমা, পূজামণ্ডপ, মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৬৭৮টি। এসব হামলায় আহত হয়েছে ৮৬২ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। নিহত হয়েছে ১১ জন। এর বাইরেও ২০১৪ সালে দুজন হিন্দু নারী ধর্ষণের শিকার হন। শ্লীলতাহানি করা হয় আরও চারজনের। এছাড়া ২০১৬, ২০১৭ ও ২০২০ সালে ১০টি হিন্দু পরিবারকে জমি ও বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দখলের অভিযোগ ওঠে। বেসরকারি মানবাধিকার এই সংস্থাটি প্রতিবছরই মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০১৩ সাল থেকে হিন্দুসহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর হামলার ঘটনাগুলোও তারা প্রতিবেদনে আলাদাভাবে দিয়ে আসছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে 'আসক' নয় বছরে হিন্দুদের উপর সাড়ে ৩ হাজারের বেশি হামলার তথ্য দিলেও প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বলে দাবি করেন বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। দুর্গাপূজার মধ্যে ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর কুমিল্লার একটি মণ্ডপে কোরাণ অবমাননার কথিত অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকটি মণ্ডপ ও স্থাপনা ভাঙচুর হয়। তার জের ধরে তিন দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭০টি পূজামণ্ডপে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে বলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ হিসাব দিয়েছে।

সরেজমিন প্রতিবেদন: কুমিল্লা

কুমিল্লা শহরের নানুয়া দীঘির উত্তর পাড়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে করা একটি পূজামণ্ডপ থেকেই ঘটনার শুরু। এই পূজামণ্ডপে কোরাণ অবমাননার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে কুমিল্লা শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। এর জের ছড়িয়ে পড়ে

নোয়াখালীর চৌমুহনী, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, ফেনী এবং রংপুরের পীরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়। মন্দির-মণ্ডপে হামলা, ভাঙচুরের পাশাপাশি আক্রমণের শিকার হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার সূত্রপাত। তার আগের দিন রাত দুইটা পর্যন্ত কুমিল্লা শহরের নানুয়া দীঘির পাড়ের ওই অস্থায়ী মণ্ডপে পূজা অর্চনা চলে। হামলায় সকাল সাতটার দিকে একরাম হোসেন নামের স্থানীয় এক যুবক ৯৯৯ জরুরি সেবায় ফোন দিয়ে পূজামণ্ডপে পবিত্র কোরাণ থাকার তথ্য জানান। এতে বোঝা যায়, কোরাণ রাখা হয়েছে ১২ অক্টোবর দিবাগত রাত ২টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে। জরুরি সেবায় একরাম হোসেনের ফোন পেয়ে সাদাপোশাকেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনওয়ারুল আজিম। সেখানে গিয়ে তিনি কোরাণ উদ্ধার করেন। উপস্থিত মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ওই সময় মোহাম্মদ ফয়েজ নামের এক ব্যক্তি ঘটনাটি ফেসবুকে লাইভ করতে থাকেন। লাইভে তিনি কোরাণ অবমাননার কথা উল্লেখ করে মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্ররোচনা দেন। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে মানুষ জমায়েত হতে থাকে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফয়েজ দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির আগে আগে দেশে আসেন। কুমিল্লার কান্দিরপাড় খন্দকার হক ম্যানশনে মোবাইল ফোনের দোকান দিয়েছেন তিনি। থাকেন নানুয়া দীঘির পাড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে দিগাম্বরী তলায়। প্রায় পৌনে ছয়'শ বছরের পুরোনো নানুয়া দীঘির আশপাশে দীর্ঘদিন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বসবাস। দিন দিন সেখানে মুসলমানদের বসতি বেড়েছে। তবে এখনো দীঘির আশপাশের বাসিন্দাদের ৪০ শতাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী। নানুয়া দীঘির উত্তর পাড়ে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত নেতা আকবর হোসেনের বাড়ি। ওই বাড়ির সামনেই অস্থায়ী পূজামণ্ডপটির অবস্থান ছিল। দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র মনিরুল হকের বাড়ি। এলাকাটি একসময় কুমিল্লা শহরের অভিজাত এলাকা ছিল।

নানুয়া দীঘির পাড়ের বিক্ষোভ ও মন্দিরে হামলাকারীদের প্রায় সবাই বয়সে তরুণ। পোশাক-আশাকও সাধারণ। মণ্ডপ থেকে কোরাণ উদ্ধার এবং ঘটনাটি ফেসবুকে লাইভ করার পরই কমবয়সী ছেলেরা জমায়েত হতে থাকে। তবে শুরুতে জমায়েত হওয়াদের বেশির ভাগের দাবি ছিল, নানুয়া দীঘির পাড়ে পূজামণ্ডপ বন্ধ করে দিতে হবে। দু-একজন মণ্ডপ ভেঙে ফেলার দাবি তুললে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে।

প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা: ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর নানুয়া দীঘির পাড় ও শহরের বিভিন্ন স্থানে যেসব মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা হয়েছে, তাতে বেশি মানুষের অংশগ্রহণ ছিল না। তাদের ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যাপ্ত কঠোর অবস্থান নেয়নি। এ সময় সিটি মেয়র, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ রাজনৈতিক নেতারা নানুয়া দীগির পাড়ে উপস্থিত হয়ে মাইকে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। একদিকে বিক্ষোভ, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অবস্থানের পরও সেখানে পুলিশের সংখ্যা কম ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

দুর্বল প্রতিরক্ষার সুযোগে বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। সাড়ে ১১টার দিকে প্রথম পুলিশ টিয়ারগ্যাসের শেল নিক্ষেপসহ শক্তি প্রয়োগ শুরু করে। প্রথমেই পর্যাপ্ত পুলিশ এনে বিক্ষুব্ধ লোকজনকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারতো।

কুমিল্লায় পুলিশ সময়মতো আসেনি, অভিযোগ মন্দির কমিটির : ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে নানুয়া দীঘির পাড়ের পূজামণ্ডপে হামলা হয় । এরপর শহরের চাঁন্দমনি কালী মন্দির হামলা হলেও পুলিশ যথাযথ ভূমিকা রাখেনি। ওই মন্দির কমিটির নেতারা বলছেন, বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তিন দফায় মন্দিরে হামলা হলে ফোন করেও পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়নি।

চার ঘণ্টায় ৩ দফা হামলা: নানুয়া দীঘি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে শহরের চকবাজার এলাকায় (কাপুড়িয়াপট্টি) শত বছরের পুরনো চাঁন্দমনি রক্ষাকালী মন্দির। সেখানে সকাল ১১টার সময় প্রথম হামলা হয়েছিল। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক হারাধন চক্রবর্তী বলেন, প্রথম দফায় হামলার চেষ্টা হয়। তবে ফটক টপকে তারা ঢুকতে পারেনি। সাড়ে ১২টার দিকে আরেকবার হামলার চেষ্টা করে তারা। কিছুক্ষণ ইট-পাটকেল ছুঁড়াছুড়ি করে চলে যায়। এরপর বেলা ৩টার দিকে তারা মই, হাতুড়ি, পেট্রোল নিয়ে চূড়ান্ত হামলা চালিয়ে সব ভেঙেচুড়ে, পুড়িয়ে চলে যায়। আমি সদর থানার পরিদর্শকের (তদন্ত) সঙ্গে কথা বলেছি প্রথম দফা হামলা চেষ্টার পর ১১টার দিকে। তিনি বললেন, 'ফোর্স পাঠাবেন'। তবে সেই ফোর্স আসেনি। এরপর বেলা আড়াইটার দিকে আবারও পুলিশের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন হারাধন, তবে তাতেও ফল হয়নি বলে তার অভিযোগ। ৩ টার পর ফটকে মই লাগিয়ে হামলাকারীরা মন্দিরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়ে নির্বিঘ্নে বের হয়ে যায়। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা থেকে চাঁন্দমনি মন্দিরের দূরত্ব এক কিলোমিটারের কম। আধা কিলোমিটার দূরেই চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশ লাইনও খুব বেশি দূরে নয়। সন্ধ্যার পর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মন্দিরে আসেন। পুলিশ সুপার কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও আনসার সদস্যকে এখানে পাহারায় রেখে যান।

চাঁন্দমনি মন্দির কমিটির সদস্য বিপ্লব ধর বলেন, হামলার পর মন্দির কমিটির নেতারা পুলিশ ও স্থানীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে দফায় দফায় যোগাযোগ করেও শুধু 'পুলিশ আসছে' এই আশার বাণীই শুনেছেন তারা। শেষে যখন হামলাকারীরা মই নিয়ে আসল, তখন আমি নিজে ৯৯৯ এ ফোন করি। একজন মহিলা ফোন ধরল। আমি কইলাম, ম্যাডাম আমাগো বাঁচান। তিনি বললেন, 'চিন্তা কইরেন না ব্যবস্থা নিতেছি'।

শহরের সালাহউদ্দীন রোডে কালীগাছতলা মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি সজল কুমার চন্দ বলেন, দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের মন্দিরে হামলা হয়। এর আগে থেকে তিনি নিজে কয়েক দফা পুলিশের সাহায্য চেয়ে ফোন করেছেন কিন্তু কেউই আসেনি। পাড়ার তরুণরা একত্রিত হয়ে মন্দির রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল জানিয়ে তিনি বলেন,

হামলাকারীরা মন্দির প্রাঙ্গণ ও আশপাশের বসতবাড়িতে হামলা চালালেও তালা মেরে রক্ষা পায় মূল মন্দির ও প্রতিমা। মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা শিল্পী চক্রবর্তী বলেন, পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে প্রতিরোধ করেছে বলে রক্ষা।

কালীগাছতলা মন্দির কমিটির তরুণ সদস্য রানা চক্রবর্তী, বাপ্পী দাস জানান, তারা যখন একত্রিত হয়ে হামলাকারীদের ঠেকানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একরামুল হোসেন বাবুও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও বারবার পুলিশকে কল করছিলেন। তবে পুলিশ এসেছে হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর।

কাউন্সিলর একরামুল হোসেন বলেন, তিনি হামলাকারীদের ঠেকাতে তার কর্মীদের ডেকে নিয়েছিলেন। এসময় সহায়তা চেয়ে তিনি প্রথমে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিট পুলিশের ইনচার্জকে ফোন করেন। এরপর ফোন করেন কান্দিরপাড় ফাঁড়ির ইনচার্জকে। তারা দু'জনই কোতয়ালি থানার ওসিকে ফোন করতে বলেন। তবে ওসিকে তিনি পাননি। একরামুল হোসেন বলেন, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় হামলাকারীদের ইটের আঘাত লাগে তার কোমরে। কোমর ব্যথায় শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। এদিকে মন্দিরে হামলার অভিযোগে যে মামলাগুলো হয়েছে, তার একটিতে কাউন্সিলর একরামুলকেও আসামি করা হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

কুমিল্লা মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও মহানগর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শিবপ্রসাদ রায় বলেন, স্থায়ী মন্দির না হওয়ায় ওই মণ্ডপ রাত দুইটার পর অরক্ষিত থাকতো। এ সুযোগই নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তার দাবি, কুমিল্লার ঘটনাটি জাতীয় ষড়যন্ত্রের অংশ। স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দারা এগিয়ে না এলে সেদিন আরও বড় ক্ষতি হতে পারতো। মণ্ডপে কোরাণ রাখার প্রধান সন্দেহভাজন যুবক ইকবাল। মণ্ডপের গদা কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিও এই ইকবাল হোসেন। ৩০ বছর বয়সী ইকবাল কুমিল্লা নগরীর ১৭ নং ওয়ার্ডের দ্বিতীয় মুরাদপুর-লস্করপুকুর এলাকার নূর আহম্মদ আলমের ছেলে।

পরিবারও চায় ইকবালের শাস্তি : ইকবালের মা আমেনা বেগম জানান, তার তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে ইকবাল সবার বড়। তিনি জানান, ইকবাল ১৫ বছর বয়স থেকেই নেশা করা শুরু করে। ১০ বছর আগে তিনি জেলার বরুড়া উপজেলায় বিয়ে করেন। ওই ঘরে তার এক ছেলে রয়েছে। পাঁচ বছর আগে ইকবালের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তারপর ইকবাল চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মিয়া বাজার এলাকার কাদৈর গ্রামে আরেকটি বিয়ে করে। এই সংসারে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। আমেনা বেগম বলেন, ইকবাল নেশা করে পরিবারের সদস্যদের ওপর অত্যাচার করতো। বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাটেও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতো।

সে বিভিন্ন সময় আখাউড়া মাজারে যেত। কুমিল্লার বিভিন্ন মাজারেও তার যাতায়াত ছিল। পঞ্চম শ্রেণি পাস ইকবালের সঙ্গে ১০ বছর আগে বন্ধুদের মারামারি হয়। এ সময় তারা ইকবালকে পেটে ছুরিকাঘাত করেন। তখন ইকবাল অপ্রকৃতিস্থ

আচরণ শুরু করেন বলে দাবি করে তার পরিবার। আমি স্থানীয় কাউন্সিলরের মাধ্যমে জানতে পেরেছি ইকবাল পূজামণ্ডপ থেকে হনুমানের গদা সরিয়ে সেখানে কোরাণ রেখেছে। ইকবাল কারও প্ররোচনায় এমন কাজ করতে পারে। তার বোধবুদ্ধি খুব একটা নেই। ছেলে সত্যিই যদি অন্যায় করে, তাহলে যেন তার শাস্তি হয়।

ইকবালের ছোট ভাই রায়হান বলেন, ইকবালকে খুঁজতে পুলিশকে সহায়তা করেছি। ১৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ সোহেল বলেন, আমি ১০ বছর ধরে ইকবালকে চিনি। সে রঙের কাজ করত। মাঝে মাঝে নির্মাণকাজের সহযোগী হিসেবেও কাজ করত। ইকবাল ইয়াবা সেবন করায় প্রায়ই তাকে নিয়ে অনেক দেন-দরবার করতে হতো। ইকবালের কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসীও বিরক্ত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ইকবালের মানসিক অসুস্থতাকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ কাজটি করেছে।

কোরাণ রাখার পর যেভাবে ছড়ানো হয় উত্তেজনা: ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর মণ্ডপে কোরাণ পাওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ ও প্রশাসন এ উত্তেজনা দমাতে পারেনি। ফলে সেখানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এর জের ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। নানুয়ার দিঘির পাশেই শাহ আবদুল্লাহ গাজীপুরি (রা.)-এর মাজারটির অবস্থান, মণ্ডপ থেকে হেঁটে যেতে সময় লাগে ২ থেকে ৩ মিনিট। দারোগাবাড়ী মাজার নামে কুমিল্লাবাসীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিতি রয়েছে মাজারটির। এর বারান্দায় দর্শনার্থীদের তিলাওয়াতের জন্য রাখা থাকে বেশ কয়েকটি কোরাণ। রাত-দিন যেকোনো সময় যে কেউ এখানে এসে তিলাওয়াত করতে পারেন।

দারোগাবাড়ী মাজারের মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এমন তিনজনকে ঘটনার পর থেকে দেখা যাচ্ছে না। তাদের মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একজনের নাম হুমায়ুন কবীর (২৫), আরেকজনের বিষয়ে নিউজবাংলা তথ্য পেলেও তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দারোগাবাড়ী মাজারের খাদেম আহামদ নবী মাসুক জানান, হুমায়ুন মাজারে এসে নামাজ আদায় করতেন। তার বাড়ি কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার দেওরা এলাকায়। ঘটনার পরদিনই তাকে পুলিশ নিয়ে যায়। এ ছাড়া মাজারে আরও দুই-একজন নামাজ আদায় করতেন। তাদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

কুমিল্লার সেই ইকবাল কক্সবাজারে গ্রেপ্তার: পূজামণ্ডপে কোরাণ অবমাননার ঘটনার ১৯ অক্টোবর পুলিশ জানায়, যে ব্যক্তি কাজটি করেছেন, তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নাম ইকবাল হোসেন। তিনি কুমিল্লা শহরেরই বাসিন্দা, তবে 'ভবঘুরে ও মাদকাসক্ত'। তাকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ বলছে, জিজ্ঞাসাবাদেও কোরাণ অবমাননার বিষয়টি স্বীকার করেছেন ইকবাল। তবে কেন এই কাজ তিনি করতে গেলেন, তাকে দিয়ে এ কাজ কারা করিয়েছেন, ঘটনার নেপথ্যের ব্যক্তিরা কারা– এসব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

কুমিল্লা নগরের নানুয়া দীঘির পাড় পূজামণ্ডপে কোরাণ অবমাননাকে কেন্দ্র করে ১৩ অক্টোবর সংগঠিত হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ফেসবুকে উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়ানোর অভিযোগে নয়টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের জামায়াতের সমর্থিত তিন কাউন্সিলরসহ এজাহারনামীয় আসামি ৯২

জন ও অজ্ঞাতনামা ৭'শ জন। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫৬ জন। তবে কুমিল্লা নগরের ঠাকুরপাড়া কালীতলা এলাকার রক্ষাময়ী কালী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর, আগুন লাগানো ও মারধরের ঘটনায় করা মামলায় পুলিশ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ মামলায় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোশাররফ হোসেন এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একরাম হোসেনকে আসামি করা হয়েছে। তবে তারা কেউ গ্রেপ্তার হননি।

পূজামণ্ডপ, মন্দিরে হামলা: কুমিল্লার ঘটনার জের ধরে ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের ১৬ জেলায়। সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় করা ৮৫টি মামলায় ২৩ হাজার ৯১১ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামি ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে বিএনপি-জামায়াত ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী রয়েছেন। আবার রাজনৈতিক পরিচয় নেই, এমন অনেককে এসব মামলায় আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সরেজমিন প্রতিবেদন : চাঁদপুর

কুমিল্লার ঘটনার পর চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ বাজারে লক্ষ্মীনারায়ণ জিওর আখড়া মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। হামলাকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও হয়েছে, জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা, মোতায়েন করা হয় বিজিবি।

সংঘর্ষের পর হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিনজনের মৃতদেহ আসার কথা জানিয়েছেন কর্তব্যরত এক চিকিৎসক। তবে সংঘর্ষে কারও নিহত হওয়ার বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। কুমিল্লা শহরের একটি মন্দিরে কোরাণ অবমাননার কথিত অভিযোগ তুলে কয়েকটি মন্দিরে হামলা হয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শহরে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর দুপুর নাগাদ কুমিল্লায় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেও পাশের জেলা চাঁদপুরে সন্ধ্যার পর মন্দিরে হামলা হয় বলে হাজীগঞ্জ উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি রুহিদাস বণিক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাত ৮টার পর উপজেলার মনিনাগ এলাকা থেকে একটি মিছিল এসে মন্দিরে (লক্ষ্মীনারায়ণ জিওর আখড়া) হামলা চালায়। বাজারের ওই মন্দির ছাড়াও আরও কয়েকটি স্থানে মন্দিরে হামলা হয়েছে বলেও জানান রুহিদাস। হামলাকারীদের পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এসময় পুলিশ গুলি ছুঁড়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

হাজীগঞ্জ থানার ওসি হারুনুর রশিদ বলেন, আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যেই ১৩ অক্টোবর রাত ৮ টার দিকে হতাহত কয়েকজনকে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সুলতান মাহমুদ বলেন, তাদের মধ্যে তিনজন মারা গেছেন। মৃতদেহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। ওই তিনজন হলেন- হাজীগঞ্জ উপজেলার

বড়কুল এলাকার আল আমিন রাজু (১৮), রান্ধুনিমুড়ার ইয়াসিন হোসেন হৃদয় (১৪) ও হাজীগঞ্জ বিজনেস পার্কের শ্রমিক বাবলু (২৮)। হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এসএম শোয়েব আহমেদ চিশতী বলেন, ৮-১০ জন গুরুতর আহত অবস্থায় এসেছে। তাদের কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার্ড (জেলা হাসপাতালে) হয়েছে।

সংঘর্ষে নিহতের বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলেও ১৭ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাজীগঞ্জের ওসি হারুন। চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মিলন মাহমুদ বলেন, মৃত্যুর কথা শুনেছি। তবে কয়জন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি এখনও। কতটি মন্দির আক্রান্ত হয়েছে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাও এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

কুমিল্লার ঘটনা নিয়ে ১৩ অক্টোবর বিকালে ফেসবুকে ঘোষণা দেওয়া হয়, সন্ধ্যায় হাজীগঞ্জ বিশ্বরোড থেকে 'আন্দোলন' হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মুসলিম ভাইদের জড়ো হওয়ার অনুরোধ জানানো হয় এতে। এরপর সেখানে জড়ো হয়ে মিছিল শুরু করে একদল কিশোর-তরুণ। একপর্যায়ে বড় হতে থাকে মিছিলের আকার। পরে পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনা ঘটে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌর এলাকার বাসিন্দা হৃদয় হাসান ওরফে জাহিদ (২০) ওই পোস্ট দিয়েছিলেন। তিনি হাজীগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের কর্মী। তার মা শাহিদা বেগম ২০১৪-২০১৯ মেয়াদে হাজীগঞ্জ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নারী কাউন্সিলর ছিলেন। আওয়ামী লীগের সমর্থনে তিনি নির্বাচনে জিতেছেন। হাজীগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউনুস মিয়ার বাদী হয়ে মামলা করেছেন। পুলিশ বলছে, ঘটনার পর থেকে হৃদয় পলাতক।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত জানান, চাঁদপুরে ১৬ মণ্ডপে হামলা হয়েছে। ১৩ অক্টোবর অষ্টমীর দিন চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে যেসব মন্দিরে হামলা হয় সেগুলো হলো- ত্রিনয়নী সংঘের পূজামণ্ডপ, লক্ষীনারায়ণজী আখড়া, রামকৃষ্ণ মিশন, জমিদারবাড়ি দুর্গা মন্দির, শ্মশান কালী মন্দির, নবদুর্গা সংঘ পূজামণ্ডপ, দশভূজা সংঘ পূজা মণ্ডপ, সোনাইমুড়ি গ্রামের পূজামণ্ডপ, হাজীগঞ্জ শহর পূজামণ্ডপ, রামপুর লোকনাথ মন্দির, ভদ্রকালী মন্দির, ত্রিশুল সংঘ পূজামণ্ডপ, রামপুর বলক্ষার বাজার পূজামণ্ডপ, হাজীগঞ্জ রাধাগোবিন্দ মন্দির, বাজারগাঁও মুকুন্দ সাহার বাড়ির দুর্গা মন্দির, হাটিলা গঙ্গানগর দুর্গা মন্দির।

স্থানীয় সংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন মানিক জানান, হৃদয় হাসানের স্ট্যাটাসের পর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সেখানে ১৫ থেকে ২২ বছর বয়সী একদল কিশোর-তরুণ জড়ো হয়। যাদের বেশির ভাগই স্থানীয়ভাবে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য হিসেবে পরিচিত। রাত আটটার দিকে তারা মিছিল শুরু করে। হাজীগঞ্জ পৌর এলাকার প্রধান সড়ক ধরে মিছিলটি শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী নারায়ণ জিউর আখড়ার সামনে দিয়ে দুই দফা চক্কর দেয়। ওই সময় সেখানকার পূজামণ্ডপে প্রায় দেড় হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী উপস্থিত ছিলেন। মিছিল শুরুর সময় পুলিশ সদস্যরা পূজামণ্ডপের সামনে অবস্থান নেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহমুদ ইমতিয়াজ রুবেল জানায়, ধীরে ধীরে মিছিলে লোক বাড়তে থাকে। বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও স্থানীয় কিছু উৎসাহী মানুষ এতে যোগ দেন। হাজীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কিশোর-তরুণেরাও মিছিলে যোগ দেওয়া শুরু করে। একপর্যায়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুই হাজারে। পূজামণ্ডপের সামনে গিয়ে হঠাৎ মিছিল থেকে ইট ছোড়া শুরু করে কিছু কিশোর-তরুণ। স্থানীয় কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের থামানোর চেষ্টা করেও পারেননি। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয় দিলীপ কুমার সাহা বলেন, হামলার সময় উৎসবের মেজাজে থাকা পূজামণ্ডপে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী রাকিব জানায়, মিছিল বড় হতে দেখে হাজীগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানকার ছয়টি পূজামণ্ডপে অবস্থান নেয়। কেন্দ্রীয় মণ্ডপের সামনে ছিল মিছিলের সবচেয়ে বড় অংশ। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে একযোগে ছয়টি মণ্ডপে হামলা চালানো হয়। পুলিশ প্রথমে লাঠিপেটা করে মিছিলকারীদের থামানোর চেষ্টা করে। এরপর ১০৯টি রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। পরে পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান চারজন। তাদের বয়স ২৩ বছরের মধ্যে। সেদিনের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ আরেকজন পরে মারা যায়।

জামায়াত-হেফাজত কর্মী চিহ্নিত: হাজীগঞ্জের ঘটনা তদন্তে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর গঠিত হওয়া কমিটি হামলার সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজন জামায়াতের রোকন ও বেশ হেফাজত কর্মীকে চিহ্নিত করেছে।

সরেজমিন প্রতিবেদন : নোয়াখালী

২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর নোয়াখালীতে বিজয়া দশমীতে পূজামণ্ডপের সদস্য যতন সাহাকে সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ইসকন মন্দিরের প্রভু মলয় কৃষ্ণ দাসের মাথায় আঘাত করে তাকেও নির্মমভাবে খুন করেছে সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা। এছাড়া তিনি ইসকন মন্দিরের সামনের পুকুরে আরও এক ভক্তের মৃতদেহ ভেসে উঠার কথাও জানান, যার নাম পার্থ দাস বলে ইসকন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এর বাইরে হাতিয়ায় ৭টি মন্দিরে ভাঙচুর হয়েছে। সেগুলো হলো- শংকর মার্কেটের আশুতোষ ডাক্তার বাড়ির পূজামণ্ডপ, জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাশ্রম পূজা মন্দির, রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম পূজা মন্দির, শ্রী লোকনাথ মন্দির পূজামণ্ডপ, তপোবন আশ্রম পূজা মন্দির, গুরুচাঁদ সত্যবামা পূজা মন্দির, হাতিয়া পৌরসভা কালী মন্দির এবং তার কাছাকাছি ৪-৫টি ঘরও ভাঙচুর করা হয়। অষ্টমীর দিনে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি সীতারাম ঠাকুর সেবাশ্রম। এর আগে ১৪ অক্টোবর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের সার্বজনীন দুর্গা মন্দির ও হরিমন্দিরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ১৫ অক্টোবর নোয়াখালীর চৌমুহনীতে রাধামাধব মন্দির, ইসকন মন্দির, রাম ঠাকুর মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মঙ্গলা পূজামণ্ডপ, রাম ঠাকুর পূজামণ্ডপেও হামলা করা হয়।

নোয়াখালীর সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র চৌমুহনীতে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধামাধব জিউর মন্দির। ১৫ অক্টোবর দুপুরের পর শত শত মানুষ মন্দিরের ফটক ভেঙে ঢুকে নির্বিচারে ভাঙচুর চালায়। এই বিভীষিকাময় ঘটনার সাক্ষী মন্দিরের ব্যবস্থাপক সত্তরোর্ধ্ব অনন্ত কুমার ভৌমিক। অনন্ত কুমার ভৌমিক বলেন, আক্রমণকারীরা ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাটও চালায়। তারা মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া টাকাপয়সা, স্বর্ণালংকার তো নিয়েছেই, পানি তোলার মোটর পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। ওইদিন রাধামাধব জিউর মন্দিরসহ চৌমুহনীতে ১২টি মন্দির ও পূজামণ্ডপে হামলা হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে বিভিন্ন দোকানপাট ও বাসাবাড়িতেও। মারা গেছেন দুজন। বেগমগঞ্জ থানার ওসি, চার পুলিশ সদস্যসহ আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক।

পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে দুষছেন এখানকার ভুক্তভোগী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা বলছেন, কুমিল্লার ঘটনার জেরে চাঁদপুরে চারজন নিহত হলো। স্বাভাবিকভাবেই শুক্রবার দুর্গাপূজার শেষ দিন বা বিসর্জনের দিন বাড়তি প্রস্তুতি রাখার কথা। কিন্তু নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে সেটা ছিল না। দীর্ঘ সময় ধরে হামলা হলেও মন্দির ও মণ্ডপগুলোতে পুলিশ আসে অনেক পরে। প্রতিটি পূজামণ্ডপে কেবল দুজন করে পুলিশ সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। দুপুর ১২টার মধ্যেই বেশির ভাগ মণ্ডপের বিসর্জন শেষ হওয়ার পরপরই অনেক মণ্ডপ ও মন্দির থেকে পুলিশ সদস্যরা চলে যান।

পাশের জেলা কুমিল্লার একটি হিন্দু মন্দিরে পূজার সময় মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণের অবমাননা করা হয়েছে– এমন অভিযোগের জেরে এই হামলা হয়। টানা তিন-চার ঘণ্টা হামলা চলে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্র জানায়, এই বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়ে আগের দিন চৌমুহনী চৌরাস্তার দক্ষিণে এখলাসপুরে মাইকিং করা হয়েছিল। চৌরাস্তার পশ্চিমে বাংলাবাজারে পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল। জুমার নামাজ শেষে এসব এলাকা ও আশপাশের বিভিন্ন মসজিদ থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে চৌরাস্তায় জড়ো হয়। সেটি চৌমুহনীর দিকে এগোয়। অন্যদিকে, চৌমুহনী থেকেও খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। পুলিশের মূল নজর ছিল প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র চৌমুহনীর ডিবি রোডের দিকে। এখানে বিক্ষোভকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ডিবি রোডের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের বিভিন্ন গলি-সড়কে ছড়িয়ে গিয়ে নির্বিচার হামলা চালায় মন্দির ও মণ্ডপগুলোতে। হামলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিল কিশোর ও যুবক।

বেগমগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এ বি এম জাফরুল্যাহ বলেন, ১৪ অক্টোবর রাধামাধব জিউর মন্দিরে গিয়ে দেখা যায়, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাঁচের টুকরা। পড়ে আছে ভাঙা প্রণামির বাক্স, বিগ্রহের মূর্তি, কোনো জানালার কাঁচ অক্ষত নেই। এই মন্দিরটি ডিবি রোড থেকে দক্ষিণে মাত্র ৩০০ গজের মধ্যে।

গণিপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে অনেক বছর ধরে। এখানে কখনো হামলা হবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। এই বিদ্যালয়ের দেয়ালে এখনো রক্তের দাগ লেগে আছে। এখানেও হামলাকারীরা প্রথমে সিসিটিভির ক্যামেরা ভাঙচুর করে।

এখানকার ইসকন মন্দিরে হামলা হয় দুই দফায়। মন্দিরের অধ্যক্ষ রসপ্রিয় দাস অধিকারী বলেন, বেলা তিনটার দিকে এখানে প্রথম হামলা হয়। তখন তার কক্ষে একজন সাংবাদিক ছিলেন। ওই সাংবাদিক পুলিশের অনেক কর্মকর্তাও হটলাইনে ফোন দেন। সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ এসে দু'চার মিনিট থেকে চলে যায়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

চৌমুহনীতে পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার: নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকায় পুকুর থেকে প্রান্ত চন্দ্র দাশ নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইসকন মন্দিরের পুকুরে ওই যুবকের মরদেহ ভেসে উঠে।

নোয়াখালী হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বিনয় কিশোর রায় বলেন, ১৩ অক্টোবর ২০২১-এ হামলায় প্রান্ত দাশ নিহত হয়েছেন। একই দাবি করেছেন নোয়াখালী পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কিশোর চন্দ্র মজুমদার। তিনি জানান, প্রান্ত দাশের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার সাহাপুর এলাকায়। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) সদস্য। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল বেগমগঞ্জ) মো. শাহ ইমরান বলেন, পুকুর থেকে একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি মন্দিরের দর্শনার্থী ছিলেন। পুলিশ জানায়, ১৩ অক্টোবর দুপুরে বেগমগঞ্জের কলেজ রোড ও ডিবি রোড এলাকায় মিছিল করেন একদল মানুষ। তারা মিছিল থেকে ভাঙচুর চালান। হামলায় যতন কুমার সাহা (৪২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। এছাড়া, বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান শিকদারসহ মোট ১৮ জন আহত হয়েছেন।

মামলা ও গ্রেপ্তার : নোয়াখালীতে ২৪ মামলায় ৭ হাজার ৯৬১ জনকে আসামী করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৬২ জনকে। নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন থানা থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, ১৩ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দির, পূজামণ্ডপ, দোকানপাট, বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর চালায় সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা। এসব ঘটনায় বেগমগঞ্জে ১০টি, হাতিয়ায় ১০টি এবং চাটখিল, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ ও কবিরহাট থানায় একটি করে মামলা হয়েছে।

সরেজমিন প্রতিবেদন: ফেনী

রাজ বিজয় সিংহ দীঘির পাড়ের শহর ফেনী। শহরের প্রাণকেন্দ্র ট্রাংক রোডে কয়েক গজের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ফেনী কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদ ও শ্রী শ্রী কালী মন্দির। মসজিদ ও মন্দির দুটির ইতিহাস প্রায় ১৪৫ বছরের।

১৮৭৬ সালে ত্রিপুরার রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ফেনী শহরে মন্দির ও মসজিদের জন্য ৫০ শতাংশ করে জমি বরাদ্দ দেন। সে সময়ের টিনের ছাউনি থেকে আজকের কংক্রিটের ধর্মীয় উপসনালয় দুটি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় সম্প্রীতির উদাহরণ হয়ে। মাত্র কয়েকশ গজের ব্যবধানে একদিকে পূজা

অর্চনা, আরেকদিকে আজানের ধ্বনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার বন্ধনকে দৃঢ় করছে প্রায় দেড়'শ বছর ধরে। তবে সাম্প্রদায়িক হামলার পর কিছুটা হলেও আঁচড় লেগেছে এই সম্প্রীতি ও বন্ধনে।

ফেনী কেন্দ্রীয় বড় মসজিদের লাগোয়া তাকিয়া রোডে ১৯৭৩ সালের আগে থেকে ব্যবসা করছে রেনু ট্রেডার্সের মালিক নয়ন পালের পরিবার। নয়ন পাল বলেন, এখানে হিন্দু-মুসলিমে কোনো তফাত ছিল না। মসজিদে নামাজ শেষে অনেক মুসলিমও আমাদের দোকানে কেনাকাটা করতেন, হিন্দুরা তো আসতেনই। তবে যে আক্রমণ করা হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর, তাতে করে সর্ম্পকে তো একটু হলেও চিড় ধরবে। অথচ শত বছরের ইতিহাসে ফেনীতে এমনটা হয়নি।

মসজিদ মার্কেটের পাটোয়ারী ফ্যাশনের মালিক নুরুল হুদা জানান, তিনিও এখানে কখনও হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ দেখেননি। হিন্দুরাও তার দোকানে আসতেন নিয়মিতই। ঘটনা কিছুটা হলেও মনে দাগ কেটেছে। এ ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা তার কাছেও নেই। জেলা প্রশাসক ও মসজিদ কমিটির সভাপতি আবু সেলিম মাহমুদ উল হাসান বলেন, এটা কোনো ধর্মীয় বিরোধ নয়। তবে একটি দুষ্কৃতকারী চক্র ঘটনার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে এই সম্প্রীতি ছিল, আছে, থাকবে।

শ্রী-শ্রী জয়কালী মন্দিরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শিল্পকলা একাডেমির সদস্য সমরজিত দাস টুটুল বলেন, কয়েক ঘণ্টার হামলায় শত বছরের ঐতিহ্যের বন্ধন যেন ম্লান হয়ে গেছে। এখানে মন্দিরে প্রতি বছর পূজার সময় মসজিদ থেকে নামাজের সময়সূচি নিয়ে আসা হতো। নামাজ-আজানের সময় পূজার কার্যক্রম বন্ধ রাখা হতো। একইরকম সহাবস্থান ছিল মসজিদের দিক থেকেও। অথচ একদিনের ঘটনায় মনে যে দাগ কেটেছে, সেটা কীভাবে মুছবেন?

আশরাফুল আলম গিটার বলেন, প্রকৃত মুসলমানরা এই হামলায় অংশ নেয়নি। কিছু বহিরাগত ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা মন্দির ও আশপাশের এলাকায় ও দোকানে হামলা করে। সাময়িকভাবে কিছুটা প্রভাব পড়লেও দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি নষ্ট হবার নয় বলেও মনে করেন তিনি।

সমরজিত দাস রাতের ঘটনার সাক্ষী। এশার নামাজের পর থেকে শুরু হওয়া হামলা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ছিলেন মন্দিরের ভেতরেই। তিনি বলেন, দশমীর বিসর্জন কোনোভাবে পার করলেও লক্ষ্মীপূজায় তাদের কোনো আনন্দ নেই। হারিয়ে ফেলেছেন প্রাণচাঞ্চল্য। মন্দির পূজা অর্চনার জায়গা, অথচ সেখানে পুলিশ বসে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। এ-ও কি সম্ভব?' তবে এই সম্প্রীতি আবারো ফিরে আসবে বলে মত তার। আমরা মাত্র আটজন মানুষ ছিলাম ভেতরে। মসজিদের সামনে বিকেলের পর থেকে থমথমে পরিবেশ হতে থাকে। এশার নামাজের পর মসজিদের ছাদ ও মিনারের ওপর থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারা হয়। এক পর্যায়ে কলাপসিবল গেটের নিচ দিয়ে পেপার ছড়িয়ে দিয়ে ওপর থেকে প্লাস্টিক বোতলের মধ্যে আগুন দিয়ে পেট্রোল ছুড়ে মারা হয়। কোনোরকমে পানি দিয়ে আগুন নিভিয়েছি। পরে ইট-

পাটকেলের আক্রমণের চোটে মন্দির অফিসের দেয়ালের পেছনে আশ্রয় নিই।' বলতে গিয়ে শিউরে ওঠেন সমরজিত।

আমাদের গর্বের মসজিদ-মন্দিরের সহাবস্থান একদিনেই প্রশ্নের মুখে পড়ল। আমাদের পুরোহিত বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীকে যে রকমভাবে ধুতি খুলে, কালেমা পড়তে বাধ্য করা হলো, তা তো একাত্তরকেও হার মানায়। সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এই হামলায় আমাদের নিয়ে খেলাধুলা হচ্ছে, আমরা এখন দাবার ঘুঁটি।

তাকিয়া সড়কের আরেক দোকানদার বিষংকর পাল। তার পরিবার প্রায় ৫৮ বছর ধরে ব্যবসা করছে। তিনি বলেন, শুধু মন্দিরেই হামলা হয়নি, মসজিদের পাশের তাকিয়া রোডে বেছে বেছে প্রায় ১৬টি হিন্দু দোকান ভেঙে মালামাল লুটপাট করা হয়েছে। তার দোকানের নগদ তিন লাখ ৭৫ হাজার টাকাসহ লুট হয়েছে ৫ লাখ টাকার পণ্য। ওই দোকানের কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শী শিমুল দাস জানান, রাত সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ পাশের শুঁটকি দোকানে হামলা দেখে দোকান বন্ধ করে কাছেই আশ্রয় নেন তিনি। দূর থেকে শস্যপণ্য ও মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া দেখেন, প্রাণের ভয়ে বাধা দেওয়ার সাহস করেননি।

লুণ্ঠনকারীরা এদের প্রত্যেকেই ১৮-২০ বছর বয়সী যুবক। এদের কেউই পরিচিত নয়। তারা শুধু হিন্দু দোকানেই আক্রমণ করেছে। ট্রাংক রোডের মোড়ে পুলিশ থাকলেও অনেকবার ৯৯৯-এ কল করার পরও পুলিশের কোনো সদস্য দোকানে হামলার সময় তাকিয়া সড়কের দিকে আসেননি। অনেকে বাসার সিসিটিভির ফুটেজে নিরুপায় বসে দোকান লুট, ভাঙচুর দেখেছেন।

বাঁশপাড়া দুর্গাপূজা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দে জানান, তারা এবার প্রতিমা বিসর্জন ঠিকমতো দিতে পারলেও শুধু প্রথম দুদিন ঠিকমতো পূজা করেছেন। বাকিটা সময় কাটিয়েছেন আতঙ্কে। বাড়ির নারী সদস্যদের খুব বেশি বাইরে না যেতে বলেছেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি শুকদেবনাথ তপন বলেছেন, শায়েস্তা খাঁর আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত মন্দির-মসজিদের সম্প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও ২০২১ সালের ১৬ অক্টোবর হামলায় সেই প্রশ্ন উঠেছে, যেটা তিনি ইতিবাচকভাবে দেখছেন না। বাবা আকাশ সাহার হাত ধরে বড় বাজার রাজকালী মন্দিরে লক্ষ্মীপূজা দেখতে এসেছে সাত বছরের শিশু নিবিড় সাহা। ভাঙা প্রতিমা দেখে তার প্রশ্ন, এগুলো এমন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তার বাবার কাছে নেই। ১৬ অক্টোবরের হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজকালী মন্দির। লক্ষ্মীপূজার জন্য সাজিয়ে রাখা সব প্রতিমা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখানকার পুরোহিতকেও হেনস্তা করে ভিডিও ছাড়া হয়েছে ফেসবুকে। আকাশ সাহা বলেন, এমন অবস্থায় ভালো থাকার সুযোগ নেই। প্রতিবার লক্ষ্মীপূজায় তিনি গ্রামের বাড়ি হাজীগঞ্জ যান, এবার আর সাহস করেননি।

কী ঘটেছিল সেদিন : ২০২১ সালের ১৬ অক্টোবর আসরের নামাজের পর কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদের পাশের জয়কালী মন্দির থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি

প্রতিবাদ মিছিল করার কথা ছিল বলে জানান জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সুশেন চন্দ্র শীল। একই সময়ে আসরের নামাজ হওয়ায় অনেক দেরিতেই মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ওদিকে মসজিদের সামনে সাধারণ মুসল্লিদের ব্যানারে জড়ো হয় দুই শতাধিক তরুণ-যুবক। এদের বেশিরভাগই এখানে নিয়মিত নামাজ পড়ে না বলেও জানান সুশেন।

তিনি বলেন, পরে পুলিশের অনুরোধে প্রতিবাদ মিছিল সরিয়ে নেওয়া চেষ্টা করলেও এই তরুণ-যুবকরা না সরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একই সময়ে আওয়ামী-যুবলীগের একটি মিছিল এসে মুসল্লিদের বাধা দিতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। তবে এতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ-যুবলীগ বেশি আহত হয়। তবে মসজিদে আশ্রয় নেওয়ায় তাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেনি পুলিশ।

আওয়ামী-যুবলীগের মিছিল তাদের ধাওয়া না দিলে পরিস্থিতি এরকম না-ও হতে পারত বলে জানান সুশেন চন্দ্র শীল। এশার নামাজের পরপরই এসব তরুণ-যুবক দলে দলে মসজিদের ছাদে উঠে পাশের মন্দিরে হামলা করে। কিছু লোক পাশের দোকান ও মন্দিরগুলোতে হামলা চালায়। মসজিদের ছাদ থেকে আক্রমণ হওয়ায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। উপর থেকে ইট-পাটকেল মারলে তা ঠেকানোর উপায় ছিল না, বলেন সমরজিত দাস টুটুল। এদিকে, পুলিশ ও প্রশাসন শুরুতে আরো দায়িত্বশীল হলে হামলা ঠেকানো যেত বলেও মনে করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

৪ মামলায় ১২ জন গ্রেপ্তার : হামলা-সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ, র‍্যাব ও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে পৃথক ৪টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ২০২১ সালের ২০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে ১৬ অক্টোবর রাতে শহরের মধ্যম রামপুর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে সাইফুদ্দিন মাহমুদের ছেলে আহনাফ তৌসিফ মাহমুদ লাবিবকে (২২) গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

ফেনীতে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় মামলা : ফেনীতে চারটি মামলায় ৬৫০ জনকে আসামী করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন যুবদল, অপরজন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা। বাকি ১৬ জন হলেন ফেনী পৌরসভার মধ্যম রামপুর গ্রামের আহনাফ তৌসিফ মাহমুদ লাবিব (২২), ফেনী সদর উপজেলার দক্ষিণ লেমুয়া গ্রামের মেহেদী হাসান মুন্না (২২), পৌরসভার মাস্টারপাড়ার আবদুল মান্নান (৪৬), ফেনী সদর উপজেলার পূর্ব মোটবী গ্রামের এনামুল হক রাকিব (২০), ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার দক্ষিণ ডেমরা এলাকার মো. মিরাজ (৩৩), কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার আমান সরকার বাজার এলাকার ফয়সল আহম্মেদ আল আমিন (১৯), ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের আবদুস সামাদ জুনায়েদ (১৯), লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মাওলানা পাড়ার মো. সোহেল (২৬), ফেনী সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন (৩২), সাইফুল ইসলাম (৩৮), বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের মো. রোমন শেখ (১৬),

তৌহিদুল ইসলাম জিদান (১৯), নোয়াখালীর সেনবাগের আবদুল্লাহ আল মিয়াজী (১৯), ফেনী পৌরসভার শান্তি কোম্পানি রোডের আজিম শরিফ (২৮) ও হাজারী রোডের ছাইদুল ইসলাম (২৯)।

সরেজমিন প্রতিবেদন: পীরগঞ্জ, রংপুর

২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর হামলা হলেও পীরগঞ্জে ঘটনা বিষয়ক দৃশ্যমান সূত্রপাত হয় অষ্টমীর দিনে অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর কুমিল্লার কোরাণ অবমাননার সাজানো নাটকের একদিন পর, যখন ইতিমধ্যেই কুমিল্লার ঘটনার জের ধরে ১০ জেলায় হামলা হয়ে গেছে। গৌতম অধিকারী (৫০) ছিলেন পীরগঞ্জের রামনাথপুর ইউনিয়নের মাঝিপাড়া গ্রামের এবারের দুর্গা পূজার মন্ডপের পুরোহিত। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা না হলেও পূজা উপলক্ষে দশমীর দিন অর্থ্যাৎ ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত ওই এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন। পুরোহিত গৌতম অধিকারী জানান, ১৪ অক্টোবরেই দুপুরের দিকে পার্শ্ববর্তী ৪ নং ইউনিয়নের পূজা কমিটির সদস্য শচিন ডাক্তার তাকে ফোন দেন। শচিন তাকে জানান, কুমিল্লার 'কোরাণ অবমাননার' ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি স্থানীয় পূজা মন্ডপগুলোতে হামলার আশঙ্কা করছেন। তার এই আশংকার কথা শুনে গৌতম তখন ফোন করেন তাদের মাঝিপাড়ার পূজা কমিটির সভাপতি অর্জুন বাবুকে। অর্জুন বাবুর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, মাঝিপাড়ার পাশে থাকা বটেরহাট বাজারে তিনি শুনে এসেছেন যে, এলাকার পূজা মন্ডপগুলোর ব্যাপারে মিটিং করেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এবং এলাকায় কানাঘুষা শোনা গেছে যে মিটিং এর বিষয়বস্তু হল 'মণ্ডপগুলোকে এখন কি করা হবে'। তবে যেহেতু গৌতম কিংবা অর্জুন কেউই বিষয়টি নিজের কানে শুনেননি এবং এলাকা আপাতদৃষ্টিতে 'শান্ত' ছিল তাই তারা নিজেরা আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেন যে যেহেতু এলাকায় জোরালো কিছু নেই, তাই চিন্তা নেই।

১৭ অক্টোবর যখন হামলা হয় তখন রাত ৮টার দিকে অর্জুন বাবুর ছেলে তাকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানালে তিনি প্রথমে পীরগঞ্জ থানার ওসিকে ফোন দেন, কিন্তু ওসি ফোন ধরেননি। এরপর একপর্যায়ে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে পুলিশ হামলা ঠেকাতে পারছে না, তখন বাধ্য হয়ে ৯৯৯ এ কল করে সাহায্য চান। গৌতমের ভাষ্য অনুযায়ী, তখন ৯৯৯ থেকে তাকে বলা হয় যে তারা পুলিশের চাহিদামতো সাড়া দেবে।

ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের অবমাননার অভিযোগ যে ছেলেটির বিরুদ্ধে, সেই পরিতোষ সরকার এইএসসির প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার বাবা প্রসন্ন চন্দ্র দাস একই সাথে একজন জেলে এবং কবিরাজ হিসেবে পরিচিত। পত্রপত্রিকাতে যেভাবে রিপোর্ট হয়েছে পরিতোষের বাড়িতে কোনো হামলা হয়নি সেই তথ্যটি সঠিক নয়। হামলা শুরু হয় পরিতোষের বাড়ির পাশের খড়ের গাদায় আগুন দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তার চিহ্ন আমরা স্বচক্ষেই দেখে এসেছি। যদিও তার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়নি। পরিতোষের বাড়ি হল উত্তর মাঝিপাড়ায়। আর মূল হামলাটি করা হয়েছে দক্ষিণ মাঝিপাড়ায়।

পরিতোষ সম্পর্কে দুই মাঝিপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে দুই রকম ভাষ্য পাওয়া যায়। যেখানে হামলা হয়েছে সেই দক্ষিণ মাঝিপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত কেউ কেউ বলেছেন যে পরিতোষ একজন বখাটে ছেলে। এটা সত্য যে পরিতোষের এক মুসলমান মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল পরে সেটি ধরা পড়ে যায় দুই পরিবারেরই অভিভাবকদের কাছে। পরে তাদের উপস্থিতিতে জোর করে সেই সম্পর্কের ইতি টানানো হয়। পরিতোষের বয়স খুব কম হলেও (১৯-২০ বছর) পারিবারিকভাবে তার বিয়ে ঠিক করা হয় মহিষকান্দির মাদারগঞ্জের এক হিন্দু মেয়ের সাথে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পরিতোষের সম্পর্কের ভাই ও তার পাশের ঘরের বাসিন্দা স্বপন চন্দ্র দাস। তবে দক্ষিণ মাঝিপাড়ার বাসিন্দারা যেমনটি বলেছেন সে ব্যাপারে পরিতোষের গ্রামের মানুষ ও প্রতিবেশীরা বরং পরিতোষ সম্পর্কে উল্টো কথাই আমাদের বলেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী পরিতোষ একটু 'দুরন্ত প্রকৃতির' বন্ধুবৎসল কিন্তু মোটেও উশৃঙ্খল ছেলে ছিল না। পরিতোষ মুসলমান মেয়েদের উত্যক্ত করতো। দক্ষিণ মাঝিপাড়ার হিন্দু বাসিন্দাদের এমন 'অভিযোগ'কে অস্বীকার করেন উত্তর মাঝিপাড়ার হিন্দুরা।

তার বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকেন যে আত্মীয় সেই স্বপন চন্দ্র দাসকে আমরা খুঁজে পাই। যিনি নিজেও ঘটনার পর থেকে হামলার ভয়ে ১৯ তারিখ সকাল পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, দায়িত্ব নিয়েই বলতে চান যে, ঘটনার দিন যখন হামলাকারীরা পরিতোষের পাড়ায় জড়ো হয় তখন খবর পেয়ে তিনি পরিতোষকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে সে কি পোস্ট করেছে ফেসবুকে? পরিতোষ তখন কাঁদতে কাঁদতে তাকে উত্তর দিয়েছিল যে, দাদা আমি এগুলোর কিছু জানি না, আমার ফেসবুক সম্ভবত কেউ হ্যাক করেছে। এর কিছুক্ষণ পর থেকেই পরিতোষের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এই ফোনালাপের কিছু সময় পরই পরিতোষ হামলার ভয়ে পুরো পরিবারসহ আত্মগোপনে চলে যায়। স্বপনের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি এই কথা পুলিশকে জানাতে পারেননি। কারণ ঘটনার দিন হামলা হওয়ার পর যখন তিনি এলাকায় ফিরেন তখন পরিস্থিতি দেখে নিজেও ভয়ে আর বাড়িতে আসেননি। লুকিয়ে ছিলেন অন্য জায়গায়। আর বাড়িতে ফেরার পর কোনো সাংবাদিক তার কাছে আসেনি তখন পর্যন্ত। তবে পীরগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর পরবর্তীকালে আমরা যখন পরিতোষের বাবার সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই তখন তার বাবা আমাদের ঘটনার আরও বিস্তারিত বয়ান দেন।

হামলা কিভাবে হল: ১৭ অক্টোবর পরিতোষ বাড়ি ফেরে বিকাল সাড়ে ৪টার সময় যার অল্প কিছু সময় আগেই সিএনজিতে তার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে "টিপাটিপি" করার পর তার মোবাইল তাকে ফেরত দিয়ে অপরিচিত চার যুবক বটেরহাট বাজারে নেমে যায়। সেসময় থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিতোষের ওই "কমেন্ট" কারা ফেসবুকে ছড়ায় সেটি আমরা তখন জানতে না পারলেও পরবর্তীকালে র‍্যাবের ব্রিফিংয়ে জানা যায় যে পীরগঞ্জের স্থানীয় এক ছাত্রলীগ নেতা সৈকত এই কন্টেন্ট ছড়ানোর পিছনে কাজ করে। এসময় কতগুলো ঘটনা সমান্তরালে ঘটে।

মাঝিপাড়া গ্রামের দুই মাথায় দুইটি মসজিদ, একটি হল উত্তর মাঝিপাড়ার পাশের বটেরহাট মসজিদ যেখানে ওই চার যুবক পরিতোষের অটো থেকে নেমে গিয়েছিল হঠাৎ করে। আর আরেকটি হল দক্ষিণ মাঝিপাড়ার পাশের হাতীবান্ধা মসজিদ। এই দুই মসজিদ থেকে সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে হামলার প্রস্তুতিমূলক মাইকিং করা হয়। গ্রামের মানুষ যারা সেই মাইকিং শুনেছেন তারা জানান যে, সেই মাইকিং এর ভাষ্য ছিল মোটের উপর এরকম: "মুসলমান ভাইয়েরা কে কোথায় আছেন, একজোট হন, আমাদের কোরাণকে অপমান করা হয়েছে হিন্দুদের আর এখানে থাকতে দেওয়া যাবে না" ইত্যাদি। এর মধ্যে হাতীবান্ধা মসজিদ থেকে উপরোক্ত উস্কানিমূলক মাইকিং এর পাশাপাশি আবার এ ধরনের কথাও বলা হয় যে, 'দক্ষিণ মাঝিপাড়ার হিন্দুরা নিজের বাড়িতে থাকুন, আপনারা কেউ উত্তর পাড়ায় যাবেন না। আপনারা আপনাদের ঘরে থাকলে কেউ আপনাদের গায়ে হাত দিবে না ইত্যাদি'। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে, বটেরহাট মসজিদে মাইকিং হয়েছিল সেই বটেরহাট বাজারে সেদিন ছিল হাট বসার দিন।

এই মাইকিং এবং হামলাকারীদের আনাগোনা ও পরিতোষের গ্রামের দিকে পুলিশের উপস্থিতি এই সবকিছু মিলিয়ে পরিতোষ এবং গ্রামের মানুষ প্রথম পরিতোষের ওই "ফেসবুকের কমেন্টের" বিষয়ে জানতে পারেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই ৩ থেকে ৪ শ' হামলাকারী এসে পরিতোষের গ্রাম উত্তর মাঝিপাড়ায় এসে হাজির হয়। ইতোমধ্যে পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা হামলার বিষয়টি আগাম টের পায়। তাই তারা পরিতোষের বাড়িতে পুলিশ পাঠায়। তবে গ্রামের মানুষ আমাদের জানান সেই পাঠানো পুলিশের সংখ্যা শুরুতে মাত্র ১৫ জনের মতো ছিল।

হামলাকারীরা এসে পরিতোষের বাড়ির থেকে কয়েকশো গজ সামনে আতাউলের মৌলভীর মুদি দোকানের সামনে এসে জড়ো হয় এবং পরিতোষের কথা তুলে হিন্দুদের গালিগালাজ করতে থাকে। পরিতোষের গ্রামের মিলন দাস জানান, এসময় আতাউলের দোকানের সামনে হামলাকারীদের সাথে 'মিটিং করে' স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ পুলিশের সদস্যরা। তবে সেই মিটিংয়ে কী আলাপ হয়েছিল সেটা তারা আমাদের জানাতে পারেননি। কারণ তারা হামলার ভয়ে সেখানে যেতে পারছিলেন না। তবে এই মিটিং এর পরেই হামলাকারীরা এগিয়ে এসে পরিতোষের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন দেয়। এসময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়লে হামলাকারীরা সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে উত্তর মাঝিপাড়ার দিকে চলে যায় এবং সেখানকার বাড়িগুলোতে আগুন দিতে শুরু করে। তবে পুলিশ সেখানে আর না গিয়ে দক্ষিণ মাঝি পাড়াতেই বটেরহাট আখিরা নদীর ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও পরিতোষের বাড়ি থেকে উত্তর মাঝিপাড়ার যে বাড়িগুলো দিয়ে হামলা শুরু হয় সেখানে হেঁটে যেতেই লাগে মাত্র ৫-৭ মিনিট। গ্রামের মানুষ আমাদের এটাও জানায় যে হামলা হওয়ার আগে দিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ চলে গিয়েছিল।

ফায়ার সার্ভিস আসলেও গ্রামের মানুষ জানান, অনেক বাড়িতেই ফায়ার সার্ভিস পৌছায়নি। তাই আগুন তাদেরকেই এসে নেভাতে হয়েছে। হামলাকারীরা মোট ৩০-

৩২টি বাড়ির অন্তত ৮০টি ঘরে হামলা চালায় বলে গ্রামের মানুষ জানান। হামলা থেকে বাঁচতে ওই বাড়িগুলোর হিন্দুরা সবাই নিজ নিজ বাড়ির পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকেন। হামলাকারীরা ঘরে আগুন দেয়ার পাশাপাশি লুটপাট চালায়। নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে গরু-ছাগল, ধান, চাল পর্যন্ত সবই লুট করে। প্রায় প্রতিটি ঘরের টিনই আমরা কোপানো দেখতে পেয়েছি। হামলাকারীরা সর্বশেষ যে বাড়িতে হামলা চালায় সেখানে হাতে থাকা বাকি সব পেট্রোল ওই বাড়িতে ঢালে এবং সেই বাড়িটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানে দুটো গরু আগুনে পুড়ে মারা যায়।

হামলাকারীরা কারা ছিল: হামলাকারীরা বহিরাগত ছিল বলে যে প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা হয়েছে সেটার সাথে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরা। কারণ তারা বলেন, হামলাকারীরা যখন তাদের বাড়ি-ঘরে হামলা চালাচ্ছিল তখন পাশের যেসব ধানক্ষেতে তারা লুকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে তাদের উচ্চশব্দের কথোপকথন তারা শুনতে পান অনেকেই। সেই সব কথোপকথন ছিল এমন 'ওইখানে টাকা আছে', 'ওইখানে স্বর্ণ আছে' 'এই বাড়িতে অটো আছে', 'ওই বাড়িতে মটরসাইকেল আছে', 'নারায়ণের ঘরটায় এখনো আগুন দিলি না?' ইত্যাদি। হামলার শিকার যারা হয়েছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে স্থানীয় মানুষ ছাড়া এতটা বিস্তারিতভাবে বহিরাগতদের জানা সম্ভব নয় যে কোনটা কার বাড়ি এবং কার ঘরে কি আছে। হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে শোডাউন করে এসেছিল। পুলিশের নাকের ডগায় এই দুঃসাহস দেখানো ক্ষমতার ছত্রছায়ায় না থাকলে সম্ভব নয়।

চিনতে পেরেছেন এমন কয়েকজন হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষদশীরা। তারা হল: মজিদপুরের মিলন (৩৫) যে এলাকায় পেশাদার চোর ও প্রতারক হিসেবে পরিচিত। নাগরপাড়ার বাবলু (৩৭) যে এলাকায় প্রতারক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। বটেরহাট মসজিদের মুয়াজ্জিন রাশেদ, যাকে মানুষ সরাসরি আগুন লাগাতে দেখেছে। সে ধুলগাড়ির রশিদ মিয়ার ছেলে উজ্জল। গারাবের গ্রামের আবু ড্রাইভারের ছেলে জনৈক মৌলভীবেশের একজন ছেলে (নাম বলতে পারেননি)। হাতীবান্ধা হাইস্কুলের দপ্তরী মোমিন। নৌকারপাড়ার গড়ের মাথার ভলুর ছেলে মনজুরুল যে কিনা এলাকায় পুলিশের সোর্স হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত!

এদের মধ্যে পুলিশের সোর্স এই মনজুরুলকে গ্রামবাসী হামলার সময় হাতে নাতে ধরে পুলিশের কাছে তুলে দিলেও পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয় বলে আমাদের জানান গ্রামের মানুষ। গ্রামের একটি মাত্র ঘরে হামলাকারীরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই ঘরে আর তারা আগুন লাগাতে পারেনি। সেটি হল শ্রী হিদর চন্দ্রের বাড়ি। সেখানে হিদর চন্দ্রের চার ছেলে, তাদের স্ত্রী, এবং ওই বাড়ির অন্যান্য নারীরা মিলে হাতের কাছে দা, লাঠি যা কিছু ছিল তাই দিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করে। সেই বাড়ির রণজিতের স্ত্রী রূপালী আমাদের বলেন যে, কয়েকজন হামলাকারী ছিল নারী যারা বোরকা পরে এসেছিল। ওই বোরকা পরিহিতা নারীরাও অংশ নিয়েছিল ও পুরুষদের সহযোগিতা করছিল।

গ্রামবাসীর ভাষ্যমতে, হামলাকারীরা যেসব বাড়ির গরু ছাগল লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে পরে কিছু কিছু গরু ছাগল আবার ফেরত দেওয়া হয় চেয়ারম্যান, মেম্বারের লোকজন ও থানার লোকজন মারফত!

গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে যা জানা যায় তাতে এটা পরিষ্কার যে, হামলাকারীরা কোনো নারীর প্রতি যৌন হয়রানি কিংবা সহিংসতা করেনি। তবে ওইখানে যেভাবে হিন্দু বাড়িগুলো অবস্থিত তাতে বেপরোয়া নিয়ন্ত্রণহীন উশৃঙ্খল জনতা হলে নারীদের উপর যৌন হয়রানি ও সহিংসতা চালানো খুবই সম্ভব ছিল কিন্তু তারা একবারের জন্যও সেটা করেনি। দুই একজন নারী লাঠির বাড়ি খেয়েছেন কিন্তু সেটা যৌন সহিংসতা বা হয়রানির কাতারে পড়ে না। তবে একটি বাড়িতে গিয়ে হামলাকারীরা বলেছে যে, তাদের যুবতী মেয়েরা কোথায়? কিন্তু এর চেয়ে বেশি তারা আগে বাড়েনি।

হামলাকারীরা পারতপক্ষে কাউকে মারধরও করেনি। যাদের মেরেছে সেটাও সামান্য পর্যায়ের। তারা ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়েছে কিন্তু কাউকে গুরুতর আহতও করেনি। এটাও খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা একটি বেপরোয়া নিয়ন্ত্রণহীন উশৃঙ্খল জনতার ক্ষেত্রে। গ্রামবাসীর বক্তব্য থেকে এটাও পরিষ্কার যে, হামলাকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রধান কাজই ছিল আগুন লাগানো, বাড়ি-ঘরের টিনগুলো কোপানো, টাকা পয়সা লুট করা। হামলাকারীরা ভালভাবেই দেখেছিল যে, ধানক্ষেতে গ্রামের হিন্দুরা লুকিয়ে আছে তারা সেদিকে টর্চ মেরে ধর ধর বলেছে ঠিকই কিন্তু ধানক্ষেতে নেমে তাদের আক্রমণ করেনি। এমন ঘটনাও পাওয়া গেছে যে ঘরে বৃদ্ধ লোক একা ছিলেন, তাকে হামলাকারীরা কোনো প্রকার গালাগালি না করে স্রেফ বলেছে যে ঘর থেকে বের হন আমরা এখানে আগুন দিব। এরপর তিনি ঘর থেকে বের হলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে চলে গেছে।

পীরগঞ্জের ওই এলাকার সাম্প্রদায়িক পরিবেশ, ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা এবং নিকট অতীতের কিছু বিষয় পীরগঞ্জের ওই এলাকায় একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশ পাওয়া গেছে। যখন হিন্দুপাড়ায় হামলা চলছিল তখন হিন্দুরা ধারে কাছের মুসলমানদের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন কিন্তু আশ্রয় দেয়নি তারা। পাকা বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে গেটটা পর্যন্ত খুলেনি। তবে এটাও সত্য যে দূরবর্তী পাড়ার মুসলমানরা অনেকেই বিপদে থাকা হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন কিন্তু মাঝিপাড়ার পাড়ার মুসলমানেরা হামলা ঠেকানোর কোনো প্রকার চেষ্টাই করেনি। হামলার মুখে পড়ে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হিন্দু যুবক এক মুসলমান বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে তখন বলা হয় যে 'এখন কেন আমাদের কাছে এসেছিস? যা, তোর দুর্গা মার কাছে যা। কেন, তোর দূর্গা মা তোরে বাঁচাইতে পারে না?' বিশেষ করে পরিতোষের গ্রামে, যেখানে মুসলমান ঘরের সংখ্যা বেশি সেখানে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ভালোভাবেই রয়েছে।

এদিকে গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সেখানকার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। তবে সেটা অনেক বড় দ্বন্দ্ব বলে কেউ বলেননি। সেখানকার জেলেরা বংশ পরম্পরায় মাছ ধরে আসছেন, সবাই

হিন্দু সম্প্রদায়েরই। তারা মাছ ধরেন সেখানকার দুটি বড় বিলে। সেই বিলের সাথে আবার নদীর সংযোগ আছে এবং সেখানে মাছের একটি অভয়াশ্রমও আছে। যার ফলে সেখানে মাছ ধরার মওসুমে প্রচুর মাছ হয়। কয়েকবছর থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর লোকেরাও মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। ফলে সেখানে বিলে এই মাছ ধরার দখল নিয়ে একটা টানাপোড়েন রয়েছে।

যে পাড়ায় হামলা হল– অর্থাৎ মাঝিপাড়া উত্তর, সেই পাড়ার হিন্দুদের উপর স্থানীয় আওয়ামী বিরোধী পক্ষের রাগ রয়েছে বলে মনে করেন গ্রামবাসী। কারণ দুই বছর আগে ইউপি নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগেরই দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ হেরে যায় তারা প্রচারণা চালায় যে হিন্দুরা তাদের পক্ষকে ভোট দেয়নি বলেই তারা হেরে গেছে। ফলে তারা তাদের হারের সব দায়ভার হিন্দুদের উপর চাপায়। যদিও এক্ষেত্রে এলাকার হিন্দুদের কথা হল তারা যে পক্ষ হেরে গেছে সেই পক্ষকেই ভোট দিয়েছিল কিন্তু এখনকার মেম্বার ভোট চুরি করে জিতে গেছে। যাই হোক, ওই সময় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও পাশের আরেকপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা চালাতে আসে হেরে যাওয়া পক্ষ, যদিও সেই হামলা এবারের মতো এত ব্যাপক ছিল না। তখন ওই পাড়ার হিন্দুদের আশ্রয় দেন এই মাঝিপাড়ার হিন্দুরা। শুধু তাই নয় তারা তখন হামলাকারীদের সাথে মারামারিও করেন। তাই মাঝি পাড়ার হিন্দুরা মনে করেন সেইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের উপর রাগ থাকতে পারে কোন মহল।

এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যেদিন পীরগঞ্জে হামলা হলো সেদিনই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এখন যেভাবে র‍্যাব থেকে বলা হচ্ছে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হল স্থানীয় ছাত্রলীগের 'সদ্য বহিষ্কৃত' নেতা সৈকত তাতে এই হামলার ঘটনার সাথে এই ইউপি নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা সেই সন্দেহ তৈরি হওয়াটা নিতান্ত অমূলক নয়।

ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরাদের অভিযোগ, পুলিশ আসল হামলাকারীদের বাদ দিয়ে পরবর্তীকালে যাদের ধরেছে তাদের অনেককেই তারা চিনেন যারা খুবই নিরীহ প্রকৃতির মুসলমান তরুণ-যুবক। ওই মুসলমান যুবকেরা হামলাকারী এটা তারা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাদের সাথে ওই এলাকার হিন্দুদের খুবই সুসম্পর্ক রয়েছে। ওই তরুণরা কখনো হিন্দুদের নিয়ে কটূ কথা বলা তো দূরে থাক তাদের সাথে কখনো উচ্চস্বরে কথা পর্যন্ত বলেনি। বরং সবসময় তাদের সাথে এসে হাসিমুখে কথা বলেছে, তাদের বাসায় এসেছে, তাদের সাথে থেকেছে। ২০২১ সালের ২২ অক্টোবর বটেরহাট মসজিদের সামনে কয়েকশো স্থানীয় মুসলমান নারী বিক্ষোভ করেন এই জন্য যে পুলিশ হামলাকারীর বদলে নিরীহ মুসলমানদের গ্রেপ্তার করছে।

তদুপরি ৩০-৩২টি বাড়ির প্রায় ৮০টি ঘরে হামলা হলেও সরকারের তরফ থেকে এই 'ক্ষতিপূরণ' দেয়া হয়েছে ৬৫ জনকে। বাকিদের শুধু 'আশ্বাস' দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকেও পরবর্তীকালে সাহায্য করা হবে। যখন বাড়িতে আগুন দেয়, বাচ্চা নিয়ে জমিতে লুকিয়ে ছিলাম : রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড়করিমপুর গ্রামের বাসিন্দা বিকেল রায়। সাম্প্রদায়িক হামলা ও সহিংসতার ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন, যখন

বাড়ি-ঘরে আগুন দিতে শুরু করে হামলাকারীরা, তখন তিনি শিশুসন্তানকে নিয়ে পাশের খেতে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যখন বাড়িতে আগুন দেয়, তখন আমি বাচ্চা নিয়ে জমিতে লুকিয়ে ছিলাম। বাড়ির সব টাকাপয়সা নিয়ে গেছে। বাচ্চাটার খাওয়ার কিছু নাই।

এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মন্দির ও বসতবাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের পর থেকে বাসিন্দারা আতঙ্কে সময় পার করছেন। কিরোন রানি নামের এক নারী কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, এই দ্যাশোত থাকার চাইতে মরি যাওয়াই ভালো। ভোরে আসি দেখি, কিচ্চু নাই। সোনা দানাসহ সব নিসে। নয়নী রাণী বলেন, সামনে মেয়ের বিয়ে। বিয়ের জন্য কিছু জিনিস কেনা হয়েছিল। শাড়ি-গয়না সব শেষ হয়ে গেছে। ঘরে থাকা ১ লাখ টাকাও লুট হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবগুলো ঘর-বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর আর আগুন লাগানোর চিহ্ন। এর মধ্যে আগুনে একেবারে পুড়ে গেছে ১৫টি পরিবারের ২১টি বাড়ির সবকিছু। সব মিলিয়ে গ্রামের অন্তত ৫০টি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। হামলাকারীরা গরু-ছাগল নিয়ে গেছে।

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার সরেজমিন প্রতিবেদন

হাওরের দুর্গম এলাকা সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা, যেখানে পাকা রাস্তা নেই বললেই চলে। উপজেলার প্রতিটি গ্রামে যেতে হলে হাওর-বিল-ঝিল পাড়ি দিতে হয়। এ উপজেলার এক'শ ঘরের মধ্যে নব্বই ঘরই হিন্দু সম্প্রদায়ের। আর সেই তালিকায় রয়েছে উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রাম।

১৫ মার্চ ২০২১- এ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা হেফাজতে ইসলামের শানে রিসালাত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসে বক্তব্য দেন দলটির তৎকালীন কেন্দ্রীয় আমির প্রয়াত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী, নায়েবে আমির মাওলানা নূরুল ইসলাম খান, মাওলানা জুনাইদ আল হাবীব ও দলটির যুগ্ম-মহাসচিব প্রয়াত মাওলানা মামুনুল হক।

সম্মেলনের পরে মাওলানা মামুনুল হকের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের সমালোচনা করে হিন্দু অধ্যুষিত সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মৃত গোপেন্দ্র দাশের ছেলে ঝুমন দাশ আপন নামের এক যুবক ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এটি সাথে সাথে ভাইরাল হয়ে যায়। যার কারণে আশপাশের গ্রামের মামুনুল হকের অনুসারীরা জড়ো হয়ে মিছিল করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে শাল্লা থানা-পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তারের আশ্বাস প্রদান করে এবং পরে ২০২১ সালের ১৬ মার্চ রাত ১১টায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শাসকাইবাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৬ মার্চ রাতে ঝুমন দাসকে গ্রেপ্তারের একদিন পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ছিল। এদিন চার গ্রামের মানুষ ঝুমন দাসের পোস্টকে কেন্দ্র করে শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁওয়ে হামলা করে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় শাল্লার উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও তাদের নিবৃত করে ফিরিয়ে দেন কিন্তু স্বাধীন মেম্বার তার নাচনী গ্রামে মাইকিং করে তার অনুসারীদের সংগঠিত করে আবারও বিকল্প সড়ক দিয়ে নোয়াগাঁও গ্রামের হিন্দু বাড়িতে তাণ্ডব চালায়।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, নোয়াগাঁও গ্রামে একে একে ৮৮টি ঘরে হামলা ও লুটপাট চালায় তারা। গ্রামের পারিবারিক মন্দির ভাঙচুর করে একটি থেকে কষ্টিপাথরের মূর্তি নিয়ে যায়। প্রতিটি ঘর থেকেই টাকা, পয়সা, সোনাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে হামলাকারীরা। হামলায় অংশ নেয় নাচনী গ্রামের স্বাধীন মিয়া, ইমারত আলী, ইনাত আলী, মির্জা হোসেন, নেহার আলী, আলম উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, আলকাছ, হুমায়ুন, লুৎফুর, মো. ফারুক, আকরামত, কেরামত, কাশিপুর গ্রামের নবাব মিয়া, সাইফুল, আব্দুল মজিদ, তৌহিদসহ শতাধিক লোক।

হামলার মূল নেতৃত্বে ছিলেন দিরাই উপজেলার নাচনী গ্রামের বর্তমান ইউপি সদস্য ও ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি শহীদুল ইসলাম স্বাধীন ও তার ব্যবসায়িক পার্টনার একই গ্রামের ক্ষমতাধর আরেক ব্যক্তি ফখরুদ্দীন ওরফে ফুক্কন মিয়া।

৮৮টি বাড়িঘরে লুটপাট, আগুন ও ৭টি মন্দিরে হামলায় মামলা হয়েছিল তিনটি। ক্ষতিগ্রস্তরা দ্রুত বিচার আইনে মামলা নেয়ার দাবি জানালেও পুলিশ তা রেকর্ড করে সাধারণ মামলা হিসেবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষে তৎকালিন ইউপি চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ মজুমদার বকুল ৭০ জনের নাম উল্লেখসহ প্রায় দেড় হাজার জনকে আসামী করে মামলা করেন। আরেকটি মামলা করেন শাল্লা থানার এসআই আব্দুল করিম। ঝুমন দাশের মা মামলা করেন আদালতে, পরে সেই মামলা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় গোয়েন্দা পুলিশকে।

২০২১ সালের ১৮ অক্টোবর গণকমিশনের তদন্ত প্রতিনিধি দলের সরেজমিন অনুসন্ধানে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নোয়াগাঁও হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুরে অংশ নেয় দিরাই উপজেলার নাচনী, চন্ডিপুর, সন্তোষপুর, ধনপুর ও শাল্লার খাশিপুরসহ দিরাই, শাল্লা উপজেলার কয়েক গ্রামের হাজারো মানুষ।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, হামলার দিন ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সকালে কাশিপুর গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে নোয়াগাঁও গ্রামে গিয়ে হামলা চালানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। সবাইকে সে গ্রামে একত্র হয়ে যাওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়। এরপর আশপাশের গ্রামের লোকজন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন খবর পেয়ে আবারও পুলিশকে জানান নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা দীপক দাস।

একই সঙ্গে গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন চক্রবর্তী ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে যান। তখন নোয়াগাঁও গ্রামের পাশের দাড়াইন নদের তীরে কয়েক হাজার লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে জড়ো হয়েছেন। প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিরা তাদের একদিকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন অন্যদিকে একটি অংশ গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়ে যায়।

শাল্লার ঘটনায় তিনটি মামলা: নোয়াগাঁও গ্রামের ঘটনায় ২০২১ সলের ১৮ মার্চ দুটি শাল্লা থানায় মামলা হয়। একটি মামলা করে শাল্লা থানার পুলিশ। থানার উপ-পরিদর্শক আবদুল করিম বাদী হয়ে করা ওই মামলায় ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে।

আরেকটি মামলা করেন নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা স্থানীয় হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ মজুমদার। ওই মামলায় ৫০ জন নামীয় উল্লেখ করে আরও ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে মামলা করা হয়।

এছাড়া সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু পল্লীতে হামলার ঘটনায় ২ হাজার ১০০ জনকে আসামি করে ঝুমন দাশের মা নিভারাণী দাস ২০২১ সালের ১৮ মার্চ একটি মামলা করেছেন।

নিভারানী দাশের মামলার আবেদনে আসামী হিসেবে ৭২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাত আসামী রাখা হয়েছে আরও দুই হাজারেও বেশি। এর মধ্যে নাচনী গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য স্বাধীন মিয়া, কেরামত আলী, ইমামত আলী, ইনাম আলী, মির্জা হোসেন, নেহার আলী, ফখর উদ্দিন ওরফে ফুক্কন আলীর নামও আছে আসামির তালিকায়।

সুনামগঞ্জের শাল্লায় ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ সাম্প্রদায়িক হামলায় গ্রেপ্তার সব আসামীই এখন জামিনে মুক্ত। হেফাজত নেতা মামুনুলের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া ঝুমন দাশ আপন প্রায় সাত মাস জেল খেটে ২০২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জামিন পেয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর কারাগার থেকে বের হন।

শাল্লায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা সম্পর্কে ‘বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন’-এর গণশুনানি

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি ককাস- এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত ‘বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন’-এর তদন্ত ও গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দিরাই উপজেলা অডিটোরিয়ামে ২০২১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর দিনব্যাপী এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গণকমিশন'-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক- এর নেতৃত্বে সুনামগঞ্জে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাস সম্পর্কে তদন্ত ও গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন গণকমিশন'-এর সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, কমিশনের সচিবালয়ের সমন্বয়কারী কাজী মুকুল এবং সচিবালয়ের সদস্য শহীদ সন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, নির্মূল কমিটির সিলেট জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী, নির্মূল কমিটির সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রুহুল তুহিনসহ সচিবালয়ের অন্যান্য সদস্য।

এছাড়াও গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আতাউর রহমান, শাল্লার হাবিবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ্র মজুমদার বকুল, নির্মূল কমিটি সুনামগঞ্জের সহ-সভাপতি এডভোকেট সালেহ আহমেদ, দিরাই উপজেলার জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমীন, সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের আহ্বায়ক মনোজ কাপালী, সুনামগঞ্জের কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি শামস শামীম।

সুনামগঞ্জ গণকমিশনের গণশুনানিতে লিখিত ৬৩ জন এবং মৌখিক ১২ জন সাক্ষী ২০১৭ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে সংখ্যালঘুদের উপর নারকীয় তাণ্ডব এবং সারাদেশে পূজা মণ্ডপে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলার সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন- শাল্লা গ্রামের ঝুমন দাস আপন, শংকর চন্দ্র দাস (৫০), আশিস চক্রবর্তী (৪৮), রঞ্জনা রানী দাস (৪৫), হরিপদ দাস (৫৭), যোগেন্দ্র দাস (৪৫), বীর মুক্তিযোদ্ধা জগত চন্দ্র দাস (৭৯), নোয়াগাঁও গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একজন হলো রবীন্দ্র দাস (৪৫), নোয়াগাঁও বাসিন্দা দীপক দাস (৪৯), নোয়াগাঁও গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত শৈলেন চন্দ্র দাস (৪৭), ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা অখিল চন্দ্র দাশ (৫৩), নোয়াগাঁও গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল চন্দ্র দাস (৭৮), বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল চন্দ্র দাস (৭৯), বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনু রঞ্জন দাস (৮২), বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কান্তি দাস (৭৮), নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা অনিল চক্রবর্তী (৫০), স্থানীয় বর্তমান ইউপি সদস্য বিশ্বরূপ দাস (৫৩), শাল্লা থানার নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা অসীম চক্রবর্তী, নোয়াগাঁও গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা লোকেশ দাস, নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নিতাই বাবু (৪৫)।

১৭ মার্চ ২০২১ সুনামগঞ্জ শাল্লায় হিন্দুদের উপর হামলার প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জবানবন্দি

১. ঝুমন দাস আপন (৩২), পিতা- মৃত গোপেন্দ্র দাস, মাতা- নিভা রানী দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

শাল্লার সেই আলোচিত ঝুমন দাস আপন বলেন, সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের পার্শ্ববর্তী বরাম হাওরের মধ্যে শাল্লা অংশে

গোসাইর বিল ও নিত্যার দাইর নামে দু'টি জলমহাল রয়েছে। এ দু'টি বিল ওয়াক্ফ এস্টেট থেকে ইজারা এনে কয়েকবছর ধরে মাছ ধরছেন নাচনী গ্রামের বাসিন্দা স্থানীয় সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শহিদুল ইসলাম ওরফে স্বাধীন এবং তার লোকজন। ইজারার নীতিমালার শর্ত না মেনে তারা পাম্প দিয়ে পানি সেচে মাছ ধরেন। এতে নোয়াগাঁওসহ আশপাশের গ্রামের কৃষকেরা বোরো আবাদে সেচ সংকটে পড়েন। এ নিয়ে নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা হরিপদ চন্দ্র দাস ও জগদীশ চন্দ্র দাস শাল্লা থানায় শহিদুল ইসলাম স্বাধীন এবং তার সহযোগী কেরামত আলী, মির্জা হোসেন, ফখর উদ্দিন ওরফে ফুক্কন, আলাম উদ্দিনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগ দেওয়ার পরও বিলে সেচ বন্ধ না হলে ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি পুলিশের সিলেট রেঞ্জের ডিআইজির কাছে আরেকটি অভিযোগ দেওয়া হয়। দিরাই উপজেলা প্রশাসন ওই দিনই গোসাইর জলমহাল থেকে দুটি সেচ পাম্পসহ ফখর উদ্দিনকে আটক করে। পরে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা দুটি সেচপাম্প নিলামে বিক্রি করা হয় ৩৫ হাজার টাকায়। আমি স্বাধীন মেম্বার তার ব্যবসায়ী পার্টনার ফুক্কন মিয়ার পানির স্লুইসগেট কেটে দেওয়ার দৃশ্য ফেসবুকে লাইভের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিই। এ নিয়ে শহিদুল ইসলাম ও তার সঙ্গীরা নানাভাবে নোয়াগাঁও গ্রামের লোকজনের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষ করে আমি ও আমার পরিবারের ওপর ক্ষুব্ধ ও হিংসাত্মক ছিলেন। যার কারণে পরিকল্পিতভাবে পরবর্তীতে স্বাধীন মেম্বারের নেতৃত্বে আমাদের নোয়াগাঁও গ্রামে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়।

আমি যখন জেলে তখনও আমার নামে ১৫-১৬টি ফেসবুক আইডি সচল ছিল। জেলে থাকার পর কীভাবে আমার নামের এই আইডিগুলো সচল থাকে? যে পোস্টের কারণে আমার নামে মামলা হয়েছে সেরকম কোনো পোস্ট আমি দেইনি। মামলায় তিনটিতে পোস্টের কথা উল্লেখ আছে। সত্যিকার অর্থে সবশেষ যে পোস্টটি সেটি আমি দিয়েছি। সে পোস্টে মামুনুল হকের সমালোচনা করা হয়েছে। বাকি যে দু'টি পোস্ট অশ্লীল কথা লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি দেইনি। কেউ আমার প্রোফাইলের স্ক্রিনশট নিয়ে এডিট করে আমার নামে চালিয়ে দিয়েছে। আমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। কী কারণে আমাকে এতদিন জেলে রাখা হলো তা জানি না। একজন ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের সমালোচনা মানে কোনো ধর্ম বা গোষ্ঠীর সমালোচনা নয়।

বিগত ১০ বছর আমি সিলেটের গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট মৌলভীবাজারের রাজনগর, শমসেরনগর, সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ও ধর্মপাশায় মার্কেটিংয়ের কাজ করেছি। স্কয়ারে কাজ করেছি। এভাবেই আমার পরিবারের খরচ চালিয়েছি। ২০২১ সালের প্রথম দিকে আমার ভাই ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা দেন। সেই টাকায় ব্যবসা শুরু করার পরই এই ঘটনা। আমি জেলে থাকায় আমার পরিবার অনেক ঋণ করেছে। এখন আমার কিছু করতে হবে। বুঝতে পারছি না কি করব?

২. নিভা রানী দাস, বাসিন্দাঃ নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা, সুনামগঞ্জ। ঝুমন দাসের মা।
নিভা রানী দাস বলেন, আমার ছেলে যে অপরাধে জেল-জুলুমের শিকার সেটির চেয়ে বড় অপরাধ করেও হামলাকারীরা বহালতবিয়তে আছে সমাজে। কারও সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করলে তার বিচার আছে তাই না? তাই বলে ঠুনকো অজুহাতে পুরো একটা গ্রামের মানুষ ও মন্দিরে হামলাসহ লুটপাট করলো কেন? আমাদের মনে যে দাগ লেগে আছে সেটা কখনো দূর হবে না। হিন্দু মুসলিম মিলেমিশে যেভাবে জীবনযাপন করছি সেটার মধ্যেও চিড় ধরেছে হামলার পর থেকে। আমাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। আমার নিরোপরাধ ছেলেকে দেশবাসীর কাছে অপরাধী বানিয়েছে। স্বাধীন মেম্বার ও ফুক্কন মিয়ার নেতৃত্বে কয়েক গ্রামের মানুষ যেভাবে হামলা ও লুটপাট চালায় সেটার কোনো সঠিক বিচার এখনো হয়নি। সকল আসামী জামিনে বেরিয়ে এসেছে। তাদের জামিন হওয়ায় আমরা আরও আতঙ্কিত।

৩. শংকর চন্দ্র দাস (৫০), পিতাঃ মনোরঞ্জন দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।
২০২১ সালের ১৭ মার্চ শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শংকর চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের গ্রামে সেদিন সংখ্যালঘুদের উপর নারকীয় তাণ্ডব ও হামলা চালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেয় সন্ত্রাসীরা। অন্তত চার গ্রামের মানুষ জড়ো হয়ে সকাল থেকে লাঠিসোটা, দা, রামদা, কিরিচসহ নানা ধরনের দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নোয়াগাঁও গ্রামেও হামলার প্রস্তুতি নেন। ঝুমন দাসের বাড়ি, আমার কাকার বাড়ি সহ অনেক বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে। আমাদের ঘরে থাকা টাকা পয়সা, জিনিসপত্র, মূর্তির গলায় থাকা অলংকারাদি লুটে নেয় এবং আমাদের ভয়-ভীতি দেখায় যে এটা শেষ না, আবার আসব। আমরা এখন খুব আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছি। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে আমাদের বেশিরভাগ বোনদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভগবানই জানে কবে আবার শান্তির সে সময় ফিরে আসবে। আমরা প্রতিটা মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।সরকারের কাছে আমাদের দাবি-দাওয়া পূরণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি সংখ্যালঘুর উপর হামলার বিচার চাই এবং নিরাপত্তা চাই সরকারের কাছে।

৪. আশিস চক্রবর্তী (৪৮), পিতাঃ অনিল চক্রবর্তী, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।
আশিস বলেন, আমাদের এলাকার সব বাড়ি-ঘর লণ্ডভণ্ড হয়েছে। আমার এলাকা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়। আমার বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়। এখন আমরা হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কে আছি। একজন ঝুমন দাসের একটি ফেসবুক পোস্টের কারণে আমাদের উপর যে নারকীয় তাণ্ডব চালানো হয়েছে সেটা অত্যন্ত ঘৃণিত ও

ন্যাক্কারজনক। যারা সংখ্যালঘুদের উপর হামলা করল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো নজির দেখি না।

আমরাও এদেশের নাগরিক। এদেশে থাকতে চাই। আমরা সংখ্যালঘু এটাই কি আমাদের অপরাধ? ঝুমন দাস আপন এর ঘর-বাড়ি সহ আমাদের ৮৮ টি বসতবাড়ির উপর হামলা চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে হামলাকারীরা। এসব অত্যাচার নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক হামলার সঠিক বিচার পাব কিনা সন্দেহ। হামলাকারী অনেকেই এলাকায় ঘুরাঘুরি করছে এবং আমাদেরকে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। এলাকায় ওরা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে আমরা কোনো কিছু বলতে পারছি না। বাজারে গেলে ওদের ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসতে হচ্ছে। পুলিশ যদি জোরালো পদক্ষেপ নিতো তাহলে আমাদের এতো বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হতো না। আমি সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই এ হামলায় যে বা যারা উস্কানি দিয়েছে, যারাই নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. রঞ্জনা রানী দাস (৪৫), স্বামীঃ প্রণেশ দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।
রঞ্জনা বলেন, আমার ভাবতে অবাক লাগে আমরা কেমন দেশে বসবাস করছি। যেখানে জীবনের নিরাপত্তা নেই, মা-বোনের ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। মানুষ কিছু একটা শুনে ভালমন্দ, সত্য মিথ্যা যাচাই না করে সংখ্যালঘুর উপর হামলা করে। এলাকার অন্য ধর্মাবলম্বীরা তামাশা দেখবে এবং প্রশাসন নিরব থাকবে- এটা কী হকে পারে! এমনকি ৯৯৯- এ কল দিয়েও হামলা থেকে বাঁচতে পারিনি। ওইদিনের হামলার কথা মনে পড়লে এখনো শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় আমার। সেইদিন যেভাবে আমাদের উপর হামলা হলো তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো না। আমরা কোনোমতে বেঁচে গেছি। হামলাকারীদের শক্তি অনেক। ওরা বারবার হামলা করবে আর আমরা নীরবে সব সয়ে যাব এটা কেমন কথা? এদেশে কি আইন আদালত নেই? কোনো কি বিচার নেই? এসব অন্যায়ের বিচার কি আমরা পাবো? আমি এ হামলাকারীদের বিচার চাই। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চাই।

৬. হরিপদ দাস (৫৭), পিতাঃ বামা চরণ দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।
হরিপদ বলেন, আমি ভাবতে পারছি না আমাদের বাড়িতে এতবড় হামলা হবে, মনে হয়েছিল আমরা মধ্যখানে দ্বীপের উপর যাযাবরের দল। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতো লাগছিল। চতুর্দিক থেকে যেভাবে লাঠিসোটা, ছুরি, তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলো আমাদের উপর, প্রশ্ন জাগে আমাদের কি দোষ?

আমাদের উপর হামলার মূল নায়ক হচ্ছে নাচনী গ্রামের ইউপি সদস্য ও ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি স্বাধীন মেম্বার ও তার ব্যবসায়ী পার্টনার ফুক্কন মিয়া। ওরা দু'জন

মাইকিং করে শতশত মানুষ জড়ো করে আমাদের উপর হামলা চালায়। আমাদের গ্রামের ৮৮টি ঘরবাড়ি লুটপাট করে। ৭টি মন্দিরে ভাঙচুর করে। এটা কেমন দেশে বসবাস করি যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন বিচার পায় না? পুলিশের কাছে গেলে মামলা না নিয়ে তালবাহানা করে? হামলাকারীরা আক্রমণ করে নিরাপদে এলাকা ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে কোনো সমস্যা হয় না কেন? দেশে সংখ্যালঘুরা কোনো বিচার পাবে কিনা জানি না। আমরা বিচার চাই সরকারের কাছে। সরকার আমাদের ক্ষতিপূরণ দিবে এটাই আশা রাখি।

৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল চন্দ্র দাস (৭৮), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল বলেন, ঝুমন কোনো ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী বক্তব্য দেয়নি। সে একজন ব্যক্তির সমালোচনা করেছে। এ কারণে তাকে তথ্য-প্রযুক্তি মামলা দিয়ে জেলা রাখা হয়েছে দীর্ঘ ছয় মাস। আমরা তার শর্তসাপেক্ষে জামিন চাই না, নিঃশর্ত মুক্তি চাই এবং যারা আমাদের গ্রামে হামলা ও লুটপাট করেছিল সবার গ্রেপ্তার চাই। পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার না করায় আমরা এখনো আতঙ্কে আছি।

নাচনী গ্রামের স্বাধীন মেম্বার ও ফুক্কনের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষ লাঠিসোটা, ধারালো ছুরি, বল্লম হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নোয়াগাঁও হামলা করে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি হামলাকারীরা মৌলবাদী ও স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী। এরাই একত্রিত হয়ে এই নারকীয় হামলা করেছে। এরাই হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম জাতীয় দাঙ্গার মূল হোতা। যেভাবে আজকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় কলঙ্ক দাগ মুছে গেছে, ঠিক এভাবে হামলাকারীদেরও তালিকা করে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল চন্দ্র দাস আরও বলেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেইদিন যেরকম অপমান ও অত্যাচারের শিকার হয়েছিলাম তাতে মর্মাহত হয়েছি। এদেশে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এসব ঘৃণ্য বর্বরোচিত হামলার জোরালো প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা যদি নিরাপদে বসবাস করতে না পারে তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে বুঝতেই পারছেন! আমি গণতদন্ত কমিশনের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তার বিধান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানালাম।

৮. অসীম চক্রবর্তী, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

অসীম চক্রবর্তী বলেন, ২০২১ সালের ১৫ মার্চ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার স্টেডিয়ামে শানে রিসালাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হেফাজতের আমীর জুনায়েদ বাবুনগরী, যুগ্ম-মহাসচিব মামুনুল হক, জুনাইদ আল হাবিবসহ কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেন। লক্ষাধিক লোকের এই সমাবেশের পর ঐ রাতেই শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁওয়ের ঝুমন দাশ আপন (২৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হেফাজত নেতা মামুনুল হককে নিয়ে সমালোচনা করে পোস্ট দেন। এতে এলাকায়

বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় মুসল্লিরা ঐ রাতেই বিক্ষোভ করে ঝুমনের গ্রেপ্তার দাবি করেন।

আমাদের সহযোগিতায় রাতেই পুলিশ ঝুমনকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হননি এলাকার লোকজন। ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সকালে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়ে নোয়াগাঁও হামলা চালানো হয়। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৮৮টি ঘর ও ৮টি মন্দির ভাঙচুর করা হয়। বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসে।

৯. লোকেশ দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

লোকেশ দাস বলেন, ২০২১ সালের ১৭ মার্চ হামলার দিন সকালে শাল্লা উপজেলার কাশিপুর গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে নোয়াগাঁও গ্রামে গিয়ে হামলা চালানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। সবাইকে সে গ্রামে একত্র হয়ে যাওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়। এরপর আশপাশের গ্রামের লোকজন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে- এমন খবর পেয়ে আবারও পুলিশকে জানায় নোয়াগাঁও গ্রামের এক বাসিন্দা। গ্রামের ওই ব্যক্তি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে যান। তখন নোয়াগাঁও গ্রামের পাশের দাড়াইন নদের তীরে কয়েক হাজার লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে জড়ো হন। প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিরা তাদের একটি অংশকে একদিকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে আরেকটি অংশ গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়ে যায়।

হেফাজত অনুসারীদের সভা-সমাবেশের খবর আমরা মুঠোফোনে ও মৌখিকভাবে পুলিশকে জানিয়েছিলাম কিন্তু নিরাপত্তা দেওয়া তো দূরের কথা হামলার আগে তারা একবারের জন্যও গ্রামে আসেনি। ঘটনার পর তাদের তৎপরতা বাড়ে। গ্রামে র‍্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা আন্তরিক হলে এ ঘটনা প্রতিহত করা যেত। পুলিশের নির্দেশনা অনুযায়ীই ঝুমন দাশকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছিলাম আমরা। এরপর পুলিশ থেকে বলা হয়েছিল, হেফাজত কর্মীরা গ্রামে হামলা করবে না। এর বাইরে উত্তেজনা প্রশমনে তারা কিছু করেনি। আমরা শত শত বছর ধরে শান্তি সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছি। আমাদের বাপ-দাদারা এখানে বসবাস করেছেন মিলেমিশে। কোনোদিন এ রকম ঘটনা হয়নি। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী গুজব ছড়িয়ে আমাদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুর, লুটপাট করেছে। আমি এর বিচার চাই।

১০. নিতাই বাবু (৪৫), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

নিতাই বলেন, নোয়াগাঁও গ্রামের হামলার নেপথ্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী বরাম হাওরের মধ্যে শাল্লা অংশে গোসাইর বিল ও নিত্যার দাইর নামে দু'টি জলমহাল রয়েছে। এ দু'টি বিল ওয়াক্‌ফ এস্টেট থেকে ইজারা এনে কয়েক বছর ধরে মাছ আহরণ করছেন নাচনী

গ্রামের বাসিন্দা স্থানীয় সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শহিদুল ইসলাম ওরফে স্বাধীন এবং তার লোকজন। ইজারার নীতিমালার শর্ত না মেনে তারা পাম্প দিয়ে পানি সেচে মাছ ধরেন। এতে নোয়াগাঁওসহ আশপাশের গ্রামের কৃষকেরা বোরো আবাদে সেচ সংকটে পড়েন।

এ নিয়ে নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা হরিপদ চন্দ্র দাস ও জগদীশ চন্দ্র দাস শাল্লা থানায় শহিদুল ইসলাম এবং তার সহযোগী কেরামত আলী, মির্জা হোসেন, ফখর উদ্দিন ওরফে ফুক্কন, আলাম উদ্দিনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন। কিন্তু এরপরও বিলে সেচ বন্ধ না হলে ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি পুলিশের সিলেট রেঞ্জের ডিআইজির কাছে আরেকটি অভিযোগ দেওয়া হয়।

দিরাই উপজেলা প্রশাসন ওই দিনই গোসাইর জলমহাল থেকে দু'টি সেচপাম্পসহ ফখর উদ্দিনকে আটক করে। পরে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা দুটি সেচপাম্প নিলামে বিক্রি করা হয় ৩৫ হাজার টাকায়। এ নিয়ে শহিদুল ইসলাম ও তার সঙ্গীরা নানাভাবে নোয়াগাঁও গ্রামের লোকজনের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দায়সারা দায়িত্ব পালন করার কারণে হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংখ্যালঘুদের উপর যে তাণ্ডব চালিয়েছে তার জন্য পুলিশের অবহেলা ছিল শতভাগ।

১১. বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কান্তি দাস (৭৮), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কান্তি বলেন, নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনাটি কারও অজানা নয়। আমাদের গ্রামে এতো বড় একটি ঘটনা ঘটলো কেন? সেজন্য কি কোনো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি? কি কি কারণে আমাদের উপর এতো বড় পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছি? আর কতদিন এভাবে চলবে? এটা উদঘাটনের কোনো সুরাহা নাই, থাকলে কিভাবে তা সম্পাদনা বা শান্তির বাতি জ্বালিয়ে আবার সুখী সমৃদ্ধির দেশ হিসেবে আবার ফিরে পাবো। মূলত দোষী কারা? ওদের টার্গেট কি ছিল? শুধু কি হামলা না অন্য কিছু? এসব বিষয়ের উপর আমাদের তদারকির খুবই অভাব, আমার মনে হয় না সহজে এটা মিটাতে পারবো।

১২. অনিল চক্রবর্তী (৫০), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

অনিল বলেন, ২০২১ সালের ১৬ মার্চ বিকাল থেকেই সনাতন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত নোয়াগাঁও গ্রামে হামলা হতে পারে ধারণা করে রাতেই গ্রামের অনেক বাসিন্দা বাড়ি ছেড়ে চলে যান। বিষয়টি পুলিশকে জানাই আমি। পরে ১৭ মার্চ সকাল ৮টার দিকে দিরাই উপজেলার নাচনী, চণ্ডিপুর, সন্তোষপুর ও শাল্লা উপজেলার কাশিপুর গ্রামের কয়েকশ' মানুষ দা, রাম দা, লাঠি-সোটা নিয়ে ওই গ্রামে হামলা চালায়। হামলা হতে

পারে জেনেও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ অথচ তাদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, হামলা হবে না তাদের গ্রামে।

১৩. বিশ্বরূপ দাস (৫৩), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ। তৎকালীন স্থানীয় ইউপি সদস্য।

বিশ্বরূপ দাস বলেন, ১৭ মার্চে এক থেকে দেড় হাজার লোক যখন সকালে লাঠি, রামদা নিয়ে আক্রমণের জন্য আসে তা নদীর এপার থেকেই দেখা যায়। তাদের দেখে গ্রামের লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু নারী ও শিশুদের একটি অংশ পালাতে পারেনি। হামলাকারীদের একটি অংশ সাঁকোর ওপারে অবস্থান করে আর আরেকটি অংশ গ্রামে ঢুকে বাড়ি ঘরে হামলা চালায়।

হামলাকারী দু'টি দলে ভাগ হয়ে বন্ধ ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করে, আলমারি ভেঙে ফেলে, স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সামগ্রী ও টাকা পয়সা লুট করে। মোট ৮৮টি ঘরে হামলা চালিয়ে তারা লুটপাট করে। আর যে নারী ও শিশুরা পালাতে পারেনি তাদের মারধর করে। বিশেষ করে ঝুমন দাসের স্ত্রী ও হবিবপুর তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যানের স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে। ইউপি চেয়ারম্যানের স্ত্রী বাথরুমে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয়। ৭-৮টা পারিবারিক মন্দির ছিল সেগুলোও ভাঙচুর করা হয়। মন্দিরের প্রতিমাও তারা ভেঙে ফেলে। নোয়াগাঁও গ্রামে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। শাল্লা উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অপসারণ করে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

১৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল চন্দ্র দাস (৭৯), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল চন্দ্র দাস বলেন, হামলাকারীরা আমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। মামুনুলের সমালোচনাকে ইসলামের সমালোচনা বলে এলাকায় প্রচার চালাতে থাকেন তার অনুসারীরা। এতে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আমরা নোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা ২০২১ সালের ১৬ মার্চ রাতে ঝুমনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও শান্ত হয়নি মামুনুলের অনুসারীরা। পরদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর সকালে কয়েক হাজার লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিল করে হামলা চালায় নোয়াগাঁও গ্রামে। তারা ভাঙচুর ও লুটপাট করে ঝুমন দাসের বাড়িসহ হাওরপাড়ের হিন্দু গ্রামটির প্রায় ৯০টি বাড়ি, মন্দির। ঝুমনের স্ত্রী সুইটিকে পিটিয়ে আহত করা হয়।

একজন মামুনুল হকের সমালোচনা করে গ্রামের একজন যুবকের ফেসবুকে একটি পোস্ট দেওয়ার কারণে যেভাবে আমাদের ৮৮ টি বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট

চালিয়েছি তাতে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অপমানিত হয়েছি। কষ্টার্জিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়ে গেলেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আজ আমরা কতটুকু তার দেওয়া দায়-দায়িত্ব রক্ষা করতে পারছি– এ প্রশ্নটি রইলো জাতির বিবেকের কাছে।

১৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনু রঞ্জন দাস (৮২), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনু রঞ্জন বলেন, আমাদের নোয়াগাঁও ঘটনার জন্য শুধু জঙ্গি মৌলবাদী হেফাজতিকে দোষী করলে ভুল হবে, মূল রহস্য উদঘাটন করতে হবে অর্থাৎ কারা কারা এই হামলার সাথে জড়িত, পরিকল্পনার মূলে সেটা উদঘাটন করতে হবে। আর খুঁজে বের করতে হবে কোন কোন ইস্যুতে আমাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো আমলে এনে সংশোধন করতে হবে। এই রকম হামলা যেন পুনরায় না হয় সেজন্য জাতীয় ঐক্য গঠনে যা যা করণীয় তা অতিশীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০২১ সালের ১৭ মার্চ সকালে কাশিপুর, দিরাই উপজেলার নাচনী, চণ্ডীপুর ও সন্তোষপুর গ্রামে হামলা চালিয়ে বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘরের জিনিসপত্রও লুট করা হয়েছে। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর মানুষ বাড়িতে ফিরে আসেন। ঘটনার দিন আমি ঘরে ছিলাম। হামলাকারীরা আমাকে মারধর করে, আমার ঘর ভাঙচুর করে, হুমকি দিয়েছে। আমরা এই দেশের নাগরিক, আমাদের নিরাপত্তা সরকারকেই দিতে হবে। যারা হামলা ও লুটপাট চালিয়ে সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দেখিয়েছেন তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।

১৬. যোগেন্দ্র দাস (৪৫), পিতাঃ গণেশ দাস, মাতাঃ মায়ারানী দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

যোগেন্দ্র বলেন, হামলাকারীরা সংখ্যায় বেশি ছিল, কিছু লোককে চিনতে পারলেও অনেক লোককে আমি চিনতে পারিনি। আমার বাড়ি-ঘর ভেঙেছে, আমার প্রতিমা ভেঙেছে। আমার অনেক মালামাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমি হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই। স্থানীয় পুলিশ যথেষ্ট সময় পেলেও যথাসময়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু কথিত হিন্দু যুবক ঝুমন দাস আপনকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করেছে। পরে কারা হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। আমি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। দেশবাসী যেদিন জাতির পিতার জন্মদিন উদ্‌যাপন করছে, ঠিক সেদিনই ধর্মান্ধ উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসীর ওপর নির্বিচার তাণ্ডববলীলা চালিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুধু গুজব ছড়িয়ে এসব আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সেসব গুজবকারী কাউকে আজ অবধি আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি।

১৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা জগত চন্দ্র দাস (৭৯), পিতাঃ ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জগত চন্দ্র বলেন, আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পরও হামলার শিকার হয়েছি। হামলার সময় আমার হাতে আঘাত পেয়েছি। আমার বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করেছে। আমাদের ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন্দলের আভাস পেয়েছি। জানি না কতটুকু সত্য? যাই হোক আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকার করবেন এবং হামলাকারীদের বিচারের দাবি জানাই।

নাসিরনগর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার না হওয়ায় উগ্রবাদীরা বারবার একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি করার সাহস দেখাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরে এসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনার বদলে সাম্প্রদায়িক চেহারার দায় শাসক দলকেই নিতে হবে। সুনামগঞ্জের শাল্লায় হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ নানা মত-পথের মানুষের সমন্বয়ে বৃহত্তর সিলেটের সুনাম ও সুখ্যাতি কালের পরিক্রমায় একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২০২১ সালের ১৫ মার্চ মাওলানা মামুনুল হকের দিরাই উপজেলায় একটি ধর্মসভাকে কেন্দ্র করে ঝুমন দাস নামের এক যুবকের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে তিনটি গ্রামের হাজার হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর যে বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ঘটেছে সেটার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল রাখতে সরকার দ্রুত আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যাতে এমন পৈশাচিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

১৮. রবীন্দ্র দাস (৪৫), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

রবীন্দ্র দাস বলেন, হামলার দিন কাশিপুর গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, হিন্দুরা আমাদের মুসলিমদের উপর বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের ধর্ম ও মাওলানা মামুনুল হকের অবমাননা করছে। আমাদের ইসলাম ধর্মের উপর আঘাত হানছে এবং হাইয়া আলাল জিহাদ, হাইয়া আলাল জিহাদ নামে আরও কি কি শব্দ দিয়ে ডাকছে, আমি শব্দগুলো বুঝতে পারিনি। ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সকালে সবাইকে একত্রিত হয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয় মাইকে। সবাই মিলে একসাথে নোয়াগাঁও গ্রামে হামলার নির্দেশনার ঘোষণা দেওয়া হয়। আমাদের গ্রামে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবর পেয়ে আমরা পুলিশকে খবর দেই, আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে আসেন। তখন দেখতে পেলাম নোয়াগাঁও গ্রামের পাশের দাড়াইন নদীর তীরে অবস্থিত দাড়াইন বাজারে হাজারেরও বেশি লোক লাঠিসোটা নিয়ে জড়ো হয়েছে। একদিকে গ্রামের লোকজন, প্রতিনিধিরা ও পুলিশ যখন আক্রমণকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করছে অন্য একটি অংশ গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। আমাদের বসতভিটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

ঝুমন দাশকে পুলিশে দেওয়ার পর স্থানীয়রা আশা করেছিল অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটবে না কিন্তু ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সকালে উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে পাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। ওই হামলায় নোয়াগাঁওয়ের কমপক্ষে ৯০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হামলা লুটপাট ও ভাংচুরের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাই।

১৯. দীপক দাস (৪৯), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

দীপক বলেন, ২০২১ সালের ১৭ মার্চ নোয়াগাঁও গ্রামে এক ভয়াবহ হামলা চালানো হয় যা আমাদের গ্রামে এ প্রথম ঘটনা। আমাদের গ্রামে এ হামলার কারণে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আমার পরিবার নোয়াগাঁও গ্রামের লোকজন চরম ভয়ে জীবনযাপন করছি। কবে নাগাদ এই ভয়ভীতি আতঙ্ক দূর হবে আমি জানি না। আমি এ হামলাকারীদের বিচার চাই।

শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁওয়ের ঝুমন দাস আপনের ফেসবুক পোস্ট যদি এতই আপত্তিকর ও অবমাননাকর হয়, তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু আইনকে তোয়াক্কা না করে স্থানীয় মসজিদের মাইক ব্যবহার করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হামলার পরে পুলিশ গ্রামে এসে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে কিন্তু প্রশাসনের এমন আশ্বাসে আস্থা রাখতে পারছি না আমি। কারণ অতীতে সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোর সঙ্গে জড়িতরা বেশিরভাগেরই বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। হামলার ঘটনাগুলোর বিচার তো দূরে থাক, কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল হয়নি বেশিরভাগ মামলার। ফলে এসব হামলার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হচ্ছে না।

২০. শৈলেন চন্দ্র দাস (৪৭), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

শৈলেন বলেন, নাচনী গ্রামের বাসিন্দা স্বাধীন ও ফুক্কনের নেতৃত্বে আমাদের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। তারা আমার ঘরের টাকা-পয়সা ও অলংকার নিয়ে গেছে। স্বাধীন মেম্বারের সঙ্গে আমাদের গ্রামবাসীর বিরোধ ছিল। সে বরাম হাওরের কুচাখাই বিল সেচতে চায় আমরা গ্রামবাসী বাঁধা দিই। বিল সেচার কারণে জমিতে পানি দেওয়া যায় না। পানির অভাবে জমি-ক্ষেত নষ্ট হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা ইউএনও সাহেবের কাছে অভিযোগ করি। অভিযোগকারী ছিলেন আমার কাকা হরিপদ দাশ। এ কারণে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। অবিলম্বে হামলাকারী ও মদদদাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি এবং একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।

২১. বীর মুক্তিযোদ্ধা অখিল চন্দ্র দাশ (৫৩), বাসিন্দা নোয়াগাঁও, হবিবপুর, শাল্লা সুনামগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অখিল চন্দ্র বলেন, হামলার সময় আমি ঘরে ছিলাম। ঘরের দরজা ভেঙে টাকা-পয়সা মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটসহ অনেক কিছু নিয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা বলার পরও তারা আমাকে রেহাই দেয়নি। আমার উপর এ ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। আমাদের নোয়াগাঁও গ্রামের লোকজন শান্তশিষ্ট মানুষ, আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো রকমের দ্বিধাবিভক্তির রেশ নেই, কে বা কারা এ হামলার পরিকল্পনা করেছে জানি না। আমাদের গ্রামের এই ন্যাক্কারজনক হামলার নিন্দা জানাই। আমাদের এলাকার খুব ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, বাড়ি-ঘর ভাঙচুর, গয়না চুরি, মানুষের প্রতি ভয় প্রদর্শনসহ অনেক ক্ষতি করেছে সন্ত্রাসীরা। আমরা এই নিন্দনীয় হামলার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।

সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রেক্ষিতে সুনামগঞ্জের শাল্লার বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার

১. ব্যারিস্টার এম এনামুল কবির ইমন, সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

ব্যারিস্টার এম এনামুল কবির ইমন বলেন, যারা হেফাজতে ইসলামের নামে স্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘুদের গ্রামে তাণ্ডব চালিয়েছে, মন্দির ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছে তারা মৌলবাদের প্রেতাত্মা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশবাসীকে নিয়ে তাদের প্রতিহত করা হবে। '৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা দেশ স্বাধীন করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই দেশ কখনো রাজাকার ও মৌলবাদের দেশ হতে পারে না। এসব ধর্মীয় উগ্রবাদী ও রাজাকারদের আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করব। এ ঘটনায় আওয়ামী লীগ সরকার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ২০২১ সালের ১৫ মার্চ শাল্লার পাশের দিরাইয়ে সমাবেশ করে হেফাজত। ওই সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য রাখেন মাওলানা মামুনুল হক। পরদিনই নোয়াগাঁও গ্রামের গোপেশ দাসের ছেলে ঝুমন দাসের স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ২০২১ সালের ১৬ মার্চ রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে পুলিশে সোপর্দ করে এলাকাবাসী।

ঝুমন দাসকে পুলিশে দেওয়ার পর স্থানীয়রা আশা করেছিল, অনাকাঙ্খিত কিছু হবে না। কিন্তু উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে পাশের কয়েকটি গ্রামের চার শতাধিক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। ওই হামলায় নোয়াগাঁওয়ের কমপক্ষে ৯০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ওই গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

২. এডভোকেট বিমান কান্তি রায়, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি।

এডভোকেট বিমান কান্তি বলেন, আমাদের ওপর দলবেঁধে নৃশংস হামলা করেছে। বাড়ি-ঘরে ভাঙচুর, নারীদের শ্লীলতাহানি, লুটপাটসহ যা খুশি তা করে যাচ্ছে। আমরা দেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে চাই। একটা মৌলবাদী গোষ্ঠীর এই হামলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করা। ২০২১ সালের ১৫ মার্চ শাল্লার পাশের দিরাইয়ে সমাবেশ করে হেফাজতে ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা মাওলানা মামুনুল ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। পরদিনই নোয়াগাঁও গ্রামের ওই তরুণের স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে।

ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ, সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাও গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির ও প্রায় শতাধিক বাড়ীতে লুটপাট, হামলা, ভাংচুর-সহ মধ্যযুগীয় তাণ্ডবে আমি গভীর উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। ব্যক্তি বিশেষের হীনস্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে নিরীহ সংখ্যালঘুদের শতাধিক বাড়ি ঘরে জঘন্য হামলা ও লুটপাটের নিন্দা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করছি। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

৩. বিমল বণিক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সুনামগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক।

বিমল বণিক বলেন, ২০২১ সালের ১৫ মার্চ শাল্লার পাশের দিরাইয়ে সমাবেশ করে হেফাজত। ওই সমাবেশে আপত্তিকর বক্তব্য রাখেন মাওলানা মামুনুল হক। পরদিনই নোয়াগাঁও গ্রামের গোপেন্দ্র দাশের ছেলে ঝুমন দাশের (২৫) পোস্টের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ২০২১ সালের ১৬ মার্চ রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে পুলিশে সোপর্দ করে এলাকাবাসী।

ঝুমন দাশকে পুলিশে দেওয়ার পর স্থানীয়রা আশা করেছিল অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটবে না। এরপরও ১৭ মার্চ সকালে উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে পাশের কয়েকটি গ্রামের চার শতাধিক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। হামলা লুটপাট ও ভাঙচুরের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাই। এছাড়া আক্রান্ত এলাকায় সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবি রইল।

৪. বাবু দীপকচন্দ্র ঘোষ, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-এর সুনামগঞ্জ জেলার সভাপতি।

বাবু দীপকচন্দ্র ঘোষ বলেন, সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

সুনামগঞ্জের শাল্লায় সাম্প্রদায়িক হামলা ও লুটপাট হয়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অসাম্প্রদায়িক শক্তির মধ্যেও বিভিন্ন অপশক্তি ও বিপথগামী শক্তি রয়েছে, যারা জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চায়। এই অপশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে হবে। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালাচ্ছে, হামলা করছে। নাসিরনগর, রামু, সাঁথিয়া, মুরাদনগরেও হামলা হয়েছে। কাজেই আমরা প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। শাল্লার ঘটনায় যাদের গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ছাড়াও এই ঘটনার আড়ালে যারা জড়িত বা যারা উসকানিদাতা তাদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে। দ্রুত বিচার আদালতে সংক্ষিপ্ত সময়ে এদের বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৫. চিত্তরঞ্জন তালুকদার, সভাপতি, সুনামগঞ্জ জেলা কমিউনিস্ট পার্টি।

চিত্তরঞ্জন তালুকদার বলেন, আমাদের দাবিগুলো হলো– ক্ষতিগ্রস্তদের রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, হামলার উস্কানিদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা এবং পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা থাকার পরও স্থানীয় প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হওয়ায়' তাদের প্রত্যাহারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. জাহাঙ্গীর আলম, উদীচীর সুনামগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশে গণতন্ত্র না থাকলে সেখানে স্বৈরতন্ত্র থাকবে, আর এমন পরিস্থিতিতে যা হবার তা-ই হয়েছে। সেখানে মানুষ সমাবেশ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়েছে। তারা দেশের নাগরিক হলেও তাদের সম্পদ লুটপাট করেছে, মন্দির ভেঙেছে। আমার দেশ যেহেতু নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করে না, সেই কারণে দুষ্টচক্র এ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে এবং একের পর এক পার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত হামলার ঘটনা জাতির জন্য লজ্জাজনক। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ কেবল নথিতে লিপিবদ্ধ, বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন আমাদের সমাজে নেই, বরং ক্রমশ বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের আপসকামীতার কারণে। বছরের পর বছর বিচারহীনতার কারণেই আজ ভয়ংকররূপে হাজির হয়েছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী। এর দায় সরকার এড়াতে পারে না।

৭. মাওলানা আব্দুল হাই, সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা হেফাজতে ইসলামের সহ-সভাপতি।

মাওলানা আব্দুল হাই বলেন, ২০২১ সালের ১৭ মার্চ সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি-ঘরে হামলার ঘটনার নিন্দা, ক্ষতিগ্রস্তদের

সমবেদনা ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। শাল্লায় ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মী কিংবা স্থানীয় আলেম-ওলামাদের সম্পৃক্ততা নেই। এরপরেও আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, কোনো অনুসন্ধান ও প্রমাণ ছাড়াই কিছুসংখ্যক গণমাধ্যম হামলার ঘটনায় হেফাজতকে জড়িয়ে উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগাণ্ডা চালাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি কুচক্রী মহল নিজেদের স্বার্থে হামলার ঘটনায় হেফাজতে ইসলামকে দায়ি করে বিবৃতি দিচ্ছে। আমরা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বাড়ি-ঘরে হামলা হেফাজত কখনোই সমর্থন করে না। একটি ফেসবুক পোস্টকে পুঁজি করে হামলাকারীরা নিজেদের স্বার্থে নিরীহ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি-ঘরে ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য নিরপরাধ কোনো মানুষকে হয়রানি না করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

৮. মাওলানা আব্দুল বাছির, হেফাজতে ইসলামের সুনামগঞ্জ জেলার সাবেক আমির, 'হেফাজতের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ও সুনামগঞ্জ দারুল উলুম আমাদানি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল।

মাওলানা আব্দুল বাছির বলেন, যেকোনো মূল্যে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখতে হবে। যারা শাল্লার নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দুদের উপর হামলা চালিয়েছে, তারা সন্ত্রাসী। ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না। হজরত মুহাম্মদ (সা.) কখনো অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেননি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

৯. নিরঞ্জন দাশ খোকন, সুনামগঞ্জের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ (সিপিবি)-এর নেতা।

নিরঞ্জন দাশ খোকন বলেন, সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে সাম্প্রদায়িক শক্তি এখন বিষাক্ত ফণা তুলছে। একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে কিন্তু সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হামলা হতে পারে আঁচ করে শাল্লার গ্রামবাসী পুলিশকে জানালেও, তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এখানকার হিন্দুপল্লীতে সাম্প্রদায়িক হামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মী জড়িত থাকার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। সরকার কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালনে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হুমকির মুখে পড়েছে। এর আগে রামু, নাসিরনগরসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার যত ঘটনা ঘটেছে, তার কোনো ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না হওয়ায় শাল্লায় সাম্প্রদায়িক হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রক্ষা করছে বলেই সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক হামলায়

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অংশ নিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নোয়াগাঁও গ্রামের যুবক ঝুমন দাসের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে সুনামগঞ্জের শাল্লায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর ও মন্দিরে হামলার যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়।

১০. আ ত ম সালেহ, সুনামগঞ্জ জেলা জাসদের সভাপতি।

আ ত ম সালেহ বলেন, বাংলাদেশে অপরাধের বহু মাত্রা, বহু পন্থা। এখানে শুধু ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ার কারণেও একজন মানুষ তার ঘর, ভিটে এমনকি প্রাণও হারাতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের বাইরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বাইরে অবাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উপর চলে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বিভিন্নরূপে এ ধরণের সাম্প্রদায়িক আচরণের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এরূপ অপরাধের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় যখন রাজনৈতিক দলসমূহ, সরকার এবং রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব হামলা ও নির্যাতনে মদদ দেয়। এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক কারণ সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্ম। আমাদের দেশ এখন নিজের জন্ম গৌরব অস্বীকার করছে। আমি বলবো সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লার হামলা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা।

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে দেশ স্বাধীন করলেও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির আগমুহূর্তে হিন্দু ধর্মালম্বীদের গ্রামে আক্রমণ প্রমাণ করে গত পঞ্চাশ বছরে শাসকশ্রেণী অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কায়েম থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। ক্ষমতাসীন শ্রেণীর একদল সাম্প্রদায়িক জামাতকে আরেকদল হেফাজতকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশে মৌলবাদী রাজনীতিকে আস্কারা দিচ্ছে। শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার হেফাজতকে তোষামোদ করে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসিরনগরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা, ধর্ম অবমাননার নামে লালমনিরহাটে মানুষ হত্যার বিচার না হওয়ায় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি একের পর এক অপকর্ম করার সুযোগ পাচ্ছে।

১১. মুক্তার হোসেন চৌধুরী, দিরাই উপজেলা হেফাজতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক।

মুক্তার হোসেন চৌধুরী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দোষ করেন, তাহলে তাকে আইনের আওতায় আনাটা স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু এভাবে হামলা-ভাঙচুর হেফাজতে ইসলাম সমর্থন করে না। যারা এসব কাজ করেছেন তাদের শাস্তি দাবি করছি। হামলার সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। স্থানীয় হেফাজতে ইসলামের নেতারা হামলাকারীদের প্রতিরোধ করেছে, বাধা দিয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে খবর দিয়েছে। তাছাড়া দিনে হামলার পর রাতে ফেসবুক লাইভে মাওলানা মামুনুল হক

বলেন, কিছু লোক হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ করেছে। এর দায়-দায়িত্ব কোনো আলেম নেবে না এবং নেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। ওই হামলার ঘটনায় আলোচিত ইউপি সদস্য শহীদুল ইসলাম স্বাধীন ওরফে স্বাধীন মেম্বারকে ২০২১ সালের ২০ মার্চ গ্রেপ্তার করে পিবিআই। দু'দিন পরেই এই হামলার মূল রহস্য উন্মোচন হয়েছে।

জলমহাল নিয়ে সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ ছিল। পূর্ব-বিরোধের জের ধরে ঝুমন দাশ আপনের আপত্তিকর ফেসবুক স্ট্যাটাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেই এ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ফেসবুক কটূক্তিকে মেম্বার স্বাধীন ও তার সহযোগীরা নিজেদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নে কাজে লাগিয়েছে। এর মাধ্যমেই অসৎ উদ্দেশ্যে হেফাজতের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের কাছে আমরা আহ্বান করছি, শাল্লার ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। একইসাথে আমরা সুনামগঞ্জের ওলামায়ে কেরামসহ সবাইকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।

১২. মাওলানা আব্দুর রকিব, সুনামগঞ্জ জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

মাওলানা আব্দুর রকিব বলেন, সুনামগঞ্জের শাল্লায় আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলাম। সেখানে সংখ্যালঘু নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে হামলাকালীন কোনো ছবি বা ভিডিও ফুটেজ না থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত অনুসন্ধান ও তদন্তের আগেই মূলধারার গণমাধ্যমে 'হেফাজতের সমর্থকদের হামলা' বলে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয়। পরে পিবিআই-এর তদন্তে বেরিয়ে এলো ভিন্ন বাস্তবতা! শাল্লার ঘটনার মূল হোতা শহিদুল ইসলাম স্বাধীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি। তাকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ জানায়, শাল্লায় হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলার পেছনে 'জলমহাল' নামে একটি ইজারা করা দিঘীর দখল সংক্রান্ত বিরোধ ছিল মূল কারণ। সুতরাং কারা সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি দখল করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এছাড়া রামু, নাসিরনগর থেকে সর্বশেষ শাল্লার ঘটনার একটি লক্ষণীয় মিল হলো, হামলার ঠিক আগে অমুসলিম কোনো যুবকের তথাকথিত ফেসবুক পোস্ট ঘিরে বিতর্ক ও উত্তেজনা তৈরি করে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলার পথ সুগম করা হয়। অথচ পরে সেসব বিতর্কিত ফেসবুক পোস্ট কিংবা পোস্টদাতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না! শাল্লায় হামলার আগের দিন ধৃত হিন্দু যুবক ঝুমন দাশের ছবি কিংবা তার সেই বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টের কোনো স্ক্রিনশট আজ পর্যন্ত মূলধারার গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। প্রতিটি হামলার ঘটনায় এ ধরনের ফেসবুক পোস্ট ও সংশ্লিষ্ট আইডির মালিক রহস্যই থেকে গেছে। ধর্মীয় ভাবাবেগের কারণেই হোক বা পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই হোক, এ দেশে কোনো সাধারণ

অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে ইসলাম অবমাননা করে প্রকাশ্যে ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার কথা নয়। তথাপি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুবই উদ্বেগের বিষয়।

১৩. অলিউল হক, শাল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

অলিউল হক বলেন, ২০২১ সালের ১৫ মার্চ দিরাই উপজেলায় হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশ হয়। এতে হেফাজতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ও মাওলানা মামুনুল হক বক্তব্য দেন। পরদিন ১৬ মার্চ নোয়াগাঁও গ্রামের যুবক ঝুমন দাশ ওরফে আপনের বিরুদ্ধে মামুনুল হককে কটূক্তি করে ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই দিন সন্ধ্যায় পাশের কাশিপুর গ্রামে এ নিয়ে বিক্ষোভ হয়। পরে বিষয়টি পার্শ্ববর্তী দিরাই উপজেলার নাচনী, সন্তোষপুর ও চন্ডীপুর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই পাঁচ গ্রামের লোকজন ঝুমনকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করে।

বিক্ষোভের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে শাল্লা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল আমিন চৌধুরীকে জানিয়েছিলাম। এরপর উপজেলা চেয়ারম্যান রাতেই ওই গ্রামগুলোতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ওই রাতে নোয়াগাঁও গ্রামবাসী ঝুমন দাসকে পুলিশে সোপর্দ করলেও পরবর্তীকালে হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। আশা করি, এ ঘটনায় দোষীদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনাবলী এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাচিত বিবৃতি, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লেখা চিঠি এবং সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

১

২৮ জানুয়ারি ২০১৬, সচিবালয়ে মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এডভোকেট আনিসুল হক এমপিকে প্রদত্ত

‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’র স্মারকলিপি

এডভোকেট আনিসুল হক এমপি
মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার বিঘ্নিত ও বানচাল করবার উদ্দেশ্যে জামায়াত-বিএনপি চক্রের যাবতীয় সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে এটি অব্যাহত রাখার জন্য আপনাকে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনি এ বিষয়ে হয়তো অবগত আছেন যে, বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা এবং ‘স্বাধীনতার ষোষণাপত্র’ চ্যালেঞ্জ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন। এর তীব্র নিন্দা করে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃত ইতিহাস অস্বীকারকারী বা বিকৃতকারীদের বিচারও শাস্তির জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছি। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণের জন্যেও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন অথবা ১৯৭৩-এর ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন’ সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছি।

২০১৫ সালে আমরা বিভিন্ন সভায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিকটিমদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা, বৈষম্য ও অমর্যাদা অবসানের জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের কথা বলেছি, যার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। আপনার নিকট আমাদের আহ্বান—

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার যে দেশপ্রেম থেকে সংবিধানে রাষ্ট্রের ৪ মূলনীতি পুনঃস্থাপন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ করেছে এর ধারাবাহিকতায় অবিলম্বে ‘মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইন’ প্রণয়ন করতে হবে।

২. ’৭১-এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে অবিলম্বে দল ও বাহিনী হিসেবে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, মুজাহিদ বাহিনী প্রভৃতি সহ যেসব পাকিস্তানি সামরিক অসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এসব অপরাধের প্রমাণ রয়েছে তাদের বিচার ও শাস্তির জন্য ১৯৭৩-এর ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন’ দ্রুত সংশোধন করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের স্থগিত দ্বিতীয় ট্রাইবুনালের কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ করে সেখানে জামায়াতের পাশাপাশি পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা যেতে পারে। আমরা সব সময় বলেছি ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে ১৯৭৪-এর ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে কোন ভিত্তি বা বৈধতা নেই।

৪. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে দণ্ডিত গণহত্যাকারী ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ব্যক্তি ও সংগঠনের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, নির্যাতিত নারী এবং অন্যান্য ভুক্তভোগীদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী যেভাবে হলোকস্ট ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সেভাবে বাংলাদেশের গণহত্যার ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পাকিস্তানের উপর সর্বাত্মক আইনি ও কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৬. বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বিদেশে অবস্থানরত ’৭১-এর যে সব যুদ্ধশিশু বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে আগ্রহী তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

৭. বঙ্গবন্ধুর সরকার মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারের সদস্যদের বাসস্থান ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ’৭১-এর গণহত্যাকারী এবং তাদের সহযোগীরা ক্ষমতায় এসে বহু শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। যারা শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের লাঞ্ছিত করেছে তাদের বিচার ও শাস্তির আওতায় এনে গণহত্যার ভিকটিমদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. আত্মপ্রকাশের পর থেকে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার জন্য যেভাবে ’৭১-এর কায়দায় মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী ও আলেম-ওলামা এবং সর্বোপরি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হত্যা-নিপীড়ন করেছে, তাদের সম্পদ ধ্বংস করেছে— জঙ্গীবাদ ও জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জব্দকৃত সম্পদের দ্বারা তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে।

৯. ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল এবং ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত জামায়াত-বিএনপির জোটের মানবতাবিরোধী সকল অপরাধ বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার করতে হবে এবং এ সময়ে যাদের জীবন-সম্পদহানী হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দণ্ডিতদের বাধ্যকরণের জন্য



২৮ জানুয়ারি ২০১৬, সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এডভোকেট আনিসুল হক এমপির সঙ্গে নির্মূল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (চ্যানেল আই অনলাইন বাংলাদেশ-এর পোস্টের ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি)। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃত ইতিহাস অস্বীকারকারী বা বিকৃতকারীদের বিচার ও শাস্তির জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন, মুক্তিযুদ্ধের ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন অথবা ১৯৭৩-এর 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন' সংশোধন এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠনে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সহসভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া

আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিশ্বের বহু দেশে এ ধরনের আইনের উদাহরণ রয়েছে। ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে দায়ী ব্যক্তি, সংগঠন ও দলকে প্রদান করতে হবে। সব সময় রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিলে এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

১০. '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধী, গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাক্ষীদের অনিরাপত্তা। জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীদের হুমকির কারণে বহু ভুক্তভোগী সাক্ষী ট্রাইবুনালে এসে সাক্ষ্যপ্রদানে ভয় পাচ্ছেন। জামায়াতিরা একাধিক সাক্ষীকে হত্যা ও দেশান্তরিতও করেছে। আমরা অবিলম্বে 'সাক্ষী সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

১১. প্রচলিত আইনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার নির্যাতিত নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ধর্ষকরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য কঠোর আইন প্রয়োজন। এ বিষয়ে 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের জন্য আপনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ মহাজোট সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

১২. বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সহ সকল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দলের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে মৌলবাদী জঙ্গী সন্ত্রাস উত্থান এবং বাংলাদেশে

অমুসলিমদের উপর যাবতীয় বঞ্চনা, বৈষম্য ও পীড়নের পথ সুগম করেছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও পীড়নের অবসান ঘটিয়ে ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তা-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের জন্য 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো পৃথক 'সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি। যার জন্য নতুন কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না।

আমরা মনে করি প্রস্তাবিত আইনসমূহের প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক পুরনো আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন বাংলাদেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের পাশাপাশি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

ধন্যবাদান্তে
'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র উপদেষ্টা পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে

(বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম)
উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি

(বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক)
উপদেষ্টা

(শাহরিয়ার কবির)
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

(মুনতাসীর মামুন)
সহ সভাপতি

(শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী)
সহ সভাপতি

(কাজী মুকুল)
সাধারণ সম্পাদক

(ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ)
আইন সম্পাদক

(ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া)
কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য

২
একুশের বইমেলায় বদ্বীপ প্রকাশনার ষ্টল বন্ধ এবং লেখক প্রকাশককে গ্রেফতারের ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে নির্মূল কমিটির বিবৃতি

একুশের বইমেলায় 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা'র অভিযোগে পুলিশ যেভাবে 'ব-দ্বীপ প্রকাশন'-এর কয়েকটি প্রকাশনা জব্দ এবং স্টল বন্ধ করে লেখক ও প্রকাশকদের গ্রেফতার করেছে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংগঠনের এক বিবৃতিতে বলা হয়—

কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা'র অভিযোগে বইমেলায় 'ব-দ্বীপ প্রকাশন'-এর কয়েকটি প্রকাশনা জব্দ করা, স্টল বন্ধ করে দেয়া এবং জব্দকৃত বইয়ের লেখক প্রকাশকদের গ্রেফতারের সংবাদ পাঠ করে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে আমরা জেনেছি পুলিশ ফেসবুক-এর অভিযোগের ভিত্তিতে একুশের বইমেলায় এই অভিযান চালিয়েছে, যা দেশের প্রচলিত আইন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের লংঘন।

'কোনও গ্রন্থে যদি 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা'র মতো কোনও বিষয় থাকে পুলিশ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে যেতে পারেন। 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' হয়েছে কি হয়নি– বিষয়টি আদালতের বিচার্য বিষয়। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির কিংবা তাদের সমচরিত্রের মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের এহেন দাবি বা ফতোয়া যদি পুলিশ বাস্তবায়ন করতে যায়– বাংলাদেশ মোল্লা উমরের আফগানিস্তান বা জিয়াউল হকের পাকিস্তানের মতো মৌলবাদী দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে, যে লক্ষ্যে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী জামায়াতীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে।

'বাংলা একাডেমির বইমেলায় জামায়াত-হেফাজতের অনুসারী মৌলবাদী কলাম সন্ত্রাসীদের লেখা অবাধে বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে ও গণপরিবহনে আদালতে দণ্ডিত গণহত্যাকারী দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ও তার অনুসারীদের সিডি বাজানো হচ্ছে। বাজারে মাদ্রাসার বইয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের চার মূলনীতির বিরুদ্ধে কুৎসামূলক লেখা লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে– পুলিশ কোথাও এসবের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এমন সংবাদ আমরা গণমাধ্যমে দেখিনি। বাংলা একাডেমির বইমেলায় এক যুগ আগে প্রথাবিরোধী খ্যাতিমান লেখক হুমায়ূন আজাদের উপর যে মৌলবাদী ঘাতকরা নৃশংস হামলা করেছিল সেই অপরাধীরা আজও অধরা রয়ে গেছে। বরং মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হুমকি ও হামলার কারণে হুমায়ূন আজাদের পুত্র তরুণ ব্লগার অনন্য আজাদকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। গত বছর মৌলবাদী ঘাতকরা ফতোয়া দিয়ে মুক্তচিন্তার লেখক ডঃ অভিজিৎ রায় সহ ৫ জন প্রগতিবাদী লেখক ও প্রকাশককে হত্যা করেছে, যার হদিস এখনও করতে পারেনি পুলিশ। মুক্তচিন্তার লেখক-প্রকাশকদের হত্যাকারী ও হুমকিদাতাদের বিচার ও শাস্তিহীনতা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

'বাংলা একাডেমির বইমেলার নিয়ম অনুযায়ী 'ব-দ্বীপ প্রকাশন' যদি বন্ধ করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে জামায়াত-হেফাজতের অনুসারী মৌলবাদী কলমসন্ত্রাসীদের বই কিভাবে মেলায় বিক্রি হয় এর জবাব বইমেলার কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। ব-দ্বীপ প্রকাশন-এর কোনও প্রকাশনায় যদি আপত্তিকর ও ক্ষতিকর কোনও বিষয়বস্তু থাকে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে। মামলায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কোনও বই বাজেয়াপ্ত বা লেখক-প্রকাশকের গ্রেফতার নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, যা মুক্তচিন্তার প্রতিপক্ষ ওহাবিবাদী, মওদুদিবাদী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করবে।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, লেখক হাসান আজিজুল হক, লেখক সৈয়দ শামসুল হক, লেখক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, অধ্যাপক অনুপম সেন, মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক অজয় রায়, ভাষাসৈনিক আবুল হোসেন, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, স্থপতি লেখক রবিউল হুসেইন, লেখক আনোয়ারা সৈয়দ হক, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, লেখক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, সমাজকর্মী নূরজাহান বোস, এডভোকেট জেয়াদ আল মালুম, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, সমাজকর্মী আরমা দত্ত, এডভোকেট বায়েজিদ আক্কাস, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, শহীদজায়া সালমা হক, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক আবুল বারাক আলভী, অধ্যাপিকা জারিনা রহমান খান, ডঃ ফরিদা মজিদ, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর

রহমান, সমাজকর্মী খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, সমাজকর্মী গোলাম মোহাম্মদ ইদু, সাংবাদিক জুলফিকার আলি মাণিক, মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) ফজলুল হক, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, লেখক সাব্বির রহমান খান, এডভোকেট হাবিবউল্লা চৌধুরী, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, এডভোকেট শাফায়েত আহমেদ খান, সমাজকর্মী চন্দন শীল, লেখক আলী আকবর টাবী, সমাজকর্মী আনসার আহমদউল্লা, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আবদুস সালাম, কবি জয়দুল হোসেন, ডাঃ মফিজুল ইসলাম মান্টু, এডভোকেট দীপক ঘোষ, সাংবাদিক মশিউর রহমান খোকন, অধ্যক্ষ খন্দকার হাফিজ ফারুক, প্রভাষক কামরুজ্জামান, সাংবাদিক শওকত বাঙালি ও ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩
নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে নির্মূল কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনকে চিঠি প্রদান

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বিষয় ঃ নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয়

সবিনয় নিবেদন,

আপনি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, চলমান ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচকমণ্ডলির উপর সন্ত্রাসীদের হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত চার দফা নির্বাচনে অন্ততপক্ষে ৮০ জন ব্যক্তি নিহত এবং ৫০০০-এর অধিক আহত হয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষভাবে তারা আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। গত ১৪ মে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এক আলোচনা সভায় বলেছেন, যশোরের চৌগাছা থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার শতাধিক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র নেতৃবৃন্দ গত ২০ মে যশোর ও চৌগাছায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার শতাধিক ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য শুনেছেন। সংগঠনের যশোর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই গণশুনানিতে অংশ নিয়েছেন নির্মূল কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তিযোদ্ধা কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ এবং যশোরের নেতৃবৃন্দ।

দিনভর শুনানির পর নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ যশোরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

যশোর ও চৌগাছার গণশুনানিতে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের নিকট আমাদের অনুরোধ-

১) আগামীতে অনুষ্ঠেয় স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচকমণ্ডলি এবং পুলিস প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।



২০ মে ২০১৬, যশোরের চৌগাছা উপজেলার পাশাপোল ইউনিয়নে স্থানীয় শাহিন চেয়ারম্যান কর্তৃক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনায় যশোর শাখা নির্মূল কমিটি আয়োজিত ভুক্তভোগীদের গণশুনানিতে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য শুনছেন নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) জেলা সহকারী পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) ভাস্কর সাহা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নার্গিস পারভিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) কে এম আরিফুল হক, নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য লেখক সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, নির্মূল কমিটি যশোর শাখার সভাপতি হারুন-অর-রশিদ, চৌগাছা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মসিউর রহমান প্রমুখ

২) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসীদের মদদদাতা রাজনৈতিক কোনও দলের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ যদি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকেন তাদের বদলি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

৩) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নির্বাচকমন্ডলির নিরাপত্তা এবং এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজিবি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

৪) থানা সদর থেকে এক ঘন্টা দূরত্বের নির্বাচনী কেন্দ্রে অস্থায়ী পুলিস ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।

৫) উচ্চতর আদালত ও নির্বাচন কমিশন তাবৎ সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জামায়াতের নেতাকর্মীরা বিএনপি ও আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে এবং কোথাও কোথাও তাদের বাড়িঘরে হামলা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করছে। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের সময় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসী জামায়াতে ইসলামীর সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬) জামায়াতিরা যাতে অন্য কোনও নামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের সময় ওয়াজ মাহফিল বা ইসলামী জলসার নামে কিংবা মসজিদে নামাজের খোৎবার সময় অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতা উদ্রেককারী কোনও বক্তব্য প্রদান করতে না পারে সে বিষয়ে প্রশাসনকে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দিতে হবে।

৭) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত এলাকায় থানা ও পুলিশ ততক্ষণ পর্যন্ত হামলাকারীদের গ্রেফতার করে না যতক্ষণ তারা আক্রান্তদের লিখিত অভিযোগ না পায়। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ পেলেও তারা হামলাকারীদের গ্রেফতারে গড়িমসি করে। ভিকটিমরা যদি অভিযোগ করতে ভয় পায় পুলিসকে বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার আদালতে তাদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

উপরোক্ত আশু করণীয় ছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচকমন্ডলি যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে নির্ভয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করবার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগে বহুমাত্রিক প্রচার অভিযান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে

(বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম)
উপদেষ্টা

(বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক)
উপদেষ্টা

(শাহরিয়ার কবির)
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

(কাজী মুকুল)
সাধারণ সম্পাদক

২৫ মে ২০১৬

৪
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্যাতন করা বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্মূল কমিটির ৪ সদস্যের সাক্ষাত

ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় যে সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে, বিশেষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে ভাবে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে এবিষয় নির্বাচন কমিশনের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২৬ মে ২০১৬ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছেন।



২৬ মে ২০১৬, ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে ভাবে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে– এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের করণীয় সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের প্রেস ব্রিফিং করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী

নির্মূল কমিটির প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে বৈঠকে নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে 'নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয়' সম্পর্কে ৭ দফা দাবিনামা প্রদান করা হয়।

বৈঠকের শেষে নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত দাবিনামা সংযুক্ত হল।

২৬ মে ২০১৬

৫

নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীজনিত নিরাপত্তা সংকট সম্পর্কে ১১ ডিসেম্বর (২০১৬)-এর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

৩০ অক্টোবর (২০১৬) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় দরিদ্র মৎস্যজীবী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা নৃশংস হামলা চালিয়ে কীভাবে তাদের ঘরবাড়ি, মন্দির, দোকানপাট ধ্বংস করেছে; লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেছে এ বিষয়ে গণমাধ্যমসমূহে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

২০১২ সালের রামু থেকে ২০১৬ সালে নাসিরনগর পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো জঙ্গি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানাবার জন্য জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করছে। এইসব হামলার ঘটনায় নিজেদের আড়াল করার জন্য তারা প্রশাসনে জামায়াত সমর্থক ব্যক্তিদের পাশাপাশি স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ব্যবহার করছে। রামুর ঘটনার পর নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সরকারি দলের কেউ যদি এসব হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের শুধু দল থেকে বহিষ্কার নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। হামলাকারীদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে রামুতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও অভিযোগপত্রের দুর্বলতার কারণে গ্রেফতারকৃত সবাই জেল থেকে জামিনে বেরিয়ে এসেছে। আক্রান্ত যারা মামলা করেছিল তারা ভয়ে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। নাসিরনগরে আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করছি। রামুর মতো নাসিরনগরেও ঘটনার নেপথ্য নায়কদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। অজ্ঞাতনামা যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা রামুর ঘটনার মতো দ্রুত জামিনে বেরিয়ে আসবে।

নাসিরনগরের আগুন নেভার আগেই হামলা হয়েছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাঁওতালদের উপর। ৬ নবেম্বর স্থানীয় ভূমিদস্যুরা প্রশাসনের সহায়তায় এক হাজারেরও বেশি সাঁওতাল পরিবারের বাড়িতে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করেছে। এই ঘটনাও গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। নির্মূল কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে একটি তদন্ত দল উপদ্রুত অঞ্চলে প্রেরণ করে। নির্মূল কমিটির প্রতিনিধিরা দুই দিন এলাকায় থেকে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের প্রতিবেদনে ঘটনার ভয়াবহতা ও সুদূরপ্রসারী অভিঘাত বিবেচনা করে গত ২১ নবেম্বর সংগঠনের উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও বিচারপতি শামসুল

হুদার নেতৃত্বে কেন্দ্র ও জেলার ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপদ্রুত এলাকায় ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। এই গণশুনানিতে দুই শতাধিক সাঁওতাল ছাড়াও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালিরাও উপস্থিত ছিলেন, যাদের প্রতিনিধিরা ঘটনার পূর্বাপর বিবরণ দিয়েছেন। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ৩০০ কম্বল এবং নগদ দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জে নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় তদন্ত দল ঘটনার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে যে সব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে– ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মাদ্রাসা কীভাবে শতাধিক বছর ধরে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। নাসিরনগরে হামলার আগের দিন হেফাজতিদের দুটি সমাবেশে কারা ছিলেন, তারা কীভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন পরদিন কোনও পত্রিকায় তার উল্লেখ ছিল না। আমাদের প্রতিবেদনে তা উঠে এসেছে, যা নির্মূল কমিটির ১৭০নং প্রকাশনা 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের মিলিত সংগ্রাম'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

গত ২৮ জানুয়ারি (২০১৬) সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির জন্য আমরা 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন সহ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং পৃথক সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের দাবিতে আইনমন্ত্রীকে যে স্মারকপত্র দিয়েছিলাম (অনুলিপি সংযুক্ত) এ বিষয়ে দৃশ্যমান কোনও অগ্রগতি হয়নি। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জামায়াতের উপস্থিতি ছাড়াও প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের শাস্তি এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। আমরা এ বিষয়ে আবারও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একইভাবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, দলের যারা বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও মৌলবাদী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি দলীয় কমিশন গঠনের জন্য।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বর্তমানে বার্মায় যে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সে দেশের সামরিক বাহিনীর যে ভয়াবহ নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তাকে আমরা গণহত্যা ও এথনিক ক্লিনজিং বলে মনে করি এবং এর তীব্র নিন্দা করি। একইসঙ্গে আমরা আক্রান্ত অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশে মৌলবাদী গোষ্ঠী সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করছে এই বলে যে, কেন বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে না। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশ তিন লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী গত ১ নবেম্বর (২০১৬) থেকে বাংলাদেশে নতুনভাবে ২২ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে।

রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে গণমাধ্যম যতটা সোচ্চার এর অপর পিঠ সেভাবে আলোচনায় আসছে না। জামায়াতিরা অসহায় রোহিঙ্গাদের দারিদ্র্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করে সাহায্যের নামে তাদের জিহাদের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে। ২০০৬ সালে জামায়াত-বিএনপির জমানায় আমরা রোহিঙ্গাদের ১৭টি জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা তৈরি করেছিলাম, যেগুলো জামায়াতের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে।

গত ২৫ বছর ধরে পাকিস্তানের করাচীকে ঘাঁটি বানিয়ে 'হরকতুল জিহাদ আরাকান' বাংলাদেশ ও বার্মায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত আমার একটি লেখায় হুজি আরাকানের প্রধান আবদুল কুদ্দুস মুজাহিদের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও দিয়েছি। বাংলাদেশ ও বার্মায় জিহাদের জন্য কুদ্দুস তাদের মুখপত্র 'তাযকারায়ে আরাকান'-এ যেখানে টাকা পাঠাতে বলেছে– সেটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর মতিঝিল শাখা। 'আইএসআই'-এর মদদে



১১ ডিসেম্বর ২০১৬, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং রোহিঙ্গা সমস্যা জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্গত' শীর্ষক 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, কেন্দ্রীয় নেতা সমাজকর্মী আরমা দত্ত, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, লেখক আলী আকবর টাবি, সহ-সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গাফ্ফার, কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরীসহ সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ

কুদ্দুস এখনও পাকিস্তানে বসে বাংলাদেশ ও বার্মায় তাদের গোপন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ঢাকার গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কীভাবে আরএসও (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন) ৩০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ক্যাম্প থেকে নিয়ে গেছে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য।

বার্মার আরাকান ও বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজারের একটি অংশ নিয়ে স্বাধীন রোহিঙ্গা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পাকি-জামায়াতি পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু আগে থেকেই আমরা লিখছি। সম্প্রতি বার্মায় নতুনভাবে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে কেন্দ্র করে যেভাবে শরণার্থী আসছে জামায়াত এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সহযোগীরা এ নিয়ে রাস্তায় মাতম করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা উল্লসিত হচ্ছে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথ সুগম হওয়ার কারণে। তারা বার্মার সরকারকে বলছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে, অথচ বাংলাদেশে তারা নির্বিচারে সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের উচিৎ হবে বার্মার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিকভাবে এবং ভারত-চীন ও থাইল্যান্ডের মতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে এ বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা। রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশে আসছে না, তারা ভারত, থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যাচ্ছে। সরকারের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একটি দল শরণার্থীজনিত সমস্যা এবং এতদসংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচনার জন্য জাতিসংঘ, ভারত, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ওআইসির গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে প্রেরণের জন্য। অসহায় রোহিঙ্গাদের এভাবে পাকি-জামায়াতিদের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য ছেড়ে দিলে তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য সমূহ হুমকির কারণ হবে, যার অভিঘাত পশ্চিম গোলার্ধও এড়াতে পারবে না। ওআইসি সহ বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বোঝা ভাগ করে নেয়ার জন্য এবং বার্মায় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। জঙ্গি রোহিঙ্গারা বার্মার সামরিক ঘাঁটিতে হামলা করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেবে, তার মাশুল দিতে হবে সে দেশের নিরীহ রোহিঙ্গাদের এবং বাংলাদেশকে– এ পরিস্থিতি কখনও কাম্য হতে পারে না। রোহিঙ্গা সমস্যা নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক বিশ্বের একটি বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়, যা বাংলাদেশের পক্ষে একা মোকাবেলা যে সম্ভব নয় এটা জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোঝাতে হবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

(শাহরিয়ার কবির)
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

৬

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে মৌলবাদী অপশক্তির হুমকির তীব্র নিন্দা জানিয়ে নির্মূল কমিটির বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে '৭১-এর ঘাতক, দালাল, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হুমকির তীব্র নিন্দা করেছে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সংগঠনের উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়–

'আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি '৭১-এর ঘাতক দালাল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির প্রতিভূ হেফাজতে ইসলাম এবং তাদের সহযোগীরা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত ন্যায়বিচারের ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে একের পর এক যেভাবে হুমকি দিচ্ছে- সরকার কিংবা উচ্চতর আদালত তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

'২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল এবং সরকার উৎখাতের জন্য জামায়াত-বিএনপির সহযোগিতায় হেফাজতিরা মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্রদের রাজধানীতে এনে যে মহাতাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল তা ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্কতার কারণে এরপর বড় কোনও ধরনের সহিংসতার ঘটনা না ঘটালেও হেফাজত বার বার বলছে তাদের ১৩ দফা দাবি থেকে তারা সরে আসেনি। প্রশাসনের অন্দরমহলে অবস্থানকারী হেফাজত-জামায়াতের অনুসারীরা একের পর এক বাংলাদেশের সংবিধান এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার উপর বার বার আঘাত করছে, যার সর্বশেষ অভিব্যক্তি হচ্ছে হেফাজতের দাবিপূরণ করতে গিয়ে স্কুলের পাঠ্যসূচির সাম্প্রদায়িকীকরণ।

'সুপ্রিম কোর্টে স্থাপিত ভাস্কর্যকে হেফাজতীরা মূর্তি বা প্রতিমা বলছে- যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভাস্কর্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু দেশের উচ্চতর আদালতে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। যে ইরানে ইসলামী হুকুমত ও শরিয়া আদালত বিদ্যমান রয়েছে সেখানেও উচ্চতর আদালতের দেয়ালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ন্যায়বিচারের প্রতীক 'জাস্টিসিয়া' ভাস্কর্য খোদাই করা রয়েছে। সৌদি আরব, মিশর, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া সহ বহু মুসলমানপ্রধান দেশে ভাস্কর্য রয়েছে নগরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য। হেফাজতিরা সুপ্রিম কোর্টের ভাস্কর্য অপসারণের নামে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও

বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সেখানে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ দেশের সর্বোচ্চ এই আদালত '৭১-এর শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে যার কয়েকটি ইতিমধ্যে কার্যকরও হয়েছে।

'হেফাজতপ্রধান আহমদ শফী সহ এই সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নেজামে ইসলামী ও ঘাতক 'মুজাহিদ বাহিনী'র সদস্য ছিলেন। আমরা যখন এসব ঘাতক সংগঠনের বিচার দাবি করছি তখন তারা সর্বোচ্চ আদালতে হামলার হুমকি দিচ্ছে যা আমরা বরদাশত করতে পারি না।

'আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি– বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত ও বিচারব্যবস্থার প্রতি হুমকি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে আমরা আরও অনুরোধ জানাব– যুদ্ধাপরাধীদের আপিল দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। একই সঙ্গে জঙ্গি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির যাবতীয় হুমকি ও হামলা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল শক্তির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, অধ্যাপক অজয় রায়, কর্ণেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, এডভোকেট সুলতানা কামাল, ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), ডাঃ আমজাদ হোসেন, সমাজকর্মী নূরজাহান বোস, কবি রুবী রহমান, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সাংবাদিক চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, সমাজকর্মী খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, ড. ফরিদা মজিদ, সমাজকর্মী আরমা দত্ত, এডভোকেট জিয়াদ আল মালুম, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, সমাজকর্মী আক্কাস হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, সাংবাদিক ফজলুর রহমান, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সমাজকর্মী সরদার জাকির হোসেন খসরু, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, অধ্যাপক উত্তম কুমার বড়ুয়া, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট দীপক ঘোষ, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, ডাঃ মোহাম্মদ মুরাদ হাসান, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদউল্লা, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সমাজকর্মী মোঃ আমিনুর জামান রিংকু, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল প্রমুখ।

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মন্থরতা, মাননীয় প্রধান বিচারপতির বক্তব্য এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উল্লম্ফন সম্পর্কে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলন

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কয়েকটি বিষয়ে আমাদের অবস্থান জানাবার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের ইতিহাসের কিছু স্বীকৃত সত্য আমরা উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭১-এ এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে সরকারি হিসেবে ৩০ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে, ২ লক্ষ নারীকে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, সর্বস্ব হারানো ১ কোটি মানুষকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশী ভারতে শরণার্থীর বিড়ম্বিত জীবন যাপন করতে হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রায় তিন কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিছক একটি পতাকা বদল বা ভূখণ্ডপ্রাপ্তির জন্য ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের ২৪ বছরের উপনিবেশসুলভ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা মূর্ত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে। যাঁরা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই এই সংবিধান রচনা করেছেন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নজিরবিহীন গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের প্রধান সহযোগী ছিল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও পিডিপি নামক উগ্র মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলসমূহ; যারা 'শান্তি কমিটি', 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আলশামস', ও 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠন করে '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের পরিধি ও মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল।

'৭১-এর গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার বন্ধ করে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের কারাগার থেকে মুক্তিপ্রদান করেন। এর পাশাপাশি তিনি সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'

বাতিল করে সংবিধানে নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে দলগঠনের সুযোগ করে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছেন; তার মাশুল এখনও আমাদের দিতে হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধে যারা স্বজন হারিয়েছেন– ৩০ লক্ষ শহীদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি জাতি কখনও '৭১-এর গণহত্যাকারীদের বিচার থেকে অব্যাহতি এবং সমাজ ও রাজনীতির এই মৌলবাদীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ মেনে নেয়নি। এই প্রতিবাদের সাংগঠনিক রূপ মূর্ত হয়েছে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ, টোকিও ও ম্যানিলায় যেভাবে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে নির্মূল কমিটি গঠনের পর থেকেই আমরা ১৯৭৩-এ প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালস আইনের' অধীনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন করেছি। নির্মূল কমিটি যাঁরা গঠন করেছিলেন, যাঁদের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির এই অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন ২৫ বছর চলমান রয়েছে– তাঁদের ভেতর রয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ এবং ছাত্র-যুব-নারী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। নির্মূল কমিটির আন্দোলনের দুটি প্রধান দাবি হচ্ছে '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, যে চেতনা মূর্ত হয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে লেখা বাংলাদেশের আদি সংবিধানে। আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা, আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করা। নির্মূল কমিটির এই আন্দোলনের কারণেই ২০০৮ সালের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী দলগুলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার করেছিল এবং ক্ষমতায় এসে প্রায় চার দশক পর এই বিচার আরম্ভ করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০১০ সালের ২৫ মার্চ যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'-সহ সমমনা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসল– এ বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

১৫ মে (২০১৭) '৭১-এর কুখ্যাত গণহত্যাকারী ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রিভিউ শুনানিকালে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ট্রাইবুনালের প্রসিকিউশন এবং নির্মূল কমিটি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের কিছু প্রসিকিউটর নাকি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভায় গিয়ে মিসকন্ডাক্ট বা অসদাচরণ করেছেন। তাঁর মতে নির্মূল কমিটি পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে, নির্মূল কমিটির মতো রাজনৈতিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে আইসিটির প্রসিকিউটরদের যাওয়া উচিত নয়।

২৫ বছর আগে নির্মূল কমিটি গঠনের সময় থেকে আমরা বলছি এটি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়, কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নির্মূল কমিটি কাজ করে না। নির্মূল কমিটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ একটি আদর্শবাদী সামাজিক সংগঠন। আমাদের প্রশ্ন– মাননীয় প্রধান বিচারপতি কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাজনৈতিক দলের বিষয় মনে করেন, যেমনটি মনে করে '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা? আইসিটির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জামায়াতের নেতারা বলেছেন '৭১-এ তারা রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। পাকিস্তান এবং জামায়াতের বিবেচনায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তান ভাঙার ভারতীয় ষড়যন্ত্র– যা আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ভারত বাস্তবায়ন করেছে। জামায়াত মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী', 'ইসলামের দুষমন' ও 'ভারতের এজেন্ট' মনে করে। যারাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে তারা জামায়াতের মতে ভারতের দালাল। আমাদের প্রধান বিচারপতি কোন বিবেচনায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জামায়াতের মতো নেতিবাচক অর্থে রাজনৈতিক বিষয় মনে করেন– আমরা এর ব্যাখ্যা দাবি করছি।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির বিবেচনা অনুযায়ী– নির্মূল কমিটির অনুষ্ঠানে যাওয়া যদি প্রসিকিউশনের জন্য অপরাধ হয় তাহলে এই অপরাধের তালিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, এ্যাটর্নি জেনারেল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের

সচিব, রাষ্ট্রদূত– কেউ বাদ যাবেন না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগদাতা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কয়েক মাস আগেও নির্মূল কমিটির ৭ম জাতীয় সম্মেলন ও রজতজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে আমাদের আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেছেন। নির্মূল কমিটি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কখনও এর কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না।

বাংলাদেশে চলমান '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং এর সাফল্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। দেশের ও বিদেশের বহু চাপ, হুমকি, হামলা অগ্রাহ্য করে গত ৭ বছরে ট্রাইবুনাল ২৮টি মামলায় ৫৩ জনকে শাস্তি দিয়েছে। অথচ মীর কাশিমের আপিল নিষ্পত্তির পর থেকে সুপ্রিম কোর্টে বাকি সব আপিলের শুনানি অজ্ঞাত কারণে বন্ধ রয়েছে। দল হিসেবে জামায়াতের এবং পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি সরকারের পক্ষ থেকে বার বার দেয়া হলেও এখনও এসব সংগঠনের বিচার আরম্ভ হয়নি, যা নিঃসন্দেহে ৩০ লক্ষ শহীদ পরিবার সহ বিচার প্রত্যাশী গোটা জাতির জন্য হতাশাজনক।

অপরদিকে বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও এমন সব মন্তব্য করছেন যা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। ট্রাইবুনালে শাস্তিপ্রাপ্ত আলবদর নেতা কামরুজ্জামানের মামলার আপিল শুনানিকালে (১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪) '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী সংগঠন 'শান্তি কমিটি' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা দাবি করেছেন– '৭১-এ তিনি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। যুদ্ধাপরাধী মীর কাশিমের মামলার শুনানিকালে তিনি মন্তব্য করেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর দুটি ট্রাইবুনালের একটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই ট্রাইবুনাল সরিয়ে নেয়ার জন্য একাধিকবার তিনি নোটিস দিয়েছেন। তিনি কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলা চলাকালে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন, যা একজন বিচারকের আচরণবিধির গুরুতর লংঘন। বিভিন্ন সময়ে বর্তমান প্রধান বিচারপতির কিছু বক্তব্য ও আচরণ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিকে যেমন হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে– মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও গণহত্যাকারীদের উল্লসিত করেছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত ন্যায়বিচারের প্রতীক 'লেডি জাস্টিসিয়া'র ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম যখন সুপ্রিম কোর্টকে হুমকি দিয়েছিল তখনই আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসন ও সর্বোচ্চ আদালতকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। (বিবৃতি সংযুক্ত ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) সরকার ও সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে নিরব থেকেছেন, যার ফলে হেফাজত এবং তাদের সহযোগী স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির স্পর্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১১ এপ্রিল (২০১৭) কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর হেফাজতে ইসলামের ধৃষ্টতা আরও বেড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে হেফাজত উল্লসিত হয়েছে। এরপর আমরা রাতের অন্ধকারে ভাস্কর্য অপসারণ ও পুনঃস্থাপন নাটক দেখেছি।

সুপ্রিম কোর্টে স্থাপিত মৃণাল হকের ভাস্কর্যের নান্দনিক ত্রুটি এবং স্থান নির্বাচন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এদেশের শিল্পী সমাজ সমর্থন করেছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে নগরের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যত্রতত্র যেভাবে ভাস্কর্য স্থাপন করা হচ্ছে, যার অনেকগুলো শিল্পমানসম্পন্ন নয়– তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি এ বিষয়ে দেশের প্রথিতযশা শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন আবশ্যক। তবে এ কথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই– ভাস্কর্য বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বসভ্যতার অন্তর্গত। ইসলামের দোহাই দিয়ে আল কায়দা ও আইএস যেভাবে আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় প্রাচীন ভাস্কর্য ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছে তা বিশ্বব্যাপী শান্তির ধর্ম ইসলামকে



১১ ডিসেম্বর ২০১৬, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং রোহিঙ্গা সমস্যা জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্গত' শীর্ষক 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, কেন্দ্রীয় নেতা সমাজকর্মী আরমা দত্ত, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, লেখক আলী আকবর টাবি, সহ-সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গাফ্ফার, কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরীসহ সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ

কলঙ্কিত করেছে। বাংলাদেশে আল কায়দা ও আইএস-এর অনুসারী হেফাজতিরা ভাস্কর্য ধ্বংসের কথা বলে আমাদের দেশের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করছে, বাংলাদেশে আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ার মতো পশ্চিমা সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

সুপ্রিম কোর্টে ভাস্কর্য অপসারণ-প্রতিস্থাপনের ডামাডোলের সময় আবারও গ্রেফতার করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে। এক বছর আগে তাঁকে হেফাজতে ইসলামের দাবির কারণে তথাকথিত 'ধর্ম অবমাননা'র অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হেফাজতকে তুষ্ট করার জন্য নারায়ণগঞ্জের সাংসদ সেলিম ওসমান এই প্রবীণ শিক্ষককে প্রকাশ্যে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছিলেন তার নিন্দা শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও হয়েছে। শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকার বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করেছিল। তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা মেলেনি। যে সাংসদ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এই শিক্ষককে চরম লাঞ্ছনা করেছেন তার বিচার ও শাস্তি হয়নি। যার কারণে কথিত ঘুষের অভিযোগে শ্যামল কান্তিকে আবারও কারাগারে যেতে হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ এবং পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি।

হেফাজতের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৫ মে বিএনপি-জামায়াতের সমর্থনে হেফাজতে ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়ে তাঁর সরকারকে উৎখাতের জন্য রাজধানীতে যে মহাতাণ্ডব, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছে আমরা তা ভুলে যাই নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তখন বলেছিলেন জামায়াত-হেফাজতকে আর ছাড় দেয়া হবে না। তখন হেফাজত নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসের জন্য শতাধিক মামলা হয়েছে। অথচ এরপর হেফাজতের মতো উগ্র মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতি সরকার হঠাৎ কেন নমনীয় হয়েছে এর ব্যাখ্যা সরকারকে দিতে হবে। আমরা

সরকারের নিকট বহুবার দাবি জানিয়েছি জামায়াত-হেফাজতের মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে, বাংলাদেশ মোল্লা উমরের আফগানিস্তান বা জেনারেল জিয়াউল হকের পাকিস্তানে রূপান্তরিত হবে। যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার বন্ধ করা এবং '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে জামায়াত-হেফাজত সহ পাকিস্তানপন্থী তাবৎ সংগঠন। জামায়াত-হেফাজতকে যত ছাড় দেয়া হোক না কেন ভোটের রাজনীতির সমীকরণে পাকিস্তানপ্রেমীরা কখনও আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে না, এ বিষয়টি দলের নীতিনির্ধারকদের অনুধাবন করতে হবে। ২০১৩ সালে ৩৯ জন নিরীহ মানুষ হত্যা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৬ জন সদস্য হত্যা, সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ও বৃক্ষনিধন সহ যাবতীয় সন্ত্রাসের জন্য হেফাজত নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত বিচার আদালতে স্থানান্তরের দাবি জানাচ্ছি।

আমরা বর্তমান প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে নই, বর্তমান মহাজোট সরকারেরও বিরুদ্ধে নই। বিচারপতি এস কে সিনহাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদানের জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ সরকারের যাবতীয় ইতিবাচক কাজ আমরা সব সময় সমর্থন করেছি। সুপ্রিম কোর্ট ও সংবিধানের মর্যাদার জন্য আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন নাগরিক সমাজ অবগত। সম্প্রতি 'রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকতে পারে না' বলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি যে বক্তব্য প্রদান করেছেন আমরা তারও প্রশংসা করেছি। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের দায়বদ্ধতার অভিব্যক্তি। তাঁর দায়িত্বপালনকালে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট যদি রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিল করে বাংলাদেশের সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা শুধু বিচার বিভাগ নয়– দেশ ও জাতির জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমরা আশা করব রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ– বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও সংসদ এবং চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে অর্জিত এই মহান দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(শাহরিয়ার কবির)
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

ঢাকা, ২ জুন ২০১৭

৮

১১ অক্টোবর (২০১৭) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠনের ঘোষণা

'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গত ২৫ বছর ধরে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য দেশে ও বিদেশে যে আন্দোলন করছে, যেভাবে গণহত্যার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করছে তার ফলশ্রুতি হচ্ছে বাংলাদেশে শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ ও ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার প্রায় ৪০ বছর পর অপরাধীদের বিচার আরম্ভ হওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ



১১ অক্টোবর ২০১৭, জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠনের ঘোষণা সংক্রান্ত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে উপবিষ্ট নাগরিক কমিশনের সদস্য এবং কমিশনের সচিবালয়ের সদস্যবৃন্দের একাংশ। প্রথম সারিতে বাম থেকে কমিশনের সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক মুহম্মদ শফিকুর রহমান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুল হুদা, কমিশনের সদস্য সচিব সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার (অবঃ), নিরাপত্তা বিশ্লেষক প্রাক্তন আইজিপি মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, 'বাংলাদেশের সম্মিলিত বৌদ্ধ সমাজ'-এর মূখ্য সমন্বয়কারী মানবাধিকারকর্মী অশোক বড়ুয়া ও 'বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী'র সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। পেছনে বাম থেকে কমিশনের সচিবালয়ের সদস্য ডাঃ মামুন আল মাহতাব, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, কমিশনের সদস্য নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুর রশীদ (অবঃ), শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সমাজকর্মী ফরিদা মজিদ, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম ও কমিশনের সচিবালয়ের সমন্বয়কারী কাজী মুকুল

সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার হয়েছে। গণহত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তি না হলে গণহত্যার ভিকটিমদের প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, একইভাবে বিভিন্ন দেশে গণহত্যাকারীদের উৎসাহিত করা হয় অধিকতর অপরাধ সংঘটনে।

নির্মূল কমিটি বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ১৯৯২ সালে গণআদালতে '৭১-এর অন্যতম প্রধান গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার আয়োজন করেছিল, যেখানে ৫ লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল। সাম্প্রতিক ইতিহাসে গণহত্যার বিরুদ্ধে এত বড় সমাবেশের দ্বিতীয় নজির নেই। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত গণআদালতে শীর্ষ গণহত্যাকারী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচারের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবার জন্য তখন শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক বাংলাদেশে এসেছিলেন।

'৭১-এর প্রধান গণহত্যাকারীদের অপরাধ তদন্তের জন্য ১৯৯৩ সালে আমরা বরেণ্য কবি ও মানবাধিকার নেত্রী সুফিয়া কামালকে প্রধান করে 'জাতীয় গণতদন্ত কমিশন' গঠন করেছিলাম। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর এই কমিশন দুই বছর কঠোর পরিশ্রম করে শীর্ষস্থানীয় ১৫ জন গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীর দুষ্কর্ম সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন

প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনই ছিল ২০১০ সালে গঠিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে'র তদন্তের প্রাথমিক ভিত্তি।

এরপর গত ২৫ বছরে আমরা দেশ ও জাতির বিশেষ সংকট মুহূর্তে, যখনই মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট অপশক্তি হত্যা, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে– তার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা নাগরিক কমিশন গঠন করেছি। মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে এ সব কমিশন সংঘটিত অপরাধের কারণ, অপরাধের ধরন, মাত্রা, বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছে এবং ভিকটিমদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অপরাধীদের শাস্তিপ্রদানের প্রস্তাব করেছে।

ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে '৭১-এর গণহত্যাকারীদের বিচার কার্যক্রমে সহযোগিতার পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের জন্য ২০১০ সালের ২০ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলনে আমরা একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করেছিলাম, যার ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। ২০১২ সালে এই কমিশনের পাকিস্তানি সদস্যরা 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পাকিস্তান শাখা' গঠন করেছেন। এই ধরনের কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সব আন্তর্জাতিক অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজে মানবিকতার বোধ নির্মাণ করা।

১৩৫টি জাতিভিত্তিক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা বা মায়ানমারে দীর্ঘকাল ধরে চলমান রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর বৈষম্য ও নির্যাতনের অভিঘাত বাংলাদেশের জন্য বহুমাত্রিক সংকট সৃষ্টি করছে। বার্মার সামরিক বাহিনীর ধারাবাহিক নির্যাতনের কারণে ১৯৭৮ সাল থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন লক্ষাধিক রোহিঙ্গা কক্সবাজার ও বান্দরবানের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে মানবেতর জীবনযাপন করছিল। ২০১৬-এর অক্টোবর এবং ২০১৭-এর আগস্টে বার্মার সামরিক অবস্থানের উপর রোহিঙ্গা জঙ্গীদের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের পর সে দেশের সেনাবাহিনী জঙ্গী দমনের নামে নিরীহ রোহিঙ্গাদের উপর যে নৃশংস হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তার কারণে অতিরিক্ত আরও প্রায় ছয় লাখ রোহিঙ্গা সর্বস্ব হারিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৭১-এর পর আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গৃহযুদ্ধ, গণহত্যা, সন্ত্রাস এবং অন্যান্য কারণে অসহায় মানুষের দেশত্যাগের অমানবিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি, কিন্তু গত দেড় মাসে আমাদের প্রতিবেশী বার্মায় যে মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে, রাষ্ট্র হিসেবে যার প্রধান ভুক্তভোগী বাংলাদেশ– এমনটি বিশ্বের কোথাও ঘটেনি। বার্মার পক্ষ থেকে এবং দেশের ভেতরে একটি রাজনৈতিক মহলের যুদ্ধের উস্কানি উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শান্তিপূর্ণভাবে এই ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবেলার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যার প্রতি যেভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেভাবে বিশ্ব জনমত রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তার ফলে জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে ভাষণ দিয়েছেন এর ভূয়সী প্রশংসা করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। আমরা মনে করি তাঁর ভাষণে উত্থাপিত ৫ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজেরও বহু করণীয় রয়েছে, কারণ কোনও সরকারের পক্ষে একা এ ধরনের মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

অতীতে বিভিন্ন সংকটকালে নির্মূল কমিটি যেভাবে নাগরিক কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে– রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলার জন্য আমরা 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' গঠন করেছি। ৪৯ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব হচ্ছেন

যথাক্রমে বিচারপতি শামসুল হুদা ও বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, এঁরা দুজনই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সঙ্ঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, মওলানা ফরিদউদ্দিন মসউদ, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক, অধ্যাপক অনুপম সেন, সাংবাদিক কামাল লোহানী, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, স্থপতি রবিউল হুসাইন, রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বান্দরবানের মারমা রাজা উ চ প্রু, স্বামী তপনানন্দগিরি মহারাজ, ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, অধ্যাপিকা আথিন রাখাইন (প্রাক্তন এমপি), মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাংবাদিক মুহম্মদ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ব্যাংকার ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার (প্রাক্তন আইজিপি), নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোঃ আবদুর রশীদ (অবসরপ্রাপ্ত), নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এ কে মোহম্মাদ আলী শিকদার (অবসরপ্রাপ্ত), মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আমজাদ হোসেন, ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, মানবাধিকার কর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস, কলামিস্ট মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, মানবাধিকার কর্মী পি আর বড়ুয়া (প্রাক্তন ডিআইজি), সমাজকর্মী রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া, সমাজকর্মী প্রমথ বড়ুয়া, ডঃ পি কে বড়ুয়া, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, মানবাধিকার কর্মী নির্মল রোজারিও, মানবাধিকারকর্মী অশোক বড়ুয়া, কবি ফরিদা মজিদ, অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া, মানবাধিকার কর্মী আরমা দত্ত, মওলানা জিয়াউল হাসান ও লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির।

এই কমিশনকে সহযোগিতার জন্য সাংবাদিক, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে একটি সচিবালয় আমরা গঠন করেছি, যার সমন্বয়কারীর দায়িত্বে রয়েছেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল। শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট এই সচিবালয়ের সদস্যদের ভেতর রয়েছেন– ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী, সমাজকর্মী আসিফ মুনীর তন্ময়, লেখক আলী আকবর টাবী, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, আদিবাসী নেতা সঞ্জিব দ্রং, ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, ডাঃ মুরাদ হাসান, সাংবাদিক মুন্নী সাহা, সাংবাদিক ফারজানা রূপা, সাংবাদিক পিনাকি রায়, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক সমরেশ বৈদ্য, সাংবাদিক মুহাম্মদ আলী জিন্নাত, সাংবাদিক সুমি খান, সাংবাদিক আতাউর রহমান, সাংবাদিক রুহুল আমিন, সাংবাদিক আমানুর রহমান রনি, সাংবাদিক হাবিব রহমান, সাংবাদিক ওয়াসিম বিন হাবিব, সাংবাদিক রাজিব নূর, সাংবাদিক ইমরান সুমন, সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিদ খান, সাংবাদিক মুস্তাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাংবাদিক আবু সালেহ রনি, সাংবাদিক ইফতেখারুল ইসলাম, তপন চক্রবর্তী, সাংবাদিক মোঃ নজিবুল ইসলাম, সাংবাদিক দীপক শর্মা দীপু, সাংবাদিক সুনীল বড়ুয়া, সাংবাদিক জাহেদ সরওয়ার সোহেল, সাংবাদিক কামাল পারভেজ, সাংবাদিক অর্পন বড়ুয়া, সাংবাদিক ইসমত আরা ইসু, সাংবাদিক আলমীগর সবুজ, সাংবাদিক মিন্টু চৌধুরী, সাংবাদিক চঞ্চল দাশগুপ্ত, প্রভাষক প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, সাংবাদিক শংকর বড়ুয়া রনি, সাংবাদিক হাসান নাসির, সাংবাদিক শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, এডভোকেট আয়াছুর রহমান, সাংবাদিক আজহার মাহমুদ, সমাজকর্মী মওলানা হাসান রফিক, সাংবাদিক সরওয়ার কামাল খন্দকার, সমাজকর্মী মওলানা দেলোয়ার হোসেন, সমাজকর্মী আবু বকর সিদ্দিক, সমাজকর্মী

মওলানা শহীদুল্লাহ, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ, সমাজকর্মী মোঃ সাইফ উদ্দিন রুবেল, সমাজকর্মী তপন দাস, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে প্রমুখ।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে রোহিঙ্গা গণহত্যা, নির্যাতন, এর প্রতিঘাত এবং গৃহহীন, জীবিকাহীন, দেশছাড়া অসহায় রোহিঙ্গাদের দুঃসহ যাতনার পাশাপাশি বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সব সংবাদ প্রকাশ করেছেন তা কমিশনের তদন্তের ক্ষেত্রে যেমন সহায়ক হবে একইভাবে এই মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ কারণে কমিশনের সচিবালয়ে সর্বাধিক সংখ্যক সাংবাদিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ঘোষিত কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে, নির্মূল কমিটি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। একই ধরনের সহযোগিতা আমরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, সমমনা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আশা করি। আমরা আশা করব কমিশন যত দ্রুত সম্ভব তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশনে'র সুপারিশ বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরা একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, আইনপ্রণেতা, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিশন গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বার্মার সরকার, বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (International Criminal Court) বিচারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আশা করি আগামী তিন মাসের ভেতর এই আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের ঘোষণা আমরা দিতে পারব।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বার্মার রোহিঙ্গা গণহত্যা ও গণবিতাড়ন সাম্প্রতিক বিশ্বের এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। এই সংকটের বহুমাত্রিকতা যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য আপনাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অতীতের মতো আমাদের এই উদ্যোগেও আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

(শাহরিয়ার কবির)
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

৯
২২ অক্টোবর (২০১৭) কক্সবাজারের প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশনে'র বক্তব্য

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত ১১ অক্টোবর 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' বার্মায় গণহত্যা এবং সন্ত্রাস তদন্তে একটি নাগরিক কমিশন গঠন করেছে। বর্তমানে এই কমিশনে মোট ৫১ জন সদস্য রয়েছেন। কমিশনের সচিবালয়ে রয়েছেন ১০১ জন সদস্য। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব শামসুল হুদা। সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের আর এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক কমিশনের সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করছেন।

এটি একান্তই একটি তদন্ত কমিশন, কোন চাপ প্রয়োগকারী বা লবিষ্ট সংস্থা নয়। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি,



২২ অক্টোবর ২০১৭, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাসের ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি গ্রহণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন' সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এসময় নাগরিক কমিশন-এর সদস্যবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সভাপতি বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক, কমিশনের সদস্য সচিব বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক প্রাক্তন আইজিপি মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুর রশীদ (অবঃ), নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল এ কে মোহম্মাদ আলী শিকদার (অবঃ), ব্রিটিশ সমাজকর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস, মানবাধিকার নেতা নির্মল রোজারিও, হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া

দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক, আইনজীবী, দু'জন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক, মুক্তিযোদ্ধা, সকল ধর্মের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও মারমা সম্প্রদায়ের দুই রাজা, রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ।

আপনারা জানেন, জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন (Advisory Commission on Rakhaine State) বার্মার অং সান সু চির সরকারের নিকট একটি ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদান করেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যে ৫ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন সেখানে আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

আনান কমিশনের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের নজরে এসেছে। ২৪ আগস্ট (২০১৭) আনান কমিশনের রিপোর্ট বার্মার সরকারপ্রধান অং সান সু চির নিকট হস্তান্তরের রাতেই বার্মার নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকটি স্থাপনার উপর জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে, যাকে অজুহাত করে বার্মার সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আনান কমিশনের প্রতিবেদনে স্বাভাবিকভাবেই চলমান গণহত্যার উল্লেখ নেই, তবে প্রচ্ছন্নভাবে সন্ত্রাসের উল্লেখ রয়েছে। আমাদের কমিশনের প্রতিবেদনে আনান কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের

লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বার্মার সরকার, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

গতকাল ২১ অক্টোবর এবং আজ সকালে আমরা রোহিঙ্গাদের কয়েকটি আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেছি এবং দুই শতাধিক ভুক্তভোগীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছি। ২১ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা ত্রাণ-পুনর্বাসন-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছি। আমরা যেভাবে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছি, সেভাবে আমাদের সচিবালয়ের তরুণ সদস্যরা আগামী এক মাসে অন্ততপক্ষে দশ হাজার জবানবন্দি সংগ্রহ করবেন। এই সব জবানবন্দি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বয়ান, বাংলাদেশ ও বার্মার বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্রের ভিত্তিতে আমাদের কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

মাঠপর্যায়ে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি সংগ্রহের জন্য আমরা একটি প্রশ্নমালা তৈরি করেছি, যেখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে–

১. বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও গণবিতাড়নসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এর জন্য কারা দায়ী,
২. আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন অনুযায়ী রোহিঙ্গারা কীভাবে বার্মার বৈধ নাগরিক,
৩. বার্মায় ধারাবাহিক রোহিঙ্গা নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়নের কারণ অনুসন্ধান,
৪. সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য 'আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি' এবং রোহিঙ্গাদের অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের কোনও দায়-দায়িত্ব আছে কিনা, থাকলে কতটুকু এবং এ বিষয়ে করণীয় এবং
৫. উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা।

আমাদের কমিশন আনান কমিশনের প্রতিবেদন এবং জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কী করা প্রয়োজন– এই সব বিষয়ও বিবেচনা করবে।

গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের নির্মম শিকার উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের জবানবন্দি সংগ্রহের ক্ষেত্রে কক্সবাজারের স্থানীয় সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সহযোগিতা আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। আগ্রহীদের অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক)
সদস্য সচিব, বার্মায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস তদন্তে নাগরিক কমিশন)

১০
রংপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার নিন্দা

ফেসবুকে তথাকথিত ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে রংপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১১ নবেম্বর ২০১৭ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়–

'আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি গত ৫ বছর ধরে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার

করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হামলা চালাচ্ছে, যার ধারাবাহিকতায় গত ১০ নবেম্বর রংপুরের পাগলাপীর ঠাকুরবাড়ি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত হামলা, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত টিটু রায় আদৌ ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার কিছু পোস্ট করেছে কিনা, এ অভিযোগের তদন্ত হওয়ার আগেই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দশ্যে হচ্ছে– বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকারকে বিব্রত করা এবং বাংলাদেশকে মোল্লা উমরের আফগানিস্তান আর জিয়াউল হকের পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসী ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা।

'২০১২ সালে কক্সবাজারের বৌদ্ধদের উপর এবং ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দুদের উপর হামলার জন্য যেভাবে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননাকর মিথ্যা অজুহাত তৈরি করা হয়েছিল একই পদ্ধতিতে রংপুরের পাগলাপীর ঠাকুরবাড়ি গ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে। রংপুরে হামলাকারীদের প্রতিরোধের সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত এবং কয়েজকন আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অতীতে এ ধরনের হামলার সময় আমরা দেখেছি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সামায়িকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এই সব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

'আমরা অবিলম্বে রংপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানাচ্ছি। এসব হামলাকারীদের বিচার ও শাস্তি না হলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত জনপদে আমরা এরকম আরও হামলার আশঙ্কা করছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক অজয় রায়, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, কর্ণেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক, ক্যাপ্টেন শাহাবউদ্দিন বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) শামসুল আলম বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), ডাঃ আমজাদ হোসেন, সমাজকর্মী নূরজাহান বোস, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সাংবাদিক চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, সমাজকর্মী খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, ড. ফরিদা মজিদ, সমাজকর্মী আরমা দত্ত, এডভোকেট জেয়াদ আল মালুম, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, সমাজকর্মী আক্কাস হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, সাংবাদিক ফজলুর রহমান, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সমাজকর্মী সরদার জাকির হোসেন

খসরু, শহীদসন্তান ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট দীপক ঘোষ, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, ডাঃ মোহাম্মদ মুরাদ হাসান, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদউল্লা, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সমাজকর্মী মোঃ আমিনুর জামান রিংকু, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল প্রমুখ

ঢাকা, ১১ নবেম্বর ২০১৭

১১
রংপুরের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং চলমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে ১৯ নবেম্বর (২০১৭)-এর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি গত ৫ বছর ধরে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হামলা চালাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ১০ নবেম্বর ২০১৭ রংপুরের ঠাকুরবাড়ি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত হামলা, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত টিটু রায় আদৌ ফেসবুকে ধর্ম অবমাননাকর কিছু পোস্ট করেছে কিনা, এ অভিযোগের তদন্ত হওয়ার আগেই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দশ্যে হচ্ছে– বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকারকে বিব্রত করা এবং বাংলাদেশকে মোল্লা উমরের আফগানিস্তান আর জিয়াউল হকের পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসী ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা।

২০১২ সালে কক্সবাজারের বৌদ্ধদের উপর এবং ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দুদের উপর হামলার জন্য যেভাবে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অজুহাত তৈরি করা হয়েছিল একই পদ্ধতিতে রংপুরের ঠাকুরবাড়ি গ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে। অতীতের সমচরিত্রের সন্ত্রাসী ঘটনাসমূহের মতো দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন সমাবেশে, এমনকি মসজিদেও টিটু রায়কে উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক, উত্তেজনাকর বক্তব্য প্রদান করেছে; এলাকায় এক ধরনের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে পূর্বঘোষিত তারিখে মানববন্ধনের নামে নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। হামলার পর প্রশাসন ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু ত্রাণসামগ্রী ও নগদ অর্থ দেয়া হয়েছে পুনবার্সনের জন্য, যেমনটি করা হয়েছিল রামু ও নাসিরনগরে। কয়েক হাজার হামলাকারীর ভেতর কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মামলার তথাকথিত আসামী টিটু রায়কে গ্রেফতার করে সঙ্গে সঙ্গে রিমাণ্ডে নেয়া হয়েছে, যেমনটি এর আগে ঘটেছিল জকিগঞ্জের রাকেশ রায় ও নাসিরনগরের রসরাজ দাসের ক্ষেত্রে। রামুর উত্তম বড়ুয়াকে গ্রেফতার করা যায়নি। পুলিশের ভাষায় আসামী পলাতক, তাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে আমরা জানি না উত্তম কোথায়, বেঁচে আছে না মারা গেছে।



১৯ নবেম্বর ২০১৭, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'রামু ও নাসিরনগর থেকে ঠাকুরপাড়াঃ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই' শীর্ষক 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন নির্মূল কমিটির সহসভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী। মঞ্চে প্রথম সারিতে বাম থেকে নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, সহসভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুল হুদা, সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মামুন আল মাহতাব, জকিগঞ্জের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভুক্তভোগী রাকেশ রায় এবং নাসিরনগরের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভুক্তভোগী রসরাজ দাস। পেছনে (বাম থেকে) নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, লেখক আলী আকবর টাবি, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময় এবং মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ

এক অর্থে রসরাজ ও রাকেশ গ্রেফতার হয়ে বেঁচে গিয়েছে, অন্তত উত্তমের মতো গুম হয়ে যায়নি। কিন্তু কী কারণে উত্তম, রসরাজ, রাকেশ আর টিটুরা আসামী? উত্তম ও রসরাজের ক্ষেত্রে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে তাদের ফেসবুকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা জালিয়াতির মাধ্যমে ইসলাম অবমাননার ছবি সেঁটে দিয়েছে। যারা এ অপরাধ করেছে তারা বহাল তবিয়তে আছে। অন্যদিকে রসরাজ ও রাকেশরা আসামীর কলঙ্ক বহন করে মামলার ঘানি টানছে। উত্তম গুম না হলে তাকেও তাই করতে হত। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের জমানায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করার জন্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমাকে দীর্ঘ আট নয় বছর মামলার শাস্তি পোহাতে হয়েছে, অপরাধী না হয়েও নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে আসামী হয়ে।

আমাদের বিচার ব্যবস্থা এমনই– যে কোনও সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত থানায় গিয়ে নিরাপরাধ কোনও অমুসলিম ব্যক্তির নামে মামলা করলে আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তাকে আসামী বানিয়ে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিতে গিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দিতে পারে। গ্রেফতারে গড়িমসি করলে সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তথাকথিত অভিযুক্তকে হত্যা করতে পারে, গোটা সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যাবতীয় সম্পদ, উপাসনাস্থল ধ্বংস করতে পারে, নির্বিচারে লুটতরাজ করতে পারে, নারীদের ধর্ষণ করতে পারে, হুমকি দিয়ে দেশছাড়াও করতে পারে। এত সব করার পর এই দুর্বৃত্তরা থানা, পুলিশ, প্রশাসন ও আদালতের নাকের ডগায় বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কিছুই হয় না।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের জমানায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘনের প্রায় দশ হাজার ঘটনা ঘটেছিল– এমনটি বলা হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনে। এই দশ হাজার ঘটনার ক্ষেত্রে শতকরা এক ভাগ অপরাধীরও বিচার বা শাস্তি হয়নি। এ কথা সত্য বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে আগের মতো বিপুল সংখ্যক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। তবে ২০১২ সালে রামুর ঘটনা থেকে আরম্ভ করে নাসিরনগর পর্যন্ত একজন সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তেরও শাস্তি হয়েছে এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে সরকার যথেষ্ট সাফল্য প্রদর্শন করলেও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে কোনও সাফল্য দৃশমান নয়।

এক্ষেত্রে সমাজ ও রাজনীতির মৌলবাদীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ ছাড়াও একটি বড় বাধা হচ্ছে আমাদের দেড়শ বছরের পুরনো ফৌজদারি দণ্ডবিধি। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে অপরাধীরা পার পেয়ে যায় মূলতঃ সাক্ষীর অভাবে। আমাদের আইনে যে কোন অপরাধ প্রমাণ করতে হলে সাক্ষ্য প্রয়োজন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের যত ঘটনা ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ করে না, মামলা করে না– অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায়। কখনও অর্থাভাবেও তারা মামলা করতে পারে না। তারপরও কেউ যদি সাহস করে মামলা করে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে কেউ সাক্ষী হতে চায় না। জোর করে সাক্ষী বানালেও মামলার তারিখে সাক্ষী আদালতে হাজির হয় না। ফলে এসব মামলা বছরের পর বছর গড়াতে থাকে। ভিকটিমরা যেমন ন্যায়বিচার পায় না, অপরাধীরাও তেমনি শাস্তি পায় না। বিচার ও শাস্তি থেকে অব্যাহতি সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের অধিকতর অপরাধে প্রেরণা জোগায়।

গতকাল (১৮ নবেম্বর) ছিল চট্টগ্রামের বাঁশখালীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ১৪তম বার্ষিকী। বিএনপি-জামায়াত জোটের জমানায় সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা বাঁশখালীর হিন্দু ধর্মাবলম্বী শীল পরিবারের ১১ জন সদস্যকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি। পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য বিমল শীল আজও স্বজনহত্যার বিচার পাননি, অথচ খুনীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গতকাল 'প্রথম আলোয়' প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–

'থানা-পুলিশ, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ধরণা দেওয়া আর আদালত প্রাঙ্গণে ছুটতে ছুটতে বিমল শীল এখন ক্লান্ত, অসহায়। বিচার পেতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি নানাজনের কাছে গেছেন। সবাই তাকে শুধু আশ্বাসই দিয়ে গেছেন। কিন্তু মা-বাবা, ভাইসহ পরিবারের সবাইকে হারানো এ মানুষটি ১৪ বছরেও বিচার পাননি। এ নিয়ে এখন আর তাঁর কোনো আফসোস নেই। কারণ বিচারের আশাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।....

'এই মামলার তদন্ত শেষ করে আদালতে অভিযোগপত্র দিতেই নয় বছর লেগে যায় পুলিশের। এরপর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলেও এক আসামি উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসায় দুই বছর বিচারকাজ বন্ধ ছিল। পরে আবার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু গত দেড় বছরে একজন সাক্ষীকেও আদালতে হাজির করতে পারেনি পুলিশ। এ পর্যন্ত ৫৭ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ১২ জনের সাক্ষ্য হয়েছে। সাক্ষীদের ১৭ জন পুলিশের সদস্য। তাঁদের একজনও সাক্ষ্য দেননি। মামলার এই বিবরণ তুলে ধরে পল্লি চিকিৎসক বিমল শীল বলেন, 'এরপর বিচারের আশা কীভাবে করি।'

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

সামাজিক প্রযুক্তির অপব্যবহার ছাড়াও আরও বহুভাবে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতন, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। গত বছর গোবিন্দপুরে সাঁওতাল পল্লীতে ভয়াবহ হামলার কারণ ছিল জমিজমা সংক্রান্ত। বাঁশখালীর হত্যাকাণ্ডও জমি সংক্রান্ত। আবার

যাদের কোনও জমিজমা বা সম্পদ নেই তারাও বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় নির্বাচনের সময়ে। বাংলাদেশে জামায়াত-বিএনপির জোট ধরেই নিয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা সবাই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। এ কারণে ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু– বিশেষভাবে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় নজিরবিহীন হামলার শিকার হয়েছিল, যাতে তারা ভোট দিতে না পারে। বাগেরহাটের একজন হিন্দু নারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তিনি যেন ভোটার তালিকা থেকে সব হিন্দুর নাম কেটে বাদ দেন। হিন্দুরা কখনও ভোট দিতে যাবে না, তারা শুধু নিজ দেশে থাকতে চায়। এরকম বহু হৃদয়বিদারক আকুতি তখন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ নিয়ে আমরা অনেক লিখেছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে যা জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল বাগেরহাটের হিজলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক অশোক কুমার ঘোষালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল– তিনি বিজ্ঞান ক্লাসে ছাত্রদের ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপদ মহলী হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২৩ দিন আসামী হয়ে কারাগারে আটক থেকে তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছিলেন বটে, তবে মামলা থেকে অব্যাহতি পাননি। ২০১৬ সালে ১৬ নবেম্বর বিচারে অশোক ঘোষালের জেল সহ ৫ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। তবে ম্যাজিস্ট্রেট দয়া করে প্রধান শিক্ষককে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন– ১) বাংলাদেশে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ কি না। যদি না হয় তার জন্য যে ম্যাজিস্ট্রেট একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে শাস্তি দিয়েছেন তার কেন বিচার হবে না? ২) প্রধান শিক্ষক নিরাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে ২৩ দিন আসামী হিসেবে জেল খাটতে হয়েছে। এতে সুনামহানী সহ যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা তাকে সইতে হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? ৩) এ ঘটনার ভেতর দিয়ে এলাকায় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিজয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তার দায় কে বহন করবে? আমরা ভিকটিমদের উচ্চতর আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য আপিল করতে বলেছিলাম। চাকুরি হারানোর পাশাপাশি অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায় তারা এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে সম্মত হননি।

একই ঘটনা ঘটেছে ২০১৪ সালে যশোরের মালোপাড়ার দুই ধর্ষিতা নারীর মামলার ক্ষেত্রে। আমরা তাদের মামলার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পরও আসামীদের হুমকির কারণে তারা মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ২০০৩ সালে খুলনার কালীগঞ্জে ধর্ষিতা রাধারাণীর মামলার ক্ষেত্রেও একই পরিণতি ঘটেছে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ২০১০ সালে বলেছিলেন এসব মামলার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার পাশাপাশি সাক্ষীদের নিরাপত্তার দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে। ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারপতি রাব্বানী বলেছিলেন, ভুক্তভোগী যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেন 'ক', 'খ' ব্যক্তি তার উপর নির্যাতন করেছে তাহলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে চার্জশিট করতে হবে এবং আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সাক্ষীর অভাবে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে এবং সন্ত্রাসী, ধর্ষক, ঘাতকরা সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে– কোন সভ্য সমাজে এ ধরনের বিচারহীনতা কাম্য হতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আমরা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইনমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম– অবিলম্বে 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন', ও 'সাক্ষী নিরাপত্তা আইন' প্রণয়ন সহ 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' এবং পৃথক সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠন করবার জন্য। আইনমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

আমরা সরকারের প্রতি আবারও আহ্বান জানাচ্ছি– সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং সাম্প্রদাযিক বৈষম্য ও নিপীড়ন বন্ধের জন্য আমাদের চার দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করুন।

একই সঙ্গে আমরা দাবি জানাচ্ছি, উত্তম, রসরাজ ও রাকেশকে আসামী হিসেবে চিহ্নিত না করে প্রকৃত ভিকটিম হিসেবে বিবেচনা করে আইনি সহযোগিতা সহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য। ঠাকুরবাড়ির টিটু রায়কে গ্রেফতার করে যেদিন আদালতে হাজির করা হয় সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ভয়ে কেউ তার জামিনের জন্য দাঁড়ায়নি। নির্মূল কমিটি টিটু রায়ের মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমাদের রংপুর জেলা শাখা ইতিমধ্যে সাতজন আইনজীবী নিযুক্ত করেছে টিটুর মামলা লড়বার জন্য। এরা হলেন– ১) এডভোকেট ইন্দ্রজিৎ রায়, ২) এডভোকেট মাশরাফি মোঃ শিবলী, ৩) এডভোকেট নরেশচন্দ্র সরকার, ৪) এডভোকেট রিয়াজুল আবেদীন লিটন, ৫) এডভোকেট বিনয়ভূষণ রায়, ৬) এডভোকেট কমল মজুমদার ও ৭) এডভোকেট জাকির হোসেন।

এই মামলার ভিকটিম টিটু রায়কে গ্রেফতারের পর বার বার রিমাণ্ডে নেয়া হলেও হামলাকারীদের কাউকে রিমান্ডে নেয়া হয়নি। আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের এই সাম্প্রদায়িক আচরণের তীব্র নিন্দা করছি। আমরা অবিলম্বে টিটু রায়ের মুক্তি দাবির পাশাপাশি যারা তার নামে ফেসবুক জালিয়াতি করেছে, যারা ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে হামলার উস্কানি দিয়েছে, যারা নেপথ্যে থেকে অর্থ ও রসদের জোগান দিয়েছে এবং যারা হামলা করেছে তাদের সকলকে দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। হামলার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও হামলার আগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য যারা দায়ী যথাযথ তদন্ত করে তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(শাহরিয়ার কবির)
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

১২

নির্বাচনকালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন এবং মানবাধিকার লংঘন রোধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে নির্মূল কমিটির মতবিনিয় সভা

বিষয় ঃ নির্বাচনকালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় করণীয়

সবিনয় নিবেদন,

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে নির্বাচনে এবার দশ কোটিরও বেশি নির্বাচকমন্ডলি অংশগ্রহণ করবেন, যাদের ভেতর দুই কোটিরও বেশি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অতীতে আমরা অত্যন্ত ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি– নির্বাচনের সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নানাবিধ নির্যাতন সহ মানবাধিকার লংঘনের গুরুতর ঘটনা ঘটে।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' প্রতিষ্ঠার পর সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। এর ভেতর সবচেয়ে সহিংস ছিল ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের যুদ্ধাপরাধী-মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত ৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নৃশংস নির্যাতন, হত্যা ও গৃহে অগ্নিসংযোগ সহ যাবতীয় সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে– মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তা ছিল নজিরবিহীন। ২০১৪



১৩ নবেম্বর ২০১৮, নির্বাচনকালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় করে। মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। এসময় উপস্থিত ছিলেন (ডান থেকে) নির্মূল কমিটির সহসভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সহসভাপতি শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, নির্মূল কমিটির চিকিৎসা সহায়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, নির্মূল কমিটির আইন সহায়ক কমিটির সদস্য সচিব ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকসহ মানবাধিকার কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও আমরা দেখেছি ২০০১ সালের মতো ব্যাপকভাবে না হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার আক্রান্ত হয়েছে বিএনপি-জামায়াতের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা অগ্রাহ্য করে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য।

আমরা ১৯৯৬-এর সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে রাজাকারমুক্ত সংসদের দাবিতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিযাত্রা' নামে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করছি– সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নির্বাচকমন্ডলীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা তদন্ত করে দেখেছি দেশের ৯২টি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ থেকে ৪৮ ভাগ পর্যন্ত, যার অধিকাংশ ঝুঁকিপূর্ণ। অবাধ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে ২৩ অক্টোবর ২০১৮ আমরা নির্বাচন কমিশনকে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছি। স্মারকপত্রে যে সব দাবি উল্লেখ করা হয়েছে তার কয়েকটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য প্রাসঙ্গিক। এর ভেতর রয়েছে–

১) ঝুঁকিপূর্ণ সকল নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচকমন্ডলির সার্বিক নিরাপত্তার জন্য পূর্বাহ্নে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচনমন্ডলিকে হুমকি প্রদানকারীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২) জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ২০১৩ সালে উচ্চতর আদালত এবং নির্বাচন কমিশন জামায়াতকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করেছে। দলীয়ভাবে নির্বাচন না করলেও ২০১৩ সালের পর যাবতীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা স্বতন্ত্রভাবে কিংবা অন্য দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং কিছু এলাকায় জয়ীও হয়েছেন। জামায়াতের সকল স্তরের নেতা ও সদস্য দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রতি অন্য যে

কোনও দলের নেতাকর্মীদের তুলনায় বেশি অনুগত। নির্বাচনী প্রচারণায় তারা দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মওদুদিবাদী দর্শন এবং দলের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচি প্রচার করেন, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং উচ্চতর আদালতের রায়ের পরিপন্থী। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি– যে গঠনতন্ত্র বা দলিল আমাদের সংবিধানবিরোধী সে গঠনতন্ত্রের অনুসারীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করুন। জামায়াতের গঠনতন্ত্র ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে না। জামায়াতের গঠনতন্ত্র নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে না। এ ধরনের গঠনতন্ত্রের অনুসারী কোনও ব্যক্তি যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তা হবে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে লেখা আমাদের মহান সংবিধানের চরম অবমাননার শামিল।...

৩) নির্বাচনে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ হলেও জামায়াতে ইসলামী এবং সমচরিত্রের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক দলগুলো নির্বাচনের সময় ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। ওয়াজের নামে কিংবা জুম্মার নামাজে খোৎবার সময় তারা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করে। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে, নারীদের বিরুদ্ধে, মুক্তচিন্তার মানুষদের বিরুদ্ধে এবং ভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চালিয়ে নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসের জমিন তৈরি করে। নির্বাচনের সময় এ ধরনের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, সংবিধানবিরোধী এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচারকারীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি। নির্বাচন স্বচ্ছ করতে হলে নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনকারীদের বিচার ও শাস্তির বিকল্প কিছু নেই।

নির্বাচন কমিশন আমাদের কিছু প্রস্তাব বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবে এ কথাও বলেছেন, আইনি সুযোগ না থাকার কারণে জামায়াতের কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীতে দেখেছি, স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে, ভিন্নমত ও ভিন্নধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে যে ধরনের ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চালায় তা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য হানিকারক এবং মানবাধিকারের গুরুতর লংঘন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-বিত্ত নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নির্বাচনকালে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত হচ্ছে–

১) মানবাধিকার কমিশন নির্বাচনকালে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় বিশেষ নজরদারি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র থেকে নিম্নতম পর্যায়ে বিশেষ সেল গঠন করতে পারে। এই সেলে স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যুক্ত করা যেতে পারে।

২) আমরা বিশ্বাস করি 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' নির্বাচনকালে মানবাধিকার রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। প্রান্তিক ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর কোথাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত উপদ্রুত এলাকা সফর করতে হবে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনকে বলতে হবে। প্রশাসনের কোনও ব্যক্তি যদি এসব ঘটনা সম্পর্কে নির্বিকার থাকেন, যদি অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাদেরও বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৩) মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য মানবাধিকার কমিশনকে বিশেষ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ভিকটিমদের ন্যায়বিচার প্রদান এবং সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিতকরণের জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি 'আইন সহায়ক কমিটি' গঠন করেছে। এ বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবীদের সঙ্গে আমাদের আইন সহায়ক কমিটি সমন্বিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

৫) অনেক সময় প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভিকটিমদের ন্যায়বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ আইন (সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন) প্রণয়নের জন্য আমরা ২৮/০১/২০১৬ তারিখে আইনমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান করেছি এবং আইন কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। আইনমন্ত্রী আমাদের প্রস্তাব বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিষয়টি যেহেতু মানবাধিকার সংক্রান্ত, এক্ষেত্রে আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতা কামনা করছি।

৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিরোধী, সংবিধানবিরোধী, সর্বজনীন মানবাধিকার সনদবিরোধী ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য নজরদারির জন্য আমরা একটি 'তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ সেল' গঠন করেছি। এ বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে আমরা আগ্রহী।

৭) নির্বাচনকালে কোথাও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে ভিকটিমদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আমরা একটি 'চিকিৎসা সহায়ক কমিটি' গঠন করেছি। ভিকটিমদের মামলা পরিচালনার জন্য মেডিক্যাল রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিকটিমদের অজ্ঞতার কারণে সংগ্রহ করা হয় না। এ বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আমরা সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

ধন্যবাদান্তে

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষে

(শাহরিয়ার কবির)

সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ

ঢাকা, ১৩ নবেম্বর ২০১৮

১৩

২৯ নবেম্বর (২০১৮) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যৌথ সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের নিকট আমাদের প্রত্যাশা

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ ডিসেম্বর (২০১৮) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশের সকল নাগরিকের মতো আমরা আশা করি এ নির্বাচন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবাধ, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হবে। এই নির্বাচনে প্রধানতঃ তিনটি রাজনৈতিক জোটের অধীনে সর্বাধিক সংখ্যক দল যেমন অংশগ্রহণ করছে, একইভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমন্ডলী

তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আমরা আশা করব আগামী নির্বাচনে ২০০১ ও ২০১৪-এর মতো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কোনও ঘটনা ঘটবে না।

বাংলাদেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' এবং মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার জন্য আন্দোলন করছে। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ধর্মের নামে শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনা থাকবে না– এটা সকলের কাম্য। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মের নামে হানাহানি, বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের জন্য ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী চার মহান নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'সমাজতন্ত্র' মুছে ফেলা সহ ধর্মের নামে রাজনীতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করে সংবিধান সহ সমাজ ও রাজনীতির যে মৌলবাদীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের অহংকার যারা হৃদয়ে ধারণ করেন তারা কখনও চাইবেন না ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে, ৫ লক্ষাধিক নারীর চরম লাঞ্ছনা ও ত্যাগের মূল্যে যে জাতীয় সংসদ আমরা অর্জন করেছি, সেই পবিত্র সংসদ কোনও স্বাধীনতাবিরোধী, মানবতাবিরোধী অপরাধী, রাজাকার, ভূমিদস্যু, দুর্নীতিবাজ, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির পদচারণায় কলঙ্কিত হোক। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা সকল রাজনৈতিক দলের নিকট আহ্বান জানিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী কিংবা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে যেন মনোনয়ন দেয়া না হয়। নির্বাচন কমিশনকে আমরা বলেছিলাম, যেহেতু জামায়াতে ইসলামী '৭১-এর গণহত্যাকারীদের দল, যে দলের গঠনতন্ত্র আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে উচ্চতর আদালত ও নির্বাচন কমিশন এই দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেছে– এই দলের কোনও সদস্য যেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আশা করি আগামী সপ্তাহে বড় রাজনৈতিক দলের জোটগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবে। ক্ষমতায় গেলে তারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তা-ভাষা-লিঙ্গ-বিত্ত-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করবেন তা দেখার জন্য দেশবাসী গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। আমরা আশা করব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা সকল জোট ও দলের নির্বাচনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে কিছু দাবি আপনাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহ সহ দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে চাই, যা রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে থাকবে– এটা আমাদের প্রত্যাশা। আমরা চাই–

১) সকল রাজনৈতিক দল ও জোট এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করবে– তারা কখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবে না এবং ক্ষমতায় গেলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কঠোরভাবে দমন করা হবে।



২৯ নবেম্বর ২০১৮, জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের নিকট আমাদের প্রত্যাশা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার এ্যালবার্ট টি রোজারিও, 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে'র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাস গুপ্ত, বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোটের সভাপতি হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান, মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের পুরোহিত রঞ্জিত চক্রবর্তী ও হরিজন ঐক্য পরিষদ-এর নারীনেত্রী সুচিত্রা রানী দাস

২) প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী যেহেতু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের মতো সামাজিক দুর্যোগকালে সংঘটিত অপরাধের বিচার সম্ভব নয়, সেহেতু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভিকটিমদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অপরাধীদের শাস্তির জন্য আমরা 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৩) সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, পীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হন। এসব সমস্যা নিরসনের জন্য 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' এবং 'সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রণালয়' গঠনের জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করছি। আমরা আশা করব নির্বাচনী ইশতেহারসমূহে আমাদের এ দাবি পূরণের ঘোষণা থাকবে।

৪) সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা সংস্কারের জন্য ছাত্রসমাজের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার যেভাবে তা সংস্কার করেছে– মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা এবং অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার বিরোধিতা করেছেন। আমরা দাবি করছি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য অন্ততপক্ষে ১৫% এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী– হরিজন, দলিত, ঋষি, মালো সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ৫% কোটা থাকতে হবে।

৫) আমরা 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' এবং 'পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিকরণ আইন' দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

৬) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন' দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

৭) আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক শিক্ষানীতি এবং নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যুগোপযোগী নারীনীতি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৮) তরুণ প্রজন্মকে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি।

৯) মন্ত্রী পরিষদ, সামরিক ও অসামরিক প্রশাসন এবং বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায় এবং অনগ্রসর দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্ব দাবি করছি।

১০) '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে এবং দুই বা ততোধিক ট্রাইবুনাল গঠন করে ২০২৪ সালের ভেতর তা সম্পন্ন করতে হবে। এই সময়ের ভেতর গণহত্যাকারীদের সকল সংগঠন এবং পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেরও দাবি জানাচ্ছি।

১১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল যেহেতু জামায়াতে ইসলামীকে গণহত্যার দায়ে অপরাধী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং উচ্চতর আদালত এই দলকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করেছে; সেহেতু আমরা জঙ্গি মৌলবাদীদের গডফাদার সন্ত্রাসী এই দলটি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।

১২) সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল আইন ও প্রথা বিলোপের দাবি জানাচ্ছি।

আমরা আশা করব নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ আমাদের দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল বা জোট সরকার গঠন করবেন, অন্যরা বিরোধী দলে থাকবেন। আমরা চাই সরকার ও বিরোধী দলের সবাই ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন।
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

১৪

২৬ মে (২০১৯) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

বাংলাদেশে আইএস-এর নতুন হুমকি ও কার্যক্রম ঃ সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আপনারা সবাই জানেন আইএস-এর একটি সাম্প্রতিক প্রকাশনা 'লোন উল্‌ফ্' (মার্চ ২০১৯)-এ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সহসভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মানবাধিকার নেত্রী এডভোকেট সুলতানা কামালকে কী ভয়ঙ্কর ভাষায় হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত সন্ত্রাসী সংগঠন 'আইএস' ও 'আল কায়েদা' ইরাক ও সিরিয়ায় জিহাদ করতে গিয়ে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ২০১৭ সালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের পরবর্তী তৎপরতার কেন্দ্র হবে আরব



২৬ মে ২০১৯, জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাদেশে আইএস-এর নতুন হুমকি ও কার্যক্রম: সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) নির্মূল কমিটির সহসভাপতি লেখক সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, সহসভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সহসভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা শহীদজায়া সালমা হক ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল

মানচিত্রের হিন্দুস্তান– বর্তমান কালের পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। ২০১৬ সাল থেকে তারা হাদিসের কিছু প্রক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে– কেয়ামতের আগে শেষ জিহাদ হবে হিন্দুস্তানের জমিনে, যেটি তাদের ভাষায় 'গাজওয়ায়ে হিন্দ', এবং এর প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে, প্রতিপক্ষকে কীভাবে ধ্বংস করতে হবে তার উল্লেখ আইএস ও আল কায়েদার প্রকাশনাসমূহ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ সহ এদেশীয় সহযোগীদের বিভিন্ন ওয়াজ ও জলসার বক্তৃতায় আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি।

২০১৬ সালের জুলাই-এ ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান ক্যাফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জঙ্গীদমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করেছে। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গত কয়েক বছরে জঙ্গীদের বহু আস্তানা ধ্বংস করেছে, তাদের বহু হামলার চক্রান্ত ও উদ্যোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে, বহু জঙ্গী ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে এবং অনেকে গ্রেফতার হয়েছে। জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'শূন্য সহিষ্ণুতা'র ঘোষণা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হয়েছে। তবে এ কথা আমরা বার বার বলছি– জঙ্গীদমনই যথেষ্ট নয়, জঙ্গীদের আদর্শ ও রাজনীতি– যাকে আমরা 'মওদুদিবাদ' ও 'ওয়াহাবিবাদ' বলি, তাকে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে নির্মূলনের কোন সমন্বিত কার্যক্রম কোথাও দেখছি না। এ সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে সব দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা এটিকে মাফিয়াদের মতো নিছক আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা মনে করছে, যা কি না শক্তি প্রয়োগ করে নির্মূল করা সম্ভব। জঙ্গীদের আদর্শ নির্মূল না করে শুধু মাঠপর্যায়ে কিছু খুচরো জঙ্গী হত্যা বা গ্রেফতার করে, কিংবা তাদের আস্তানা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত বোধ করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে যাবে।

বিভিন্ন মাদ্রাসার পাঠক্রম, দেশব্যাপী উগ্র মৌলবাদীদের ওয়াজ মাহফিল ও জলসায় ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিভিন্ন মসজিদে জুম্মার নামাজের পর খুৎবা এবং সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমে চরম উত্তেজনামূলক বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে– বাংলাদেশে বড় রকমের জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে। গত মাসে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৫ জন ওয়াজকারী মোল্লার তালিকা প্রস্তুত করেছে, যারা প্রতিনিয়ত ভিন্নমত, ভিন্নধর্ম, ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসী এবং নারীসমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সন্ত্রাসমূলক বক্তব্য প্রচার করছেন। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছি– সমাজে অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও হত্যার জমিন তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ওয়াজকারীর সংখ্যা ১৫ জন নয়, শতাধিক হবে, যাদের বক্তব্য সিডি ও ডিভিডি আকারে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হচ্ছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। আইএস ও আল কায়েদার সমর্থক জঙ্গী সন্ত্রাসীদের শত শত উস্কানিমূলক বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের তরুণদের মনোজগতে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের আধিপত্য বিস্তার করছে, যার বিরুদ্ধে সরকার এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ দৃশ্যমান নয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশে অদূরভবিষ্যতে জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস হতে পারে এদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা জনবিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা হয়ে তাদের বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ভেতর জেহাদী জজবা সৃষ্টির জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। ২০০৫ সালে জামায়াত-বিএনপির জমানায় আমরা বাংলাদেশে ১২৫টি জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম, যার ভেতর ১৭টি ছিল রোহিঙ্গাদের। ২০১৭ সাল থেকে বিপুল পরিমাণে রোহিঙ্গা শরণার্থীর আগমন ঘটার পর আমরা তদন্ত করে রোহিঙ্গা শিবিরে এ পর্যন্ত ৩৯টি জঙ্গী রোহিঙ্গা সংগঠনের সন্ধান পেয়েছি। মায়ানমারের সরকারের ভয়াবহ গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের ক্ষোভ, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে জামায়াতিরা তাদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী মৌলবাদী প্রচারণা চালাচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানকারী নতুন ও পুরাতন প্রায় ১৫ লাখ রোহিঙ্গার ভেতর মৌলবাদীরা যদি ১ লাখ রোহিঙ্গা তরুণকে জিহাদী প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেটি শুধু বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশের জন্য হুমকি হতে পারে। রোহিঙ্গাদের শিবিরে উদ্বেগজনক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হুমকি হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। যারা বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটাতে চাইছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকার মতো পরাশক্তির হস্তক্ষেপ কামনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত করা।

জঙ্গীদমনের পাশাপাশি জঙ্গীবাদকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবেলা করতে হলে সরকার ও নাগরিক সমাজকে সমন্বিতভাবে যা করতে হবে তা আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে চাই–

১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধা যাঁরা বাংলাদেশ স্বাধীন করে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই জাতিকে যে অনন্যসাধারণ সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানের ৩৮ ধারা অনুযায়ী ধর্মের নামে রাজনীতি অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে।

২) ওয়াজ ও খুৎবার নামে যারা শান্তি ও সহমর্মিতার ধর্ম ইসলামকে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা ও সন্ত্রাসের সমার্থক বানাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত সে সব ব্যক্তিকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে আইএস ও আল কায়েদার রণনীতি ও রণকৌশল প্রচার করছে– ফেসবুক ও ইউটিউব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে অবিলম্বে সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ ও উন্মাদনা সৃষ্টিকারী প্রচারণা বন্ধ করতে হবে এবং প্রচারকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৪) জঙ্গীদমনে বাংলাদেশের সাফল্য যেহেতু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাস নির্মূলনের ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ বাংলাদেশ নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে– জঙ্গী মৌলবাদ দমনে যে সব দেশ আন্তরিক এবং সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে সে সব দেশের সরকারের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি, সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় আয়োজনের উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করুক। সমগ্র বিশ্ব থেকে ধর্মের নামে হানাহানি, সন্ত্রাস ও গৃহযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে এই সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে এমন একটি ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করতে পারে যা জাতিসংঘ প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করবে।

৫) বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের আকুল আহ্বান– জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের সকল কার্যক্রমের উপর প্রখর নজরদারি রাখুন এবং মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

   ক) কোনও ওয়াজ বা খুৎবায় ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্নমত, ভিন্নধর্ম ও ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যারা ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করছে তাদের বিরোধিতা করুন। যদি প্রতিবাদ করতে না পারেন তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করুন এবং গণমাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন।

৬) আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ বাংলা নববর্ষ উদযাপন সহ বহু গ্রামীণ মেলার সময়সূচি নির্ধারণ করে দিলেও উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে ওয়াজ মাহফিল ও সালানা জলসার কার্যক্রম গ্রামেগঞ্জে সারারাত চালানো হয়, যা মারাত্মক শব্দদূষণ ছাড়াও ছাত্রদের পড়াশোনা, মানুষের বিশ্রাম ও শান্তি বিনষ্ট করছে, অথচ এসবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। মওদুদিবাদী মোল্লাদের আপত্তির কারণে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের সময়সূচি নিয়ন্ত্রণ কিংবা চিরায়ত গ্রামীণ মেলার শান্তিপূর্ণ আয়োজনের উপর বিধিনিষেধ জারি কোনওভাবে কাম্য নয়। প্রশাসনের এ ধরনের কার্যক্রম সমাজে অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উগ্রতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক– যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৭) সরকার কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিলেও তাদের পাঠক্রমে জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির সহায়ক বিষয় নিয়ন্ত্রণের কোনও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মানবিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সকল শিক্ষা মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করা সহ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

   ক) যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে না সে সব প্রতিষ্ঠান এবং এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নাম ও পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশের আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে আমরা আশা করব মানবাধিকার উন্নয়নের সূচকেও একই রকম সাফল্য অর্জনে সরকার যত্নবান হবে।

দেশে যেহেতু শক্তিশালী কোনও বিরোধী দল নেই– গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সরকার ও গণপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে

(শাহরিয়ার কবির)
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

১৫

২ আগস্ট (২০১৯) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ভিকটিমদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ করুন ঃ অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করুন

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিন দশক যাবৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্য কাজ করছি। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের আইনি ও চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি সীমিত সাধ্য অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসনের জন্যও আমরা কাজ করছি। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি– আমাদের অঙ্গীকার ছিল এদেশে ধর্মের নামে কোনও রকম শোষণ-পীড়ন-বৈষম্য-বিদ্বেষ থাকবে না। স্বাধীনতার জন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তা নির্বিশেষে এদেশের মানুষ জীবন দিয়েছে, যার স্বীকৃতি ছিল ১৯৭২-এর সংবিধানে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এবং তাঁর প্রধান সহযোগী– যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর অনন্যসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন করেছেন– তাঁদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ও পাকিস্তানিকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা এখনও বন্ধ হয়নি। বিশেষভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল পর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আসার কারণে সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ কিছু অপসারিত হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় উন্নত হয়েছে এ কথা আমরা কেউ অস্বীকার করি না। তবে এখনও দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সংবাদ আমাদের কাছে আসে যা অনেক সময় জাতীয় দৈনিকে স্থান পায় না। আজ আপনাদের নিকট কয়েকটি ঘটনা আমরা তুলে ধরছি– সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কীভাবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় তা অনুধাবনের জন্য।

গত ২৪ জুলাই রাজধানীর মিরপুরের আলীমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী স্কুল ইউনিফর্ম না পরে বোরখা পরে স্কুলে যাওয়ায় পিটি শিক্ষক তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক এ বি এম মিজানুর রহমানের কাছে নিয়ে যান। তিনি ছাত্রীকে বলেছেন, ভবিষ্যতে সে যেন স্কুলের ইউনিফর্ম পরে ক্লাসে আসে। মেয়েটি বাড়িতে গিয়ে তার অভিভাবকদের এ বিষয়ে



০২ আগস্ট ২০১৯, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার: অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করুন' শীর্ষক 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন নির্মূল কমিটির সহসভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার রসরাজ দাসের আইনজীবী ও নির্মূল কমিটির ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আইন সম্পাদক এডভোকেট নাসির মিয়া, নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সহসভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, নির্মূল কমিটির আইন সহায়ক কমিটির সভাপতি এডভোকেট খোন্দকার আব্দুল মান্নান ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার রাজধানীর মিরপুরের আলীম উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেশ কান্তি ঘোষ

জানালে তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রমেশ কান্তি ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। তারা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে শুধু অসৌজন্যমূলক আচরণই করেন নি, তার কক্ষে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটিয়েছেন। যদিও ছাত্রীর ভাই রাকিবুল হাসান তার ফেসবুকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে লিখেছেন, তিনি নাকি বলেছেন 'হিজাব বোরখা পরে স্কুলে যাওয়া যাবে না।' এ নিয়ে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছেন, যা বর্তমানে তদন্তাধীন।

ছাত্রীর অভিভাবকের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রী সব সময় ইউনিফর্মের রঙের হিজাব ও বোরখা পরে, এমনকি শিক্ষয়িত্রীরাও বোরখা পরেন– কখনও প্রধান শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষের কেউ এ নিয়ে আপত্তি করেননি। ছাত্রীর ভাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লিখেছেন তার বোনকে নাকি স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিজাব বোরখা পরার জন্য হিন্দু প্রধান শিক্ষক স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যক্তি প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় গালাগালি করার পাশাপাশি বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদান করছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারও বিরুদ্ধে যদি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনও অভিযোগ করা হয় তার পরিণতি কী হতে পারে আলীমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রমেশ কান্তি ঘোষ তার সাম্প্রতিক উদাহরণ। রাকিবুল হাসানের একটি মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় বিভিন্নজনের ফেসবুকে এমন মন্তব্যও করা হয়েছে– অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে জুতো মেরে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে, হিন্দুরা সব ইসলাম বিদ্বেষী ও বিশ্বাসঘাতক, নব্বইভাগ মুসলমানের দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের হিজাব ও বোরখা বাধ্যতামূলক করতে হবে, ইসলামবিদ্বেষীদের শাস্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন প্রণয়ন করতে হবে, বাংলাদেশে শরিয়া

আইন চালু করতে হবে ইত্যাদি, যা প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগী উগ্র মৌলবাদীদের রাজনৈতিক এজেন্ডা। আমরা রমেশ কান্তি ঘোষ এবং তার পরিবারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজ আপনাদের সামনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর ও নবীনগরের দুই তরুণ ভুক্তভোগী রসরাজ দাস ও সঞ্জু বর্মণ উপস্থিত আছে। প্রায় তিন বছর আগে রসরাজের ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম অবমাননার মিথ্যা বক্তব্য সেঁটে দিয়ে নাসিরনগরে হতদরিদ্র হিন্দু জেলেপাড়ায় কী ধরনের হামলা হয়েছিল তা আপনারা জানেন। রসরাজকে যখন গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হয় তখন বিএনপি-জামায়াত সমর্থক আইনজীবীরা 'রসরাজের কল্লা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করেছিলেন। রসরাজের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের আইনজীবীদের হুমকি দেয়া হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে যদিও বলা হয়েছে রসরাজের ফোন থেকে এ ধরনের কোনও কিছু প্রচার করা হয়নি তারপরও রসরাজকে গত তিন বছর ধরে আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে, থানা থেকে এখনও ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়নি, যদিও 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে'র সপ্তম অধ্যায়ে ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

রসরাজের মতো আরেক ভুক্তভোগী নবীনগরের সঞ্জু বর্মণ, যার তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তার নাম ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় বিষোদগার করে একটি দীর্ঘ লেখা পোস্ট করা হয়েছিল, যার কারণে রসরাজের মতো সঞ্জুকেও গত বছর (২০১৮) অক্টোবরে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার ভূয়া ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার যে পোস্ট দেয়া হয়েছে সেটি যিনি লিখেছেন, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে তার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, যে বিষয়ে সঞ্জুর প্রাথমিক শিক্ষা নেই। আমাদের আইনজীবীরা তাকে জামিনে জেল থেকে বের করে আনলেও সঞ্জু সারাক্ষণ আতঙ্কের ভেতর রয়েছে। এই দুই ঘটনায় রসরাজ ও সঞ্জু সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভুক্তভোগী, কোনও কারণে অভিযুক্ত বা আসামী হতে পারে না। আমরা অবিলম্বে রসরাজের মামলা দ্রুত প্রত্যাহার এবং সঞ্জুর মামলার গোয়েন্দা তদন্ত দাবির পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানাচ্ছি।

বাংলাদেশকে যারা ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা উমরের আফগানিস্তান বা জিয়াউল হকের পাকিস্তানের মতো জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানাতে চায়, যারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিস্ময়কর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করতে চায়, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কোনও অজুহাতে বা অজুহাত সৃষ্টি করে ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত ও ভিন্ন জীবনধারার ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে, তারা আঘাত করছে বাঙালিত্বের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সংবিধানকে– যা বন্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। কখনও কাউকে ৫৭ ধারায় গ্রেফতার করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে এসে একই কাজ করছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে আলকায়দা ও আইএস-এর জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলয় বিস্তৃতি লাভ করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে। অতীতে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৌলবাদী অপশক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য যে উগ্র, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছে– এ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হচ্ছে আমাদের কিশোর ও তরুণ সমাজ, যা শিষ্টাচার ও সভ্যতার সকল বোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা প্রতিবেশী মায়ানমারে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার সে দেশের প্রায় পনের লক্ষ সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবতার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছি। আমাদের দেশে ধর্মীয় বা জাতিগত কারণে সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য কেউ লাঞ্ছনা বা নির্যাতনের শিকার হবেন– এটা কোনওভাবে মেনে নেয়া যায় না।

আমরা আশা করব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচার করে যারা জনজীবন ও রাষ্ট্রের মূল কাঠামো বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী এ ধরনের উদ্যোগ প্রতিহত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

১৬

২৯ নবেম্বর ২০১৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রস্তাবিত জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন-এর কাঠামো (খসড়া) উপস্থাপনকালে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বক্তব্য

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রায় তিন দশক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে সংবিধানে বর্ণিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চার রাষ্ট্রীয় নীতি, যার লক্ষ্য ছিল ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্তা-ভাষা-বিত্ত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। দুর্ভাগ্যের বিষয়– ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী তাঁর প্রধান সহযোগী, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেছিলেন– তাঁদের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর দুই জেনারেল, জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এর সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছেন, যে কলঙ্ক থেকে আমরা আজও মুক্ত হতে পারিনি।

আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫-এর পর বেশির ভাগ সময় বাংলাদেশে ক্ষমতায় থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, যারা আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্য মুছে ফেলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছে, এ ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত আছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছি, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য পৃথক 'আইন সহায়ক কমিটি' ও 'চিকিৎসা সহায়ক কমিটি' গঠন করেছি মানবাধিকারের প্রতি নিবেদিত আইনজীবী ও চিকিৎসকদের সমন্বয়ে, যা করার দায়িত্ব মূলতঃ রাষ্ট্রের।

২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুন:স্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের জন্য 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন এবং 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছি। যদিও বর্তমান সরকারের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা যে সব অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করছেন তা অতীতে বাংলাদেশে কখনও আমরা দেখিনি, তারপরও তারা বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক



২৯ নবেম্বর ২০১৯, জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' প্রস্তাবিত 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন'-এর সাংগঠনিক কাঠামো (খসড়া) পাঠ করছেন কাঠামোর রচয়িতা উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। ছবিতে (বাম থেকে) নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, নির্মূল কমিটির চিকিৎসা সহায়ক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, নির্মূল কমিটির সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সভাপতি সঙ্গীতশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, নির্মূল কমিটির আইন সহায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, নির্মূল কমিটির চিকিৎসা সহায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব এবং নির্মূল কমিটির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী

অপশক্তির হামলার শিকার হয়েছেন, উপযুক্ত আইনের অভাবে অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান কিংবা ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার প্রদান সম্ভব হয়নি।

নির্মূল কমিটির পাশাপাশি 'বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ' এবং আরও কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এই দাবি সমর্থন করেছে, যার কারণে ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এসব দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের কমিশন রয়েছে সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষার জন্য। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম শ্লোগান– 'সংখ্যালঘুর অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার।'

যেহেতু 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের অঙ্গীকার বর্তমান সরকারের রয়েছে, সেহেতু সরকারকে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তাবিত কমিশনের কর্ম পরিসর ও সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে চাই, যা প্রণয়ন করেছেন আমাদের অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।

আমরা আশা করব মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার আমাদের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে

(শাহরিয়ার কবির)
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

প্রস্তাবিত জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের কাঠামো (খসড়া)

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমান অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য 'জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের দাবি জানাচ্ছে– যা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল– তা এখনও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব– এই কমিশন হতে হবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ সংস্থা, যা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল বৈষম্য এবং অপরাধের ক্ষেত্রে সফল এবং কার্যকরপন্থা গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষ সকল নাগরিকের যেসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদে যেসব অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া যেন এই কমিশন গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। অমুসলিমদের উপর নির্যাতন, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করা, প্রতিমা ইত্যাদি ধ্বংস বন্ধ করার জন্য এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজনে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা এই কমিশনের থাকা প্রয়োজন; যার ভেতর থাকতে পারে এজহার দায়ের করার ক্ষমতা, তদন্ত করার ক্ষমতা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করার ক্ষমতা ইত্যাদি। বিভিন্ন দপ্তর এবং কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে গোপনীয় নয় এমন দলিল তলব করা, তথ্য-উপাত্ত তলব করা এবং সাক্ষীকে তলব করার ক্ষমতা এই কমিশনকে দিতে হবে যা ভারতীয় কমিশনের রয়েছে। ভুক্তভোগীরা হাইকোর্টে রিট মামলা করলে কিংবা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে রিটকারী বা আবেদনকারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের ক্ষমতা কমিশনের থাকতে হবে, যে ক্ষমতা যুক্তরাজ্যের বর্ণসাম্য কমিশনে রয়েছে। প্রস্তাবিত এই কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো কেমন হতে পারে সে বিষয়ে ধারণার জন্য আমরা ভারতীয় কমিশন, যুক্তরাজ্যের বর্ণসাম্য কমিশন এবং আমাদের দেশের মানবাধিকার কমিশন সহ একই ধরনের বেশ কয়েকটি সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করেছি।

কমিশনের কর্মপরিসর

(১) কমিশন অমুসলিমদের নিকট থেকে তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার লংঘন, তাদের সম্পত্তি দখল উপাসনালয়ে হামলা কিংবা মূর্তি ভাংচুরের অভিযোগ প্রাপ্ত হলে দ্রুত তদন্ত পরিচালনা করবে। সংবাদ মাধ্যম বা অন্য সূত্রে একই ধরনের সংবাদ পেলেও তদন্ত পরিচালনা করবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(২) কোন অমুসলিম ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে, কমিশন উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) কোন অমুসলিমের সাংবিধানিক এবং আইনগত অধিকার খর্বের অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণিত হলে, কমিশন প্রথমতঃ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করবে এবং তাতে ব্যর্থ হলে, প্রয়োজনে হাইকোর্টে রিট বা অন্য আদালতে মামলার পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(৪) কোন অমুসলিম তার ব্যক্তি, সম্পত্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণের অভিযোগ করলে এবং অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে, কমিশন প্রাথমিকভাবে আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ আদায়ের চেষ্টা করবে; ব্যর্থতায়, ভুক্তভোগীকে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেবে এবং এ ব্যাপারে যথার্থ মনে করলে আইনী এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৫) অমুসলিমদের ধর্ম পালন ও প্রচারে যেন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে কমিশন নজর রাখবে এবং বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক করবে।

(৬) কমিশন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষ, এ্যাটার্নি জেনারেল এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং কমিশনের দৃষ্টিতে আসা বিষয় এবং ঘটনাসমূহ তাদের নজরে আনবে।

(৭) কমিশন প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে থাকবে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহের সার সংক্ষেপ, পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলাফলের সার সংক্ষেপ। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আইন, স্বরাষ্ট্র, গণপ্রশাসন এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন সমূহ, এ্যাটার্নি জেনারেল, স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ সমূহ, পুলিশ প্রধান, প্রতি জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার, মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারদের মাঝে বিতরণ করবে।

(৮) কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগের সার সংক্ষেপ, পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলাফলের সার সংক্ষেপ প্রকাশ করবে।

(৯) কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে, গোপন নয় এমন দলিলাদি তলব করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করতে পারবে যদি ঘটনা উদঘাটনের স্বার্থে এ ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

(১০) কমিশন তার উপদেষ্টা মন্ডলীর পরামর্শ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(১১) কমিশন কয়েকজন আইনজীবীর একটি প্যানেল তৈরি করে আইনি বিষয়ে তাদের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করবে এবং ভুক্তভোগীদের আইনী সহায়তা দিতে উক্ত প্যানেলকে নির্দেশ দিতে পারবে।

(১২) নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এ্যাটর্নি জেনারেল ও দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রস্তাবিত কমিশন প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে তাদের সহায়তা নেবে।

(১৩) জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময়ে অমুসলিম ভোটারদের উপর সম্ভাব্য হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি রোধকল্পে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তা নিয়ে কমিশন সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকবে।

(১৪) কমিশন প্রয়োজনে ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগী সম্প্রদায়ের রিট মামলা বা অন্যান্য ধরনের মামলা করতে পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কমিশনের প্রধান, কার্যনির্বাহী এবং সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা চেয়ারম্যান নামে পরিচিত হবেন, যিনি হবেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সমমর্যাদার।

কমিশনের একটি উপদেষ্টা মন্ডলী (অবৈতনিক) থাকবে, যার সদস্যরা কমিশনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সব সংগঠন কাজ করছে তাদের প্রতিনিধিরা সহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি এবং স্বরাষ্ট্র, আইন ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিও থাকবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানের নিচে থাকবেন দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং তার নিচে থাকবেন ৫জন কমিশনার। কমিশনে পাঁচজন পরিচালক থাকবেন, প্রত্যেক পরিচালককে সহায়তা করবেন একজন উপ-পরিচালক।

কমিশনের সচিব হবেন সরকার মনোনীত এক ব্যক্তি যার অধীনে বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

পরিচালকবৃন্দ

পরিচালকগণ কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। ৫ জন পরিচালককে ৫টি ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। তারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে কমিশনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। কমিশনের নিকট থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তারা অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগীদের বক্তব্য গ্রহণ ও রেকর্ড করে তা কমিশনে প্রদান করবেন। তারা তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলি কমিশনের নজরে আনবেন। তারা গবেষণা কর্মকর্তাদের তথ্যউপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা যোগাবেন। এছাড়াও কমিশনের নির্দেশে তারা বিভিন্ন ঘটনা তদন্ত করে তদন্তের প্রতিবেদন কমিশনে উপস্থাপন করবেন।

সচিব

সরকার এমন এক ব্যক্তিকে সচিব পদে নিয়োগ দেবেন যিনি হয় কর্মরত জেলা জজ বা সমপর্যায়ের বিচারিক কর্মকর্তা অথবা একজন উপসচিব অথবা ঐ সমস্ত একটি পদে অতীতে কর্মরত ছিলেন। কমিশনের সমস্ত রেকর্ড রক্ষা করা হবে তার দায়িত্ব। তাছাড়া চেয়ারম্যান এবং কমিশনারবৃন্দের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কর্মসূচি (ভ্রমণ কর্মসূচিসহ) সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যার মধ্যে থাকবে– প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবহিত করার দায়িত্ব।

গবেষণা বিভাগ

কমিশনে একটি গবেষণা বিভাগ থাকবে যার গবেষক সংখ্যা নির্ধারণ করবে কমিশন। সরকারের অনুমোদনক্রমে কমিশন গবেষকদের নিয়োগ করবেন এবং গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। গবেষকগণ প্রতিনিয়ত তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যউপাত্ত কমিশনে প্রদান করবেন।

অন্যান্য ক্ষমতা

কমিশনের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন আইনী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা– যথা রিট বা অন্য ধরনের মামলায় সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ, এজাহার দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা, কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন দলিল বা তথ্য তলবের সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কমিশন তলবকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, যে ক্ষমতা ভারতীয় কমিশনকে দেওয়া হয়েছে এবং যে ক্ষমতা দুর্নীতি দমন কমিশনেরও রয়েছে। আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে কমিশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

জনবল

সরকারের অনুমোদনক্রমে জনবল নির্ধারণ করবে কমিশন। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদগুলি বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন।

১. একাধিক কম্পিউটার প্রোগ্রামার
২. একাধিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
৩. একাধিক গবেষণা কর্মকর্তা
৪. প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার অপারেটর
৫. প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টেনোগ্রাফার
৬. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিগত সহকারী
৭. হিসাবরক্ষক এবং হিসাব সহকারী
৮. ফটোকপি অপারেটর
৯. একাধিক স্থির ও ভিডিও গ্রাহক
১০. প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রহরী ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামো

<table>
<tr><td colspan="3">চেয়ারম্যান</td><td colspan="3">উপদেষ্টা পরিষদ (অবৈতনিক)</td></tr>
<tr><td colspan="3">ভাইস চেয়ারম্যান</td><td colspan="3">ভাইস চেয়ারম্যান</td></tr>
<tr><td>কমিশনার</td><td>কমিশনার</td><td>কমিশনার</td><td>কমিশনার</td><td colspan="2">কমিশনার</td></tr>
<tr><td>পরিচালক
উপ-পরিচালক</td><td>পরিচালক
উপ-পরিচালক</td><td>পরিচালক
উপ-পরিচালক</td><td>পরিচালক
উপ-পরিচালক</td><td colspan="2">পরিচালক
উপ-পরিচালক</td></tr>
<tr><td colspan="6">সচিব</td></tr>
</table>

কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ সরকারি অনুমোদনক্রমে পরিচালক ও উপপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদের নিয়োগ দেবেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কমিশনের কার্যালয়

কমিশনের সদর দফতর থাকবে রাজধানী ঢাকায়। ভুক্তভোগীদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য পর্যায়ক্রমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কমিশনের দফতর স্থাপন করতে হবে ।

(বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক)
উপদেষ্টা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

১৭
সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিএনপির মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নির্মূল কমিটির বিবৃতি

বিএনপির সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আজ সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের এক বিবৃতিতে বলা হয়–

'১০ ডিসেম্বর বিএনপির এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেছেন 'বিএনপি কখনও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করেনি।... বিএনপির আমলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে.... বরং সংখ্যালঘুদের উপর আওয়ামী লীগ আমলে যত নিপীড়ন হয়েছে, তা আর কখনও হয়নি' ইত্যাদি। আমরা বিএনপি নেতার এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করছি।

'২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং পরবর্তী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি-জামায়াত জোট বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধী দলের নেতাকর্মী, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের উপর যে নৃশংস নির্যাতন,

হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এর কোনও নজির নেই। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রথম ১৫০০ দিনের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সম্পর্কে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত তিন খন্ডের শ্বেতপত্রে প্রায় তিন হাজার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে উচ্চতর আদালতের নির্দেশে গঠিত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর কমিশনের শ্বেতপত্রে ২০০১-২০০৬ সালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের প্রায় দশ হাজার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রতিবেশি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল যাদের ভেতর আড়াই লক্ষের অধিক পরবর্তীকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে, যে সব ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেছে বর্তমান সরকার তা অস্বীকার না করে দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

'বিএনপির সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভুক্তভোগী পূর্ণিমা, আদুরি, রাধারাণী সহ শত শত নারী এখনও বেঁচে আছেন সাক্ষী দেয়ার জন্য। নির্যাতন করে সে ঘটনা অস্বীকার করা আরও বড় অপরাধ, যা নির্যাতকদের অধিকতর নির্যাতনে উৎসাহিত করে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা বিএনপি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি– সাহাবুদ্দিন চুপ্পু কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, কর্ণেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), ডাঃ আমজাদ হোসেন, সমাজকর্মী নূরজাহান বোস, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, সাংবাদিক চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, সমাজকর্মী খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, ড. ফরিদা মজিদ, সমাজকর্মী আরমা দত্ত, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, সমাজকর্মী আক্কাস হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, সাংবাদিক ফজলুর রহমান, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সমাজকর্মী সরদার জাকির হোসেন খসরু, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট দীপক ঘোষ,

সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্লাহ, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, সমাজকর্মী মোঃ আমিনুর জামান রিংকু, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী পূর্ণিমা রাণী শীল, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল প্রমুখ

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯

১৮
আহমদীয় সম্প্রদায়ের শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে ফেলার নিন্দা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কবর থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের শিশুর লাশ তুলে ফেলার পৈশাচিক ঘটনার নিন্দা করেছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মানবাধিকার নেতা বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি লেখক, চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবির। ১১ জুলাই, ২০২০ এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃদ্বয় বলেন–

'আজ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দাফনের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের এক শিশুর মরদেহ কবর থেকে তুলে ফেলার সংবাদ আমাদের অত্যন্ত ব্যথিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ করেছে। আমরা এই পৈশাচিক অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবি করছি।

'আমরা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করছি '৭১-এর গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের উগ্র মৌলবাদী সহযোগীরা জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির হত্যা ও সন্ত্রাসের দর্শন বাস্তবায়নের জন্য আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বার বার হামলা চালাচ্ছে, তাদের হত্যা করছে, ঘরবাড়ি ও মসজিদ ধ্বংস করছে; অথচ এসব নৃশংস অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং দেশের ভেতর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সহ নাগরিকদের বিভিন্ন ফোরাম থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ ও নিন্দাজ্ঞাপনের পরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। যার ফলে মওদুদিবাদী, ধর্মব্যবসায়ী, মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা করোনাকালের এই ঘোর দুর্দিনে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের একজন হওয়ার কারণে কবর থেকে শিশুর লাশ তুলে ফেলার মতো ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাণ্ড করতে উৎসাহী হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন এই ঘৃণ্য অপরাধীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে যেভাবে তথাকথিত সালিশের নামে অপরাধের ঘটনা চাপা দিয়ে অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছে তা মানবাধিকারের গুরুতর লংঘন এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী। এর আগে গোপালগঞ্জে নিখিল তালুকদার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এভাবে সালিশের নামে ধামাচাপা দিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা একই ধরনের অপরাধ করেছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর সংঘটিত এ ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকে ক্রমাগত

প্রশ্রয় দেয়া হলে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অপরাধকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে, যা অপরাধীদের অধিকতর অপরাধে প্ররোচিত করবে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করবে।

'আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সংবিধানপ্রদত্ত সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ব্যর্থতা ও অবহেলার বিষয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এ ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত ও ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসী নাগরিকদের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত করা হলে অন্তিমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি যে কলঙ্কিত হয়– এ বিষয়টি সরকার ও প্রশাসনকে সব সময় মনে রাখতে হবে।'

ঢাকা, ১১ জুলাই ২০২০

১৯
জাতীয় জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে পোশাকবিধি নির্ধারণে ফতোয়াবাজীর তীব্র নিন্দা

জাতীয় জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য পোশাকবিধি নির্ধারণ করে উগ্র মৌলবাদী বিজ্ঞপ্তি জারি করায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডাঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিমের ফতোয়াবাজির তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আজ সংগঠনের এক বিবৃতিতে বলা হয়– 'জাতীয় জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পরিচালক ডাঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম মুসলিম নারীদের জন্য 'হিজাব' সহ টাকনুর নিচে পোষাক পরিধান এবং পুরুষদের জন্য টাকনুর ওপরে পোষাক পরিধানের জন্য বিজ্ঞপ্তির নামে যে ফতোয়া জারি করেছেন আমরা তার প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি। পত্রিকান্তরে আমরা দেখেছি এই ব্যক্তি নারীদের হিজাব না পরাকে অশালীন ও কবিরা গুনাহ বলেছেন। বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে নারীরা কখনও অশালীন পোষাক পরেন না। এমনকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার, বিরোধী দলের নেতা, ফার্স্ট লেডী কিংবা মন্ত্রিপরিষদের নারী সদস্যরা যে পোষাক পরেন তা শুধু সর্বোচ্চ শালীনই নয়, আবহমান বাংলার শালীন সংস্কৃতির অন্তর্গত। পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হক এবং আফগানিস্তানে বিন লাদেন ও মোল্লা উমরদের সন্ত্রাসী তালেবান আল কায়দারা ক্ষমতায় গিয়ে আবদুর রহিমের মতো পোষাক বিধি জারি করে ফতোয়া দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

'বাংলাদেশের একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ইসলামের দোহাই দিয়ে যেভাবে সন্ত্রাসী তালেবান, আল কায়দা ও আইএস-এর পোষাকবিধি তার অধিদপ্তরে জারি করেছেন তা শুধু সংবিধান বা আদালত অবমাননা নয়, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জল ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপনের সমতূল্য অপরাধ। জনরোষের আশঙ্কায় এই ব্যক্তি তার প্রজ্ঞাপনজারির কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে তড়িঘড়ি ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি নিছক প্রতারণামূলক। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের আমলে যেভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির মৌলবাদীকরণ, সাম্প্রদায়িকরণ তথা পাকিস্তানীকরণ হয়েছে, যেভাবে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বাধীনতাবিরোধী, গণহত্যাকারী জামায়াতি মওদুদিবাদী ও ওহাবিবাদীরা অনুপ্রবেশ করেছে– সরকারি বিজ্ঞপ্তির নামে উপরোক্ত ফতোয়া তারই একটি বহিঃপ্রকাশ।

'আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই উগ্র মৌলবাদী, ওহাবিবাদী কর্মকর্তার অবিলম্বে চাকরি থেকে অপসারণ এবং ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক, ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), ডাঃ আমজাদ হোসেন, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, ড. ফরিদা মজিদ, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গফফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, এডভোকেট দীপক ঘোষ, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক সাব্বির খান, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্যাহ, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, কবি দিব্যেন্দু দ্বীপ, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী পূর্ণিমা রাণী শীল, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল প্রমুখ।

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০২০

২০
লালমনিরহাট ও মুরাদনগরের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং নিহত ও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে নির্মূল কমিটি

আজ ৫ নবেম্বর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অজুহাতে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সাম্প্রতিক উত্থান এবং এ বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয় সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের পরিচালনায় সংগঠনের লালমনিরহাট শাখার সভাপতি সমাজকর্মী ময়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), কেন্দ্রীয় সদস্য শহীদসন্তান কথাশিল্পী মুহম্মদ জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামী জোটের সভাপতি হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান, নির্মূল কমিটি চিকিৎসা সহায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডাঃ মামুন আল মাহতাব, কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার তুরিন

আফরোজ, কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, নির্মূল কমিটির সুইজারল্যান্ড শাখার সভাপতি সমাজকর্মী রহমান খলিলুর, ফিনল্যান্ড শাখার আহ্বায়ক সমাজকর্মী মুজিবুর দফতরী, ফ্রান্স শাখার আহ্বায়ক চলচ্চিত্রনির্মাতা প্রকাশ রায়, অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি মানবাধিকারকর্মী একরাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, রংপুর শাখার সভাপতি ডাঃ মফিজুল ইসলাম মান্টু, কুড়িগ্রাম শাখার সভাপতি সংস্কৃতিকর্মী জ্যোতি আহমদ, যশোর শাখার সভাপতি সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, দিনাজপুর শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ সাইফুদ্দিন আখতার, নীলফামারী শাখার সভাপতি শিক্ষাবিদ মমতাজ উদ্দিন, কুমিল্লা শাখার আহ্বায়ক অধ্যাপক দিলীপ মজুমদার, সিলেট শাখার আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী, ঠাকুরগাঁও শাখার সাধারণ সম্পাদক সমাজকর্মী সুচরিতা দেব, বগুড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সমাজকর্মী এটিএম রাশেদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সমাজকর্মী কাজী মুকুল প্রমুখ।

সূচনা বক্তব্যে নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, লালমনিরহাটের পাটগ্রামে কোরান অবমাননার গুজব রটিয়ে শহীদুন্নবী জুয়েলকে পুড়িয়ে হত্যা করা কিংবা কুমিল্লার মুরাদনগরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ফেসবুকে শেয়ার করার অপরাধে নিরীহ হিন্দুদের উপর হামলা ও গৃহে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন কিংবা নির্বাচনকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভের পর থেকেই জামায়াত-হেফাজত-বিএনপি যখনই কোনো অজুহাত পাচ্ছে কিংবা নিজেরা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে শুধু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, তাদের অপছন্দের মানুষদের ওপর হামলা ও হত্যা, গৃহে অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠন সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে বাংলাদেশে উদারনৈতিক ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য এবং বাংলাদেশকে মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান বা জিয়াউল হকের পাকিস্তানের মতো মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বানাবার জন্য। লালমনিরহাট ও মুরাদনগরের ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং হামলাকারীদের পূর্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে জানাবার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির পাটগ্রামের নিহত শহীদুন্নবী জুয়েলের পরিবার এবং মুরাদনগরে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভিকটিমদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, সম্প্রতি মুরাদনগরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর এবং উপসনালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় প্রশাসন নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করেছে, এমনকি হামলাকারীদের মদদ দিয়েছে। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম পুরুষ কর্মকর্তাদের পায়ের গোড়ালির উপর পোষাক পরা এবং নারী কর্মকর্তাদের হিজাব সহ পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত কাপড় পরার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন– বিষয়টিকে বিচারপতি মানিক ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। আব্দুর রহিমকে শুধু ও.এস.ডি বা বহিষ্কার করলে হবে না তার ফৌজদারি আইনে বিচার হতে হবে বলে দাবী করেছেন সাবেক এই বিচারপতি।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বলেন, ধর্ম ও ধর্মান্ধতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী এর ফায়দা লুটছে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে দিয়ে এমন বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মৌলবাদী জামায়াত-শিবির চক্র ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে। যে কারণে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। যে কোনো মূল্যে আমাদের মৌলবাদীদের প্রতিহত করতে হবে।

নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা কথাশিল্পী মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'সৃষ্টিকর্তা সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না' এবং 'যে একজন ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করল সে

যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল।' এই কথাটি পবিত্র কোরানে সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ আছে। অথচ ধর্মান্ধরা ধর্মগ্রন্থ ভাল করে না পড়ে নিরীহ মানুষকে বর্বরভাবে হত্যা করছে।

নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, লালমনিরহাটে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে মৌলবাদীরা বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে। আজকে যদি একজন মুসলমানকে নির্মমভাবে আগুনে পুড়ে মরতে হয় তাহলে আমাদের দেশের যে সমস্ত সংখ্যালঘুরা আছে তাদের কী অবস্থা হতে পারে তা ভাবাই দুষ্কর।

হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান বলেন, কোরানে কোথাও ইসলাম ও নবীর বিদ্রুপকারীদের জাগতিক শাস্তির বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়নি বরং এর জন্য আল্লাহ পাক নিজেই বিদ্রুপকারীদের শাস্তি দেবেন বলে উল্লেখ আছে।

নির্মূল কমিটি ফ্রান্স শাখার আহ্বায়ক প্রকাশ রায় বলেন, বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলাম যেভাবে ফ্রান্স বিরোধী আন্দোলন করছে এতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তো ক্ষুণ্ন হচ্ছেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের বিশেষ করে ফ্রান্সে অবস্থানরত প্রবাসীদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে এবং প্রবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ঢাকা, ০৫ নবেম্বর, ২০২০

২১
বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনে বাধা এবং ভাঙার হুমকির তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য অপসারণের নামে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুমকির তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৫ নবেম্বর ২০২০ সংগঠনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করা হয়:

'আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনে বাধাপ্রদান এবং স্থাপিত ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার ভয়ঙ্কর হুমকি দিয়েছে চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। গত ১৩ নবেম্বর করোনাকালীন যাবতীয় বিধিনিষেধ লংঘন করে তারা যেভাবে গেন্ডারিয়ার ধূপখোলার মাঠে সমাবেশ করেছে এবং যে ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিষোদগার করেছে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতাতুল্য অপরাধ হলেও এখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কিংবা সরকারদলীয় কোনও প্রতিবাদ আমাদের নজরে পড়েনি। হেফাজত-জামায়াত-বিএনপির মদদপুষ্ট তথাকথিত 'তৌহিদী জনতা ঐক্যপরিষদে'র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানবিরোধী ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির তীব্র নিন্দার পাশাপাশি আমরা মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির এহেন রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অবস্থানের জন্য সরকারেরও নিন্দা করছি।

'মওদুদিবাদী, ওহাবিবাদী মোল্লাদের কেবলা পাকিস্তান ও সৌদি আরব সহ সকল মুসলিমপ্রধান দেশেই ভাস্কর্য আছে, যা নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ইতিহাসের মহানায়কদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের স্মারক। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার প্রাণকেন্দ্রে হিন্দু পৌরাণিক চরিত্রের ভাস্কর্য রয়েছে, যেগুলোকে পৌত্তলিকতা বা মূর্তি আখ্যায়িত করে অপসারণের ধৃষ্টতা কখনও সে দেশের কট্টরপন্থীরা প্রদর্শন করেনি। বাংলাদেশে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কখনও প্রশ্রয়ের কারণে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরেধী এবং সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ড

পরিচালনা করছে তাতে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'শূন্য সহিষ্ণুতা'র ঘোষণা অচিরেই প্রহসনে পরিণত হবে। যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনে বাধা দিচ্ছে এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছে এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে– আমরা দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় আশঙ্কা করছি, যা আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে।

'করোনা মহামারীকালে যে কোনও অজুহাতে আমরা সব রকম প্রকাশ্য জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। যারা স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে না তাদের শাস্তির উদ্যোগও প্রশাসনকে নিতে হবে।

'আমরা আবারও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগীরা সাংবিধানিকভাবে ধর্মের নামে হত্যা, সন্ত্রাস ও হিংসা-বিদ্বেষের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক, ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), ডাঃ আমজাদ হোসেন, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, ড. ফরিদা মজিদ, এডভোকেট খন্দকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী, অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, ডাঃ মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, এডভোকেট দীপক ঘোষ, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক সাব্বির খান, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্যাহ, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, কবি দিব্যেন্দু দ্বীপ, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী পূর্ণিমা রাণী শীল, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল প্রমুখ।

ঢাকা, ১৫ নবেম্বর, ২০২০

২২
কুমারখালীতে বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার নিন্দা

কুমারখালীর কয়ায় বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক শহীদ বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আজ সংগঠনের সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়–

'১৭ ডিসেম্বর ২০২০ রাতে মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা কুমারখালীর কয়া গ্রামে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক শহীদ বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্মস্থানে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক স্থাপিত আবক্ষ ভাস্কর্যটির মুখমণ্ডলের একটি অংশ ভেঙে ফেলেছে। বিএনপি-জামায়াতের মদদে হেফাজত-খেলাফতের জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতারা সারা দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার হুমকি দিয়ে যেভাবে ওয়াজের নামে সন্ত্রাস ও উন্মাদনা ছড়াচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় কুমারখালীতে অগ্নিযুগের এই বিপ্লবীর ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা অবিলম্বে ভাস্কর্য ভাঙার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের এবং এদের প্ররোচক ও নির্দেশদাতাদের গ্রেফতার এবং বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), যিনি বাঘা যতীন নামে খ্যাত, জন্মগ্রহণ করেছেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর কয়া গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। ছাত্রজীবনেই তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তির শপথ গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে উড়িষ্যার বালাশোরে শহীদ হন।

বিপ্লবী বাঘা যতীনের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "আমরা মরব, দেশ জাগবে"। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তাঁর মহান আত্মত্যাগ যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের তরুণ সমাজকে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তরুণদের এই আত্মদান অনিবার্য করেছে নৃশংস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিজয়ে।

'সংবিধানের ২৪ ধারায় ভাস্কর্য সহ বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির 'ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু ও স্থানসমূহ বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ' থেকে রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেয়া হলেও সরকার এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা সংবিধানের ২৪ ধারা লংঘনকারী ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার জন্য নতুন আইন প্রবর্তনেরও দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় সারা দেশে ভাস্কর্য ভাঙার পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা আমাদের কয়েক হাজার বছরের গৌরবের ইতিহাস ও সম্প্রীতির যাবতীয় নিদর্শন 'ইসলামবিরোধী' ফতোয়া দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে বাংলাদেশকে মোল্লা উমরের আফগানিস্তান বা জিয়াউল হকের পাকিস্তান বানাবে। এভাবেই তারা '৭১-এর শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তির আওতায় না এনে সরকার যদি এদের সঙ্গে কোনও ধরনের সমঝোতার পথ গ্রহণ করে– তা দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।'

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

২৩
সুনামগঞ্জে হিন্দুদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ হেফাজতের জঙ্গি সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি

সুনামগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হেফাজতে ইসলামীর জঙ্গি মৌলবাদীদের সন্ত্রাসীদের সাম্প্রদায়িক হামলার তীব্র নিন্দা করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৮ মার্চ ২০২১ সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়–

'গণমাধ্যমে সুনামগঞ্জের শাল্লা ও দিরাই উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে মাইকে ঘোষণা দিয়ে শতাধিক বাড়িতে হামলা, মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। স্বাধীনতার মাসে মুক্তিযুদ্ধের আত্মস্বীকৃত বিরোধিতাকারী

মৌলবাদী দুর্বৃত্তদের এ ধরনের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা করি। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশের পর হেফাজত নেতা মামুনুল হকের বিরুদ্ধে জনৈক ঝুমন দাসের ফেইসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট দেয়ার কারণে হেফাজতের লোকজন এই হামলা চালিয়েছে, যদিও পুলিস হামলার আগেই ঝুমন দাসকে গ্রেফতার করেছে। এই হামলা থেকে হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ মজুমদারের বাড়িও রেহাই পায় নি।

'মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে হেফাজত নেতারা বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান মিত্র ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার পাশাপাশি সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে তারা আবারও প্রমাণ করেছেন তাদের শীর্ষ নেতারা '৭১-এ যেভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করতে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন এবং বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গঠন করে ইসলামের নামে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিলেন, এখনও তারা একই অবস্থানে রয়েছেন। মামুনুল হক ও বাবুনগরী সহ হেফাজতে ইসলামের মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতাকর্মীরা ২০১৩ সালে রাজধানীর মতিঝিলে কী ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়েছিলেন তা আমরা ভুলে যাইনি। এখনও তারা ওয়াজের নামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতের অনুসারী সহ নির্মূল কমিটির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে চরম উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান করে ধর্মের নামে যেভাবে মানুষকে উত্তেজিত করে দেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছেন এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েক ডজন মামলা করা যায়।

'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সংবিধানবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সন্ত্রাসী বক্তব্যের জন্য হেফাজত নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে হেফাজতের সমালোচনাকারীদের যেভাবে গ্রেফতার করছে তা ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের মূল্যে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে কখনও মেনে নেয়া যায় না।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম ও তাদের সহযোগীদের নিন্দনীয় অবস্থান এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদানের প্রেক্ষিতে এসব দলের সকল সমাবেশ অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার জন্য আমরা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সুনামগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং ভুক্তভোগীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি।'

স্বাক্ষরদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, কথাশিল্পী ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক, নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আলমগীর সাত্তার বীরউত্তম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ আমজাদ হোসেন, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, কথাশিল্পী মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, ড. ফরিদা মজিদ, চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গাফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর

রহমান, সাবেক ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, অধ্যাপক ডাঃ মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, এডভোকেট দীপক ঘোষ, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক সাব্বির খান, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্লাহ, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, এডভোকেট আবদুল মালেক, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট মালেক শেখ, সাংবাদিক দিব্যেন্দু দ্বীপ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী পূর্ণিমা রাণী শীল, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল, লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা শাকিল রেজা ইফতি, সমাজকর্মী শরিফুল হাসান সুমন প্রমুখ।

ঢাকা, ১৮ মার্চ, ২০২১

২৪
হেফাজতে ইসলামকে জঙ্গি সংগঠন ঘোষণার দাবি জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশকে জঙ্গি সংগঠন ঘোষণার দাবি জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টোনি ব্লিঙ্কেন-এর নিকট স্মারকলিপি পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ছয়টি সংগঠন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক শাখা, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ইউএসএ কমিটি ফর সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র শাখা, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটারেনস যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দ যদিও এই সংগঠনকে একটি ধর্মীয় সংগঠন দাবি করে, কিন্তু তাদের সকল কর্মকাণ্ড জঙ্গি সংগঠন তালেবান এবং আইসিস-এর মত। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ধর্মের নাম করে তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ দেশব্যাপী নারী বিরোধী, সংখ্যালঘুবিরোধী এবং স্বাধীনতাবিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশব্যাপী বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং তারও কিছুদিন পূর্বে সিলেটের সুনামগঞ্জের শাল্লা পাড়ায় সংখ্যালঘুদের উপরে সন্ত্রাসী হামলার বিস্তারিতও এই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংগঠনগুলোর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টোনি ব্লিঙ্কেন-এর কাছে জানানো হয়, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ মৌলবাদী সংগঠনটিকে যদি জঙ্গি সংগঠন ঘোষণা দিয়ে দ্রুত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে এই সংগঠনটি ধর্মের আড়ালে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠে শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও বিপদজনক হয়ে উঠবে। উপরোল্লিখিত ছয়টি সংগঠনের পক্ষে স্মারকলিপিটি পাঠান একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ নুরুন নবী। (স্মারকলিপির ইংরেজি কপিটি সংযুক্ত করা হল।)

(স্মারকলিপির সংযুক্ত ইংরেজি কপি)

April 7, 2021

To,
Antony John Blinken
Secretary of State
U.S. Department of State
Washington, D.C. 20520
Secretary@state.gov

Honorable Secretary Blinken,

We, the undersigned Bangladeshi Americans organizations, urge that the U.S. Department of State declare Hefazat-e-Islam Bangladesh as a terrorist outfit. Hefazat-e-Islam was founded in 2010 based on the support from the vast majority of the Quami madrassas and their students. The Islamic outfit claims itself to be a non-political Islamic Advocacy group. But its ideology and activities are reminiscent of those of the Taliban and ISIL. Like Taliban (means students), it is a conglomerate of Wahabi-Salafist radical Sunni clerics. It has been slowly gaining strength as a political force since its formation in 2010. Its headquarter, the Hathahazari Madrassa in Chittagong, has been alarmingly transformed as a fortress similar to the Lal Mosque, Islamabad, Pakistan.

Hefazat-e-Islam came in prominence through its 13 points charter of demand. A review of its charter 13-point demand and its history of violence against women, minorities, and cultural and historical sites would show that Hefazat has been emulating the Taliban's success while exploiting the fractious political environment to turn Bangladesh into a monolithic Islamic theology. Hefazat-e-Islam's current strategy seems to wear down and destabilize the Bangladesh government by resorting to surprise violence, then going into hiding, and reappearing with more severe violence.

To illustrate few violent activities of Hefazat-e-Islam, let us start with the most recent spate of violence on the eve of the 50th anniversary of Bangladesh's Independence. On March 26, 2021, Hefazat-e-Islam went on a country-wide rampage during its protest against Indian Prime Minister Narendra Modi's visit. Hefazat activists burnt and destroyed many historical sites and public and private properties, including the Ustad Allaundin Khan Music School at Shibpur, Brahmanbaria, built on Ustad's ancestral home. Ustad Allauddin Khan is considered "the most notable music teacher of the 20th century in Indian classical music". The attack destroyed many historical documents and artifacts commemorating Ustad's life-long works in music. Hefazat activists also burnt and destroyed many Hindus and secular activists' houses and scores of government properties that include the City's central rail station. The violence cost the lives of about ten people and injured hundreds.[1]

Only a few days ago, on March 17, 2021, hundreds of supporters of Mamunul Haque, the Joint Secretary of Hefazat-e-Islam, attacked, burnt, and destroyed about 70-80 Hindus

1 Hefazat activists go on rampage in Brahmanbaria, attack train. The Financial Times, March 28, 2021. https://thefinancialexpress.com.bd/national/hefazat-activists-go-on-rampage-in-brahmanbaria-attack-train- 1616922127

houses in Shalla Upazila of Sunamganj district in the Sylhet division. The Hefazatis perpetrated the violence on the pretext that one Hindu youth from that village earlier had posted derogatory remarks in social media about Mamunul Haque.[2]

On November 13, 2020, in a public gathering, Mamunul Haque demanded that the proposed installation of the statue of Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, be stopped as the statue being against the value of Islam. He threatened that any installed statue would be dug out and thrown into the river. Following his threat, the Hefazat activities started defacing the historical statues and monuments across the country. One such defaced statue was Bagha Jatin's, an Indian freedom activist who had fought against the British occupation of the Indian Subcontinent and later died.

Hafezat's hatred against cultural and historical artifacts is very similar to those of the Taliban and ISIL. For instance, same as the Taliban, which destroyed 1600 years old Buddhas of Bamiyan, and the ISIL, which destroyed 2100 years old Temple of Bel in Palmyra and other thousands of years of other archeological sites, Hefazat-e-Islam has constantly been threatening to demolish public displays of statues.

They were successful in forcing the Bangladesh government to remove the statue of the 'Lady Justice' from the Supreme court premise in 2017.[3], [4]

Like Taliban and ISIL, Hefazat-e-Islam is also vehemently opposed to the rights of women, minorities, and the freedom of speech. All these oppositions are clearly manifested in Hefazat's charter of 13 point demand, which was crafted as a retaliation to the 'National Women Development Policy 2011' (NWDP). The NWDP was "*intended to create an appropriate political and socioeconomic structure to ensure the overall development of women. It provides for setting aside one-third of parliamentary seats for women and arranging direct election to the reserved seats, and appointing women to the government's Cabinet Division and other policy-making positions. The policy also provides for adoption of a law for five months of maternity leave to working women*. The NWDP was ratified in the Bangladesh Parliamnet in 2011.[5]

The review of Hefazat's charter of 13-point demand would indicate that Hefazat demands the scrapping of the NWDP and the restriction of freedom of speech and liberties. For instance, eight of the demand include[6],

- enactment of an anti-blasphemy law with provision for the death penalty
- exemplary punishment to all bloggers and others who "insult Islam"

2 Hefazat-e-Islam followers attack Hindu houses in Sunamganj, Dhaka Tribune, March 17, 2021. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/03/17/hefazat-e-islam-followers-ransack-hindu- houses-in-sunamganj

3 Bangladesh Islamists protest court's Greek goddess statue. February 24, 2017. https://www.strait- stimes.com/asia/south-asia/bangladesh-islamists-protest-courts-greek-goddess-statue

4 Statue of Woman Removed From Bangladesh!s Supreme Court. New York Times. May 26, 2017.

5 National Women Development Policy (2011). Government of the People!s Republic of Bangladesh. https://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/policies/64238d39_0ecd_4a56_b00c_b834cc54f88d/National-Women%20Development%20Policy-2011Eng- lish.pdf

6 Hefazat-e Islam: Islamist coalition by Sabir Mustafa, BBC, May 6, 2013 https://www.bbc.com/news/world-asia-22424708

- cancellation of the country's women development policy
- a ban on erecting sculptures in public places
- a ban on mixing of men and women in public
- a ban on candlelit vigils
- ending what they call "shameless behaviour and dresses"
- declaring the reformist Ahmadiyas as "non-Muslims".

On April 6, 2013, Nadia Sharmeen, along with few other journalists, was brutally attacked and severely beaten up by the activities of Hefazat-e-Islam while reporting on the outfit's agitation program demanding the implementation of 13-point demand. Ms. Sharmeen had survived the attack and was later honored with the 2015 U.S. Secretary of State's International Women of Courage Award.[7]

The partners of the Hefazat include leaders of the radical Islamic outfits, who had organized massive protests in the 90s forcing Writer Taslima Nasreen into exile and have frequently demanded that Ahmadiyas Muslims be declarednon-Muslims.

As it appears from its 13-point demand, violence against women, minorities, and cultural and historical sites, Hefazat has been emulating the Taliban's success and exploiting the fractious political environment to turn Bangladesh into a monolithic Islamic theology which is worrisome. Hefazat-e-Islam is engaged in the war of attrition. Its current strategy seems to destabilize the Bangladesh government by resorting to surprise violence, going into hiding temporarily, and then reappearing with more severe violence.

Unless stopped, Hefazat would undoubtedly appear as an anti-freedom monolithic terrorist organization like ISIL and Taliban, eventually destabilizing entire South Asia and posing a new national security threat for the United States.

Under the above circumstances, we urge you to take necessary actions as soon as possible to safe guard the national security threat for the United States of America.

Sincerely,

1. USA Bangabondhu Parishad
   Dr. Nuran Nabi, President, email: nurannabi@gmail.com, Tel : 609 529 5065
   Rafayet Choudhury, Acting General Secretary, Tel: 347 387 2122
2. USA Committee for Secular and Democratic Bangladesh
   Dr. Nuran Nabi, President, email: nurannabi@gmail.com, Tel : 609 529 5065
   Prof. ABM Nasir, Advisor, Email: nasnc@yahoo.com
   Zakaria Choudhury, General Secretary, Tel: 917 514 4641
3. Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971, New York
   Fahim Reza Noor, President, Tel: 646 270 0676
   Shikrity Barua, General Secretary, Tel:646 629 4281
4. Bangabandhu Foundation, USA Chapter
   Dr. Mansur Khandker, President, Tel: 443-690-6067
   Md Abdul Kader Miah, General Secretary, Tel: 917-306-8831 Lovlu Ansar, Communication Director, Tel: 347-623-7137
5. Sector Commanders Forum, USA chapter Rashed Ahammed, President
   Tel: 718-316-1948 Rezaul Bari, General Secretary, Tel: 917-756-7953

[7] International Federation of Journalists (IFJ), 9 April 2013. https://ifex.org/journalists-assaulted-in-day- long-political-protests-in-bangladesh/

6. Bangladesh Liberation War Veterans, USA
   Golam Mostafa Khan Miraz, President, Tel: 718-559-2322 Mohammed Faruq Hossain, General Secretary, Tel: 929-431-5127

Copies:
Senate Committee on Foreign Relations, Chair: Senator Bob Menendez House Foreign Affairs Committee, Chair, Congressman Gregory Meeks Bangladesh Embassy in WDC, Ambassador M Shahidul Islam
US Embassy in Bangladesh, Ambassador Earl R. Miller

ঢাকা, ০৯ এপ্রিল, ২০২১

২৫
বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশনের প্রথম সভা

১২ এপ্রিল ২০২১ সকাল ১১টায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সংসদের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী বিষয়ক ককাসের যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বানচালে হেফাজত-জামায়াতের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্ত কমিশনে'র প্রথম সভা নির্মূল কমিটির মহাখালীস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কমিশনের সদস্য রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেনন এমপি, রাজনীতিবিদ হাসানুল হক ইনু এমপি, রাজনীতিবিদ ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, ব্যারিস্টার ডঃ তুরিন আফরোজ (সদস্য সচিব), সমন্বয়কারী কাজী মুকুল এবং সচিবালয়ের সদস্য: শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সাংবাদিক আবু সালেহ রনী, সাংবাদিক খায়রুল আলম, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সমাজকর্মী সাইফ রায়হান, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ, সমাজকর্মী মোঃ সাইফউদ্দিন রুবেল ও সমাজকর্মী তপন দাস উপস্থিত ছিলেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে কমিশনের অন্যতম সদস্য সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

কমিশনে আরও চারজন সদস্য কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়েছে। এরা হচ্ছেন– ১) অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ২) শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক মমতাজ লতিফ, ৩) শিক্ষাবিদ ও কথাশিল্পী মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং ৪) ইসলামী চিন্তাবিদ হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. এই কমিশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সারা দেশে যে সন্ত্রাসী তাণ্ডব পরিচালনা করেছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়াজের নামে জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত ও ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান করেছে তা মাঠপর্যায়ে তদন্ত করে শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করবে।

২. তদন্তের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তদন্ত কমিশন 'হেফাজত-জামায়াতের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ৪০০ দিন' প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করেছে তা অনুসরণ করা হবে।

৩. দ্রুত তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিশনের সচিবালয়ে সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রাম থেকে আরও স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও আইনজীবীদের যুক্ত করতে হবে।

৪. সারা দেশে ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ওয়াজের নামে প্ররোচনা সহ যে সব মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে সে সবের ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনুসন্ধানকারী সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের লিখিত বক্তব্য প্রেরকের নাম ঠিকানা সহ কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়– অর্পণ নিবাস, গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২ এবং ই-মেইল nirmul.committee@gmail.com এ পাঠাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ক) প্রেরিত প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্ভব হলে ছবি, ভিডিও ক্লিপ, ইশতেহার, পোস্টার প্রভৃতি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

খ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মের নামে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার নমুনা পাঠানোর জন্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানকারী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

৫. কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন সুপারিশসহ শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশের সময়সীমা কমিশনের প্রথম সভার পর থেকে ১০০ দিন। আগামী ২২ জুলাই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশনের প্রতিবেদন সরকার ও জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে।

২৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারীবিদ্বেষী, সংবিধানবিরোধী সুপারিশের তীব্র নিন্দা

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত গার্ড অব অনারে নারী কর্মকর্তার উপস্থিতি সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে গতকাল ১৩ জুন ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি যে প্রস্তাব করেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দাজ্ঞাপন করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। এ বিষয়ে ১৪ জুন ২০২১ সংগঠনের কেন্দ্র ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়–

'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত গার্ড অব অনারে সরকারের নারী কর্মকর্তা বা পুলিশ বাহিনীর নারী সদস্যদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি যে সুপারিশ করেছে– গণমাধ্যমে এ বিষয়ে জানতে পেরে আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারীর মর্যাদা ও সমঅধিকার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ মর্যাদার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ধর্মের দোহাই দিয়ে কীভাবে এ ধরনের নারীবিদ্বেষী, মানবাধিকারবিরোধী, সংবিধানবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সুপারিশ করতে পারে তা আমাদের বোধের অতীত। আমরা এই ন্যক্কারজনক প্রস্তাবের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

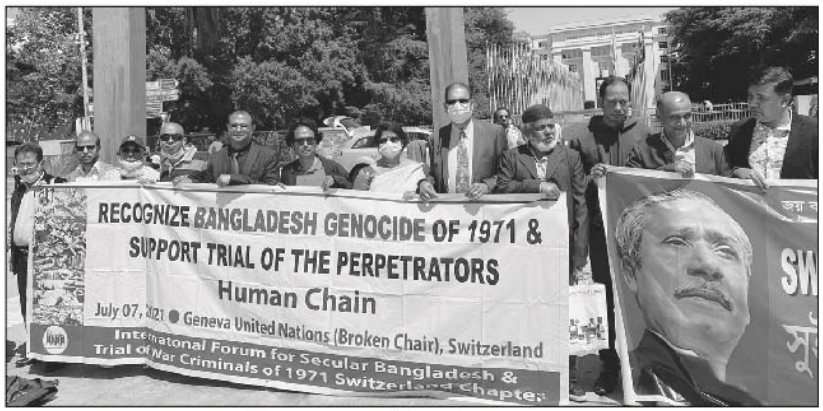
'জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম সহ জঙ্গি মৌলবাদী কোনও ওয়াহাবী, সালাফী, মওদুদীবাদী সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে ইসলামের দোহাই দিয়ে এ ধরনের দাবি জানায় নি। তারা নারী নেতৃত্ব হারাম বলে ফতোয়া দিলেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা মেনে নিয়েছে। সংসদীয় কমিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাজার গার্ড অব অনারে নারীদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি করে মৌলবাদের যে বিষধর সাপকে গর্ত থেকে বের করে আনতে চাইছে এর পরিণতি বর্তমান সরকার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য ভয়াবহ হবে। ওয়াহাবী-মওদুদীবাদীরা মাজার জেয়ারত, মিলাদ শরিফ আয়োজন, নারীশিক্ষা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের মূলনীতি সহ অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে। এদের

একটি দাবিও যদি মানা হয় বাংলাদেশ কালক্রমে মোল্লা উমরের সন্ত্রাসী তালেবানি রাষ্ট্র আফগানিস্তান বা জিয়াউল হকের পাকিস্তানে রূপান্তরিত হবে। আমরা অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানবিরোধী সুপারিশ প্রত্যাহার এবং এ ধরনের নিন্দনীয় আচরণের জন্য তাদের দুঃখ প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে এই ধরনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিও বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।'

বিবৃতিদাতা– বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি শামসুল হুদা, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, লেখক সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, অধ্যাপক অনুপম সেন, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুননবী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, অধ্যাপক ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক, ক্যাপ্টেন (অবঃ) সাহাবউদ্দিন আহমেদ বীরউত্তম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অবঃ), মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ আমজাদ হোসেন, ড. নূরন নবী, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, কলামিস্ট সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ, অধ্যাপক শিল্পী আবুল বারক আলভী, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, ড. ফরিদা মজিদ, অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডাঃ ইকবাল কবীর, মুক্তিযোদ্ধা মকবুল-ই এলাহী চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, এডভোকেট আবদুস সালাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, অধ্যাপক আবদুল গাফ্ফার, কবি জয়দুল হোসেন, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, মুক্তিযোদ্ধা কাজী লুৎফর রহমান, সাবেক জাতীয় ফুটবলার শামসুল আলম মঞ্জু, সমাজকর্মী কামরুননেসা মান্নান, এডভোকেট আজাহার উল্লাহ্ ভূঁইয়া, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাত-ই ফেরদৌসী লাকী, অধ্যাপক ডাঃ মামুন আল মাহতাব, সাংবাদিক শওকত বাঙালি, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা, লেখক আলী আকবর টাবী, সমাজকর্মী চন্দন শীল, এডভোকেট কাজী মানছুরুল হক খসরু, এডভোকেট দীপক ঘোষ, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক মহেন্দ্র নাথ সেন, শহীদসন্তান তৌহিদ রেজা নূর, শহীদসন্তান শমী কায়সার, শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, মানবাধিকারকর্মী তরুণ কান্তি চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক সাব্বির খান, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্লাহ, মানবাধিকারকর্মী স্বীকৃতি বড়ুয়া, এডভোকেট আবদুল মালেক, সাংবাদিক দিব্যেন্দু দ্বীপ, অধ্যাপক সুজিত সরকার, সমাজকর্মী হারুণ অর রশীদ, এডভোকেট মালেক শেখ, সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত, সমাজকর্মী শিমন বাস্কে, সমাজকর্মী শেখ আলী শাহনেওয়াজ পরাগ, সমাজকর্মী সাইফ উদ্দিন রুবেল, লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা শাকিল রেজা ইফতি প্রমুখ।

২৭
'৭১-এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিতে জেনেভায় জাতিসংঘের সামনে নির্মূল কমিটির সমাবেশ ও মানববন্ধন

৭ জুলাই ২০২১, জেনেভায় জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দফতরের সামনে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র কেন্দ্র ও সর্ব ইউরোপীয় শাখার সহযোগিতায় সুইজারল্যাণ্ডের নির্মূল কমিটি বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী মায়ানমারে গণহত্যার শিকার ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে



৭ জুলাই ২০২১ জেনেভায় জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দফতরের সামনে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র কেন্দ্র ও সর্ব ইউরোপীয় শাখার সহযোগিতায় সুইজারল্যাণ্ডের নির্মূল কমিটি বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী মায়ানমারে গণহত্যার শিকার ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

নির্মূল কমিটির সর্ব ইউরোপীয় শাখার সভাপতি তরুণকান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত, সুইজারল্যাণ্ড শাখার সভাপতি খলিলুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় আইটি সেলের সভাপতি শহীদসন্তান আসিফ মুনীর তন্ময়ের সঞ্চালনায় এই সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দেন নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সমাবেশে কায়িকভাবে উপস্থিত থেকে এবং ভার্চুয়ালি বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মানবাধিকার নেতা জুলিয়ান ফ্রান্সিস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি, অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির এমপি লরি ফার্গুসন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, খেমার রুজ ট্রায়ালের কম্বোডিয়ান টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা গণহত্যা বিশেষজ্ঞ ড. হেলেন জার্ভিস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলিম চৌধুরীর কন্যা অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, ভারতের লেখক সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকার, টার্কিশ পেন-এর সাবেক সভাপতি কবি ও নাট্যকার তারিক গুনারসেল, ভারতের জহওরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার ভরদ্বাজ, যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ইরানের মানবাধিকার নেতা বানাফশে যাদ, পোল্যান্ডের মানবাধিকার কর্মী নাটালিয়া সিনায়েভা পাঙ্কোভস্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বায়োমেডিকাল বিজ্ঞানী ড. জেফ মুডি, যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার নেতা ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন, টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ফোরাম ফর হিউম্যানিজম তুরস্ক-এর সভাপতি লেখক চলচ্চিত্রনির্মাতা ফেরহাত আতিক, ফোরাম ফর সেক্যুলার ইজিপ্ট এ্যান্ড মিডল ইস্ট-এর সভাপতি মানবাধিকার নেতা সাংবাদিক মহসিন আরিশি, সুইজারল্যান্ডের আর্থ ফোকাস ফাউন্ডেশন-এর সহসভাপতি নিকোলাস ফুরে, যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত বেলুচ বুদ্ধিজীবী ড. নাসির দাস্তি, ওয়ার্ল্ড সিন্ধি কংগ্রেস-এর সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার নেতা ড. লাকু লুহানা, সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত বেলুচ মানবাধিকার

নেতা মুনির মেঙ্গল, যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত সিন্ধি মানবাধিকার নেতা ডঃ সাগর শেখ, ভারতের ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক প্রিয়জিৎ দেব সরকার, ইংল্যান্ডের মানবাধিকার নেতা ভাল হার্ডিং, পাকিস্তানের মানবাধিকার নেতা তাহিরা আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার নেতা আরিয়াদাসা বিদ্যাসেকারা, যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত পাকিস্তানি মানবাধিকার নেতা আরিফ আজাকিয়া, আফগান ছাত্র নেতা সৈয়দ মশিউল্লাহ হাশিমি, গণহত্যার ভুক্তভোগী ফিলিস্তিনি লেখক আহমেদ শাফি, তুরস্কে আশ্রয়গ্রহণকারী উইগুর গণহত্যার ভুক্তভোগী সাবো কসিমোভা, লাইবেরিয়ার ছাত্র নেতা আবু এস. কামারা, নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. নুরন নবী, সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি এম নজরুল ইসলাম, সর্ব ইউরোপীয় নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার নেতা আনসার আহমদ উল্লাহ, শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির সদস্য ফয়সাল হাসান তানভীর, নির্মূল কমিটির বহুভাষিক সাময়িকী জাগরণের হিন্দি বিভাগের সম্পাদক ভারতের তাপস দাস, নির্মূল কমিটির সুইডেন শাখার সভাপতি মানবাধিকার নেতা আখতার এম জামান, নির্মূল কমিটির ফিনল্যান্ড শাখার সভাপতি ড. মুজিবুর দফতরি, বেলজিয়াম নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার নেত্রী আনার চৌধুরী, নির্মূল কমিটির যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড শাখার নেতা মানবাধিকারকর্মী মাহফুজ রহমান, নির্মূল কমিটির অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি সমাজকর্মী একরাম চৌধুরী, নরওয়ে নির্মূল কমিটির সভাপতি কবি খোরশেদ আহমেদ, টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ফোরাম ফর সেকুলার হিউম্যানিজম তুরস্কের সাধারণ সম্পাদক লেখক চলচ্চিত্রনির্মাতা শাকিল রেজা ইফতি সহ ওয়ার্ল্ড সিন্ধি কংগ্রেস, বেলুচ ভয়েস, সুইজারল্যান্ডের আর্থ ফোকাস ফাউন্ডেশন, সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগ, সর্ব ইউরোপীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগ, আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন সুইজারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদ, নির্মূল কমিটির যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়ে, ফ্রিনল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড ও বোস্টন, তুরস্ক, মিশর, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া শাখার নেতৃবৃন্দ।

জেনেভার সময় বেলা বারটায় আরম্ভ হয়ে ছয় ঘন্টা দীর্ঘ এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পাঁচটি মহাদেশের ২৩টি দেশের মানবাধিকার নেতা, বুদ্ধিজীবী, আইনপ্রণেতা, গণহত্যার ভিকটিম এবং নির্মূল কমিটির বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মীরা কায়িকভাবে উপস্থিত থেকে এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশ শেষে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হাই কমিশনারকে নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সর্ব ইউরোপীয় শাখার সভাপতি তরুণকান্তি চৌধুরী ও সুইজারল্যান্ড শাখার সভাপতি খলিলুর রহমানের স্বাক্ষরকৃত স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। অনলাইনে স্মারকপত্র পাঠ করেন নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ। (স্মারকপত্র সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত)

উদ্বোধনী ভাষণে নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যার বিবরণ দিয়ে বলেন, '১৯৭১ সালের গণহত্যার অপরাধীদের বিচারের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হয়েছিল। চলমান বিচার কার্যক্রম নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাকিস্তানি দখলদার সেনা এবং এদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছে। এখন সময় এসেছে বাংলাদেশের গণহত্যার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির।

শাহরিয়ার কবির বলেন, 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' এবং নির্মূল কমিটির বৈদেশিক শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণহত্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির জন্য প্রচার

চালাচ্ছে কেননা এখনও গণহত্যাকারীরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়। যদিও পাকিস্তানের বিবেকবান নাগরিকরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের চলমান যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন এবং ১৯৭১ সালে তাদের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন, কিন্তু পাকিস্তানি সরকার এখনও ক্ষমা চায়নি এবং তারা এখনও সত্যটি মেনে নিতে পারেনি। তদুপরি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বালুচ ও সিন্ধি জাতিসমূহের বিরুদ্ধেও গণহত্যার পুনরাবৃত্তি করছে। গণহত্যাকারীদের যদি শাস্তি না হয় তাহলে বারবার এ ধরনের জঘন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তি হবে। যেমনটি মিয়ানমার, পাকিস্তান, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে আজও দেখতে পাচ্ছি।

'২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার ১১ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। আজকের সমাবেশ থেকে আমরা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সরকার ও গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত সমস্ত গণহত্যার নিন্দা জানানোর জন্য। রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য শরণার্থীদের তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য জাতিসংঘকে দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে হবে।

'২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ৯ই ডিসেম্বরকে 'গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের স্মরণ ও সম্মানের দিবস এবং গণহত্যা অপরাধ প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই প্রস্তাব গ্রহণকালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সদস্য দেশসমূহের জনগণকে গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে, যাতে গণহত্যা রোধ করা যায়। সুতরাং, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে গণহত্যা প্রতিরোধে এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মানবাধিকার নেতা জুলিয়ান ফ্রান্সিস বলেন, 'যিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করেছেন তার পক্ষে এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং মেনে নেয়া কঠিন যে, এখনও অনেকেই বাংলাদেশের গণহত্যা অস্বীকার করে। আমার এখনো স্মরণ আছে কিভাবে বাংলাদেশের ১ কোটি শরণার্থীরা ভারতের নয়শোটির বেশি শরণার্থী শিবিরে আতঙ্কিত অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সকলেই নৃশংসতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা তাদের সামনে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রিয়জনদের।'

রোহিঙ্গা গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে এবং শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে জাতিসংঘকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জুলিয়ান ফ্রান্সিস বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে অবহেলা করেছে এবং এখন কিছু দেশ আলোচনায় বাধা দিচ্ছে। এখন এটি আরও অনিশ্চিত হয়ে গেছে কারণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ কোভিড-১৯ মহামারীর দিকে। আরও আগেই মিয়ানমারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সাথে আলোচনায় খুবই নম্র হয়ে কথা বলছে। ২০১৯ সালে জাতিসংঘে ইউএনএইচআরসি-এর অসন্তোষজনক ভোটাভুটিতে চীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সমাধানের বিরোধিতা করেছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের উপর আরো কড়া বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে যেন মিয়ানমার দ্রুত কোফি আনান রিপোর্টের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী সমাজকর্মী আরমা দত্ত এমপি বলেন, 'আমি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান। আমার পিতামহ শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার শিকার। জাতিসংঘের গণহত্যার কনভেনশন অনুযায়ী 'গণহত্যা'-এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে? একজন ভুক্তভোগী হিসেবে বিশ্ব

সম্প্রদায়ের নিকট আমি গণহত্যা স্বীকৃতি চাই এবং জাতিসংঘ যেন এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে বাংলাদেশের মতো আর কোথাও এমন নৃশংস গণহত্যা না ঘটে।'

অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির এমপি লরি ফার্গুসন বলেন, 'হিটলার বাহিনী যেমন ইহুদিদের বেছে বেছে হত্যা করেছিল ঠিক তেমনভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, গায়কসহ বাংলাদেশের তৎকালীন প্রথিতযশা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষজনকে বেছে বেছে হত্যা করে। সরকারি হিসেবে ২ লক্ষ (বেসরকারি হিসাবে ৫ লক্ষাধিক) নারীকে তারা নির্যাতন করে যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনাগুলোর একটি।'

খেমার রুজ ট্রায়ালের কম্বোডিয়ান টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা গণহত্যা বিশেষজ্ঞ ড. হেলেন জার্ভিস সমাবেশের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেন, 'দীর্ঘদিন যাবৎ গণহত্যার নথিপত্র ও আলামত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন দেশে গণহত্যার বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছি। কম্বোডিয়াসহ আরো অনেক দেশের সম্প্রদায়ের উপর চালানো গণহত্যাকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই প্রত্যাশা নিয়ে আমি আজকে আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করছি। জাতিসংঘকে অবশ্যই ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া গণহত্যার স্বীকৃতি দিতেই হবে কেননা এর প্রভাব সরাসরি এখন বাংলাদেশের উপর পড়েছে। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী গণহত্যার শিকার হয়ে আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে পালিয়ে আসছে। মিয়ানমারের সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নিশ্চিত করার বদলে তাদের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে হত্যা, নির্যাতন, গুম, খুন করে দেশ থেকে বিতাড়ন করছে ঠিক যেমনটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী '৭১ সালে ও তার পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বাঙালি জাতির সঙ্গে করে এসেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখনও তাদের দেশে একই কায়দায় গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।'

ভারতের লেখক সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকার বলেন, 'সাংবাদিক হিসাবে আমি '৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কভার করার সময় স্বচক্ষে যদি পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা প্রত্যক্ষ না করতাম তাহলে কখনোই হয়তো এ বীভৎসতার কথা বিশ্বাস করতাম না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মানবতার বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ সংঘটিত করেছিল তা ক্ষমার অযোগ্য।

'বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি দোসরদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সাজা দিতে পারলেও তাদের নির্দেশদাতাদের এখনও বিচারের মুখোমুখি করতে পারে নি। তারা যে বীভৎস গণহত্যা সংঘটিত করেছে তার জন্য অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত ইরানের মানবাধিকার নেত্রী বানাফশে যাদ ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি বাংলাদেশীদের পাশে দাঁড়িয়েছি, যেখানে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ত্রিশ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা জাতিসংঘকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত গণহত্যা, গণহত্যা সংক্রান্ত সমস্ত অপরাধ এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংস ও স্বৈরাচারী শাসনামলের সকল হত্যার আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দা জানানোর আহ্বান জানাই।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বায়োমেডিকাল বিজ্ঞানী ড. জেফ মুডি বলেন, 'আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস থেকে আমি আজকের সভায় বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট বাংলাদেশের একজন হয়ে ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্বীকৃতি চাইছি। একই সঙ্গে জাতিসংঘকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাব যেন বাংলাদেশের গণহত্যা মতো বর্বরোচিত গণহত্যা ভবিষ্যতে আর না সংঘটিত হয়।'

যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার নেতা ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন বলেন, 'বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বৈশ্বিক স্বীকৃতি এখন পর্যন্ত না পাওয়াটা এদেশের উত্তরাধিকারীদের জন্য লজ্জার। আমরা পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে অবগত আছি। সেই ভয়াবহতার বহু ভুক্তভোগী আজও শরীরে সেই নৃশংসতার চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন শুধু দরকার বৈশ্বিক স্বীকৃতি। এজন্য বিশ্ব সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘকে এগিয়ে আসতে হবে। গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ বলে 'নেভার এগেইন'। সত্যিই কি তারা এটি চায়?

'ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য নিরাপদ ভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এখন তারা নিজেদের দেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যার বৈশ্বিক স্বীকৃতি চায়। সুতরাং বিশ্বসম্প্রদায়ের উচিত এখনই বাংলাদেশের সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর।'

ফোরাম ফর সেক্যুলার ইজিপ্ট এ্যান্ড মিডল ইস্ট-এর সভাপতি মানবাধিকার নেতা সাংবাদিক মহসিন আরিশি বলেন, 'আরবের দেশগুলোতে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী– যারা ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী হত্যাকে বৈধতা দেয়, তাদের কারণে মানুষের রক্ত ঝরছে। ঠিক একই ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের গণহত্যায় জামায়াতে ইসলামী ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলো প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল। তারা এমনকি মসজিদে সেজদারত মুসল্লিদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। মুসলিম দেশগুলো এবং ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলো যদি ৫০ বছর পূর্বে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হতো, তাহলে আরব ও আমার এই অঞ্চলের মানুষ ১০ বছরের বেশি সময় ধরে চলা রক্তপাত থেকে রেহাই পেত। মুসলিম দেশগুলোর এজন্য ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠন করা জরুরি, যেখানে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের স্থান নেই।

যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত বেলুচ বুদ্ধিজীবী ড. নাসির দাস্তি বলেন, '১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল তারাই আজকে বেলুচিস্তানে গণহত্যা পরিচালনা করছেন। গণহত্যার ক্রীড়ানক যারা, তাদের ধমণিতে বইছে মানুষ হত্যার বংশীয় খুন। পাক সেনাবাহিনী ঔপনিবেশিক আমল থেকেই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেই সমস্ত অফিসারদের দ্বারাই পরিচালিত হয় যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকেই বংশীয় ভাবে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীতে কর্মরত। সে সমস্ত সেনাবাহিনীর পূর্বপুরুষরা ১৮৪৩ সালে সিন্ধিতে ছয় হাজারের বেশি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইভের হয়ে ৫০ হাজারের অধিক বাঙালির তাজা রক্তে রঞ্জিত করে তাদের হাত। এমনকি ১৯৭০ সালে জর্ডানে ৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। '৭১ সালে বাংলাদেশে আর বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব অঞ্চলে তাদের হত্যাযজ্ঞ চলমান।

'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মানুষের রক্ত পান করার নেশা বহু পুরনো। মাছ চোর বিড়াল সদৃশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গলায় এবার ঘন্টি বাঁধতে হবে। সময় এসেছে তাদের দৌরাত্ম্য থামানোর। তাদের পরিকল্পনা আরও সুদূরপ্রসারি– পারমাণবিক অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে শাসন করা। তাদেরকে এবার থামাতেই হবে।'

ওয়ার্ল্ড সিন্ধি কংগ্রেস-এর সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার নেতা ড. লাকু লুহানা বলেন, 'আমি সিন্ধু জনগণের পক্ষ থেকে নির্মূল কমিটির সঙ্গে বাঙালি সম্প্রদায়ের ভাই বোনের উপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল– বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট তার স্বীকৃতি চাওয়ার জন্য একান্ত ভাবে আজকের সমাবেশে একাত্মতা পোষণ করছি। গণহত্যার বিচার ও স্বীকৃতি খুবই

জরুরী একটি বিষয়। ১৯৭১ এর গণহত্যার বিচার না হওয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখন সিন্ধু, বালুচ ও পশতুন সম্প্রদায়ের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে। আমরা আর গণহত্যা দেখতে চাই না।'

পাকিস্তানের মানবাধিকার নেতা তাহিরা আবদুল্লাহ বলেন, '১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার জন্য জেনারেল পারভেজ মুশারফ বাংলাদেশে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আমি চাই– পাকিস্তান যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের কাছে নিঃস্বার্থ ক্ষমা চায়। অনুশোচনা বা দুঃখ প্রকাশ করা এবং নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে অপরাধ সংঘটিত করেছে সে অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তবু জাতি হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা মোচনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের নিকট পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

গণহত্যার ভুক্তভোগী ফিলিস্তিনি লেখক আহমেদ শাফি বলেন, 'সবাইকে শুভেচ্ছা, আমি আহমেদ সাফি, একজন ফিলিস্তিনি। আমি ফিলিস্তিন স্কার্ফ ও বাংলাদেশের পাঞ্জাবি পরে আজকের এই সমাবেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য একাত্মতা প্রকাশ করতে এসেছি।

আহমেদ শাফি এরপর ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত দেয়ার ইয়াসসেন-এর গণহত্যা বর্ণনা দেন, যেখানে কমপক্ষে ১০০ জন ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষ ও শিশুকে ইসরাইলি বাহিনী হত্যা করেছিল। ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিষয়ে তিনি বলেন, 'ইসরাইলি সরকার গণহত্যার বিষয়টি বরাবরই অস্বীকার করে আসছে। আমি আজ জাতিসংঘকে অনুরোধ জানাব কর্তৃপক্ষ যেন গণহত্যাকারীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় নিয়ে আসেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের গণহত্যাসহ পৃথিবীর সমস্ত গণহত্যার স্বীকৃতি দাবি করি। নতুন প্রজন্মের জন্য যেন আমরা এক বাসযোগ্য উন্নত বিশ্ব রেখে যেতে পারি।'

তুরস্কে আশ্রয়গ্রহণকারী উইগুর গণহত্যার ভুক্তভোগী সাবো কসিমোভা সমাবেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বলেন, 'বাংলাদেশে একাত্তরের গণহত্যা অত্যন্ত নির্মম ছিল। গণহত্যায় ৩০ লক্ষাধিক মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরদের অবশ্যই বিচার করতে হবে।

'আমার সম্প্রদায়ও গণহত্যার স্বীকৃতি এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নৃশংস চীনই সুপার পাওয়ার। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী চীন জাতিসংঘের ভেটো প্রদানকারী ক্ষমতাধর একটি দেশ।

'সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। জাতিসংঘের কনভেনশনে নিবন্ধিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের দুটি ধারায় স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। চীন সরকার এগুলো সমস্তই লংঘন করেছে। আমি জাতিসংঘ এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাবো, গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়ে মানবতার পক্ষে দাঁড়ান।'

লাইবেরিয়ার ছাত্র নেতা আবু এস. কামারা বলেন, 'আমরা যেন আফ্রিকায় সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন গণহত্যার কথা, বিশেষ করে রুয়ান্ডায় ঘটে যাওয়া অন্যতম বৃহৎ গণহত্যার কথা যেন ভুলে না যাই। বিশ্বের কোন না কোন প্রান্তে গণহত্যা ঘটেই চলেছে এবং এর প্রতিরোধে আমাদের আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে বিশেষ করে জাতিসংঘকে। গণহত্যার স্বীকৃতি অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তুলবে। যারা গণহত্যা সংঘটিত করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা গেলে পরবর্তীতে কেউ আর এমন নৃশংস কাজ করার সাহস পাবে না।'

(সংযুক্ত)

স্মারকলিপি

সম্মানিত হাই কমিশনার, ইউএনএইচসিআর, জেনেভা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি এবং মিয়ানমারে গণহত্যার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবিলম্বে প্রত্যাবাসনের জন্য স্মারকলিপি

যেহেতু, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীরা বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, দুই লক্ষেরও বেশি নারীকে ধর্ষণ করেছিল এবং বাংলাদেশের এক কোটি অসহায় মানুষকে প্রতিবেশী ভারতে চলে যেতে বাধ্য করেছিল,

যেহেতু, ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বাংলাদেশে একাত্তরের গণহত্যাকারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার আরম্ভ হয়েছে,

যেহেতু, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিচারের রায় দিয়েছে, যেখানে একাত্তরের গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্তদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়, যেখানে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল উভয়ই বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য পাকিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করেছে,

যেহেতু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং বাংলাদেশে তাদের সহযোগীদের নিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল অথচ তারা তা সব সময় অস্বীকার করেছে যেভাবে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি যুদ্ধাপরাধীরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছিল যেহেতু, ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে, 'গণহত্যা বিষয়ক গবেষকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা' একটি প্রস্তাব পাস করে যেখানে– 'গণহত্যা অস্বীকারকে গণহত্যার চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে গণহত্যার পথ সুগম করে।'

যেহেতু, পাকিস্তান ১৯৭১-এর গণহত্যার দায়মুক্তির পরে পুনরায় বালুচ ও সিন্ধি জাতিসমূহের বিরুদ্ধে একই রকম গণহত্যা মানবতাবিরোধী অপরাধ অব্যাহত রেখেছে এবং

যেহেতু মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা মিয়ানমারের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের গণহত্যা চালাচ্ছে।

যেহেতু, দায়মুক্তির ফলস্বরূপ মিয়ানমারে চলমান গণহত্যার শিকার প্রায় ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী, বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, যা বর্তমান সময়ের অন্যতম মানবাধিকার বিপর্যয়,

যেহেতু, মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আহ্বান সত্ত্বেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক,

যেহেতু, বিশ্ববাসী গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের অপরাধীদের দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং গণহত্যা এমন একটি অপরাধ যা অপূরণীয় এবং অসহনীয় যন্ত্রণার কারণ।

যেহেতু, বিশ্ববাসী জাতিসংঘের সনদের উদ্দেশ্য এবং নীতিগুলি বার বার নিশ্চিত করেছে এবং ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ৯ ডিসেম্বরকে 'গণহত্যার অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তদের এবং এই অপরাধ প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক স্মরণ ও সম্মান দিবস'

হিসাবে ঘোষণা করেছে, জাতিসংঘের বিবেচনা অনুযায়ী দিবসটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো গণহত্যা কনভেনশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, গণহত্যার অপরাধকে প্রতিরোধ ও প্রতিরোধে এর ভূমিকা এবং এর ক্ষতিগ্রস্থদের স্মরণ ও সম্মান জানানো;

সেহেতু, আজ, ২০২১ সালের জুলাইয়ের সপ্তম দিন, আমরা ইউরোপের বাংলাদেশী প্রবাসীরা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণহত্যার ভুক্তভোগী এবং মানবাধিকারকর্মীরা জেনেভাতে জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দফতরের সামনে কায়িক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উভয়ভাবেই উপস্থিত হয়েছি– **(ক) একাত্তরের গণহত্যার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাতে, (খ) বিশ্বজুড়ে এখনও চলমান সকল গণহত্যা অপরাধের নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য এবং (গ) বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশ্ববাসী যেন মিয়ানমার সরকারের উপর কার্যকরী চাপ প্রয়োগ করে।**

আজকের শুভ সমাবেশ থেকে আমরা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সারা বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত সমস্ত গণহত্যামূলক কাজের নিন্দা জানাতে আহ্বান জানাই।

আসুন, আমরা ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা বা যে কোনও ধরনের মতবাদের নামে বিশ্বজুড়ে এখনও সংঘটিত সকল ধরনের গণহত্যামূলক অপরাধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই এবং আমাদের গ্রহটিকে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং যে কোনও ধরনের কার্যকলাপ– যা মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হতে পারে, তা থেকে মুক্ত রাখি।

রহমান খলিলুর
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সুইজারল্যান্ড শাখা

তরুণ কান্তি চৌধুরী
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সর্বইউরোপীয় শাখা

শাহরিয়ার কবির
সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

৭ জুলাই ২০২১

২৮

আফগান পরিস্থিতি সম্পর্কে ৩৬টি দেশের নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দের আন্তর্জাতিক সম্মেলন

'ধর্মের নামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নাগরিক প্রতিরোধ সংগঠিত করতে হবে'

৫ সেপ্টেম্বর (২০২১) দুপুর ২টায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে আফগান সংকট সম্পর্কে এক অনলাইন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও মানবাধিকার নেতা শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের বিষয় ছিল: **'আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতাদখল: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধের আহ্বান।'**

সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, মিশর, ঘানা, লাইবেরিয়া, ইথিওপিয়া, সিয়েরা লিওন, মেসিডোনিয়া, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ক্রোয়েশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, জামাইকা, জাপান, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার তিন শতাধিক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনপ্রণেতা, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী, শান্তিকর্মী ও উন্নয়নকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের সূচনাপর্বে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আফগান মানবাধিকার নেত্রী বিশিষ্ট আইনজীবী কোবরা মোরাদি ছয় মহাদেশের ১০৭জন বিশিষ্ট নাগরিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত খসড়া ঘোষণা ও প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যা বিস্তারিত আলোচনার পর গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব জাতিসংঘ এবং এর সকল অঙ্গ সংস্থাকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে তালেবান সহ সকল জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গিকার সম্মেলনে ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পাকিস্তানি মানবাধিকার নেত্রী তাহেরা আবদুল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী সম্মেলনে গৃহীত ঐতিহাসিক প্রস্তাবের সপক্ষে বিশ্বব্যাপী ১০ লক্ষ গণস্বাক্ষর সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্মেলনে অন্যান্য বক্তা ছিলেন আফগান ইন্টেলেকচুয়ালস গ্লোবাল কমিউনিটি-এর প্রেসিডেন্ট মানবাধিকার নেতা ও লেখক শাহী সাদাত, বেলজিয়ামের সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রাক্তন এমইপি পর্তুগিজ রাজনীতিবিদ পাওলো কাসাকা, ভারতের ডেইলি পাইওনিয়ার-এর উপদেষ্টা সম্পাদক লেখক সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকার, যুক্তরাষ্ট্রের ইরানি নারী অধিকার কর্মী সাংবাদিক বানাফসে যানদ, সুইডেনের ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর মানবাধিকার নেত্রী এ্যাটর্নি মোনা স্ট্রিন্ডবার্গ, সুইস ইন্টার-স্ট্রাটেজি গ্রুপ-এর কম্যুনিকেশনস-এর ডিরেক্টর নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন, পাকিস্তানের নারী অধিকার ও শান্তি কর্মী, "তেহরিক-ই-নিশওয়ান"-এর সভাপতি ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী সীমা কেরমানি, তুরস্কের আর্থ সিভিলাইজেশন প্রজেক্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা, কবি ও নাট্যকার তারিক গুনারসেল, ফ্রান্সের খাইবার ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সভাপতি মানবাধিকার নেতা, লেখক সাংবাদিক ফজল উর রহমান আফ্রিদি, যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ল্ড সিন্ধি কংগ্রেস-এর সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার নেতা ড. লাকুমাল লুহানা, তুরস্কের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ থিয়েটার ক্রিটিক-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট লেখক ও নারী অধিকার নেত্রী জেনেপ ওরাল, ফোরাম ফর সেকুলার নেপাল-এর সভাপতি রাষ্ট্রদূত যুবনাথ লামসাল, ফোরাম ফর সেকুলার ইজিপ্ট এ্যান্ড মিডল ইস্ট-এর সভাপতি লেখক সাংবাদিক মহসিন আরিশি, আফ্রো-এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি অর্গানাইজেশন-এর প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার নেতা আরিয়াদাসা বিদ্যাসেকেরা, ঘানার মানবাধিকার নেত্রী সাংবাদিক মারিয়াম ইয়াং, উজবেকিস্তানের উইঘুর মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক সাবো কোসিমোভা, পাকিস্তানের মানবাধিকার নেত্রী তাহেরা আবদুল্লাহ প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে বাংলাদেশের লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবির সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আফগানিস্তানে বৈধ সরকারকে অবৈধভাবে অপসারণ করে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী তালেবানরা যেভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ আজ সোচ্চার। আমরা অতীতে

আফগানিস্তানে একই পন্থায় তালেবানদের ক্ষমতাদখল এবং পাঁচ বছরের নারকীয় শাসনকাল দেখেছি; যেখানে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাতিসত্তা নির্বিশেষে আফগানদের উপর সীমাহীন দুর্যোগ নেমে এসেছিল। দক্ষিণ এশিয়া সহ গোটা পৃথিবীতে পাকিস্তান, আমেরিকা ও সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তালেবানরা গত তিন দশক ধরে যে ভাবে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাস রফতানি করেছে, তার মাশুল আজও আমাদের দিতে হচ্ছে। বিশেষভাবে মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে গত পঁচিশ বছরে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মৌলবাদীকরণ ও তালেবানিকরণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবানদের সাম্প্রতিক উত্থানে এসব দেশের মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ীদের উল্লাসে আমরা উদ্বিগ্ন। বিশ্বের সর্বত্র মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করতে হলে এবং সভ্যতার বোধ ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে হলে দেশে দেশে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার নামে উগ্রতা, সন্ত্রাস ও হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপনকালে আফগান-অস্ট্রেলিয়ান মানবাধিকার নেত্রী কোবরা মোরাদি বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষত শান্তি এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা। আফগানিস্তানে উদ্ভূত সংকটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পদক্ষেপ সমগ্র আফগান জাতির ভবিষ্যৎ এবং ৩.৮ কোটি আফগান জনগণের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করবে। লিঙ্গ, বয়স, জাতি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক আফগানদের অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের সবকিছুই করতে হবে। তালেবানের একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থা মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে সম্মান করে না। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত তাদেরকে ধিক্কার জানানো এবং স্বীকৃতি না দেয়া।'

সম্মেলনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে আফগানিস্তানের ভুক্তভোগী মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য মানবাধিকার নেতা পাওলো কাসাকা বলেন, 'যারা সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাদের সবাইকে অবশ্যই আফগান জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে এবং যারা দেশটিকে তালেবানের হাতে তুলে দিতে চায় তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করতে হবে। ধর্মান্ধ তালেবান শাসকরা তাদের দেশের জনগণের জন্য তো বটেই সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ভারতের ডেইলি পাইওনিয়ার-এর উপদেষ্টা সম্পাদক লেখক সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকার বলেন, 'ইতোপূর্বে, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবানের শাসনের ভয়াবহতা এখনো আফগানিস্তানের জনগণকে তাড়া করে, বিশেষ করে নারীদের স্বাধীনতা হরণ, ধর্মীয় পুলিশের মাধ্যমে প্রত্যেক পুরুষের দাড়ি-টুপি, টাখনুর উপরে কাপড় পরেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করা আফগানদের জন্য এখনও দুঃস্বপ্নের মতো। যদিও তালেবান বলছে এখন তারা আগের অবস্থানে নেই, তারা নারীদের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছে। তাদের এই কথার কোন ভিত্তি নেই এবং তাদের কোনভাবেই বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

ইরানী নারী অধিকার কর্মী সাংবাদিক বানাফসে যানদ বলেন, 'আমি ইরানের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের নারী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলতে চাই। আমরা চাই, আফগানিস্তানে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক যেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। নারী অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠী সকলের স্বাধীনতা কেবলমাত্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যেই নিহিত– যা থেকে তালেবানরা যোজন যোজন দূরে। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে

তালেবান যেন আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারে এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

ব্রিটিশ নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন বলেন, 'আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা এবং ন্যাটো চলে যাবার পর ভারতকে নতুন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। যখন নিরাশাবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের দিকে চেয়ে ছিল তখন পাকিস্তান আফগানিস্তানের জঙ্গিবাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠে। পাকিস্তান তখন তাদের মৌলবাদী জঙ্গিদের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তান সর্বদা প্রতিরক্ষার পরিবর্তে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এতকিছুর পর তালেবান এবং পাকিস্তান জঙ্গিবাদ ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এমনটা চিন্তা করা বোকামী ছাড়া কিছুই হতে পারে না।'

পাকিস্তানের নারী অধিকার কর্মী ও "তেহরিক-ই-নিশওয়ান' -এর সভাপতি ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী সীমা কেরমানি বলেন, 'আমরা পাকিস্তানের নারীরা আফগানিস্তানের নারী এবং নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে সামরিকতন্ত্র, মৌলবাদ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। আফগানিস্তানের নারীরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই মুক্ত নই। আমরা বিশ্বাস করি, আফগানিস্তানের নারীদের অবশ্যই শিক্ষা, ভ্রমণ, চলাচলের স্বাধীনতা, চাকরি, নিরাপত্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ সমস্ত অধিকার থাকতে হবে। একই সাথে আমি শিল্পী, রূপান্তরকামী, এলজিবিটি সম্প্রদায় এবং হুমকির সম্মুখীন সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি। আমরা এই অধিকারগুলির সুরক্ষা কবজ হিসেবে সমতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলি সমর্থন করি।'

প্রখ্যাত পশতুন বুদ্ধিজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী ফজল উর রহমান আফ্রিদি বলেন, 'তালেবানের কাবুল দখল আফগানিস্তান ও সমগ্র অঞ্চলের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী করেছে। তাদের এই কর্তৃত্বের ফলে দেশটির উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে শত্রুতা তৈরী হবে। হুমকির সম্মুখীন হবে তাজিক, উজবেক এবং হাজারা জনগোষ্ঠী। ফলে অচিরেই দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, মায়ানমার, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং ভারতে আইএস, তালেবানের মত জঙ্গিগোষ্ঠীর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে।'

তুরস্কের বিখ্যাত লেখিকা ও মানবাধিকার কর্মী জেনেপ ওরাল বলেন, '১৯৮০ সালের পর থেকে আমেরিকা তালেবানকে সহযোগিতা করেছে। তারা ন্যাটোর মাধ্যমে ২০ বছর ধরে সেখানে অভিযান চালিয়েও শান্তি এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আফগান নারীদের অধিকার এবং স্বাধীনতা আজ হুমকির মুখে। আফগানিস্তানের রাস্তাঘাটে রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার আগেই সারা বিশ্বের উচিৎ তালেবানের উপর চাপ প্রয়োগ করা।'

ফোরাম ফর সেকুলার নেপাল-এর সভাপতি রাষ্ট্রদূত যুবনাথ লামসাল বলেন, 'আফগানিস্তানে তালেবানের কর্তৃত্ব গ্রহণের ফলে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন হয়েছে যা আমাদের সবার জন্য বেশ উদ্বেগের। আমরা বিশ্বাস করি, আফগানিস্তানের জনগণকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের সরকার বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে।'

উজবেকিস্তানের উইঘুর মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক সাবো কোসিমোভা বলেন, 'ইতোপূর্বে তালেবান যখন আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিল তখন তারা আফগানিস্তানের জনগণ ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে এমন বার্তা দিয়েছিল যে, তারা খুব সাধারণ ভাবেই আফগানিস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করবে কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের সীমাহীন বর্বরতার

চিত্র বিশ্ব সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করেছিল। ঠিক একই কায়দায় তারা আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে চলেছে। তারা আফগানিস্তানে পুনরায় শরিয়া আইন প্রবর্তন করবে– এই ঘোষণা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে কমিউনিস্ট চীন, যারা নিজেদের দেশে উইঘুর মুসলমানদের নির্যাতন করছে মুসলমান হওয়ার কারণে, তারা আফগানি জঙ্গি সন্ত্রাসী তালেবানদের সমর্থন করছে। আফগানিস্তানে তালেবানের উত্থান গোটা বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুতরাং তালেবানের ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়–

যেহেতু, আফগানিস্তান বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, মতাদর্শ এবং ভৌগলিক বৈচিত্রসহ বহু জাতি গোষ্ঠীর একটি দেশ;

যেহেতু, আফগানিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সাংবিধানিক সরকার এবং জাতীয় পতাকা গ্রহণের অধিকার রয়েছে;

যেহেতু, আফগানিস্তানের জনগণের রয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং অন্য সকল অধিকার– আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, জাতিসংঘের কনভেনশন ও আইন, ইউডিএইচআর এবং জাতিসংঘ সনদ দ্বারা সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত;

যেহেতু, আফগান নারীরা দেশটির জনসংখ্যার অর্ধেক, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আফগান নারীদের সমতা, ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের মৌলিক মানবিক অধিকার রয়েছে, বিশেষত আসন্ন শান্তি ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে;

যেহেতু, চরমপন্থী জঙ্গি তালেবান জোরপূর্বক আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছে;

যেহেতু, তালেবান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনে তাদের নতুন "মধ্যপন্থী অবস্থান" প্রচার করলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অসম্মান, নারী ও সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার, আইনের শাসন, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নিশ্চিত মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়ে তাদের চরমপন্থী ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শকে পরিত্যাগ করেনি;

যেহেতু, জাতিসংঘ এবং এর অনেক সদস্যরাষ্ট্র তালেবানকে তার জঙ্গি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং চরমপন্থী মতাদর্শের জন্য একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, পাশাপাশি তালেবানরা দেশে-বিদেশে ধর্মের নামে জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে;

যেহেতু, দখলদার তালেবান-এর জঙ্গি সদস্যরা এখনও আফগানিস্তানে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছে;

যেহেতু, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী তালেবান-এর দখলদার জঙ্গিরা ইতোমধ্যে তাদের নেতাদের অবৈধভাবে সরকারের মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা আরম্ভ করেছে; উপরন্তু তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, নারীদের সরকারের ঊর্ধ্বতন কোন পদে সমাসীন করবে না, তবে 'নারী স্বাস্থ্য' এবং 'প্রাথমিক শিক্ষা' পরিষেবা খাতে নারীদের নিয়োগের জন্য 'অনুমতি' দেয়া হবে;

যেহেতু, তালেবানরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের মানবাধিকারের কথা বাদ দিয়েছে, এবং অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী তালেবান জঙ্গিদের অধীনে আফগান শিয়া, হাজারা ও অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন;

সেহেতু, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আফগান সংকট বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ছয়টি মহাদেশের আইন প্রণেতা, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, মানবাধিকার কর্মী, শান্তি কর্মী, সংখ্যালঘু অধিকার কর্মী, সুশীল সমাজ, উন্নয়নকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী এবং আফগান প্রবাসীরা নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে অনুমোদন ও সমর্থন করেন:

১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী চরমপন্থী জঙ্গি তালেবান (টিটিএ) গোষ্ঠীর অসাংবিধানিক ও অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দ্ব্যর্থহীন নিন্দা জানানোর জন্য একটি প্রস্তাব পেশ এবং সমর্থন করতে হবে। অতঃপর জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রের স্বঘোষিত তালেবান "সরকার" বা "আফগানিস্তান ইসলামিক আমিরাত"কে স্বীকৃতি দেওয়া অবশ্যই অনুচিত– কারণ তা হবে অবৈধ, অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক।

২. জাতিসংঘের মহাসচিব, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই সুবিস্তৃত, সর্ব-অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্তানে শান্তি নিশ্চিত করতে হবে, এরপর আফগান জনগণের জন্য আইনগত এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত ও বৈধ প্রতিনিধিত্বের বিধান করতে হবে– যা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অ-ধর্মতান্ত্রিক সরকার গঠন, অঞ্চল, জাতি, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সম্প্রদায়, বর্ণ, গোত্র, উপজাতি, শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এবং আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের বিদ্যমান পতাকার প্রতি দায়বদ্ধ।

৩. আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে– এখন থেকে তাদের ভূখণ্ড বা সীমান্ত কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন/গোষ্ঠীকে আশ্রয় দেবে না এবং জঙ্গিবাদ প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হবে না।

৪. আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলির সরকারের উচিত হবে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তাদের সীমানা উন্মুক্ত করা।

৫. অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো বিশেষত: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ন্যাটো জোট এবং গত ২০ বছরে আফগানিস্তান দখলে সামরিকভাবে জড়িত বৃহত্তর জোটকে আফগানিস্তানে বর্তমান মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. এই দেশগুলোকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া আরম্ভ করতে হবে: (ক) আফগান শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা; (খ) আফগানিস্তানে তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা, বিশেষত আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস্তুচ্যুত আফগানদের ত্রাণ প্রদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ, সংস্থা/এনজিওগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা; (গ) প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে (বিশেষ করে ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ইউএনওসিএইচএ) জরুরী অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান; এবং (ঘ) পরবর্তীতে আফগানিস্তানে বারবার আক্রমণ, দখল এবং ক্রমাগত যুদ্ধের ৪২ বছর পর প্রয়োজনীয় ব্যাপক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন শুরু করার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজকে স্বল্প-মধ্যমেয়াদে আফগানিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, কারণ আন্তর্জাতিক উপস্থিতি (ক) মানবিক ত্রাণ প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; (খ) আলোচনাকৃত শান্তি ও মানবাধিকার, বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার পর্যবেক্ষণ ও সুরক্ষার বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এবং (গ) পুনর্গঠন কর্মসূচী শুরুতে সমর্থন করা।

৮. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএন-এইচআরসি) মাধ্যমে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়কে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নের পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রমাণ পর্যবেক্ষণ, নথিভুক্তি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান কমিশন গঠন করতে হবে।

৯. আফগান সমাজের সকল দুর্বল অংশ বিশেষত নারী, কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং আফগানিস্তানের সকল ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে; পাশাপাশি তাদের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১০. সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ সহ জাতিসংঘকে এর সকল সনদের অধীনে প্রদত্ত আফগান গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের) মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাসহ প্রচার-প্রসার নিশ্চিত করতে হবে।

১১. আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজ, মানবাধিকারকর্মী এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর উচিত সকল প্রকার গণহত্যামূলক অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কাজ এগিয়ে নেয়া, বিশেষ করে যুদ্ধ/গৃহযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে নারী ধর্ষণ, দাসত্ব এবং জোরপূর্বক বিবাহকে ব্যবহার করা, হোক তা আফগানিস্তানে বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে; এবং যে রাষ্ট্রগুলি এই জাতীয় অপরাধ করে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

১২. আমরা নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা সকল রাষ্ট্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সনাতন সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ও সামরিক ধারণা এবং চরমপন্থী সন্ত্রাসী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে "সামরিক সম্পদ" হিসাবে ব্যবহার করা, অথবা অভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তথাকথিত "ভাল" বনাম "খারাপ" পার্থক্য করা, বিভাজন এবং শাসনমূলক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক খেলা বন্ধের জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে আহ্বান জানাই। আফগানিস্তানের পাশাপাশি মধ্য ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ন্যায়বিচারের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এসব এখনই বন্ধ করতে হবে।

৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, অনুষ্ঠিত আফগান সঙ্কট বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন সম্মেলনে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো অনুমোদিত এবং গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষর করেন:

১. লেখক সাংবাদিক চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবির (সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)
২. পর্তুগিজ রাজনীতিবিদ পাওলো কাসাকা (প্রাক্তন এমইপি, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম, বেলজিয়াম)
৩. মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিশেল বোকোজ, (ফিলিপাইনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত)
৪. বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক (সভাপতি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশিয় গণসম্মিলন, সাবেক বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট)
৫. মানবাধিকার নেতা ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী)
৬. শান্তি কর্মী মিকিকো ওতানি (চেয়ার, জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি, ওসাকার সাবেক অ্যাটর্নি, জাপান)
৭. মানবাধিকার নেত্রী আরমা দত্ত (বাংলাদেশের সংসদ সদস্য)
৮. সংস্কৃতিকর্মী নাট্যাভিনেতা রামেন্দু মজুমদার (সাম্মানিক সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট)
৯. লেখক সাংবাদিক জেরার্ড বুসকেট (দক্ষিণ এশিয়ার প্রাক্তন এএফপি সংবাদদাতা, ফ্রান্স)

১০. অধ্যাপক টম সিরিং (চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস রিসার্চ লীগ, কো-চেয়ার, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল, ইন্টারেস্ট গ্রুপ অন মাইগ্রেশন এন্ড রিফিউজি ল, নরওয়ে)
১১. মানবাধিকার নেতা এন্ড্রু কপসন (প্রধান নির্বাহী, হিউম্যানিস্টস ইউকে)
১২. অধ্যাপক পবিত্র সরকার (সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত)
১৩. মানবাধিকার নেতা ড. খিন জাও উইন (পরিচালক, তামপাদীপা ইনস্টিটিউট, মিয়ানমার)
১৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী লরেন স্মিথ ভ্যান লিন (পরিচালক, স্মিথভেনলিন কনসালটেন্সি, প্রাক্তন পরিচালক, আন্তর্জাতিক বার অ্যাসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠাতা, তাল্লাওয়াহ জাস্টিস ফর উইমেন, জ্যামাইকা)
১৫. নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রশিদ (নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব কনফ্লিক্ট ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বাংলাদেশ)
১৬. মানবাধিকার নেতা জুলিয়ান ফ্রান্সিস (সদস্য, বার্মায় রোহিঙ্গা গণহত্যা তদন্তে নাগরিক কমিশন)
১৭. মানবাধিকার নেত্রী অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম (সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচারস ইউনিয়ন)
১৮. মানবাধিকার নেতা জেনেভিভ অ্যাভেনার্ড (সভাপতি, ইউরোপীয়ান নেটওয়ার্ক অব চিলড্রেনস এডভোকেটস ইএনওসিএ, ফ্রান্স)
১৯. অধ্যাপক ফিলিপ ডি. জাফে (ভাইস-চেয়ারম্যান, জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি ও অধ্যাপক, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড)
২০. মানবাধিকার নেতা মফিদুল হক (পরিচালক, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস, বাংলাদেশ)
২১. ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসির মামুন (চেয়ারম্যান, ১৯৭১ গণহত্যা ও নির্যাতন জাদুঘর এবং আর্কাইভ বাংলাদেশ)
২২. অ্যার্টনি কোবরা মোরাদি (অস্ট্রেলিয়ার আফগান মানবাধিকার কর্মী)
২৩. লেখক ও মানবাধিকার নেতা শাহী সাদাত (প্রেসিডেন্ট, আফগান ইন্টেলেকচুয়ালস গ্লোবাল কমিউনিটি)
২৪. লেখক সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকার (উপদেষ্টা সম্পাদক, ডেইলি পাইওনিয়ার, ভারত)
২৫. চলচ্চিত্রনির্মাতা, চিত্রগ্রাহক, সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা গৌতম ঘোষ (প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ভারত)
২৬. শান্তি কর্মী এর্লিং ফকভোর্ড (প্রাক্তন সংসদ সদস্য, নরওয়ে)
২৭. ইরানের নারী অধিকার কর্মী, লেখিকা ও সাংবাদিক মান্দা যানদ এরভিন (সভাপতি, এলাইয়েন্স অব ইরানিয়ান উইমেন)
২৮. ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী সীমা কেরমানি (নারী অধিকার ও শান্তি কর্মী, সভাপতি, "তেহরিক-ই-নিসওয়ান", পাকিস্তান)
২৯. অ্যাটর্নি উইলিয়াম স্লেন (প্রাক্তন সভাপতি, নর্থ আমেরিকান জুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কানাডা চ্যাপ্টার)
৩০. মানবতাবাদী ইরমা পেইপোনেন (সভাপতি, হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ফিনল্যান্ড)
৩১. মানবতাবাদী আরিয়েন মনুচাইন (থিয়েটার কর্মী, নাট্যকার, ফ্রান্স)
৩২. মানবতাবাদী ফিলিপ আলফনসি (সাংবাদিক ও তথ্যচিত্রনির্মাতা, ফ্রান্স)
৩৩. লেখক সাংবাদিক মানস ঘোষ (প্রাক্তন সম্পাদক, স্টেটসম্যান কলকাতা, ভারত)
৩৪. কবি ও নাট্যকার তারিক গুনারসেল (প্রতিষ্ঠাতা, আর্থ সিভিলাইজেশন প্রজেক্ট, তুরস্ক)
৩৫. রাজনীতিবিদ উল্লা হফম্যান (চেয়ারপার্সন, ফ্রিস্টাডসফন্ডেন, সাবেক সদস্য, সুইডিশ পার্লামেন্ট)

৩৬. মানবাধিকার নেত্রী তাহেরা আবদুল্লাহ (পাকিস্তান)
৩৭. লেখিকা সেলিনা হোসেন (নির্বাহী পরিচালক, ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সাবেক সদস্য)
৩৮. চলচ্চিত্রনির্মাতা সংস্কৃতিকর্মী নাসিরউদ্দিন ইউসুফ (সভাপতি, আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ)
৩৯. রাজনীতিবিদ ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি)
৪০. মানবাধিকার নেত্রী মোনা স্ট্রিন্ডবার্গ (এ্যাটর্নি এট ল, ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন, সুইডেন)
৪১. শান্তি কর্মী ড. ক্যারিন লে বোর্গনে (সিনিয়র পলিসি এডভাইজার ও আইটিএডব্লু লিড, ওয়ার্ল্ড ভিশন, যুক্তরাজ্য)
৪২. শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার নেতা আরিয়াদাসা বিদ্যাসেকেরা (প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল, আফ্রো-এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি অর্গানাইজেশন)
৪৩. সাংবাদিক মুহম্মদ শফিক রহমান এমপি (প্রাক্তন সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব বাংলাদেশ)
৪৪. ফ্রান্সের পশতুন মানবাধিকার নেতা, লেখক সাংবাদিক ফজল উর রেহমান আফ্রিদি (সভাপতি, খাইবার ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ)
৪৫. লেখক অধ্যাপক আতিউর রহমান (সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক)
৪৬. যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার নেতা ড. লাকুমাল লুহানা (সাধারণ সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড সিন্ধি কংগ্রেস)
৪৭. সুইজারল্যান্ডের বেলুচ মানবাধিকার নেতা মুনির মেঙ্গল (সভাপতি, বেলুচ ভয়েস অ্যাসোসিয়েশন)
৪৮. লেখক, শান্তি কর্মী ও নারী অধিকার নেত্রী জেনেপ ওরাল (ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব থিয়েটার ক্রিটিক, তুরস্ক)
৪৯. মানবাধিকার নেতা মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরন নবী (বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
৫০. বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া (সভাপতি, ইউরোপীয় বাংলাদেশ ফোরাম, নেদারল্যান্ডস)
৫১. নারীনেত্রী শিরীন আক্তার এমপি (সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ, বাংলাদেশ)
৫২. লেখক চলচ্চিত্রনির্মাতা ফেরহাত আতিক (সভাপতি, টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ফোরাম ফর হিউম্যানিটি, তুরস্ক)
৫৩. রাষ্ট্রদূত যুবনাথ লামসাল (সভাপতি, ফোরাম ফর সেকুলার নেপাল)
৫৪. মানবাধিকার নেতা, লেখক সাংবাদিক মহসিন আরিশি (সভাপতি, ফোরাম ফর সেকুলার ইজিপ্ট এন্ড মিডল ইস্ট)
৫৫. যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার নেতা লেখক ড. নাসির দাস্তি (নির্বাহী সভাপতি, বেলুচ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল)
৫৬. সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত (কলামিস্ট ও লেখক, ভারত)
৫৭. অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ (লোকসঙ্গীত ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, ভারত)
৫৮. লেখক শিক্ষাবিদ শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত (প্রাক্তন অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত)
৫৯. মানবাধিকার নেত্রী নাটালিয়া সিনায়েভা পাঙ্কোভস্কা (সদস্য, নেভার এগেইন, পোল্যান্ড)
৬০. সঙ্গীতশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল (সাধারণ সম্পাদক, ইন্টার-রিলিজিওন হারমোনি সোসাইটি, বাংলাদেশ)
৬১. এডভোকেট জাফর মালিক (সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান)
৬২. রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন (কম্যুনিকেশনস ডিরেক্টর, সুইস ইন্টার-স্ট্রাটেজি গ্রুপ, সুইজারল্যান্ড)

৬৩. সাংবাদিক মারিয়াম ইয়াং (মানবাধিকার নেত্রী, ঘানা)
৬৪. সাংবাদিক সাবো কোসিমোভা (উইঘুর মানবাধিকার কর্মী, উজবেকিস্তান)
৬৫. মানবাধিকার নেত্রী নিকোলাস ফুরে (সহসভাপতি, আর্থ ফোকাস ফাউন্ডেশন, সুইজারল্যান্ড)
৬৬. লেখক চিত্রশিল্পী হাশেম খান (সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশ)
৬৭. নিরাপত্তা বিশ্লেষক, কলামিস্ট মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মাদ আলী শিকদার (নির্বাহী পরিচালক, রিজিওনাল এন্টি-টেরোরিস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ)
৬৮. বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম (প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ)
৬৯. ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ (প্রাক্তন সিনিয়র প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ)
৭০. মানবাধিকার নেতা বেভারলি বারবি (সঙ্গীতশিল্পী, ফ্রান্স)
৭১. মানবাধিকার নেতা নাসির আজিজ খান (পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, সুইজারল্যান্ড)
৭২. মানবাধিকার নেতা বেরহানে তেভেলদে-মেধিন (প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এশিয়ান-ইউরেশিয়ান হিউম্যান রাইটস ফোরাম, সুইজারল্যান্ড)
৭৩. লেখক, মনোবিজ্ঞানী, আলোকচিত্রশিল্পী ভেরা সেথার (সংস্কৃতিকর্মী, নরওয়ে)
৭৪. অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান (সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)
৭৫. সমাজকর্মী অজয় দে (সভাপতি, ইন্দো-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন, ভারত)
৭৬. মুক্ত চিন্তাবিদ এসা ইলিকোস্কি (ট্রাস্টি, ইউনিয়ন অব ফ্রিথিঙ্কারস, ফিনল্যান্ড)
৭৭. মানবাধিকার নেতা পল কাউফম্যান (চেয়ারপার্সন, ইস্ট লন্ডন হিউম্যানিস্টস, ইউকে)
৭৮. যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার নেতা আমান্ডা সেবেস্টিন (চেয়ারপার্সন, জিউজ ফর জাস্টিস ফর প্যালেস্টিনিয়ানস)
৭৯. মানবাধিকার নেত্রী বানফশে যানদ (ইরানি-আমেরিকান সাংবাদিক)
৮০. মানবাধিকার নেতা মেসবাহ কামাল (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)
৮১. মানবাধিকার নেতা অধ্যাপক ফিরোজ আলম (স্কুল অফ অ্যারোস্পেস, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, আরএমআইটি ইউনিভার্সিটি মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)
৮২. শান্তি কর্মী কাটিকা কুলাভকোভা (সাহিত্যের অধ্যাপক, ম্যাসিডোনিয়া)
৮৩. শান্তি কর্মী উইলিয়াম নাইগার্ড (প্রকাশক, নরওয়ে)
৮৪. শান্তি কর্মী ইউজিন শলগিন (ঔপন্যাসিক, নরওয়ে)
৮৫. সংস্কৃতিকর্মী মোহাম্মদ শেরিফ (শিল্প নির্দেশক, সিয়েরা লিওন)
৮৬. ভ্লাদিমির বোগদানী (সাংস্কৃতিক কর্মী, ক্রোয়েশিয়া)
৮৭. মানবতাবাদী ড. বরেন্দু মণ্ডল (অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত)
৮৮. মানবাধিকার নেতা ড. এএবিএম নাসির (অধ্যাপক, নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
৮৯. নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অরিন্দম মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক, ইনস্টিটিউট অব স্যোশাল এন্ড কালচারাল স্টাডিজ, ভারত)
৯০. মানবাধিকার নেতা সাংবাদিক সঞ্জগ ওয়াল্টার (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, স্বপ্নীল সংসার, ভারত)
৯১. ড. ম্যাক্সিম দুবায়েভ (মানবাধিকার নেতা, রাশিয়া)
৯২. নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রিয়জিৎ দেব সরকার (যুক্তরাজ্যের ভারতীয় লেখক)
৯৩. ডা. জিওফ্রে মুডি (বায়োমেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট, ইউএসএ)

৯৪. চিত্রশিল্পী, লেখক সাংবাদিক পার্থ রায় (ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইন্দো-বাংলাদেশ ফোরাম ফর সেক্যুলার হিউম্যানিজম, ভারত)
৯৫. ডা. মিশেল পিয়ারসন (স্টাফ বিশেষজ্ঞ, রিহেবিলিটেশন মেডিসিন, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)
৯৬. শান্তি কর্মী অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (সাধারণ সম্পাদক, 'সম্প্রীতি' (অ্যামিটি) বাংলাদেশ)
৯৭. মানবাধিকার নেতা রেবেকা ফিলিপস (প্রকাশনা সম্পাদক, অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি)
৯৮. সুইজারল্যান্ডের মানবাধিকার নেতা সরদার শওকত আলী কাশ্মীরি (চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড কাশ্মীর পিপলস ন্যাশনাল পার্টি)
৯৯. মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হ্যান্স ক্লেইন, এমডি (চেয়ারম্যান, হিউম্যানিস্টিস, কার্লস্ট্যাড ডিভিশন, সুইডেন)
১০০. শিশু অধিকার কর্মী, লেখক ক্লারিস জিলার (ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাবেক অ্যাডভোকেসি সহকারী, সহযোগী, শিশু ও কিশোর অধিকার জাতীয় কেবিনেট, মানবাধিকার মন্ত্রণালয়, ব্রাজিল)
১০১. ড. ডিঙ্কি দারুওয়ালা (সহযোগী অধ্যাপক, কার্লস্ট্যাড বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য, হিউম্যানিস্টিস, কার্লস্ট্যাড ডিভিশন, সুইডেন)
১০২. ডা. শকুন্তলা সঙ্গম (সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস এসোসিয়েশন, ভারত)
১০৩. মানবাধিকার নেত্রী ড. কানিজ আকলিমা সুলতানা (প্রেসিডেন্ট, ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক-বোয়ান, বাংলাদেশ)
১০৪. শান্তি কর্মী আব্রাহাম এম কেইটা (ওওয়াইডব্লু-ইসি পিস এ্যামবাসেডর, লাইবেরিয়া)
১০৫. শান্তি কর্মী কনস্টাঙ্গা মার্টিনেজ (জেনেভায় আর্জেন্টিনা থেকে জাতিসংঘের প্রতিনিধি)
১০৬. শিক্ষাবিদ জেনেভিভ সুইসা (মানবাধিকার নেতা, ফিলিপাইন)
১০৭. মানবাধিকার কর্মী ফয়সাল হাসান তানভীর (সদস্য, জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি, বাংলাদেশ)
১০৮. সাংবাদিক নিং আরুমদানি (শিশু অধিকার কর্মী, ইন্দোনেশিয়া)
১০৯. শান্তি কর্মী এসেতু এলেমু (উন্নয়ন কর্মী, আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া)
১১০. নারী অধিকার কর্মী রোহ গুল জেকরুল্লাহ (সদস্য, ইউরোপীয়ান জিরগা অব আফগান)
১১১. মানবাধিকার নেতা সৈয়দ জাকের শাহ (রাজনৈতিক নেতা ও বিশ্লেষক)
১১২. মানবাধিকার নেতা নকিবুল্লাহ নবাবী রেখা (রাজনৈতিক নেতা)
১১৩. মানবাধিকার নেতা বিরো দিয়াওয়ারা (জাতিসংঘে আরএডিডিএইচও-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার এগেইনস্ট টেরোরিজম (আইসিএটি)
১১৪. এডভোকেট সফদার খান (পশতুন মানবাধিকার নেতা)
১১৫. মানবাধিকার নেত্রী পালওয়াশা কাকর (মহিলা বিষয়ক প্রাক্তন উপমন্ত্রী, নরওয়ে আফগানিস্তান ডেস্কের কুর্দি নারী অধিকার বিষয়ক সদস্য)
১১৬. যুক্তরাষ্ট্রের নারী অধিকার কর্মী ইলদা সাদাত
১১৭. মানবাধিকার নেতা ইহতেশাম আফগান (সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)
১১৮. অধ্যাপক সঞ্জয় কে ভরদ্বাজ (জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত)
১১৯. আফগান মানবাধিকার নেতা সবুর শাহ দাউদজাই (সিইও, বিন দাউদ ফাউন্ডেশন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ওয়ান ইয়ং ওয়ার্ল্ড)

পরিশিষ্ট-২
র‍্যাব প্রতিবেদন

গণতদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জঙ্গিদমনে র‍্যাব-এর কার্যক্রম সম্পর্কে র‍্যাব-এর সদর দফতরের নিকট তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। 'র‍্যাব'-এর মিডিয়া শাখা থেকে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

জঙ্গি সংক্রান্ত গ্রেফতার/উদ্ধার পরিসংখ্যান
(হলি আর্টিজান হামলার পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	গ্রেফতার						
		২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	সর্বমোট
১.	মোট অভিযান	৬৫	৭১	৬৭	১২৭	১৮৪	১৮৫	৬৯৯
২.	জঙ্গি সদস্য গ্রেফতার	৮৮	৩০৮	২৩৩	২৬৬	২৫১	২৯৬	১৫৪২
৩.	জঙ্গি আত্মসমর্পণ	৬	১	–	–	–	৯	১৬
৪.	জঙ্গি সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে	৭	১১	৫	২	–	–	২৫

নোট ঃ

১. ২০১৭ সালে আতিয়া মহলে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে নিহত র‍্যাব সদস্য– ০১ জন (শহীদ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, বিপিএম, পিপিএম, ইবি)

২. ২০১৬ সাল হতে অদ্যাবধি জঙ্গি বিরোধী অভিযানে গুরুতর আহত হয়ঃ ১. লেঃ কর্ণেল তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ, জি, ২. মজর আব্দুল হাকিম, ৩. অতি. পুলিশ সুপার জনাব আ.ফ.ম. আনোয়ার হোসেন খান, ৪. সিনি. সহ. পুলিশ সুপার এ বি এম মুজাহিদুল ইসলাম, ৫. ল্যা. নায়েক মো. ইউনুছ আলীসহ বেশ কয়েকজন র‍্যাব সদস্য।

গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গিবিরোধী অভিযানঃ

১. ০৭ জুলাই ২০১৬ তারিখ হলি আর্টিজানের পরপরই জঙ্গিদের টার্গেট ছিল কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদগাহ ময়দান। উক্ত ঘটনায় জঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় র‍্যাব। ঘটনাস্থল থেকে পলায়নরত এক জঙ্গিকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

২. গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর মিরপুরের দারুস সালাম থানাধীন কমল প্রভা নামক একটি বাসায় র‍্যাব অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি

হামলার অন্যতম মদদদাতা, পরামর্শদাতা, আশ্রয়দাতা ও প্রথম সারির জঙ্গি নেতাদের গুরু হিসেবে খ্যাত জঙ্গি আব্দুল্লাহ আস্তানাটি ঘিরে ফেলা হয়। আত্মসমর্পণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে শীর্ষ এই জঙ্গি কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে সহ ৭ জঙ্গি নিহত হয়। বিস্ফোরণে স্প্রিন্টারের আঘাত ০২ জন্য র‍্যাব সদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

৩. জঙ্গিবিরোধী অভিযানের কারণে ২০১৭ সাল এর শেষের দিকে জঙ্গি শহর হতে দুর্গম চরাঞ্চলের আস্তানা তৈরির পরিকল্পনা করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোদাগাড়ীর চর আলাতুলিতে জঙ্গিদের এরকম একটি আস্তানায় র‍্যাবের অভিযানের সময় ৩ জঙ্গি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহুতি দেয়। উদ্ধার করা হয় অস্ত্র, পাওয়ার জেল ও আইইডি।

৪. ১২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে তেজগাঁয়ের নাখাল পাড়া এলাকার 'রুবি ভিলায়' র‍্যাব জঙ্গি বিরোধী অভিযান চালায়। যেখানে জঙ্গিরা একটি মেসে সাধারণ মানুষদের সাথে ছদ্মবেশে অবস্থান করছিল। গভীর রাতে বাড়িটি ঘিরে ফেলে র‍্যাব; আত্মসমর্পণের আহ্বান প্রত্যাখান করে প্রতিরোধ করে জঙ্গিরা। ঝুঁকিপূর্ণ এ অভিযানে দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের সাথে গুলি বিনিময়ে নিহত হয় ৩ জঙ্গি। অভিযানে ০২ জন্য সদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়। উদ্ধার করা হয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক। এভাবে জঙ্গিদের হামলা করার পূর্বেই নসাৎ করে দেওয়া হয় তাদের পরিকল্পনা।

৫. র‍্যাবের অভিযানে গত ২০ নবেম্বর ২০২০ তারিখে রাজশাহী মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন পবা এলাকা হতে নিষিদ্ধ ঘোষিকত জঙ্গি সংগঠন 'জেএমবি' এর ০৪ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপতার করে এবং সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার উকিলপাড়া এলাকায় অভিযানে ০৪ জন 'জেএমবি' সদস্য আত্মসমর্পণ করে। উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ উগ্রবাদী বই, আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি।

৬. ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ র‍্যাবের অভিযানে রাজধানীর দীয়াবাড়ি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার যাবৎজীবন সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গি মোৎ ইকবাল হোসেন, জাহাঙ্গীর সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়।

৭. গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বিভক্ত জেএমবির একটি গ্রুপের কর্ণধার জঙ্গি নেতা এমদাদুল হক, উজ্জল মাস্টার (৫৫)কে রাজধানীর বসিলা হতে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। উক্ত অভিযানে উদ্ধার করা হয় অস্ত্র, গুলি, বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য।

৮. গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ র‍্যাব কর্তৃক নীলফামারী সদর উপজেলাধীন এলাকা হতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির রংপুরের সামরিক শাখার প্রধানসহ ০৫ সদস্য গ্রেফতার করা হয়। উক্ত অভিযানে আইইডিসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ প্রতিবেদন

গণতদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জঙ্গিদমনে 'পুলিশ'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে পুলিশ-এর সদর দফতরের নিকট তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। 'পুলিশ'-এর মিডিয়া শাখা থেকে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

জঙ্গি অপারেশন সংক্রান্ত তথ্যঃ
অপারেশনে নিহত (জঙ্গি)- ৬২ জন
ঘটনার সময়ে ও পরে গ্রেফতার-৬০
ভিকটিম উদ্ধার-১০৩ জন
অপারেশনে নিহত পুলিশ অফিসার-০৮ জন
অপারেশনে আহত পুলিশ অফিসার-৬২ জন

জঙ্গি/সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক হামলা সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর মামলার পরিসংখ্যান
(সময়কাল ঃ ১৩/০২/২০১৩ থেকে ১০/০২/২০২১ পর্যন্ত)
এক নজরে জঙ্গি মামলার পরিসংখ্যান

জঙ্গি সংক্রান্ত মোট ঘটনা	৮৩
উল্লিখিত ঘটনায় সর্বমোট মামলা	৯৪
মোট চার্জশীট মামলা (বিচার সম্পন্ন+বিচারাধীন=১০+৬৬)	৭৬
মোট চূড়ান্ত রিপোর্ট মামলা (এফআরটি)	১৭
মোট তদন্তাধীন মামলা	০১
মোট গ্রেফতারকৃত আসামী	৪৯৩
ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি প্রদানকৃত আসামী	১৬২
ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক স্বাক্ষীর জবানবন্দি	২০৯

জঙ্গি/সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত মামলার পরিসংখ্যান

জেএমবি কর্তৃক সংঘটিত ঘটনা	আনসারুল্লাহ বাংলা টীম/আনসার আল ইসলাম কর্তৃক সংঘটিত ঘটনা	অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত ঘটনা	সর্বমোট মামলা	মন্তব্য
৭৮	১০	০৬	৯৪	–

পরিশিষ্ট-৩
হেফাজতে ইসলামের ঘাঁটি ১০০০ মাদ্রাসার তালিকা

বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক অবস্থান আছে এরকম ১,০০০ মাদ্রাসা খুঁজে বের করেছে গণকমিশন, যেগুলো হেফাজতে ইসলাম নিয়ন্ত্রিত কওমি শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া-বেফাক) এর মহাসচিব মাওলানা আবদুল কুদ্দুসের তথ্যমতে, বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৩ হাজার। সারাদেশে বেফাকে অধিভুক্ত আছে ১৩ হাজার ২০০টি প্রতিষ্ঠান। যেসব মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৯ হাজার। গণকমিশনের জরিপ থেকে সেসব কওমি মাদ্রাসা বাদ রাখা হয়েছে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ২০০-এর নিচে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষাক, ছাত্রও হেফাজত নেতাদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, তাদের মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা কত? তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত সারণী তৈরি করা হয়েছে।

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
১.	জামিয়া ঢালকা নগর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা কুতুবুদ্দীন	৩৫	২০০০
২.	জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম, ফরিদাবাদ, সূত্রাপুর, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস	৫০	৩৫০০
৩.	জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, কাজী রিয়াজুদ্দীন রোড, লালবাগ, ঢাকা	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ	৫৫	৪০০০
৪.	জামিয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা ফারুক আহমদ	৪০	২২০০
৫.	জামালুল কোরআন মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা এমদাদুল ইসলাম	৪০	১২০০
৬.	জামিয়া ইসলামিয়া তাতিবাজার, ঢাকা	মাওলানা মুজাফ্ফর হোসাইন	৩৫	২৫০০
৭.	জামিয়া ইসলামিয়া মুহাম্মদিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	৩৮	১৪০০
৮.	বায়তুল ফালাহ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা তালহা	৩০	৯০০
৯.	আল-মারকাযুল ইসলামি নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা	মুফতি শহিদুল ইসলাম	৪০	৩০০০
১০.	জামেউল উলুম মিরপুর-১৪	মুফতি আবুল বাশার	৪০	১০০০
১১.	মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামি, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	মুফতি মোঃ আব্দুল্লাহ	৩৫	৯০০
১২.	দারুর রাশাদ মাদ্রাসা, মিরপুর-১২	মাওলানা সালমান	৬০	৩৫০০
১৩.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মিরপুর	মাওলানা নাজিমুদ্দীন	৪৫	১০০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
১৪.	খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, মিরপুর-১৩	মুফতি ইমরান মাজহারী	৪০	১০০০
১৫.	মাদ্রাসাতুল উলমিয়া ইসলামিয়া মুরাদপুর, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন	৩৫	১০০০
১৬.	জামিয়া ইসলামিয়া বড়কাটারা মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা	মুফতি সাইফুল ইসলাম	৬০	৩২০০
১৭.	জামিয়া নূরীয়া আশরাফাবাদ কামরাঙ্গিচর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী	৬৫	৪৮০০
১৮.	ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা, আজিমপুর, ঢাকা	মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ	২৫	৭০০
১৯.	মাদ্রাসাতুল মদিনাহ, কামরাঙ্গিচর, ঢাকা	মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ	২৭	৭৫০
২০.	জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা	মাওলানা মোহাম্মদ মুসা	৫০	২৫০০
২১.	জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া, রামপুরা মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা মোহাম্মদ আলী	৩৮	১৫৫০
২২.	জামিয়া মাখজানুল উলুম মাদ্রাসা, খিলগাঁও, ঢাকা	মাওলানা নুরুল ইসলাম জিহাদী	২৮	৯৫০
২৩.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, ওয়াপদা, মতিঝিল, ঢাকা	মাওলানা রফিক আহমদ	২৯	৮৫০
২৪.	তেজগাঁও রেলওয়ে জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা শামসুজ্জামান	৩০	৫০০
২৫.	জামিয়াতুল ইব্রাহিম (আঃ) সাইন বোর্ড মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ	মুফতি শফিকুল ইসলাম	২৫	৭৫০
২৬.	জামিয়া আশরাফিয়া সাইন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ	মুফতি আব্দুল বারি	২৫	৬০০
২৭.	জামিয়া ইসলামিয়া মেরাজ নগর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা ইসমাইল নূরী	৩০	১২০০
২৮.	মাদ্রাসা,ই মাহফুজুল কোরআন কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মুফতি আহসান উল্লাহ	২৫	৭০০
২৯.	জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা মনির হোসেন কাসেমী	৩০	১৫০০
৩০.	মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা জোবাইর আহমদ	২৫	১০০০
৩১.	ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, বসুন্ধরা মাদ্রাসা, ঢাকা	আরশাদ রহমানী	৬৫	৪০০০
৩২.	দারুল উলুম দক্ষিণখান মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা সিদ্দিক আহমদ	২৫	৮০০
৩৩.	জামিয়াতুস সাহাবা, ঢাকা	মাওলানা এহসানুল করিম	৩০	৯০০
৩৪.	বায়তুল সালাম মাদ্রাসা, উত্তরা, ঢাকা	মুফতি আব্দুল হাই	৩৫	১২০০
৩৫.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, হরিনাল, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা শরফুদ্দীন	৩৫	১৫০০
৩৬.	জামিয়া নূরীয়া ইসলমিা, টঙ্গী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা ইরফান বিন তোরাব আলী	৩০	১৬০০
৩৭.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইবরাতুল উলুম মাদ্রাসা, আফতার নগর, ঢাকা	মুফতি আহমদ আলী	২৫	৬৮০
৩৮.	জামিয়া রহিমিয়া দারুল মারিফ, গাবতলী, ঢাকা	মাওলানা আবুল কাশেম	২৫	৮০০
৩৯.	জামিয়া আরাবিয়া হামিউস্সুন্নাহ বিয়ানী বাউনিয়াবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আখতারুজ্জামান	২৬	৯৫০
৪০.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, আমিনবাজার, ঢাকা	মাওলানা সলিম উল্লাহ	২৬	৭৫০
৪১.	জামিয়া সিদ্দিকীয়া দারুস সালাম, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম	৩৭	১৩০০
৪২.	আমিন বাজার মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আফজাল হোসাইন	২৯	১৫০০
৪৩.	জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা	মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন	৬৫	৪২০০
৪৪.	এমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস	৫৫	২২০০
৪৫.	মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম বড় কাটারা, ঢাকা	মাওলানা তোরাব আলী	৪৫	১৬০০
৪৬.	মাদ্রাসা, জামিয়া ইসলামীয়া আরাবিয়া, ঢাকা	মাওলানা আবুল কাসেম	৪৬	১৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৪৭.	মাদ্রাসা, দারুল উলুম ঢাকা দক্ষিণ	মাওলানা আব্দুর রহিম	৩৫	১২০০
৪৮.	মাদ্রাসা,-ই নূরীয়া আশরাফাবাদ, ঢাকা	মাওলানা হাফেজ হামিদুল্লাহ	৪৫	১৫০০
৪৯.	জামিয়া আগারগাওঁ মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা মোহিব্বুল্লাহ	৪০	৯০০
৫০.	মাদ্রাসা, ফয়জুল উলুম আজিমপুর গোরস্তান, ঢাকা	মাওলানা জাহিদ হোসেন	৩৫	৭০০
৫১.	দারুল কোরআন শামসুল উলুম মাদ্রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	৫৫	১৫০০
৫২.	মাদ্রাসা মিফতাহুল উলুম ঢাকা	মাওলানা হাফেজ ফজলুর রহমান	৪৫	১২০০
৫৩.	জামেউল উলুম মাদ্রাসা, ডেমরা, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল মালেক	৪২	৯০০
৫৪.	মাদ্রাসাতুল খোলাফা আহমদ রাশেদীন (রাঃ) চট্টগ্রাম	মুফতি আব্দুল মান্নান	৩০	৭০০
৫৫.	জামিয়া ইসলামিয়া কওমিয়া, দক্ষিণখান উত্তরা, ঢাকা	মুফতি হেমায়েতুল্লাহ	৩৫	৫০০
৫৬.	আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইয়াহিয়া	১২০	৯০০০
৫৭.	ইচাপুর ফয়েজীয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মাওলানা শিহাবুদ্দীন	৪০	২৫০০
৫৮.	নাছেরুল ইসলাম ফতেহপুর মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	৩৫	১৫০০
৫৯.	আল- জামেয়াতুল ইসলামীয়া কাছেমুল উলুম চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুল্লাহ	৩৫	১২০০
৬০.	জিয়াউল উলুম বাথুয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মাওলানা শফি	৩০	৭০০
৬১.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া বাবুনগর মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী	৫০	৪০০০
৬২.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা সালাহ উদ্দীন নানুপুরী	৬৫	৬০০০
৬৩.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ভূজপুর কাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা জুনাইদ বিন জালাল	৩৫	৭০০
৬৪.	আল-জামিয়াতুল কোরআনিয়া তালীমুদ্দীন মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুফতি ওসমান	২৫	১২০০
৬৫.	ধর্মপুর এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবু বকর	৩৫	৭০০
৬৬.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজাদী বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা হাবিবুল্লাহ	৩২	৮০০
৬৭.	শাহনগর দারুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইউসূফ	৩৫	৮০০
৬৮.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, শাহনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা মামুনুর রশীদ	৩০	৬০০
৬৯.	রাঙ্গামাটিয়া তালীমুল ইসলাম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইলিয়াছ	২৫	৬৫০
৭০.	জামালুল কোরআন মাদ্রাসা, ধরুং, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইসমাইল কাসেমী	২৫	৭০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৭১.	ধুরুং হেদায়েতুল ইসলাম মুনাফখীল মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	৩৫	৭৫০
৭২.	কাজিরখীল পাচপুকুরিয়া মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ওসমান	২৫	৭০০
৭৩.	চুরখাঁ হাট মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ছালেহ আহমদ	২৮	৫৫০
৭৪.	হারুয়ালছড়ি হাবিবুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা সেলিম উল্যাহ	২৬	৬০০
৭৫.	বড় বিল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ছালে জহুর	২৬	৫০০
৭৬.	রাবার বাগান ইউনুছিয়া মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা সিদ্দীক আহমদ	২৫	৬৫০
৭৭.	ছিকনছড়া বড় মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইলিয়াছ	২৫	৬০০
৭৮.	কাজী বাড়ী এমদাদুল ইসলাম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবুল কালাম	৩০	৭৫০
৭৯.	কাঞ্চন নগর খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইসমাইল	৩০	৮০০
৮০.	সাইয়্যিদুশ শুহাদা মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম	মাওলানা হাজী ইউসূফ	৩০	৮০০
৮১.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া মেহেরিয়া রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইসহাক	২৮	৬০০
৮২.	ফুলবাগিচা মাদ্রাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২৬	৮০০
৮৩.	আরব নগর মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম	কে এম আলমগীর মাসউদ	২২	৪০০
৮৪.	ফতেহ নগর মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা ইসহাক মাদানী	২৮	৬০০
৮৫.	জামিয়াতুল উলুম লালখান বাজার চট্টগ্রাম	মাওলানা মুফতি ইজাহারুল ইসলাম চৌধুরী	৩৫	২০০০
৮৬.	মুজাহেরুল উলুম মাদ্রাসা, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা লোকমান হাকিম	৩৮	৩৫০০
৮৭.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল মা'আরিফ চট্টগ্রাম	মাওলানা সোলতান যওক নদভী	৪০	১৮০০
৮৮.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদানিয়া দামপাড়া	মাওলানা রুহুল আমিন হায়দার	৩০	৮০০
৮৯.	দারুল ইফতা আল ইসলামী জালালাবাদ, চট্টগ্রাম	মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী	৩০	৮৫০
৯০.	তা'লীমুল কোরআন কমপেøক্স, সেগুনবাগান, চট্টগ্রাম	হাফেজ তৈয়ুব	৩৫	১৫০০
৯১.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হেদায়া মাদ্রাসা, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম	মাওলানা আজিজুল হক আল মাদানী	২৫	৬০০
৯২.	দারুল ফোরকান হালিশহর, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুনির উদ্দীন	৩০	৬৫০
৯৩.	তা'লীমুল উম্মাহ অক্সিজেন, চট্টগ্রাম	মাওলানা এনামুল হক	২৫	৪০০
৯৪.	দারুল ইত্তেছাল, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবু তাহের	২৬	৮০০
৯৫.	চাঁদগাও দারুল ফুনুন, চট্টগ্রাম	মাওলানা করিমুল ইসলাম	২৪	৭৫০
৯৬.	আল-জামিয়াতুল ওয়াহেদিয়া বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	২৫	৮০০
৯৭.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া কৈয়গ্রাম মাদ্রাসা আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	মাওলানা হোসাইন আহমদ	৩৫	১২০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৯৮.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কছেমুল উলুম, পটিয়া, চট্টগ্রাম	মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী	৮০	৫৫০০
৯৯.	আল- জামিয়া আজিজুল উলুম ইমদাদিয়া মাদ্রাসা, পুকখালি, চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা ফুরকান আহমদ	৫৫	২০০০
১০০.	তা'লীমুল ফোরকান ঈদগা মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা আবুল কালাম	২৫	৮০০
১০১.	কক্সবাজার আল-জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ	৩৫	১৮০০
১০২.	খরণা মাদ্রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুর রহীম	৩০	৮৫০
১০৩.	আল- জামিয়াতুল ইসলামিয়া পূর্ব ফিরোজ শাহ, খুলশী, চট্টগ্রাম	মাওলানা তাজুল ইসলাম	৫০	১৫০০
১০৪.	বাহার ছড়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম	গাজী আশরাফ আলী	২৫	৬০০
১০৫.	মনকির চর মাদ্রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবু বকর	৩০	৬০০
১০৬.	সাতকানিয়া বড় মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা আজিজুল হক	৩৫	১২০০
১০৭.	বায়তুন্নুর মাদ্রাসা আশিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম	কারী মাওলানা আনোয়ার	২৫	৮০০
১০৮.	পুকুরিয়া মাদ্রাসা, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম	মাওলানা নুর আহমদ	৪২	২১০০
১০৯.	চনুয়া মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, কক্সবাজার	মুফতি মোহাম্মদ আবু তৈয়ুব	২৫	৯০০
১১০.	চাম্বল মাদ্রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুল জলিল	২৭	৮৫০
১১১.	চমাদার পাড়া মাদ্রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা শোয়াইব	৩৫	৫৫০
১১২.	আল-জামিয়া ইসলামিয়া রাজঘাট মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মুফতি সিব্বির আহমদ	৪০	১৮০০
১১৩.	জামিয়া ইসলামিয়া বশরত নগর মাদ্রাসা, পুকখালী, কক্সবাজার	মাওলানা ইদ্রিচ	৩১	১৩০০
১১৪.	শাহমিরপুর আমিরাবাদা মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুর রহমান	২৫	৮৮০
১১৫.	পদুয়া দোহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম	মাওলানা আনোয়ার শাহ	৩০	১৪৩০
১১৬.	দারুচ্ছুন্নাহ দুধকুমড়া মাদ্রাসা হীলা, কক্সবাজার	মাওলানা ছলিম উল্যাহ	২৬	৪৩৩
১১৭.	পুরাতন বোয়ালিয়া মাদ্রাসা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুফিজুর রহমান	২৮	৬৮৯
১১৮.	নদওয়াতুল ওলামা মাদ্রাসা, পুকখালী, কক্সবাজার	মাওলানা রুহুল আমিন	২৮	৭৮০
১১৯.	ছোট বেতুয়া সিরাজুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	২৪	৭৫০
১২০.	দারুস্সুন্নাহ হীলা মাদ্রাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার	মাওলানা ইসহাক	৪৫	১৭৬০
১২১.	সাবরাং মাদ্রাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার	মাওলানা নূর আহমদ	২৬	৯৮৫
১২২.	জাপতনগর ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুজিবুর রহমান	২৫	৪৫০
১২৩.	আল মা'দুল ইসলামিয়া বালক বালিকা মাদ্রাসা, ভূজপুর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মুফতি মাহমুদ হাসান	৩৫	১৫০০
১২৪.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া হাইলধর মাদ্রাসা, আনোয়ারা	মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম	৫০	২০০০
১২৫.	মারকাযুল উলুম হালিশহর, চট্টগ্রাম	মাওলানা তোয়াহা/ মাওলানা বাহাউদ্দীন	২৬	৭০০
১২৬.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদানিয়া মাদ্রাসা, মান্দাকিনি ফটিকছড়ি	মাওলানা ইসমাইল কাসেমী	২৫	৮৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
১২৭.	রামু বড় মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা আব্দুল হক	৪০	১৫০০
১২৮.	তিনট্যহরী হামিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, মানিকছড়ি খাগড়াছড়ি	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন	৩৮	৮৫০
১২৯.	মানিকছড়ি বড় মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা ফজলুল হক	২৮	৭০০
১৩০.	জালিয়া পাড়া মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা আব্দুল মতিন	৩০	৭৮০
১৩১.	বান্দরবান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র	মাওলানা হোসাইন	৪০	২০০০
১৩২.	মধুনাঘাট মাদ্রাসা, হাটহাজারী	মাওলানা শিহাব উদ্দীন	৩৫	১২০০
১৩৩.	খন্দকিয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী	মাওলানা মোস্তাফা	৩০	৬৫০
১৩৪.	মাদার্শা মাদ্রাসা, হাটহাজারী	মাওলানা ইয়াছিন	৩০	৭৫০
১৩৫.	গড়দুয়ারা মাদ্রাসা, হাটহাজারী	মাওলানা ইদ্রিচ	৩০	৮০০
১৩৬.	জামিয়াতুস্‌সুন্নাহ বিশ্বরোড় মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা মনযুর আহমদ	৪০	১২০০
১৩৭.	জামেয়া মাদানিয়া কাজিরবাজার, সিলেট	মাওলানা আবুল কালাম	৬৫	২৫০০
১৩৮.	জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহ জালাল (রহঃ), সিলেট	মুফতি আবুল কালাম	৫৫	১৭০০
১৩৯.	জামেয়া নূরীয়া ইসলামিয়া ভার্থখলা, সিলেট	হাফেজ মাওলানা মজদুদ্দীন আহমদ	৩৫	১১০০
১৪০.	মদিনাতুল উলুম দারুস সালাম খাসদবীর, সিলেট	মুফতি ওলীউর রহমান	৩০	৯৫০
১৪১.	জামেয়া নয়া সড়ক মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা আব্দুল কাদির	৩০	৮০০
১৪২.	জামেয়া মাহমুদিয়া সোবহানীঘাট, সিলেট	মাওলানা শফিকুল হক	৩০	৮০০
১৪৩.	জামেয়া তায়াক্কুলিয়া রেংগা, সিলেট	মাওলানা মুহিবুল ইসলাম বোরহান	২৮	৬৫০
১৪৪.	জামেয়া হোসাইনিয়া গওহরপুর, সিলেট	মাওলানা মোসলেহ উদ্দীন রাজু	৪০	২২০০
১৪৫.	জামেয়া দারুল হাদিস খেলাফত বিল্ডিং, সিলেট	মাওলানা মকবুল হুসাইন	৩১	১৭০০
১৪৬.	দয়ামীর মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা ইলিয়াছ আহমদ	২৮	৮০০
১৪৭.	উমরপুর মাদ্রাসা, সিলেট	হাফিজ শিহাব উদ্দীন	৩৫	১৫০০
১৪৮.	গলমুকাপন মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা আব্দুশ শহীদ	২৮	৬৫০
১৪৯.	জামেয়া দারুল উলূম কানাইঘাট, সিলেট	মাওলানা মুহাম্মদ বিন ইদ্রিচ	২৬	৭০০
১৫০.	দক্ষিণকাছ মাদ্রাসা, শাহ পরান, সিলেট	মাওলানা রেজউল করিম কাসেমী	৩০	৮০০
১৫১.	হরিপুর বাজার মাদ্রাসা, জৈন্তাপুর, সিলেট	মাওলানা হেলাল উদ্দীন	২৪	৭৫০
১৫২.	দারুল উলুম হেমু জৈন্তাপুর, সিলেট	মাওলানা মাহমুদ আলী	৩০	৮০০
১৫৩.	জামেয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট	মাওলানা জিয়াউদ্দীন	৩১	৮০০
১৫৪.	জামেয়া রাজাগঞ্জ কানাইঘাট, সিলেট	মাওলানা মমতাজ উদ্দীন	২৬	৮০০
১৫৫.	জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ, সিলেট	মাওলানা শিব্বির আহমদ	৩৫	৮৫০
১৫৬.	জামেয়া সরাইঘাট মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট	মাওলানা শফিকুল হক	২৫	৭০০
১৫৭.	জামেয়া আকুনী মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট	মাওলানা হাবিব আহমদ	২৫	৭০০
১৫৮.	খরিলহাট মাদ্রাসা, জৈন্তাপুর, সিলেট	মাওলানা হাবিবুর রহমান	২৮	৬৫০
১৫৯.	লাফনাউট মাদ্রাসা, গোয়াইনঘাট, সিলেট	মাওলানা আব্দুল খালেক	৩০	১০০০
১৬০.	কৌড়িয়া মাদ্রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট	হাফেজ মাওলানা মুহসিন আহমদ	৩৫	১২০০
১৬১.	জামেয়া মুহাম্মদিয়া বিশ্বনাথ, সিলেট	মাওলানা শফিকুর রহমান	২৫	৯০০
১৬২.	দেউলগ্রাম মাদ্রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	৩০	১২০০
১৬৩.	মেউয়া মাদ্রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট	মাওলানা জিয়াউদ্দীন	৩২	১১০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
১৬৪.	মুন্সি বাজার মাদ্রাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা মোকাদ্দস আলী	২৮	৮০০
১৬৫.	হাড়িকান্দি মাদ্রাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা আব্দুল গণি	৩২	৯০০
১৬৬.	রাজারগাঁও মাদ্রাসা, শিবের বাজার, সিলেট	মাওলানা আব্দুল আহমদ	২৯	১১০০
১৬৭.	রামধা মাদ্রাসা, বিয়ানী বাজার, সিলেট	মাওলানা ইউসূফ খাদিমানী	২৮	৯০০
১৬৮.	জামেয়া দারুল হুদা দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	মাওলানা মুজিবুর রহমান কাসেমী	৩৫	২০০০
১৬৯.	ধলইগাঁও মাদ্রাসা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মান্নান	২৯	২১০০
১৭০.	ঢাকা দক্ষিণ মাদ্রাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা ছালেহ মুহাম্মদ জাকারিয়া	৩২	২৩০০
১৭১.	বুধবারী বাজার মাদ্রাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	৩৫	২৫০০
১৭২.	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল কোরআন, সিলেট	মাওলানা শাহিনুর পাশা চৌধুরী	৪৫	৩৫০০
১৭৩.	দরগাপুর মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ	মাওলানা মুশাহিদ আহমদ	৩২	৯০০
১৭৪.	কাতিয়া মাদ্রাসা, জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ	হাফেজ মাওলানা এমদাদুল্লাহ	৩৫	১২০০
১৭৫.	জাউয়া মাদ্রাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ	মুফতি আব্দুস সোবহান	২৯	১০০০
১৭৬.	হাসনাবাদ মাদ্রাসা, ছাতক সুনামগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল হান্নান	২৬	৮০০
১৭৭.	ছৈয়দপুর মাদ্রাসা, জগন্নাথপুর	মাওলানা মতিউর রহমান	২৯	১১০০
১৭৮.	ইছহাকপুর মাদ্রাসা, জগন্নাথপুর	মাওলানা আব্দুল আলী	৩৫	১৫০০
১৭৯.	মাদানিয়া মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল বাসির	৩২	৯০০
১৮০.	বামনগর মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ	মাওলানা গোলাপনবী	২৯	৮০০
১৮১.	তেঘরিয়া মাদ্রাসা, সদর সুনামগঞ্জ	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন	২৫	৯০০
১৮২.	মাদ্রাসাই নূরে মদিনা শায়েস্তাগঞ্জ	মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী	৩৫	১৫০০
১৮৩.	জামেয়া আরবিয়া ওমেদ নগর মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ	হাফেজ মাওলানা তফজ্জল হক	৩৫	৮৫০
১৮৪.	ইমামবাড়ী মাদ্রাসা, নবিগঞ্জ, সিলেট	মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	২৮	৬০০
১৮৫.	শামসুল উলুম মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, সিলেট	মাওলানা জহুর আলী	৩০	৯০০
১৮৬.	কাসেমুল উলুম বাহুবল মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ, সিলেট	হাফেজ মাওলানা তফজ্জল হক	৪০	৩০০০
১৮৭.	জামেয়া দ্বীনিয়া সদর, মৌলভীবাজার, সিলেট	মাওলানা মাসউদ আহমদ	৩৫	১৮০০
১৮৮.	দারুল উলুম মৌলভীবাজার, সিলেট	মাওলানা মাসুক আহমদ	৩২	১৫০০
১৮৯.	রায়পুর মাদ্রাসা, সদর, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা গিয়াস উদ্দীন	২৬	১২০০
১৯০.	জামেয়া লূতফিয়া আনোয়ারুল উলুম হামিদ নগর বরুনা মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল, সিলেট	মাওলানা খলিলুর রহমান হামিদী	৫১	২২০০
১৯১.	বড়লেখা রশিদিয়া মাদ্রাসা, বড়লেখা, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা আলাউদ্দীন	৩২	৬০০
১৯২.	সুনারগাও মাদ্রাসা, কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা আবুল কালাম	৩৫	৮০০
১৯৩.	মুন্সিবাজার মাদ্রাসা, কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা আব্দুল গফ্‌ফার	২৯	১২০০
১৯৪.	কর্মধা মাদ্রাসা, কুলাউড়া, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা নজরুল ইসলাম	৩০	৭০০
১৯৫.	আজিমগঞ্জ মাদ্রাসা, বড়লেখা, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা বদরুদ্দীন	৩০	১০০০
১৯৬.	খলাগাও মাদ্রাসা, বড়লেখা, মৌলভী বাজার, সিলেট	মাওলানা আলাউদ্দীন	২৯	৬৫০
১৯৭.	জামেয়া রহমানিয়া মৌলভীবাজার, সিলেট	মাওলানা জামিল আহমদ আনছারী	৩২	৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
১৯৮.	শেখ বাড়ি মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল, সিলেট	মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক	৩৫	২০০০
১৯৯.	জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, ঢাকা	মুফতি মাহমুদুল হাসান	২৭	৬০০
২০০.	জামিয়াতুল আযীয আল ইসলামিয়া, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা	মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক	৩৫	৯০০
২০১.	জামিয়াতু ইব্রাহীম সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ	মুফতি শফিকুল ইসলাম	৩০	৫০০
২০২.	জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	৪২	৮০০
২০৩.	আল জামিয়াতুল কাসেমিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা নুমান আহমদ	৩৬	৭০০
২০৪.	জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা	মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া	৫০	১৫০০
২০৫.	মসজিদে আকবর কমপ্লেক্স মাদ্রাসা, মিরপুর-১, ঢাকা	মুফতি দেলোয়ার হোসেন	২৫	৭৫০
২০৬.	দারুল উলুম মিরপুর-৬, ঢাকা	মুফতি রুহুল আমিন	৩২	৬০০
২০৭.	জামালুল কোরআন গেণ্ডারিয়া, ঢাকা	মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম	৩৫	৮০০
২০৮.	জামিয়া দ্বীনিয়্যাহ শামসুল উলুম পীরজঙ্গী, ঢাকা	মাওলানা শফিউল্লাহ	৩০	৭০০
২০৯.	শেখ জনুরুদ্দীন (রাঃ) মাদ্রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা	মাওলানা আবু মুছা	২৫	৮৫০
২১০.	আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল আরাবিয়া খিলক্ষেত, ঢাকা	মাওলানা ফজলুর রহমান	৩০	৮০০
২১১.	বাবুস সালাম এয়ারপোর্ট মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আনিসুর রহমান	৩০	৬৫০
২১২.	ইসলামিয়া গাওয়াইর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ	৩৬	৬০০
২১৩.	দারুল উলুম দিলুরোড় মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা সালাউদ্দীন	৪২	৮০০
২১৪.	জামিয়া মাদানিয়া রাজফুল বাড়িয়া সাভার, ঢাকা	মাওলানা মোস্তাফা	৪০	৯০০
২১৫.	জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা মোস্তাক আহমদ	৩৫	১৮০০
২১৬.	জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম, খুলনা	মাওলানা আবুল কালাম	৪০	২২০০
২১৭.	জাকারিয়া দারুল উলুম সেনহাট মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা আহমদ উল্লাহ	৩৫	১৫০০
২১৮.	জামিয়া মাদানিয়া আস আব্দুল উলুম মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা এমদাদুল্লাহ কাসেমী	২৯	১৬০০
২১৯.	জামিয়া রশিদিয়া গোয়ালখালী মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	৪৫	২৫০০
২২০.	আল জামিয়াতুল আরাবিয়া শামসুল উলুম মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৩২	২০০০
২২১.	জামিয়া আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা, শরই, বাগেরহাট খুলনা	মাওলানা আমিরুল ইসলাম	৩৬	১৮০০
২২২.	জামিয়া হালিমিয়া বাঘেরহাট মাদ্রাসা, খুলনা	মাওলানা আহমদ ইকবাল	২৫	১২০০
২২৩.	জামিয়া এজাজিয়া দারুল উলুম রেলষ্টেশন মাদ্রাসা, যশোর খুলনা	মুফতি ওয়াক্কাস	৩৮	২২০০
২২৪.	জামিয়া এমদাদিয়া মাদানী নগর মাদ্রাসা, যশোর খুলনা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	৫৩	২৬০০
২২৫.	মদিনাতুল উলুম বাসনা মাদ্রাসা, যশোর খুলনা	মাওলানা ইব্রাহিম	৩৫	১৩০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
২২৬.	শামসুল উলুম লক্ষীপাশা মাদ্রাসা, নড়াইল খুলনা	মাওলানা ইকরামুল হক	৪৫	১৬০০
২২৭.	জামিয়া কোরাআনিয়া পৌর গোরস্থান কওমী মাদ্রাসা, মাগুরা	মাওলানা ইসমাইল	৪২	১৮০০
২২৮.	কাসেমুল উলুম কওমী মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ	মাওলানা ওসমান গণি	৩৩	১১০০
২২৯.	ইদ্রিচ আলী বিশ্বাস আল্লাহর দরগা মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা খাজা রফিকুজ্জামান শাহ	৩৭	১২০০
২৩০.	দারুল উলুম সাতক্ষীরা মাদ্রাসা,	মাওলানা আব্দুর রহমান	৪০	১৫০০
২৩১.	নাসরুল উলুম মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	মুফতি মাহফুজুর রহমান	৩০	৮০০
২৩২.	দারুল মুকাররম মাদ্রাসা, খুলনা	হাফেজ মাওলানা মোহেসেনুদ্দীন	৪৫	১৪০০
২৩৩.	জামিয়া আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম মাদ্রাসা, নোয়াপাড়া যশোর	মাওলানা খাজা রফিকুজ্জামান শাহ	৫০	১৮০০
২৩৪.	দড়াটানা মাদ্রাসা, যশোর, খুলনা	মাওলানা আব্দুল হামিদ	২৫	৭০০
২৩৫.	বরুড়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা নুমান	২৭	৬০০
২৩৬.	জামিয়া রশিদিয়া রানীর বাজার মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা মুনির হোসেন	৩৫	১২০০
২৩৭.	বট্টগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা নুরুল হক	৩৬	১২০০
২৩৮.	জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানী মাদ্রাসা, চাঁদপুর, কুমিল্লা	মাওলানা মাহবুবে এলাহী	৫৫	২৬০০
২৩৯.	মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	৪৩	১৫০০
২৪০.	জামিয়া ইসলামপুর মাদ্রাসা, নরসিংদী	হাফেজ মাওলানা আব্দুল হান্নান	৪৪	৮০০
২৪১.	জামিয়া ইসলামিয়া কারিমিয়া নুরুল উলুম জুম্মাপাড়া মাদ্রাসা, রংপুর	হাফেজ মাওলানা ইদ্রিছ	৫৪	১৫০০
২৪২.	দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মুফতি রুহুল আমিন	৫৫	২৩০০
২৪৩.	কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মুফতি আব্দুল গাফ্ফার	৪৫	১৯০০
২৪৪.	জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মুফতি মুবারেকুল্লাহ	৬০	২৫০০
২৪৫.	জামিয়া দারুল আরকাম মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা সাজেদুর রহমান	৭০	৩৫০০
২৪৬.	খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা আব্দুল মজিদ	৩৫	১৩০০
২৪৭.	জামিয়া রশিদিয়া আহসানাবাদ চরমোনাই, বরিশাল	মুফতি রেজাউল করিম	৬০	২৫০০
২৪৮.	আলী নগর আজিজিয়া মাদ্রাসা, ভোলা	মাওলানা তৈয়বুর রহমান	২৫	৯০০
২৪৯.	জামিয়া আহলিয়া ইজ্জতুল ইসলাম চরখলিফা মাদ্রাসা, ভোলা	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	৪৫	১৬০০
২৫০.	নিউ টাউন মাদ্রাসা, দিনাজপুর	মাওলানা হোসাইন আহমদ	৫৫	১৯০০
২৫১.	জামিয়া ইসলামিয়া মমিনপুর মাদ্রাসা, চাঁদপুর	হাফেজ মাওলানা মুহসিন	৪৩	৮০০
২৫২.	জামিয়া আশরাফুল মাদারেস, নোয়াখালী	মাওলানা আব্দুল কবির	৪৫	৯০০
২৫৩.	আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা তৈয়ব	৩০	৭৫০
২৫৪.	জামিয়া আশরাফিয়া ফুলগাজী, ফেনী	মুফতি হাবিবুর রহমান	৫০	১৫০০
২৫৫.	জামিয়া মাহমুদিয়া মদিনাতুল উলুম বাথুয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা শফি	৪৫	৮০০
২৫৬.	জামিয়া রহমানিয়া নোয়াখালী	মাওলানা সৈয়দ আহমদ	৪০	৯০০
২৫৭.	দারুল উলুম ধর্মপুর ফেনী, নোয়াখালী	মাওলানা ইলিয়াছ	৩০	৭০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
২৫৮.	জামিয়া দারুল উলুম রহিমপুর, ফেনী	মাওলানা আবু তাহের	৩৩	৫০০
২৫৯.	জামিয়া মনিরুল উলুম, ফেনী	মাওলানা নুরুল আহমদ	৩৫	৫০০
২৬০.	জামিয়া ইসলামিয়া হাট মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা আবু তাহের	৪৪	৭০০
২৬১.	মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়া রামগতি, ফেনী	মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ	৪৫	৮০০
২৬২.	মদিনাতুল উলুম মাইজদিকোর্ট, ফেনী	মাওলানা মুজিবুল্লাহ	৩০	৭০০
২৬৩.	জামিয়া দারুল উলুম চৌমহনী, নোয়াখালী	মাওলানা আব্দুল মোমেন	৪০	৮০০
২৬৪.	মাদ্রাসায়ে নূরীয়া মাইজদি কোর্ট, নেয়াখালী	মাওলানা হানিফ	৩৫	৮৫০
২৬৫.	জামিয়াউল উলুম মাদ্রাসা, লাম্বুরহাট, চট্টগ্রাম	মাওলানা কাসেম	৩০	৬৫০
২৬৬.	কবিরহাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা নজির আহমদ	৩০	৭০০
২৬৭.	কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	মাওলানা আব্দুল বাকী	৩৫	৮০০
২৬৮.	ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মাওলানা কবির আহমদ	৩০	৮০০
২৬৯.	শামসুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মুফতি আব্দুল কাদের	৪৪	৯০০
২৭০.	কমরপুর মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মাওলানা হেলাল উদ্দীন	৩৩	৫০০
২৭১.	দারুল উলুম ইসলামিয়া খুলনা	মুফতি ওয়াক্কাস	৫৫	১৭০০
২৭২.	মাদ্রাসা, জমিরিয়া কাসেমুল উলুম, বড়াইগ্রাম, নাটোর	মাওলানা নুরুল ইসলাম	৫০	১৫০০
২৭৩.	এজাজিয়া দারুল উলুম রেলষ্টেশন, যশোর	মাওলানা আবুল হাসান	৪৫	১১০০
২৭৪.	জামিয়া ইসলামিয়া ময়মনসিংহ	মাওলানা মিয়া হোসেন	৫৫	১৪০০
২৭৫.	জামিয়া মিফতাহুল উলুম নেত্রকোণা	মাওলানা মনজুরুল হক	৪০	১২০০
২৭৬.	মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা নেছারউদ্দীন	৩৪	৭০০
২৭৭.	দারুস সালাম মাদ্রাসা, সোহাগী, ইশ্বরগঞ্জ	মাওলানা হোসাইন আহমদ	৩৫	৮০০
২৭৮.	মাদ্রাসায়ে মদিনাতুল উলুম তারাকান্দি ময়মনসিংহ	মাওলানা ইব্রাহিম	৩৪	৭০০
২৭৯.	যাকারিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, সেনহাটী দৌলতপুর খুলনা	মাওলানা মুজিবুর রহমান	৪০	১১০০
২৮০.	মাদ্রাসায়ে যাকারিয়া দারুল উলুম সোসাইটি দৌলতপুর, খুলনা	মাওলানা আব্দুল বারি	৪৫	১৩০০
২৮১.	ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া	মাওলানা ইউসুফ বরিশালী	৩৪	৬০০
২৮২.	ইসলামিয়া হোসাইনিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা, নাসিরনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ক্বাজী মাওলানা সাহেব আলী	৪২	৯০০
২৮৩.	খকনী দারুল উলুম মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল জলিল	৩২	৭০০
২৮৪.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল দ্বীনিয়া দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী	মাওলানা মাহমুদ হাসান	৪০	১৫০০
২৮৫.	মারকাযুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়া গাবতলী, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল হাকিম	৪০	১২০০
২৮৬.	জামিয়া-ই আশ্রাফুল উলুম ও এতিমখানা, ধুলেরচর, টাঙ্গাইল	মাওলানা আব্দুল আজিজ	৩০	৮০০
২৮৭.	জামিয়া ইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মদ মিয়া কাসেমী মাদ্রাসা, রাজশাহী	মাওলানা জামাল উদ্দীন মাহমুদ	৩৫	৭০০
২৮৮.	বান্দাই ভাটা মাদ্রাসা, নাটোর	মাওলানা জামাল উদ্দীন মাহমুদ	২৮	৭০০
২৮৯.	মাদ্রাসা, মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া, বনশ্রী, ঢাকা	মাওলানা ইহতিশামুল হক নুমান	৩৫	৭৬০
২৯০.	মারকায-এ তালীমুল কোরআন সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ	মাওলানা আব্দুর রশিদ খান	৩০	৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
২৯১.	দারুল ইহসান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ	মুফতি ইমাদ উদ্দীন	২৭	৮০০
২৯২.	মাদ্রাসা, ওমর ইবনে খাত্তাব, ফরিদাবাদ	মুফতি ইমাদ উদ্দীন	৩২	৭০০
২৯৩.	জামিয়া ইউনুছিয়া ছানিয়া সৈয়দাবাদ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা আব্দুর রশীদ	৩৫	৯০০
২৯৪.	জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা মাহফুজুল হক	৬৫	৭০০০
২৯৫.	দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	মুফতি রুহুল আমিন	৫৫	৩৫০০
২৯৬.	জামি'আ মাহমুদিয়া ইসলামিয়া, কদমতলী, ঢাকা	মুফতি মুহিব্বুল্লাহ কাসেমী	৪২	২৫০০
২৯৭.	মারকাযুদ দাওয়াহ আল- ইসলামিয়া, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল মালেক	২৫	৮০০
২৯৮.	দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসা, নিউমার্কেট, ঢাকা	মুফতি নিয়ামতুল্লাহ	৩২	১২০০
২৯৯.	জামিয়া আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উত্তর যাত্রাবাড়ী	মুফতি বোরহান উদ্দীন	৩৫	১৬০০
৩০০.	মারকাযুল উলুম আশ শরইয়্যাহ, হাজারীবাগ, ঢাকা	মুফতি আব্দুর রহমান কাসেমী	৩২	৮০০
৩০১.	আল-মানাহাল মডেল কওমি মাদ্রাসা, উত্তরা, ঢাকা	মাওলানা কিফায়েতুল্লাহ আরমান	২৫	৮০০
৩০২.	মারকাযুল বুহ্স আল-ইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা	মুফতি হারুন	৩৫	৭০০
৩০৩.	মাদ্রাসা,তুস সুফ্ফা আল-ইসলামিয়া, বাসাবো, ঢাকা	মাওলানা আবু তাহের রহমানী	৪০	২০০০
৩০৪.	মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া, হাজীপাড়া, ফতুল্লা	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	৩৫	৯০০
৩০৫.	দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ সি পল্লবী, ঢাকা	মুফতি নুরুজ্জামান	৩৫	৮০০
৩০৬.	জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম লাকসাম, কুমিল্লা	মাওলানা আশরাফ আলী	৪০	১৫০০
৩০৭.	মাদ্রাসাতুল এস্তেদাদ দক্ষিণখান, ঢাকা	মাওলানা ওয়ায়েজ উদ্দীন কাসেমী	৩৫	৯০০
৩০৮.	মারকাযুস শরাফতুল উলুম কামরাঙ্গিচর, ঢাকা	মাওলানা জাফরুল্লাহ মাহবুব	৩৫	১২০০
৩০৯.	আল-জামিয়াতুল শামসুল উলুম মূলপাড়া, হাজীবাড়ি, নরসিংদী	মাওলানা সালাহ উদ্দীন আহমদ	৪০	১৬০০
৩১০.	মারকাযুল হুজ্জাতিল ইসলাম, মাতুয়াইল, ঢাকা	মুফতি জিয়াউর রহমান আহমদি	৩৫	১২০০
৩১১.	মারকাযুল মাআরিফুল ইসলামিয়া মিরপুর, ঢাকা	মুফতি আব্দুল হাকিম	২৮	৬০০
৩১২.	হাস্সান বিন সাবেত ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, বারিধারা, ঢাকা	মুফতি হাসানুল কাদির	২৫	৭০০
৩১৩.	দারুল ইফতা ওয়াল বুহিছিল ইসলামিয়া, ধামরায়, ঢাকা	মুফতি আতিকুর রহমান	৩২	৬৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৩১৪.	জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া গাজীপুর, ঢাকা	মুফতি নুরুল ইসলাম	৩৫	৮০০
৩১৫.	মাদ্রাসাতুল ইত্কুন লি উলূমিল কোরআন রসুলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মাওলানা আনিসুর রহমান	৪০	১৬০০
৩১৬.	মারকাযুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মাওলানা নেছার আহমদ আন-নাছিরী	৩৮	১৮০০
৩১৭.	আল- জামিয়া ইসলামিয়া ময়মনসিংহ বড় মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী	৩০	৮০০
৩১৮.	শায়খ যাকারিয়া ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, বারিধারা, ঢাকা	মুফতি সাঈদ	৪৫	১২০০
৩১৯.	জামিয়া শায়খ যাকারিয়া, কাঁচকরা উত্তরখান, ঢাকা	ড.মাওলানা মুসতাক আহমদ	৩৫	৯০০
৩২০.	জামিয়া এমদাদীয়া কল্যাণপুর, ঢাকা	মাওলানা আবু তাহের জিহাদী	৩৫	৮০০
৩২১.	জামিয়া ইসলামীয়া মাহমুদীয়া মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব	৪০	১৫০০
৩২২.	আল-জামিয়াতুল ইসলামীয়া জান্নাতুল আতফাল শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা কাজী মঈনুদ্দীন আহমদ	২৫	৬০০
৩২৩.	জামিয়া ইমদাদীয়া আরাবিয়া দলিপাড়া উত্তর ঢাকা	মাওলানা শেখ আজিম উদ্দীন	৩০	৯০০
৩২৪.	জামিয়া ইসলামিয়া মফিজিয়া মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর	মুফতি শামীম আহমদ	৩২	৬০০
৩২৫.	নূরে মদীনা মাদ্রাসা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা আমিনুল হাসান সিদ্দিকী	৪০	১৩০০
৩২৬.	জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম ভাদুঘর ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা মুনিরুজ্জামান সিরাজী	৪৫	২০০০
৩২৭.	জামিয়া ইসলামিয়া খারাসপুর মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মুফতি আব্দুল কাদির	২৬	৭০০
৩২৮.	জামিয়া ইকরা, ঢাকা	মাওলানা ছদরুদ্দীন মাকনুন	৪০	১৮০০
৩২৯.	জামিয়া রশিদিয়া আহসানাবাদ চরমোনাই	মুফতি রেজাউল করিম	৭০	৬০০০
৩৩০.	মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা	মুফতি আব্দুর রহমান	৮০	৩৫০০
৩৩১.	জামিয়া ইসলামীয়া মারকাযুল উলুম, খুলনা	মুফতি গোলাম রহমান	৪৫	২৫০০
৩৩২.	তালীম কোরআন মাদ্রাসা, সেগুনবাগান, খুলশী, চট্টগ্রাম	হাফেজ তৈয়ব	৭০	২৫০০
৩৩৩.	জামিয়া ইসলামিয়া রাজাপুর মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা মোহাম্মদ সাঈদ	৪০	১০০০
৩৩৪.	জয়নুল উলুম সিংআড্ডা মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা সানাউল্লাহ আমিনী	৩৮	৯০০
৩৩৫.	জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম কুমিল্লা	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক	৪০	১১০০
৩৩৬.	জামিয়া রশিদিয়া আজিজুল উলুম. কুমিল্লা	হাফেজ মাওলানা মুনির	৪৫	১৫০০
৩৩৭.	করিমপুর দারুল উলুম মহিউস্সুন্নাহ মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা মোস্তাফা মাহমুদী	৫০	২০০০
৩৩৮.	জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদি মাদ্রাসা, নোয়াখালী (আল আমিন মাদ্রাসা,)	মাওলানা আজিজুল্লাহ নওয়াব	৬৫	২৫০০
৩৩৯.	বড়গাওঁ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	আলহাজ্ব মাও বদিউল আলম	৩৫	৭০০
৩৪০.	জামিয়া ইসলামিয়া কলাকূপা মাদ্রাসা, লক্ষীপুর	মাওলানা কলিমুল্লাহ	৩৮	৭০০
৩৪১.	মাদ্রাসা, এ আশরাফুল মাদারিস, বটতল, লক্ষীপুর	মাওলানা মামুন ইবনে আব্দুল কবির	৩৫	৬০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৩৪২.	চরমুটুয়া আল আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, লক্ষীপুর	মাওলানা আবু তাহের	৪০	৮০০
৩৪৩.	জামিয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপুল, ফেনী	মুফতি সাঈদ আহমদ	৭০	২৫০০
৩৪৪.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ঢাকারগাঁও দাউদকান্দি, কুমিল্লা	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	৬৫	১৮০০
৩৪৫.	দারুল উলুম আল হোসাইনিয়া ওলামা বাজার মাদ্রাসা, ফেনী	মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ	৫০	১৮০০
৩৪৬.	নূরীয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, শাটিরপাড়া, নরসিংদী	মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ	৩২	১১০০
৩৪৭.	মাদ্রাসাতুল হিদায়া কামরাঙ্গিচর, ঢাকা	মাওলানা আলাউদ্দীন	৩০	১০০০
৩৪৮.	আল জামিয়া দারুল উলুম হারিনাল মাদ্রাসা, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা শরফুদ্দীন	৩৫	১৩০০
৩৪৯.	জামিয়া ওসমানিয়া দারুল সাতইশ টঙ্গি, ঢাকা	মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	৩৮	১৩৫০
৩৫০.	দারুল উলুম দত্তপাড়া, নরসিংদী	মাওলানা শওকত হোসাইন	৩৫	১২০০
৩৫১.	জামিয়াতুস্সুন্নাহ শিবচর, মাদারীপুর	মাওলানা নিয়ামত আলী	৪২	১৩০০
৩৫২.	আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া কওমী মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আব্দুস সামাদ	৪০	১৬০০
৩৫৩.	শামশুল উলুম কওমী মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আকরাম হোসাইন	২৫	৭০০
৩৫৪.	আশরাফুল উলুম বালিয়া, ময়মনসিংহ	মাওলানা আইনুদ্দীন	৩০	৯০০
৩৫৫.	জামিয়া ইসলামিয়া তল্লী গফরগাঁও ময়মনসিংহ	মাওলানা ফজলুল রহমান খান	৩৫	১০০০
৩৫৬.	জামিয়া আশরাফিয়া খাগডহর, ময়মনসিংহ	মাওলানা তাজুল ইসলাম	২০	৬০০
৩৫৭.	জামিয়া আরাবিয়া মাখজানুল উলুম, ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী	৩৫	১২০০
৩৫৮.	জামিয়া আরাবিয়া মিফতাহুল উলুম মাসখান্দা, ময়মনসিংহ	মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন	২৫	৬০০
৩৫৯.	জামিয়া আহাদিয়া বারুই গ্রাম ময়মনসিংহ, ঢাকা	মুফতি ইব্রাহিম	২৭	৫০০
৩৬০.	জামিয়া মাহমুদিয়া আরাবিয়া মদিনাতুল উলুম, টাঙ্গাইল, ঢাকা	মাওলানা শামসুল হক	৪০	১৫০০
৩৬১.	দেওহাটা এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল, ঢাকা	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২৫	৭০০
৩৬২.	জামিয়া কোরআনিয়া মে'রাজুল উলুম, নরসিংদী	মাওলানা ইসমাইল হোসেন নূরপুরী	২৩	৬০০
৩৬৩.	তালুক কান্দি শামশুল উলুম মাদ্রাসা, নরসিংদী	মাওলানা আমজাদ হোসাইন	২৮	৮০০
৩৬৪.	আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদপুর	হাফেজ মাওলানা কবির আহমদ	৩০	৮০০
৩৬৫.	জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া বাহিরদিয়া, ফরিদপুর	মাওলানা আকরাম আলী	৩২	১২০০
৩৬৬.	জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম খাবাশপুর ফরিদপুর	মুফতি কবির আহমদ	৩০	১১০০
৩৬৭.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম, ভৈরব	মাওলানা আব্দুচ্ছালাম	৩০	১২০০
৩৬৮.	দারুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা খায়রুল ইসলাম	৩০	৭০০
৩৬৯.	মক্কীনগর মাদ্রাসা, আব্দুল্লাপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল হাকিম	৩০	৭০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৩৭০.	উত্তর বেগুনবাড়ি ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	২৪	৪৫০
৩৭১.	জামিয়া তা'লীয়া মাদ্রাসা, আদর্শ নগর, কুতুবপুর, ফতুল্লাহ, ঢাকা	মাওলানা হাফিজুর রহমান	৩০	১০০০
৩৭২.	দারুল কোরআন হাজী ইউনুছ কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা গোলাম মোস্তাফা	২৮	৭০০
৩৭৩.	মদিনাতুল উলুম নূরীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	হাফেজ ক্বারী ইব্রাহিম বিন আলী	২৫	৬০০
৩৭৪.	মাদ্রাসা, এ মারকাযুন নূর ঢালকা নগর, ঢাকা	মাওলানা তৈয়ব আশরাফ	৩০	১২০০
৩৭৫.	জামিয়া রহমানিয়া ছোটবন, রাজশাহী	মুফতি আব্দুল জাব্বার	৩৫	১২০০
৩৭৬.	জামিয়া ইসলামিয়া শাহ মাখদুম দরগাপাড়া, রাজশাহী	মাওলানা শাহাদাত আলী	৩২	১১০০
৩৭৭.	আল জামিয়া আল ইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মদ মিয়া কাসেমী, রাজশাহী	মাওলানা জামাল উদ্দীন মাহমুদ	৪২	১৫০০
৩৭৮.	জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনাবাদ, রাজশাহী	মাওলানা সেলিম উদ্দীন	৩৮	১৩০০
৩৭৯.	জামিয়া নিজামিয়া দারুল উলুম বেতুয়া, রাজশাহী	মাওলানা মাহমুদ আলী	৩২	৯০০
৩৮০.	জামিয়া হোসাইনিয়া মদিনাতুল ইলূম, সিরাজগঞ্জ	মাওলানা মাসুম উদ্দীন	৩৫	১০০০
৩৮১.	কাসেমুল উলুম জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া	মাওলানা আব্দুল হক	৬০	৩৫০০
৩৮২.	জামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল	মাওলানা ওবায়দুর রহমান মাহবুব	৫৫	২৪০০
৩৮৩.	জামিয়া হোসাইনিয়া, বরিশাল	মাওলানা শওগাত আলী	৩৬	৯০০
৩৮৪.	জামিয়া মুহাম্মদিয়া মর্জিদিয়া গৌরনদী		৩৩	৭০০
৩৮৫.	জামিয়া মাদানিয়া হাজী ওমর শাহ রহ. বরিশাল	মাওলানা শিব্বির আহমদ	৩৮	৭৫০
৩৮৬.	বরিশাল বহুমূখী ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও দারুল ইফতা, বরিশাল	মাওলানা নজরুল ইসলাম	২৫	৫০০
৩৮৭.	ধর্মদী ফয়জুল উলুম ইসলামিয়া কওমী মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা মোঃ ইদ্রিছ	৩৬	৭০০
৩৮৮.	জামিয়া ইসলামিয়া, বরগুনা	মাওলানা আব্দুল করিম	৪২	৯০০
৩৮৯.	দারুল উলুম আশরাফিয়া ইমদাদিয়া গালুয়া, ঝালকাটি	মাওলানা আব্দুল হক পীর সাহেব	৪৫	১০০০
৩৯০.	জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া কারিমপুর, ঝালকাটি	মাওলানা নুরুল হুদা ফয়েজী	৪৪	১৫০০
৩৯১.	দারুল উলুম রাজাপুর, ঝালকাটি	ক্বারী বেলায়েত হোসাইন	৪৫	১৪০০
৩৯২.	এইইয়াউল উলুমুল দ্বীন মাটি ভাঙ্গা ভান্ডারীয়া পিরোজপুর	মাওলানা আব্দুল জলিল	২৫	৭০০
৩৯৩.	দারুল উলুম মালি পাড়া জিয়ানগর ফিরোজপুর	হাফেজ শমসুল হক	২৮	৬০০
৩৯৪.	খলিসাখালী আশারাফুল উলুম মাদ্রাসা, ফিরোজপুর	মাওলানা আব্দুর রউফ	৩৬	৭০০
৩৯৫.	মাদ্রাসা,য়ে আরাবিয়া সাতকাসেমিয়া, ফিরোজপুর	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ	৪০	৮০০
৩৯৬.	বাজেমহল ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা, পটুয়াখালী	মাওলানা রফিকুল ইসলাম	৫২	১২০০
৩৯৭.	আহলিয়া ইজ্জাতুল ইসলাম মাদ্রাসা, ভোলা	মাওলানা ফয়েজ উল্লাহ	৫০	১৫০০
৩৯৮.	জামিয়া ইসলামিয়া মুহাম্মদিয়া গোরস্থান, ভোলা	মাওলানা মাঈনুদ্দীন	৪৫	১৩০০
৩৯৯.	জামিয়া ইসলামিয়া চরশুভি মাদ্রাসা, দৌলতখান, ভোলা	মাওলানা মুফিজুল ইসলাম	৩৬	৮০০
৪০০.	মদিনাতুল উলুম হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, তমুজুদ্দীন ভোলা	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২৭	৬০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৪০১.	হামিউস্‌সুন্নাহ তাবলিগুল উলুম মাদ্রাসা, রংপুর	মাওলানা আহমদ উল্লাহ	৩০	৫০০
৪০২.	আল জামিয়াতুল আরাবিয়া সৈয়দপুর, রংপুর	মাওলানা আবুল কালাম	৩৫	৬০০
৪০৩.	জামিয়া আরাবিয়া নুরুল উলুম জুম্মাপাড়া রংপুর	হাফেজ ইদ্রিছ	৪৫	১২০০
৪০৪.	জামিয়া আরাবিয়া দারুল হেদায়া পোরশা, নওগাঁ	মাওলানা হারুন ইসলাম	২৮	৭০০
৪০৫.	জামিয়া আরাবিয়া নীলফামারী রংপুর	মাওলানা আহমদ উল্লাহ	৪৬	১৩০০
৪০৬.	ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া দারুস্ সালাম, ঠাকুরগাও	মাওলানা আকরাম আলী	৪০	১০০০
৪০৭.	জামিয়া ইসহাকিয়া ইসলামিয়া রায়পুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর	মাওলানা আবু বকর	৪২	১১০০
৪০৮.	ইসলামিয়া আজিজিয়া আনোয়ারুল উলুম, দিনাজপুর	মাওলানা হারুন চৌধুরী	২৫	৪০০
৪০৯.	আজিজিয়া কওমী মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা তৈয়বুর রহমান	৫৫	১৪০০
৪১০.	নাসির গাজী মাদ্রাসা, ভোলা বরিশাল	মাওলানা আবুল বশর	২৭	৪০০
৪১১.	চরপাতা মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা ফারুক আহমদ	৩৪	৭০০
৪১২.	বোখারবান্দা মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা আনাছ	৩২	৬০০
৪১৩.	মীর্জাখালী মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	৩৩	৬০০
৪১৪.	সাহেবেরহাট কওমী মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা মুফিজ	৩৮	৭০০
৪১৫.	বালিয়া কওমী মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা আবু ছালেহ	৩৪	৬৫০
৪১৬.	রাজারব্রগ কওমী মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল	মাওলানা হাবিবুর রহমান	২৮	৪৩০
৪১৭.	জামিয়া ইসলামিয়া টেক্সটাইল মাদ্রাসা, দিনাজপুর	মাওলানা আমান উল্লাহ	২৬	৬০০
৪১৮.	দারুল উলুম মালুপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী	হাফেজ মাওলানা আব্দুচ ছালাম	২৫	৬৫০
৪১৯.	জামিয়া মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী	মাওলানা আবু সাঈদ	২৮	৫০০
৪২০.	জামিয়া ইসলামিয়া রেলওয়ে, সিরাজগঞ্জ	মাওলানা নজরুল ইসলাম	৪০	১৩০০
৪২১.	জামিয়া ইসলামিয়া আলিমপুর সিরাজগঞ্জ	মাওলানা আমজাদ আলী	৩৮	১১০০
৪২২.	জামিয়া দারুল উলুম পোরশা, সিরাজগঞ্জ	মাওলানা শরীফ উদ্দীন	৩২	৭০০
৪২৩.	জামিয়া ইসলামিয়া হেদায়া , সিরাজগঞ্জ	মাওলানা হারুন চৌধুরী	২৮	৪০০
৪২৪.	জামিয়া দারুল কুরআন সাইন বোর্ড, ঢাকা	মাওলানা সানাউল্লাহ আমিনী	২৭	৩৫০
৪২৫.	সিরাজুল উলুম মাদ্রাসা, ফিরোজপুর	মাওলানা আলী আকবর	৩৩	৬০০
৪২৬.	মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসা, ফিরোজপুর	মাওলানা ইসমাইল	৩৫	৬০০
৪২৭.	জামিয়া ইমদাদিয়া, ফিরোজপুর	মাওলানা নুরুল ইসলাম	৩৫	৫০০
৪২৮.	জামিয়া রহমানিয়া, ফিরোজপুর	মাওলানা শহিদুল্লাহ	৪৫	১২০০
৪২৯.	দারুল উলুম, ফিরোজপুর	মাওলানা আব্দুল জাব্বার	৪৮	১৪০০
৪৩০.	হরিণপুর কওমী মাদ্রাসা, ফিরোজপুর	মাওলানা আব্দুশ শহীদ	৪২	১০০০
৪৩১.	দারুল উলুম ইফতা মাদ্রাসা, ফিরোজপুর	মাওলানা আবু সাঈদ	২৮	৫০০
৪৩২.	হামিউস্‌সুন্নাহ কাসেমুল উলুম কওমী মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম, রংপুর	মাওলানা আমিনুল ইসলাম	৫৫	১৩০০
৪৩৩.	জামিয়া ফজলুল করিম রহ. মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম, রংপুর	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	২৫	৭০০
৪৩৪.	জামিয়া শরিয়্যাহ কুড়িগ্রাম, রংপুর	মাওলানা আব্দুল হান্নান	৪৫	৯০০
৪৩৫.	জাফরাপুর কওমি মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম, রংপুর	মুফতি জামাল উদ্দীন	৩৮	৯০০
৪৩৬.	জামিয়াতুশ সাহাবা মাদ্রাসা, বাগেরহাট খুলনা	মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক	৪০	১২০০
৪৩৭.	জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বাগেরহাট, খুলানা	মাওলানা আব্দুল মাবুদ	৩৫	৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৪৩৮.	দারুল উলুম চিতলমারি মাদ্রাসা, বাগেরহাট	মাওলানা আব্দুর রহমান	৩৮	৪০০
৪৩৯.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম, বাগেরহাট	মাওলানা ইব্রাহিম ফারুকী	৩৫	৫০০
৪৪০.	ইসলামিয়া কওমী মাদ্রাসা, বাঘেরহাট	মাওলানা তাজাল্লাহ	৩৮	৬০০
৪৪১.	তিনট্যহরী মুহিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন	২৩	৭৫০
৪৪২.	খাদিজাতুল কোবরা বালক/বালিকা মাদ্রাসা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি	মুফতি দিদারুল আলম	২৫	৬৫০
৪৪৩.	হামিউস্‌সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসা, কালকিনি, মাদারীপুর	মাওলানা হাবিবুর রহমান	২৮	৪৫০
৪৪৪.	আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার	মুফতি কিফায়েতুল্লাহ	৩৬	৫০০
৪৪৫.	ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, টেকনাফ, কক্সবাজার	মুফতি আরশাদ রহমানী	২৫	৪০০
৪৪৬.	হোসাইনিয়া ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার	মুফতি কিফায়েতুল্লাহ	২৮	৭৫০
৪৪৭.	দারুল উলুম সাবরাং মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা নূর আহমদ	৪৫	১০০০
৪৪৮.	আহমদিয়া বাহারুল উলূম মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা হোসাইন আহমদ	৪২	৮০০
৪৪৯.	জামিয়া দারুস্‌সুন্নাহ হ্নীলা টেকনাফ	মাওলানা আখতার কামাল (ছুফী সাহেব)	৪৮	৯০০
৪৫০.	জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসা, নয়াপাড়া সাবরাং টেকনাফ	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৩৫	৭০০
৪৫১.	দারুত তারবিয়্যাহ কক্সবাজার	মাওলানা মোহাম্মদ আমিন	২৮	৮০০
৪৫২.	দারুশ শরিয়্যাহ আল ইসলামিয়া, কক্সবাজার	মাওলানা শাহাবুদ্দীন	৩৭	৬০০
৪৫৩.	দারুস্‌সুন্নাহ আজিজিয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা আমান উল্লাহ	৩৫	৫০০
৪৫৪.	জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মুফতি আব্দুর রহমান	৩০	৪০০
৪৫৫.	ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, কক্সবাজার	মুফতি কিফায়েতুল্লাহ	২৬	৪০০
৪৫৬.	মাদ্রাসা, সায়্যিদুশ শুহাদা রাউজান, চট্টগ্রাম	হাজী মাওলানা ইউসুফ	৩৩	৪০০
৪৫৭.	সোলতানিয়া আজিজুল উলুম খিরাম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আনাছ সোলতানী	২৫	৫৫০
৪৫৮.	ধর্মপুর এমদাদিয়া সোলতানুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুল মতিন	২৮	৬০০
৪৫৯.	বায়তুল হুদা মাদ্রাসা, বখতপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা এমদাদ হাসান	৩৬	৫০০
৪৬০.	পুরান রামগড় কাজী বাড়ী মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবুল কালাম	৩০	৮০০
৪৬১.	মদিনাতুল উলুম নতুন বাজার, ফটিকছড়ি	মুফতি ইউসুফ	৩০	৭৫০
৪৬২.	আল ইহসান মাদ্রাসা, ফেনী	মাওলানা শহিদুল ইসলাম	২৫	৬০০
৪৬৩.	আল হেরা ইসলামি একাডেমী, ফেনী	মাওলানা আতিকুল্লাহ আল মামুন	২৫	৭৫০
৪৬৪.	দক্ষিণ বধূয়াই তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসা, সদর ফেনী	হাফেজ রফিকুল ইসলাম ভূইয়া	২৮	৪৫০
৪৬৫.	শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক সেন্টার, বনানী, ঢাকা	মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ	৩৫	৬০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৪৬৬.	মকসুদপুর ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, দোহার, ঢাকা	মাওলানা আকরাম হোসাইন	৩৩	৫৫০
৪৬৭.	জামিয়া ফয়জুর রহমান (রহ.) মাদ্রাসা, সদর ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুল হক	৪০	৮০০
৪৬৮.	দাওয়াতুল হক মাদ্রাসা, চায়নামুখ ময়মনসিংহ	শেখ মাওলানা আব্দুল হক	৩২	৫০০
৪৬৯.	কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা আশ্রাফ আলী	২৭	৭৫০
৪৭০.	জামিয়া ইসলামিয়া মানিকনগর, ঢাকা	মাওলানা ইসহাক কাসেমী	৩৫	৬০০
৪৭১.	বালুয়া চৌমহনী ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা আবু তাহের	২৫	৪৫০
৪৭২.	জোরাইন ফজলুল উলুম মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা ইয়াছিন খান সা'দী	৩৫	৫৫০
৪৭৩.	জামিয়া কুরআনিয়া বৈয়াপুর, নরসিংদী	মাওলানা আব্দুচ ছালাম	৩৮	৮০০
৪৭৪.	জামিয়া মেরাজুল উলুম মাদ্রাসা, নরসিংদী	মাওলানা আব্দুল আহাদ	৩২	৬৫০
৪৭৫.	জামিয়া ইসলামিয়া রাণী শংকৈল, ঠাকুর গাঁও	মাওলানা আরশাদুল ইসলাম	৩৫	৫৫০
৪৭৬.	জামিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, ফেনী	হাফেজ রশিদ আহমদ	৩৫	৬৫০
৪৭৭.	হোসাইনিয়া লালপুল মাদ্রাসা, ফেনী	মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ	৫০	১২০০
৪৭৮.	জামিয়া রশিদিয়া লস্কারহাট, ফেনী	মুফতি শহিদুল্লাহ	৩৫	৬০০
৪৭৯.	আল জামিয়া আল ইসলামিয়া মাদানিয়া, ফেনী	মাওলানা সাইফুল ইসলাম	৪৫	৯০০
৪৮০.	দারুল উলুম হোসাইনিয়া ওলামাবাজার, ফেনী	মাওলানা সৈয়দ সাঈদ	৪৫	১৮০০
৪৮১.	জামিয়া হালিমিয়া হোসাইনিয়া, সোনাগাজী, ফেনী	মাওলানা খোরশেদ আলম	৩১	৫০০
৪৮২.	কাসেমুল উলুম আজিজিয়া মাদ্রাসা, ছাগলনাইয়া, ফেনী	মাওলানা রুহুল আমিন	৩৫	৬০০
৪৮৩.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আহমদপুর মানুমিয়ারহাট, ফেনী	মাওলানা লোকমান আহমদ	৩৮	৭০০
৪৮৪.	জামিয়া মাদানিয়া ছিলোনিয়া মাদ্রাসা, ফেনী	মাওলানা সাইফুদ্দীন	৪০	৮০০
৪৮৫.	জামিয়া ফারুকিয়া পরশুরাম মাদ্রাসা, ফেনী	মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ	৩৫	৬৫০
৪৮৬.	দারুল উলুম চকরি মাদ্রাসা, ফেনী	হাফেজ মাওলানা রফিক	২৯	৪৫০
৪৮৭.	নুরুল উলুম কাবাদিয়া মাদ্রাসা, ফেনী	মাওলানা খলিলুর রহমান	২৯	৭৫০
৪৮৮.	রহমানিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, বারমাসিয়া পেকুয়া, কক্সাবাজার	মাওলানা আজগর	২৮	৮৫০
৪৮৯.	পেকুয়া আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসা, কক্সবাজার	হাফেজ মাওলানা আইয়ুব	৩৫	৯০০
৪৯০.	কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, শীলখালী, কক্সবাজার	মাওলানা মুনিরুল ইসলাম	৩০	৬০০
৪৯১.	বানিয়া চং মাদ্রাসা, কক্সবাজার	মাওলানা আজহার	৩৫	৬৫০
৪৯২.	ফেনী দারুল উলুম মাদ্রাসা, ফেণী	মাওলানা নুরুল্লাহ মুছাপুরী	২৮	৪৫০
৪৯৩.	হোসাইনিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	মাওলানা আতিকুল্লাহ	৩৫	৭০০
৪৯৪.	কালাপানি হেদায়েতুল উলুম মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবুল ফজল	৩৮	৮৫০
৪৯৫.	বাউরিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	মাওলানা শাহাবুদ্দীন	৪০	১২০০
৪৯৬.	কাজিরখীল আজিমপুর মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ	৩৫	৯০০
৪৯৭.	ফুলগাজী আশ্রাফিয়া মাদ্রাসা, ফেনী	মুফতি হাবিবুর রহমান	৩২	৬০০
৪৯৮.	ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা, ধুরুং কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	মাওলানা ইসমাইল কুতুবী	৩০	৮৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৪৯৯.	জামিয়া ইসলামিয়া জোয়ারিয়া নীলা, রামু, কক্সবাজার	মাওলানা আব্দুল হক	৪০	৮০০
৫০০.	কমরপুর মাদ্রাসা, ভৈরব	মাওলানা সাঈদুর রহমান হোসাইনি	৩৫	৬৫০
৫০১.	জামিয়া ইসলামিয়া মাইজপাড়া ঈদগা কক্সবাজার	মাওলানা মুক্তার আহমেদ	২৯	৭০০
৫০২.	জামিয়া ইসলামিয়া হালিমিয়া সিরাজদী খান, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল হামিদ	৪২	৮০০
৫০৩.	গোরকঘাটা বড় মাদ্রাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার	মাওলানা আনোয়ার শাহ	৩৫	৬৫০
৫০৪.	হযরত ইমাম বোখারী মাদ্রাসা, চিরিঙ্গা, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুর রহীম বোখারী	৩৫	৫০০
৫০৫.	আল জামিয়া রহমানিয়া বড়ঘোপ মাদ্রাসা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	মাওলানা মোখতার আহমদ	৩৫	৬০০
৫০৬.	আল জামিয়া ইসলামিয়া খুটাখালী মাদ্রাসা, চকোরিয়া, কক্সবাজার	মাওলানা আনোয়ার হোসেন কুতুবী	৩২	৪৫০
৫০৭.	জামিয়া মদিনাতুল উলুম ইন্টারন্যাশনাল, বাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা সাদেকুর রহমান সিদ্দিকী	৩০	৭৫০
৫০৮.	মারকাযুদ্ দাওয়া আল ইসলামিয়া পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী	৪৫	৮০০
৫০৯.	জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সাদ্দাম মার্কেট, ঢাকা	মুফতি মুহিব্বুল্লাহ কাসেমী	৩৮	৬৫০
৫১০.	উম্মুল কোরা ইসলামিক একাডেমী মধ্য বাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা হাবিবুল্লাহ	২৮	৩৫০
৫১১.	মাদ্রাসাতুল বালাগ কানুনগর, হাজারীবাগ, ঢাকা	মুফতি আহসান শরীফ	৩৫	৬৫০
৫১২.	মাদ্রাসাতুল সুফ্ফা আল ইসলামিয়া, যশোর	হাফেজ মাওলানা ইমরান	৪৫	৮০০
৫১৩.	মারকাযুল হুদা আল ইসলামিয়া, ঢাকা	মাওলানা আজহারুল ইসলাম	৩০	৮০০
৫১৪.	আল জামিয়াতুল আজিজ আল ইসলামিয়া ঢাকা উদ্যান মুহাম্মদপুর, ঢাকা	মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক	৪৫	৮০০
৫১৫.	ইসলামি ফিকাহ একাডেমী উত্তর কুতুবখালী যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মুফতি মুঈনুল ইসলাম	৩০	৬৫০
৫১৬.	দারুল হুদা আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, উত্তর মধ্য বাড্ডা, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা মুনিরুল ইসলাম সিরাজী	৩৫	৯০০
৫১৭.	আশরাফুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, আন্দারিঘাট, কুড়িগ্রাম	মাওলানা আলমগীর হোসাইন	৩২	৮৫০
৫১৮.	মদিনাতুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, ভুইয়াবাড়ি, কুড়িগ্রাম	মাওলানা মাহবুবুর আলম	২৯	৭৫০
৫১৯.	আল জামিয়াতুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, ভুইয়াবাড়ি কুড়িগ্রাম	মাওলানা জিয়াউল হক	৩৫	৮২০
৫২০.	পুরাতন ক্যাম্পের পাড় কওমি মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম	মাওলানা দুলাল	৩০	৮৫০
৫২১.	দারুল কোরআন মাদ্রাসা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	মাওলানা আজিজুল ইসলাম	৩৫	৮০০
৫২২.	জামিয়া কাসেমিয়া মাদ্রাসা, মোহনগঞ্জ	মাওলানা মোখতার মিয়া	৩৫	১২০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৫২৩.	দারুস্সালাম মাদ্রাসা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	মাওলানা মজাহারুল হক	৪০	১৫০০
৫২৪.	জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	মাওলানা আব্দুল হামিদ	৫০	২৫০০
৫২৫.	মেসবাহুল উলুম মাদ্রাসা, নেত্রকোণা	মাওলানা জসিম উদ্দীন	৩৫	১০০০
৫২৬.	দারুস্সুন্নাহ মাদ্রাসা, মাটিরাঙ্গা খাগড়াছড়ি	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন	৩০	৬০০
৫২৭.	বাইন্যাছড়ি কওমি মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা নুমান	৩০	৬৫০
৫২৮.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি সদর	মাওলানা আলী আহমদ	৩৫	৮০০
৫২৯.	মুহাম্মদিয়া ক্বেরাতুল কোরআন মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা মামুনুর রশীদ	১৮	৪০০
৫৩০.	দিঘিনালা ইসলামিয়া কওমী মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মেহেরু	২৫	৬০০
৫৩১.	হালিমিয়া মাদ্রাসা, দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা জসিমুদ্দীন	২০	৪০০
৫৩২.	দিঘিনালা বাজার কওমি মাদ্রাসা, খাগড়াছড়ি	মাওলানা ইলিয়াছ	১৮	৩০০
৫৩৩.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	মাওলানা জাকারিয়া	১৬	৩০০
৫৩৪.	বলিপাড়া কওমি মাদ্রাসা, রামগড়, খাগড়াছড়ি	মাওলানা নুরুল আমিন	১৮	৩০০
৫৩৫.	ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামীয়া মাদ্রাসা, আল্লারদর্গাহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা ফিরোজুল আলম	৪০	৬০০
৫৩৬.	সাইফুল উলুম মাদ্রাসা, নতুন কাউদিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা মুফতি আমিনুল ইসলাম	৩৫	৮০০
৫৩৭.	স্বরূপদহ মাদ্রাসা, পোড়াদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা ইব্রাহিম হুসাইন কাছেমী	৩৫	৬৫০
৫৩৮.	তালতলা দারুল উলুম মাদ্রাসা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	মাওলানা লিয়াকত আলী	৩৫	৬০০
৫৩৯.	মাদ্রাসা, আশারায়ে মুবাশ্যারা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মুফতি আবুল কালাম কাছেমী	৪২	৫০০
৫৪০.	আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	হাফেজ মাওলানা আবু দাউদ	৩৫	৯০০
৫৪১.	আলমপুর ফজলুল উলুম মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মুফতি মোখতারুজ্জামান	৩০	৬০০
৫৪২.	ধাপারিয়া কওমি মাদ্রাসা, মিরপুর, কুষ্ঠিয়া	মাওলানা রেজউল ইসলাম	২৫	৩৫০
৫৪৩.	পরাবী মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	৩৫	৮০০
৫৪৪.	দারুস্সুন্নাহ মাদ্রাসা, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া	মাওলানা আব্দুর রউফ	২৫	৪০০
৫৪৫.	মাদ্রাসাতুল আবরার পুরাতন আলফা মোড়, কুষ্টিয়া	মাওলানা মাসুদুর রহমান	৪০	৯০০
৫৪৬.	ফজলুল উলুম মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা ওবায়দুল্লাহ	৪০	৯০০
৫৪৭.	দহকুলা দারুল উলুম মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা আব্দুল মজিদ	৩৫	১২০০
৫৪৮.	মহিশাডাঙ্গা মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	২৫	৬০০
৫৪৯.	মাজিলা দারুস্সুন্নাহ মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা বশির উদ্দীন	৪০	১৩০০
৫৫০.	বড়িয়া কওমি মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা আলাউদ্দীন	৩০	৯৫০
৫৫১.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, কমলাপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা ইলিয়াছ	২৮	৬০০
৫৫২.	কামিরহাট মাদ্রাসা, মিরপুর, কুষ্টিয়া	মুফতি আনোয়ারুল ইসলাম	৩২	৭৫০
৫৫৩.	দারুল কোরআন ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চুনিয়ারমোড়, কুষ্টিয়া	মাওলানা হাবিবুর রহমান	৩৬	৮৫০
৫৫৪.	রানাকড়িয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মাওলানা খায়রুল ইসলাম	২৫	৩৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৫৫৫.	জামালপুর কওমিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুর, কুষ্ঠিয়া	মাওলানা শাহজাহান	৩৫	৪৫০
৫৫৬.	মেহেরপুর কওমিয়া মাদ্রাসা, পুরাতন পোস্টঅফিস, কুষ্টিয়া	মাওলানা জহিরুল ইসলাম	৩৫	৬০০
৫৫৭.	মদিনাতুল উলুম কওমিয়া গোরস্থান পাড়া, কুষ্টিয়া	মাওলানা সাদেকুর রহমান	৩০	৮৫০
৫৫৮.	বারাদি মদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া	মুফতি শফিকুল ইসলাম	৩১	৬৫০
৫৫৯.	জামিয়া মজাহারে সা'আদাত মাদ্রাসা, ফিরোজপুর, কুষ্টিয়া	মুফতি আবু বকর	৩৫	৭০০
৫৬০.	বলিয়াপুর কওমিয়া মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা আনোয়ার হোসেন	৩৫	৭৫০
৫৬১.	বাগুয়ান মক্কিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা, মুজিব নগর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা ওমর ফারুক	৩০	৮৫০
৫৬২.	এলাঙ্গি কওমিয়া মাদ্রাসা, রায়পুর মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা মোহসিনুল করিম	৪০	৯৫০
৫৬৩.	ঝাউবাড়িয়া কওমিয়া মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা এনামুল হক	৩৫	৬৫০
৫৬৪.	গাড়িবাড়িয়া কওমিয়া মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	হাজি শওকত হোসেন	২৮	৬০০
৫৬৫.	দিঘলকান্দি কওমিয়া মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা মুনির হোসাইন	৩৬	৮৫০
৫৬৬.	ভরাট দারুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা আবু সাঈদ	২৫	৩৬০
৫৬৭.	দারুল কোরআন ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ইসলামপুর, দৌলতপুর	মাওলানা হাবিবুর রহমান	৩১	৭৫০
৫৬৮.	বাগোয়ান দারুল ইসলাম মাদ্রাসা, মতরাপুর দৌলতপুর	মাওলানা খলিলুর রহমান	২৮	৪৫০
৫৬৯.	মহিষকুন্দি দারুল হাসনাত কওমিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	হাফেজ আমিনুল ইসলাম	৩৫	৪৫০
৫৭০.	ফজলুল উলুম কওমি হোসেনাবাদ মতুরাপুর দৌলতপুর, কুষ্ঠিয়া	ক্বারী মোঃ রুহুল আমিন	৩০	৪৫০
৫৭১.	মহেষকুন্দি বাধেরবাজার গোরস্থান মাদ্রাসা, দৌলতপুর	মাওলান ওসমান গণি	২৫	৪৫০
৫৭২.	মারকাযুল উলুম ইসলামিয়া পিয়ারঘর দৌলতপুর কুষ্টিয়া	মুফতি রুহুল আমিন	৩২	৪৫০
৫৭৩.	মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া বীরবোয়ালী মাদ্রাসা, দৌলতপুর কুষ্টিয়া	মাওলানা নাজমুল হুদা	২৮	৫৫০
৫৭৪.	নুরুল উলুম কওমি মাজদিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুর কুষ্টিয়া	মাওলানা রায়হানুল হক	৩৫	৬০০
৫৭৫.	হোসেনাবাদ সাখাওয়াত উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুর কুষ্টিয়া	হাফেজ মাওলানা আসাদুজ্জামান	৩৪	৬০০
৫৭৬.	আদাবাগিয়া কওমি মাদ্রাসা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	মাওলানা সাইফুল ইসলাম	২৫	৪০০
৫৭৭.	কালিদাসপুর ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	ক্বারী উজীর আলী	২৫	৩৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৫৭৮.	শিহালা ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	মুফতি অলিউল্লাহ	২৬	৭০০
৫৭৯.	বেলগাছী আছির উদ্দীন মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	৩০	৯০০
৫৮০.	খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা মাহফুজুর রহমান	২৮	৬৫০
৫৮১.	মাদ্রাসা,তুন নূর পৌর কলেজ পাড়া চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আনিসুর রহমান	২৯	৬৮০
৫৮২.	কালিয়া বকরী মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা মামুনুর রশীদ	৩৫	৯০০
৫৮৩.	গোয়ালপাড়া মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৪০	৮৫০
৫৮৪.	ডুমুরিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা বদরুজ্জামান	৩৫	৬০০
৫৮৫.	গোয়ালবাড়ী মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	৩৮	৮০০
৫৮৬.	দোস্তগ্রাম মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	২২	৪৫০
৫৮৭.	খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা মাহফুজুর রহমান	৩০	৬৫০
৫৮৮.	কুন্দিপুর কওমিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদিয়া, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা বেলাল হোসেন	২৮	৭০০
৫৮৯.	কুতুবপুর কওমি মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা সাহবুবুল আলম	৩০	৮০০
৫৯০.	কার্পাসডাঙ্গা কওমি মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মুফতি সাইফুল্লাহ	৩৫	৭৫০
৫৯১.	করিমপুর কওমি মাদ্রাসা, দর্শনা চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা হাফিজুর রহমান	২৫	৬০০
৫৯২.	আব্দুল বারিয়া কওমি মাদ্রাসা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আব্দুল আলিম	৩৫	৬০০
৫৯৩.	গোয়ালবাড়ি দারুস্সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসা, মুন্সিগঞ্জ, আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা আব্দুল মান্নান	৪০	১২০০
৫৯৪.	মাদ্রাসা,তুশ সালেহা রামনগর, আসমানখালি, আলমডাঙ্গ, চুয়াডাঙ্গা	হাফেজ আবু জাফর	৩৫	৮০০
৫৯৫.	বড় আইলচারা মাদ্রাসা, ভেড়ামারা, চুয়াডাঙ্গা	মুফতি আব্দুল হামিদ	৪০	১৫০০
৫৯৬.	আলিয়া মাদ্রাসা, ভেড়ামারা, চুয়াডাঙ্গা	মাওলানা এসকান্দর আলী	২৫	৫০০
৫৯৭.	দারুল কোরআন মাদ্রাসা, ভেড়ামারা, চুয়াডাঙ্গা	হাফেজ আব্দুল হামিদ	২০	৬০০
৫৯৮.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, ভেড়ামারা	মাওলানা আব্দুল্লাহ	২৮	৪০০
৫৯৯.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম রিকাবি বাজার মাদ্রাসা, মিরকাদীম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আজহার উদ্দিন	৪৫	২২০০
৬০০.	জামিয়া আজিজিয়া দারুল উলুম দেওভোগ মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা মুফতি নেছার আহমেদ	৩৮	১৮০০
৬০১.	জামিয়া আইয়ুবিয়া দক্ষিণ ইসলামপুর মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা শামসুল আলম আরেফিন	২৯	৮০০
৬০২.	রহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মুফতি আসাদুল্লাহ	৪০	১৬০০
৬০৩.	মহিউস্সুন্নাহ মুন্সীরহাট মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আমির হোসেন	৪০	১৫০০
৬০৪.	রঞ্জু দারুল উলুম মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা হাবিবুর রহমান	৩৮	১৪০০
৬০৫.	যোগিনীঘাট দারুল উলুম মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা রফিকুল ইসলাম	৪০	১৬০০
৬০৬.	মাদ্রাসা,তুন নূর আল ইসলামিয়া মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আবুল বাশার	৩২	৯০০
৬০৭.	কাগজীপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, মিরকাদীম, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা হাদিউজ্জামান	৪০	৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৬০৮.	সিপাহীপাড়া ইলমুল মদীনা মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা গাজী নজরুল ইসলাম	৩২	৮০০
৬০৯.	চুরাইন রহমানিয়া মাদ্রাসা, বজ্রযোগিনী, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা শমসুল হক	৪০	১৮০০
৬১০.	নলবুনিয়া কান্দি দারুল ইসলাহ মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা হারুন	২৮	৭০০
৬১১.	চিতুলিয়া বাজার দারুল উলুম মাদ্রাসা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আবুল খায়ের	২৫	৬০০
৬১২.	লালমিয়া মাদ্রাসা, বোগদাদীয়া প্লাজা, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা হাবিবুর রহমান	৩৫	৮০০
৬১৩.	জামিয়া হালিমিয়া মধুপুর, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল হামিদ পীরসাহেব মধুপুর	৪০	১২০০
৬১৪.	আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসা, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল্লাহ	৪৫	১৫০০
৬১৫.	সৈয়দপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা বশির আহমদ	৩৫	৭০০
৬১৬.	মাদ্রাসা,য়ে ইমদাদিয়া মেদেনীমন্ডল সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আব্দুর রহমান	২৫	৬৫০
৬১৭.	মধ্যপাড়া মারকাযুল উলুম মাদ্রাসা, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা আবু বকর	৩০	৬৫০
৬১৮.	ফয়জুল উলুম মধ্যপাড়া মাদ্রাসা, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা রশিদ আহমদ	৩৫	৭০০
৬১৯.	কুচিয়ামোড়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ	মাওলানা খলিলুর রহমান	৩০	৬০০
৬২০.	মাদ্রাসা,য়ে ইমদাদুল উলুম নয়ানন্দ, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা মজিদুল হক	৫০	১৮০০
৬২১.	বাদশাহী মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা আব্দুলহান্নান	৩৫	২০০০
৬২২.	বেশনাল দারুল উলুম মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা আরাফাত উল্লাহ	২৫	১০০০
৬২৩.	কাঠাদিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মুফতি হারুন	৩৫	১২০০
৬২৪.	সেরাজাবাদ দারুল উলুম মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মুফতি ইসমাইল	৪০	১৮০০
৬২৫.	জামিয়া কাশিমিয়া আব্দুল্লাহপুর মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মুফতি রুহুল আমিন	৩৫	৯০০
৬২৬.	মিতারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস	৪০	২৫০০
৬২৭.	হাজিরহাট জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা নুরুল ইসলাম	৪৫	২৫০০
৬২৮.	মিফতাউল উলুম মাদ্রাসা, ধন্নপুর, নোয়াখালী	মাওলানা আনসার উদ্দীন	৩৫	১২০০
৬২৯.	চৌমুহনী ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নেয়াখালী	মাওলানা নুরুল হুদা	৩২	১৫০০
৬৩০.	আলহেরা তালীমুল ইসলাম মাদ্রাসা, নারায়ণহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুল জাব্বার	৩২	৭০০
৬৩১.	হেয়াকো তালীমুল কোরআন মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	মাওলানা হারুন	৩০	৮৫০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৬৩২.	জামিয়া হোসাইনিয়া শামশুল উলুম পশ্চিম নন্দীপাড়া, ঢাকা	হাকীম হাফেজ মাওলানা আব্দুস সামাদ	৪০	১০০০
৬৩৩.	মা'হাদুল ইকতিসাদ ও ফিকহিল ইসলামী, দক্ষিণ কাজলা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মুফতি কামাল উদ্দীন আহমদ রাশেদী	৩০	৭০০
৬৩৪.	নোমানীয় মাদ্রাসা, ১১২/৬ পূর্বরামপুর, ঢাকা	মুফতি ওয়ায়ের আমীন	৩০	৮০০
৬৩৫.	আত-তাখাস্সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা, ঢাকা	মুফতি মুঈনুল ইসলাম	৩০	৭৫০
৬৩৬.	জামিয়া দারুস্সুন্নাহ গলম কাপন মাদ্রাসা, ঢাকা	শায়েখ আব্দুর রশীদ	৩৫	৮০০
৬৩৭.	মাদ্রাসাতুল ফালাহ (শর্ট কোর্স) বাসাবো, মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা	শাহ ওলীউল্লাহ	২৫	৭৫০
৬৩৮.	দারুল ইনসান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা	মুফতি ইমাদুদ্দীন	৪০	৬৫০
৬৩৯.	মাদ্রাসা, ইসলামিয়া আরাবিয়া বলিয়াপুর সাভার, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা সাঈদুর রহমান	৩৫	৫৫০
৬৪০.	দারুল আরকাম মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা আবু তাহের	২৮	৬৫০
৬৪১.	গলমকাপন দারুস্সুন্নাহ কওমি দ্বীনি মাদ্রাসা, ওসমানি নগর, সিলেট	শায়খ আব্দুস শহীদ	৪৫	৭৫০
৬৪২.	মাদ্রাসা,তুর রহমান আল আরাবিয়া দক্ষিণখান, সরদারবাড়ী, ঢাকা	মাওলানা বখতিয়ার হোসাইন সরদার	৩০	৮০০
৬৪৩.	মির্জারচর কারিমিয়া কওমি মাদ্রাসা, বাজিতপুর, শিবচর, মাদারীপুর	মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ	৪৩	৭০০
৬৪৪.	জামিয়া আবুকর মক্কী নগর মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা	মাওলানা শাহ আলতাফ হোসাইন	৪৫	১৫০০
৬৪৫.	জামিয়া তাহফীজুল কোরআন আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	হাফেজ আব্দুর রহমান	৩৫	১১০০
৬৪৬.	দারুল হুদা আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বাড্ডা, ঢাকা	হাফেজ মনিরুল ইসলাম	২৯	৮০০
৬৪৭.	মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	হাকিম মুফতি নুরুল্লাহ নূরানী	৫৪	৮৫০
৬৪৮.	ইসলামপুর হাফিজুল উলুম মাদ্রাসা, ধামরাই, ঢাকা	মাওলানা ফরিদ আহমদ	৩৪	৭৫০
৬৪৯.	মাদ্রাসাতুল ফালাহ সবুজবাগ, ঢাকা	মুফতি সাইদুল্লাহ	২৫	৮০০
৬৫০.	জামিয়া আরাবিয়া খলিলিয়া সাবিলর রাশাদ, হাজারীবাগ, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী	৩৫	৮০০
৬৫১.	মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া বাংলাদেশ, কাশীমপুর, ফতুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ	মুফতি আব্দুর রহমান কাসেমী	৩০	৬৫০
৬৫২.	মাদ্রাসা, জামিয়াতুন নূর মেরাজনগর শ্যামপুর, ঢাকা	মাওলানা নুরুল আলম নদভী মাযাহিরী	২৮	৮০০
৬৫৩.	বায়তুন নূর মাদ্রাসা, বামৈল বাজার, ডেমরা, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা কামাল উদ্দীন	২৬	৭০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৬৫৪.	দারুল ফজল কওমি মাদ্রাসা, কামার্তা, রুহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা হাফিজুর রহমান	২৫	৬৫০
৬৫৫.	জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামীয়া মিরপুর	মুফতি মুহিব্বুল্লাহ কাসেমী	৩৫	৮০০
৬৫৬.	মিফতাহুল উলুম আল ইসলামিয়া চান্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা ইমদাদুল্লাহ	৩০	৫৫০
৬৫৭.	টিঘর মহিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা আইয়ুব আলী	২৮	৪০০
৬৫৮.	মাদ্রাসা, শায়খে যাকারিয়া (রাহ.) রামপুরা, ঢাকা	মাওলানা হামিদুল্লাহ রহমানি	৩৫	৭০০
৬৫৯.	ফরিদুল উলুম ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসা, পূর্বজুরাইন, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা আসাদুল্লাহ	৩২	৮৫০
৬৬০.	জামিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা,	মাওলানা কাসেম ফয়জুদ্দীন	৩৫	৯০০
৬৬১.	মাদ্রাসা, এ রহিমিয়া তেলীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মুফতি ফজলুল হক নিযামী	৩১	৬০০
৬৬২.	জামিয়া রহমানিয়া ইসলামিয়া দাক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	মুফতি আব্দুল হান্নান	৩২	৬৫০
৬৬৩.	মাদ্রাসা, বাহারুল উলুম সবুজবাগ, ঢাকা	মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ কাশফী	২৫	৬৫০
৬৬৪.	মাদ্রাসা, ইসলামিয়া আরাবিয়া বিলয়াপুর, সাভার, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা সাঈদুর রহমান	২৮	৬৫০
৬৬৫.	কাশেমুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মুফতি আব্দুল গফ্‌ফার	৪০	১৪০০
৬৬৬.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মাওলানা কেরামত আলী	৩৮	১৬০০
৬৬৭.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ভৈরব	মাওলানা আব্দুস সামাদ	৫০	১৮০০
৬৬৮.	দারুল উলুম ঘাইলকটি, ভৈরব	মাওলানা মনসুর	৪০	১৮০০
৬৬৯.	মহিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, ভৈরব	মাওলানা আব্দুর রউফ	৩০	৬০০
৬৭০.	বধ্যচর ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ভৈরব	মাওলানা শাহাদাত হোসাইন	৪০	১৬০০
৬৭১.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, কুমিরা, চট্টগ্রাম	মাওলানা কবির উদ্দীন	৫০	১৫০০
৬৭২.	ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, কুমিরা, চট্টগ্রাম	মাওলানা আলমগীর	৪৮	১৩০০
৬৭৩.	পাহাড়কুল এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা	মাওলানা আখতারুজ্জামান	৬০	১৯০০
৬৭৪.	জামিয়া আজিজিয়া লক্ষীপুর মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা আব্দুল হান্নান	৩৮	১২০০
৬৭৫.	জামিয়া ইসলামিয়া ইছহাকিয়া কুড়িগ্রাম	মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক	৩০	৭০০
৬৭৬.	কাসেমুল উলুম মাদাসা কুড়িগ্রাম	মাওলানা আমিনুর রহমান	৩৫	৯০০
৬৭৭.	মাদ্রাসা, দারুল কোরআন শাহেদপাড়া, সিদ্দিরগঞ্জ	মাওলানা সানাউল্লাহ আমিনী	১৯	৭০০
৬৭৮.	জামিয়া আলতাফিয়া দাবুয়া চান্দিনী কুমিল্লা	হাফেজ মাওলানা আহমদ উল্লাহ	৩৫	১৪০০
৬৭৯.	আল জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম গাজীপুর	মাওলানা যাকারিয়া হামীদ	৪৫	১৪০০
৬৮০.	জামিয়া রশিদিয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর	মাওলানা গোলাম মওলা	৩৫	৯০০
৬৮১.	জামিয়া বুরুলিয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর	মাওলানা সিরাজ উদ্দীন	৩৮	১৪০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৬৮২.	জামিয়া শহিদিয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর	মাওলানা হিফজুর রহমান	৪০	১৮০০
৬৮৩.	খালেকিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর	মাওলানা ফজুলর রহমান	৪২	২০০০
৬৮৪.	মাদ্রাসাতুল আবরার গাজীপুর	মাওলানা রফিকুল ইসলাম কাসেমী	৪৫	১৫০০
৬৮৫.	জামিয়া গাছবাড়িয়া গোপালগঞ্জ	মাওলানা নুরুল হক	৫০	২৫০০
৬৮৬.	মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, চান্দপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া	হাফেজ মাওলানা এমদাদুল্লাহ	৪০	১৮০০
৬৮৭.	বাহারিয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর	মাওলানা আকরাম আলী	৩০	৮০০
৬৮৮.	জামিয়া দারুল উলুম, মতিঝিল, ঢাকা	মাওলানা রফিক আহমদ	৪৫	৯০০
৬৮৯.	জামিয়া আশরাফিয়া পাবনা	মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ	২৮	৭০০
৬৯০.	জামিয়া ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ডাঙ্গা ঢাকা	মাওলানা সৈয়দ আহমদ	৩৫	১২০০
৬৯১.	মাদ্রাসা, ইসলামিয়া পরমেশ্বরদী মাদারীপুর	মাওলানা হাতেম আলী	৪০	১৬০০
৬৯২.	জামিয়া এমদাদিয়া চরগুমানী লেজপাতা ভোলা	মাওলানা আব্দুল হক	৫০	২২০০
৬৯৩.	ইসলামিয়া মাদ্রাসা, শেখেরচর নরসিংদী	মাওলানা আব্দুল মতিন	৩৮	১৪০০
৬৯৪.	নলরানী তালিমুল কুরআন শাহকান্তি মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা বেলায়েত হোসাইন	২৫	৫৫০
৬৯৫.	নারায়নকর মাদ্রাসা, জগন্নাথদিঘী কুমিল্লা	মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ	৩৫	৭০০
৬৯৬.	মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, গোরগ্রাম নীলফামারী	মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ	২৫	৬০০
৬৯৭.	জামিয়া আশরাফিয়া শামসুল উলুম মুহাম্মদপুর, উলপুর, ফরিদপুর	হাফেজ মাওলানা নিজামুদ্দীন	৫০	১৬০০
৬৯৮.	ভুবন ইসলামিয়া হোসাইনিয়া আনওয়ারুল উলুম মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা ক্বাজী সাহেব আলী	৪০	১৪০০
৬৯৯.	নোয়াপাড়া মাদ্রাসা, যশোর	মাওলানা রফিকুজ্জামান	৭০	৩৫০০
৭০০.	মাদ্রাসা,য়ে দারুল উলুম চৌমুহনী নোয়াখালী	মাওলানা আব্দুল মমিন	৩২	৮০০
৭০১.	জামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	৬৫	২৫০০
৭০২.	চৌমহনী ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা নুরুল হক	৩৫	৯০০
৭০৩.	জামিয়া যিনুরাইন চাটখিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিছবাহ	৪০	১৫০০
৭০৪.	নোনারগাওঁ মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ	মাওলানা হাতেম	২৫	৮০০
৭০৫.	জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ	মাওলানা আযহার আলী আনোয়ার শাহ	৪৫	১৮০০
৭০৬.	তাবলীগুল কুরআন মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা আব্দুল হক নোমানী	৩৫	১৫০০
৭০৭.	জামিয়া ইসলামিয়া শামসুল উলুম খারাসপুর ফরিদপুর	মুফতি আব্দুল কাদির	৪০	১৮০০
৭০৮.	দারুল উলুম মিরপুর-৬ ঢাকা	মাওলানা আতাউর রহমান খান	২৮	৬০০
৭০৯.	টঙ্গী দারুল উলুম মাদ্রাসা, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা মুফতি মাসউদুল করিম	৩৫	৯০০
৭১০.	শামসুল উলুম জামেয়াতুস সুন্নাহ কংশুর গোপালগঞ্জ	হাফেজ মাওলানা নিজামুদ্দীন	৪০	১৪০০
৭১১.	জামিয়া দারুল উলুম হক্কানিয়া শিবচর, মাদারীপুর	মাওলানা আজহারুল হক ফরিদী	৫০	১৮০০
৭১২.	মাদ্রাসা, ইসলামিয়া আরাবিয়া হোসাইনিয়া কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	হাফেজ মাওলানা বেলাল হোসাইন	৪০	২৫০০
৭১৩.	ইসলামিযা আজিজিয়া আনোয়ারুল উলুম হিলী, রাজশাহী	মাওলানা হারুন চৌধুরী	৩৮	১৯০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৭১৪.	অরঙ্গবাদ কওমি মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ ঢাকা	মাওলানা সাইদ নূর	৪০	৩৫০০
৭১৫.	মাদ্রাসাতুল সাহাবা কওমি মাদ্রাসা সাতক্ষীরা	মাওলানা মুহাম্মদ মুইনুদ্দীন	৩০	৭৫০
৭১৬.	পরানদহা কওমি মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	মাওলানা রবিউল ইসলাম	৩৪	৮৮৫
৭১৭.	আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া কওমিযা মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আব্দুস সামাদ	৪০	১২০০
৭১৮.	জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা নেয়ামত আলী	৩৫	৯০০
৭১৯.	শামসুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আকরাম আলী	৩২	৮৫০
৭২০.	সিঙ্গাইর কওমি মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ ঢাকা	মাওলানা আব্দুল বাতেন	২৫	৪০০
৭২১.	বাস্তাধল্লা কওমি মাদ্রাসা, গিওরপোস্তা	মাওলানা ফখরুদ্দিন	৩২	৫০০
৭২২.	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আব্দুস সামাদ ফরিদী	৩৫	৮০০
৭২৩.	শামসুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা আকরাম উদ্দীন	৩৮	৯০০
৭২৪.	হামিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, মাদারীপুর	মাওলানা ওমর ফারুক	২৫	৬০০
৭২৫.	দারুস শরিয়াহ মাদারীপুর	মাওলানা হাসান	২২	৫৫০
৭২৬.	জামিয়া ইসলামিয়া মাদারীপুর	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২৮	৬০০
৭২৭.	মহিউস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, নরসিংদী	মাওলানা মজিবুর রহমান চাঁদপুরী	৩২	৭০০
৭২৮.	হাবিবপুর মাদ্রাসা, নরসিংদী	মাওলানা মুজিবুর রহমান	২৫	৫০০
৭২৯.	মাহমুদপুর মাদ্রাসা, নরসিংদী	মুফতি আব্দুল আলিম	২৮	৫০০
৭৩০.	নকিপুর কাঠকালি মাদ্রাসা, নরসিংদী	মাওলানা অছিউর রহমান	২২	৬৫০
৭৩১.	তারালি মাদ্রাসা, নরসিংদী	মুফতি গোলাম মোস্তাফা	২৮	৬০০
৭৩২.	ফজলুল উলুম আল কোরআন মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা নজরুল ইসলাম	২০	৬০০
৭৩৩.	জামিয়া ইসলামিয়া রহমানিয়া টাঙ্গাইল	মাওলানা হাফেজুর রহমান	৪০	৯০০
৭৩৪.	আল-জামিয়া ইমদাদিয়া টাঙ্গাইল	মাওলানা নুরুল হক	৩৮	৭০০
৭৩৫.	জামিয়া ইসলামিয়া নূরীয়া ঢাকা	মাওলানা রফিকুল ইসলাম	২৫	৫৫০
৭৩৬.	রহমানিয়া দারুল উলুম সাভার ঢাকা	মাওলানা শহিদুল ইসলাম	৩৫	৭৫০
৭৩৭.	জামিয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আহমদ উল্লাহ	২৫	৫৫০
৭৩৮.	আরাবিয়া মদিনাতুল উলুম ঢাকা	মাওলানা সোলায়মান	২২	৫৫০
৭৩৯.	দারুল আরকাম মাদ্রাসা, সভার ঢাকা	মাওলানা আব্দুচ ছালাম	২৫	৪০০
৭৪০.	জামিয়া আরাবিয়া বায়তুল উলুম রসুলপুর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল মতিন নেছারী	৪০	১২০০
৭৪১.	জামিয়া ইসলামিয়া সেহরা ময়মনসিংহ	মাওলানা শওকত হোসেন	৩০	৬০০
৭৪২.	জামিয়া ইসলামিয়া গোরস্থান ভোলা	মাওলানা মহিউদ্দীন	৩৫	৫৫০
৭৪৩.	জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা ঢাকা	মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী	৩৮	১২০০
৭৪৪.	দারুস সালাম কওমী মাদ্রাসা, বগুড়া	মাওলানা আঃ রাজ্জাক	৫	১৫০
৭৪৫.	জামিল মাদ্রাসা, চক ফরিদ, বগুড়া	হাফেজ আব্দুল হক হক্কানী	৬৭	২৮০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৭৪৬.	জামিয়া ইসলামিয়া হালিমিয়া সিরাজদী খান মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা আব্দুল হামিদ	৪২	৮০০
৭৪৭.	জামিয়া সরফ ভাঠা রাঙ্গুনিয়া মাদ্রাসা,- চট্টগ্রাম	আল্লামা ইছহাক	২০	৮০০
৭৪৮.	জামিয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা মুছা	২২	৮৫০
৭৪৯.	আজিজিয়া কাসেমুল উলম মাদ্রাসা, কোদালা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মুহতাসিম আব্দুল কাদের	২০	৭০০
৭৫০.	দারুল উলুম মাদ্রাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা সা'আদাত	১৫	৭০০
৭৫১.	জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম	মাওলানা আব্দুস সুবহান	৩০	৫০০
৭৫২.	জামিয়া আজিজিয়া বৈলছরী বাঁশখালি, চট্টগ্রাম	মাওলানা রফিকুল ইসলাম	৪০	৭০০
৭৫৩.	জামিয়াতুল আনওয়ার পদুয়া মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম	মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী	২০	৭৫০
৭৫৪.	হোছাইনিয়া আজিজুল উলুম রাজঘাটা, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম	মাওলানা সামশুল ইসলাম	৩০	৫০০
৭৫৫.	ছমদিয়া আশরাফুল উলুম লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	মাওলানা আমিনুল্লাহ	২০	৮০০
৭৫৬.	মাদ্রাসাতুল মারবিয়া ছমদারপাড়া লোহাগাড়া চট্টগ্রাম	মাওলানা আবুল হাসান	১৫	৭০০
৭৫৭.	দারুল উলুম উসমানাবাদ, চট্টগ্রাম	মাওলানা আবুল ওয়াফা শামছী	২০	৭০০
৭৫৮.	মাহমিরপুর মাদ্রাসা, আনোয়ারা চট্টগ্রাম	মাওলানা হাফেজ আহমদুল্লাহ	২০	৬৫০
৭৫৯.	ওবাইদিয়া ইসলামিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম,	মাওলানা আনোয়ার সাহেব	১৫	৭০০
৭৬০.	নাসিরাবাদ মিছবাহুল উলুম, চট্টগ্রাম	আব্দুল জব্বার	১৫	৭৫০
৭৬১.	জামিয়া আশরাফুল উলুম ঝাপুয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম	মাওলানা রিদওয়ানুল হক	৪০	১২০০
৭৬২.	জামিয়া ইসলামিয়া টেকনাফ মাদ্রাসা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম	মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ	৫০	২০০০
৭৬৩.	জামিয়া দারুসসুন্নাহ হ্নীলা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম	মাওলানা আখতার কামাল	৪০	২০০০
৭৬৪.	জামিয়া আশরাফুল উলুম ধলিরছড়া উকিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম	মাওলানা আমানুল্লাহ	৩০	১০০০
৭৬৫.	জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া ফেনী	মাওলানা সাইফুদ্দীন কাশেমী	৩০	৫০০
৭৬৬.	জামিয়া ইসলামিয়া সদর ফেনী	মাওলানা কবির আহমদ	২৫	৪০০
৭৬৭.	উলামা বাজার মাদ্রাসা, ফেনী,	মাওলানা সাঈদ আহমদ	২০	৫০০
৭৬৮.	মদিনাতুল উলুম বিসমিল্লাহ, নোয়াখালী	মাওলানা আনোয়ার হোসেইন	৩০	৪০০
৭৬৯.	জামিয়া জিননুরাইন চাটখিল, নোয়াখালী	মাওলানা আব্দুল হাই নাফিস	২০	৮০০
৭৭০.	জামিয়া উসশানিয়া চাটখিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা সানাউল্লাহ আব্বাসী	২৫	৫০০
৭৭১.	দেওটি হামেয়াতুল ইসলাম মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা মুজ্জাম্মিল হোসাইন	৩০	৪০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৭৭২.	বড়গাঁও ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা বদিউল আলম	১৫	৮০০
৭৭৩.	চৌমুহনী ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা নুরুল হুদা	২০	৭০০
৭৭৪.	জামিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা, নোয়াখালী	মাওলানা আব্দুল বারী	২৫	৬০০
৭৭৫.	চরমটুয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, নোয়াখালী	মাওলানা নুরুল হুদা	২২	৫৪০
৭৭৬.	জামিয়া আরাবিয়া কাশেমুল উলুম, কুমিল্লা	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক	২০	৬০০
৭৭৭.	জামিয়া রশিদিয়া আজিজুল উলুম, কুমিল্লা	মাওলানা মুনির	১৫	৮০০
৭৭৮.	জামিয়া ইসলামিয়া, রাজাপুর কুমিল্লা	মাওলানা সাঈদ আহমদ	২৫	৪০০
৭৭৯.	দারুল উলুম স্বল্প পেন্নায় মাদ্রাসা, কুমিল্লা,	মাওলানা আবদুল কুদ্দুস	২০	৮০০
৭৮০.	জামিয়াতুল সুন্নাহ বিশ্বরোড মাদ্রাসা, কুমিল্লা	মাওলানা মনজুর আহমদ	২৫	৭০০
৭৮১.	জামিয়া ইসলামিয়া কলাকোপা, লক্ষীপুর	মাওলানা আব্দুল হান্নান	৩০	৫০০
৭৮২.	ইশা আতুল উলুম লুধুয়া, লক্ষীপুর	মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ	৫০	১০০০
৭৮৩.	চরমটুয়া আল আরাবিয়া দারুল উলুম, লক্ষীপুর	মাওলানা আবু তাহের	৪০	৫০০
৭৮৪.	জামিয়া আহমদিয়া, কচুয়া, চাঁদপুর	মাওলানা আবু হানিফ	২৫	৭০০
৭৮৫.	ইবরাহিমিয়া উজানী, মাদ্রাসা, চাঁদপুর	মাওলানা মুবারক করিম	৩০	৫০০
৭৮৬.	জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	মাওলানা মুফতি মুবারকুল্লাহ	৫০	১০০০
৭৮৭.	দারুল উলুম শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা আবু তাহের	৪০	৫০০
৭৮৮.	জামিয়া দারুল আরকাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,	মাওলানা সাজিদুর রহমান	৩০	৫০০
৭৮৯.	জামিয়া সিরাজদিয়া দারুল উলুম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা মুনিরুজ্জামান সিরাজী	৫০	১০০০
৭৯০.	দারুল উলুম দারমা মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মাওলানা সেরাজুল হক কাসেমী	৪০	৫০০
৭৯১.	আশরাফিয়া সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ	মাওলানা মুফতি আব্দুল বারী	৩০	৫০০
৭৯২.	ইবরাহীয়া সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা	মোঃ মুফতি শফিকুল ইসলাম	২৫	৭০০
৭৯৩.	জামিয়া আবুবকর ছিদ্দিক মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা মুফতি বোরহান উদ্দিন	৩০	৫০০
৭৯৪.	জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, তাঁতী বাজার, ঢাকা	মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন	২০	৭০০
৭৯৫.	জামালুল করআন গেন্ডারিয়া, ঢাকা	মাওলানা এমদাদুল ইসলাম	২৫	৬৫০
৭৯৬.	ইসলামবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা হাফেজ সাখাওয়াতুল্লাহ	১৫	৬০০
৭৯৭.	ফজলুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা	আহমদ উল্লাহ আশরাফ	১৭	৬৫০
৭৯৮.	নুরীয়া আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা	মাওলানা ফারুক আহমদ	২০	৬৫০
৭৯৯.	আকবর কমপ্লেক্স মিরপুর-১, ঢাকা	মাওলানা রুহুল আমীন	২৫	৬৫০
৮০০.	দারুল উলুম মিরপুর-১, ঢাকা	মাওলানা সালমান	২৫	৬৫০
৮০১.	জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম, মিরপুর-১২, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আবদুল ওয়াহিদ কাসেমী	২৭	৬৬০
৮০২.	দারুল উলুম মিরপুর-১৩, ঢাকা	মাওলানা মুফতি রেজাউল হক আব্দুল্লাহ	৩০	৮৮০
৮০৩.	জামিউল উলুম মিরপুর-১৪, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আবুল বশর নোমানী	২৩	৭৫০
৮০৪.	খাদিমুল ইসলাম, মিরপুর-১৩, ঢাকা	মাওলানা মুফতি ইমরান মাজহারী	২২	৭০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৮০৫.	মহাখালী টি এন্ডটি কলোনী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা জাফর আহমদ	২৪	৭২০
৮০৬.	জামিয়া মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা	মাওলানা মুফতি নোমান	১৫	৭৫০
৮০৭.	মাদানীনগর মাদ্রাসা, নারায়ণগঞ্জ	মাওলানা ফয়জুল্লাহ সন্দিফী	২১	৮৮০
৮০৮.	তেজগাঁও ইসলামিয়া রেলওয়ে মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ	১৮	৮৭০
৮০৯.	জামিয়া দ্বীনিয়া শামসুল উলুম পীরজঙ্গী ঢাকা	মাওলানা ছফী উল্লাহ	১০	৮০০
৮১০.	জামিয়া করিমিয়া আরবিয়া, রামপুরা, ঢাকা	মাওলানা মকবুল হুসাইন	২০	৭৯০
৮১১.	মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, বাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা আবুল হাসান	১৯	৬৮০
৮১২.	বাইতুস সালাম উত্তরা, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আব্দুল হাই	১৮	৬৫০
৮১৩.	ইসলামীয়া গাওয়াইর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ	১২	৬৫৫
৮১৪.	উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ, ঢাকা	মাওলানা আবদুল মান্নান	১৫	৬৭০
৮১৫.	জামিয়া মাদানিয়া রাজ ফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	১২	৮৪০
৮১৬.	নুরীয়া ইসলামিয়া টঙ্গী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা ছফিউল্লাহ	১১	৬২০
৮১৭.	দারুল উলুম দাওপাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা শওকত হোসেন সরকার	১৩	৫৩০
৮১৮.	আশরাফুল উলুম বালিয়া, নরসিংদী, ঢাকা	মাওলানা সামসুদ্দীন	২১	৫০০
৮১৯.	জামিয়া ইসলামিয়া তল্লী- গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	মাওলানা ফজলুর রহমানা	২২	৫২০
৮২০.	জামিযা ইসলামিয়া সেহড়া, ময়মনসিংহ,	মাওলানা আব্দুল গণী	২৫	৬৫০
৮২১.	জামিয়া আফরাফিয়া খাগডহর, ময়মনসিংহ	মাওলানা মুফতি তাজুল ইসলাম	১৯	৭৩০
৮২২.	জামিয়া আরবিয়া মাখযানুল উলুম, ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী	১১	৬৬০
৮২৩.	মিফতাহুল উলুম মাসকান্দা, ময়মনসিংহ	মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন	১৩	৬৮০
৮২৪.	মারফাজুল উলুম হাজী পাড়া, ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	১৪	৫৮০
৮২৫.	দারুল উলুম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	মাওলানা আজীমুদ্দিন	১২	৫৫০
৮২৬.	দারুল উলুম সিদ্দিকীয়া, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা নরুল ইসলাম	১৬	৫৬০
৮২৭.	জামিয়া এনামিয়া মাদ্রাসা, শেরপুর	মাওলানা কাশিম সাহেব	১৩	৬৫০
৮২৮.	জামিয়া শামসুল উলুম, জামালপুর	মাওলানা আবদুল মতিন	১০	৬৫৫
৮২৯.	জামিয়া রশিদিয়া, বগুড়া	মাওলানা গোলাম মাওলা	১৪	৬৬০
৮৩০.	জামিয়া দেওভোগ, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা মুফতি নেছার আহমদ	১৬	৭৮০
৮৩১.	জামিয়া এমদাদিয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ	মাওলানা আনোয়ার শাহ	২১	৭২০
৮৩২.	জামিয়া ইসলামিয়া ধলিরচর টাঙ্গাইল, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল আজিজ	১৯	৮১০
৮৩৩.	জামিয়া সিদ্দিকিয়া তেরাবাজার, শেরপুর	মাওলানা নরুল ইসলাম	১৮	৭৯০
৮৩৪.	জামিয়া সিদতাহুল উলুম বারহাট্টা রোড, নেত্রকোণা	মাওলানা রইছ উদ্দিন	১৭	৬৮০
৮৩৫.	সৈয়দপুর জামিয়া ইসদাদিয়া সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা বশির আহমদ	২২	৬৫০
৮৩৬.	জামিয়া ইসলামিয়া মোস্তাফাগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা মুফতি আব্দুল্লাহ আল-ফারুকী	২৩	৫৩০
৮৩৭.	জামিয়া ইসলামিয়া হালিমিয়া মধুপুর, মুন্সিগঞ্জ,	মাওলানা আবদুল হামিদ	১৮	৫৭০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৮৩৮.	জামিয়াতুল সুন্নাহ, মাদারীপুর	মাওলানা হুসাইন আহমদ	১১	৫৫০
৮৩৯.	জামিয়া আবাবিয়া বায়তুল রসুলপুর, রাজবাড়ী	মাওলানা আব্দুল মতিন নেছরী	১৩	৫৬০
৮৪০.	জামিয়া তাওয়াকুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা শামসুল ইসলাম খলিল	৩০	৭০০
৮৪১.	মাদ্রাসাতুল উলুম দারুল হাদিস হরিপুর বাজার, সিলেট	মাওলানা হিলাল আহমদ।	২০	৬০০
৮৪২.	জামিয়া আব্বাসিয়া কৌড়িয়া, সিলেট	হাফেজ মৌঃ মহসিন আহমদ	৩৫	৬০০
৮৪৩.	জামিয়া আল ইতলী কাতিয়া, সিলেট	মাওলানা ইমদাদুল্লাহ।	৩০	৫০০
৮৪৪.	ইমামবাড়ি মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	২০	৭০০
৮৪৫.	মদিনাতুল উলুম দারুস সালাম খসদবীর, সিলেট	হাফেজ মাওলানা ওয়ালিউর রহমান	২২	৭০০
৮৪৬.	জামিয়া ইসলামিয়া কলাবাড়ি, সিলেট	মাওলানা মুফতি আব্দুল মুছাব্বির	৩০	৫০০
৮৪৭.	পাটকেল ঘটা কওমি মাদ্রাসা তালা, সাতক্ষীরা	মাওলানা মনিরুল হক	২০	৬৩৫
৮৪৮.	জামিয়া দারুল উলুম হুসাইনিয়া দরগাপুর সিলেট	মাওলানা মুশাহীদ আলী	৪০	৭০০
৮৪৯.	সেবহানীঘাট মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা শফিকুল হক	২৫	৭০০
৮৫০.	দারুস সালাম লাফনাউট, সিলেট	মাওলানা আব্দুল খালিফা	১৫০	৬০০
৮৫১.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আজিমগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা বদরুদ্দীন।	৩০	৭০০
৮৫২.	জামিয়া হুসাইনিয়া মিরবকস টুলা নয়াসড়ক, সিলেট	মাওলানা আব্দুল কাদির	৩৫	৭০০
৮৫৩.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল কুরআন, সিলেট	মাওলানা মুফতি তালিবুল আহমদ	৩২	৫০০
৮৫৪.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেউলগ্রাম, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মুছাব্বির	৩০	৬০০
৮৫৫.	মুন্সিবাজার মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার	১৫	৮০০
৮৫৬.	মুহাম্মদীয়া ফাসিমিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী	মাওলানা সুলিমুদ্দীন কাসেমী	৩০	৫০০
৮৫৭.	উসমানিয়া হুসানিয়া বাখরাবাজ কাটাখালি মহিহার, রাজশাহী	মাওলানা জামাল উদ্দিন	৩৫	৫০০
৮৫৮.	জামিয়া নিজামিয়া দারুল উলুম বেতুয়া, রাজশাহী	মাওলানা মাহবুবুল আলম	৩০	৬০০
৮৫৯.	সাতকাসেমিয়া আবাবিয়া মাদ্রাসা, পিরোজপুর	মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান	৩৫	৭০০
৮৬০.	জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, খুলনা	হাফেজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ	৩০	৭০০
৮৬১.	জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম, খুলনা	মুফতি আবুল কাসিম	৩৫	৬৫০
৮৬২.	জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম, খুলনা	মাওলানা আসাদুল্লাহ	২৮	৫০০
৮৬৩.	জাকারিয়া দারুল উলুম সেনহাট, খুলনা	মাওলানা মজিবুর রহমান	২০	৫০০
৮৬৪.	জামিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসা, আগারগাঁও, তালতলা, ঢাকা	মাওলানা হাফেজুর রহমান সিদ্দীকি	২০	৬০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৮৬৫.	জামিয়া এমদাদিয়া তালিমুল কুরআন কওমি মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	মাওলানা আজিহুর রহমান	২০	৫৪৬
৮৬৬.	জামিয়া রহমানিয়া ইসলামিয়া রহিম মেটাল, নাবিস্কো, ঢাকা	মাওলানা মাহফুজুল হক	২০	৬০০
৮৬৭.	জামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল	উবাদুর রহমান	২৬	৫৫০
৮৬৮.	জামিয়া হুসাইনিয়া, বরিশাল	শওকতুল ইসলাম	২০	৬৮০
৮৬৯.	জামিয়া হাজি উমর মাদ্রাস, বরিশাল	মুফতি সাব্বির আহমদ	২১	৭০০
৮৭০.	জামিয়া ইসলামীয়া মুহাম্মদীয়া, বরিশাল	মাওলানা মহিউদ্দিন	১৯	৭০০
৮৭১.	মদিয়াতুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২২	৭২০
৮৭২.	জামিয়া হুসাইনিয়া মদিনাতুল উলুম, রাজশাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক	২০	৭৫০
৮৭৩.	খাজা মঈনুদ্দীন (বাজার রোড়) মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা আবদুল মজিদ	২৩	৬৩০
৮৭৪.	আহলিয়া ইজ্জাতুল ইসলাম মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	১৮	৬৯০
৮৭৫.	দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসা, বাঙ্গালের মোড় সাতক্ষীরা	মাওলানা আবদুর রহমান	২২	৬৫০
৮৭৬.	কাশেমপুর কওমি মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	মাওলান আবু দাইদ	১৬	৬৫৫
৮৭৭.	খুলিয়ারচর জামিয়া নুরুল উলুম মাদ্রাসা, ভোলা	মুফতি আব্দুল কায়েস	৩৮	১৩০০
৮৭৮.	চাকসার মূলবর্ণ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ভোলা	মাওলানা মাশুক আল আবেদীন	২৯	৫৫০
৮৭৯.	ভৈরব ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, ভৈরব	মাওলানা ইউসূফ খালেদ	৩০	৬০০
৮৮০.	সাতবাড়ি দারুস্‌সুন্নাহ মাদ্রাসা, দিনাজপুর	মুফতি আব্দুর রউফ	৪০	১২০০
৮৮১.	জামিয়া আশরাদিয়া মাদ্রাসা, বংশীপুর শাহী মসজিদ, ইশ্বরীপুর, সাতক্ষীরা	মাওলানা ইউনুস আলী	২৫	৬৫০
৮৮২.	মাদ্রাসাতুল মদিনা আল-আমিনা কওমি মাদ্রাসা, পুরাতন সাতক্ষীরা, পূর্ব পড়া,	মাওলানা সাইফুল্লাহ	১২	৬৬৫
৮৮৩.	জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া আনোয়ারুল উলুম, হিলি, দিনাজপুর	মাওলানা হারুন চৌধুরী	৩১	৬৪০
৮৮৪.	জামিয়া সারাবিয়া মাখজানুলউলুম মাদ্রাসা ময়মনসিংহ সদর,	মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজী	৫০	১০০০
৮৮৫.	জামিয়া আরাবিয়া মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা ময়মনসিংহ সদর	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	৪	৭০০
৮৮৬.	মাহমুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া বাংলাদেশ চরখরিচা ময়মনসিংহ সদর	মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ সিদ্দীক	২৫	৫০০
৮৮৭.	তারবিয়াতুল উলুম মাদ্রাসা কেরানীগঞ্জ সদর	মাওলানা মামুনুল হক	২০	৫০০
৮৮৮.	আল জামিয়া খাতামুন নাব্বীয়ীন কমলাপুর বিরুলিয়া সাভার ঢাকা	মাওলানা আশেকুর রহমান কাসেমী	৩০	৫২০
৮৮৯.	দারুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা ফিরোজ নুর জিয়ানগর	মাওলানা শামছুল আলম	৪৫	১৫০০
৮৯০.	জামিয়াতুল আবরার হাসনাবাদ কেরানীগঞ্জ ঢাকা	মাওলানা আরশাদ রহমানী	৪০	১০০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৮৯১.	জামিয়া মাহদুল কোরআন দনিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা	মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ	৩০	৫০০
৮৯২.	জামিয়া ইছহাকিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা উত্তরা, জুরাইন সেমনুর ঢাকা	মাওলানা আব্দুল হক	২৮	৬০০
৮৯৩.	জামিয়াতুল মারিফ আল ইসলামিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা	মুফতী সাঈদ মাহমদ	২২	৬৮০
৮৯৪.	জামিয়া ইসলামিয়া আলিমুস সুন্নাহ দক্ষিণ মুগদা ঢাকা	মাওলানা মোস্তাকীম বিল্লাহ হামিদী	৩০	৫০০
৮৯৫.	মারকাযুল ফয়যুল কুরআন আল ইসলামি ঢাকা উত্তর সিটি	মাওলানা মুরতাদা হাসান ফয়েজী	৩২	৫০০
৮৯৬.	মাদ্রাসাতুর রহমান আল মারাবিয়া দক্ষিণ খান উত্তরা ঢাকা	মুফতী বখতেয়ার হোসেন	৬৩	৯৫০
৮৯৭.	জামিয়া হক্বরা খিলগাঁও ঢাকা	আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসুদ	৩৫	৫৫০
৮৯৮.	জামিয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম ফরিদপুর সদর	মুফতী কামরুজ্জামান	৩০	৬৫০
৮৯৯.	আল জামিয়াতুল আরাবিয়া নিজামুল উলুম পুরুরা সালতা ফরিদপুর	মাওলানা জহুরুল হক	৩৫	৫৫০
৯০০.	জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া দেওভোগ সদর মুন্সীগঞ্জ	মুফতী মনসুরুল হক	৩১	৬২০
৯০১.	আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মুজিব বাগ নিজনিজি সিদ্ধিরগঞ্জ নারায়নগঞ্জ	শায়েখ তোহা কাসেমী	৩৫	৮৫০
৯০২.	জামিয়া আরাবিয়া ওয়াহাবুল উলুম সুভাড্ডা কেরানীগঞ্জ ঢাকা	মাওলানা আইয়ুন খান	৩৪	৫০০
৯০৩.	জামিয়া ইসলামিয়া চরওয়াশাপুর বচিলা কেরানীগঞ্জ ঢাকা	মুফতী জামাল উদ্দীন	৩৬	৯৫০
৯০৪.	জামিয়া কোরআনিয়া নূরে মদিনা কালিমদী কেরানীগঞ্জ ঢাকা	মুফতী নূরে আলম সিদ্দিকী	২২	৫০০
৯০৫.	জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া তাঁতী বাজার ইসলামপুর ঢাকা	মাওলানা বদরুল হুদা কাছেমী	৩৮	৮৫০
৯০৬.	জামিয়া দ্বিনীয়া মৌলভী বাজার সিলেট	মাওলানা মাজদুদ আহমদ	২৪	৫৫০
৯০৭.	জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ বাড়ী শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার	মাওলানা রশিদুর রহমান ফারুকী	৫০	১০০০
৯০৮.	জামিয়া লুৎফিয়া আনোওয়ারুল উলুম হামিদ নগর শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার সিলেট	মাওলানা সাইদুর রহমান	৬৭	২০০০
৯০৯.	নাজাত ইসলামী মারকায তানাপুর শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার সিলেট	মাওলানা শেখ ছালেহ আহমদ হামিদী	২১	৫০০
৯১০.	দারুল উলুম সুড়িকান্দী গোয়াল্টাবাজার বড়লেখা মৌলভী বাজার সিলেট	মাওলানা অলিউর রহমান	২১	৫০০
৯১১.	জামিয়া ইসলামিয়া ঝুড়ি মৌলভীবাজার সিলেট	মাওলানা তোফাজ্জল হক	২০	৫০০
৯১২.	আলজামিয়া ইসলামিয়া হায়দারগঞ্জ কুলাউড়া মৌলভীবাজার সিলেট	মাওলানা জাফর আহমদ	৩০	৫০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৯১৩.	জামিয়া মুহাম্মাদিয়া দারুস সুন্নাহ মাহমুদাবাদ কুলাউড়া পৌরসভা মৌলভীবাজার সিলেট	মাওলানা মাহমুদুর রহমান ইমরান	৪০	৬৫০
৯১৪.	ইবরাহীয়া সাইনবোর্ড, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মোঃ মুফতি শফিকুল ইসলাম	২৫	৪০০
৯১৫.	জামিয়া আবুবকর ছিদ্দিক মাদ্রাসা, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা মুফতি বোরহান উদ্দিন	৩০	৫০০
৯১৬.	জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, তাঁতী বাজার, ঢাকা	মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন	২০	৩০০
৯১৭.	জামালুল করআন গেন্ডারিয়া, ঢাকা	মাওলানা এমদাদুল ইসলাম	২৫	৫৫০
৯১৮.	ইসলামবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা হাফেজ সাখাওয়াতুল্লাহ	১৫	৫০০
৯১৯.	ফজলুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা	আহমদ উল্লাহ আশরাফ	১৭	৫৫০
৯২০.	নুরীয়া আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা	মাওলানা ফারুক আহমদ	২০	৫৫০
৯২১.	লালমাটিয়া মাদ্রাসা,-১২৩০, ঢাকা	মাওলানা মুফতি মাহফুজুল হক	৪০	৪০০
৯২২.	আকবর কমপ্লেক্স মিরপুর-১, ঢাকা	মাওলানা রুহুল আমীন	২৫	৩৫০
৯২৩.	দারুল উলুম মিরপুর-১, ঢাকা,	মাওলানা সালমান	২৫	৩৫০
৯২৪.	জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম, মিরপুর-১২, ঢাকা,	মাওলানা মুফতি আবদুল ওয়াহিদ কাসেমী	২৭	৩৬০
৯২৫.	দারুল উলুম মিরপুর-১৩, ঢাকা	মাওলানা মুফতি রেজাউল হক আব্দুল্লাহ	৩০	৫৮০
৯২৬.	জামিউল উলুম মিরপুর-১৪, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আবুল বশর নোমানী	২৩	৫৫০
৯২৭.	খাদিমুল ইসলাম, মিরপুর-১৩, ঢাকা	মাওলানা মুফতি ইমরান মাজহারী	২২	৪০০
৯২৮.	মহাখালী টি এন্ডটি কলোনী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা জাফর আহমদ	২৪	৪২০
৯২৯.	জামিয়া মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা	মাওলানা মুফতি নোমান	১৫	৪৫০
৯৩০.	জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, ঢাকা	মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আলী	১২	৪২০
৯৩১.	মাদানীনগর মাদ্রাসা, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা ফয়জুল্লাহ	২১	৪৮০
৯৩২.	তেজগাঁও ইসলামিয়া রেলওয়ে মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ	১৮	৫৭০
৯৩৩.	জামিয়া দ্বানিয়া শামসুল উলুম পীরজঙ্গী ঢাকা	মাওলানা ছফী উল্লাহ	১০	৫০০
৯৩৪.	শেখ জনুরুদ্দীন রহ চৌধুরীপাড়া, মালিবাগ, ঢাকা	মাওলানা আবু মুছা	১৩	৫৩০
৯৩৫.	আজমিয়া দারুল উলুম রামপুরা, ঢাকা	মাওলানা ইরাহইয়া মাহমুদ	১৫	৪৫০
৯৩৬.	জামিয়া করিমিয়া আরবিয়া, রামপুরা, ঢাকা	মাওলানা মকবুল হুসাইন	২০	৫৯০
৯৩৭.	মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, বাড্ডা, ঢাকা	মাওলানা আবুল হাসান	১৯	৪৮০
৯৩৮.	বাবুস সালাম এয়ারপোর্ট মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আনিসুর রহমান	১৭	৫৯০
৯৩৯.	বাইতুস সালাম উত্তরা, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আব্দুল হাই	১৮	৩৫০
৯৪০.	ইসলামীয়া গাওয়াইর মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ	১২	৪৫৫
৯৪১.	উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ, ঢাকা	মাওলানা আবদুল মান্নান	১৫	৩৭০
৯৪২.	জামিয়া মাদানিয়া রাজ ফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা	মাওলানা মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	১২	৪৪০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
৯৪৩.	নুরীয়া ইসলামিয়া টঙ্গী মাদ্রাসা, ঢাকা	মাওলানা ছফিউল্লাহ	১১	৪২০
৯৪৪.	মাদ্রাসা, মাহফুজুল কুরআন, আহমাদাবাদ, ঢাকা	মাওলানা জয়নুল আবেদীন	১৬	৫৫০
৯৪৫.	দারুল উলুম দাওপাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা শওকত হোসেন সরকার	১৩	৫৩০
৯৪৬.	আশরাফুল উলুম বালিয়া, নরসিংদী, ঢাকা	মাওলানা সামসুদ্দীন	২১	৫০০
৯৪৭.	জামিয়া ইসলামিয়া তল্লী- গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	মাওলানা ফজলুর রহমানা	২২	৫২০
৯৪৮.	জামিযা ইসলামিয়া সেহড়া, ময়মনসিংহ,	মাওলানা আব্দুল গণী	২৫	৪৫০
৯৪৯.	জামিয়া আফরাফিয়া খাগডহর, ময়মনসিংহ	মাওলানা মুফতি তাজুল ইসলাম	১৯	৫৩০
৯৫০.	জামিয়া আরবিয়া মাখযানুল উলুম, ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী	১১	৫৬০
৯৫১.	মিফতাহুল উলুম মাসকান্দা, ময়মনসিংহ	মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন	১৩	৪৮০
৯৫২.	মারফাজুল উলুম হাজী পাড়া, ময়মনসিংহ	মাওলানা আব্দুল আউয়াল	১৪	৫৮০
৯৫৩.	দারুল উলুম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা আজীমুদ্দিন	১২	৫৫০
৯৫৪.	দারুল উলুম সিদ্দিকীয়া, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা	মাওলানা নরুল ইসলাম	১৬	৩৬০
৯৫৫.	জামিয়া এনামিয়া মাদ্রাসা, শেরপুর-ঢাকা	মাওলানা কাশিম সাহেব	১৩	৪৫০
৯৫৬.	জামিয়া শামসুল উলুম, জামালপুর	মাওলানা আবদুল মতিন	১০	৪৫৫
৯৫৭.	জামিয়া রশিদিয়া, বগুড়া	মাওলানা গোলাম মাওলা	১৪	৫৬০
৯৫৮.	জামিয়া দেওভোগ, গাজীপুর, ঢাকা	মাওলানা মুফতি নেছার আহমদ	১৬	৪৮০
৯৫৯.	জামিয়া এমদাদিয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ	মাওলানা আনোয়ার শাহ	২১	৫২০
৯৬০.	জামিয়া ইসলামিয়া ধলিরচর টাঙ্গাইল, ঢাকা	মাওলানা আব্দুল আজিজ	১৯	৫১০
৯৬১.	জামিয়া সিদ্দিকিয়া তেরাবাজার, শেরপুর, ঢাকা	মাওলানা নরুল ইসলাম	১৮	৩৯০
৯৬২.	জামিয়া সিদতাহুল উলুম বারহাট্টা রোড, নেত্রকোণা	মাওলানা রইছ উদ্দিন	১৭	৪৮০
৯৬৩.	সৈয়দপুর জামিয়া ইসদাদিয়া সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা বশির আহমদ	২২	২৫০
৯৬৪.	জামিয়া ইসলামিয়া মোস্তাফাগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ	মাওলানা মুফতি আব্দুল্লাহ আল-ফারুকী	২৩	৫৩০
৯৬৫.	জামিয়া ইসলামিয়া হালিমিয়া মধুপুর, মুন্সিগঞ্জ,	মাওলানা আবদুল হামিদ	১৮	৪৭০
৯৬৬.	জামিয়াতুল সুন্নাহ, মাদারীপুর	মাওলানা হুসাইন আহমদ	১১	৪৫০
৯৬৭.	জামিয়া আবাবিয়া বায়তুল রসুলপুর, রাজবাড়ী	মাওলানা আব্দুল মতিন নেছরী	১৩	৩৬০
৯৬৮.	জামিয়া তাওয়াকুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা শামসুল ইসলাম খলিল	৩০	৪০০
৯৬৯.	মাদ্রাসাতুল উলুম দারুল হাদিস হরিপুর বাজার, সিলেট	মাওলানা হিলাল আহমদ।	২০	৪০০
৯৭০.	জামিয়া আব্বাসিয়া কৌড়িয়া, সিলেট	হাফেজ মৌঃ মহসিন আহমদ	৩৫	৬০০
৯৭১.	জামিয়া আল ইতলী কাতিয়া, সিলেট	মাওলানা ইমদাদুল্লাহ।	৩০	৫০০
৯৭২.	ইমামবাড়ি মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা মুফতি আব্দুল কাইয়ুম	২০	৩০০
৯৭৩.	মদিনাতুল উলুম দারুস সালাম খসদবীর,	হাফেজ মাওলানা ওয়ালিউর	২২	৩০০

ক্রমিক	মাদ্রাসার নাম	মুহতামিমের নাম	শিক্ষক	ছাত্র
	সিলেট	রহমান		
৯৭৪.	জামিয়া ইসলামিয়া কলাবাড়ি, সিলেট	মাওলানা মুফতি আব্দুল মুছাব্বির	৩০	৫০০
৯৭৫.	পাটকেল ঘটা কওমি মাদ্রাসা তালা, সাতক্ষীরা	মাওলানা মনিরুল হক	২০	৫৩৫
৯৭৬.	জামিয়া দারুল উলুম হুসাইনিয়া দরগাপুর সিলেট	মাওলানা মুশাহীদ আলী	৪০	৫০০
৯৭৭.	খরিল হাট মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা হাবিবুর রহমান	২২	৩৫০
৯৭৮.	দারুস সালাম লাফনাউট, সিলেট	মাওলানা আব্দুল খালিফা	১৫০	৪০০
৯৭৯.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আজিমগঞ্জ, সিলেট	মাওলানা বদরুদ্দীন।	৩০	৩০০
৯৮০.	দলইরগাও টাইটেল মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মান্নান	২০	৩০০
৯৮১.	জামিয়া হুসাইনিয়া মিরবকস টুলা নয়াসড়ক, সিলেট	মাওলানা আব্দুল কাদির	৩৫	৫০০
৯৮২.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল কুরআন, সিলেট	মাওলানা মুফতি তালিবুল আহমদ	৩২	৫০০
৯৮৩.	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেউলগ্রাম, সিলেট	মাওলানা আব্দুল মুছাব্বির	৩০	৪০০
৯৮৪.	মুন্সিবাজার মাদ্রাসা, সিলেট	মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার	১৫	২০০
৯৮৫.	মুহাম্মদীয়া ফাসিমিয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী	মাওলানা সুলিমুদ্দীন কাসেমী	৩০	৫০০
৯৮৬.	উসমানিয়া হুসানিয়া বাখরাবাজ কাটাখালি মহিহার, রাজশাহী	মাওলানা জামাল উদ্দিন	৩৫	৫০০
৯৮৭.	জামিয়া নিজামিয়া দারুল উলুম বেতুয়া, রাজশাহী	মাওলানা মাহবুবুল আলম	৩০	৪০০
৯৮৮.	সাতকাসেমিয়া আবাবিয়া মাদ্রাসা, পিরোজপুর	মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান	৩৫	৫০০
৯৮৯.	জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, খুলনা	হাফেজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ	৩০	৭০০
৯৯০.	জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম, খুলনা	মুফতি আবুল কাসিম	৩৫	৬৫০
৯৯১.	জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম, খুলনা	মাওলানা আসাদুল্লাহ	২৮	৫০০
৯৯২.	জাকারিয়া দারুল উলুম সেনহাট, খুলনা	মাওলানা মজিবুর রহমান	২০	৩০০
৯৯৩.	জামিয়া তৈয়বিয়া মাদ্রাসা, আগারগাঁও, তালতলা, ঢাকা	মাওলানা হাফেজুর রহমান সিদ্দীকি	২০	৪০০
৯৯৪.	জামিয়া এমদাদিয়া তালিমুল কুরআন কওমি মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	মাওলানা আজিহুর রহমান	২০	৩৪৬
৯৯৫.	জামিয়া রহমানিয়া ইসলামিয়া রহিম মেটাল, নাবিস্কো, ঢাকা	মাওলানা মাহফুজুল হক	২০	৪০০
৯৯৬.	জামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল	উবাদুর রহমান	২৬	৩৫০
৯৯৭.	জামিয়া হুসাইনিয়া, বরিশাল	শওকতুল ইসলাম	২০	২৮০
৯৯৮.	জামিয়া হাজি উমর মাদ্রাস, বরিশাল	মুফতি সাব্বির আহমদ	২১	৪০০
৯৯৯.	জামিয়া ইসলামীয়া মুহাম্মদীয়া, বরিশাল	মাওলানা মহিউদ্দিন	১৯	৪০০
১০০০.	মদিয়াতুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল	মাওলানা নুরুল ইসলাম	২২	২২০

পরিশিষ্ট-৪
বাংলাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন-এর শ্বেতপত্রে প্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থের তালিকা

পুস্তিকা/পুস্তক

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১.	ইসলাম ও রাজনীতি	আল্লামা শাহ্ আহ্মদ শফী আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	আনাস মাদানী, প্রকাশকাল ২০১১
২.	ইজহারে হাকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদূদী মতবাদ	আল্লামা শাহ্ আহ্মদ শফী আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	আনাস মাদানী, প্রকাশকাল ২০১০
৩.	একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া	আল্লামা শাহ্ আহ্মদ শফী আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	আনাস মাদানী, প্রকাশকাল ২০০৯
৪.	হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব	আল্লামা শাহ্ আহ্মদ শফী	১ম --- অক্টোবর ২০০০ ১০ম --- মার্চ ২০১১
৫.	নাস্তিক-মুরতাদের শরীয়া বিধান	আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী মহাসচিব, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া হাটহাজারী, ১৩ মে, ২০১৩
৬.	নাস্তিক মুরতাদ ও ইসলাম বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে ভাষণ	আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী, নায়েবে আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	আনাস মাদানী এপ্রিল ২০১০
৭.	বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন	মুহাম্মদ লোকমান হোসেন	মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, মে, ২০০৬
৮.	দারুল উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস	মুফতী জসীম উদ্দিন	মুফতী জসীম উদ্দিন, ২২ অক্টোবর ২০০২
৯.	বাংলাদেশঃ রাজনীতি আলেম সমাজ ও ইসলামী দল	ফজলুর রহমান জুয়েল	ফজলুর রহমান জুয়েল, নবেম্বর ২০০৪
১০.	ইসলামী আন্দোলন দেশে দেশে	মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন	মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন, জুলাই ২০০৫
১১.	বুশের ক্রুসেড ওসামার জিহাদ	অধ্যাপক আবু মিরাজ	অধ্যাপক আবু মিরাজ , জানুয়ারি ২০০২
১২.	আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী	উবায়দুর রহমান, ১ম---, আগষ্ট ১৯৮৮ ১৪তম--- জুলাই ২০০৮
১৩.	ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়	মোস্তফা মাশহুর	মোস্তফা মাশহুর, অক্টোবর ২০০০
১৪.	ইসলামের নামে এত দল! আমরা যাবো কোথায়?	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১ম--- সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ২য়--- অক্টোবর ২০০৩
১৫.	রাষ্ট্র-ক্ষমতার উত্থান	অধ্যাপক গোলাম আজম	জুন ২০১২
১৬.	সংগঠন পদ্ধতি	বাংলাদেশ জামায়ত ইসলামী	সেপ্টেম্বর ২০১২

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১৭.	ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ	অধ্যাপক গোলাম আজম	বাংলাদেশ জামায়ত ইসলামী ফেব্রুয়ারি ২০১১
১৮.	পরিচিতি	বাংলাদেশ জামায়েতে ইসলামী	এপ্রিল ২০১১
১৯.	জিহাদ কি ও কেন?	আহমদ আবদুল কাদের	জানুয়ারি ২০০৮
২০.	তাহরীকে দেওবন্দ	মাওলানা আবিদুল রহমান	ডিসেম্বর ২০০০
২১.	কাদিয়ানী মতবাদ যাচাইয়ের সহজ উপায়	মাওলানা নুমানী (রহ)	ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
২২.	আস্তিক-নাস্তিক দ্বন্দ্ব এবং হেফাজত	রশীদ জামীল	এপ্রিল ২০১৩
২৩.	আফগানিস্তান ও তালিবান	এ.জেড.এম শামসুল আলম	জুন ১৯৯৭
২৪.	রক্তাক্ত আফগানিস্তান	এ.জেড.এম শামসুল আলম	নবেম্বর ২০০১
২৫.	রক্তস্নাত আফগানিস্তান	মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ	ফেব্রুয়ারি ২০০২
২৬.	হেফাজতে ইসলাম ৪০ বছর	দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম কর্তৃপক্ষ	আনাস মাদানী, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
২৭.	ফতোয়া নারীনীতি ও শিক্ষানীতি	মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী	আব্দুল কাদের, প্রকাশকাল ২০০৯
২৮.	প্রখ্যাত আলেম-ইসলামী রাজনীতিক ও পীর- মাশায়েখের সাক্ষাতকার (১ম সংস্করণ)	শাকের হোসাইন শিবলি	ফেব্রুয়ারি, ২০০৮
২৯.	প্রখ্যাত আলেম-ইসলামী রাজনীতিক ও পীর- মাশায়েখের সাক্ষাতকার (২য় সংস্করণ)	শাকের হোসাইন শিবলি	ফেব্রুয়ারি, ২০০৮
৩০.	মাশায়েখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জীবন ও কর্ম	মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান	মুফতী ইহতিশামুল হক নোমান ডিসেম্বর, ২০১২
৩১.	মওদূদী জামাত ফেৎনার স্বরূপ	আনোয়ার কবির	আনোয়ার কবির, এপ্রিল ২০১৩
৩২.	ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. নেছার উদ্দিন	অক্টোবর, ২০০৫
৩৩.	বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব	ড. মোঃ আবদুস সাত্তার	ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, জুন ২০০৪
৩৪.	একজন জঙ্গীর আত্মকথা	হাসান রফিক	অক্টোবর, ২০০৫
৩৫.	জামায়াতে ইসলামীর ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, জুন ২০০৬
৩৬.	মওদূদী সাহেব ও ইসলাম	মাওলানা মুজিবুর রহমান	মার্চ ২০০৬
৩৭.	দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ সবার জন্য ফরয	মাওলানা মুহাম্মদ অংশগ্রহণ রহীম	নিলুফার পারভিন, সায়লা পারভিন রুমানা পারভিন, নুসরাত পারভিন মে ২০০৬
৩৮.	প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার	শাকের হোসাইন শিবলি	মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন মার্চ ২০০৫
৩৯.	শহীদদের ফাযায়েল ও মাসায়েল	অনুবাদক ওলিউল্লাহ	এএইচএম হারুণুর রশীদ, জুন ১৯৯৯
৪০.	কেন জিহাদ করবো	মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ	জানুয়ারি ২০১২
৪১.	মুজাহিদের সংলাপ ও জিহাদ শিক্ষা	মাওলানা মাসউদ আযহার	হারুণ রশীদ, জুলাই ১৯৯৮
৪২.	আযাদী ও লড়াই	মাওলানা মাসউদ আযাহার	আবু আবদিল কাদির, ডিসেম্বর ২০০২
৪৩.	কাদিয়ানী মতবাদ ও উলামায়ে ইসলাম	শাইনুল ইসলামী	শাইনুল ইসলামী এপ্রিল ২০০৪

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
৪৪.	আফগান রণাঙ্গনে	মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ আযহার	রশীদ আহমাদ ও খলিল আহমাদ মার্চ ২০০৩
৪৫.	এনজিও নাস্তিক মুরতাদ	নোমান আহমদ	নাজমুল নাদিয়া বুক কর্ণার, মার্চ ২০০৩
৪৬.	২৫ বছর পূর্তি প্রেরণার স্মারক মিছিল	মজিবুর রহমান মনজু	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির অক্টোবর ২০০২
৪৭.	ইসলামের বিভিন দল ও উহাদের উৎসব	আল্লামা আবু মোহাম্মদ আলীউদ্দিন (রা)	আবু আবদুল্লাহ মাহমুদ, অক্টোবর ২০০৫
৪৮.	ক্রুসেডের মোকাবিলায় উলামায়ে দেওবন্দী	মাওলানা সাইয়িদ আসআদ মাদানী (রা)	মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, মে ২০১২
৪৯.	স্মরণকালের ভন্ডামী	মাওলানা আবু জাফর কাসেমী	মাওলানা হাফিজ আবদুল কাদের, সেপ্টেম্বর ২০০৭
৫০.	আমরা যাদের উত্তরসুরী	হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	আল কাওসার প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৯
৫১.	ভ্রান্ত মতবাদ ও তার জবাব	মুযযাম্মিলুল হক	দারুল হুদা কুতুবখানা, আগস্ট ২০০৫, ডিসেম্বর ২০১২
৫২.	সেবার আড়ালে এনজিওরা কি করছে?	মাওলানা হিফজুর রহমান	সম্পাদক-মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ, প্রকাশক-সাইখুল ইসলাম ফাউন্ডেশন ১৯৯২-২০০৮
৫৩.	ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান	আবু জাফর	কাঁটাবন বুক কর্নার, সেপ্টেম্বর ২০০০-নবেম্বর ২০০৮
৫৪.	কাওমী মাদ্রাসা কি এবং কেন?	হযরত মাওলানা আবু তাহের নদভী	আল কাউসার প্রকাশনী, জুন ২০১৩
৫৫.	প্রিয়নবী (সাঃ) এর বিবি ও কন্যাগণ	মাওলানা মোহাম্মদ মকবুল হোসেন	কোহিনুর লাইব্রেরী, অক্টোবর ২০০৫-ফেব্রুয়ারী ২০১২
৫৬.	ইসলাম ও বহুবিবাহ	মুহম্মদ ছফিউল্লাহ হাসেমী	রাহবার লাইব্রেরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯
৫৭.	নবীর অবমাননাকারীদের ভয়াবহ পরিনতি	মুফতী মোহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম	হিলফুজুল প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৩
৫৮.	আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব	মুহম্মদ কামরুজ্জামান	আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই ২০০৮
৫৯.	পটিয়ার দশ মনীষী	মাসউদুল কাদির	আল-মানার লাইব্রেরী, ২০০৬-২০০৯
৬০.	নারী	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	খায়রুন প্রকাশনী, মে ২০০৮
৬১.	হযরত থানভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মাওলানা তকী উসমানী	মাকতাবুল আখতার, মে ২০০৬-ফেব্রুয়ারী ২০০৯
৬২.	যেমন কর্ম তেমন ফল	ইসহাক ওবায়দী	মাকতাবুল কোআরান, ফেব্রুয়ারী ২০১১
৬৩.	নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তি	মুফতী আবদুর রহমান আযাদ	আননুর প্রকাশনী, মে ২০১৩
৬৪.	ইসলাম বিদ্বেষীদের অপকর্মের জবাব	আবুবকর সিদ্দীকী	রিমঝিম প্রকাশনী-২০০২
৬৫.	আল কুরআনে যুদ্ধ জিহাদ	সগীর বিন ইমদাদ,	মাকতাবুল কোরান, এপ্রিল ২০১৩
৬৬.	ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি	আশরাফুল হক	দারুল হক প্রকাশনী সেপ্টেম্বর ২০০৯
৬৭.	অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল-কুরআন	আব্দুর রব	খায়রুল প্রকাশনী নবেম্বর ২০১২
৬৮.	মিস্টার মওদুদীর নতুন ইসলাম	মুফতী মনসুরুল হক	জামিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া ডিসেম্বর ২০০৬
৬৯.	ধর্মগ্রন্থ সমূহে বিশ্বনবীর আগমন বার্তা	ডা. ফজলুর রহমান	কালী প্রকাশনী ২০১৪

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
৭০.	অপারেশন কাশ্মীর-গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে	হাফেজ আকরাম উল্লাহ	মুহিউদ্দিন/আবাবিল পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ২০১৩
৭১.	মরণজয়ী মুজাহিদ	মল্লিক আহমেদ সরোয়ার মনজুর আহমেদ	আবাবিল পাবলিকেশন, নবেম্বর ১৯৯৭-আগস্ট-২০০৮
৭২.	মুজাহিদদের জীবন	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী	কিতাব কেন্দ্র, জুন ২০১৩
৭৩.	বুশের ক্রুসেড ওসামার জিহাদ	অধ্যাপক আবু মিরাজ	আলহাজ মাওলানা জয়নাল আবেদীন, জানুয়ারি-২০০২
৭৪.	নুতন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ও আজকের মুসলমান	মাওলানা আবু তালহা আনসারী	হাসান প্রকাশনী, মার্চ-২০০৩
৭৫.	রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস	এন এম হাবীবুল্লাহ	মুনাওয়ার আহমেদ-সেপ্টেম্বর ২০০২
৭৬.	ধর্ম ও ঈশ্বরের বাধা কোথায়	হাসান ফকরী	অক্ষর বিন্যাস আগস্ট-২০০৭
৭৭.	ওলামায়ে দ্বীন ও কওমী মাদ্রাসা	মাওলানা হাবীবুর রহমান	আল ফালাহ প্রকাশনী-মার্চ-২০০৭
৭৮.	ইসলাম ও ফ্যাশনের সংঘাত	প্রফেসর হাসান সাইদ	মাওলানা মুহীউদ্দীন, জুন-২০০৫
৭৯.	গণতন্ত্রের কবর	এ আর ভূইয়া	জানুয়ারি ২০০৫
৮০.	মঞ্জিলের পথে	সম্পাদক আমীনুল ইসলাম	ডিসেম্বর ২০০২
৮১.	নির্বাচন '৯৬	গোলাম ফারুক	মিমমা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
৮২.	মহানায়ক ওসামা বিন লাদেন অজানা কাহিনী	আওরঙ্গজেব গওহর	দস্তান প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০১
৮৩.	দুঃসময়ের চার বছর	সংকট উত্তরণের পথে আবুল মাল আব্দুল মুহিত	নূহ উল আলম লেনিন, মে ২০০৬
৮৪.	ইসলামের নামে এতদল আমরা যাবো কোথায়	শাহ আলম খান ফারুকী	ইনকিলাব প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৩
৮৫.	ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের কবলে কওমী মাদ্রাসা	মোঃ আবদুল হক	ড. রিয়াজ বুক কর্নার, মে ২০১০
৮৬.	জিহাদ ঃ জান্নাতের পথ	রাগেব আল জিহাদ	কেতাব কেন্দ্র, আগস্ট ২০০২
৮৭.	ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা	ডা ঃ আহমেদ আলী	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারি ২০১০
৮৮.	গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ইসলাম	আলীমুল হক	দি রয়েল সাইন্টিফিক পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৮৯.	শাহাদাত ছিল কাম্য যাদের	ফরিদ উদ্দিন নিজামী	ডিসেম্বর ১৯৯৮
৯০.	কোঅরান হাদীসের আলোকে আল্লাহর পথে জ্বিহাদ	মাও. খলিলুর রহমান মমিন	আলহেরা প্রকাশনী, এপ্রিল ১১৯৯
৯১.	আধুনিক মুসলিম বিশ্ব	ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	নভেল পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৬
৯২.	তালীমুল জ্বিহাদ	মাও. মাসউদ আজহার	শহীদুল ইসলাম, ফ্রেব্রুয়ারি, ২০০৬
৯৩.	নামে মাত্র আস্তিক কথায় কাজে নাস্তিক	মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান	মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী, মে, ২০১০
৯৪.	ধর্ম ব্যবসায়ের ইতিবৃত্ত	শেখ আতাউর রহমান	রঞ্জন ঘোষ অর্পিতা প্রকাশনী, একুশের বইমেলা ২০১১
৯৫.	মুজাহিদের সংলাপ ও জিহাদ শিক্ষা	মাওলানা মাসউদ আযহার	রাহিমিয়া লাইব্রেরী, জুলাই ১৯৯৮

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
৯৬.	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	আমীর হোসাইন মজুমদার,	সাহাবউদ্দীন আহমেদ, এপ্রিল ২০০৬
৯৭.	এনজিওদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ	মুহাম্মদ এনামুল হক জালালাবাদী	এমএস ইসলাম, নাছিমা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯
৯৮.	Afghanistan Exposes Inter feraence in its internal Affairs		kabul, 1986
৯৯.	মাদ্‌রাসা মক্‌তবের বিধানাবলী	মুফ্‌তী মো ঃ আব্দুল্লাহ	বাতিল প্রতিরোধ লাইব্রেরী, জুন ১৯৯৯
১০০.	বাংলাদেশে ইসলাম শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	আব্দুল ওয়াহিদ	ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, নবেম্বর ২০০১
১০১.	বাবরী মসজিদ লংমার্চ জানা অজানা ইতিহাস	আহম্মদ এহসানুল হক	থানবী লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ২০১২
১০২.	দেওবন্দ আন্দোলন	আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া	রিসার্চ একাডেমী, মার্চ, ১৯৯৮
১০৩.	ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদী ও মুক্তিযুদ্ধের স্বত্বলোভীদের প্রতি খোলা চিঠি	অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ	ইস্ট-ওয়েস্ট পাবলিকেসন্স, এপ্রিল ২০১২
১০৪.	বাংলাদেশ ও ইসলাম	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম	সাহিত্যিক, অক্টোবর ১৯৯৯
১০৫.	হৃদয় নিংড়ানো প্রেম	জাফরুল্লাহ খান মাশরাব	শহীদুল ইসলাম মোল্লা, ২০১২
১০৬.	তাসলিমার নষ্টামি ইসলামের বিরুদ্ধে তার অপপ্রচার	মুহসিন আল জাবির	আনোয়ার লাইব্রেরি, জানুয়ারি ২০১৩
১০৭.	রাসুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	মোঃ হাবীবুর রহমান	খাইরুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২
১০৮.	আল-জিহাদ	কাজী আবদুল্লাহ হারুন	হরফ প্রকাশনী
১০৯.	মুজাহিদের আযান, জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ	মাসউদ আযহার	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, জুন ২০০৪
১১০.	ফাযায়িলে জিহাদ	মোঃ মাসউদ আযহার	আবাবিল পাবলিকেশন, অক্টোবর, ২০০২
১১১.	ফারাজী আন্দোলন	আহসান উল্লাহ	শরীয়ত পাবলিকেশ, এপ্রিল ২০১০
১১২.	ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	ড. মোহাম্মদ আনওয়ার	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউটাব ইসলামী থট, সেপ্টেম্বর ২০০৩
১১৩.	সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস	আবু হাসান আলী নদ্‌ভী	মোহম্মদ ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২
১১৪.	দারুল উলূম দেওবন্দ মুবাশশারাত, পরিচিতি ও আকাবিরের কারামত,	হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,	মোহম্মদ ব্রাদার্স, মার্চ, ২০০৬
১১৫.	বাংলাদেশে এনজিও আগ্রাসন	ইকবাল কবীর মোহন	বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, ডিসেম্বর ১৯৯৪
১১৬.	কুরআন ও সুন্নাহর ফয়সালায় মুসলমান কিভাবে কামিয়াব হয়?	ছাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী আতাউল্লাহ বিন ছাঈফ	নভেম্বর ২০০০
১১৭.	দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কালিমা এক ইলাহর ইবাদতের দাওয়াত	নূরুল্লাহ কাসেমী	২০১০
১১৮.	রাসুলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	১৯৮৪/২০০৭
১১৯.	ইসলামের শান্তি ও যুদ্ধ	মজিদ কাদদুরী	জ্ঞান বিতরণী, ২০১০
১২০.	মানবীয় মতবাদ ও ইসলাম	অধ্যাপক আজিজুল হক	বদ্বীন প্রকাশেনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯০
১২১.	গণতন্ত্র ও ইসলাম	মোহাম্মদ আব্দুল আজীম	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থস্ট, ২০০৬
১২২.	মৌলবাদ নয় ইসলাম	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	সেন্টার ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৬
১২৩.	গণতন্ত্র কি একটি শিরক ও কুফরী মতবাদ?	মাজহারুল আনোয়ার	মাজহারুল আনোয়ার সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১২৪.	ওসামা বিন লাদেন	আব্দুর রহমান	মৈত্রী পাবলিকশন, বাংলাবাজার ঢাকা, অক্টোবর ২০০১
১২৫.	লাল সাগরের ঢেউ	মুহিবুর রহমান খান	খান প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১
১২৬.	সেবার নামে এনজিওদের ষড়যন্ত্র	মুফতী রেজাউল করীম শিবলী	আশরাফী বুক ডিপো, মার্চ ২০১৪
১২৭.	সেবার আড়ালে এনজিওরা কি করছে	মুফতী হিফজুর রহমান	
১২৮.	পাবর্ত্য শান্তি চুক্তি	সম্পাদনা অধ্যাপক এম এ বাশার খান	অধ্যাপক এ আর হাওলাদার ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট স্টাডিজ ফোরাম, বাংলাবাজার
১২৯.	বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন	প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর	ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১৩০.	অধ্যাপক গোলাম আযম-একটি বিপ্লবী চেতনার নাম	সামছুল আরেফিন মু আতাউর রহমান সরকার	প্রত্যয় প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১২
১৩১.	রাষ্ট্র সাম্পদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	কঙ্কর সিহং	অনন্যা, জানুয়ারি ১৯৯২
১৩২.	ইসলামে মানবাধিকার	মুহাম্মদ সালাহদ্দীন	আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৮৩
১৩৩.	অপসংস্কৃতির আগ্রাসন	মুফতী হিফজুর রহমান	মুহাম্মদপুর, ১লা মিলকদ ১৪২৫ হিজরী
১৩৪.	বিশ্ব শান্তির রোড ম্যাপ	অধ্যাপক মফিজুর রহমান	মদিনা একাডেমী দেওয়ান বাজার, জানুয়ারি ২০০৬
১৩৫.	ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ	অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মতিন	মে -২০০৩, সাহাল প্রকাশনী
১৩৬.	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ডঃ মুসতাফা আসসিবায়ী	বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, সেপ্টেম্বর-১৯৯১
১৩৭.	জিহাদের চল্লিশ হাদিস	মাওলানা আব্দুস সালাম সাইয়াল	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, অক্টোবর ১৯৯৯
১৩৮.	মুসলমানের সামরিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজনয়ীতা	মাওলানা মাসউদ আযহার	সাইফুল্লাহ প্রকাশনী/অক্টোবর/১৯৯৯
১৩৯.	আল কুরআনের দৃষ্টিতে দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব ও ফজিলাত	খন্দকার আবুল খায়ের	আশা প্রকাশন/ঢাকা/নভেম্বর ১৯৯৩
১৪০.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মওদুদী মতবাদ	মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক	আল আবরার ট্রাস্ট/বাংলাবাজার, মার্চ ২০০৬
১৪১.	ভ্রান্তি নিরসন ও আকীদা সংশোধন	ফতেওয়া বিভাগ (দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম/ হাটহাজারী/চট্টগ্রাম	হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ
১৪২.	সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	মুহাম্মদ আবদুল আজিজ	বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, আগষ্ট-২০০৬
১৪৩.	গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচন এ নির্বাচনী জোট ইসলাম কী বলে	মাওলানা আখতার ইমাম আদিল কাসেমি	ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার/শাকের হোসাইন শিবলী/সেপ্টোম্বর ২০১৩
১৪৪.	ফাযায়েলে জিহাদ	মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ	মাকতাবাতুল কুরআন-অক্টোবর ২০০৯
১৪৫.	সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহানুভব তার ধর্ম	মোঃ মুখলেছুর রহমান	এনআর বি গ্রুপ-মার্চ ২০১১
১৪৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা	আতাউর রহমান কাসেমী	আল আতাহার একাডেমী/ডিসেম্বর ১৯৯৭
১৪৭.	ফতোয়া (১৯৯১-১৯৯৫ সম্পাদনা পরিষদ	আনিসুজ্জামান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও অন্যান্য, সম্পাদক মালেকা বেগম	শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা,কেন্দ্র ঢাকা (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১৪৮.	নাস্তিক মুরতাদের শাস্তি	হাফেজ মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান আজাদ	আল নূর প্রকাশনী, ঢাকা, ১০ মে ২০১৩
১৪৯.	এনজিও নাস্তিক মুরতাদ	নোমান আহমদ	নাদিয়া বুক কর্ণার, ঢাকা, ৩০ মার্চ ২০০৩
১৫০.	বুশের ক্রুসেড	অধ্যাপক আবু মিরাজ,	আলহাজ্ব মাওলানা জয়নুল আবেদীন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২
১৫১.	দ্বীনে এলাহী অসৎ আলেম ও পীর	আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী, মুফতী ফজলুল হক আমিনী	মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ) একাডেমী, জুলাই-২০১১
১৫২.	ইসলামী আন্দোলন দেশে দেশে	মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন	বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, জুলাই ২০০৬
১৫৩.	জেন্ডার ইস্যু ও নারীর ক্ষমতায়ন	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান,	তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা, ২০০২
১৫৪.	তালোয়ার নয় উদারতায়	শায়খুল ইসলাম ইসাইন আহমাদ মাদানী (রহ)	হরফ প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ২০০৮
১৫৫.	মিম্বায়ের ধ্বনি	মাহমুদুল হাসান	হায়াত পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম, আগষ্ট ২০০৬
১৫৬.	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন	বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, মে, ২০০৬
১৫৭.	বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি আলেম সমাজ ও ইসলামী দল	ফজলুর রহমান জুয়েল	তাসমিয়া বই বিতান, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪
১৫৮.	ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজত	মাওলানা মুহাম্মদ হারুন	রহিমিয়া লাইব্রেরী/ডিসেম্বর ১৯৯৯
১৫৯.	হায়াতুল মুছান্নিফীন	মাওলানা মাহবুবে এলাহী	আনোয়ার লাইব্রেরী/জুন ২০১২
১৬০.	সেকুলারিজম	অধ্যাপক ফজলুর রহমান	দার-আল-খায়ের, সিলেট/জানুয়ারী ২০১০
১৬১.	শাহবাগ হতে শাপলা চত্তর-১৩ দফা	মাওলানা ইসমাইল খান	কম্পোজ, ডিজাইন-মদিনা কম্পিউটার সেন্টার, চট্টগ্রাম/জুন ২০১৩
১৬২.	রক্তাক্ত শহীদি চত্বর	আবরার সিদ্দিক	এপ্রিল ২০১৪
১৬৩.	জঙ্গীবাদ কওমী মাদরাসা এবং আকাবিরদের ভাবনা	ডঃ আফম খালিদ হোসেন	আল-মানার লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, জুন ২০০৯
১৬৪.	ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ	ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ঝিনাইদহ, আগস্ট ২০০৬
১৬৫.	ফতোয়া নারীনীতি ও শিক্ষানীতি	মাওলানা আশরাফ আলী	নিজামপুরী, সালমান প্রকাশনী/ মে ২০১১
১৬৬.	খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ও তাঁর চিন্তাধারা	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	প্রকাশক—ইঞ্জিনিয়ার জিয়া ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০১০
১৬৭.	সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই এর জীবনী, সংকলন	মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী খান	মুজাহিদ প্রকাশনী/অক্টোবর ২০১৩
১৬৮.	সনদের স্বীকৃতির চেয়ে কর্মের মূল্য বেশি	মাকতাবাতুল কুরআন	বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
১৬৯.	যুদ্ধাপরাধ জঙ্গিবাদ ও বাংলাদেশ	মে. জে. এ, কে মোহাম্মদ আলী শিকদার	বিজয় প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারী ২০১২
১৭০.	অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ	আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৬
১৭১.	নাস্তিক মুরতাদের পরিণাম	মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ	মাকতাবায়ে কাসেমিয়া, অক্টোবর ২০১৩
১৭২.	বাংলাদেশের রাজনীতিঃ যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গী প্রসঙ্গ, (৫ম খন্ড)	সম্পাদক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ	অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা বই মেলা ২০১২

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১৭৩.	কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার আইন	মুফতী হাবীবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী	উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ২০১১
১৭৪.	দ্বীন নিয়ে উপহাস প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম	মার্চ ২০১৪
১৭৫.	বাংলাদেশের রাজনীতি যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গী প্রসঙ্গ (৩য় খন্ড)	সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ	অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১০
১৭৬.	মুখোশ উন্মোচন	মাওলানা আব্দুল আলীম মাহমুদ	নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ঢাকা/ জানুয়ারী ২০০৯
১৭৭.	কওমী মাদরাসা কী ও কেন	শাইখুল হাদীস শফীউল্লাহ আল মোস্তফা	থানভী লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম/ অক্টোবর ২০১১
১৭৮.	আলোকিত ভাবনা	মাওলানা লিয়াকত আলী	মার্চ ২০০৮
১৭৯.	প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার	শাকের হোসাইন শিবলি	বাড কম্প্রিট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা/ মার্চ ২০০৬
১৮০.	শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রঃ) জীবন সংগ্রাম	আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	প্রভাত প্রিন্টিং প্রেস পাবলিকেশন, ঢাকা/ ডিসেম্বর ১৯৯১
১৮১.	দারুল উলুম হাটহাজারীর ইতিহাস	মুফতী জসীমউদ্দীন	বুখারী একাডেমী, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০০২
১৮২.	জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ কেন টার্গেট	মেহেদী হাসান পলাশ	বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার ডিসেম্বর ২০০৬
১৮৩.	জিহাদ ও জঙ্গীবাদ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম	শ্যামল বাংলা একাডেমী, রাজশাহী/ এপ্রিল ২০১০
১৮৪.	পরিবর্তিত বিশ্ব ও আলেমদের করণীয়	মাও. হানিফ জালান্ধরি মুফতি জামিল আহমদ	আবুজর গিফারী/ অক্টোবর ২০১২
১৮৫.	ঐক্যের ডাক	আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (দঃবাঃ)	মাও. মুস্তাফীজুর রহমান মোমতাজী, ঢাকা/ ফেব্রুয়ারী ২০১৩
১৮৬.	হযরত হাফেজ্জী হুজুর এর শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের ডাক থেকে জামায়াতে ইসলামীর পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্কবাণী	মজলিসে দাওয়াতুল হক	বাংলাদেশে, আল আবরার ট্রাষ্ট-ঢাকা
১৮৭.	জিহাদ কি ও কেন?	আহমদ আবদুল কাদের	বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা/ জানুয়ারী ২০০৮
১৮৮.	জীবন ও কর্ম	আল্লামা শাহ আহমদ শফী	মাওলানা মুনির আহমদ/তালীমুল কুরআন কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম/ ৯ মার্চ ২০১৩
১৮৯.	প্রখ্যাত আলেম ইসলামী রাজনীতিক ও পীর মাশায়েখের সাক্ষাৎকার	শাকের হোসাইন শিবলি	বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা/একুশে বইমেলা ২০০৮
১৯০.	আওরঙ্গজেব ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম	শেখ আজিজুল হক	মল্লিক ব্রাদার্স/কলিকাতা/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
১৯১.	আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি	মাও. ওবায়দুর রহমান খান নদভী	কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা জুলাই ২০০৮
১৯২.	জঙ্গীবাদ জেহাদি ও ইসলাম	রফিকুল ইসলাম বুলবুল	অমর প্রকাশনী, ঢাকা/ডিসেম্বর ২০১১
১৯৩.	মিডিয়া সন্ত্রাস	আশরাফ আলী	নিজামপুরী/আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, চট্টগ্রাম/এপ্রিল ২০১০

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১৯৪.	দেওবন্দ আন্দোলন-ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান	মাওলানা আবুল হাত্তাহ মুহা. ইয়াহইয়া	আলআমিন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ/মার্চ ১৯৯৮
১৯৫.	আমার জীবনকথা	আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী	নদভী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম/এপ্রিল ২০১৪
১৯৬.	আলোর কাফেলা	জামেয়া	কোরআনিয়া আরাবিয়া, ঢাকা/ডিসেম্বর ১৯৯৭
১৯৭.	কওমী মাদরাসা আকাবিরের ভাবনা	মাওলানা লিয়াকত আলী	মাদরাসা দারুর রাশাদ, ঢাকা/সেপ্টেম্বর ২০০১
১৯৮.	উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দাওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন	ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সাল	প্রকাশক-ওমর আহসান ফাহিম/ফেব্রুয়ারী ২০১১
১৯৯.	বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়াখের ছাত্রজীবন	মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী	বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন/মার্চ ২০০৯
২০০.	বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব	ড. মোঃ আবদুস সাত্তার	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ/জুন ২০০৪
২০১.	ইসলামী সমাজে নারী	সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার	উমরী/আধুনিক প্রকাশনী/ নভেম্বর ১৯৯১
২০২.	মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি	সোহরাব হাসান	পরমা, ঢাকা/১৯৯৯
২০৩.	ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবসমাজ	আবদুর রাজ্জাক	র‍্যামন পাবলিকেশন্স, ঢাকা/ফেব্রুয়ারী ২০০৫
২০৪.	স্মরণকালের ভন্ডামী	মাওলানা আবু জামার	কাসেমী/ কাসেমী প্রকাশনী, ঢাকা/ সেপ্টেম্বর ২০০৯
২০৫.	সত্য সমাগত মিথ্যা হোক বিলুপ্ত	হায়দার আলী চৌধুরী	টুকু আবদুর রহমান, ঢাকা/অক্টোবর ২০০৯
২০৬.	ইসলাম ও মওদুদীবাদের সংঘাত	মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক	শায়খুল হিন্দ একাডেমী সিলেট/নভেম্বর ২০১০
২০৭.	আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা	হোসেনুর রহমান	মিত্র ঘোষ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০১
২০৮.	বুদ্ধিজীবী মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজী	আশরাফ আলী নিজামপুরী	পরিবেশনায়-বোখারী একাডেমী, চট্টগ্রাম/জানুয়ারী ২০০৫
২০৯.	বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ (১ম খন্ড)	ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ	অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা/ফেব্রুয়ারী ২০০৮
২১০.	অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনীতি অর্জন ও ব্যর্থতা (১ম পর্ব)	মাওলানা মোহাম্মদ চামির উদ্দিন গাজীপুরী	গ্রন্থাকার, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৫।
২১১.	এ্যাটম বোমের গুপত্চর ও ইসলামিক বোম	মিয়া মুঃ সিরাজুল হক	পরমাণু প্রকাশনী, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
২১২.	বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্	মুহাম্মদ আমিনুর রহমান	মতিয়া হাসান, ঢাকা, ২০০১
২১৩.	খিলাফতে রাশেদা	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	খায়রুন প্রকাশনী, ঢকা-১৯৭৫
২১৪.	একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও মুসলিম উন্নাহ	ইকবাল কবলি মোহন	সম্পাদিত ভেনাস প্রকাশনী ঢাকা, ১৫মে, ২০০১
২১৫.	ইসলামী আন্দোলন দেশে দেশে	মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন	বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা-জুলাই ২০০৫
২১৬.	ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী	সাইয়েদ আবুল আর্লা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-ডিসেম্বর ১৯৬৩
২১৭.	ধর্মভিত্তিক রাজনীতি	মাওলানা মো. ফজলুর রহমান	আমরাফী আর.আই.এস পাবলিকোশন্স, ঢাকা নভেম্বর ১৯৯৫

ক্র.নং	নাম	লেখক ও সংগঠনের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
২১৮.	কাফের মুসলামানের সম্পর্ক	মুহাম্মদ আবদুল কাদের	-মোসাম্মৎ আফরোজা বেগম, সাভার, ঢাকা আগস্ট ১৯৯২
২১৯.	শি আরে ইসলাম স্মারক	উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগের ছাত্রবৃন্দ	হাটহাজারী চট্টগ্রাম ৬ই জুন ২০১২
২২০.	ফতোয়াবাহ	মিজানুর রহমান খান	অনুগম প্রকাশনী, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
২২১.	ইবাদাত ও খিলাফত	মুহাঃ হাবীবুর রহমান	আল-ফালাহ প্রকাশনী, বগুড়া, ১৪২১ হিজরী
২২২.	ইসলাম ও গণতন্ত্র	মাওলানা আসেম ওমর	আবাবিল প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪
২২৩.	তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদি ও দাজ্জার	মাওলানা আছেম ওমর	মাও-মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, জানুয়ারি ২০১৩
২২৪.	দীন বড় না দেশ বড়	মাওলানা আসেম	ওমর আবাবিল প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪
২২৫.	ইসলাম ও চিন্তার বিকাশ	শাহেদ আলী	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা-নভেম্বর ১৯৪
২২৬.	সংস্কার	মোহাম্মদ জামিলুল বাসার	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি, নিউইয়র্ক,-২২জুন ২০০২
২২৭.	তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দাজ্জাল-ইমাম মাহদী আ.এর আগমন	মাওলানা আসেম উমর	মক্কা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৪
২২৮.	জিহাদের কাফেলা	শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান	ফারুকী হুংকার প্রকাশনী,/২৪ চৈত্র, ১৪০৬
২২৯.	উন্মাহর মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের পথ	মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক খান	খান প্রকাশনী, ঢাকা-অক্টোবর ২০০৩
২৩০.	কাশ্মীর রণাঙ্গনে	মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ আযহার	মুমতাজ লাইব্রেরী/ঢাকা-অক্টোবর ২০০২
২৩১.	আফগান রণাঙ্গণে	এ কে এম মহিউদ্দীন	কাদেরিয়া পাবলিকেশণ লি. ঢাকা-আগস্ট ১৯৮৮
২৩২.	আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা	সামীম মোহাম্মদ	আফজাল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন/ অক্টোবর ২০১৪
২৩৩.	তারীখে উম্নত- খিলাফতে বনু উমাইয়া	আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার	নিজামী প্রকাশনায় আল-মানার লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম
২৩৪.	সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের অন্তরালে	সরকার এম.এ.মাজেদ	জনতা প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ২০০৬
২৩৫.	হিউম্যানিজম	শফিকুর রহমান	সন্দেশ-বইমেলা ১৯৯৭
২৩৬.	আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস	আবদুস সাত্তার	ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আগষ্ট ১৯৮০
২৩৭.	জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী (১ম খণ্ড)		আবু তাহের মুহাম্মদ মাছুম-সেপ্টেম্বর ২০১৩

দলিল

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
২৩৮.	গঠনতন্ত্র	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	ডাঃ শফিকুর রহমান, মে ১৯৮০
২৩৯.	১৩ দফা দাবী সরকারের অবস্থান ও পর্যালোচনা	হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	রূপনগর থানা শাখা, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০১৩
২৪০.	কমিটির তালিকা	হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ মে ২০১৩
২৪১.	নাস্তিক ব্লগার বনাম হেফাজত	সৈয়দ আবদুল মুস্তাফা	হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ২০ এপ্রিল ২০১৩
২৪২.	আল-মুঈন	আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম	আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম ২০০৬

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
২৪৩.	১২ দফা কী ও কেন?	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত	মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, ২০১৩
২৪৪.	লিফলেট	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ২০১৩
২৪৫.	স্থায়ী কর্মসূচী ও দিক নির্দেশনা	আল্লামা শাহ্ আহ্মেদ শফী আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ	হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ২০১৩
২৪৬.	ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁসি চাই	আল মেহেদী	আল আমিন প্রকাশনী এপ্রিল ২০০৬
২৪৭.	খতমে নবুওয়ত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়	মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী	মো. সিরাজুল মতিলা ছাত্র জুলাই ২০০১
২৪৮.	গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট	মাওলানা আমিনুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর, ২০০৬
২৪৯.	কাদিয়ানী এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য	মাওলানা মুহাঃ ইউসুফ লুবইয়ানভী (মাঃমিঃ)	মুফতী মো. আব্দুল্লাহ অক্টোবর ২০০০
২৫০.	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ মার্চ ১৯৯৩
২৫১.	আমি কেন জিহাদ করি	সোহেল বিন আবু বকর	আল-হেরা ইসলামী পাঠাগার অক্টোবর ২০০১
২৫২.	গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?	শহীদুল্লাহ আনোয়ার	মুফতী সালমান অক্টোবর ১৯৯৯
২৫৩.	আমি রণবীর	মাওলানা মাসউদ আযহার	হুংকার প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০১
২৫৪.	ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	খায়রুন প্রকাশন মে ২০০১
২৫৫.	ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ মাছুম আগস্ট ২০০৮
২৫৬.	সশস্ত্র জিহাদ— মুসলিম উম্মাহর মুক্তির সোপান	ইবনু আব্দুল মাতিন	আবু আব্দুল্লাহ ডিসেম্বর ২০০১
২৫৭.	নামায-রোযার হাকীকত	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী	আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ২০০৯
২৫৮.	কাদিয়ানী সমস্যা	সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী	এবিএম এ খালেক মজুমদার, ১৯৯৩
২৫৯.	নাস্তিক-মুরতাদের শরয়ী বিধান	আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী	উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ মে ২০১৩
২৬০.	আছ-ছিরাজি ফিল্‌মিরাজ (আরবী)	শায়েখ সিরাজউদ্দিন	মোহম্মদ বিন আব্দুল রশীদ আল হানাফি ১৯৯৬ সাল
২৬১.	স্মরণীকা (বার্ষিক) (আরবী)	আল হাইয়াতুল খাইরিয়াতুল ইসলাম আলমিয়া	ফিলিস্তিন ১৯৯৮ সাল
২৬২.	আল্ ফোরকান (আরবী)	জিয়া আব্দুল করিম	১৯৯৮ - ২০০০ সাল
২৬৩.	আল্ এরশাদ (আরবী)	মোহম্মদ আলবুল মুনতাসীর	১৯৯৪ সালে
২৬৪.	খতমে নবুয়াত (আরবী)	মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ	১৯৯২ - ১৯৯৮ সাল
২৬৫.	আল্ রাবেতা (আরবী)		সৌদী আরব
২৬৬.	আল্ মুজাতাম (আরবী)	মুহাম্মদুল বসরী	কুয়েত ২ জুন, ১৯৯৮- ২৫ জুলাই, ২০০২

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
২৬৭.	শাহবাগ চত্বর ও শাপলা চত্বর	আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী	রকমারী প্রকাশনী, নবেম্বর ২০১৩
২৬৮.	জাতীয় শিক্ষানীতি ও নারীনীতি (১,২)	আল্লামা নুরুল ইসলাম উলিপুরী	আল কাওসার প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১১
২৬৯.	দ্বীন কায়েম আগে ঘর পরে রাষ্ট্র	জহুর বিন ওসমান	জায়েদ লাইব্রেরী, জুলাই ২০১৩
২৭০.	ইক্বামাতে দ্বীন না ফিক্বাহ মতে সিংহাসন	জহুর বিন ওসমান	জুন ২০১১, অক্টোবর ২০১২
২৭১.	রমনীদের শাস্তি কোথায়?	মাওলানা আহমদ শফী	জানুয়ারী ২০১৪
২৭২.	মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	নুরুল ইসলাম ওলীপুরী	দারুল উলুম লাইব্রেরী, এপ্রিল ২০১০
২৭৩.	মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বেকার বলার অন্তরালে	নুরুল ইসলাম ওলীপুরী	দারুল উলুম লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ২০১১
২৭৪.	কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস	মাও. শহীদুর রহমান শিবলী	আল মাকতাবাতুশ শামেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
২৭৫.	সাংবাদিক সম্মেলন		বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ৯ এপ্রিল ২০১২
২৭৬.	মুসলমানের সামরিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা	মাও. মাসুদ আযহার	সাইফুল্লাহ প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৯৯
২৭৭.	ইসলামী রাজনীতি	আনসার আলী	রেহানা প্রকাশনী ডিসেম্বর, ১৯৯৭
২৭৮.	শিক্ষা, মৌলবাদ ও পর্দা	নুরুল ইসলাম ওলিপুরী	ডিসেম্বর ২০১০
২৭৯.	মাদ্রাসা শিক্ষিতরা অবহেলিত কেন?	খন্দকার আবুল খায়ের	খন্দকার মাহমুদুল কাদির, ডিসেম্বর ১৯৯১
২৮০.	চরমোনাইর পীর ছাহেবের ওয়াজ সম্বলিত পুস্তিকা "মাওয়ায়েজে কারিমিয়া" এ লিপিবদ্ধ বয়ানের তাত্ত্বিক আলোচনা	মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম	শাইখুল হাদীস ইসলামিয়া হোসাইনিয়া কওমিয়া ও সাগরদী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল।
২৮১.	কুরআন হাদীসের আলোকে শহীদ কারা	মাওলানা আবদুল মাতিন বিক্রমপুরী	আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৬
২৮২.	সত্যের দর্শনে ইসলাম, ইসলামী দল ও ইসলাম বিরোধী দল	মুহাম্মদ আবদুল হাই চৌধুরী আযম বাহার	প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪
২৮৩.	গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?	শহীদুল্লাহ আনোয়ার,	রহিমিয়া লাইব্রেরী/এইচ এস হারুনুর রশীদ, শিবপুর
২৮৪.	ধর্মের নামে ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচন সংকলনে:	মিজান সিরাজ ফেনবী	মাকতাবুল মিজান, ফেনী, মে, ২০১২
২৮৫.	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ভূমিকা সম্পাদনা	শাকের হোসাইন শিবলি	আলেম মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম:/জুন ২০১২

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
২৮৬.	নাস্তিক—মুরতাদের শরয়ী বিধান	আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী	আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম, হাটহাজারী চট্টগ্রাম, মে ২০১৩
২৮৭.	ফতোয়াকে কেন্দ্র করে ইসলাম নির্মূলের অভিযান	দারুল ইফতা বাংলাদেশ	আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, দরুল ইফতা বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি-২০০১
২৮৮.	ওরা ১১ জন-কথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ সন্ধানে	শামস জহির	স্বাধীনতা কেন্দ্র
২৮৯.	মদীনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য		ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৬
২৯০.	হেফাজতে ইসলামের ৪র্থ দফা—নারী অধিকার ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তি নিরসন	মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক	দারুল উলুম লাইব্রেরী, ঢাকা, মে ২০১৩
২৯১.	জিহাদ সন্ত্রাস না রহমত?	মাওলানা মাসউদ আযহার	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, নভেম্বর ১৯৯৯
২৯২.	নারী নেতৃত্বের শরয়ী বিধান—মুফতী রফী উসমানী দা. বা, মাকতাবাতুল হেরা যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ বার্তা	শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযম রহ	বইঘর, এপ্রিল ২০১৪
২৯৩.	আমরা কেন নির্যাতিত, কি আমাদের অপরাধ	—ফেরদাউস চাকলাদার	মাকতাবায়ে শামেলা, চট্টগ্রাম, মার্চ ২০১৩
২৯৪.	কওমী মাদ্রাসার কিতাব ও বইসমূহের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য (সিলেবাস)		আল ফাত্তাহ পাবলিকেশন, ২০১৪-২০১৬
২৯৫.	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ	আল-গালিব-হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩
২৯৬.	ইজহারে হাকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ	হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আহমদ শফী সাহেব (দাঃ বাঃ)	মাওলানা মুহাম্মদ আনাস
২৯৭.	আল্লামা আশরাফ আলী থানভী ও নেজামে ইসলাম পার্টির ভূমিকা	আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি/জুলাই ২০১৩
২৯৮.	আল্লামা আহমদ শফী ও হেফাজতে ইসলাম	মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী	ইসলামী গবেষণা পরিষদ, চট্টগ্রাম/আগস্ট ২০১৩
২৯৯.	ইসলাম সন্ত্রাসকে নিন্দা করে	মূল-হারুন ইয়াহিয়া	জাবীন হামিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/এপ্রিল ২০০৯
৩০০.	রক্ত ঝরছে আরাকানে	মাও আতিক উল্লাহ জুলফিকার	আল নুর পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম/আগস্ট ১৯৯৬
৩০১.	রাসুলুল্লাহ (সা) এর হুদায়বিয়ার সন্ধি	মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দীকী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন/এপ্রিল ২০০৫
৩০২.	ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু	অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু	ইসলামিক ফাউন্ডেশন/মার্চ ২০১৩
৩০৩.	সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম	নুরুল ইসলাম মানিক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন/এপ্রিল ২০০৫
৩০৪.	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসুল (সা)	রওশন আলী খোন্দকার	ইসলামিক ফাউন্ডেশন/এপ্রিল ২০০৫

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
৩০৫.	ইসলাম আজ কোন পথে	আহমদ আলী	আইরীন পারভীন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭
৩০৬.	ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	স্মৃতি প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯১
৩০৭.	ইসলামে মানব জীবন	মুফতী মুহাম্মদ নুরুল আবছার আল ওবাইদী	দারুল ইফতা ওয়াত তাছনীফ আজ জমীরিয়া, মার্চ ২০০৫
৩০৮.	তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহবান	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী	মুহাম্মদ ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১১
৩০৯.	মুসলিম ভীতি ও পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র	হোসাইন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	নিরূপম প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৮
৩১০.	মসজিদ ও রাজনীতি	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	আল-নূর ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, অগ্রহায়ণ ১৪০৫
৩১১.	কুরআন হাদীসের আলোকে জিহাদ কি ও কেন?	মুহাম্মদ ইসলহাক খান,	৩১২. মাকতাবাকুল কুরআন-অক্টোবর ২০০৩
৩১৩.	নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)	হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ	২রা জুন ১৯৯৩
৩১৪.	বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন	মুহাম্মদ লোকমান হোসাই,	বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, মে-২০০৬
৩১৫.	ইসলামী শিক্ষানীতি বনাম বর্তমান প্রেক্ষাপট	হাফেজ মাওলানা মামুনুর রশীদ	হাফেজ মো জয়নাল আবেদিন, মেসার্স সাউদিয়া কুতুবখানা, ২০০৫
৩১৬.	বাংলাদেশ-রাজনীতি আলেম সমাজ ও ইসলামী দল	ফজলুর রহমান জুয়েল	তাসনিয়া বই বিতান, নভেম্বর ২০০৪
৩১৭.	মওদুদীর তাফসীর কি চিন্তাধারা	হযরত মাওলানা রফিক আহমদ সাহেব	মুহয়বী শায়েরুল হাদিস ফাউন্ডেসন, ১৯৮৭
৩১৮.	সমকালীন রাজনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়- আশায়	নেছার আহমদ	শৈলী প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৬
৩১৯.	মওদুদীবাদের স্বরূপ সন্ধানে	মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী	সাইদ আহমদ যাকওয়াল, দারুল ইলম লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ২০০৬
৩২০.	হত্যা ও গৃহযুদ্ধ সম্পূর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী	শাইফুল ইসলাম	হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ তাকী উসমানী দায়রা মাকতাবতুল হেরা সাল নাই
৩২১.	আল হাবীব (ডায়েরী)		জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া ২০১৩
৩২২.	ধূম্রজালে জিহাদ	মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ আলহার	মাকতাবাতুল ইফাদা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৩২৩.	মুজাহিদের আযান জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ	মাওলানা মাসউদ আযহার	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স, আগষ্ট ১৯৯৮
৩২৪.	একুশ শতকের অর্থনীতি-নির্বাচিত সাক্ষাতকার	ফেরদৌস সালাম	কথা প্রকাশন, আগষ্ট ২০০৪
৩২৫.	৭১ এর যুদ্ধাপরাধীরা কে কোথায়	রিশাদ আহম্মেদ	স্বরাজ প্রকাশনী এপ্রিল ২০১০
৩২৬.	সেই সব অন্ধকার	তসলিমা নাসরিন	চারদিক, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
৩২৭.	সম্ভাবনাময় বৃহত্তর চট্টগ্রাম	-ড. এম এস এমরান চৌধুরী	মেট্রো মিডিয়া (প্রা) লিঃ ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯
৩২৮.	বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মগবাজার, জানুয়ারি ১৯৭৯
৩২৯.	৭১-এ কি ঘটেছিল, রাজাকার কারা ছিল	খন্দকার আবুল খায়ের	খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা-জানুয়ারি ২০০২
৩৩০.	মসজিদ ও রাজনীতি	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক আল-নূর	ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, ঢাকা-অগ্রহায়ন ১৪০৬
৩৩১.	পরকালের পাসপোর্ট	মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী	আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা-আগষ্ট ২০০৯
৩৩২.	বিদেশে পঞ্চাশ দিন	আব্বাস আলী খান	-শৌমী প্রকাশনী, ঢাকা-জানুয়ারি ১৯৯৭
৩৩৩.	নারী নেতৃত্ব ও ইসলাম	মাওলানা মুহাম্মদ, আবুল বাশার	তামীম প্রকাশনী, আগষ্ট-২০০৬
৩৩৪.	বক্তৃতামালা	মতিউর রহমান নিজামী	আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-জানুয়ারি ২০০৫
৩৩৫.	মুযাহিদের আযান-জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ	মাওলানা মাসউদ আযহার	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশ, আগষ্ট ১৯৯৮
৩৩৬.	তালেবান-ইসলামী বিপ্লবের রাহবার	সাইফউদ্দিন ইয়াহ ইয়া	কাবা প্রকাশনী, ঢাকা-১৫ নভেম্বর ১৯৯৬
৩৩৭.	সিলেবাস	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা	ঐ জুলাই ঢাকা ১৯৮১
৩৩৮.	এসো সোনালী দিগন্তে	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা	ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
৩৩৯.	তালেবান্ শাসক ও শাসনের পদ্ধতি	মাওলানা মুফতি জামিল খান	ইসলামিক বানচারাল ফোর্ম ৮মে ১৯৯৭
৩৪০.	ইসলামী রাজনীতি ও ভ্রান্ত মতবাদ	মাওলানা হাবীব আহমদ মাছুম	মুতামারুল আনসার জাতীয় মুসলিম ফান্ড বাংলাদেশের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সেপ্টেম্বর ২০০৯
৩৪১.	ধর্মজীবীদের কালো থাবা	আমিনুল ইসলাম	শুকুর জুন-১৯৯৭
৩৪২.	ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর এ কি আজব ফাতওয়া	প্রফেসর এ, এইচ, এম শামসুর রহমান	সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা অক্টোবর ২০১৩
৩৪৩.	মহানবীর সচিবালয়	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	নুর প্রকাশনী, ঢাকা নভেম্বর ১৯৮৫
৩৪৪.	ইসলাম ও জেহাদ	এ জি নূরানী	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড জানুয়ারি ২০০৩
৩৪৫.	চরমোনাইর পীর কাহিনী	মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম	শাইখুল হাদীস ইসলামীয়া হোসাইনিয়া কওমিয়া ও সাগরদী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা বরিশাল/প্রকাশকাল-২০ডিসেম্বর ১৯৯৩
৩৪৬.	দেখো, ঐ কাফেলা চলে যায়	ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম	আবু আবদুল্লাহ, জুলাই ২০০৫ দারুল জিহাদ বাংলাদেশ
৩৪৭.	গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?	শহীদুল্লাহ আনোয়ার	এইচএম হারুণুর রশীদ নরসিংদি প্রকাশকাল-জুলাই ২০০২

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
৩৪৮.	যুবক ভাইয়ের প্রতি বিশেষ বার্তা	শহীদ শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম	বইঘর, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪
৩৪৯.	খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঃ স্বপ্ন নয় বাস্তবতা	মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক খান	প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৯
৩৫০.	দ্যা হান্ড্রেড-(বাংলা মায়ের একশ কৃতি সন্তান)	আশরাফ আলী নিজামপুরী	সালমানী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, সেপ্টেম্বর ২০১৩
৩৫১.	হায়াতুল মুছান্নিফীন (১ম ও ২য় খণ্ড)	হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স, মিরপুর, পরিবেশক আল-কাউসার প্রকাশনী জুন ২০১২
৩৫২.	২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা	মো. কোরবান আলী	তপন কুমার দে, টিকাটুলী, ঢাকা ২১ আগস্ট ২০০৫
৩৫৩.	সেনাপতি মুহাম্মদ ও তাঁর যুদ্ধ কৌশল	মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ শফিউদ্দিন	ওমর সাঈদ খান, উত্তরা, ঢাকা পরিবেশক-জামেরা প্রকাশনী প্যারীদাস রোড, ঢাকা-জুলাই ২০০৫
৩৫৪.	বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন	মুহাম্মদ লোকসান হোসাইন	বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, বাংলাবাজার, ঢাকা, মে ২০০৬
৩৫৫.	মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সফলতা - বাংলাদেশ (২০০৯-২০১০)	-সেন্টার ফর ন্যাশনাল এণ্ড রিজিওনাল স্টাডিস পরিবেশনায়	-স্বরাহ প্রকাশনী ফেব্রুয়ারি ২০১০
৩৫৬.	সত্যের পথে জিহাদ	হুসাইন আল জাওয়াদ	মালেক মাহমুদ, সিদ্দীকিয়া পাবলিকেশন্স। বাংলাবাজার, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০০৬
৩৫৭.	খেলাফত থেকে রাজতন্ত্র ঃ হিজাজ ফিরিয়ে দাও	আবু আদনান	আব্দুল্লাহ আবু সাদ, চিন্তাধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৩৫৮.	সংগ্রাম ও সাধনা	এবিএম আলউল্লাহ	মুহাম্মদ নোমান, কুরআন মজিল লাইব্রেরী, মার্চ ২০১৩ ঢাকা
৩৫৯.	মওদুদী জামাত ফেৎনার স্বরূপ	আনোয়ার কবির	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৩
৩৬০.	রক্তে ধুয়ে আসে মুক্তি	আহ্বায়ক মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ডিসেম্বর ১৯৯৮
৩৬১.	এ ইসলাম ইসলামই নয়	-মোহাম্মদ বায়জীদ খান পন্নী	হিযবুত তওহীদ, করটিয়া, টাঙ্গাইল, প্রকাশকাল-নাই
৩৬২.	গবেষণার ধারণাপত্র	সামীম মোহাম্মদ আফজাল	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ ২০১৪
৩৬৩.	আলিয়া মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা	সামীম মোহাম্মদ আফজাল	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ ২০১৪
৩৬৪.	জামায়াত ইসলামী বিরোধীদের গোপন রহস্য	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	তরিফুল ইসলাম, বাগেরহাট,২০০৬
৩৬৫.	জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ কেন টার্গেট	মেহেদী হাসান পলাশ	বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার / ডিসেম্বর ২০০৬
৩৬৬.	জিহোদ ও জঙ্গীবাদ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম	শ্যামল বাংলা একাডেমী রাজশাহী এপ্রিল ২০১০

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
৩৬৭.	পরিবর্তিত বিশ্ব ও আলেমদের করণীয়— মাও হানিফ জালান্ধার	মুফতি জামিল আহমদ	আবুজর গিফারী অক্টোবর ২০১২
৩৬৮.	ঐক্যের ডাক	আল্লামা কাজী মু'তাসিস বিল্লাহ(দা: বা:)	মাও.মুস্তাফীজুর রহমান মোমতাজী/ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৬৯.	হযরত হাফেজ্জীহুজুর এবং শীর্ষ স্থানীয় এলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্কবানী	মজলিসে দাওয়াতুল হক	বাংলাদেশ আল-আবরার ট্রাষ্ট ঢাকা
৩৭০.	জিহাদ কি ও কেন?	আহমদ আব্দুল কাদের	বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন ঢাকা জানুয়ারি ২০০৮
৩৭১.	জীবন ও কর্ম	আল্লামা শাহ আহমদ শফী	মাওলানা মুনির আহমদ/ তারীমুল কুরআন কমপ্লেক্স/ চট্টগ্রাম-৯মার্চ ২০১৩
৩৭২.	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব- হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ/ফেব্রুয়ারী ২০১৩
৩৭৩.	ইজহোরে হাকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদূদী মতবাদ	হযরতুল আল্লামা মাওলানা মাহ আহমদ শাফী সাহেব(দা.রা.)	মাওলানা মুহাম্মদ আনাস
৩৭৪.	আল্লামা আশরাফ আলীথানভী ও নেজামে ইসলাম পার্টির ভূমিকা — আল্লামা মুফতি	মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি/ জুলাই ২০১৩
৩৭৫.	আল্লামা আহমদ শফী ও হেফাজতে ইসলাম	মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী	ইসলামী গবেষণা পরিষদ/চট্টগ্রাম/আগষ্ট২০১৩
৩৭৬.	ইসলামী রাজনীতি		বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৩৭৭.	একবিংশ শতাব্দীর মহান ব্যক্তিত্ব কুতবে যামান	আল্লামা শাহ জমীর উদ্দিন নানুপুরী (রহ) ফেরদাউস	৩৭৮. চাকলাদার, মার্চ ২০১৪
৩৭৯.	বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পোষ্টমার্টেম	বদরুল ইসরাম মুনীর	চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, নভেম্বর ১৯৯২
৩৮০.	ইসলামের নামে এত দল! আমরা যাব কোথায়?	শাহ আলম খান	ইনকিলাব পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৩৮১.	ইনফাক ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর হাকিকত	খন্দকার আবুলখায়ের	খন্দকার প্রকাশনী, ঢাকা বইমেলা- ২০০৪
৩৮২.	শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোট	মুফতী মুহাম্মদ শফী	হরফ প্রকাশ, ২২ জুলাই ২০০১
৩৮৩.	একটি খানি মিষ্টি হাসি ও ইসলামিক আন্দোলন	সিরাজুল ইসলাম মতলীব	প্রফেসরস পাবলিকেশন, এপ্রিল ২০০১১
৩৮৪.	ইসলামী আন্দোলন ও আমাদের ঘর	শাব্বির আহমদ মানযার ক্বুদুসী	সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, অক্টোবর ১৯৯২
৩৮৫.	জিহাদ সন্ত্রাস না রহমত?	মাললানা মাসউদ আযহার	জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন, নভেম্বের ১৯৯৯
৩৮৬.	মুক্তির পয়গাম	ইবনে মাসুম	আইসি এস পাবলিকেশন, মে ২০০৬

ক্র.নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশক/প্রকাশকাল
৩৮৭.	ডাঃ জাকির নায়েক ও আমরা	মুহাম্মদ ইসহাক খান	খান প্রকাশনী, ৩ জুন ২০১১
৩৮৮.	ইসলামই বাংলাদেশের ম্যান্ডেটরী জাতীয় আদর্শ	খন্দকার আবুল খায়ের	খন্দকার প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯২
৩৮৯.	ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে	ডক্টর হাসান জামান	রিমঝিম প্রকাশনী, নভেম্বের ২০০৩
৩৯০.	এক নজরে বাংলাদেশ	কুরআন শিক্ষা সোসাইটি	প্রকাশনি বাংলাদেশ কুরআন, শিক্ষা সোসাইটি, চতুর্থ মুক্স এপ্রিল ২০১১
৩৯১.	চরমোনাইর পীর ছাহেবের ওয়াজ সম্বলিত পুস্তিকা মাওয়ায়েজে কারিমিয়া এ লিপিবদ্ধ বয়ানের তাত্ত্বিক আলোচনা	মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম	
৩৯২.	শরীয়তের দৃষ্টিতে রাজনীতি ও খেলাফত	মাওলানা মু গোলাম হাক্কানী	মোঃ গোলাম রহমান সাইদী কসরা বি বাড়িয়া, ১৯৯১
৩৯৩.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন পরিচিতি, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসুচি	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	

ডায়েরী

ক্র. নং	নাম	সংগঠনের ও লেখকের নাম	প্রকাশকাল
৩৯৪.	জামিয়া আরাবিয়া	ইমদাদুল উলুম	ফরিদাবাদ, ঢাকা, ২০১৩

ফোল্ডার

ক্র. নং	নাম	সংগঠনের নাম	প্রকাশকাল
৩৯৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন পরিচিতি, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	
৩৯৬	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	ঢাকা/জানুয়ারি ২০০৫
৩৯৭.	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির—সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির	

কওমি মাদ্রাসা পাঠ্য বই

ক্র. নং	নাম	সংগঠনের নাম	প্রকাশকাল
৩৯৮.	ইতিহাস পাঠ (৩য় শ্রেণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৬
৩৯৯.	ইতিহাস পাঠ (৪র্থ শ্রেণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৬
৪০০.	আদর্শ বাংলা পাঠ (৪র্থ শ্রণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৬
৪০১.	ইতিহাস পাঠ (পঞ্চম শ্রেণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৬
৪০২.	আদর্শ বাংলা পাঠ(৫ম শ্রণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৬
৪০৩.	সাহিত্য সওগাত (৮ম শ্রেণি)	বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ	প্রকাশকাল -২০০৩

পত্রিকা

ক্র. নং	নাম	সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল
৪০৪.	মাসিক নতুন ডাক	সিদ্দিকুর রহমান	জানুয়ারি, ২০১৩-জানুয়ারি, ২০১৪
৪০৫.	মাসিক আদর্শ নারী	মাওলানা জহিরুল ইসলাম	নবেম্বর, ২০১২-এপ্রিল, ২০১৩
৪০৬.	মাসিক আল-আমানাহ	মাওলানা আব্দুস সামাদ	ডিসেম্বর, ২০১২-এপ্রিল, ২০১৩
৪০৭.	মাসিক আল-কাউসার	মুফতি আবুল হাসান মোঃ আব্দুল্লাহ	সেপ্টেম্বর, ২০১২-জুলাই, ২০১৪
৪০৮.	মাসিক রহমানী পয়গাম	মাওলানা মোঃ মামুনুল হক	জানুয়ারি, ২০১২-আগস্ট, ২০১৪
৪০৯.	মাসিক আল-আশরাফ	মুফতি রুহুল আমিন	জুন, ২০১৩
৪১০.	মাসিক আল জামিয়া	নেয়ামতুল্লাহ আল-ফরিদী	মার্চ/জুন, ২০১৩
৪১১.	মাসিক মদীনা	মাওলানা মহিউদ্দিন খান	ডিসেম্বর, ১৯৯৯-মে, ২০১৩
৪১২.	মাসিক মুইনুল ইসলাম	আহমদ শফী	নবেম্বর, ১৯৯৭ - ডিসেম্বর, ২০১৩ জানুয়ারি,২০১৪
৪১৩.	মাসিক আল- আবরার	মুফতি আরসাদ রহমানী	৫ জুন ২০১৩
৪১৪.	আলোর পথে	আবু আম্মান আব্দুল্লাহ	অক্টোবর/ডিসেম্বর, ২০১২
৪১৫.	মাসিক আত্-তাওহীদ	মাওলানা আব্দুল হালীম বোখারী ড.আ ফ ম খালিদ হোসেন	জানুয়ারি, ১৯৯৩-সেপ্টেম্বর, ২০১৪
৪১৬.	মাসিক নেয়ামত	আঃ কুদ্দুস	জুলাই, ২০১৩-আগস্ট- ২০১৪
৪১৭.	মাসিক আল নাবা	যোবায়ের রশিদ	জুন/জুলাই, ২০১৩
৪১৮.	মাসিক মহিলা কণ্ঠ	মুফতি তাজুল ফাত্তাহ	জুন, ২০১৩
৪১৯.	সাপ্তাহিক লিখনী	শাহ ইফতেখার তারিক	মার্চ, ২০১৩ - অক্টোবর, ২০১৩
৪২০.	কাফেলা	জামেয়া মাদানিয়া ইসলামী	২০১৩
৪২১.	আল ক্বাসিম	আবুল কালাম জাকারিয়া	মে ২০১৩
৪২২.	আলোর মিনার	মাওলানা মোঃ ইসহাক খান	এপ্রিল, ২০১৩ ও জুলাই ২০১৪
৪২৩.	মাসিক তরজুমান	জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী	মে ২০১৩
৪২৪.	মাসিক রহমত	মনজুর আহমদ	৬ এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩
৪২৫.	মাসিক দাওয়াতুল হক	মুফতি হাবিবুর রহমান কাসেমী	জুন, ১৯৯৮- এপ্রিল, ২০০১
৪২৬.	মাসিক দাওয়াতুল হক	মুফতি হাবিবুর রহমান কাসেমী	সেপ্টেম্বর ২০১২-আগস্ট, ২০১৪
৪২৭.	মাসিক আল-হক	এম এম ফুরকান উল্লাহ খলিল সুলতান যওক নদভী	ফেব্রুয়ারি, ২০১০-সেপ্টেম্বর, ২০১৪
৪২৮.	জাগো মুজাহিদ	আব্দুর রহমান ফারুকী হরকাতুল জিহাদ, হাফেজ আঃ হাই	মে, ১৯৯২ - ডিসেম্বর ২০০২
৪২৯.	চেতনা	জাকারিয়া হাসানবাদী	অক্টোবর, ২০০৪
৪৩০.	মাসিক মুজাহিদ বার্তা	মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	মার্চ, ১৯৯৬
৪৩১.	মাসিক আল-রশিদ	মুফতী ছাঈদ আহমদ	মে, ১৯৮৮ - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪
৪৩২.	ছাত্র সংবাদ	মজিবর রহমান মঞ্জু	অক্টোবর-২০০২-ফেব্রুয়ারী ২০১২
৪৩৩.	মাসিক আদর্শ নারী	মুফতী আবদুল হাসান	মার্চ-এপ্রিল ২০১৩
৪৩৪.	মাসিক নতুন ডাক	মুফতী ফয়জুল্লা	জানুয়ারী ২০১৪

ক্র. নং	নাম	সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম	প্রকাশকাল
৪৩৫.	আলোর মিনার	আল্লামা শফী	এপ্রিল ২০১৩-জুলাই, ২০১৪
৪৩৬.	ইসলামিক রেনেসা	মুফতী হারুন ইজাহার	ডিসেম্বর ২০১৩
৪৩৭.	মনযিল	বদিউল আলম	জানুয়ারী ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারী ২০০৬
৪৩৮.	সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ	মাঃ ইকরামুল হাসান	জানুয়ারী ২০১৪-ফেব্রুয়ারী ২০১৪
৪৩৯.	মাসিক আল আমানাহ	মাওলানা আবদুস সামাদ	এপ্রিল ২০১৩
৪৪০.	মাসিক আল আজহার	হোসেইন আহমদ	মে ২০১৩
৪৪১.	দেশ জগত	হারুন ইজহার চৌধুরী	জুন-২০১০-জুলাই ২০১৩
৪৪২.	আজকের সূর্যোদয়	খোন্দকার মোজাম্মেল হক	ফেব্রুয়ারী ২০১৪
৪৪৩.	সত্য সমাগত	মনসুর আহমদ	জানুয়ারী ২০১৪
৪৪৪.	আনন্দ ধারা	মঈনুল আহসান সাবের	ফেব্রুয়ারী ২০১৪
৪৪৫.	Perspective	Dr. Md. Fakhruddin Manik	June 2011
৪৪৬.	Weekly	Nida-e-Khilafat (Lahor)	vol. 21, 22 (No. 5, 27, 30, 43)
৪৪৭.	আল-মানাহিল	জাকারিয়া হাসনাবাদী	সেপ্টেম্বর ২০১২
৪৪৮.	মাসিক জিজ্ঞাসা	মোঃ তাজুল ইসলাম	জুলাই ২০১২
৪৪৯.	ইসলামী সম্মেলন স্মারক	মামুনুর রমীদ নূরী,	মে ২০০৮
৪৫০.	আলোর পথে	হাসেইন আহমদ	ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৪৫১.	মাসিক আল কাউসার	শরীফ মোহাম্মদ	ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৪৫২.	ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা	সামিউল আহম্মদ খান	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩
৪৫৩.	প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী	আবদুল হক চৌধুরী	প্রকাশকাল ২০০৬
৪৫৪.	A History of Arakan	Mohammad Yunus	প্রকাশকাল ১৯৯৫
৪৫৫.	রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস	এন এম হাবিব উল্লাহ	প্রকাশকাল ১৯৯৫
৪৫৬.	National Refugee Week	The Refugee Council of Australia	17 June, 1992
৪৫৭.	আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম	আবদুল মাবুদ খান	প্রকাশকাল ২০০৭
৪৫৮.	সারজীনম আরকান কি তাহরিকে আজাদী	মুহম্মদ তাহের জামাল নভদী, আরাকান হিষ্ট্রিকাল সোসাইটি	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
৪৫৯.	অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস	মোহাম্মদ ইউনুছ	প্রকাশকাল ১৯৯৮
৪৬০.	বার্মায় মুসলিম গণহত্যা	আবুল হোসেন মাহমুদ	প্রকাশকাল ২০১৮
৪৬১.	আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস	ড. মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড	সেপ্টেম্বর ২০১৩
৪৬২.	ইতিহাসের ধারায় বাংলাদেশ আরাকান সম্বন্ধ	এবনে গোলাম সামাদ	নভেম্বর ২০০০
৪৬৩.	রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ	ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, পরিলেখ	প্রকাশকাল ২০১৮
৪৬৪.	রোহিঙ্গা গণহত্যা কাঠগড়ায় সু চি	ইমরুল কায়েস, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন	প্রকাশকাল ২০১৮